প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

দশম ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক — চৈত্র

১৩১৭

।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ষিক মূল্য তিন টাকা ছয় আনা।

বর্ণানুক্রমিক চিত্র-সূচী

সূচীপত্র

লেখক ও তাঁহাদের রচনার বর্ণানুক্রমিক-সূচী

সূচীপত্র

ইত্যাদি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

১০ম ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩১৭

১ম সংখ্যা

মাতৃশ্রাদ্ধ

আমি কোনো ইংরেজি বইয়ে পড়েছি, যে, ঈশ্বরকে যে পিতা বলা হয়ে থাকে সে একটা রূপক মাত্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে পিতার সঙ্গে সন্তানের যে রক্ষণ পালনের সম্বন্ধ ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সেই সম্বন্ধ আছে বলেই এই সাদৃশ্য অবলম্বনে তাঁকে পিতা বলা হয়।

কিন্তু একথা আমরা মানিনে। আমরা তাঁকে রূপকের ভাষায় পিতা বলিনে। আমরা বলি পিতামাতার মধ্যে তিনিই সত্য পিতা মাতা। তিনিই আমাদের অনন্ত পিতামাতা, সেই জন্যেই মানুষ তার পৃথিবীর পিতামাতাকে চিরকাল পেয়ে আস্‌চে। মানুষ যে পিতৃহীন হয়ে মাতৃহীন হয়ে পৃথিবীতে আসে না তার একমাত্র কারণ, বিশ্বের অনন্ত পিতামাতা চিরদিন মানুষের পিতা মাতার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে আস্‌চেন। পিতার মধ্যে পিতারূপে যে সত্য সে তিনি, মাতার মধ্যে মাতারূপে যে সত্য সে তিনি।

পিতামাতাকে যদি প্রাকৃতিক দিক্ থেকে দেখাই সত্য দেখা হত, অর্থাৎ আমাদের মর্ত্ত্যজীবনের প্রাকৃতিক কারণ মাত্র যদি তাঁরা হতেন, তাহলে এই পিতামাতা সম্ভাষণকে আমরা ভুলেও অনন্তের সঙ্গে জড়িত করতুম না। কিন্তু মানুষ পিতামাতার মধ্যে প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে ঢের বড় জিনিষকে অনুভব করেছে—পিতামাতার মধ্যে এমন একটি পদার্থের পরিচয় পেয়েছে যা অন্তহীন, যা চিরন্তন, যা বিশেষ পিতামাতার সমস্ত ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে; পিতামাতার মধ্যে এমন একটা কিছু পেয়েছে, যাতে দাঁড়িয়ে উঠে চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহতারাকে যিনি অনাদি-অনন্তকাল নিয়মিত করচেন সেই পরম শক্তিকে সম্বোধন করে বলে উঠেছে পিতানোঽসি—তুমি আমাদের পিতা। একথা যে নিতান্তই হাস্যকর প্রলাপবাক্য এবং স্পর্দ্ধার কথা হত যদি এ কেবলমাত্রই রূপক হত। কিন্তু মানুষ এক জায়গায় পিতামাতাকে বিশেষ ভাবে অনন্তের মধ্যে দেখেছে, এবং অনন্তকে বিশেষ ভাবে পিতামাতার মধ্যে দেখেছে, সেই জন্যেই এমন দৃঢ় কণ্ঠে এতবড় অভিমানের সঙ্গে বল্‌তে পেরেছে "পিতানোঽসি।"

মানুষ পিতামাতার মধ্য থেকে যে অমৃতের ধারা লাভ করেছে সেইটেকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখেছে কোথাও তার সীমা নেই, দেখেছে যেখান থেকে সূর্য্যনক্ষত্র তাদের নিঃশেষহীন আলোক পাচ্চে, জীবজন্তু যেখান থেকে অবসানহীন প্রাণের স্রোতে ভেসে চলে আজ পর্য্যন্ত কোনো শেষে গিয়ে পৌঁছল না, সেই জগতের অনাদি আদি প্রস্রবণ হতেই ঐ অমৃতধারা প্রবাহিত হয়ে আস্‌চে; অনন্ত ঐখানে আমাদের কাছে যেম্‌নি ধরা পড়ে গেছেন অমনি আমরা সেই দিকেই মুখ তুলে বলে উঠেছি "পিতানোঽসি"—বলেছি, যাকেই পিতা বলে ডাকিনা কেন, তুমিই আমাদের পিতা।

তুমি যে আমাদেরই, অনন্তকে এমন কথা বল্‌তে শিখ্‌লুম এইখান থেকেই। তোমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য

কারবার নিয়ে তুমি আছ সে কথা ভাবতে গেলেও ভয়ে মরি - কিন্তু ধরা পড়ে গেছ এইখানেই—দেখেছি তোমাকে পিতার মধ্যে, দেখেছি তোমাকে মাতার মধ্যে তাই তুমি যত বড়ই হওনা কেন, পৃথিবীর এই এক কোণে দাঁড়িয়ে বলেছি, তুমি আমাদের পিতা—পিতানোহসি। আমাদের তুমি আমাদের, আমার তুমি আমার।

এমন করে যদি তাকে না পেতুম তবে তাকে খুঁজতে যেতুম কোন্ রাস্তায়? সে রাস্তার অন্ত পেতুম কবে এবং কোন্খানে? যত দূরেই যেতুম তিনি দূরেই থেকে যেতেন। কেবল তাঁকে অনির্ব্বচনীয় বল্‌তুম, অগম্য অপার বল্‌তুম।

কিন্তু সেই অনির্ব্বচনীয় অগম্য অপার তিনিই আমার পিতা, আমার মাতা, তিনিই আমার,—মানুষকে এই একটি অদ্ভুত কথা তিনি বলিয়েছেন। অনধিগম্য এক মুহূর্ত্তে এত আশ্চর্য্য সহজ হয়েছেন।

একেবারে আমাদের মানব-জন্মের প্রথম মুহূর্ত্তেই। মা'র কোলে মানুষের জন্ম এইটেই মানুষের মস্ত কথা এবং প্রথম কথা। জীবনের প্রথম মুহূর্ত্তেই তার অধিকারের আর অন্ত নেই; তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে এত বড় স্নেহ তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, জগতে এত তার মূল্য। এ মূল্য তাকে উপার্জ্জন করতে হয় নি, এ মূল্য সে একেবারেই পেয়েছে।

মাতাই শিশুকে জানিয়ে দিলে বিশাল বিশ্বজগৎ তার আত্মীয়, নইলে মাতা তার আপন হত না। মাতাই তাকে জানিয়ে দিলে, নিখিলের ভিতর দিয়ে যে যোগের সূত্র তাকে বেঁধেছে সেটি কেবল প্রাকৃতিক কার্য্যকারণের সূত্র নয়, সে একটি আত্মীয়তার সূত্র। সেই চিরন্তন আত্মীয়তা পিতামাতার মধ্যে রূপ গ্রহণ করে জীবনের আরম্ভেই শিশুকে এই জগতে প্রথম অভ্যর্থনা করে নিলে। একেবারেই যে অপরিচিত এক নিমেষেই তাকে সুপরিচিত বলে গ্রহণ করলে—সে কে? এমনটা পারে কে? এ শক্তি আছে কার? সেই অনন্ত প্রেম, যিনি সকলকেই চেনেন, এবং সকলকেই চিনিয়ে দেন।

এই জন্যে প্রেম যখন চিনিয়ে দেন, তখন জানা-শুনা চেনা-পরিচয়ের দীর্ঘ ভূমিকার কোনো দরকার হয় না, তখন রূপগুণ শক্তিসামর্থ্যের আসবাব আয়োজনও বাহুল্য হয়ে ওঠে, তখন জ্ঞানের মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওজন করে হিসেব করে চিন্‌তে হয় না। চিরকাল তাঁর যে চেনাই রয়েছে, সেই জন্যে তাঁর আলো যেখানে পড়ে সেখানে কেউ কাউকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না।

শিশু মা বাপের কোলেই জগৎকে যখন প্রথম দেখ্‌লে তখন কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে না বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থেকে একটি ধ্বনি এল—এস, এস। সেই ধ্বনি মা বাপের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে এল কিন্তু সে কি মা-বাপেরই কথা? সেটি যাঁর কথা তাঁকেই মানুষ বলেছে "পিতানোহসি।"

শিশু জন্মাল আনন্দের মধ্যে, কেবল কার্য্যকারণের মধ্যে নয়। তাকে নিয়ে মা-বাপের খুসি, মা-বাপকে নিয়ে তার খুসি। এই আনন্দের ভিতর দিয়ে জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আরম্ভ হল। এই যে আনন্দ, এ আনন্দ ছিল কোথায়, এ আনন্দ আসে কোথা থেকে? যে পিতামাতার ভিতর দিয়ে শিশু এ'কে পেয়েছে, সেই পিতামাতা এ'কে পাবে কোথায়? এ কি তাদের নিজের সম্পত্তি? এই আনন্দ জীবনের প্রথম মুহূর্ত্তেই যেখান থেকে এসে পৌঁছল সেইখানে মানুষের চিত্ত গিয়ে যখন উত্তীর্ণ হয় তখনই এত বড় কথা সে অতি সহজেই বলে পিতানোহসি তুমিই আমার পিতা আমার মাতা।

আমাদের এই মন্দিরের একজন উপাসক আমাকে জানিয়েছেন আজ তাঁর মাতার শ্রাদ্ধদিন। আমি তাঁকে বলচি আজ তাঁর মাতাকে খুব বড় করে দেখবার দিন, বিশ্বমাতার সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে দেখবার দিন।

মা যখন ইন্দ্রিয়-বোধের কাছে প্রত্যক্ষ ছিলেন তখন তাঁকে এত বড় করে দেখবার অবকাশ ছিলনা। তখন তিনি সংসারে আচ্ছন্ন হয়ে দেখা দিতেন। আজ তাঁর সমস্ত আবরণ ঘুচে গিয়েছে—যেখানে তিনি পরিপূর্ণ সত্য সেইখানেই আজ তাঁকে দেখে নিতে হবে। যিনি জন্মদান করে নিজের মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে বিশ্বমাতার পরিচয়-সাধন করিয়েছেন আজ তিনি মৃত্যুর পর্দ্দা সরিয়ে দিয়ে সংসারের আচ্ছাদন ছিন্ন করে সেই বিশ্বজননীর মধ্যে নিজের মাতৃত্বের চিরন্তন মূর্ত্তিটি সন্তানের চক্ষে প্রকাশ করে দিন।

শ্রাদ্ধদিনের ভিতরকার কথাটি, শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ হচ্চে বিশ্বাস।

আমাদের মধ্যে একটি মূঢ়তা আছে; আমরা চোখে দেখা কানে শোনাকেই সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি। যা আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধের আড়ালে পড়ে যায়, মনে করি সে বুঝি একেবারেই গেল। ইন্দ্রিয়ের বাইরে শ্রদ্ধাকে আমরা জাগিয়ে রাখতে পারিনে।

আমার চোখে দেখা কানে শোনা দিয়েই ত আমি জগৎকে সৃষ্টি করিনি যে আমার দেখা শোনার বাইরে যা পড়বে তাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যাকে চোখে দেখ্‌ছি, যাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জান্‌চি, সে যাঁর মধ্যে আছে, যখন তাকে চোখে দেখিনে, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানিনে, তখনো তাঁরই মধ্যে আছে। আমার জানা আর তাঁর জানা ত ঠিক এক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। আমার যেখানে জানার শেষ সেখানে তিনি ফুরিয়ে যান নি। আমি যাকে দেখ্‌চিনে, তিনি তাকে দেখ্‌চেন—আর তাঁর সেই দেখায় নিমেষ পড়চেনা।

সেই অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের দেখার মধ্যেই আজ মাকে দেখ্‌তে হবে। আজ এই শ্রদ্ধাটিকে হৃদয়ে জাগ্রত করে তুল্‌তে হবে, যে, মা আছেন, মা সত্যের মধ্যে আছেন; শোকানলের আলোকেই এই শ্রদ্ধাকে উজ্জ্বল করে তুল্‌তে হবে, যে, মা আছেন, তিনি কখনই হারাতে পারেন না। সত্যের মধ্যে মা চিরকাল ছিলেন বলেই তাঁকে একদিন পেয়েছি—নইলে একদিনো পেতুম না—এবং সত্যের মধ্যেই মা আছেন বলেই আজও তাঁর অবসান নেই।

সত্যের মধ্যেই অমৃতের মধ্যেই সমস্ত আছে এ কথা আমরা পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতেই যথার্থতঃ উপলব্ধি করি। যাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহপ্রেমের আমাদের জীবনের গভীর যোগ নেই তারা আছে কি নেই তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না—সুতরাং মৃত্যুতে তারা আমাদের কাছে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইখানেই মৃত্যুকে আমরা বিনাশ বলেই জানি।

কিন্তু এ মৃত্যুর অর্থ কি ভেবে দেখ। যে-মানুষকে আনন্দের মধ্যে দেখিনি তাকে অমৃতের মধ্যেই দেখিনি—আমার পক্ষে সে কেবল মাত্র চোখে-দেখা কানে শোনার অনিত্য লোকেই এতদিন ছিল; যেখানে তাকে সত্যরূপে বৃহৎরূপে অমররূপে দেখতে পেতুম সেখানে সে আমাকে দেখা দেয় নি।

যেখানে আমার প্রেম সেইখানেই আমি নিত্যের স্বাদ পাই, অমৃতের পরিচয় পেয়ে থাকি। সেখানে মানুষের উপর থেকে তুচ্ছতার আবরণ চলে যায়, মানুষের মূল্যের সীমা থাকেনা। সেই প্রেমের মধ্যে যে মানুষকে দেখেছি তাকেই আমি অমৃতের মধ্যে দেখেছি। সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে তার মধ্যে অসীমকে দেখ্‌তে পাই, এবং মৃত্যুতেও সে আমার কাছে মরে না।

যাকে আমরা ভালবাসি মৃত্যুতে সে যে থাক্‌বে না এই কথাটা আমাদের সমস্ত চিত্ত অস্বীকার করে;—প্রেম যে তাকে নিত্য বলেই জানে, সুতরাং মৃত্যু যখন তার প্রতিবাদ করে তখন সেই প্রতিবাদকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে এতই কঠিন হয়ে ওঠে। যে মানুষকে আমার অমৃতলোকের মধ্যে দেখেছি তাকে মৃত্যুর মধ্যে দেখ্‌ব কেমন করে?

মনের ভিতরে তখন একটি কথা এই ওঠে—প্রেম কি কেবল আমারই? কোনো বিশ্বব্যাপী প্রেমের যোগে কি আমার প্রেম সত্য নয়? যে শক্তিকে অবলম্বন করে আমি ভালবাস্‌চি আনন্দ পাচ্চি সেই শক্তিই কি সমস্ত বিশ্বে সকলের প্রতিই আনন্দিত হয়ে আছেন না? আমার প্রেমের মধ্যে এমন যে একটি অমৃত আছে, যে অমৃতে আমার প্রেমাস্পদ আমার কাছে এমন চিরন্তন সত্য—সেই অমৃত কি সেই অনন্ত প্রেমের মধ্যে নেই? তাঁর সেই অনন্ত প্রেমের সুধায় আমরা কি অমর হয়ে উঠিনি? যেখানে তাঁর আনন্দ সেইখানেই কি অমৃত নেই?

প্রিয়জনেরই মৃত্যুর পরে প্রেমের আলোকে আমরা এই অনন্ত অমৃতলোককে আবিষ্কার করে থাকি। সেই ত আমাদের শ্রদ্ধার দিন,—সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অমৃতের প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রাদ্ধের দিনে আমরা মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে অমৃতের প্রতি সেই শ্রদ্ধা নিবেদন করি; আমরা বলি, মাকে দেখ্‌চিনে কিন্তু মা আছেন। চোখে দেখে হাতে ছুঁয়ে যখন বলি মা আছেন তখন সে ত শ্রদ্ধা নয়—আমার

সমস্ত ইন্দ্রিয় যেখানে শূন্যতার সাক্ষ্য দিচ্চে সেখানে যখন বলি মা আছেন তখন তাকেই যথার্থ বলে শ্রদ্ধা। নিজে যতক্ষণ পাহারা দিচ্চি ততক্ষণ যাকে বিশ্বাস করি তাকে কি শ্রদ্ধা করি? গোচরে এবং অগোচরেও যার উপর আমার বিশ্বাস অটল তারই উপর আমার শ্রদ্ধা। মৃত্যুর অন্ধকার-ময় অন্তরালেও যাকে আমার সমস্ত চিত্ত সত্য বলে উপলব্ধি করচে, তাকেই ত যথার্থ আমি সত্য বলে শ্রদ্ধা করি।

সেইশ্রদ্ধাই প্রকাশ করার দিন শ্রাদ্ধের দিন। মাতার জীবিতকালে যখন বলেছি, মা তুমি আছ--তার চেয়ে ঢের পরিপূর্ণ করে বলা, আজকের বলা—যে, মা তুমি আছ। তার মধ্যে আর একটি গভীরতর শ্রদ্ধার কথা আছে— "পিতানোহসি।" হে আমার অনন্ত পিতামাতা তুমি আছ, তাই আমার মাকে কোনো দিন হারাবার জো নেই।

যে দিন বিশ্বব্যাপী অমৃতের প্রতি এই শ্রদ্ধা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠবার দিন—সেই দিনকারই আনন্দমন্ত্র হচ্চে :—

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধু মান্নোবনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

এই আনন্দমন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর ধূলি থেকে আকাশের সূর্য্য পর্য্যন্ত সমস্তকে অমৃতে অভিষিক্ত করে মধুময় করে দেখবার দিন এই শ্রাদ্ধের দিন। সত্যং—তিনি সত্য, অতএব সমস্ত তাঁর মধ্যে সত্য এই শ্রদ্ধা যে দিন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে সেই দিনই আমরা বল্‌তে পারি আনন্দং—তিনি আনন্দ এবং তাঁর মধ্যেই সমস্ত আনন্দে পরিপূর্ণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লঙ্কায় বৌদ্ধ বিহার

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম-এ, পি-এইচ, ডি, কর্ত্তৃক বিবৃত বিবরণ হইতে)

গত বৎসর শ্রাবণের প্রথমে আমরা কলিকাতা হইতে লঙ্কা যাত্রা করি। রেলপথে তুতিকোরিন গিয়া তারপর জাহাজে যাইতে হয়।

তুতিকোরিনে যাত্রীদের থাকিবার জন্য একটি বৃহৎ ধর্ম্মশালা আছে। এই ধর্ম্মশালায় যাহার ইচ্ছা সেই থাকিতে পায়। ধর্ম্মশালার দ্বার কোন সময়েই রুদ্ধ করিবার নিয়ম নাই। আমাদের সঙ্গে অনেক জিনিস পত্র, আহারের জন্য চাউল, দাইল প্রভৃতিও ছিল। বাক্সগুলি ষ্টেশন-মাষ্টারের জিম্মায় রাখিয়া অত্যাবশ্যক ও মূল্যবান্ জিনিস-গুলি লইয়া আমরা ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। আমাদের ধর্ম্মশালাটি একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা, এককালে শত শত লোক আহার বিশ্রাম করিতে পাবে। বাড়ীটির এক অংশ আর্য্যাবর্ত্ত ও অপর অংশ দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। আর্য্যাবর্ত্তের অংশে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম দেখিয়া আমাদের অসুবিধার আশঙ্কায় আমরা সপরিবারে দাক্ষিণাত্য-বিভাগেরই একটি প্রকাণ্ড ঘর অধিকার করিয়া রহিলাম। আগন্তুকগণ কে, কোথা হইতে আসিতেছে, কয় দিন থাকিবে এ-সকল জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ, তবে আহার্য্য প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য "কয়জন" এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিবার জন্য একজন লোক আসিল। আমাদের আহারীয় সঙ্গেই ছিল, কেবল জ্বালানি কাষ্ঠ লইতে হইল।

সন্ধ্যার পর একটু অসুবিধা হইল। রাজ্যের যত দোকানী, পসারী, পথিক, সকলে আসিয়া সেই ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দ্বার রুদ্ধ করিবার নিয়ম নাই, সুতরাং বিশেষ সতর্কভাবে কতকটা বিনিদ্র অবস্থাতেই রাত্রি যাপন করিতে হইল।

পরদিন একখানি ষ্টীমলঞ্চে চড়িয়া আমরা সিংহলাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। সেই বিশাল বারিধিবক্ষে কদলী পত্রের মত লঞ্চখানি কম্পিতকলেবরে হেলিতে দুলিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। মন্নার উপসাগর একেই বিশেষ চঞ্চল, তাহাতে আবার মৌসুমীর সময়; প্রতিমুহূর্ত্তেই ভয় হইতে

লাগিল লঞ্চখানি এইবার ডুবিয়া যাইবে। মনে হইতে লাগিল এরূপ ভয়সঙ্কুল অবস্থায় পড়িব জানিলে পূর্ব্বেই নিরস্ত হইতাম।

এইরূপে কয়েক মাইল আসিয়া বড় জাহাজে উঠিতে হইবে। একে সমুদ্রের চঞ্চলতা, তাহাতে বড় জাহাজের গায়ে লাগিয়া ঢেউগুলি লঞ্চখানিকে ডুবাইবার যোগাড় করিতেছে। বিপদের উপর বিপদ। লঞ্চ হইতে জাহাজে উঠিতে হইবে। লঞ্চ প্রায় সমুদ্রের সহিত সমতলে, আর জাহাজ অতি উচ্চ। কিরূপে পার হইব সে এক মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। শেষে এক অভিনব উপায়ে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। একটি বড় ঢেউএ চড়িয়া লঞ্চখানি যেমন জাহাজের ডেকের প্রায় সমান উঁচুতে উঠিল, তখনই উভয়দিকের লোকের সাহায্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে জাহাজে পার হইয়া গেলাম। সে স্থলে কতকটা নিরাপদ। এতক্ষণ প্রাণের আশঙ্কায় জিনিসপত্রের খোঁজ লইবার অবসর পাই নাই, এইবার সে কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম নিজেরা রক্ষা পাইয়াছি ইহাই যথেষ্ট, জিনিসের আশা করা বৃথা। কিন্তু জাহাজের কাপ্তেনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ও দেখিলাম জিনিসপত্র সব জাহাজে পৌঁছিয়াছে, কাহারও ছাতাগাছটি পর্য্যন্ত গোলমাল হয় নাই। এই সুবন্দোবস্ত দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

তুতিকোরিন হইতে বেলা ৩॥ টার সময় রওনা হইয়াছিলাম, পরদিন প্রাতঃকাল ৬টার সময় লঙ্কায় পৌঁছিলাম। জাহাজ অতি গভীর জল দিয়া চলে, রাত্রে অন্ধকারে সমুদ্রের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে না পাইলেও জাহাজের দোলানিতেই ভয়ে গা কাঁপিতে লাগিল। বন্দরের নিকটে জল অনেকটা স্থির। মাটিতে নামিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

এইখানে ভারত হইতে লঙ্কার পথের কথা একটু বলিয়া লই। আমরা যে দিক দিয়া আসিলাম তাহা ভিন্ন আর একটি পথ আছে—তাহাতে রামেশ্বর হইতে Coast Line ষ্টিমারে আসিতে হয়। এই ষ্টিমার সপ্তাহে একদিন পাওয়া যায়। এ পথে তরঙ্গের ভয় নাই—জলের গভীরতাও খুব কম। রামেশ্বর ও পাম্বান দ্বীপ হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত পথে ৫২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। জলের গভীরতা স্থানে স্থানে ৩।৪ ফুট মাত্র। এই সকল দ্বীপে লোকালয় খুব কম, মাঝে মাঝে দুই চারিটি মুসলমানের বাড়ী আছে মাত্র। এখানকার কলা ও নারিকেল প্রসিদ্ধ। পাম্বান ও লঙ্কার মধ্যে মান্নার দ্বীপ। এই দ্বীপটি বড়, অনেক ঘরবাড়ী আছে। এইখানে জলের গভীরতা ৬।৭ ফুট মাত্র হইলেও ষ্টিমারের জন্য যন্ত্রদ্বারা খুঁড়িয়া ১০ ফুট গভীর একটি পথ করা হইয়াছে। এই পথের চিহ্ন রাখিবার জন্য জলের মধ্যে দুই সারি তালগাছ পুঁতিয়া দেওয়া হইয়াছে। বলিতে গেলে লঙ্কা ভারতেরই এক অংশ। এই দ্বীপসকল কোন সময়ে পরস্পর সংযুক্ত ছিল এরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের সেতু এই দ্বীপশ্রেণীকেই বলা যায়। আর বানররাও কল্পিত জীব নয়। দাক্ষিণাত্যের অনেক লোক, এমনকি বড় বড় রাজা জমিদার পর্য্যন্ত, আপনাদিগকে হনুমানের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। রামেশ্বরের ষ্টিমার কোম্পানীর এজেণ্ট মহাশয়ই নিজেকে রাবণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিলেন। ইঁহাদের মতে রাবণ দাক্ষিণাত্যের তামিল বংশীয় রাজা ছিলেন। পরে লঙ্কা অধিকার করিয়া তথায় বাস করেন এবং খর ও দূষণকে দাক্ষিণাত্যে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

আধুনিক সিংহলে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারি বিভাগ। ইহার মধ্যে দক্ষিণবিভাগের রাজধানী গল্ নাকি রাবণের শীতাবাস ছিল। গল অতি সুন্দর স্থান, পরবর্ত্তীকালে পর্ত্তুগীজ ও দিনেমারদের সময়েও ইহা রাজধানী ছিল। উত্তর বিভাগের রাজধানী অনুরাধপুর। পশ্চিমে কলম্বো। পূর্ব্ববিভাগের নিউরেলিয়া পর্ব্বতটি রাবণের গ্রীষ্মাবাস বলিয়া কথিত। ইহা বর্ত্তমানকালে লঙ্কার শাসনকর্ত্তার গ্রীষ্মাবাস। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রত্নপুর ও নিউরেলিয়ার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে মৃত্তিকায় কয়লার অংশ অধিক, লঙ্কার অপর কোনও স্থলে এরূপ নহে। প্রবাদ এই যে ইহা হনুমানের লঙ্কাদাহেরই সাক্ষ্যমাত্র। গলে রাবণের রাজধানীর নিকটে সীতাবক নামে এক নিবিড় অরণ্য আছে। সেখানে সীতাকুণ্ড নামে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী প্রভৃতি রামায়ণোক্ত অশোক কাননের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সিংহলবাসীদিগেরও সেইরূপ বিশ্বাস। কলম্বোর সন্নিকটে কল্যাণী গঙ্গার তীরে বিভীষণের মন্দির দৃষ্ট হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের পূর্ব্বে সিংহলে শৈব ধর্ম্মের অধিক
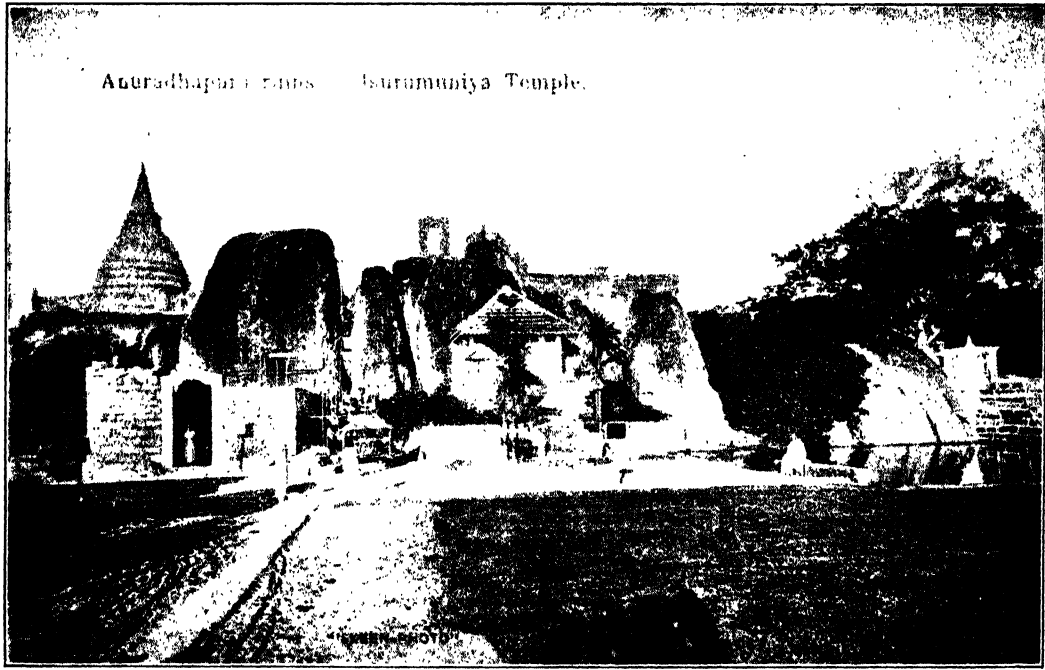
ঈশুরমণি মন্দির।

প্রভাব ছিল এরূপ প্রবাদ আছে। এখনও তথায় শৈবধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অনেক।

অনুরাধপুরে অতি প্রাচীন ঈশুরমণি মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন। এই মূর্ত্তিটি পাহাড়ের গা খুদিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে।

আডাম্‌স্ পীক, শ্রীপাদপর্ব্বত বা সমন্তকূট (৭৫০০ ফুট উচ্চ) শিখরের উপর একটি বৃহৎ পদচিহ্ন বিদ্যমান আছে। শৈব তামিলগণ বলেন এটি মহাদেবের পদচিহ্ন। রাবণবধের পূর্ব্বে রামচন্দ্র ইহার পূজা করেন। বৌদ্ধগণের বিশ্বাস ইহা বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন। মুসলমানগণ ইহাকে আদমের পদচিহ্ন বলিয়া দাবী করেন। পর্ত্তুগীজ খ্রীষ্টানগণ সেণ্ট টমাসের পদচিহ্ন বলিয়া মনে করেন। সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীই ইহার পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু মন্দিরটি একজন বৌদ্ধ পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে আছে। এই মন্দিরের আয় খুব বেশী এবং এরূপ সমৃদ্ধ দেবালয় এখানে আর নাই।

পুরাকালের যক্ষ, রাক্ষস ও নাগগণ শৈব ছিল, বর্ত্তমান তামিল অধিবাসিগণও শৈব। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য হইতে তামিলগণ দলে দলে লঙ্কায় গমন করে। ইহারা শৈব, সংখ্যায় বৌদ্ধ অপেক্ষা কিছু কম। সন্ধ্যাকালে যখন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টা-নিনাদিত মন্দির হইতে "শিবা-শিবা" রব উত্থিত হয় তখন মনে হয় পুণ্যভূমি বারাণসীরই অংশবিশেষে বিচরণ করিতেছি। তামিলগণ গায় ভস্ম মাখে। লঙ্কায় নানা প্রকারের ভস্ম বা বিভূতি দৃষ্ট হয়।

পর্ত্তুগীজগণের অধীনতায় সিংহলীরা সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিল। এখনও ফার্ণাণ্ডো প্রভৃতি নাম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই নামধারী লোক খাঁটি সিংহলী। ইংরাজ-রাজত্বে থিয়সফী সম্প্রদায়ের প্রভাবে এই প্রথার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন সিংহলীরা বিশুদ্ধ সংস্কৃত নামের আদর করিয়া থাকে এবং পূর্ব্বের ন্যায় গ্রীক্, লাটিন প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত ও পালি ভাষা শিখিয়া থাকে।

আডাম্‌স্ পীক্ প্রকৃত মলয় পর্ব্বত। বৌদ্ধজাতক-আখ্যানে উল্লিখিত আছে যে বুদ্ধ যখন পাম্বান বা নাগদ্বীপে উপস্থিত হন, সেই সময় লঙ্কার রাজা রাবণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে লঙ্কায় লইয়া যান। মলয়

শ্রীপাদপর্ব্বত বা সমন্তকূট বা মলয়পর্ব্বত।

পর্ব্বতে বুদ্ধের আবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই কথা লঙ্কাবতারসূত্র নামক প্রাচীন মহাযান গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

কলম্বোতে আমাদের জন্য একটি সুন্দর বাঙ্গলা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমাদের বাসার নিকটেই বিদ্যোদয় সংস্কৃত কলেজ। সেইখানে আমার পূর্ব্বপরিচিত কয়েকজন গুজরাটী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারাও আমাদের বাসাতেই রহিলেন। লঙ্কায় মাছ খাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, কতক বা আগ্রহের অভাবে, কতকটা বা গুজরাটী বন্ধুদের খাতিরে। তাঁহারা যে বাসায় মাছ রান্না হয় সেখানে থাকেন না। লঙ্কায় প্রচুর পরিমাণে নানা প্রকার ফল পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নারিকেল, কমলা ও আনারস প্রধান। কমলা এক একটি এত বড় হয় যে দুইজনে খাইয়া শেষ করা যায় না। ভিক্টোরিয়া পার্ক ও বাজার আমাদের বাসার নিকটে।

প্রথমে মনে ভয় ছিল লঙ্কায় গিয়া না জানি কত অসুবিধাই ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু তত্রত্য বিদ্যোদয় বিহারের অধ্যক্ষ মহাস্থবির সুমঙ্গলের কৃপায় কোন অসুবিধাই ঘটে নাই। বিশেষতঃ অনাগারিক ধর্ম্মপাল তখন লঙ্কায় ছিলেন। তিনি ও তাঁহার আত্মীয়গণ আমাদের বিশেষ সহায়তা করেন। যে দিন গিয়া পৌঁছিলাম সেদিন বিহারের অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবনা মনে করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন শুনিয়া সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকট গেলাম। বিহারটি আমাদের বাসার ঠিক সম্মুখে।

আমার বিশ্বাস ছিল সিংহলে পালি বা সংস্কৃতের সেরূপ চর্চ্চা নাই, কিন্তু সুমঙ্গল মহাশয়ের উভয় ভাষায় পাণ্ডিত্য দেখিয়া ভ্রম দূর হইল। প্রত্যেক বিহারেই সংস্কৃত ও পালি বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করা হয়। সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণে ভিক্ষুগণ সুপণ্ডিত। সুমঙ্গলের সহিত আমার সংস্কৃত ও পালি ভাষার সাহায্যে কথোপকথন হইল। আমার নাম পূর্ব্বেই তাঁহাদের জানা ছিল। আমার কলম্বো পৌঁছিবার অল্প পরেই অনেক লোক আমাকে দেখিতে আসিলেন।

বিহারটি আমাদের বাসার নিকটে হওয়ায় তথায় ভিক্ষুদের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিবার খুব সুবিধা হইয়াছিল।

ভিক্ষুগণ খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করেন। আমি ৫টার সময় উঠিয়াও দেখি তাঁহারা পূর্ব্বেই উঠিয়াছেন।
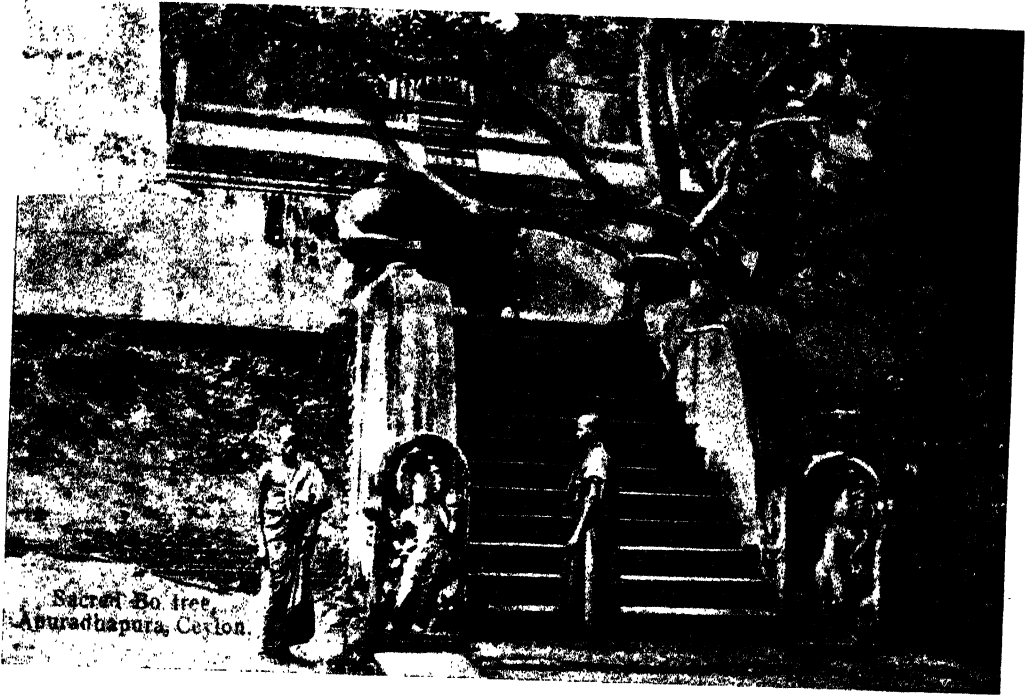
বিহার, ভিক্ষু ও বোধিবৃক্ষ।

প্রত্যেক বিহারেই সাতটি অত্যাবশ্যক জিনিস থাকা চাই। ইহা না হইলে বিহার হইতেই পারে না।

প্রথম, বোধিবৃক্ষ। বুদ্ধ যে বৃক্ষতলে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, সেই বৃক্ষের একখানি শাখা অশোক লঙ্কায় প্রেরণ করেন। তাহা হইতে সহস্র সহস্র বোধিবৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া প্রত্যেক বিহারে বিরাজ করিতেছে।

দ্বিতীয় চৈত্য বা স্তূপ। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র লঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে গেলে সেখানকার লোকেরা জিজ্ঞাসা করে "আমরা ত বুদ্ধকে দেখিতে পাইলাম না, তাঁহার ধর্ম্ম লইব কি প্রকারে?" তদুত্তরে মহেন্দ্র বলেন, "যে বুদ্ধের কোন দেহাবশেষ দেখিয়াছে সেই বুদ্ধকে দেখিয়াছে বলা যায়।" তদনুসারে অশোক বুদ্ধের গলদেশের একখানি অস্থি ও শরীরের অন্যান্য অংশের অস্থিখণ্ড তথায় প্রেরণ করেন। এই অস্থিখণ্ডসমূহ অতি পবিত্র পদার্থ। প্রত্যেক বিহারেই চৈত্যমধ্যে ইহার অংশ আছে। চৈত্যকে ইংরাজীতে প্যাগোডা বলা হয়। প্যাগোডা, ড্যাগোবা শব্দেরই রূপান্তর। ড্যাগোবার অর্থ ধাতুগর্ভ। যে বিহারে বুদ্ধের এই চিহ্ন নাই তাহা অপবিত্র। বৌদ্ধগণের বিশ্বাস যে চৈত্য নির্ম্মাণ অতি পুণ্যের কার্য্য এবং এই পুণ্যের পরিমাণও চৈত্যের উচ্চতার উপর নির্ভর করে। এই জন্য চৈত্যগুলি অতি প্রকাণ্ড আকারে প্রস্তুত হয়। অনেক চৈত্যের উচ্চতা কলিকাতার মনুমেণ্ট অপেক্ষাও অধিক। এই পুণ্যাকাঙ্ক্ষা এত প্রবল যে এই জন্য ধনী বৌদ্ধেরা প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। এবং অনেকে মৃত্যুকালে উইল দ্বারা সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ চৈত্য নির্ম্মাণে দান করিয়া অবশিষ্ট উত্তরাধিকারিগণের জন্য রাখিয়া যান। চৈত্যমধ্যে অস্থি রক্ষা করিবার প্রণালী চমৎকার। চৈত্যগুলির তিনটি ভাগ থাকে। উপরে চূড়া, মধ্যে অস্থির আধার ও নীচে ভিত্তি। মধ্যস্থলে ব্যতীত উপরে ও নীচেও অস্থিচিহ্ন রাখিতে হয়। তাহার কারণ এই যে যদি কোনও বিধর্ম্মী চৈত্যের চূড়া ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং এমন কি মধ্য দেশও যদি উৎপাটিত করে, ভিত্তিদেশের অস্থিখণ্ড স্থাপনকর্ত্তার পুণ্যকীর্ত্তি রক্ষা করিবে।

প্রতিমাগৃহ বিহারের তৃতীয় অঙ্গ। ইহাতে বুদ্ধমূর্ত্তি থাকে। সাধারণতঃ চারি অবস্থার বুদ্ধমূর্ত্তি দেখা যায়। তবে অধিকাংশ স্থলেই শয়িত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

উপোষথ-গৃহ।

তাহার কারণ এই যে এই মূর্ত্তি যত বৃহদাকার হইবে স্থাপন-কর্ত্তার পুণ্যও তত অধিক বিবেচিত হয়। দণ্ডায়মান, ধ্যানস্থ বা আসনস্থ মূর্ত্তি অপেক্ষা শয়িত মূর্ত্তি অধিক বড় করা যায়। এই মূর্ত্তি যে গৃহে থাকে তাহাকে প্রতিমাগৃহ বলে। এই প্রতিমাগৃহের দেয়ালগুলি অতি সুদৃশ্য সুরঞ্জিত চিত্রে শোভিত।

বিহারের আর একটি অঙ্গ উপোষথ-গৃহ। এটি সাধারণতঃ লোকালয় হইতে দূরে হ্রদমধ্যে নির্ম্মিত হয়। সেখানে ভিক্ষুগণ প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেই দিনে কৃত পাপকার্য্যের ক্ষালনের জন্য ধ্যান করেন। তার পর প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে এই উপোষথ-গৃহে সমবেত হইয়া সঙ্ঘরাজের নিকট তাঁহাদিগকে নিজ নিজ পাপের উল্লেখ করিয়া অনুতাপ করিতে হয়। সঙ্ঘরাজ সমবেত ভিক্ষুগণকে প্রত্যেক প্রকার নিষিদ্ধ কার্য্যের উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন কেহ ঐ কার্য্য করিয়াছেন কি না। কেহ করিয়া থাকিলে উত্তরে তাহা স্বীকার করিতে হয়। উপোষথ-গৃহ অতি নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। হ্রদের মধ্যে উচ্চ স্তম্ভের উপর স্থাপিত। চারিদিকে তাল ও নারিকেলের গাছের সারি ইহাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছে। ভিক্ষুগণ ভিন্ন অপর কাহারও এই হ্রদে নৌকা চালনের অধিকার নাই। বিশেষতঃ ভিক্ষুগণের বিচারের সময় চারিদিকে পাহারা থাকে। প্রশান্ত হ্রদের মধ্যে জলের ধারে বারান্দায় বসিয়া পূর্ণিমা ও অমাবস্যা নিশিতে শত শত ভিক্ষু যখন ভগবানের আরাধনা করেন তখন কি এক মধুর পবিত্র ভাবের উদয় হয় তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়।

পর্ণশালা বা ছাত্রদের থাকিবার ছোট ছোট কুটীরগুলি বিহারের আর এক অঙ্গ।

এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক বিহারে প্রধান পুরোহিতের একটি কক্ষ এবং একটি পুস্তকাগার আছে। পৃথিবীর মধ্যে আর কোন দেশে লাইব্রেরীর এত আদর নাই। পুস্তক-গুলি অধিকাংশই হস্তলিখিত। সেগুলি এমন সুন্দর ভাবে সাজানো যে নাম করিবামাত্র সেই বই বাহির করা যায়। এরূপ সুন্দর সাজানোর, এবং সংখ্যা, বিভাগ প্রভৃতির প্রণালী অন্য কোন ভাষার গ্রন্থের নাই।

ভিক্ষুদের নিয়ম বড় কঠোর। লাভ বা অলাভ, সুখ বা দুঃখ, প্রশংসা বা নিন্দা, যশ বা অযশ হইতে পারে

এরূপ কার্য্য ব পক্ষে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ তাঁহারা উল্লিখিত আট প্রকার লোকধর্ম্ম হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কলম্বোবিহারের প্রধান পুরোহিত আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। কিন্তু স্নেহ ভালবাসা তাঁহাদের নিষিদ্ধ। এজন্য তিনি এরূপ ভাবে কৌশলে আমার কথা বলিতেন যে তাহাতে তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহার একজন গৃহস্থ ছাত্র প্রতিদিন বেড়াইয়া আসিলেই আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রথমে মনে করিতাম ঐ ছাত্রটিরই আগ্রহ, কিন্তু ক্রমে প্রকৃত কথা জানিতে পারিলাম।

ভিক্ষুদের পক্ষে সঞ্চয় নিষিদ্ধ। প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণে ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাহা পাইবেন ঠিক সেই সময়ে তাহা আহার করিতে হইবে, অপর দিনের জন্য রাখিয়া দিবার নিয়ম নাই। দ্বিপ্রহরের পরে কিছু আহার করিবার নিয়ম নাই। জলপান করিতে পারেন। প্রত্যেক বিহারেই শত শত নারিকেল প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। কিন্তু ভিক্ষুরা তাহা স্পর্শও করেন না, ভৃত্যেরা সেগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার করে, ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করেন না। দান করাও ভিক্ষুদের পক্ষে নিষিদ্ধ, কেননা তাহাতে প্রশংসা হইতে পারে। তবে বুদ্ধমূর্ত্তি দানে ও ধর্ম্মগ্রন্থ বিতরণে তাঁহাদের অধিকার আছে।

ভিক্ষু হইতে হইলে প্রথমে প্রব্রজ্যা লইতে হয়। ২০ বৎসরের অনধিক বয়স্ক যুবকের প্রব্রজ্যা গ্রহণের অধিকার নাই। প্রব্রজ্যা লইতে ইচ্ছা করিলে সেই যুবককে পিতা মাতার অনুমতি লইয়া কোন ভিক্ষুর নিকট গিয়া স্বীয় ইচ্ছা জানাইতে হয়। ঐ ভিক্ষু তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, যথা, তোমার নাম কি? বয়স কত? রাজকর্ম্মচারী কি না? কোন রোগ আছে কি না? পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছ কি না? পিতা মাতার অনুমতি পাইয়াছ কি না? প্রভৃতি।

তাহার পর ঐ ভিক্ষু তাহাকে সঙ্ঘনায়কের নিকট লইয়া যান। সঙ্ঘনায়ক সভা আহ্বান করিয়া যথারীতি সঙ্ঘের নিয়মাবলী শিক্ষা দিয়া তাহাকে উপসম্পদা প্রদান করেন। পরে তাহাকে ভিক্ষুপদে উন্নীত করা হয়। ভিক্ষুরা মহাসম্মানের পাত্র, রাজা অপেক্ষাও তাঁহাদের সম্মান অধিক।

ভিক্ষুগণের দৈনিক কতকগুলি কাজ আছে, তন্মধ্যে বোধিবৃক্ষ প্রদক্ষিণ ও পাঠ প্রধান। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা তাঁহাদের জীবনের সম্বল। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রব্রজ্যার অধিকারী নহে। ভিক্ষুদের মধ্যে কাহারও ব্যাধি প্রায় দেখা যায় না।

আমরা বিহার দেখিবার জন্য অনুরাধপুরে গিয়াছিলাম। এই অনুরাধপুরে পূর্ব্বে জ্যোতিষের মানমন্দির ছিল। এইখান হইতেই হিন্দুজ্যোতিষের দ্রাঘিমা গণনা করা হইত। পরে উজ্জয়িনী হইতে গণনা আরম্ভ হয়। ইহাতেও বোধ হয় লঙ্কা এক সময়ে ভারতের সহিত সংযুক্ত ছিল। অনুরাধপুর প্রাচীন ভারতের স্মৃতি জাগরিত রাখিয়াছে। এখানে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত যে সকল প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন আছে তাহা বোধ হয় সমস্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন চিহ্নগুলির সমষ্টি অপেক্ষা ন্যূন নহে। পুরাতত্ত্ববিদের পক্ষে এই স্থান অতি আদরের জিনিস। নিকটেই মিহিন্তাল পর্ব্বত। এই স্থানেই মহেন্দ্রের সহিত লঙ্কার রাজার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। মহেন্দ্র লঙ্কেশ্বরকে নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক সম্বোধন করেন। মহেন্দ্র ও তৎসমভিব্যাহারী পীতবসনধারী বৌদ্ধভিক্ষুগণকে দেখিয়া রাজা প্রশ্ন করেন—"আপনারা কাহার প্রজা?"

মহেন্দ্র উত্তর দিলেন যে "যিনি স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালের অধিপতির নিকটও নত নহেন তাঁহারা তাঁহারই প্রজা"।

এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন রাজার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। মহেন্দ্র এক আমগাছ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ঐটি কি গাছ?"

রাজা। "আমগাছ।"

"আর আমগাছ আছে?"

"হাঁ, আছে।"

"আমগাছ ভিন্ন অন্য গাছ আছে?"

"হাঁ আছে।"

"সমস্ত গাছ হইতে ঐ অন্য গাছগুলি বাদ দিলে কি গাছ থাকে?"
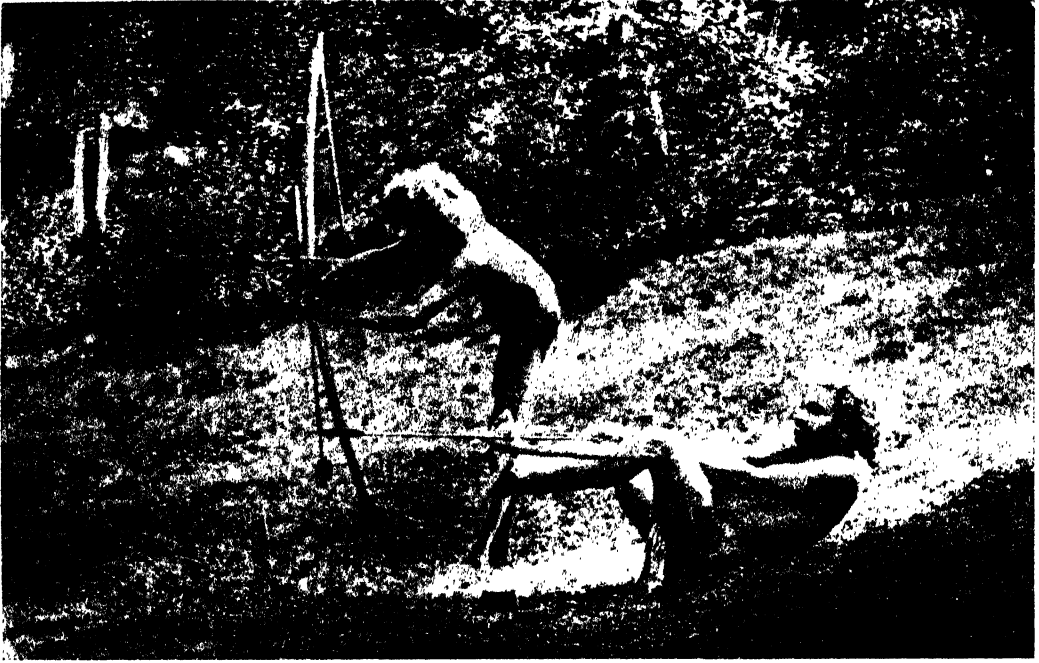
"আমগাছ।"

বেদ্দা বা ব্যাধ।

"সমস্ত আমগাছ হইতে ঐটি ছাড়া অন্যগুলি বাদ দিলে কি গাছ থাকে ?"

"ঐ আমগাছটি থাকে।"

রাজার বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহেন্দ্র তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন।

ঐ স্থানের আম্রকাননে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার সময় মহেন্দ্রের স্মরণোদ্দেশে মহামেলা হয়। সমগ্র সিংহল হইতে সহস্র সহস্র লোক মিহিন্তাল পর্ব্বতের উপর সমাগত হয়।

ডো-ডো-ভুয়া বিহারও অতি প্রসিদ্ধ। ঐস্থান দেখিবার জন্য আমরা সেখানে উপস্থিত হইলে আমাকে অনুরোধে পড়িয়া সেখানকার হলে বক্তৃতা দিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আধ ঘণ্টার মধ্যে লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত সেই স্থানে মহাজনতা হইয়া গেল। বক্তৃতা শ্রবণে তথাকার লোকের খুব উৎসাহ দেখিলাম। রাত্রি একটার সময় বক্তৃতা শেষেও ভিড় কমে নাই। জনতা না কমিলে আমরা বাহির হইতে পারি না, জনতাও আমরা না গেলে কমে না।

বিহারটি সমুদ্রের ধারে। রাত্রে যে ঘরে আমাদের বাসা পাইয়াছিলাম তাহার পাদদেশে সমুদ্রের ঢেউ আঘাত করিতেছিল। সমুদ্রের হাওয়ায় দিবসের সমস্ত ক্লান্তি দূরে গেল। সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জনে রাত্রি ৪॥০ টার সময় নিদ্রা-ভঙ্গ হইলেও কোন অবসাদ বোধ করি নাই। সেখানে একটি হাঁসপাতাল আছে। তথায় একজন ডাক্তার ছিলেন কিন্তু বহুকাল রোগী না থাকায় তিনি স্থানান্তরে গিয়াছেন, এখন একজন কম্পাউণ্ডার আছেন। তাহার নিকট শুনিলাম ঔষধগুলি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে, ২৫ বৎসরের মধ্যে কোন রোগী সেখানে দেখা যায় নাই। স্থানটির নাম ডডন-ডুবা। ইহার একদিকে সমুদ্র অপর দিকে এক হ্রদ। এই স্থানের বিহার শৈলবিম্বারাম লঙ্কার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ও সুদৃশ্য স্থান।

আমরা গলে গিয়াছিলাম। সেখানে রাবণকোটী নামে একটি পর্ব্বতখণ্ড প্রায় অর্দ্ধ মাইল সমুদ্রমধ্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধকালে বহু সৈন্যের বিনাশ দেখিয়া রাবণ হিমালয়ে বিশল্যকরণী আনিতে লোক পাঠান। কিন্তু কেহই ঐ

ঔষধ চিনিয়া আনিতে না পারায় হিমালয়ের এক পর্ব্বত-খণ্ডই ভাঙ্গিয়া আনিয়াছিল। রাবণকোটী সেই পর্ব্বতাংশ। ইহার দক্ষিণে মাতরম্‌ নামক স্থানে কালিদাসের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। রত্নপুরের নিকটে সীতাবন নামে এক নিবিড় অরণ্য আছে।

এখানকার লোকের আতিথ্য অতুলনীয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা অতিথিদের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানে ভৃত্যদের নিকট বহু অর্থ দেওয়া থাকে, অতিথিদের যাহা ইচ্ছা চাহিলেই পাইয়া থাকেন। নারিকেল অতি প্রসিদ্ধ, বিশেষতঃ লাল নারিকেল। ইহাকে সর্ব্বরোগ-হর বলা যায়।

গলে মহেন্দ্র কলেজের ইউরোপীয় প্রিন্সিপাল বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। সেখানে ভারতীয়ের, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর, আদর খুব বেশী। কোন বাঙ্গালীর আগমন-সংবাদ পাইলে শত শত লোক তাঁহাকে দেখিতে আসে।

সিংহলের অধিবাসীদের মধ্যে তিন প্রকারের লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) যক্ষ, রক্ষ ও নাগগণের বংশধর। ইহাদিগকে বেদ্দা বা ব্যাধ বলে। ইহাদের সংখ্যা ক্রমে কমিতেছে। হয়ত অল্প দিনের মধ্যে এই জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে।

(২) বাঙ্গালী সেনাপতি বিজয়সিংহের সন্তানসন্ততি। ইহারাই সিংহলী বৌদ্ধ। ইহাদের ভাষার তিনচতুর্থাংশ শব্দ সংস্কৃত এবং বাঙ্গালার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। গণের প্রভাবে ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব ক্রমে বাড়িতেছে। বাঙ্গালীদের সহিত এই জাতির আকৃতিগত সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়। আচার ব্যবহারও অনেক মিলে। অন্নাহারেও ইহারা বাঙ্গালীকে অনুকরণ করে।

(৩) তামিল। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য হইতে লঙ্কায় গিয়াছে। তামিলরা শৈব। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-গণ খুব নিষ্ঠাবান। পৌরোহিত্য ইহাদের উপজীবিকা। ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও আছেন। তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্যপ্রভাব বিশেষভাবে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ইউরোপ-প্রত্যাগত তামিলগণও গায়ে ভস্ম মাখিয়া থাকেন ও পরিচ্ছদে জাতীয়তা বজায় রাখেন।

প্রায় ছয়মাস পরে আমরা লঙ্কা হইতে বিদায় লই। আসিবার সময় সহজপথে কোষ্টলাইন ষ্টীমারে রামেশ্বর দিয়া আসিয়াছিলাম।

এক্ষণে রেলওয়ে কোম্পানী পুনর্ব্বার রামেশ্বর হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সেতুবন্ধের আয়োজন করিতেছেন। আশা করি দুইএক বৎসর মধ্যেই রেল চলিবে।

শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরী।

মহারাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণ

খুব ভোর থেকেই শ্রোতে মহারাজের বাড়ী সানাইয়ের বাজনা বাজ্‌তে আরম্ভ হয়েছে। এ সানাইটী আমাদের অনেক দিনের পরিচিত। প্রায় পাঁচবৎসর ধরে যেখানে "হল্‌দিকুঙ্কুম" "পানশুপাড়ি" "দোল্‌নায় ডালা" "গৌরীপূজা" "গণেশপূজা" আর যতকিছুর নিমন্ত্রণ হয়েছে, নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে গিয়েই ঐ সানাইয়ের ধ্বনি শুনেছি, আর তখনই বুঝেছি সেই চেনা-শোনা সুরটী ছাড়া আর কোন সুর নয়। আমাদের এই বিখ্যাত সানাইওয়ালাটী ছাড়া সহরে আর কোন বাদ্যকর আছে কিনা সে বিষয়েও আমার সন্দেহ হয়েছিল।

যাহোক্, বিছানায় শুয়ে সেই একঘেয়ে সুর শুন্‌তে শুন্‌তে তন্দ্রাটী যখন বেশ ভাল করে ভেঙ্গে গেল, তখন মনে পড়্‌লো, আজই শ্রোতে মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র গবাই-য়ের মুঞ্জিবন্ধন অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত ধারণ। শ্রোতে মহা-রাষ্ট্রীব্রাহ্মণ, তাঁর সম্পূর্ণ নাম আত্মারাম বলবন্ত শ্রোতে, 'মহারাজ' উপাধিটী—ব্রাহ্মণত্ব বাচক। বেচারা কলেজে ছেলে পড়িয়ে দেড়শত টাকা মাহিনা পায়, তাইতেই তা'কে অনেক পরিবার প্রতিপালন কর্‌তে হয়। রাজ্য তো দূরের কথা—এককাঠা জমীও তা'র দখলে নাই। অথচ বেশ নির্ব্বিবাদে 'মহারাজ' উপাধিটী ভোগ দখল করে' আস্‌ছে, এজন্য কোন হস্‌পিটাল অথবা মেমোরিয়াল ফণ্ডেও কিছু দান খয়রাত কর্‌তে হয়নি।

শ্রোতের বাড়ীটী আমাদের বাড়ীর ঠিক্ একখানা বাড়ীর পরে। চারচালা, দোচালা ও বাংলা ঘরের চালে চালে জোড়া লেগে অনেকদূর পর্য্যন্ত সৈন্যনিবাসের মত

একটা মস্ত লম্বা বাড়ীর সার চলে গেছে। সেই একচালে ঘর বেঁধে মহারাষ্ট্রী, মান্দ্রাজী, বাঙ্গালী ও পার্শি নানা দেশের নানা জাতির লোক নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করছে। "নানা পক্ষী একবৃক্ষে, নিশীথে বিহরে সুখে, প্রভাত হইলে দশদিকেতে গমন।"—আমাদেরও অবস্থা অনেকটা সেই রকম।—যাহোক্ দশদিকে যখন যেতে হয় তখনকার কথা আলাদা, এখন বেশ সুখেই আছি। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেলে আমাদের বাংলার বারাণ্ডায় মেয়েদের মজলিস বসত, তাতে ঘরসংসার সুখদুঃখের কথার আলোচনা হ'ত। আমার মা অনেক সময়ই পূজা ও মালাজপ এই সব নিয়ে থাকতেন,—কিন্তু এসব যেমন তাঁর নিত্য কাজ, পাড়াপড়্সীর বিপদে আপদে দেখা শুনা খোঁজখবর নেওয়া সেটাও ঠিক্ যেন পূজার মতই নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছিল। স্রোতের মার যত কিছু সুখ দুঃখের কথা সমস্তই আমার মার সঙ্গে। মহারাষ্ট্রদেশে অবরোধ প্রথা নাই, স্রোতেরও কোন বিষয়ে সঙ্কোচ ছিল না, যখন তখন আমাদের বাড়ীর ভিতর এসে মায়ের কাছে খাবার চেয়ে খেতে তাঁর কোন আপত্তি দেখা যেত না।

গবাই ছেলেটাও ঠিক্ বাপের মত সকল বিষয়েই সঙ্কোচহীন। ছুতার মিস্ত্রী দুয়ার মেরামত করতে আরম্ভ করেছে। গবাই কিছুক্ষণ বসে বসে একমনে তার কাজ দেখ্ছে, তারপর তার সঙ্গেই এমন ভাবে কাজে লেগে গেল যেন সে ছুতারেরই ছেলে, চিরকাল মিস্ত্রীর কাজই করে এসেছে। এই রকম গুপারিকাটা পানসাজা থেকে আরম্ভ করে তাতাম্মার (ঠাকুমার) মাথার পাকাচুল তোলা পর্য্যন্ত কোন কাজই তার বাদ যায় না। সকল কাজে সকল স্থানেই তার অবাধগতি। ছেলেটার বয়স নয় বৎসর, চেহারাটা তেমন সুকুমার না হলেও আমার ভারি ভাল লাগ্ত। সুকুমার চেহারা না হ'লেও বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের ছেলেরা কত যত্নে কেশবিন্যাসের জন্য সম্মুখের চুলগুলি পারিপাটী করে রাখে, কিন্তু সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে মহারাষ্ট্রী রুচি সম্পূর্ণ আর একরকম। সেই রুচি অনুসারে মরুভূমির মাঝখানের ওয়েসিসের মত গবাইয়ের মাথার ঠিক মাঝখানে গোলাকার একগোছা চুল আর মাথার চারিপাশ বেশ পরিষ্কার করে ক্ষুর দিয়ে কামানো। এই জন্যে গবাইয়ের চওড়া কপাল আরও বড় ব'লে বোধ হ'ত। কানে দুটী মোটা মোটা সোনার মাকড়ি,—পরনে একখানা চওড়া লালপেড়ে কাপড়। গবাইয়ের নাকটী বেশ আর্য্যোচিত, কিন্তু চোখ দুটী ছোট। আমি স্রোতেকে বার বার আশ্বাস দিতাম তার ছেলে কালে একজন বড়লোক হবে, কেননা অঙ্কের ঘণ্টায় প্রতিদিনই ক্লাসে সে প্রথম থাকে।

স্রোতের বাড়ীর উঠানটী খুব বড়। ঘরগুলি ঘেঁসা-ঘেঁসি হলেও বাড়ীর সম্মুখে অনেকটা করে জায়গা আছে। চারিধারে বাঁশের খুঁটি পুঁতে আজ সমস্ত উঠানটা ঘেরা হয়েছে। উঠানের একপাশে একটা মাটির বেদী। তার উপর মুণ্ডিতমস্তক গবাই একখানি আসনে পূর্ব্বমুখ হয়ে বসে আছে। পুরোহিত সেই বেদীর একপাশেই হোমকুণ্ড জ্বেলেছেন। এইখানে হোম হচ্ছে। আমাদের দেশে যেমন ব্রহ্মচারীকে অসূর্য্যাম্পশ্য হয়ে তিন দিন ঘরের ভিতর বন্ধ থাকতে হয় এখানে সে রকম নিয়ম নাই। তবে মস্তক মুণ্ডন, কাষায়বস্ত্র পরিধান, ভিক্ষাগ্রহণ এ সমস্ত নিয়ম বাংলা দেশেরই মত।—মুঞ্জিবন্ধনে এ দেশে আরও কয়েকটী অনুষ্ঠান আছে, সেগুলি অনেকটা বিবাহের স্ত্রী-আচারের মত।

বাড়ীর ভিতর খুব জোরে বাজনা বেজে উঠল, সেখানে স্ত্রী-আচার আরম্ভ হয়েছে। আত্মারাম ও তাঁর সহধর্ম্মিণী চন্দ্রভাগা বাঈ পাশাপাশি দুখানি চিত্রকরা জলচৌকীতে বসেছেন। চন্দ্রভাগা একখানি বাসন্তী রংএর কাপড় ও ওড়্না পরেছেন, ওড়্নার আঁচলের সঙ্গে আর স্রোতের উত্তরীয়ের সঙ্গে গিরা দিয়ে বাঁধা, (যেমন আমাদের দেশে বরকন্যার গাঁঠছড়া বাঁধে)। ডোলে মহারাজের স্ত্রী (ডোলে একজন অধ্যাপক, মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ) হলুদ নিয়ে গায়ে-হলুদের দিনে বরকে হলুদ মাখাবার মত স্রোতেকে হলুদ মাখাচ্ছেন, আর স্রোতের ছোট বোন কৃষ্ণা বাঈ চন্দ্রভাগাকে হলুদ মাখাচ্ছেন।—স্রোতে আমাকে দেখে ভারী খুসী, হাসতে হাসতে ঈষৎ গর্ব্বিতভাবে বললেন "Well Sir, you are acquainting yourself with the customs of our country." বলিয়া পার্শ্বস্থিতা সহধর্ম্মিণীর দিকে চাইলেন।

কিন্তু চন্দ্রভাগা বাঈ লজ্জিতা হচ্ছেন দেখে শ্রৌতের অনুরোধ সত্ত্বেও আমার সে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান আর ভাল করে দেখা হল না। মুঞ্জিবন্ধনের দিন এরূপ স্ত্রী-আচার আরও অনেক আছে। মুঞ্জিবন্ধন ছেলের, কিন্তু যত টানাটানি ছেলের বাপ মাকে নিয়ে।—দম্পতির একত্রে স্নানের পর একত্রে ভোজন করবারও নিয়ম আছে। এখানে শুধু বালকের পিতা মাতা নয় পিসি মাসি প্রভৃতি আত্মীয়ারাও স্বামীর সঙ্গে একত্রে আহার করেন। পাশা-পাশি দুখানা পিড়ি (পীঠাসন) রাখা হয়, আর সম্মুখে একটা রূপার তেপায়ায় (ত্রিপদিকা) থাবার থাকে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে উভয়কে সেই খাবার খাইয়ে দেন। এটী একটা বিশেষ মঙ্গল অনুষ্ঠান। আহারের সময় বাজনা বাজতে থাকে, সম্মুখে ঘিয়ের প্রদীপ জলে, আর বাড়ীর যে যেথানে আছেন সকলে সেই ঘরে একত্র হন। গুরুজন অথবা পরিজনের সম্মুখে স্বামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা কি একত্রে থাওয়া যে কোন লজ্জার বিষয় মহারাষ্ট্রী রমণীদের এরকম ধারণা একেবারেই নাই। তাঁহারা যেমন অসঙ্কোচে অন্য সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেন, কথাবার্ত্তা বলেন, স্বামীর সঙ্গেও ঠিক সেই রকম ভাব। শ্রৌতের ছোট ভায়ের স্ত্রী জান্‌কী বাঈয়ের বয়স ১৪।১৫ বৎসর। স্বামীর সঙ্গে জান্‌কীর প্রায়ই ঝগড়া হত আর ঝগড়া হলেই জান্‌কী কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরের কাছে গিয়ে স্বামীর নামে নালিস করতেন, শ্বশুর বধূর পক্ষেই থাকতেন, কাজেই লছ্‌মন্ বেচারার প্রত্যেক বারেই হার হত।

আমার কাছে এই নিঃসঙ্কোচ ভাবটী ভারী ভাল লাগে। সোহাগিন্ অর্থাৎ সধবা মহারাষ্ট্র ললনার মাথায় অবগুণ্ঠন দিবার নিয়ম নাই, কেননা তাঁদের মাথার 'ছত্র' আছে; কিন্তু বিধবার তো মস্তকের ছত্র স্বরূপ কেহ নাই, এই জন্য তাঁদের বস্ত্রাচ্ছাদনে মাথা ঢাকতে হয়। অনবগুণ্ঠিতা মহা-রাষ্ট্রীয়া রমণী রাজপথ দিয়ে চলে যেতে একটুও সঙ্কুচিত হন না। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে রমণীরাই পরিবেষণ করেন। শত শত পরিচিত অপরিচিত লোকের মধ্যে অনবগুণ্ঠিতা কুলবধূ পরিবেষণ করছেন—এ দৃশ্য ভাবতে গেলে আমাদের সংস্কারে কেমন একটা আঘাত লাগে। কিন্তু যখন নিমন্ত্রণ সভায় দেখি অনবগুণ্ঠিতা কুলবধূ এক হাতে পরিবেষণ-পাত্র ও এক হাতে দর্ব্বি নিয়ে শত শত লোকের পাতে অন্ন দিচ্ছেন, তখন তাঁদের শ্রমে ক্লান্ত অথচ প্রসন্ন মাতৃমূর্ত্তি দেখলে মনে হয় যেন অন্নপূর্ণা নিজে সন্তানের পাতে অন্ন পরিবেষণ করছেন।

কেবল পরিবেষণ নয়, রাঁধবার ভারও মেয়েদের উপর, রাঁধুনী বামুনের উপর ভার দিয়ে গৃহলক্ষ্মীরা নিশ্চিন্ত থাকেন না। রন্ধন কাজটা খুব 'শোলী'তে (পবিত্রভাবে) হওয়া চাই। মেয়েরা শুদ্ধ কাপড় পরে রাঁধেন। উচ্ছিষ্ট বিচার খুবই আছে, তবে ভাত ডাল এসব সকড়ি বলে ধরা হয় না।

শ্রৌতের বাড়ীতে একদিকে রান্না, একদিকে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন চলছে। কোথাও রাশীকৃত ফুলুরি ভেজে স্তূপাকার করা হয়েছে, কোনখানে অন্নের রাশি, কোথাও নানারকম নাড়ু, কোনখানে পুরাণ-পুরী—এই সব নানা জায়গায় নানারকম আয়োজন।—এদিকে উঠানে পাত পাড়া হয়েছে।—আমাদের দেশের মত সোজাসুজি কুশাসন মাটীর গেলাস আর পাত পাড়া নয়, এখানে থাবার জায়গা করতে আরও কিছু পরিশ্রম ও নৈপুণ্য দরকার। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের ভোজনস্থানের চারিপাশে চৌকা দিতে হবে। ছোট ছোট লোহার হাতল দেওয়া ফাঁপা লোহার 'রোলার', তার চারিদিকে জাফ্‌রীর কাজের মত লতাপাতা খোদাই করা থাকে, আর তার ভিতরে খড়ির গুঁড়া পোরা থাকে; সেই রোলারের হাতল ধরে আস্তে আস্তে প্রত্যেকের পাতের চারিপাশে মাটীতে গড়িয়ে নেওয়া হয়, তাতে তিন আঙ্গুল কি চার আঙ্গুল চওড়া চিত্রবিচিত্র লতাপাতা-আঁকা আলপনার মত একটা দাগ পড়ে যায়; এই রকম দাগটানাকে চৌকাটানা বলে। চৌকাটানা স্থানটী যেন একটী স্বতন্ত্র ঘর। প্রত্যেকে নিজের নিজের চৌকার ভিতর আহার করতে বসেছেন, কারও সঙ্গে কারও কোন সংস্রব নাই।

যাহোক্ ব্রাহ্মণেরা ভোজনে বসলেন। প্রকাণ্ড উঠান। প্রায় দুইশত ব্রাহ্মণ সারি দিয়ে বসেছেন। প্রথমে পাতে পাতে তরকারী পরিবেষণ করা হল, আর সেই সঙ্গে এক একটী পাতার ঠোঙ্গায় ঘি পরিবেষণ করা হল। তরকারির ভিতর ভাজাভুজিই বেশী, আর "কাঢ়ি"টা

চাই-ই চাই। "কাঢ়ি" একরকম ঘোলের তরকারি, মহারাষ্ট্রীদের এটী বড়ই প্রিয় ব্যঞ্জন। তরকারি এমন সুনিয়মে পরিবেষণ করা হয় যে প্রায়ই পাতে কিছু থাকে না, একবারের পরিবেষণের পর পাত একেবারে খালি না হলে আর দ্বিতীয়বার পরিবেষণ করা হয় না। এজন্য প্রায় কোন জিনিস নষ্ট হয় না।

তরকারি আর ঘি পরিবেষণের পর ভাত আর পুরাণ-পুরী পরিবেষণ করা হল। ভাতগুলি খুব মিহি আতপ চালের। ফেন গালবার প্রথা এদেশে নাই, কিন্তু আন্দাজ করে জল দেওয়ার জন্যে ভাত বেশ সুসিদ্ধ হয় অথচ গলেও যায় না, তবে খুব ঝরঝরে হয় না। পিতলের মোটা ডাণ্ডিওয়ালা গোল হাতার মত (দর্ব্বি), যেগুলি দিয়ে আমাদের নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে ব্রাহ্মণেরা তরকারি পরিবেষণ করে, সেই হাতার ভিতর ভাত বেশ চেপে চেপে পূরে ডাণ্ডিটা ধরে থালার উপর উবুড় করলেই ছোট একটী গোল বাটীর আকারের ভাতের চাপ থালার উপর পড়ে, এইরকম এক একটা বড় থালায় ত্রিশ চল্লিশটা বাটীর আকার বিশিষ্ট ভাতের চাপ সাজিয়ে পরিবেষণ স্থানে এনে একটি একটি করে সকলের পাতে দিয়ে যাওয়া হয়। তাড়াতাড়ির সময় এক হাতে ভাতের থালা আর এক হাতে দর্ব্বি নিয়ে যেমন তেমন করে বাটীর ভিতর ভাত চেপে পাতে পাতে হাতা উবুড় করে দিয়ে যাওয়া হয়।

এতক্ষণ ব্রাহ্মণেরা হাত তুলে ছিলেন, পাতে অন্ন পড়লে সকলে গণ্ডূষ করে সমস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। একত্রে শত শত কণ্ঠে উচ্চারিত সেই সু-গম্ভীর বেদগান শুনতে বড়ই সুন্দর। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রী উচ্চারণের যে বিশেষত্ব আছে তাতে শ্লোকোচ্চারণ আরও সুমধুর বোধ হয়।

স্তোত্র পাঠের পর আচমন করে ব্রাহ্মণেরা আহার করতে বসলেন। এক-পত্তন অন্ন ব্যঞ্জন উঠে গেলে আবার নূতন করে ঘি পরিবেষণ করা হল, তার পর পুরাণ-পুরী আর ফুলুরী। পুরাণ-পুরী অনেকটা ডালপুরীর মত, ঘিয়ে ডুবিয়ে খেতে হয়। পুরাণ-পুরীর সঙ্গে আরও তিন চার রকমের পিঠাপুরী ও হালুয়া ছিল। যখন এ সমস্ত খাওয়ার পর পাত বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন লাড্ডু এসে হাজির। এ সমস্ত মিষ্টান্ন ঘরেরই প্রস্তুত, বাড়ীর মেয়েরা দু' তিন দিন ধরে এ সব তৈরি করে রেখেছেন। যিনি যতটী লাড্ডু চাইলেন তাঁকে ততটী দেওয়া হল, উপরোধ করে বেশী দেওয়ার প্রথা এখানে নাই। তা বলে ব্রাহ্মণেরা যে কেউ কম লাড্ডু খেলেন তা নয়।

আমি ভাবছি এইখানেই শেষ, কিন্তু আবার ভাত ও দই এসে উপস্থিত। এবার আর বাটী করে ভাত দেওয়া হল না। মুঠা মুঠা করে যিনি যেমন চাইলেন পাতে পাতে পরিবেষণ করা হল।

সকলের শেষে "অমৃতখণ্ড" নামে একরকম দই ক্ষীর এলাচ কর্পূর প্রভৃতি নানা-উপকরণ-মিশ্রিত পায়েসের মত মিষ্টদ্রব্য পরিবেষণ শেষ হলে ব্রাহ্মণভোজন সমাধা হল।

শ্রী:—

ব্রাউনিং

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের কাব্য-গগনে টেনিসন এবং ব্রাউনিং ভাস্বর নক্ষত্র। বর্ত্তমান সময়ে টেনিসনের নাম সর্ব্বজনবিদিত—দেশে বিদেশে তাঁহার প্রভূত সম্মান; কিন্তু ব্রাউনিংএর পাঠকসংখ্যা নিতান্ত বিরল। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন নহে। টেনিসনের রচনাবলী প্রাঞ্জল, পাঠমাত্রই অর্থপ্রতীতি হয়, ভাবগাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও মস্তিষ্কের ব্যায়াম অনাবশ্যক। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় শব্দ-গ্রন্থন-পটুতা, সুতীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি প্রভৃতি বহুগুণে মণ্ডিত বলিয়া তাঁহার কবিতা পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু ব্রাউনিংএর ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। ব্রাউনিংএর রচনা কোমল-কান্ত পদাবলী নহে, ব্রাউনিং লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকশিক্ষাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার লেখার সর্ব্বত্র পদবিন্যাসের লালিত্য দেখিতে পাই না, অনেক স্থলেই তাঁহার কবিতা কর্কশ-কঠোর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই কর্কশতার অন্তরালে যে অলোক-সামান্য ধীশক্তি এবং অনির্ব্বচনীয়

সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার সন্ধান না পাইয়া অনেক পাঠক ব্রাউনিংএর প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়েন। টীকাকার মল্লিনাথ কিরাতার্জ্জুনীয়ের টীকারম্ভে লিখিয়া গিয়াছেন যে—

"নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ সপদি তদ্‌ বিভজ্যতে।
স্বাদয়ন্তু রসগর্ভনির্ভরং সারমস্য রসিকা যথেপ্সিতম্‌॥"

ব্রাউনিংএর কবিতাও ভারবির রচনার মত কঠোর আবরণে আচ্ছাদিত রসগর্ভ নারিকেল ফলের সহিত উপমিত হইতে পারে। তাহার রসাস্বাদন অসহিষ্ণু পাঠকের ভাগ্যে ঘটিবার নহে। ব্রাউনিংএর মহত্ত্ব কোথায়, তাহার জীবনের এবং কবিতার গভীর উদ্দেশ্য কোন্‌ স্থানে নিহিত, তিনি মানবজাতির নিকট কোন মহান্‌ সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন,—এই কয়েকটী কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করিব। এই জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক Sainte Beauve বলিয়াছেন যে ঈশ্বর, প্রকৃতি, প্রতিভা, ললিতকলা, প্রেম, মানবজীবন—প্রধানত এই ছয়টি মৌলিকতত্ত্ব সর্ব্ববিধ কবিতার মূলীভূত উপাদান। আমরা সমালোচনা-প্রসঙ্গে এই কয়েকটী কথা স্মরণ রাখিব এবং আলোচ্য কবির কাব্যে এই তত্ত্বগুলি কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ ঈশ্বরতত্ত্বের কথা—মানবের সহিত, জগতের সহিত ভগবান্‌ কোন্‌ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এবং কবির হৃদয়-ফলকে ভগবানের মূর্ত্তি কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে ইহা দেখিতে হইবে। জড়বিজ্ঞানবাদী কঠোর বৈজ্ঞানিক বলেন Law is God নিয়মই ঈশ্বর। ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু হইতে বিশাল নক্ষত্রপিণ্ড পর্য্যন্ত জগতের কুত্রাপি নিয়মশৃঙ্খলার ব্যবচ্ছেদ নাই। যেমন বহির্জগতে তেমনি অন্তর্জগতে,—সর্ব্বত্রই নিয়মের সমান শাসন। নিয়মের প্রভাব হইতে অব্যাহতি পায় এমন বস্তু জগতে নাই। নিয়ম সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্য্যামী। সুতরাং নিয়মই ঈশ্বর। টেনিসন বিজ্ঞানের ভক্ত উপাসক ছিলেন, কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিকের হৃদয়-শূন্য উক্তি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন—"God is Law, say the wise", জ্ঞানীর মতে ঈশ্বরই নিয়ম স্বরূপ, নিয়ম ঈশ্বর নহে। নিয়ম স্বরূপ ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে নিয়মের অধিষ্ঠান স্বাভাবিক। তিনি নিয়মের মহত্ত্ব, নিয়মের শক্তিমত্তা উপলব্ধি করিতেন, তাই তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্র নিয়মের মহিমাকীর্ত্তন শুনিতে পাই। তিনি বলেন—"Nothing is that errs from law"। তিনি নিয়মেই ভগবানের সত্তা প্রকাশিত দেখিতে পান। কিন্তু ব্রাউনিং ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহার হৃদয় শুষ্ক নিয়মের দিকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয় না, তিনি ভগবানের সহিত এত দূর-দূর সম্পর্ক ভালবাসেন না। নিয়মের মধ্যস্থতায় ভগবানকে উপলব্ধি করিতে হইবে, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন না। ভগবানের সহিত টেনিসনের সম্পর্ক কতকটা বুদ্ধি-জাত, বুদ্ধি-সংশ্লিষ্ট; ব্রাউনিংএর সম্পর্ক কতকটা হৃদয়ের সম্পর্ক, প্রাণের আকর্ষণ। মানবের অনন্ত চিত্তবেদনা এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে একটী মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য আছে, ব্রাউনিংএর কল্পনা তাহার মধ্য হইতে আপনার জীবনোপযোগী রস আহরণ করে। এই শোভাময়ী প্রকৃতির অনন্ত সুষমার মধ্যে, মানব-হৃদয়ের চির-সঞ্চিত প্রেম-প্রবাহের মধ্যে, ব্রাউনিং ভগবানের আবির্ভাব মনে অনুভব করেন। নব বসন্তের করস্পর্শে সমগ্র প্রকৃতি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, নবোন্মেষিত সৌন্দর্য্যের হিল্লোলে জগৎ স্পন্দিত হইয়াছে, কোকিলকূজন, কুসুমসৌরভ এবং দক্ষিণপবনে চতুর্দ্দিকে একটা বিচিত্র আনন্দের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে—ব্রাউনিং বুঝিলেন ভগবান্‌ বিশ্ব-বিমোহন বেশে জগৎসমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন।

"The lark
Soars up and up, shivering for very joy;
Afar the ocean sleeps; white fishing gulls
Flit where the strand is purple with its tribe
Of nested limpets; savage creatures seek
Their loves in wood and plain—and God renews
His ancient rapture!"

সর্ব্বব্যাপী শক্তি, ইচ্ছা এবং প্রেমের প্রকাশ ব্যতীত প্রাকৃতিক নিয়মের মূল্য নাই। শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম ত জড়শক্তির লীলামাত্র, তাহার সঙ্গে মানব-হৃদয়ের সম্পর্ক কি? ভারতীয় বৈষ্ণব কবির ন্যায় ব্রাউনিং প্রাণে প্রাণে অন্তরে অন্তরে ভগবানের মধুর রূপ ধ্যান করিতে ভাল

বাসেন। তিনি ভাবেন মেঘবিনির্মুক্ত আকাশে দ্বিপ্রহর কালে সূর্য্য যেমন উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়, আমাদের চিত্তগগনে ভগবানের প্রকাশও সেইরূপ, কোন বাধা নাই, কোনও অন্তরায় নাই, বাসনা-মেঘের ছায়ামাত্র নাই।

"He glows above
With scarce an intervention, presses close
And palpitatingly, His soul o'er ours."

টেনিসনের ন্যায় ব্রাউনিংও মঙ্গলবাদী। টেনিসন বলিয়াছেন "Every winter change to spring," ব্রাউনিংও প্রকারান্তরে ঐ কথাই বলিয়াছেন- তবে উভয়ে প্রভেদ আছে। টেনিসন মানবজাতির অনন্ত উন্নতিতে বিশ্বাসবান্, ব্রাউনিং-এর কল্পনায় মানবজাতির কথা তত বেশী স্থান পায় না। তিনি মানবের ব্যক্তিগত জীবনের এবং ভবিষ্যতের কথা লইয়াই ব্যস্ত। ব্রাউনিং মনে করেন জ্ঞান বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক অধিকারের সীমা বিস্তারের দ্বারা কখন মানুষের চিরন্তন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। প্রকৃত উন্নতি মানবের অনুভবশক্তি, আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ এবং দুঃখসহিষ্ণুতার উপরে নির্ভর করে। এ সংসারে মানুষমাত্রই অতৃপ্ত, রাজ্যেশ্বর হইতে পথের কাঙ্গাল পর্য্যন্ত সকলেই নিজ নিজ অবস্থায় অসন্তুষ্ট, এ সীমাবদ্ধ সংসারের ক্ষুদ্র সুখে তাহার অনন্ত পিপাসা তৃপ্ত হয় না, তাহার হৃদয়ের অনন্ত সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা পার্থিব জগতের সর্ব্বসৌন্দর্য্য ভোগ করিয়াও অপূর্ণ থাকিয়া যায়, এ সংসারের সুখ সৌন্দর্য্য প্রেম তাহাকে ভোগ হইতে ভোগান্তরে টানিয়া লইয়া যায়, কিন্তু কখনই তৃপ্তি দান করে না। এইরূপে সে ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'। এইরূপে সংসারের অপূর্ণতাই তাহাকে পূর্ণস্বরূপ ভগবানের নিত্যানন্দ, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অতুল প্রেমের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া তাহার অধিকারী করিয়া তোলে। শুধু সংসারের ভোগ-বৈবিত্র্যে যদি তাহার প্রাণ তৃপ্তিলাভ করিত তাহা হইলে তাহার হৃদয়ের অনন্তাভিমুখী গতি কোথায় থাকিত? আবদ্ধ জলের ন্যায় তাহার আত্মা দূষিত হইয়া পড়িত। এই অতৃপ্তিতেই মানুষের মহত্ত্ব—সংসারের চরম ঐশ্বর্য্যও আমাদের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা সাধন করিতে পারে না, ইহাতেই আমাদের হৃদয়ের বিশালতা।

"Progress, man's distinctive mark alone,
Not God's and not the beasts'; God is, they are,
Man partly is, and wholly hopes to be."

আমাদের জীবনের মধ্য দিয়া, শত শত নৈরাশ্যপরম্পরা ভেদ করিয়া আমরা উচ্চতম আদর্শের সন্নিহিত হই। সুতরাং জীবনে নৈরাশ্য, অকৃতকার্য্যতা, দুঃখ কষ্টের প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না; বরং এই হিসাবে দেখিতে গেলে সুখ অপেক্ষা দুঃখের, কৃতকার্য্যতা অপেক্ষা অকৃতকার্য্যতার উপযোগিতা অধিক।

যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে, প্রকৃতি সম্বন্ধেও ব্রাউনিংএর দৃষ্টি তদ্রূপ। এই সুনীল আকাশ, এই শ্যামলা ধরণী তাঁহার বড় প্রিয়, কারণ ইহাতে তিনি ভগবানের শক্তি এবং প্রেমের বিকাশ দেখিতে পান। প্রকৃতি আমাদিগকে আবদ্ধ করে না। আমাদিগকে ভগবানের প্রেম এবং ঐশ্বর্য্য অঙ্গুলী সঙ্কেতে দেখাইয়া দেয়—from Nature up to Nature's God. যে হতভাগ্য কেবল জগৎকে ভাল বাসিয়াছে, এই সৌন্দর্য্যপূর্ণ, বিস্ময়কর, আনন্দময় বিশাল প্রকৃতিকে ভাল বাসিয়াও প্রকৃতির প্রেমময় অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় নাই, সে অভিশপ্ত জীব। তাহার উপর ভগবানের অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে।

"Thou art shut
Out of the heaven of spirit; glut
Thy sense upon the world."

ইহা অপেক্ষা কঠোর অভিশাপ আর কি হইতে পারে? কারণ আমরা এই জগৎকে দেখিয়া যদি জগদতীতকে লাভ করিবার চেষ্টা না করি, যদি এই সসীম জগতেই আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার পর্য্যবসান হয় তবে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

প্রতিভা সম্বন্ধেও ব্রাউনিংএর ধারণা এই যে প্রকৃত প্রতিভা আমাদের সুপ্তমনোবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলে, আমরা প্রাণে প্রাণে যেন একটা অনির্ব্বচনীয় অভাব অনুভব করি; কিন্তু সে অভাবের মোচন অথবা সে উদ্বোধিত আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা সংকীর্ণ জীবনে ঘটিয়া উঠেনা। পাঠকের মনে এই উদার ব্যাকুলতার সৃষ্টি প্রকৃত প্রতিভাবানের কাজ।

কলাবিদ্যা সম্বন্ধে ব্রাউনিং যে সত্য প্রচার করিয়াছেন

তাহারও অন্তর্দ্দেশে আমরা এই মহান্ তত্ত্বটী উপলব্ধি করি। লালিত কলার প্রকৃত মহত্ত্বই এই যে ইহাতে আমাদের অন্তঃকরণে এমন কতকগুলি আকাঙ্ক্ষার ও আশার উদ্রেক করে যাহা পৃথিবীতে কখনও তৃপ্তিলাভ করে না, বরং তাহাতে আরও কতকগুলি নূতন নূতন বাসনার সৃষ্টি করে। এইরূপে আকাঙ্ক্ষা হইতে আকাঙ্ক্ষান্তরে উন্নীত হইতে হইতে ক্রমশঃ আমরা ভগবানের সিংহাসনসান্নিধ্যে উপস্থিত হই। যে ভাস্কর, চিত্রকর অথবা গায়ক নিজের খোদিত মূর্ত্তিতে, অঙ্কিত চিত্রে কিংবা গীত সঙ্গীতে আপনার মনোমত আদর্শ প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার শিল্পকার্য্যে লেশ মাত্রও অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হয় না, তিনি কলাবিদ্যার পূর্ণ উদ্দেশ্য সংসাধনে অসমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার অবসান হইয়াছে, সুতরাং কলাবিদ্যা অনুশীলনের দ্বারা তিনি লাভবান্ হইতে পারেন নাই। "Andrea del Sarto" নামক কবিতাতে ব্রাউনিং এই তত্ত্বটী পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। Andrea নির্দ্দোষ চিত্রকর (faultless painter), তাঁহার চিত্রে সামান্য একটী রেখা পর্য্যন্ত অযথা সন্নাস্ত হয় না। তিনি মনোমধ্যে সৌন্দর্য্যের যে রমণীয় আদর্শ কল্পনা করেন তুলিকাসংযোগে তাহা পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন—তাঁহার চিত্র সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আদর্শ-অনুযায়ী হয়, সর্ব্বত্রই অনিন্দ্য সুন্দর, কোন স্থানে তিলমাত্র ভ্রম অথবা অনুচিত বর্ণবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহার চিত্রে দর্শকের নয়ন তৃপ্তিলাভ করে বটে, কিন্তু হৃদয়ে একটা অনির্দ্দিষ্টের দিকে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে না, তদপেক্ষা উচ্চতর এবং অধিকতর মনোহর সৌন্দর্য্যের ছবি মনোমধ্যে স্বপ্নবৎ জাগাইয়া তোলে না। তাঁহার চিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, রমণীয়তার চরমোৎকর্ষ—কাজেই ইহাতে চিত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় না।

"A man's reach should exceed his grasp,
Or what is Heaven for ? all is silver grey,
Placid and perfect with my art—the worse."

কিন্তু যুবক Raphaelএর চিত্রকলা তত নির্দ্দোষ নহে, মাঝে মাঝে ভ্রম প্রমাদও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তথাপি Andrea রাফেলকে উচ্চতর চিত্রকর আখ্যা প্রদান করিত এবং এমন কি তাঁহাকে চিত্রগুরু বলিয়া ভক্তি করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তাহার কারণ এই—

"The true artist is ever sent through and beyond his art unsatisfied to God, the fount of light and beauty."*

'Abt Vogler' ব্রাউনিংএর আর একটি মনোহর কবিতা। এই প্রাচীন গীতিবিদ্যাবিশারদ বাদক নিজের ভগ্ন বাদ্যযন্ত্রের উপর যে বিলাপসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহা চিরদিন প্রাণে গাঁথিয়া রাখিবার যোগ্য। ইহাতে ব্রাউনিংএর কলাসম্বন্ধীয় মতামত ব্যক্ত হইয়াছে। Vogler একজন স্বভাবসিদ্ধ গায়ক। তাঁহার সঙ্গীতের এরূপ মোহিনীশক্তি ছিল যে শ্রুতমাত্রই মনে হইত যেন স্বর্গরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সঙ্গীতের মোহমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া কত কত দেবযোনি তাঁহার বশীভূত হইত এবং তাঁহার সমক্ষে নয়নাভিরাম অথচ ক্ষণস্থায়ী প্রাসাদ রচনা করিত। প্রাসাদের ভিত্তি পাতাল পর্য্যন্ত প্রসৃত, স্বচ্ছ প্রাচীরমালা গগনস্পর্শিনী, চূড়াদেশে জলন্ত উল্কাপিণ্ডসকল শোভা পাইত। এই মায়া-মন্ত্রগঠিত প্রাসাদে পৃথিবী যেমন স্বর্গস্পর্শকামনায় উদ্ধোত্থিতা, তেমনি স্বর্গও পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষায় অবনত। এখানে অতীত কালের মৃত মহাত্মাগণ উপস্থিত হইতেন, ভবিষ্যতের অজাত প্রাণিমণ্ডলী জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই কল্পনাবলে ভাবরূপে আবির্ভূত হইতেন; নিকট এবং দূরে সর্ব্বত্রই নবজীবন এবং নবীন মহিমার সমাবেশ দেখা যাইত—অনাদি অতীত এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সহিত একত্র মিলিত হইত। কিন্তু এখন এ প্রাসাদ চূর্ণীকৃত হইয়াছে—সঙ্গীতোপশমের সঙ্গে সঙ্গে এ মায়াপুরী অন্তর্হিত হইয়াছে। Vogler প্রাণে প্রাণে ইহার অভাব অনুভব করিতেছেন, কারণ ইহা আর ফিরিবে না। তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রহিয়া গেল—ক্ষণিকের জন্য তাঁহার হৃদয়ে বিষাদ এবং শূন্যতার ছায়া পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু সে কতক্ষণ? মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহার অপূর্ণ আশা পূর্ণতার জন্য পূর্ণস্বরূপ ভগবানের দিকে প্রধাবিত হইল। Vogler সান্ত্বনা লাভ করিলেন, উদ্যত করযুগলে ঈশ্বরের নিকট ব্যাকুলভাবে আপনার হৃদয়ের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন—

* See Dowden's "Studies in Literature," p. 223.

"হে দেব, হে অমরনামময় মহাপুরুষ, আমি তোমাকে ছাড়িয়া এখন আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? নির্ম্মাতাও তুমি, স্রষ্টাও তুমি— যে প্রাসাদ মানবের করসাহায্যে গঠিত হয় না সে অদৃশ্য প্রাসাদের রচয়িতাও তুমিই। তোমা হইতে বিকার অথবা পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা নাই, কারণ তুমি চিরদিনই সমভাবাপন্ন। যে হৃদয় তুমি প্রসারিত করিয়াছ সে হৃদয় তুমিই পূর্ণ করিবে—যে আকাঙ্ক্ষা তুমি উদ্বোধিত করিয়াছ সে আকাঙ্ক্ষা তুমিই সফল করিবে—আমি তাহাতে সংশয় করিনা।

"একটি মঙ্গলও কখনও নষ্ট হইবে না। যাহা ছিল তাহা পূর্ব্ববৎ চিরদিনই বিদ্যমান থাকিবে। অমঙ্গল সে ত শূন্য পদার্থ, মিথ্যা বস্তু, নিঃশব্দ অভাব মাত্র। যাহা পূর্ব্বে মঙ্গল ছিল তাহা পরেও মঙ্গলই থাকিবে, অমঙ্গল সত্ত্বেও—অমঙ্গল সহিতও—মাঙ্গল্যশক্তি কখনই ধ্বংস হয় না, বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীতে যাহা খণ্ডতাপন্ন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, স্বর্গে তাহা পূর্ণরূপে বিরাজমান।

"আমরা চিরদিন যাহা চাহিয়া আসিতেছি, যাহার প্রতি আমাদের একান্ত আশা নিহিত, যে শুভস্বপ্ন আমাদের নিশিদিনের মানস-সহচর তাহাকে আমরা অবশ্যই প্রাপ্ত হইব—তাহা আছে এবং চিরদিনই থাকিবে—ছায়া নহে, সাদৃশ্য নহে, প্রকৃত বস্তু। যে সৌন্দর্য্য, মঙ্গল অথবা শক্তির মহাবাণী একবার ধ্বনিত হইয়াছে, কুত্রাপি আর তাহার বিনাশ নাই। যখন অনন্ত কালের মধ্যে মুহূর্ত্তের কল্পনা সমতা প্রাপ্ত হইবে, সেই মহাক্ষণে আবার সে অন্তহিত সৌন্দর্য্য, অদৃষ্ট মঙ্গল এবং সুপ্ত শক্তি প্রকাশমান হইবে।

"যে উচ্চ ভাব অত্যধিক উচ্চতার জন্য অপূর্ণ রহিয়াছে, যে বীরত্ব-কল্পনা ক্ষুদ্র সংসারের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই, যে চিত্ত-বেদনা পৃথিবীর অন্তঃকরণ হইতে উঠিয়া আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে নিরালম্বভাবে আকাশে বিলীন হইয়াছে—সে সমস্তই প্রেমিক অথবা কবির হৃদয়োত্থিত ঈশ্বরোদ্দিষ্ট সঙ্গীতলহরী। যদি উহা একবার তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে তাহা হইলেই যথেষ্ট, উহা শীঘ্রই আমরা শুনিতে পাইব।"

প্রেম সম্বন্ধেও ব্রাউনিংএর শিক্ষা কিছু স্বতন্ত্রভাবাপন্ন। যে কোন প্রকার গভীর আবেগ আমাদের চিত্তের উন্নতিকর, ইহা ব্রাউনিংএর বিশ্বাস। কারণ উহাতে আমাদের প্রাণে অনন্তাভিমুখী অনন্তকালস্থায়িনী গতির সৃষ্টি হয় এবং এই গতির দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্নিহিত হইতে পারি। এই স্থলেও টেনিসন এবং ব্রাউনিংএর মধ্যে কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়। উভয় কবিই মানবের নানাবিধ প্রলোভনের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ে কি সুদূর ব্যবধান। টেনিসন মনে করেন, কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করিয়া অথবা বিবেকের বাণী অগ্রাহ্য করিয়া প্রেম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা মানবের প্রধান প্রলোভন। কিন্তু ব্রাউনিং মনে করেন সতর্ক সাংসারিকতা, লোকাপ-বাদের ভয়, গভীর আলস্য অথবা হৃদয়ের দুর্ব্বলতার খাতিরে জীবনের প্রকৃত উন্নতিদায়ক এবং মহিমাব্যঞ্জক প্রেম প্রবৃত্তির পরিচালনা না করা মানুষের অধিকতর প্রলোভন। 'Youth and Art' নামক কবিতায় ব্রাউনিং দেখাইয়াছেন যে প্রেমের অভাবে জীবন শুষ্ক হইয়া যায়। একটি ভাস্কর-বালক এবং সঙ্গীত-বালিকার মধ্যে অল্পে অল্পে প্রণয় সঞ্চার হইতেছিল। কিন্তু সে ভাব অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। উভয়েব মনে অদম্য বৈষয়িকস্পৃহা ছিল, সতর্ক সাংসারিকতার দ্বারা উভয়ের জীবন পরিচালিত হইতে লাগিল। সুতরাং যে স্ফুলিঙ্গ এতদিন অন্তরে অন্তরে একটু একটু প্রজ্বলিত হইতেছিল বিষয়ানিলে তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। উভয়েই সংসারে প্রভূত প্রতিপত্তি এবং কৃতকার্য্যতা লাভ করিলেন, কিন্তু শেষে দেখিলেন কেহই সুখী হইতে পারেন নাই—

"Each life's unfulfilled you see;
It hangs still patchy and scrappy;
We have not sighed deep, laughed free,
Starved, feasted, despaired,—been happy."

'Statue and Bust'এও এই সত্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ডিউক এবং মহিলার হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি আসক্তি জন্মিয়াছিল। এই মহিলা পরিণীতা রমণী—তাঁহার স্বামী এই গূঢ় আসক্তির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে প্রাসাদকক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। মহিলা বাতায়ন-সন্নিধানে উপবেশন করিতেন এবং স্বীয় প্রণয়ীর দৃষ্টিলাভ করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। ডিউক প্রতিদিন যথাসময়ে অশ্বা-রোহণে তলবর্ত্তী পথ দিয়া বাতায়নের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া গমনাগমন করিতেন। এই রূপে কতকদিন অতি-বাহিত হইল। পরে উভয়েই সংকল্প করিলেন এক সঙ্গে পলায়ন করিবেন—কিন্তু আগামী দিবসের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে আর পলায়ন ঘটিয়া উঠিল না। প্রত্যহই পরদিন পলাইবেন এই আশায় উৎফুল্ল থাকেন, কিন্তু সে পরদিন আর আসিল না। এদিকে ক্রমেই তাঁহাদের প্রেমের নিবিড়তা শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, তাঁহারা শূন্যগর্ভ আশা লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন। এই ভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া গেল—তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন যে তাঁহাদের প্রেম অলীক স্বপ্নমাত্র এবং এই স্বপ্নের মোহে তাঁহাদের সমস্ত যৌবন অতিবাহিত হইয়াছে।

"Gleam by gleam
The glory dropped from their youth and love,
And both perceived they had dreamed a dream."

যাহাতে এই স্বপ্নভঙ্গ না ঘটে এবং যাহাতে তাঁহাদের বিগলিত যৌবনের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে এই উদ্দেশ্যে ডিউক নিজের পূর্ণমূর্ত্তি এবং মহিলা কেবলমাত্র নিজের বদনমণ্ডল ভাস্করদ্বারা গঠন করাইলেন। অতীত যৌবনে যে প্রকারে ডিউক এবং মহিলা পরস্পরের প্রতি আনন্দদৃষ্টি হইয়া অবস্থান করিতেন পাষাণমূর্ত্তিতে অবিকল সেই ভাব রক্ষিত হইয়াছিল।

মানবজীবনের চিন্তাতেও টেনিসনে এবং ব্রাউনিংএ অনেক পার্থক্য। টেনিসনের মতে দীর্ঘকাল স্থায়ী আত্ম-সংযমের দ্বারাই জীবনের নৈতিক উদ্দেশ্য নিরূপিত হয়—প্রবৃত্তি এবং বাসনার বিরুদ্ধে বিবেকের পক্ষাবলম্বনে সংগ্রাম করিতে করিতে যখন আমরা জয়লাভ করি তখন আমাদের জীবনের চরম মুহূর্ত্ত। কিন্তু ব্রাউনিং মনে করেন তাহা নহে। তিনি বলেন যখন অকস্মাৎ প্রেমের আলোকে বহুবৎসরের উপেক্ষিত ভাবসমূহ আমাদের মনে প্রকটিত হয় অথবা যখন আমরা জীবন্ত আবেগজনিত অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া জীবনের গতিপরিবর্ত্তনকারী কোনো উদার উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হই তখনই আমাদের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত। কারণ সমগ্রজীবনের শ্রেষ্ঠ ভাবসমূহ এবং মহান্ আদর্শসকল উক্ত মুহূর্ত্তে সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে।

ব্রাউনিং সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বারান্তরে লিখিব।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ।

মনের দাগ

(১)

সংবাদপত্রে অজীর্ণরোগের ঔষধগুলির বিজ্ঞাপন যখন সব একে একে পরীক্ষা করিয়া হায়রান হইয়া পড়িলাম তখন একবার 'চেঞ্জে' যাইব মনস্থ করিলাম। মধুপুর যাওয়াটাই প্রথমে স্থির করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে এটোয়া হইতে অনুকূলের এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূল লিখিয়াছে—"আমি এটোয়া থাকিতে তুমি 'চেঞ্জের' জন্য আর কোথাও গেলে অতিশয় দুঃখিত হইব। এখানকার জল হাওয়া খুব ভাল, তুমি আসিলে তোমার তো নিশ্চয়ই উপকার হইবে, সেই সঙ্গে আমারও প্রবাসের কয়েকটা দিন একটু সুখে কাটিবে। এখানে বাঙালীর মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না—শুধু পাগড়ী আর লাহাঙ্গা*—প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে! আর একটী বাঙালী আছেন বটে কিন্তু তাঁর দেখা পাওয়া দুষ্কর—ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী! বলিতে কি, আমিও বন্ধুছাড়া হইয়া দিন দিন স্ত্রৈণ হইয়া পাড়তেছি। এ সময় তুমি আসিলে শুধরাইয়া যাইতে পারি—এখনো রোগ 'ক্রনিক' হইয়া দাঁড়ায় নাই।

"আমার ছোটবোন্ প্রিয়বালাটি বড় হইয়া উঠিতেছে। তার জন্য একটি সম্বন্ধ দেখিতে পার?—তোমার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কাহারও যদি চিরকুমারব্রত ভঙ্গ হইবার সময় উপস্থিত হইয়া থাকে বোধ কর, তা' হ'লে তাঁহার ব্রতটী যা'তে এই এটোয়াতে ভঙ্গ করাইতে পার তার চেষ্টা দেখিও! কবে আসিতেছ?—দেরী করিয়ো না।"

অতঃপর এটোয়া যাওয়াই স্থির হইল। ডিপুটি হইলেও আমি থার্ড ক্লাশে 'ট্র্যাভল্' করিয়া থাকি। এ বিষয়ে 'গ্ল্যাডষ্টোন্' আমার আদর্শ,—কিন্তু সত্য কহিতে হইলে, উদ্দেশ্যটা ব্যয় সংক্ষেপ। কথাটা আজ এই নূতন প্রকাশ করিলাম।

এই আমার প্রথম পশ্চিমযাত্রা। যথারীতি সাহেব সাজিয়া 'ষ্টার্ট' করিলাম। শুনা ছিল হ্যাট-কোট দেখিলে 'খোট্টা'র ভিড় সরিয়া যায়—এবং প্রকৃতই তাই! আমাকে দেখিয়া হিন্দুস্থানীর দল জড়সড় হইয়া বসিল। কেবল একটা লোক—চেহারাটা তার অতি বদখৎ—দুষমনের মত—বাঁ গালে লোমযুক্ত একটা মস্ত জড়ুল—সে আমায় দেখিয়া বলিল—"সাবলোক্ তো হিঁয়া কাহে?"

লোকটার কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম সে অনেক দিন কলিকাতায় কাটাইয়াছে। তার উপর কেমন ভারি রাগ হইতে লাগিল, ভাবিলাম—দুষমনটা নামিয়া গেলে বাঁচি!

কিন্তু সে যেরূপ পরিপাটী আয়োজন করিয়া শয়ন করিয়াছিল তাহাতে যে শীঘ্র তার নামিবার সম্ভাবনা আছে

* হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের ঘাগ্‌রা বিশেষ।

এমন ত বোধ হইল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোম্ কাঁহা যাগা ?"

লোকটা যেমন শুইয়াছিল তেমনি অবস্থায় থাকিয়া আমার দিকে শুধু বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রুক্ষস্বরে বলিল—"শিকোয়াবাদ।"

শিকোয়াবাদ! এই দুষমনের সহিত এটোয়া পর্য্যন্ত সাতশ কুড়ী মাইল যাইতে হইবে!—আমার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল! গাড়ী আসানসোলে পৌঁছিতেই আমি অন্য কামরায় চলিয়া গেলাম।

আমি যাইতেছি দেখিয়া সেই লোকটা তাহার সঙ্গীকে বলিল—"সাব্ ভাগ্‌তা!" আমি চোখ রাঙাইয়া একবার তাহার প্রতি কটাক্ষ করিলাম। লোকটা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিটি কিন্তু বড় সরল—সে হাসি সেই দুষমনের মুখে বড় বিসদৃশ দেখাইতে লাগিল। আমি আর মুহূর্ত্ত কাল সেখানে অপেক্ষা করিলাম না।

(২)

রাত তখন প্রায় বারোটা—এটোয়া পৌঁছিলাম। মাঘমাস—কন্‌কনে শীত। তার উপর টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল। ষ্টেশনে অনুকূলের আসিবার কথা ছিল কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। একে অচেনা দেশ, তায় ঘোর অন্ধকার—একটু চিন্তিত হইলাম। অনুকূল লিখিয়াছিল—'চুঙ্গী'কা বাবু বলিলেই গাড়োয়ান বাসা চিনিবে। কিন্তু পশ্চিম খারাপ দেশ, মারিয়া কাড়িয়া নেয় যদি?—ভাবিলাম 'পাঁড়ে'কে সঙ্গে আনিলে ভাল হইত। হঠাৎ আমার সাহস ফিরিয়া আসিল—সঙ্গে তো বন্দুক আছে!

মালপত্রগুলো কুলিকে দিয়া গুছাইয়া রাখিয়া গাড়ীর উদ্দেশে যাইব এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে আমায় স্পর্শ করিল। একটু চম্‌কাইয়া ফিরিয়া দেখি—এক দীর্ঘাকার যুবা পুরুষ—গালভরা দাড়ি, মাথায় আসমানী রঙের এক প্রকাণ্ড পাগড়ী—চুড়িদার পাজামা—পায়ে নাগরা জুতা, গায়ে একখানা লালের উপর কালোচেক্ কাশমিরী র‍্যাপার, হাতে এক মোটা লাঠি!

আমি স্তম্ভিত হইয়া আগন্তুকের দিকে ক্ষণেকের নিমিত্ত চাহিয়া রহিলাম—আগন্তুক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বরের পরিচয় পাইয়া, বুঝিতে আর বাকী রহিল না। আমি বলিলাম—"বাহ্ জোভ্! তুমি যে একেবারে পুরো 'হিন্দুস্থানী' সেজেছ!"

অনুকূল আমার সাহেবী পোষাকের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল—"আমার এ পোষাকটাকে 'বাঙলা' তবু আপনার বল্‌তে পারে!"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"সাবধান! সিডিশনের গন্ধ বেরুচ্চে!"

অনুকূল শ্মশ্রুরাজির মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে বলিল—"ওঃ ভুলে গেচি—তুমি ডেপুটি!"

হঠাৎ আমার দৃষ্টি বন্ধুর অজস্রজাত নিবিড় কৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজির উপর পতিত হইল—বলিলাম "এটোয়ার জলহাওয়ায় দাড়িটিরও দেখ্‌চি হেল্‌থ ফিরে গেচে!"

অনুকূল হাসিয়া বলিল—"ওহে এটা ইকনমির চিহ্ন।"

আমার জঠরে রীতিমত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, বলিলাম—"ষ্টেশনে যে রাত কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করচ—এটাও ঐ ইকনমির উদ্দেশ্যে নাকি ?"

অনুকূল হারিবার পাত্র নহে—বলিল "পশ্চিমে ত হাওয়া খেতে এসেচ—তার ত আর দাম লাগে না!"

গাড়ীতে যাইতে যাইতে অনুকূলকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার জন্যে যে বাঙলাটা ঠিক করেচ সেটা কোন দিকে ?"

অনুকূল কৃত্রিম আশ্চর্য্যের সহিত বলিল—"'বাঙলা'!—'বাঙলা' আবার কোন দিকে হয়? সেত চিরকালই পশ্চিমের পূব দিকে!"

আমি বলিলাম—"তোমার ও ইয়ারকি রাখ!"

অনুকূল মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল—"তবে না হয় সিরিয়াস্‌নেসের সহিত বলচি—হে আমার স্বদেশের প্রিয় পাখি! তোমার জন্যে আমি হৃদয়কুঞ্জে নিবিড় প্রেমের নবীন নীড় রচনা করিয়া রাখিয়াছি। তাহাতে অবস্থান করিয়া তুমি আমার প্রবাসের 'দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী' নিবিড় ভাবে অমৃত-সিক্ত করিয়া তোল!"

(৩)

অনুকূলের বাসাতে আসিয়াই উঠিলাম। শয়ন করিতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল। পরদিবস উঠিতে বেলা হইল।

নিদ্রাভঙ্গে দেখি ছোট ছোট হিন্দুস্থানী বালিকারা আমার ঘরে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, তাহাদের ইচ্ছা আমি একবার তাহাদের ডাকি? অনুকূলের ছোট ভাই—সেটি একটু তোত্‌লা—বলিল—"সব্‌ ভাঃ—ভাঃ—ভাগ্‌তা কাহে? ই—ই—ধার আও!"

অমরনাথ যতক্ষণে এই কয়টী কথা উচ্চারণ করিতেছিল, আমি সেই সময়ে একটী বালিকাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলাম—তাহারা ছুটিয়া পলাইল। এইরূপ বার কতক লুকোচুরি খেলার পর একে একে বালিকার দলটী ধূলিমলিন পদ লইয়া আমার ফরাসে আসিয়া অধিষ্ঠান করিল। এমন সময় দরজার নিকট একটী বালিকা আসিয়া বলিল—"গরম জল দেওয়া হয়েছে।"

আমি অমরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এটী তোমার কোন বোন?"

অমর বলিল—"ও—ও—ওযে—পি-পি প্রিয়!" আমি মনে মনে বলিলাম—"এই প্রিয়! এত সুন্দর! এর জন্যে চিরকুমার ব্রত অচিরে ভাঙলে দোষ কি?"

রবিবার। অনুকূলের আপিস নাই। ভোজনের সময় অনুকূল জিজ্ঞাসা করিল—"কিহে কেমন বোধ করচ?"

আমি কহিলাম—"বড় ভাল ঠেক্‌চেনা!"

অনুকূল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"সেকি হে!"

আমি বলিলাম—"হুঁ! আর কিছু দিন থাক্‌লেই হয়েচে আর কি!—একটী আস্ত পেটুক হয়ে দাঁড়াব!"

অনুকূল বলিল—"তাই ভাল!—এটোয়ার জল হাওয়া ভাল নয় বলচো ভেবে আশ্চয্যি হয়ে গিছলাম।"

আমি ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিলাম—"এটোয়ার জল হাওয়ায় বুঝি ভেবেচ পেটুক হয়ে পড়বার ভয় করচি?"

অনুকূল জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি জন্যে?"

আমি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলাম—"তোমার গৃহিণীর দ্রৌপদীত্বে!"

অনুকূল হাসিয়া বলিল—"ওহে! স্ত্রীর সম্বন্ধে ও উপমাটা আধুনিক স্বামীর পক্ষে একটু আশঙ্কাজনক।"

সেই সময় অনুকূলের মাতা আসিয়া আমাদের ভোজনের নিকট বসিলেন। তিনি প্রিয়র বিবাহের কথা পাড়িলেন—বলিলেন—"বাবা! প্রিয়র একটি সম্বন্ধ দেখো, তোমার তো ঢের বন্ধুবান্ধব আছে!"

প্রিয়র বিবাহ!—আমার উপর সম্বন্ধ ঠিক করিয়া দিবার ভার! বুকের ভিতর রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল। আমি ঘাড় হেঁট করিয়া আহারেই অধিকতর মনোনিবেশ করিলাম।

প্রিয়র মাতা বলিতে লাগিলেন—"তুমি ত বাবা আমার অবস্থা জান!" আমি সহানুভূতির একটী ছোটখাটো নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার উক্তি সমর্থন করিলাম।

কিছুক্ষণ আমরা তিন জনেই নীরব। রন্ধনশালা হইতে প্রিয় মাতাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা! মাছের চপ আর দুখানা নিয়ে যাই?" আমার নির্লজ্জ কর্ণমূল দুটা হঠাৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। প্রিয়র মাতা কন্যাকে বলিলেন—"হ্যাঁ, নিয়ে আস্‌বে বৈ কি।" আর আমাকে বলিলেন—"কি বাবা ব্যান্নে ঝাল হয়েচে?"

আমি বুঝিলাম আমার কর্ণের প্রতি বিধবার দৃষ্টি পড়িয়াছে, আমি বাধ্য হইয়া বলিলাম "একটু।" প্রিয়র মাতা সেইখান হইতে বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"ও বৌমা! একটু ঝাল কম দিও বাছা! সুধীর ঝাল খেতে পারে না!"

বেয়াদব অনুকূলটা অমনি বলিয়া উঠিল—"কেন আগে ত সুধীর খুব ঝাল খেত!" প্রিয়র মাতা আমার পক্ষ লইয়া বলিলেন—"চিরকাল কি আর এক অভ্যেস্‌ থাকে?" আমি বলিলাম "ঠিক বলেচেন—মানুষের কি একভাব চিরকাল থাকে?"

এমন সময় প্রিয় একখানা রেকাবী করিয়া গরম গরম চপ্‌ লইয়া উপস্থিত—একটু জড়সড় ভাব! ছড়ানো চুলের মাঝে, পাতার আড়ালে ফুলের মত, মুখখানি!

সহসা অনুকূলের মাতা বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা সুধী!—তুমি কি বিয়েটিয়ে করবে না?—এখন ত যাহক্‌ দু'পয়সা বেশ্‌ রোজগার কচ্চ?"

কি জানি কেন সেই সময় প্রিয়র হাত হইতে একখানা চপ্‌ মাটিতে পড়িয়া গেল! দেখিয়া প্রিয়র মাতা কহিলেন—"আস্তে আস্তে দাও মা!—তাড়াতাড়ি করো না!"

অপরাহ্ণে প্রিয়র বিবাহ লইয়া অনুকূলের সহিত কথা

হইতেছিল। অনুকূল বলিল—"আচ্ছা! তোমার রমেনটিকে কেমন বোধ হয়?"

"রমেন ছেলেটি ভাল বটে, তবে এদিকে কিছু নেই, তা'ছাড়া শুনতে পাই রমেনের মা বড় রাগী মেজাজের।"

অনুকূল বলিল—"না ভাই কাজ নেই—প্রিয় আমার বড় অভিমানী! আচ্ছা সতীশ?"

"হুঁ! টাকা কড়ি আছে বটে, তবে হেল্‌থ বড় খারাপ!"

"মনোমোহন?"

"সব ভাল কিন্তু ভয়ানক ম্যালেরিয়ার দেশ!"

"যতীশ?"

"রংটা একটু ময়লা!"

এইবার অনুকূল হাসিয়া উঠিল। বলিল—"এখন তোমার মত নিখুঁত পাত্র পাই কোথায় বল?"

আর ধৈর্য্য রহিল না—বলিলাম—"আমার মত'তে আর দরকার কি? একেবারে আসলটিই না হয়—"

অনুকূল আমার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"অ্যাঁ! —সত্যি বলচ?"

আমি বলিলাম—"তোমার সঙ্গে কবে মিথ্যে কয়েচি?" অনুকূল গাঢ়স্বরে বলিল—"আজ কি সুখী করলে আমাদের!" অনুকূল তৎক্ষণাৎ 'মা'—'মা' করিতে করিতে অন্দরের দিকে গেল। আমি আনন্দবিহ্বলনেত্রে বৈঠকখানার মুক্ত দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে দেখি একটী ছোট হিন্দুস্থানী বালিকা আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। এই তাহাকে প্রথম দেখিলাম। তাহাকে ডাকিতে সে নিকটে আসিল। নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল—"সুখ দেবী"। মুখখানি তার কষ্টে মাখা!—সংসারের স্নেহ যেন সে জীবনে পায় নাই! সে যখন তার সুরমাটানা চোখের ম্লান দৃষ্টি আমার উপর ফেলিয়া বলিল—"হাম্ সুখ্ দেবী", তখন যেন তার হৃদয়খানি আমার হৃদয়কে জানাইতেছিল—"হাম্ জনমদুখী।"

ক্রমে সুখ দেবী তার জীবনের পাতাগুলি একে একে উল্টাইয়া আমায় দেখাইতে লাগিল—তার মা নাই,—বাপ আগ্রায় কাজ করে,—তার সৎমা তাকে ভালবাসে না,—বাপও তাকে ভালবাসে না,—সে বাপের জন্য কত কাঁদে,—তার ঠাকুরদাদা বলে তার বাপ শীগ্‌গীর আসবে কিন্তু কত দিন হয়ে গেল আসেনি, সে তার বাপের একখানা চিঠি পাবার জন্য কত লালায়িত—পিয়ন দড়ির জালে বাঁধা পার্সেল ঘাড়ে করে যখন তাদের বাড়ীতে এসে "বিটিয়া খৎ লিজিয়ে" বলে হাঁকে তখন সে বাপের চিঠির আশায় ছুটে আসে, কিন্তু এসে দেখে তার বাপের চিঠি নয়, তখন তার কত কান্না পায়!—বলিতে বলিতে তার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল! বেদনায় আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, অতি কষ্টে চোখের জল চাপিয়া ভাবিতে লাগিলাম—আহা! অনাথা স্বামীপ্রেমে যদি একদিন সুখী হয়!

(৪)

অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমার প্রতি শিশুদলের যে একটা কৌতূহল ছিল তাহা মিটিয়া গেল! আর তাহারা বড় একটা আমার পাশে জড় হয় না। তবে, এখনও তাহারা আমার 'পয়ের গাড়ীর' ঘণ্টা বাজাইবার লোভটী একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এখন আমার সঙ্গে তাহাদের শুধু ঐটুকু সম্বন্ধ!

শুধু সেই মাতৃহীনা উপেক্ষিতা অনাদৃতা বালিকাটি এই মাতৃহীন যুবককে দিন দিন তাহার ক্ষুধার্ত্ত হৃদয়ের নিকট বিপুল আবেগে টানিয়া লইয়া যেন আপনার করিতে লাগিল!

মধ্যাহ্নে যখন অনুকূল আপিসে, অমরনাথ স্কুলে, প্রিয়বালা মাতৃপরিচর্য্যায়, তখন এই নিঃসঙ্গী প্রবাসীর জন্য বিধাতা সেই মাতৃহীনা অনাথা বালিকাটীকে যেন একান্ত আত্মীয় করিয়া পাঠাইয়া দিতেন! সুখদেবী কোন কোন দিন তার ছোট ঢোলকটী লইয়া সুর করিয়া দুলিতে দুলিতে গীত আরম্ভ করিয়া দিত—"চারো যুগমে নাম শুনায়ে কিষণে কানাইয়া হো—।"

সে একদিন আমার বন্দুকটী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ইস্‌মে কেয়া হোতা?" আমি বলিলাম "চিড়িয়া মারনা হোতা।" শুনিয়া তার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল! —তারও একটী ছোট পাখী আছে! সে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুজি! চিড়িয়া মারনেসে তোমারা আপ্‌সোষ্ নহি হোতা?" হঠাৎ কে যেন আমার হৃদয়ের ঘুমন্ত করুণাকে

স্পর্শ করিল!—ভাবিলাম—সত্যি! পাখী মারা—কি নিষ্মম আমোদ!

আমি সুখদেবীর চিবুকটা ধরিয়া বলিলাম—"সুখদেবী! হাম্ আউর কবি চিড়িয়া নেই মারেগা!"

বালিকার দুই চোখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল!

একদিন শুনিলাম সুখদেবীর বিবাহের 'সম্বন্ধ' হইতেছে—পাত্র কলিকাতার এক 'হৌসে' কাজ করে, বাড়ী শিকোয়াবাদে।

শিকোয়াবাদ! হঠাৎ সেই দুষমনকে মনে পড়িল।

সুখদেবী একদিন হাসিতে হাসিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুজি! পিয়ারীকো আপ্ সাদি করেগা?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ বোলা?

সুখদেবী আনন্দে হেলিতে দুলিতে বলিল "খুদ পিয়ারীনে কহা!"

আমি সুখদেবীর ছোট নথটি ধরিয়া নাড়িয়া দিলাম। "বাবুজী পিয়ারীকা দুলাহা*" বলিতে বলিতে সে দৌড়িয়া পলাইল।

হিন্দুস্থানীরা প্রিয়কে পিয়ারী বলিত।

(৫)

এটোয়ায় চেঞ্জে গিয়াছিলাম—সে আজ দুবৎসর। সুখদেবীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে—সেই শিকোয়াবাদে। আমারও চিরকুমারব্রত নষ্ট হইয়া গিয়াছে—সেজন্য দায়ী প্রিয়বালা!

সুখদেবীর বিবাহের চারিমাস পরে সেই শিকোয়াবাদের জড়ুলচিহ্নিত দুষমন যুবা—নাম মাধব দেও—আমার এজলাসে অভিযুক্ত হইয়া উপস্থিত!

আমি নবীন ডেপুটি—অভিযোগও গুরুতর, কেমন একটা রাগও ছিল—দুষমনকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিলাম। এমন রায় দিলাম তাহা উপর কোর্টেও বাহাল রহিয়া গেল!

* * * *

দুই বৎসর পরে আবার এটোয়ায় আসিয়াছি—প্রিয়কে লইতে। সুখদেবীর বিবাহের সময় কোন কারণে ব্যস্ত থাকায় তাহার বিবাহবাসরে তাহাকে কিছু উপহার দিতে পারি নাই। এবার আসিবার সময় দুগাছি ব্রেস্লেট তৈরী করাইয়া আনিয়াছি। প্রিয়কে বলিলাম—"সুখদেবী কি এখানে?"

প্রিয় একটা নিশ্বাস ফেলিল। আমি বলিলাম—"অমন ক'রলে যে?—তার জন্যে দুগাছি ব্রেস্লেট্ এনেচি।"

প্রিয়র চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—"কি হয়েচে প্রিয়?" প্রিয় একটা ঢোক গিলিয়া বলিল—"সে বিধবা হয়ে—" আমি আহত হইয়া তাহার অসমাপ্ত কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম—"য়্যাঁ! কত দিন?"

"বিয়ের আট মাস পরে।"

"কৈ আমায় তো কিছু লেখ নি! কি হয়েছিল?"

"জেলে মারা গেছে!"

"জে—লে!"

"হাঁ—কিন্তু সে নির্দ্দোষী!"

"তার নাম?"

"মাধব দেও।"

"মাধব দেও!—তার বাঁ গালে কি একটা জড়ুল ছিল?"

প্রিয় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ—তুমি কেমন করে জান্লে?"

আমি বলিলাম—"প্রিয়! আমিই নির্দ্দোষী মাধব দেওকে রাগের বশে অন্যায় শাস্তি দিয়েছিলুম—আমিই সুখদেবীকে বিধবা করেছি!"

প্রিয়র মুখখানা সাদা হইয়া গেল—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"সেও বেঁচে নেই—বিষ খেয়েছে!"

কে যেন তপ্ত-লৌহ-শলাকা দিয়া আমার হৃদ্‌পিণ্ডটাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল!—হায়! প্রবৃত্তির দাস মানুষ কেন বিচারের ভার নেয়!

কলিকাতায় আসিয়াই কাজে ইস্তফা দিলাম!—

মনের দাগ কিন্তু মুছিল না!

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

তপস্যা

পুরাণে সৃষ্টির আরম্ভের কথায় আছে, শুধু এক কারণ-সাগর। দেশ নাই, কাল নাই, পাত্র নাই, কেবল নিবিড়

* স্বামী।

অন্ধকার। আদি ও অন্ত বলিয়া যে দুটী শব্দ আছে তাহা তখন রচনাই হয় নাই। সে অন্ধকার তুলনা দিয়া, বর্ণনা করিয়া বুঝান যাইবে এমন কিছু উপায় নাই। যে জ্ঞানের দ্বারা আমরা পদার্থের সত্ত্বা অনুমান করিয়া লইতে পারি সে জ্ঞান সেই দেশ-কাল-নিমিত্তহীন সৃষ্টিপূর্ব্বের কারণ-বারিধিকে ধরিতেই পারে না, তবে এই জ্ঞানেরও অজ্ঞাত আর কোন জ্ঞান যদি থাকে সেই জ্ঞানে সৃষ্টির আরম্ভের চিত্রাভাস মনে আনিয়া দিতে পারে।

পুরাণ বলিতেছেন এই কারণ-বারিধিতে ব্রহ্মা প্রথমে জন্মলাভ করিলেন, তাহার পর বিষ্ণু, তাহার পর রুদ্র। জন্মলাভ করিয়াই তাঁহারা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—

নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমির্
নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।

•তাঁহারা দেখিলেন কেবল অন্ধকার। এ অন্ধকার যে জ্যোতির অভাবজনিত অন্ধকার তাহা নহে, এ অন্ধকার সৃষ্টির পূর্ব্বের নিখিল সৃষ্টির বীজধাত্রী কারণময় অন্ধকার। তাঁহারা মুদিত নয়নে দেখিলেন কেবল অন্ধকার, আবার চোখ চাহিয়া দেখিলেন কেবল অন্ধকার। সহসা অশব্দ প্রলয়ান্ধকার, "তপঃ" এই মহাগম্ভীর শব্দে বিচলিত হইয়া উঠিল। সৃষ্টির আরম্ভে এই প্রথম শব্দ তপঃ। যে মাত্র মহা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে এই অতি গভীর অন্তর্ভেদী শব্দ দিগ্দেশহীন কারণ-সমুদ্রে প্রতিধ্বনিত হইল তখনই কোথা হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির রেখা অনন্ত অন্ধকারকে পরাজিত করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ধ্বনিহীন ব্রহ্মাণ্ডের সেই সর্ব্ব প্রথম ধ্বনি এখনও ধ্বনিত হইতেছে। আমরা কেবলই যখন অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছি, দিগ্দেশ নির্ণয় করিবারও কোন উপায় পাইতেছি না, তখনই সেই এক গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাইতেছি "তপঃ!"

সৃষ্টি-তত্ত্বের পুরাণবর্ণিত এই উপাখ্যানটী আমাদের মনের কাছে এত সুস্পষ্ট, যে, তাহার জন্য আর কোন যুক্তি তর্ক প্রয়োজন হয় না। সৃষ্টি কিসে আরম্ভ হইল? তপস্যায়। নূতন সৃষ্টি কিসে হইতে পারে? সেও এই তপস্যায়। একবার সৃষ্টি হইলে তাহাতে কিছু চিরদিন চলে না। প্রতিদিনই প্রলয়,—প্রতিদিনই তন সৃষ্টি। আরও ভাল করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রতি নিমেষেই প্রলয়, আর প্রতি নিমেষেই নূতন সৃষ্টি হইতেছে, তাই জগৎ চিরনবীন। যেমন বটগাছের ক্ষুদ্র বীজের ভিতরই প্রচ্ছন্নভাবে একটী ক্ষুদ্র বটগাছ রহিয়াছে তেমনি অনন্তকালের সমস্ত লক্ষণগুলি ক্ষুদ্র একটী নিমেষেও আছে, সে যে অনন্তকাল মহান্ মহীরুহেরই একটী ক্ষুদ্র বীজ। সৃষ্টিও যেমন নিত্য, প্রলয়ও তেমনি নিত্য। এই জন্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রলয়, আবার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন সৃষ্টি।

তাই, "তপঃ" এই ধ্বনির আর বিরাম নাই। দিন নাই, রাত্রি নাই, প্রলয়ের অশব্দ অন্ধকার ভেদ করিয়া যে ধ্বনি উঠিয়াছিল, সেই ধ্বনি নিমিষে, নিমিষে প্রাণের প্রতি স্পন্দনে, অন্তরেরও অন্তরে, অন্তরে বাহির,—বৃক্ষ-লতাগুল্মে—নদীসমুদ্রে, সর্ব্বগামী বায়ুতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমরা দিনরাত্রিই তপস্যা করিতেছি, কতকটা জানি, আর অনেকটাই জানি না। জানিয়া যে তপস্যা করিতেছি তাহার সৃষ্টি প্রত্যক্ষ, অজ্ঞাত তপস্যায় অজ্ঞাত নিগূঢ় সৃষ্টিকার্য্য চলিতেছে।

"তপঃ" এই শব্দটীর অর্থ কি? ভগবান তপস্যার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শাস্ত্রে আমরা এই কথা জানিতে পাই। তিনি অখণ্ড, পূর্ণ ও আনন্দময়। আপনাকে খণ্ড করিয়া, আপনার অংশ দিয়া—আপনার আনন্দ দিয়া তিনি পরিপূর্ণ গ্রহমণ্ডলের সহিত নিখিল জীবধাত্রী জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া সহজ কাজ নহে, জগৎ সৃষ্টি যেমন কঠিন কাজ, আপনাকে বিতরণ করাও তেমনি কঠিন কাজ। এই কঠিন কার্য্য সিদ্ধির জন্য যে সাধনা যে প্রয়াস তাহাই তপস্যা। ভগবানের তপস্যায় "তপঃ" এই শব্দটী কঠিন প্রস্তরে নির্ম্মিত সুধাভাণ্ডের ন্যায় দ্যুলোক হইতে নবজাগ্রত জগতে পতিত হইল। ভগবানের তপস্যায় "তপঃ" এই জাগরণের মন্ত্র যেমন দেশ কাল পাত্র জাগ্রত করিয়া ধ্বনিত হইল অমনি প্রথম সূর্য্যোদয়ে যেমন মুদিত পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তেমনি অন্ধকার কারণ-বারিধিতে নিবিড় আনন্দ-জ্যোতিতে ধীরে ধীরে লীলাশতদল বিকশিত হইয়া উঠিল। নবজাগ্রত সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্তস্বরায় অনাহত ধ্বনি উঠিল "আনন্দম্ পরমানন্দম্।"

শাস্ত্রে বর্ণিত এই কথাগুলি আমাদের কেবল কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার ক্ষমতা নাই। প্রতিদিনই আমাদের চোখের সম্মুখে ইহার প্রমাণ আসিতেছে। সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া অবধি জননীর কি তপস্যার বিরাম আছে? আপনার জীবনের কতখানি অংশ দিয়া যে মা একটী সুকুমার শিশু সৃষ্টি করেন তাহা আমরা ভাল করিয়া অনুমানই করিতে পারি না। ক্ষুদ্র শিশুটীকে কোলে পাইয়া অবধি জননী তপস্যায় মগ্ন হইয়া গেলেন। তাঁহার সেই একাগ্র তপস্যায় সন্তান দিনে দিনে নূতন ভাবে বাড়িতে লাগিল। মা তাহাকে আপনার প্রাণ দিয়া, মন দিয়া, শরীর দিয়া গড়িতে লাগিলেন। মা নিজের হাসি দিয়া শিশুর কচি ঠোঁটে হাসি ফুটাইলেন, মায়ের চোখের আলোকে সন্তান প্রথম জগৎ দেখিতে শিখিল, মায়ের স্নেহমাখা সম্ভাষণে তাহার প্রথম ভাষা শিক্ষা।

এই তপস্যা কোথায় না আছে? জীবজগতে, প্রাণী-জগতে—অচেতন জড়জগতেও তপস্যার বিরাম নাই। একটী মুকুলকে ফুটাইয়া তুলিতে বৃক্ষের কতখানি আত্মদান, কতখানি তপস্যা। মায়ের স্নেহ যেমন শিশুকে বেষ্টন করিয়া থাকে তেমনি সবুজ রংএর পল্লবগুলি যে পর্য্যন্ত ফুলটী রৌদ্রের তাপ বায়ুর পীড়ন সহিবার উপযুক্ত না হয় সে পর্য্যন্ত কত যত্নেই তাহাকে ঢাকিয়া রাখে। এই যে ফুলটী একটী পরিপক্ব বীজগর্ভ ফলের সৃষ্টি করিতেছে ইহার ভিতর পুষ্পের কি অসামান্য আত্মদান! আপনাকে নিঃশেষে বিতরণ করিয়া তবে ফুল ফলটীকে গড়িয়া তুলিতেছে। কঠিন শিলাকন্দরে রুদ্ধ নির্ঝরধারা কত না তপস্যায়—কত আঘাত সহিয়া কত আঘাত দিয়া আপনাকে বন্ধন-মুক্ত করিতেছে; তাহার পর নদীরূপে আপনাকে বিলাইয়া ধরিত্রীকে শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিতেছে।

"তপঃ" এই শব্দটীর ভিতর কত যে অর্থ আছে, তাহার সীমা নাই। কতক অর্থ বলিয়া বুঝান যায়, কতক মনে বুঝা যায়, কতক অর্থ যেন বুঝিয়াও বুঝা যায় না। অশব্দ ব্রহ্মাণ্ডে এইটীই প্রথম শব্দ, এইজন্য এইটীই সকল শব্দের বীজস্বরূপ। সহজভাবে যদি আমরা তপস্যার এইটুকু অর্থ বুঝি, যে, 'আপনাকে বিতরণ করিবার যে শক্তি, সেই শক্তি অর্জ্জন করিবার ও প্রয়োগ করিবার সাধনার নামই তপস্যা' তাহা হইলে আমাদের ঠিক বুঝা হইবে না। শুধু বিতরণই যদি হয় তবে কি তপস্যার পরিণাম কেবল রিক্ততায় গিয়া দাঁড়াইবে? পরিপূর্ণ অখণ্ড পূর্ণানন্দময় ভগবান আপনাকে দান করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন,—জগন্নাথ কি জগৎ সৃষ্টির জন্য আত্মদানের ফলে খণ্ডিত ও অপূর্ণ হইয়া গেলেন? জমা খরচের গণিত-শাস্ত্র তাই বলে বটে, কিন্তু এ আবার এক নূতন গণিত-শাস্ত্র। ইহার শুভঙ্করের আর্য্যায় লেখা আছে "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।" একটী প্রদীপ হইতে আলোক লইয়া আর একটী, দুটী, শত সহস্র দীপশিখা জ্বলে, তথাপি যে দীপশিখা শত-সহস্র দীপকে জ্যোতি দান করিল তাহার জ্যোতি এই ব্যয়ে ক্ষয় পায় না, তাহার শিখা তো ম্লান হইয়া যায় না। নদী এত যে জল বিলায় তবু তো নদীর জল ফুরায় না। ইহার কারণ কি? এ কোন নূতন গণিত?

ইহার কারণ, "তপঃ" এই শব্দটী জাগরণের মন্ত্র। যতক্ষণ আমি ঘুমাইয়া থাকি ততক্ষণ আমার জীবন থাকাতে ও না থাকাতে তত বেশী পার্থক্য থাকে না। যতক্ষণ না কোন যন্ত্র চলিতে থাকে ততক্ষণ তাহার চলিবার শক্তি থাকিলেও তাহাতে আর অচল পদার্থে কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না। একটী দীপ জ্বালিয়া যদি ধামা ঢাকিয়া রাখি তবে সে দীপ নির্ব্বাপিত অথবা প্রজ্বলিত উভয়ই সমান। আমার যে প্রাণ আছে তাহার পরিচয় কিসে পাওয়া যায়? আমি এই যে হাত নাড়িতেছি, এই যে কথা বলিতেছি, আমার প্রাণের একটী অংশ দিয়া একটী স্পন্দনের, কতকগুলি শব্দের সৃষ্টি করিতেছি, আমার সজীবতার পরিচয় ইহাতেই পাওয়া যাইতেছে। যদি ভগবান কঠিন শাসকের মত চোখ রাঙ্গাইয়া বলিতেন "তোমাদের প্রাণ দিয়াছি বটে, কিন্তু খরচ করিয়া ফেলিতে পাইবে না", তবে তাঁ'র সে দেওয়া না দেওয়া সমানই হইত। নাবালকের সম্পত্তির মত তাহাতে অধিকার থাকিয়াও কোন অধিকার থাকিত না। কিন্তু ভগবান তো তাহা বলিতে পারেন না, তিনি যে আপনাকে বিলাইয়া আপনার আনন্দ দিয়া তবে এই প্রেমে পূত, সৌন্দর্য্যে ভূষিত, আনন্দে উল্লাসিত জগৎ গড়িয়াছেন, তিনি যে আপনার চৈতন্য দিয়া জগৎ সঞ্জীবিত করিয়াছেন। ধনী যেমন

ভিখারীকে স্বর্ণমুষ্টি দিয়া বিদায় করে এ দান যদি সেই ভাবের দান হইত তবে জগৎ দু'দিনেই নিঃসম্বল হইয়া যাইত। ভিখারীর ভিক্ষার ধনে আর কয় দিন চলে? কিন্তু দাতাশ্রেষ্ঠ সে ভাবে দান করেন নাই, তিনি যে কেবল প্রাণ দিয়াছেন তাহা নয়, প্রাণ বিলাইয়া দিবার ক্ষমতাটীও সেই সঙ্গে দিয়াছেন, সেইটীই তাঁহার অক্ষয়-ভাণ্ডারের চাবি। তাঁহার অক্ষয় আনন্দের উৎস যেখানে সেই তপস্যা-হিমাচলের পথটীও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন।

সে পথ বড়ই বন্ধুর, কণ্টক-কঙ্কর-পরিপূর্ণ। তথাপি সে পথে পথিকের অভাব নাই। "ক্ষুরধার নিশিত দুর্গম দুরত্যয়" সেই পথ সাধারণের পথ। যদি সে পথে এত বিঘ্ন, এত কষ্ট, তবে আমরা সে পথ দিয়া কেন চলি; সে আয়াসে, সে ক্লেশে আমাদের প্রয়োজনই বা কি? তার খুব সহজ উত্তর এই যে, সেই ক্লেশই আমরা চাই। মানবের যদি কোথায়ও তৃপ্তি থাকে তবে সে তৃপ্তি সেই কণ্টকময় পথেই চলিয়া। যদি কোনখানে আনন্দ থাকে তাহা সেই "ক্ষুরধার নিশিত দুর্গম দুরত্যয়" সাধনার পথে।

উমা মহাদেবের জন্য তপস্বিনী সাজিয়াছেন, অতি সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সূত্র-বিরচিত ক্ষৌম পট্টবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কর্কশ কাষায়বস্ত্র পরিয়াছেন। কর্ণাবলম্বী মুক্তাগুচ্ছের পরিবর্ত্তে দুটী কর্ণিকার পুষ্প কর্ণে ধারণ করিয়াছেন। কমকণ্ঠে গজমুক্তার একাবলী হারের স্থানে রুদ্রাক্ষমালা শোভা পাইতেছে। তাঁহার তপঃক্লেশশীর্ণ বাহুলতা হইতে রুদ্রাক্ষ-বলয় খসিয়া পড়িতেছে। এই বেশে পাণ্ডুর ইন্দুলেখার ন্যায় তপস্বিনী উমা যখন আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন পুরন্দরের সৌভাগ্যগর্ব্বিতা স্বর্গরাজ্যেশ্বরী ইন্দ্রাণীর সৌন্দর্য্যও তাঁহার রূপপ্রভায় সূর্য্যরশ্মির নিকট দীপের ন্যায় একমুহূর্ত্তেই ম্লান হইয়া গেল। তাপসী উমার সুকুমার তনু আজ আর মণিমাণিক্য-ভূষণে ভূষিত হইয়া উজ্জ্বল হয় নাই, এক অপূর্ব্ব আনন্দ-দীপ্তিতে আজ তাঁহার সকল অঙ্গ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাভরণে ভূষিতা ভাগীরথীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তপস্যার ফলে উমা মহাদেবকে প্রাপ্ত হইবেন সেই আশাতেই কি তিনি এত আনন্দিতা? তাহা নয়। গিরিরাজ-তনয়ার তপস্যাক্লেশেই আনন্দ-উৎস উছলিয়া উঠিতেছে। এ তপস্যা যে তাঁহারই জন্য! বামদেবের চরণপ্রাপ্তির কামনাতেই যে এই তপঃক্লেশ স্বীকার! তাই এই তপস্যার আনন্দেই উমার চিত্ত পরিপূর্ণ, তপস্যার ফলে বামদেব প্রসন্ন হইবেন অথবা বামই রহিবেন, সে চিন্তার এখন তথায় স্থান নাই।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু তপস্যা করিবে সমস্ত আমাকে অর্পণ কর" অর্থাৎ তাহার কোন ফল প্রার্থনা করিও না। প্রকৃতপক্ষে তপস্যা আপনাতেই আপনি পরিপূর্ণ, সে কোন ফলের কামনা রাখে না। দ্রোণ-প্রত্যাখ্যাত একলব্য মৃণ্ময় দ্রোণমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তপস্যায় দুর্লভ অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্রক্ষেপণ-কৌশলে বিস্মিত দ্রোণ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে, কাহার শিষ্য, কাহার নিকট এই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিলে?" তখন বিনয়াবনত একলব্য উত্তর করিলেন, "আমি নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য, আমি দ্রোণের শিষ্য, তাঁহারই নিকট এই অস্ত্রবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি।" একলব্য নিজে যে কঠোর তপস্যায় অস্ত্রবিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন সে অভিমান তাঁহার মনে স্থানও পাইল না। আবার যখন দ্রোণ গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চাহিলেন, তখন একলব্য প্রসন্নমনে ধনুর্দ্ধারণের প্রধান অবলম্বন সেই বৃদ্ধাঙ্গুলি ছিন্ন করিয়া গুরুর হস্তে দক্ষিণা দান করিলেন। তাঁহার এত ক্লেশে অর্জ্জিত অস্ত্রবিদ্যা যে বিফল হইয়া গেল, সেজন্য তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও ক্ষোভের উদয় হইল না।

একলব্যের উপাখ্যানের ভিতর এমন একটী কথা আছে যাহাতে তপস্যার ভিতরের খবর কতকটা জানিতে পারা যায়। সে কথাটী এই যে—"একলব্য প্রসন্ন মনে দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দান করিলেন।" কর্ত্তব্যের চরণে প্রাণ দেওয়া সকলের পক্ষে সহজ নহে, কিন্তু পুরুষের পক্ষে প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা মান দেওয়া আরও কঠিন, সাধনালব্ধ সিদ্ধি দেওয়া আরও কঠিন;—তথাপি কর্ত্তব্য-পথের পথিক যাঁহারা, যাঁহারা বীর, তাঁহারা চিরদিনই এ সকল দিয়া আসিতেছেন। একলব্যও দিয়াছেন, কিন্তু কেবল কর্ত্তব্য-বোধে দিয়াছেন তাহা নয়, 'প্রসন্ন মনে' দিয়াছেন। যে দুষ্কর একাগ্র তপস্যায় তিনি দ্রোণের অজ্ঞাতে দ্রোণের অস্ত্র-বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই তপস্যার আনন্দেই তাঁহার

চিত্ত পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সেখানে কোন লাভ কোন ক্ষতি সে আনন্দ বৃদ্ধি কি মলিন করিতে পারে না। মাটীর আল দিয়া বাঁধা সরোবরের জল রৌদ্রতাপে শুখাইয়া যায় আবার বৃষ্টিধারায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু সকল বন্ধনহীন সমুদ্রের জলে হ্রাসবৃদ্ধি নাই। যখন তপস্যাপূত আনন্দ লাভক্ষতির বাঁধন কাটাইয়া মুক্ত হইয়াছে তখন আর তাহাকে ম্লান করিতে কেহ সক্ষম নহে। সুরের যেমন আদিতে 'সা' আবার অন্তেও 'সা', তেমনি তপস্যারও আদি অবসানে সেই এক রাগিণীই বাজে "আনন্দম্ পরমানন্দম্"! ব্রহ্মার মানস কন্যা বীণাপাণির অমৃতমধুর বীণাধ্বনিতে যে রাগিণী বাজিয়াছে, প্রলয়কালে রুদ্রের পিনাকগর্জ্জনেও সেই এক রাগিণীই বাজে "আনন্দম্ পরমানন্দম্!"

এ সব কথা শুনিতে যেন নিছক্ কবিত্বের মতই শুনায়, বাস্তব জগতের পক্ষে এ সমস্ত কথা কতখানি খাটে সে বিষয়ে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু একলব্যের প্রসন্নমনে বৃদ্ধাঙ্গুলিদানের মত এমন অসম্ভব ঘটনাও পৃথিবীতে ঘটিতেছে। কি করিয়া ঘটিল, কেমন করিয়া ঘটিতে পারে তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া থাকি। আমাদের দেশ-কাল-নিমিত্তে নিয়মিত জ্ঞান দেশ-কালের অতীত কূলহীন আনন্দ-সমুদ্রের ধারণা করিতে পারে না। সংসারে স্নেহে প্রেমে করুণায় প্রতিদিন আমরা যে আনন্দের আভাস পাই সে যেন এই মহা সমুদ্রেরই একটা অংশ, মধ্যে দেশ-কাল-নিমিত্তের পাথরের প্রাচীর উঠিয়াছে।—তাই মনের ভিতর বাজিতেছে "তপঃ, তপঃ!" তপস্যা কর! তপস্যা কর! ওগো বন্দী, মুক্ত হও। যুগ যুগ ধরিয়া আঘাত দিয়া আঘাত সহিয়া শিলা প্রাচীর ক্ষয় কর।

শ্রীঃ—

শক্তির শক্তি

চোর, দস্যু কহে—সাধু! ভেবে দেখ মনে,
রয়েছ শঙ্কিত নিত্য মোদের পীড়নে!
সাধু কহে—তবু জেনো, ফির দেশে দেশে,
মোদের শাসনে থাকি'—ভণ্ড-সাধু বেশে!

শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত।

কলঙ্ক

বাতাবি-কুঞ্জে সন্ধ্যার বায় পুষ্পপরাগ-চোর—
কলঙ্কী মন, চেয়ে দেখ্ আজি সঙ্গী মিলেছে তোর।
দিবা অবসান, রবি হ'ল রাঙা
পশ্চিমাকাশে নটকনা-ভাঙা;
সঙ্গহীনের যাহা কিছু সাজ সাঙ্গ করেছি মোর,
কুঞ্জদুয়ারে বসে আছি একা কুসুমগন্ধে ভোর।

আধফুটন্ত বাতাবিকুসুমে কানন ভরিয়া আছে,
কি গোপন কথা গুঞ্জরি অলি ফিরিছে ফুলের কাছে;
স্ফুটনোন্মুখ ফুলদলগুলি
পুলক-পরশে উঠে দুলি' দুলি',
গন্ধভিখারী সন্ধ্যার বায় ফুল-পরিমল যাচে—
সঙ্কোচে নত পুষ্পবালিকা, অতিথি ফিরে বা পাছে!

বেলা বয়ে যায়, উন্মাদ বায় আসি' কহে বার বার
সন্ধ্যা হয় যে, অন্ধ কুসুম খোল অন্তর-দ্বার।
মুকুল-গন্ধ অন্ধ ব্যথায়
কুঁড়ির বন্ধ টুটিবারে চায়,
লুটাইতে চায় সন্ধ্যার গায় রুদ্ধ আবেগ ভার,
বিকাইতে চায় চরণের পরে কৌমার সুকুমার।

মন্থর পদে সন্ধ্যা নামিল কাজল তিমিরে আঁকা,
দুয়ারে অতিথি, অন্তরে ব্যথা সম্ভব সে কি থাকা?
গন্ধে পাগল অন্তর যার
আবরণ মাঝে থাকে সে কি আর,
খুলি' দিল দ্বার, পরাণ তাহার পরাগ শিশিরে মাখা,
কুঞ্জ ঘেরিয়া আঁধারে ছাইল স্বপ্ন-পাখীর পাখা।

বাতাবি-কুঞ্জে সন্ধ্যার বায় পুষ্পপরাগ-চোর,
হারে কলঙ্কী হৃদয় আমার, সঙ্গী মিলেছে তোর।
দূর দিগন্তে রবি হ'ল সারা
অম্বর ভরি' ফুটে' উঠে তারা,
নব ফুটন্ত নেবুর গন্ধে আসিল তন্দ্রা-ঘোর;—
কলঙ্কী মন, মুগ্ধ হৃদয়—একি পরিণাম তোর।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

বিকানীর

আমরা বঙ্গবাসী অনেকেই রাজপুতানার বিকানীর রাজ্যের নাম শুনিয়া থাকিলেও, এরাজ্যের বিবরণ অতি অল্পই বিদিত আছি, আজ পাঠকগণের অবগতির জন্য সংক্ষেপে বিকানীরের ঐতিহাসিক বিবরণ কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

বিকানীর রাজপুতানার মরুভূমি প্রদেশে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ভাওয়ালপুর ও সার্ষা; পূর্ব্বে হিসার জেলা (ব্রিটিশ) ও জয়পুর রাজ্য; দক্ষিণে যোধপুর; এবং পশ্চিমে যশল্মীর ও ভায়ালপুর। আয়তনে ২২৩৪০ বর্গমাইল। বোধহয় দেশীয় রাজ্যের মধ্যে আয়তনে বিকানীর চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম স্থান অধিকার করিবে, কিন্তু মরুভূমি প্রদেশ বলিয়া ইহার লোকসংখ্যা অতি অল্প এবং কৃষির উপযোগী ক্ষেত্র অতি সামান্য। সমগ্র রাজ্যে কলিকাতা নগরীর লোকসংখ্যার চেয়েও কম অধিবাসী। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারিতে দেখা গিয়াছে তৎকালে ৮৩১৯৪৩ জন অধিবাসী ছিল। কিন্তু উহার পর ১৮৯২, ১৮৯৭ এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ক্রমে তিনবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় লোকসংখ্যা ১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারীতে কিঞ্চিদধিক পাঁচ লক্ষে দাঁড়ায়। এ কয়েক বৎসরে তেমন দুর্ভিক্ষ না হইলেও পূর্ব্বের সংখ্যা এখনও পূরণ হইতে অনেক বাকী। এখানকার অধিবাসীর দশমাংশ মুসলমান।

বিকানীর-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ কনৌজের মহারাজা জয়চাঁদ। জয়চাঁদের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র রাও সিয়াজি তাঁহার রাজ্যের পতনাবস্থায় দেশত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান যোধপুরের অন্তর্গত পালী নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে থাকেন (১২১১ খৃঃ)। তাঁহার বংশধর রাও যোধা বর্ত্তমান যোধপুর সহর হইতে চারি মাইল দূরবর্ত্তী মান্দোর নামক স্থানে অবস্থান করতঃ যোধপুর সহর নির্ম্মাণ করিয়া ক্রমে যোধপুর রাজ্য স্থাপন করেন। এই যোধার পুত্র বিকা যোধপুর হইতে কতিপয় আত্মীয় স্বজন এবং পাঁচশত পদাতিক এবং একশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বর্ত্তমান বিকানীর অভিমুখে যাত্রা করেন (১৪৬৫ খৃঃ) এবং বিকানীর হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী দেশমুক গ্রামে পৌঁছিয়া কার্ণিজি নাম্নী অলৌকিক শক্তিসম্পন্না এক চারণ মহিলার পূজা করেন। তিনি পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া বিকার ভবিষ্যৎ বলিতে আরম্ভ করেন এবং বিকা তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীই চলিতে থাকেন। এ প্রদেশে এই ভবিষ্যদ্বাণী অনেকটা গ্রীসের ডেল্‌ফি অরেক্‌লের ন্যায় বিবেচিত হয়। আজ পর্য্যন্তও এখানকার রাজা এবং সাধারণ লোকে কার্ণিজিকে দেবীরূপে পূজা করে।

বিকার সহিত এখানকার আদিম অধিবাসী জাট এবং ভাটি প্রভৃতির যুদ্ধ বাধিয়া যায়। বিকার সৈন্যসংখ্যা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্ষমতা বাড়াইবার জন্যই বিকা পোগলের ভাটী রাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু কিছুতেই আর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় না। যুদ্ধ চলিতে থাকে। অবশেষে বিকা একে একে যাবতীয় আদিম এবং স্থানীয় শক্তিকে পরাস্ত করিয়া এ রাজ্যের অধীশ্বর হন। এবং তাঁহার নাম হইতেই এ রাজ্যের নাম বিকানীর হইয়াছে।

১৪৯০ খৃঃ যোধপুরাধিপতি যোধার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ছাতানের অকালমৃত্যুতে দ্বিতীয় পুত্র বিকাই যোধপুরের গদিরও অধিকারী হয়েন। কিন্তু বিকার অনুপস্থিতিতে তাঁহার অপর ভ্রাতা সুজোজি গদি দখল করিয়া বসেন। বিকা ত্রিশ সহস্র সৈন্য সহ যোধপুর আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লয়েন, কিন্তু শেষে তিনি তাঁহার ভাইকে যোধপুর অর্পণ করিয়া বিকানীরে ফিরিয়া আসেন।

ইহাঁরা রাঠোর বংশীয় রাজপুত। এক যোধপুর-রাজ যোধার বংশধরগণই আজ পর্য্যন্ত ছোট বড় আটটি দেশীয় রাজ্যের অধীশ্বর, যথা—বিকানীর, যোধপুর, ইদর, কিষণ-গড়, ঝাবোয়া, রাৎলাম, শৈলানা এবং শিতামউ।

এই সাড়ে চারিশত বৎসরে বিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান মহারাজা পর্য্যন্ত বিশজন রাজা বিকানীরের গদিতে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইহাঁদের রাজত্বের প্রথম ভাগের ইতিহাস কেবল যুদ্ধবিগ্রহেই পূর্ণ। কখন যোধপুর, কখন জয়পুর, কখন উদয়পুর, কখন যশল্মীর, আবার কখন বা দিল্লীর বাদসাহের সহিত যুদ্ধ চলিত। তাছাড়া রাজ্যের অধীনস্থ সর্দ্দার অর্থাৎ জমিদারগণ প্রায়ই বিদ্রোহী হইয়া গোলমাল বাঁধাইত। তাঁহাদিগকে শাসনে রাখিতে প্রায়ই গৃহ-যুদ্ধ হইত। ষোড়শ রাজা সুরতের রাজত্বকালে

(১৮১৫ খৃঃ) সর্দ্দারগণের উপদ্রব এতদূর বাড়িয়া উঠে যে রাজা ইংরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সাহায্যপ্রার্থী হন। বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরাজ জেনারেল আল্নার সসৈন্যে বিকানীর রাজ্যে প্রবেশ করেন, এবং বিদ্রোহ দমন করিয়া কতকগুলি পরগণায় শান্তি স্থাপন করেন এবং পরগণাগুলি রাজার অধিকারভুক্ত করিয়া দেন। কেবল ইংরাজ-সৈন্যের ব্যয় আদায় করিয়া তুলিবার জন্য বাহাদ্রণ নামক একটি পরগণা চারি বৎসরকাল ইংরাজাধিকারে রাখেন।

একটী প্রাচীন ঘটনা এস্থলে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। এখানে রাজার নিশানে, চাপরাশে, বাসন-পত্রে, গাড়ী পাল্কী প্রভৃতি সমস্ত আসবাবেই আজ পর্য্যন্ত দেবনাগরী অক্ষরে "জয় জঙ্গলধর বাদসাহ" লিখিত হইয়া থাকে।

যে সময়ে দারা, সুজা এবং আরঙ্গজেবের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, সে সময় বিকানীরের রাজা করণ সিংহ আরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করেন। পদম সিংহ এবং কেশরী সিংহ নামক করণসিংহের পুত্রদ্বয় যুদ্ধে অসীম প্রতিপত্তি দেখাইয়া বাদশাহ আরঙ্গ-জেবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

একদা আরঙ্গজেব অনেক সৈন্যসামন্ত এবং অনেক প্রাদেশিক হিন্দুরাজা সহ দিগ্বিজয়ে বাহির হন। আটক পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে বিকানীর-রাজ করণ সিংহ এক ষড়যন্ত্রের অনুসন্ধান পাইলেন। তাহাতে দেখিলেন রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য যাবতীয় হিন্দুকে জোর-জুলুমে মুসলমান করা। সমস্ত হিন্দুরাজাগণ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও পারেন না অথচ হিন্দু-ভ্রাতাদের সমূহ বিপদও উপস্থিত।

হিন্দুরাজাগণ মহা সমস্যায় নিপতিত হইলেন। করণ সিংহ একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি নৌকার সাহায্যে সমস্ত মুসলমানকে দিগ্বিজয়ের জন্য অপর তীরে পাঠাইয়া দিলেন। পুনরায় হিন্দুদিগকে তীরে লইবার জন্য নৌকা যখন প্রত্যাবর্ত্তন-পথে নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত তখন করণ সিংহের বুদ্ধিকৌশলে উহা অর্দ্ধপথেই চূর্ণ এবং জলমগ্ন হইয়া গেল। হিন্দুরাজাগণ করণ সিংহকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিলেন "জয় জঙ্গলধর বাদসাহ।" ইহার অর্থ মরুভূমির রাজার জয়। এ অঞ্চলে জঙ্গল অর্থে মরুভূমি বুঝায়। সেই অবধি বিকানীরের রাজগণ "জয় জঙ্গলধর বাদসাহ" শব্দটী সম্মানসূচক বংশ-নিদর্শন স্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন।

আরঙ্গজেবের আর দেশ জয় করা হইল না। হিন্দু রাজাগণ মহা আনন্দে এবং বাদসাহ ক্ষুণ্ন মনে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বাদসাহ দরবার-স্থলে তাঁহার সাক্ষাতে করণ সিংহকে আনিয়া ঘাতককে তাঁহার মস্তক ছেদনে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। দরবার বসিল। করণ সিংহ গিয়া দরবারে উপবেশন করিলেন, ভীষণ আকৃতি দুই বীর সন্তান পদম সিংহ এবং কেশরী সিংহ পিতার দুই পার্শ্বে বসিয়া বাদসাহের ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে-ছিলেন। বাদসাহ আরঙ্গজেব দুই বীরের ভীষণ চেহারা দেখিয়া ভীত হইলেন এবং ঘাতককে দরবার-স্থল হইতে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। বাদসাহ করণ সিংহকে একটী কথাও বলিতে সাহসী হইলেন না। যদি ঐ সময় উহাঁর শিরশ্ছেদন করিতে ঘাতককে অনুমতি দেওয়া হইত তাহা হইলে হয়ত পরবর্ত্তী ইতিহাসেরও অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত।

তারপর করণ সিংহ এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় পূর্ব্বের ন্যায় বাদসাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। আরঙ্গজেব করণ সিংহকে দাক্ষিণাত্যের আওরাঙ্গাবাদ শাসনে প্রেরণ করেন এবং তথায় তাঁহাকে অনেকটা জায়গার জায়গীর প্রদান করেন। ঐ স্থানে উহাঁদের নামানুসারে করণপুরা, কেশরীপুরা এবং পদমপুরা নামক তিনটী গ্রাম স্থাপন করা হয়। আজ পর্য্যন্তও দাক্ষিণাত্যের এই তিনটী গ্রাম বিকানীর রাজ্যের অন্তর্গত।

সপ্তদশ রাজা রতন সিংহের রাজত্বকালে সন্তান-হত্যা প্রথা রহিত হয়। বিবাহের ব্যয়বাহুল্যে রাজপুতগণ সন্তানকে হত্যা করিয়া ফেলিত। রতন সিংহ বিবাহের ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য আদেশ প্রচার এবং সন্তানহত্যার বিরুদ্ধে আইন প্রচার করেন।

অষ্টাদশ রাজা সর্দ্দার সিংহ পৈতৃক ঋণে জড়িত হইয়া পড়েন। কিছুতেই অভাব পূরণ হইয়া উঠে না। কোন

মন্ত্রীই অভাব পূরণ করিয়া উঠাইতে পারেন না বলিয়া তাঁহার রাজত্ব-সময়ে চব্বিশবার মন্ত্রী পরিবর্ত্তিত হয়। এই বিশৃঙ্খলার সময় (১৮৬৮ খৃঃ) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট ডাকাতি-দমন উপলক্ষে জয়পুর, মাড়োয়ার এবং বিকানীর রাজ্যের ত্রিসীমানার সন্ধিস্থলে বিকানীরের অন্তর্গত সুজান-গড় নামক স্থানে আসিয়া আড্ডা স্থাপন করেন। ক্রমে তিনি বিকানীরের রাজকার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন। এই সময় হইতেই বিকানীর রাজ্য গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্টের তত্ত্বাবধানের অধীন। রাজা সর্দ্দার সিংহ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজপক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তিব্বি এলাকা পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন। সর্দ্দার সিংহের সময়ই (১৮৭১ খৃঃ, নভেম্বর) এ রাজ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়।

সর্দ্দার সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পোষ্যপুত্র ডুঙ্গর সিং সিংহাসনাধিরোহন করেন। ইংরাজ-এজেণ্ট ষ্টেট কাউন্সিলকে রিজেন্সি কাউন্সিলে পরিণত করিয়া নিজে উহার প্রেসিডেণ্ট হইয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তারপর রাজা সাবালক হইয়া রাজ্যভার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেও কার্য্যতঃ রিজেন্সি কাউন্সিলই সমস্ত কাজ চালাইতে থাকে।

১৮৭২ খৃঃ এ রাজ্যে সতীদাহ প্রথা রহিত হয়। বিকা-নীর সহর হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী দেবীকুণ্ড নামক স্থানে এক হ্রদতীরস্থ শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত রাজা ও রাণীদের স্মৃতিস্তম্ভ প্রাচীন ইতিহাস অদ্যাপিও স্মৃতিপথে জাগরুক করিয়া দিতেছে। কোন্ রাজার সহিত কতজন সতী চিতারোহণ করিয়াছেন তাহারও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রস্তর-গাত্রে খোদিত রহিয়াছে। কোন রাজার সহিত ২০।২১ জন সতীও প্রজ্বলিত স্বামীর চিতায় সানন্দে আরোহণ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সংগ্রাম সিংহ নামক জনৈক অনুচরও সতী-নিয়মানুযায়ী (১৭৮৮ খৃঃ) পঞ্চদশ রাজা রাজ সিংহের চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করেন।

রাজা ডুঙ্গর সিংহের রাজত্বকালে (১৮৭৯ খৃঃ) আফগান যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে বিকানীর-রাজ ইংরাজকে উট-সৈন্য দ্বারা সাহায্য করেন। এখনও বিকানীর-রাজের পঞ্চশত উষ্ট্রারোহী সৈন্য আছে।

১৮৮৪ খৃঃ সদর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত উঠিয়া যায় ও তৎপরিবর্ত্তে নিজামত আদালতের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৮৮৫ খৃঃ রাজ্যের স্থানে স্থানে নয়টী হাসপাতাল স্থাপিত হয়। উহার পরবৎসর আটটী য়্যাংগ্লো ভারনাকুলার স্কুল স্থাপিত হয়।

উনবিংশ রাজা ডুঙ্গর সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্য-পুত্র গঙ্গা সিংহ সাত বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ডুঙ্গর সিংহ স্বীয় সহোদর ভ্রাতাকেই পোষ্য লইয়া-ছিলেন। এই গঙ্গা সিংহই বর্ত্তমান রাজা। উপাধি-সহ ইঁহার সম্পূর্ণ নাম হিজ্ হাইনেস্ শ্রীমহারাজা অধিরাজ, রাজরাজেশ্বর, নরেন্দ্র সারোমান, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল গঙ্গা সিং বাহাদুর, জি, সি, আই, ই ; কে, সি, এস্, আই ; এ, ডি, সি। রিজেন্সি কাউন্সিল নাবালক রাজার শিক্ষা ও রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা আজমীরের মেয়ো কলেজে শিক্ষিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান রাজা সাবালক হইয়া রাজ্যভার নিজ হস্তেই গ্রহণ করিয়াছেন। রিজেন্সি কাউন্সিলের পরিবর্ত্তে পুনরায় ষ্টেট্ কাউন্সিল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রিটিশ এজেন্সি আপিস এতদিন পর্য্যন্ত বিকানীরে ছিল। সম্প্রতি কয়েকমাস যাবত আপিসটী এখানে নাই, শুনিতে পাই উহা যোধপুরে উঠিয়া গিয়াছে ; যেহেতু রাজা শিক্ষিত এবং উপযুক্ত, তিনি নিজেই সমস্ত রাজকার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন। ইনি একবার চীনে এবং দুইবার বিলাত গিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে রাজ্যের, বিশেষতঃ বিকানীর সহরের, বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। বারান্তরে স্থানীয় বিষয় লিখিবার ইচ্ছা রহিল। পূর্ব্বে এই রাজ্যে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। ঐ সময় অন্য প্রদেশের সহিত বাণিজ্যের সম্পর্ক অতি কমই ছিল। বাহির হইতে খাদ্যের সরবরাহ বন্ধ থাকায় দুর্ভিক্ষে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। বর্ত্তমান রাজার সময়ে রাজ্যে রেল হওয়ায় আজকাল অন্যান্য প্রদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য একরূপ অনায়াস-লব্ধ বলিতে হইবে। কাজেই এখন কোন বৎসর দুর্ভিক্ষ হইলেও মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়াছে।

শ্রীযদুনাথ সরকার

সংকলন ও সমালোচন

বাহা-ধর্ম্ম*

"মানুষের চিত্ত এমন করিয়া শিক্ষা লাভ করিবে যাহাতে সত্ত্বগুণের দ্বারা মানুষ পশুপ্রবৃত্তির উপর জয় লাভ করিতে পারে ও পুণ্যজ্যোতি সর্ব্বত্র অবাধে প্রসারিত হয়—এই অভিপ্রায়েই জগতে মাঝে মাঝে দিব্যশক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে।"

ইহাই আবদুল বাহার প্রচারিত বাক্য। ইনি বাহা-ধর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক বাহাউল্লার জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ভার ইঁহারই প্রতি ন্যস্ত ছিল। বাহাউল্লা তাঁহার লেখায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে তিনিই ঈশ্বরের সার্ব্বজনীন প্রকাশ অর্থাৎ তিনি মানবের সার্ব্বজনীন গুরু। বস্তুত এই বাহা-ধর্ম্ম আমাদের যুগে প্রকাশিত একটী সুমহৎ বিশ্বজনীন ধর্ম্মোদ্যম, আর সেই কারণেই ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ ভাবে ঔৎসুক্যজনক। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এই ধর্ম্মান্দোলনের সূত্রপাত হয়। সকলের নিকট "বাব" নামে পরিচিত যুবক আলি মহম্মদ পারস্য দেশে স্বদেশবাসিগণের নিকট প্রথম ইহা প্রচার করেন। তিনি কেবল ছয় বৎসর মাত্র ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকিয়া অবশেষে প্রতিকূল পক্ষের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। পারস্যদেশে বর্ত্তমান কালে যে এক আশ্চর্য্য উদ্বোধন দেখা দিয়াছে "বাব"ই তাহার সূচনা করেন এবং পরে বাহাউল্লা ও তাঁহার পুত্রের চেষ্টায় তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে। যদি এই ধর্ম্মান্দোলনের বেগ কেবল মাত্র "বাবে"র শক্তির উপর নির্ভর করিত তবে সম্ভবতঃ ইহা ইস্‌লাম ধর্ম্মেরই কথঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করিয়া ক্ষান্ত থাকিত। উপদেশ ও ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা "বাব" দলের লোকের মনে, অনতিবিলম্বে তাঁহার অপেক্ষা মহত্তর আর এক গুরুর আগমন-সম্ভাবনার প্রত্যাশা জাগরিত করিয়াছিলেন। বাব কর্ত্তৃক ধর্ম্মান্দোলনের উনিশ বৎসর পরে বাহাউল্লা এই ধর্ম্মের প্রচার-ভার গ্রহণ করিয়া "বাবে"র সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করেন। তিনি এই ধর্ম্মের ক্ষেত্রকে সার্ব্বভৌমিক ভাবে প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে পারস্য দেশের প্রায় একতৃতীয়াংশ লোক এই বাহা-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যেও এই মতাবলম্বীর সংখ্যা বহু সহস্র হইবে। সিকাগোতে, আমেরিকাবাসী বাহায়ীদিগের উপাসনা-কার্য্যের জন্য সম্প্রতি একটী স্থান কেনা হইয়াছে ও সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। ইহার উদ্দেশ্য গির্জ্জার অনুরূপ নহে। সকলে মিলিয়া আধ্যাত্মিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনায় একত্র হইবার জন্যই এই মন্দির সঙ্কল্পিত। রুশীয় তুর্কীস্থানের ইস্কাবাদ নগরে এইরূপ মন্দিরগৃহ সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইউরোপে ষ্টুটগার্ট, প্যারিস, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে বাহাধর্ম্মীর দল আছে। এই ধর্ম্ম সম্প্রতি ভারত ও ব্রহ্মদেশবাসীদিগের মধ্যেও বিস্তার লাভ করিতেছে ও এই সকল দেশের অসংখ্য মত ও অসংখ্য জাতির মধ্যে প্রকৃত ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের পক্ষে এই ধর্ম্মমত সহায়তা করিবে এরূপ আশা করা যায়।

অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করেন যে আমাদের এই বর্ত্তমান যুগ একটী প্রবল আধ্যাত্মিক চাঞ্চল্যের যুগ, ইহা গভীরভাবে সত্যানুসন্ধানের যুগ, এবং বর্ত্তমান কালের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত করিয়া ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলিকে পুনরায় নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুলতার এই যুগ। বাহাউল্লা বলেন যে তাঁর ধর্ম্মে তিনি নবযুগের এই সমস্ত প্রয়োজন সাধনেরই ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন। যে প্রণালীতে তিনি তাহা সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহা এস্থলে লিখিত হইবে।

বাহাউল্লার শিক্ষা একান্তভাবে কর্ম্মপ্রধান। তিনি বলেন, যিনি বিশ্বের সমস্ত যাচাই করিয়া দেখিতেছেন সেই ঈশ্বর, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কেবল মাত্র কতকগুলি মুখের কথাকে আর গ্রহণ করিবেন না—যথার্থ সত্য ও সাধু কর্ম্মই কেবল তিনি স্বীকার করিবেন। যাহারা শিষ্য হইতে ইচ্ছা করিয়াছে বাহাউল্লা বিশেষভাবে তাহাদের জন্য কতকগুলি আচার ও কর্ম্মের বিধি স্থির করিয়া দিয়াছেন।

* ধর্ম্ম-ইতিহাসের আন্তর্জাতিক সভায় মিস্ রোজেনবের্গ্ কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

তিনি বলিয়াছেন শ্রদ্ধাপূর্ণ সেবার ভাবে যে-কোন কার্য্য করা যায় ঈশ্বর তাহাকেই তাঁহার উপাসনা বলিয়া গ্রহণ করেন। অতএব জগতের মধ্যে ও সমাজের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির যে বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট আছে সেইখানেই সত্যভাবে আপন কর্ত্তব্য সকলকেই পালন করিতে হইবে। সেই জন্য প্রত্যেক বাহায়ীকেই তিনি নিজের ও অন্যের হিতের উদ্দেশ্যে কোন একটি শিল্প, বাণিজ্য বা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বিশেষরূপে আদেশ দিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁহার আর একটি এই উপদেশ যে—স্ত্রী ও পুরুষের মহত্তম কর্ত্তব্য এই যে পরিবারকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে সন্তানবর্গ উপযুক্তরূপে নৈপুণ্য ও সুশিক্ষা লাভ করিয়া স্বজাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহার মতানুবর্ত্তী প্রত্যেকেরই প্রতি তাঁহার অনুশাসন এই যে তাহারা পুত্র কন্যা উভয়েরই জন্য সমানভাবে যথাসাধ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এই সম্বন্ধে তিনি এই সুন্দর বাক্যটী বলিয়াছেন, যে-কোন ব্যক্তি সন্তানদিগকে সুশিক্ষা দেন তিনি আমার আপন পুত্র কন্যাদিগকেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার আর এক বিধান এই যে সমুদয় শিক্ষক ও গুরুর জন্য বিশেষ সম্মান ও জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিতেই হইবে।

বাহাউল্লা যেমন একদিকে ভিক্ষাবৃত্তি একান্তভাবে নিষেধ করিয়াছেন তেমনি অপরদিকে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের প্রতি তাঁহার এই অনুশাসন ছিল যে যাহার প্রয়োজন ঘটিবে তাহাকেই কাজ জোগাইয়া দিতে হইবে।

তিনি বলেন অনন্যোপায় অক্ষম ও পীড়িতদিগের এবং অসহায় বিধবা ও শিশুদিগের ভার বিশেষ ভাবে সমাজের উপর থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক বাহায়ীকে, যোগ্যতা অনুসারে অর্থ দিতে হইবে—এবং নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা যে সমিতি স্থাপিত হইবে সেই সমিতিগুলিই বিচার করিয়া এই ধন-ভাণ্ডারকে ব্যবহারে লাগাইবেন। এই সমিতিগুলির নাম হইবে ন্যায়ভবন।

প্রত্যেক দল বা সমাজ ন্যায়নিষ্ঠ, সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাচন করিয়া এইরূপ সমিতি গঠন করিবে। এক একটি সম্প্রদায়ের যেমন এক একটি ন্যায়ভবন থাকিবে তেমনি আবার প্রত্যেক নেশনের জন্য একটী করিয়া সাধারণ ন্যায়ভবন স্থাপিত হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধি সংগ্রহ করিয়া একটি সার্ব্বভৌমিক ন্যায়ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া দিবে।

বাহাউল্লা আরো বলেন যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল শিক্ষা দিবার জন্য, সাধারণ লোক হইতে স্বতন্ত্র কোন পুরোহিত বা যাজকশ্রেণী থাকিবে না। শিক্ষা ও চরিত্রগুণে যাঁহারা উপযুক্ত হইবেন তাঁহারাই এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন। এজন্য তাঁহারা কোন বেতন বা কোন নির্দ্দিষ্ট দান পাইবেন না। অন্যান্য সকল বাহায়ীর ন্যায়, তাঁহাদিগকেও, আপন আপন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উপার্জ্জন করিতে হইবে। স্ত্রী পুরুষের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক অধিকার সম্পূর্ণ সমান—ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে তিনি প্রচার করিয়াছেন।

অনুবর্ত্তীদিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ উপদেশ এই যে, জগৎব্যাপী শান্তি স্থাপনার চেষ্টা করা, বিরোধ লয় করা, সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের সহিত প্রকৃত ভ্রাতৃভাবে প্রেম ও সাহানুভূতির সহিত মিলিত হওয়া এবং মনুষ্য মাত্রকেই এক সত্যের সন্ধানপ্রার্থী বলিয়া স্বীকার করা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

এই উপদেশের প্রতিই তিনি সকলের চেয়ে অধিক জোর দিয়াছেন এবং ইহাকেই তাঁহার সকল শিক্ষার মূল ভিত্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

তিনি বলেন অতীত কালের সমুদয় ঋষি ও ধর্ম্মোপদেষ্টা-গণকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। প্রত্যেক যুগের অবস্থার স্বাতন্ত্র্য বশতঃ কালে কালে নূতন নূতন উপদেষ্টার অভ্যুদয় আবশ্যক, তাঁহারা একই ধর্ম্মকে কালোপযোগী করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রচারিত করিবেন।

বাহাউল্লার লেখায় বহুতর দিক আছে। সে সকলের আলোচনা বিশেষ কৌতুহলজনক হইলেও তাঁহার সে-সকল উপদেশ কেবলমাত্র চারিত্রনৈতিক ও ব্যবহারগত নহে। যাহা উদার ভাবে আধ্যাত্মিক, এই প্রবন্ধে কেবল সেইগুলিরই উল্লেখ করিব।

চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাহাউল্লা এই ধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি যে অসংখ্য গ্রন্থ

রচনা করেন তাহার কতকগুলি ব্যবহারিক, কতকগুলি সম্পূর্ণ রহস্যময় ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির। ইহার মধ্যে অনেক-গুলি ইতিপূর্ব্বে ইংরাজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্য এইসকল গ্রন্থের অংশবিশেষ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

১। সংসারের স্থিতি ও জীবমাত্রের শান্তি রক্ষার সর্ব্বোচ্চ উপায় ধর্ম্ম।

২। সমস্ত সত্তার মূলে একটি সত্যের যোগ আছে। যাঁহারা মানবগুরু-রূপে ঈশ্বরের সার্ব্বজনীন প্রকাশ তাঁহারা সেই স্বরূপগত যোগটি জানিয়া সেই জ্ঞানের দ্বারাই জগতে ঈশ্বরের বিধানকে প্রচার করেন।

৩। যে-কোন দেশ ও যে-কোন রাজ-সরকারের আশ্রয়ে বাহায়ীদল বাস করিবে তাহাদের প্রতি তাহাদিগকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সত্য ব্যবহার করিতে হইবে।

৪। জগৎকে দুর্ব্বিষহ অপব্যয় হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ন্যায়ভবনের সভ্যগণকে "মহাশান্তির" উন্নতিসাধন করিতে হইবে। ইহা অত্যাবশ্যক ও অবশ্যকরণীয়, কারণ যুদ্ধ ও বিবাদ বিসম্বাদই দুঃখদুর্গতির মূল।

৫। যে রাজা বন্দীর প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, যে ধনী দরিদ্রের প্রতি অনুকূল, যে ন্যায়বান ব্যক্তি অত্যাচারে পীড়িত বা ক্ষতিগ্রস্তের পক্ষাবলম্বী ও যিনি চিরন্তন প্রভুর আদেশসকল একান্ত বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত পালন করেন তিনিই কল্যাণ প্রাপ্ত হন।

৬। ন্যায়ই মনুষ্যগণের আলোক, অত্যাচার ও নির্য্যা-তনের প্রতিকূল বায়ুর দ্বারা তাহাকে নির্ব্বাপিত করিও না।

৭। শিশুগণকে ধর্ম্মভাবে দীক্ষিত করাই বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য—কিন্তু ইহা যেন মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়া বালক বালিকাগণকে গোঁড়ামী ও উন্মত্ততার পক্ষে লইয়া গিয়া তাহাদের ক্ষতির কারণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা চাই।

৮। মানবের সত্তার পক্ষে জ্ঞান যেন ডানার মত, এবং উন্নতির পথে তাহাই সোপান। অতএব জ্ঞানার্জ্জন মানুষের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য, কিন্তু যেসকল বিদ্যার কেবল কথায় আরম্ভ এবং কথায় শেষ, যাহাতে মানুষের কোন উপকার নাই, তাহা অনাবশ্যক।

৯। রাজাগণ—ঈশ্বর তাহাদের সহায় হউন—অথবা রাজমন্ত্রিগণ পরামর্শ ও বিচার পূর্ব্বক, প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে কোন একটি অথবা কোন নূতন একটি ভাষা সর্ব্ব-মানবের মধ্যে প্রচলিত ক'রবেন এবং পৃথিবীর যাবৎ বিদ্যালয়ে সেই ভাষায় বালকবালিকাগণকে শিক্ষা দান করিবেন। এই উপায়ে জগৎ ঐক্যে সম্মিলিত হইবে।

১০। তোমাদের প্রত্যেকেরই, শিল্প বাণিজ্যাদির ন্যায় কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমাদের সেই সকল ব্যবসায়কেই সত্য ঈশ্বরের পূজার সহিত অভিন্ন বলিয়া আমি গণ্য করি।

১১। হে বাহায়ীগণ তোমরা প্রেম-প্রভাতের ঊষার ন্যায়, এবং তোমরাই ঈশ্বরের বিধানের নব অভ্যুদয়ভূমি। তোমরা কাহারও প্রতি অভিশাপ ও কুৎসার দ্বারা জিহ্বাকে কলুষিত করিও না, যাহা কিছু অযোগ্য তাহা হইতে দৃষ্টিকে রক্ষা কর—কাহারও দুঃখের হেতু হইও না, বিবাদ বিদ্রোহ হইতে বিরত থাকিও। তোমরা সকলে এক সমুদ্রের বারিবিন্দু, এক বৃক্ষের পল্লবপুঞ্জ।

১২। হে বন্ধুগণ, আবদুল বাহার ইচ্ছা যে বাহায়ীগণ এক ঐক্যভূমির প্রতিষ্ঠা করে। আমরা সকলে একই গৃহের সেবক, একই সমুদ্রের তরঙ্গ, একই স্রোতস্বিনীর বারিবিন্দু, একই উদ্যানের তরুরাজি। * * * * যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র তাঁহারা অনাত্মীয়দেরও সুহৃৎ। বন্ধুগণ, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যগুলি সাধনের নিমিত্ত সভা-সকল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যথা, সত্যশিক্ষার সভা, ধর্ম্ম-সৌরভ বিস্তারের সভা, অনাথ ও দরিদ্রদিগের আশ্রয়দান ও দুঃখ মোচনের সভা, শিক্ষা বিস্তৃতির সভা,—এক কথায়—যে কোন বিষয়ে মনুষ্যের সুখ স্বচ্ছন্দতার সহায়তা করে তাহারই জন্য সভা আহ্বান করিতে হইবে, যেমন বাণিজ্য-সমাজ, শিল্পকলা ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য সভা-সকল গঠন করা ইত্যাদি। আমি আশা করি পূর্ব্ব পশ্চিমের সমুদয় বন্ধুগণ এক সভায় উপবেশন করিবেন, এক সম্মিলনকে অলঙ্কৃত করিবেন এবং বিশ্বমানব-সমাজে সমস্ত স্বর্গীয় গুণে দীপ্যমান হইয়া প্রকাশিত হইবেন।

বাহাউল্লা ও তাঁহার পুত্র আবদুল বাহার রচনাবলী হইতে এরূপ অনেক উক্তি সংগ্রহ করা যাইতে পারে কিন্তু

আমরা যেগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহারা ব্যবহারিক হিসাবে যে কিরূপ অনুকূল ও তাহাদের ক্ষেত্র যে কিরূপ বিশ্বব্যাপী তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

হিন্দুধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি *

খৃষ্ট ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, ও হিন্দু ধর্ম্ম, জগতের এই চারিটি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত দুইটিকে পাশ্চাত্য ও শেষোক্ত দুইটিকে প্রাচ্য বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। যে যে দেশে এইসকল ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে সেই সেই দেশের রাষ্ট্রনীতির সহিত তাহাদের কি সম্বন্ধ আমাদের প্রবন্ধের তাহাই আলোচ্য বিষয়।

যথেষ্ট উন্নতিপ্রাপ্ত সমাজেও যে বহুদেববাদ থাকিতে পারে গ্রীস ও রোম তাহার দৃষ্টান্তস্থল। তাহার কারণ, গ্রীসে রাষ্ট্রনীতির সহিত ধর্ম্মের বিশেষ যোগ ছিল না; গ্রীস রাষ্ট্রনীতিতে বর্ত্তমান যুগের সমকক্ষ ছিল বটে কিন্তু ধর্ম্মমতে গ্রীসের জনসাধারণ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া ছিল। কেবল সর্ব্বসাধারণের নৈতিক অবস্থার প্রতি গভর্মেণ্টের দৃষ্টি ছিল। অনাচার ও নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে আইন বাধা দিত এবং সমস্ত দেশের প্রতি দেবতার কোপ যাহাতে আকৃষ্ট হয় এমন কোন প্রকাশ্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে শাস্তির ব্যবস্থা হইত, এই পর্য্যন্ত দেখা যায়। দার্শনিক পণ্ডিতগণ যুক্তিকে ভিত্তি করিয়া নীতি শিক্ষা দিতেন এবং প্রচলিত কুসংস্কারের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সেগুলিকে অবজ্ঞার সহিত সহ্য করিতেন। যদিও তাঁহারা প্রতিমা-পূজায় আস্থাবান ছিলেন না তবু তাঁহারাই এইরূপ পূজা-অনুষ্ঠানের উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন।

গ্রীকদের অপেক্ষা রোমানদের রাজত্বে ধর্ম্মের সহিত রাষ্ট্রব্যাপারের ঘনিষ্ঠতর যোগ ছিল। রোমের গভর্মেণ্ট কথনো পরাজিত জাতির ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে নাই; এই জন্যই অল্প সময়ের মধ্যে রোমের শাসনাধীনে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইতে পারিয়াছিল। তথাপি পূজা-অনুষ্ঠানের ঐক্যবন্ধনে সকল প্রজাকে এক করিবার প্রতি রোমের রাষ্ট্রনীতির চেষ্টা ছিল। রোম অধীন জাতি সকলের দেবতাদিগকে কোন প্রকারে রোমীয় করিয়া লইত। এইরূপে রোম একদিকে এককেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যচালন ও অন্যদিকে বিচিত্র ধর্ম্মের প্রতি সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত একত্রে দেখাইয়াছে।

বর্ব্বর ইয়োরোপ সহজেই রোমের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল। রোমানরা এ পর্য্যন্ত কোন গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠ জাতির সংস্পর্শে আসে নাই। কিন্তু তাহারা যখন এসিয়া জয় করিতে আরম্ভ করিল তখন প্রাচ্য ধর্ম্মের বন্যা আসিয়া ইয়োরোপকে আঘাত করিল। রোমানরা অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর ও গভীরতর অধ্যাত্মিক ভাবের পরিচয় লাভ করিতে লাগিল। ইয়োরোপের নানা ধর্ম্মকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনা রোমের পক্ষে সহজ ছিল কিন্তু প্রাচ্য ধর্ম্ম বশ মানিবার নহে। প্রাচ্য দেশীয় উদ্দাম ধর্ম্মোৎসাহ ও বিচিত্র পূজা-অনুষ্ঠান সুশৃঙ্খল প্রণালীবদ্ধ রোমান রাজ্যে মহা গোলযোগ বাধাইয়া তুলিল। তথাপি, ধর্ম্মকে রাষ্ট্রনীতির অনুগত করিবার জন্য রোমের যে বিশেষ চেষ্টা ছিল তাহা এসিয়ায় একেবারেই ব্যর্থ হয় নাই। রোমকেরা পুরোহিত-দের ক্ষমতা অনেকটা কমাইয়া আনিল ধর্ম্মের মধ্যে একটা সীমা টানিয়া দিল। ক্রমে বিজিত এসিয়ার ধর্ম্মতন্ত্রে রোমান দেবতারও স্থান হইতে লাগিল।

অবশেষে রোমান সাম্রাজ্যে যখন ধর্ম্ম শতধা হইয়া পড়িল তখন খৃষ্টধর্ম্ম আপন কঠোর সন্ন্যাস ও অচলা ভক্তি লইয়া আবির্ভূত হইল। ব্যূহবদ্ধ সেনার সম্মুখে যেমন কোন অসংযত জনতা টিঁকিতে পারে না, সেইরূপ খৃষ্টধর্ম্মের নিকট উচ্ছৃঙ্খল বহুদেববাদ টিঁকিতে পারিল না। রোমের প্রজাগণ একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের বিধিবিহিত যে-সকল ক্রিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিত এই নবধর্ম্ম একেবারে তাহার মূলে গিয়া আঘাত করিল। খৃষ্টানদের নিষ্ক্রিয় প্রতিকূলতাকে (Passive resistance) রোমান গভর্মেণ্ট বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য করিল এবং তাহাদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈতিক বলেরই জয় হইল এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম রোমে প্রতিষ্ঠিত হইল। একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের সঙ্গে একধর্ম্মের যোগ হওয়াতে জাতীয় ও লৌকিক প্রভেদ-গুলি চলিয়া গেল। চার্চ্চ অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্ঘ নিজের অধিকারের

* ধর্ম্ম-ইতিহাস আলোচনার আন্তর্জাতিক সভায় সার্ আলফ্রেড লায়াল্ কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

মধ্যে রাজসরকার অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। তাহারা ধর্ম্ম-বিদ্রোহীদের দমন ও স্বধর্ম্মমতের পরিপোষকতার জন্য রাজসরকারের সাহায্য লইল। এবং পুরোহিত-তন্ত্র স্থাপিত করিল। পুরাতন রোমে ধর্ম্মকে রাষ্ট্রনীতির বাহন স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু পরে যখন সর্ব্বত্রই এক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল তখন ধর্ম্মসঙ্ঘই শাসন-ব্যবস্থাকে শাস্ত্রাচারের অনুগত করিয়া তুলিল। এই চার্চ্চ রাজসরকারকে ধর্ম্ম সমর্থনের একটি উপায় স্বরূপ করিয়া লইল। খৃষ্টান সম্রাটগণ পৌত্তলিক রীতি নীতি আচার বিচারের বিরুদ্ধে আইন প্রস্তুত করিলেন ও সমস্ত দেব-মন্দির একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন।

যখন পশ্চিম ইয়োরোপে বর্ব্বর জাতির আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য বিদীর্ণ হইয়া গেল, তখন সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর পোপতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল এবং তাহার নিজ অধি-কারের মধ্যে সে রাজকীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল। য়ুরোপের পৌত্তলিক ধর্ম্মজগতে রোম রাজ্য যেমন কেন্দ্র স্বরূপ ছিল খৃষ্টানজগতে রোমের চার্চ্চ সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। রাজনৈতিক সম্বন্ধে যাহারা বিচ্ছিন্ন ছিল খৃষ্টধর্ম্ম তাহাদিগকে একধর্ম্মের পতাকা-তলে একত্র করিয়া, সকলকেই "খৃষ্টান" এই সাধারণ নামে অভিহিত করিল।

ইয়োরোপ ও এসিয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম স্থাপিত হইবার অল্প পরেই মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয় হওয়াতে কেবল রাষ্ট্রীয় জগতে নহে কিন্তু পশ্চিম এসিয়ার ও ভূমধ্য সাগরের পশ্চিম তীরস্থ দেশসমূহের ধর্ম্মসমাজেও বিষম বিপ্লব ঘটাইল। তখন কনষ্টান্টিনোপলের সাম্রাজ্য ধর্ম্মমতের দ্বন্দ্বে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই দৃঢ়বিশ্বাসী উৎসাহী মুসলমানগণ ঐক্যসূত্রে বদ্ধ ছিল। ইজিপ্ট ও সিরিয়ায় তাহারা অবিলম্বেই জয়ী হইল। উত্তর আফ্রিকায়ও রোমান গির্জ্জা ও রোমান ভাষা একেবারে বিলুপ্ত হইল। পারস্য দেশেও মুসলমান পতাকা জয়ী হইল। মধ্য এসিয়াতেও মুসলমান সৈন্যের অভিযান দেখা দিল। তাহারা এক এক দেশ জয় করে আর অবিলম্বে তাহাকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লয়। মুসলমান ইয়োরোপ ছাইয়া ফেলিল এবং দক্ষিণ পশ্চিম ইয়োরোপে প্রায় সমস্ত স্পেন দেশ তাহাদের বশ মানিল।

ধর্ম্মযুদ্ধ পাশ্চাত্য জাতির ইতিহাসে কালিমা মাখাইয়াছে। ইয়োরোপ ও এসিয়ার সীমান্ত প্রদেশে মুসলমান ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের যে সংঘর্ষ বাধিয়াছিল সেই সংঘর্ষ হইতেই সেইসকল ধর্ম্মযুদ্ধের উৎপত্তি এবং এইরূপে ইয়োরোপ ও এসিয়ার মধ্যে জাতক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে। এই-সকল যুদ্ধের অবসানে ইয়োরোপে খৃষ্টধর্ম্ম ও এসিয়ায় মুসলমানধর্ম্ম লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইল। কিন্তু এই দুই ধর্ম্মমতের ভয়াবহ সংঘর্ষে দুই পক্ষেই ধর্ম্মোন্মত্ততার সৃষ্টি হইল। তখন খৃষ্টধর্ম্মের সেবকগণ সামরিক ভাবাপন্ন ও প্রচারধর্ম্মী হইলেন। তখন ধর্ম্মপ্রচারই দেশজয় করা ও উপনিবেশ স্থাপন করার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হইল। অবশেষে যখন পুরাতন ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায় পৃথক হইয়া গেল তখন ইয়োরোপের সমস্ত বিভিন্ন দেশ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল এবং সেই যুগের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের কালে ধর্ম্মবিদ্বেষ হইতেই যত কিছু রাজনৈতিক হিংসা বিদ্বেষের উৎপত্তি হইয়াছিল।

এইরূপে পশ্চিম এসিয়া ও ইয়োরোপের ধর্ম্ম-ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উভয় দেশেই রাজ-সরকারের সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। অনেক শতাব্দী ধরিয়া রাষ্ট্রনীতির উপর ধর্ম্মসঙ্ঘের অত্যন্ত প্রভাব ছিল এবং তাহাই দেশের ভাগ্যকে পরিচালনা করিয়াছে। প্রচলিত ধর্ম্মমতকে সমর্থন করা যে রাজসরকারের কর্ত্তব্য এ বিষয়ে উভয় ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই একমত ছিল। তাহা-দের মতে ধর্ম্মবিদ্রোহীদের দমন করা জনসাধারণের কর্ত্তব্য। সে সময় মনে করা হইত যে যে দেশে এক ধর্ম্ম নাই সেই দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র কখনই প্রজাদের ঐক্যসাধন করিতে পারে না, তাই এই বিষয়ে ধর্ম্মসঙ্ঘের সহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের মিল ছিল। এই উপায়েই খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।

এখন একবার এসিয়ার আরো সুদূর দেশসকলের ধর্ম্ম-ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যাক। এইসকল দেশে গ্রীস বা রোমের সভ্যতার আলোক প্রবেশ করে নাই, এখানে খৃষ্টধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্মের উৎপত্তির পূর্ব্বে যে-সকল ধর্ম্ম ও পূজা-অনুষ্ঠান ছিল আজও তাহাই আছে। কেবল ভারতবর্ষ ও চীনে ধর্ম্মের সহিত রাষ্ট্রনীতির কতটা যোগ তাহাই দেখিব। কারণ এই দুই দেশই বৌদ্ধধর্ম্ম

ও হিন্দুধর্ম্মের আবাসভূমি। এই দুইটি ধর্ম্ম যে যে দেশে প্রচলিত সেখানকার বহুদেববাদকে তাহারা আপনার অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে ও অনেকটা পরিমাণে বহুদেববাদকে উন্নত করিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ও যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্ম্মের যে কি মহাশক্তি ছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। এসিয়ার পূর্ব্ব দিকে মুসলমান ধর্ম্মের সীমার বাহিরে ধর্ম্ম-ইতিহাস অন্যরূপ। যত দিন ভারতে মুসলমান ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব না হইয়াছিল ততদিন এসিয়ার পূর্ব্ব বিভাগে ধর্ম্মসংগ্রামের প্রাদুর্ভাব ছিল না। এখানে যত ধর্ম্ম-আন্দোলন হইয়াছে বা ধর্ম্ম-বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহা রাষ্ট্র-বিপ্লবের সহিত জড়িত বা যুদ্ধ বিগ্রহে অবসিত হয় নাই।

ইয়োরোপে ও মুসলমান-অধিকারগত এসিয়ায় বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই তথাকার সনাতন দেবমন্দিরের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে; রাজসরকার ও ধর্ম্মসঙ্ঘ এই উভয় শক্তির মিলিত চেষ্টায় ইহা সম্ভব হইতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষেও মুসলমানধর্ম্মের তরঙ্গ আঘাত করিয়াছিল; ভারতবর্ষীয়েরা যদিও পরাভূত হইয়াছিল তথাপি তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতের বাহিরে পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী দেশে কোন বিখ্যাত মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। এসিয়ার এই অংশে খৃষ্টধর্ম্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম আপনাপন প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই দুইটি ধর্ম্মমতে ব্যাপক ভাবে বহুদেববাদের স্থান আছে, কিন্তু তাহা উচ্চতর ভাবুকতার দ্বারা উন্নমিত, ও প্রচলিত নানা মতামতের প্রতিযোগিতায় পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অন্য কোন অপেক্ষাকৃত সুপ্রতিষ্ঠ ধর্ম্মমতের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। তখনকার শাসনকর্ত্তারা যতই অত্যাচারী থাকুন না কেন, ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার তাঁহাদের নিকট হইতে প্রশ্রয় পায় নাই। বস্তুত ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নির্ব্বাসিত করা বা বলপূর্ব্বক দীক্ষিত করা প্রভৃতি উপদ্রব তখন ছিল না বলিলেই হয়। শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদের সিংহাসনকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য প্রজার ধর্ম্মকে সমর্থন ও অন্য ধর্ম্মকে দমন করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নাই। প্রজা এবং শাসনকর্ত্তার একধর্ম্মাবলম্বী হওয়া দরকার, রাষ্ট্র-নীতির এই মূলমন্ত্রটি জগতের এই অংশে কোন দিন প্রচলিত ছিল না। উভয় ধর্ম্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে ডুবাইয়া দিল এবং বহু শতাব্দী পরে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইল, কিন্তু ইতিহাসে এই দুই ধর্ম্মের সংঘর্ষের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না অথবা রাজসৈনিক যে এই ধর্ম্মবিপ্লবে কোন প্রধান অভিনেতা ছিল এমন কোন কথাও আমরা জানি না।

অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম যে রাজকীয় প্রভাবের নিকট কিছুমাত্র ঋণী নয় এমন কথা বলিতে পারি না। অশোকের চেষ্টায়, তাঁহার ক্ষমতার গুণে বৌদ্ধধর্ম্ম এমন দেশময় ব্যাপ্ত হইতে পারিয়াছিল। অশোক তাঁহার রাজকীয় ক্ষমতাকে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে নিয়োগ করিয়াছিলেন। যত প্রধান রাজকর্ম্মচারীদের প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল যে তাঁহারা প্রজাদিগকে মুক্তির পন্থানির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। তিনি বিদেশে প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। পুণ্যজীবন লাভ করিতে হইলে কোন্ সাধনার প্রয়োজন সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশপূর্ণ অনুশাসন-লিপি তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মকে সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, তাহা কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। অশোক কিন্তু কখনো বলপূর্ব্বক প্রজাদিগকে দীক্ষিত করেন নাই। তাহা যদি করিতেন তবে তিনি নিজের অনুশাসন-বিরুদ্ধ কাজ করিতেন, কেন না তাঁহার অনুশাসনে পরধর্ম্মের প্রতি সহিষ্ণু হইবার জন্য বারম্বার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অশোক পৌত্তলিকদিগকে নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা করেন নাই। যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা যে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ইহা সুনিশ্চিত। রাজকীয় প্রভাব ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের অনেক সুবিধা হইয়াছিল, তথাপি তাহার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত আছে তাহারই জোরে সে জয়ী হইয়াছিল। অন্যসকল ধর্ম্মের তুলনায় বৌদ্ধধর্ম্মই রাষ্ট্রনীতি হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত, এই কর্ম্ম-জগতের কোলাহল হইতে নিভৃতে সন্ন্যাস-সাধনের উহা উপযোগী ধর্ম্ম, পার্থিব ব্যাপারের সহিত যোগ তাহার অল্পই।

কোন রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে দূরিত হয় নাই। মুসলমানরা ভারতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইয়াছে

বলিয়া মনে হয়। ইতিমধ্যে উহা চীনদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে চীনদেশে দুই প্রকার ধর্ম্মমতের প্রাধান্য ছিল, যদিও তাহাকে ঠিক ধর্ম্মমত বলা যায় না, তাহা অনেকটা নৈতিক উপদেশাবলী। একটি মতবাদ কঠোর সন্ন্যাসব্রতকে সমর্থন করে; ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে ঘৃণা করিতে, নম্র হইতে, আত্মত্যাগ করিতে, এবং আড়ম্বরহীন সরল জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিয়া থাকে। সেই ধর্ম্মের মতানুসারে রাষ্ট্রচালনায় প্রয়োজন-মত বল প্রয়োগ দোষের নহে কিন্তু ধর্ম্ম বা নৈতিকক্ষেত্রে তাহা নিতান্ত নিন্দনীয়। অন্য ধর্ম্মতন্ত্রটি ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, আত্মসংযম, রাজভক্তি ইত্যাদি গুণগুলির উৎকর্ষ-সাধনের অনুশাসন মাত্র। ইহার পশ্চাতে কোন দর্শন-শাস্ত্রের সম্পর্ক নাই। আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহা বিশেষ কিছু বলে নাই।

সংসারের প্রতি অবজ্ঞা, জীবনের প্রতি অনাসক্তি ও মুক্তিলাভের প্রতি একাগ্র লক্ষ্য লইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম যখন চীনের ন্যায় এমন ব্যবহারবুদ্ধিপ্রধান দেশে প্রবেশ করিল তখন সেখানে নিশ্চয়ই একটা বিপ্লব বাধাইয়া তুলিয়াছিল। বহুশতাব্দী ধরিয়া সম্রাটের প্রসাদ লাভের জন্য এই তিনটি ধর্ম্মের প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল। সম্রাট যে ধর্ম্মকে সমর্থন করিতেন সেই ধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিত। সম্রাটের পরিবর্ত্তনের সহিত ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন ঘটিত। কোন সম্রাটের ইচ্ছায় হয় ত বৌদ্ধমঠ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইত আবার কাহারও ইচ্ছানুসারে তাহার পুনঃসংস্কার করা হইত। চীন-সম্রাটগণ বলিতেন যে রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে ধর্ম্মের প্রবেশাধিকার নাই। এবং সনাতন ধর্ম্মবিধির বিরুদ্ধে যদি কেহ গোলযোগ বাধাইয়া তোলে তাহা পুলিসেরই দমন করা উচিত, ধর্ম্মসমাজের তাহাতে ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।

বহু দিন হইতে চীন-সম্রাটগণ বংশ পরম্পরায় এইরূপ প্রণালীতে শাসন করিয়া আসিয়াছেন, চীন দেশে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থার যেরূপ সম্বন্ধ। আধুনিক জগতে বোধ হয় তাহা অদ্বিতীয়। চীনেম্যানেরা বলে যে সম্রাটই জাতীয় ধর্ম্মের প্রতিনিধি স্বরূপ ঈশ্বরের নিকট দায়ী। সম্রাট স্বয়ং ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদির বিধি ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহার অনুমোদন ভিন্ন নূতন কোন পূজানুষ্ঠান প্রচলিত হইতে পারে না ও তাঁহার অনুমোদিত ক্রিয়াকলাপ বিধিসংহিতায় সন্নিবেশিত হয়। চীন দেশে যদি কেহ নূতন কোন বিশ্বাস-মতে চলে, বিশেষত বৈদেশিক পূজা সম্পন্ন করে, তবে তাহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া মনে করা হয়। রাজবিধিতে যে সকল দেবদেবীর কোন উল্লেখ নাই তাহাদের অর্চ্চনা করিলে পুলিস তাহা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য এবং সংহিতায় যে সকল সম্প্রদায়কে স্বীকার করা হয় নাই তাহাদিগকে তাহারা দমন করিয়া থাকে। পুরাতন খৃষ্টান ও মুসলমানেরা অধিকৃত রাজ্যসমূহে ধর্ম্মভেদ বিলুপ্ত করিয়া ধর্ম্মের ঐক্য সাধন করিয়াছে, কিন্তু রোম, চীন এবং জাপান ধর্ম্মসমূহকে রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যের অনুগত করিয়া রক্ষা ও চালনা করিয়াছে।

ভারতবর্ষে কিন্তু ধর্ম্মের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ, জগতের আর কোথাও এমনটি নাই। সমস্ত এসিয়ার ধর্ম্মতত্ত্বের মূল প্রস্রবণটী ভারতবর্ষে। এইখানে আমরা সর্ব্বপ্রকারের বহুদেববাদ দেখিতে পাই ও দেবদেবীর অরণ্যের মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়ি বলিলেও চলে। এখানে লোকের খেয়াল বা ইচ্ছা বা অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে আচার অনুষ্ঠানাদির সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। হিন্দুধর্ম্ম সকল প্রকার ধর্ম্মমতকে সহ্য করে, কি ঈশ্বরের প্রকাশ, কি প্রাকৃতিক শক্তি, কি দেহ ও মনের ক্রিয়া সম্বন্ধে, যাহার যা খুসী সে তাহাই বিশ্বাস করিতেছে। হিন্দুধর্ম্ম বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা কোথাও সীমাবদ্ধ হয় নাই। রাষ্ট্রনীতি কখন তাহার অবাধগতিকে সংহত করে নাই।

আপাতদৃষ্টিতে এই অবস্থাকে প্রাচীনকালের বহু-দেববাদের যুগের ন্যায়ই ঠেকে। ভারতবর্ষীয়দের ন্যায় এমন প্রখরবুদ্ধিশালী ও সত্যসন্ধানপর জাতির মধ্যে এই সকল পৌত্তলিকতা কেমন করিয়া রহিয়াছে তাহা জিজ্ঞাস্য বটে। বিচিত্র বাহ্য ঘটনার সহিত নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা মিলিত হইয়া বড় বড় জাতির ধর্ম্মকে বিশেষ আকার দান করে ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সে সকল আলোচনার স্থান ইহা নহে। আমি শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে হিন্দুরা জাতিভেদের দ্বারা অসংখ্য বিভাগে

বিভক্ত এবং শাস্ত্রভেদের দ্বারা তাহাদের ধর্ম্মাচার্য্যগণ নানা বিচিত্র শাখার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এই কারণে হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম্মের ঐক্যসাধনের ক্রিয়া সহজে ঘটিতে পারে নাই। এইসকল ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঐতিহাসিক বলিয়াও হিন্দুরা মানে না। সেইজন্য কোন বিশেষ একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জীবন ও উপদেশকে কেন্দ্র-স্বরূপ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম তাহার চতুর্দ্দিকে বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। সম্ভবত এই কারণেই হিন্দুর ধর্ম্ম এমন ব্যাপক এবং অসম্বদ্ধ। হিন্দুদের জন্য সর্ব্বপ্রকার মুক্তির পথই খোলা রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র আজও শেষ হয় নাই, নূতন নূতন দার্শনিক মতামত, ব্যাখ্যা, তত্ত্ব, এখনও হিন্দুশাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। তথাপি এখানকার উচ্চ অঙ্গের তত্ত্বজ্ঞান ও পৌত্তলিকধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী নহে, বরঞ্চ তাহার বিপরীত। তাহারা উভয়ের সমর্থন করে। কারণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম লোকপ্রচলিত পৌত্তলিকতাকে সর্ব্বব্যাপী অদ্বৈততত্ত্বের প্রত্যক্ষগোচর বাহিরের মূর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এখানকার কৃষক ও পণ্ডিত হয়ত একই দেবতার উপাসক কিন্তু দুইজনে দুই ভাব হইতে পূজা করেন অথচ সেই ভাবের প্রভেদ লইয়া দুই পক্ষে কলহ বাধে না। কিন্তু এইরূপ মিশ্রিত জটিল ধর্ম্ম যে বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্মের ন্যায় সুসম্বদ্ধ ধর্ম্মমতের আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা ধর্ম্মের এই অব্যবস্থার জন্য কতক পরিমাণে দায়ী। চীনের ন্যায় অনুমোদনের দ্বারাই হোক্ আর মুসলমানের ন্যায় জয়ের দ্বারই হোক্, শাসনকর্ত্তার ইচ্ছা ও সাহায্য ভিন্ন কোন বৃহৎ দেশে কোন এক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ কখন সম্পূর্ণরূপে একেশ্বর শাসনের অধীনে আসে নাই। আরঙ্গজেব ভিন্ন আর কোন মোগল সম্রাটই গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না। তাঁহারা বরঞ্চ ইচ্ছা করিয়াই হিন্দুপ্রজাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন না। বরঞ্চ মুসমলানধর্ম্মের সংঘাতে হিন্দু-সমাজে ধর্ম্মভাব আরো প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান-যুগে ভারতবর্ষে অনেক ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের অভ্যুদয় হইয়াছে, নূতন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া নানা বাদ প্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল আন্দোলনে মুসলমান গভর্মেণ্ট অনেকদিন পর্য্যন্ত ভ্রূক্ষেপ করে নাই। এই নূতন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সম্প্রদায়-বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ অবস্থায় আরঙ্গজেবের গোঁড়ামিতে হিন্দুধর্ম্ম উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। শিখ-গুরুদের প্রতি অত্যাচারে শান্তিপ্রিয় শিখদিগকে দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা করিয়া তুলিয়াছিল। নিশ্চেষ্ট এবং ঐক্যহীন জাতিও যে ধর্ম্মের নামে কি অদম্য শক্তিতে বলীয়ান হইয়া উঠে ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। পশ্চিম এসিয়ার ইতিহাসের সহিত তুলনা করিয়া মোট এই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষীয়েরা যদিচ একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ জাতি তথাপি অন্য সকল ধর্ম্মের ন্যায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বা রাষ্ট্রব্যবস্থার নিকট হইতে বিশেষ বাধা পায় নাই। মুসলমানদের ন্যায় প্রচার-পরায়ণ জাতিও ভারতের অধীশ্বর হইয়া এমন বিচ্ছিন্ন ধর্ম্মকে অতি অল্প পরিমাণেই বিচলিত করিতে পারিয়াছে। মুসলমানধর্ম্ম বরঞ্চ তাহাদিগকে আরো দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ঐ ধর্ম্ম পশ্চিম এসিয়ায় বহুদেববাদকে যেরূপ নিষ্পেষিত করিয়াছিল ভারতবর্ষে তাহা পারে নাই। কিম্বা পূর্ব্ব এসিয়ার ন্যায় তাহাকে শাসনাধীনে নিয়ন্ত্রিত করিতেও সক্ষম হয় নাই। শ্রীঅতসী দেবী।

কুমীর পোষা

কুমীরের ভণ্ডামি ও নির্ব্বুদ্ধিতা একেবারে প্রবাদগত; ইহাদের স্বভাব অদমনীয়, অনেকে এইরূপ মনে করেন। কিন্তু এই মস্তিষ্কবিহীন কদাকার ভীষণ জলজন্তুগুলিকেও দমন করিয়া মানুষের ইচ্ছাধীনে আনা হইয়াছে। প্যর্ণলে (Pernelet) নামক ফরাসী ভদ্রলোক কুমীর পুষিতে অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেন। প্রথমে এই ভদ্রলোকটী এই কার্য্য কেবলমাত্র সখের জন্য করিতেন। ক্রমে তিনি ফরাসী জনসমাজের নিকট কুমীর পোষায় আপন নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এক্ষণে ইংরাজ-দিগের নিকটে তাঁহার শিক্ষিত জন্তুদের শিক্ষা-কৌশল প্রদর্শন করিতেছেন।
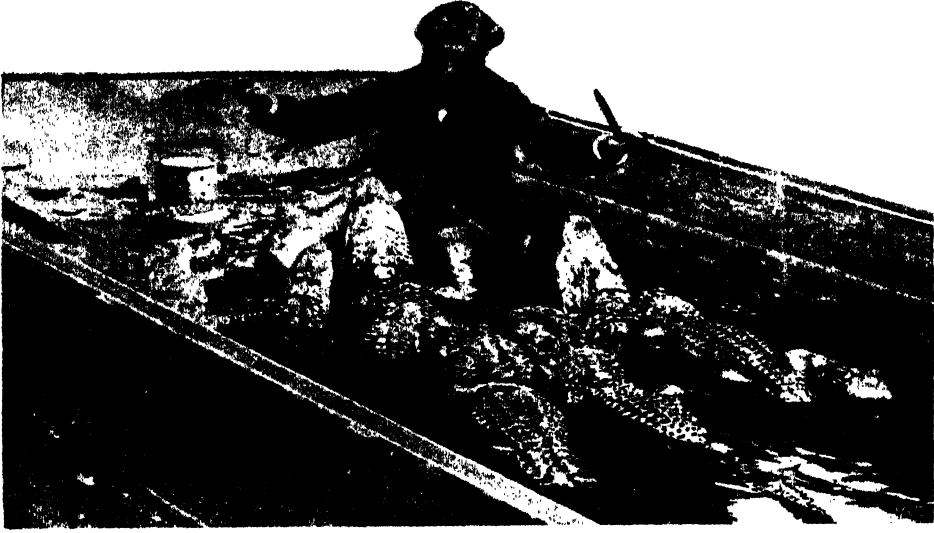
প্যার্ণলে ও তাঁহার পোষা কুমীর

কুমীর দাঁত দেখাইতেছে।

প্যার্ণলের যতগুলি কুমীর আছে উহার সবগুলিই তিনি আপন হাতে ধরিয়াছেন; তিনি আফ্রিকা ও আমেরিকা হইতে প্রাণীগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। একজন দেশীয় লোকের সঙ্গে গিয়া তিনি নদীতীরে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং তাহাদিগকে ধরিতেন। প্রথম প্রথম উহাদিগকে ধরিবার জন্য তিনি অত্যন্ত শক্ত জাল ফেলিয়া ধরিবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু এই বলশালী জন্তুগুলি প্রাণপণ করিয়া সেই জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিত এবং সময়ে সময়ে নিজেরা অত্যধিক পরিশ্রমে অর্দ্ধমৃতপ্রায় হইয়া যাইত। তারপর তিনি ফাঁস দিয়া কুমীর ধরিতে আরম্ভ করেন কিন্তু এ প্রণালীতেও তত কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। তাই তিনি এক নূতন অথচ খুব সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।

কুমীর লইয়া খেলা।

শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, এবং পথের লোকেরা প্রাণের ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কুমীরটিও এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে আবার খাঁচায় পূরিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

পার্ণলে তাঁহার প্রিয় জন্তুগুলিকে 'সুন্দর' 'চিত্তরঞ্জন' প্রভৃতি নানা বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণ লোক এই কদাকার প্রাণীর মধ্যে কোনো সৌন্দর্য্যই দেখিতে পায় না। ইহাদের গাত্রতাপ বাহিরের উত্তাপের অপেক্ষা সর্ব্বদাই কম থাকে বলিয়া তাহাদের গাত্রস্পর্শ করাও বিশেষ সুখকর নহে। তাহাদের ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী এবং কখনো তাহার শান্তি হয় না। পচা মাংস প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য তাহারা অতিশয় আনন্দের সহিত ভক্ষণ করে। আর উহাদের বুদ্ধি এতই অল্প ও স্থূল যে তাহাদের মস্তিষ্ক আছে কিনা সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করেন; যদি থাকে তাহা নিতান্তই অল্প। কিন্তু তাহাদের বুদ্ধি অতি সামান্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা অদ্ভুত বশ্যতার সহিত মানুষের নিকট পোষ মানিয়াছে। কুমীরের দাঁত দিয়া ধরিবার শক্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; পার্ণলে এক টুক্‌রা কাপড় কুমীরের মুখে দিয়া সেইটি ধরিয়া তাহাকে উঁচু করেন এবং পিঠের উপর করিয়া বেড়াইতে থাকেন।

কুমীরের কামড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার শক্তি অসাধারণ একবার কোনো জিনিষ ইহাদের দাঁতের মধ্যে পড়িলে, উহাকে তাহারা প্রাণপণে কামড়াইয়া থাকে। কাঠের টুকরাতে দড়ি বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিলে কুমীরেরা সেইগুলিকে দাঁত দিয়া অত্যন্ত জোরে কামড়াইয়া ধরে। তখন ধীরে ধীরে তাহাদিগকে ডাঙ্গায় তুলিয়া একটি বাক্সের মধ্যে পূরিয়া ফেলা সহজ;—পার্ণলে এই উপায়ে কুমীর ধরিতেছেন। আনিবার সময়ে রাস্তায় প্রায়ই দুই একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা হইয়া থাকে। একবার জাহাজের খোলের মধ্যে হইতে একটি প্রকাণ্ড কুমীর হঠাৎ বাহিরে আসিয়া পড়ে। ইহাতে জাহাজ সুদ্ধ লোক এরূপ ভীত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাঁহাদিগকেই সামলান কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। আর একবার যখন তিনি জাহাজ হইতে নামিয়া গাড়ী করিয়া আসিতেছিলেন, ঘোড়ার গাড়ী বেশ ঘড়্ ঘড়্ করিয়া যাইতেছিল, গাড়ীর উপরে খাঁচার মধ্যে একটি কুমীর ছিল। কিছুদূর যাইতেই গাড়ীর ঝাঁকুনিতে কুমীরটি অত্যন্ত ভীত হইয়া রাস্তায় লাফাইয়া পড়ে। এই ঘটনায় গাড়ীর কোচম্যান্ তাহার বসিবার স্থানে ভয়ে প্রায় সংজ্ঞা-

কুমীর ধৃত হইবার পর কয়েক দিন তাহাকে বায়ু অথবা খাদ্য কিছুই দেওয়া হয় না এবং তার পর তাহার দলবলের মধ্যে চৌবাচ্চার জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। পার্ণলে চৌবাচ্চায় নামিলে প্রথমে প্রত্যেক কুমীরই একবার করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে, কিন্তু তাঁহার এমনই একটি শক্তি আছে যে তিনি তাহাদিগকে অনায়াসে দূরে রাখিতে পারেন।

কুমীরদের আহার দান।

আহারের সময়ে বড়ই কৌতুক হয়। কুমীরের দাঁতের গঠন এরূপ যে তাহারা কোনো জিনিষ চিবাইয়া খাইতে পারে না—একেবারে গিলিয়া আহার করে। সেইজন্য খুব বড় একটুক্‌রা মাংস দিলে তাহারা বড়ই মুসকিলে পড়ে; অত্যন্ত বড় বলিয়া গিলিতে পারে না; দুইটিতে মিলিয়া ভাগাভাগি করিয়া তবে আহার করিতে পারে।

এই প্রাণীকে পোষ মানানো অধিক কষ্টকর নহে, কিন্তু তাহাদিগকে জীবন্ত রাখিয়া পালন করা অত্যন্ত কষ্টকর। প্যার্ণলে নিজে অতিশয় যত্নের সহিত তাঁহার পোষা কুমীর-গুলিকে রক্ষা করেন,—নতুবা য়ুরোপের ন্যায় শীতপ্রধান স্থানে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রাণী রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইত।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ক্ষমা

(গল্প)

(Charles Foleyর ফরাসী হইতে)

বৈঠকখানা ঘরে, ডাক্তার ছল্‌ছল্‌-চোখে, ফ্রেডেরিকের হাত চাপিয়া ধরিলেন এবং নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে ও অনুনয়ের স্বরে এই কথাগুলি বলিলেন:—

—ভাই, এইবার সব শেষ। ধীরে ধীরে এইবার তার প্রাণটি বেরিয়ে যাবে এই অন্তিমকালে তুমি আর তাকে কোন কষ্ট দিও না, কোনো-রকমে তাকে উদ্বিগ্ন কোরো না।…

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ফ্রেডেরিক আবার ঘরের কৌচে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মনে একটা তীব্র দুঃখের জোয়ার-ভাটা চলিতেছিল; এই কষ্টের মধ্যে, ফ্রেডেরিক ভাবিতে লাগিল, ডাক্তারের ঐ কথাগুলির অর্থ কি;—"এই অন্তিমকালে তুমি আর তাকে কষ্ট দিও না—কোনরকমে তাকে উদ্বিগ্ন কোরো না"।…দুই বৎসর হইল আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে আমার লুসিল্‌কে যতদূর ভালবাসিবার বাসিয়াছি, যতদূর যত্ন করিবার করিয়াছি, আমার মত ভাল স্বামী খুব কমই দেখা যায়। আর লুসিলের মত সতীসাধ্বী স্ত্রীও প্রায় দেখা যায় না—লুসিল্‌ও আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে।

তবে, ডাক্তারের ওকথা বলিবার অভিপ্রায় কি?

ঘরের একটা দ্বার খুলিল। যুবক শিহরিয়া উঠিল। তাহার কষ্টজনিত জড়তা অন্তর্হিত হইল। এই সময়ে পাপ-খ্যাপন (confession) করাইয়া পাদ্রি, লুসিলের কাম্‌রা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পাদ্রি বাষ্পার্দ্রনেত্রে ফ্রেডেরিকের পানে চাহিলেন, ডাক্তারের মত' তিনিও তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া, অনুনয়ের স্বরে এই কথাগুলি বলিলেন:—

ঈশ্বরের সহিত তাহার মিটমাট হয়ে গেছে

সে তোমার সঙ্গে একটা মিট্‌মাট্ করতে চায়। তার মনে কষ্ট হয়—এমন কোন কথা তাকে বোলো না। এখন তার মৃত্যু আসন্ন।

আবার আমাকে এই অনুরোধ কেন?—ফ্রেডেরিক মনে মনে ভাবিতে লাগিল। মনকষ্ট অপেক্ষা ফ্রেডেরিকের কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিল। তখন ফ্রেডেরিক দ্বার খুলিয়া, রোগশয্যাশায়িনী লুসিলের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

বালিসের ধবলতার মধ্যে লুসিলেরও রং ধপ্-ধপ্ করিতেছে—একেবারে ফ্যাকাসে সাদা। এখনও লুসিলের শ্রীটুকু যায় নাই, যদিও মুখে বলি-রেখা পড়িয়াছে, পার্চমেণ্ট-কাগজের মত গাত্রের চর্ম্ম শুকাইয়া গিয়াছে। লুসিল বিছানার ঠাণ্ডা চাদরের ভাঁজের মধ্যে নিমজ্জিত—মনে হইতেছিল যেন একটি ক্ষুদ্র হৈমন্তিক কুসুম বরফের মধ্যে ডুবিয়া আছে। রোগ-যন্ত্রণায় তাহার চক্ষু কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে। লুসিল তাহার সেই কোটর-প্রবিষ্ট চোখ দুটি তুলিয়া ফ্রেডেরিকের চোখের পানে ভয়ে-ভয়ে চাহিল। এই মৌন কাতর দৃষ্টিতে ফ্রেডেরিকের মনে একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই কিছু পূর্ব্বে যে একগুঁয়েমি করিতেছিল, কত খাম্‌খেয়ালি ফরমাস্ করিতেছিল, কত আদুরেপনা করিতেছিল—হঠাৎ কেন সে এরূপ দীনভাবাপন্ন ও ভীত হইয়া পড়িল? না-জানি ইতিমধ্যে ডাক্তার ও পাদ্রির সহিত উহার কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে। এমন কি ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে লুসিলের মনে ভয় হইতে পারে!

শয্যার নিকট ফ্রেডেরিক হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। চোখের জল আট্‌কাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। তবু কিসের ভাবনায় তার মন আকুল হইয়াছে তাহা সাহস করিয়া লুসিল্‌কে বলিতে পারিতেছে না।

—লুসিল্, লুসিল্! না জানি ওরা তোমাকে কি বলেছে,—কেন তুমি এত বিষণ্ণ হয়েছ?

লুসিল্ নৈরাশ্যময় দৃষ্টিতে ফ্রেডেরিকের মুখের পানে সমান চাহিয়া আছে। পরে, তাহার বিবর্ণ ওষ্ঠদ্বয় উন্মুক্ত করিয়া,—যেন দূর হইতে কে কথা কহিতেছে এইরূপ অতি ক্ষীণস্বরে এই কথাগুলি বলিল:—আমার মৃত্যু আসন্ন, ডাক্তার আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন।

ফ্রেডেরিকের চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; এবং কেহ না দেখিতে পায়, এই জন্য হাত দিয়া মুখ ঢাকিল। তাহার পর, ফ্রেডেরিক, লুসিলের ঠাণ্ডা ছোট ছোট আঙ্গুলগুলির উপর হাত্ বুলাইতে লাগিল; তখন লুসিল আবার ক্ষীণস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল।

—কিন্তু পাদ্রির কথায় আমার যতটা কষ্ট হয়েছে, ডাক্তারের কথায় তেমন হয় নি! পাদ্রি আমায় বেশ বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছেন যে আমি তোমার নিকট অপরাধী!

—সে পাগল!—ফ্রেডেরিক এইকথা প্রচণ্ড স্বরে বলিয়া উঠিল; পাছে অশ্রুজল দেখিতে পায় এখন আর সে ভাবনা না করিয়া, ফ্রেডেরিক আবেগভরে দুই বাহু দিয়া লুসিলের ভঙ্গুর দেহযষ্টি জড়াইয়া ধরিল।

—লুসিল্! আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তুমিও আমাকে তেমনি ভালবাস। তোমা হতেই আমি সুখের প্রথম আস্বাদ পেয়েছি!

এই মুমূর্ষু ক্ষুদ্র রমণীর নেত্রদ্বয়, তীব্র যাতনায় আরও যেন বেশী কোটর-প্রবিষ্ট হইল, তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখের চর্ম্ম কুঞ্চিত হইল। কথাগুলা শেষ করিবার জন্য যাহাতে একটু বল পায়, তাই প্রার্থনার ভঙ্গীতে যোড়হস্তে, লুসিল ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘর্ঘর-কণ্ঠে এই কথাগুলা বলিয়া ফেলিল:—

—আমার উপর তোমার ভালবাসা খুব বেশী ছিল বলেই, আমার এখন ভয়ানক অনুতাপ হচ্চে—আর যে কথা আমি তোমার কাছে স্বীকার করব সেও ভয়ানক কথা। আমায় সে পাপ স্বীকার করতেই হবে, কেন না পাদ্রি এই করারেই আমাকে পাপ হতে মুক্তি দিয়েছেন। আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে যা বল্‌চি—শোনো। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ না হলেও, এর চেয়ে উচ্চস্বরে সে কথা তোমার কাছে আমি কখনই বল্‌তে পার্‌তেম না। শোনো তবে ফ্রেডেরিক—শোনো!—আমি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি···

ফ্রেডেরিকের হৃদয়ে যেন শত শূল বিদ্ধ হইল। যাতনায় মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ চাপা দিবার জন্য শয্যার আস্তরণের মধ্যে ফ্রেডেরিক মুখ গুঁজিয়া রহিল। লুসিলের চোখের তারা ভয়ে তমসাচ্ছন্ন হইল। ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে তার প্রাণ বাহির হইবে—এই কল্পনাটি তাহাকে নিতান্ত অধীর করিয়া তুলিল।

—উত্তর দেও···একটা কিছু আমাকে বল···আমার তখন বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল···আ! বল! বল!···তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর তা'হলে আমি বড় কষ্টে মরব!

শয্যার আস্তরণের ভিতর ফ্রেডেরিক মুখ গুঁজিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে—লুসিলের ঠাণ্ডা আড়ষ্ট আঙ্গুলগুলি এক-একবার ফ্রেডেরিকের গ্রীবাদেশ স্পর্শ করিতেছে—লুসিল্ স্পষ্টভাবে হাত বুলাইতে আর সাহস করিতেছে না।

তখন ফ্রেডেরিকের মনে পড়িল—পাদ্রি ও ডাক্তারের সেই সাগ্রহ হস্তপীড়ন, তাহাদের সেই ছল্ ছল্ চোখ্—তাহাদের সেই সকরুণ অনুরোধ:—"আর তাকে কোন কষ্ট দিও না, তার মৃত্যু আসন্ন।"

তখন ফ্রেডেরিকের সুগভীর প্রেমার্দ্র হৃদয় হইতে করুণার উৎস উৎসারিত হইল। যেন মর্ম্মাহত হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত রক্তপ্রবাহ ঠেলিয়া রাখিয়া একটু বলসঞ্চয় করিবে এই ভাবে সে আপনার বুক দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। এবং যাহাতে হতভাগিনী মুমূর্ষু শান্তিতে মরিতে পারে এই জন্য ফ্রেডেরিক প্রাণপণে আপনার বুক বাঁধিয়া, একটি করুণার্দ্র মিথ্যা কথা—একটি মধুর মিথ্যা কথা স্মিতমুখে বলিল।

—লুসিল, আমি তা জান্‌তেম—আমি তা জান্‌তে পেরে পূর্ব্বেই তোমায় ক্ষমা করেছি···হাঁ-হাঁ আমি সব জান্‌তেম!

লুসিলের নেত্রে সুখের বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল; পরে তাহার নেত্রপল্লব ধীরে ধীরে অবনত হইয়া তাহার সমস্ত উদ্বেগকে নিদ্রাভিভূত করিল—শেষ নিশ্বাসের সহিত যখন তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল,—তাহার ঠোঁট দুটিতে অতীত সুখের অবশেষ-স্বরূপ কেবল একটি মিষ্টি হাসি রহিয়া গেল।

লুসিলের পাণ্ডুবর্ণ মুখখানিতে শুধু মৃত্যুর শান্তি ও আরাম প্রকাশ পাইল; মৃত্যুর যাহা কিছু ভীষণতা—সে শুধু ফ্রেডেরিকের হৃদয়ে রহিয়া গেল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অপূর্ব্ব দীপাধার

একদিন স্নিগ্ধ মধুর প্রভাতে পুরাণো একখানা সংবাদপত্রে জড়ানো একটি বাণ্ডিল হাতে শাচা ডাক্তার কোশেলের রোগী-পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিল।

ডাক্তার কোশেল সহরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসা তাঁহার ব্যবসায়ের অঙ্গ হইলেও, অর্থোপার্জ্জনে তিনি অস্ত্র-প্রয়োগ-নীতি অবলম্বন করিতেন না। সজ্জন সদাশয় বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল;—ধনী, দরিদ্র, সম্ভ্রান্ত ও জনসাধারণ—সকল সমাজেই সেজন্য তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রতিপত্তি।

শাচাকে দেখিবামাত্র ডাক্তার চিনিলেন। শাচা সহরবাসিনী একটি বিধবার একমাত্র পুত্র:—কিশোর বয়স প্রায় অতিক্রম করিয়াছে। কিয়দ্দিবস হইল, শঙ্কটাপন্ন পীড়া হইতে, সদাশয় ডাক্তার সাহেবের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে শাচা পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে।

বিধবার স্বামী প্রাচীনকালের বিচিত্র কারুকার্য্য-ভূষিত ধাতুনির্ম্মিত নানাবিধ দুর্ল্লভ দ্রব্যসম্ভার বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। তাহার যে উপার্জ্জন ছিল, তাহাতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পর, অন্তিম সময়ে, স্ত্রীপুত্রের জন্য বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারে নাই। একমাত্র পুত্র লইয়া বিধবা সংসারে নিরাশ্রয় হইয়া, স্বামীর ব্যবসায় অবলম্বনেই কোনরূপে দিনপাত করিতে লাগিল। কিন্তু সংসারের একমাত্র অবলম্বন, নয়নের মণি সেই পুত্রটি যখন মরণাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইল, তখন তাহার চিকিৎসার ব্যয় সঙ্কুলানও বিধবার সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল। ডাক্তার সাহেব দীনদরিদ্রের বান্ধব; তিনি নিঃস্বার্থভাবে বহুদিন অকাতর পরিশ্রমে চিকিৎসা করিয়া যুবকটিকে নিরাময় করেন।

আজ শাচাকে রোগীর পরীক্ষাগারে সমাগত দেখিয়া, ডাক্তার সাহেব শাচার প্রতি ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে যুবক, আজকাল কেমন আছ, এখন আর কোনো অসুখ নাই তো?"

শাচা যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া বিনয়নম্র স্বরে উত্তর করিল, "না, মহাশয়, আপনার কৃপায় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ

হইয়াছি, এখন বেশ বলও লাভ করিয়াছি। আমার মা আপনাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। আমি মার একমাত্র সন্তান; আমাকে আপনি মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছেন; কিন্তু ডাক্তার সাহেব, আমার জননী অর্থহীনা, কেমন করিয়া যে আমরা আপনাকে কৃতজ্ঞতা দেখাইব তাহা ভাবিয়া পাই না।" বলিতে বলিতে কৃতজ্ঞতাভরে শাচার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল,—হৃদয়ের আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

ডাক্তার সহজ সরল মিষ্ট হাসি হাসিয়া শাচাকে বাধা দিয়া মধুর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "শাচা, তুমি কি বলিতেছ, আমি তো তেমন কিছুই করি নাই; যে কোনো চিকিৎসাব্যবসায়ীই আমার ন্যায় এরূপ কাজ করিত। এতে আমার তেমন প্রশংসার কি আছে?"

শাচা পুনরায় বলিল, "না, মহাশয়, আমি বিধবা মাতার একমাত্র পুত্র, আপনি আমার জীবন দান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বড় গরীব, আপনাকে উপযুক্ত ফি দিতে পারি নাই; যা হউক তাতে আর লজ্জা করিয়া ফল নাই; আপনি সদাশয় মহাপুরুষ। কিন্তু আমাদের মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। আমাদের প্রার্থনা, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশে এই পিত্তল নির্ম্মিত দীপাধারটি গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করুন। আপনার নিঃস্বার্থ পরোপকারের তুলনা নাই। এ জিনিষটী অতি সামান্য, তবু ইহা অতি প্রাচীন, আর ইহাতে বিচিত্র কলা-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। আমার স্বর্গীয় পিতা মহাশয় এই দীপাধারটি সযত্নে রক্ষা করিতেন। আমরাও বাবার আদরের জিনিষ বলিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্নরূপে এতদিন এ জিনিষটি রক্ষা করিয়া আসিতেছি। আমাদের এই আদরের জিনিষটি আপনাকে অর্পণ করিতে পারিলে কৃতার্থ বোধ করিব।" এই কথা বলিতে বলিতে শাচা যেমন একদিকে দীপাধারটি কাগজের মোড়ক হইতে মুক্ত করিতে যত্ন করিতেছিল, অপরদিকে ডাক্তার কোশেল বলিয়া উঠিলেন, "শাচা, আমার জন্য তোমাদের কিছু করার প্রয়োজন নাই, বস্তুতঃ আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য মাত্র করিয়াছি, তজ্জন্য কোন জিনিষ গ্রহণ করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত; তোমাদের এজন্য কোনরূপ আয়াস স্বীকারের আদৌ প্রয়োজন নাই।"

শাচা কাতর স্বরে বলিল, "না, মহাশয়, তাহা হইবে না, আপনাকে ইহা গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা আমার মা নিরতিশয় দুঃখিতা হইবেন, আমরা কিছুতেই হৃদয়ে শান্তি পাইব না।"

যুবকের হস্তস্থিত বাণ্ডিলটি এতক্ষণে আবরণ-মুক্ত হইয়া টেবিলের উপর আপনার অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি প্রকটিত করিল। তখন ডাক্তার সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সে জিনিষটি আর কিছুই নয়, একটি পিত্তল-নির্ম্মিত দীপাধার। কিন্তু দীপাধারটি অনিন্দ্য সুন্দরী বিবসনা দুইটি পরীমূর্ত্তির হস্তে কৌশলে সংস্থাপিত হইয়াছে। আহা! সেই পরীমূর্ত্তি দুইটি কি সুন্দর! কলা কল্পনার চরমোৎকর্ষ যেন আজ সজীব হইয়া অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া এই মূর্ত্তি দুইটিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এমন সুঠাম সুগঠিত মূর্ত্তি যেন বিশ্ববিধাতার অপূর্ব্ব অনন্ত সৃষ্টিতেও দুর্লভ। মনে হয় যেন ত্রিদিব শোভার ললামভূতা উর্ব্বশী ও রম্ভা, অথবা আদি সৃষ্টির অনিন্দ্য সুন্দরী ইভা দেবী যুগলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মুক্ত-বসনা হইয়া আজ এই দীপাধার হস্তে ধরিয়া মানব-নয়ন-সমক্ষে আবির্ভূতা হইয়াছেন। এই পরীমূর্ত্তি দুইটির হাব ভাব, বিলাস-চঞ্চল দৃষ্টি, যেন প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাহারা এমনি আনমনে চঞ্চলপদে পাদ-পীঠোপরি দণ্ডায়মান, আর এমনি তাহাদের অপাঙ্গ ভঙ্গি যে, মনে হয় যেন মুহূর্ত্তমাত্র সময় মধ্যে তাহারা দীপাধারের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইবে, আর দীপাধার অজ্ঞাতসারে তাহাদের সুকুমার করপল্লবের স্পর্শসুখে বঞ্চিত হইয়া ধরায় লুটাইবে,—তাহারা এখনি যেন চঞ্চল চরণসঞ্চালনে পাদপীঠ হইতে অবতরণ করিয়াই মুনিজন-মোহকর নৃত্য-লাস্যে ভুবন মাতাইয়া তুলিবে।

কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে ডাক্তার সাহেব এই অনিন্দ্য-কান্তি দীপাধারটি বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ডাক্তারের বদনমণ্ডলে চিন্তার রেখাপাত হইল, তিনি কি ভাবিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, চঞ্চল করাঙ্গুলি-স্পর্শে তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগের সুবিন্যস্ত কেশরাশি বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, অজ্ঞাতসারে অপরিস্ফুট ধ্বনিতে সামান্য একটুকু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,

জিনিষটি অদ্ভুত কারুকার্য্যসম্পন্ন ;—কিন্তু, —"

শাচা বলিয়া উঠিল, "আপনি কি বলিতে চান?"

ডাক্তার বলিলেন, "জিনিষটি বস্তুতই অদ্ভুত ; এমন আজগুবি জিনিষ পুরাকালের সয়তানের মত অদ্ভুত কারিকরও কল্পনায় আনিতে পারিত কি না সন্দেহ। এমনধারা পাগলামো জিনিষ গৃহে স্থান দিয়া দেখি বিষম দায়েই পড়িতে হইবে।"

শাচা যেন একটু দুঃখিত হইল, তথাপি সসম্ভ্রমে নিবেদন করিল, "ডাক্তার সাহেব, শিল্পকলা সম্বন্ধে দেখছি, আপনার কেমনধারা ধারণা। এখানে কি আপনি কলা দেবতার জীবন্ত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছেন না ? এই সামান্য দীপাধারে ত্রিদিবসুন্দরী শিল্পদেবতার পূর্ণ পরিস্ফুট লাবণ্যের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া সেই শিল্পদেবতার চরণে কাহার মস্তক অবনত না হয় ? এইরূপ অতুলনীয়া ভুবনমোহিনী সুন্দরীর রূপ প্রত্যক্ষ করা দূরে থাকুক, কল্পনায় অঙ্কিত করিতে পারিলেও এ মর্ত্ত্যভূমির অসার দ্রব্যসম্ভারের কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে বিস্মৃত হইয়া যাইতে হয়, এবং স্বর্গীয় অমল ভাবে হৃদয় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। দেখুন, এই সুন্দরী মূর্ত্তি দুইটির কেমন অপরূপ গঠন, সুচিক্কণ কেশরাশি অবধি সুচারু পাদপদ্ম পর্য্যন্ত প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কেমন সামঞ্জস্য, সুকুমার বদনে,—সুচঞ্চল নয়নে, অধিক কি সুঠাম সুন্দর প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কেমন জীবন্তভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে !"

ডাক্তার সাহেব অমনি বলিলেন, "তুমি যা বলিতেছ, সবই ঠিক ; আমি এসব উত্তমরূপেই বুঝিতেছি, এবং নির্ম্মাতার অসাধারণ শিল্পকৌশলে বাস্তবিক মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এই সুন্দরীগণের স্বভাবসুন্দর নিরুপম দেহলাবণ্যের উপর বসনাবরণ নাই, এ মুক্ত সৌন্দর্য্য, —হায়, আমি বিবাহিত। সংসারে আমার স্ত্রী আছেন, সদাসর্ব্বদা মহিলা-গণের সমাগমে আমার আবাসগৃহ মুখর হইয়া উঠে, বালক বালিকাগণও—"

ডাক্তার কোশেলকে বাধা দিয়া শাচা অমনি কহিল, "অবশ্যই সৌন্দর্য্যজ্ঞানহীন সাধারণ লোকের চক্ষে এই দীপাধারের কলাকৌশল সমস্তই ভাবান্তরের উদ্রেক করিতে পারে। তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু শিল্পকলাই যাঁহাদের আরাধ্য দেবতা, তাঁহারা ইহার অপূর্ব্ব মাধুরী যে ভাবে দেখিতে সমর্থ, আপনার নিকট কি আমি সেই ভাব প্রত্যাশা করিতে পারি না ? আপনি এই দীপাধারটি গ্রহণ না করিলে মা যে কিরূপ দুঃখিত হইবেন, আমার হৃদয়ে যে কিরূপ দারুণ আঘাত লাগিবে, তাহা বোধ হয় অনুভব করিতে পারেন। আমি মার একমাত্র সন্তান—সংসারের একমাত্র অবলম্বন,—আপনি আমার জীবন-দাতা,—আমরা আমাদের গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান, সর্ব্বাপেক্ষা আদরের জিনিষটি আপনাকে উপহার দিতে আনিয়াছি, আমাদের মনে এইমাত্র দুঃখ যে এরূপ আর একটি দীপাধার দিতে পারিলেই আপনার বৈঠকখানার টেবিলের শোভা বেশ মানানসই হইত ;—টেবিলের দুই পার্শ্বে দুইটি অনুরূপ দীপাধার থাকিলে তোরণের উভয় পার্শ্বের সুদৃশ্য অনুরূপ স্তম্ভ-যুগলের ন্যায় কেমন সুন্দর শোভা পাইত !"

ডাক্তার বুঝিলেন, আর বাদানুবাদ বৃথা। তাই বলিলেন, "আচ্ছা ভাল, তাহাই হউক; দীপাধারটি আমার গৃহে অবশ্যই স্থান পাইবে। তোমাদের একান্ত আগ্রহে আমি ইহা গ্রহণ করিলাম। তোমার মাকে আমার ধন্যবাদ জানাইবে, তোমাদের ব্যবহারে আমি প্রকৃতই সুখী হইয়াছি। কিন্তু তুমি নিজেই একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, কি করা যায়, কোথায় এ দীপাধার রাখা যায়,—বাড়ীতে ছেলেপুলে আছে, রমণীগণ সর্ব্বদা এখানে যাতায়াত করিয়া থাকেন,—আচ্ছা যাক, তোমাকে বুঝানো দায়, থাক, দীপাধারটি এখানেই থাকুক ; গৃহে একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তথায় ইহা রাখা যাইবে।"

ডাক্তারের সম্মতিসূচক বাক্যে শাচা এতক্ষণে আশ্বস্ত হইল, হৃষ্টচিত্তে বলিল, "ডাক্তার সাহেব, আপনার বৈঠকখানার টেবিলের এক পার্শ্বেই এই দীপাধারের স্থান হইতে পারে, এখানেই ইহা বেশ দেখাইবে। আমরা বড়ই দুঃখিত যে, এই দীপাধারের অনুরূপ আর একটি দীপাধার আমাদের নাই তাহা হইলে এক জোড়া দীপাধার আপনার টেবিলের উভয় পার্শ্বে বেশ শোভা পাইত। যাহা হউক, তার আর উপায় নাই। আজ

তবে এখন বিদায় হই। আপনি যে অনুগ্রহ করিয়া এটি গ্রহণ করলেন, তাহাতে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।”

শাচা প্রস্থান করিলে, ডাক্তার কোশেল পুনরায় অনিমেষ নয়নে বহুক্ষণ দীপাধারটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, আবার করাঙ্গুলি সঞ্চালনে তাঁহার কেশরাশি আন্দোলিত হইল, নখস্পর্শে শ্রবণেন্দ্রিয়ের পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল, কয়েক মিনিট তিনি চিন্তায় মগ্ন হইলেন, মনে মনে ভাবিলেন, “শিল্পের হিসাবে দেখিতে গেলে, এ দীপাধারটির সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই; কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারে না। এইরূপ অপরূপ জিনিষটিকে ফেলিয়া দেওয়াও সঙ্গত নহে। অথচ আমার টেবিলের এক পার্শ্বে স্থান দেওয়াও অসম্ভব। আচ্ছা, ভাল, আমার এমন বন্ধু কি কেহ নাই, যাঁহাকে উপহার দিয়া এই জিনিষটি রাখার দায় হইতে মুক্ত হওয়া যায়?”

অকস্মাৎ পরম বন্ধু ব্যারিষ্টার কফ্ সাহেবের কথা ডাক্তার কোশেলের স্মরণ হইল। কফ্ তাঁহার অনেক মামলা মোকদ্দমা করিয়া দিয়াছেন, কখনও কোন ফি নেন নাই; আপন কার্য্যের ন্যায়, তাঁহার কার্য্যে অনবরত খাটিয়াছেন। ডাক্তার ভাবিলেন, “ভাল, বন্ধু আমার নিকট ফি লইতে আপত্তি করেন, আমি কোনো উপহার দিলে তো আর গ্রহণ না করিয়া পারিবেন না। ভাগ্যক্রমে বন্ধু এখনো অবিবাহিত আছেন; বিশেষতঃ তিনি ততটা গম্ভীরপ্রকৃতির নহেন। তাঁহার নিকট ইহার সমাদর হইবে।”

ডাক্তার অমনি সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দীপাধারটি সহ একেবারে কফ্ সাহেবের ভবনে উপস্থিত। সৌভাগ্যক্রমে কফ্ সাহেব গৃহেই ছিলেন। প্রথম-দর্শনোচিত সম্ভাষণের পর ডাক্তার সাহেব ব্যারিষ্টার বন্ধুকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইলেন, এবং তিনি যে এই বিচিত্র কারুকার্য্য-ভূষিত দীপাধারটি বন্ধুকে উপহার দিতে আনিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলেন। দীপাধারের অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে কফ্ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, আনন্দের উচ্ছ্বাসে প্রথমটা খুবই প্রশংসা করিয়া ফেলিলেন। শিল্পিগণের কি বাহাদুরি, তাহারা এমন সুন্দর ছবি কল্পনা করিয়াছে, জীবন্ত মূর্ত্তিতে তাহা গঠিত করিয়া তুলিয়াছে। এই অলৌকিক জিনিষটি ডাক্তার সাহেব কোথা হইতে আনাইয়াছেন, ভাবিয়া তিনি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

প্রথম বিস্ময়ের মোহ কাটিয়া গেলে ব্যারিষ্টার সাহেবের যেন চৈতন্যোদয় হইল। দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি ডাক্তার কোশেলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বন্ধু, তোমার উপহার দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু এ দীপাধার রাখার সাধ্য আমার নাই, তোমার জিনিষটি তোমাকেই ফিরাইয়া লইতে হইল; বড়ই দুঃখের বিষয়, আমি ইহা গ্রহণ করিতে পারিব না; তুমি এখনই এই দীপাধার লইয়া যাও।”

ডাক্তার বলিলেন, “কেন কি হইয়াছে?”

ব্যারিষ্টার উত্তর করিলেন, “না বন্ধু, এ গৃহে আমার মক্কেলগণ সদাসর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক মহিলাও আসেন। গৃহে দাসদাসীরও অভাব নাই। এ অবস্থায় আমি কিছুতেই এ দীপাধার রাখিতে পারিব না।”

ডাক্তার কোশেল যুগপৎ বাহুযুগল আন্দোলন করত বন্ধুর আপত্তি খণ্ডন করিয়া বলিলেন, “না, না, বন্ধু তুমি আমাকে কোনোমতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। এ জিনিষ তোমাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। শিল্পকলার চরমোৎকর্ষের আদর্শস্থল এমন সুন্দর জিনিষটি প্রত্যাখ্যান করা তোমার পক্ষে বড়ই অশোভন হইবে। তুমি আমার কত কার্য্যে অনবরত পরিশ্রম করিতেছ, তোমাকে এই সুন্দর জিনিষটি উপহার দিতে আনিয়াছি, প্রত্যাখ্যান করিলে আমি অন্তরে দারুণ আঘাত পাইব।”

“আহা! যদি এই পরী-মূর্ত্তি দুইটির মুক্ত সৌন্দর্য্য একটু কিছু আবরণে—” কফ্ সাহেবের কণ্ঠ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতেই ডাক্তার আপন বিশাল বাহুযুগল পুনরায় প্রসারিত করিয়া ব্যারিষ্টার বন্ধুর হাত ধরিয়া তাঁহার বাক্যসমাপ্তির পথে বাধা জন্মাইলেন এবং ত্বরিতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এইরূপে দীপাধারের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া ডাক্তার কোশেল পুলকিত মনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

তখন ব্যারিষ্টার ডাক্তারেরই মত বহুক্ষণ নির্নিমেষ লোচনে এই প্রমাদ-সঙ্কুল উপহারের বস্তুটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যেন কি ভাবনায় নিবিষ্ট রহিলেন, তারপর দীপাধারটিতে হস্তার্পণ করিলেন। কিন্তু দীপাধারটির ব্যবস্থা কি করিবেন, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

মনে মনে তিনি চিন্তা করিলেন, "এই দীপাধারটি প্রকৃতই শিল্পপ্রতিভার চরমোৎকর্ষ; এরূপ সুশোভন জিনিষটি ফেলিয়া দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না।—অথচ এ ঘরে স্থানদানও অসম্ভব। এরূপ জিনিষ উপহার দেওয়ার পক্ষেই বেশ উপযুক্ত। বন্ধুবান্ধবকে এমন সুন্দর জিনিষ উপহার দিলেই ইহার যথোচিত সুব্যবস্থা করা হয়। আমার বন্ধুদের মধ্যে রঙ্গালয়ের প্রসিদ্ধ অভিনেতা, রঙ্গরসাভিনয়ে সুপটু শাশ্‌কিনকে এই সুন্দর জিনিষটি উপহার দিলে ভাল হয় না? আমি এখনই তাহাকে ইহা দিয়া আসিব। তিনিতো এসব জিনিষ বেশ পছন্দ করেন; বিশেষতঃ আজ রাত্রে তাঁর গৃহে এক সান্ধ্য সমিতি আছে; আজ তিনি এ উপহার পাইলে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারেন।"

দীপাধারটি পুনরায় উত্তমরূপে আবৃত হইল। ব্যারিষ্টার কফ্ তদীয় হৃদ্য বন্ধু শাশ্‌কিনকে তাহা সাদরোপহার প্রদান করিলেন। আবরণ খুলিয়া দীপাধারের অলৌকিক সৌন্দর্য্যদর্শনে রসিকচূড়ামণি শাশকিন্‌ও তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সেদিনকার সান্ধ্যসমিতিতে যে কয়জন সুহৃদ সমবেত ছিলেন, সকলেই উচ্চকণ্ঠে এই অপূর্ব্বদর্শন দীপাধারের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের প্রশংসাসূচক বচনাবলী শিল্পদেবতার এবং সঙ্গে সঙ্গে দীপাধার-নির্ম্মাতার স্তবে পরিণত হইয়া উঠিল। আমোদজনক হাস্যকৌতুকে সে ভবন পূর্ণ হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে একটু রাত্রি হইল। তখন সে রজনীর অভিনয় আরম্ভ হইবে। একজন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী নাট্যারম্ভের পূর্ব্বে শাশ্‌কিনের দ্বারে উপস্থিত! তাঁহার পদশব্দে শাশকিনের মোহ ভাঙ্গিয়া গেল! এতক্ষণে যে পিত্তল-বিনির্ম্মিত দীপাধারের আশ্রয়স্থল অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন বসনবিরহিত এই মূর্ত্তিযুগল সান্ধ্যসমিতিতে সমবেত সুহৃজ্জনগণের মনোরঞ্জন করিতেছিল, এই একটিমাত্র মহিলার সমাগমে, তাহা তাঁহার নিকট নিতান্তই অশোভন বোধ হইতে লাগিল। শাশকিন্ আপনার ত্রুটী সংশোধনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অমনি ত্বরিত কণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন, "সুন্দরি, আপনি দ্বারদেশে ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, কক্ষে প্রবেশ করিবেন না, আমি অভিনয়োচিত বেশভূষা পরিধান করিতে বিব্রত আছি। বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া অবিলম্বে আপনাকে সংবাদ দিতেছি।"

বন্ধুজনের সাহায্যে তাড়াতাড়ি দীপাধারটি স্থানান্তরিত করিয়া অভিনেত্রীকে সংবাদ দিলেন।

সে রজনীর অভিনয় শেষ হইয়া গেলে, শাশকিন্ পুনরায় দীপাধারের প্রতি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে বহুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া ভাবিলেন, "আহা, এই জিনিষটি কি সুন্দর! কিন্তু হায়, আমার গৃহে নিত্য নিত্য কত কত অভিনেত্রীর সমাগম হয়, ইহা গৃহে রাখিলে শিষ্টতা রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে; সদা সর্ব্বদা এ দীপাধার তাড়াতাড়ি স্থানান্তরিত করার ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়া এ অপূর্ব্ব দ্রব্যটি গৃহে রাখা অসম্ভব!" অথচ বন্ধুর উপহার-প্রদত্ত অপরূপগঠন এই মূর্ত্তিযুগল-হস্ত-ন্যস্ত দীপাধারটির কি ব্যবস্থা করিবেন, নির্দ্ধারণ করিতে তাঁহার অবিরল রসকল্পনাপ্রসূ উর্ব্বর মস্তিষ্ক আলোড়িত হইল, কিন্তু কিছুতেই কোন সমীচীন উপায় উদ্ভাবনের সম্ভাবনা দেখা গেল না।

দুই একদিনের মধ্যে তাঁহার ভৃত্য প্রভুকে একটু অন্যমনস্ক দেখিয়া কারণ অবগত হইল। তখন সে নিতান্ত সহজ উপায় দেখাইয়া দিল। প্রভুকে বুঝাইল, এই জিনিষটি বিক্রয় করিলেই আপদ চুকিয়া যায়। এই সব জিনিষ বিক্রয় করিতেও কোনোই ঝঞ্ঝাট নাই; সহরের মধ্যে শাচার মা এই সব জিনিষ খরিদ বিক্রয়ের ব্যবসায় করিয়া থাকে!

অনন্যোপায় হইয়া ভৃত্যের পরামর্শমতে কার্য্য করাই পরিশেষে শাশ্‌কিন্ স্থির করিলেন! অচিরে দীপাধার শাচার মা'র হস্তে আসিয়া পড়িল।

প্রাতে শাচা পুনরায় ডাক্তার কোশেলের নিকট খবরের কাগজে দীপাধারটি মুড়িয়া লইয়া উপস্থিত হইল।

আজ তাহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল। ডাক্তারকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া মধুরস্বরে কহিল, "ডাক্তার সাহেব, আমরা বড় আহ্লাদিত হইয়াছি যে আপনাকে উপহার দেওয়ার জন্য সেইরূপ আরো একটি দীপাধার সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। এখন আর আমার মা, অথবা আমার নিজের কোনো আপশোষই নাই। এই দুইটি অনিন্দ্য-সুন্দর দীপাধারে আপনার টেবিল অপরূপ শোভা ধারণ করিবে, তাই এই দীপাধারটিও আপনাকে উপাহার দিতে আনিয়াছি,—গ্রহণ করুন।"

বলিতে বলিতে আবরণ মুক্ত করিয়া দীপাধারটি টেবিলের উপর স্থাপন করিয়া বিস্ময়াভিভূত ডাক্তারকে পুনরায় অভিবাদন করত শাচা মুহূর্ত্ত মধ্যে কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

এই তিল মাত্র সময় মধ্যে কত ভাব কত চিন্তা সমুদিত হইয়া ডাক্তারের প্রবীণ মস্তিষ্ক বিষম আলোড়িত করিয়া তুলিল, তিনি যুবককে কি বলিতে ইচ্ছা করিয়া আসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ এবার বিষম রুদ্ধ হইয়া গেল, কম্পিত অধরে কোন বাক্যই স্ফুরিত হইল না।*

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী।

ফেরার ও তাঁহার আদর্শ

ফেরার স্পেনদেশের একজন অধ্যাপক ছিলেন। রাজতন্ত্র-বিরোধী ছিলেন বলিয়া তিনি স্পেন-রাজপুরুষের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। বার্সেলনার বিপ্লবের হাঙ্গামায় জড়িত করিয়া তাঁহাকে গত ১৩ই অক্টোবর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ফেরারের বন্ধুবর্গের বিশ্বাস যে তিনি আদৌ এই হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিলেন না। পুলিশ মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া ও জাল পত্রাদি তৈয়ার করিয়া এই জনহিতৈষী মহাপুরুষকে দণ্ডিত করিয়াছে।

ফেরার প্রকৃতপক্ষে নিজে কোনও বিপ্লব ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন না। তবে তাঁহার স্বাধীন মত দেশপ্রচলিত শাসনপদ্ধতির বিরোধী ছিল। সর্ব্ববিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে মানবের মুক্তিসাধনই তাঁহার আদর্শ ছিল। বিবেকের স্বাধীন অনুশীলন দ্বারাই মানবসমাজ এই মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা এই স্বাধীন বিবেকের অনুশীলনের অনুকূল নহে। এবং বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীও ইহার প্রতিকূল।

স্পেনে সেই সময় এনার্কিষ্টগণ যে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আয়োজন করিতেছিল তাহার প্রতি ফেরারের বিশেষ আস্থা ছিল না। তিনি বলিতেন যে সাম্রাজ্যবাদীদের ন্যায় ইহাদের মনও নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, সমগ্র বিশ্বমানবের মঙ্গলের সঙ্গে ইহাদের আদর্শের কোনও যোগ নাই। স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনা এবং স্বাদেশিকতার স্বার্থই ইহাদিগকে এই বিপ্লবে প্রণোদিত করিয়াছে—সমগ্র মানবের মঙ্গলের প্রতি ইহাদের লক্ষ্য নাই।

ফেরার তাঁহার এই উন্নত মত অনুযায়ী শিক্ষা দানের জন্য একটা আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হন। তাঁহার বিশ্বাস এই, যে, মানবমুক্তির এই আদর্শকে শিক্ষার দ্বারা জীবনগত এবং জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতে বিস্তার করিতে হইবে।

একটী ফরাশী মহিলার প্রদত্ত অর্থে ১৯০১ খৃঃ অব্দে ফেরার বার্সেলনা নগরে প্রথম আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার পরে মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার দ্বারা স্থাপিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১০৯টী।

দেশের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে ফেরারের মত এই যে—শিশুগণ ভবিষ্যতে যেন রাষ্ট্রীয় ও সমাজ সংঘের বিধি ব্যবস্থাতে আস্থাবান হয় এবং শান্ত ভাবে তাহা মানিয়া চলে—তাহাদের চিন্তাস্রোতও যেন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত না হয়—ইহাই বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ইচ্ছা। এই ইচ্ছার অনুকূলেই শিশুদের মনুষ্যত্বকে পরিচালিত করিতে হইবে। এই প্রণালীতে তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক মনোবৃত্তিগুলি সরল ও স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হইতে পারে না। সমাজ ও রাষ্ট্র তাহাদের মনকে কৃত্রিম ব্যবস্থার ছাঁচে ঢালিয়া স্বার্থের অনুকূলে গড়িয়া তোলে। ইহাতে তাহাদের মধ্যে একটা স্বাধীন মত গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় না। বাহিরের একটা গঠিত মতকে জোর করিয়া তাহাদের

* রুশিয়ার বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ গল্পলেখক Anton Chekovএর গল্পের ইংরেজী অনুবাদের ছায়াবলম্বনে বিরচিত।

মনের মধ্যে বসাইয়া দেওয়া হয় মাত্র। এই শিক্ষার ফলে মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বকে সমাজ-কারখানার দাসত্বে বিক্রীত করে।

এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী যে মানবসমাজের মুক্তির বিরোধী হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। এই শিক্ষা শাসন-শক্তির হস্তে আত্মবিক্রয়ের উপায়স্বরূপ। শাসন-শক্তি ব্যক্তিত্বকে উন্নত ও স্বাধীন না করিয়া—পরাধীনতার নিগড়ে তাহাকে আরও শক্ত করিয়া আবদ্ধ করে। অতএব বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা দ্বারা মানবমুক্তির আশা করা বাতুলতা মাত্র।

তার পর ফেরার বলেন যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত। শিশুদের বিভিন্ন মনোবৃত্তিগুলি যাহাতে অব্যাহত রূপে পরিস্ফুট হইতে পারে—তাহাদের আত্মার যাহাতে স্বাধীন বিকাশ হয়, ভিতর হইতে যেন একটা শক্তি গঠিত হইয়া উঠে ইহাই তাঁহার লক্ষ্য। এইরূপ লোককে রাষ্ট্র বা সমাজ বড়ই ভয়ের চক্ষে দেখে। তাই ফেরার স্পেন-কর্ত্তৃপক্ষের কোপদৃষ্টিতে পড়েন।

ফেরারের প্রতিষ্ঠিত মানবমুক্তির এই নূতন মত অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র স্পেনে ছড়াইয়া পড়ে। ফরাসী, ইংলণ্ড ও জর্ম্মানীর অনেক সাধারণতন্ত্রী ও সোসিয়ালিষ্ট নেতা ফেরারের এই উন্নত মতকে সমর্থন করেন। তার পর স্পেনে বিপ্লবের সূত্রপাত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে ফেরারের এই স্বাধীন মতই ইহার জন্য অনেকটা দায়ী। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে মেটোমরেল নামক এক ব্যক্তি স্পেনের রাজা ত্রয়োদশ আলফঞ্জকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে বোমা নিক্ষেপ করে। কর্ত্তৃপক্ষ সেই গোলমালের উপলক্ষে ফেরারকে জড়িত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সমগ্র জগতের সভ্য-সমাজ তাহাতে বিচলিত হইয়া উঠে এবং ফেরারের পক্ষ সমর্থন করে। সেইজন্যই সেবার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে বাধ্য হয়।

তারপর গত বৎসর বার্সেলনার হাঙ্গামায় মিথ্যা সাক্ষ্য জুটাইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করা হইয়াছে।

এই সত্যনিষ্ঠ সাধুপুরুষের অন্যায় মৃত্যুতে সমগ্র ইয়ুরোপে তাঁহার মত সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। ইংলণ্ড, ফরাসী ও জর্ম্মানীর নানাস্থানে ফেরারের মতানুযায়ী বিদ্যালয় স্থাপন করা হইতেছে। তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুগণ জগতে তাঁহার এই উন্নত মতের প্রতিষ্ঠার জন্য বিরাট আয়োজনের সূচনা করিয়াছেন। ফেরারের পবিত্র মৃত্যুর মধ্য দিয়াই তাঁহার সত্য জয়যুক্ত হইবে।

শ্রীঃ—

লবঙ্গ দ্বীপ

(ওয়ারল্ড ওয়ার্ক হইতে)।

আফ্রিকার পূর্ব্বদিকে ভারত মহাসাগরে, জাঞ্জিবার দ্বীপের সাতাইশ মাইল উত্তরে লবঙ্গপ্রসূ পেম্বাদ্বীপ অবস্থিত। ছোট বড় অসংখ্য স্রোতস্বিনী, উপসাগর ও খাঁড়ি দ্বীপটির উপকূলভাগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সবুজ তৃণ, নারিকেল ও লবঙ্গ তরুর কুঞ্জ দ্বীপটিকে একটি শোভন শ্রী দান করিয়াছে। দ্বীপের চারিপার্শ্বস্থ সমুদ্র শ্যামলতৃণাস্তীর্ণ দ্বীপ-খণ্ড দ্বারা বেষ্টিত—তথায় অসংখ্য কুক্কুট ও বৃহদাকার বানর বাস করে। কোনো কৌতূহলী দর্শক তাহাদের বাসভূমির সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র তাহারা সমবেতকণ্ঠে কাতর চীৎকার তুলিয়া তাহার অনধিকার প্রবেশের প্রতিবাদ জানাইয়া থাকে। দ্বীপের অভ্যন্তরে যেখানে লোক-নিবাস রহিয়াছে জাহাজ হইতে নামিয়া নৌকার সাহায্যে সেখানে যাইতে হয়। স্রোতস্বিনী ও খাঁড়িগুলির উভয় তীর হইতে অসংখ্য বৃক্ষ ঝুঁকিয়া পড়িয়া জলপথকে বনভূমির আকার দান করিয়াছে। উপকূলভাগে প্রবাল ও পুষ্পাকৃতি স্পঞ্জ এবং দুর্লভ শুক্তিসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়।

চেক্‌চেক্ নগর এই দ্বীপের রাজধানী। সেখানকার সংকীর্ণ, আঁকাবাঁকা ও কদর্য্য নির্ম্মিত রাস্তাগুলি দর্শকের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথা হইতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি যে উদার ও বিস্ময়কর মনোহর দৃশ্য দেখিতে পান তাহা অতুলনীয়। তখন তাঁহার দৃষ্টিতে তৃণশ্যামল উচ্চ উপকূল একগাছি তাজা সবুজ মালা—দ্বীপখণ্ডগুলি নীল সমুদ্রের উপরে ভাসমান মরকত-খণ্ড এবং দূরবর্ত্তী আফ্রিকার শৈলশ্রেণী মেঘমুক্ত তরলনীল গ্রীষ্মাকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দর্শক এই দ্বীপের

নগর দেখিয়া যতখানি নিরাশ হইবেন, নগরের বহির্ভাগস্থ তরঙ্গায়িত ভূভাগের স্রোতস্বিনী, উপত্যকা, এবং কদলীকুঞ্জ-বেষ্টিত কুটীর ও পল্লী, লবঙ্গবৃক্ষের সারি, এবং বিপুল অরণ্য দেখিয়া ততোধিক উল্লসিত হইবেন। এই দ্বীপের বিচিত্র সুন্দর শোভা নিঃসন্দেহ দর্শকের চিত্ত স্পর্শ করিবে।

পেম্বাদ্বীপ জাঞ্জিবারের সুলতানের শাসনাধীন। ইতি-পূর্ব্বে পারসিক ও পর্ত্তুগিজেরা এই দ্বীপে রাজত্ব করিতেন। রাজত্ব শেষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের স্মৃতিও বিলুপ্ত হইয়াছে। দ্বীপবাসীদের উপর তাঁহারা কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। কিন্তু সুলতানদের শাসনে দ্বীপ-বাসীদের অবস্থার ও চরিত্রের বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রায় একশত বৎসর গত হইল জাঞ্জিবারের এক সুলতান এখানকার ভূমি পরীক্ষা করিয়া উহা লবঙ্গ-চাষের উপযোগী বলিয়া মনে করেন। তিনি এই দ্বীপে সর্ব্বপ্রথমে লবঙ্গ-বৃক্ষ রোপণ করেন। তাঁহার চেষ্টা সফলতা লাভ করায় ক্রমশঃ এই দ্বীপে লবঙ্গের চাষ বাড়িতে থাকে। এখন এই স্থানটি লবঙ্গের ফসলে পৃথিবীর অপর সকল স্থানকে অতিক্রম করিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ লবঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে পেম্বা ও জাঞ্জিবারেই তাহার সাত-অষ্টমাংশ জন্মিয়া থাকে।

এই লাভজনক কৃষি প্রবর্ত্তিত হইবামাত্র দ্বীপবাসীদের চরিত্র বদলাইয়া গিয়াছে। তাহারা পূর্ব্বে একান্ত কর্ম্ম-কুণ্ঠ ও অলস ছিল। এখন বালবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ কেহই কর্ম্ম-বিমুখ নহে। লবঙ্গ-চয়ন আরম্ভ হইবার পর হইতে উহার সমাপ্তি পর্য্যন্ত দ্বীপবাসীদের মুখে দ্বিতীয় কোনো প্রসঙ্গ নাই—লবঙ্গ-সংগ্রহ ও উহার ক্রয় বিক্রয়ের কথা লইয়াই তাহারা দিবারাত্রি মাতিয়া থাকে।

নিদাঘ মধ্যাহ্নে যিনি গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ এই দ্বীপের লবঙ্গ-তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন তিনি তাঁহার সেই ভ্রমণের সুখ-স্মৃতি কখনো ভুলিতে পারিবেন না। পত্রিত তরুর বিরামদায়িনী সুশীতল ছায়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান জানাইয়াছে;—নিবিড় মধুর সুরভি-আকুল বায়ুর শীতলস্পর্শ তাঁহার আতপ-তপ্ত তনু জুড়াইয়াছে।

বহুশাখাযুক্ত সরল লবঙ্গদ্রুম উচ্চতায় ৬০।৭০ ফুটের কম নহে। এই বৃক্ষের ঘন পত্রস্তবকের মধ্য দিয়া সূর্য্য-রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না। শাখাগুলির মাঝখা[নে] স্থানে স্থানে যে অবসর আছে সেই সকল ফাঁক দিয়া কির[ণ]মালা প্রবেশ করিয়া তলদেশে আলো ও ছায়ার লীলা[র] দৃশ্য সৃষ্টি করে। সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে লবঙ্গকুঞ্জ-মধ্যব[র্ত্তী] অন্ধকারাবৃত ভূখণ্ডগুলির চারিদিকে অস্তগামী সূর্য্যরশ্[মি]গুলিকে সোণার রেখা বলিয়া ভ্রম জন্মে। জ্যোৎস্না-ধব[ল] রাত্রিকালে লবঙ্গ-তরুকুঞ্জের দৃশ্য আরো বিস্ময়কর। কোনে[া] কোনো স্থানে রজতশুভ্র-চন্দ্রকররাশি ঝক্ ঝক্ করিতেছে[,] আবার কোনো স্থানে বা কালো কালো অন্ধকার জমি[য়া] বসিয়া আছে। এইসময়ে এখানকার গাছপালা ভূমি সকল সজীব বলিয়া প্রতীত হয়। রাত্রি যত বাড়িতে থাকে প্রাণের স্পন্দন উত্তরোত্তর ততই বাড়িতে থাকে। দিব[া]ভাগে যে জীবগুলি নীরব ছিল, এখন তাহাদের সহ[স্র] কণ্ঠের সমবেত ঝিল্লীরাগিণী দশদিক প্লাবিত করিতেছে[;] মাঝে মাঝে ছোট বড় বানরের কিচিমিচি শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়।

লবঙ্গপত্র প্রায় গোলাকার ঈষৎ চেপ্টা। এই চির সবুজ পত্রগুলির উপরিভাগ মসৃণ ও উজ্জ্বল। বাজারে যে লবঙ্গ বিক্রীত হয় সেগুলি অবিকশিত পুষ্পমুকুল[।] মুকুলগুলির রং প্রথমে ধূসর থাকে; ক্রমে বদলাইয়া পাটক[িলে] এবং সর্ব্বশেষে গোলাপী বর্ণে পরিণত হয়। সাধারণত লবঙ্গমুকুলের এক-একটি গুচ্ছে আট হইতে পনরটি—উপরের শাখাগুলির এক একটি গুচ্ছে উহার দ্বিগুণ লবঙ্গ ফলিয়া থাকে। মুকুলগুলি বিকশিত হইয়া ফুলে পরিণত হইলে লবঙ্গের মূল্য কমিয়া যায়। লবঙ্গের অগ্রভাগে টোপরের ন্যায় একটি আবরণ আছে—উৎকৃষ্ট লবঙ্গে সেটি থাকিবেই। মুকুল ফুলে পরিণত হইলে শুকাইবার সময়ে উক্ত আবরণ খসিয়া পড়ে।

মুকুল ধরিবার প্রায় পাঁচ মাস পরে চয়নকার্য্য আরম্ভ হয়। উক্তকার্য্য প্রায় তিন মাস চলিয়া থাকে। সাধারণতঃ এক একটি বৃক্ষ হইতে একবার মাত্র মুকুল চয়ন করা হয়। কোনো কোনো বৎসর ঐ কার্য্য দ্বিতীয় তৃতীয় বারও চলিয়া থাকে। অচ্ছিন্ন মুকুলগুলি কিছুদিন পরে বড় হইয়া একটি দীর্ঘ ফুলের আকার ধারণ করে। এইগুলি হইতে বীজ সংগ্রহ করা হয়; কারণ সাধারণ লবঙ্গ

অপরিণত মুকুল বলিয়া সেগুলি হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না।

যখন চয়ন চলিতে থাকে তখন তরুশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী অবকাশ স্থান দিয়া ভ্রমণ করিলে ভ্রমণকারী ঘনপল্লবিত তরুরাজির মধ্য হইতে অদৃশ্যকণ্ঠের কাকলি, হাস্য ও সঙ্গীত শুনিয়া সেই অদৃশ্য জীবদিগকে উপদেবতা বলিয়া মনে করিবেন। স্ত্রী পুরুষ সকলেই লবঙ্গচয়ন করিয়া থাকে। চয়নকারী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া একখানি মোটা ডালের খাঁজে পা সংলগ্ন করে; তৎপরে ছোট ছোট আঁকুষির সাহায্যে পল্লবগুলি নোয়াইয়া গুচ্ছগুলি ছিঁড়িয়া লয়, এবং ছিন্নমঞ্জরীগুলি একটা থলিয়ার মধ্যে রাখিয়া দেয়।

রাত্রির অন্ধকার দূর হইতে না হইতে চয়নকারীরা তাহাদের কার্য্যে লাগিয়া যায়। অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময়ে সমাপ্তিসূচক ঢক্কাধ্বনি শুনিবামাত্র সংগৃহীত মঞ্জরী-গুলি লইয়া তাহারা ভাণ্ডারগৃহে গমন করে। সেখানে শুষ্ক-শক্ত মাটির তৈয়ারি প্রশস্ত খোলা চত্বরে সেগুলিকে শুকানো হয়। এক-এক জন মজুর এক-একখানি মাতুর বিছাইয়া তাহার উপর বোঁটা হইতে লবঙ্গ খসাইয়া রাখে। হাতের তালুর উপর মঞ্জরীগুলি রাখিয়া অঙ্গুলির দ্বারা লবঙ্গ ছাড়ানো হয়। বৃন্তগুলিও একধারে স্তূপাকার করিয়া রাখা হয়। লবঙ্গের সপ্তাংশ মূল্যে এইগুলি বিক্রীত হইয়া থাকে। বৃন্ত হইতে খসানো কাঁচা লবঙ্গগুলিকে পরদিন হইতে প্রত্যহ মাতুরে বিছাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয়। কাঁচা লবঙ্গগুলি একটু মাত্র বৃষ্টির জলে ভিজিলে পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়, এইজন্য লবঙ্গ শুকাইতে দিয়া প্রহরীদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। রৌদ্রে দিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই কাঁচা লবঙ্গের গোলাপীবর্ণ বদলাইতে আরম্ভ করে—পাঁচ ছয় দিন মধ্যে তাহাদের রং পিঙ্গল হইয়া উঠে। কাঁচা লবঙ্গমঞ্জরীর গন্ধ মৃদুমধুর, কিন্তু সেগুলি যতই শুষ্ক হইতে থাকে, গন্ধের উগ্রতা ততই বাড়িতে থাকে। শুষ্ক লবঙ্গস্তূপের পাশ দিয়া চলাফেরা করায় কখনো কখনো শিরঃপীড়া জন্মিয়া থাকে।

কাঁচা লবঙ্গগুলি যথোপযুক্তরূপ শুকাইল কি না তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত অভিজ্ঞ পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকে। যদি লবঙ্গ বাঁকানো যায় অথচ সেটা অটুট থাকে তাহা হইলে সেটা কাঁচা রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। আবার বাঁকাইবার চেষ্টা মাত্রেই যদি লবঙ্গ মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে সেটা অতিরিক্ত শুকাইয়াছে। বাঁকাইবার চেষ্টা করায় যদি লবঙ্গ কতক ভাঙ্গে কতক বাঁকিয়া থাকে তাহা হইলে উহা যথাযথরূপ শুকাইয়াছে বুঝিতে হইবে। শুকানো লবঙ্গগুলি ছালায় পূর্ণ করিয়া মজুরেরা নিকটবর্ত্তী নৌকা-ঘাটে লইয়া যায়, সেখান হইতে নৌকাযোগে সেগুলিকে জাঞ্জিবারে চালান করা হয়, তথায় শুল্কগৃহে বস্তাগুলি বিক্রীত হইয়া থাকে।

আরবেরা প্রথমে ক্রীতদাসদের দ্বারা এই কৃষিকার্য্য চালাইত—তখন কুলীর অভাব ছিল না। গাছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মই লাগাইয়া কুলীরা লবঙ্গমঞ্জরী চয়ন করিত। উক্ত চয়নপ্রণালীতে কাজ বড়ই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইত। দাসত্বপ্রথা যখন উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন আরবেরা বড়ই চিন্তিত হইয়াছিল—তাহাদের আতঙ্ক হইয়াছিল যে কুলীর অভাবে তাহাদের কৃষিকার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে। সুখের বিষয়, দাসত্বপ্রথা রহিত হইবার পরে তাহাদের ভীতি অলীক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ কৃষি-কার্য্য চালাইবার জন্য যত মজুরের প্রয়োজন এই ছোট দ্বীপ সকল সময়ে তত লোক যোগাইতে পারে না। ফলে মজুর দুর্ঘট ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে মুকুলচয়ন এবং বর্ষা ঋতুতে সেগুলিকে শুকাইবার ব্যবস্থা করিবার কথা উঠিয়াছিল কিন্তু তাহা ব্যয়সাধ্য বলিয়া কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। জাঞ্জিবার-গবর্ণমেণ্ট এখানকার লবঙ্গকৃষি হইতে বিস্তর রাজস্ব পাইতেছেন; এইজন্য তাঁহারা এই কৃষির উন্নতিসাধনে যত্নশীল আছেন।

শ্রীশরৎকুমার রায়।

নভোবিজ্ঞান

(Astro-Physics)

জ্যোতিষ শাস্ত্রের উৎপত্তি সুদূর অতীতের আঁধার গর্ভে বিলীন। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অপ্রতিহত নিয়মিত আবির্ভাব এবং তিরোভাব মানবকে দূরাদপিদূর অতীত হইতে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, ঋতু পরিবর্ত্তনাদি দেখাইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ মানব এইরূপ ধীর নিয়মিত প্রকাশে

অভ্যস্ত হইয়া, ধূমকেতু, উল্কাপাত, গ্রহণাদি অসাধারণ প্রকাশকে বিশ্বস্রষ্টার ক্রোধের পরিচায়ক বলিয়া অনেকদিন বিশ্বাস করিয়াছে। আজও সেই বিশ্বাস—তাই সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের মৃত্যুর কারণ আকাশে ঐ ধূমকেতু! কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা পশ্চিম গগনে সন্ধ্যার পর আরেকটি ধূমকেতু দেখিয়াছিলাম। সকাল সন্ধ্যা পূর্ব্ব পশ্চিমে ধূমকেতু! এই বৎসর সৃষ্টি থাকে কি যায়—মহাসমস্যা! জ্যোতিষিগণ আমাদিগকে অনেক রকম কথাই বলিতেছেন।

যদিও দেখিতে গেলে, জ্যোতিষশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ, তথাপি কোন কোন বিষয়ে ইহার আধুনিক বিস্তার ও প্রসার উহার পূর্ণ যৌবনের প্রভাবই প্রকাশ করে। ভৌতিক বিজ্ঞানের (Physical Science) ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সময় সময় ইহার প্রত্যেক বিভাগেই অতিশয় সজীবতার পর যেন একটা নির্জীব নিস্পন্দভাব আসিয়া পড়ে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাসে ঐরূপ একটি সময় গিয়াছে। তখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা এবং তাহার সাহায্যে নূতন আবিষ্কার বা নূতন গবেষণার আশা যেন চরমে পৌঁছিয়াছিল। লিভেরিয়া (Leverier) এবং এডামস্‌এর (Adams) আবিষ্কারের সমকক্ষ হইবার মত আর কিছু হইতে পারে তখন এমন কিছু ধারণায় আসে নাই।

নিউটন (Newton) ত্রিপার্শ্ব (Prism) কাচের সাহায্যে সূর্য্যকিরণ সপ্তধা বিশ্লেষণ করেন, আবার ঐ বর্ণ-চ্ছত্রের (spectrum) সপ্তবর্ণ কিরণ একত্র সংযোগে বর্ণহীন আলোক পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে উলাষ্টন (Wollaston) সপ্তধা বিশ্লেষিত সূর্য্যকিরণের বর্ণচ্ছত্রের মাঝে মাঝে ক্ষীণ সূত্রবৎ আলোকাভাব দর্শন করেন। (Fraunhofer) ফ্রাউনহফের তাহাই যত্নসহকারে অঙ্কিত (map) করেন—সেই অবধি এই সকল আলোক-বিহীন রেখা ফ্রাউনহফেরের নামে খ্যাত। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ফুকো (Foucault) দীপালোক হইতে ফ্রাউনহফেরের রেখা পাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তারপর যেদিন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রাসায়নিক বুনসেন্ (Bunsen) এবং কির্‌চ্‌হফ (Kirchhoff) সোডিয়াম বাষ্প (Sodium Vapour), তড়িত শিখা এবং আলোকবিশ্লেষণ-যন্ত্রের (Spectroscope or Spectrometer) মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া ফ্রাউন-হফেরের (Fraunhofer) D রেখা পাইতে সমর্থ হয়েন সেদিন শুধু অর্দ্ধবিস্মৃত ফুকো পরীক্ষার (Foucault experiment) পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়—সেদিন বিজ্ঞানজগতের একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন।

যেদিন দূর জ্যোতিষ্কের আলোকরশ্মি আলোকবিশ্লেষণ-যন্ত্রে (Spectroscope) প্রথম পরীক্ষিত হইয়াছিল সেই দিন নভোবিজ্ঞানশাস্ত্রের জন্ম। আর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাহার যৌবনে প্রথম পদার্পণ। আজও তাহার যৌবনই চলিতেছে।

একটি ছোট ছেলে আস্তে আস্তে ঠিক ঠিক সময়ে দোল্ দিয়া, একটি বড় দোল্‌নাকে বেশ জোরে অনেকটা দোল খাওয়াইতে পারে। সার জর্জ ষ্টকস্ বলেন, (Sir George Stokes) জড় জগতের সর্ব্ববিভাগেই ঐরূপ একটি নিয়ম আছে। আস্তে আস্তে ঠিক ঠিক সময়ে দোল্ দিলে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সেই দোলের শক্তি নিজেদের আয়ত্ত করিয়া লয়। অনেকগুলি তার একই সুরে (বিশেষতঃ একই গ্রামে) বাঁধা হইলে, একটি বাজাইলে অন্যগুলি আপনিই বাজিয়া উঠে। একটির স্পন্দন বাতাসকে আশ্রয় করিয়া অন্য তারগুলিতে লাগিলে, অন্য তারগুলি আস্তে আস্তে তাহা গ্রহণ করে। কিন্তু বেসুরা তার বাজে না।

আলোক শুধু ঈথর (Ether) তরঙ্গের খেলা। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর পরমাণু (হয়ত পরমাণুর পরমাণু—সূক্ষ্মাণু—তন্মাত্র পরমাণু—electrons) বিভিন্ন, অথচ নির্দ্ধারিত সময়ে তাহাদের স্পন্দনক্রিয়া সম্পন্ন করে। সূর্য্যরশ্মি হয়ত সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আসিবার রাস্তায় সূর্য্যের চারিদিকে কিঞ্চিৎ কম উষ্ণ সোডিয়াম বাষ্পের (Sodium Vapour এবং অন্যান্য বাষ্প) পরমাণুগুলিকে স্পন্দিত করিয়া কিঞ্চিৎ হৃতশক্তি হইয়া পড়ে। সোডিয়াম (Sodium) পরমাণু নিজেদের মত স্পন্দনগুলি নির্ব্বাচন করিয়া নিজস্ব করিয়া রাখিয়া দেয়, তাই আমাদের আলোকবিশ্লেষণ-যন্ত্রের (Spectroscope) বর্ণচ্ছত্রে (Spectrum) D রেখার অভাব। সূর্য্যকিনার পরীক্ষায়, বিশেষতঃ গ্রহণ-কালে, আবার সেই D রেখাই সুস্পষ্ট প্রবল হরিদ্রাবর্ণ রেখা দেখায়।

এতদিন আমরা আকাশপথে সৌর জগতের গতি ও পথ লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলাম। নক্ষত্রগুলিও স্থিরই ভাবিতাম, তাহারা এতই দূরে যে দুই চারি সহস্র বৎসরেও তাহাদের স্থানভ্রষ্ট হইবার বিশেষ পরিচয় লক্ষ্য করিতে পারি নাই। তাহাদের রাসায়নিক গঠনোপাদান (Chemical composition) তাপ চাপ পরিমাণ ইত্যাদি ভৌতিক অবস্থা চিন্তাবিজ্ঞানের বাহিরে, বরঞ্চ কবিকল্পনারই যোগ্য বিষয় বলিয়া ধারণা ছিল। অধুনা আলোকবিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষার ফলে শুধু যে সূর্য্যে পৃথিবীস্থিত অনেক মূলধাতুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে তাহা নয়, সূর্য্যপৃষ্ঠে আবার পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত মূলধাতুরও সন্ধান পাওয়া-গিয়াছে। করনিয়মের (Coronium) সন্ধান আজও পৃথিবীতে পাওয়া যায় নাই। সাধারণতঃ নক্ষত্রলোকের বর্ণচ্ছত্র জলজান বাষ্পের (Hydrogen) বর্ণচ্ছত্রের অনুরূপ, আবার অনেক তারকালোক সূর্য্যালোকের অনুরূপ।

নীহারিকা (Nebula) সমূহের বাস্তবতা সম্বন্ধে বহুদিনাবধি আমাদের নানারূপ ধারণা ছিল। দূরবীক্ষণ তাহাদের সম্বন্ধে আমাদিগকে স্থিরনিশ্চয় কিছু বলিতে পারে নাই—তাহারা এতই দূরে যে পুঞ্জীকৃত তারকা-সমষ্টি হইলেও তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়া দেখাইবার শক্তি দূরবীক্ষণের নাই। বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষায় কোন কোন নীহারিকা পূর্ণাবয়ব বর্ণচ্ছত্র দেখায়, তাই তাহারা অত্যধিক চাপপ্রযুক্ত গাঢ় পদার্থে গঠিত বলিয়াই অনুমান করা হয়। আবার অনেকগুলি শুধুই রেখা বর্ণচ্ছত্র (line spectra) দেখায়, তাই মনে হয় সেগুলি এখনও অতিশয় হাল্কা বাষ্পরাশি—নূতন সৌর জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বাভাস মাত্র।

বিজ্ঞান এতটা অগ্রসর হইয়াও আলোকবিশ্লেষণ-যন্ত্রের পূর্ণ ক্ষমতার পরিচয় পায় নাই। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়াম হগিনস্ (Sir William Huggins) জিলেটিন ড্রাই প্লেটে (Gelatine dry plate) জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বর্ণচ্ছত্রের ও বর্ণরেখার আলোকচিত্র (photograph) অঙ্কিত করিয়া রাখিতে আরম্ভ করেন। চক্ষু এবং দূরবীন যাহাকে ধরিতে পারে নাই এরূপ অনেক জ্যোতিষ্ক আলোকচিত্রে আস্তে আস্তে প্রতিভাত হইতে লাগিল। আলোকচিত্রে তাহাদের ক্রমবিকাশ এবং পূর্ণপ্রকাশ, স্থায়ী দলিল (as permanent records) রূপে নিত্য নূতন আবিষ্কার এবং তথ্য দেখাইতেছে। প্রত্যেক মানমন্দিরে প্রতিদিন এখনও এইরূপে আলোক-চিত্ররূপ দ'লল সংগ্রহ হইতেছে। ভারতে দেরাদুন (Dehra Dun) এবং কডাইকানাল (Kodai Kanal) মানমন্দির এক্ষণে একাজে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত্রিপার্শ্ব কাচ ব্যবহারে যে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায় তাহাতে অনেক দোষ আছে। কাচের দোষগুণের উপর বর্ণচ্ছত্রের অনেক বিষয়ে তারতম্য হয়। আমরা সবুজ চসমা পরিয়া সবই সবুজ দেখি, তাহার কারণ আমাদের চসমার কাচ বা পাথরের নির্ব্বাচনী শক্তির গুণে, বা দোষেই বলি, বিশেষ বিশেষ বর্ণের অভাব হইয়া পড়ে। তাই লাল চসমা পরিলে নীল জিনিস কালই দেখায়। আবার দ্রব্য-গুণের উপর বর্ণচ্ছত্রের বর্ণরেখার কমবেশী বিশ্লেষণত্ব, এমন কি বর্ণপর্য্যায় (order of the spectrum) পর্য্যন্ত, নির্ভর করে। তাই এবিষয়ে বড় গরমিল হইবার কথা। তবে সৌভাগ্যের বিষয় আধুনিক আলোকবিশ্লেষণ-যন্ত্রের এই সব দোষ নাই বরঞ্চ অনেক গুণ আছে।

যদি কোন আলোক পরাবর্ত্তনশীল ধাতব গাত্রে (reflecting metallic surface) সমান্তরালভাবে সমদূরবর্ত্তী দাগ (equidistant parallel lines) কাটিয়া দেওয়া যায়, তবে বিষমপরাবর্ত্তিত (diffracted) আলোকরশ্মি হইতে যে বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন হয়, তাহা অনেক বেশী পূর্ণাবয়ব (extended and fuller) এবং বর্ণরেখার স্থান (position of particular lines) সম্বন্ধে সহজ নিয়মাধীন। কিন্তু সমান্তরালভাবে সমদূরবর্ত্তী দাগ কাটিয়া দেওয়া বড় সহজ কথা নয়। কেন না দাগের অঙ্ক (number of the lines per unit length) বড় সহজ নয়—ইঞ্চিতে ১০ কি ১৫ হাজার বড় বেশী কথা নয়—যত বেশী হইবে এবং যত নিঁখুত হইবে ততই ভাল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে (Rowland) রাউলেণ্ড স্ক্রু (Screw) তৈয়ারি সম্বন্ধে উন্নতি সাধন করিয়া, অন্তর্গোলগাত্রে (concave surface) এরূপ নিখুঁত রেখা টানিবার সুবিধা করিয়া দেন। সেই হইতে সাধারণ আতশি (lens) কাচে নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ (refracting telescope) ব্যবহার করিবার আবশ্যকতা নাই। দ্রব্য-

গুণের উপর নির্ভর করিয়া বর্ণচ্ছত্রের আলোকচিত্র (photo) লইবার আর বাধ্যবাধকতা নাই। পরাবর্ত্তন দূরবীক্ষণ (refracting telescope) ব্যবহার করিয়া অন্তর্গোলগাত্র হইতে বিষমপরাবর্ত্তনজনিত বর্ণচ্ছত্র (concave grating spectrum) একেবারে আলোকচিত্রিত (directly taken on a photographic plate) করিয়া লইলে আর কোন গোল থাকে না। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে পৃথিবী স্থির ভাবে নাই, তাই নভোমণ্ডল যেন সর্ব্বদাই ঘূর্ণিপাক খাইতেছে। আলোকরশ্মি যাহাতে সর্ব্বদা একই ভাবে আসিয়া পড়িতে পারে তাহার জন্য আমাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে—কিন্তু তাহা খুব বেশী শক্ত কথা নয়।

বিষমপরাবর্ত্তনজনিত বর্ণচ্ছত্র, ত্রিপার্শ্ব কাচজনিত বর্ণচ্ছত্র হইতে শুধু যে বর্ণরেখাপর্য্যায় বিষয়েই (order of the spectral colours in the same spectrum) শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে—বিস্তার বিষয়েও অনেক শ্রেষ্ঠ। সাধারণ বর্ণচ্ছত্রে তাপচ্ছত্র (heat spectrum) দেখিতে গেলে নাই বলিলেই হয়। কিন্তু লেঙ্গলির (Langley) সূক্ষ্ম-সূত্র তাপপরিমাণ যন্ত্র (Platinum wire Barometer) সংযোগে বিষমপরাবর্ত্তন বর্ণচ্ছত্রে তাপচ্ছত্রের (heat spectrum) বিস্তার দৃশ্যচ্ছত্রের (Visible light spectrum) অনুরূপ দেখায়। আবার অন্যদিকে অদৃশ্য আলোকচ্ছত্র (activic spectrum) বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকচিত্র দিতে সমর্থ দেখা গিয়াছে। বস্তুতঃ ঈথর-তরঙ্গের শক্তির যে অংশ আলোকরূপে আমাদের চক্ষুতে প্রতিভাত হয়, তাহার তুলনায় অপরিমেয় তরঙ্গশক্তি অদৃশ্য অননুভূত রহিয়া যায়—তাহারই ক্ষুদ্র অংশ তাপরশ্মি, ফটোরশ্মি, কখনও বা তড়িত-রশ্মি রূপে আমরা আমাদের যন্ত্ররূপ চক্ষুতে অনুভব করিবার প্রয়াস পাই। বিজ্ঞানবিদ্ নিত্যই নূতন চক্ষু উদ্ভাবনে নিরত।

রেল এঞ্জিন যখন বাঁশী ফুঁকিতে ফুঁকিতে ষ্টেসনের সম্মুখীন হইতে থাকে, তখন তাহার স্বর যে গ্রামের যে সুরের শুনায়, সেই স্বরই আবার এঞ্জিন ষ্টেসন হইতে দূরবর্ত্তী হইতে থাকিলে নীচু সুরের (lower pitch) শুনায়। শব্দতরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং গাড়ীর বেগের অনুপাতে আমাদের কর্ণপটহে তরঙ্গাঘাত-অঙ্কের (frequency) উনিশ বিশ হয়। তাই সুরের ব্যতিক্রম শুনায়। তেমনি একটি তারকা যদি পৃথিবীর দিকে বেগে ছুটিয়া আসে বা পৃথিবীর দিক হইতে ছুটিয়া চলিয়া যায়, তবে আমাদের চক্ষুতে তাহার বর্ণব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। আলোক-বিশ্লেষণযন্ত্রে বর্ণরেখার বামে দক্ষিণে সরিয়া পড়িবার (displaced) কথা। দুই অবস্থার দুখানা আলোক চিত্র (photograph) পরীক্ষা করিয়া কোনও একটি বিশেষ বর্ণ-রেখার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং স্থানচ্যুতির অনুপাত হইতে তারকার গতিবেগ গণনা করা অসম্ভব নয়। ডপ্লারের (Doppler) এই সিদ্ধান্ত নভোবিজ্ঞানের আরও অনেক দুর্ব্বোধ্য এবং দুরূহ বিষয়ের আঁধার পৃষ্ঠা আলোকিত করিয়াছে!

পৃথিবী যেমন ২৪ ঘণ্টায় একবার করিয়া তাহার অক্ষের (axis) চারিদিকে ঘুরিয়া লয়, তেমনি সূর্য্যের অগ্নিগোলকও তাহার নিজ অক্ষের চারিদিকে সর্ব্বদাই ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে। সূর্য্যের বিভিন্ন প্রান্ত পরীক্ষায় ফ্রাউনহফেরের (Fraunhofer's lines) রেখার স্থানচ্যুতি হইতে স্পষ্টই উহা প্রতি-পাদিত হয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দ্বারা অপহৃত আলোকরেখার সেরূপ স্থানচ্যুতির কোন কারণ নাই, তাই সূর্য্যের এই ঘূর্ণীবেগ (velocity of rotation) গণনা করা সহজ হইয়া পড়ে।

মানব বহুদিন হইতে সূর্য্য-কলঙ্ক (solar spots) লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। অনেক ভৌতিক আকস্মিক অবস্থা-বিপর্য্যয় (terrestrial, magnetic, volcanic, &c. phenomena) সূর্য্য-কলঙ্ক আবির্ভাবের সমকালীন বলিয়া দৃষ্ট হয়। সূর্য্যে মহাঝঞ্ঝাবাত সূর্য্য-কলঙ্কের কারণ বলিয়া আমাদের বহুদিন হইতেই বিশ্বাস ছিল। অধ্যাপক হেইল (Professor Hale) সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রে C রেখার পরীক্ষা করিয়াও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ক হইতে ক পর্য্যন্ত সোজা ভাবে যে একটি আলোক-বিহীন অপেক্ষাকৃত মোটা রেখা দেখায় সে অংশ সূর্য্য-কলঙ্ক-প্রসূত। আড়াভাবে আলোকবিহীন রেখাগুলি ফ্রাউনহফের (Fraunhofer) রেখা। C রেখাটি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে সূর্য্য-কলঙ্ক অংশে একটি বিশেষ অংশ অতিশয় উজ্জ্বল। তাহার কারণ এই হইতে পারে যে
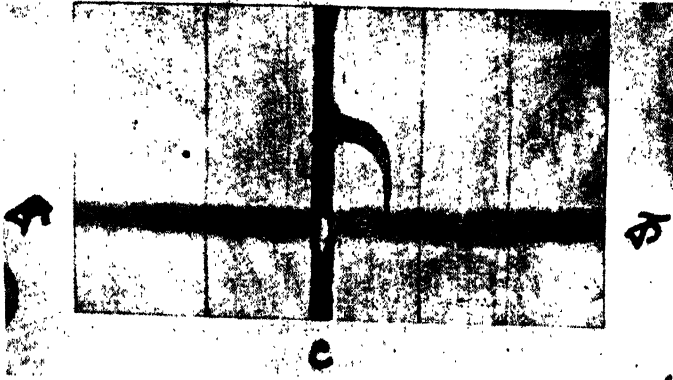
বর্ণচ্ছত্র

সূর্য্যগোলকের উপরিভাগে যে কিঞ্চিৎ ঈষদুষ্ণ জলজান বাষ্প (যাহারই নির্ব্বাচন ফলে C রেখার উৎপত্তি) রহিয়াছে, তাহারও উপরে কোন কারণ বশতঃ অতিশয় উষ্ণ বাষ্প সূর্য্য হইতেও উজ্জ্বলতর রশ্মি প্রেরণ করিতেছে।

সূর্য্য-কলঙ্ক-প্রসূত অংশের একটি বিশেষ অংশের মধ্য হইতে একটি আলোকবিহীন অংশ বহির্গত হইয়া সূর্য্যের অকলঙ্ক অংশের C রেখায় যাইয়া মিশিয়াছে। তাহার কারণ, সূর্য্যকলঙ্কের মধ্য হইতে জলজান বাষ্প অতি বেগে (গণনার ফলে প্রতি সেকেণ্ডে ১২০ মাইল) বহির্গত হইয়া ৩০ কি ৪০ হাজার মাইল দূরে এক অকলঙ্ক অংশে থামিয়াছে এবং তখন C রেখায় স্থিরভাবে বর্ত্তমান।

সূর্য্যগ্রহণকালীন সূর্য্য প্রান্ত হইতে অগ্নিশিখাবৎ লোল-জিহ্বার উজ্জ্বল রেখাচ্ছত্র (bright line spectra) পরীক্ষায় এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে দুই কি তিন শত মাইল বেগে প্রধাবিত প্রলয়প্রচণ্ড লোলজিহ্বা শুধুই সাধারণ তাপ বা চাপের বিপর্য্যয়ে প্রসূত নয়। সম্ভবতঃ সূর্য্যের অগ্নিগোলকের অভ্যন্তরীন বিকট উদ্গারশক্তি (explosive force) হইতে সম্ভূত।

যুগলতারকা (double star) এককেন্দ্র গতিতে আকাশে বিচরণ করে। দূরবীক্ষণ তাহাদিগকে, তাহাদের দূরত্বহেতু, বিভক্ত করিয়া দেখাইতে অসমর্থ, আবার কখনও কখনও যুগলতারকার একটি মাত্র জ্যোতিষ্মান। ইহার ফলে, কোন কোন তারকার জ্যোতির সাময়িক হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়। এইরূপ সাময়িক হ্রাস বৃদ্ধি গ্রহণ হইতেই সম্ভব হয়। কিন্তু যেখানে তারকাযুগলের গতি একে অন্যের গ্রহণ প্রতিপাদনে অক্ষম সেখানেও আলোকচিত্রে বর্ণরেখার বামে দক্ষিণে সাময়িক স্থানচ্যুতি তাহাদের অস্তিত্ব এবং প্রকৃতি প্রতিভাত করে। Algol (B Persei) এবং B Lyræ এই জাতীয় দুইটি যুগলতারকা।

ধীমান্ ক্লার্ক মেক্স্ওয়েল (Clerk Maxwell) অঙ্কশাস্ত্র-মতে এই মীমাংসায় উপনীত হন যে শনিগ্রহের চক্র (Rings of Saturn) অসংখ্য উল্কাসমষ্টিতে গঠিত। তাহা না হইলে, চক্রের বিভিন্ন অংশ কেন্দ্রদূরত্ব (radial distance) অনুযায়ী বিষম বেগহেতু (unequal velocity) এক অস্থায়ী অনিশ্চিত অবস্থায় (unstable equilibrium) থাকিয়া যাইত। কিলার (Keeler) শনি-চক্রের বিভিন্ন অংশের পরীক্ষায় দেখাইয়াছেন যে চক্রের অন্তরাংশ বহিরাংশ হইতে বেশী বেগে প্রধাবিত। যদি চক্র উল্কাসমষ্টি না হইয়া দৃঢ় ঘন পদার্থে গঠিত হইত তবে বেগপরিমাণ ঠিক বিপরীত দেখাইবার কথা।

সূর্য্য এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কের আলোকবিশ্লেষণ ব্যাপারে আমরা অনেক নূতন তথ্য অবগত হইলাম। বুনসেন (Busen) এবং কিরচহফ (Kirchhoff)এর ধারণা ছিল, এক একটি পরমাণুর স্পন্দন, যাহা হইতে আলোক-তরঙ্গের উৎপত্তি তাহা, একইরূপ স্পন্দনহেতু একইরূপ বর্ণচ্ছত্র উৎপাদন করে—বাহ্যিক অবস্থাভেদে তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না। দেখিয়াছি আসল কথা তত সহজ নয়। দেখিয়াছি পরমাণুর স্পন্দনব্যতিক্রম না হইলেও দৃষ্ট এবং দর্শকের গতিবেগের উপর নির্ভর করিয়া বর্ণ-রেখার স্থানচ্যুতি ঘটিতে পারে। তারপর ইহা হইতেও জটিল প্রশ্ন উপস্থিত আছে। আমাদের ধারণা ছিল জ্যোতিষ্মান বাষ্প কেবল সূক্ষ্ম রেখাচ্ছত্র দিতে সক্ষম, কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখিতে পাই বাষ্পের ঘনত্বের বা তাপ চাপ পরিমাণের উপর বর্ণরেখার বিস্তার (broading) এবং এমন কি স্থান পর্য্যন্তও নির্ভর করে। আবার চুম্বকশক্তির প্রয়োগে জিমেন (Zeeman) একটিমাত্র বর্ণরেখাকে দ্বিধা ও বহুধা বিভক্ত করিয়া আলোকের

তড়িতচুম্বকবাদমতের (Electro-magnetic theory of light) পোষকতা করিয়াছেন। আবার সামান্য অবিশুদ্ধি হেতু কোন কোন বস্তুর বর্ণচ্ছত্র একেবারেই লোপ পাইতে দেখা যায়। যে পথ আজ বন্ধুর তমসাচ্ছন্ন সেই পথই একদিন বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া সহজ হইবে।

লৌহবাষ্পের বর্ণচ্ছত্রে প্রায় দুই হাজার বর্ণরেখা দেখা যায়। এইরূপ অন্যান্য মূল পদার্থের (element) বর্ণরেখা পরীক্ষা করিলে, জটিলতা দেখিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইতে হয়। লেনার্ড, কেজার, রুঙ্গে, লকিয়ার (Lenard, Kayser, and Runge, Lockeyer) প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদেরা পরীক্ষা এবং গবেষণার ফলে দেখিয়াছেন যে একটি জটিল বর্ণচ্ছত্রকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক একটি বিভাগ কোন বিশেষ বিশেষ বাহ্য অবস্থাভেদে বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। যেমন সোডিয়াম বাষ্পের (Sodium vapour) তিনটি বিভাগ। তড়িতালোকের (Electric Arc flame) বহির্ভাগাংশে একবিভাগ, আবার অন্তরাংশে অবস্থাভেদে অন্য দুই বিভাগ প্রবল। বাদ্যযন্ত্রে কোন একটি সুর (fundamental note) ধ্বনিত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ নীচ গ্রামের (higher and lower pitch harmonies) অনেক সুর আপনিই বাজিয়া উঠে—তাহারই উপরেই স্বরের (timbre) মধুরত্ব নির্ভর করে। যন্ত্রের গঠনপ্রণালী এবং গঠনোপাদানের সহিত ইহা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। দুইটি বেহালার মূল্যের তারতম্য উহাতেই। স্বরগুলির মধ্যে কিন্তু একটি সহজ নিয়ম আছে—তাহাদের স্পন্দন-অঙ্কগুলি সেই আসল সুরের (fundamental note-frequency) স্পন্দন-অঙ্কের সঙ্গে বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ (simply related)। সেইরূপ কোন একটি বর্ণচ্ছত্রের এক বিভাগে রেখাগুলির তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও বিশেষ সহজ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দেখা যায়। সব তথ্য এখনও সহজবোধগম্য হয় নাই—এখনও ঘন আঁধার, শুধু একটু একটু অদৃশ্য আভা।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জেনসেন (Jansen) সূর্য্যগোলকের প্রান্তপ্রদেশে এবং গ্রহণকালীন প্রলয়প্রচণ্ড অগ্নিতুল্য বাষ্পশিখায় একটি নূতন হরিদ্রাবর্ণ রেখা দেখিতে পান। লকিয়ার এবং ফ্রেঙ্কলেণ্ড (Lockeyer and Frankland) উহা কোন, পৃথিবীতে তখনও অনাবিষ্কৃত, মূলপদার্থের (element) বর্ণরেখা অনুমান করিয়া ঐ মূলপদার্থটিকে হিলিয়াম (Helium সৌর্য্যেয় ?) আখ্যা দেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রেমজে (Ramsay, Sir William) পৃথিবীপৃষ্ঠে ইহার প্রথম সন্ধান পান। হিলিয়ামের আর একটি বর্ণরেখা সবুজ—তাহা অবস্থাভেদে কখন কখনও বিভক্ত হইয়া প্রবল দেখায়। কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে বর্ণরেখার এইরূপ বিশ্লেষণ পরমাণুর বিশ্লেষণত্বের পরিচায়ক। কিন্তু টমসন (Sir J. J. Thomson)এর মতে একই অণু দুই প্রকার পরমাণুতে বিশ্লেষিত হয় বলিয়াই এরূপ। একটি পরমাণু হইতে এক তড়িতকণা (electron—তন্মাত্র) ছুটিয়া যাইয়া অন্য একটিতে গ্রথিত হইয়া যায় বলিয়া, এই বস্তুর পরমাণু দ্বিত্ব ভাব ধারণ করিতে সমর্থ।

রেমজে এবং রদারফর্ড (Ramsay and Rutherford), রেডিয়াম ধ্বংসে, হিলিয়ামের উৎপত্তি প্রতিপন্ন করিয়া বিজ্ঞানজগতে এক নূতন বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। সূর্য্যে রেডিয়াম (Radium) বর্ত্তমান, ইহা যদিও আজ পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি রেডিয়াম ধ্বংসে হিলিয়মের জন্ম—আবার সূর্য্যে হিলিয়াম নিঃসন্দেহ বর্ত্তমান আছে দেখা গিয়াছে। শেষ কথা দুটি হইতে কি অনুমান করা যায় ?——আবার রেডিয়ামের ধ্বংসসময়ে উৎক্ষিপ্ত বিদ্যুৎকণা এবং রেডিয়াম ইমেনেসন (Radium emanation, and alpha, beta and gama rays) তরল বাষ্প এবং অন্যান্য অনেক বস্তুতে আঘাতের ফলে জ্যোতিকণা উৎপাদনে সমর্থ দেখা গিয়াছে। সূর্য্য হইতে রেডিয়াম-উৎক্ষিপ্ত এবং উচ্চতাপজনিত উৎক্ষিপ্ত বিদ্যুৎকণা (electrons or rays) পৃথিবীর উর্দ্ধতন বায়ুমণ্ডলে আসিয়া আঘাতের ফলে বায়ুমণ্ডলকে জ্যোতিষ্মান করিতে সমর্থ—ইহাই হয়ত Aurora Borealisএর কারণ।

সূর্য্যোত্তাপ সম্বন্ধে গণনার ফলে দেখা যায় যে সূর্য্যের তাপের পরিমাণ ৬০০০ ডিগ্রি (centigrade)। লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) প্রমুখ পণ্ডিতগণ সূর্য্যের তাপ-

বিকিরণ ক্ষমতা, এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠতল ও ভূগর্ভের তাপ ইত্যাদি বিষয়ের পরীক্ষার ফলে সূর্য্য এবং পৃথিবীর বয়স গণনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা ভূতত্ত্ববিদগণের (Geologist) ভূপৃষ্ঠের বিভিন্নস্তর এবং প্রাণীতত্ত্ববিদগণের (Biologists) ক্রমবিকাশবাদ হইতে গণনার ফলের সহিত একেবারেই গরমিল ছিল। (W. E. Wilson, Rutherford, Strutt) উইলসন, রদারফর্ড, ষ্ট্রাটপ্রমুখ বিজ্ঞানবিদগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে সূর্য্যে যদি ১০ লক্ষ ভাগে ২ কি ৩ ভাগ রেডিয়াম থাকে তাহা হইলেই, তাহার ধ্বংসজনিত শক্তি হইতে, সূর্য্যের সমস্ত তেজোবিকিরণ-ক্ষমতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। আবার পৃথিবীপৃষ্ঠে মৃত্তিকাতে যে পরিমাণ রেডিয়াম দেখা যায়, সেই পরিমাণ রেডিয়াম যদি ভূগর্ভের মৃত্তিকাতেও বর্ত্তমান থাকে, তবে ভূপৃষ্ঠের গাছপালা জীবজন্তুগণের বাসোপযোগী হইবার বয়স, কেলভিনের ১০০০ লক্ষ বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী হইতে পারে। ভূতত্ত্ববিদ এবং প্রাণীতত্ত্ববিদগণ ইহাতে তাঁহাদের মতের পোষকতা পাইতেছেন।

আমরা, জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বাভাস বাল্যাবস্থায়, একটি জ্যোতিষ্কে জলজান এবং হিলিয়াম বাষ্প প্রধান দেখিতে পাই। তারপর তাহার যৌবনে জ্যোতিষ্মান ধাতব বাষ্প প্রবল। তারপর ক্রমে বার্দ্ধক্যে নির্ব্বানোন্মুখ প্রদীপের লোহিত আভা। সর্ব্বশেষে যুগলতারকার অন্ধ সঙ্গীসম মৃতাবস্থা। তারপর—তারপর মৃত্যু হইতে জাগরণের আভাসও দেখিতে পাই।

হিপারকাস (Hipparchus), টাইকব্রাহি (Tycho Brahe), কেপলার (Kepler), ইঁহারা সকলেই কোন কোন তারকার হঠাৎ আবির্ভাব এবং তিরোভাব দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে Nova Aurigae নামে একটি তারকার আবির্ভাব দেখা যায়। নভোমণ্ডলের আলোকচিত্র পরীক্ষায় ডিসেম্বর এবং জানুয়ারীতে তাহার পূর্ব্বাভাস লক্ষিত হয়। তিন মাস পরে তাহার জ্যোতি ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া এপ্রিল মাসে প্রায় অদৃশ্য হইয়া যায়। তাহার কিছু পরেই আবার সেই স্থানেই ক্ষীণ আভা নীহারিকার আবির্ভাব দৃষ্ট হয়—কিন্তু তাহার বর্ণচ্ছত্র পূর্ব্ববর্ণচ্ছত্র হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে Nova Persei নামে আর একটি তারকা উদিত হয়। ষ্টনিহারসৃষ্টে (Stonyhurst) ফাদার সিডগ্রিভস্ (Sidgreeves), এবং লিক মানমন্দিরে (Lick Observatory) অধ্যাপক কেম্পবেল (Prof. Campbell) উহাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন। দিনে উহার জ্যোতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তারপর দশদিন ক্রমে উনিশ বিশ হইয়া ক্ষীণতর হইতে থাকে। শেষে নীহারিকার আবির্ভাব। দূরত্ব গণনার ফলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে ঐ ঘটনা তিনশত বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট আকবরের সময়কালীন। বর্ণরেখা পরীক্ষায় জ্যোতিষ্মান বর্ণরেখাগুলি লোহিতাংশের দিকে এবং অভাবিহীন বর্ণরেখাগুলি বিপরীত দিকে হেলিতে দেখা যাওয়াতে মনে হয় যুগলতারকার অন্ধ তারকাটি কোনরূপ আঘাতে জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিয়াছিল—তথাপি ঠিক কথা এখনও আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা এই অল্প কয়মাসের মধ্যেই দুইটি ধূমকেতুর আবির্ভাব দেখিলাম। তাহার একটি ৭৮ বৎসর পরে পরে বহু শতাব্দী হইতে মানবকে দেখা দিয়া আসিতেছে। হেলির (Haley) নামে এটি প্রসিদ্ধ। ধূমকেতুর পুচ্ছ আমরা সকলেই দেখিয়াছি। পুচ্ছটি সর্ব্বদাই সূর্য্য হইতে বিপরীত দিকে থাকে। পুচ্ছটির এই বিশেষ আকারের বিষয়ে আধুনিক মত দিয়া আজকার মত প্রবন্ধ শেষ করিব।

ক্লার্ক মেক্সওয়েল (Clerk Maxwell) এবং বর্ত্তমান সময়ে লারমর (Larmor) আলোকের তরঙ্গবাদ হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যে, কোন বস্তুর উপরে আলোকরশ্মি পতিত হইয়া অপহৃত (absorbed) হইলে বা পরাবর্ত্তিত হইলে সেই বস্তুর পৃষ্ঠদেশে একটি চাপ বোধ হইবার কথা। অধ্যাপক লিবেডেফ (Prof. Lebedef) এবং পরে নিকলস্ ও হাল (Nichols & Hull) এই সিদ্ধান্তের সত্যতা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন।

সূর্য্য যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা একটি ক্ষুদ্র কণাকে আকর্ষণ করিবে তেমনি আবার আলোকরশ্মির পতনহেতু বিপরীত শক্তি দ্বারা দূরে সরাইবার চেষ্টা

পাইবে। বস্তুর পরিমাণ (mass) এবং সেই হেতু ব্যাসার্দ্ধের ঘন ফলের (third power of the radius) উপর আকর্ষণ নির্ভর করে। অন্য দিকে পৃষ্ঠতলের বর্গফল বা ব্যাসার্দ্ধের বর্গের (second power of the radius) উপর বিপরীত শক্তি নির্ভর করে। এই কণাটি যতই ছোট হইবে ততই বিপরীত শক্তিটি বেশী অনুভূত হইবে। এমন কি কণার ব্যাসার্দ্ধ ০·০০০১ মিলিমিটর হইতে ছোট হইলে বিপরীত শক্তি প্রবলতর হইয়া কণাটিকে সূর্য্য হইতে দূরে নিক্ষেপও করিতে পারে। এই কারণেই পুচ্ছের ঐরূপ বিস্তার হইয়া পড়ে—কণা আকারে যত বড় তত সূর্য্যের সম্মুখীন থাকিতে পারে এবং যত ছোট তত দূরে যাইয়া পড়ে।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ।

আরংজীবের সৌভাগ্যের সূত্রপাত

(মডার্ন রিভিয়ু হইতে)

আরংজীব যখন মাত্র চৌদ্দ বৎসরের বালক, তখনই তিনি যে অসাধারণ বীরত্ব, সাহস, ধৈর্য্য, অকুতোভয়তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতেই জানা গিয়াছিল যে তাঁহার চরিত্র কেমন ধাতুতে গঠিত। সেই বয়সেই তাঁহার নাম ও খ্যাতি সারা ভারতবর্ষময় পরিব্যাপ্ত হইয়া মুখে মুখে কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে তারিখের প্রাতঃকালে সম্রাট শাজাহাঁ হাতীর লড়াই দেখিতেছিলেন। সুধাকর ও সুরতসুন্দর নামক দুইটি মত্ত হস্তী যমুনার তীরে লড়াই করিতেছিল। সম্রাট আগ্রা প্রাসাদের বারান্দা হইতে দেখিতেছিলেন। তিন জন শাহজাদা অশ্বপৃষ্ঠে লড়াইক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। আরংজীব ভালো করিয়া লড়াই দেখিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইতে হইতে একেবারে হাতীর সন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

হাতী দুটা শুঁড়ে শুঁড়ে জড়াজড়ি করিয়া টানাটানি করিতেছিল। হঠাৎ ছাড়া পাইয়া সুরতসুন্দর পলায়ন করিল। সুধাকর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সে প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে বিকট শব্দ করিয়া নিকটস্থ শাহজাদাকেই আক্রমণ করিল।

আরংজীবের বয়স তখন সবে চৌদ্দ বৎসর। সেই সঞ্চরমান পর্ব্বতের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। ঘোড়া না ভড়কায় এরূপ সতর্কতার সহিত তিনি নিজের জায়গাতেই স্থির হইয়া রহিলেন এবং নিজের বল্লম ফেলিয়া হাতীর মাথায় আঘাত করিলেন। হাতী আরো ক্রুদ্ধ হইয়া ছুটিয়া আসিল এবং দাঁত দিয়া তাঁহার ঘোড়াকে তুলিয়া ফেলিয়া দিল। ঘোড়া পড়িতে না পড়িতে আরংজীব লাফাইয়া পড়িলেন এবং তরবারি খুলিয়া হস্তীর সম্মুখীন হইলেন।

ততক্ষণে চারিদিকে হুলুস্থুল লাগিয়া গিয়াছে—চারিদিকে চেঁচামেচি, ছুটাছুটি; সকলের মুখেই ভয়ের কালিমা। দর্শকগণ পলায়ন করিতে গিয়া আরো গোল পাকাইয়া তুলিল, কে কোন দিকে পলাইবে ঠিক পায় না। ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি, গড়াগড়ি লাগিয়া গেল। আমীর ওমরাহ ও ভৃত্যগণ আর্ত্তনাদ করিয়া শাহজাদার সাহায্যের জন্য ছুটাছুটি করিতেছিল। কিন্তু সকলের চীৎকার হাতীকে আরো ক্ষেপাইয়া তুলিতেছিল। আতসবাজি ছাড়িয়া হাতীকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গেল।

হাতীর সহিত আরংজীবের অসম যুদ্ধ সাংঘাতিক হইত যদি আর একজন সাহসী শাহজাদা সাহায্য না করিতেন। সুজা ভিড় ও আতসবাজির ধোঁয়া ভেদ করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং ঘোড়া ছুটাইয়া গিয়া হাতীকে বর্শা দিয়া বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ঘোড়া ভড়কাইয়া পিছন পায়ে খাড়া হইয়া উঠিল এবং সুজা পড়িয়া গেলেন। এই সময়ে রাজা জয়সিংহও এক হাতে তাঁহার ভীত অশ্বকে কোনোমতে চালনা করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হাতীকে আঘাত করিলেন। সম্রাটও ততক্ষণে নিজের রক্ষিগণকে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে শাহজাদার প্রাণ রক্ষা হইল। পলাতক সুরতসুন্দর পুনরায় লড়াই করিবার ইচ্ছায় ফিরিয়া আসিয়া সুধাকরকে আক্রমণ করিল। কিন্তু সুধাকর বর্শার আঘাতে ও আতসবাজির বিভীষিকায় দমিয়া আসিয়াছিল। বিশ্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত শ্রান্ত সুধাকর সংগ্রামের আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া

আরংজীবের হাতীর সহিত লড়াই।

(ছবির বামপার্শ্বে অশ্বপৃষ্ঠে আরংজীব, ছবির উর্দ্ধদেশে সম্রাট শাজাহাঁ)

পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। সুরতসুন্দরও তাহাকে তাড়া করিয়া পিছু পিছু ছুটিল।

বিপদ নিরাকৃত হইল। শাহজাদারা রক্ষা পাইলেন। সম্রাট শাজাহাঁ আরংজীবকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার সাহসের প্রশংসা করিলেন। এবং তাঁহাকে "বাহাদুর" খেতাব ও প্রচুর খেলাত দিলেন। সভাসদেরাও বলাবলি করিতে লাগিলেন যে শাহজাদা "বাপকা বেটা"—সম্রাট শাজাহাঁও যৌবনকালে একটা বুনো বাঘকে তরোয়াল হাতে করিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন।

সম্রাটের উল্লাসের আবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তিনি আরংজীবকে তাঁহার অসমসাহসিকতার জন্য একটু ভৎর্সনা করাতে শাহজাদা জবাব করিলেন "এই অসম যুদ্ধে আমার জীবননাশ ঘটিলেও আমার লজ্জার কারণ কিছু ছিল না। মৃত্যু সম্রাটদেরও রেয়াত করে না—মরণ অপমান নহে। আমার ভাইয়েরা যেমন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন তাহাই বরং অপমান ও লজ্জার বিষয়।"

আরংজীবের এই শ্লেষাত্মক ইঙ্গিত দারা শিকোর প্রতিই লক্ষ্য করিয়া। কিন্তু এরূপ শ্লেষ করা আরংজীবের পক্ষে অন্যায় ও অযৌক্তিক হইয়াছিল। আরংজীব ও সুজার নিকট হইতে দারা দূরে ছিলেন, এবং তিনি ইচ্ছা করিলেও ভিড় ভেদ করিয়া আরংজীবকে সাহায্য করিতে আসিতে পারিতেন না, যেহেতু এত বড় একটা কাণ্ড তো নিমেষ মধ্যেই সংঘটিত হইয়া গিয়াছিল।

ইহার তিন দিন পরে আরংজীবের পঞ্চদশ জন্মদিন উপস্থিত হইল। সম্রাট সমগ্র দরবারের সম্মুখে শাহজাদাকে সোনার মোহর দিয়া ওজন করিয়া সেই অর্থ (৫০০০ মোহর) শাহজাদাকে উপহার দিলেন—আর দিলেন সেই হাতী সুধাকর ও দুলক্ষ টাকার অন্যান্য সওগাদ। এই ঘটনা উর্দ্দু ও পার্সী কবিতাতে কীর্ত্তিত হইল। সেই গাথা লিখিয়া রাজকবি সয়দাই গিলানি ওরফে বেদিল খাঁ ৫০০০ টাকা পুরস্কার লাভ করিলেন। সুজাও তাঁহার বীরত্বের জন্য প্রশংসিত ও সম্মানিত হইলেন। ৫০০০ সোনার মোহর দরিদ্রদিগকে দান খয়রাতে ব্যয়িত হইল।

এই ঘটনা হইতেই আরংজীবের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার ও

লক্ষ্মীর কৃপালাভের সূত্রপাত। পর বৎসর (১৬৩৪ সাল) তিনি কাশ্মীরের পরম রমণীয় লোকভবন পরগণা পুরস্কার পাইলেন। এই স্থান কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের ইতিহাসে সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ, ও মনোরম উৎসধারার জন্য বিখ্যাত। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি অন্যান্য শাহজাদার মতোই দৈনিক ৫০০ টাকা খরচ পাইতেন, কিন্তু এই বৎসর এই কিশোর বয়সেই তিনি দশহাজারী মনসবদার হইয়া প্রবীণ ওমরাহ-দিগের সমকক্ষতা লাভ করিলেন। রাজচিহ্ন লালতাম্বু ব্যবহার করিবার অধিকার দিয়া তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের দায়িত্বপূর্ণ শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করাও হয় এই সময়ে এবং এই কর্ম্মের উপযোগী যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার হাতেখড়ি দিবার জন্য ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বুন্দেলাদিগের সহিত যুদ্ধে পাঠানো হয়।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাগ্যচক্র

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে ফ্র্যাঙ্ক আসিয়া দেখিলেন ইভা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আছেন। তিনি ব্যথিত হইয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে ইভা?"

উত্তর দিতে প্রথমে ইভার একটা সঙ্কোচ ও দুর্ব্বলতা বোধ হইতে লাগিল;—প্রসঙ্গটা যে নিতান্ত সাঙ্ঘাতিক! কিন্তু তিনি নিজেকে শক্ত করিয়া লইলেন। তাহার সেই কোমল প্রাণের মধ্যে যতটুকু শক্তি ও দৃঢ়তা ছিল তাহার সবটাকে তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। তিনি অসহায়, পিতা তাঁহার পক্ষ লইলেন না, একলাই তিনি সংগ্রামে দাঁড়াইয়াছেন, এই কথা স্মরণ করিয়া নিজেকে খুব দৃঢ় রাখিবার জন্য সচেষ্ট রহিলেন।

একটা হতাশমিশ্রিত উত্তেজনার সহিত ইভা বলিতে আরম্ভ করিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! তোমার সঙ্গে আজ একটা বোঝাপড়া করে নিতে চাই। আমার সন্দেহটা যে মিথ্যা তা বুঝতে পারচি, কিন্তু মনকে তা স্বীকার করাতে পারচি না সেই জন্যে তোমার মুখ থেকে সত্য কথা শুনে নিয়ে নিঃসংশয় হতে চাই। কথাটাকে নিজের মধ্যে যতই চেপে রাখতে যাই ততই নিজেকে পীড়িত করে তুলি;—আর সহ্য হয় না। নিজের মুখে কথাটা তোমার সামনে তুলতে পারব না বলে বাবাকে বলেছিলুম তোমাকে বলতে, কিন্তু তিনি রাজি হলেন না,—হয় তো তিনি যা ভালো, বুঝলেন সেইটেই ভালো, কিন্তু আমার মন যে মানচেনা তাই নিজেই তোমায় জিজ্ঞাসা করচি।"

বাধ্য হইয়া কথাটা নিজমুখে বলিতে হইতেছে বলিয়া ইভার মনের মধ্যে তখনো কেমন একটা ক্ষোভ হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি সে দুর্ব্বলতা কাটাইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন,—"ফ্র্যাঙ্ক! তোমার সেই অভিনেত্রী! তারই কথা! সে কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারচি না।"

"কিন্তু ইভা! সে তো—"

"চুপ কর। সব কথা আগে বলে নি;—বাধা পেলে হয় ত আর পারব না বলতে।

"সর্ব্বদাই যে আমি তাকে কাছে কাছে দেখচি—তার গায়ের গন্ধ যেন নাকে এসে লাগচে, তার কণ্ঠস্বর সদাই যেন কানে বাজচে;—আমি কিছুতেই তার কথা ভুলতে পারচি না"—বলিতে বলিতে ইভা যেন ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। সেই যে কার দুটো কালো কালো চোখ, যাহা অনবরত তাহার কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা যেন তখন তাহার পানে কর্ক্কশভাবে চাহিয়া উঠিল,—সেই অলৌকিক কণ্ঠস্বরটা কানের পাশে গুমরাইতে লাগিল। তিনি যাহা বলিতেছেন, যাহা করিতেছেন, মনে হইল, তাহা যেন সেই কণ্ঠস্বর, সেই চক্ষু দুটারই প্ররোচনায়;—তাহারা যেন তাঁহার মুখ দিয়া তাহাদের নিজেদের কথা বলাইয়া লইতেছে। ইভার বোধ হইতে লাগিল সেই অন্ধকারের মতো দুটো কালো কালো চোখের তীব্র কটাক্ষ যেন তাঁহার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে!

তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ও! ফ্র্যাঙ্ক!" তাঁহার চক্ষু বহিয়া জল ঝরিতে লাগিল। পাছে এই দুর্ব্বলতায় সমস্ত কথাটা খুলিয়া বলিবার সাহস চলিয়া যায় সেই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বলিতে লাগিলেন—"না!—আমি তোমার মুখের উপর স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করব! কেন তুমি আমার কাছে অমন গম্ভীর

হয়ে থাক? কেন সব কথার স্পষ্ট জবাব দাও না? কিছু নয় বলে সব উড়িয়ে দাও কেন? বুঝেছি! সেই অভিনেত্রীটাকে এখনো তুমি ভালোবাসো—আমার চেয়েও ভালোবাস! এখনো তার কথা ভুলতে পারনি। সে তোমার জীবনসর্ব্বস্ব! সে তোমার সব! সে জন্য আমি ক্ষোভ করি না। কিন্তু কেন তুমি আমাকে ভালোবাসার ভান দেখিয়েছিলে? কেন আমার ভালো-বাসা অপহরণ করেছ? আমি বুঝতে পারচি তোমার মনে কোথায় বাধচে! সে তোমার প্রথম প্রণয়িনী! তাই সে প্রণয়ের মোহ, তা সে যতই ঘৃণ্য হোক্, হেয় হোক্, কাটাতে পারচ না। তাই আমার কাছে তুমি চুপ করে গম্ভীর হয়ে বিমর্ষ হয়ে থাক। বেশ! তাই যদি হয়, স্পষ্ট করে বল; একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাক। আমি তোমার মুখ থেকে না শুনে নিশ্চিন্ত হতে পারচি না। সন্দেহটা কিন্তু আমার মনের নিজস্ব সন্দেহ নয়—সে যেন কে আমার উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে। আমার মন, আমার বিশ্বাস তাকে যতবার প্রত্যাখ্যান করে ততবারই সে ফিরে ফিরে এসে আমাকে পীড়িত করে তোলে;—আমি কিছুতেই তার হাত থেকে মুক্তি পাচ্চি না। তাই তো তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই। আমি আর এ সংশয়ের যাতনা সহ্য করতে পারি না। ফ্র্যাঙ্ক তুমি একবার বল—যা হয় বল—না হয় বল যে আমি নির্ব্বোধ তাই অমন সব চিন্তা মনে স্থান দিই। বল, সত্য করে বল যে আমার সন্দেহ মিথ্যা;—তুমি তাকে ভালোবাস না, তার কাছে যাওনা—তুমি আমাকেই শুধু ভালোবাস।"

বলিতে বলিতে তাঁহার প্রাণের আবেগ, হৃদয়ের বেদনা মুখে যেন জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে মুখভাব দেখিয়া মনে হইল যে তিনি নিজের হৃৎপিণ্ডটাকে নিজের নখের দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন।

কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক সে সময়কার তাঁহার প্রাণের বেদনা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। ইভার কথায় তাঁহার সমস্ত শরীরটা একটা অমানুষিক রাগে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল;—এই রকম রাগ তাঁহার বহুদিন হয় নাই, যখন ছেলেমানুষ ছিলেন তখন এক-একবার হইয়াছে বটে! তাঁহার এ রাগ বড়ভয়ঙ্কর—তাঁহাকে কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য করিয়া তোলে—মনের আর সমস্ত ভাবকে দমন করিয়া সে প্রধান হইয়া ওঠে—তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। তাঁহার এই কথা মনে হইয়া রাগ হইল—ইভার একি অবিচার! আমার কথা, আমার আশ্বাস, আমার সরলতা সে বিশ্বাস করে না! আমি এমন কী করিয়াছি যাহাতে তাহার এত সন্দেহ! সে কি মনে করে আমার এতটুকু আত্মসম্মানবোধ নাই?—আমি মিথ্যাবাদী! রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল—তাঁহার চক্ষু দুটা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। দাঁতে দাঁত ঘসিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"ইভা! এ অসহ্য! তুমি আমাকে এত নীচ ভাবো স্বপ্নেও কখনো মনে করিনি! কি ভয়ঙ্কর! আমি তোমাকে বলেছি না—না—না—তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই; তবুও সেই কথাই আমায় বার বার জিজ্ঞাসা কর। আমি কি মিথ্যাবাদী যে আমার কথা বিশ্বাস কর না? কোনো দিন কোনো কথা তোমায় মিথ্যা বলেচি? আমি যখন বলি—না, তখন সেটা সত্যিই বলি—না! তবুও তোমার সন্দেহ! এ কি! সোজা কথা যেমন পড়ে রয়েছে সেই ভাবে সেটাকে নাওনা কেন? তুমি তো সবই জানো;—তোমার কাছে তো সবই খুলে বলেছি; তবুও বিশ্বাস কর না কেন? কে বল্লে আমি তার জন্যে মুখ বুজে গম্ভীর হয়ে থাকি? আমার মনে এতটুকু খুঁৎমুৎ নেই। আমি তোমাকে ভালোবাসি—তোমাকে পেলে আমি অনন্ত সুখী! কিন্তু ইভা, বলে রাখচি এমনি করে যদি চল তাহলে তোমার জীবনটাকে চিরদিনের জন্য অসুখী করে রাখবে এবং তার সঙ্গে আমায়ও অসুখী করবে!"

ইভা তাঁহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ফ্র্যাঙ্কের কথায় তাঁহার অভিমান উথলিয়া উঠিল। তিনি উদ্ধত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! ওকি! আমার উপর চোখ রাঙিয়ে কথা কও কি! কী এমন আমি বলেছি! যার জন্যে যা-না-তাই আমায় শুনিয়ে দিলে। আমি তো বলচি সন্দেহটা আমার ইচ্ছাধীন নয়—কে যেন জোর করে আমার মনের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। সে কথা তুমি বুঝলে না। তোমার হৃদয়টা কী পাষাণ!"

ফ্র্যাঙ্ক রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। কিন্তু

ইভার কথায় তিনি নিজেকে একটু সংযত করিবার চেষ্টা করিয়া ধীরভাবে বলিলেন—"কিন্তু ইভা আমি তো তোমাকে খুলে বলেচি!"

—"বলেছ বটে!"

—"আমার সে কথা অবিশ্বাস কর।"

—"এইটুকু অবিশ্বাস করি যে—"

—"আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর না!" এই বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক রাগে আত্মহারা হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

ইভা বলিলেন—"আমার কেবলই মনে হয় আমার কাছে কি একটা কথা তুমি গোপন করে রেখেছ!"

—"গোপন? কি গোপন করে রেখেছি?"

ইভার ঠোঁটের আগায় বার্টির নামটা আসিয়াছিল, কিন্তু বলিতে গিয়া আটকাইয়া গেল, তিনি ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

বার্টি যেন তাঁহাকে কেমন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; সে মন্ত্রের প্রভাব দমন করিয়া স্বাধীন ইচ্ছায় কিছু করিতে পারেন এমন ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ফ্র্যাঙ্কের সমক্ষে যখনই তিনি বার্টির নাম উল্লেখ করিতে যাইতেন তখনই কে যেন তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিত—এমন কি আজকের এই সঙ্গীন অবস্থায়—বার্টির নামটা করিলে যখন সমস্ত গোলমাল চুকিয়া যাইত তখনও তিনি সে নাম বলিতে পারিলেন না—এমনি বার্টির প্রভাব! তিনি জড়িতকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—"আমি জানিনা—আমি ঠিক বুঝতে পারচিনা কি তুমি গোপন করচ, কিন্তু একটা কথা যে গোপন করচ তা আমার মন বলচে—হয়ত সে অভিনেত্রীরই কথা হবে।"

-"কিন্তু আমি তো বলেছি যে সে—"

—"না, না, আমায় বলতে দাও" বলিয়া ইভা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—

"আমি জানি ওগো জানি—তোমরা পুরুষরা ওসবগুলোকে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দাও;—সে সব তোমাদের জীবনের অতীত রহস্য!—পৃথিবীসুদ্ধ লোকের তা ঘটে বলে তাকে তোমরা স্বীকার কর না—কিন্তু আমরা রমণীরা যে তাকে অস্বীকার করতে পারি না। তাই তুমি যাকে কিছু নয় বলচ, আমি তাকেই একটা-কিছু ঠাউরে, ভাবচি তা তুমি গোপন করে রেখেছ।"

—"আমি শপথ করে বলচি—"

—"আর তোমায় শপথ করতে হবে না—শপথ করে পাপের ভার কেন বাড়াচ্চো!" বলিয়া ইভা গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে বিশ্বাস তখন দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে;—স্পষ্টভাবে কিছুই ধরিতে পারিতেছিলেন না বটে কিন্তু তবুও কোনো সংশয়কে তিনি মনের মধ্যে আমল দিতেছিলেন না, কারণ তর্কের মাথায় মন এমন চড়িয়া উঠিয়াছিল যে সে স্পষ্টতার কোনো আবশ্যকই স্বীকার করিতেছিল না। তাই ইভা বলিতে লাগিলেন—"আর তোমায় শপথ করতে হবে না। আমি বেশ বুঝতে পারচি—আমার চারিদিকেই আমি সেটাকে অনুভব করচি!"

এই কথা শুনিয়া ফ্র্যাঙ্ক রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন—ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে ইভার পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"তাহলে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করচ না?—আমায় তুমি অবিশ্বাস কর!"

ফ্র্যাঙ্কের কথার স্বরে যে একটা উদ্ধত রাগের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল তাহাতে ইভা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কাহারো তিরস্কার সহ্য করিতে পারেন না। ফ্র্যাঙ্কও উত্তরোত্তর রাগিয়া উঠিতে লাগিলেন। মহা কাণ্ড বাধিয়া গেল! এতদিন এই প্রণয়ীযুগল হৃদয়ের সেই অংশটা দিয়া পরস্পরে মিশিতেছিলেন যেখানে তাঁহাদের ভাবের ঐক্য ছিল; কিন্তু আজ, তাঁহাদের ভিতরে যে বৈষম্য আছে তাহা জাগ্রত হইয়া উঠিয়া দুজনের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধাইয়া দিল,—প্রণয়ের বন্ধন টুটিয়া ফেলিবার পক্রম করিল!

ইভা ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—"হাঁ—তোমায় অবিশ্বাস করি—এই স্পষ্টই বল্লুম! তুমি আমার কাছে সে অভিনেত্রী সম্বন্ধে কোনো কথা নিশ্চয়ই গোপন করে রেখেছ! এ আমি স্থির জেনেছি—আমার হৃদয় থেকে সে সন্দেহ উঠচে, আমি তা অবিশ্বাস করি না। নইলে সে কথা আমি ভুলতে পারচিনা কেন? তার সঙ্গে যদি তোমার কোনো সম্বন্ধ নেই তবে আমার অন্তর থেকে সন্দেহ ওঠে কেন? নিশ্চয় তুমি তার জন্যে আমার কাছে মিথ্যা বলচ, গোপন করচ, প্রবঞ্চনা করচ।"

ফ্র্যাঙ্ক নিজের ক্রোধকে আর কিছুতেই ধারণ করিয়া

রাখিতে পারিলেন না—অপমানের একটা তীব্র জালা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি পাগলের মতো ছুটিয়া গিয়া ইভার হাতখানা সজোরে ধরিলেন—ইভা ভয়ে একটু পিছাইয়া গেলেন বটে কিন্তু নিজেকে ফ্র্যাঙ্কের কবল হইতে মুক্ত করিতে পারিলেন না—ফ্র্যাঙ্ক কঠিন হস্তে তাঁহাকে ধরিয়া রহিলেন ;—একটা বৈদ্যুতিক শক্তির তরঙ্গ ইভার শিরায় শিরায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বজ্রের মতো গর্জ্জন করিয়া ফ্র্যাঙ্ক বলিতে লাগিলেন—"ওঃ! কী নিষ্ঠুর তুমি! এমন জঘন্য চিত্ত কখনো দেখিনি! এত সন্দেহ? হৃদয় বলে জিনিষটা কি তোমার একেবারে নেই! এমন নির্ম্মম কথা বল কি করে? যে এমন সব কথা ভাবতে পারে তার মতো নীচ পাষণ্ড জগতে নেই। তুমি বলচ তোমার অন্তর থেকে সন্দেহ উঠচে ;—সে কেবল তোমার অন্তরটা সঙ্কীর্ণ বলে তাই! তোমার সমস্ত প্রকৃতিটা সঙ্কীর্ণতা, জঘন্যতা, নীচতা, নির্ম্মমতায় ভরা। আমি তোমায় চিনতে পারিনি। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধ ঘুচলো!—যাও!" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক ইভাকে হাতের এক ঝটকায় পার্শ্বস্থ সোফার উপর ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। ইভা চুপ করিয়া কড়িকাঠের দিকে আড়ষ্ট ভাবে চাহিয়া পড়িয়া রহিলেন। সে সময় তাঁহার মনে আর রাগ ছিল না, তিনি কেমন হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন—ব্যাপারটা কি ঘটিয়া গেল যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না

ফ্র্যাঙ্ক ইভার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ ও চোখের উপর দিয়া একটা মর্ম্মান্তিক ক্রোধ ও ঘৃণার ভাব খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইভার দেহসৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন ;—সেই শ্রীমণ্ডিত লাবণ্যময় ক্ষীণ তনুখানি যেন আবেশতন্দ্রায় অভিভূত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া আছে ; সূক্ষ্ম বস্ত্রের ভাঁজে ভাঁজে যুবতীসুলভ অঙ্গসৌষ্ঠব ও দেহ-রেখাগুলি কমনীয় হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, রেশমের মতো কেশগুচ্ছ লীলাভরে মাটিতে এলাইয়া পড়িয়াছে, বুকের উপর একটা আবেগ-স্পন্দনের ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে ;—ফ্র্যাঙ্ক তাহাই দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একটা অতৃপ্তির বেদনায় তাঁহার বুকটা ভরিয়া উঠিল ;—হায়, এ সমস্ত সৌন্দর্য্যকে তিনি স্বেচ্ছায় আজ ত্যাগ করিয়াছেন! আবার তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্য একটা ব্যাকুল বাসনা মনের ভিতর গুমরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার অপমানিত আত্মসম্মান ক্রোধে স্ফীত হইয়া বলিল—না না! তা কিছুতেই হইবে না! তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন, তার পর দ্রুতপাদক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইভা যেমন স্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন তেমনই পড়িয়া রহিলেন। একটা অস্পষ্ট বিস্ময়ের আবেগ তাঁহাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রাণের মধ্যে যেন ঘোর অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল। মিথ্যার প্রতারণায় সন্দেহের অন্ধতায় চালিত হইয়া তিনি যেন নিজের অজ্ঞাতসারে এক দুর্গম স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, হঠাৎ চোখ খুলিয়া গেলে দেখেন চারিদিক অন্ধকার, কেহ কোথাও নাই! তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না কি হইতেছে—তাঁহার হৃদয়ে কি গুরুতর আঘাত আজ বাজিয়াছে! আর কিছু ভাবিতেছিলেন না কেবল মনে হইতেছিল—এ কী অন্ধকার! চারি পাশে এ কী ঘোর অন্ধকার!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইহার পর, একটা মাস নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়া গেল। কিন্তু দুজনের মধ্যে ক্রমেই একটা বিরাট স্তব্ধতা জমিয়া উঠিতে লাগিল,—তীব্র দুঃখভারে দুজনেই নত হইয়া রহিলেন। তাঁহাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত তাহার সমস্ত খুঁটিনাটি লইয়া কেবল বিরসমণ্ডিত হইয়া রহিল। তাঁহাদের চারিদিকটা এমনি বিরসতায় ভরিয়া উঠিল যে সেখানে যে-কেউ, যা-কিছু রহিল তাহাই বিষণ্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিল! এমন কি বার্টি পর্য্যন্ত তাহা হইতে মুক্ত রহিল না। সে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, ব্যাপার কি! কেমন সহজে শীঘ্র সমস্ত ঘটিয়া গেল। সে? না! কখনো না! সে কিছুই করে নাই—তাহার ক্ষমতা কি যে সে কিছু ঘটাইয়া তুলিতে পারে! ঘটনাগুলি একটার ফলে একটা করিয়া ঘটিয়া গিয়াছে। যাহা হইয়াছে তাহা হইতই—কেহ বাধা দিতে পারিত না।

এখন সে নিশ্চিন্ত! আবার নির্ব্বিবাদে সুখে জীবন যাপনের সম্ভাবনায় তাহার সমস্ত ভাবনা নিমেষের মধ্যে

দূর হইয়া গেল। অখণ্ড শান্তিতে ও চূড়ান্ত বিলাসিতায় এখন তাহার দিন গুজরান হইতে পারিবে ;—আর ভাবনা নাই। কাজেই তখন বার্টির মনে পুনরায় ফ্র্যাঙ্কের প্রতি সেই পুরানো স্নেহ ভালবাসা জাগিয়া উঠিল; এখন বার্টি যখন ফ্র্যাঙ্কের সহিত কথা কহে তখন তাহার ক্ষীণস্বরের মধ্যে সত্যই একটা বেদনাভরা আন্তরিক সহানুভূতি থাকে!

ওঃ! প্রথম কয়দিন কি দুঃখই গিয়াছে! কিন্তু তবু আঘাতটা যে কত গুরুতর তাহা তখন বোঝা যায় নাই। তারপর রাগ ঠাণ্ডা হইয়া গেলে ফ্র্যাঙ্ক দুঃখে মুহ্যমান, বিস্ময়ে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এ কি হইল? কেন এমন হইল? কেমন করিয়া হইল? তিনি কিছুতেই এ রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারিলেন না। এমনি গোলমাল হইতে লাগিল যে তাঁহার মনে হইল এ যেন এমন একখানা বই কে তাঁহার সামনে ধরিয়াছে যাহার মধ্যের পাতা নাই, তাহাতে এমনি খাপছাড়া হইয়া গেছে যে বইয়ের লিখিত ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাইতেছে না! ইভার সন্দেহ, তাঁহার রাগ, এ দুটা কোথা হইতে কোন্ সূত্র ধরিয়া কেমন করিয়া আসিল তাহা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও তিনি ঠিক করিতে পারিলেন না। এ কি বিষম রহস্য! তাঁহার মনে হইল জীবনটা যেন শুধু একটা ধাঁধা—তাহার আগা গোড়া কিছু বোঝা যায় না! তিনি জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া এই জীবন-রহস্যের সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু কোনো কিনারা হইত না। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতেন না—দিনরাত্রি বাড়ির মধ্যে নিরিবিলি বসিয়া আপন মনে কেবল ভাবিতেন। ভাবিতে ভাবিতে সংসারের প্রতি কেমন একটা নির্লিপ্ত ভাব তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিতে লাগিল। আর কিছুর দিকে তাঁহার কোনো আকর্ষণ রহিল না—তখন সমস্ত দৃষ্টি তাঁহার নিজের জীবনের দিকে ফিরিল। এই সব-প্রথম তাঁহার জীবন, তাঁহার চরিত্র ভালো করিয়া অন্বেষণ করিবার অবসর পাইলেন—দেখিলেন, তিনি কি হীন, কি অব্যবস্থিত, তাঁহার সেই পুষ্ট সবল দেহকে জড়াইয়া কি জঘন্য দুর্ব্বলতা বিরাজ করিতেছে! তাঁহার মনে হইল—তিনি শিশু! শিশুর শক্তি লইয়া তিনি উন্মত্ত তরঙ্গের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যে ভৈরব ঝটিকা তাঁহার জীবনের সুখ শান্তিকে প্রবল বেগে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন! কি ধৃষ্টতা! সে কি তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিতে সম্ভব! তবে উপায়? উপায় নাই দেখিয়া ফ্র্যাঙ্ক নিরাশার বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। দুঃখটা এত অধিক হইয়া উঠিল যে তাহার সবটা তিনি অনুভব করিতে পারিলেন না,—মানুষের মনে এতটা শক্তি নাই যে সে অত দুঃখ ধারণ করিতে পারে।

সময়টা যখন এমনি নিরানন্দে কাটিতেছিল তখন দুই বন্ধু কাছাকাছি এক সঙ্গেই থাকিতেন;—ফ্র্যাঙ্ক এতদূর অভিভূত হইয়াছিলেন যে বাড়ির বাহির হইতে পারিতেন না, বার্টিও বাহির হইত না, সে সর্ব্বদা ফ্র্যাঙ্কের পাশে পাশে বিষণ্ণ মুখে ঘুরিয়া বেড়াইত। সে তখন সত্যই ফ্র্যাঙ্কের দুঃখে দুঃখিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে যে বুঝিয়াছিল ফ্র্যাঙ্ক তাহাকে আবার স্নেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—মধ্যে যে বাধা ছিল তাহা কাটিয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া ফ্র্যাঙ্ক এই ধাক্কাটা কাটাইয়া উঠিতে পারেন, কিসে তাঁহার প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসে এখন সে সেই চেষ্টাই করিতে লাগিল। পূর্ব্বের মতো আবার থিয়েটারে যাতায়াত, নাচ গানের মজলিস, ভোজের বন্দোবস্ত করিবার পরামর্শ দিতে লাগিল। কখনো বলিল চল দেশভ্রমণে বাহির হওয়া যাক; কখনো ফ্র্যাঙ্ককে একটা কিছু কাজ গ্রহণ করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সব চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। ফ্র্যাঙ্ক সে সব কথা কানেও তুলিলেন না—তাঁহার বিমর্ষতার অতলে সবই যেন তলাইয়া যাইতে লাগিল। কিছুতেই তাঁহার মনের নিরানন্দ দূর হইতেছিল না; তখন তাঁহার জীবনের মধ্যে একটিমাত্র সান্ত্বনা ছিল—তাহা বার্টির সঙ্গ, তাহার স্নেহময় পরিচর্য্যা! বার্টি তাঁহাকে আন্তরিকতার সহিতই যত্ন করিত যে! এখন তাহার স্বার্থসিদ্ধি হইয়াছে—দারিদ্র্যের ভয় আর নাই, তবে সে কেন আবার ফ্র্যাঙ্ককে তেমনি করিয়া ভালোবাসিবে না, ফ্র্যাঙ্কের এই দুঃখের দিনে কেন সে সমবেদনা ভোগ করিবে না। সে তো তাঁহাকে বরাবরই ভালোবাসে; ফ্র্যাঙ্কের উপর তাহার ভালোবাসা চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া যে সে তাঁহার শত্রুতা করিয়াছে তাহা তো নহে; সে কেবল নিজেকে দুঃখ দৈন্যের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য, চিরদিনের মতো বিলাসিতার মধ্যে

থাকিবার লোভে এই সব করিয়াছে! ভালোবাসা তাহার অটুট ছিল।

দিবারাত্র ফ্র্যাঙ্ককে এইরূপে দারুণ ভাবে দুঃখে অভিভূত দেখিয়া বার্টির প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিত, কি করিয়া সান্ত্বনা দিবে তাহার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিত—কতবার স্নেহের সহিত তাঁহার হাত দুখানি ধরিয়া বুঝাইতে যাইত, কিন্তু সান্ত্বনার কথা খুঁজিয়া পাইত না। সে বলিত—"স্ত্রীজাতিটাই বড় সঙ্কীর্ণচিত্ত, তাদের মধ্যে এতটুকু ভালো নাই, তাদের না আছে সত্যকার প্রেম, না আছে পবিত্র ভালোবাসা—কেবল হাবভাব ছলাকলায় তারা মানুষের মন ভোলায়—হৃদয় তারা নেয় না, হৃদয় তারা দেয় না—তারা একটা মস্ত প্রহেলিকার মতো, তাদের জন্যে জীবনটাকে ব্যর্থ করে ফেলা পুরুষমাত্রেরই অনুচিত। তার চেয়ে দেখো বন্ধুত্ব কী মহান্‌—রমণীর সাধ্য নেই সে মহত্ত্ব বোঝে—বন্ধুত্বের মধ্যে যে কী হৃদয়ের মিলন, কী আনন্দ, কী সৌন্দর্য্য, কী মঙ্গল, কী পরিপূর্ণতা রয়েছে তা কি তুমি বোঝ না? কেন একটা তুচ্ছ রমণীর জন্য পাগল হচ্ছ!" কথাটা বলিয়া বার্টি গর্ব্ব বোধ করিত—মনে করিত খুব একটা মহৎ আদর্শের কথা বলিয়াছে!

কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক ইভার প্রেমে এমনি তন্ময় হইয়া ছিলেন যে এ সকল স্তোক বাক্যের সার্থকতা তিনি খুঁজিয়া পাইতেন না, এ সকল কথা তাঁহার মনে এতটুকু সান্ত্বনা দিত না। তাঁহার মনের শোচনীয়তা দিন দিন ঘনাইয়া উঠিয়া তাঁহাকে একেবারে কাতর করিয়া ফেলিতেছিল। তিনি তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মনে মনে তাঁহাদের বিচ্ছেদ-সময়ের ঘটনাটার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনা করিতেন—কেমন করিয়া ইভার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইল! তিনি কি বলিয়াছিলেন, আর ইভাই বা তাহার কি উত্তর দিয়াছিলেন? যতই ভাবিয়া দেখিতে লাগিলেন ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল সমস্ত দোষ তাঁহার নিজেরই—ইভার সন্দেহের জন্য তিনি তাঁহাকে কি না কুবাক্য বলিয়াছেন! তাঁহার সেই সর্ব্বনেশে রাগের জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া উঠিল—পুরুষ হইয়া রমণীর প্রতি তিনি কি কুৎসিত দুর্ব্যবহার করিয়াছেন—বিশেষত সে রমণী তাঁহারই ইভা! এখন কি হইল? তাঁহার সহিত অনন্ত বিচ্ছেদ! ওঃ একথা মুখে আনিতে বুক ফাটিয়া যায়! তাঁহার সহিত আর কখনো সাক্ষাৎ হইবে না, তাঁহার সহিত জীবনের আর কোনো সম্পর্ক থাকিবে না, এ কথা চিন্তা করিতেও যে হৃদয় শতধা হইয়া যায়! সত্যই কি তাহাই হইবে! সত্যই কি সব শেষ—জন্মের মতো সব শেষ!

না—না—না—কখনো না! তিনি প্রাণ থাকিতে তা কখনোই হইতে দিবেন না—দৈবদুর্ব্বিপাকের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহার জীবনের অপহৃত সুখশান্তি তিনি ফিরাইয়া আনিবেন!

আর সে? সে কি করিতেছে? সেও কি তাঁহারই মতো এমনি মনকষ্টে আছে? সে কি এখনও তাঁহাকে সন্দেহ করে? সে সন্দেহ কি তাঁহার উন্মত্ত ক্রোধের তীব্র প্রতিবাদে দূর হইয়া যায় নাই? যদি গিয়া থাকে তবে—কিন্তু কেমন করিয়াই বা যাইবে? হায়! তাহা হইলে সে কি অননুমেয় যন্ত্রণাই ভোগ করিতেছে! সে তো তাহারই দোষ—কেন সে মিথ্যা সন্দেহ পোষণ করে, সে তাহার ভারি অন্যায়! তাঁহার রাগ, সে তো হইবারই কথা, এমন কথা শুনিলে কার না রাগ হয়—তাঁহার দোষ কি?

সেও কি আমাকে এইরূপ নির্দোষ মনে করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে? না, আমার দুর্ব্যবহারে, আমার নিষ্ঠুরতায় মর্ম্মপীড়িতা হইয়া জীবন্মৃত হইয়া আছে? সে অপমান সে ভুলিতে পারিতেছে না? তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন, কি তাঁহার মনের ভাব তাহা জানিবার জন্য ফ্র্যাঙ্কের মনে ব্যাকুল বাসনা জাগিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল এখনই গিয়া তিনি ইভার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন—তিনি যে প্রেমকে, স্বর্গের জীবনের যে আনন্দকে নিদারুণভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছেন আবার তাহা যাচিয়া আনেন। কিন্তু সে কি এত অপমানের পর আবার তাঁহাকে কাছে যাইতে দিবে!—তিনিই বা কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন! তবে একখানা চিঠি লিখিলে হয় না! কথাটা মনে পড়াতে ফ্র্যাঙ্কের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সে কী আনন্দ! পত্রের মধ্যে লেখা তাঁহার ক্ষমা-ভিক্ষার কাতর-ধ্বনি যখন ইভার হৃদয়-দুয়ারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে

তখন সে কী আনন্দ! তখন তিনি আর কখনোই পাষাণের মতো হইয়া চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিবেন না—ব্যাকুল প্রাণে নিশ্চয়ই তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া লইবেন! এই মনে করিয়া ফ্র্যাঙ্ক আবেগভরে পত্র লিখিতে বসিলেন—কিন্তু লেখাগুলা কিছুতেই তখন ঠিক হইল না—প্রাণের কাতরতা, হৃদয়ের নম্রতা কিছুতেই যেন তখন ফুটিয়া উঠিতে চাহিল না।

সমস্ত দিনটা তিনি পত্র-রচনায় ব্যাপৃত রহিলেন; কবি যেমন করিয়া তাঁহার কাব্যকে বিচিত্র রস, ছন্দ, ভাব ও কথায় উজ্জ্বল করিয়া তোলেন তেমনি করিয়া তিনি তাঁহার পত্র-রচনা করিতে লাগিলেন। শেষে যখন লেখা সমাপ্ত হইল তখন তাঁহার হৃদয় হইতে একটা গুরুভার যেন নামিয়া গেল, তাঁহার মনে হইল, যে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হারাইয়াছিলেন তাহা যেন আবার ফিরিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার এ চিঠিতে ইভার মনের সমস্ত সন্দেহ, গ্লানি, দ্বিধা যে ঘুচিয়া যাইবে সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না

তিনি আনন্দের এই আবেগ লইয়া তাঁহার বন্ধু বার্টির কাছে গেলেন। গিয়া তাহাকে সকল কথা বলিলেন;—ইভাকে চিঠি লেখার কথা, তাহাকে আবার যে ফিরিয়া পাইবেন সেই আশার কথা বলিলেন! ফ্র্যাঙ্ক মনের আনন্দে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত কথা কহিতেছিলেন—তাঁহার কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

বার্টি কিন্তু শুনিয়া একেবারে বসিয়া পড়িল, তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। হৃদয়ের ভাব তাড়াতাড়ি গোপন করিয়া সে তখন ফ্র্যাঙ্কের মুখের হাসির সহিত চেষ্টা করিয়া একটু হাসি মিলাইয়া তাঁহার আশাটাকে দৃঢ়তা দিবার জন্যই যেন কহিল—"না, আর কোনো ভাবনা নেই!" সে মুখে বলিল বটে "কোনো ভাবনা নেই", কিন্তু তাহার মনের মধ্যে যথেষ্ট ভাবনা জমাট হইয়া উঠিতে লাগিল! এবং কথাটা শেষ হইতে না হইতে তাহার কুঞ্চিত কেশের নীচে হইতে কপালটা দারুণ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল!

ক্রমশঃ

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র

(চাণক্য হইতে সঙ্কলিত)

আয়ুধগারাধ্যক্ষ নিরূপিত সময়ে এবং নির্দ্ধারিত বেতনে চক্র, অস্ত্র, কবচ, এবং যুদ্ধ, দুর্গনির্ম্মাণ বা দুর্গরক্ষা অথবা শত্রুর নগর বা দুর্গ নষ্ট করিবার উপযোগী অস্ত্র নির্ম্মাণে বহুদর্শী এবং নিপুণ কর্ম্মী নিযুক্ত করিবেন। ঐ সকল অস্ত্র ও যন্ত্রাদি উপযুক্ত স্থানে রক্ষিত হইবে। অস্ত্রশস্ত্রাদি সদাসর্ব্বদা একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে ও উহাতে রৌদ্রপ্রদান করিতে হইবে। যে সকল অস্ত্র আতপ বা বাষ্প লাগিয়া নষ্ট হইতে পারে এবং যাহারা কীটদষ্ট হইতে পারে, তাহাদের নিরাপদ স্থানে রাখিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের জাতি, রূপ, লক্ষণ, প্রমাণ, আগম, মূল্য এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পরীক্ষা করিতে হইবে।

"স্থিরযন্ত্র" (অচল)—সর্ব্বতোভদ্র (চক্রবিশিষ্ট শকট, ইহাকে ঘূর্ণন করা যাইত এবং ঘূর্ণনকালে চতুর্দ্দিকে প্রস্তর বিক্ষিপ্ত হইত); জামদগ্ন্য (তীর নিক্ষেপ করিবার জন্য বৃহৎ যন্ত্র); বহুমুখ (দুর্গোপরিস্থিত অট্টালিকা হইতে চতুর্দ্দিকে তীর নিক্ষিপ্ত হইত এবং তীরন্দাজদিগের আশ্রয়ের জন্য চর্ম্ম-আচ্ছাদন ব্যবহৃত হইত। যাহারা মেগাস্থিনিস-বর্ণিত পাটলিপুত্রের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন তাহারাই জানেন যে পাটলিপুত্র নগরীর প্রাচীরের উপর এইপ্রকার ৫৭০টী অট্টালিকা ছিল); বিশ্বাসঘাতী (দুর্গের পরিখার উপর স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ড; শত্রু এই কাষ্ঠখণ্ডোপরি আরোহণ করিলেই ইহা ভগ্ন হইত); সঙ্ঘাটী (অট্টালিকা এবং দুর্গের অন্যান্য স্থানে অগ্নি দিবার জন্য ব্যবহৃত দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড); যানক (চক্রোপরি স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ড; ইহা শত্রুর প্রতি প্রক্ষিপ্ত হইত); পর্য্যনক (অগ্নি নিবারণের জন্য জল-যন্ত্র); অর্দ্ধবাহু (যুগলস্তম্ভ; ইহা এরূপভাবে প্রস্তুত ও স্থাপিত হইত যে শত্রুকে দলিত করিবার জন্য ইচ্ছানুসারে ভূমিসাৎ করা যাইত); ঊর্দ্ধবাহু (উচ্চে স্থিত বৃহৎ স্তম্ভ; আবশ্যক অনুসারে শত্রুর গতিরোধার্থ নিক্ষেপ করা হইত)।

"চলযন্ত্র" (চলনশীল)—পঞ্চালিক (পেরেক সমন্বিত বৃহৎ কাষ্ঠফলক; শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য ইহা

জলপূর্ণ পরিখার মধ্যে স্থাপিত হইত); দেবদণ্ড (দুর্গ-প্রাচীরে স্থাপিত পেরেক সমন্বিত বৃহৎ কাষ্ঠদণ্ড); সুকরিক (তুলা বা পশমপূর্ণ থলিয়া); মুষল (খদিরবৃক্ষ নির্ম্মিত তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড); যষ্টি (দীর্ঘ দণ্ড); হস্তিবারক (হস্তীর গতি প্রতিহত করিবার জন্য তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ দণ্ড); তালবৃন্ত (পাখার ন্যায় চক্রাকার যন্ত্রবিশেষ); মুদ্গার, গদা, স্পৃক্তল (অনেকগুলি তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড); কুদ্দাল (কোদাল); অস্ফটিম (শব্দোৎপাদনের জন্য চর্ম্মথলি ও দণ্ড); উদ্‌ঘাটিম (অট্টালিকা ধ্বংস করিবার জন্য যন্ত্রবিশেষ); শতঘ্নি (দুর্গপ্রাচীরের উপরে স্থিত তীক্ষ্ণাগ্র স্তম্ভ); ত্রিশূল; এবং চক্র।

হলমুখী (লাঙ্গলের মুখের ন্যায়); শক্তি (চতুঃহস্ত পরিমিত ধাতব অস্ত্র); প্রাস (চব্বিশ অঙ্গুলি পরিমিত এবং দুটী হাতলবিশিষ্ট অস্ত্র); কুন্ত (৫, ৬ কি ৭ হস্ত দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড); ভিণ্ডিবাল (গুরুভার বিশিষ্ট দণ্ড); হাটক (ত্রিধারযুক্ত দণ্ড); শূল; তোমর (দণ্ডান্বিত লৌহময় অস্ত্র); বরাহকর্ণ (বরাহের কর্ণের আকারের অস্ত্র); কণয় (ধাতব দণ্ড, ইহার উভয়দিক ত্রিকোণাকার); ত্রাসিক (প্রাসের ন্যায় অস্ত্র)।

ধনুক;—তাল, চাপ (বংশবিশেষ), দারু এবং শৃঙ্গ নির্ম্মিত ধনুককে যথাক্রমে কার্ম্মুক, কোদণ্ড, দ্রুণ এবং ধনু বলা হয়।

জ্যা—মোরব্বা, অর্ক (আকন্দ), শণ, গবেধু (তৃণ-ধান্য) এবং স্নায়ু দ্বারা জ্যা প্রস্তুত হয়।

তীর—বেণু, শর, শলাকা, দণ্ডাসন এবং নারাচ এই কয় প্রকার তীর প্রস্তুত হয়। তীরের মুখ লৌহ, অস্থি বা কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইবে।

তরবারি—নিস্ত্রিংশ (বক্র হাতলবিশিষ্ট তরবারি), অসিযষ্টি (দীর্ঘ এবং তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট তরবারি), মণ্ডলাগ্র (এই তরবারির উপরে চক্র থাকিত), এই কয় প্রকার তরবারি প্রচলিত আছে। গণ্ডার বা মহিষের শৃঙ্গ, হস্তীদন্ত, কাষ্ঠ অথবা বংশদণ্ডের মূল দ্বারা তরবারির হাতল নির্ম্মিত হওয়া উচিত।

ক্ষুরকল্প (ক্ষুরের ন্যায়), পরশু (সওয়া হস্ত পরিমিত, অর্দ্ধচন্দ্রাকার অস্ত্র), কুঠার, পট্টিশ (পরশুর ন্যায় কিন্তু উভয় দিকই ত্রিশূলের মত), খনিত্র, কুদ্দাল, চক্র এবং কাণ্ডচ্ছেদন (বৃহৎ কুঠার)।

অন্যান্যপ্রকার আয়ুধ—যন্ত্রপাষাণ (প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য যন্ত্র), গোষ্পণ-পাষাণ (প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য দীর্ঘ দণ্ড), মুষ্টিপাষাণ (মুষ্টি দ্বারা নিক্ষিপ্ত প্রস্তর), রোচনী এবং প্রস্তর।

কবচ—লৌহজালিক (মস্তক, হস্ত এবং শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রক্ষার জন্য আবরণ), পট্ট (হস্ত ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অঙ্গের আবরণ), কবচ, সূত্রক (কোমর ও নিতম্ব রক্ষার্থ)। এই সকল লৌহে বা হস্তি গো গণ্ডারের চর্ম্মে অথবা খুর বা শৃঙ্গে নির্ম্মিত হইবে।

শিরস্ত্রাণ, কণ্ঠত্রাণ, কূর্পাস (শরীর রক্ষার জন্য), কঞ্চুক (হাটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত), বারবাণ (পাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঙ্গরাখা), পট্ট এবং নাগদরিক (দস্তানা)—এই কয়েক-প্রকারের কবচও ব্যবহৃত হয়।

আবরণী—বেরি (লতানির্ম্মিত মাদুর), চর্ম্ম, হস্তিক (সর্ব্বাবয়ব রক্ষা করিবার জন্য), তালমূল (কাষ্ঠনির্ম্মিত ঢাল), ধমনিক (শিঙ্গা), কবাট (কাষ্ঠফলক), কিটিক (চর্ম্মনির্ম্মিত আবরণ), অপ্রতিহত (হস্তীর আক্রমণ প্রতিহত করিবার যন্ত্রবিশেষ), এবং বলাহকান্ত (অপ্রতি-হতের ন্যায়, তবে ইহাতে ধাতব পাত থাকিত)—এই সকল যন্ত্র আত্মরক্ষার্থ ব্যবহৃত হইত।

উপকরণ—হস্তী, রথ, অশ্বের অলঙ্কার এবং তাহাদের যুদ্ধকালীন প্রেরোচিত করিবার জন্য অঙ্কুশ—ইহারাই উপকরণ শ্রেণীভুক্ত।

উপরোক্ত যে সকল আয়ুধের বর্ণনা করা হইয়াছে তদ্ব্যতীত নিপুনশিল্পী যে সকল নূতন নূতন অস্ত্র নির্ম্মাণ করিবে তাহাও আয়ুধাগারে রাখিতে হইবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

বার্দ্ধক্যের চিকিৎসা

পূর্ব্বেই একথা বলিয়া আসিয়াছি যে আমাদের আয়ু যে শত বৎসরেরও অনেক অধিক তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নানা দৃষ্টান্ত হইতেই এই তথ্যে উপনীত হওয়া গিয়াছে। সংগৃহীত বিবরণ হইতে একথা বেশ জোরের সহিতই বলা

যাইতে পারে যে, সাবধানতা অবলম্বন করিলে আমরা একশত বৎসরের অনেক অধিক কাল বাঁচিতে পারি। কিন্তু কয়জন শত বৎসর পর্য্যন্তও বাঁচে? কেন এত অকাল-মৃত্যু ঘটে? দার্শনিক পণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকই বহুদিন হইতে এই প্রশ্নটির উত্তরের অভাব বোধ করিয়া আসিতেছেন।

অনেকে বলেন, অকালমৃত্যুর প্রধান কারণই মৃত্যুভয়। মানুষ একটা বিশেষ বয়সে উপস্থিত হইলে কিম্বা একটী বিশেষ মানসিক অবস্থা লাভ করিলে স্বতঃই মৃত্যুর কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। তখন হইতেই সে এই কথাটায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বসে যে, সে ভবসমুদ্রের কিনারায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, শীঘ্রই তাহাকে পাড়ি দেওয়া শেষ করিতে হইবে। এই সময় হইতেই সে আপনার চারিদিকে একটা বিকট মৃত্যুরাজ্য কল্পনা করিয়া লইয়া চিত্তের বল হারাইয়া ফেলে। অনেকে এই মৃত্যুভয়ের সহিত সংগ্রামও যে না করে তাহা নহে কিন্তু এ সংগ্রামে জয় লাভ করে অতি অল্প লোকেই।

যে সকল ব্যক্তি এইরূপ মানসিক অবস্থা লাভ করে তাহারা কেবলই মৃত্যুর কথা মনে মনে তোলাপাড়া করে ও মৃত্যুভয়ে অতি ভীত হইয়া শেষে মৃত্যুর দিকেই দ্রুত অগ্রসর হয়। ভীতি তাহাদের আহার ও পরিপাকশক্তি কমাইয়া দেয়। তাহাদের স্নায়বিক বল কমিয়া যায় এবং বাহির হইতে তাহাদের যত বলই পাওয়ার সম্ভাবনা থাকুক না কেন কোনো কিছুই কাজে আসে না।

৭০ বৎসর বয়সের কোনো লোকের মনে যদি কেহ এই ধারণাটি জন্মাইয়া দিতে পারে যে, সে আজো বৃদ্ধ হয় নাই, তাহা হইলে সে ব্যক্তির আরো ৭০ বৎসর বাঁচিবার সম্ভাবনা জন্মিবে।

যুদ্ধে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীত হয় তাহারাই সর্ব্বাগ্রে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহারা এই মৃত্যুর কথাই ভাবে, স্বপ্ন দেখে, যেন তাহাকেই খুঁজিয়া বেড়ায়, এবং মৃত্যু তাহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়া তাহাদের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকে। যুদ্ধে মৃত সৈন্যদের মুখে যে একটা ভীতির চিহ্ন দেখা যায় এই মৃত্যুভীতিই হয়তো তাহার কারণ।

শতাতীতজীবী কিম্বা যাঁহারা শত বর্ষের কাছাকাছি বাঁচিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে খবর লইলে, তাঁহারা জীবনের শেষটাকে কি এক উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। একজন শতাতীতজীবী, তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন কিনা জিজ্ঞাসা করায়, উত্তর দিয়াছিলেন—

"আমি শত বৎসর বয়সে মৃত্যুকে যেরূপ ভয় করিতাম ষাট বৎসর বয়সেও সেইরূপই করিতাম; এবং ষাট বৎসর বয়সে আমার যতটুকু মৃত্যুভয় ছিল, ২০ বৎসর বয়সে, যৌবনকালেও ততটুকুই ছিল, আমি কোনো দিনই মৃত্যুকে ভয় করি নাই। আমি সকল সময়েই সৎভাবে জীবন কাটাইতে চেষ্টা করিয়াছি এবং সকল সময়েই হৃদয়ে এই আশা পোষণ করিয়াছি যে মৃত্যু যথাসময়েই উপস্থিত হইবে এবং সে আমার নিকট কষ্টদায়কভাবে আসিবে না।"

মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা দীর্ঘায়ুলাভের একটা উপায়। যাহারা কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া জীবন যাপন করেন এবং অকারণ মৃত্যুচিন্তায় অভিভূত হইয়া আয়ুক্ষয় না করেন, তাঁহাদের দীর্ঘায়ু লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

শুনিতে পাই, পুরাকালের লোকেরা চিরযৌবনের উপায় খুঁজিয়া বেড়াইত। এমন কোনো একটা পদার্থ তাহারা খুঁজিত যাহা ব্যবহার করিলেই আর যৌবন হারাইবার ভয় থাকে না। বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য এরূপ চেষ্টায় শক্তিক্ষয় করিবার পাত্র নহেন। তাঁহারা বার্দ্ধক্যের কারণগুলি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া লইয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন যে বার্দ্ধক্যকে লোকে যতটা ভয় করে উহা ততটা ভয়ের কারণ নহে। বার্দ্ধক্য যে অবশ্যম্ভাবী তাহা সত্য, কিন্তু তাহার আগমনকে পিছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

কথাটিকে আরো স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য বিষয়টিকে লইয়া আরো একটুকু বিশদভাবে আলোচনা করা যাউক।

আমাদের রক্তে লোহিতবর্ণের অতি সূক্ষ্ম গোলাকার এক প্রকার পদার্থ বর্ত্তমান আছে, তাহাই রক্তকে লাল করিয়াছে এবং তাহাই আমাদের শরীরের পেশীসমূহের অভ্যন্তরে নিশ্বাস দ্বারা গৃহীত বায়ু হইতে অম্লজান নামক গ্যাস বহন করিয়া লইয়া গিয়া পেশীগুলিকে সজীব রাখে। ইহা ভিন্ন বাহির হইতে আহার ও নিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের শরীরের মধ্যে যে সকল বিষাক্ত বীজাণু প্রবেশ করে

সেগুলি যাহাতে আমাদের শরীরের কোন ক্ষতি করিতে না পারে এজন্য তাহাদের শক্তিকে প্রতিহত করাও এই লোহিতবর্ণের কণিকাগুলির আর একটি কাজ। এই দিক দিয়া দেখিলে এইগুলি যে আমাদের পেশীগুলির পক্ষে বড়ই হিতকর তাহাতে কোনো সন্দেহই নাই। কিন্তু এই কণিকাগুলির মধ্যে দুই রকমের কণিকা দেখা যায়—একদল সম্পূর্ণরূপে পেশীগুলির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; আর একদল একদিকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াও আর একদিকে শত্রু। বাহিরের বীজাণু যখন পেশীকে আক্রমণ করে তখন এই দুই দলই একত্র হইয়া বীজাণুর সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু এই দুইটির দ্বিতীয় দল শত্রু ধ্বংস করিতে গিয়া পেশীগুলিকেও ক্ষয় করিয়া ফেলে। এই রাক্ষুসে দল-টিকে মাইক্রোফেগাস্ (microphagus) বা অম্বুভুক্-দল নাম দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ-বিগ্রহই যেন ইহাদের স্বভাবগত। তাই যখন কোনো বীজাণুর সহিত যুদ্ধ করিতে না পায়, স্বভাবদোষে এগুলি অন্তর্যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া স্বজাতিকেই গ্রাস করিবার চেষ্টা করে। মাইক্রোফেগাস্গুলি পেশীগুলিকে ক্ষয় করিয়া আমাদের শরীরে বার্দ্ধক্য আনয়ন করে। পেশীগুলিকে এই দুর্দ্দান্ত শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই বার্দ্ধক্যের আগমনকে বাধা দিবার একটা উপায় পাওয়া যায়।

এম্, মেশ্নিকফ্ এই বিষয়ে অনেক তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি মাইক্রোফেগাস্গুলিকে বিনাশ করিবার ঔষধ আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা যে একেবারেই ফলবতী হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু তিনি যে ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা আদৌ কার্য্যোপযোগী হয় নাই, কারণ তাহা ব্যবহার করিলে দুষ্ট মাইক্রোফেগাসের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক অম্লজানবাহী অপর রক্তকণিকার দলটিও বিনাশ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে; কাজেই ইহাতে সুফল পাওয়া তো দূরে থাক, কুফল ফলিবার সম্ভাবনাই অধিক। রোগ নষ্ট করিয়া রোগীকে বাঁচাইবার জন্যই ঔষধের প্রয়োজন; যাহাতে রোগের সঙ্গে সঙ্গে রোগীও বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহা তো ঔষধ নহে, তাহা বিষ! মাইক্রোফেগাস্-গুলিকে নষ্ট করিতে গিয়া যেগুলি না থাকিলে আমরা বাঁচি না যদি সেগুলিই নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে আর কি হইল? তাই মেশ্নিকফের চেষ্টা ফলবতী হইয়াও কার্য্যকরী হয় নাই।

ফ্রান্সের প্যাষ্টিউর সমিতিতে আর একদিক হইতে এই বিষয়ের চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের সকল বয়সেই আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে মাইক্রোফেগাস্ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু সকল সময়েই তেমন প্রবলভাবে থাকিতে পারে না। যৌবনে যখন পেশীগুলি সবল থাকে তখন মাইক্রোফেগাস্ হইতে তাহাদের কোনো ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকে না। মাইক্রোফেগাস্গুলিকে বিনাশ করার পরিবর্ত্তে যাহাতে পেশীগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া বিনাশের মুখে অগ্রসর না হয় এরূপ কোনো ব্যবস্থা করিতে পারিলে বার্দ্ধক্যকে বাধা দিয়া রাখা যাইতে পারিবে। প্যাষ্টিউর সমিতির বৈজ্ঞানিকেরা এই পথেই বার্দ্ধক্যের চিকিৎসার আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইহাঁদের চেষ্টা ফলবতী হইলে আমরা এই একটী উপায়েই দীর্ঘায়ুর সংস্থান করিয়া লইতে পারিব বলিয়া আশা হয়। অবশ্য মৃত্যু রহিত করা যে কোনো দিনই সম্ভব হইবে না তাহাতে কোনো ভুল নাই। কাল সমস্ত পদার্থকেই ক্ষয় করে, আমাদের শারীরযন্ত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশগুলির তো কথাই নাই। কালের হস্ত হইতে কি নিস্তার পায়? বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী তাহাতে সন্দেহই নাই, কিন্তু বিজ্ঞানের করুণায় যদি বার্দ্ধক্যের আগমনকে পিছাইয়া দিয়া আমাদের আয়ুকে দীর্ঘতর করিয়া লইতে পারা যায় সেটাই কি কম?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কেরোসিনের উৎপত্তি

ঘরে আলো জ্বালার কাজে অল্পদিন হইতে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া কেরোসিনকে নূতন জিনিস বলা যায় না। চীন, গ্রীস্ ও রোমের অতি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কেরোসিনের উল্লেখ আছে। সাধারণ তৈল বা চর্ব্বির পরিবর্ত্তে ইহা প্রদীপে ব্যবহৃত হইত বলিয়াই বোধ হয় অনেকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে কেরোসিন্ পাওয়া যায় না, এই জন্যই মনে হয় আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহার

বিশেষ উল্লেখ নাই। ভারতবর্ষের অতি নিকটে ব্রহ্মদেশে কয়েকটি কেরোসিনের খনি আছে। বহুদিন এগুলি অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল। আজ কয়েক বৎসর হইতে কতকগুলি ইংরাজ-কোম্পানি এই সকল খনি হইতে তৈল উঠাইয়া কেরোসিন্ প্রস্তুত করিতেছেন। মাটি হইতে যখন উঠানো যায়, তখন জিনিসটাকে ঠিক কেরোসিনের আকারে পাওয়া যায় না। নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার করিলে আকরিক তৈল কেরোসিন হইয়া দাঁড়ায়।

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এ প্রকার একটা জিনিসের সহিত পরিচিত থাকা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে বড়ই উপেক্ষা দেখাইয়া আসিতেছিলেন। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য প্রায় সকল জিনিসেরই রাসায়নিক সংগঠন ও উৎপত্তি-তত্ত্ব বহুদিন হইতে স্থির হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু কেরোসিনের উৎপত্তি নির্ণয়ের জন্য কোন প্রাচীন বৈজ্ঞানিকই বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। কেবল গত পঞ্চাশ বৎসর হইতে কোন কোন বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে তুই একটি কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সোনা রূপা লোহা ইত্যাদি আকরিক জিনিস বটে, কিন্তু ইহারা মূল-পদার্থ। কাজেই ইহাদের উৎপত্তি নির্ণয়ের আবশ্যক হয় না। এগুলি যখন অপর জিনিসের সহিত মিশ্রিত থাকে তখনো এই সংমিশ্রণের পদ্ধতিটি বুঝা যায়। যাহা স্বভাবতঃ যৌগিক তাহারই উৎপত্তি আবিষ্কার করা কষ্টসাধ্য। কয়লা খনিজপদার্থ এবং যৌগিকও বটে। কিন্তু জিনিসটা নিজের পরিচয় নিজেই দিয়া ফেলে। ইহার ভিতরে যে লতাপাতা পুষ্পপল্লবের ছাপ থাকে, তাহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, উদ্ভিদের দেহই রূপান্তর গ্রহণ করিয়া কয়লার উৎপত্তি করে। কেরোসিনের উৎপত্তি-তত্ত্ব খোঁজ করিতে গেলে এ প্রকার কোন সূত্রই পাওয়া যায় না। জিনিসটার নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, এবং রাসায়নিক সংগঠনও আবার সকল স্থানের তৈলে সমান দেখা যায় না। অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত অসুবিধাগুলি অনুসন্ধিৎসুর উদ্যম ভঙ্গ করিয়া দেয়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেবল গত পঞ্চাশ বৎসর হইতে বৈজ্ঞানিকগণ কেরোসিনের উৎপত্তি নিরূপণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইহার প্রথম ত্রিশ বৎসরের অনুসন্ধানে জিনিসটা জীবদেহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। কয়লাও জীবদেহজাত। কি প্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া উদ্ভিদের দারুময় দেহ কয়লায় রূপান্তরিত হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা ঠিক বলিয়া দিতে পারেন। কিন্তু কেরোসিন্-উৎপত্তির রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিবরণ ইঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায় না। উপর উপর কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, হয় প্রাণিদেহ, না হয় উদ্ভিদ্দেহ হইতে জিনিসটার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদিগকে নীরব থাকিতে হইয়াছিল।

কেরোসিন্ সম্বন্ধে প্রকৃত গবেষণা গত কুড়ি বৎসর হইতে বিশেষ ভাবে চলিতেছে। ফ্রান্স, রুসিয়া, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা প্রভৃতি প্রায় সকল দেশেরই বড় বড় বৈজ্ঞানিক ইহাতে যোগ দিয়াছেন। গবেষণার ফলাফল আজও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে বোধ হইতেছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহই কেরোসিনকে জৈব পদার্থ বলিয়া মানিতে চাহেন না। ইঁহারা বলিতেছেন,—কেরোসিনকে বিশ্লেষ করিলে যে সকল মূল-পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়, ভূগর্ভে তাহাদের কোনটিরই অভাব নাই। পরীক্ষাগারে যেমন নানা পদার্থের সংযোগ-বিয়োগে আমরা বিশেষ বিশেষ যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করি, ভূগর্ভস্থ সেই হাইড্রোজেন সেই অঙ্গার প্রভৃতি পদার্থগুলি ভূগর্ভের তাপেই মিলিত হইয়া কেরোসিনের উৎপত্তি করে।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী রসায়নবিদ্ বার্থেলো (Berthelot) সাহেবের বিশেষ পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। জৈব রসায়নশাস্ত্রে তিনি বর্ত্তমানকালে অদ্বিতীয় মহাপণ্ডিত ছিলেন। কেরোসিন্ সম্বন্ধে নব-সিদ্ধান্তটিকে তাঁহার গবেষণার ফল বলা যাইতে পারে। ইনি দেখিয়াছিলেন, সোডিয়ম্ পটাসিয়ম্ জাতীয় ধাতু (Alkali metals) বা লৌহকে অত্যন্ত উষ্ণ করিয়া যদি জলীয়-বাষ্প এবং অঙ্গারক বাষ্পের (Carbonic oxide) সংস্পর্শে আনা যায়, তবে ইহাদের মধ্যে আপনা হইতেই একটা রাসায়নিক কার্য্য চলিতে থাকে। ইহাতে অঙ্গারক বাষ্প এবং জলের অক্সিজেন (অম্লজান) বিযুক্ত হইয়া অবশিষ্ট খাঁটি অঙ্গার এবং হাইড্রোজেন্ (উদজান) পরস্পর সংযুক্ত হইয়া পড়ে। এই নূতন

যৌগিক পদার্থটিকে পরীক্ষা করিলে তাহাকে ঠিক্ কেরোসিনের ন্যায়ই দেখা যায়। বাঁংলো সাহেব এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে নূতন তৈল প্রস্তুত করিয়া কেরোসিনের সহিত তাহার তুলনা করিয়াছিলেন। অবিশুদ্ধ আকরিক কেরোসিনের সহিত জিনিসটার কোনই পার্থক্য দেখা যায় নাই।

জগদ্বিখ্যাত রুস পণ্ডিত মেণ্ডেলিফ্ (Mendeleeff) সাহেবও কেরোসিনের উৎপত্তি নির্ণয়ের জন্য কিছুদিন গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহার মীমাংসার জন্য গত ১৮৭৬ সালে তিনি স্বয়ং পেন্‌সিলভানিয়া অঞ্চলে কেরোসিনের খনি পরিদর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে কয়েক মাস পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া যাহা জানা গিয়াছিল, তাহাতে ইনিও কেরোসিনকে জীবমূলক পদার্থ বলিতে পারেন নাই। ইঁহার মতে, অঙ্গার ও লৌহ ইত্যাদি ধাতু-ঘটিত যৌগিক পদার্থগুলিই কেরোসিনের উৎপাদক। এগুলি ভূগর্ভের গভীরতম অংশে অত্যন্ত উষ্ণ অবস্থায় থাকে। কোন গতিকে ইহাদের গায়ে জল লাগিলে, জলের হাইড্রোজেন্ ধাতুমিশ্রিত অঙ্গারকে টানিয়া লইয়া কেরোসিনের উৎপত্তি করে এবং অবশিষ্ট অক্সিজেন্‌টা ধাতুর সহিত মিলিয়া থাকিয়া যায়। এই প্রকারে যখন কেরোসিন্ উৎপন্ন হয়, তখন তাহা সেই অত্যুষ্ণ স্থানে কখনই তরলাকারে থাকিতে পারে না। খুব সম্ভবতঃ বাষ্পাকারেই তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তার পর সেই বাষ্প ভূগর্ভের নিম্নস্তর হইতে ক্রমে উপরের শীতল স্তরে উঠিয়া জমাট বাঁধিলেই, তাহা কেরোসিন হইয়া দাঁড়ায়।

গভীর প্রাকৃতিকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তকেই চরম সিদ্ধান্ত বলা যায় না। আধুনিক রসায়নবিদ্‌গণের যাঁহারা নেতা ছিলেন, এবং যাঁহাদের জীবনব্যাপী দীর্ঘ সাধনার ফলে রসায়নশাস্ত্র এত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, কেরোসিনের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় নবসিদ্ধান্তটি তাঁহাদেরই গবেষণালব্ধ ফল। সুতরাং ইহাকে এখন মানিয়া চলাই সঙ্গত মনে হয়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সর্পের আত্মহত্যা

How a snake commits suicide.
By a Mining Engineer
of Arizona.

কিছুদিন পূর্ব্বে নিউ মেক্‌সিকোর (New Mexico) অন্তর্গত স্যান এন্‌ড্রিস্ (San Andreas) পর্ব্বতের সংলগ্ন কয়েকটী খনি পরীক্ষা করিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে আমাকে বাধ্য হইয়া সকোরো মরুভূমি (Socorro Desert) পার হইতে হইয়াছিল। এই সুবিস্তৃত মরুভূমিটী প্রায় ৬০ মাইল প্রশস্ত এবং ভয়াবহ পার্ব্বতীয় সর্পগণ সর্ব্বদাই এইস্থানে নিঃশঙ্কচিত্তে পথিক-দিগের ভীতি উৎপাদন করিয়া স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতেছে। আমার একমাত্র সঙ্গী আমার পরিচালক 'রেটেল' সর্প সম্বন্ধে বহু গল্পের অবতারণা করিয়া আমার কর্ম্মক্লান্ত এবং অশান্তিপূর্ণ ঘণ্টাগুলি বেশ একরকম কাটাইয়া দিতেছিল। আমি তন্দ্রাবিজড়িত অলস নয়নপল্লব ঈষদুন্মীলিত করিয়া আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছিলাম। তন্মধ্যে একটী গল্পে আমার অতিমাত্র বিস্ময় উৎপাদন করিল। আমি একটু সজাগ হইয়া তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া ফেলিলাম।

পরিচালক বলিল যে "রেটেল" (Rattle) সর্প যখন অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয় তখন তাহারা আত্মহত্যা করিয়া থাকে। তাহারা দন্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ ছিঁড়িয়া ফেলে এবং ক্ষতস্থানে মুখ প্রবেশ করাইয়া তীব্র বিষধারা ঢালিয়া দেয়। এইরূপে অল্পক্ষণ মধ্যেই সর্পটীর মৃত্যু ঘটে

আমি এই গল্পটীর সত্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়িলাম। সুখের বিষয় এই যে এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইতেও আমার কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হইল না। অনতিবিলম্বেই আমরা একটী ফাঁদের (Trap) নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড হীরকপৃষ্ঠ র‍্যাটেল (Rattle) সর্প ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে সংগ্রাম-লালসায় ঘন ঘন ফাঁদের রজ্জুতে দংশন করিতেছে। শ্রমক্লান্ত হইয়া সর্পটী মাথা উপর দিকে করিয়া ঘন ঘন

নিশ্বাস ফেলিতেছিল, ইহাতে তাহার হৃদপিণ্ডের প্রসারণ কয়েক ফুট পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

আমরা তাঁবুর একটা খুঁটী খুলিয়া কয়েক মিনিট সাপটাকে অতিরিক্ত মাত্রায় খোঁচাইতে লাগিলাম, প্রতি মুহূর্ত্তেই সাপটা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতে লাগিল। অবশেষে যখন সে দেখিল যে তাহার সমস্ত দংশনচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, তখন আমার চালকের বর্ণিত ঘটনার ন্যায় সাপটা নিজের তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ (মেরুদণ্ডের নিকট) ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং ক্ষতস্থানে মুখ প্রবেশ করাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ১০ মিনিটের মধ্যেই সাপটা মরিয়া গেল, যদিও সর্পের আত্মহত্যা সম্বন্ধে আমার আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না তথাপি আমার একটী সন্দিগ্ধ বন্ধুর সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই অরগেন (Organ mountain) পর্ব্বতে আর একটা সর্প দ্বারা এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

আমার গৃহভিত্তিতে যে সর্পচর্ম্মখানা ঝুলান রহিয়াছে তাহা দৈর্ঘ্যে ৫ ফুটেরও উপর হইবে।

আমেরিকার সর্ব্বপ্রকার সর্পের মধ্যে হীরকপৃষ্ঠ রেটেল (Rattle) সর্পই অত্যন্ত ভয়ানক এবং তীব্রবিষধর। ইহারা দৈর্ঘ্যে ৮ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মাইতি।

ভাষাশিক্ষা

জগতের বিভিন্ন পদার্থ মানবচিত্তের উপর কার্য্য করিয়া এক একটী ভাব ও চিন্তার সৃষ্টি করে। এই পদার্থসমূহ মানবের চিন্তার বিষয়। প্রাকৃতিক জগতের বিবিধ শ্রাব্য ও দৃশ্য বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া মানব জল, স্থল ও নভোমণ্ডলের বিভিন্ন পদার্থের চিন্তা করে। এইরূপে সমস্ত স্থূলবিশ্ব তাহার ভাবরাজ্যের আয়ত্ত হইয়া পড়ে। সেইরূপ মানবের সমাজ, রাষ্ট্র, বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি মানববিষয়ক যাবতীয় পদার্থই এক একটী চিন্তার উদ্রেক করে। ইহাদের সংস্পর্শে আসিলে মনে এক একটী ভাবের উদয় হয়। মানবীয় ও প্রাকৃতিক উভয়বিধ জগতের সকল প্রকার তথ্য ও ঘটনা ব্যতীত মানব চিন্তা করিতে পারে না। মানবচিত্ত ইহাদের দ্বারা আন্দোলিত হইয়া ইহাদেরই দ্বারা পূর্ণ হয়। ইহারাই ভাব ও ধারণার কারণ, ইহারাই ভাব ও ধারণার বিষয়।

ভাব ও ধারণার বিষয়ীভূত বিশ্বের বিবিধ পদার্থ যখন চিত্তকে আঘাত করে তখন মানবের নিকট ইহাদের প্রকৃতি ও স্বরূপ প্রতীয়মান হয়, মানব ইহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হয়। যখন কোন বিষয়ে চিন্তা করা যায় বা পৃথিবীর কোন পদার্থ যখন মনোরাজ্যের অন্তর্গত হয় তখন ইহাদের ধর্ম্ম ও গুণগুলি ধরা পড়ে; ইহারা লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া সীমাবদ্ধ ও নির্দ্দিষ্ট হয়। এইরূপে গুণ ও ধর্ম্মের পরিচয় পাইয়া ইহাদিগকে বিশিষ্ট করা ভাব ও চিন্তার কার্য্য। পরিচয় প্রদান, স্বরূপের উপলব্ধি, ধর্ম্ম প্রকাশ এবং গুণের আরোপই ভাব ও চিন্তার প্রাণ। বৃক্ষ, পর্ব্বত প্রভৃতি জড় পদার্থ যখন চিন্তার বিষয় হয়, তখন ইহাদের স্থিতি পরিমাণ প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। অন্যান্য বৃক্ষাদির সহিত তুলনা সাধন করিয়া, অথবা নিজের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অথবা বিশ্বের অন্যান্য পদার্থের সহিত সংযোগ বিধান করিয়া মানব ইহাদিগকে বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত করিয়া তোলে। সেইরূপ সমাজের বিবিধ কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তার দ্বারা ইহাদের পরস্পরের তুলনা সাধিত হয়, এবং সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে সমাজের বিভিন্ন পদার্থগুলির পরিচয় স্থির ও নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। মানবের এমন কোন ভাবনা বা চিন্তা হয় না যাহার দ্বারা কোন না কোনও বিষয়ের গুণ বা ধর্ম্ম প্রকাশিত হয় না। তুলনা না করিয়া, সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া, লক্ষণ নির্ণয় না করিয়া, ধর্ম্মবিশিষ্ট না করিয়া, কোন ধারণাকার্য্য সমাধা হইতে পারে না। ভাব ও চিন্তার প্রকৃতিই এইরূপ যে ইহাদের বিষয়ীভূত মানবীয় ও প্রাকৃতিক বিশ্ব, সংযোগ তুলনা প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত ও গুণবিশিষ্ট হয়।

বিভিন্ন মানবের চিন্তাপ্রণালী ও জ্ঞান বৃদ্ধির পারম্পর্য্য ও পর্য্যায়গুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে মানবের চিন্তাপদ্ধতির কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। প্রথমতঃ, এক সময় দুইটী বস্তু চিত্তের উপর কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং মানব একেবারে বিশ্বের সর্ব্ববিধ পদার্থই চিন্তার আয়ত্ত করিতে পারে না, সে এক সঙ্গে একই আয়াসে

সকলগুলির পরিচয় লাভ ও গুণ নির্ণয় করিতে পারে না। তাহাকে বিষয়গুলি বিভাগ করিয়া এক একটীর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই জন্য চিন্তাপদ্ধতির মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য ও ক্রমান্বয় থাকিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, চিন্তার বিষয়ীভূত পদার্থগুলির মধ্যে এমন বিশেষত্ব ও পরস্পর বৈসাদৃশ্য আছে যে মানবের বিভিন্ন বয়সে ইহাদের কার্য্য হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বয়সে মানব ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পদার্থের চিন্তা করিতে পারে। সকল অবস্থায়ই কোন পদার্থের সকল প্রকার ধারণা সম্ভবপর হয় না। এজন্য ভাবের ক্রমিক বিকাশ বয়োবৃদ্ধি এবং ধারণাশক্তির বিকাশের সহিত জড়িত।

তৃতীয়তঃ, পুরাতন ভাব ও ধারণার ভিত্তি অবলম্বন না করিয়া, প্রতিষ্ঠিত সুপরিচিত চিন্তার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, মানব নূতন ধারণা, নূতন ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। পরিচিত পদার্থসমূহের দ্বারা চিত্তের উপর যে যে কার্য্য হইয়াছে এবং তাহা দ্বারা পৃথিবীর স্বরূপ সম্বন্ধে, পদার্থের গুণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিয়া রহিয়াছে, সেই কার্য্যসমূহ ও জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া, তাহাদিগকে ব্যবহার করিয়া এবং তাহাদের সহিত সংযোগ বিধান করিয়া, অপরিচিত নূতন পদার্থের জ্ঞান জন্মে; ইহাদের দ্বারা চিত্তের উপর যে যে কার্য্য হয় তাহার প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং নূতন লক্ষণ ও গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য মানব প্রথমেই অপরিচিত পদার্থের, দূর ভবিষ্যত বা দূর অতীতের বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না। অপরিচিত আয়ত্ত করিবার পদ্ধতির মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য ও ক্রমান্বয় থাকিয়া যায়।

চতুর্থতঃ, মানব প্রথমেই চিন্তার বিষয়ীভূত পদার্থগুলির সর্ব্ববিধ গুণ উপলব্ধি করিতে পারে না। এক সঙ্গেই অথবা এক বয়সেই সে পদার্থের সহিত পদার্থের তুলনা বা সংযোগ বিধান করিয়া, পদার্থের সহিত নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ইহাদের সকল প্রকার ধর্ম্ম ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। এই গুণারোপ এবং ধর্ম্মপ্রকাশেও পৌর্ব্বাপর্য্য এবং ক্রমান্বয় আছে। একাধিক পদার্থ যেমন এক সময়ে মানবের চিন্তার বিষয় হইতে পারে না; সর্ব্ববিধ বিষয়ই যেমন যে কোনও এক বয়সে মানবের আয়ত্ত হইতে পারে না; এবং দূর অতীত ভবিষ্যৎ প্রভৃতি অপরিচিত পদার্থসমূহ যেমন প্রথমেই মানবের চিত্তের উপর কার্য্য করিয়া তাহার নিকট পরিচিত, লক্ষণাক্রান্ত, ধর্ম্মসংযুক্ত ও বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না; সেইরূপ মানব কোন পদার্থের একাধিক গুণ একেবারে এক সঙ্গেই উপলব্ধি করিতে পারে না। সর্ব্ববিধ গুণই যে-কোন এক বয়সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, এবং প্রথমেই স্থূল, সূক্ষ্ম, জটিল প্রভৃতি বিচিত্র লক্ষণসমূহ ধারণা করিতে পারে না। বয়োবৃদ্ধি এবং চিন্তাশক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও চিন্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ক্রমশঃ ইহারা জটিল ও সূক্ষ্ম হইয়া বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চমতঃ, প্রথমেই ধারণাসমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্য থাকে না। প্রথমাবস্থায় পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন গুণগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতীয়মান হয়। ক্রমশঃ তুলনার দ্বারা ইহাদের মধ্যে যোগ সাধিত ও সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপায়ে পদার্থ ও গুণের বৈচিত্র্য ও জটিলতার মধ্যে প্রণালী ও নিয়ম আবিষ্কৃত হয়, এবং লক্ষণ ও ধর্ম্মসমূহ শৃঙ্খলীকৃত হইয়া ভাবগুলিকে সুসম্বদ্ধ করে।

নিজের মনোগত ভাব সমাজে কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবার জন্য মানব কতকগুলি ইঙ্গিত অবলম্বন করে। যে সকল ইঙ্গিত ব্যবহার করিয়া সমাজস্থ অধিকাংশ লোক তাহাদের মনোভাব প্রকাশ করে এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে, সেই ইঙ্গিতসমূহের দ্বারা তাহাদের ভাষা গঠিত হয়। যদি পৃথিবীতে একজন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি না থাকিত, যদি সমাজ বা সঙ্ঘ বলিয়া কোন পদার্থ গঠিত না হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর বিবিধ বস্তু তাহার চিত্তের উপর কার্য্য করিয়া তাহাকে বিশ্ব সম্বন্ধে যেরূপ চিন্তা করাইত তাহা প্রকাশিত হইবার কোন কারণ থাকিত না, তাহা হইলে ভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন হইত না। কিন্তু মানব যে প্রণালীতে গঠিত হইয়াছে তাহাতে সমাজের প্রয়োজন আছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের মানবীয় ও প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে একজন যাহা উপলব্ধি করে অপরের নিকট তাহা ব্যক্ত করিয়া তাহার মনোভাব বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। সুতরাং ভাব ও ধারণার আদান প্রদানের সুবিধারও প্রয়োজন আছে।

এজন্য এতদুপযোগী ইঙ্গিতসমূহ বা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। এই ইঙ্গিতসমূহের মধ্যে মানব ধ্বনি ও বচনের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া বাচনিক ইঙ্গিত বা কথা প্রধানতঃ ও মুখ্যতঃ ভাষা নামে অভিহিত হয়।

যদিও ভাষা বা ইঙ্গিতসমূহ ব্যতীত পরস্পর মনোভাব ব্যক্ত করা অসম্ভব, তথাপি ভাষা উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ। অর্থ আছে বলিয়াই বাক্যের প্রয়োজন। বৃক্ষ, পর্ব্বত, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের দ্বারা চিত্তের আন্দোলন জন্মে বলিয়া এবং এজন্য ইহাদের গুণ নির্ণয়, লক্ষণ নির্দ্দেশ এবং প্রকৃতির পরিচয় ও স্বরূপ উপলব্ধি হয় বলিয়াই ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়া, বাক্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, ভাষা ব্যবহার করিয়া ইহাদিগকে ব্যক্ত করিতে হয়। অতএব ভাবই ভাষার প্রাণ। সুতরাং ভাষার প্রকৃতি, উৎপত্তি ও ক্রমিক বিকাশ ভাবের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও ক্রমিক বিকাশের অনুরূপ। ভাষা সকল বিষয়ে ভাবেরই অনুসরণ করে।

এই জন্য ভাব ও ধারণার কারণ এই বিষয়সমূহ ভাষার মধ্যে কথার দ্বারা ইঙ্গিতের ভিতর দিয়া ধ্বনির সাহায্যে প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক জগৎ ও মানবীয় জগতের তথ্য ও ঘটনাসমূহই মানবের ভাষার বিষয়। মানব যখন কোনও ইঙ্গিত ব্যবহার করে বা কোনও কথা বলে তখন এই বিবিধ বিশ্বের পদার্থই তাহার কথা বা ইঙ্গিতের বিষয়ীভূত হয়। এই সমুদয় ছাড়িয়া দিয়া তাহার কোন ভাষা বা বাচনিক কার্য্য সমাধা হয় না। বিশ্বের দ্বারা তাহার মনের উপরে যে কার্য্য হয় সেই সমুদয়ই তাহার ভাষার বিষয় ও কারণ। তাহার কথাসমূহ ও ইঙ্গিতসমূহ এই বিশ্বের বিবিধ ঘটনাবলীর দ্বারাই পূর্ণ। সুতরাং ভাব যেরূপ মানব ও প্রকৃতি-বিষয়ক, ভাষাও সেইরূপ মানব ও প্রকৃতি বিষয়ক।

আবার ভাবের প্রকৃতি যেমন পদার্থের গুণ আরোপ করা, ভাষার প্রকৃতিও সেইরূপ গুণ ব্যক্ত করা। মানব কথা বলিয়া এবং ইঙ্গিত ব্যবহার করিয়া মানবের নিকট পদার্থসমূহের তুলনা করে, সংযোগ সাধন করে এবং নানা উপায়ে ইহাদের ধর্ম্ম ব্যক্ত করে। মানবের ভাষার ভিতর দিয়া ইহাদের প্রকৃতি ও পরিচয় সমাজে প্রকাশিত হয়। মানব যখন কোন কথা বলে তখন সে অন্ততঃ কোন পদার্থের একটী ধর্ম্ম প্রকাশ করে। এমন কোনো কথা হইতে পারে না যাহার দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে বিশেষণ ব্যবহার করিয়া তাহাকে বিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট করা হয় না।

একটীমাত্র ধ্বনির সাহায্যে একটীমাত্র পদ ব্যবহার বা শব্দ প্রয়োগ করিয়া মানব তাহার চিত্তের উপর কোন পদার্থের কার্য্য অথবা কোন বস্তু বা ব্যক্তির গুণ নির্ণয় বা পরিচয় প্রকাশ করিতে পারে না। প্রকৃতভাবে পরিচয় প্রদান ও স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইলে, এবং যথার্থভাবে গুণ বা লক্ষণসমূহ ব্যক্ত করিতে হইলে অন্ততঃ একটী পূর্ণবাক্য ব্যবহার করিতে হয়। এই বাক্যের দুইটী অঙ্গ থাকে। বিশ্বের যে পদার্থের দ্বারা ভাবের উদ্রেক হয় এবং যে পদার্থ সম্বন্ধে গুণের আরোপ আবশ্যক হয়, সুতরাং যে সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন হয়, সেই পদার্থ-বাচক ধ্বনি বা শব্দ বাক্যের একটী অঙ্গ; এবং সেই পদার্থের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মানবচিত্ত যেরূপ আন্দোলিত হয় এবং সেই আন্দোলনের ফলে তৎসম্বন্ধে যে গুণ আরোপ করা হয়, সুতরাং তাহার পরিচয়স্বরূপ যাহা বলিবার প্রয়োজন হয়, সেই বক্তব্যবাচক ধ্বনি বা শব্দ বাক্যের অপর অঙ্গ। কেবল একটীমাত্র ধ্বনি প্রয়োগ করিলে কোন পদার্থের সহিত তাহার গুণের সংযোগ করা হয় না, পদার্থের সহিত পদার্থের তুলনা সাধন বা সংযোগ বিধান হয় না, অথবা নিজের সহিত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং তুলনা সাধন ও গুণারোপ যেমন ভাবের প্রকৃতি, সেইরূপ শব্দ যোজনা, পদসংযোগ এবং বাক্য রচনাই ভাষার লক্ষণ ও প্রকৃতি। কোন বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধি না করিলে, পদার্থের সহিত তাহার ধর্ম্মের সংযোগ না করিলে যেরূপ চিন্তাকার্য্য হয় না, সেইরূপ শব্দ যোজনার দ্বারা বাক্য রচনা না করিলে কোন ভাষা সিদ্ধ হয় না। পদার্থবিশিষ্ট বাক্যই ভাষার মৌলিক উপাদান। ভাষা কতকগুলি শব্দের সমষ্টি নহে। কেবল মাত্র শব্দ ব্যবহার করিলেই ভাষা ব্যবহার করা হয় না। যেখানে বাক্যপরম্পরা অথবা একটীমাত্র বাক্যের প্রয়োগ নাই সেখানে ভাষার অস্তিত্ব নাই।

ভাবই ভাষার ভিতর দিয়া ব্যক্ত হয় বলিয়া ভাষার ক্রমিক অভিব্যক্তি ভাবের ক্রমবিকাশের অনুরূপ। বিভিন্ন মানবের ভাব-প্রকাশপ্রণালী এবং বিভিন্ন মানবের ভাষার পুষ্টির পারম্পর্য্য ও পর্য্যায়গুলি আলোচনা করিলে ভাষার বিকাশ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা যায়। দেখা যায় যে চিন্তাপদ্ধতির মধ্যে যেমন পারম্পর্য্য ও ক্রমান্বয় আছে, ভাষার ইতিহাসও সেইরূপ পারম্পর্য্য এবং ক্রমান্বয় বিশিষ্ট।

প্রথমতঃ, মানব একই সময়ে দুই বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে বাক্য রচনা করিয়া তাহাদের বিষয়ে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে না। সে একবারে একাধিক বাক্য রচনা করিতে অসমর্থ। এজন্য তাহাকে পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করিয়া অথবা কোন পর্য্যায় বা ক্রম অবলম্বন করিয়া পদার্থের গুণ প্রকাশ করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, মানবের ভাষা একই বয়সে সর্ব্বভাব-ব্যঞ্জক হইতে পারে না। বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাক্যসমূহ বিবিধ বিষয়ক হয়। প্রথমেই মানব সকল পদার্থ সম্বন্ধে এবং কোন এক পদার্থের সর্ব্ববিধ গুণ সম্বন্ধে কথা বলিতে পারে না। সে ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বাক্য রচনা করিয়া বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে বক্তব্য জ্ঞাপন করে।

তৃতীয়তঃ, সর্ব্বদা যেসকল শব্দ যোজনার দ্বারা বাক্য প্রয়োগ করিয়া মনোভাব প্রকাশ করা হয় সেই পরিচিত বাক্যসমূহ, সেই পুরাতন ভাষা অবলম্বন করিয়াই নূতন বাক্য রচিত হয়। সাধারণতঃ যে ভাষা ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহাই নূতন ভাষা সৃষ্টির উপাদান হয়। এইরূপে মানবের ভাষা ক্রমশঃ পরিচিত পদার্থসমূহ হইতে অপরিচিত দূরস্থ এবং নূতন পদার্থের পবিচায়ক হইতে থাকে।

চতুর্থতঃ, মানব কোন পদার্থ সম্বন্ধে একসঙ্গে একই আয়াসে বহুবিধ বাক্য রচনা করিতে পারে না। তাহার বাক্যরচনা যেমন প্রথমেই পৃথিবীর সকলপদার্থ-বিষয়ক হইতে পারে না, তাহার বাক্য-পরম্পরা যেমন একই বয়সে সর্ব্বভাব-ব্যঞ্জক এবং সর্ব্বপদার্থ-জ্ঞাপক হইতে পারে না এবং তাহার বাক্যসমূহ যেমন প্রথমেই অপরিচিত নূতন ও অজ্ঞাত পদার্থ-বিষয়ক হইতে পারে না, সেইরূপ কোনও বিষয়ে তাহার বাক্যসমূহ প্রথমেই বহুবিধ এবং নানা শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে না। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি ও বুদ্ধিবিকাশের সহিত যেমন তাহার ধারণা ও বিচারশক্তির বিকাশ হয়, তেমন তাহার ভাষা সূক্ষ্ম জটিল হইয়া বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হয়। ভাষা প্রথমে সরল ও সহজ থাকে, ক্রমশঃ ইহাতে অনৈক্য ও জটিলতা প্রবিষ্ট হয়।

পঞ্চমতঃ, মানব প্রথমেই অতি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কথা বলিতে পারে না। প্রথম অবস্থায় তাহার বাক্যসমূহ অসামঞ্জস্যপূর্ণ, পরস্পব বিরোধী বা সম্বন্ধহীনভাবে পৃথক পৃথক অস্তিত্বযুক্ত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা আনীত হয়। অবশেষে ইহারাই সুসম্বদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ হইয়া প্রবন্ধ ও সাহিত্যের ভাষা সৃষ্টি করে। বাক্যগুলি ক্রমশঃ বিবিধ পদার্থ-বিষয়ক ও বিবিধ ভাব-ব্যঞ্জক হয়। এই উপায়ে ইহারা ক্রমশঃ সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া জটিলতা লাভ করে। বাক্য-সমূহের এইরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি ও ক্রমিক জটিলতা লাভেই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত হয়। সুতরাং ভাষার ভিতর দিয়া মানব ক্রমশঃ বক্তব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। বক্তব্য-সমূহের বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষই ভাষার সৌষ্ঠব ও উৎকর্ষের কারণ।

ভাষা ও ভাবের সম্বন্ধ, ভাষার উৎপত্তি, প্রকৃতি, ক্রমিক বিকাশের নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভাষা-শিক্ষার প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। কোন ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে বক্তব্য ও ভাবসমূহের প্রতিই বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। এজন্য বাক্যরচনা ও পদ-যোজনাকেই একমাত্র উপাদানভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। বাক্যরচনায় নৈপুণ্য জন্মিলেই ভাষা আয়ত্ত হইতে পারে, নতুবা নহে। এজন্য অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া শব্দ মুখস্থ বা ব্যাকরণের নিয়ম আবৃত্তি করিবার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। অধিক সংখ্যক শব্দ বা উচ্চারণ করিতে কঠিন, যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট শব্দের অর্থ জানিলেই ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মিতে পারে না। কারণ কঠিন শব্দেই কঠিন ভাষা হয় না। ভাব কঠিন হইলেই

প্রকৃতপক্ষে ভাষা কঠিন হয়। সহজ ভাব প্রকাশ করিবার জন্য কঠিন শব্দ ব্যবহার করিলেও ভাষার কাঠিন্য প্রতীয়মান হয় না। অথচ কঠিন ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া অযুক্তাক্ষরবিশিষ্ট অতি সরল শব্দ ব্যবহার করিলেও ভাষা কঠিনই থাকিয়া যায়। সুতরাং প্রথম হইতেই কঠিন বা বহুসংখ্যক শব্দ শিক্ষায় প্রবৃত্ত না হইয়া শিক্ষার্থীর স্বীয় ভাবপ্রকাশোপযোগী বাক্যরচনা করিতে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করা উচিত। ভাবসমূহ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন কঠিন, জটিল ও সুসম্বদ্ধ হইতে থাকিবে, তেমনি তাহাকে কঠিন ও জটিল বাক্যের সাহায্য অবলম্বন করিতে হইবে, ক্রমশঃ সে ভিন্ন ভিন্ন পরস্পর বিচ্ছিন্ন বাক্যসমূহ পরিত্যাগ করিয়া শৃঙ্খলীকৃত ও সুসম্বদ্ধ এবং ঐক্যবিশিষ্ট বাক্য-পরম্পরা অবলম্বন করিবে।

মাতৃভাষা শিক্ষা করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে প্রথম হইতেই তাহার আজন্মব্যবহৃত বাক্যরচনা-প্রণালী তাহার সর্ব্ববিধ মনোভাব প্রকাশে প্রয়োগ করিতে হইবে। এই প্রয়োগ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, সমগ্র জ্ঞেয় জগতই তাহার মনোবৃত্তিনিচয়ের বিকাশের কারণ। সুতরাং কি প্রাকৃতিক, কি মানবীয় উভয় বিশ্বই তাহার বাক্য প্রয়োগের ক্ষেত্র। এজন্য তাহার বাক্যরচনা কোন এক পদার্থ বা এক বস্তুতে আবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্ব পদার্থ এবং জগতের সর্ব্ববিধ ঘটনাতেই প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে একদিকে তাহার ভাষার বৈচিত্র্য ও জটিলতা জন্মিবে, অপরদিকে বিশ্বের বিবিধ সজীব ও নির্জ্জীব পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবার পক্ষে সহায়তা হইবে। শিক্ষার্থী কেবল মাত্র ভাষাই শিক্ষা করে না। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও ধারণা, সৃষ্টি এবং জ্ঞান বিকাশের উপযোগী বিবিধ বিদ্যাও শিক্ষা করে। সুতরাং ভাষা শিক্ষার সময়ে যদি অন্যান্য বিদ্যালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগের বন্দোবস্ত থাকে তাহা হইলে সকল বিদ্যার মধ্যে পরস্পর-সহায়তা-বিধায়ক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। ইহাতে সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হয়—ভাষা শিক্ষা জীবন্ত হয় এবং অন্যান্য বিদ্যাসমূহ বদ্ধমূল হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, বয়সের তারতম্যানুসারে বাক্যরচনা-প্রয়োগের ক্ষেত্রের এবং বাক্যরচনা-প্রণালীর তারতম্য হওয়া উচিত। সমগ্র জগতই শিক্ষার্থীর জ্ঞেয় বটে, কিন্তু সামগ্রী একই বয়সে জ্ঞেয় নহে। এইজন্য প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার্থীর সুপরিচিত পদার্থ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহেই বাক্য-রচনা-প্রণালী আবদ্ধ রাখিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞেয় পদার্থসমূহের বিভাগ ও বিশ্লেষণ সাধন করিয়া সুবোধ্য অংশগুলিকেই বাক্য রচনার বিষয় করিতে হইবে। এই উপায়ে ক্রমশঃ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ শিক্ষার্থীর ভাষার আয়ত্ত করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ কোন পদার্থের বর্ণনা করিতে যাইয়া শিক্ষার্থী যে বাক্য কয়েকবার রচনা করিয়াছে সেই বাক্যসমূহেরই সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপ নূতন বাক্য রচনা করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। যে বিষয়ে কখনও কোন আলোচনা হয় নাই তাহার সহিত পূর্ব্বপরিচিত বা আলোচিত বিষয়ের যদি কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকে তাহা হইলে সেই নূতন বিষয় সম্বন্ধে বাক্যরচনা করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। পূর্ব্বের অভ্যাস অবলম্বন করিয়াই নূতন প্রয়াস করিতে হইবে। সুতরাং বাক্য হইতে বাক্যান্তরে গমন করিবার সময়ে ভাব হইতে ভাবান্তরে গমনের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

চতুর্থতঃ কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর একেবারেই বহুবাক্য রচনা করিতে যাওয়া উচিত নহে। বাক্যসমূহ প্রথম অবস্থায় সরল ও অজটিল থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রথমাবস্থায় বাক্যসমূহ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সূক্ষ্মভাবব্যঞ্জক না হইয়া স্থূলগুণবাচক এবং সহজভাবজ্ঞাপক হওয়া উচিত।

পঞ্চমতঃ, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্রভাব-প্রকাশোপযোগী বিচিত্র বাক্যরচনা শিক্ষা করিতে হইবে। কোন পদার্থের সম্বন্ধে স্থূল ও সরলভাবে বাক্যরচনা না করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে করিতে হইবে।

এইরূপ বাক্যরচনা দ্বারা ভাষার প্রণালী আয়ত্ত করিতে পারিলে শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং উচ্চ সাহিত্য পাঠ করিবার জন্য অভিধানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া প্রচলিত শব্দের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। অথবা আলোচিত সাহিত্য হইতেই শব্দ বাছিয়া লইয়া প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। এই উপায়ে কথা বলিয়া এবং প্রবন্ধ

লিখিয়া ভাষাপ্রয়োগ সম্বন্ধে নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা জন্মিলে ভাষার অন্তর্নিহিত যুক্তিসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। ভাষা শিক্ষা করিতে যাইয়া, ভাষা ব্যবহার করিতে যাইয়া, ভাষা ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিয়া এবং ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া ভাষার মধ্যে যে বাক্যরচনা-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে যুক্তির দ্বারা সেই প্রণালীর আলোচনা করিয়া নিয়মসমূহ বা বৈয়াকরণিক প্রথা আবিষ্কার করিতে হইবে। ব্যাকরণ ভাষার ন্যায়শাস্ত্র—ইহা আবিষ্কার করিবার জিনিষ, প্রয়োগ করিবার জিনিষ নহে। ভাষাশিক্ষার জন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই। ন্যায়শাস্ত্রের এক অঙ্গ বলিয়া ইহার স্বতন্ত্র আলোচনা সঙ্গত।

অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করিতে হইলেও মাতৃভাষা শিক্ষার প্রণালীই অবলম্বন করিতে হইবে। সেই ভাষাকে মাতৃভাষার ন্যায় মনে করিয়া সকল বিষয়ে মাতৃভাষা শিক্ষা ও মাতৃভাষায় অবলম্বিত প্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে। সকলেই লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই নিজ মাতৃভাষায় কথা কহিয়া ভাব প্রকাশ করে। অন্যান্য ভাষাতেও সেইরূপ নিজ মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শব্দশিক্ষা গৌণ রাখিয়া প্রথম হইতেই সেই ভাষাতে কথা বলিতে শিক্ষা করিতে হইবে। সেই ভাষার বর্ণমালার সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই সেই ভাষায় বাক্য রচনা করিতে হইবে, সেই ভাষায় বাক্যগুলি শুনিয়া শুনিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। সেই ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার যে বিশেষ প্রণালী আছে, যে স্বতন্ত্র উপায়ে সেই ভাষাভাষী সমাজ বাক্যরচনা ও পদযোজনা করিয়া থাকে, ঠিক সেই প্রণালীর সহিত সম্যক্ পরিচিত হইয়া তাহার সাহায্যে নিজের প্রয়োজনমত বাক্য-রচনা শিক্ষা করিতে হইবে।

কেবলমাত্র কোন একবিষয়েই সেই প্রণালী প্রয়োগে সন্তুষ্ট না থাকিয়া জগতের প্রত্যেক বিষয়েই জ্ঞান ও বিচার শক্তির বিকাশানুসারে ব্যবহার করিতে হইবে। প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ এবং স্থূলভাব প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত হইয়া ক্রমশঃ জটিল, সুসম্বদ্ধ ও সূক্ষ্মভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। এই উপায়ে ক্রমশঃ সেই ভাষায় বাক্যরচনা করিয়া প্রবন্ধ ও সাহিত্যের ভাষায় অধিকার লাভের চেষ্টা করিতে হইবে।

এইরূপে ভাষায় প্রবেশ লাভের পর ভাষার নিয়ম, ইতিহাস এবং সাহিত্য ও ইতিহাসের সহিত পরিচিত হওয়া উচিত।

কি মাতৃভাষা কি অন্যান্য ভাষা, যে কোন ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বদা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রথমতঃ ভাষা ও সাহিত্য দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ। ভাষা শিক্ষা করা এবং সাহিত্য শিক্ষা করা একই বিষয় নহে। মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই ভাষার কার্য্য সিদ্ধ হইল। এই ভাব প্রকাশ যাহার দ্বারা অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পারে সেই উপায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা। সুতরাং ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষার্থীকে সেই উপায়গুলির সহিতই পরিচিত হইতে হইবে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালীতে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা ব্যবহার করা হয়। ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইলেই ভাবের উৎকর্ষ সাধিত হয় না। নিকৃষ্ট ভাবসমূহও উৎকৃষ্ট ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতে পারে। এই ভাবসমূহই সাহিত্যের উপাদান। উচ্চ অঙ্গের উৎকৃষ্ট ভাবসমূহ শিক্ষা করিলেই উচ্চ সাহিত্য শিক্ষা করা হয়। এই সাহিত্য ভাষার ভিতর দিয়া বিশদরূপে প্রকাশিত হইতে পারে, আবার অস্পষ্ট-ভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে। উৎকৃষ্ট ভাব হইলেই ভাষা উৎকৃষ্ট হয় না। অতিসুন্দর ভাবসমূহও নিকৃষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে সুতরাং ভাবের ক্রমবিকাশের ফলে সাহিত্যের পুষ্টি, ভাবপ্রকাশের উপায়ের ক্রমবিকাশের ফলে ভাষার উৎকর্ষ। ভাষা ও সাহিত্যের গতি দুই বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করে।

দ্বিতীয়তঃ ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বাক্য রচনা করিতে যাইয়া চিন্তাশক্তির বিকাশোপযোগী যে যে ভাবসমূহ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করা হয় তাহার দ্বারা সেই সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যেও প্রবেশলাভ হইয়া থাকে। এইরূপ যুগপৎ ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পরে যে অবস্থায় ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে বলিয়া আশা করা যায় সেই অবস্থায় মুখ্যভাবে সাহিত্য শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া ভাষার নিয়ম ও ইতিহাস শিক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন বন্দোবস্ত করা

উচিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিধান ব্যবহার করিয়া শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহার ফলে ভাষা ও সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য প্রথম হইতেই প্রতীয়মান হয়।

তৃতীয়তঃ, ভাষা প্রধানতঃ ও মুখ্যতঃ বাচনিক এবং মৌখিক। ধ্বনি ইহার প্রাণ, কর্ণ ইহার বিজ্ঞাপক। সুতরাং ভাষা শিক্ষায় ধ্বনি প্রকাশ এবং মৌখিক কথারই অবলম্বন গ্রহণ করিতে হইবে। লিখিত হইলে ভাষা সম্পূর্ণ নূতন হইয়া যায়। ইহাতে ভাষার সার্থকতা নষ্ট হয়। সুতরাং শিক্ষার্থী লিখিতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে হইবে সম্পূর্ণ নূতন এক বিষয়ের শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার দ্বারা ভাষা শিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হয় বটে, এবং ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই লিখিতে শিক্ষা করিবার প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু ভাষা শিক্ষার জন্য লিখনপ্রণালী শিক্ষার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। এজন্য লিখিতে শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই মুখে মুখে ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতেই ভাষা শিক্ষা নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া জীবন্ত ভাবে কার্য্য করিবে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

কার্য্য-কারণ

আলো কহে 'কালো অতি তুইরে আঁধার।'
আঁধার কহিছে 'তাই আদর তোমার।'
সুখ কহে 'দুঃখ! কেন রাখিস্ জীবন?'
দুঃখ কহে 'শুধু দাদা! তোমারি কারণ।'

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভৌমিক।

নবীন সন্ন্যাসী

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গদাই পালের দুশ্চিন্তা

পরদিন বৈকালে গদাই পাল অন্য কর্ম্মচারীকে নিজ কাযকর্ম্ম, কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া, গোপীকান্ত বাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেল। বাবু তখন কয়েকজন বন্ধু সহ বসিয়া পাশা খেলিতেছিলেন। গদাধর গিয়া দণ্ডায়মান হইল, তাহাকে দেখিয়াও প্রথমটা কিছু বলিলেন না। পাশার একটা চাল ভাবিতে ব্যস্ত ছিলেন। একটু অপেক্ষা করিয়া গদাই নিজেই বলিল "হুজুরের হুকুম হয়েছিল কাল আমি দরিয়াপুর যাব।" বাবু তখন তাহার প্রতি না চাহিয়াই বলিলেন—"কাল যাচ্ছ?"—গদাই বলিল—"আজ্ঞা হাঁ—কাল ভোরে রওনা হব।"—বাবু শুধু বলিলেন—"আচ্ছা বেশ সাবধানে কাযকর্ম্ম কোরো"—বলিয়া পুনশ্চ পাশায় মনোনিবেশ করিলেন। গদাই প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

তখন সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব নাই। সদর রাস্তা হইতে নিজের বাসায় যাইবার পথে নামিবার সময় গদাই হঠাৎ দেখিতে পাইল, বগলে ছাতি রমণচন্দ্র ঘোষ কাছারি বাড়ীর অভিমুখে চলিয়াছে। রমণকে দেখিয়াই গদাই একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইল। সে চলিয়া দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, গদাই পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

বাসায় আসিয়া, হাত পা ধুইয়া, একছিলিম তামাক সাজিতে সাজিতে গদাই নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিল—রমণ ঘোষ এমন ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে কেন? তাহার অভিপ্রায়টা কি? কোনওরূপ গূঢ় অভিসন্ধি নাই ত?

তামাক ধরিল। দুই চারি টান টানিয়া হুঁকাটি হাতে নামাইয়া, দুই চক্ষু উর্দ্ধে তুলিয়া আবার সে চিন্তা-সাগরে মগ্ন হইল। ভাবিতে লাগিল—ঘোষের পোকে বিশ্বাস নাই। কি করিতে আসে? কাল ছোট বাবুর কাছে গিয়া কি গোপন পরামর্শ করিতেছিল? জোতজমা খাজনা-পত্র সম্বন্ধে কোনও কথা নিশ্চয়ই নয়—কারণ ছোট বাবু সে সকল বিষয়ের কিছুই খবর রাখেন না। তিনিত আপনার পূজাআহ্নিক আর পড়াশুনা লইয়াই আছেন। তবে কি রমণ ঘোষ হঠাৎ ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল? ছোট বাবুর কাছে ধর্ম্মের কথা শুনিতে আসে? তাহাকে গুরু করিয়া শিষ্য হইবে? কিন্তু ছোট বাবু যে রকম নিষ্ঠাবান, শূদ্রকে যে শিষ্য করিবেন এমন ত বোধ হয় না। নিশ্চয়ই রমণের অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। বোধ হয় সে কোনও সূত্রে জানিতে পারিয়াছে যে গদাই এখানে

গদাইপালের দুশ্চিন্তা।

চাকরী লইয়াছে। বোধ হয় ছোট বাবুর কাছে সে গদাধরের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিতে আসিয়াছিল। মনে জানে ছোট বাবু লোকটা ভারি কড়াক্কড়। যদি শুনেন গদাধরের জেল হইয়াছিল—সে একজন পাকা জালিয়াৎ—তবে হয় ত তিনি জ্যেষ্ঠকে বলিয়া গদাধরকে অর্দ্ধচন্দ্র দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু রমণ যদি সে আশা করিয়া থাকে, তবে তাহার দুরাশা—কারণ সৌভাগ্যবশতঃ বড় বাবু এমন নীতিবায়ুগ্রস্ত ননীর পুঁতুল নহেন যে এই সব কথা শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন।

ভাবিতে ভাবিতে গদাধরের কলিকার আগুন নিবিয়া গেল। হুঁকাটি মুখে দিয়া দুই চারিবার কসিয়া টান দিয়া দেখিল—ধূম বাহির হয় না। তখন সে হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল।—তাহার মনে হইল—"আচ্ছা আজ আমি যখন বাবুর কাছে বিদায় নিতে গেলাম—তখন তিনি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কইলেন না কেন? আমার মুখের পানে চাইলেন না পর্য্যন্ত। আমার উপর কি বিরক্ত হয়েছেন? হয় ত ছোট বাবু আমার নামে তাঁকে কিছু বলে থাকবেন। নইলে বাবুর ভাবটা অমন বদলে গেল কেন? আমার জেল হয়েছিল বলে অথবা আমি জাল করেছি শুনে বড় বাবু কখনই আমার উপর বিরক্ত হন নি। নিশ্চয়ই রমণ ঘোষ আমার নামে লাগিয়েছে যে আমি লোকটা অত্যন্ত নিমকহারাম—বিশ্বাসঘাতক। নইলে জেলের কথা শুনে ত বাবুর কাছে আমার কদর বেড়েই গিয়েছিল। এখনও বেশী দেরী হয়নি। এখন ছোট বাবুর আহ্নিক করবার সময়—হয় ত এখনও রমণ ঘোষ বসে আছে। বাবুর আহ্নিক শেষ হবার আগে যে সে তাঁর দেখা পায়, এমন ভরসা কম। যেতে হল—খবরটা নিতে হল। নইলে সমস্ত রাত্রি ছটফট করতে হবে—রাত্রে আমার নিদ্রে হবে না।"

এই ভাবিয়া গদাধর উঠিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে—বেশ অন্ধকার। ঘরে দুয়ারে চাবি বন্ধ করিয়া গদাই বাহির হইয়া গেল। কাছারিবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অন্য সকল আমলারা প্রস্থান করিয়াছে—কাছারিতে তালা বন্ধ। প্রাঙ্গন জনশূন্য—কেবল দুই একজন দরোয়ান সদর দরজায় বসিয়া আছে। একজন দরোয়ান বলিল—"বাবু আবার আসিলেন যে?"

গদাই বলিল—"একখানা জরুরি কাগজ ফেলে গিয়েছিলাম—সেখানা দরিয়াপুর নিয়ে যেতে হবে—তাই একবার এসেছিলাম। কাছারি ত দেখ্‌ছি বন্ধ হয়ে গেছে।"—বলিয়া গদাধর মোহিতলালের বৈঠকখানার দিকে চাহিল। দেখিল একটি খোলা জানালা দিয়া আলোক নির্গত হইতেছে। ধীরে ধীরে সেইদিকে অগ্রসর হইল। সে জানালাটা পশ্চাৎদিকের দেওয়ালের—ভূমি হইতে কিছু উচ্চ। জানালার নিম্নে কতকগুলা শেওলা ধরা ভাঙ্গা ইট পড়িয়া আছে, তাহা ছাড়া সেখানে কচুবন ও আগাছার জঙ্গল। গদাই পা টিপিয়া টিপিয়া সেই জানালার নিম্নে গিয়া দাঁড়াইল। জানালা উচ্চ হওয়াতে ভিতরের কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল

বুঝিতে পারিল দুইজন লোক কথা কহিতেছে। কণ্ঠস্বরে বুঝিল ছোটবাবু ও রমণ ঘোষ—কিন্তু সকল কথা ধরিতে পারিল না। দুই একটা কথা যাহা কানে গেল তাহা এই।

ছোট বাবু বলিলেন—"কবে উৎসব?"

রমণ বলিল—"শ্যামাপূজার দিন। কিন্তু তাঁরা অনেক করে বলে দিয়েছেন শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিনে হুজুরকে সেখানে পৌঁছতেই হবে।"

ছোট বাবু বলিলেন—"আচ্ছা যাব। কাল তুমি যখন এসেছিলে, প্রমথ বাবু বলে আমার একটি বন্ধু এখানে বসেছিলেন। তাঁদেরও বাড়ী খুলনার কাছেই। অনেক করে বলে গেছেন যেন আমি তাঁদের ওখানে গিয়ে দিন পাঁচ সাত থাকি। খুলনায় শ্যামাপূজার দিন তাঁদের উৎসব দেখে—পরদিন প্রমথ বাবুদের বাড়ী যাব এখন। তুমি কবে যাচ্ছ?"

"আজ্ঞা আমি কাল সকালেই রওনা হব। শ্যামাপূজা বাদ একবারে ফিরবো।"

"আচ্ছা—তুমি যাও। চিঠির জবাব লিখে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। মুখেও তাঁদের বোলো এখন, শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিন আমি গিয়ে পৌঁছব।"

তাহার পর অনুচ্চ স্বরে দুইজনে আরও কি কি কথা হইল, গদাধর ধরিতে পারিল না। কচুবনের মধ্যে খড় খড় করিয়া কি একটা নড়িতে লাগিল। ভয়ানক অন্ধকার, কিছুই দেখা যাইতেছে না। সর্প না কি ঠিক নাই—গদাধর আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না। "হে মা মনসা, রক্ষা কর"—এই কথা মনে মনে বলিতে বলিতে পা টিপিয়া টিপিয়া সে সরিয়া পড়িল। কাছারির প্রাঙ্গন পার হইয়া, ফটক পার হইয়া, স্বীয় বাসগৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

কিয়দ্দূর যাইতেই একজন পেয়াদা তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল—"কেও নাজির মশাই?"

গদাধরের বুকটা চমকিয়া উঠিল। এইমাত্র জানালার নিম্নে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া চোরের মত সে আড়ি পাতিয়া আসিয়াছে, তাই কি ছোট বাবু তাহাকে ধরিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন? শঙ্কিত স্বরে গদাই উত্তর করিল—"হ্যাঁ—কেন?"

"বাবু আপনাকে তলব করেছেন।"

"কোন বাবু?"

"কোন বাবু আবার?—জমিদার—মালিক—বড় বাবু।"

"বড় বাবু তলব করেছেন? কেন রে?"

"কি জানি মশাই—তা ত বলতে পারিনে। আমায় শুধু বাবু হুকুম দিলেন—'যা নাজিরকে ডেকে আন।'"

গদাই, পেয়াদার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৈঠকখানা ঘরের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বাবু একাকী সেখানে বসিয়া একখানি বহি পড়িতেছেন। গদাই প্রণাম করিয়া বলিল—"হুজুর কি আমাকে স্মরণ করেছেন?"

"হ্যাঁ। কাল দরিয়াপুর রওনা হচ্ছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ভোরে উঠে যাব স্থির করেছি।"

"যাবার কি বন্দোবস্ত করেছ?"

"আজ্ঞে, চলেই যেতাম। কিন্তু দু চারটে মোটমাটারি আছে কি না, থালাটা-ঘটিটে, দুই একটা ভাঙ্গা ফুটো বাক্স, তাই একটা গোরুর গাড়ী বলে রেখেছি।"

বাবু বলিলেন—"জিনিষ পত্র গোরুর গাড়ীতেই রওনা করে দিও। কন্তু তুমি জমিদারের নায়েব হয়ে যাচ্ছ, তোমার গোরুর গাড়ীতে যাওয়াটা ভাল দেখায় না;—ওতে ইজ্জতের হানি আছে। আমি পাল্কী বলে দেব এখন, পাল্কী করে যেও।"

এতক্ষণে গদাধরের মন হইতে সমস্ত আশঙ্কা ও সংশয় দূরীভূত হইল। তবে বাবু তাহার উপর রুষ্ট হন নাই। কেহ তাঁহার কাছে কিছু শোনায় নাই। হাত দুইটি যোড় করিয়া গদাই উত্তর করিল—"যে আজ্ঞা হুজুর।"

একটু পরে বাবু বলিলেন—"আর একটা কথা। সে দিন সেই যে একটা স্ত্রীলোকের কথা বলেছিলাম।"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"এখন আপাততঃ কেনারাম ঘোষকে ডাকিয়ে কিছু বলবার দরকার নেই। তবে তার প্রতি নজরটা রেখ। যদি দেখ থানায় টানায় যাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ আমায় সংবাদ দিও।"

"যে আজ্ঞা।"

"সে স্ত্রীলোকটা এক মাসের উপর বাড়ী ছেড়েছে।

যদি থানা পুলিস্ করবার হত, এতদিন কেনারাম নিশ্চয়ই করত। তা যখন করেনি, বোধ হয় আর করবেও না। বিষয়ের ভাগীদার, আপদ গেলেই বাঁচে। এখন আর খুঁচিয়ে সে কথা তোলবার দরকার নেই।”

“যে আজ্ঞে।”

“পরে যদি কোনও রকম কিছু করবার প্রয়োজন হয়, তোমাকে জানাব। মাঝে মাঝে তুমি এখানে এসে আমায় খবরাখবর দেবে। সপ্তাহে একদিন হোক, দুদিন হোক্।”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আসব বৈ কি। যেমন যেমন হয় জানাব।”

“বেশ, তা হলে এস এখন।”

বাবুর পাদবন্দনা করিয়া গদাধর দ্বিতীয়বার বিদায় গ্রহণ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

স্ত্রী-চরিত্র

বাহির হইয়া, অন্ধকার পথে ধীরে ধীরে গদাই আপন বাসস্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইল। দুর্ভাবনাটা তিরোহিত হওয়াতে তাহার মনটা বেশ প্রফুল্ল হইয়াছে। আপন মনে গুন গুন করিয়া গান করিতে লাগিল।

সদর রাস্তা হইতে, পুষ্করিণীর তীরস্থিত নিজ বাসার পথে নামিবার সময় গদাই নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে দেখিতে পাইল, তাহার নিকট হইতে পাঁচ হাতের মধ্যে, আপাদ-মস্তক শ্বেতবস্ত্রে আবৃত এক নারীমূর্ত্তি তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেখিয়াই গদাধরের প্রাণ উড়িয়া গেল। ভাবিল, দৌড় দিই নিশ্চয়ই ইহা প্রেতিনী। কিন্তু ভয়ে তাহার পা এমন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, পলাইবারও সামর্থ্য নাই। ইতিমধ্যে সে নারীমূর্ত্তি তাহার দিকে আর একটু অগ্রসর হইয়া ভীতস্বরে বলিল --“কে গা?”

গদাধরের দেহে প্রাণ আসিল—বুঝিল ইহা হরিদাসীর কণ্ঠস্বর। কাছে সরিয়া গিয়া বলিল—“কেও হরিদাসী?”

হরিদাসী বলিল—“এত রাত্রে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?”

“রাত কোথায় হরিদাসী—এই ত সন্ধ্যা হয়েছে। তুমি কোথা থেকে?”

হরিদাসী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল—“বলি হ্যাঁগো, তুমি নাকি কাল ভোরে দরিয়াপুর যাচ্ছ?”

“হ্যাঁ। তোমায় কে বল্লে?”

“আমায় কে বল্লে! না বলে কয়ে এই রকম করে চলে যাচ্ছ যে?”

গদাধর বুঝিল, হরিদাসীর অভিমান হইয়াছে। অনুমান করিল, সে বোধ হয় তাহার বাসাতেই গিয়াছিল, দরজায় তালাবন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তাই উপস্থিতবুদ্ধি-বশে বলিল—“তোমার সঙ্গে দেখা করব বলেই ত তোমায় খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি হরিদাসী। নইলে এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার—কোলের মানুষ চেনা যায় না—আমি কি কখনও বাড়ী থেকে বেরুই?”

“আমায় খুঁজছিলে?”—হরিদাসী যেন একটু মোলায়েম হইল।

গদাই কাতরস্বরে বলিল—“তোমায় নয় ত কাকে খুঁজবো হরিদাসী? ত্রিসংসারে আমার আর কে আছে? এস, এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে। আমার বাসায় এস--অনেক কথা আছে।”—বলিয়া গদাধর অগ্রসর হইল, হরিদাসীও তাহার অনুসরণ করিল।

বাসায় গিয়া, সদর দরজায় খিল বন্ধ করিয়া, রোয়াকে একখানি মাদুর পাতিয়া গদাই বসিল এবং হরিদাসীকে বসিতে অনুরোধ করিল। হরিদাসী প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া মাদুরে বসিতে আপত্তি জানাইল—কিয়দ্দূরে ধরাতলেই উপবেশন করিল।

গদাই বলিল—“তার পর হরিদাসী?”

হরিদাসী বলিল—“তার পর হরিদাসী? তোমার আর ন্যাকামি করতে হবে না, রাখ। তুমি যেমন মানুষ, আমি তা বুঝতে পেরেছি। তুমি নাকি দরিয়াপুরের নায়েব হয়েছ? নায়েব বাহাদুর?”

গদাই বলিল --“এখনও পাকা নয়—একটিনি।”

“পাকা ডাঁসা আমি বুঝিনে। বড় লোক হয়েছ তাই বুঝি আর মাটীতে পা পড়ছে না?”

গদাই একটু রসিকতার চেষ্টা করিয়া বলিল—“বড় লোক হলাম কৈ? কথায় বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। তুমি যদি

আমায় বিয়ে কর—তবে দেখ বড় লোক হই কি না। তোমার ত দয়া হচ্ছে না।"

হরিদাসী বলিল—"দয়া হচ্ছেনা আবার কি?—কেন, আমি সেদিন কি বলে গেলাম? আমি ত নিজে মুখে বলে গেলাম আমি রাজি আছি। তুমি বল্লে এইবার তবে একদিন দুজনে বসে সমস্ত পাকাপাকি স্থির করা যাবে। তার পর কথা নেই বাত্রা নেই চম্পট দেবার উয্যুগ করেছ?"

গদাই বলিল—"স্ত্রীচরিত্র এই রকমই বটে! বলি হ্যাঁগো হরিদাসী, তার পর থেকে তুমি কি একদিনও এসেছিলে?—এমুখো হয়েছিলে যে দুজনে বসে পাকাপাকি স্থির করব?—আমি কোথা রোজ সন্ধ্যেবেলা বসে বসে ভাবছি, আজ হরিদাসী আসবে, আজ যখন এলনা তখন কাল নিশ্চয়ই আসবে—কোথায় বা হরিদাসী, আর কোথায় বা কে! আর এখন কিনা উল্টে আমার দোষ?"

কথাটা শুনিয়া হরিদাসী একটু অপ্রতিভ হইল। মনে মনে বুঝিল, গদাই যাহা বলিতেছে তাহা ত সত্যই বটে। আজ হঠাৎ যখন সে শুনিল, গদাধর নায়েব হইয়া দরিয়াপুর চলিয়া যাইতেছে—তখনই তাহার মনে আগুন লাগিয়া গেল। ভাবিল গদাধর তাহাকে বিবাহ করিব ইত্যাদি যাহা বলিয়াছিল তাহা ছলনা মাত্র—অবোধ স্ত্রীলোক পাইয়া তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে। তাই সে রাগে দিশাহারা হইয়া সন্ধ্যার পর গদাধরের অন্বেষণে আসিয়াছিল।

হরিদাসীকে নীরব দেখিয়া গদাই বলিল—"এ দিকে আর আসা হয় না কেন? সেই রেঁধে খাইয়ে গেলে, বলে গেলে সুবিধে পেলেই আসব, তার পর আর দেখা নেই।"

হরিদাসী বলিল—"কি করে আসি বল না? আসা কি সহজ? আমরা হলাম বড় লোকের বাড়ীর চাকরাণী, পথে পথে কি বেড়াতে পারি? আজ গিন্নীর কাছে কত বাহানা করে তবে এসেছি।"

"তবু ভাল। আমি মনে করলাম বুঝি, পাছে আমায় বিয়ে করতে হয়, এই ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ।"

হরিদাসী বলিল—"পালাচ্ছি আমি, না, তুমি পালাচ্ছ? দরিয়াপুর চলে যাচ্ছ, বিয়ের একটা ঠিকঠাক, একটা দিনস্থির, কি করে হবে?"

গদাই বলিল—"হবে বৈ কি। ক্রমে একটা দিনস্থির করতে হবে।"

এই কথা শুনিয়া হরিদাসী আবার আগুন হইয়া উঠিল। বলিল—"এমন বেগারঠেলা ভাবে বলছ যে?"

"বেগারঠেলা কিসে বুঝলে হরিদাসী? স্ত্রীলোকের মন কিনা—সকল বিষয়েই অবিশ্বাস।"

হরিদাসী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"দেখ, আমায় বিয়ে করতে যদি সত্যিই তোমার মন থাকে, তবে একটা ঠিকঠাক করে ফেল। এখানে আর আমার মন টিকছে না। যদি বিয়ে না করবার হয়, তাও খোলসা করে বল। আমার সেই যে মাসী ছিল, সে মরে গেছে,—আমায় কিছু টাকা দিয়ে গেছে। ভাবচি না হয় কাশী চলে যাই—আমার টাকাকড়ি নিজের যা ছিল আর মাসীর যা পেয়েছি, সব মিলিয়ে গুছিয়ে কাশীতে আমার বেশ চলে যাবে। হরিনাম করবো, গঙ্গাস্নান করবো, মনের সুখে থাকবো। আর দাসীবৃত্তি করতে আমার মন নেই।"

এই কথাগুলি শুনিয়া গদাধরের মস্তকে চট্ করিয়া একটা ফন্দি আসিল। ভাবিল, সেদিন ত হিসাব করিলাম ইহার নিজের প্রায় আড়াইশত টাকা আছে। আবার মাসীর টাকা পাইয়াছে বলিতেছে। সে কত টাকা, তাই বা কে জানে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেও না—অধিকন্তু আমার উপর সন্দেহ হইতে পারে। হরিদাসীর টাকাগুলি হস্তগত করিবার উপায় তখনি তখনি গদাধর একটা স্থির করিয়া ফেলিল।

গদাধর তখন বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল-"হরিদাসী, তুমি কি মনে করেছ, যদি তোমায় আমি আজ বিয়ে করতে পাই তাহলে কাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরি? আসল কথাটা কি জান, এ ত সধবা বিয়ে নয়, এ বিধবা বিয়ে। বিধবা-বিয়েতে হাঙ্গাম কত! সধবা বিয়ে হত—দুটো মন্তর বলে একটা ফুল ফেলে দিলেই হয়ে যেত। বিধবা বিবাহের মন্তর বলাতে পারে এমন বিজ্ঞ পুরুতই এ সব পাড়াগাঁয়ে পাওয়া মুস্কিল, কল্‌কাতা ভিন্ন সে দরের পুরুত পাওয়া যাবে না। কলকাতা না গেলে বিয়ে হবে না। কলকাতায় যাওয়া, সেখানে একটা বাসা ভাড়া করা—ধর, অনেক টাকা ব্যয়। আমার

কাছে তিন কুড়ি টাকা আছে। তাতে যে সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ হয়, এমন ভরসা নেই। সেই জন্যেই একটু গড়িমসি করছি বৈ ত নয়। তা, ভগবানের কৃপায় একটা উপায়ও হয়েছে।"

হরিদাসী ঔৎসুক্যের সহিত বলিল—"কি উপায় হয়েছে ?"

গদাই বলিল—"এক মস্ত সাধুপুরুষের দর্শন পেয়েছি। কিছু টাকা আমায় পাইয়ে দেবার উপায় তিনি করেছেন।"

হরিদাসীর কৌতূহল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বলিল—"কি উপায় হয়েছে বলনা গো !"

গদাই গম্ভীরভাবে বলিল—"মেয়েমানুষের সে কথা শুনে কাজ নেই।"

হরিদাসী মিনতি করিয়া বলিল—"না গো, বল বল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

গদাই তখন অনুচ্চস্বরে, ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

"কালকে সন্ধ্যের পর নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি, একটা অশথ গাছের তলায়, ধুনী জ্বালিয়ে এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। তাঁর মাথার জটা কি ! একবারে মাটীতে লতিয়ে পড়ছে। ইয়া হাতের গুলি, ইয়া বুকের ছাতি, টকটক্ করছে রঙ—তার উপর বিভূতি মাখা—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। একটা বোতলে মদ রয়েছে, একটা মড়ার মাথার খুলিতে তাই ঢেলে ঢেলে বাবা খাচ্ছেন। নেশায় দুই চক্ষু যেন একবারে জবার ফুল—দেখে ভক্তি হল। কাছে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করে, যোড়হস্ত হয়ে বসে রইলাম। আমাকে দেখে বাবা বল্লেন—'ক্যায়ে বাচ্চা ?—তেরা মুখ অ্যাসা মলিন কাহে ?'—আমি বল্লাম—'বাবা—আমি বড় গরীব। বিবাহ করবার ইচ্ছে হয়েছে—পাত্রীও ঠিক, কিন্তু কেবল টাকার অভাবে বিয়ে করতে পারছি নে। তাই ভেবে ভেবে আমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে বাবা।'—এই কথা শুনে বাবা খল্ খল্ করে হাসতে লাগলেন। বল্লেন—"রূপিয়া তো খোলামকুচি হায়। কেত্তা রূপিয়া তেরা চাই ?'—আমি হাতযোড় করে বল্লাম—'বাবা, শো দুই টাকা হলেই আমার বিয়েটি হয়।' শুনে বাবা বল্লেন—'তেরা পাশ কেত্তা রূপিয়া হায় ?' আমি বল্লাম—'বাবা—বড় জোর পঞ্চাশ কি ষাট। গরীব মানুষ, কোথা পাব টাকা ?'—বাবা বল্লেন—'আচ্ছা, কুচ পরোয়া নেই—হাম তুঝে একঠো মন্তর শিখা দেগা—মন্তরকা চোট্‌সে তেরা এক এক রূপিয়া চার চার রূপিয়া হো যাগা।'—আমি বল্লাম—'বাবা মন্তরটি তা হলে বলে দিন।'—বাবা বল্লেন—'যাও, নদীমে আস্নান করকে আও।'—আমি গিয়ে নদীতে স্নান করে এলাম। ভিজে কাপড়ে এসে বাবার কাছে বস্‌লাম। বাবা বল্লেন—'হাম যো যো বাৎ বোলতা হায়, মন দেকে শুনো। তেরা যেত্তা রূপিয়া হায়, একঠো লকড়িকা বাকস্‌মে বন্দ করনা। কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী রাতমে, কোই বিধবা আওরৎকো কহনা কি তুম চুল এলো করকে, মাটীমে উবুড় হয়ে পড়্‌কে, আপনা দাঁতসে, একঠো ঘলঘসে গাছকা শিকড় উপড়ায়কে লাও। ঐ শিকড় লাল সুতাসে বাক্‌সমে বাঁধ দেনা। বাকস্‌মে পিত্তলকা তালা বন্ধ করকে, চাভি ঐ বিধবা আওরৎকো দে দেনা। রোজ রাত দুপুরমে বাকস্‌কে উপর একশো আট বার মন্তরকো জপ করনা। এক মাহিনা বাদ ফিন্ যব কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশীকা রাত আওয়েগা,—আওরৎ কো বোলায়কে চাভি খোলনা। তব দেখোগে কি এক এক রূপিয়া চার চার রূপিয়া হো গিয়া।'—বলে, বাবা আমার কাণে মন্তরটি বলে দিলেন। বেশী নয়, কেবল তিনটি অক্ষর।"

হরিদাসী গালে হাত দিয়া, অবাক হইয়া, গদাধরের কথাগুলি শুনিতেছিল। গদাই থামিলে পরও কিছুক্ষণ তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

অবশেষে রুদ্ধশ্বাসে হরিদাসী বলিল—"হ্যাঁ গো—সত্যি ?"

গদাই বলিল—"সত্যি কি না পরীক্ষা করে না দেখলে ত বলা যায় না। বাবা যেমন যেমন বলেছেন, সেই রকম করে দেখব, টাকা চারগুণ হয়, ভালই—না হয়, আমার আসল টাকাটা ত কোথাও যাচ্ছে না।"

"কবে পরীক্ষা করবে ?"

গদাই চিন্তিত হইয়া বলিল—"তাই ত ভাবছি। এখন যাচ্ছি দরিয়াপুরে দুমাসের জন্যে একটিনি করতে—এখন এ দুমাস ত হবে না। আসি দরিয়াপুর থেকে—তার পর

বাবুর কাছে একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ী যাব। সেখানে আমার পিসী আছে—সে বিধবা—তাকে দিয়েই কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী রাত্রে শিকড় তোলাব। কিন্তু পিসীর অনেক বয়স হয়েছে কিনা, তার আবার দাঁত নেই, এই হয়েছে মুস্কিল।"

গদাধর মনে করিতেছিল, হরিদাসী নিশ্চয়ই বলিবে, আগামী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী রাত্রিতে এইখানেই পরীক্ষা আরম্ভ হউক। পরীক্ষার ফলাফল জানিতে হরিদাসীর ঔৎসুক্য কিরূপ প্রবল তাহা উহার কণ্ঠস্বরেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। গদাই যাহা ভাবিতেছিল, ঠিক্ তাহাই হইল। পরক্ষণেই হরিদাসী বলিল—"আচ্ছা দেখ, চতুর্দ্দশীর আর ত বেশী দেরী নেই, তা তুমি কেন সেই রাত্রে দরিয়াপুর থেকে এখানে এসনা ?"

গদাই বলিল—"এলাম না হয়, কিন্তু বিধবা কোথা পাব। যে সে বিধবা হলে ত হবে না, দাঁতওয়ালা বিধবা চাই।"

"আমি ত রয়েছি। আমিই না হয় ঘলঘসের শিকড় তুলে দেব।"

গদাই যেন পরম আপ্যায়িত হইয়া বলিল—"আহা তা যদি তুমি স্বীকার কর হরিদাসী তা হলে কি আর আমায় অন্য কোথাও যেতে হয়? আজকে হল নবমী। আর পাঁচদিন পরে চতুর্দ্দশী। তুমি যদি নিশ্চয় করে বল, তবে চতুর্দ্দশীর দিন রাত্রে আমি আসি।"

"নিশ্চয় করে বলছি। কতক্ষণে তুমি আসবে ?"

"এখান থেকে দরিয়াপুর হল তিন ক্রোশ পথ। কায-কর্ম্ম সেরে কাছারি বন্ধ করে একটু বেলা থাকতে থাকতে যদি বেরুই সন্ধ্যে নাগাদ এসে পৌছব।"

"বেশ, আমি এই এমনি সময় কোনও ছুতো করে গিন্নির কাছ থেকে এক ঘণ্টা ছুটি নিয়ে আসব। কিন্তু ঘলঘসের গাছ কোথায় পাওয়া যাবে।"

গদাই হাসিয়া বলিল—'হেঁ হেঁ—ঘোড়া হলে কি আর চাবুকের ভাবনা হরিদাসী ? তুমি যদি এস, তা হলে ঘলঘসে গাছের জন্যে আটকাবেনা। কত নেবে ঘলঘসে গাছ ? আমার উঠানের কোণেই রয়েছে। এসনা দেখবে।"

গদাই প্রদীপ হাতে করিল। দুজনে উঠিয়া উঠানের কোণে গেল। হরিদাসী দেখিল অনেক গুলা ঘলঘসে গাছ হইয়া রহিয়াছে বটে। বলিল—"আচ্ছা, দাঁতে করে যে ওঠাতে বলেছে, যদি গাছ কেটে যায়, শিকড় না ওঠে ?"

গদাই বলিল—"ঘলঘসের ডাঁটা বেশ শক্ত, দাঁতে কাটবে না। যদিই দেখ দুই একটা কেটে গেল, তখন একটা গাছের গোড়ায় আঁচলের কাপড় বেস করে জড়িয়ে, সেই কাপড়ের উপর কামড় দিয়ে টেনে উঠিয়ে ফেলবে। বুদ্ধি থাকলে কি না হয় হরিদাসী ?"

হরিদাসী প্রসন্ন দৃষ্টিতে গদাধরের পানে চাহিয়া বলিল—"তোমার কিন্তু খুব বুদ্ধি !"

"এত বুদ্ধি ধরেও ত তোমার মন পেলাম না।"—বলিতে বলিতে উভয়ে আবার রোয়াকে ফিরিয়া আসিল।

হরিদাসী আর বসিল না, বলিল—"আমাকে এখনি ফিরতে হবে।"

"একটু বসবে না হরিদাসী! দুটো মনের কথা কবারও সময় পাওয়া গেল না। ভগবান যদি দিন দেন, টাকাগুলো যদি চতুর্গুণ হয়, তবে অগ্রাণ মাসের শেষাশেষি কলকাতায় গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলা যাবে।"—বলিতে বলিতে গদাই হরিদাসীর সঙ্গে সদর দরজায় আসিল।

হরিদাসী বলিল—"চতুর্দ্দশীর দিন সন্ধ্যাবেলা নিশ্চয় আসবে ত ?"

"নিশ্চয়। এখন তোমার মনে থাকলে হয়।"

"মনে থাকবে।"—বলিয়া হরিদাসী নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গঙ্গানারায়ণ-বিরচিত "ভবানী-মঙ্গল"

সাহিত্য-সেবী মাত্রেরই দৃঢ় ধারণা বীরভূমি, জয়দেব, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, জগদানন্দ প্রভৃতি কয়েকটিমাত্র জগদ্বিখ্যাত কবি উৎপাদন করিয়াই নিরস্ত হয় নাই। সমতল ক্ষেত্র হইতে ধবলগিরির ন্যায় অভ্রভেদী উত্তুঙ্গশৈলশিখরের সমুদ্ভব হয় না—শত সহস্র যোজনব্যাপী সমুচ্চ ভূ-পৃষ্ঠোপরি অগণিত শৈলমালার মধ্য হইতেই ধবলগিরি সগর্ব্বে জগৎসমক্ষে মস্তকোত্তলন করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে।

জয়দেবের মত কবি—চণ্ডীদাসের মত কবি—যাঁহাদের ভগবচ্চিন্তার পবিত্র-ধারা স্বর্গের সুবর্ণ-দ্বার স্পর্শ করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছে—যাঁহাদের কীর্ত্তি, যাঁহাদের কবিত্ব, নিম্নতলে জগতীতলের উর্দ্ধে, বহু উর্দ্ধে—মূর্ত্তিমন্ত বিরাট ও বিশাল আকার ধারণ করিয়া জগতের ধার্ম্মিক, প্রেমিক ও সাহিত্যিকগণের সম্ভ্রম লুব্ধ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে—তাঁহারা কখনই একক জন্মগ্রহণ করেন নাই—করিতেও পারেন না। তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে—উত্তরে ও ভবিষ্যতে, পূর্ব্বে ও পশ্চাতে—অগণিত কবি জন্মগ্রহণ করিয়া সমুচ্চ ক্ষেত্রতল সৃষ্টি করিয়াছেন—তদুপরি আবার কত কবি, স্থায়ী কীর্ত্তিলাভ করিয়া শিখরমালার সৃষ্টি করিয়াছেন—যুগের পর যুগ, এইরূপে কতকাল সৃষ্টি-কার্য্যের পর, আমরা অভ্রভেদী যশঃস্তম্ভের অধিকারী জয়দেব ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

কিন্তু এইসকল অজ্ঞাতনামা কবিবৃন্দের পরিচয় বা তাঁহাদের জীবন-ব্যাপী কঠোর সাধনার ফল অমূল্য রত্নরাজি বিবিধ গ্রন্থমালার বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। সম্প্রতি, এইসকল লুপ্ত রত্নোদ্ধারের প্রচেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছে—ইহারই ফলে আমরা অদ্য একজন অপ্রকাশিত-নামা গ্রন্থকার ও তাঁহার গ্রন্থের পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইলাম।

আমাদের প্রস্তাবোল্লিখিত "ভবানীমঙ্গল" নামক সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থখানির সংবাদ, সর্ব্বপ্রথম চতুর্দ্দশবর্ষ পূর্ব্বে ১৩০৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা "পরিষৎ পত্রিকায়", অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ, মহোদয় কর্ত্তৃক, পাকুড়রাজ পৃথ্বীচন্দ্র-বিরচিত "গৌরী-মঙ্গল" কাব্যের পরিচয়প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই 'গৌরীমঙ্গল' নামক অপ্রকাশিত কাব্যে স্থানবিশেষে বিবিধ কাব্য ও তৎসমুদয়ের রচয়িতাগণের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একস্থানে লিখিত আছে—

গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানীমঙ্গল।
কিরীটমঙ্গল আদি হইল সকল॥

এই দুই ছত্র পাঠ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণ, গঙ্গা-নারায়ণ-বিরচিত "ভবানীমঙ্গল" গ্রন্থের পরিচয় প্রাপ্ত হন। ইহার পর শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের ভূমিকায় ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধের অংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া গঙ্গানারায়ণ-রচিত "ভবানীমঙ্গলের" নাম, কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই দীনতম লেখককেও তাহার "সাহিত্য-সেবক" নামক চরিতাভিধান গ্রন্থে, এই গঙ্গানারায়ণ-বিরচিত "ভবানীমঙ্গল" গ্রন্থের উল্লেখমাত্র করিয়া নিরস্ত হইতে হইয়াছে।

"ভবানীমঙ্গল" পুঁথির উদ্ধারকর্ত্তা, বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু গণপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র। শুদ্ধ আমাদের কেন, তিনি সমগ্র সাহিত্যসেবিগণের স্বতঃ-উচ্ছসিত কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গঙ্গানারায়ণের বংশধর বীরভূম রামপুরহাটের উকীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, গঙ্গানারায়ণের জীবনীসংগ্রহে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা চিরঋণী রহিলাম।

এখন আমরা "ভবানীমঙ্গল"-রচয়িতা কবি গঙ্গা-নারায়ণের পরিচয়প্রদানের চেষ্টা করিব। কবি গঙ্গানারায়ণ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে ভণিতা-প্রসঙ্গে নানাস্থানে বিক্ষিপ্তভাবে এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

(১) সুষেণ-জগদানন্দ গঙ্গানন্দ আর।
ফুলিয়া কুলের চূড়া বিদিত সংসার॥
সুষেণ সন্ততি দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ।
ভবানী মঙ্গল গান করিল রচন॥

(২) ফুলিয়া কুলের মণি সুষেণ পণ্ডিত গণি
ক্রমে কহি সন্ততির নাম।
শিবাচার্য্য গোপেশ্বর বিশ্বেশ্বর তারপর
জনার্দ্দন-সুত রামরাম॥
নিবাস ম্যাটারী গ্রাম পিতামহ রামরাম
তিতুরাম তাহার নন্দন।
তার সুত রাম নিজ গঙ্গানারায়ণ দ্বিজ
উমাগীত করিল রচন॥

(৩) ফুলিয়া কুলের মণি সকল সভাতে জিনি
তিতুরাম মুখুর্য্যা সৎকৃতি।
তার সুত রাম নিজ গঙ্গানারায়ণ দ্বিজ
বিরচিল ভাবি ভগবতী॥

ইহা হইতে আমরা গঙ্গানারায়ণের উর্দ্ধতন ছয় পুরুষের নাম প্রাপ্ত হইতেছি। এইস্থানে আমরা কবি গঙ্গানারায়ণের একটি বিস্তৃত বংশতালিকা প্রদান করিলাম—
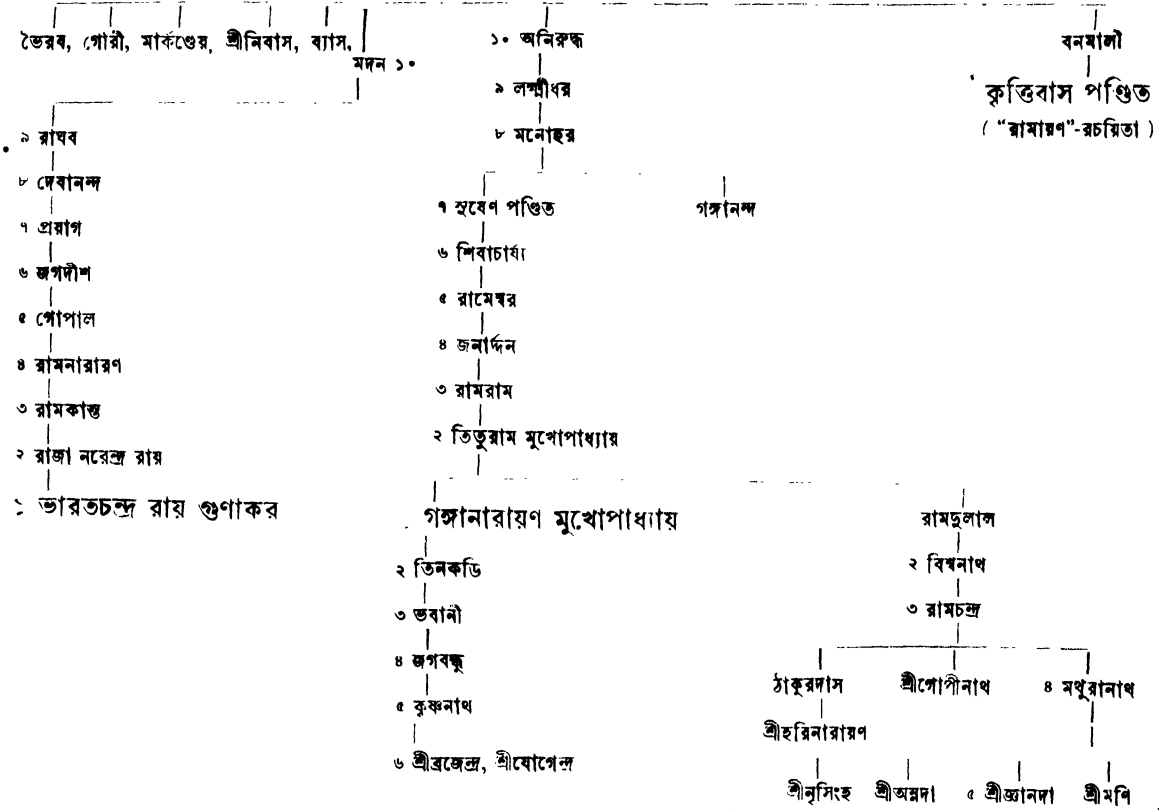
"এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ কান্যকুব্জের ঔডুম্বর গ্রাম হইতে গৌড়ে আদিশূর কর্তৃক আনীত হইয়া ব্রহ্মপুরী নামক গ্রামে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। উৎসাহ, বল্লাল সেনের নিকট কৌলিন্য প্রাপ্ত হন। আবার, উৎসাহের পুত্র আয়িত ও মহাদেব, লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক কুলীন বলিয়া পূজিত। আয়িত-মুখুটির প্রপৌত্র নৃসিংহ ওঝা, মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রপৌত্র দনৌজ মাধবের (বেদানুজ মহারাজ) একজন সভাসদ ছিলেন। পরে, ব্রাহ্মণ-অধিকৃত বঙ্গভাগে এবং পূর্ব্ববঙ্গে রাষ্ট্র-বিপ্লব 'প্রমাদ' উপস্থিত হইলে তিনি গঙ্গা-তীরস্থিত 'গ্রামরত্ন' ফুলিয়ায় আসিয়া বাসস্থাপন করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার বংশাবলী 'ফুলের মুখুটী' বলিয়া অদ্যাবধি খ্যাত হইতেছেন। দেবীবর ঘটকের কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মেল বন্ধনের সময়, এই 'ফুলের মুখুটী'-বংশীয়গণই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন" ("বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক" কৃত্তিবাস ওঝা)।

গঙ্গানারায়ণের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ সুষেণ পণ্ডিতের সহোদর এবং সুবিখ্যাত 'রামায়ণ'-রচয়িতা কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জ্যেঠতুত ভ্রাতা লক্ষ্মীধরের পৌত্র গঙ্গানন্দকে লইয়াই ফুলিয়া মেলের সৃষ্টি হয়। আবার, আয়িতের ভ্রাতা মহাদেব-শাখায় কামদেবকে লইয়াই খড়দহ-মেলের সৃষ্টি।

এই বংশেই বর্ত্তমান সময়ের প্রধান কুলীন বিষ্ণু ঠাকুরাদির উৎপত্তি। আবার, কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠতাত মদনের বংশে, কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তবেই আমরা দেখিতেছি, এই বংশে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ও ভারতচন্দ্রের মত দেশবিখ্যাত কবি জন্মগ্রহণ করিয়া এই কুলীন বংশকে সমধিক গৌরবান্বিত করিয়াছেন। সুতরাং,

কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটী বংশের যশ জগতে বাখানে ॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। এই মুখুটী বংশের গোত্র, ভরদ্বাজ।

এইবার আমরা কবি গঙ্গানারায়ণের সময় নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ কুলের মণি সকল সভাতে জিনি
শ্রীযুত আনন্দ চন্দ্র রায়।
তার সভাসদ কবি চণ্ডীর চরণ ভাবি
দ্বিজ গঙ্গানারায়ণে গায় ॥

ইহা হইতে আমরা বুঝিতেছি, কবি গঙ্গানারায়ণ, আনন্দচন্দ্র রায় নামক কোন ধনবান ব্যক্তির সভাসদরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন—

মহারাজ বসন্তের সন্ততি সকলে।
কৃপা করি রাখ মাতা কল্যাণকুশলে ॥

এই 'মহারাজ বসন্তের সন্ততি' আনন্দচন্দ্র রায়েরই তিনি সভাসদ ছিলেন। 'মহারাজ বসন্ত', রামপুরহাটের সন্নিকট মলুটী রাজবংশের আদি পুরুষ। ইনি, তদানীন্তন মৃগয়া-পরায়ণ মুর্শীদাবাদের নবাবের পলায়িত প্রিয়তম বাজপক্ষী ধৃত করিয়া দিলে, নবাব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মলুটীর নিকটবর্ত্তী বহুতর 'নানকর' নাখেরাজ ভূমি জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। রাজা বসন্ত তদবধি "বাজ বসন্ত" নামে এখনও এতদঞ্চলে পরিচিত রহিয়াছেন। আনন্দচন্দ্র রায় ইঁহারই বংশধর। রাজা আনন্দচন্দ্র যে, দাবা খেলায় সিদ্ধহস্ত ও সভাসদ কবি 'গোস্বেনী গঙ্গানারায়ণকে' বীরভূম রাজনগরের ইতিহাসবিখ্যাত আলিনকি খাঁর নিকট দাবা খেলিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ কথা আবহমান কাল প্রচলিত আছে। দেওয়ান আলিনকি খাঁ ১৭৬৪ খ্রীঃ ২রা মার্চ্চ, বঙ্গাব্দ ১১৭০, ২১শে ফাল্গুন, ন্যূনাধিক দুই বৎসর কাল শয্যাগত রহিয়া দেহত্যাগ করেন। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি, গঙ্গানারায়ণ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

এইরূপ অনুমানের দ্বিতীয় প্রমাণ—এই বংশের মুরারী ওঝার পুত্র মদন ও অনিরুদ্ধ। মদনের অধস্তন দশম পুরুষ, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এবং অনিরুদ্ধের অধস্তন দশম পুরুষ আমাদের প্রস্তাবোল্লিখিত গঙ্গানারায়ণ। সুতরাং, এই উভয় কবি যে সমকালে বর্ত্তমান রহিবেন, ইহা অতি সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কবিবর ভারতচন্দ্র ১৭১২ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৬০ খ্রীঃ দেহত্যাগ করেন। আমাদের প্রথম অনুমানের সহিত ইহার সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

তৃতীয় প্রমাণ—কবির বর্ত্তমান বংশধরগণ হইতে তিনি ষষ্ঠ পুরুষ ঊর্দ্ধ। প্রতি পুরুষ গড়ে ২৮ বৎসর করিয়া ধরিলেও তিনি ন্যূনাধিক ১৬৮ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করিতে হয়। তাহা হইলেও তিনি, ১৭৪২ খ্রীঃ বা খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন ধরিয়া লইলে বিশেষ ভ্রমে পড়িতে হয় না। এইরূপে তিনটি বিভিন্ন প্রকার অনুমানফল যখন বিপরীত না হইয়া একমুখী হইতেছে, তখন আমরা নিঃসন্দেহে কবি গঙ্গানারায়ণকে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি বলিয়া গ্রহণ করিতেছি।

"ভবানী-মঙ্গলের" কবি গঙ্গানারায়ণ, বীরভূমের এক প্রান্তে বসিয়া যে সময়ে "ভবানী-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, সেই সময় বীরভূমের অপর প্রান্তে, অপূর্ব্ব শব্দ-কবি বৈষ্ণব পদকর্ত্তা জগদানন্দ (অনু ১৭০২-১৭৮২ খ্রীঃ) শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদরচনায় তন্ময় ভাবে ব্যাপৃত।

সমকালিক কবি।

সন্নিহিত বাঁকুড়া অঞ্চলে অষ্টকাণ্ডীয় সুবৃহৎ রামায়ণ-রচয়িতা জগৎরাম রায় ও তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ রায় 'ভবানী-মঙ্গলের" সমবিষয় অবলম্বনে "দুর্গাপঞ্চরাত্র" প্রভৃতি গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত। এবং নবদ্বীপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবিরূপে গঙ্গা-নারায়ণের স্ববংশীয় কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও অম্বষ্ঠ বংশীয় ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন স্বকীয় দিগন্ত-বিচ্ছুরিত কবিত্ব-প্রভায় সমগ্র দেশ আলোকিত করিতে অগ্রসর। শাক্তকবি দেওয়ান রঘুনাথ রায়, প্রেমিক কবি রামনিধি রায়, কবি-সঙ্গীত রচয়িতা হরু ঠাকুর প্রভৃতির নামও এই সঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তৎকালীন দেশের অবস্থা।

যে যুগে এইসকল কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের যুগ। তখন মোগল-সূর্য্য অস্তমিত -- শিখ, জাঠ ও মারাঠা জাতি মস্তকোত্তলনে প্রয়াসী—এ দিকে, প্রবলপ্রতাপান্বিত ইংরাজ বণিক ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তার সম্মানিত শূন্য-সিংহাসন অধিকার মানসে দ্রুতগতি অগ্রসর।

বঙ্গে তখন বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী, মহারাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক উত্যক্ত— তাঁহার অন্তে যুবক সিরাজদ্দৌলা পলাশী যুদ্ধে পরাজিত। তদনন্তর মুর্শীদাবাদের মসনদে তখনই মিরজাফর, তখনই মিরকাসিম—আজ এখানে যুদ্ধ, কাল স্থানান্তরে রাষ্ট্র-বিপ্লব—নিত্য অশান্তি—প্রজাসাধারণ পরিবারবর্গ লইয়া নিয়ত শশব্যস্ত। ইহার উপর আবার ছিয়াত্তরের মন্বন্তর!

আমাদের ক্ষুদ্র বীরভূমও এই ভারতব্যাপী বিপ্লব-তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে যথেষ্ট আলোড়িত হইয়াছিল। বীরভূমের বিলাসপরায়ণ পাঠান নরপতি বাদিওজ্জমান খাঁ (১৭১৮—১৭৫২) কিছুকাল বীরত্বের সহিত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া পরিশেষে দ্বিতীয়াস্ত্রী-জাত আসদজ্জমান খাঁকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া ফকীরের সঙ্গে জীবনের অবশিষ্ট ঊনবিংশতি বর্ষকাল ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এ দিকে তাঁহার প্রথমাস্ত্রী-জাত ইতিহাস-প্রখ্যাত পূর্ব্বোক্ত আলিনকি খাঁ, মুর্শীদাবাদের নবাবের অধীনে সেনাধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া যথেষ্ট বীরত্বযশ অর্জ্জন করিতেছিলেন। এই সময়, মহারাষ্ট্রগণ বীরভূমে আসিয়া দেশবাসিগণকে সমধিক ত্রস্ত ও উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। আসদজ্জমানের রাজত্বকালে (১৭৫২—১৭৭৭ খ্রীঃ) বীরভূমের পাঠান রাজ উন্নতির চরম সীমা লাভ করিয়া বীরভূমে সংঘটিত যুদ্ধ বিগ্রহে অচিরকাল মধ্যেই একবারে রিক্তহস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন।

সুতরাং, এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল ভারতইতিহাসে মহাবিপ্লবের কাল—মোগল শক্তির তিমিরগর্ভে চিরতরে বিলোপ এবং প্রচণ্ড বৃটিশসূর্য্যের প্রখররশ্মি-সমুদ্ভাসিত বরাভয়পূর্ণ উজ্জ্বলমূর্ত্তির দ্রুত বিকাশ!

এই অভাবনীয় বিপ্লব ও অশান্তির মধ্যে বাস করিয়া যাঁহারা জনসাধারণ হইতে বহু ঊর্দ্ধে বিমল অক্ষয় শান্তিপূর্ণ সাহিত্য-কাননের আশ্রয় লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বঙ্গবাসীর পরিচর্য্যায় রত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গবাসী মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র সন্দেহ নাই।

কবি-পরিচয়। কবি গঙ্গানারায়ণ, নিজ পরিচয়-প্রসঙ্গে একস্থলে লিখিয়াছেন—

নিবাস মেটেরী গ্রাম পিতামহ রামরাম
তিতুরাম তাহার নন্দন।
তার সুত রাম নিজ গঙ্গানারায়ণ দ্বিজ
উমা-গীত করিল রচন॥

এই মেটেরী গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার সন্নিকট স্বনামখ্যাত মেটেরী গ্রাম। এই গ্রামে গঙ্গানারায়ণের পূর্ব্বপুরুষগণের বাস; পরিচয়স্থলে তিনি তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। গঙ্গানারায়ণের পিতা, 'কুলীনসন্তান' তিতুরাম মুখোপাধ্যায়, উত্তর কালে পৈত্রিক আবাস পরিত্যাগ করিয়া বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামপুরহাট মহকুমার অধীন এবং মলুটীর দুই মাইল অন্তরে অবস্থিত হস্তিকান্দা নামক গ্রামে তত্রত্য রায়-বংশীয় শ্বশুর-আশ্রয়ে বাস করেন। এই হস্তিকান্দা গ্রামে, ইঁহাদের আবাস-স্থানের ভিটা এখনও বর্ত্তমান আছে। তিতুরামের দুই পুত্র—গঙ্গানারায়ণ ও রামদুলাল। বিবাহ করিয়া গঙ্গানারায়ণ সাত আট মাইল দূরবর্ত্তী উদয়পুর নামক গ্রামে এবং রামদুলাল আখিরা নামক গ্রামে বাসস্থাপন করেন। গঙ্গানারায়ণের বৃদ্ধপ্রপৌত্র কৃষ্ণনাথ উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী দেখুড়িয়া নামক গ্রামে বাস করেন। এই গ্রামে গঙ্গানারায়ণের বংশধরগণ এবং পূর্ব্বোক্ত আখিরা গ্রামে তাঁহার ভ্রাতার বংশধরেরা বাস করিতেছেন।

গঙ্গানারায়ণ শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মেটেরীর সন্নিকট নলাহাটী জগদানন্দপুরে ইঁহার ইষ্টদেবের বাস। গঙ্গানারায়ণের কুলদেবতা ধাতুময়ী অন্নপূর্ণার মূর্ত্তির নিত্য পূজা হইয়া থাকে। কবির স্বহস্তলিখিত গ্রন্থ এই বিগ্রহের সহিত এক সিংহাসনে তাঁহার ভক্ত বংশধরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইত। কয়েক বৎসর হইল, গৃহদাহে এই পুঁথিখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে!

গঙ্গানারায়ণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার রচনাভঙ্গী দেখিলেই তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কবি, মলুটী রাজদরবারের সভাসদ ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি, এই রাজ-আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া বহু 'নানকার' বা নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তাঁহার বংশধরগণ এখনও পর্য্যন্ত ইহার উপসত্ব ভোগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে জীবন যাপন করিতেছেন।

কবি গঙ্গানারায়ণ, "ভবানী-মঙ্গল" ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না তাহা এপর্য্যন্ত অবগত

হইতে পারি নাই। তবে তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে বহুতর সংস্কৃত শ্লোকের সরল পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন—এই অনুবাদিত শ্লোকমালা এখনও লোকমুখে প্রচলিত আছে। ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কবির বাসস্থানের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের পাঠশালার ছাত্রগণকে এই শ্লোকমালা কণ্ঠস্থ করান হইত। এই স্থানে মাত্র একটি শ্লোক সংগৃহীত হইল—

'কে দিল অনলে হাত কে ধরিল ফণি।
অষ্টম মঙ্গল যার রন্ধ্র গত শনি॥'

অর্থাৎ যাঁহার জন্মনক্ষত্র হইতে অষ্টম স্থলে মঙ্গল বা যাঁহার রন্ধ্রগত শনি, তিনি ভিন্ন অপর আর কোন ব্যক্তি অনলে হস্তক্ষেপ বা ফণি ধরিয়া নিজকে বিপদগ্রস্ত করিবে? গঙ্গনারায়ণের অনূদিত এইরূপ শ্লোকমালা সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

'ভবানী-মঙ্গল'—বিষয় নির্দ্দেশ। এইবার আমরা কবি গঙ্গানারায়ণ-বিরচিত "ভবানী-মঙ্গল" কাব্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কবি গ্রন্থারম্ভে গণেশ, দুর্গা, শিব, রাম, কৃষ্ণ, গঙ্গা, শ্যামা, চৈতন্য এবং প্রত্যেক দেবতার বন্দনা করিয়াছেন। তদনন্তর,

অভিলাষ করে দাস শুন মা শঙ্করী।
রচিব তোমার লীলা মনে বাঞ্ছা করি॥
পুরাণ-সম্মত কথা রচিব ভাষাতে।
অষ্ট দিবসের গান ছন্দ নানা মতে॥
* * * *
আসরে উরিয়া ঘটে হবে অধিষ্ঠান।
লাএক জনেরে সদা করিবে কল্যাণ॥
গায়েন বায়েন আর নৃত্যকের প্রতি।
সদয় থাকিবে মাতা দেবী ভগবতী॥

এইরূপে শঙ্করী ভবানীর, 'গায়েন', 'বায়েন' ও 'নৃত্যক' প্রভৃতি সকলের প্রতি আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া পুরাণ-সম্মত ভবানী-চরিত্র অষ্ট দিবসব্যাপী গীতিচ্ছলে বিবিধ ছন্দে ভাষা-কথায় রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

দক্ষ-যজ্ঞে সতী দেহত্যাগের পর, গিরিরাজগৃহে মেনকারাণীর গর্ভে উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন। উমা বা গৌরীর জন্ম-উপাখ্যান হইতে 'ভবানী-মঙ্গল' গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে।

উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা যতেক রূপসী।
যোগ্যতা কি যোগ্য হবে চরণের দাসী॥
অপরূপ রূপগুণ নাহি হয় লেখা।
গৌরী গুণময়ী গিরি-গোষ্ঠীর পতাকা॥

এই "গুণময়ী গিরি গোষ্ঠীর পতাকা" গৌরীর বাল্যলীলা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিয়া নির্জ্জন বনে তাঁহার তপস্যা বর্ণনা করিয়াছেন। এই তপস্যা বর্ণন পাঠের সময় "কুমার-সম্ভবের" কথা মনোমধ্যে উদিত হয়। তপস্যান্তে শিব উপস্থিত হইলেন—

এত বলি বিশ্বনাথ গৌরী অঙ্গে দিয়া হাত
আপাদমস্তক ধূলি ঝাড়ি।
কহেন বিনয় বাণী আমারে আপন জানি
কেমনে আছিলা আমা ছাড়ি॥
কৈলাস বিলাস বাস নহে মোর অভিলাষ
তোমারে না দেখি অন্ধকার।
আজি মোর পুণ্য দিন যুগল নয়ন তিন
দিব্যরূপ দেখিল তোমার॥

এই বলিয়া পুনর্মিলনের কথা জ্ঞাপন করিলেন।

এদিকে গিরিরাণী, তপস্যা-নিরতা গৌরীর অদর্শনে বিহ্বলা হইয়া উমার গুণ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। গৌরীর রূপবর্ণন প্রসঙ্গে গিরিরাণী বলিতেছেন,

হস্তেতে সমস্ত তোর অপূর্ব্ব অঙ্গুলি।
পূজা হেতু ভক্তে পাছে নেয় চাঁপা বলি॥

তদনন্তর, গৌরীর বিবাহ—নারদের আগমন ও ঘটকালি।

মেনকা বলেন মুনি মোর কথা ধর।
ঘর বর ভাল হয় ইহা বুঝে কর॥

শিবের বিবাহ নারদের নিমন্ত্রণ বিবাহ-বাসর কন্যাদান প্রভৃতি বিষয় যথারীতি বর্ণন করিয়াছেন। বিবাহান্তে, গিরিরাজের গৃহে শিব এক বৎসরকাল অবস্থান করিলেন। শ্বশুরগৃহে এই দীর্ঘকাল অবস্থিতির জন্য গৌরী, সখীগণের নিকট শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া স্বামীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন,

শ্বশুরমন্দিরে বাস ত্যজ প্রভু অভিলাষ
শীঘ্র চল নিজালয় তথা।

তদনন্তর গৌরী,

চলিয়া শিবের সাথে আসিয়া অর্দ্ধেক পথে
বসিলেন শঙ্কর পার্ব্বতী॥

তখন,

ভবানীর অভিলাষে সম্প্রতি দম্পতী ভাবে
পুরী এক করিল নির্ম্মাণ ॥
'বারাণসী' থুলা নাম ত্রিজগতে অনুপাম
দেবের দুর্লভ সেই পুরী।
তাহাতে যে মরে জীব সে হয় অবশ্য শিব
বিশেষে বিশ্বের অধিকারী ॥

এই,

আনন্দ-কানন কাশী করিয়া নির্ম্মিত।
আনন্দে বিহরে হর পার্ব্বতী সহিত ॥
কাশী আসি শিবলিঙ্গ স্থাপিল প্রত্যক্ষে।
যাহার স্থাপিত লিঙ্গ সেই নাম ডাকে ॥
আদি বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ সর্ব্বদা বিরাজে।
কোটি লিঙ্গ স্থাপন হইল কাশী মাঝে ॥
পার্ব্বতী সহিত তথা প্রভু বিশ্ব-পতি।
করিল কৌতুক লীলা বহুকাল স্থিতি ॥
তার পর শঙ্করে শঙ্করী সঙ্গে লৈয়া।
উল্লাসে কৈলাসপুরী গেলেন চলিয়া ॥
* * * *
তার পর ভক্তগণ শুন ভক্তি করি।
কৈলাসে রহিলা সুখে শঙ্কর শঙ্করী ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা এ তিন সংসারে।
পূজার সময় আসি হৈল তার পরে ॥
মেনকা মলিন বড় গৌরী নাহি ঘরে।
গিরিরে গঞ্জনা রাণী প্রতিদিন করে ॥
গৌরী গৌরী বলি রাণী সদাই দুঃখিত।
দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ রচিল সঙ্গীত ॥

পরিশেষে, গিরিরাণী শেষ কথা বলিলেন

যদি মোরে রক্ষা চাহ গৌরী আনি শীঘ্র দেহ
নহিলে আমার অবসান ॥

তদুপরি অনুযোগ,

তুমিত গৌরীর বাপ তব চিত্তে কত তাপ
মোর চিত্তে সমুদ্র উথলে।

বিশেষতঃ গৌরীত সামান্যা কন্যা নয়—

গৌরী কন্যা হৈতে মোকে ভাগ্যবতী বলে লোকে
তোমাকে বলয়ে পুণ্যবান।
হেন কন্যা না দেখিয়া কেমনে রহিবে হিয়া
স্থির বা কেমনে রহে মন ॥

অনেক অনুনয় বিনয়, এবং বাদানুবাদের পর গিরিরাজ কহিতেছেন,

গৌরীরে আনিতে আমি গিয়াছিলাম তথা ॥

কিন্তু,

শঙ্কর কহিলা গৌরী না পাঠাব তথা।
কয়েছে অনেক রাণী অপমান-কথা ॥

তাই বলিতেছেন,

দেবতার দয়ামায়া নাহি বুঝ রাণী।
ইতিহাসে শুন কিছু অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
* * * *
সঙ্গে ছিলা নন্দ ঘোষ অনেক কহিল।
গোকুল গমনে মন কদাচ নহিল ॥
সে সব মায়ের স্নেহ পাশরিয়া মনে।
এইত দেবের রীত শুনহ আপনে ?
কেবা তার ভাই বন্ধু কেবা তার পিতা।
ভক্তিতে ভক্তের বশ সত্য এই কথা ॥

তখন

রাণী বলে বিবরিয়া কহ হিমালয়।
কিরূপে জন্মিলা কৃষ্ণ নন্দের নিলয় ॥

এই অবসরে কবি বহুপৃষ্ঠাব্যাপী কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণন করিয়া রাস লীলায় বংশী শ্রবণে গোপীগণের অবস্থা ভাগবতের অনুরূপ কেমন বর্ণন করিয়াছেন দেখুন—

কেহ বা রন্ধনে ছিলা কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তিলা
কেহ আধ ললাটে সিন্দূর।
চঞ্চল চিত্তের ভ্রমে আভরণ ব্যতিক্রমে
করে পরে পায়ের নূপুর ॥

তদনন্তর কবি,

পতিব্রতা ধর্ম্ম ত্যজি সেই গোপীজনে।
পরপতি-মতি তারা করিল কেমনে ॥

এই সমস্যার যথাযথ মীমাংসা করিয়া রাধিকার প্রতি শ্রীদামের অভিশাপ, তুলসীর উৎপত্তি, ও রাধিকার জন্ম-কথা বিবৃত করিয়াছেন। তদনন্তর অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন জন্য

এত বলি যায় রথে বামে শব শিবা তাথে
পূর্ণ কুম্ভ লয়া নারীগণ।
দক্ষিণে গোমুখ দ্বিজ বিকশিত সরসিজ
ঘৃত মধু রজত কাঞ্চন ॥
শ্বেতধান্য হয় গজ পুষ্পমালা দেখি ধ্বজ
দধি মৎস্য বৎস সনে ধেনু।
যাত্রা সুমঙ্গল দেখি অক্রূর অন্তরে সুখী
পুলকে পূর্ণিত হৈল তনু ॥

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাইবেন শুনিয়া গোপীগণ ব্যাকুলা হইয়া ভাবিতে লাগিল,

জীবন যৌবন ধন লোচন বচন মন
সমর্পণ যাহার চরণে।
গোপীগণ পরিহরি যদি যায় সেই হরি
প্রাণ ধরি রহিব কেমনে ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের ব্যাকুলতার প্রতি মনোযোগী হইলেন না,

মথুরা চলিয়া গেলেন। যথাস্থানে রজক, তন্তুবায়, কুব্জা, মালাকার প্রভৃতির বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে মথুরাবাসী শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া—

যেই অঙ্গে যার দৃষ্টি সেই অঙ্গে থাকে।
অন্য দেহ দৃষ্টি করে সাধ্য নাহি রাখে॥

তদনন্তর কুবলয়াপীড়-বধ, কংশ বধ, নন্দ-বিদায় ও নন্দরাণীর খেদ। শ্রীকৃষ্ণ, একান্তই প্রত্যাগমন করিলেন না দেখিয়া গোপীগণ হতাশ হৃদয়ে বিলাপ করিতেছে—

চাঁদে দেখি মনে হবে শ্রীমুখমণ্ডল।
নয়ান পড়িবে মনে দেখিয়া কমল॥
অধর পড়িবে মনে দেখিয়া অরুণে।
এই সবে দৃষ্টিশূন্য হৈল গোপীগণে॥
আপন আপন আঁখি কাল হৈল সবে।
কহ কহ প্রাণসখী কি উপায় হবে॥
কেহ কহে নয়ন মুদিয়া যদি থাকি।
অন্তরে শ্যামের রূপ নিরন্তর দেখি॥
যোগযুক্ত দুই কর শুন মোর বাণী।
সদা চিত্তে চিন্তা কর কৃষ্ণ গুণমণি॥
করে জপ কৃষ্ণগুণ মুখে জপ হরি।
হৃদে সদা কৃষ্ণগুণ দেখ ধ্যান করি॥
এই যুক্তি সার আমি কহিল সভারে।
এখন না পাই কৃষ্ণ পাব জন্মান্তরে॥

এই স্থানে রাধিকা-মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে, 'কৃষ্ণ' নামের পূর্ব্বে 'রাধা' নামের সংস্থান সম্বন্ধে কবি একটি সুন্দর উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন—

নিজ নাম পাছে কৈল তব নাম আগে।
হেমযুক্ত নীলমণি শোভা বড় লাগে॥

এইরূপ কৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক দীর্ঘ প্রসঙ্গের পর—

গিরি কহে মেনকা শুনিলে সব কথা।
মায়া দয়া হীন হয় দুরন্ত দেবতা॥
এত স্নেহে নন্দরাণী পালিলা কৃষ্ণেরে।
পুনরায় আসি দেখা নাহি দেন তারে॥
আনন্দে গেলেন নন্দ রামকৃষ্ণ লঞা।
নৈরাশ করিয়া তারে দিল পাঠাইয়া॥
এমতি বুঝিবে সব দেবের চরিত।
পিতামাতা বলে মর্ম্ম নহে কদাচিত॥
তুমি মোরে কহ গৌরী আনিবার তরে।
আর কি আসিবে গৌরী অভাগার ঘরে॥
মেনকা কহেন গিরি শুনিল সকল।
সম্প্রতি অধিক কথা কয়া কিবা ফল॥

পরে হতাশহৃদয়ে বলিতেছেন,—

তাহে যদি ত্রিপুরারী গৌরী না পাঠাব।
আপনি আসিবে ঘরে মন বুঝাইব॥

অবশেষে বহু আলোচন আন্দোলনের পর গিরিরাজ গৌরী-আনয়ন জন্য হিমালয় যাত্রা করিলেন। কিন্তু কৈলাসের পথ গিরিরাজের অজ্ঞাত, তাই—

অসম্ভব কার্য্য মনে করি অভিলাষ।
মোর সাধ্য যাই কিবা শিবের কৈলাস॥
চিন্তাকুল হৈয়া গিরি ভাবেন অনেক।
জিজ্ঞাসিতে পথ লোক না দেখে জনেক॥
মনে মনে হিমালয় যুক্তি কৈল বসি।
সম্প্রতি আমার গতি পুরী বারাণসী॥
মোর ঘর হৈতে হয় গৌরী সঙ্গে লৈয়া।
কাশীবাসী হৈলা আসি মহা হৃষ্ট হৈয়া॥

এই স্থানে কবি বিবিধপুরাণ-সম্মত কাশী-মাহাত্ম্য বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন। আবার, কাশী-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে রামায়ণ, গঙ্গামাহাত্ম্য, গৃধিণী-সংবাদ, বিষ্ণু-যমদূত-সংবাদ প্রভৃতি দীর্ঘ উপাখ্যান সন্নিবেশিত আছে। কাশীতে কিছু কাল অবস্থানের পর,

গঙ্গাজল বিল্বদল শতদল লৈয়া।
সত্বরে শিখরয়াজ চলে হৃষ্ট হৈয়া॥

গিরিরাজ এই স্থানে নারদ ঋষির সাক্ষাতকার লাভ করিয়া তাঁহারই সঙ্গে কৈলাস যাত্রা করিলেন। গিরিরাজ, গৌরী আনয়ন জন্য বহু আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া, বিশেষতঃ গৌরী অদর্শনে মেনকার শোচনীয় অবস্থা বর্ণন করিয়া গৌরীকে বলিলেন,

বুঝিয়া বিহিত মাত করহ আপনে।

তখন গৌরী বলিলেন, এ বিষয়ে শিবের অনুমতি লওয়া আবশ্যক। কেননা,

একবার জানি আমি লঙ্ঘিয়া শিবের বাণী
দক্ষযজ্ঞে তেজিল পরাণে।
সেই হতে ভয় মনে শঙ্করের বাক্য বিনে
সাধ্য নাহি যায় কোন স্থানে॥

গৌরী বিনা আয়াসে শিবের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন; কেন না,

এ কথা নিশ্চয় দৃঢ় আমারে করুণা বড়
অর্দ্ধ অঙ্গ বাঁটিলা আমারে।

আবার গৌরী, শিব বিনা অধিক দিন থাকিতে পারিবেন না; তাই বলিলেন,

কেবল মায়ের স্নেহ যাব জনকের গেহ
আসিব দিবস তিন পরে।

ক্রমে গিরিরাণী শুনিলেন,

গৌরী আজ আসিবে বিহানে।

এই স্থলে গৌরীর মুখে শারদীয়া পূজার প্রচলন ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এইবার,

গৌরী এল ঘরে মোর উমা এল ঘরে।
আনন্দে বিহ্বল রাণী আপনা পাশরে॥ ধ্রু॥

ইহার পর সপ্তমীপূজা-আরম্ভপ্রসঙ্গে—বিভিন্নদেশের পূজা-প্রচলন, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পূজার ক্রম নিরূপণ বর্ণিত আছে। কবি এই উপলক্ষে একস্থানে বলিয়াছেন,

ফলে জলে দরিদ্র পূজয়ে ভক্তি করি।
তাহাতে অধিক তুষ্ট দেবী মহেশ্বরী॥

সপ্তমীপূজার পর মহাঅষ্টমী, সন্ধিপূজা, দুর্গার শতনাম বর্ণন করিয়া মহাঅষ্টমী সন্ধিপূজা সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহার পর মহানবমীপূজা আরম্ভ, স্তবস্তুতি, ও পরে মহানবমীপূজা সমাপ্ত। তদনন্তর বিজয়া দশমী।

এইরূপে সুমিষ্ট ভাষায় বিরচিত কাব্যগ্রন্থে,

হরগৌরী প্রেমভাষা ভক্তের পূরায়ে আশা
রচিল শ্রীগঙ্গানারায়ণ॥

কাব্য শেষে কবি

গঙ্গানারায়ণ করে নিবেদন
চণ্ডীর চরণতলে।
সমর নিদানে তব গান শুনে
মরি যেন গঙ্গাজলে॥

আমাদের কবির এই কাতর প্রার্থনা ভবানী পূরণ করিয়াছেন কি না, তাহা এখন আর জানিবার উপায় নাই।

কবির ভাষায় 'ভবানী-মঙ্গল' গ্রন্থের উপাখ্যানভাগের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া নিরস্ত হইলাম। এক্ষণে আমরা ভারতচন্দ্রের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিয়া এই গ্রন্থের গুণাগুণ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

তুলনায় সমালোচনা।

যে যুগে ভবানী-মঙ্গলের কবি গঙ্গানারায়ণের আবির্ভাব, সে যুগের সাহিত্য-সেবকগণের প্রধান ও খ্যাতনামা পৃষ্ঠপোষক স্বনামখ্যাত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র; আর সে যুগের খ্যাতনামা কবি "অন্নদা-মঙ্গল" রচয়িতা রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র এবং ভক্ত কবি রামপ্রসাদ। এই যুগের কবিগণের মধ্যে অনেকেরই রুচি অতি মাত্রায় বিকৃত ও অশ্লীলতা-দুষ্ট, চিত্ত অসংযত এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি বিষম বিদ্বেষভাবাপন্ন। ভারতচন্দ্র এই যুগের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী কবি—আবার তিনিই এই যুগ-নির্দ্দিষ্ট অপরাধে পূর্ণমাত্রায় অপরাধী।

কবি গঙ্গানারায়ণের সহিত ভারতচন্দ্রের তুলনা করিবার এই কয়টি বিশেষ কারণ রহিয়াছে—(১) উভয়েই সমকালিক কবি, (২) উভয়েই বিষয় নির্ব্বাচনে এক মত, (৩) উভয়েই একপরিবার-সম্ভূত, (৪) উভয়েই পরস্পর অপরিচিত—এক জন দেশবিখ্যাত মহারাজের সভাপণ্ডিত, অপরে নিভৃত পল্লীতে নামে মাত্র রাজোপাধি প্রাপ্ত ক্ষুদ্র জমিদারের সভাসদ্। এতগুলি ঐক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় কবি সংসর্গ-বশে কিরূপ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিবার কথা।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ভবানী-মহাত্ম্য প্রচারোদ্দেশে লিখিত অন্নদা-মঙ্গল উপাখ্যানে বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল উপাখ্যান সংযোজিত করিয়া স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির সম্পূর্ণরূপ অপব্যবহার করিয়াছেন। গঙ্গানারায়ণ প্রসঙ্গ-ক্রমে অবান্তর উপাখ্যান সংযোগ করিয়া গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন সত্য—কিন্তু তাহা সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া। গঙ্গানারায়ণ শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও যেরূপ ভক্তিভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও নাম-মাহাত্ম্য ও শ্রীরাম-চরিত প্রভৃতি উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিরল। ভারতচন্দ্র কিন্তু অবসর পাইলেই ভিন্ন ধর্ম্মাব-লম্বীকে বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত করিতে ত্রুটি করেন নাই।

ভারতচন্দ্র স্বীয় বিকৃত রুচি কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া অজ্ঞাতভাবে দুর্গামাহাত্ম্য-উপাখ্যানের প্রথমাংশ গ্রহণ করিয়াছেন—যেখানে স্বামীর বাক্য অতিক্রম করিয়া সতী-লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত। আর ভবানী-মঙ্গলের কবির উমা

শঙ্করের বাক্য বিনা, সাধ্য নাহি যায় কোন স্থানে।

একজন কবি, নারীর স্বামী-বাক্য অতিক্রম করিয়া কিরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিতেছেন, তাহারই বর্ণন করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন—অপর কবি, সতীর স্বামীর-আজ্ঞানুবর্ত্তিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের সমগ্র কাব্য আমরা বিনা সঙ্কোচে সকলের সমক্ষে পাঠ করিতে পারি না—ইহা অশ্লীলতায় এতই কলুষিত! কিন্তু "ভবানী-মঙ্গল" গ্রন্থে অশ্লীলতার লেশমাত্র

নাই। সুতরাং ইহা অসঙ্কোচে সর্ব্বজনসমক্ষে পাঠ করা যায়। সুকাব্যের ইহা একটি প্রধান গুণ।

ভারতচন্দ্র এখনও জীবিত রহিয়াছেন—কেবলমাত্র তাঁহার অপূর্ব্ব শব্দপ্রয়োগ-কুশলতার জন্য; নচেৎ, তাঁহার কাব্য স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহের কথা। আমাদের "ভবানী-মঙ্গলে"র কবিও যথেষ্ট শব্দ সম্পদের অধিকারী ছিলেন—তিনি দুষ্ট বা গ্রাম্য-শব্দ একবারে পরিহার করিয়াছেন, অথচ দীর্ঘ সমাসযুক্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার না করিয়া সুমার্জ্জিত, সুশ্রাব্য ও যথাযথ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

কবি ভারতচন্দ্র যে সকল উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই আবহমান কাল প্রায় প্রত্যেক বঙ্গীয় কবি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং, তৎ-সমুদয় উপমা তাঁহার নিজস্ব নহে; তবে তিনি, সেই সকল উপমা তাঁহার অপূর্ব্ব ভাষায় সুষ্ঠু পরিচ্ছদ দান করিয়া জন-সাধারণের সমক্ষে আনয়ন করিয়াছেন। কবি গঙ্গানারায়ণের কাব্যেও তদ্রূপ বহুতর প্রচলিত উপমা প্রয়োগের বাহুল্য দৃষ্ট হইবে। কিন্তু গঙ্গানারায়ণও সুশিক্ষিত ছিলেন—ভাষার উপর তাঁহারও অসাধারণ অধিকার ছিল—তাই তিনি সেইগুলি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, অথচ কোথাও কর্ণপীড়া উৎপাদন করেন নাই। তাঁহার ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল—এত বড় বৃহৎ কাব্য, হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পাঠ করিতেও বিন্দুমাত্র ক্লান্তি অনুভব হয় না। গঙ্গা-নারায়ণ, শ্বশুরালয়ে সুদীর্ঘকাল অবস্থিতা দুহিতার প্রতি জননীর যে প্রবল আকর্ষণ এবং তাহার জন্য যে নিদারুণ ব্যাকুলতা ও বিহ্বলতা, আবহমান কাল প্রত্যেক গৃহস্থেই পরিদৃষ্ট হয়, তাহারই এক অতি উজ্জ্বল আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। যখনই ইহা উদ্ঘাটিত হইবে তখনই ইহাতে মাতৃ-হৃদয়ের অবিকৃত প্রতিচ্ছায়া দর্শন করিয়া সহৃদয় পাঠককে বিমুগ্ধ হইয়া রহিতে হইবে।*

শ্রীশিবরতন মিত্র।

---

* বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে ২৯শে শ্রাবণ তারিখে পঠিত। 'ভবানী-মঙ্গল' গ্রন্থখানি 'বীরভূম সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক অচিরে সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইবে-- লেখক।

সচ্চাষী জাতি

সচ্চাষী জাতির মধ্যে সামাজিক সংস্কার ও বিদ্যা-বিস্তারের কতকটা সূচনা দেখা দিয়াছে। এটী সুলক্ষণ। কেবল নাম পরিবর্ত্তন ও হুজুগ করা অপেক্ষা প্রকৃত উন্নতির চেষ্টা করিলে জাতির উন্নতি হয়।

১। ধান্যকুঁড়িয়া হাই স্কুল। ২৪ পরগণার সচ্চাষীর কেন্দ্রগ্রামে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত। সচ্চাষী বালকগণ এখানে বিনাবেতনে প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষা পর্য্যন্ত বিদ্যালাভ করিতে পারে। সচ্চাষীগৌরব স্বর্গীয় শ্যামা-চরণ বল্লভ মহোদয় এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামবাজারের বল্লভ বাবুরা এক্ষণে ইহার পরিচালক।

২। দাক্ষায়ণী বালিকা বিদ্যালয়। প্রায় ৭০টী বালিকা এখানে অধ্যয়ন করে। সচ্চাষী ডাক্তার শ্রীযুত জলধর মণ্ডল, এল, এম, এস, মহাশয় ইহার তত্ত্বাবধান করেন।

৩। হিতৈষিণী সভা। সচ্চাষী বালকগণকে বিদ্যা-শিক্ষা দিবার জন্য আজ ২।৩ বৎসর হইল এই শিক্ষাবিস্তার সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহার আয় দ্বিতীয় বৎসরের পুস্তিকায় ৭৪৲, ব্যয় ২৯৮৲। ইহার নেতাগণ যথা—

শ্রীযুক্ত	দেবেন্দ্র নাথ বল্লভ—	শ্যামবাজার ব্যাঙ্কার।
"	পেন্দ্র নাথ সাউ	" "
"	মহেন্দ্র নাথ গাইন	" "
"	বামনদাস রায়	জমিদার চৌবেড়িয়া
"	সুরেন্দ্রনাথ রায়	" "
"	কুঞ্জবিহারী বল্লভ, এম-এ, বি-এল, মুনসেফ।	

৪। এই সমিতির শাখা খিদিরপুরে খোলা হইয়াছে। সেখানে প্রায় ৩০টী বালক বিদ্যাশিক্ষা পায়। স্থানীয় উকিল বাবু রাসবিহারি দাস, বি. এল, তাহার প্রধান উদ্‌যোগী।

৫। ডুমজুড় সচ্চাষী-সমিতি। হাবড়া জেলায় সচ্চাষী-কেন্দ্রগ্রামে এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য চাউল সংগ্রহ করিয়া তাহার বিনিময়ে গরীব বালকদিগকে বিনাবেতনে প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া। স্থানীয় ডাঃ উমাচরণ দাসের পুত্র ডাঃ শৈলেশ্বর দাস ইহার অগ্রণী।

৬। চাতরা সচ্চাষী সমাজ। শ্রীরামপুরে যে সচ্চাষী-

সমাজ আছে, তাহারাও বালকদিগকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা পাইতেছে, তবে এখনও কোন সমিতি গঠিত হয় নাই। এখানে যে প্রসিদ্ধা শীতলাদেবী আছেন, তাহার সত্ত্বাধিকারী ও সেবাইত উক্ত সচ্চাষীগণ। এখানকার সচ্চাষীরা রসারসি ও শণপাটের কার্য্যের জন্য বড় প্রসিদ্ধ।

৭। খিদিরপুর পঞ্চানন আশ্রম। যাহাতে জাতীয় ব্রাহ্মণ বালকগণ বিনা ব্যয়ে বিদ্যালাভ করেন, এই টোলের তাহাই উদ্দেশ্য। স্থানীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিশেষ উদ্‌যোগী।

৮। সচ্চাষী-সুহৃদ্। এখানি সচ্চাষীদিগের হিতকরী মাসিকপত্র। প্রকাশক ও সম্পাদক বেলগেছিয়ার কবি-কৌমুদী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব। আরো সুমার্জ্জিত ও সাময়িক হওয়া দরকার। প্রায় ২ বৎসর চলিতেছে।

৯। বঙ্গীয় কৃষিবৈশ্য সমিতি। উক্ত নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে যে সমস্ত সচ্চাষী জাতি আছে, তাহারা কোন কোন স্থানে হলধর জাতি বলিয়া পরিচিত। উদ্দেশ্য সচ্চাষী সমাজের সহিত একত্রিত হওয়া।

১০। সচ্চাষী জাতি প্রায় বঙ্গের সকল জেলাতেই অবস্থিত। মোট লোকসংখ্যা ২৯,৫০৬ জন গত আদম-সুমারিতে নির্দ্ধারিত; কিন্তু পূর্ব্বে ৪০ হাজার ছিল, ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিকার ও অনুসন্ধান আবশ্যক।

১১। ইহারা কোথাও চাষাধোপা, কোথাও হলধর, চাষীপতি বা চাষীধব বলিয়া পরিচিত। এখন ইহাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র যাহাতে সচ্চাষী বলিয়া পরিগণিত বা লিখিত হয়—কারণ বক্তব্য এই কথাটা চাষাধোপা নহে অপিচ চাষীধব অর্থাৎ চাষার শ্রেষ্ঠ এবং উক্ত সচ্চাষী মানেও তাই। আরমবাগ সবডিভিসনে ইহারা চাষীপতি বলিয়া পরিচিত।

১২। যাঁহারা সহরে বাস করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পকর, কিন্তু যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁহারা কৃষি ও গোপালনের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

১৩। এই জাতির ভিতর প্রাথমিক শিক্ষার আরো বহুল প্রচলন হওয়া আবশ্যক, অন্যথা কোনও উন্নতি বা সামাজিক সম্মিলন অসম্ভব। ইহাদের অনেকে ধনবান ও কতিপয় বিদ্বান ব্যক্তি আছেন। আচার ব্যবহারে বেশ ভদ্র।

শ্রীনন্দলাল দাস।

আমার লেখা

(১)

ভাবের মাথায় লাঠী মেরে ছন্দে দিয়ে শক্ত ঠোকা,
হঠাৎ একদিন ধরল কামড় পদ্যলেখা মস্ত পোকা;
ভাব আহত বিষম রকম, ঠোকার ঘায়ে ছন্দ জখম,
এগোয় না কেউ হাতের কাছে বেয়াড়া সব আত্মরোষে।
তবুও আমায় লিখ্‌তে হবে ঘুরছে মাথা মত্ত ঝোঁকে॥

(২)

ফর্দ্দ দু তিন সাদা কাগজ কর্জ্জ করি পাড়া হ'তে,
পেন্‌সিলটাও অনেক খোঁজে যোগাড় হল কোনোমতে;
হা অদৃষ্ট তাও যে ভোঁতা, কাট্‌ব কিসে? ছুরি কোথা?
জাঁতির ঘায়ে নিলাম সেরে—যদিও নাই অনিষ্ট তায়।
সরস্বতীর সঙ্গে আমি এমনি বাঁধা ঘনিষ্ঠতায়॥

(৩)

ভাবের ঘায়ে জলের পটী, ছন্দে গাঁদার পাতা, মলম,
লাগিয়ে দিয়ে, মিলাম সাথে—নিলাম কালি খাতা কলম;
বস্‌ব কোথা? নির্জ্জনতা কোথায়? শোবার ঘরের কথা
পড়্‌লো মনে, কলম কাণে, বগল তলে ফেলে খাতা
লম্ফ দিয়ে বস্‌লাম গিয়ে, যেথায় শয়ন-শয্যা পাতা॥

(৪)

লিখতে হবে যত্ন ক'রে—তামা কর্ত্তে হবে সোনা,—
হিঁদুমতে বিলাতযাত্রা, পানে পোকার গবেষণা—
হাওয়াগাড়ীর চল্‌তি টিকী, ভাব্‌চি বসে কোন্‌টা লিখি;
গিন্নি এসে মুচকী হেসে শুইয়ে গেল বাঁয়ের দিকে
পঞ্চমাসের মঞ্চগত সুতাসঞ্চ মেয়েটিকে॥

(৫)

বাহির আসর জমিয়ে যখন উঠেছে বেশ হোঁকাধ্বনি,
সুড়সুড়িয়ে এলেন টলে চার বছরের খোকামণি,
ছন্দ ফন্দ থাকগে পাছে,—ভাষাই মোটে পাইনে কাছে,
ভাষার দোরে আমার যখন এমনি মাথা ঠোকাঠুকি
বিষম রকম কান্না তখন জুড়ে দিলে খোকা খুকী॥

(৬)

রাগের মুখে ছেলের বুকে মেয়ের গালে চাপড় মেরে,
বস্‌লাম উঠে কায়দা মত কাছা কোঁচা কাপড় ঝেড়ে;
"দূরহ গাধা" বল্‌তে রেগে—ও বাবাগো, ভীষণ বেগে,
সূক্ষ্ম হতে উচ্চতরে যে সুস্বরে চড়্‌ল টান।
কুমার ধর্ল্লে সানাই, মেয়ে ব্যাগ্‌পাইপে ধর্‌ল তান॥

(৭)

চাঁদির মল আর মাকড়ী বালা পালংপাতা, চেন্ গিল্‌টি,—
গয়না-পরা গিন্নী আমার কলম খাতা পেন্‌সিলটি—
ফেল্লে ছুঁড়ে, দণ্ডে আসি—সাত জন্মের গুণের দাসী;
রূপে সাক্ষাৎ ঘটোৎকচের আপন মায়ের পেটের বোন্,
আদর ক'রে তুল্লে ছেলে—ষাট্, ষাট্, ষাট্ যেটের ধন॥

(৮)

প্রলয়-ঝড়ের মূর্ত্তি দেখে, বাঁধন-ছেঁড়া ষাঁড়ের মত,
ভাব দিল ছুট, ছন্দ শুধু রইল প'ড়ে মূর্চ্ছাগত,
ভাব্‌লেম, ভাব যাক্ না চলে? ছন্দ আছে, তারই বলে,
লিখ্‌ব এমন মিষ্টি লেখা,—বুঝ্‌বে অতি-ধীরজনও তা।
পাই যদি হায় একটুখানি ভাষার কৃপা—নির্জ্জনতা॥

(৯)

বিশ্বভরা গণ্ডগোলে—মানুষগুলোর দ্বন্দ্ব বেজায়।
নির্জ্জনতা কোথায় পাব? নইলে আবার ছন্দ যে যায়।
যমের বাড়ী?—অনেকদূরে! হায় গো বিশাল ভবপুরে
কোথায় গেলে মিল্‌বে তারে? কিসে ভাষার চল্‌বে ঢেউ?
জানো যদি, দয়া করে তোমরা ওগো বল্‌বে কেউ?

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আলোচনা

—:o:—

বরাহমিহির

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে "বরাহমিহির সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলাম। বরাহমিহিরের সময় লইয়া বড়ই গোলযোগ দেখা যায়। সুতরাং এ বিষয়ে যতই আলোচনা হয়, ততই সুবিধা। আমরা এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

বরাহমিহির বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রঘুবংশাদি রচয়িতা কালিদাসও তাঁহার একজন সভাপণ্ডিত ছিলেন। সম্বৎপ্রচলন কর্ত্তা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই।

বৃহৎসংহিতার যে সংস্করণ আমরা এখন দেখিতেছি, তাহা ২৮৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত। এই বরাহমিহির কর্কটের আদিতে দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইতে দেখিয়াছেন (১)। কিন্তু ইনি মূল বৃহৎসংহিতার রচয়িতা নহেন। প্রথমমুনি-কথিত অবিতথ বিস্তীর্ণ গ্রন্থার্থ অবলোকন করিয়া নাতিস্বল্প নাতিবহুল রচনা দ্বারা তাহাই স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন (২)। এই প্রথম মুনি বরাহমিহির। সম্বতের প্রথমে ৫৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন।

দ্বিতীয় বরাহমিহির ২য় শকে ৮০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি ২ শক করণাব্দ করিয়া পৈতামহ সিদ্ধান্তের এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন (৩)।

তৃতীয় বরাহমিহির বৃহৎসংহিতার বর্ত্তমান সংস্করণের রচয়িতা। ইনি ২৮৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

চতুর্থ বরাহমিহির "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা" রচনা করিয়াছেন। ৪২৭ শকে ৫০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। নিজ কৃত "পৌলিশ" সিদ্ধান্তে তিনি লিখিয়াছেন, "সম্প্রতি পুনর্ব্বসুতে দক্ষিণায়ণ হইতেছে।" ইনি কর্কটের আদিতে দক্ষিণায়ণ দেখেন নাই তৃতীয় বরাহের (৫০৫—২৮৫ খৃষ্টাব্দ) ২২০ বৎসর পরে ইনি ছিলেন। ৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বসুতে দক্ষিণায়ণ হইয়াছে।

পঞ্চম বরাহমিহির ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর শাহের সময় ছিলেন (৪)।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়,
রাজসাহী।

(১) বৃহৎসংহিতা ৩য় অধ্যায় ২ শ্লোক।
(২) বৃহৎসংহিতা ১ম অধ্যায় ২ শ্লোক।
(৩) আমাদের জ্যোতিষী ৬২ পৃষ্ঠা।
(৪) বিশ্বকোষ "বরাহমিহির" শব্দ।

স্বর্ণসিন্দূর রহস্য

সম্প্রতি প্রবাসীতে স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুত সম্বন্ধে রসায়নবিদ্ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর সহিত কবিরাজ মহাশয়গণের বড় বাদপ্রতিবাদ চলিতেছে। বিষয়টি গুরুতর। স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুত করিতে সোনা লাগে। অথচ প্রস্তুত হইলে দেখা যায় যে তাহাতে সোনা কিছুমাত্রই মিশ্রিত হয় নাই; শিশির নীচে পড়িয়া আছে।

পঞ্চানন বাবুর যুক্তি এই,—যখন স্বর্ণসিন্দূরে সোনা মিশ্রিত হয় না, পরীক্ষা করিলেও স্বর্ণের বিন্দুমাত্র সংস্রব পাওয়া যায় না, তখন তাহাতে সোনা দেওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই।

কবিরাজ মহাশয়েরা বলেন—যদিও স্বর্ণসিন্দূরে সোনা প্রত্যক্ষভাবে মিশ্রিত না হউক, তথাপি স্বর্ণ-সংস্পর্শে ইহা এমন গুণান্বিত হয়, সোনা না দিলে তাহা কোন ক্রমেই তেমন হইতে পারে না। যদি স্বর্ণসিন্দূরে সোনা না দিলে চলিত, তবে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ঋষিগণ স্বর্ণসিন্দূর ও রসসিন্দূর এদু'টি ঔষধ পৃথক পৃথক সৃষ্টি করিলেন কেন?

এই সমস্যার মীমাংসা বড় কঠিন। কারণ ইহার একদিকে যেমন রসায়নবিদের প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফল; অন্যদিকে আবার তেমন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের ব্যবস্থা। স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুত করিতে যে স্বর্ণের অধঃক্ষেপ হয়,—শাস্ত্রে কিন্তু তাহার কোন উল্লেখ নাই।

বহুদিন হয় আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ একজন সন্ন্যাসীর নিকট শুনিয়াছিলাম যে—স্বর্ণ, পারদ ও গন্ধক উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া, তিন বৎসর কাল

জগাই মাধাই।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত ও তাঁহার অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

চিত্রপরিচয়

ভগ্নদূত।

এবারকার রঙিন চিত্রটি অজন্টা গুহার দুই নম্বর গুহার প্রাচীর-গাত্র হইতে ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত নকল। কয়েকটি মাত্র রেখাসম্পাতে বুদ্ধের একটি চমৎকার ভাবব্যঞ্জক ভঙ্গী প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রাচীন চিত্রটির মধ্যে চিত্রকর যে কোন ভাবটি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা এই সুদূর কালে বলা শক্ত। আমরা এ চিত্রের নাম দিয়াছি "ভগ্নদূত"। যেন দূত আসিয়া রাজার কাছে বলিতেছে—"মহারাজ, সব শেষ হইয়া গেছে।" এই চিত্র দেখিয়া রাবণের সভায় ভগ্নদূতের শোক-সংবাদ নিবেদনের কথা মনে পড়ে। সে যেন বলিতেছে—

"লঙ্কাপুরী বীরশূন্য হৈল এত দিনে।"

কেহ কেহ এই চিত্রটিকে বুদ্ধদেবের দর্শন লাভে ভক্তের বিস্ময়ভক্তি গদগদ ভাবের প্রকাশক বলিয়া মনে করেন। সেই মহাপুরুষের জ্ঞানশ্রীপ্রদীপ্ত মূর্তি দেখিয়া ও তাঁহার অমৃতগম্ভীর বাণী শুনিয়া ভক্ত যেন বলিতেছে—

"আমার নয়ন ভুলানো এলে,
আহা আমি কি দেখিলাম হৃদয়-মেলে!"

ভালো কাব্য ও ভালো চিত্র একই শ্রেণীর। তাহা পাঠক ও দর্শকের মনোবৃত্তির অনুকূল হইয়াই ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়।

জগাইমাধাই।

কিরূপ পাপী হঠাৎ ধর্ম্মপথের পথিক হয়, এই চিত্রে তাহার পরিচয় আছে। সকল রকমের পাপীর আকস্মিক পরিবর্ত্তন হয় না।

এই ছবিখানিও কতকগুলি রেখাসম্পাতে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত এবং পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশক। নন্দলাল বাবুর রেখাঙ্কনের বিশেষত্ব সেগুলির দৃঢ়তায় এবং প্রত্যেকটির ভাবব্যঞ্জনায়। শারীর-সংস্থানের দৃঢ় রেখাগুলি, হাজার রেখায় কল্পিত চুলগুলি, মাথায়-বাঁধা নামাবলীর পাগড়ীটি এবং রেখার দ্বারাই ছায়াসুষমার সংসাধন শিল্পীর দক্ষতার পরিচায়ক। একটা অতসী কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে এই মুখদুটির গঠনপারিপাট্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়।

একটা বালিয়াড়ির আড়ালে, বড় নদীর কিনারে একখানা যা-কিছু বিছাইয়া এই দুই বন্ধু ঘণ্টাখানেকের ফূর্ত্তি লুটিবার জন্য মজলিস জমাইয়া বসিয়াছে। মদ্যভাণ্ড হইতে সুরা পরিবেষণের তিনটি কটোরা চালো খাও খাও ঢালো করিবার জন্য সমাহৃত, আরো সংগৃহীত হইয়াছে এক থালা ফলের চাট। দক্ষিণ দিকে যে আছে সে সদানন্দ বৈরাগী তাহার কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই, বামদিকের পাগড়ীধারীই গোছালো, সেই সমস্ত যোগাড় করিয়া আনিয়াছে, মায় মদ শেষ করিয়া তামাক খাওয়ার যন্ত্রটি পর্য্যন্ত; আর সে-ই পেয়ালা ভরিয়া মদ সদানন্দ সঙ্গীর চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে—তাহার কিন্তু গ্রহণের আগ্রহ নাই, তাড়াতাড়ি নাই, সে সঙ্গীর উৎক্ষিপ্ত বাহুকে সংযত করিয়া নিমেষালস দৃষ্টিতে মদের আনন্দ-ঢলঢল রূপ দেখিয়াই পুলকিত। তাহার মুখে আনন্দ, আর ইহার মুখে মত্ততার আবেশ সুস্পষ্ট। ইহাদের আনন্দ মত্ততা ততটা বস্তুগত নহে যতটা ভাবগত—পানেই ইহাদের আগ্রহ নহে, পানের পরের উল্লাসের চিন্তাতেই ইহাদের আনন্দ।

ইহারা মাতাল বটে কিন্তু বড়, সরল, সদানন্দ মাতাল। তারা উদ্বোধনের সময়েও তাহাদের ভাবে ভঙ্গীতে এমন কিছু নাই যাহা বিশ্রী, যাহা উদ্দাম, যাহা কুরুচির পরিচায়ক। তাহারা যে ভদ্রসন্তান, তাহারাও যে ভদ্রসমাজের, এ সংজ্ঞাটুকু যেন তাহাদের মত্ততার ভিতরেও আছে। এবং এই দুটি প্রমত্ত বন্ধুর প্রগাঢ় প্রীতি আলিঙ্গনের বন্ধনে প্রকাশ করিতেছে—তাহাদেরও প্রাণ আছে, ভাব আছে, অনুভূতি আছে। পাপের মধ্যেও, অনাচারের মধ্যেও, তাহাদের প্রাণ আপনাদের সহৃদয়তার পরিচয় প্রকাশ করিতেছে। তাহারা যে ধর্ম্মের সঙ্গে একেবারে বিযুক্ত নহে, মাথায় করা নামাবলীখানিই তাহার সাক্ষী।

এইরূপ সরল উদার সদানন্দ প্রাণই ঘটনাবশে সাধু বা অসাধু হইয়া উঠে, সে কোথাও মধ্যপথে থামিতে জানে না। যাহাদের প্রকৃতিই দূষিত, পাপপ্রবৃত্তি যাহাদের মজ্জাগত, তাহারা কখনো হঠাৎ সাধু হইয়া যাইতে পারে না। ধর্ম্ম-ইতিহাসে যে সব পাপীর আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কাহিনী শোনা যায়, তাহারা প্রথমশ্রেণীর লোক। সেই পরিবর্ত্তন আকস্মিক হইলেও তাহাদের অভ্যন্তরের প্রচ্ছন্ন সাধুতা আকস্মিক নহে, তাহা জন্মগত, তাহা স্বভাবগত। বাহিরের কোনো মহাত্মার পুণ্যস্পর্শে সেই ক্ষণিকের খোলস একদিন খসিয়া পড়ে, তখন খাঁটি মানুষটিকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই নিত্যানন্দ প্রভু যখন "মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না" বলিয়া জগাই মাধাইকে আলিঙ্গনপাশে বাঁধিয়াছিলেন তখন অতি অনায়াসে জগাইমাধাইয়ের খাঁটিস্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। জগাইমাধাই, মাতাল ছিল, দুরন্ত ছিল, অত্যাচারী অনাচারী ছিল কিন্তু এ যেন শিশুর দুরন্তপনা—অনাচার তাহাদের সকলকে তাচ্ছিল্যের ফল, অত্যাচার তাহাদের চিন্তাহীনতার ফল। সেই শুভদিনে যখন তাদের কাছে প্রেমপাগল নিত্যানন্দের আবির্ভাব হইল সেদিন তাহারা বুঝিল—যে আনন্দের অন্বেষণে তাহারা পাগল হইয়া ফিরিয়াছে, সে আনন্দ কোথায়। যে ইন্ধন তাহারা অকাতর পরিশ্রমে জড়ো করিয়া তুলিয়াছিল তাহাতে প্রেমানন্দের স্ফুলিঙ্গ পড়িল; তাহাদের অন্তর বাহিরের সকল আবর্জনা জ্বালাইয়া পুড়াইয়া সমস্ত প্রাণমন আনন্দে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

তুচ্ছ তখন সুরাপাত্র! তুচ্ছ তখন ইন্দ্রিয়সুখ! যে সুরার আস্বাদ তাহারা পাইল তুচ্ছ তাহার কাছে শুঁড়ির চুয়ানো সুরা।

এই চিত্রে জগাই মাধাইয়ের এই ভবিষ্যসঙ্কেত শিল্পী অতি নিপুণতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র চিত্রখানি শিল্পীর ভাবুকতা ও অন্তর্দৃষ্টির চমৎকার নিদর্শন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কবীর (প্রথম খণ্ড)—শান্তিনিকেতন গ্রন্থপর্য্যায়ের অন্তর্গত শ্রীক্ষিতি-মোহন সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ২৪ ভাঁজের ১৩২ + ১৬ পৃষ্ঠা মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। কবীরের দোঁহাবলী যে রত্নমালার মতো অকলঙ্ক সুন্দর তাহা কাহারো অবিদিত নাই। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখন তখন ধর্ম্মসংস্কারের জন্য ভগবান বিশেষ বিশেষ ভক্তের প্রাণে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের মুখ দিয়া এমন সব কথা বলান যাহা শুনিলে অন্তরের সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব সঙ্কোচ সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া চিত্ত নির্ম্মল প্রসন্ন হইয়া উঠে। ভারতবর্ষ যখন একদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ডের

হাসি কান্না— শ্রীকৃষ্ণবিহারী দত্ত প্রণীত।

ইংরাজ—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

ভুতের বেগার—শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত।

তিনখানিই কথোপকথনের ছলে লিখিত সুতরাং নাটক বলিতে হয়। কিন্তু এগুলি যে কি ছাই ভস্ম তা বলিতে পারি না। যেমন রুচি কদর্য্য তেমনি লিখিবার ভঙ্গী জঘন্য। সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পুণ্যের জয়—শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি প্রণীত সচিত্র ডিটেক্টিভ উপন্যাস। শ্রীপাঁচকড়ি দে সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত, চট্টগ্রাম। একেবারে ত্র্যস্পর্শা যোগ। বইখানার আগাগোড়া অসামঞ্জস্য। নাম সচিত্র, চিত্র কিন্তু নাই। দীনেশ বাবু ভূমিকা লিখিবেন তিনি কিন্তু লিখেন নাই। প্রথম লাইনেই গ্রন্থকারের উর্ব্বর মস্তিষ্ক "নিবিড় অরণ্যের সম্মুখভাগে একটি পুষ্পোদ্যান" কাল্পনা করিয়াছে। এইরূপ প্রতি ছত্রে অস্বাভাবিকতার ছড়াছড়ি। চোর ডাকাতের দল বৃক্ষকোটরে লুকাইল আর ডিটেকটিভ গাছের গায়ে একটা ফুটোর মুখে অণুবীক্ষন লাগাইয়া সব দেখিল। লেখক চক্ষে অণুবীক্ষন কখনো দেখিয়াছেন কি এবং অণুবীক্ষনের দ্বারা কি হয় জানেন কি? যাহারা নিজেরা না শিখিয়া গ্রন্থকাররূপে পরকে শিক্ষা দিবার স্পর্দ্ধা করে তাহারা কখনো সিদ্ধিলাভ করে না। পাপচিত্র দেখাইতে গিয়া যাহারা কদাচারের প্রকাশ্য চিত্র ভদ্রসমাজে উপস্থিত করে তাহারা সাহিত্যদরবারে দণ্ড পাইবার যোগ্য। গ্রন্থকারের স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহ একটা ধুয়া স্থানাস্থান কালাকাল জ্ঞান নাই বক্তৃতা ও গুরুগিরি করিয়াছেন। একজন যুবতী বিধবাকে দিয়া হঠাৎ একজন অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে গ্রন্থকার বিধবা বিবাহের সপক্ষে যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা কুলনারীর পক্ষে লজ্জা ও অপমানেরই বিষয়।—গ্রন্থকার এক জায়গায় বলিয়াছেন—"পাঠক বোধ করি লেখককে অতিশয় নির্লজ্জ ভাবিতেছেন… আধুনিক যুবক-সম্প্রদায়ের রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাদের ন্যায় হতভাগা লেখকগণকে বই লিখিতে হয় তা নির্লজ্জই বল আর গালই দাও লেখক গ্রহণ করিতে বাধ্য।" আহা বেচারী! দয়া করিয়া লেখনী সংবরণ করিলাম—এমন কদর্য্য জঘন্য বইয়ের সমালোচনা লিখিয়া তাহাকে কলঙ্কিত করিব না।

রেখা- শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ, প্রণীত। ডবল ক্রাউন ষোড় শাংশিত ৯৬ পৃষ্ঠা। মূল্য বারো আনা। এখানি কবিতাপুস্তক। যতীন্দ্র বাবুর পরিণত লেখনীর কবিতাগুলি পরম উপভোগ্য হইয়াছে। তাঁহার শব্দচিত্র, ছন্দের অনাহত লীলা ও ঝঙ্কার, এবং ভাবের রমণীয়তা ইহাতে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে। এই নবীন কবির কবিতাগুলি সরস ও সুখপাঠ্য। তবে কোন কোন কবিতা রবীন্দ্রনাথের ভাবের প্রতিধ্বনি হইয়া পড়িয়াছে মনে হয়। এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা—বহিরাবরণটিও নয়নরঞ্জক হইয়াছে।

মুদ্রা-রাক্ষস।

"খাদ্য"—শ্রীচুনীলাল বসু, এম, বি, এফ, সি, এস্ প্রণীত, সাহিত্য-সভার গ্রন্থ প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা। গুরুদাস লাইব্রেরী প্রভৃতি সকল বিশিষ্ট স্থলেই পাওয়া যায়।

ডাক্তার চুনীলাল বসু সর্ব্বজনবিদিত। তিনি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক। আজ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর যাবৎ এই কার্য্যে ক্রমাগত ব্রতী থাকিয়া কতই অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন। সুতরাং খাদ্য সম্বন্ধে মতামত দিতে কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। আর আমাদের দেশে খাদ্যের বড়ই দুর্দ্দশা। যেমন অভাব তেমনি অজ্ঞতা ও অবহেলা! আমাদের দেশে নাটক নভেল অনেক আছে কিন্তু প্রকৃত শিখিবার বই বড়ই কম। বিশেষ বাঙ্গালা ভাষায় খাদ্য সম্বন্ধে ভালপুস্তক অতিশয় বিরল। আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মত উভয়ই বিশদরূপে অনুশীলন ও সামঞ্জস্য করিয়া এ পুস্তকখানি লিখা। আর এই বইখানি ভাষা ও ভাবে বড় সরল ও প্রাঞ্জল। এই সব নানা কারণে রায় বাহাদুর ডাক্তার চুনীলাল বসুর 'খাদ্য" সম্বন্ধে পুস্তকখানি সাধারণের পক্ষে অতিশয় উপকারী ও জ্ঞানপ্রদ হইয়াছে।

খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণ বিষয়ের অনুশীলন ছাড়াও এই পুস্তকের আর একটু বিশেষত্ব আছে। কার্য্যগতিকে সে বিশেষত্বটুকুর তাঁহার যেমন জানিবার অবসর এমন আর কাহারও নাই, সেটি আমাদের দেশের খাদ্যের ভেজাল সম্বন্ধে। কি কি দিয়া সচরাচর খাদ্যের ভেজাল চলে, ও তাহাতে কিরূপ স্বাস্থ্যের হানি হয়, ও কেমন করিয়াই বা সেগুলি চেনা যায়, ও তন্নিবারণেরই বা উপায় কি, এই সব অত্যাবশ্যক কথা অতি বিশদরূপে অনুশীলন করা হইয়াছে। খাদ্যের ভেজালে, যথা দুধ ঘি তেল ইত্যাদিতে, আমাদের দেশে, বিশেষ কলিকাতাতে, লোকের কতই স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হয়। দেশজুড়া মন্দাগ্নি, অম্লরোগ, রাজযক্ষ্মা, টাইফইড, কলেরা, বেরীবেরী প্রভৃতি রোগ সব আহারেরই দোষে ঘটে। দুধ অভাবে ও দুধের দোষে কত শিশু রোগগ্রস্ত হয় ও মারা যায়। শিশু বয়সে খাদ্যাভাবে দুর্ব্বল হইলে তাহার দুর্ব্বলতা ত অনিবার্য্য হয়। হাজারে আমাদের দেশে তিনশত ত্রিশটি শিশু মারা যায়। যদি চুণীবাবুর লেখা মত অবলম্বন করিয়া এই সবের প্রতিকার হয়, দেশের কত উপকার হইবে। তিনি যেমন সাধারণ লোকদের এবিষয়ে সতর্ক করিয়া সুশিক্ষা দিয়াছেন তেমনি সরকার বাহাদুরদেরও অনুনয় করিয়া এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বলিতে ছাড়েন নাই। এবং উপায়েরও কতক আভাস দিয়াছেন।

বিশেষ ভাষা এত সহজ ও লিখিবার ভাব এত সুবোধ্য ও মধুর যে আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীদের হাতে এই জ্ঞানভাণ্ডার পড়িলে নিঃসন্দেহ অশেষ সুফল ফলিবে। আমরা এই পুস্তকখানি ঘরে ঘরে দেখিতে চাই।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

বীণা।
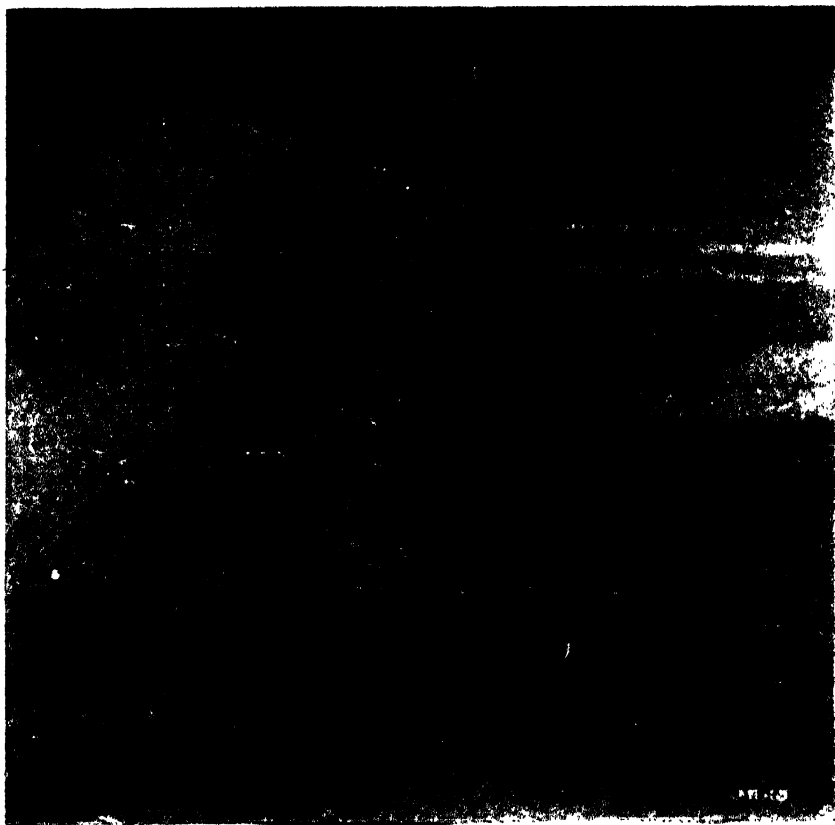
শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত মূল চিত্র হইতে শিল্পীর অনুমতিক্রমে

Three colour blocks by U. Ray. *Kuntaline Press, Calcutta*

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১০ম ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩১৭

২য় সংখ্যা

স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম

যে বস্তু আমাদের বাহিরের বস্তু, তাহার সম্বন্ধে তোমার আমার এ ভেদ বিচার সম্ভবে না। জড়জগৎ আমাদের বাহিরে পড়িয়া আছে। বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা জড়ের জ্ঞান লাভ করি। সুতরাং জল সকলের নিকটেই তরল, বরফ সকলের নিকটেই কঠিন। এ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই জ্ঞান একরূপ। ধর্ম্ম বস্তু যদি এরূপ বাহিরের বস্তু হইত; রাজার আইনের মত, ধর্ম্মের বিধানও যদি বাহির হইতে আমাদের উপরে আসিয়া চাপিয়া পড়িত, তবে ধর্ম্ম সম্বন্ধেও স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম এরূপ ভেদবিভাগের কোনও অবসর থাকিত না। কিন্তু ধর্ম্ম বস্তু অন্তরঙ্গ বস্তু। আমাদের ভিতর হইতে ইহা ফুটিয়া উঠে, বাহির হইতে আসিয়া চাপিয়া বসে না। সুতরাং ধর্ম্মে স্ব পর ভেদ অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য।

কারণ, সকল মানুষ সমান নহে। মানুষে মানুষে এ ভেদ কোথা হইতে আসিল, জানি না। কিন্তু এ ভেদ যে মৌলিক, অনতিক্রমণীয়, ইহা অস্বীকার করা যায় কি? আমাদের চেহারাই যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা নহে; আমাদের মনের গঠনে, চিন্তার প্রণালীতে, ভাবের লীলাখেলায়, আমাদের রুচি ও প্রবৃত্তি, শক্তি ও প্রকৃতি, অন্তররাজ্যের সকল বিষয়েই এক একটা নিজস্ব বা বিশেষত্ব আছে। ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকারে আমাদের যে বিষয়জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সে জ্ঞান মোটের উপরে সকলেরই সমান হইলেও, সে জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া আমাদের চিত্তে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা সকলের এক হয় না। একই দৃশ্য দর্শনে কারও বা আসক্তির, কারও বা বিরক্তির উদ্রেক হয়। একই বস্তুর ধ্যানে কেহবা এক রস, আর কেহ বা অন্যবিধ রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। আর এই ভাব, এই রস, এই আস্বাদন বিভিন্ন হয় বলিয়া, তৎ সম্বন্ধে আমাদের কার্য্যাকার্য্যেরও অশেষ প্রকারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এ সকল বৈষম্য বাহির হইতে আইসে না, ভিতর হইতেই ফুটিয়া উঠে। এ সকলে আমাদের অন্তরঙ্গ প্রকৃতির মৌলিক বৈষম্যই প্রতিষ্ঠিত করে। ধর্ম্ম বস্তু অন্তরঙ্গ বস্তু। আর ইহা একান্ত অন্তরঙ্গ বস্তু বলিয়াই, ইহাতে স্ব-পর ভেদ অনিবার্য্য। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের নিজস্ব বা বিশেষত্বটুকুকে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কেন?

অথচ অতিশয় আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আধুনিক কালে যাঁহারা ধর্ম্ম বস্তুকে একান্তভাবে মানবের অন্তরেই প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইতেছেন, তাঁহারাই আবার ধর্ম্মে যে সত্যসত্যই স্ব-পর-ভেদ আছে, ইহা স্বীকার করিতে চান না।

যাঁহাদের ধর্ম্মের প্রামাণ্য ভিতরে ততটা নহে যতটা বাহিরে; যাঁহারা অতিপ্রাকৃত-শাস্ত্রের বা বিশিষ্ট অবতার, প্রবক্তা, বা গুরুর উপদেশের ও সাক্ষ্যের উপরে ধর্ম্মকে স্থাপিত করিতে যান, তাঁহারা স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম এ ভেদ অলীক বলিয়া অস্বীকার করিতে পারেন। খৃষ্টীয়ান্ সহজেই একথা বলিতে পারেন যে, ধর্ম্মের প্রামাণ্য যখন বাইবেল

গ্রন্থ, আর এই গ্রন্থ আমরা যখন আমাদের নিজেদের মনের ভিতর হইতে গ’ড়িয়া তুলি নাই, সত্যের চিরন্তন সাক্ষী স্বরূপে ইহা যখন তোমার আমার সকলেরই বাহিরে প্রতিষ্ঠিত আছে, তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমার আর আমার— স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম—এমন কথা আদৌ উঠিতেই পারে না। এখানকার ভেদ ধর্ম্মে আর অধর্ম্মে, সত্যে আর অসত্যে। তোমার ধর্ম্ম তোমার, আমার ধর্ম্ম আমার, তোমার সত্য তোমার, আর আমার সত্য আমার—এ রাজ্যে এমন অদ্ভুত দাবি চলিতেই পারে না।

জগতের যে সকল ধর্ম্ম মতবিশেষের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যাহাদের প্রামাণ্য অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র বা প্রবক্তা বা গুরু বা অবতার, ইংরেজি ভাষায় যে সকল ধর্ম্মকে ক্রেড্যাল রিলিজন—credal religion—বলা হয়, সে সকলে “স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ” —এমন উপদেশের স্থান নাই, থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মের প্রামাণ্য বাহিরে অন্বেষণ করেন না, কিন্তু মানবের অন্তরেই স্থাপন করিয়া থাকেন, যাঁহারা ধর্ম্মকে একান্তভাবে শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাঁহারা কেমন করিয়া এই উপদেশকে উড়াইয়া দিতে পারেন, ইহা বুঝি না।

বাহিরের প্রামাণ্য একান্তভাবে বর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মকে শুদ্ধ অন্তরের অনুভূতির উপরে স্থাপন করিলে, তাহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়; সত্যে ও মতে কোনই প্রভেদ থাকে না, ইহা বুঝি। শাস্ত্র গুরু একান্তভাবে পরিহার করিয়া, ধর্ম্মকে প্রাকৃতজনের চঞ্চল বিচারবুদ্ধির উপরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাতে, তাহার স্থায়িত্ব ও সনাতনত্ব অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়, স্বীকার করি। যাঁহারাই ধর্ম্মকে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ, অধিকারী ও অনধিকারী, এ সকল বিচার না করিয়া, ব্যক্তিগত মতামতের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই যে কালক্রমে আপনাদের ধর্ম্মসাধনের ও ধর্ম্মসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া ভীত হইয়াছেন, ইহাও জানি। এবং এই সাংঘাতিক আপত্তি খণ্ডনের চেষ্টায়, তাঁহারাই যে আবার প্রাচীন শাস্ত্র, প্রাচীন গুরু, প্রাচীন প্রবক্তা ও পয়গম্বরদিগকে উড়াইয়া দিয়াও, পরিণামে নূতন সংহিতা, নূতন গুরু, নূতন প্রবক্তার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহাও দেখিয়াছি। সত্যের নামে, স্বাধীনতার নামে, ধর্ম্মের নামে ও মনুষ্যত্বের নামে যাঁহারা জনসমাজের প্রাচীন বন্ধনকে নির্ম্মমভাবে ছেদন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই যে আবার আপনাদের দুদিনের মত ও সংস্কারের বন্ধনে দুনিয়াকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাও অবিদিত নহে। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। মানুষ যেখানেই আধখানা সত্য লইয়া কলহ-কোলাহলে প্রবৃত্ত হয়, সেখানেই শেষে আপনার অসঙ্গতিজালে আপনি আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

যাঁহারা ধর্ম্মকে একান্তভাবে বাহিরের প্রামাণ্যের উপরে, অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র বা গুরু বা অবতারাদির উপরে, প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা সত্যের আধখানা মাত্র ধরিয়াছেন। অন্যপক্ষে যাঁহারা এই অপূর্ণ সত্যকে একান্ত অসত্য ভাবিয়া, ইহার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া, ধর্ম্মবস্তুকে একান্তভাবে শুদ্ধ অন্তরের অনুভূতির উপরেই স্থাপন করিতে গিয়াছেন, তাঁহারাও সত্যের আধখানা মাত্র ধরিয়াছেন। ফলতঃ ধর্ম্মবস্তু একান্ত বাহির হইতেও আসে না, একান্ত ভিতর হইতেও ফুটিয়া বাহির হয় না। মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের সকল বিষয়েই ভিতরের সঙ্গে বাহিরের একটা নিত্য, অপরিহার্য্য, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে।

আপাততঃ হয়ত আমরা এমনও ভাবিতে পারি যে এই বিশাল জড়রাজ্য আমাদের বাহিরে পড়িয়া আছে, এবং বাহির হইতেই আমরা ইহাকে জানিয়া থাকি। কিন্তু সত্য কথা ইহার বিপরীত। আমাদের জ্ঞানের বিষয় বাহিরের সত্য, কিন্তু আমাদের মনের ভিতরে কতকগুলি ছাঁচ আছে, সেই ছাঁচের ভিতর দিয়াই বাহিরের সর্ব্ববিধ বিষয় আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। এই ছাঁচটা আমাদের ভিতরকার বস্তু, আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি।

এই ছাঁচটা কিন্তু সকলের ঠিক সমান নয়। এই জন্য বাহিরের বিষয় যখন একই হয়, তখনও সেই একই বিষয় অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা সর্ব্বথা এক আকারের হয় না। আর বাহিরের বিষয় যেমন মনের এই অন্তরঙ্গ ছাঁচে পড়িয়াই কেবল আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে, সেইরূপ মনের ভিতরকার এই ছাঁচগুলিও, বাহিরের বিষয়ের সংস্পর্শে না আনা পর্য্যন্ত কখনও সজাগ, সচেতন, কার্য্যকরী হয় না। যতক্ষণ না বাহির হইতে [illegible]

হয়, ততক্ষণ এই ভিতরকার ছাঁচগুলো শূন্য পড়িয়া থাকে। ততক্ষণ তাহারা তাহাদের নিজেদের স্বরূপও প্রকাশিত করিতে পারে না, আর বিষয়ের রূপও প্রকাশিত করিতে পারে না। যে বিষয়ের অনুরূপ ছাঁচটা আমাদের ভিতরে নাই, আমরা কিছুতেই বাহির হইতে সে বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। "যা নাই ভাণ্ডে তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে," এই প্রচলিত কথাতে ভাণ্ড বলিতে মনের ভিতরকার এই ছাঁচগুলোই বোঝায়, আর ব্রহ্মাণ্ড বলিতে আমাদের বাহিরের এই বিশাল বিষয়রাজ্যকেই নির্দ্দেশ করে। কিন্তু "যা নাই ভাণ্ডে তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে," এ কথা যেমন সত্য, যাহা না পাই ব্রহ্মাণ্ডে তাহা দেখি না ভাণ্ডে, এ কথাটাও তেমনি সত্য। ভাণ্ড সত্যের আধখানা ধারণ করিয়া আছে, ব্রহ্মাণ্ডে তার অপরার্দ্ধ রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে ভাণ্ডের, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর, জ্ঞেয়ের সঙ্গে জ্ঞাতার, ভোগ্যের সঙ্গে ভোক্তার সম্বন্ধ আকস্মিক নহে, নিত্য, এ সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী মাতা-পুত্রবৎ। যেখানে পুত্র নাই সেখানে মাতাও নাই; যেখানে মাতা নাই সেখানে পুত্রও নাই। মাতার মাতৃত্বের উপরেই পুত্রের পুত্রত্ব, আর পুত্রের পুত্রত্বের উপরেই মাতার মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের উপরেই ভাণ্ডের, বাহিরের উপরেই ভিতরের, বিষয়ের উপরেই বিষয়ীর; এবং অন্যদিকে ভাণ্ডের উপরেই ব্রহ্মাণ্ডের, বিষয়ীর উপরেই বিষয়ের, ভিতরের উপরেই বাহিরের প্রতিষ্ঠা। একে ছাড়িয়া অপরে থাকিতে পারে না। যাঁহারা ধর্ম্মকে একান্তভাবে বাহিরের শাস্ত্র, গুরু, প্রবক্তা বা অবতারের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাঁহারা কেবল ব্রহ্মাণ্ডকেই দেখেন। যে ভাণ্ড না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ডের কোনও জ্ঞান, কোনও অর্থ সম্ভব হয় না, সেই ভাণ্ডের প্রতি তাঁহারা যথোপযুক্ত মনোনিবেশ করেন না। তাঁহারা এটি তলাইয়া দেখেন না, যে, সত্যের চূড়ান্ত আপীল-আদালত আমাদের মনের ভিতরে। শাস্ত্র বল, গুরু বল, প্রবক্তা বল, অবতার বল, সকলেই স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া, আপন আপন আধ্যাত্মিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন।

দুনিয়ায় তো শাস্ত্র অনেক, গুরু অনেক, প্রবক্তা অনেক, প্রত্যেক ধর্ম্মই তো এক বা ততোধিক পয়গম্বর বা অবতারের দাবি দায়ের করিয়া থাকেন। অথচ সকল লোকে সমান ভাবে, এই সকল শাস্ত্রকে, এই সকল গুরুকে, এই সকল প্রবক্তা, পয়গম্বর বা অবতারকে গ্রহণ করিতে পারে না কেন? একই শাস্ত্র যাঁহারা মানেন, একই পয়গম্বরের বা একই প্রবক্তার, বা একই অবতারের আনুগত্য যাঁহারা মোটামুটি স্বীকার করেন, তাঁরা সকলেই বা কেন সেই শাস্ত্রের একই অর্থ করেন না? একই বেদের উপরে হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু হিন্দুর সম্প্রদায় অসংখ্য; এমন কেন হয়? একই বাইবেলের উপরে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, একই কোরানের উপরে মুসলমানধর্ম্ম, একই বুদ্ধের উপদেশের উপরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত; অথচ সকল খৃষ্টীয়ান, সকল মুসলমান, বা সকল বৌদ্ধ, এক মতাবলম্বী, বা এক সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, একই শাস্ত্রের একই উপদেশের, বিভিন্নার্থ করিয়া থাকেন কেন? ইহার অর্থ এই যে, স্বানুভূতিকে ছাড়িয়া শাস্ত্র বল, অবতার বল, প্রবক্তা বল, পয়গম্বর বল, কেহই কাজ করিতে পারেন না। বাহিরের শাস্ত্র, বাহিরের গুরু, বাহিরের প্রবক্তা, বাহিরের যাবতীয় বস্তু কেবল আমাদের মনের ভিতরকার ছাঁচে পড়িয়াই, সেই ছাঁচের আকারে, সেই অন্তরঙ্গ অনুভূতির মধ্য দিয়াই আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত ও চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। একান্ত-ভাবে যাঁহারা ধর্ম্মকে বাহিরের প্রামাণ্যের উপরে,—অতি-প্রাকৃত-শাস্ত্র গুরু প্রভৃতির উপরে, স্থাপন করিতে চাহেন, তাঁহারা এ তত্ত্বটী ভাল করিয়া তলাইয়া দেখেন না।

আর অন্যদিকে যাঁহারা বাহিরের শাস্ত্র, বাহিরের গুরু, বাহিরের সিদ্ধ মহাজন, প্রবক্তা, পয়গম্বর, বা অবতারাদিকে একান্তভাবে অগ্রাহ্য করিয়া, শুদ্ধ ভিতরকার অনুভূতির উপরেই ধর্ম্মকে স্থাপন করিতে চান, তাঁহারা বিপরীত ভ্রান্তিতে পতিত হন। তাঁহারা এটি তলাইয়া দেখেন না, যে, ব্রহ্মাণ্ড না হইলে ভাণ্ড শূন্য পড়িয়া থাকে, কেবল ভাণ্ড হইতে কোনও জ্ঞান, কোনও তত্ত্ব, কোনও অনুভূতিই জন্মে না। জ্ঞানমাত্রেই বস্তুতন্ত্র, বিষয়ের অধীন। যতক্ষণ না আমরা বিষয়ের সম্মুখীন হই, ততক্ষণ আমাদের বিষয়জ্ঞানও জন্মে না, আত্মজ্ঞানও জন্মিতে পারে না। বিষয়ের ভিতর দিয়াই, আমরা নিজেদের বিষয়ীরূপে,

জ্ঞাতারূপে, জানিতে ও ধরিতে পারি। আর জ্ঞান সর্ব্বদাই বিষয়ানুরূপ হয়। বিষয় যদ্রূপ, জ্ঞানও তদ্রূপ, আব জ্ঞান যেরূপ যতটুকু, জ্ঞাতাও সেইরূপ ততটুকু মাত্রই প্রকাশিত হন। জ্ঞানের ভিতর দিয়াই জ্ঞাতার সার্থকতার ওজন হইয়া থাকে। যেখানে জ্ঞেয় বস্তু ক্ষুদ্র, জ্ঞানও সেখানে ক্ষুদ্র, জ্ঞাতাও সেই জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যে সার্থকতা লাভ করেন, তাহা তাহারই অনুরূপ ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর হয়। জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভিতরে, একটা নিরবচ্ছিন্ন আদান প্রদানের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিষয়কে জানিতে যাইয়া আমরা সর্ব্বদাই বিষয়ের হস্তে নিজেদের সমর্পণ করি, আর এই বিষয় আপনি আমাদের যতটুকু গ্রহণ করিতে পারে, ততটুকু আমাদের ফিরাইয়া দিয়া সেই পরিমাণ আত্মজ্ঞানই আমাদের জন্মাইয়া থাকে। প্রতিনিয়তই আমি আমার আত্মচৈতন্যের চরিতার্থতার জন্য আমাকে বিষয়ের হস্তে প্রকাণ্ডভাবে অর্পণ করিতে চাই, কিন্তু বিষয় কিছুতেই আমাকে একান্ত ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ আমি ক্ষুদ্র হইলেও পূর্ণ। আমি সমগ্রেরই স্বরূপ। আমি বিষয়ী, সর্ব্বদাই বিষয়ের উপরে, বিষয়ের অতীতে, বিষয়কে অধিকার করিয়া, বিষয় হইতে বড় হইয়া বহিয়াছি। সুতরাং বিষয় যত কেন বড় হউক না, আমার পূর্ণতাকে, আমার সমগ্রকে, কিছুতেই নিঃশেষে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বিষয় আমার সম্মুখীন হইয়া আমার বিষয়ীরূপ পূর্ণতার অংশমাত্র স্পর্শ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই অংশকে স্পর্শ করিয়াই তাহার পশ্চাতের অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত পূর্ণতাকেও নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই জন্য আমি যাহা জানি, আমার জ্ঞান সর্ব্বদাই তাহার চাইতে বড় হইয়া থাকে। যেমন আমাদের দৃষ্টিগোচর যে ক্ষুদ্র, পরিচ্ছিন্ন দেশাংশ প্রকাশিত হয়, তাহা সর্ব্বদাই নিজেকে প্রকাশিত করিতে যাইয়া, অনন্ত দেশের সংবাদ দিয়া যায়, যেমন পলবিপলাদি ক্ষুদ্রতম কালবিভাগ, নিজেদের খণ্ডতাকে জানাইতে গিয়াই যে অখণ্ড ঘটনাবলীর উপরে অনন্ত কালপ্রবাহ প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে নির্দ্দেশ করে, সেইরূপ প্রত্যেক বিষয় আমাদের জ্ঞানের সম্মুখীন হইয়া আমাদের ক্ষুদ্র খণ্ডবিশিষ্ট জ্ঞানের ভিতর দিয়াই এ সকলের পশ্চাতে যে বৃহৎ অখণ্ড, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানসমুদ্র পড়িয়া আছে, তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই জন্য আমরা বিশেষ বস্তুকে জানিবা মাত্রই তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ ভাল মন্দ ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ত্ব ইত্যাদি গুণের ওজন ও বিচার করিতে সমর্থ হই। কোনো বস্তুরই নিজেদের দ্বারা নিজের বিচার হয় না। তদপেক্ষা বৃহত্তর সমজাতীয় বস্তুর কাছে লইয়া গিয়াই তাহাব ভাল মন্দ বিচার করিতে হয়। বিচার্য্য বস্তু অপেক্ষা বিচারের মাপকাটিটা সর্ব্বদাই বড় হওয়া চাই। এই মাপকাটিটা আমাদের অন্তরের বস্তু। সে মাপকাটি যে কত বড় আমরা তাহা বলিতে পারি না, তাহার ধারণা আমাদের পক্ষে সম্ভবে না। কিন্তু আমরা এটি সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করি যে বাহিরের বিচার্য্য বিষয় যতই বাড়ুক না কেন, আমাদের ভিতরকার এই মাপকাটিটা সে বিষয়ের সম্মুখীন হইবা মাত্রই তাহাকে আপনা হইতেই ছাড়াইয়া উঠে, আর ছাড়াইয়া উঠে বলিয়াই অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিবা মাত্রই আমরা তাহার ভাল মন্দ সত্যাসত্যাদির বিচার করিতে সমর্থ হই।

কিন্তু জ্ঞান আর উপলব্ধি ঠিক এক বস্তু নহে। জ্ঞান ভিন্ন উপলব্ধি হয় না, সত্য। কিন্তু জ্ঞান সর্ব্বদাই আপনাকে ছাড়াইয়া উঠিলেও এই জ্ঞান অবলম্বনে যে উপলব্ধি উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বদাই জ্ঞেয়ের অনুরূপ হইয়া থাকে। প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়াতে জ্ঞাতা আপনাকে জ্ঞেয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকেন। এই জ্ঞেয় তাঁহার যতটুকু ধারণ করিতে সমর্থ হয়, ততটুকু মাত্রই তাঁহার সমক্ষে প্রকাশিত করে। বিষয় কিছুতেই আপনার বিষয়ত্বের সীমাকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। আর জ্ঞেয় জ্ঞাতাকে যতটুকু পরিমাণে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে, আপনার ভিতর দিয়া প্রকাশিত করিতে পারে, ততটুকু পরিমাণেই সেই বিষয়ের সাহায্যে, সেই বিষয়সাক্ষাৎকারে বিষয়ীর আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। মৃৎপিণ্ডকে লইয়া আমরা যতই নাড়াচাড়া করি না কেন, মৃৎপিণ্ডকে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিয়া, মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের ভিতর দিয়া আমরা জ্ঞাতারূপে যা-কিছু সার্থকতা লাভ করিতে পারি, তাহা কিছুতেই মাটিকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। সেইরূপ পশুজগতের সাক্ষাৎকারে, পশুজীবনকে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিয়া, পশুকুলের সঙ্গে আমাদের যে সাধারণ ধর্ম্ম আছে,

কেবল তাহাই মাত্র ধরিতে ও সাধন করিতে পারি, আমাদের পশুত্বকেই এক্ষেত্রে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহার উপরে উঠা সাধ্যায়ত্ত হয় না। তেমনি মানুষ যখন আমাদের সম্মুখীন হইয়া, আমাদের বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন আমরা তাঁহাকে জানিয়া, নিজেদের সাধারণ মনুষ্যত্ব মাত্র উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। সেইরূপ যাঁহাদের মধ্যে জীবত্ব, সাধনপ্রভাবে, শিবত্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাঁহারা জীবন্মুক্ত, সেই সকল সিদ্ধ মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎকার যখন লাভ করি, তাঁহাদের দেবচরিত্র যখন আমাদের মনের ভিতরকার ছাঁচে পড়িয়া আমাদের জ্ঞানের, ধ্যানের, ভক্তির, ভোগের বিষয়ীভূত হয়, তখন আমরা তাঁহাদিগের সাহায্যে নিজেদের দেবত্ব, শিবত্ব, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব অনুভব ও উপলব্ধি করিয়া থাকি।

বাহিরের বিষয়কে অবলম্বন করিয়া আমাদের অন্তরের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সেই বিষয়কে ধরিয়াই জ্ঞান উত্তরোত্তর পূর্ণতা ও পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এই বাহিরের আশ্রয় ব্যতিরেকে জ্ঞানক্রিয়া অসম্ভব, জ্ঞানের গতি অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। সেইরূপ বাহিরে বিবিধ রসের যে মূর্ত্তি ও ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, সেই সকল অবলম্বন করিয়া, তাহাদেরই আশ্রয়ে আমাদের অন্তরে রসানুভূতি লাভ হইয়া থাকে। রসের মূর্ত্তি নাই, বিষয় নাই, বহিঃপ্রকাশ নাই, অথচ শুদ্ধ ঐকান্তিক আন্তরিক রসসম্ভোগ হয়, ইহা একান্তই অসম্ভব। বাহিরের বিষয় ধরিয়াই অন্তরে জ্ঞান ফুটে। বাহিরের রসমূর্ত্তিকে দেখিয়াই অন্তরের রঞ্জিনীবৃত্তি নাচিয়া উঠে। তেমনি বাহিরে ধর্ম্মের যে মূর্ত্তি ও ক্রিয়াকলাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নিত্য নিত্য ধার্ম্মিকমণ্ডলীর জীবনে ও চরিত্রে যে মূর্ত্তি ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার সাক্ষাৎকারে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া, তাহারই প্রেরণাতে আমাদের অন্তরে ধর্ম্ম সজাগ হইয়া উঠে। ধার্ম্মিকের সঙ্গে ধর্ম্মের, শাস্ত্রের সঙ্গে স্বানুভূতির, বাহিরের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মচরিত্রাদির সঙ্গে অন্তরের ধর্ম্মভাবের, ও ধর্ম্মের আদর্শের এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। ধর্ম্ম বাহির হইতে আসে না, অন্তরেই জাগ্রত হয়। কিন্তু বাহিরে ধর্ম্মের যে প্রকাশ, শাস্ত্র গুরু প্রভৃতিতে ধর্ম্মের যে মূর্ত্তি প্রকট হইয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া, তাহার সহায়ে, তাহার প্রেরণায় ধর্ম্ম জাগে। ধর্ম্মে শাস্ত্র গুরু প্রভৃতিরও স্থান আছে। আর এ স্থান ও অধিকার অসত্য নহে, সত্য; আকস্মিক নহে, নিত্য।

আমাদের অন্তরের জ্ঞান ভাবাদি সকল বিষয়েরই সঙ্গে বাহিরের যে একটা সত্য, নিত্য, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, জ্ঞানের, রসের, ধর্ম্মের সকল আন্তরিক অভিজ্ঞতারই ভিতরে ও বাহিরে যে দুইটী মূর্ত্তি দেখিতে পাই, ইহার অর্থ এই যে, আমাদের অন্তর ও বাহির উভয়ই এক অখণ্ড নিত্য সত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সেই একেরই অভিব্যক্তি বাহিরে, আর তাঁহারই অভিব্যক্তি আমাদের অন্তরে। একই জ্ঞানবস্তু, একই নিত্যসিদ্ধ চৈতন্য একদিক দিয়া আমাদের জ্ঞানে, আমাদের বুদ্ধিতে ও অপর দিক দিয়া বাহিরের জ্ঞেয় বিষয়রাজ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন বলিয়া আমরা বাহিরের বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞানসূত্রে আবদ্ধ হইতেছি। সেই পরম চৈতন্যই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞাতা; জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা,—এই সম্বন্ধ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। সেখানেই অন্তর বাহিরের সমন্বয়। সেইরূপ একই নিখিল রস, বাহিরের রসমূর্ত্তি সকলে ও অন্তরের রসগ্রাহী রঞ্জিনীবৃত্তির ভিতরে উভয়তঃ প্রকাশিত হইতেছেন বলিয়া, আমাদের সর্ব্ববিধ ভোক্তাভোগ্যের সম্বন্ধ সম্ভব হইতেছে। সেই রসস্বরূপে আমাদের সকল আনন্দের অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত। ভিতরে সম্ভোগেও সেই একই রসস্বরূপ, বাহিরে ভোগ্যেও সেই একই রসস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। রসরাজ্যে তাঁহাতেই অন্তর বাহিরের সম্মিলন ও সমন্বয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাহাই। ধর্ম্মের বহিরঙ্গ শাস্ত্র গুরু, আচার অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম্ম,—এ সকলই তাঁহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, আর অন্তরের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মের প্রেরণাও তাঁহা হইতেই আসিতেছে। তিনিই ধর্ম্মাবহ হইয়া বাহিরে, সমাজের জীবনে, অন্তরে, প্রত্যেক ব্যক্তির অনুভূতিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। এই জন্যই সমাজ-জীবনের বিধি নিষেধ ব্রতানুষ্ঠানাদির সঙ্গে আমাদের অন্তরের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির যোগ ও আদান প্রদান সম্ভব হইতেছে। কিন্তু সকল বিষয়েই ভিতর বাহির অপেক্ষা বড়। বাহিরে স্থিতির শক্তি, ভিতরে উন্নতির প্রেরণা। বাহিরের সাহায্যে ভিতরকার জ্ঞানভাবাদি যতই জাগিয়া উঠে, ততই আবার এই

ভিতরকার ভাবের প্রেরণায় বাহিরের জ্ঞানাঙ্গ, ভাবাঙ্গ, কর্ম্মাঙ্গ প্রভৃতিও উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি লাভ করে। আর যে অদ্বৈততত্ত্বে ভিতর বাহিরের সমন্বয় হয়, সেই অদ্বৈত-তত্ত্বেই স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই উপরে পরধর্ম্মেরও প্রতিষ্ঠা।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহাত্মা কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসাধন

মহাত্মা কেশবচন্দ্র বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ; তাঁহার কার্য্য অতি অদ্ভুত; তিনি ধর্ম্মের উন্মাদিনী শক্তিতে উন্মত্ত হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃদয়ে ধর্ম্মের এক বৈদ্যুতিক তেজ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। সেই তেজে তেজস্বী হইয়া এ দেশের অনেক যুবক দৃঢ়মুষ্টিতে সত্য ও ন্যায়কে ধরিয়া পাপ ও দুর্নীতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন, এবং অনেক তরুণবয়স্ক ব্যক্তি সদর্পে বিষয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেশের সেবায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। কেশবচন্দ্র তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও বাগ্মিতাশক্তির সাহায্যে আধ্যাত্মিক সত্যকে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই জন্য জগতের ধর্ম্মসমাজের লোকেরা বিস্ময়পূর্ণনেত্রে তৎ-প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। এমন এক সময় ছিল, যখন কেশবচন্দ্র কোন্ নূতন কথা বলিলেন, কোন্ নূতন সত্য প্রচার করিলেন, তাহা জানিবার জন্য ইংলণ্ড ও এমেরিকার ধর্ম্মসমাজের লোকেরা উৎসুক হইয়া থাকিতেন। সুতরাং যে সময় দেশের লোক সর্ব্বপ্রকার উন্নতিলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন, তৎকালে কেশব-চন্দ্রের জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। এই জন্য আমরা কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসাধন কর্ম্মযোগ ও ধর্ম্ম-প্রচার বিষয়ে আলোচনা করিব।

সর্ব্বাগ্রে কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক। কেশবচন্দ্র হৃদয়ে স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অন্তরে সেই ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যখন অল্পবয়স্ক বালক, তখনই মৎস্য ও মাংস-আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই বাল্যকালে প্রতিদিন স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিতেন, সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম অঙ্কিত করিতেন; ইহাতে তাঁহার দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি হইত; একটি পুণ্যশ্রীতে তাঁহাকে তাপস-বালক বলিয়া মনে হইত।

কেশবচন্দ্রের তরুণবয়সে তাঁহার পৈতৃক বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু হিন্দুকলেজে ইংরাজি সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার পর, আর কোন প্রাচীন ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাহা বলিয়া তিনি উন্মার্গগামী যুবকদিগের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন নাই। কেশবচন্দ্র নাকি পরবর্ত্তী সময়ে লোকের ধর্ম্মগুরু হইবেন, সেই জন্য জীবনের এই উষাকালে ধর্ম্মের এক অনুপম আলোকচ্ছটা তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইল; সেই নির্ম্মল আলোকরশ্মিতে তাঁহার জীবনপুষ্পের দলগুলি বিকশিত হইয়া উঠিল; সুমধুর গীতধ্বনির ন্যায় ঈশ্বরের অমৃতময়ী বাণী তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিল। তিনি স্পষ্টই শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহার প্রাণের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—

"তুমি প্রার্থনা কর, তুমি প্রার্থনা কর।"

কেশবচন্দ্র অকস্মাৎ এই বাণী শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। বিশ্বাস ও ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র স্বয়ং **"জীবনবেদ"** গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

"ধর্ম্মজীবনের সেই প্রথম উষাকালে 'প্রার্থনা কর', 'প্রার্থনা কর' এই ভাব, এই শব্দ, হৃদয়ের ভিতর হইতে উত্থিত হইল। * * জীবনের সেই সময় আলোকের প্রথমাভাস স্বরূপ 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই' এই শব্দ উচ্চারিত হইল। * * কে প্রার্থনা করিতে বলিল, তাহাও লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভ্রান্ত হইতে পারি, এ সন্দেহও হইল না। প্রার্থনা করিলাম।"

কেশবচন্দ্র এই প্রার্থনার সাহায্যেই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তাঁহার অন্তরে নিরাকার অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের সত্তা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার পর স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের রচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের একখানি গ্রন্থ কেশবচন্দ্রের হস্তগত হইল। গ্রন্থখানি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস কি, তাহাই উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত ছিল। কেশবচন্দ্র দেখিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসের সঙ্গে

তাঁহার অন্তরাগত ধর্ম্মভাবের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। এজন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন। তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের পরিচালক ও প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তৎকালে হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে দেবেন্দ্রনাথ ঋষিত্ব লাভ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সহাধ্যায়ী কেশবচন্দ্রকে মহর্ষির নিকট উপস্থিত করিলেন। মহর্ষি কেশবচন্দ্রের সৌম্যমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন; কেশবচন্দ্রের ভিতরে যে এক আধ্যাত্মিক তেজ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা মহর্ষির চক্ষে ধরা পড়িল। একজন বৈজ্ঞানিক খনির উপরের মৃত্তিকাস্তর দেখিয়াই বুঝিতে পারেন, ভিতরে স্বর্ণখণ্ড লুক্কায়িত আছে। তেমনি মহর্ষি কেশবচন্দ্রের জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়াই বুঝিলেন, ইঁহার আত্মার মধ্যে আধ্যাত্মিক রত্ন লুক্কায়িত আছে। মহর্ষি তাই শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত এই তরুণ যুবককে গ্রহণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কেশবচন্দ্র মহর্ষির প্রিয় শিষ্য ও প্রিয়তম পুত্রের মধ্যে গণ্য হইলেন।

ধর্ম্মপ্রাণ কেশবচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংসর্গে বাস করিয়া সাধনের জন্য অধিক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রথমতঃ বৈরাগ্য ও পবিত্রতা লাভের জন্যই সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাপের প্রতি ভয়ঙ্কর ঘৃণা জন্মিয়াছিল। অন্তরে পাপবোধ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষের মন যখন ঈশ্বরকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং হৃদয়ে স্বর্গের রশ্মি আসিয়া পড়ে, তখন স্বভাবতঃই আত্মদৃষ্টি প্রবল হয়; মানুষ আপনার মধ্যে পাপের সূক্ষ্মরেখা দেখিয়াও ভয়ে ভীত হইয়া উঠে। কেশবচন্দ্রের তাহাই হইয়াছিল। তিনি আপনার হৃদয়কে নির্ম্মল পুষ্পদলের ন্যায় সুপবিত্র রাখিবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কেশবচন্দ্র "বিয়োগ ও সংযোগ" শীর্ষক উপদেশে বলিয়াছেন—

"কিসে পাপ যায়, প্রথম এই একই চেষ্টা ছিল; কিসে মনে কুপ্রবৃত্তি না হয় এই ভাবই ছিল। কিসে পরসেবা করিয়া সার্থকজন্মা হইব, কয়েক মাস ধরিয়া এই ভাবই মনের স্থায়ী ভাব হইল। * * কখনও বৈরাগ্য, কখনও পুণ্য, কখনও প্রেম একটি একটি করিয়া সাধন করিয়াছি। ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে প্রথম ন্যায়ের ভাবই হৃদয়ে প্রবল হইয়া প্রকাশিত হয়।"

কেশবচন্দ্র পবিত্রতা ও বৈরাগ্যের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলেন; তাহার পর তাঁহার স্বচ্ছ হৃদয়ে ভক্তির প্রকাশ হইল। তিনি ভক্তিতে বিভোর হইয়া প্রকাশ্য রাজপথে সঙ্কীর্ত্তন বাহির করিলেন। আমরা এখন দেখিতেছি, শিক্ষিত লোকেরাও মস্তক মুণ্ডন ও সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম অঙ্কিত করিয়া রাজপথে কীর্ত্তন করিতে বাহির হন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তি কীর্ত্তনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন? সর্ব্বপ্রথম ভক্ত কেশবচন্দ্র মহাত্মা চৈতন্যের হৃদয়োন্মাদকারী কীর্ত্তনকে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে লইয়া আসিলেন; শান্তিপুরের গোস্বামী বংশের ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার সাহায্য করিলেন। কেশবচন্দ্র স্বীয় অন্তরে ভক্তির স্ফূরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"এই জীবনে প্রথম ভক্তি ছিল না, প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না; অল্প অনুরাগ ছিল। ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য। তিনের প্রথম অক্ষর ব, স্মরণের পক্ষে সুযোগ। তিন লইয়া এই সাধক ধর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। ক্রমে আর যাহা প্রয়োজনীয়, সমস্তই দেখা দিল। * * ঈশ্বরপ্রসাদে অবশেষে ভক্তির সঞ্চার হইল।"

ভক্তির সঞ্চার হইল বটে; কিন্তু কেশবচন্দ্র সাধনে নিবৃত্ত হইলেন না। কারণ ভক্তির সাধন দুচারি দিনেই শেষ হইবার নহে। ভক্ত নব নব সাধনের দ্বারা যতই বিশ্বাস ও ভক্তিলাভ করিতে থাকেন, ততই তাঁহার চিত্ত সৌন্দর্য্যময়ের অনুপম রূপমাধুরী দর্শন করিয়া, ভক্তির নূতন নূতন ভাব লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাই সাধক সাধনের নব নব উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া যান। কেশবচন্দ্রও সাধনের নূতন নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া, তদনুসারে সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সাধনের জন্য কেশবচন্দ্র বেলঘরিয়ার উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। এই উদ্যানটি অতিশয় রমণীয়। ইহার চতুর্দ্দিকে হরিৎবর্ণ তরুলতা ও শ্যামল তৃণরাজি শোভা পাইত; বৃক্ষশাখা সবুজ পত্রে ও পুষ্পস্তবকে অত্যন্ত মনোহর হইয়া উঠিত; বিহঙ্গমগণ সুস্বরে কানন মধুময় করিয়া তুলিত এবং প্রজাপতি স্বর্ণপাখা বিস্তার করিয়া ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়াইত। কেশবচন্দ্র তাঁহার প্রচারক সঙ্গীদিগকে লইয়া এই মনোরম উদ্যানে স্বহস্তে রন্ধন ও শাকান্ন ভোজন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেন। প্রচারকগণ তাঁহার সাধনশক্তির সঙ্গে রন্ধন-নৈপুণ্য দেখিয়াও বিস্মিত হইতেন।

বেলঘরিয়ার উদ্যানেই মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পরমহংস মহাশয় পরম উদারচিত্ত ভক্ত ও ভাবুক; ভৃঙ্গ যেমন পুষ্পের সুঘ্রাণ পাইয়া তাহার সন্ধান করিতে করিতে কুসুমোদ্যানে গিয়া উপনীত হয়, তেমনি তিনি কেশবচন্দ্রের অন্তরস্থিত ভক্তিকুসুমের সুগন্ধ পাইয়া, তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাগানে আসিয়া প্রথমেই কেশবচন্দ্রকে কহিলেন—

"ওগো বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন কর? সে দর্শন কি রকম, আমি জানিতে চাই।"

কথায় বলে যে জহরী, তাহার হীরা চিনিতে অধিক সময় লাগে না। পরমহংস মহাশয় নিজে প্রকৃত ভক্ত; তাই অল্পায়াসেই কেশবচন্দ্রকে চিনিতে পারিলেন। এই যে শুভক্ষণে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল, এই আলাপেই ক্রমে ক্রমে দুই ভক্তের মধ্যে সুমধুর প্রীতির যোগ স্থাপিত হইল।

কেশবচন্দ্র ভক্তি-সাধনে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পৃথিবীতে এক সমন্বয়ের ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিলেন; এজন্য আপনাকে ধর্ম্মের বিশেষ কোন গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নাই। তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রতিভাও অসাধারণ। তিনি সেই প্রতিভার জ্যোতিতে সাধনরাজ্যের সত্যসকল দর্শন করিতেন। তাই বৈষ্ণবদিগের মত শুধুই ভক্তি লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বায়ুস্পর্শে তটিনীর বারিরাশি যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, তেমনি ভক্তির সংস্পর্শে হৃদয় ভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠে। সুতরাং যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক শান্ত সমাহিত হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ শান্তম্ ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যযোগে যুক্ত হইয়া থাকা অসম্ভব; ভাবের চঞ্চলতাই সাধককে ঈশ্বর হইতে দূরে এবং সত্যের আলোক হইতে অজ্ঞানতার মধ্যে লইয়া যায়। তজ্জন্য কেশবচন্দ্র ভক্তির অমৃতহ্রদের মধ্যে যোগের তরণীতে আরোহণ করিলেন এবং তাঁহার চিরবাঞ্ছিত অনন্ত পুরুষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কেশবচন্দ্র তাঁহার যোগ-সাধন:সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ভক্তি যখন বাড়িতে লাগিল, তখন বুঝিলাম ভক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য যোগ আবশ্যক। ক্ষণস্থায়ী প্রমত্ততা জন্মিতে পারে বটে কিন্তু যোগ ব্যতীত তাহা চিরকাল থাকে না। ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া আবশ্যক। * * অনেকে কঠোর যোগের মধ্যে পড়িয়া অদ্বৈতবাদ-সাগরে পড়িয়া গিয়াছেন। ভক্তির উচ্ছ্বাসে পড়িয়া অনেকে কুসংস্কারে পতিত হইয়াছেন। আমি দুই দিক বাঁধিলাম। আমার ভক্তি যোগকে অবলম্বন করিয়া থাকিত।"

কেশবচন্দ্র ভক্তি ও যোগের সাধনায় কিরূপ সিদ্ধিলাভ করিলেন, সে বিষয়ে একটি কথা বলা আবশ্যক। স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত ইঁহারা দুই বন্ধু। দুজনের নিবাসই শান্তিপুর। দুজনেই সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। দুজনেই বিষয়সুখ পায়ে ঠেলিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা দুই বন্ধুই দুই সাধক; শুধু সাধক বলি কেন? ইঁহারা ধর্ম্মরাজ্যে দুই অসাধারণ ব্যক্তি। ইঁহাদের জীবনের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের কত পুরুষ ও নারী যে উন্নত ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন, তাহা কে বলিবে? কিন্তু এই দুই ধার্ম্মিক পুরুষ কেশবচন্দ্রের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট সাধন-তত্ত্বের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। কেশবচন্দ্র ভক্ত বিজয়কৃষ্ণকে ভক্তিধর্ম্ম ও সাধু অঘোরনাথকে যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। কেশবচন্দ্র স্বয়ং ভক্তি ও যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিলে এই দুই তেজস্বী সাধক ব্যক্তি কখনই তাঁহার নিকট মস্তক নত করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেন না।

বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথের ভক্তি ও যোগ শিক্ষার সময়, কেশবচন্দ্র তাঁহাদের প্রতিদিনের কার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত সেই নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতেন। নিয়মগুলি এই :—

"১। প্রাতঃস্মরণ ২। প্রাতঃস্নান ৩। নামশ্রবণ ৪। নামগান ৫। উপাসনা ৬। বিবিধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাদি পাঠ ৭। স্বহস্তে রন্ধন ৮। দরিদ্রকে অন্নদান ৯। ভক্তসেবা ১০। পশুপক্ষী-সেবা ১১। বৃক্ষলতা সেবা ১২। আহার ১৩। প্রাতঃকালে পঠিত শ্লোকাদি পুনরাবৃত্তি। ১৪। সৎপ্রসঙ্গ ১৫। নির্জ্জনে স্তব ও কীর্ত্তন ১৬। সজনে প্রার্থনা ও কীর্ত্তন ১৭। ভক্তদিগের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ১৮। নির্জ্জনে ধ্যান ও তপস্যা এবং দ্বিপ্রহর রাত্রিতে যোগাভ্যাস।"

কেশবচন্দ্র ভক্তি ও যোগের সাধনা করিতে করিতেই ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্য ও মহাযোগী খ্রীষ্টের সঙ্গে মহাভাবে

যুক্ত হইলেন; এই দুই মহাপুরুষের আত্মা যেন কেশবচন্দ্রের অন্তরে শক্তিসঞ্চার করিল। তাই কেশবচন্দ্র বিশ্বাসে পাহাড়ের ন্যায় অটল হইয়া ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং ভাবোন্মত্ত বৈষ্ণবের মত প্রেমে মত্ত হইয়া ভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কেশবচন্দ্রের ভক্তি ও মত্ততা সম্বন্ধে ভক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন—

"পায়ে নূপুর হাতে সোনার বালা পরিয়া যখন হরিসঙ্কীর্ত্তনে মাতিতেন, তখন থামাইয়া রাখা ভার হইত। হুঙ্কার, গর্জ্জন, নৃত্য কিছুই বাকী ছিল না। * * ভক্তিমার্গের শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য্যরস তিনি ব্রাহ্মসমাজের শুষ্ক দেহে সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন।"

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

ভ্রমণ-কাহিনী

ডেরাদুন-মুশুরী।

সেদিন হরিদ্বারের ষ্টেসন প্লাটফরমে পাইচারি করিতেছিলাম, এমন সময় ডেরাদুন হইতে লক্সারের গাড়ী আসিল। গাড়ীটীতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাই বেশী, অথচ হরিদ্বার হইতে মধ্যম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী বিস্তর উঠিল। গাড়ীতে তাহাদের স্থান হয় না—এক কামরা হইতে তাড়া খাইয়া অন্য কামরায় ছুটিয়া যায়, আবার সেখানে ঢুকিতে পায় না। যাত্রিগণের মধ্যে অধিকাংশই বৃদ্ধাস্ত্রীলোক, তাহাদের কষ্ট দেখিয়া মনে অত্যন্ত ক্লেশ হইল। রেলওয়ে কোম্পানী তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া মস্তিষ্কের অপব্যয় করিতে রাজি নহেন অথচ এই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর পয়সাতেই কোম্পানি চলিতেছেন; প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর নিকট হইতে তাঁহারা কয়টা টাকা পান?

যাহা হউক, এই বৃদ্ধা তীর্থযাত্রিগণের নিকট হইতে আমাদের অনেক শিখিবার আছে। ইহারা যাহা বিশ্বাস করে তাহার জন্য দেখ কত না কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, কিন্তু শিক্ষাভিমানী নব্য বঙ্গীয় আমরা আমাদের বিশ্বাসের জন্য কি কষ্ট সহ্য করি, কোন্ সুখ ত্যাগ করি? বন্ধু বলিলেন—"We have opinions but have no faith." আমাদের কতকগুলা মতামত থাকিতে পারে কিন্তু যাহাকে বিশ্বাস বলে তাহার কিছুই আমাদের নাই।

*　*　*　*　*

হরিদ্বার হইতে ডেরাদুন ৩২ মাইল। রেললাইন গঙ্গা ছাড়িয়া উত্তর-পশ্চিম মুখে চলিয়া গিয়াছে। হৃষিকেশ রোডের তাম্রাভ শুষ্ক কাশপুষ্পের জঙ্গল ছাড়াইয়া গাড়ী দইওয়ালা ও হরওয়ালার বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম এবং ধান ও জোয়ারের বড় বড় ক্ষেতের মধ্যে আসিয়া পড়িল। মাঝে মাঝে সুবর্ণ বর্ণ সরিষার ক্ষেত নেত্রতৃপ্তি বর্দ্ধন করিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে ডেরাদুন নগরে আসিয়া পড়িলাম। বেলা তখন ১০টা, স্নানাহার সারিয়া একটু সহর বেড়াইয়া ওবেলা মুশুরী যাইব মনস্থ করিলাম। ডেরাদুনে বসিয়া সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল না কেননা আসিবার সময় হরিদ্বার ষ্টেসনে একটী বৃদ্ধ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। আমরা ডেরাদুন বেড়াইতে যাইতেছি শুনিয়া তিনি বলিলেন "তার চেয়ে একটা কাজ করুন। যে কয়টা টাকা খরচ হইবে আমাকে দিন, আমি একটা ডেরাদুনের কেচ্ছা বলিয়া দিতেছি, আপনাদের যাইবার কষ্ট বাঁচিয়া যাইবে। সেখানে গিয়া আর দেখিবেন কি? একটা সামান্য পশ্চিমে সহর মাত্র। তবে কিছু দেখিবার সাধ থাকে ত মুশুরী পাহাড়ে যান।" ভদ্রলোক তিন মাস ধরিয়া ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন। আজ কাল অনেক বাঙ্গালীর দেশ ভ্রমণের সখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ষ্টেসনের নিকটেই গুরুদ্বার ও তৎসংলগ্ন ধর্ম্মশালা। এই স্থানে উদাসীন-সম্প্রদায়স্থ শিখগণের গুরু বা মোহন্ত বাস করেন। তাঁহার ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইবামাত্র সেখানকার একজন কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল, "আপনারা এখানে আসিলেন কেন? এখানে আপনাদের বহুৎ তক্লিফ হইবে। কোনও বাঙ্গালী এখানে কখনও থাকে না। আপনারা বাঙ্গালী-পাড়ায় যান—সেখানে খুব আরামে থাকিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।" এখন কোনও ভদ্রলোককে অকারণ ব্যস্ত করিতে আমরা সম্মত ছিলাম না, কাজেই এলোকটী আমাদের থাকা সম্বন্ধে আপত্তি করায় অসন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইলাম। শেষে সে যখন বলিল "আপনাদের বড় কষ্ট

হইবে, এখানে তামাকু বা চুরুট কিছুই খাইতে পাইবেন না", তখন বন্ধু বলিলেন "now the cat is out of the bag." লোকটী ভাবিতেছে তামাক খাইয়া আমরা তাহাদের ধর্ম্মশালা অপবিত্র করিয়া দিব। শিখ মদ খাওয়া সহ্য করিতে পারে কিন্তু তামাক খাইলেই একেবারে ধর্ম্মনাশ হইবে।"

তখন আমরা বুঝাইয়া বলিলাম আমরা তামাক খাই না। অগত্যা লোকটী একটা বাহিরের কামরা খুলিয়া দিল। সেখানে ট্রাঙ্ক রাখিয়া আমরা আহারেব সন্ধানে বাহির হইলাম। গুরুদ্বারের পার্শ্বেই একটী ছোট হোটেলে ভাত ডাল খাইয়া লইলাম।

ডেরাদুনের জলের কল একটু নূতন রকমের। মুশুরী পাহাড় হইতে নলের ভিতর দিয়া জল আসিয়া কতকগুলি চৌবাচ্ছায় সঞ্চিত হয়, সেই চৌবাচ্ছার গায়ে ট্যাপ লাগান আছে।

এইবার গুরুদ্বার দেখিবার জন্য, জুতা বাহিরে রাখিয়া ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মধ্যস্থলে উদাসীনসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুরু রামরায়ের কবর, তাহার চতুষ্কোণে তাঁহার চারি সহধর্ম্মিণীর কবর। গুরুদ্বারটী আগাগোড়া মুসলমানী ঢঙে নির্ম্মিত। সেরূপ হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

অষ্টমগুরুর মৃত্যুর পর রামরায় শিখগণের গুরুপদপ্রার্থী হন কিন্তু শিখসর্দারগণ তাঁহার অপেক্ষা তেগবাহাদুরের যোগ্যতা অবধারণ করিয়া তেগবাহাদুরকে গুরুপদে বরণ করেন। বিফলমনোরথ রামরায় সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হইলে সম্রাট তাঁহাকে গাড়োয়াল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দুর্গ-উপত্যকায় গিয়া বাস করিতে বলিলেন এবং গাড়োয়ালরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন যেন তিনি রামরায়ের সুবিধা করিয়া দেন। কাজেই গাড়োয়ালরাজ রামরায়কে অনেক ভূসম্পত্তি দান করিলেন। তিনি যে গ্রামে বাস করিতেন সেখানে একটী সহর বসিয়া গেল; এইরূপে গুরুর ডেরা হইতে ডেরাদুনের উৎপত্তি।

রামরায় বরাবর ঔরঙ্গজেবের নিকট আর্জি পেশ করিতে থাকিলেন 'আমাকে গদীতে বসাইয়া দিন', ঔরঙ্গজেবও তদানীন্তন শিখগুরুর মৃত্যুবাণ স্বরূপ রামরায়কে পোষণ করিতে লাগিলেন।

রামরায় যোগবলে মৃতের ন্যায় অনেকক্ষণ থাকিতে পারিতেন এবং পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইতেন। একদিন এইরূপ মৃতপ্রায় হইয়া আর পুনর্জ্জীবিত হইলেন না। যে শয্যায় তিনি শেষ শয়ন করেন তাহা উদাসী-সম্প্রদায়ের মহা ভক্তির জিনিস—প্রতিদিন তাহার রীতিমত পূজা হয়।

রামরায় অপুত্রক ছিলেন—তাঁহার পর যাঁহারা গুরু হন তাঁহারা সকলেই অবিবাহিত।

গুরুদ্বারের ফটকের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড ধ্বজা আছে। প্রতি বৎসর বৈশাখমাসে মেলা হয়—সেই সময় ধ্বজাদণ্ড বা ঝাণ্ডা একবার করিয়া বদলান হয়। শ্রদ্ধেয় জলধর সেন মহাশয়ের 'প্রবাসচিত্র' পড়িয়া মনে করিয়াছিলাম এই ঝাণ্ডাটী নাজানি কি বৃহৎ নহিলে শত সহস্র লোক টানাটানি করিয়া ইহাকে খাড়া করিতে পারে না? কিন্তু দেখিয়া ইহাকে তেমন কিছু বলিয়া বোধ হইল না। জন দশ পনর লোক ইহাকে অনায়াসে খাড়া করিতে পারে।

কিছুক্ষণ সহর দেখিয়া একটী টোঙ্গা* ভাড়া করিয়া ৭ মাইল দূরবর্ত্তী রাজপুর নামক স্থানে গেলাম। এই দীর্ঘ রাস্তাটী দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, টোঙ্গার পর টোঙ্গা করিয়া সাহেব বিবি, ছেলে মেয়ে, কাঁড়ি কাঁড়ি মালপত্র সমেত রাজপুর হইতে ডেরাদুন চলিয়াছেন—অক্টোবরের শেষে শীত পড়ায় তাঁহারা মুশুরী পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের চেহারা কেমন সুস্থ ও সবল!—মুখ হইতে যেন রক্ত ফাটিয়া বাহির হইতেছে। দূরে মুশুরী পাহাড় দেখা যাইতে লাগিল, পাহাড়টীতে বৃক্ষলতাদি কিছু কম; মুশুরী সহরের শাদা বাড়ীগুলি সবুজ পাহাড়ের গায়ে শাদা শাদা ফুটকির মত দেখাইতে লাগিল।

রাজপুর মুশুরী পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। বেলা চারিটার সময় আমরা সেখানে পৌঁছিলাম। এক্ষণে পাহাড়ী রাস্তা ধরিয়া ৭ মাইল উঠিলে তবে মুশুরী সহর। যাঁহারা দুর্ব্বল তাঁহারা এ পথটা ডাণ্ডী চড়িয়া যান। ডাণ্ডী একটা ইজিচেয়ারের ন্যায় ডুলি বিশেষ, চারিজন কুলি

* টোঙ্গা একার উন্নত সংস্করণ।

কাঁধে করিয়া লইয়া যায়—ভাড়া ২৲ টাকা এবং মাশুল ১॥০ টাকা, কাজেই একজন লোক উঠিতে ৩॥০ টাকা খরচ। যাঁহারা সবল তাঁহারা ঘোড়ায় চড়িয়া উঠেন, ঘোড়ার ভাড়া ১॥০ টাকা এবং মাশুল ১॥০ টাকা। আমরা কিন্তু একটা দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিয়া ফেলিলাম—পায়ে হাঁটিয়া মুশুরী যাইব। স্থানীয় দুই একটী লোক বলিল 'সে আপনারা পারিবেন না—বিশেষতঃ সন্ধ্যা আসিতেছে, শীতে ও অন্ধকারে বড় কষ্ট পাইবেন।' আমরা ভাবিলাম আমাদের সামর্থ্য কতটুকু একবার পরীক্ষা করা যাউক।

এখানে মাল লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর গুর্খা কুলি মিলে। ইহারা বেশ বলবান ও কষ্টসহিষ্ণু; সচরাচর একমণ, কেহবা দেড়মণ মোট লইয়া ৭।৮ মাইল পথ পাহাড়ে উঠিয়া থাকে—মজুরি ছয় আনা পয়সা মাত্র। দুইজন কুলি সঙ্গে লইয়া আমরা পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করিলাম।

রাজপুরে সাহেবদের বড় বড় হোটেল ছাড়াইয়া, হিমালয়ান গ্লাস ওয়ার্কসের পাশ দিয়া যাইতে হইল। এই কারখানাটী এক্ষণে বন্ধ রহিয়াছে। এদেশে কাচের কারখানার উপর যেন অভিসম্পাত আছে, বাঙ্গালাতেও ত কয়টী কাচের কারখানা ফেল হইয়া গিয়াছে।

রাজপুরে মাশুল-ঘরে মাশুল দিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে হয়। প্রতি কুলির উপর দেড় আনা মাশুল লাগিল। এই পাহাড়ী রাস্তাটী বর্ষায় বড় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়—মিউনিসিপ্যালিটীকে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ইহার মেরামত করিতে হয়, সেইজন্যই এই মাশুলের ব্যবস্থা। হৃষিকেশ তীর্থযাত্রিগণের উপরও মাশুল চাপান আছে। হৃষিকেশ রোড ষ্টেসন হইতে আসিবার সময় প্রতি টিকিটের উপর এক আনা মাশুল ধরা আছে। এই টাকায় বদরিকাশ্রমের পথ মেরামত হয়।

যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম ততই দূরাৎ দূরতর প্রদেশ চক্ষুগোচর হইতে লাগিল, প্রতি বেঁকের মুখে একটী নূতন ছবি। যিনি কখনও পর্ব্বতে আরোহণ করেন নাই তিনি জীবনের একটী সুখে বঞ্চিত সন্দেহ নাই।

এ সময় পাহাড়ে উঠিতেছে অতি কম লোক—দলে দলে লোক কেবল নামিতেছে। বিবি ও দুর্ব্বল সাহেবগণ ডাণ্ডি চড়িয়া নামিতেছেন, সবল সাহেবগণ ঘোড়ায় চড়িয়া নামিতেছেন, সকলেই এই বাঙ্গালী কয়টীর দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে তাকাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে বহুসংখ্যক খচ্চর (mule) এবং কুলি পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় নামিতেছে।

অর্দ্ধেক পথ উঠিবার পর একটী বিশ্রামস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। আমাদের গুর্খা কুলিদুইটীর সহিত আলাপে জানিলাম তাহারা রাজপুত, তাহাদের আত্মীয় স্বজন রেজিমেণ্টে আছে। দুই তিন বৎসর অন্তর একবার স্বদেশ নেপালে যাইতে ইচ্ছা করে; তবে অনেকে রাজপুরেই বসবাস করিতেছে আর দেশে যায় না। ইহারা বলবান হইলেও সুস্থ নহে, এই সময় অনেকে বোখারে (জ্বরে) ভুগিতেছে। ইহার কারণ বোধ হয় যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যের ও পরিচ্ছদের অভাব। একটা ছিন্ন কম্বল ভিন্ন শীত নিবারণের আর কিছুই নাই, খাদ্যও পর্য্যাপ্ত নহে, কাজেই তাহাদের চেহারা রুগ্ন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেমানান। তাহাদের স্ফূর্ত্তির মধ্যে একটু রক্সিপান (মদ্যপান)।

কিছুক্ষণ পরে সূর্য্য ডুবিয়া গেলেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্র আমাদের পথ আলোকিত করিতে লাগিলেন। রাস্তার ধারে একটী রাজসই প্রাসাদে নেপালের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী (Ex-Prime Minister) বাস করিতেছেন। সহরের উপকণ্ঠ হইতে 'বিজলী'-বাতির আলো পাওয়া যাইতে লাগিল।

হরিদ্বার ষ্টেসনের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বলিয়া দিয়াছিলেন 'লাণ্ডোরে আর্য্য ধর্ম্মশালায় গিয়া বাস করিবেন।' মুশুরী ও লাণ্ডোর পাশাপাশী সহর। লাণ্ডোরের বাজারের নিকট রাস্তা হইতে অনেকটা নামিয়া গিয়া আর্য্যধর্ম্মশালা। উহার নিকটেই উদাসী-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী ধর্ম্মশালা আছে। দুইটী ধর্ম্মশালাই সুন্দর বাঙলো—কাচ ও কাষ্ঠনির্ম্মিত—দার্জ্জিলিঙের বাড়ীর ন্যায়।

আর্য্যধর্ম্মশালাটী দার্জ্জিলিঙের লাউইস সেনিটেরিয়মের ন্যায় সুন্দর সাজান গোছান (well-furnished)। দুই বৎসর হইল আর্য্যসমাজী জনকয়েক ভদ্রলোকের ব্যয়ে এইটী নির্ম্মিত হওয়ায় মুশুরী বাসের যে কি পর্য্যন্ত সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। বাসের জন্য কিছুই দিতে হয় না;

তবে ধর্ম্মশালা ফণ্ডের জন্য যদি কেহ উপযাচক হইয়া দান করেন তাহা ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হয়। কেননা, ধর্ম্ম-শালার দরুণ এখনও কিছু দেনা রহিয়াছে।

আমরা যে সময় ধর্ম্মশালায় পৌঁছিলাম তখন আর কেহ সেথায় বাস করিতেছিল না। চৌকিদারকে ডাকিয়া একটী ঘর খুলাইয়া লইলাম। দিন কয়েক ধর্ম্মশালায় monarchs of all we surveyed ভাবে বাস করা গেল।

বসিবার ঘরে Guide to Mussoorie নামে একটী মোটা বই এবং বড় একখানি মুশুরীর ম্যাপ আছে। তাহাতে কত জ্ঞাতব্য কথা রহিয়াছে। সাহেবরা সকল কথাই পুস্তকে লিখিয়া রাথায় কোনও ব্যক্তির জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নষ্ট হইতে পায় না। এই কারণেই, এই অকিঞ্চিৎকর ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা, যে, কোনও কালে কোনও ব্যক্তির কাজে আসিতে পারে; নহিলে পাঠকের অমুল্য সময় নষ্ট করিবার প্রবৃত্তি ছিল না।

পরদিন প্রাতে সহর দেখিতে বাহির হইলাম। লাণ্ডোরের বাজারটী দেখিয়া ইউরোপীয়ান সহর বলিয়া মনে হয় না—চতুর্দ্দিকেই দেশী লোকের দোকান এবং বিস্তর দেশী ভদ্র ও দরিদ্র লোকের বাস। গাইড-বুকের ভাষায় বাজারটী 'Bania's Shops'। লাণ্ডোর হইতে মাইলটাক পথ গেলে মুশুরী। এটী পাকা সাহেবী সহর বটে। চতুর্দ্দিকে সাহেবদের বাড়ী, রাস্তায় বিস্তর বিবি ডাণ্ডি চড়িয়া ও অনেক সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া বা পদব্রজে বেড়াইতেছেন। সাহেব অপেক্ষা বিবি ও ছোট ছেলে মেয়ের সংখ্যাই অধিক, কারণ সাহেবদের কর্ম্মের খাতিরে বাধ্য হইয়া সমতল ভূমির গরমে পচিয়া মরিতে হয় কিন্তু স্ত্রী ও ছেলেমেয়েগুলিকে স্বাস্থ্যকর পর্ব্বতের উপর পাঠাইয়া দেন। আরও ছেলেমেয়েগুলি বয়স্থ লোকের ন্যায় গরম সহ্য করিতে পারে না, শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই জন্য ইংরেজদের স্কুলগুলি গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিঙ, মুশুরী প্রভৃতি শৈত্যপ্রধান স্থানে অবস্থান করে। ইহাতেও নাকি ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না—তাই অনেকে ছেলেদের ইংলণ্ডে বাস করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। দার্জ্জিলিঙ, শিমলা প্রভৃতি স্থানে গবর্ণর ও রাজকর্ম্ম-চারিগণের প্রাদুর্ভাব, এইজন্য সওদাগর, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি বে-সরকারী লোক এবং অপেক্ষাকৃত গরীব সাহেবরা মুশুরী সহরে থাকিতে ভাল বাসেন। আবার মুশুরী নাকি দার্জ্জিলিঙ অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর; দার্জ্জিলিঙের বায়ু ও মৃত্তিকা আর্দ্র, মুশুরীর বায়ু ও মৃত্তিকা শুষ্ক। সেইজন্যই মুশুরীতে দার্জ্জিলিঙের ন্যায় বৃক্ষ লতাদির আধিক্য নাই। সহরের প্রধান রাস্তাটীতে বৃক্ষাদি না থাকায় অত্যন্ত রৌদ্র লাগে এবং গ্রীষ্মকালে বেশ গরম হয়।

অপরাহ্নে লাণ্ডোরের পাহাড়ী রাস্তা ধরিয়া উচ্চে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। লাণ্ডোর মুশুরী হইতেও কিছু উচ্চ। সহরের উপরাংশে ক্যাণ্টনমেণ্ট—বিস্তর রুগ্ন ও দুর্ব্বল গোরা সৈন্য শরীর সারিবার জন্য বাস করিতেছে; বাস্তবিক লাণ্ডোরকে মিলিটারী এবং মুশুরীকে সিভিল সহর বলা যায়। সার রিচার্ড টেম্পল বলেন ভারতবর্ষে ইংরাজ সৈন্যের স্বাস্থ্যহানি ঘটে এই জন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে প্রায়ই শৈত্যপ্রধান পাহাড়ী সহরে রাখিতে হয়। একজন সাহেব কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন "ভারত-বর্ষে ইংরাজ সৈন্য সর্ব্বদাই যুদ্ধে ব্যাপৃত আছে—কখনও শত্রুর সহিত যুদ্ধ, কখনও অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর সহিত যুদ্ধ।"

সেদিন প্রাতে মুশুরীস্থ ব্লুচারর্ম হিলে উঠিয়া এক অতি সুন্দর, অতি মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলি (panorama) দেখিতে পাইলাম। একজন গাড়োয়ালী আমাদিগকে সমস্ত স্থান বুঝাইয়া দিতে লাগিল। বরফাচ্ছাদিত পাহাড় অনেক স্থান হইতে দেখিয়াছি বটে কিন্তু এই উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে দিগন্তব্যাপী, মাইলের পর মাইল ধরিয়া, উজ্জ্বল রৌপ্যের ন্যায় তুষারাচ্ছাদিত শিখরশ্রেণী প্রখর সূর্য্যকিরণে যেরূপ জলজল করিতে লাগিল, সেরূপ কখনও দেখি নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন আমরা দূরবীক্ষণটা লইয়া যাই নাই; অন্য দিন দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়া বরফের পাহাড় দেখিয়াছি, উহা কতকটা শাদা বালির স্তূপের ন্যায় দেখায়; সর্ব্বত্র শাদা বর্ণও নাই মধ্যে মধ্যে কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। গাড়োয়ালী বলিতে লাগিল ঐটী বদরীনাথ পর্ব্বত, এটী কেদারনাথ পর্ব্বত। বরফের ক্রোড়ে, আমাদের উত্তরে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কেবল নীল ও পাঁশুটে বর্ণের পর্ব্বতের রাশি, 'শৃঙ্গের উপরে শৃঙ্গ, শৃঙ্গ

তদুপরি'। উত্তর-পশ্চিমে পর্ব্বতের নীচে একটা স্থান দেখাইয়া বলিল ঐ চক্রাটা সহর, ঐখানে একটী ক্যান্টনমেণ্ট আছে; মুশুরী হইতে একটী হাঁটা পথ চক্রাটা হইয়া সিমলা পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর একটী পথ টিহরি হইয়া গঙ্গোত্রী গিয়াছে। অনেক সাহেব বিস্তর লোকজন সঙ্গে লইয়া মুশুরী হইতে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও বদরীনাথ প্রভৃতি দেখিয়া আসেন এবং ফটো লইয়া আসেন।

দীর্ঘ ও অল্পবিস্তার মুশুরী ও লাণ্ডোর সহরের সকল স্থানই স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। উহার দক্ষিণে দূন উপত্যকা, তাহার দক্ষিণে শিবালিক পর্ব্বতশ্রেণী। এক-দিকে হিমালয় ও অন্য দিকে শিবালিক, মধ্যে স্বাস্থ্যকর ও উর্ব্বর দূন উপত্যকা (উচ্চতা সাগরপৃষ্ঠ হইতে ২৩০০ ফুট মাত্র।) শিবালিক পর্ব্বতের দক্ষিণেও দৃষ্টি চলে; সেখানে রুড়কী ও সাহারাণপুর পর্য্যন্ত দেখা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিমে যমুনার জল সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে ঝকঝক করিতে লাগিল। দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটী পার্ব্বত্য নদী এবং রেল-লাইন হৃষিকেশ ও হরিদ্বার অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখিতে এই দূন উপত্যকা। কে যেন একটী দেশের ম্যাপ চক্ষের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ আঁকাবাঁকা রাস্তাটী ধরিয়া আমরা ডেরা-দূন হইতে রাজপুর আসিয়াছিলাম; ঐ বৃক্ষপুঞ্জের ন্যায় স্থানটী ডেরাদূন সহর; ঐ সকল মাঠ; ঐ সকল বৃক্ষাচ্ছাদিত গ্রাম; এইটী শুষ্কপ্রায় পাহাড়ী নদী, গর্ভের মধ্যে একটু জল ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে। সমতল উপত্যকার অব্যবহিত পরেই হিমালয়ের প্রথম শিখর। এই মুশুরী পর্ব্বত খাড়া ৫০০০ ফুট উঠিয়াছে।

কয়দিনের মত একটী গাড়োয়ালী ব্রাহ্মণ চাকর রাখিয়াছিলাম। সে ভাত ডাল রাঁধিত, ফরমায়েস খাটিত এবং বাসন মাজিত। সে যথার্থ ব্রাহ্মণ কি না বলিতে পারি না, তবে তাহার উপবীত দেখিয়াছিলাম বটে। তাহার প্রধান পেশা ডাণ্ডি বহন। তাহাকে খোরাক ও প্রতিদিন ছয় আনা হিসাবে দিতে হইত।

লোকটী কদাকার নহে; তাহার মুখে আর একটু বুদ্ধির লাবণ্য থাকিলে তাহাকে একজন সুশ্রী পুরুষ বলা যাইতে পারিত। তাহার নিকট শুনিলাম মুশুরীর যত কুলি সকলে গুর্খা এবং যত ডাণ্ডি-বেহারা সমস্ত গাড়োয়ালী। গুর্খাগণের শারীরিক বল সম্বন্ধে তাহার অগাধ বিশ্বাস। সে বলিল "উহারা যেরূপ এক মণ দেড় মণ বোঝা পিঠে করিয়া পাহাড়ে উঠে তাহা গাড়োয়ালীর হাড়ে হইবে না।"

বলবান ও সাহসী গুর্খা অতি সহজে ভীরু কুমায়ুনী ও গাড়োয়ালীকে পরাজিত করিয়া ভুটান হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল।

এই গাড়োয়ালী ব্রাহ্মণ ও হৃষিকেশের সেই মাড়য়ারী ব্রাহ্মণের হীনবৃত্তির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কত কথা মনে আসিতে লাগিল। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আজ কি শোচনীয় অধঃপতন! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এক্ষণে কুলি মজুর, বা চাকর নফর। যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন তাঁহারা কি এ সকল কথা চিন্তা করেন না?

ধর্ম্মশালার ম্যানেজার পণ্ডিত হরনারায়ণ ডেরাদূন-বাসী আর্য্যসমাজী। এই ধর্ম্মশালাটীর জন্য ভদ্রলোক বিশেষ পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তিনি মুশুরীর একটী ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করেন। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় আমাদের খবর লইতেন। এই আদর্শ ভদ্রলোকটীর নিকট আমরা অনেক বিষয়ে ঋণী আছি।

মুশুরীতে জনকয়েক বাঙালী অধিবাসী আছেন। বাস্তবিক, কেরাণী, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার রূপে দুই চারি জন বাঙালী নাই এরূপ বড় সহর ভারতবর্ষে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোয়েটাতে বাঙালী কেরাণী আছেন, মুলতানে বাঙালী উকিল আছেন, ঝাঁসীতে বাঙালীর ডাক্তারখানা আছে এবং খাণ্ডোয়াতে বাঙালী শিক্ষক আছেন। বাঙালী অতিথি পাইলে এই সকল প্রবাসী বাঙালী যথেষ্ট আদর যত্ন করিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু কোনও ভদ্রলোককে বিব্রত করা অপেক্ষা ধর্ম্মশালায় বা কালীবাড়ীতে অবস্থান করা পছন্দ করি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

স্পর্শমণি

(গল্প)

বন্ধু বান্ধবকে চমকিত করিয়া, আত্মীয় স্বজনকে অসন্তুষ্ট করিয়া নবীন যৌবনের উচ্ছ্বসিত আবেগে দ্বিজেন্দ্রনাথ খুব একটা "রোম্যাণ্টিক" রকমের বিবাহ করিয়া, কল্পিত বিজয়গর্ব্বের উন্মাদনায় কিছুকাল আত্মহারা হইয়াছিল। কিন্তু হায়! বিবাহের পর মাস দুই যাইতে না যাইতেই কি এক প্রবল অস্বস্তি এবং অতৃপ্তি-জনিত শূন্যতা সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিল। মনোরমার জ্বালাময়ী সুষমার তীব্র-মাদকতা গোধূলি অন্তে রবিকরচ্ছটার ন্যায় ধীরে ধীরে তাহার চক্ষের উপর শূন্যে মিলাইতেছিল।

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ রূপসী উর্ব্বশী!"—পড়িতে পড়িতে দ্বিজেন্দ্রনাথ কতবার মানসনেত্রে সেই আদর্শ সৌন্দর্য্য-কল্পনার দিকে লুব্ধনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে। কিন্তু আজ—! আজ সেই উর্ব্বশীপ্রতিম "আপনাতে আপনি বিকশিত" সৌন্দর্য্যরাশি মনোরমাতে শরীরিণী দেখিয়াও তাহার মনে আকুল আকাঙ্ক্ষা উথলিয়া উঠিতেছিল—হায়, এই অনুপম সুষমারাশির অন্তরালে যদি এক বিন্দুও হৃদয় থাকিত! আলোকরঞ্জিত বীচিবিক্ষোভিত তটিনীর ন্যায় তীব্র-সৌন্দর্য্যে চারিদিক ঝলসিত করিয়া, কলগুঞ্জনগীতে প্রভাতাকাশ উদ্বেলিত করিয়া মনোরমার জীবনস্রোত দ্বিজেন্দ্রনাথের চক্ষের উপর দিয়া খরপ্রবাহে বহিয়া যাইতেছিল—দ্বিজেন্দ্রনাথ তীরে বসিয়া বসিয়া গুরুভার বক্ষে বহিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে শুধু ভাবিতেছিল, 'এত যত্নে, এত আদরে, এত প্রাণান্তকর আবেগেও এই মসৃণ চিক্কণ আলোকোৎফুল্ল জলরাশির উপর একটু ছায়াপাত করিতেও পারিলাম না!'

দ্বিজেন্দ্রনাথ ভর্ৎসনা করিয়া দেখিয়াছে—অভিমান করিয়া দেখিয়াছে—অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া দেখিয়াছে, কিছুতেই সে মনোরমার কৌতুকোজ্জ্বল সদাহাস্যময় নলিনীপ্রতিম বদনমণ্ডলে একটু মলিনতা, একটু ভাবান্তর আনয়ন করিতে পারে নাই। অতি কঠোর আঘাত পাইয়া এতদিনে দ্বিজেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছে নির্ব্বিকার আশক্তিহীন দেবীচরিত্রে মানুষের সুখ নাই—তৃপ্তির জন্য শান্তির জন্য স্নেহময়ী সমবেদনাময়ী সুখদুঃখবিচঞ্চল মানবীর প্রয়োজন। তাহাতে উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্য না থাকিলেও চলিতে পারে, কিন্তু হৃদয় না থাকিলে কিছুতেই চলে না।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ উভয়সঙ্কটে পড়িয়াছিল। মনোরমাকে—"ইন্দুকিরণ--ঝলকিতা"—"ফুলগন্ধপুলকিতা"—"চরণভঙ্গে-ললিতরাগিণী-মুখরিতা"—"নন্দন-ফুলহার" মনোরমাকে—পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতাও দ্বিজেন্দ্রনাথের ছিল না। এই সুকঠিন মর্ম্মরপ্রতিমাকে দ্বিজেন্দ্রনাথ যতই আবেগে হৃদয়ে ধারণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, ততই তাহার হৃদয় প্রপীড়িত হইতেছিল, তবু তাহাকে হৃদয় হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। মনোরমার অনুপস্থিতিকালে দ্বিজেন্দ্রনাথ সময়ে সময়ে চিত্তকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিত,—তাহাকে ভুলিবার জন্য সুকঠিন প্রতিজ্ঞাপাশে হৃদয়কে বাঁধিবার সংকল্প করিত, কিন্তু সেই "ভুবনমনোমোহিনী" সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র আবার অজ্ঞাতসারে তাহার আরক্ত চরণতলে আপনার সকল "তপস্যার ফল" বিসর্জ্জন দিয়া "তৃণ শূন্য" করিয়া তাহার পূজা করিত। হাসিতে হাসিতে "বিজয়িনী" ভক্তপ্রদত্ত পুজোপহার লীলাচ্ছলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূমিতল আচ্ছন্ন করিতে করিতে আপন মনে ভাসিয়া যাইত। দ্বিজেন্দ্রনাথ উপহার দিত, উপহারের পরিণাম দেখিত, তবু আবার উপহার দিত,—কাঁদিত, রাগ করিত, অভিমান করিত— আবার আবেগভরে যন্ত্রণা সহিবার জন্য ছুটিয়া আসিত।

এমনি করিয়া এক বৎসর কাটিয়া গেল।

(২)

ভাবহীনা মনোরমাকে জগতের সুখদুঃখস্পন্দনের সংস্পর্শে আনিয়া ভাবে বৈচিত্র্যে সমবেদনায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার আশায় দ্বিজেন্দ্রনাথ মনোরমাকে লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

কতদিনের পর ঘুরিতে ঘুরিতে সে মুঙ্গেরে আসিয়া পড়িল। সহর হইতে দূরে নির্জ্জন ভাগীরথীতীরে "পীর পাহাড়ের" উপর সে বাসা লইল।

যদি মানবপ্রকৃতির উপর স্বভাব-সৌন্দর্য্যের কোন প্রভাব থাকে তাহা হইলে এখানে সে প্রভাব যথেষ্ট ছিল।

যতদূর দৃষ্টি যায় ভাগীরথীর সুনির্ম্মল প্রসন্ন ধারা অবিরাম তর-তর বেগে বহিয়া যাইতেছিল—পাল-তোলা ছোট বড় নৌকাগুলি জলচর পক্ষীর ন্যায় ভাগীরথীবক্ষকে শুভ্র সৌন্দর্য্যে বিখচিত করিতেছিল; ফুল্ল চন্দ্রালোকে দূরে আম্রকানন-শোভিত প্রাচীন নগরীকে সুচিত্রিত চিত্রবৎ দেখাইতেছিল এবং ভাগীরথীর তীরে তীরে হরিৎ-সুন্দর শস্যশ্রেণী সুশীতল বায়ুভরে অবিরাম আন্দোলিত হইতেছিল।

মনোরমা—বন্ধনহীনা পুলকচঞ্চলা মনোরমা—এই উদার প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া দিল। ভাগীরথীর তীর বাহিয়া, শ্যামল শস্যশ্রেণীর বক্ষভেদ করিয়া, আম্রকাননের ঘনচ্ছায়াকে ঝলসিত করিয়া তাহার বিদ্যুৎ-প্রতিম রূপজ্যোতি মুহুর্মুহু সর্ব্বত্র বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল!

আর দ্বিজেন্দ্রনাথ—হতভাগ্য দ্বিজেন্দ্রনাথ—শৈলশিরে একাকী বসিয়া বসিয়া গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জনোন্মুখ ফুল্লমূর্ত্তি ভাস্করের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিত, 'হায় বুঝি মরণেই এক মাত্র সান্ত্বনা!'

দ্বিজেন্দ্রনাথ কাহারও সঙ্গে মিশিত না। সে পীর পাহাড়ে আসিয়া অবধি আপনার চিন্তা লইয়াই আপনি মগ্ন ছিল। মনোরমারও চিত্তে কোন অভাব-বোধ ছিল না—সেও আপনার আনন্দে আপনি মাতোয়ারা থাকিত। কাজেই—পীরপাহাড়ে যে দুই চারি জন অধিবাসী ছিল তাহাদের কাহারও সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ বা মনোরমার আলাপ পরিচয় হয় নাই।

বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মনোরমা তাহার সুদীর্ঘ প্রাতভ্রমণ-সবেমাত্র শেষ করিয়া সিক্ত বস্ত্রে দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশপ্রসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছে, এমন সময়ে এক অপরিচিতা যুবতী তাহার শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মনোরমার কক্ষে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

মনোরমা স্মিতমুখে কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে যুবতীর দিকে চাহিল। যুবতী কহিল "এই পাহাড়ের নীচেই আমাদের বাসা। এখানে আমরাই একঘর বাঙালী আছি। আপনারা এসেছেন জেনে আলাপ করতে এলাম।" মনোরমা হাসিয়া কহিল "বসুন"।

যুবতী যতক্ষণ মনোরমার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, ততক্ষণ তাহার শিশুপুত্র একদৃষ্টে মনোরমার মুখ পানে চাহিয়াছিল। কক্ষান্তর হইতে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া মনোরমা খোকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল পরম সুন্দর শিশু! মনোরমা আদর করিয়া খোকার দিকে হাত বাড়াইল। খোকা উল্লাসে মনোরমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

মৃদু হাসিয়া খোকার মা বলিল "এক মুহুর্ত্তেই আলাপ হয়ে গেল যে!" মনোরমা খোকাকে কোলে লইয়া অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর তাহাকে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। চিরতুষারের দেশে প্রভাতের কনক-রশ্মি এই প্রথম আসিয়া পৌঁছিল।

সেইদিন হইতে মনোরমার উচ্ছৃঙ্খল অবাধগতি যেন কিছু সংযত হইয়া আসিল। খোকাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার ভ্রমণবৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ দিনের পর দিন অল্প অল্প কমিয়া আসিতেছিল।

(৩)

গৃহ হইতে কিছু দূরে শৈলাসনে বসিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ আন্দোলিত ভাগীরথীবক্ষে প্রভাতারুণের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা চক্ষু ভরিয়া দেখিতেছিল, এমন সময়ে মনোরমা আসিয়া কহিল "আজ দুদিন থেকে সুকুমারী (খোকার মা) এ বাড়ীতে আসেনি, তাদের কি হল একবার খবর নিয়ে এসনা গো!" দ্বিজেন্দ্রনাথ বিস্মিত চক্ষে দেখিলেন মনোরমার চিরোজ্জ্বল স্বচ্ছমুখে দুশ্চিন্তার ঈষৎ কৃষ্ণাভা পড়িয়াছে। ম্লান হাসি হাসিয়া দ্বিজেন্দ্র বলিলেন "তবু ভাল! তুমি এতদিনে মানুষের জন্যে ভাবতে শিখেছ। সুকুমারী আমার চেয়ে ভাগ্যবতী দেখছি।" "যাও যাও দেরি কোরোনা"—বলিতে বলিতে সুন্দরী বায়ুতাড়িত মেঘখণ্ডের মত কোথায় ভাসিয়া গেল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সুকুমারীর বাড়ীর দিকে চলিলেন। সংবাদ যাহা শুনিলেন, তাহাতে প্রাণ তাঁহার শুকাইয়া গেল!

কৃষ্ণনাথ বাবু আজ দুই দিন হইল সহরে গিয়াছিলেন—সহরে থাকিতে থাকিতেই কম্প দিয়া জ্বর আসে—গাড়ী

করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসেন। তখন হইতে অঘোর অচৈতন্য—আজও জ্ঞান হয় নাই। গত রাত্রি হইতে মুখ ও গলা ফুলিয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছেন "ইহা প্লেগ ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

কম্পিত বক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যত শীঘ্র পারেন মুঙ্গের ত্যাগ করিবেন।

বাটী প্রবেশ করিতেই দ্বারে মনোরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মনোরমা বলিল "কি গো, ব্যাপার কি? তোমার মুখ অমন শুক্‌নো কেন?"

উদ্বিগ্ন দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিল "সর্ব্বনাশ হয়েছে—মনোরমা! কৃষ্ণনাথ বাবুর প্লেগ হয়েছে! আর একদণ্ড এখানে থাকা নয়। যাওয়ার উদ্যোগ কর। আজই রাত্রে আমরা কলকাতা যাব।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের ভীতি ও উদ্বেগ দেখিয়া মনোরমার মুখে ধীরে ধীরে কৌতুকের স্নিগ্ধ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। মনোরমা কহিল "প্লেগকে অত ভয় কেন? মরণ ত একদিন আছেই! সুকুমারীর এমন বিপদ দেখে আমি ত যেতে পারি না। তোমার যাওয়ার আয়োজন করে দেবো কি?" মর্ম্মাহত দ্বিজেন্দ্রনাথ কহিল "হায় পাষাণি,—একবার যদি বুঝতে, তোমার একটী কঠোর কথা হৃদয়কে কেমন করে রক্তাক্ত করে দেয়"—দ্বিজেন্দ্রনাথ আরও বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু মনোরমার আয়তলোচনে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের তীব্রজ্যোতি দেখিয়া সহসা তাহাকে উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ বলপূর্ব্বক সংযত করিতে হইল।

মনোরমা দ্বার অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। দ্বিজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাচ্ছ?" অবিচলিত কণ্ঠে মনোরমা কহিল "সুকুমারীর বাড়ী।" কম্পমান হৃদয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ কহিল "কি সর্ব্বনাশ! প্রত্যক্ষ মৃত্যুর মুখে কে ইচ্ছা করে ছুটে যায়?" সহাস্যমুখে মনোরমা কহিল "তা হলে মৃত্যু তোমার নিকট যাতে প্রত্যক্ষ না হতে পারে, তুমি বসে বসে সেই চেষ্টা কর—আমি যখন সুযোগ পেয়েছি, একবার প্রত্যক্ষ মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি।" বলিতে বলিতে মনোরমা দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল—ভীত চিন্তিত ক্ষুব্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল!

(৪)

কৃষ্ণনাথ বাবু রক্ষা পাইলেন না। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় জড়দেহের বন্ধন কাটাইয়া তিনি দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।

সুকুমারী হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু অধিকক্ষণ শোক তাহাকে অভিভূত করিবার অবসরও পাইল না।

কৃষ্ণনাথ বাবুর সৎকারান্তে স্নান করিয়া আসিয়াই সেও জ্বরে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে গভীর অচৈতন্য তাহার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

মনোরমা আর বাড়ী ফিরিবার অবসর পাইল না। খোকাকে কোলে করিয়া সুকুমারীর রোগ-শয্যা-পার্শ্বে সেও স্থান গ্রহণ করিল।

লুব্ধ ভ্রমর মুদিত পদ্মের চারিপাশে আকুল হৃদয়ে যেমন গুঞ্জরিয়া ফিরে, প্লেগ-ভয়ভীত দ্বিজেন্দ্রনাথ তেমনি করিয়া কৃষ্ণনাথ বাবুর বাটীর চারিপার্শ্বে ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু মনোরমার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিলেন না। তৃতীয় দিনে সুকুমারীরও সুস্পষ্ট প্লেগলক্ষণ প্রকাশ পাইল। মনোরমা অবিচলিত চিত্তে যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করিল কিন্তু কোনই ফলোদয় হইল না। চতুর্থ দিনে সুকুমারীর জ্বর ছাড়িয়া গেল—চৈতন্য ফিরিয়া আসিল—শরীর কিছু সুস্থ বোধ হইল। মনোরমা সুধাইল "এখন একটু ভাল বোধ হচ্চে বোন্?" ক্ষীণ কণ্ঠে সুকুমারী কহিল "আর ভাল বোন্, নিববার আগে প্রদীপের অবস্থা যেমন হয় আমার অবস্থাও তেমনি। আমার দিন ফুরিয়েছে। আমি স্পষ্ট দেখছি আমার স্বামী আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছেন। ভগবান করুন তুমি চিরজীবী হও, আমার একটী কথা রেখো বোন্—খোকাকে আপনার ছেলের মত দেখো—তার আর কেউ নেই!" বলিতে বলিতে মুমুর্ষুর চক্ষুপ্রান্ত বাহিয়া অশ্রুবিন্দু নীরবে গড়াইয়া পড়িল। মনোরমা কোন উত্তর দিতে পারিল না। নীরবে খোকাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। তুষার গলিতে আরম্ভ করিয়াছিল!

রাত্রিশেষে রোগিনীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। সুকুমারী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "একবার খোকাকে বুকের কাছে দাও বোন্, তাকে শেষ দেখা দেখি।" মনোরমা খোকাকে

সুকুমারীর বুকের উপর শোয়াইয়া দিল। সুকুমারী মাতৃ-হৃদয়ের অন্তিম উচ্ছ্বাসে খোকাকে বক্ষের উপর টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল—কিন্তু এই আবেগে তাহার শেষ বক্ষস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল।

নবীন উষার প্রথম স্বর্ণরশ্মিরেখা গবাক্ষপথে আসিয়া সত্যোমৃতের পাণ্ডু মুখের উপর পড়িয়াছে। তরুণ সূর্য্যালোকে সেই মৃত্যুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন বিবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া খোকা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল—আকুল ভাবে "মা! মা!" বলিয়া মনোরমার দিকে তাহার ক্ষুদ্র বাহু প্রসারিত করিল। আবেগপূর্ণ হৃদয়ে "এস বাবা এস" বলিয়া সুকুমারী তাহাকে আপনার উদ্বেলিত হৃদয়ের উপর টানিয়া লইল। খোকা সেই শান্তিময় স্নেহনীড়ে আশ্রয় পাইয়া ক্ষণকাল পরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মনোরমার প্রশান্ত নয়নতট স্নেহোচ্ছ্বাসে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল!

(৫)

সুকুমারীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শিশুটিকে বক্ষে লইয়া মনোরমা যখন দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ মনোরমাকে দেখিয়া আপনার অজ্ঞাতসারে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কি মহামহিমাময়ী রাজরাজেশ্বরীরূপিণী দেবীমূর্ত্তি! কোথায় সে চঞ্চল চটুলতা, কোথায় সে মর্ম্মভেদী বিদ্রূপপূর্ণ তীক্ষ্ণ খর-দৃষ্টি, কোথায় সে হৃদয়হীন উপেক্ষার তুষারশিলা!

চঞ্চলতা গাম্ভীর্য্যে ঢাকিয়া গেছে, নিষ্ঠুর কৌতুক-প্রিয়তার তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ বাৎসল্য ও প্রেমের স্নিগ্ধ মেঘতলে অন্তর্হিত হইয়াছে—রূঢ় অবিশ্বাস এবং মর্ম্মভেদী অবজ্ঞার কণ্টকরাজির উপর ভক্তিবিশ্বাসের শ্যাম শস্যরাজি নীরবে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে!

স্তম্ভিত দ্বিজেন্দ্রনাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে মনোরমার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল—

আর সে মনোরমা নাই! মাতৃত্বের "সোনার কাঠির" স্পর্শ-গুণে বনবিহঙ্গিনী স্বেচ্ছায় আজ পিঞ্জরবাসিনী—"কপালকুণ্ডলা" "সূর্য্যমুখী"তে পরিণত!

দ্বিজেন্দ্রনাথের হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইল। খোকা "সন্ধিপত্র" রূপে উভয়ের মধ্যে আজ অকস্মাৎ মিলন ঘটাইয়া দিল। এমন কঠিন লোহাকেও সোনা করিয়া তুলিল খোকা "স্পর্শমণি"।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

সেন্তে বিউব

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে সকল সাহিত্য-সমালোচক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ফরাসী সেন্তে বিউব তাঁহাদিগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে একটী দরিদ্র পরিবারে তাঁহার জন্ম হয় এবং ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ধনলালসা ও পদগৌরবস্পৃহা বিসর্জ্জন দিয়া কায়মনোবাক্যে সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন,—সাহিত্য তাঁহাকে জগতের বরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। চিন্তার ও ভাবের রাজ্যে তাঁহার হৃদয়ের অসংখ্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে মনে হয় যেন সাগরের অসংখ্য উর্ম্মিমালার অবিশ্রান্ত ক্রীড়া চলিতেছে। তাঁহার প্রতিভার সহস্র চঞ্চল তরঙ্গে সমাজকে অবাক্ করিয়া তুলিয়াছে ও তাঁহাকে তৎযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচকের গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছে। তিনি অবিবাহিত ছিলেন, তাঁহার বংশলোপ হইয়াছে, কিন্তু কীর্ত্তিলোপ হইবে না। তিনি সমালোচনার রাজ্যে সেবা-নীতির প্রকৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ইউরোপে ক্লাসিকেল সাহিত্যের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। অবশ্য ইতিপূর্ব্বে, এমন কি ষোড়শ শতাব্দীতেও সেক্ষপিয়র-প্রমুখ প্রতিভাবান্ লেখক সময়ে সময়ে ক্লাসিকেল আদর্শের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে গমন করিয়াছেন, তবুও বলিতে হয় যে রুসো-লিখিত Emile গ্রন্থের পূর্ব্বে "Back to Nature" প্রকৃতিতে-প্রত্যাবর্ত্তন-পন্থী লেখকের যুগ বিশেষভাবে স্থাপিত হয় নাই। রুসো যখন এমিলিকে প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত করিয়া বিকশিত করিয়া তুলিলেন, তখন এই নব্যপন্থার প্রতি ইউরোপের সাহিত্য-সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখন সুধীসমাজ দেখিতে পাইলেন যে ক্লাসিকেল আদর্শের ভাব, ভাষা ও বস্তুনির্ণয়ের নির্দ্দিষ্ট নিয়মবদ্ধ প্রণালীর ভিতর দিয়া সাহিত্যে স্বাধীন প্রবৃত্তি প্রস্ফুটিত

হইতে পারে না; তখন মধ্য ও বর্ত্তমান যুগের ভাব ও রুচি ঘটনা ও ব্যবহার লইয়া নানাবিধ নূতন উপকরণে Romantic School নামক নূতন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হয়।

সেন্তে বিউব যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন Romantic প্রথার জয়জয়কারের দিন। অবশ্য তখন কেহ কেহ Pre-Classic আদর্শেও সাহিত্য-সেবায় ব্রতী ছিলেন। বিশ বৎসর বয়সে সেন্তে বিউব এই Romantic আন্দোলনের মুখপত্র স্বরূপ Globe নামক পত্রিকায় লেখনী পরিচালনা আরম্ভ করেন। উক্ত কাগজের সম্পাদক তাঁহারই একজন ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক ছিলেন। সেন্তে বিউবের মৃত্যুর পর গ্লোবে লিখিত তাঁহার প্রবন্ধাবলী Premiers Lundis নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত রচনায় কোনও বিশেষত্ব ছিল না, তবে উত্তরকালে তিনি একজন নিবিষ্ট পাঠক, উদার ও পক্ষপাতশূন্য সমালোচক হইয়া দাঁড়াইবেন এমন আভাস যথেষ্ট ছিল।

সেই সময়ে প্রসিদ্ধ মনস্বী ভিক্তর হিউগো ফরাসী দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠপদ অধিকার করিয়া বর্ত্তমান ছিলেন। ২৩ বৎসরের যুবক সেন্তে বিউব হিউগোর Odes et Ballades সমালোচনা করিয়া দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উক্ত দুই প্রবন্ধ লেখককে Romantic দলের শ্রেণীভুক্ত করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার গৌরবের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। ইহার পরে তিনি ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী-সাহিত্য সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ গ্লোব পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করেন। ২৫ বৎসর বয়সে এবং ইহার কিঞ্চিৎ পরে তিনি ২।১ খানি কাব্য গ্রন্থের সংস্করণ ও প্রণয়ন করেন। কিন্তু কবি হিউগোর প্রতিভার সংস্রবে আসিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে কবি-যশঃ-প্রার্থী হওয়া অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে গদ্য সাহিত্যের সেবক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝিলেন যে "যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের বার আনা কবিতা উবিয়া যায়।"

এই সময়ে দ্বিতীয়বার ফরাসীবিপ্লব সংঘটিত হয়। সেন্তে বিউব তখন প্যারী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে চলিয়া যান। বিপ্লবের অবসান সময়ে রাজধানীতে অনুপস্থিত নিবন্ধন তাঁহার জীবনোপায়ের কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই। দশবৎসর ব্যাপিয়া দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া তিনি মলিন ও কৃশ হইয়া পড়েন। এই দুঃখ দারিদ্র্যের দিনে ত্রিশবৎসর বয়সে তিনি Volupte নামক উপন্যাস রচনা করেন। ইহাই তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের একমাত্র উপন্যাস-গ্রন্থ। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে তিনি একটী সামান্য লাইব্রেরীয়ানের পদে নিযুক্ত হন। মধ্যে ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে কিছু দিনের জন্য তিনি সুইজার্লণ্ডের Lausanne বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইয়া সাহিত্য সম্বন্ধে ৮১টী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে ভিক্তর হিউগোর নেতৃত্বে স্বদেশের ফরাসী একাডেমি সেন্তে বিউবকে অভিনন্দন প্রদান করেন। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে বেলজিয়ামের Liege বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করেন। ফলে সুইজার্লণ্ডের ও বেলজিয়াম প্রভৃতি স্থানের বক্তৃতার সুযশ সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়া তাঁহাকে ফরাসীদেশের, এমন কি সমস্ত ইউরোপের, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচকের পদে বরণ করে। লোকে তখন বুঝিতে পারে যে ফরাসী দিদেরো ও জার্ম্মেন লেসিং এর পরে এত প্রবল সূক্ষ্মদর্শিতা লইয়া আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।

Volupte রচনা করিবার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি প্যারী রিভিউ পত্রে ও অপরাপর পত্রিকায় Causeries (সুদীর্ঘ নিবন্ধ) লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বেলজিয়াম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার অমর নিবন্ধাবলী রচনায় তিনি আপনার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বিশ বৎসরের অধিক কাল তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানে "Causeries du Tundi" নামে, বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মাতৃ-বিয়োগের পরে তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। ৭ বৎসর পরে ফরাসী-কলেজে Virgil সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন। যিনি বিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিদেশে পূজা ও প্রশংসা লাভ করিতেছিলেন, তিনি বিশ বৎসর পরেও যে আপনদেশে সম্মান লাভ করিলেন ইহাই তাঁহার বিশেষ সৌভাগ্য, কারণ স্বদেশে ক্বচিৎ প্রতিভার পূজা হইয়া থাকে। চারি বৎসর পরে তিনি সেনেট মহাসভার সভ্যপদে বৃত হন, ইহাই তাঁহার জীবনে পদগৌরবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

Causeries নিবন্ধাবলি তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। প্রত্যেক নিবন্ধে প্রায় আট হাজার শব্দ থাকিত। ফরাসী-সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধেই অধিকাংশ নিবন্ধ বিরচিত হইত। এই নিবন্ধ সমালোচনার এক অভিনব প্রণালী প্রদর্শন করে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে সমালোচক আপনার নিজ বিদ্যাবুদ্ধির ও ধারণার কষ্টিপাথরে সাহিত্যের পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাতে সমালোচকের ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ প্রতিভায় সময় সময় মহান্ লেখকের রচনাও বিকৃত মূর্ত্তিতে সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। অপর একদল সমালোচক লেখককে অবস্থার জীব মনে করিয়া তাহার রচনা হইতে লেখকের ব্যক্তিত্ব মুছিয়া ফেলিতে চান। লেখকের সংসারের ও সমাজের গতি ও রীতি অনেক পরিমাণে সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে বটে, কিন্তু লেখকের সাধনার ও প্রতিভার প্রভাবও অল্প নহে। এই শেষোক্ত সত্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া কেহ কখনও সাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনা করিতে পারেন না। সেন্তে বিউব এই উভয় পন্থীর পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নিজে নূতন পথ খুলিয়াছেন। পাঠক কখনও এক জীবনে বিশ্বসাহিত্যের রসাস্বাদ করিতে পারেন না। সমালোচকগণ যদি আপনাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট ধারণার সাহায্যে সেই বিশ্বসাহিত্যের বিচারে বসেন, তবে লেখকের পরিবর্ত্তে সমালোচকের দীক্ষায় অনভিজ্ঞ পাঠক দীক্ষিত হইয়া উঠেন। সমালোচনার এই প্রচলিত অস্বাভাবিক গতি দেখিয়া সেন্তে বিউব পাঠককে লেখকের ভাষায় ও মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই জন্য বিভিন্ন গ্রন্থকারের সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে বিভিন্ন মতের পরিপোষণ করিতে হইয়াছে। সাধারণ লোক এই রহস্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে চঞ্চলচিত্ত বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছে। সাহিত্যসেবীর মধ্যে এই জন্য তাঁহার জীবনব্যাপী বন্ধুলাভ ঘটে নাই। একজন গ্রন্থকারের সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি যে রাজনীতি ও ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, হয়ত অপর প্রসঙ্গে তাঁহাকে বিরুদ্ধমত প্রচার করিতে হইয়াছে। এই জন্যই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে তাঁহার হৃদয় চঞ্চল-উর্ম্মিমালা-বিক্ষুব্ধ-সাগরবক্ষ-সদৃশ অনন্ত লীলাক্ষেত্র। অবশ্য লেখককে লেখকের ভাষায় বিবৃত করিতে হইলে সমালোচকের ব্যক্তিত্ব একেবারে লোপ পায় না। সেইজন্য সাহিত্যসেবী বলিয়া সেন্তে বিউবের যে গৌরব লাভ হইয়াছে তাহার মূলেও তাঁহার আপন ব্যক্তিত্বের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। কিন্তু সেই ব্যক্তিত্ব কখনও লেখকের বিশেষত্ব অতিক্রম করিয়া যায় নাই। সেবাবৃত্তিই সেই ব্যক্তিত্ব। সেবাবৃত্তি শাসনবৃত্তি অপেক্ষা বিশেষ প্রাণস্পর্শী। বোধ হয় এই জন্যই শাসন-নির্দ্দিষ্ট ক্লাসিকেল আদর্শের সমাধিভূমি, কল্পনা-প্রিয়, Romantic আদর্শে অনুপ্রাণিত ইউরোপ সেবক সেন্তে বিউবকে তৎযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিংহাসন প্রদান করিয়াছে। অবশ্য তিনি যে পথে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন বর্ত্তমান ইউরোপ টেন-প্রমুখ সমালোচকের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে তাহা হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন পথে গমন করিতেছে। সেবক কখনও আপন দেবতাকে অবস্থার জীব মাত্র মনে করে না। সেন্তে বিউব সেইজন্য Product-of-the-Circumstances Theory পরিহার করিয়াছেন। সমালোচক সেন্তে বিউবের প্রাধান্যমূলে এই মাত্র উপলব্ধি করিতে পারি যে, তিনি সাহিত্যসেবক ছিলেন, সাহিত্যশাসক ছিলেন না।

শ্রীরজনীরঞ্জন দেব

"বাঙ্গালা ন্যাসনালিটি"*

(NATIONALITY)

আমরা আজ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছি বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারণ আমাদের উদ্দেশ্য। আমার মতন লোকের এই সম্মিলনে কোন প্রকার কার্য্যের ভার লওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতার কথা। কারণ বাঙ্গালী-সন্তান হইয়াও নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা করার অবসর আমার এত অল্প হইয়াছে যে, আমার মতন লোকের সেই জ্ঞান লইয়া এই বিদ্বজ্জন-সম্মিলনে উপস্থিত হওয়া কেবল হাস্যভাজন হওয়া মাত্র। অধিকন্তু যে বিষয়টীর আলোচনা করিবার জন্য আমি উপস্থিত হইতেছি, তাহা ইংরাজি ভাষায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাহার

* রাজসাহী সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

আলোচনা করিতে এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষায় তাহা আজিও পাওয়া যায় না। এই জন্য আমার ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না। তবে আমি যে বিষয়টী উপস্থিত করিব, আপনারা তাহারই কেবল আলোচনা করিবেন। যদি আমি বিষয়টী ইংরাজী-বাঙ্গালা কথায় আপনাদের নিকট বিশদরূপে উপস্থিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। এই সময়ে আর একটী কথাও বলিয়া রাখা আবশ্যক। আমি এই বিষয়টী আলোচনা করিতে করিতে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, আপনাদের আমি তাহা গ্রহণ করিতে বলি না। যদি এই প্রবন্ধে আপনাদের এই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষিত হয় এবং আপনারা এই বিষয়টী ভাবিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আমি আমার কর্ত্তব্য করিয়াছি বলিয়া মনে করিব। বিষয়টী খুব জটিল এবং ইহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও বিচার আবশ্যক। অনেক লোকের গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলে ক্রমশঃ ইহা পরিষ্কার হইবে।

এখন যাহারা বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেছে, তাহারা বা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে চিরকালই বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিত, তাহা মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখি না। এইজন্য প্রথমেই আমি বাঙ্গালা ভাষার কি করিয়া প্রসারণ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার দুই একটী উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিব।

আমি যখন চট্টগ্রামে ছিলাম, তখন মহামুনি নামক স্থানে চৈত্রসংক্রান্তিতে "মহাবিষুব" পর্ব্বে Chittagong Hill Tracts-বাসী মঙ্গোলীয় জাতীয় (Mongolian) অধিবাসীদের প্রথমে সেই পর্ব্ব উপলক্ষে সমবেত হইতে দেখি। সাধারণতঃ ইহারা "জুমিয়া মগ" (Jumia Mug) নামে পরিচিত। আজি পর্য্যন্ত ইহারা ভূমিকর্ষণ করিতে শিখে নাই। গয়াল বা বন্যগরু তাহাদের গৃহের নিকট রাত্রিতে আসিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহারা আজিও তাহাদের পুষিতে শিখে নাই। গরু পুষিলে তাহার দুধ খাওয়া যায়, তাহাদের দ্বারা জমি চাষ করা যায়, বা একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে তাহারা ভারবহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, ইহারা আজিও তাহা জানে না। ইহারা কেবল শেয়ালের মাংস আহার করিতে শিখিয়াছে। ইহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, এই জন্য ইহাদের মগ বলে। যে প্রকারে তাহারা শস্য বপন করে, তাহাকে "জুম" বলে বলিয়া ইহারা "জুমিয়া মগ" বলিয়া পরিচিত। ইহাদের বিষয় যদি কেহ জানিতে চান, তাহা হইলে Capt. Lewin-কৃত Chittagong Hill Tracts and their Dwellers therein নামক পুস্তক পাঠ করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। ইহাদের দেশে তিন জন রাজা আছেন। তাহার মধ্যে এক জনের নাম চকমা রাজা (Chukma Rajah); এই চকমা রাজার রাজ্য ঐ Hill Tractsএর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার Head Quarters—সহরটীর নাম রাঙ্গামাটী (Rangamati)। এই খানে বাঙ্গালীরা গিয়া দোকান পসরা খুলিয়াছেন—এই খানে একটী Entrance School—সরকার হইতে খোলা হইয়াছে। ইহার ফলে দেখা যাইতেছে—এই প্রদেশের লোকদের বাঙ্গালী সাজিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। এখন যিনি রাজা, তাঁহার নাম "ভুবনমোহন রায়"। এই রাজা একবার চট্টগ্রাম সহরে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। দেখিয়াছিলাম, তখন তিনি ঠিক আমাদের মতন কাপড় পরিয়াছেন। কথাবার্ত্তা সব বাঙ্গালা ভাষায় হইল। তিনি Entrance পরীক্ষায় পাস করিয়াছিলেন। শুনিলাম, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত মঙ রাজা (Mong Rajah) নামধারী অপর এক রাজার কন্যার সহিত বিবাহ স্থির হওয়ায় সেই মেয়েটীকে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই রাঙ্গামাটী স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিতে যে সব ছেলেরা চট্টগ্রামে আসিয়াছিল—দেখিলাম, তাহারা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, এই দুই ভাষায় পরীক্ষা দিতেছে। এই সব শুনিয়া কি আপনাদের মনে হইতেছে না যে, অলক্ষ্য ভাবে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা ভাষার প্রসারণ হইতেছে। চট্টগ্রাম স্কুলে একজন শিক্ষক আছেন, তাঁহার নাম "কৈলাসচন্দ্র", তিনি জাতিতে কুকি। তিনি আমাদের সহিত বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় কথা কহিতেন না। ইনি বি-এ গ্রীক পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। আমি যখন সেখানে ছিলাম, তখন তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী বৌদ্ধের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ইহার উদাহরণে কুকিদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী সভ্যতার

আলোক কি প্রকার কার্য্য করিবে, তাহা বোধ হয় আপনারা সহজে বুঝিতে পারিতেছেন।

আর এক দিনের কথা বলিতেছি। এক দিন চট্টগ্রাম হইতে রেলে আসিতেছিলাম—তখন অন্য এক গাড়ীতে "হরি সঙ্কীর্ত্তন" হইতেছিল। শুনিতে পাইতেছিলাম, অনেক লোক একসঙ্গে গান করিতেছিল, ক্রমে যখন আমরা আসিয়া একটী বড় ষ্টেসনে পৌঁছিলাম, তখন গান বন্ধ হইল। গাড়ী সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়, আমি নামিয়া দেখিতে গেলাম—কাহারা গান করিতেছিল। গাড়ীর কাছে গিয়া দেখি যে, মণিপুরীরা গান করিতেছিল, গান বন্ধ হওয়ার পর হইতেই তাহারা নিজেদের ভাষায় কথা কহিতেছে, আর বাঙ্গালা ভাষায় নয়। আপনারা বোধ হয় অবগত আছেন যে, মণিপুরীরা বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, এই জন্য তাহারা পূজা প্রভৃতি কার্য্যে বাঙ্গালা ভাষাই ব্যবহার করে। সেই দিনও রাস উপলক্ষে দলে দলে মণিপুরীরা নবদ্বীপে আসিতেছে, দেখিলাম। বৈষ্ণবধর্ম্ম যে কেবল বাঙ্গালা ভাষা প্রসারণে সাহায্য করিতেছে, তাহা নয়, এখন আবার এই ধর্ম্ম গ্রহণ করায় ফল স্বরূপ এই অনার্য্য মঙ্গোলীয় (Mongolian) মণিপুরীদের মধ্যে এক শ্রেণী উপবীত লইয়া ব্রাহ্মণ সাজিয়া যজনযাজন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহা হইলে আপনারা কি বলিবেন যে, ব্রাহ্মণ মাত্রেই আর্য্যবংশ-সম্ভূত? ইহাতে আর এক কথা কি মনে হইতেছে না—(Non-Aryan Non-Hindu Race) অনার্য্য অহিন্দু জাতি ক্রমে হিন্দু হইয়া আর্য্য হিন্দুসমাজে মিশিতেছে। আপনারা ইহাদিগকে কেহ ভাল ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না; তাহারাও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের সহিত মিশিবে না। উত্তর পশ্চিমের ব্রাহ্মণেরা কি আমাদের দেশের ব্রাহ্মণকে আবহমানকাল ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া আসিতেছে?

বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্বে কি হইতেছে, তাহা বলিলাম। পশ্চিমে কি হইতেছে, তাহাও দেখুন। বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা ও হাজারিবাগ জেলার যে অংশ বাঙ্গালা দেশের সহিত সংশ্লিষ্ট, আমি সেখানে সাঁওতালদের সহিত মিশিয়াছি। দেখিয়াছি যে, যখন তাহারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা কয়, তখন তাহারা সাঁওতালী ভাষায় কথা কয়—কিন্তু বাঙ্গালীদের সহিত তাহারা সর্ব্বদাই ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় কথা কয়। একটু অবস্থার উন্নতি হইলেই বাঙ্গালীর মতন ধুতি, জামা, জুতা পরিয়া "বাঙ্গালী বুবু" সাজিয়া বেড়ান অতি গৌরবের কথা মনে করে। এমন কি, খৃষ্টান পাদ্রীরা খৃষ্টান সাঁওতালদের বাঙ্গালী সাজাইয়া গ্রামে গ্রামে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান—দেখান যে খৃষ্টান হইলে এই রকম "বাঙ্গালী বুবু" হওয়া যায়। কেহ কেহ বলিবেন, বাঙ্গালীদের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য করার জন্য ইহারা দোভাষীর ন্যায় বাঙ্গালা কথা কহিলে বলিলে বাঙ্গালা ভাষার প্রসারণ হইল না। মানভূম জেলায় গেলেই ইহার উত্তর পাইবেন। সেখানে "ভূমিজ" (Bhumij) বা ভূঁইয়া (Bhunya) বলিয়া এক জাতি দেখিতে পাইবেন। তাহাদের শারীরিক গঠন দেখিলে একবারও আপনাদের সন্দেহ হইবে না যে, তাহারা অনার্য্য (Dravidian race) দ্রাবিড়ী বংশ সম্ভূত নয়। তাহাদের আচার ব্যবহার এখনও দ্রাবিড়ী জাতিদের ন্যায়। ভাষা একেবারে বাঙ্গালা, অন্য কোন ভাষা জানেই না। তাহাদের "বঙ্গা" "বঙ্গী" "মরং বুরু" (Bonga Bongi Morung Buru) আর উপাস্য নয়; ঐ সব দেবতাদের একেবারে ত্যাগ করিয়াছে বলিতে পারি না, তবে হিন্দু-দেবদেবী তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে ও এই দেবতারা পশ্চাতে পড়িয়াছে। এখন ইহারা একটী Hindu caste হইয়াছে। এদিকেও হিন্দু-ধর্ম্মের প্রসারণ হইয়াছে, বাঙ্গালা ভাষারও প্রসারণ দেখা যাইতেছে।

আমি আরও একটী উদাহরণ দিব। আপনারা যদি কেহ শিক্ষাবিভাগে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বিহারে যান, তাহা হইলে দেখিবেন যে, স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে তিন দল শিক্ষক দরকার। বাঙ্গালী ছেলে থাকিলে বাঙ্গালী শিক্ষক দরকার, মুসলমান ও কায়স্থ ছেলেদের জন্য উর্দ্দু জানা শিক্ষক দরকার, বিহারী অন্য হিন্দুদের জন্য হিন্দি জানা শিক্ষক আবশ্যক। সাধারণতঃ সকলে হিন্দি ভাষায় কথা কহিলেও পুস্তক পড়াইবার সময় তিন স্বতন্ত্র অক্ষর ও তিন স্বতন্ত্র ভাষা একজনের পক্ষে জানা বড় সহজ নয়। স্কুল বিভাগের উচ্চ শ্রেণীতে ইংরাজিতেই অনেক কাজ

হয় বটে, তবে সেখানেও অনুবাদ করিবার সময় তিন শ্রেণীর শিক্ষক দরকার হয়। কিন্তু উড়িষ্যায় যান—নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত কোথাও এক জনের বেশী শিক্ষক দরকার হয় না। উড়িয়া শিক্ষকেরা সকলেই বাঙ্গালা জানেন। বাঙ্গালী ও উড়িয়া ছেলে এক শ্রেণীতে থাকিলে তাহারা নিজ নিজ ভাষায় পুস্তক পড়ে বটে, কিন্তু তাহার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক দরকার হয় না। যদি শিক্ষক বাঙ্গালী হন, তিনি বাঙ্গালায় পড়ান, কোন উড়িয়া ছেলেদের তাহাতে অসুবিধা হইবে না। তাহারা সকলেই বাঙ্গালা পড়িতে জানে। উড়িয়া শিক্ষক হইলে তাঁহারা বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে জানেন, বাঙ্গালী ছেলেদের কোন অসুবিধা নাই। ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার উড়িয়ায় কোন পুস্তক নাই—বাঙ্গালা হইতে তাহারা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে শিখিলে তাহাতেই উড়িয়া হইতে অনুবাদ শিক্ষা হইয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষা উড়িষ্যা দেশে কিরূপ প্রচলন হইতেছে, ইহা হইতে তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন। আমি উড়িষ্যা দেশে বাস করিবার সময় এমন একজনও উড়িয়া ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করি নাই, যিনি বেশ শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় আমার সহিত কথা কন নাই। বরং আমি এমন শুনিয়াছি, যদি আমি তাঁহাদের সহিত উড়িয়া ভাষায় কথা কহিতাম, তাহা হইলে তাঁহারা মনে করিতেন যে আমি তাঁহাদের হেয়জ্ঞান করিয়া বেহারার শ্রেণীর লোক মনে করিতেছি। আমরা মাথা কামান অশিক্ষিত উড়িয়া বাঙ্গালা দেশে দেখিতে পাই, কিন্তু উড়িষ্যায় যান, দেখিবেন, শিক্ষার সঙ্গে কি পরিবর্ত্তন হইতেছে। উড়িয়া একেবারে বাঙ্গালীর ন্যায় পোষাক পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছে। এখন একটা রব উঠিয়াছে বটে যে, "Orissa for the Uryas"—এই রবটী এখনও তেমন ঝাঁকিয়া উঠে নাই, কারণ যিনি এই রব ভাল করিয়া তুলিয়াছেন, নিজে উড়িয়া হইলেও আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তায় তিনি সম্পূর্ণ বাঙ্গালী। বিগত ৪।৫ শত বৎসর হইতে বাঙ্গালীরা উড়িষ্যায় গিয়া বাস করিতেছেন, উড়িষ্যায় সাধারণের ধর্ম্ম চৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্ম, এবং উড়িষ্যার জমিদারীর অধিকাংশ ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীদের হাতে আসিয়া পড়িতেছে। এই সব কারণে উড়িষ্যায় বাঙ্গালা ভাষার এত আদর হইয়াছে। এদিকেও কি বাঙ্গালা ভাষার প্রসারণ দেখিয়া আমাদের আনন্দ হয় না?

আমি এতক্ষণ বাঙ্গালা ভাষার প্রসারণের কথা বলিতেছি—এই বাঙ্গালা সাহিত্য-সম্মিলনে এই কথা জানিয়া সকলের কত আনন্দ হইবে। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কথারও আমি অবতারণা করিতেছি, তাহা এই যে, যাহারা বাঙ্গালা ভাষা গ্রহণ করিতেছে, তাহারা কি সব বাঙ্গালী—বাঙ্গালী বলিয়া কোন একটা race আছে, কিম্বা কখনও কি ছিল? পূর্ব্ব দেশে যাহারা বাঙ্গালা ভাষা বা বাঙ্গালীর ধর্ম্ম বা বাঙ্গালীর সভ্যতা গ্রহণ করিতেছে, তাহারাও সব (Mongolian) মঙ্গোলীয় জাতি সম্ভূত। পশ্চিমে যাহারা আমাদের সহিত মিশিতেছে, তাহারাও সব (Dravidian) দ্রাবিড়ী জাতি সম্ভূত। এই রাজসাহী ডিবিসনে যে "রাজবংশী"দের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে, তাহারা (Mongolian) মঙ্গোলীয় জাতি সম্ভূত। তবে ত আমরা দেখিতেছি যে, বাঙ্গালা ভাষায় যাহারা কথা কয়, তাহারা ত সব এক জাতি (race) সম্ভূত নয়। উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালীদের ধমনীতে যে আর্য্যরক্ত রহিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আর্য্য (Aryan), মঙ্গোলীয় (Mongolian) ও দ্রাবিড়ী (Dravidian) তিন শ্রেণী হইতেই যখন লোক আসিয়া ও একত্র মিশিয়া বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেছে, তখন ইহাদের উৎপত্তি যে এক, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

কেহ বলিবেন যে, মসলা (materials) নানাস্থান হইতে আসিতে পারে, সব যদি ভাঙ্গিয়া গড়িয়া এক হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে যে একটী Nation হইবে না, তাহা কে বলিবে? এই এক বাঙ্গালা ভাষায় সব এক করিতেছে। এই বাঙ্গালা ভাষা আমাদের বাঙ্গালী জাতি গঠনের মূলমন্ত্র। এই জন্যই ত আমরা বাঙ্গালার অঙ্গচ্ছেদে এত আপত্তি করিতেছি। কথাটা এখন ভাল করিয়া বিচার হউক। এক ভাষাতেই কি কখনও Nationality গঠন করিয়াছে? ইউরোপে France, Germany ও Italy তিন দেশে এই বিশ্বাস—এক ভাষা Nationality গঠনের একটী প্রধান উপাদান—এই তিনটী Nationality গঠনে খুব সাহায্য করিয়াছে। আমাদের দেশেও

তাহা করিবে না কেন? কেবল ভাষাই কি তাহা করিয়াছে, না অন্য অনেক কারণ Nationality গঠনের মূলে ছিল, ভাষা কেবল উপলক্ষ মাত্র ছিল?

Sidgwick সাহেব লিখিয়াছেন যে, একটী Nation গঠনে এই কয়েকটী উপকরণ দরকার—(১) এক বংশে (race) উৎপত্তি, (২) এক ধর্ম্ম, (৩) এক প্রকার আচার ব্যবহার (Social custom), (৪) এক ভাষা, (৫) এক ইতিহাস (common Political History and common struggles against foreign foes). Risley সাহেবও তাঁহার People of India পুস্তকে এই ভাবই অন্য ভাষায় লিখিয়াছেন—

"As the word is ordinarily used, it sseems to imply that the persons composing a nationality are keenly conscious, and may even be passionately convinced, that they are closely bound together by the tie of common interests and ideals, that in a special and intimate way they belong to one another, and that the moral force and enthusiasm by which their sentiment of unity is inspired render it independent of the Government or Governments under which they may happen to live. This feeling of self-consciousness gives to a body of man a sort of personality, so that they become a moral unity with a common thought."

আমরা সকলে এক Nation, এই কথা মনে আসিলেই অমনি আমাদের মনে আর একটা ভাব আসা উচিত যে, আমরা অতি নিকট সম্পর্কিত এবং আমরা এক-ভাবাপন্ন। বাস্তবিক আমরা সকল বাঙ্গালীই কি এক-ভাবাপন্ন?

দেখা যাউক, আমাদের এমন উপকরণ আছে কি না, যাহাতে আমরা সব এক হইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। একটা জিনিষ আমাদের অবশ্য আছে, যাহাতে আমাদের সকলকে এক করিয়াছে—তাহা আমাদের এক ভাষা, এবং এই ভাষা এক হওয়ায় আমাদের মনে একটা ধারণা হইয়াছে যে (Imagination—a mental attitude—a subjective conviction which may subsist independently of any objective reality) আমরা এক বংশ হইতে উৎপন্ন। যদিও ইহা সত্য নয়, তথাপি যদি এই ধরণা আমাদের জাতীয় জীবনে (National life) কাজ করে, তাহা হইলে বিভিন্ন প্রকারের মসলা—আর্য্য, দ্রাবিড় বা মঙ্গোলীয় জাতীয় লোক বাঙ্গালা দেশে বাস করিলেও আমাদের এক হইবার পথ আছে। ইউরোপের কোন Nation কি কোন এক জাতি race হইতে সম্ভূত হইয়া একটী Nation তৈয়ারী হইয়াছে? সব Nation এর ভিতরই ত অন্য অনেক জাতি races মিলিত হইয়াছে। ইংরাজ জাতি ত Angles, Saxons, Jutes, Celts, Normans প্রভৃতি races এক হইয়া এক নূতন English Nationality গঠন করিয়াছে। আমাদের তেমন হইবে না কেন? ভাষা ত আমাদের সাহায্য করিতেছে।

বাঙ্গালা ভাষাতে আমাদের মনে এক বংশ হইতে উৎপন্ন ভাবটী—যদিও সময়ে সময়ে জানাইয়া দিতেছে বটে, but caste favours particularist rather than nationalist tendencies. এই জাতিভেদ আমাদের এক হইবার পথে এমন বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছে যে, যতদিন ইহা বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন আমরা এক হইতে পারিব কি না সন্দেহ। আমি কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একথা বলিতেছি না—ভারতবর্ষের Ethnology পাঠ করিয়া আমার এই ধারণা এমন বদ্ধমূল হইয়াছে—আজ আমি সেই কথাই আপনাদের নিকট বিশেষ ভাবে বলিব বলিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমি যে কেবল এই কথা বলিতেছি, তাহা নয়—Risley, Ibbetson, Senart প্রভৃতি প্রবীণ Indian Ethnologists সকলেই এই কথা বলিতেছেন। একটি গল্প বলিয়া এই বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিব।

একজন শ্রদ্ধেয় বাঙ্গালী একবার পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, রেলের গাড়ীতে এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজের সহিত আমাদের দেশের Political future সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ হয়। তাহাতে সেই ইংরেজটী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা চাও কি? তিনি বলিলেন যে, "আমরা চাহি যে, তোমরা আর কিছুদিন থাক, আমরা প্রস্তুত হইয়া লই, তাহার পর তোমাদের এ দেশ হইতে তাড়াইয়া দিব। আমাদের দেশ আমাদের হউক।" সাহেবটী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিন পরে তোমরা আমাদের তাড়াইয়া দিতে পারিবে, মনে কর।" তাহাতে তিনি বলিলেন—"প্রায় একশত বৎসর লাগিবে।" ইংরাজটী স্থির হইয়া একটু ভাবিয়া পরে বলিলেন যে, "বাবু, যতদিন তোমাদের মধ্যে

জাতিভেদ থাকিবে, ততদিন আমরা নিশ্চিন্ত আছি। এই জাতিভেদ থাকিতে তোমরা কখনও এক হইতে পারিবে না। এক হইতে না পারিলে আমাদেরও কোন ভয় নাই।"

কেন তিনি এ কথা বলিলেন? জাতিভেদের মধ্যে এমন কি আছে যে, আমাদের এক হইতে দিবে না? দেখা যাউক, জাতিভেদের উৎপত্তির কারণ কি? তাহার ভিতর এমন কিছু আছে কি না, যাহাতে আমাদের এক হইবার পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে? কেহ হয়ত বলিবেন যে, পৃথিবীতে জাতিভেদ কোথায়ও উঠিয়া যায় নাই—ইংলণ্ডে ধনী নির্ধনের মধ্যে এত ব্যবধান যে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না—সেখানে Lord বংশের লোকেরা অতি ঘৃণার চক্ষে অপরের দিকে চাহিয়া থাকে। ঐ সব দেশে aristocracy of wealth আছে, আমাদের দেশে aristocracy of birth,—জাতিভেদ ছাড়া যায় না। সে সব দেশে যখন জাতিভেদে nationality গঠনে কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই, আমাদের দেশে যে তাহা দ্বারা ক্ষতি হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? পৃথিবীতে কোন সময়ে যে কোন সমাজের ভিতর সব লোকই এক ভাব ও অবস্থাপন্ন হইবে, ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। যতদিন মানুষের মধ্যে বুদ্ধি ও শক্তির বিভিন্নতা থাকিবে, ততদিন বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী লোকেরা পৃথিবীতে সকল স্থানেই প্রাধান্য পাইবেই। আমাদের কথা এই যে, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এই বুদ্ধি বা শক্তি কেবল বংশ বিশেষে চিরকালের জন্য একচেটিয়া নাই বা থাকিবেও না, এবং তাহার উপর কোন সমাজও দাঁড়াইতে পারে না। রাখিবার চেষ্টা করিলেই তাহার ফল বিষময় হইবে। আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, পাশ্চাত্য দেশে Capital ও Labourএর মধ্যে যে সংগ্রাম উপস্থিত, তাহার ফলে সমাজের ভিতরকার অসামঞ্জস্য ভাগ ক্রমে অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে। ইহা ভিন্ন Death Duties, Old Age Pension, Taxation on unearned income, Nationalization of Land, Nationalization of Railways প্রভৃতি যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহা দ্বারা সমাজে কতকগুলি লোকের হাতে অর্থ আর জমিবার উপায় থাকিতেছে না। দেশের টাকা দশ জনের হাতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভেদ একেবারে চলিয়া যাইতেছে না—যাইতে পারেও না। তবে কোন সমাজ বংশগত ভাবে তাহা রাখিবার চেষ্টাও করিতেছে না—রাখিতে গেলে থাকিবেও না।

পাশ্চাত্য দেশে যখন আমাদের দেশের মত বংশগত জাতিভেদ দেখিতেছি না, তখন তাহার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে আমাদের দেশের কথা আলোচনা করিতেই হইবে। ইহার উৎপত্তির কারণ কি?

সাধারণতঃ তিনটী কারণ দর্শিত হইয়া থাকে। প্রথমটী আমাদের দেশের শাস্ত্রকারদের। জাতিভেদের কথা উঠিলে আমরা প্রথমেই মনুর কথা তুলি। মনু জাতিভেদ সম্বন্ধে একমাত্র লেখক নন। তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে অনেকেই এই বিষয়ে লিখিয়াছেন। আমরা সকলের মতামত আলোচনা করিবার সময় পাইব না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনুর মতকে literary theory বলিয়াছেন। এই মত অনুসারে এদেশে আদিতে চারি বর্ণ ছিল। এই চার বর্ণ মধ্যে আদান প্রদান চলিত। উচ্চশ্রেণীর পুরুষে নিম্নশ্রেণীর কন্যা বিবাহ করিলে অনুলোম বিবাহ বলিত। নিম্নশ্রেণীর পুরুষে উচ্চশ্রেণী হইতে কন্যা গ্রহণ করিলে তাহাকে প্রতিলোম বলিত। এইরূপ উভয়বিধ বিবাহে যে সব সন্তান সন্ততি হইত, তাহাতে সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইত। ক্রমে আদি চারি বর্ণ ও এই সঙ্করবর্ণ ও তাহাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে যত বিবাহ হইতে লাগিল, ততই নূতন নূতন প্রকার জাতির উৎপত্তি হইতে লাগিল। এই theory গ্রহণ করিয়া সময় সময় সংহিতাকারগণ বিপদে পড়িয়াছিলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, চীন, শক বা দ্রাবিড় জাতীয় পরাক্রান্ত রাজারা এদেশে বর্ত্তমান আছেন ও যখন ইহাও দেখিলেন, তাঁহাদের ক্ষত্রিয় বলিয়া না স্বীকার করিলে চলে না, তাঁহাদের সঙ্করবর্ণ বলিলেও চলে না—তখন আর একটা কথা উঠিল, তাঁহারা আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ তাঁহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া সমাজে গৃহীত হইলেন। Main, Hunter প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই theoryটীর এই অর্থ করিয়াছেন যে প্রথমে যখন আর্য্যেরা এদেশে আগমন করেন, তখন আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই বর্ণ ছিল। আর্য্যেরা

কার্য্যভেদে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিন জাতি গঠন করিলেন। তিন জাতিই আর্য্যবংশ-সম্ভূত বলিয়া ইহাদের মধ্যে প্রথমে বিবাহ বন্ধ হইল না। আদিতে তেমন বাঁধা-বাঁধি রকমে জাতিভেদ না থাকিলেও, ক্রমে বংশপরম্পরায় নিজেদের জাতিগত ব্যবসায় চলিতে লাগিল ও এক-ব্যবসায়ী লোকদের মধ্যে বিবাহাদি বেশী চলিতে লাগিল। ক্রমে জাতিভেদ পাকা হইল। এদিকে অনার্য্যবংশীয়েরা দাস, দস্যু নামে পরিচিত হইতে লাগিল। তাহারা অনার্য্যদের দ্বারা বিজীত হইয়া তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত রহিল, শূদ্র জাতির উৎপত্তি হইল। উচ্চ শ্রেণীর পুরুষেরা যে তাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন না, তাহা নয়। তখন করিয়াছেন—এখনও, মান্দ্রাজ প্রদেশে যদি আপনারা গমন করেন, তাহা হইলে স্থানে স্থানে দেখিতে পাইবেন যে, ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্রই কেবল ব্রাহ্মণকন্যা গ্রহণ করিতেছেন—অন্য সন্তানেরা অন্য জল-আচরণীয় জাতির কন্যা গ্রহণ করিয়া বাস করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশেও এই শূদ্রকন্যা গ্রহণ একেবারে লোপ পাইয়াছে—তাহা কেহ মনে ক'রবেন না। আমি চট্টগ্রামে যখন ছিলাম, তখন Gait সাহেবের Bengal Census Report, 1901, পাঠ করিয়া ও স্থানীয় ভদ্রলোকদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে, সে প্রদেশে "ফলজল্যা" নামে এক প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে। সম্ভ্রান্তবংশের লোকেরা নিম্নশ্রেণীর অবিবাহিত দাসী আনিয়া বাড়ীতে রাখেন। এই দাসীরা বাড়ীর কর্ত্তার পায়ের হাঁটুতে বা গলায় একছড়া ফুলের মালা ও জল দিয়া বরণ করিলে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। তাহাদের যে সন্তান সন্ততি হইবে, তাহারা সেই বাড়ীর কর্ত্তাদের উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকে। যিনি আমাকে এই সংবাদ দেন, তিনি নিজে "ঘোষ" বংশসম্ভূত, তাঁহাদের রীতিতে এই সব দাসীপুত্র "ঘোষ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছে। কায়স্থ বা বৈদ্যের ঘরে এই দাসীপুত্রেরা শূদ্রনামে পরিচিত। ব্রাহ্মণের ঘরে সন্তানেরা "ব্রাহ্মণ ডিঙ্গর" নামে পরিচিত হয়। তবে ক্রমে এই প্রথা প্রায় লোপ পাইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যে সিকদার বা গোলাম কায়স্থ নামে এক জাতি গঠিত হইয়াছে—তাহার উৎপত্তি এইরূপ বলিয়া Risley, Gait প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মনে করিতেছেন। আপনারা যদি উড়িষ্যায় যান, তাহা হইলে সাগরপেষা নামে এইরূপ একশ্রেণীর লোক পাইবেন। নেপালেও সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়ীতে যে সব "কেটী" (Kati) দাসী রক্ষিত হয়, তাহাদেরও সন্তানদের এইরূপ অবস্থা। আমি এই সব কথার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, ইহা হইতে আপনারা জানিতে পারিবেন, যে প্রথার কথা আমরা মনুসংহিতাতে পড়িতেছি, তাহা আজিও বর্ত্তমান আছে। ইহা দেখিলে আর একটী কথাও বোধ হয় আপনারা সহজে বুঝিতে পারিবেন—কেমন করিয়া এই আর্য্য ও অনার্য্যবংশ ধীরে ধীরে মিশিয়া গিয়াছে। যদি মানহানির সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে আমি নাম করিয়া বলিতে পারিতাম যে, এইরূপ দাসীপুত্রেরা অর্থ ও পদমর্য্যাদা পাইয়া এবং ক্রমে কায়স্থ ও বৈদ্যবংশে পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া, ঐ দুই জাতিতে গৃহীত হইয়াছেন।

আমরা এতক্ষণ মনুর Theory of mixed castes কি, তাহার আলোচনা করিলাম। কেহ কেহ বলিবেন, ইহা theory কি, ইহা যে fact। প্রকৃত ঘটনা দেখিয়াই তাঁহার লেখা। এ কথা বোধ হয় কেহ বলিবেন না যে, যখন মনু তাঁহার সংহিতা লেখেন, তখনই এই সব মিশ্র-জাতিগুলি সংগঠিত হইতেছিল। বরং ইহাই ঠিক যে তাঁহার সময়ের পূর্ব্বে বৌধায়ন, অপস্তম্ভ প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজেও তাঁহার উপর নূতন কিছু কিছু যোজনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কোন কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করা অতি কঠিন কার্য্য, সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য্য হওয়া প্রায়ই ঘটে না। তাহার উপর সামাজিক বিষয়ে কোন কারণ অনুসন্ধান করা আরও কঠিন। এ অবস্থায় জতিভেদের উৎপত্তির কারণ জানিতে যে কেহ কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। Inorganic Worldএর ভিতর যে সব নিয়ম চলিতেছে, তাহাদেরই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে আমাদের আজিও ভাল করিয়া ধারণা হইতেছে না—তাহার উপর মানবসমাজ, যাহা মানবের স্বাধীন চিন্তার উপর নির্ভর করিতেছে,—ভিন্ন ভিন্ন

অবস্থায় পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম গঠিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে একটা কার্য্যকারণ নির্দ্দেশ করা কত কঠিন তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন। এ অবস্থায় সংহিতাকারগণ যে জাতিভেদের মতন সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের খুব অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু যখন জানিতে পারি যে, একটী জাতির (caste) ইতিহাস দিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন সংহিতাকার ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—তখনই মনে হয়, অতীতের কারণ নির্দ্দেশ করিতে সকলেরই কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। তাঁহারা যখন জীবিত ছিলেন, তখন সমাজে নানা শ্রেণীর লোক দেখিয়া তাহাদের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহার জন্য কল্পনা দরকার হইয়াছে, কারণ পুর্ব্বের যাহা চলিয়া গিয়াছে, তাহাও ফিরিয়া আসিবে না যে, তিনি দেখিয়া তাহার বিষয় লিখিবেন। এই জন্য তাঁহারা কল্পনার সাহায্যে দুইটী theory লইয়া জাতিভেদের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন—সঙ্কর ও ব্রাত্য। কতকগুলি উচ্চজাতি ভ্রষ্ট হইয়া নূতন জাতি গঠন করিয়াছে এবং অনার্য্যদের আচার ভ্রষ্ট মনে করিয়া আর্য্যদের মধ্যে নূতন জাতি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। মোটের উপর এই দুই theoryর সাহায্য লইয়াই ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজে সংহিতাকারেরা নূতন নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই জন্য এক-জাতির একাধিক ইতিহাস পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা দেশে কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির অধিনায়ক মহাশয়েরা যে ভিন্ন ভিন্ন সংহিতার সাহায্যে পরস্পরকে কিরূপ বিদ্রূপ করিতেছেন, তাহা আমা অপেক্ষা আপনারা খুব ভাল করিয়া অবগত আছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বসু।

বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়

আজ কয় বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কথা শুনিয়া আসিতেছি। বহু দূরে থাকি, বিদ্যালয়টি দেখিবার সাধ হইলেও সুযোগ হয় নাই। তাই এবারে গ্রীষ্মের ছুটীতে যখন দেশে যাই তখন দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে এ সুযোগ ছাড়িব না। কলিকাতা হইতে বারাণসী ফিরিবার সময় বোলপুরে নামি এবং শান্তিনিকেতনে কএক ঘণ্টা কাটাই। স্থানটি এতই মনোরম যে কএকদিন থাকিলেও সাধ মিটে না। কার্য্যগতিকে থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু যে কয় ঘণ্টা ছিলাম তাহাতে আমার মনে যাহা হইয়াছে, তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

অনেকেই হয়ত বিদ্যালয়টির নামও শুনেন নাই, কিম্বা শুনিয়াও স্বচক্ষে দেখিবার প্রয়োজন বোধ বা কষ্ট স্বীকার করেন নাই। যাঁহারা আমাদের ছেলেদের বর্ত্তমান শিক্ষা-রীতির বিষয় কিছু চিন্তা করিয়া থাকেন অন্ততঃ তাঁহাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ যে তাঁহারা একবার বিদ্যা-লয়টি দেখিয়া আসেন। দেখিলেই বুঝিবেন যে আমাদের বিদ্যালয়পরিচালিত শিক্ষায় এমন কতকগুলি অভাব আছে যাহার জন্য প্রচলিত শিক্ষারীতি আমাদের দেশের অবস্থার সহিত ঠিক খাপ খাইতেছে না। আমাদের ছেলেদের লইয়া যাহা করিতে চাই তাহা করিতে পারিতেছি না তাহাদের যাহা হওয়া উচিত তাহাও হইতেছে না। বোলপুর ব্রহ্ম-বিদ্যালয় সেই অভাববোধের একটি ফল এবং বর্ত্তমান শিক্ষারীতিতে যাহা দোষ তাহার নিরাকরণের একটি সযত্ন প্রয়াস। ইহার কার্য্য পরিচালনার খুঁটিনাটিতে অনেকে হয়ত অনেক ত্রুটী দেখিতে পাইবেন। কিন্তু ছেলেগুলি যে মানুষ হইতেছে সে বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিবেন না। আর কি চাই?

বিদ্যালয়টি স্বর্গগত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু এখানে বলিয়া রাখি—বিদ্যালয় বলিতে সচরাচর আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি—ইহা তাহার মত কিছুই নয়। চেয়ার টেবিল বেঞ্চে পরিপূর্ণ ঘনসংলগ্ন কতকগুলি কামরাবিশিষ্ট পাকা-বাড়ী—সে সব এখানে কিছুই নাই। প্রায় লোকালয়শূন্য প্রান্তরের মাঝখানে গাছ পালায় ঢাকা একটি শান্তিময় স্থান। তাহাদেরই ছায়াতলে দূরে দূরে কতগুলি চালাঘর। অবশ্য সেগুলির দেওয়াল ইঁটের এবং মেজে পাকা। তাহাই ছাত্র এবং অধ্যাপকের আবাসস্থান। আসবাব অতি সামান্য। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য একখানি করিয়া

তক্তাপোষ ও একটি করিয়া বই রাখিবার তাকি। তক্তাপোষে বিছানা পত্র প্রভৃতি বিলাসিতার উপকরণ যৎসামান্য। তাহাতেই সকলে সন্তুষ্ট। সকলের মুখেই আরামের চিহ্ন, কাহাকেও বিমর্ষ দেখি নাই। ছুটীর সময় ছেলেরা কেহ ঘরে, কেহ গাছতলায়, কেহ মাঠে গিয়া খেলা বা আরাম করে। সকলেই খালি পায়ে থাকে। অধ্যয়নের সময় সকলেই এক একখানি কম্বলের আসন লইয়া গাছতলায় বসে—তাহাই এখানকার ক্লাস। দেখিলে অতীত কালের গুরু শিষ্যের একটি শান্ত ছবি মনে আসে। চালাঘরগুলি কেবল রাত্রিবাসের জন্য। চালাঘর ছাড়া দুইখানি পাকা-বাড়ী আছে। তাহার একটিতে পূর্ব্বে মহর্ষি থাকিতেন, এখন তাঁহারই উপযুক্ত সন্তান আমাদের রবীন্দ্রনাথ থাকেন। অপর খানিতে ছাত্রাবাস, লাইব্রেরী ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রালয়। ইহা ছাড়া এখানে আর একটি দেখিবার জিনিস আছে। তাহাকে সেখানকার লোকেরা "শিশ-বাঙ্গালা" বলে। এটি মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত উপাসনা-মন্দির। একটি হল—আগা গোড়া কাঁচের—কেবল মেজেটী মর্ম্মর পাথরের। এখানে সাপ্তাহিক উপাসনা ও ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। এতগুলি বাড়ী এবং তাহাতে অন্যূন ১৫০ জন লোক থাকিলেও সমস্ত স্থানটী বনের মত শান্তিময় নির্জ্জন সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ বোধ হয়। যে প্রান্তরের মধ্যে স্থানটী অবস্থিত—তাহা দেখিলেই বোধ হইবে অতিশয় স্বাস্থ্যকর। কারণ প্রান্তরটী উচ্চভূমি। ষ্টেসন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। যাইবার সময় বেশ বুঝা যায় ক্রমশঃ উঁচুতে উঠিতেছি। জল দাঁড়ায় না। আর মাটীতে বালির অংশ খুব বেশী—সে জন্য কাদা হয় না, জল পড়িবা-মাত্র শুখাইয়া যায়। বৈদ্যনাথ, দেওঘর, মধুপুর প্রভৃতি স্থানের মাটী যেমন, ঠিক তেমনই। আমার বোধ হয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও সমান। যাঁহারা যাইতে চাহেন তাঁহাদের অবগতির জন্য বলিয়া রাখি যে বোলপুর ষ্টেসন হইতে শান্তিনিকেতনে যাইবার একটী সুন্দর পাকা রাস্তা আছে। গরুর গাড়ীই একমাত্র যান।

এই ত গেল বিদ্যালয়। এখন সেখানকার পড়াশুনার কথা কিছু বলা আবশ্যক। এ বিষয়ে খুঁটিনাটি খবর দিতে আমি অপারগ। কারণ আমি সেখানে বৈকালে কএক ঘণ্টা মাত্র ছিলাম। তবে তাহারই মধ্যে যেটুকু দেখিয়াছি ও তাহা হইতে যেটুকু অনুমান করিয়াছি তাহাই এখানে লিখিতেছি। বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা এখন শতাধিক। তাহাদের লইয়া কএকটী শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের কড়াকড়ি নিয়ম খাটান হয় নাই। কারণ বিদ্যালয়টি শিক্ষাবিভাগের সম্পূর্ণ বাহিরে। এ জন্য শ্রেণী-বিভাগে নিয়মানুবর্ত্তিতা অপেক্ষা উপযোগিতার প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। শিক্ষার বিষয় বাঙ্গলা, সংস্কৃত, ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞান। পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনেও শিক্ষাবিভাগের হাত নাই। কেবল সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীদ্বয়ের যে সকল ছাত্র কলিকাতা ইউনিভার্সিটির মাট্রিকুলেসন পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক—তাহা-দিগকেই নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক পড়িতে হয়। অন্যান্য শ্রেণীতে পাঠ্য পুস্তকের আড়ম্বর নাই। এমন কি ছাত্রদের নিকট পাঠ্য পুস্তকের স্বল্পতা দেখিয়া এবং সে জন্য মনে মনে তাহাদের আরাম কল্পনা করিয়া আনন্দ হইল। যে কয়খানি পাঠ্য পুস্তক ব্যবহৃত হয় তাহাদের মধ্যে অধিকাংশগুলিই এখানকার ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। সেগুলি দেখিলেই এখানকার শিক্ষাপ্রণালী কতকটা অনুমান করা যায়। তাহাতে ছেলেরা "পড়া-মুখস্থ" না করিয়া যাহাতে পাঠ্য বিষয় অনায়াসে অভ্যাস করিতে পারে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। কাজেই যে কয়খানি বই লইয়া ছেলেরা নাড়া চাড়া করে, সেগুলিকে বোঝা মনে করে না। আবার পাঠের সময় ও বিষয়কে শ্রেণী অনুসারে এমন ভাগ করা হইয়াছে যে ছেলেরা মনেই করে না যে তাহাদের উপর একটা চাপ দেওয়া হইয়াছে।—দেখিলে বোধ হয় তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে (উচ্ছৃঙ্খলতা নহে) আরামের সহিত লেখাপড়া শিখি-তেছে। আজকাল শিক্ষানীতির প্রধান উপদেশ এই যে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে ছেলেদের মনে কিছুতেই বিদ্যালয়-ভীতি না জন্মায়। কিন্তু নীতিজ্ঞ মনীষিগণ বিদ্যালয় পরিচালনার যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে বালকদের মনে বিদ্যালয় প্রীতির যে বিশেষ সঞ্চার হইতেছে এমন ত বোধ হয় না। নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া বইয়ের বোঝা বগলে করিয়া তাড়াতাড়ি

দশটায় হাজিরী। তারপর ৫.৬ ঘণ্টা ধরিয়া এক বিষয় থেকে আর এক বিষয় অনবরত পড়া। ছুটীর পর বাড়ী ফিরিয়া কিছু বিশ্রাম করিতে না করিতেই আবার পরদিনের পড়া মুখস্থ। রাত নাই দিন নাই। বেচারা যে এখনও জীবিত থাকিয়া পরীক্ষায় পাস করিতেছে ইহাই আশ্চর্য্য। আবার নিয়মের কড়াকড়ি ছোট ছেলেকেও বাদ দেয় না। শিক্ষা বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতেই হইতেছে! বিদ্যালয়গুলি বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার। ফল যাহাই হউক একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য ত বাহির হইবে। বড়ই আনন্দের কথা ব্রহ্মবিদ্যালয় এরূপ নির্ম্মম বিজ্ঞানের হাত হইতে বহুদূরে সেখানে ছেলেদের বালক এবং মানুষ বলিয়া ধারণাটাই প্রবল দেখিলাম। এই ত গেল পড়া শুনার কথা। ইহাতে ছেলেদের লেখা পড়া হওয়া সম্বন্ধে যদি কাহারও সন্দেহ হয় হউক। কিন্তু তাহাদের স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এখন একথা যেন কেহ মনে না করেন ব্রহ্মবিদ্যালয় শুধু ছেলেদের দেহ পুষ্টির জন্যই স্থাপিত হইয়াছে। আমরা সচরাচর যাহাকে লেখা পড়া বলিয়া থাকি ঠিক তাহা না হইলেও সেখানে যে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিক্ষা বলিতে বুঝায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি। এজন্য বর্ত্তমান শিক্ষানীতি বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে বালকের দৈহিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনকেও শিক্ষার উদ্দেশ্য মধ্যে স্থান দিয়াছে। সুস্থ সবল দেহ, সতেজ উদার বুদ্ধি, নির্ম্মল কর্ম্মশীল চরিত্র, ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি ইহাদের কোনটিই যথার্থ মনুষ্যত্ব হইতে বাদ দেওয়া যায় না: যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ববিধানই শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে সাধারণ বিদ্যালয়ে সচরাচর যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে মনুষ্যত্বের উপকরণগুলির উপর যে ঠিকমত দৃষ্টি রাখা হইতেছে এ কথা স্বীকার করা যায় না। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষা বলিতে পুস্তক পাঠ ও তদ্দ্বারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করানই বুঝিতাম। তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন হইতেছে এ ধারণা আমাদের মনে মনে থাকিলেও যথার্থভাবে তাহা হইতেছে কি না সে বিষয়ে দৃষ্টি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এখনও আমরা যে বিদ্যালয় হইতে অধিকাংশ ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহাকেই সমাদর করিয়া থাকি। তারপর শিক্ষা-বিভাগ হইতে আদেশ হইল যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বালকদের শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে। অমনি স্কুল কলেজে জিমনাষ্টিকের সূত্রপাত হইল। ক্রমশঃ ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস্, হকি প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য ক্রীড়ার আবির্ভাব হইল। এখন দৈহিক শিক্ষার যুগ। খেলার ঝোঁক এতই বাড়িয়াছে যে কোনও কোনও বিদ্যালয়ে ইহারই অধিক সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে আবার School ও College tournament নামে যে খেলার পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ক্রীড়াকুশল বালকেরা আর কিছুই করে না। তাহাদের খেলা জ্ঞান, খেলা ধ্যান। বিদ্যালয়ের পরিচালক ও শিক্ষকগণ জয়লাভের জন্য তাহাদিগকে এই একটি বিষয়েই উৎসাহিত করিয়া থাকেন। সম্প্রতি আর একটি ধুয়া উঠিয়াছে। নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা। এতদিন পরে যে এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে ভাল কথা। কিন্তু এখনও স্থির হইল না কি ভাবে এ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এখন দেখা যাক কি স্থির হয় এবং প্রচলিতব্য শিক্ষার ফলই বা কি হয়। ভয় হয় এখানেও পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় শিক্ষাটি হাস্যকর না হইয়া উঠে। মোটকথা মনুষ্যত্বকে আদর্শ করিয়া তাহার উপকরণগুলির সামঞ্জস্য যতদিন না সাধিত হইবে ততদিন যথার্থ শিক্ষা হইবে না। শিক্ষা অন্তরের জিনিস। বাহ্যিক প্রতিযোগিতার সেখানে স্থান নাই।

ব্রহ্মবিদ্যালয় শুধু যে লোকালয়ের বাহিরে বনের ভিতরে আপনার স্থান লইয়াছে তাহাই নহে, সকল বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী হইতেও আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিয়াছে। সেখানে কোনও প্রতিযোগিতা নাই। এজন্য মনুষ্যত্বের প্রতি নির্ম্মল দৃষ্টি রাখিয়া, তাহার উপকরণগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে। সামঞ্জস্যটি আবার এমন সহজ ভাবে রাখা হইয়াছে যে সেখানে সকল প্রকার শিক্ষার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। একেবারে আতিশয্য ও ক্ষুণ্ণতা বর্জ্জিত। যেন যেমনটি হইয়া থাকে এবং হওয়া উচিত তেমনি। কোনও শিক্ষারই অতিরিক্ত আড়ম্বর নাই। সবই সহজ ও সরল। প্রত্যুষে বালকেরা সকলেই

উঠিবে। তারপর কিছুক্ষণ ব্যায়াম করিবে—যাহার যেরূপ অভিরুচি কোনও বাঁধাবাঁধি নাই। তারপর হাত মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া ভগবানের উপাসনা। তাহাও যাহার যেখানে যে ভাবে ইচ্ছা। কিন্তু করা চাই। তারপর জলযোগ। তদন্তে দুই ঘণ্টা গাছতলায় অধ্যাপকের কাছে অধ্যয়ন। তারপর ছুটী—স্নান ও আহার। আহারান্তে দুই ঘণ্টা বিশ্রাম। সে সময় ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে গল্প করিতে পারে, বেড়াইতে পারে বা পড়িতেও পারে। অধ্যাপক ছেলেদের সঙ্গেই থাকেন। কোনওরূপ কঠোর শাসন নাই অথচ উচ্ছৃঙ্খলতাও নাই। তারপর বৈকালে দুই তিন ঘণ্টা আবার গাছতলায় বসিয়া অধ্যাপকের কাছে পড়া শুনা। তারপর ছুটী, জলযোগ ও মাঠে গিয়া নানা রকমের খেলা। সন্ধ্যাকালে আবার উপাসনা। তারপর কেহ হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান করে—কেহ গল্প করে—কেহ পড়ে। রাত্রি আটটার সময় আহার। তারপর অধ্যাপকের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেরা ভাল ভাল বিষয়ে গল্প করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে। যাহারা উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে তাহারা ইচ্ছা করিলে কিছুক্ষণ পড়িতে পারে। কি সুখের জীবন! মনে হয় আবার বালক হইয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ে গিয়া বাস করি। কেবল উচ্চ দুই শ্রেণীর যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবে তাহাদিগকেই দিনে ও রাত্রে একটু অতিরিক্ত পড়িতে হয়। হা বিশ্ববিদ্যালয়! তোমার নির্ম্মমতা এখানে আসিলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

যাঁহারা তাঁহাদের ছেলেদের বাড়ীতে স্কুলের পড়া মুখস্থ করিতে দেখিয়া আসিতেছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে করিতেছেন "এই পড়াশুনা—ইহাতে লেখাপড়া কি হইবে?" তাঁহাদের দোষ নাই। যাহাতে অভ্যস্ত তাহা ছাড়া যে আর কিছু ভাল থাকিতে পারে এ ধারণা আমাদের মনে সহজে আসে না। বিদ্যালয়ে যত সময় পড়ে অন্ততঃ তত সময় বাড়ীতে পড়া মুখস্থ করাই দেখিয়া আসিতেছি। কাজেই সেইটিই বিদ্যাশিক্ষার ঠিক পথ এই ধারণা মনে জন্মিয়াছে। তাহার ব্যতিক্রম হইলেই ভাবি ছেলেটি কিছুই করেনা—আর তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করি। একবারও ভাবিয়া দেখি না যে বুদ্ধির উৎকর্ষই পুস্তক পাঠের উদ্দেশ্য এবং তাহা অধ্যাপকের শিক্ষাপ্রণালী ও বালকের মনঃসংযোগ ও ধারণাশক্তির উপর নির্ভর করে। শিক্ষানীতিতে সুপণ্ডিত ও শিক্ষাপ্রণালীর নূতন পথপ্রদর্শক একজন জর্ম্মান লেখক লিখিয়াছেন যে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ শিক্ষাপ্রণালীর গুণে একখানি মাত্র পুস্তক পাঠ হইতেই হইতে পারে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ইহার পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। পাঠ্য বিষয় যদি শিক্ষার গুণে বিদ্যার্থীর চিত্তাকর্ষক হয়—তাহা হইলে অতি অল্প সময়ে অল্প পাঠেই বিদ্যালাভ হইতে পারে। চাই উপযুক্ত শিক্ষক। আম আশা করি ব্রহ্মবিদ্যালয়ে সেরূপ শিক্ষকের অভাব নাই। কারণ সেখানকার প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি ও বিশেষভাবে লিখিত পুস্তকের আদর্শে উপযুক্ত শিক্ষকও প্রস্তুত হইতেছে এরূপ অনুমান হয়। আমি যে কয় ঘণ্টা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ছিলাম তাহার অধিকাংশ সময় সেখানকার ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে তাহাদের বুদ্ধির উৎকর্ষ অন্যান্য বিদ্যালয়ের সমবয়স্ক ছাত্রদের অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন নহে। ইহাও শুনিতে পাই যে ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেয় তাহাদের অধিকাংশই ভাল ভাবে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। আমাদের স্কুল হইতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত একটি ছাত্র এবারে এক বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে সেখানে সহজে ও বিনা আড়ম্বরে যেটুকু শিক্ষা হইয়া থাকে তাহার ফল উপেক্ষনীয় নহে।

আজ কাল বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে Discipline (যাহার অর্থ আমি বুঝি শাসন) এর কিছু ধুমধাম পড়িয়াছে এবং ইহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সুদীর্ঘ নিয়মাবলীও প্রস্তুত হইতেছে। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে Discipline বা তৎসহচর নিয়মাবলী কোথাও দেখিলাম না। এখানে সকল বিষয়েই ছেলেদের একটু স্বাধীনতা দেখিতে পাইলাম, অথচ কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। কোনওরূপ নিয়মের বাঁধাবাঁধি বা শাসনের কড়াকড়ি দেখিলাম না। সেখানকার গাছ পালা বাতাসের মত সকলেই যেন মুক্ত, অথচ সকলেই নিজের নিজের কাজ সহজ ভাবে করিয়া যাইতেছে। কাহারও

উপর কোনও চাপ নাই। এই জন্যই বোধ হয় ছেলেরা এখানে আসিয়া এত খুসী থাকে—এমন কি শুনিলাম ছুটী হইলেও বাড়ী যাইতে চায় না। আবার বাড়ী গিয়াও আসিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা বিদ্যালয়ের আর কি গৌরব হইতে পারে। আমি যে দিন সেখানে গিয়াছিলাম সে দিন সন্ধ্যাকালে উপাসনা-মন্দিরে ছোট ছোট ছেলেদের রবীন্দ্র বাবু ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। এরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া বয়স্ক ছেলেদের ও একদিন করিয়া ছোট ছেলেদের দেওয়া হইয়া থাকে। যখন ঘণ্টা বাজিল অমনি চারিদিক হইতে ছেলেদের ধীর শান্ত ভাবে মন্দিরের দিকে আসিতে দেখিলাম। কাহারও মুখে কথা নাই বা শরীরে চাঞ্চল্য নাই। যেন সেদিনকার উপদেশের জন্য তাহারা নিজেকে প্রস্তুত করিয়া বসিয়াছিল। একে একে সকলেই মন্দিরের ভিতরে চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। কাহাকেও তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ বা শ্রেণী-নিবেশ করিতে হইল না। রবীন্দ্র বাবু যতক্ষণ দাঁড়াইয়া উপনিষদের শ্লোক উচ্চারণ করিয়া ভগবানের উপাসনা করিলেন সকলেই করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল এবং উপাসনা শেষ হইলে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আসনে বসিল। তারপর রবীন্দ্র বাবু অন্ততঃ আধ ঘণ্টা কাল তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। সকলেই ধীরভাবে নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে লাগিল। আমি তাহাদের মধ্যে যাহারা খুব ছোট তাহাদের কাছেই বসিয়াছিলাম। তাহাদের চঞ্চলতা-শূন্য শান্ত ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কারণ সেরূপ বয়সের ছেলেদের একস্থানে স্থির রাখা বড়ই কঠিন। এ কঠিন সংযম তাহাদের কে শিখাইল! ইহার জন্য কোনও কঠোর শাসন ত দেখিলাম না। উপদেশ শেষ হইলে সকলকেই ভক্তিভরে রবীন্দ্র বাবুর চরণে প্রণাম করিতে দেখিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হইল। কারণ আজকাল ছেলেদের 'গুরুজনের' প্রতি ভক্তি যেন কম হইয়া গিয়াছে। প্রণাম করা অনেক স্থলে হীনতা বলিয়া মনে করা হয়। অথচ ভগবৎভক্তি বিকাশের ইহাই সহজ পথ। আমরা গুরুকে ভক্তি করিতে করিতেই যথার্থ ভাবে ভগবানকে ভক্তি করিতে শিখি। যেখানে শ্রদ্ধার পাত্র মানুষের প্রতি ভক্তি নাই সেখানে ভগবৎভক্তি অসার কথা মাত্র।

রাত্রে একত্র আহার কালেও কোনও বিশৃঙ্খলতা দেখিলাম না। অন্যূন একশত বালক একত্র আহার করিতে বসিল। সকলেই সংযতভাবে আপন আপন স্থানে বসিয়া যেন একটি কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া গেল। অধ্যাপকগণ সঙ্গেই আহার করিলেন। তাঁহাদের উপস্থিতি তাহাদিগকে সংযত রাখিলেও ছেলেদের কাহারও মুখে "মাষ্টার-ভীতি"র চিহ্ন দেখিলাম না। মাষ্টার মহাশয় তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই আছেন—"কিবা শয়নে, স্বপনে, জাগরণে।" তাহাদের সকল কাজে শুধু চালক নহেন—সাথীও বটে। এজন্য মাষ্টার মহাশয়কে তাহারা ভালবাসে, ভয় করে না। আমার বোধ হয় এই ভালবাসার জন্যই তাঁহাদের উপদেশ ছেলেদের মনে এত গভীর ভাবে বসিয়া তাহাদিগকে সংযত করিয়াছে। আজকাল শিক্ষানীতিজ্ঞগণ অধ্যাপক ও ছাত্রদের একত্র অবস্থান ও ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলন খুব প্রয়োজনীয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। তাহার ফলে অনেক স্থানে এরূপ ভাবে মিলনের বিশেষ আয়োজনও হইতেছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাই যাহার জন্য মিলন আবশ্যক ঠিক তাহা হইতেছে না। কারণ—প্রথমতঃ মিলন অল্পকালস্থায়ী। তাহার মধ্যে গুরুশিষ্যের যে ব্যবধানটুকু অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে সেটুকু হয় থাকিয়াই যায়—নতুবা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়া গুরু-শিষ্যের আর কোনও প্রভেদ থাকে না। কাজেই গুরুতে অনুকরণীয় যে কিছু আছে তাহা মনেই আসে না। যেখানে গুরুতে মানুষ ও দেবতার সমাবেশ দেখিবার সুযোগ হইবে সেখানেই শিষ্যের সহানুভূতি ও তাহার ফলে উন্নতি হইবে। কিন্তু ইহার জন্য একত্র অবস্থান একান্ত প্রয়োজন। "গুরু আমারই মত, অথচ কত মহৎ কত বিদ্বান। আমিও গুরুর মত হইতে পারি এবং হইব।" ইহাই গুরু-শিষ্য মিলনের মূলমন্ত্র।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বিশেষ ভাবে দেখিবার আরও একটি বিষয় আছে। এখানে ছেলেরা সকলেই খালি পায়ে থাকে। তাহাদের পরিচ্ছদ বা বিলাসিতার উপকরণের কোনও আড়ম্বর নাই। অতি সাদাসিধে ধরণে যথার্থ ব্রহ্মচারীর

মতই তাহারা থাকে। সুতরাং পোষাক পরিচ্ছদ যে "ভদ্রতা"র একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস এ ভুল ধারণা তাহাদের হইতেই পারে না। তা'ছাড়া শারীরিক পরিশ্রম, যে ভাবেরই হউক, ভদ্রতার হানিকর নয় বরং তাহার গৌরব—এই অতি প্রয়োজনীয় ধারণাটি ধীরে ধীরে তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইতেছে। ছেলেদের নিজের হাতে নিজের স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়, কাপড় কাচিতে হয়, মাটি কাটিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে হয়, বাগান করিতে হয়—আরও নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে হয়। তাহারাও সহজে ও গৌরবের সহিত ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাতে যে তাহাদের ভবিষ্যতের কর্ম্ম-জীবনের জন্য শিক্ষা হইতেছে শুধু তাহাই নহে। যেখানে থাকে সেটি তাহাদের নিজের জিনিস বলিয়া একটি মমতাও মনোমধ্যে অজ্ঞাতসারে জাগিয়া উঠিতেছে। ইহা হইতে আশা করা যায় ইহারাই ভবিষ্যতে ব্রহ্মবিদ্যালয়টিকে আপনার জিনিস বলিয়া তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে।

এই ত গেল বিদ্যালয়ের কথা। এখন আরও দুই চারিটি কথা না লিখিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতে পারিতেছি না। বিদ্যালয়টি যে আমাদের অবস্থা ও আমাদের জাতিগত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ উপযোগী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকাল জাতীয় ভাবে আমাদের বালকদের শিক্ষা দিবার জন্য আলোচনা ও প্রযত্ন দেখা যাইতেছে। যদি আমাদের ছেলেদের আমাদেরই মত করিয়া শিক্ষা দিবার প্রয়োজন বুঝিয়া থাকি, তবে এই ব্রহ্মবিদ্যালয়কে আদর্শ করিয়া স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যক হইয়াছে। কারণ একটি মাত্র বিদ্যালয় দিয়া আমাদের অভাব পূরণ হইবে না। আমাদের জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ ও চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহাদের অভিমতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়-গুলি যদি শিক্ষাবিভাগ-পরিচালিত বিদ্যালয়ের আদর্শেই গঠিত হয় তাহা হইলে আর জাতীয়তা কোথায় রহিল। আমার মনে হয় ব্রহ্মবিদ্যালয়ই যথার্থভাবে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়। আমরা কোনও ভাল জিনিস পাইলে একটা আশঙ্কা মনে আপনিই আসে পাছে ইহাকে হারাই। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মত একটি আদর্শ শিক্ষার স্থান দেখিয়া এরূপ আশঙ্কা মনে আসাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্র বাবু যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন তিনি "ধন মন তন" দিয়া বিদ্যালয়টি রক্ষা করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে যদি আমরা এরূপ একটি অমূল্য জিনিস হারাই তাহা আমাদের অতিশয় দুর্ভাগ্যের কথা। যদিও আশা করা যায় যে তাঁহার সহযোগী অধ্যাপকগণ ও বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ তাঁহার দেবচরিত্রের স্মৃতিতে ও দেশের কল্যাণ কামনায় উৎসাহিত হইয়া বিদ্যালয়টি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। তবুও বাহির হইতে সাহায্যের যে প্রয়োজন হইবে না এ কথা বলা যায় না। বরং এরূপ সাহায্য পাইলে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরও সুচারুরূপে চলিতে পারিবে। এজন্য শিক্ষাবিভাগে যাঁহারা কর্ম্ম করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহযোগিতার বড়ই প্রয়োজন। তাঁহারা হয় ত অবসর লইয়া শান্তিতে জীবন কাটাইতে গিয়া অলস জীবন ভারবহ মনে করিবেন। শান্তিনিকেতনের চতুর্দ্দিকে বহুদূরবিস্তৃত প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেখানে গিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া শান্তিতে থাকিতে পারেন এবং ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে কার্য্য করিয়া অলস জীবনের ভারও লঘু করিতে পারেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ লোভনীয় জীবন আর দেখি না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির অধ্যয়ন ও তত্ত্বানুসন্ধানে জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিতে চাহেন—কিম্বা ধর্ম্মানুশীলনেই জীবনযাপন করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষেও এই স্বাস্থ্যকর শান্তিময় স্থানটি বড় উপযুক্ত। হয় ত তাঁহাদের দ্বারা বিদ্যালয়ের জ্ঞানলিপ্সু ছাত্রগণের উচ্চশিক্ষার অভাব দূর হইবে—এবং ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদিগের জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। ইহা অপেক্ষা মহৎ কার্য্য আর কি হইতে পারে!

শ্রীফণিভূষণ অধিকারী,
অধ্যাপক, সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ, বারাণসী।

সংকলন ও সমালোচন

সুফীমত*

কাশ্‌ফুল মাজুব অর্থাৎ রহস্য প্রকাশ নামক পারসী গ্রন্থখানি সুফীমতের প্রাচীন ইতিহাসের একটী প্রামাণিক পুস্তক। আলী বিন্ উথ্‌মান আল জুল্লাবী আল হজ্‌বীরী এই গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি পঞ্চম হিজিরাব্দের লোক। এক সময়ে যখন তিনি মুলতান জেলায় লহাবারে বন্দী ছিলেন তখনই পূর্ব্বোক্ত পুস্তকখানি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সুন্নি-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তথাপি অন্যান্য সুফীদের ন্যায় তিনি প্রচলিত মুসলমান-ধর্ম্মমতের সহিত সুফীধর্ম্মরহস্যের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম-তত্ত্বে যদিচ নির্ব্বাণ মুক্তির উল্লেখ আছে তথাপি তিনি চূড়ান্ত নির্ব্বাণবাদী ছিলেন না।

ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা যাইতে পারে এই মতের বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়ভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হওয়ার সহিত মুক্তির তুলনা করিয়াছেন। লোহাকে আগুনে পোড়াইলে তাহা যেমন উজ্জ্বলতা উত্তাপ প্রভৃতি অগ্নির গুণ ও সাদৃশ্য লাভ করে অথচ আপনার স্বতন্ত্র সত্তাকে হারায় না—মুক্তির দ্বারাও আত্মা সেইরূপ পরমাত্মার সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় কিন্তু আপনার স্বরূপকে বিলুপ্ত করে না। সঙ্গীত কীর্ত্তনাদির সাহায্যে দশা পাওয়া ও স্ত্রী পুরুষের প্রণয় ব্যাপারকে আধ্যাত্মিক রূপক স্বরূপে ব্যবহার করা সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানা যায় যে তাহা দার্শনিকতত্ত্ব ও বিচারপ্রধান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সুফীমতের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার সহিত সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মমতের সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে এ কথা কোনো মতেই বলা যায় না।

এই গ্রন্থে "সুফী-সম্প্রদায়গুলির ভিন্ন ভিন্ন মত" শীর্ষক চতুর্দ্দশতম অধ্যায়টি বিশেষভাবে ঔৎসুক্যজনক। ইহাতে গ্রন্থকার সুফীদের দ্বাদশটী শাখার বিশেষ মতগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দশটীকে তিনি প্রশংসাযোগ্য বলিয়াছেন ও অপর দুইটীকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। দশটী প্রশংসিত শাখার মত এক, কেবল তাহাদের সাধনা স্বতন্ত্র। সুফীতন্ত্রের প্রশংসিত শাখা দশটীর মধ্যে "হারিৎ আল্ মহাশিবির" শাখাটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। আল হজ্‌বীরী বলেন, "রিদ্দা" অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণকে মহাশিবি "হাল" বলিয়া গণ্য করেন, "মকাম" বলিয়া স্বীকার করেন না, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব।

সুফীধর্ম্মে কাহাকে "মকাম" ও কাহাকে "হাল" বলে তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়ার পথে সাধককে যে যে অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয় তাহারই এক একটী অবস্থাকে এক একটী "মকাম" বলে। প্রথম অনুতাপের অবস্থা, দ্বিতীয় ত্যাগের অবস্থা, তৃতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থির হওয়ার অবস্থা ইত্যাদি। এই সকল অবস্থা নিজের চেষ্টা বা সাধনার দ্বারা লভ্য। কিন্তু সেই বিশেষ দশাকেই "হাল" বলা হয় যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বর হইতে মনুষ্যের অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হয় এবং মনুষ্যের চেষ্টা যাহাকে আকর্ষণ করিতে অথবা প্রতিহত করিতে পারে না। ইহা এক প্রকার ঈশ্বর-প্রেরিত অপার্থিব আনন্দ, ইহার আবির্ভাবে মনুষ্যের অহং চৈতন্য সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হয়। অন্য সুফী-গুরুরা বলিয়া থাকেন এই "হাল" একটী স্থায়ী দশা কিন্তু "মহাশিবি" তাহা স্বীকার করেন না এবং তিনি বলেন যতক্ষণ এই "হাল" অভ্যস্ত ও নিত্য হইয়া না যায় ততক্ষণ তাহার গৌরব অধিক নহে।

কাসারি শাখাটী "মলামৎ" মতের জন্য প্রসিদ্ধ। এই মতের নামানুসারেই এই মতানুবর্ত্তীদিগকে "মলামতী" বলা হয়। "মলামৎ" শব্দের অর্থ "নিন্দা"। কোন একজন সাধু ব্যক্তি যখন এরূপভাবে কার্য্য করেন যে তাঁহার কার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া লোকে তাঁহার নিন্দা করে সুফীদিগের মতে তাহাকেই "মলামৎ" বলে। প্রতিবেশীদের নিকট শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে করিতে সাধুতা-অভিমানের পাপ পাছে চিত্তকে স্পর্শ করে এই

* ধর্ম্ম ইতিহাস আলোচনার আন্তর্জাতিক সভায় পঠিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

আশঙ্কায় মলামতী ইচ্ছা পূর্ব্বক এমন বিধিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকেন যাহাতে লোকের মন তাঁহা হইতে সরিয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ অবস্থায় কোন যথার্থ অপরাধ না করিয়া এমন কাজ করেন যাহা বাহিরে দেখিতে যতই মন্দ হউক বস্তুতঃ অনিন্দনীয়।

তয়ফূরী ও জুনৈদী, সূফী সম্প্রদায়ের দুই বিখ্যাত শাখা। ইহাঁদের মধ্যে একটী মতবিরোধ আছে। তয়ফূরীগণ বলেন ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত হওয়াই প্রকৃত সিদ্ধি, কারণ, প্রশান্ততায় মানুষের সমস্ত গুণ সমতালাভ করে—এই সাম্যাবস্থাই জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য আবরণ। পরন্তু দিব্যোন্মাদের অবস্থায় মানুষের অন্য সমস্ত গুণ লয় প্রাপ্ত হইয়া কেবল দিব্যগুণগুলিই অবশিষ্ট থাকে। জুনৈদীরা ইহার উত্তরে বলেন, মত্ততা অপ্রমাদের বিরুদ্ধ—অপ্রমত্ততার শান্তভাব ব্যতীত কথনই ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। তাঁহারা বলেন, অন্ধতা কথনই প্রকৃতির মায়াজাল হইতে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না;—মুক্ত হইতে গেলে সত্যকে জানা চাই, অপ্রমত্ত না হইলে সত্যকে জানা সম্ভবপর হয় না।

নূরী শাখার মতের বিশেষত্ব "ঈথার" অর্থাৎ পক্ষপাত। নিজের পরার্থ ত্যাগ করিয়া অন্যের প্রতি পক্ষপাত—এক কথায় পরার্থপরতা।

কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা রিপুগণের সহিত আধ্যাত্মিক সংগ্রামের প্রতিই "সালিস" শাখা বিশেষভাবে জোর দেয়—যেমন উপবাস পূজা অর্চ্চনা ইত্যাদি। আত্মনিগ্রহকে অন্যান্য সূফীরা ধ্যানের অবস্থা লাভের গৌণ উপায় স্বরূপ গণ্য করেন, কিন্তু "সাল আল তুস্তারি" ইহাকেই মুখ্য উপায় বলিয়া জানেন। তিনি বলেন ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার সেবাকার্য্যের কঠোরতা স্বীকার করা চাই। ঈশ্বরের প্রসাদজনক ভাবে তাঁহার সেবা সুসম্পন্ন করার অব্যবহিত ফলই তাঁহার সহিত মিলন। যাঁহারা বলেন কেবলমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহের বলেই তাঁহার সহিত মিলন সম্ভবপর হয়, তাঁহাদের মতের প্রতিবাদ করিবার কালে ইনি পূর্ব্বতন ঋষিদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল ঋষিরা আত্মনিগ্রহকে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। কৃচ্ছ্রব্রত পালনের দ্বারাই সমাধি লাভ যদি সুগম না হয় তবে সেই ঋষিদের প্রচারিত বিধিব্যবস্থাকে ব্যর্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে হয়।

সাধুতার বিশেষ প্রকৃতি ও তাহার বিচিত্র অবস্থা, পুরাণ-কথিত অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রামাণিকতা এবং সাধুদিগের সহিত ঋষিদিগের অলৌকিক কার্য্যের পার্থক্য লইয়া "হাকিমি" শাখা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছে। সূফী-সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধু-শাসনচক্র নামক যে একটী বিখ্যাত মত প্রচলিত আছে "মহম্মদ বিন আলি আল্ হাকিম"ই সর্ব্বপ্রথমে তাহাকে পল্লবিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন এই সাধু-চক্র কর্ত্তৃকই সমস্ত জগতের ব্যবস্থা রক্ষিত হইতেছে। তাঁহার মতে, ঋষিরা যেমন ঈশ্বর-কৃপায় সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত, সাধুরা সেরূপ নহেন—তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র সাধুধর্ম্মের বিদ্রোহাচরণ অর্থাৎ অবিশ্বস্ততা হইতে ঈশ্বর বিশেষ ভাবে রক্ষা করেন। মহাশিবি ও জুনৈদীর এই মত। অন্যেরা বলেন, ঈশ্বরের আদেশ পালনই সাধুতার লক্ষণ, অতএব মহাপাপ মাত্রেই সেই আদেশ-লঙ্ঘন, এবং সেই অপরাধে সাধুপদ হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

আর তিনটী শাখার কথা বলা বাকী আছে। তাহা-দের নাম খর্রাজি, খফীফী, এবং সয়্যারী। খর্রাজীদের প্রধান মত "লয় ও স্থিতি", খফীফীদের "অনুপস্থিত ও উপস্থিত" এবং সয়্যারীদের "মিলন ও বিচ্ছেদ"।

খর্রাজীমতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।

আল্‌হুজবীরী বলেন আবু সৈদ্ আল খর্রাজই "লয় ও স্থিতি"-তত্ত্বের প্রথম ব্যাখ্যা-কর্ত্তা। যাঁহারা সাধুদের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া "মকাম" ও "হাল" উভয়ই উত্তীর্ণ হইয়াছেন ও পরম ধনকে লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধেই লয় ও স্থিতি এই দুটী শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। তাঁহার মতে অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের বিলোপ অর্থেই লয় শব্দের ব্যবহার সঙ্গত নহে—এবং স্থিতি বলিতেও পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ সম্বন্ধ বোঝায় না। "ফনা" এবং "বকা" অর্থাৎ "লয় ও স্থিতি" জীবেরই বিশেষ অবস্থা। "লয়" বলিতে সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপার হইতে চিত্তবৃত্তির সংহরণ এবং "স্থিতি" অর্থে ঈশ্বরের চিন্তাতেই চিত্তবৃত্তিকে নিত্য নিবিষ্ট করা বুঝায়। আবু সৈদ্ আলখর্রাজ 'ফনা'

শব্দের ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন "মানবিক দীনতা হইতে মৃত্যু ও ঐশ্বরিক ধ্যানের মধ্যেই জীবন সাধন করা—অর্থাৎ এমন সম্পূর্ণভাবে সমাধি লাভ করা যাহাতে ঈশ্বরের সেবক নিজের কোন কর্ম্মকে আর নিজের বলিয়া অনুভব করিতে না পারেন, সমস্তকেই ঈশ্বরের বলিয়া জানেন—ইহাকেই বলে ফনা।"

থিয়সফিকাল সভার পত্রিকায় জনৈক মুসলমান লেখক সূফীমত সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ আমরা উপরি লিখিত প্রবন্ধের পরিশিষ্টস্বরূপ নিম্নে সংকলন করিয়া দিলাম।

কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে সূফীতন্ত্র একপ্রকারের অদ্বৈতবাদ,—অর্থাৎ তাহার মতে, জগৎ ঈশ্বরেরই প্রকাশ এবং তাহাতে "অব্দ্" বা জীবের কোন স্থান নাই। কিন্তু এই জীবের সত্যতা স্বীকার না করিলে ইস্লাম ধর্ম্মের সমস্তই একেবারে ভিত্তিহীন হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া যায়। কারণ মহম্মদ পুনঃপুনঃ আপনাকে ঈশ্বরের জীব ও দূত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কোন কোন সূফীতত্ত্বজ্ঞানী সমাধির অবস্থায় "আমিই সত্য!" "হে বরণ্যে আমার মহিমা কি বিপুল!" ইত্যাদি বলিয়াছেন বটে কিন্তু সম্ভবতঃ তাহার গভীর অর্থ বিশুদ্ধ সোঽহংবাদমূলক নহে। বস্তুতঃ সূফীরা যেমন ঈশ্বরের বিশ্বাতীত ভাবকে স্বীকার করে তেমনি তাঁহার বিশ্বরূপকেও বিশ্বাস করে। কোরানে আছে "প্রকৃতই ঈশ্বর তোমাকে বেষ্টন করিয়া আছেন", "তুমি যেথানেই থাক ঈশ্বর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন", "ঈশ্বর পূর্ব্বে আছেন পশ্চিমে আছেন যেদিকে তুমি মুখ ফিরাও সেইদিকেই তাঁহার মুখ রহিয়াছে"—এই পদগুলি ঈশ্বরের বিশ্বাতীত ভাব প্রকাশক। আবার, "তিনি তোমার নাড়ী অপেক্ষাও নিকটে আছেন", "তিনি একেবারে তোমার নিজত্বের ভিতরে রহিয়াছেন কিন্তু তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাও না" ইত্যাদি শ্লোকে ঈশ্বরের বিশ্বানুপ্রবিষ্ট ভাবকে প্রকাশ করে।

ইস্লামধর্ম্মে জীবের সত্তাকে সর্ব্বত্রই স্বীকার করিয়াছে। এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নিজেকে কথনই পূর্ণসত্য বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। এক পরমেশ্বর ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নাই, এবং মহম্মদ তাঁহার জীব ও দূত ইহাই তাঁহার ধর্ম্মের মূল মন্ত্র।

সূফী কবিদের কাব্য হইতে বুঝা যায় যে তাঁহাদের মতে পরম পুরুষের জ্ঞানের মধ্যেই "অব্দ্" বা জীবের সত্যতা চির বিরাজিত। কিন্তু তাহার প্রকাশ নিত্য পরিবর্ত্তমান। "জৎ" অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। জ্ঞান, জ্যোতি, সত্তা এবং প্রকাশ এই চারিটী তাঁহার মুখ্যগুণ। বাক্য, শ্রুতি এবং দৃষ্টি আরও এই তিনটী গুণকে এই সঙ্গে ধরা হয়। এই সাতটী মুখ্যগুণ—ইহা হইতে অন্যান্য অসংখ্য গুণের উদ্ভব। তাঁহার স্বরূপে তাঁহার গুণ আশ্রিত। স্বরূপ অপরিবর্ত্তনীয়; গুণ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল। গুণ হইতে "ইস্ম্" অর্থাৎ নামের উৎপত্তি। বাক্য যাহার গুণ; বক্তা তাহার "ইস্ম্" অর্থাৎ নাম। জগৎ ঈশ্বরের নামেরই প্রকাশ। কিন্তু নাম (ইস্ম্) কথনো রূপ (রস্ম্) ব্যতীত প্রকাশ পাইতে পারে না। ঈশ্বরের জ্ঞানের মধ্যে জীবের যে রূপ আছে তাহাই রস্ম্। ঈশ্বর যথন আপনাকে দয়াময় (রহিম্) বলিয়া জানেন, তথন, সঙ্গে সঙ্গেই আপনার জ্ঞানে "মরহুম" অর্থাৎ দয়ার পাত্রের সত্যতা উপলব্ধি করেন। "দয়াময়" নামটী "দয়ার পাত্র" নামক রূপের যোগে প্রকাশিত। এই নাম ও রূপের মধ্যে কালের ক্ষণমাত্র ব্যবধান নাই।

জীব মুক্তিসাধনার দ্বারা নিজের চিন্তার মধ্যে নিজের নাম রূপ ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত করিতে করিতে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে—এইরূপে সে নিজের বিশেষত্ব বিলীন করিয়া দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যেক জীবের যে বিশেষত্ব আছে তাহা নিত্য—তাহা জীবের সাধনার দ্বারা লুপ্ত হইতে পারে না। এইরূপে মুক্তিসাধনায় জীব নিজের দিক দিয়া নিজেকে লয় করে—কিন্তু ঈশ্বরের দিক দিয়া তাহার লয় নাই—সেইথানে ঈশ্বরের মধ্যে জীব আপনার বিশুদ্ধ নিত্যরূপটি লাভ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় মানুষ বলিতেও পারে যে, আমিই সত্য।

শ্রী :—

জৈনধর্ম্ম-তত্ত্ব *

জৈনধর্ম্মকে যনি তাহার চরম পরিণতি দান করিয়া গিয়াছেন সেই তীর্থঙ্কর মহাবীর মগধে জন্মিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের এই প্রদেশেই, উপনিষদের মতানুসারে, যাজ্ঞবল্ক্য,

* ধর্ম্মইতিহাসের আন্তর্জাতিক আলোচনা-সভায় অধ্যাপক জাকবি-কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

ব্রহ্ম ও আত্মাকে নিত্য পদার্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এবং এইখানেই মহাবীরের প্রতিদ্বন্দ্বী বুদ্ধ, যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সার কথা এই, যে, কিছুই নিত্য নহে।

বাহ্যজগতের এবং আমাদের মনোজগতের গভীরতার মধ্যে একটি অদ্বিতীয় নিত্য সত্য আছেন, উপনিষৎকারগণ সেই বৃহৎ সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছেন। সেই সত্তার সহিত অন্য সমস্তের যে কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে কিছু বলেন নাই। কিন্তু কোন পূর্ব্ব সংস্কার না লইয়া যে কেহ উপনিষদ পড়িবেন তিনিই দেখিবেন যে উপনিষদ প্রাকৃতিক জগতের সত্যতাকে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু নিত্য ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে বুদ্ধ আত্মবাদকে গুরুতর ভ্রম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কাঠিন্য শৈত্য প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্মমাত্রই আছে কিন্তু সেই ধর্ম্মগুলি কোন ধর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়া নাই।

জৈনেরা বলেন সৎ পদার্থের তিনটি গুণ আছে :—উৎপত্তি, ধ্রুবতা, ও বিনাশ। (সদুৎপাদ-ধ্রৌব্য-বিনাশ-যুক্তম্।) তাঁহারা আপন মতবাদকে 'অনেকান্তবাদ' বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহারা বলেন জগতে যত কিছু দ্রব্য আছে তাহার মূল বস্তুটি নিত্য কিন্তু এই বস্তুটির গুণগুলি উৎপত্তি ও বিনাশশীল। বস্তু (matter) বস্তুরূপেই চিরকাল থাকে। যেমন মৃত্তিকা বস্তুরূপে নিত্য, কিন্তু ঘটরূপে তাহার উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে।

যে মতবাদের উপর জৈন-ধর্ম্মতত্ত্ব প্রধানতঃ নির্ভর করে তাহার নাম স্যাদ্বাদ। জৈনেরা বলেন যে এই স্যাদ্বাদ কুতর্কের অরণ্য হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করে। স্যাদ্বাদের সার কথা এই যে সৎ পদার্থ যখন উৎপত্তি, ধ্রুবতা ও বিনাশ এই তিনটি পরস্পরবিরোধী গুণযুক্ত তখন কোনো দ্রব্য সম্বন্ধে যে কোনো প্রতিজ্ঞাই (proposition) করা যাক্ না তাহাতে তাহার অনির্দ্দেশ্যতা দূর হইবে না। অর্থাৎ সেটি একদিক দিয়া সত্য অথচ অন্য দিক দিয়া সত্য নহে। এই মত অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানঘটিত প্রতিজ্ঞার সাত প্রকারের রূপ আছে এবং প্রত্যেকটিতেই এই 'স্যাৎ' পদের যোগ আছে ; যথা, স্যাদস্তি সর্ব্বম্, স্যান্নাস্তি সর্ব্বম্ (অর্থাৎ সমস্ত আছেও বা, সমস্ত নাইও বা।) স্যাৎ শব্দের অর্থ—"হবেও বা"। তাহাকে "কথঞ্চিৎ" এই শব্দের দ্বারাও কখনো কখনো ব্যাখ্যা করা হয়—"যেমন ঘটটি কথঞ্চিৎ আছে" এবং "ঘটটি কথঞ্চিৎ নাই" অর্থাৎ তাহা ঘটরূপে আছে কিন্তু বস্ত্ররূপে নাই। অর্থাৎ তাহার মধ্যে, আছে এবং নাই এই দুই ক্রিয়াপদেরই স্থান আছে ; সুতরাং থাকা এবং না থাকা কোনটাই তাহার পক্ষে একান্ত নহে। এই কারণেই ইহাকে অনেকান্তবাদ কহে।

ঘট যে কেবল ঘটমাত্র, তাহা বস্ত্র নহে, এরূপ বাহুল্য উক্তির কারণ এই যে, বেদান্তীরা বলে যে, সকল দ্রব্যের মধ্যেই একই সত্তা আছে, আর দ্বিতীয় কিছু নাই। সেই জন্য জৈনদর্শনে দ্রব্য মাত্রেরই দুইটি পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট লক্ষণ স্বীকার করা হয়, অস্তি এবং নাস্তি ; তাহার আর একটি তৃতীয় লক্ষণ আছে তাহার নাম অবক্তব্য। কারণ, যেহেতু সৎ এবং অসৎ একই কালে একই দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং যেহেতু এরূপ পরস্পরবিরোধী গুণের একত্র সমাবেশ কোন ভাষার দ্বারাই প্রকাশ করা যাইতে পারে না, এই জন্য দ্রব্য মাত্র সম্বন্ধে "অবক্তব্য" এই বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণের বিচিত্র যোগাযোগের দ্বারাই স্যাদ্বাদের সপ্তভঙ্গী অর্থাৎ সাতটি প্রতিজ্ঞা নির্ম্মিত হইয়াছে।

সাংখ্যযোগের সহিত জৈনদর্শনের কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে আমি এখনও কিছু বলি নাই। ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি, কেন না এই দুই দর্শনই শ্রমণ নামধারী সন্ন্যাসীদের (ইহাদের আধুনিক নাম যোগী) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, জৈন ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের যোগসাধনা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং ইহাদের মূল যে একই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সাংখ্য বলেন পুরুষ অর্থাৎ আত্মাসকল নিত্য ও নির্ব্বিকার, প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল। সাংখ্য-মতে পুরুষ বা আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্তই প্রকৃতি হইতে জাত। জৈনেরাও বলেন যে জীব অর্থাৎ আত্মা ব্যতীত সমস্তই পুদ্গল হইতে উৎপন্ন—এই পুদ্গল বস্তু একই কিন্তু ইহা সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যেই পরিণত হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে সাংখ্য এবং জৈনদর্শন একই প্রকার ধারণা লইয়া সুরু করিয়া পরে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। সাংখ্যদর্শনে বলে একটি নির্দ্দিষ্ট

পর্য্যায় অনুসারে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হয় এবং তাহারই বিপরীত পর্য্যায়ে অর্থাৎ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে প্রলয় ঘটে। জৈনেরা কিন্তু পুদ্গলের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা স্বীকার করেন না।

জৈনমতে পাপপুণ্য অনুসারে কর্ম্ম নামক একরূপ সূক্ষ্ম আণবিক বস্তু জীবকে আচ্ছন্ন করে, বিকৃত করে এবং তাহার অন্তর্নিহিত গুণকে বাধা দেয়। জৈনেরা স্পষ্টই বলেন যে কর্ম্ম একরূপ বস্তু (পৌদ্গালিকম্ কর্ম্ম), ইহা রূপক নহে, এক প্রকার বাস্তব পদার্থ। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলিতেই তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে। জৈনেরা বলেন জীব অত্যন্ত লঘু এবং উর্দ্ধগামী (উর্দ্ধ গৌরব) কেবল কর্ম্মের দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া তাহা নিম্নে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু নির্ব্বাণের অবস্থায় যখন জীব এই কর্ম্মবস্তু হইতে মুক্ত হইয়া যায় তখন একেবারে ঋজুরেখায় বিশ্বজগতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে মুক্ত পুরুষদের আবাসস্থলে অধিরোহণ করে। আর একটি দৃষ্টান্ত :—কর্ম্মবস্তু জীবের মধ্যে নানা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঘোলাজলে পঙ্ক যেমন জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া চঞ্চল হইয়া থাকে, জীবের মধ্যে কর্ম্মের সেই এক অবস্থা। আবার তাহা যখন জলের নীচে থিতাইয়া স্থির হইয়া থাকে সেই এক অবস্থা। আবার পঙ্ক থিতাইয়া গেলে স্বচ্ছ জলকে যখন ঢালিয়া স্বতন্ত্র করা হয় সেই এক অবস্থা। তৃতীয় দৃষ্টান্ত :—জৈনমতে নিবিড়তম কৃষ্ণ হইতে উজ্জ্বলতম শুভ্র পর্য্যন্ত জীবের ছয় প্রকার বর্ণ আছে। এই বর্ণগুলিকে বলে লেশ্যা। ইহা সাধারণ মর্ত্ত্যচক্ষুর গোচর নহে। কর্ম্মবস্তুই জীবকে এইরূপ বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করে। অতএব জৈনমতে কর্ম্ম যে এক প্রকার সূক্ষ্ম বস্তু তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই কর্ম্মবস্তু জীবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আট প্রকার বিচিত্র আকারে পরিণত হয়। একই খাদ্য যেমন শরীরের মধ্যে নানারস উৎপাদন করে তেমনি একই কর্ম্মবস্তু হইতে বিচিত্র কর্ম্মরূপের উৎপত্তি হয়। এই আট প্রকার কর্ম্ম আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া একটি সূক্ষ্মশরীর রচনা করে। আত্মা যতদিন না নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শিখরদেশে প্রস্থান করে ততদিন পর্য্যন্ত এই সূক্ষ্মশরীর জন্মান্তরে জীবের অনুসরণ করে। জৈনদের এই "কার্ম্মণ শরীর" সাংখ্যদের সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীরের প্রতিশব্দ। এই সূক্ষ্মশরীরে কর্ম্ম যে আটটি রূপ ধারণ করে নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া গেল। (১) জ্ঞানাবরণীয়। (২) দর্শনাবরণীয়—ইহারা জ্ঞান ও বিশ্বাসকে বাধা দেয়। (৩) মোহনীয়—ইহারা মোহের সঞ্চার করে, বিশেষত রাগদ্বেষ ও রিপুদের ইহাই কারণ। (৪) বেদনীয়—সুখ দুঃখ ইহার পরিণাম। (৫) আয়ুষ্ক—ইহা বর্ত্তমান জন্মে জীবনের আয়ুকাল পরিমিত করিয়া দেয়। (৬) নাম—যাহা কিছুর দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব রচিত হয় এই নামই তাহা জোগাইয়া থাকে। (৭) গোত্র—ইহাতে মানুষের শ্রেণী বা জাতি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। (৮) অন্তরায়—ইহা মানুষের শক্তি ও গুণের বিকাশে বাধা দিয়া থাকে। এই কর্ম্মগুলি কেবল একটি নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত টিঁকিতে পারে, সেই সময় ব্যাপিয়াই জীবের উপর ইহাদের ফল ফলিয়া থাকে। তাহার পর ইহারা জীবকে ত্যাগ করিয়া যায়, সেই ত্যাগ প্রক্রিয়ার নাম নির্জ্জরা। যদ্দ্বারা কর্ম্ম আত্মার মধ্যে প্রবেশ করে সেই বিপরীত প্রক্রিয়ার নাম আস্রব। মন যখন দেহের সহিত যুক্ত হয় সেই উপলক্ষে আস্রবের সঞ্চার হইয়া থাকে, তখনই কর্ম্মবস্তু জীবের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পুণ্যশীল নহে অর্থাৎ সত্যধর্ম্মে যাহার বিশ্বাস নাই, ব্রতপালন যে না করে, ও আচারে যে শিথিল, যে রিপুদমনে অক্ষম, তাহার আত্মা কর্ম্মবস্তুকে ধরিয়া রাখে—ইহাকে বলে বন্ধ। কিন্তু এই আস্রব অর্থাৎ কর্ম্মবস্তুর প্রবেশের প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। সেই প্রতিরোধকে বলে সম্বর।

বিশেষ কতকগুলি আচার পালনের দ্বারা, কায়মন ও বাক্যকে সংযত করার দ্বারা, শীল রক্ষা, ধর্ম্ম চিন্তা ও প্রিয় অপ্রিয়ে রাগ বিরাগ বিসর্জ্জন দ্বারা এই সম্বর সাধিত হয়। এই সম্বরের পক্ষে তপই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়। তপ যে কেবল কর্ম্মকে বাধা দেয় তাহা নয়, তাহা সঞ্চিতকর্ম্ম ক্ষয় করে। তপ জীবকে প্রথমে নির্জ্জরার অবস্থায় লইয়া যায়, তাহার পরে নির্ব্বাণে উপনীত করে। জৈনশাস্ত্রে দুই প্রকারের তপ আছে—বাহ্য তপ এবং আভ্যন্তর তপ। উপবাস, স্বল্পাহার, স্বাদবিহীন খাদ্য ভোজন, আরাম

পরিহার ও দেহকে পীড়াদান বাহ্য তপের অঙ্গ। কৃতপাপের স্বীকার ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত, মঠবাসের কর্ত্তব্যপালন, বাধ্যতা, লজ্জা, আত্মসংযম এবং ধ্যানই আভ্যন্তর তপ। সাংখ্যযোগের প্রণালীর সহিত জৈন তপের প্রণালীর কিছু কিছু ঐক্য আছে; কিন্তু সাংখ্যযোগে ধ্যান, ধারণা, সমাধিকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে, আর জৈন তপে তপস্যার অন্যান্য অঙ্গের অপেক্ষা ধ্যানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা হয় নাই—ইহাদের সকলকেই তুল্য সম্মান দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্যযোগ সন্ন্যাসধর্ম্মের দার্শনিকতত্ত্ব, ইহাতে সন্ন্যাস অত্যন্ত সূক্ষ্মতা ও আধ্যাত্মিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু জৈনশাস্ত্রের সন্ন্যাস অন্য প্রকারের; কর্ম্মের অশুদ্ধিতা হইতে জীবকে মুক্ত করাই তাহার প্রধান লক্ষ্য।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে জৈনধর্ম্ম ভারতের অন্য সকল ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র; এই কারণে প্রাচীন ভারতের দার্শনিক মত ও ধর্ম্মজীবনের আলোচনায় ইহার প্রয়োজনীয়তা গুরুতর তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

শ্রী :—

জ্যোতিষিক যৎকিঞ্চিৎ

১। প্রাথমিক জীবের জন্ম।

এক প্রকাণ্ড জলন্ত নীহারিকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন আমাদের এই পৃথিবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন ইহাতে যে কোন জীব ছিল না তাহা সুনিশ্চিত। সেই প্রচণ্ড উত্তাপে আমাদের পরিচিত কোন জীবই বাষ্পময় ধরায় জীবিত থাকিতে পারিত না। কাজেই বলিতে হয়, জন্মের বহুকাল পরে যখন পৃথিবী শীতল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখনকারই কোন এক দিনে প্রাথমিক জীব ভূতলে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু কি প্রকারে আধুনিক প্রাণীউদ্ভিদের সেই অতিবৃদ্ধ পিতামহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা আধুনিক জীবতত্ত্বের একটা বৃহৎ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে ব্যাপারটির মীমাংসা হয় নাই। বোধ হয় হইবারও নয়।

যাহা হউক প্রাথমিক জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-দিগের বক্তব্য অনুসন্ধান করিতে গেলে দুইটি পৃথক সিদ্ধান্ত নজরে পড়িয়া যায়। একদল বৈজ্ঞানিক বলেন, অপর কোন সজীব-জ্যোতিষ্ক হইতে আসিয়া প্রাথমিক জীব পৃথিবীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিল। তারপর স্থানটিকে জীবন রক্ষার অনুকূল পাইয়া সেটিই বংশবিস্তার দ্বারা এখন ভূতলকে প্রাণীউদ্ভিদে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। প্রাথমিক জীবের জাত্যান্তর পরিগ্রহের কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নয়। অভিব্যক্তি ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে ফেলিয়া দেখিলে, ক্রমিক পরিবর্ত্তনের ধারা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে।

আর একদল পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, আমাদের এই ভূতলেই একদিন প্রাথমিক জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পৃথিবী তাহার নিজের জন্মকাল হইতে যে সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহারই মধ্যে একটির ব্যবস্থা এ প্রকার ছিল যে, তখন জড় আর স্থির থাকিতে পারে নাই। সেই শুভ কালে বাহিরের প্রকৃতি এবং ভিতরকার রাসায়নিক শক্তি একত্রে মিলিয়া জড়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই অপূর্ব্ব রাসায়নিক শক্তি যে কি তাহা আমরা জানি না; এবং যে মহাযোগসূত্র ভিতর ও বাহিরের প্রকৃতিকে একত্র করিয়া ভূতলে প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহারও এখন অস্তিত্ব নাই। আমাদের এই পৃথিবীখানি এখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, স্বতঃজনন (Spontaneous generation) একবারে অসম্ভব।

এই দুইটি সিদ্ধান্তের মধ্যে এ পর্য্যন্ত শেষের মতটিকেই অনেকে প্রাধান্য দিয়া আসিতেছিলেন। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু গবেষণা হইয়াছে, তাহা প্রাথমিক জীবের স্বতঃজনন মানিয়া লইয়াই করা হইতেছিল। আজ কয়েক বৎসর হইল পরীক্ষাগারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীব উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বৈজ্ঞানিক বার্ক সাহেব যে বৃথা কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা হয়ত পাঠকের মনে আছে। ইনি জীবের স্বতঃজননের উপর নির্ভর করিয়া গবেষণা করিয়া-ছিলেন। অপর জ্যোতিষ্ক হইতে জীব আসিয়া পৃথিবীর অধিবাসী হইয়াছে, একথা আজকাল বড় শুনা যায় না। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের অন্যতম নেতা অধ্যাপক আরেনিয়স্ (Arrhenius) সম্প্রতি জীবোৎপত্তির এই মতবাদটিরই সমর্থন করিয়াছেন। জ্যোতিঃশাস্ত্র তড়িৎবিদ্যা

এবং রসায়নশাস্ত্র এই মহাপণ্ডিতের নানা গবেষণায় এখন সত্যই সম্পদশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লর্ড কেল্‌ভিনের পর এ প্রকার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত আর দেখা যায় নাই। এই জন্য ইহাঁর উক্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

গ্রহান্তর হইতে প্রাথমিক জীবের আগমন প্রতিপন্ন করিতে গিয়া আরেনিয়স্ সাহেব প্রথমেই আলোকের চাপের (Light pressure) কথা তুলিয়াছেন। ইহাঁর বক্তব্যের স্থূল মর্ম্ম এই যে, ধূমকেতুর দেহের সূক্ষ্ম কণাগুলি যখন আলোকের চাপে পড়িয়া কোটী কোটী মাইল দীর্ঘ পুচ্ছের রচনা করিতেছে তখন ঐ চাপ দ্বারা চালিত হইয়া অতি সূক্ষ্ম প্রাথমিক জীবের অঙ্কুর যে গ্রহান্তর হইতে ভূতলে আসিতে পারে না, একথা কখনই বলা যায় না। বরং এই প্রকারে জীবের ভূমিষ্ঠ হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। স্বতঃজননবাদিগণ যে একটা কিম্ভূতকিমাকার রাসায়নিক শক্তির কল্পনা করিয়া নিজেদের মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, ইহাতে সে প্রকার কোন অনির্দ্দিষ্ট ব্যাপারকে স্বীকার করিয়া গোঁজামিল দিবার আবশ্যক হয় না।

বিরোধীদিগের প্রধান আপত্তি এই যে, গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে জড়কণার চলাফেরা সম্ভব হইলেও মহাশূন্যের ভিতর দিয়া সজীব পদার্থের আনাগোনা একবারেই অসম্ভব। সজীব থাকিতে গেলে প্রাণী ও উদ্ভিদকে এক একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতার সীমার মধ্যে থাকিতে হয়। এই সীমা অতিক্রম করিলেই জীবের মৃত্যু অনিবার্য্য। যে সকল তাপ-তরঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া চলিতেছে, তাহা মহাশূন্যকে উত্তপ্ত করিতে পারে না। যদি কোন জিনিস ঐসকল তরঙ্গে আহত হয়, তবেই তাপের বিকাশ হয়। এই কারণে গ্রহ নক্ষত্রের তাপ তাহাদেরই চারিপাশে আবদ্ধ রহিয়াছে। মহাশূন্য সম্পূর্ণ নিস্তাপ এবং স্তব্ধ। সুতরাং আকাশের শীতলতার ভিতর দিয়া আসিবার সময় কোন জীবেরই সজীব থাকার সম্ভাবনা নাই। আরেনিয়স্ সাহেব প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের যুক্তিটিকেই গ্রহণ করিয়া দেখাইয়াছেন, মহাশূন্য নিস্তাপ বলিয়াই গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে জীবের গমনাগমন সম্ভব হইয়াছে। শীতের আধিক্য ক্ষুদ্র প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনীশক্তিকে রোধ করে মাত্র,—নষ্ট করে না। এই অবস্থায় বহু বৎসর মৃতবৎ থাকিয়াও ইহারা একবারে নির্জীব হয় না। ইনি একপ্রকার জীবাণুর (Staphylococci) জীবনীশক্তি পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন সাধারণ উষ্ণতায় ইহাদের অর্দ্ধেক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু তরল বায়ুর (Liquid air) শীতলতার মধ্যে রাখিলে উহাদিগকেই চারিমাস কাল জীবিত রাখা যায়।

আচার্য্য আরেনিয়স্ পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলির উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন, বর্ত্তমানযুগে পৃথিবীতে জীবের স্বতঃ-জনন যখন অসম্ভব, এবং পূর্ব্বে কখন ইহা হইয়াছিল কি না তাহারও যখন প্রমাণাভাব, তখন লোকান্তর হইতে প্রাথমিক জীবের আগমন সম্ভাবনাকেই স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত। যে অনন্ত গ্রহসূর্য্য মহাকাশে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিরই প্রাকৃতিক অবস্থা বিচিত্র এবং বিচিত্র রাসায়নিক শক্তি প্রত্যেকটিতেই নানা প্রকারে কাজ করিতেছে। এই অবস্থায় অন্ততঃ কতকগুলি শীতল জ্যোতিষ্কে আজও স্বতঃজনন চলিতেছে বলিয়া যদি স্বীকার করা যায়, তবে তাহাতে বিশেষ ভুল হয় না। তা'রপর আলোকের চাপ আছে। ইহা অতি ক্ষুদ্র জড়কণাগুলিকে চালাইয়া যে সকল জ্যোতিষিক ঘটনা দেখাইতেছে, তাহা আমরা প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুতরাং অতি প্রাচীন যুগে কোন এক দূর সজীব-জ্যোতিষ্ক হইতে এক অণুপ্রমাণ ক্ষুদ্র জীব আলোকের ধাক্কায় পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছিল, যদি এই কথাটিকে মানিয়া লওয়া যায় তবে প্রাথমিক জীবের জন্ম সম্বন্ধে সকল বিতর্কেরই অবসান হয়।

আজকাল জীবাণুনাশক অনেক রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার দেখা যাইতেছে। এগুলির সংস্পর্শে সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু মরিয়া যায়। এজন্য ব্যাধি-সংক্রমিত স্থান এই সকল পদার্থ দ্বারা পরিশুদ্ধ করা হয়। রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি রৌদ্রে দিয়া শোধন করিবার যে রীতি আছে, তাহার কারণ সূর্য্যালোকে জীবাণু-নাশ-শক্তি বর্ত্তমান। সম্প্রতি এই সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সূর্য্যরশ্মিতে লোহিত পীতাদি যেসকল মৌলিক বর্ণরশ্মি মিশ্রিত আছে, তাহাদের মধ্যে বেগুনের পরবর্ত্তী অস্পষ্ট রশ্মিগুলিই (Ultra-violet rays) যথার্থ জীবাণুনাশক। এই

আবিষ্কারের পর পূর্ব্বোক্ত জীবাণু-নাশক আলোকপাত করিয়া নর্দ্দমা প্রভৃতির গলিত আবর্জ্জনাগুলিকে শোধন করিবার এক নূতন বিধি প্রচলিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত ফরাসী-বৈজ্ঞানিক বেকেরেল্ (Becquerel) সাহেব ইহা দেখিয়া বলিতেছেন, আরেনিয়স্ সাহেব অপর গ্রহনক্ষত্রে যে স্বতঃজনন অনুমান করিয়াছেন, তাহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে, এবং আলোকের চাপে সেই সকল স্বতঃজাত জীবের আণুবীক্ষণিক বংশধরগণ পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে বলিয়া স্বীকার করিলে, গোড়ায় একটা প্রকাণ্ড গলদ থাকিয়া যায়। মহাকাশের সর্ব্বাংশই সেই জীবাণু-নাশক আলোকতরঙ্গে পূর্ণ রহিয়াছে, সুতরাং শুষ্ক ও প্রায় নির্জ্জীব জীবাণুগুলি যখন আকাশের ঘোর শীতের ভিতর দিয়া পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে, তখন সেই আলোকরশ্মির সংস্পর্শে তাহাদের জীবনান্ত হইবারই সম্ভাবনা অধিক। এক সৌরজগতের আকাশই আলোকময় নয়। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে জুড়িয়া কোটী কোটী চন্দ্রসূর্য্যের আলোক সর্ব্বদা আনাগোনা করিতেছে, এবং এই সকল আলোকে জীবাণু-নাশক রশ্মিরই পরিমাণ অধিক। সুতরাং অতি দূর জ্যোতিষ্কের জীব আলোকের চাপে যে, সজীব অবস্থায় ভূতলে পড়িবে তাহার সম্ভাবনা নাই। লোক-লোকান্তরকে সংযুক্ত করিয়া আলোকধারা যে সেতু রচনা করিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া জীব যাওয়া আসা করিতে পারে না।

আচার্য্য আরেনিয়স্ ও বেকেরেল্, উভয়েই আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নেতা এবং মহা পণ্ডিত। এই বিতর্কের মীমাংসার পর সিদ্ধান্তটি কি প্রকার আকার গ্রহণ করিবে, তাহা এখন বলা যায় না। প্যারিসের প্রধান বৈজ্ঞানিক পরিষদে (Academie des Sciences) এই ব্যাপারটি লইয়া সম্প্রতি খুব আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

২। জ্যোতিষীর মৃত্যু।

গত কয়েক মাসের মধ্যে ইটালি ও জর্ম্মানির দুই জন বিখ্যাত জ্যোতিষীর মৃত্যু হইয়াছে। উভয়েই খুব বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং বিধাতা যে গুরু কর্ত্তব্য তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহা সুসম্পন্ন করিয়া উভয়েই কোলাহলময় জগতের এক নিভৃত প্রান্তে বসিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং এই মৃত্যুতে শোক করিবার কিছুই নাই। ইহাঁরা যে কঠোর সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফল মানবজাতি চিরদিন ভোগ করিতে থাকিবে। কর্ম্মীর জীবনের বোধ হয় ইহাই চরম সার্থকতা।

ইটালীয় জ্যোতিষী সিয়াপেরেলি (Schiaparelli) প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মিলান মানমন্দিরের সহকারী জ্যোতিষীরূপে কিছুকাল কাজ করিয়া ইনি ধূমকেতু ও উল্কাবর্ষণ লইয়া দীর্ঘকাল গবেষণা করেন। ধূমকেতুর কক্ষা ভেদ করিবার সময়েই যে পৃথিবীতে অধিক উল্কাবর্ষণ হয়, এই তত্ত্ব, সিয়াপেরেলিরই প্রধান আবিষ্কার। অপর জ্যোতিষিগণ এই অদ্ভুত আবিষ্কারের সমাচার পাইয়া মহা বিতর্কের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সিয়াপেরেলির আবিষ্কারই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত-সম্প্রদায় যুবক আবিষ্কর্ত্তাকে তাঁহাদের নেতৃত্বের আসনে বরণ করিয়াছিলেন। সিয়াপেরেলিও এই আসনের মর্য্যাদা নব নব আবিষ্কার দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। আগষ্ট মাসের উল্কাবর্ষণ যে ১৮৬২ সালের ধূমকেতুর দেহচ্যুত পিণ্ডগুলি দ্বারা সংঘটিত তাহা ইনিই সুস্পষ্ট দেখাইয়াছিলেন। ইহার পর এপ্রিল ও নবেম্বর মাসের উল্কাপাতের সঙ্গে এক একটি সাময়িক ধূমকেতুর সম্বন্ধ একে একে আবিষ্কার হইয়াছিল। এই সকল গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্য ১৮৭২ সালে সিয়াপেরেলি ইংলণ্ডের আষ্ট্রনমিকাল সোসাইটির সুবর্ণপদক প্রভৃতি পাইয়া অশেষ প্রকারে দেশ বিদেশে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

গত ১৮৭৭ সালে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলে সিয়াপেরেলির পর্য্যবেক্ষণকুশলতার এক নূতন পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইনি মঙ্গলগ্রহের উপরে কতকগুলি রেখাময় চিহ্ন দেখিয়া সেগুলিকে মঙ্গলের খাল বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কার জ্যোতিষীমহলে যে বিতর্কের সূচনা করিয়াছিল, তাহার আজও অবসান হয় নাই। আজকাল জগতের বৃহৎ মানমন্দিরগুলির শত শত দূরবীক্ষণ মঙ্গলের দিকে সংযুক্ত থাকিয়া প্রতিবৎসরই যে নব নব তথ্য সংগ্রহ করিতেছে, সেগুলিকে সিয়াপেরেলির আবিষ্কারেরই ফল বলা যাইতে পারে।

শুক্র ও বুধ-গ্রহ পৃথিবীর এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন জ্যোতিষীদিগের মধ্যে কেহই ইহাদের আবর্ত্তন-কাল নিরূপণ করিতে পারেন নাই। সিয়াপেরেলি বহু বৎসর ধরিয়া গ্রহদ্বয়কে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাদের গতিবিধি আবিষ্কার করিয়াছিলেন; সেই পর্য্যবেক্ষণের ফলকে আজও সকলে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। আমাদের চন্দ্র যেমন পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসিবার সময় নিজে একবার ঘুরপাক খায়, বুধগ্রহ সেই প্রকারে সূর্য্য প্রদক্ষিণকালে যে একবার মাত্র পূর্ণাবর্ত্তন দেয়, তাহা অধ্যাপক সিয়াপেরেলিই ১৮৮২ সালে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে শুক্রেরও ঐ প্রকার গতি ধরা পড়িয়াছিল।

ইহা ছাড়া সিয়াপেরেলি সাহেবের আরো অনেক ক্ষুদ্র আবিষ্কার আছে। ইহাদের প্রত্যেকটিতেই আবিষ্কর্ত্তার অদ্ভুত প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। একজন জ্যোতিষীর চেষ্টায় এতগুলি আবিষ্কার সুসম্পন্ন হওয়া সত্যই বিস্ময়কর। যুগল তারকার গতিবিধি পরিমাপ এবং গ্রহগণের অবস্থান নির্ণয় প্রভৃতি জ্যোতিষিক প্রসঙ্গেও ইহাঁর অসাধারণ প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়

অধ্যাপক গ্যালি (J. G. Galle) আটানব্বই বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়া জ্যোতিষিক-সম্প্রদায়ের আর একখানি মহাসিংহাসন শূন্য করিয়াছেন। গত শতাব্দীর ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক জ্যোতিষিক আবিষ্কারের সহিত গ্যালির নাম জড়িত রহিয়াছে। ১৮৪৬ সালে ইংরাজ-জ্যোতিষী আডাম্ (Adams) এবং ফরাসী পণ্ডিত লেভেরিয়ার যখন গণিতের সাহায্যে নেপ্‌চুন্ গ্রহের অস্তিত্বের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়াছিলেন, তখন এই গ্যালি সাহেবই সর্ব্ব প্রথমে নূতন গ্রহটিকে চাক্ষুষ দেখিয়াছিলেন। এই সূত্রে ইহাঁর খ্যাতি ভুবনবিদিত হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর শনি-গ্রহের ভিতরকার বলয়টি একক তাঁহারি চেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়া পড়িলে, গ্যালির প্রতিভার পূজা আরম্ভ হইয়াছিল। অলৌকিক প্রতিভা-জ্যোতিঃতে উনিই বার্লিন মানমন্দিরকে জ্যোতিষীদিগের এক মহাতীর্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন। রয়াল আষ্ট্রনমিকাল সোসাইটি প্রভৃতি জ্যোতিষী পরিষদের বহু সম্মান অজস্র ধারায় তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল।

ক্ষুদ্র গ্রহের (Asteroids) গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সূর্য্যের লম্বন (Parallax) নির্ণয়ের যে পদ্ধতিটি প্রচলিত আছে, অধ্যাপক গ্যালিই তাহার আবিষ্কারক। তা'ছাড়া বহু ধূমকেতুর কক্ষা নিরূপণ করিয়া ইনি যে সারণী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা অনেকদিন ধরিয়া জ্যোতিষীদিগের গণনার সহায় হইয়াছিল।

৮৫ বৎসর বয়সেও গ্যালি সাহেবকে জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে অবিরাম শ্রম করিতে দেখা যাইত। জীবনের শেষ অংশটা বিশ্রামে কাটাইবার উদ্দেশ্যে ইনি গত ১৮৯৭ সালে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পটস্‌ডামের নিভৃত পল্লীনিবাসটিকে তিনি এক দিনের জন্য ত্যাগ করেন নাই। ঋষিপ্রতিম গ্যালি সাহেবের সেই পুণ্য আশ্রম আজ মৃত্যুর স্পর্শে শূন্য হইয়াছে।

৩। আবিষ্কার সমাচার

০, ৩, ৬, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬ এই সংখ্যাগুলির মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। ছয় তিনের দ্বিগুণ, বারো আবার ছয়ের দ্বিগুণ ইত্যাদি। কাজেই শূন্যকে ছাড়িয়া দিলে, প্রত্যেক রাশিকে পূর্ব্ববর্ত্তী রাশির দ্বিগুণ দেখা যায়। এখন প্রত্যেকের সহিত যদি চার যোগ করা যায়, তবে সংখ্যাগুলি ৪, ৭, ১০, ১৬, ২৮, ৫২ এবং ১০০ হইয়া দাঁড়ায়। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় সূর্য্য হইতে গ্রহগুলির দূরত্বের অনুপাত প্রায়, ৪, ৭, ১০ ইত্যাদির অনুরূপ। অর্থাৎ সূর্য্য হইতে বুধের দূরত্ব যদি ৪ হয়, তবে শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনির দূরত্ব ঐ অনুপাতে যথাক্রমে ৭, ১০, ১৬, ৫২, এবং ১০০ হইয়া পড়ে। কিন্তু আটাশের স্থানে কোন গ্রহ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গ্রহগণের দূরত্বের এই অদ্ভুত সম্বন্ধটি জ্যোতিষী টিটিয়স্ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে ইহাই বোডের নিয়ম (Bode's Law) বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইউরেনসের আবিষ্কার হইলে, তাহাকেও বোডের নিয়ম মানিয়া চলিতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু মঙ্গল ও বৃহস্পতির ক্ষেত্রের মধ্যকার সেই আটাশের ঘরে কোন গ্রহের সন্ধান না পাইয়া প্রাচীন জ্যোতিষিগণ বিস্মিত

হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে সময় ছোট জ্যোতিষ্ক পর্য্যবেক্ষণের সুব্যবস্থা ছিল না। কাজেই ঐ শূন্য স্থানে বহুকাল কোন নূতন গ্রহের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইহার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিনে হঠাৎ আটাশের ঘরে একটি ছোট গ্রহ দেখা গিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর এপর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষার মধ্যে দুই চারিটি করিয়া নূতন গ্রহের আবিষ্কার হইতেছে। এখন এগুলির সংখ্যা প্রায় চারি শত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটিই আকারে বড় নয়। যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহার ব্যাস তিনশত কুড়ি মাইল মাত্র, এবং ক্ষুদ্রতমের ব্যাসের পরিমাণ কুড়ি মাইলের অধিক নয়। সকলগুলিকে ভাঙিয়া যদি একটি মাত্র গ্রহে পরিণত করা যায়, তবে তাহার আয়তন আমাদের পৃথিবীর চল্লিশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র হয়। ক্ষুদ্র গ্রহগুলি পৃথিবীর তুলনায় যে কত ছোট, তাহা এই হিসাব হইতে বেশ বুঝা যায়।

যাহা হউক হ্যালির ধূমকেতু পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় এবৎসর ঐ গ্রহগুলির অধিকৃত স্থানের পুনঃ পুনঃ ফোটোগ্রাফ্ ছবি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে অনেকগুলি নূতন গ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে। বলা বাহুল্য এগুলিকে খালি চোখে মোটেই দেখা যায় না, এবং বড় দূরবীণ দিয়া দেখিতে গেলেও গ্রহ বলিয়া চেনা কঠিন হয়। ফোটোগ্রাফের ছবি না তুলিলে ইহারা নিশ্চয়ই আরো বহুকাল আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিত। এই নবাবিষ্কৃত গ্রহগুলির গতিবিধি সম্বন্ধে সকল খবর আজও জানা যায় নাই।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

প্রাচীন তুলা ও মান

(পরিমাণ-পদ্ধতি)

পৌতবাধ্যক্ষ নিম্নলিখিত পরিমাণ ও ওজন প্রস্তুত করিবেন।

দশ মাষা (অর্থাৎ দশটী মুগের বীজের ওজন)=১ সুবর্ণমাষা।

১৬ মাষায় এক সুবর্ণকর্ষা।

৪ কর্ষায় এক পল।

৮৮ শ্বেত সরিষায় এক রৌপ্যমাষা।

১৬ রৌপ্যমাষা বা ২০ শৈব্যায় (বীজ) এক ধরণ।

২০ তণ্ডুলে হীরকের এক ধরণ।

অর্দ্ধমাষা, একমাষা, দুইমাষা, চারিমাষা, অষ্টমাষা, এক সুবর্ণ, দুই সুবর্ণ, চারি সুবর্ণ, অষ্ট সুবর্ণ, দশ সুবর্ণ, বিশ সুবর্ণ, ত্রিশ সুবর্ণ, চল্লিশ সুবর্ণ এবং শত সুবর্ণ এই কয় প্রকার পরিমাণ ব্যবহৃত হয়। "ধরণে"ও পূর্ব্বোক্ত মাপ প্রস্তুত করিতে হইবে।

মগধ এবং মেকল দেশে প্রাপ্ত লৌহ বা শৈলদ্বারা ওজন প্রস্তুত করিতে হইবে। অভাবে, যে সকল দ্রব্য জলে সিক্ত হইলে সঙ্কুচিত হয় না বা উত্তাপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না এইরূপ দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে।

তুলাদণ্ড।

ছয় অঙ্গুলি পরিমিত তুলাদণ্ড এবং একপল ওজনের ভার হইতে আরম্ভ করিয়া দশ প্রকারের তুলাদণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে। এই দশটী দণ্ডের দৈর্ঘ্য প্রত্যেকটী অপরটী অপেক্ষা অষ্টাঙ্গুলি বেশী হইবে এবং ওজনও এক এক পল করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে।

বাহাত্তর অঙ্গুলি লম্বা এবং ৫৩ পল ওজনে সমবৃত্তনামে একটী তুলাদণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার প্রান্তদেশে ৫ পল ওজনের নিক্তি দিয়া কর্ষমাপকালীন যে স্থলে দণ্ড সমকরণ হইবে সেই স্থলে দাগ দিতে হইবে। ঐ দাগের বামদিকে চিহ্নদ্বারা ১ পল, দ্বাদশ পল, পঞ্চদশ পল, এবং বিংশ পল স্থির করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপর, প্রত্যেক দশমস্থলে চিহ্ন দিয়া শত পল পর্য্যন্ত চিহ্ন দিতে হইবে। অক্ষ স্থলে নান্দী চিহ্ন স্থাপন করিতে হইবে।

সমবৃত্তাপেক্ষা দ্বিগুণ লৌহ দ্বারা এবং ৯৬ অঙ্গুলি পরিমিত তুলাদণ্ড নির্ম্মাণ আবশ্যক। ইহাকে পরিমাণী বলে। ইহার দণ্ডে প্রথম ১০০ শত চিহ্ন, পরে ২০,৫০,১০০ এইরূপ চিহ্ন দিতে হইবে।

বিশ তুলায় একভার।

দশ ধরণে এক পল।

একশত পলে এক আয়মানী (রাজকীয় আয়ের মাপ)।

আয়মানীর সহিত তুলনায় ব্যবহারিকী (সাধারণে

ব্যবহৃত তুলাদণ্ড), ভাজনি (ভৃত্যবর্গের ব্যবহৃত তুলাদণ্ড) এবং অন্তঃপুরভাজিনী (অন্তঃপুরে ব্যবহৃত তুলাদণ্ডের) প্রত্যেকটী ক্রমান্বয়ে ৫ পল করিয়া কম হয়। (অর্থাৎ ব্যবহারিকী ৯৫ ধরণপল; ভাজনি ৯০ এবং অন্তঃপুর-ভাজিনী ৮৫ ধরণ পল)।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে প্রত্যেক পল অর্দ্ধধরণ করিয়া কম পড়ে। যথা—

১০ ধরণ=আয়মানীর একপল।

৯½ ধরণ=ব্যবহারিকীর একপল।

৯ ধরণ=ভাজনির একপল।

৮½ ধরণ=অন্তঃপুরভাজিনী।

উপরোক্ত কয়েক প্রকার দণ্ডের লৌহ ওজনে এবং দৈর্ঘ্যে হ্রাস হয়। যথা—

আয়মানী দীর্ঘে	৭২ ইঞ্চি এবং ওজনে	৫৩ পল
ব্যবহারিকী "	৬৬ " " "	৫১ পল
ভাজনি "	৬০ " " "	৪৯ পল
অন্তঃপুরভাজিনী	৫৪ " " "	৪৭ পল

প্রথমোক্ত দুই প্রকার তুলাদণ্ডে ওজন করিলে মাংস, ধাতু, লবণ এবং মূল্যবান প্রস্তর ব্যতীত অন্য সকল প্রকার পণ্যই দেশের নরপতিকে পাঁচপণ অতিরিক্ত দিতে হইবে।

অষ্টহস্ত দীর্ঘ কাষ্ঠনির্ম্মিত তুলাদণ্ড ময়ূরের ন্যায় পাদদানের উপর স্থাপিত করিতে হইবে এবং ইহাতে চিহ্ন করিতে হইবে।

পঞ্চবিংশ পল কাষ্ঠে একপ্রস্থ তণ্ডুল সিদ্ধ হইবে। অধিক বা অল্প কাষ্ঠের ওজনের জন্য এই মাপ প্রচলিত আছে।

২০০ পলে=এক দ্রোণ=এক আয়মান্।

১৮৭½ পলে=১ ব্যবহারিক।

১৭৫ পলে=১ ভাজনীয়।

১৬২½ পলে=১ অন্তঃপুরভাজনীয়।

আদক, প্রস্থ এবং কুটুম্ব পূর্ব্বোক্ত কয়েকটীর ¼ অংশ

১৩ দ্রোণ=১ বারী।

২০ দ্রোণ=১ কুম্ভ।

১০ কুম্ভ=১ বহ।

জলীয় পদার্থ ওজন করিতে হইলে নিম্নলিখিত ওজন অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। যথা—

১¼ পণ=এক দ্রোণ।

¾ পণ=এক আদক।

৬ মাষা=এক প্রস্থ।

১ মাষা=এক কুটুম্ব।

যাহারা ঘৃত বিক্রেতা তাহারা ক্রেতাকে তপ্তব্যাজী (অর্থাৎ ঘৃত জলীয় ভাবে থাকার জন্য ক্ষতিপূরণ) স্বরূপ $\frac{১}{৩২}$ অংশ অধিক ঘৃত দিবে। জলীয় পদার্থ বিক্রয়কালীন পাত্রে লাগিয়া থাকার দরুণ বিক্রেতা ক্রেতাকে $\frac{১}{৫০}$ অংশ অধিক দিবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

মরণ-পরিদীপিত উদেনি-বস্তু*

(ধর্ম্মপদের অর্থ-কথা হইতে অনূদিত)

[ধর্ম্মপদের অপ্রমাদবর্গের প্রথম গাথার ব্যাখ্যার নিমিত্ত এই বস্তু বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ছয়টি পৃথক্ গল্প আছে। কিন্তু গল্পসকল পরস্পর সম্বদ্ধ। সেই গল্পসকলের নাম যথা—(১) উদেনি-বস্তু; বা আনুপূর্ব্বী কথা; (২) ঘোষক-বস্তু, (৩) শ্যামাবতী-বস্তু; (৪) বাসুলদত্তা-বস্তু; (৫) মাগন্দী-বস্তু; (৬) মরণ-পরিদীপিত উদেনি-বস্তু।]

১। আনুপূর্ব্বী কথা।

বুদ্ধ যখন কৌশাম্বীনগরের ঘোষিতারামে বিহার করিতে-ছিলেন তখন শ্যামাবতী-প্রমুখ পঞ্চশত স্ত্রী এবং মাগন্দী ও তাহার পঞ্চশত জ্ঞাতির মরণ ও ব্যসন উপলক্ষে এই বস্তুর বিষয়ে এইরূপ আনুপূর্ব্বী কথা বলিয়াছিলেন।—

অতীত কালে অল্লকপ্প রাজ্যে অল্লকপ্পক নামে রাজা ছিলেন, আর বেটঠদীপক রাজ্যে বেটঠদীপক নামে রাজা

* যে গল্প আশ্রয় করিয়া বুদ্ধাদি অর্হতেরা কোন উপদেশ দিয়াছিলেন তাদৃশ গল্পের নাম বস্তু। উদেনি বা উদয়ন রাজার গল্প অবলম্বন করিয়া এই বস্তু রচিত। উদয়ন রাজা বুদ্ধের সময় কৌশাম্বীতে রাজত্ব করিতেন। হস্তিনাপুর হইতে যমুনাতীরে কৌশাম্বীনগরে পাণ্ডবদের বংশধরেরা রাজধানী উঠাইয়া আনেন।

এই সকল গল্প ভারতবর্ষের সর্ব্বদেশে প্রচলিত আধুনিক গল্পসমূহের মূল ভিত্তি। ইহারা প্রায় ষোল-সতের শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের তৎকালের আচার ব্যবহারের বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যায়। কথাসরিৎসাগর এবং বৃহৎকথাতেও উদয়ন রাজার কথা আছে। কিন্তু ইহাই প্রাচীনতম।

ছিলেন। ইহাঁরা বাল্যকাল হইতে পরস্পরের সহায়ক (বন্ধু) ছিলেন এবং একই আচার্য্যকুলে শিল্প (arts and sciences অর্থে শিল্প শব্দ পালিতে প্রযুক্ত হয়) শিক্ষা করিয়া স্ব স্ব পিতার মৃত্যুর পর পিতৃরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দশ দশ যোজন বিস্তৃত রাজ্যের ছত্রধারী রাজা ছিলেন।

তাঁহারা সময়ে সময়ে মিলিত হইয়া একত্র অবস্থান উপবেশন ও শয়নাদি করিতেন। লোকসকলকে জায়মান, ক্ষীয়মাণ ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া তাঁহারা চিন্তা করিলেন যে— 'মনুষ্যেরা যখন পরলোকে যায় তখন কিছুই সঙ্গে যায় না, আপনার শরীরকেও ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, অতএব গৃহাবাসে আর কি হইবে? প্রব্রজিত হওয়াই শ্রেয়।'

এইরূপ বিচার করিয়া পুত্রদারাদিকে রাজ্য দিয়া তাঁহারা ঋষি-প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হইয়া হিমবান্ প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা বিচার করিলেন যে আমরা রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছি, কিন্তু তথাপি যদি আমরা এক স্থানে বাস করি তবে অপ্রব্রজিতের মত হইব; অতএব আইস আমরা পৃথক্ পৃথক বাস করি। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ পর্ব্বত-শৃঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন; কেবল অর্দ্ধমাসান্তে উপোসথ-দিবসে পরস্পর মিলিত হইতেন। পরে এরূপ সঙ্গ করাও অনুচিত বিবেচনা করিয়া প্রত্যেকে অর্দ্ধমাসান্তে স্বকীয় পর্ব্বতে অগ্নি জ্বালাইয়া পরস্পরকে নিজ নিজ জীবিত থাকার নিদর্শন জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে বেহুদীপক তাপস লোকান্তরিত হইয়া দেবরাজ শক্র হইয়া দেবলোকে জন্মাইলেন। অনন্তর অর্দ্ধ-মাস পরে তাঁহার পর্ব্বতে অগ্নি না দেখিয়া অপর তাপস মনে করিলেন, বোধ হয় আমার সহায়ক মৃত হইয়াছেন।

আর মৃত তাপস দেবলোকে উৎপন্ন হওয়া মাত্র আপনার দৈবী শ্রী দেখিয়া প্রব্রজ্যার পর হইতে আপনার পুণ্যকর্ম্ম-সকল (ও তাহার ঐ ফলের বিষয়) অবগত হইয়া স্বীয় বন্ধুকে উহা জানাইতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর তিনি দেবরূপ ত্যাগ করিয়া এক মার্গিক (পথিক) পুরুষের রূপ ধারণ করিয়া পথিকের মত বন্ধুর নিকট যাইয়া বন্দনা পূর্ব্বক একান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাপস জিজ্ঞাসিলেন 'কোথা হইতে আসিয়াছেন?'

আগন্তুক। আমি মহাশয়! পথিক; দূর হইতে আসিয়াছি। আর্য্য! আপনি কি এই স্থানে একক থাকেন, না অন্য কেহ আছে?

তাপস। হাঁ, আমার এক বন্ধু ঐ পর্ব্বতে থাকেন। কিন্তু উপোসথ-দিবসে (পূর্ণিমায়) অগ্নি জ্বালেন নাই, তাই বোধ হইতেছে তিনি মৃত হইয়াছেন।

আগন্তুক। হাঁ, তাহাই হইয়াছে। ভ্রাতঃ, আমিই সেই।

তাপস। কোথায় জন্মাইয়াছেন?

আগ। দেবলোকে মহাশক্র দেবরাজ হইয়া জন্মা-ইয়াছি। আর্য্যকে দেখিবার জন্য আসিয়াছি। এই স্থানে আপনি যে বাস করেন তাহাতে কি কোন উপদ্রব আছে?

তাপস। হাঁ, হস্তীর উপদ্রব আছে।

আগ। হস্তীরা কি করে?

তাপস। তাহারা সম্মার্জ্জিত স্থানে মলত্যাগ করে ও তাহাকে পদাঘাতে ধূলিযুক্ত করে। তাহা পরিষ্কার ও সমান করিবার জন্য আমাকে কষ্ট পাইতে হয়।

তাহা শুনিয়া দেবরাজ হস্তী নিবারণ করিবার জন্য তাপসকে হস্তীকান্ত বীণা এবং হস্তীকান্ত মন্ত্র দিলেন। দিবার কালে সেই বীণার তিন তন্ত্রী দেখাইয়া বলিয়া দিলেন যে "এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক এই তন্ত্রী বাজাইলে হস্তীরা পশ্চাৎদিকে না দেখিয়া একবারে পলাইয়া যাইবে। আর ঐরূপে অন্য তন্ত্রী বাজাইলে হস্তীরা পশ্চাৎদিকে দেখিতে দেখিতে পলাইবে। আর তৃতীয় তন্ত্রী বাজাইলে যূথপতি হস্তী পৃষ্ঠে উঠাইয়া লইবার জন্য পৃষ্ঠ নত করিয়া আগমন করিবে। ইহা আপনি যথারুচি ব্যবহার করিবেন।"

এই বলিয়া দেবরাজ তাপসকে বন্দনা * করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাপস কেবল পলায়ন-তন্ত্রী বাজাইয়া হস্তীদের তাড়াইয়া দিতেন।

এই সময়ে কৌশাম্বীতে পরন্তপ নামে রাজা ছিলেন।

* যদিও তপস্যাদির ফল দেবত্ব তথাপি প্রব্রজিত তাপসেরা রাজা-দের পূজ্য বলিয়া দেবরাজ তাপসকে বন্দনা করিলেন ও আর্য্য বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তপস্যা ও যজ্ঞাদির ফলে যে দেবলোকে গতি হয়

তিনি একদিন দেবীর (অগ্রমহিষীর) সহিত ছাতে বালাতপ সেবন করিতেছিলেন। দেবী গর্ব্বিণী ছিলেন। তিনি শত সহস্র মূল্যের রাজকীয় রক্তকম্বল আস্তরণ করিয়া তদুপরি নিষণ্ণা হইয়া রাজার অঙ্গুলি হইতে শত সহস্র মূল্যের রাজমুদ্রিক (অঙ্গুরী) খুলিয়া নিজ অঙ্গুলিতে পরিতেছিলেন ও কথাবার্ত্তা করিতেছিলেন।

সেইকালে হস্তীলিঙ্গ পক্ষী আকাশমার্গে যাইতে যাইতে দূর হইতে রক্তকম্বলাসনে দেবীকে দেখিয়া মাংসপেশী মনে করিয়া পক্ষ গুটাইয়া অবতরণ করিতে লাগিল। রাজা সেই অবতরণ-শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু দেবী গর্ভভারের জন্য ও ভয়বিহ্বলতার জন্য পলাইতে পারিলেন না। পক্ষী কম্বল সুদ্ধ দেবীকে নখপঞ্জরে গ্রহণ করিয়া উড্ডীন হইল। হস্তীলিঙ্গ পক্ষীর বল পঞ্চহস্তীর সমান*। তাহারা শিকারকে আকাশমার্গে লইয়া যাইয়া যথাভিলষিত স্থানে আহার করে।

দেবী মরণভয়ে ভীতা হইলেও চিন্তা করিতে লাগিলেন যে "তীর্য্যক্ জাতিরা মনুষ্যের শব্দে ভয় পায়, অতএব আমি যদি চীৎকার করি তবে আমাকে পক্ষী ফেলিয়া দিবে আর আমি তাহাতে গর্ভসমেত বিনষ্ট হইব। এ যখন কোন স্থানে বসিয়া আমাকে খাইবার উপক্রম করিবে তখন ইহাকে চীৎকারের দ্বারা তাড়াইয়া দিব।" দেবী নিজের সুবুদ্ধি হেতু এইরূপ নিশ্চয় করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন।

সে সময়ে হিমবান প্রদেশে অত্যোচ্চ মণ্ডপাকার এক মহান্ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। সেই শকুন তথায় মৃগাদিকে লইয়া খাইত, অতএব দেবীকেও তথায় লইয়া বিটপের অভ্যন্তরে রাখিয়া আগমনমার্গ অবলোকন করিতে লাগিল; কারণ আগমনমার্গ অবলোকন করা তাহাদের স্বভাব। সেইক্ষণে দেবী সেই পক্ষীকে তাড়ান উচিত মনে করিয়া উভয় হস্ত উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক একবারে পাণিশব্দ ও মুখশব্দ করিয়া পক্ষীকে তাড়াইয়া দিলেন।

অনন্তর সূর্য্যাস্তগমনকালে রাজ্ঞীর কর্ম্মভোগ হেতু ঝটিকা বহিতে লাগিল এবং সর্ব্বদিকগামী মহামেঘ উত্থিত হইল। তাবৎকাল পর্য্যন্ত সুখে স্থিতা সেই রাজমহিষীকে "আর্য্যে ভয় নাই" এরূপ বলিয়া কেহ আশ্বাস দিবার লোকও তখন ছিল না। তাহাতে দুঃখযুক্তা হইয়া সমস্ত রাত্রি অনিদ্র অবস্থায় রহিলেন। অনন্তর রাত্রির প্রভাতকালে মেঘবিগম অরুণোদ্গম ও রাজ্ঞীর পুত্রপ্রসব এককালে এই তিন ঘটনা ঘটিল। মেঘ ও পর্ব্বত হইতে সূর্য্যের উদ্গমনকালে পুত্র হওয়াতে রাজ্ঞী পুত্রের নাম 'উদয়ন' রাখিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত অল্লকপ্পক তাপসের বাসস্থান তাহার অবিদূরে ছিল। যে দিন বর্ষা হইত সে দিন স্বভাবতঃ তিনি শীতভয়ে ফলাফলের জন্য বনে বিচরণ করিতেন না। কিন্তু, তিনি বৃক্ষমূলে যাইয়া শকুনদের ভুক্তাবশিষ্ট মাংসের অস্থি সকল আহরণ পূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া তাহার রস প্রস্তুত করত পান করিতেন।* অতএব সে দিন তিনি অস্থি আহরণ করিবার জন্য সেই বৃক্ষমূলে অস্থি অন্বেষণ করিতে করিতে উপরে শিশুর রোদন শুনিয়া তাহাদের দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া সব জ্ঞাত হইলেন।

তাপস রাজ্ঞীকে অবতরণ করিতে বলিলে রাজ্ঞী বলিলেন 'আর্য্য, আমি জাতিনাশের ভয় করি।' "আপনার কি জাতি?" "আমি ক্ষত্রিয়া।" তাপস বলিলেন "আমিও ক্ষত্রিয়।" তাঁহাকে রাজ্ঞী ক্ষত্রিয়মায়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তাপস তাহা বলাতে রাজ্ঞী বলিলেন "তবে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আমার পুত্রকে গ্রহণ করুন।" তাপস এক পার্শ্ব দিয়া আরোহনমার্গ করিলেন। রাজ্ঞী বলিলেন "আমাকে না ছুঁইয়া শিশুকে লইয়া অবতরণ করুন।" তাপস তাহাই করিলেন। দেবীও পরে অবতরণ করিলে তাপস তাহাদের আশ্রমপদে লইয়া যাইলেন। তথায় স্বকীয় ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ না করিয়া অনুকম্পাপূর্ব্বক নীবার ও অমক্ষিক মধু সংগ্রহ পূর্ব্বক যাগু প্রস্তুত করিয়া তাহাদের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাপসের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া কিছুদিন পরে দেবী বিচার করিলেন

* বৃক্ষমূলে নিপতিত পক্ষীদের ভুক্তাবশিষ্ট ফল সংগ্রহ করিয়া তাপস ভোজন করিতেন এরূপ বলিলে গল্পটি সুসঙ্গত হইত। সম্ভবত আর্য্যাবর্ত্তে ঐ গল্প ঐরূপ আকারে প্রচলিত ছিল। লঙ্কায় যাইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করা সম্ভবপর। বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন "পরম্পরাগতা তস্সা নিপুণা অত্থবণ্ণনা। যা তম্বপণ্ণি দীপম্হি দীপভাসায় সণ্ঠিতা।" অর্থাৎ তাঁহার রচিত এই অর্থকথার মূল তাম্রপর্ণী দ্বীপে দ্বীপভাষায় পূর্ব্বে ছিল। অথবা তাপসদের প্রতি কিছু কটাক্ষ করাও এই গল্পের

যে "আমি এখানে আসার এবং এখান হইতে যাওয়ার পথ জানি না, আর এই তাপসের সহিত আমার সেরূপ ঘনিষ্ঠতাও নাই। ইনি যদি আমাদের ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যান তবে আমাদের মরণ নিশ্চয়। অতএব কোন প্রকারে ইঁহার শীলভঙ্গ করিয়া যাহাতে আমাদের কখন ত্যাগ না করেন তাহা করা কর্ত্তব্য।" এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবী নানা প্রকারে তাপসকে প্রলোভিত করিয়া তাঁহার শীলভঙ্গ করাইয়া তাঁহার সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদিন তাপস নক্ষত্রযোগ দেখিতে দেখিতে পরন্তপ রাজার নক্ষত্রপীড়ন দেখিয়া রাজ্ঞীকে বলিলেন "ভদ্রে, কৌশাম্বীতে পরন্তপ রাজা মৃত হইয়াছেন।" দেবী বলিলেন 'আর্য্য, এরূপ কেন বলিতেছেন, ঐ রাজার সহিত কি আপনার শত্রুতা আছে?' 'না ভদ্রে, নক্ষত্র-পীড়ন দেখিয়া এরূপ বলিতেছি।' ইহা শুনিয়া দেবী রোদন করিতে লাগিলেন। তাপস তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন দেবীর স্বামী পরন্তপ রাজা। দেবী বলিলেন 'আর্য্য, আমার পুত্র রাজকুলের অনুরূপ। সে যদি তথায় থাকিত তবে শ্বেতছত্র ধারণ করিত অর্থাৎ রাজা হইত।' তাপস বলিলেন 'ভদ্রে, তুমি চিন্তা করিও না, সে যদি রাজ্য চায়, তবে যাহাতে তাহা পায় তাহা আমি করিব।'

অনন্তর তাপস উদয়নকে হস্তীকান্ত বীণা এবং হস্তী-কান্ত মন্ত্র দিলেন। সেইকালে অনেক সহস্র হস্তী আসিয়া বটবৃক্ষমূলে থাকিত। তাপস উদয়নকে বলিয়া দিলেন যে হস্তীরা আসিবার পূর্ব্বে তুমি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া থাকিবে। পরে হস্তীযূথ আসিলে বীণা বাজাইয়া যেরূপে তাহাদের তাড়াইতে ও ডাকিতে হয়, তাহা বলিয়া দিলেন। কুমার তিন দিনে বীণার তিনপ্রকার গুণ পরীক্ষা করিয়া তাহার ব্যবহার শিক্ষা করিলেন।

অনন্তর তাপস দেবীকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমার পুত্রকে সমস্ত বলিয়া দাও, সে এখান হইতে যাইয়া রাজা হউক।" তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন "বৎস, তুমি কৌশাম্বীর পরন্তপ রাজার পুত্র। আমাকে হস্তীলিঙ্গ পক্ষী এখানে আনিয়াছে।" পরে সেনাপতি প্রভৃতির নাম বলিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে তাহারা তোমার কথায় বিশ্বাস না করিলে পিতার এই বিছাইবার কম্বল এবং অঙ্গুরী-মুদ্রা দেখাইবে। কুমার তাপসকে জিজ্ঞা-সিলেন "অতঃপর কি কর্ত্তব্য?" তাপস বলিলেন—"বীণার এই তন্ত্রী প্রহার করিলে যখন যূথপতি হস্তী পৃষ্ঠ অবনত করিয়া আসিবে তখন তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বীয় রাজ্যে যাইয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে।"

কুমার মাতা পিতাকে বন্দনা করিয়া পরে বীণা বাদনের দ্বারা সমাগত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হস্তীর কর্ণে বলিয়া দিলেন যে "আমি কৌশাম্বীর পরন্তপ রাজার পুত্র; হে স্বামিন্, আমাকে সেই রাজ্য পাওয়াইয়া দিউন।" হস্তী তাহা শুনিয়া যাহাতে অনেক সহস্র হস্তী একত্র মিলিত হয়, এরূপ হস্তীরব করিল। পরে 'বৃদ্ধ হস্তীরা যাউক' এবং 'অতি তরুণেরা যাউক' এইরূপ রব করিল। তাহারা সব নিবর্ত্তিত হইলে কুমার সহস্র যুদ্ধহস্তীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া কৌশাম্বী রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামে উপনীত হইলেন।

তথায় প্রচার করিলেন যে 'আমি রাজার পুত্র, যাহারা সম্পত্তি চাও তাহারা আমার সহিত আইস।' এইরূপে লোক সংগ্রহ করিয়া নগর ঘিরিয়া আদেশ পাঠাইলেন যে 'হয় যুদ্ধ দাও নয় নগর দাও।' নাগরিকেরা বলিল 'আমরা দুয়ের একটিও দিব না। আমাদের গর্ভবতী দেবী হস্তীলিঙ্গ পক্ষীর দ্বারা নীত হইয়াছেন। তাঁহার অস্তিভাব বা নাস্তিভাবের বিষয় যাবৎকাল না জানিতে পারিব তাবৎকাল যুদ্ধ বা রাজ্য কিছুই দিব না।' সেই রাজ্য তখন রাজশূন্য ছিল। কুমার আত্মপরিচয় এবং কম্বল ও মুদ্রা দেখাইয়া সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করাতে, নাগরিকেরা নগরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে আনয়ন পূর্ব্বক রাজ্যে স্থাপন করিল।

ইহাই উদয়ন রাজার উৎপত্তি।

স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য।

আফ্রিকার বামন মানব

Scribner's Magazine-এ শ্রীযুত হেনরী ম, ষ্টানলি আফ্রিকার বামন মানবদের সম্বন্ধে একটী কৌতূহলোদ্দীপক

প্রবন্ধ লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে তাঁহার প্রবন্ধের সার সংকলন করিয়া দিলাম—

আমি আফ্রিকা মহাদেশের সমস্ত পর্ব্বত, মরুভূমি, বন প্রভৃতিতে বহু বৎসর ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহা আমার 'In Darkest Africa' নামক পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছি। আফ্রিকার জঙ্গলের বামন মানবদের সম্বন্ধে আমার মনে সাধারণতঃ কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হইত। বামন মানব প্রকৃত মনুষ্য-শ্রেণী-ভুক্ত কিনা? মানুষের মত তাহাদের যুক্তি-তর্ক ও চিন্তাশক্তি আছে কি না? তাহারা যাহা দেখে তাহা প্রকাশ করিতে পারে কি না? আমার অভিজ্ঞতার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে বামন মানবদের সহিত আমাদের বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। আমরা যেমন ভাষার সাহায্যে কথা বলি এবং তাহাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছি, তাহাদের অস্পষ্ট ভাষা যদি আমরা বুঝিতাম তবে হয়ত শুনিতে পাইতাম তাহারাও প্রশ্ন করিতেছে, মানুষ আমাদের মত কথা কহিতে পারে কি না? ডারউইন সাহেব যাহাই বলুন না কেন, এ কথার কোনো প্রকৃষ্ট প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নাই যে মানুষ কোনো দিন অন্য জন্তু ছিল। আবহমান কাল হইতে মানুষ মানুষই রহিয়াছে এবং মানুষের সহিত অন্য সমস্ত জীবের একটা বিশেষ পার্থক্য আমরা চিরদিনই দেখিতে পাইতেছি। পুরাকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেন এবং গাছের ছাল পরিধান করিতেন তখনও তাঁহাদের সহিত অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবের একটা পার্থক্য ছিল। বুদ্ধিবৃত্তির সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে বামন-মানবদের বুদ্ধি আমাদের চেয়ে কম নয় অথচ তাহারা যুগযুগান্তর হইতে একই ভাবে রহিয়াছে কেন? পাখী ও মৌমাছি যেমন বাসা নির্ম্মাণ করে, পিপীলিকা যেমন উপনিবেশ স্থাপন করে, তেমনি ইহারা হেরোডোটাসের এথেন্স ভ্রমণের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৪৫ বৎসর হইতে একই ভাবে বাস করিতেছে। আটাশ কি উনত্রিশ শতাব্দী পূর্ব্বে ইহারা (Albert Lake) আল্‌বার্ট হ্রদের চতুর্দ্দিকে বাস করিত ইহার প্রমাণ আছে। পরিবর্ত্তন প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু তিন হাজার বৎসরেও এই বামন

বন্দী বামন।

মানবদের কোনোই পরিবর্ত্তন হইল না। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

বামন মানবদের আবিষ্কারের জন্য আমরা হেরোডোটাস ও এণ্ড্রু ব্যাট্টেলের নিকট ঋণী। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমি প্রথম একটী বামন মানবের সাক্ষাৎ পাই কিন্তু তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ ঘটে না। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এমিন পাশাকে মুক্ত করিবার জন্য সসৈন্যে আফ্রিকার বনপ্রদেশের মধ্য দিয়া যাইবার সময় আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন বিভিন্ন বয়সের বামনকে ধরিয়া আনিয়াছিলাম। আমি ১৭০০ শত মাইল বনপথ অতিক্রম করিয়াছি। বামন মানবদের প্রদেশটী ইতুরিয়ো এবং ইতুরি নদীর মাঝখানে ত্রিশ হাজার মাইল স্থান বিস্তৃত। আমি এই অভিযানের সময় আমার কয়েদীদের নিকট হইতে অনেক বিষয় জানিয়াছি এবং অনেক বামনদের গ্রাম দেখিয়াছি। একখানি গ্রাম অতিক্রম করিতে দেড় ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না।

বাস আছে। বামন মানবদের চেয়ে তাহারা সাধারণতঃ উচ্চ, বলিষ্ঠ ও সুন্দর। শরীর শোভনের জন্য ইহারা মানুষের দাঁত, বানরের হাড় প্রভৃতি দ্বারা মালা গাঁথিয়া গলায় পরে। সাধারণ মানুষের মত বামন মানবদের উচ্চতা বিভিন্ন প্রকারের। মোটামুটি ৪ ফুট্ ২ ইঞ্চি হইবে। কতকগুলি আমরা মাপিয়া দেখিয়াছি মাত্র ৩৩ ইঞ্চি লম্বা। তিন চারিটি সন্তান প্রসব করিয়াছে এমন

সাধারণ মানব ও বামন।

স্ত্রীলোককেও প্রথম দেখিয়া বালিকা বলিয়া ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক।

আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে বামন যোদ্ধাদের খুব বড় দাড়ি থাকে কিন্তু অনেক অনুসন্ধানে একজনের মাত্র অল্প দাড়ি আছে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহাদের শরীরের চামড়া এত শিথিল যে সহজেই আঙ্গুল দ্বারা ধরা যায়।

অস্ত্র শস্ত্র, গহনা পত্র প্রভৃতি ইহারা নিজেরা কিছুই প্রস্তুত করিতে পারে না। বনের বাহিরে যে কৃষক সম্প্রদায় আছে তাহাদের নিকট হইতে অন্য জিনিস পরিবর্ত্তন করিয়া অথবা চুরি করিয়া আনে। মধু, বন্য পশুর মাংস, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পাখীর পালক প্রভৃতিই পরিবর্ত্তনের প্রধান জিনিস। অন্য মাংসের যখন প্রাচুর্য্য না থাকে তখন ইহারা গর্ত্ত খুঁড়িয়া হাতী বা বন্য মহিষ শিকার করে এবং তাহার মাংস ও হাড় বিনিময়ে কৃষকদের নিকট হইতে তীর, ধনুক, লোহার অলঙ্কার প্রভৃতি আনয়ন করে। চামড়ার কোমর-

বামনের হাতী শিকার।

বন্ধনি, তূণীর, শিকার করিবার ছোরা রাখার থলি প্রভৃতি জিনিসও সময় সময় আনা হয়। কাঁচা কলা, পাকা কলা

বা কলার মদ্যও ইহারা অল্প আদর করে না। কোনো কারণে অবসাদ বোধ করিলে সেই মদ্য পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করে। এ মদ্য তাহাদের বিলাসিতার সামগ্রী। যে গর্ত্তগুলি দ্বারা বন্য পশু শিকার করে সেগুলি গাছের ছাল, ঘাস ও মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয় এবং জন্তুগণ ভুল করিয়া তাহাতে বন্দী হয়। তাহারা নানাবিধ বন্য ফল আহার করে। তাহার মধ্যে কতকগুলি এমন সুমিষ্ট ও উপাদেয় যে পৃথিবীর যে কোনো সভ্য জাতি তাহা আদর করিয়া খাইতে পারে। আবার এমন বিষাক্ত ফল আহার করিতে তাহারা অভ্যস্থ যে অন্য কোনো সভ্য মানুষের পাকস্থলীতে তাহা প্রবেশ করিলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। মাংস আগুনে অল্প সেঁকিয়াই আহার করে। রান্নাকরার জন্য আমরা আগুন, জল ও পাত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি তাহাতেও তাহারা রান্না করিতে চাহে না। ইহার কারণ, হয় তাহারা রান্না করিতে জানে না অথবা কাঁচাই সুখাদ্য মনে করে। বামন মানবদের পক্ষে আমাদের মাংস আহার করা আশ্চর্য্য নয়। আমরা দেখিয়াছি অনেক মৃতদেহ ইহারা কবর খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে, আমাদের দলের লোক হত্যা করিয়া সেই দেহগুলি লইয়া ইহারা পলায়ন করিয়াছে। আর একদিন দেখিয়াছি কতকগুলি বামন একটী আহত স্ত্রীলোককে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে এবং তাহার চারিদিকে আগুন জ্বালানো হইয়াছে। প্রত্যেক বামনের হাতে একএকটী পাত্র। তাহাদের বসিবার কায়দা দেখিলেই বোঝা যায় যে সেই স্ত্রীলোকটীর মাংস আহার করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। আমাদের কয়েদী-দের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিয়াছে যে তাহারা নিজেরা আহার করে না তবে তাহাদের প্রতিবেশীরা নর-মাংস আহার করে।

বামনরা চাষ করে না বা কোনো জিনিসই উৎপন্ন করে না। বনের বাহিরের কৃষক সম্প্রদায় তামাক, কলা, প্রভৃতির চাষ করে এবং তাহা চুরি করিয়াই বামন মানবরা নিজেদের অভাব মোচন করে। ইহাদের অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে বর্শা, তীরধনু ও ছোরা। ধনুক খানার উভয়-দিক রেশমের ফুল দ্বারা সাজানো এবং মাঝখানে একটুকরা বানরের লেজ বান্ধা। এই লেজটুকু ধনুকটীকে শক্ত করিবার জন্য ব্যবহার করে। তীরগুলি দৈর্ঘ্যে ১৮ইঞ্চি পরিমাণ হইবে। সাধারণতঃ ইহারা তীরের মাথায় বিষ মাখাইয়া ব্যবহার করে। ইহাদের গ্রেপ্তার করিবার সময় সাবধান হইয়া ইহাদের স্পর্শ করিতে হয়, কারণ শুকনা বিষগুলিও ভয়ানক। কাঁচা বিষগুলি এমন ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক যে তাহাতে মরার চেয়ে অন্য যে কোনো রকমে মৃত্যু মানুষ আদর করিতে পারে। এই বিষ প্রয়োগের ঘটনা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের সহিত একটী ক্ষুদ্র সংঘর্ষে আমাদের কয়েক জন সৈন্য সামান্য আঘাত পায়। আমরা সে সামান্য আঘাতকেও তুচ্ছ না করিয়া পচননিবারক ঔষধ ব্যবহার করিলাম কিন্তু তাহাতেও সে হতভাগ্যদের বাঁচাইতে পারিলাম না। যদি বিষাক্ত তীর না হইত তবে সে আঘাতে কোনো ঔষধেরই আবশ্যক করিত না। আহতদের মধ্যে কয়েকজন ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মরিল, কতকের আহত স্থান পচিয়া গেল এবং যাহারা বাঁচিল তাহাদেরও রক্ত এমন দূষিত হইল যে তাহাদের জীবন ভার বোধ হইত।

এই বিষের প্রতিকারক ঔষধ আমরা এক বৎসরের মধ্যে বাহির করিতে পারি নাই। বহু পরীক্ষার পর আমরা আহত স্থানের সন্নিকটে (Ammon Carb) এমন কার্ব্ব প্রবেশ (inject) করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। ইহাদের কালা-বিষ যাহা হইতে প্রস্তুত হয় ডাক্তার ফ্রেজার তাহা হইতে (Stropanthin) ষ্ট্রোপ্যান্থিন্ নামক একটী ঔষধ বাহির করিয়াছেন। ইহার $\frac{১}{১০}$ গ্রেন মাত্র ব্যবহারে একটী ভেকের মৃত্যু হয়।

বামন মানবরা দুই ভাগে বিভক্ত। একদলের রং একটু লালচে। অন্য দল ভয়ানক কালো। উভয় দলেরই কপাল ছোট ও ঠোঁট বড়। হাতগুলি ছোট ও চিকণ, পাগুলি বাঁকা। তবু অনেকের চেহারা বড়ই সুন্দর। একটী ৩৩ ইঞ্চি লম্বা স্ত্রীলোককে আমি বড়ই সুন্দর দেখিয়া-ছিলাম। তাহার সলজ্জ চাহনি মনকে মোহিত করে এবং তাহাকে দেখিলে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়।

বামনদের রাণীর অর্থাৎ নেতার স্ত্রীর রূপ বর্ণনা করিবার উপযুক্ত। তাহার শরীরের রংটী অতি উজ্জ্বল

এবং তাহার গায় কোনো বিশেষ অলঙ্কার ছিল না, কেবল কয়েকগাছি লোহার বালা, চিক ও নাকে নথ ছিল। ছোট ছোট কালো চুলগুলি একপ্রকার তেল দ্বারা ভিজানো। তাহাতে মুখের সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়াছে। সে খুব শান্তশিষ্ট এবং তাহাকে যে কাজে দেওয়া হইয়াছিল অতি মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সহিত তাহা সম্পন্ন করিয়াছিল।

বামন মানবরা যে বহুশতাব্দী হইতে একই অবস্থায় আছে তাহার কারণ বোধ হয় সভ্য মানবদের সহিত সংযোগের অভাব। শিক্ষা দিলে ইহারাও সভ্য য়ুরোপ ও আমেরিকাবাসীর ন্যায় হইতে পারে। একজন ৪০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক আমাদের দলে থাকিয়া এমন চমৎকার কাজ অভ্যাস করিয়াছিল যে য়ুরোপের কোনো প্রথম শ্রেণীর বাবুর্চ্চিও তাহা পারে না। সে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোনো জিনিসই হাত না ধুইয়া ছুঁইত না। তাহার একমাত্র দোষ ছিল সে একটু অধিক কথা কহিত এবং তাহার জিহ্বাখানা একটু কর্কশ। সে জিব্‌কে সামলাইতে চেষ্টা করিত কিন্তু পারিত না। অবশ্য কোনো খারাপ কথা সে কহিত না বরং তাহার কথায় বেশ রহস্য ছিল।

একটী অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক বালক আমাদের কয়েদীদের মধ্যে ছিল। সে বড় অল্পভাষী। দিবারাত্র মনোযোগ দিয়া সে স্বধু কাজ করিত। কেহ কোনো প্রশ্ন করিলে সে লজ্জায় মরিয়া যাইত। কেহ কোনো অত্যাচার করিলেও সে নীরবে তাহা সহ্য করিত।

মোট কথা আমরা উপরোক্তরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে পারি যে এই অসভ্য জঙ্গলবাসী বামন মানবগুলি শিক্ষা পাইলে অতি অল্প দিনের মধ্যে সভ্য সমাজের উপযুক্ত হইতে পারে। যদিও তাহারা নিজেদের অভাবপূরণের জন্য কিছুই করিতে পারে না, এমন কি একটা মাটির পাত্র, বা গাছের ছাল হইতে একখানি কাপড়ও প্রস্তুত করিতে পারে না, তবুও তাহাদের মানুষেরই মত চিত্তবৃত্তি আছে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহারা অতি সহজে ভালবাসিতে পারে এবং ভালবাসা আদায়ও করিতে পারে। ইহারা সাহসী ও অধ্যবসায়ী। বনের মধ্যে থাকিতে সিংহ বা ব্যাঘ্রকেও ভয় করে না এবং চাতুরীতে শিম্পাঞ্জিকেও ইহাদের কাছে হার মানিতে হয়। ইহারা নানাবিধ বৃক্ষ লতা মানবশরীরে কি কাজ করে তাহা জানে এবং আবশ্যকমত ব্যবহারও করে।

আমরা অনেক দৃষ্টান্ত জানি যে য়ুরোপীয়গণ বন্য মহিষ বা হাতীদ্বারা হত হইয়াছেন। Gamble Keys, Captain Deane, Guy Dawny প্রভৃতি বিখ্যাত ভ্রমণকারীরা বন্য জন্তুদের দ্বারাই হত হইয়াছেন, কিন্তু এই ক্ষুদ্র অসভ্য মানুষগুলি অতি সহজে এই ভীষণ জন্তুগুলিকে হত্যা করিতে সক্ষম।

বামনদের গ্রাম।

বামন মানবদের গ্রামগুলি বড় বড় গাছের তলায় অবস্থিত। আমি একটী গ্রাম দেখিয়াছি, সেখানে ৯৬ ঘর বামনের বাস। সে ক্ষুদ্র গৃহগুলি খুব পরিষ্কার। হাঁটা চলা করিতে করিতে যে রাস্তা হইয়াছে তাহা স্থানে স্থানে প্রস্থে ৫।৬ ফুটও হইবে। যে রাস্তা যত অধিক প্রস্থে

সাধারণতঃ সেই গ্রামেই লোকবসতি অধিক। ঘরে দুই দিকে দরজা থাকে। দরজাগুলি তিন ফুটের অধিক উচ্চ নয়। কেহ আক্রমণ করিলে পলায়ন করিবার জন্য গুপ্ত দরজা আছে। ঘরগুলি বৃত্তাকারে স্থাপিত এবং বৃত্তের মাঝখানে রাজা বা নেতার বাস। রাজাকে পাহারা দেওয়া সকলের একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে। ঘরগুলি উচ্চে ৪ ফুট, দৈর্ঘ্যে ৮।১০ ফুট এবং প্রস্থে ৬।৭ ফুটের অধিক হয় না। বড় বড় কতকগুলি গাছের পাতাই উত্তম বিছানা।

রাত্রি প্রভাত হইলে প্রায় সকলেই আহার্য্য সংগ্রহের জন্য বাহির হয়। পূর্ব্বদিনের পাতা ফাঁদ, গর্ত্ত প্রভৃতির অনুসন্ধান করাই প্রথম কার্য্য। অবশিষ্ট যাহারা থাকে, গ্রাম পাহারার ভার তাহাদেরই উপর। কোনো কোনো গাছের পাতা হাতে মুড়িয়া ইহারা চুরুটের মত ব্যবহার করে।

এই বামন মানবদের সহিত বাহিরের কৃষকদের মাঝে মাঝে ভীষণ সংঘর্ষ হয়। কারণ, ইহারা তাহাদের জিনিস রাত্রে চুরী করে। ইহাদের মধ্যে কোনো নৈতিক নিয়ম না থাকায় চুরি করার বড় সুবিধা। কোনো জিনিস পছন্দ হইলেই ইহারা লইয়া পলায়ন করে। এইজন্য কৃষকগণ মনে করে, এ জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইলেই পৃথিবীর মঙ্গল। বামনগুলি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত না থাকিলে অনেকগুলি মিলিয়াও কৃষকদের একজনের সহিত পারিয়া ওঠেনা। কিন্তু অস্ত্র হাতে থাকিলে একজনেও সমান অস্ত্রধারীর সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম। আমাদের দলের অনেক সাহসী সৈন্য রাইফেল বন্দুক লইয়াও ইহাদের সহিত পারিয়া উঠে নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ৫।৬টী বিষাক্ত তীরে বিদ্ধ হইয়া তাম্বুতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বামনরা সর্ব্বদাই সতর্ক থাকে। আমাদের দলের লোকগুলি সম্মুখে কাহাকেও না দেখিলেই অসতর্ক হয়, এবং কোথা হইতে সেই সময় অদৃশ্য ভাবে তীর আসিয়া গায়ে বিদ্ধ হইয়া তাহার সমস্ত উৎসাহের অবসান করিয়া দেয়।

বামন মানবদের শরীরে একপ্রকার দুর্গন্ধ আছে, তাহা দ্বারাই দূর হইতে তাহাদের অস্তিত্ব বা আগমন টের পাওয়া যায়।

কত শতাব্দী হইতে ইহারা এই জঙ্গলে বাস করিতেছে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। হিসাবে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে খ্রীষ্টের জন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে Rameses যখন নিউবিয়া দেশ জয় করেন সেই সময় হইতে অর্থাৎ আজ ৩৫ শতাব্দী ধরিয়া ইহারা এখানে বাস করিতেছে। তাহারা এতদিন অসভ্য, বর্ব্বর থাকিলেও যখন এত শতাব্দীতে পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই তখন আশা করা যায় ভবিষ্যতে ইহারা সভ্যমানবশ্রেণীভুক্ত হইবে। আফ্রিকায় বনের মধ্য দিয়া যে রেলপথ গিয়াছে এবং তাহাতে তাহারা যে সভ্যমানবের সংস্পর্শে আসিতেছে ইহাই আমার অনুমান সাফল্যের পূর্ব্বসূচনা।

সুশীলা।

ভাগ্যচক্র

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ঘণ্টাখানেক পরেই দেখা গেল বার্টি ঘরের মধ্যে একেলা অধীরভাবে পদচারণা করিতেছে। সে এমনি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে ঝটিকাসঙ্কুল সমুদ্রে নৌকা যেমন করিয়া কেবলই উঠে ও পড়ে তেমনি করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডটা কেবলই উঠিতে ও পড়িতেছিল। তাহার মুখের সে কোমলতা আর নাই—কী একটা জঘন্য হিংস্রতায় সে মুখখানা ভরিয়া উঠিয়াছে। খাঁচার সিংহের মত সে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আস্ফালন ও গর্জ্জন করিতে লাগিল।—সে কি ইহারই জন্য এতদিন ধরিয়া এত কৌশল, এত পরিশ্রম, এত শক্তি অপব্যয় করিয়াছে! একখানি মাত্র চিঠি, তাহার গুটিকয়েক লাইনে প্রেমের কোমল সম্ভাষণ, তাহাতেই সমস্ত পণ্ড! না, না, কখনোই না—সহস্রবার না! ভাবিতে ভাবিতে চোখের সামনে দিগন্ত-রেখায় ভবিষ্যতের একটা ছবি ফুটিয়া উঠিল। সে চিত্রটা কী ভয়ঙ্কর! তাহার মধ্যে মৃত্যুর সে কী ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, সম্মুখে দারিদ্রের কী ভয়াবহ শুষ্ক মরুভূমি! উঃ! তাহারই মধ্যে সে নিক্ষিপ্ত হইবে! ভয়ের উত্তেজনায় তাহার দেহের সমস্ত শিথিল শিরাগুলা রক্তপ্রবাহে স্ফীত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে জোরের সহিত বলিল—না, কখনোই না;—সমস্ত বাধা জয় করিতেই হইবে।

অন্ধকার আকাশের গায়ে সর্পগতিতে যেমন বিদ্যুৎ

খেলিয়া যায় তেমনি করিয়া তাহার মাথার ভিতর একটা মতলব হঠাৎ খেলিয়া উঠিল। হাঁ, এই একমাত্র উপায় বটে! ইহাই সব চেয়ে সহজ ও সরল পথ;—হোক তাহা জঘন্য। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া আর কোনো ফল নাই;—এখন চাই কাজ—শুধু কাজ!

আর তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া বার্টি তখনই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। যে কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছে তার জন্য তাহার নিজের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সে ঘৃণাকে সে কিছুতেই আমল দিতে চাহিল না।

তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি ডাকিয়া ইভাদের বাড়ীর ঠিকানায় যাইতে বলিল। বলিতে গিয়া নিজের গলার করুণ কোমল স্বর শুনিয়া সে নিজেই চমকিয়া হাসিয়া উঠিল—সে স্বর তো তাহার স্বাভাবিক স্বর নয়, সে যেন নাট্যশালার বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা অভিনেতার বহু যত্নে শেখা কণ্ঠস্বর! সে তাড়াতাড়ি গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা কোণ ঘেঁসিয়া বসিল—কাঁধ দুটা কান পর্য্যন্ত তুলিয়া দিয়া অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে বাহিরের অন্ধকারের কুহেলিকার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল;—তাহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে একটা বিষাদ ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল!

ইভাদের বাড়ীর কাছাকাছি হইলে সে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল, এবং কিছুদূর পদব্রজে গিয়া বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিল। অনেকক্ষণ কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সেই রুদ্ধ দরজার বাহিরে নিস্তব্ধ অন্ধকারে অপেক্ষা করিতে করিতে তাহার মনে হইতে লাগিল সে যেন অনন্তকাল হইতে একটা কুহেলিকাচ্ছন্ন দারুণ হতাশার বিষণ্ণতার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। কোথায় তাহার শেষ, কি তাহার পরিণাম কে জানে! চারিদিক নিস্তব্ধ—কেহ কোথাও নাই, অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ে না;—তাহার মনে হইতে লাগিল এ বিশাল জগৎসংসারের মধ্যে সে যেন আজ একা! তাহার সমস্ত মনের চিন্তা সেই একারই উপর তখন কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িল;—কেবলই নিজের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজের উপর একটা ঘোর ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় চিত্ত ভরিয়া উঠিল; সে বেশ বুঝিতে পারিল তাহার অন্তরের মধ্যে যে পাপ ও কুটিলতা প্রচ্ছন্ন আছে তাহা সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া তাহাকে কী নির্ম্মমভাবে বার বার আঘাত করিতেছে।

এক ভৃত্য আসিয়া কবাট খুলিল। এত রাত্রে আগন্তুক দেখিয়া সে বিস্মিত নয়নে চাহিল। তারপর যখন দেখিল বার্টি একেলা, সঙ্গে ফ্র্যাঙ্ক নাই, তখন সে বিরক্তির সহিত নিতান্ত উদ্ধতভাবে বার্টির পানে আর একবার চাহিল, এবং কোনরূপ নম্রতা না দেখাইয়া বেগারঠেলা গোছের একটা অভিবাদন করিয়া বার্টিকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবার জন্য দরজাটা খুলিয়া দিল।

বার্টি বলিল—"না! তোমারই সঙ্গে কথা আছে।"

ভৃত্য অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

বার্টি বলিল—"তোমাকে একটা উপকার করতে হবে—তোমার সাহায্য না হ'লে চলচে না! গোপনে দুটো কথা শোনবার কি অবসর আছে?"

ভৃত্য বলিল—"এখন?"

বার্টি বলিল—"হাঁ, এখনই!"

ভৃত্য উচ্চকণ্ঠে বলিল—"তবে আসুন আমার ঘরে।"

বার্টি সে উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—"চুপ! চুপ!" তারপর বলিল—"না, সে হবে না। তুমিই বাইরে এস।"

ভৃত্য বলিল—"এখন তো বাইরে যেতে পারব না—এখন যে আমার প্রভুর শয়নের সময়!"

বার্টি বলিল—"আচ্ছা বেশ, আমি অপেক্ষা করচি—বাগানের রেলিঙের ধারে থাকবো—তুমি ঠিক এসো, বুঝলে। ভয় নেই আমি তোমায় খুসী করব!"

শেষের কথাটা শুনিয়া ভৃত্য উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল,—বাড়ীর নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে সে হাসির একটা ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল, বার্টি তাহা শুনিয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল!

ভৃত্য বলিল—"তাহ'লে মশায় এখন বড়লোক!"

বার্টি জড়িতকণ্ঠে কহিল—"হাঁ—হাঁ! ঠিক এস!"

ভৃত্য উৎসাহিত হইয়া বলিল—"তবে রীতিমত দক্ষিণা চাই!"

বার্টি বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে এখন। তুমি যত শীঘ্র পার এস।"

আবার দরজা বন্ধ হইল। বার্টি বাহিরে অনেক ক্ষণ ধরিয়া অন্ধকারে ও শীতে পদচারণা করিতে লাগিল। ঠাণ্ডায় তাহার দাঁতে দাঁত লাগিয়া যাইতেছিল। কুয়াসার ভিতর হইতে প্রেতের চোখের মতো রাস্তার বাতির আলোগুলা তাহার দিকে কী ভীষণভাবে চাহিতেছে! সে বিমর্ষভাবে আশ্রয়হীন ভিক্ষুকের মতো শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে এধার ওধার বেড়াইতে লাগিল,—এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল কাহারো দেখা নাই। তখনও সে অধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিল। নিজের প্রতি একটা দারুণ ঘৃণায় তাহার চক্ষু দুটা তখন একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গেছে; অন্ধকারের মধ্য হইতে সাদা মুখখানা বাহির করিয়া সে সেই কালো কালো বন্ধ কবাট দুখানার পানে অধীর হইয়া চাহিয়া রহিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কয়েক দিন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিয়া ফ্র্যাঙ্ক যখন ইভার নিকট হইতে তাঁহার পত্রের কোনো উত্তর পাইলেন না তখন তিনি আবার একখানি পত্র দিলেন। প্রথম পত্রের উত্তর না পাইয়া যদিও তিনি একরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন তবুও বাড়ীর সদর দরজায় কাহারো পদশব্দ শুনিলে অমনি ছুটিয়া যাইতেন, মনে করিতেন, ঐ বুঝি ইভার চিঠি আসিল। তখন তাঁহার মনে আর কোনো চিন্তা ছিল না, কেবল চিঠির কথাই ভাবিতেন;—একখানি খামের ভিতর তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখশান্তি বহন করিয়া এক পত্রবাহক পথ হাঁটিয়া আসিতেছে, কল্পনায় এই চিত্র কেবলই জাগিয়া উঠিত। তিনি যেন চোখের সামনে দেখিতেন চকচকে কাগজের উপর মোটা মোটা ছাঁদে গুটিকয়েক লাইন, নীচে ইভার নাম সই! বেশি কথা নাই, শুধু আছে প্রেমের আহ্বান, সঙ্গীতের সুরে বাঁধা দুটিমাত্র কথা!

কই এখনো সে চিঠি আসেনা কেন? কিসের বিলম্ব? তবে কি তাহার অভিমান এখনো দূর হয় নাই? না, কি বলিয়া কেমন করিয়া গুছাইয়া লিখিবে তাহা স্থির হয় নাই বলিয়া চিঠি লেখা হইয়া উঠিতেছে না? হয়ত সে ইহার মধ্যে কতবার লিখিয়াছে, মনের মতন হয় নাই বলিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে! এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। ফ্র্যাঙ্ক যখন বাড়ী বসিয়া থাকিতেন তখন প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে হইত ঐ পত্রবাহক আসিতেছে, ঐ যে চারখানা বাড়ী আগে। এই তিনখানা, দুখানা, এইবার একখানা বাড়ীর আগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এই এইবার এ বাড়ী—এই বুঝি দরজায় ধাক্কা দিল, কিন্তু কৈ কাহারো কোনো সাড়া নাই! যখন তিনি বাহির হইতেন তখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না, কেবলই মনে হইত এতক্ষণে নিশ্চয়ই চিঠি বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া আছে। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিতেন, কিন্তু চিঠির কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইতেন না। যেখানটায় চিঠির সন্ধান করিতেন সেখানটা শূন্য দেখিয়া তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা শূন্য বোধ হইত!

দুই দুই খানা চিঠি দুই দুইবার তিনি লিখিলেন, তবুও কোনো জবাব আসেনা! কেন? ইহার তো কোনো কারণ নাই। মন যে কেবলই এই কথা বলিতেছে—আসিবে, আসিবে, এখনই আসিবে—ওগো অপেক্ষা কর, ধৈর্য্য ধর! তাঁহার তখন বোধ হইত সমস্ত জীবনটা শুধু একখানি চিঠির অপেক্ষায় যেন শূন্য ও নীরস হইয়া আছে, সে চিঠি পাইলেই আবার তাহা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিবে। কিন্তু দিনের পর দিন গেল, তবুও কোনো চিঠি আসিল না!

তখন একদিন ফ্র্যাঙ্ক বার্টির কাছে আসিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"ইভার কাছ থেকে এখনো কোনো উত্তর পেলুম না; কেন বল দেখি বার্টি?" ফ্র্যাঙ্কের এ কথার মধ্যে দুঃখের সহিত একটা সঙ্কোচও ছিল; ইভা তাচ্ছিল্য করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন নাই এই অপমানের কথা কাহারো কাছে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা তো হইবেই।

বার্টি চোখ দুটা কপালের দিকে তুলিয়া বলিল—"অ্যাঁ এখনও উত্তর পাওনি?"

বন্ধুর সেই কাতর দৃষ্টি দেখিয়া, আর্ত্তনাদের মতো কণ্ঠস্বর শুনিয়া বার্টির কালো কালো কোমল চোখের উপর একটা করুণ বিষাদের ছায়া জমিয়া উঠিল। সত্যই তাহার বুকের উপর একটা গুরুভার চাপিয়া আছে, সত্যই সে তখন একটা মর্ম্মান্তিক বেদনা বোধ করিতেছে। সে যাহা করিয়াছে তাহা যাহার এতটুকু হৃদয় আছে সে করিতে পারে না।

কিন্তু এ সবই তো ফ্র্যাঙ্কের দোষ! যখন ইভার সহিত একবার বিচ্ছেদ হইয়া গেছে তখন কেন - কেন আবার তাঁহার চিন্তা? রমণী-প্রেমই কি সর্ব্বস্ব? বন্ধুত্বের মধ্যে কি সুখ নাই? সেই সুখটুকু লইয়াই ফ্র্যাঙ্ক কেন তৃপ্ত নন? সে তো ফ্র্যাঙ্কেরই দোষ! সে কী আনন্দ, দুই বন্ধুতে একসঙ্গে বাস, ভ্রাতৃত্বের বেষ্টনে, স্নেহের বন্ধনে, হর্ষ শোকের সহানুভূতির আকর্ষণে এক প্রাণ এক মন—এক বৃন্তে দুটি ফুলের মতো হইয়া থাকা—সে কী পবিত্র আনন্দ! ইহার মধ্যে রমণীর কুটিলতা, স্বার্থের কলুষতা, পার্থিব প্রেমের পঙ্কিলতা নাই;—প্রভাত-পুষ্পের মতো এ প্রেম শুভ্র নির্ম্মল উজ্জ্বল সরল! তিনি ফ্র্যাঙ্ককে এই প্রেমেরই বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে চিরসুখী করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাকে রমণীপ্রেমের কুটিল মোহ হইতে রক্ষা করিতেছেন—বন্ধুর কর্ত্তব্য করিতেছেন; ইহা সাধনের জন্য যদি কোনো অসৎ পথ গ্রহণ করিয়া থাকেন তো সে ধর্ত্তব্যই নহে, কারণ তাহার উদ্দেশ্য মহৎ, তাহার কাজের পরিণাম শুভ!

এই সব কথা বলিয়া বার্টি নিজের মনকে বুঝাইত, এই বলিয়া সে তাহার কৃত গর্হিত কর্ম্মের সমর্থন করিয়া যাইত, বিবেকবুদ্ধির দংশনে যখন অস্থির হইয়া উঠিত তখন এই স্তোক বাক্যেরই প্রলেপ দিয়া জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টা করিত। দিবারাত্রি পাপের পঙ্কিলতার মধ্যে থাকিয়া একটা উচ্চ আদর্শের জন্য যখন তাহার প্রাণে ব্যাকুলতা জাগিত তখন সে ইহাকেই আদর্শ পথ বলিয়া মনকে স্বীকার করাইত!

মনে মনে যদিও সে বার বার জোরের সহিত বলিত—এ ফ্র্যাঙ্কের দোষ, তবুও কিন্তু মন হইতে সন্দেহ উঠিত—সত্যই কি এ ফ্র্যাঙ্কের দোষ! সে ইভাকে ভুলিতে পারেনা, সে কি তাহার দোষ?

না! না! এ দৈবের লীলা! দোষ কাহারো নয়! এ ঘটনাচক্রের খেলা!

বার্টি তখন মনকে বুঝাইত—"হাঁ, এই ঠিক কথা—এ ঘটনা চক্রেরই লীলা! কিন্তু সবই যদি দৈবের খেলা তবে কেন আমাদের এ বুদ্ধি, বিচার-শক্তি? যদি স্বাধীনভাবে কিছু করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই তবে কেন আছে আমাদের ব্যথা বোধ করিবার শক্তি? আমরা তো গাছ কি পাথর হইলেই পারিতাম!"

বার্টি এই সব বিপুল রহস্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইয়া যাইত—হঠাৎ চমক ভাঙিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িত। তাহার এ কী পরিবর্ত্তন! কোথা হইতে সে এসব কথা চিন্তা করিতে শিখিল? আমেরিকায় যখন সে দুমুঠা অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত তখন কি কখনো এসব চিন্তা মনে স্থান পাইয়াছে? সে তখন শুধু বুঝিত খাও, দাও, মজা কর ব্যস্! এখন আরাম ও বিরামের ক্রোড়ে থাকিয়া তাহার দেহের স্নায়ু যেন রেশমের মতো সূক্ষ্ম সুতায় তৈরি হইয়া উঠিতেছে—হাওয়ার মতো সামান্য একটু ভাবের আঘাতে তাহা এখন স্পন্দিত হইয়া উঠে! কোথা হইতে সে শিখিল এ সব তত্ত্বের কথা? সে বিস্মিত হইয়া নিজের বাল্যজীবন অনুসন্ধান করিত—কাহারো শিক্ষায়, কোনো কেতাব হইতে সে কি এসব তত্ত্বের বীজ শিশুকালে সংগ্রহ করিয়াছিল? তা তো নয়!—তবে কোথা হইতে পাইল? পিতা মাতার চরিত্র হইতে? বাল্যকালের কথা, পিতা মাতার কথা ভাবিতে ভাবিতে চোখের সামনে জাগিয়া উঠিত সে কী দৃশ্য! স্নেহবেষ্টিত নীড়ের মধ্যে নির্ভয়ে নির্ভাবনায় উন্মুক্ত আনন্দের জীবন! হায় সে কী সুখের দিন! সে কি সত্যই সুখের দিন, না, দূরের সামগ্রী বলিয়া সুন্দর দেখায়?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আরো কয়েকদিন জীবন্মৃতভাবে অপেক্ষা করিয়া ফ্র্যাঙ্ক যখন ইভার নিকট হইতে কোনো পত্র পাইলেন না তখন তিনি আর্চিবল্ডকে একখানি চিঠি লিখিলেন। কিন্তু তাহারও কোনো উত্তর আসিল না। তখন তাঁহার সমস্ত হৃদয়ের দুঃখ অভিমান উথলিয়া উঠিল—তিনি বার্টির কাছে সাশ্রুনয়নে অনুযোগের সহিত সেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আরো কিছু দিন গেল তখন আর তাঁহার অভিমান রহিলনা, ইভার অসৎ ব্যবহারে তিনি উন্মত্ত পশুর মতো ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিন তিন বার তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পত্র দিয়াছেন—ইহাই সামান্য

ক্রটির পক্ষে কি যথেষ্ট নহে? ইভার অন্তরে যদি এতটুকু ভালোবাসা থাকিত তাহা হইলে তিনি পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবামাত্রই তাঁহার অভিমান রাগ নিমেষের মধ্যে কোথায় ভাসিয়া যাইত! তাঁহার প্রতি এ কী অবিচার! সামান্য একটু ক্রটির কি ক্ষমা নাই!

ফ্র্যাঙ্ক হৃদয়ের আবেগে ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পদচারণা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"আমার ঠিক মনে নেই তাকে তখন কি বলেছিলুম—নিশ্চয় কোনো কঠোর কথা হবে—আমি রাগের মাথায় কাকে যে কখন কি বলি! মনে পড়চে বটে তার হাতখানা ধরে আমার কাছ থেকে তাকে দূর করে ঠেলে দিয়েছিলুম—তার পর চলে আসি। আমি তখন জ্ঞানশূন্য—কি বলেচি, কি করেচি কিছু জানি না। নিশ্চয় অত্যন্ত রূঢ় হয়ে উঠে-ছিলুম—সে আমার উচিত হয়নি—কিন্তু কি করব রাগলে যে আমার জ্ঞান থাকে না!"

বার্টি আরাম কেদারায় শুইয়া শুইয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল—"ফ্র্যাঙ্ক! সে সব কথা ভুলে যাও! এখন আর কোনো চারা নেই—যা হবার হয়ে গেছে, তাই নিয়ে দুঃখ করে কি হবে, সে সব ভুলে যাও!"

"ভুলে যাব! ভুলব? বার্টি! তুমি কি কাউকে কখন ভালোবেসেছ?"

"বেসেচি বইকি!"

"তাহলে তুমি বুঝতে পারবে আমার হৃদয়ের বেদনা কী! কিন্তু তেমন করে তুমি কাউকে কক্‌খনো ভালো-বাসনি—ভালবাসতে পার না—সে তোমার স্বভাবই নয়—তুমি নিজেকে যে সব চেয়ে ভালোবাস!"

"তা হতে পারে—কিন্তু আমি তোমায় ভালোবাসি—তোমার দুঃখ আমার সহ্য হয় না। আমি তো দেখতে পাই না এর কোনো উপায় আছে—তাঁরা ব্যাপারটাকে এম্‌নি গুরুতরভাবে গ্রহণ করেচেন যে তার আর সংশোধন করবার কোনো পথ নেই। কি করবে বল? এ দৈবের বিধান! মানুষের কোনো হাত নেই। এখন সেসব ভুলে যাও—নূতন পথে জীবন ফেরাও—এ সংসারে কি আর রমণী নেই? তুমি পুরুষ মানুষ—এ তোমার কী দুর্ব্বলতা—প্রেমের জন্য জীবনটা খোওয়াবে! নির্ব্বোধ বালিকারাই এম্‌নি করে জানি—তুমি বালিকা নও!"

বার্টি কথা শেষ করিয়া এমনি এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফ্র্যাঙ্কের পানে চাহিল যে ফ্র্যাঙ্কের ক্ষণেকের তরে মনে হইল বার্টি যাহা বলিতেছে তাহা সত্য! কিন্তু পরক্ষণেই ইভার কথা মনে পড়িয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। তিনি বার্টির সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া প্রতিবাদের স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বার্টি! তুমি বুঝচনা—তুমি যে কখনো কোনো রমণীকে ভালবাসনি! কেন আবার আমি ইভাকে ফিরে পাবো না? কী এমন হয়েছে? দুটো রূঢ় কথা বলেচি বই তো নয়! তাতে কি? যে যাকে ভালোবাসে তার দুটো রূঢ় কথা কি সে ক্ষমা করতে পারে না! এ কি এমনি অসম্ভব!"

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল—মনে হইতে লাগিল বাতাসের উপর যেন একটা কী ভয়ঙ্কর গুরুভার চাপিয়াছে! তার পর বার্টি ধীরে ধীরে কোমল কণ্ঠে আরম্ভ করিল—"হাঁ, সম্ভব মনে করতুম যদি একখানা চিঠিতেই সব মিটমাট হয়ে যেত। তিন তিন খানা চিঠি লিখলে—এখন অসম্ভব বই কি!"

ফ্র্যাঙ্ক অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বেশ! তাহলে আমি নিজেই গিয়ে একবার দেখবো!"

বার্টি স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাহার মনে হইতে লাগিল বাতাসের সেই গুরুভারটা যেন তাহার বুকের উপর আসিয়া চাপিয়াছে, সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল, ফ্র্যাঙ্কের কথাটা সে যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না। তাই সে স্বপ্নাবিষ্টের মতো জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বল্লে?"

—"আমি নিজে গিয়ে একবার দেখবো!"

—"কোথায় যাবে?"

—"আরে, ইভাদের বাড়ী! তুমি কি কালা হলে না কি!"

বার্টি চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহার চোখ দুটা দীপ্ত অঙ্গারের মতো জ্বলিতে লাগিল! হৃদয়ের উদ্বেগ প্রাণপণে চাপিয়া রাখিয়া সে ধীরকণ্ঠে কহিল—"সেখানে কসের জন্যে যাবে?"

কত লতাপা। হইতে হইয়া এর জন্যে ...

"একটা মিটমাট্ করে ফেলতে।"

বার্টি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল---"একেবারে কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হয়েছ?"

"কেন?"

"কেন? তোমার কি এতটুকু আত্মসম্মান বোধ নেই? তুমি সেই বাড়িতে যাবে?"

"যাবো বই কি!"

"সে কী অপমান!"

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"যাই তুমি বল—আমি যাবো। আমার যে আত্মসম্মান জ্ঞান নেই, আমি যে বুঝচিনা যে সেখানে যাওয়ায় আমার অপমান, তা নয়। কিন্তু কি করব আমি আর এ দুঃখ বহন করতে পারি না—আমি যে তাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি। আমি সে কী আনন্দে ছিলাম, আমার জীবনে সে কি মাধুর্য্যই ছিল, নিজের দোষে সব হারালুম! তুমি যাই বল বার্টি, আমি সেখানে না গিয়ে পারবনা।"

বলিতে বলিতে ফ্র্যাঙ্ক দুঃখাবেগে অধীর হইয়া বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখের সূক্ষ্ম শিরাগুলি পর্য্যন্তও উদ্বেগে স্পন্দিত হইতেছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমার প্রাণ যে এ কী হচ্ছে তা আমি নিজেই বুঝতে পারচিনা—আমি নিতান্তই হতভাগ্য! আমি জীবনের মধ্যে কখনো তেমন পরিপূর্ণ আনন্দ, তেমন গভীর শান্তি পাইনি—ইভার কাছে যতদিন ছিলুম সে কী সুখের দিন---সে যেন স্বপ্নরাজ্যে ছিলুম! এখন সব শেষ—সে সুখস্বপ্ন টুটেছে, সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে, যেন আমার জীবনের যা কিছু সব শেষ হয়ে গেছে; তবু যে কেন আছি তা বুঝতে পারচিনা। একবার কি চেষ্টা করে দেখবনা আবার সে সুখের অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারি কি না? তবে এ নিরর্থক জীবনধারণে ফল? বুঝতে পারচনা বার্টি আমি কেন সেখানে যেতে চাচ্চি—সেই খানেই যে আমার সমস্ত জীবনটা পড়ে রয়েছে! সেখানে গিয়ে যদি বুঝি আর কিছু ফিরবেনা, সব সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাহলে জেনো বার্টি আমার জীবনও সেইখানে সমাপ্ত!—"

বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক চেয়ারের উপর অবসন্নভাবে গা ঢালিয়া দিলেন—তাঁহার অতবড় বলিষ্ঠ দেহখানা শুষ্ক লতার মতো এলাইয়া পড়িল, তন্দ্রার মতো একটা জড়তা তাঁহার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সম্মুখে বার্টি দাঁড়াইয়া, হতাশার উত্তেজনায় তাহার দেহ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইতেছে! সে ধীরে ধীরে কম্পিত হস্তে ফ্র্যাঙ্কের নির্জীবপ্রায় দেহ স্পর্শ করিল—স্পর্শমাত্রেই মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের আঘাতের মতো আসিয়া একটা তীক্ষ্ণ বিদ্বেষভাব তাহাকে অধিকার করিল—ফ্র্যাঙ্কের উপর একটা ঘৃণায় চিত্ত ভরিয়া গেল—ছিঃ পুরুষ হইয়া প্রেমের জন্য পাগল! কিন্তু শীঘ্রই সে ঘৃণাকে তুচ্ছ করিয়া একটা ভয় তাহার চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল—পলে পলে সে এ কোন্ অধঃপতনের অতলে ডুবিতেছে!—লতা যেমন বৃক্ষকে আঁকড়াইয়া থাকে তেমনি করিয়া সে ফ্র্যাঙ্ককে আঁকড়াইয়া ধরিল!

তারপর রুদ্ধকণ্ঠে উত্তেজনার সহিত বলিতে লাগিল—"ফ্র্যাঙ্ক! শোনো, নিজেকে এমন করে পীড়িত কোরোনা! এসব কী? নির্ব্বোধের মতো বলচ—ছেলেমানুষের মতো কাঁদচ! এ সমস্ত দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেল—সাহস দেখাও! সমস্ত জীবনটাকে এমনি করে নষ্ট করে ফেল না! যা হবার তা হয়েছে! একটা বালিকার ভালোবাসা হারিয়েছ বলে কি সমস্ত জগৎ সংসারটা শূন্য হয়ে গেছে? তুমি কি ভাবো বালিকার প্রেমের মধ্যেই জগতের যা কিছু সুখ সমস্ত নিহিত? সে ভুল! ভুল! তাদের মতো হৃদয়হীন, স্বার্থপর কীট জগতে নেই—তারা এ জগতের মধ্যে নিরর্থক, অতিরিক্ত, জলবুদ্বুদের মতো, কেবল শূন্যতা নিয়ে তারা ভেসে ওঠে! তার জন্যে তুমি জীবনটা বিসর্জ্জন দেবে? ধিক্ তোমায়! হতে পারে আমি জানি না রমণীর ভালোবাসা সে কী! কিন্তু আমি বলচি তুমি জানো না দুঃখ কাকে বলে! ভাবচ পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ বুঝি তুমি আজ একলাই বহন করচ! কিন্তু তা নয়---এ সামান্য একটু ব্যথা—তোমার আত্ম-অভিমানের উপর একটু আঘাতমাত্র—তার বেশি কিছু নয়। আমি যদি আমার জীবনে এরূপ ছোটোখাটো দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়তুম তাহলে এতদিনে জীবনে আমায় সহস্রবার মরতে হোতো! কিন্তু দ্যাখো বড় বড় দুঃখের ঢেউ কাটিয়ে আমি এখনো মাথা তুলে রয়েছি। তুমি সামান্যতেই কাতর হ

পৌরুষ তোমার নেই! ইভার ব্যবহারে কি তুমি স্পষ্ট বুঝচনা যে সে তোমায় চায় না—সে তোমার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখবে না! তবুও তুমি তারই জন্যে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে—তারই উদ্দেশে ছুটবে! কোন্ মুখে তার সঙ্গে দেখা করতে চাও—সে যদি তোমায় বাড়ী থেকে দূর করে দেয়! তখন? সে অপমান কোন্ প্রাণে বহন করবে? সত্যই যদি তুমি সেখানে যাও—তার সঙ্গে দেখা কর—তা হলে বুঝব তুমি নিতান্তই অধঃপাতে গেছ. তোমার মতো দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ, মূর্খ জগতে দুটি নেই—তার চেয়ে তোমার মরণ ভালো!"

ফ্র্যাঙ্ক কোনো কথা কহিতে পারিলেন না—দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া তাঁহার মন উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল;—বার্টির যুক্তি তর্কের মধ্যে সার আছে, তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না—ইভার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছাও প্রবল, তাহাও দমন করা যাইতেছে না।

বার্টির বক্তৃতার মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতারণা রহিয়াছে এমন একটা সন্দেহ ফ্র্যাঙ্কের মনে উঠিতেছিল বটে কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে কিছু ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছিলেন না বলিয়া বার্টির কথাগুলাকে মন থেকে ঠেলিয়া দেওয়া সহজ হইতেছিল না, সে কথাগুলা সদর্পে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বার বার তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছিল! সে আক্রমণে তিনি নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন বটে কিন্তু তবুও নিজের গোঁ বজায় রাখিয়া সজোরে বলিয়া উঠিলেন—"আমি কিচ্ছু গ্রাহ্য করি না—তুমি যাই বল—আমি যাবো!"

বার্টি এবার নরম হইয়া গেল। মাটির উপর বসিয়া চেয়ারে মাথা নত করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে মৃদুভাবে বলিতে লাগিল—"ফ্র্যাঙ্ক! স্থির হও, ভালো করে বোঝ! সেখানে যাবার কথা মন থেকে দূর করে দাও! এখনো তুমি এতটা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হওনি, এতটা আত্মসম্মান হারাওনি যে সত্যই তুমি ইভার কাছে আবার যেতে পারবে! সে সব কথা কি ভুলে গেলে? ইভা কি তোমায় স্পষ্টই বলেনি যে সে তোমায় বিশ্বাস করে না, তুমি তাকে প্রতারণা করেছ, তুমি তাকে ভালোবাসনা, সেই অভিনেত্রীকে ভালোবাস? তবে কেন আবার তার পায়ে ধরে সাধা? সত্য বলতে কি আমি গোড়া থেকেই বুঝেছিলুম ইভা মেয়েটি ভালো নয়, তার মতো সংশয়চিত্ত, দুর্ব্বল, চঞ্চলহৃদয় বালিকা বড়ঘরের উপযুক্ত নয়। থিয়েটার থেকে ফেরবার সময় সে রাত্রে এমনইবা কি ঘটনা ঘটেছিল যার জন্যে তার এত সন্দেহ! তার উপর তার কাছে মন খুলে সব কথা নিবেদন করলে, তাতেও তার প্রত্যয় হল না, তোমাকে সে বিশ্বাস করলে না—এ কি ভয়ঙ্কর নীচতা! এ সব অপমান স্বীকার করে তুমি তার কাছে কি বলে যেতে চাচ্চ! তোমার যা খুসী করতে পারো—আমার তাতে কি বল না, কিন্তু আমি হলে তো পারতুম না, প্রাণ গেলেও না! এ অপমান—ভয়ঙ্কর অপমান!"

ফ্র্যাঙ্ক নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার সমস্ত মাথার ভিতরটা ওলটপালট করিতে লাগিল!

বার্টি আবার বলিতে লাগিল—"ফ্র্যাঙ্ক, ভেবে দেখ আমি যা বল্লুম তা ঠিক কি না—স্থির হয়ে ভেবে দেখ।"

ফ্র্যাঙ্ক বিরসবদনে বলিলেন—"আচ্ছা, ভেবে দেখবো।"

বার্টি উৎসাহিত হইয়া তখন সহস্রকণ্ঠে ফ্র্যাঙ্কের হৃদয়-বলের প্রশংসাগান করিতে লাগিল—কী তাঁহার পৌরুষ! কী তাঁহার সাহস! সে গান সহস্র স্বরে ঝঙ্কৃত হইয়া ফ্র্যাঙ্কের কানে যেন অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল—কী পৌরুষ! কী সাহস! কী পৌরুষ! কী সাহস! কোথায় গেল তখন ইভার ভালোবাসা—তাহার প্রেম! এখন সমস্ত জগত জুড়িয়া বাজিতেছে শুধু পৌরুষ! সাহস! পৌরুষ! সাহস!

বার্টি তখন স্নেহের সহিত ফ্র্যাঙ্কের দিকে বাহু দুটি প্রসারিত করিয়া তাঁহার কাছে ঘেঁসিয়া আসিল, এবং তাঁহার পাদুখানি সবলে আঁকড়াইয়া বাঘ যেমন করিয়া বসিয়া শীকার ধরে তেমনি করিয়া বসিয়া ফ্র্যাঙ্কের মুখের পানে চাহিয়া রহিল—সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাঘের দৃষ্টিরই মতো অন্ধকারে জ্বলিতে লাগিল!

বার্টি বলিতে লাগিল—"ফ্র্যাঙ্ক! ফ্র্যাঙ্ক! কথা কও—অমন করে চুপ করে থেকোনা, ওভাবে তোমায় দেখলে আমার প্রাণ ফেটে যায়! আমি তোমায় কত স্নেহ করি তা তুমি জানো না, আমিও জানিনা কেমন করে জানাতে হয়! তুমি ভাবো আমি অকৃতজ্ঞ—কিন্তু আমায় তুমি বুঝতে পার না।—আমি তোমার একান্তই

অনুগত। আমি কখনো বাপকে ভালোবাসিনি, মাকে ভালোবাসিনি, কোনো রমণীকে ভালোবাসিনি, আমি ভালোবেসেচি শুধু তোমায়—নিজের চেয়েও বেশি করে ভালবেসেচি তোমায়! তোমার জন্যে যদি প্রাণ দিতে হয় তাও পারি—তোমার জন্যে যা করতে বল তাই করতে রাজি! তুমি এমন কাতর হয়ে থাকবে এ আমি দেখতে পারি না। চল—আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই—প্যারিস আছে, ভায়েনা আছে! বেশ ভায়েনাতেই চল—সে তবু অনেক দূর! না হয় আমেরিকা, সানফ্রান্সিস্‌কো, কিম্বা অষ্ট্রেলিয়া যেখানে খুসী তোমার চল! বিপুল পৃথিবী পড়ে রয়েছে—নূতন দেশে গিয়ে নূতন করে তোমার জীবন আরম্ভ কর! বল তো আফ্রিকায়ই যাত্রা করা যাক! সে অসভ্য দেশে যেতে পেলে আমি তো খুবই আনন্দ উপভোগ করব;—আমি দেখতে দুর্ব্বল বটে কিন্তু আমার শরীরে কষ্ট সহ্য হয়; আমার জন্যে ভাবনা নেই! চল আফ্রিকায়ই চল! বিশ্বব্যাপী দুর্গম বনের ভিতর দিনের পর দিন কেবলই নূতনের মধ্যে চলে যেতে সে কী আনন্দ বল দেখি! এস, আমরা দুটিতে এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে, মুক্ত আকাশের তলে আমাদের জীবনটাকে বিস্তীর্ণ করে দিই!"

ফ্র্যাঙ্ক গুমরিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বেশ! তাই—তাই হবে—দেশ ভ্রমণেই যাবো! কন্তু এখন আর তেমন স্বচ্ছন্দে বেড়ানো হবেনা—গত বৎসর যে খরচ হয়ে গেছে! এবার টাকার বড় টানাটানি!"

বার্টি বলিল—"তাতে কী! এবার আমরা বুঝে সুঝে খরচ করব। বেশি বাবুয়ানিতে দরকার কি? আমি তো গরীবয়ানা চালে বেশ থাকতে পারি।"

ফ্র্যাঙ্ক ধীরে ধীরে বলিলেন—"বেশ, ভালো কথা।"

তার পর দুই জনেই অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ একটু নড়িতে গিয়া ফ্র্যাঙ্কের হাতখানা একবার বার্টির হাতের উপর আসিয়া ঠেকিল, ফ্র্যাঙ্ক চমকাইয়া উঠিয়া আবেগের সহিত সেই হাতখানা নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন তারপর রুদ্ধনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন—

"বন্ধু আমার! প্রাণের বন্ধু আমার!" (ক্রমশ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সংরুদ্ধ সন্ন্যাসী*

'লিঙ্গা' মঠের (Monastery of Linga) ঊর্দ্ধে যে উপত্যকা আছে তাহারই একটি গুহায় একজন লামা গত তিন বৎসর হইতে বাস করিতেছেন, একথা শুনিয়াছিলাম। জানিতাম সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পাইব না—তাঁহার ভয়াবহ বাসস্থলীর অভ্যন্তর দেখারও কোন সম্ভাবনা নাই—তথাপি যতী কি ভাবে বাস করিতেছেন সে সম্বন্ধে ঈষৎ একটু আভাস পাইবার এই যে সুযোগ, ইহাকে কিছুতেই উপেক্ষা করিব না স্থির করিলাম।

আমরা ষ্টকহলম্ (Stockholm) ছাড়িবার ঠিক আঠার মাস পরে, ১৯০৭ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে কনকনে হাওয়া বহিতেছিল—আকাশে মেঘের ঘনঘটার সহিত গাঢ় তুষারপাত মিলিয়া দিনটিকে শূন্য নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর চৈত্যশ্রেণী পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা লিঙ্গার কাছাকাছি পর্য্যন্ত অশ্বপৃষ্ঠে গিয়া উপনীত হইলাম। শেষ শয়নাগারশ্রেণী পশ্চাতে পড়িয়া রহিল,—সম্মুখে কে বহু পুরাতন একটি গাছের গুঁড়ি লোহিত ও শ্বেতবর্ণে চিত্রিত করিয়া দিয়াছে, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ একটি নির্ঝরিণী, তাহার উপরিভাগ অল্প একটু জমিয়া গিয়াছে—রাশি রাশি পাথরের স্তূপে প্রোথিত পতাকা-দণ্ডগুলি খাড়া হইয়া আছে, দেখিতে দেখিতে অবশেষে সামদে-পুক মঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহা একটি শৈলবাহুর শেষ সীমান্তে নির্ম্মিত; ইহার দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটি উপত্যকা নামিয়া গেছে। ইহা 'লিঙ্গা' মঠেরই অন্তর্গত। ইহাতে চারিজন মাত্র ভ্রাতা আছেন, তাঁহারা সকলেই প্রবেশদ্বারে বিশেষ হৃদ্যতার সহিত আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন।

পূর্ব্বে যে সকল মঠ দেখিয়াছি ভিতর বাহির দুইদিক দিয়াই ইহা তাহাদেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। ডুকাং (Dukang) টির তিনটি মাত্র স্তম্ভ এবং চারিজন ভিক্ষুর জন্য একটি মাত্র শিষ্টসভা (divan) আছে—ইহারা

* সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক এবং আবিষ্কর্ত্তা Sven Hedin-প্রণীত নবপ্রকাশিত Trans-Himalaya গ্রন্থের 'Immured Monks" নামক পরিচ্ছেদের অনুবাদ।

একত্রে সংঘমন্ত্র (Mass) উচ্চারণ করিয়া থাকেন। চামড়ার ফেটি দিয়া ঘুরান যায় এমন নয়টি জপ-স্তম্ভ (Prayer-cylinders), একটি জয়ঢাক, একটি কাংসঘণ্টা, নৃমুণ্ড-মুকুটশোভিত দুইটি মুখোস,—মূর্ত্তির শ্রেণী,—ইহার মধ্যে চেনরেসি এবং সেকিয়ার প্রধান যাজক কঙ্গমার প্রতিচ্ছবির অনেকগুলি প্রতিরূপ ছিল।

পশ্চিম-দক্ষিণে কয় পদ যাইয়া আমরা স্ফটিকময়, বিস্তৃত ভূখণ্ডের পাদদেশে দুইটি পাথরের কুটীর দেখিলাম—ইহা আগুন জ্বালাইবার জন্য ডালপালা লতাগুল্মে পূর্ণ ছিল। সামদে-পু-পে এ দুইটি ক্ষুদ্র মন্দির—তাহার বেদীগুলি মৃত্তিকানির্ম্মিত। ইহার একটিতে মাঝারি আকারের কয়েকটি দেবমূর্ত্তি এবং সামুদ্রিক শঙ্খ ছিল। তাহার সম্মুখে ধূপচূর্ণ ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জ্বলিতেছিল—আঁকাবাঁকা ধূপের চূর্ণ পুড়িতে পুড়িতে একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া পৌঁছিতেছিল। ভিতরে লোবানের প্রতিকৃতির সম্মুখে দুইটি বাতি জ্বলিতেছিল এবং ভিতরে তাকের উপর কতকগুলি হস্তলিপি ছিল—ইহাকে ইহারা চুনা বলে। বৃষ্টির জল, ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, ঊর্দ্ধাধ লম্বমান, শ্বেতবর্ণ কয়েকটি প্রণালী, পলস্তরার ভিতর তৈয়ারি করিয়াছিল। ছাদের নিম্নে সরু লম্বা রেশমের একটি টুকরা ঝুলিতেছিল—দ্বারের পর্দ্দা বাতাসে ফরফর করিতেছিল। পেম্বুর ভয়ানক দুর্গে ইঁদুরেরা যতটুকু উত্যক্ত হয় এখানে সেটুকু হইবারও সম্ভাবনা ছিল না।

সন্ন্যাসী, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, যেখানে অতিবাহিত করেন, পর্ব্বতের পাদদেশে অত্যন্ত নিকটেই এই সেই "ড়ুপ্‌কং"—সেই আশ্রম। ইহা একটি ঝরণার উপরে নির্ম্মিত, পাঁচফুট চারিটি দেয়ালের একটি ঘর। ঘরের মেজে ফুঁড়িয়া একটি ঝরণা এই ঘরের মাঝখানে ফেনায়িত হইয়া উঠে। দেয়ালের ব্যাস অত্যন্ত স্থূল। ইহার সমস্তটিই কঠিন এবং ঠাসা, কোথাও একটি বাতায়নেরও অবকাশ নাই। দরজার চৌকাটটি অত্যন্ত নীচু—কাঠের দরজাটি রুদ্ধ, তালাচাবি বন্ধ। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে, বড় বড় জমাট-বাঁধা এবং ছোট খণ্ড খণ্ড পাথর দিয়া দরজার সম্মুখে একটি প্রাচীর গড়িয়া তোলা হইয়াছে, দেয়ালের ভিতরকার অত্যন্ত ছোট ছোট ছিদ্রপথগুলিও সযত্নে রুদ্ধ। বস্তুতঃ দরজার এক ইঞ্চিও আর লোক-চক্ষুর গোচর নহে। কিন্তু প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ আছে, যতীর আহার্য্য ইহার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দেওয়া যায়। এই সুদীর্ঘ গোলাকার ছিদ্রপথে যেটুকু সূর্য্যরশ্মি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে তাহার পরিমাণ নিশ্চয়ই খুব স্বল্প; এই আলোকটুকুও অবাধে সুড়ঙ্গমুখে পৌঁছায় না, কারণ কুটীরের সম্মুখভাগ দেয়ালে আবদ্ধ হইয়া একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনের সৃষ্টি করিয়াছে—যতীর দৈনিক আহার্য্য যে সন্ন্যাসী লইয়া আসেন, ইহার ভিতরে একমাত্র তাঁহারই প্রবেশাধিকার আছে। যতীর সমতল ছাদ ভেদ করিয়া নাতিদীর্ঘ একটি চিমনি উঠিয়াছে—প্রতি ষষ্ঠ দিবসে চা তৈয়ারি করিবার অনুমতি সন্ন্যাসীর আছে, এবং সেই জন্য কিছু কিছু জ্বালানি কাঠ সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া তাঁহার ঘরে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। চিমনির ভিতর দিয়াও একটি ক্ষীণ আলোকরেখা ভিতরে আসিয়া পড়ে। এই দুইটি ছিদ্র দিয়া কুঠরিতে বায়ু চলাচল করিতে পারে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই কুঠরিতে প্রাচীর-বেষ্টিত হইয়া এখানে যে লামা বাস করিতেছেন তাঁহার নাম কি?

"তাঁহার কোনো নাম জানি না এবং জানিলেও তাহা উচ্চারণ করিতে সাহস করিতাম না। আমরা তাঁহাকে সুধু লামা রিম্‌পোচি বলিয়া জানি।" কোপ্‌পেনের মতে 'লামা' অর্থে বুঝিতে হইবে 'এমন একজন যাঁহার উপরে আর কেহ নাই; রিম্‌পোচি=রত্ন; মাণিক্য, পবিত্রতা।)

"তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন?"

"তিনি 'নাকটসাং'-স্থিত ঙোর (Ngore) নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

"তাঁহার আত্মীয় স্বজন কেহ আছে?"

"সে সম্বন্ধে কিছু জানি না; কেহ যদিই বা থাকেন, সন্ন্যাসী যে এখানে আছেন তাহা তাঁহারা জানেন না।"

"অন্ধকারের ভিতর কতদিন তিনি বাস করিতেছেন?"

"তিন বৎসর হইল তিনি উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।"

"এখনও আর কত দিন সেখানে তিনি থাকিবেন?"

"যত দিন তাঁহার মৃত্যু না হয়।"

"মৃত্যুর পূর্ব্বে আর কি তিনি দিবালোকে বাহির হইয়া আসিতে পারিবেন না ?"

"না ; সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম যে সংকল্প তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন—শবে পরিণত হইবার পূর্ব্বে আপনার আশ্রম ত্যাগ না করার যে পবিত্র সত্য তাহাকেই তিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন।"

"তাঁহার বয়ক্রম কত ?"

"তাঁহার বয়স কত আমরা জানি না, তাঁহাকে চল্লিশ বৎসরের মত দেখায়।"

"কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে কি হয় ? তাঁহার কি সাহায্য পাইবার কোনো উপায় থাকে না ?"

"না ; অপর কোনো মনুষ্যের সহিতই তাঁহার বাক্যালাপ চলিতে পারে না। অসুস্থ হইয়া পড়িলে সারিয়া উঠা অথবা মরিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করা ছাড়া আর তাঁহার কোনো উপায় নাই।"

"তবে তিনি কেমন আছেন, সে কথা আপনারা কখনই জানিতে পারেন না ?"

"না, মৃত্যুর পূর্ব্বে নহে। প্রতিদিন একবাটি ৎসম্বা (এক প্রকার ভাজা ছাতু) এবং প্রতি ষষ্ঠ দিনে একবাটি চা ও মাখনের এক টুকরা রন্ধ্র-পথে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়; রাত্রে আহারের পর শূন্য পাত্র পরদিন আহার্য্যের জন্য তিনি বাহির করিয়া দেন। রন্ধ্র-মুখে ভোজনপাত্র অস্পৃষ্ট অবস্থায় থাকিতে দেখিলে আমরা বুঝি সংরুদ্ধ পুরুষ সুস্থ নাই। দ্বিতীয় দিনও খাদ্য স্পর্শ না করিলে আমাদের আশঙ্কা বাড়িয়া উঠে; উপর্য্যুপরি ছয়দিন আহার্য্য এইরূপ অস্পৃষ্ট অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে তাঁহাকে মৃত স্থির করিয়া আমরা প্রবেশদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলি।"

"এরূপ কি বাস্তবিক কখনও ঘটিয়াছে ?"

"হাঁ; তিন বৎসর পূর্ব্বে একজন লামা দেহত্যাগ করিয়াছেন, তিনি দ্বাদশ বর্ষ ঐ কক্ষে যাপন করিয়া গেছেন। পনর বৎসর পূর্ব্বে আর একজন মারা গিয়াছেন, চল্লিশ বৎসর তিনি নির্জ্জনে ছিলেন, বিশ বৎসর বয়ক্রমের সময় তিনি অন্ধকারে প্রবেশ করেন। লং-গান্‌ডেন-গোম্পা মঠে যে লামা উনসত্তর বৎসর পৃথিবীর সংসর্গ এবং দিবা-লোক হইতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহার কথা মহাশয় অবশ্যই শুনিয়াছেন।"

"কিন্তু যে সন্ন্যাসী 'ৎসম্বা'-পাত্র ছিদ্রপথে ভিতরে প্রেরণ করেন, তাঁহার সহিত বন্দীর বাক্যালাপ করার কি সম্ভাবনা নাই? সমস্তই যে যথাযথ হইতেছে—তাহা দেখিবার জন্য সেখানে ত আর কোনো সাক্ষী উপস্থিত থাকে না।"

আমার সংবাদদাতা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তাহা কখনও ঘটিতে পারে না, তাহা কখনও ঘটিতে দেওয়া হয় না। বাহিরের সন্ন্যাসী রন্ধ্রপথে মুখ দিয়া ভিতরের সন্ন্যাসীর সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করিলে চিরদিনের জন্য তাঁহার আত্মা অভিশপ্ত হইবে—ভিতরের সন্ন্যাসী একবার কথা বলিলে তাঁহার সাধনা নষ্ট হইয়া যাইবে। একটি কথা বলিলে তাঁহার এই তিন বৎসরের তপস্যা একবারে বৃথা হইয়া যাইবে, কে আর তাহা ইচ্ছা করে ?—কিন্তু লিঙ্গা অথবা সামদেপুকে কোনো লামা অসুস্থ হইয়া পড়িলে তিনি তাঁহার রোগের বিবরণ ও সংরুদ্ধ সন্ন্যাসীর মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া ৎসম্বা-পাত্রের সহিত রন্ধ্রপথে ঠেলিয়া দিতে পারেন। পীড়িত ব্যক্তির জন্য সংরুদ্ধ পুরুষ তখন প্রার্থনা করেন এবং প্রথমোক্তের যদি প্রর্থনার শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা থাকে এবং ইতিমধ্যে যদি তিনি কোনো অযোগ্য বিষয়ে বাক্যালাপ না করেন তবে দুইদিন পরে লামা রিমপোচির প্রার্থনায় ফল হয় এবং পীড়িত ব্যক্তি পুনরায় আরোগ্যলাভ করেন। কিন্তু সংরুদ্ধ সন্ন্যাসী লিখিয়া নিজের কোনো সংবাদ কাহাকেও প্রেরণ করেন না।"

"আমরা এখন তাঁহার কাছ হইতে দুই এক পা মাত্র দূরে আছি। আমরা যাহা বলিতেছি তাহা কি তিনি শুনিতে পাইতেছেন না ?—অন্তত কেহ যে তাঁহার গুহার বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে তাহা ত তিনি বুঝিতে পারিতেছেন ?"

"না; এ দেয়াল এত পুরু যে আমাদের কণ্ঠস্বর ভিতরে পৌছাইতে পারে না—পৌছাইলেও তিনি শুনিতে পাইবেন না, কেননা তিনি সমাধিতে মগ্ন আছেন; হয় ত দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি গৃহের এক কোণে

নতদেহে বসিয়া তিনি প্রার্থনা, মন্ত্রজপ অথবা তাঁহার সহিত যে পুণ্য শাস্ত্রগ্রন্থসকল আছে, তাহারই কোনটি অধ্যয়ন করিতেছেন।"

"তাহা হইলে পাঠ করিতে পারিবার পক্ষে যথেষ্ট আলোক নিশ্চয় তাঁহার আছে?"

"হাঁ, দুইটি প্রতিমূর্ত্তির মধ্যস্থানে একটি তাকে একটি ক্ষুদ্র ঘৃতের প্রদীপ আছে—তাহাতেই তাঁহার যথেষ্ট হয়। প্রদীপ নিবিয়া গেলে ভিতরে গভীর অন্ধকার জাগিয়া উঠে।"

বহুতর অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক বিচিত্র চিন্তায় আমার মন পূর্ণ হইয়া উঠিল--যে পথে সন্ন্যাসী জীবনে একবার মাত্র পাদক্ষেপ করিয়াছিলেন, যতীর নিকট বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে আমি সেই পথে চলিলাম। আমাদের সম্মুখে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত এই যে দৃশ্য—ইহা তাঁহার চক্ষুকে আর কোনো দিন আনন্দিত করিবে না! নীচে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিয়া উর্দ্ধে আশ্রম-উপত্যকার দিকে যতবার তাকাইয়া দেখিলাম ততবারই অন্ধকার গুহায় উপবিষ্ট সেই হতভাগ্য লোকটির কথা আমার মনে বাজিতে লাগিল।

নিঃস্ব, নামধামগোত্রহীন, অজ্ঞাত অখ্যাত সে, একটি গুহাগৃহ শূন্য পড়িয়া আছে শুনিয়া লিঙ্গায় আসিয়াছিল এবং আশ্রমে সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়া বলিয়াছিল চিরদিনের জন্য অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করিবার সংকল্প সে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পর অহঙ্কার এবং অভিমানের আবাসস্থলী এই ধরাতলে যে দিন তাহার শেষ সূর্য্য উদিত হইল, যেদিন লিঙ্গার সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় স্তব্ধভাবে তাহার গুহা-গহ্বরে শ্মশানের গাম্ভীর্য্য বহন করিয়া তাহাকে জীবন্তে সমাধি দিয়া আসিলেন—সেদিন তাহার দ্বারে যে অর্গল পড়িল জীবনের অবশিষ্ট কালের জন্য তাহা আর কখনও উন্মোচিত হইবার নহে! সেদিনকার সেই স্মরণীয় 'শোভা-যাত্রার' ছবি আমার মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—রক্তবর্ণ-উত্তরীয় ভিক্ষুগণ, স্তব্ধ এবং গম্ভীর—সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি মৃত্তিকায় আবদ্ধ। পদবিক্ষেপ অত্যন্ত ধীর—দেখিলে মনে হয় যে পূজার যে বলিটি তাঁহারা লইয়া চলিয়াছেন যতক্ষণ সম্ভব সূর্য্য এবং আলোক সে উপভোগ করিয়া লয় এই তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা! যাহার সহিত তুলনা করিলে, আমি যাহা কিছু কল্পনা করি না কেন—যে বিপদ নিশ্চিত-মৃত্যুর মুখে লইয়া যায় তাহাও, আমার কাছে নগণ্য বলিয়া মনে হয়—তাহার সেই অমানুষিক স্থৈর্য্য কি সহযাত্রী সন্ন্যাসীদের বিস্ময়ে উচ্ছ্বসিত করিয়া দেয় নাই! চল্লিশ কি ষাট বৎসরের জন্য আপনাকে অন্ধকারে জীবন্তে সমাহিত করিবার তুলনায় উপরের কামানশ্রেণী নিজেকে একবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবে জানিয়াও হিরোশীর মত বীরের পোর্ট আর্থারের প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করিতে যে স্থৈর্য্য এবং শৌর্য্যের প্রয়োজন হয় তাহা স্বল্প মাত্র। শেষোক্ত ব্যাপারে যন্ত্রণা শুধু মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী হয় মাত্র এবং যে গৌরব লাভ হয় তাহা অনন্ত। প্রথমোক্ত ব্যাপারে আপনাকে যে এমন করিয়া উৎসৃষ্ট করিল সে মৃত্যুর পূর্ব্বে যেমন অখ্যাত অজ্ঞাত ছিল, তেমনি অজ্ঞাত অখ্যাতই থাকিয়া যায়—তাহার যে ক্লেশ তাহা অনন্ত এবং সে যন্ত্রণা যে ধৈর্য্যের বলে বহন করা চলে তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর অনুগমন-সময়ে ধর্ম্ম-যাজকের মনে যে করুণা এবং সহানুভূতির উদয় হয়, নিঃসন্দেহ সন্ন্যাসিগণ সেই স্নেহ এবং সেই সহানুভূতির সহিতই তাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু পৃথিবীতে এই শেষ যাত্রা করিতে করিতে তাহার মনে কি ভাব আসিতেছিল?—এ পথে আমাদের সকলকেই একবার চলিতে হয়, কিন্তু কখন যে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু সে জানিত এ সূর্য্য আর কখনও তাহার স্কন্ধে তপ্তকর দিয়া স্পর্শ করিবে না। যে সমাধি তাহাকে অপেক্ষা করিয়া আছে তাহার চারি পার্শ্বের আকাশচুম্বী এই সকল পর্ব্বতে সে সূর্য্য আর কখনও আলোক ও ছায়ার সমাবেশ করিবে না। এখন তাহারা তাহাদের গম্যস্থানে আসিয়া পৌছিয়াছে—সমাধির দ্বার উন্মুক্ত। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহারা এক কোণে টুকরা টুকরা কাপড়ের মিশ্রিত-বুনন একটি মাদুর পাতিতেছে, দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলির সহিত পবিত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলিকে যথাস্থানে রাখিতেছে। যে ধরণের ঠেলাগাড়িতে (Go-cart) শিশু প্রথম হাঁটিতে শেখে এবং যাহা মৃত্যু না আসা পর্য্যন্ত তাহার আর কোনো কাজেই লাগে না—

সেই ধরণের ঠেলা-গাড়ীর একটি ফ্রেম এক কোণে রহিয়াছে। সন্ন্যাসীরা উপবেশন করিলেন, তাঁহাদের প্রার্থনা শোনা যাইতেছে—কিন্তু মৃতের জন্য সাধারণত যে সকল প্রার্থনা হইয়া থাকে এ ত সে প্রার্থনা নহে—এগুলি নির্ব্বাণের গৌরব, উজ্জ্বল জীবন এবং আলোক সম্বন্ধে! তাঁহারা উঠিয়া তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ করিতেছেন, বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহারা দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এখন সে একাকী—এখন হইতে আর কখনও নিজের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনও মানুষের কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণগোচর হইবে না, তিনি যখন প্রার্থনা উচ্চারণ করিবেন তখন তাহা শুনিবার জন্য আর দ্বিতীয় কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিবে না।

সকলে যখন চলিয়া গেল এবং দরজা শেষবারের জন্য বন্ধ করিবার সময়—(সে দরজা তিনি শবে পরিণত না হইলে আর খুলিবে না)—মুহূর্ত্তের জন্য যে গম্ভীর শব্দ উঠিয়াছিল তাহার প্রতিধ্বনি যখন দূরে মিলাইয়া গেল, তখন তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইতেছিল কে জানে! —হয় ত ফ্রডিং যাহা কবিতায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন সেই ভাবেরই কিছু তাহার মনে আসিয়াছিল—

"যে সকল বন্ধনে আত্মার পক্ষকে এই জীবনের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আত্মা এখানে সে সমস্ত বন্ধন হইতে নিজকে ছিন্ন করিয়া লইল—ওপারের অন্ধকারের ভিতর সেই চিরবিস্মৃতির দেশে যাত্রা, এখান হইতেই আরম্ভ হইল!"

গুরুভার বৃহৎ পাথরগুলিকে ভ্রাতৃগণ উত্তোলকদণ্ডের সাহায্যে দরজার উপর গড়াইয়া আনিয়া স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিতেছিল—সেই স্তরের মধ্যে যে অবকাশ থাকিয়া যাইতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড দিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া দিতেছেন—এ শব্দ তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। এখনও সমস্ত একবারে অন্ধকার হইয়া যায় নাই—দরজার ফাঁক দিয়া উপরের দিকে অল্প অল্প সূর্য্যালোক এখনও দেখা যাইতেছে! কিন্তু বাহিরের দেয়াল ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে। অবশেষে একটিমাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র অবশিষ্ট রহিল—ইহার ভিতর দিয়া সূর্য্যের শেষ কিরণ সেই সমাধির মধ্যে এখনও প্রবেশ করিতেছে। অকস্মাৎ দারুণ নিরাশা আসিয়া কি তাহাকে আক্রমণ করিল? সে কি লাফাইয়া উঠিয়া, দরজার উপর নিজের হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া আর একটু পরেই তাহার চক্ষুর উপর হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হইয়া যাইবে যে সূর্য্য—তাহার একটু শেষ আভাস পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে নাই? কিন্তু সে কথা ত কেহ জানে না—সে কথা কেহ কখন জানিবেও না। যে সন্ন্যাসীরা সেখানে উপস্থিত থাকিয়া দেয়াল বন্ধ করিয়া দিতে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। কিন্তু সে বেচারি মানুষমাত্র, সে ত দেখিতে পাইতেছিল উপরের যে রন্ধ্র পথে একটি মাত্র শেষ আলোকরশ্মি ভিতরে আসিতেছিল একটি পাথরের টালিকে কি করিয়া সেখানে খাঁজে খাঁজে বসান হইল; তাহার পর এখন তাহার সম্মুখে প্রগাঢ় অন্ধকার! যে দিকেই ফিরুক না কেন তাহার চতুর্দ্দিকেই অভেদ্য অন্ধকার!

সে মনে করিতেছে অন্যান্য যতিগণ এতক্ষণ সামদেপুক ও লিঙ্গাতে ফিরিয়া গেছেন। কেমন করিয়া সে তাহার সন্ধ্যাটি কাটাইবে?—এখনই তাড়াতাড়ি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নের কোন প্রয়োজন নাই—তাহার জন্য প্রচুর সময় আছে, হয় ত চল্লিশ বৎসর! সে মাদুরের উপর বসিয়া পড়িয়াছে তাহার মাথাটি ধীরে ধীরে দেয়ালের উপর ঝুঁকিয়া আসিতেছে। গত জীবনের খুঁটিনাটি সব কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট আকারে তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে। সুকঠিন প্রস্তরে ক্ষোদিত সুবৃহৎ অক্ষরে "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ" তাহার মনে পড়িতেছে—অর্দ্ধস্বপ্নাবিষ্ট ভাবে সে এই পুণ্যকথাগুলি উচ্চারণ করিতেছে—"পদ্মের মধ্যে তুমি যে মণি, তোমাকে নমস্কার!" কিন্তু শুধু একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি সে মন্ত্রের সায় দেয়। সে একটু অপেক্ষা করে, আবার শব্দ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে, তাহার পর সে নিজের স্মৃতির স্বর শুনিতে থাকে। প্রথম রাত্রি আরম্ভ হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল হয়—কিন্তু বাহিরের অন্ধকার—তাহার সমাধির ভিতরে যে অন্ধকার রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা গাঢ়তর কিছুতেই হইতে পারে না।—অন্তরের বেদনায় অভিভূত হইয়া সে শ্রান্ত অবসন্ন দেহে ঘরের এক কোণে ঘুমাইয়া পড়ে।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে নিজকে তাহার ক্ষুধিত বলিয়া মনে

নতদেহে বসিয়া তিনি প্রার্থনা, মন্ত্রজপ অথবা তাঁহার সহিত যে পুণ্য শাস্ত্রগ্রন্থসকল আছে, তাহারই কোনটি অধ্যয়ন করিতেছেন।”

“তাহা হইলে পাঠ করিতে পারিবার পক্ষে যথেষ্ট আলোক নিশ্চয় তাঁহার আছে?”

“হাঁ, দুইটি প্রতিমূর্ত্তির মধ্যস্থানে একটি তাকে একটি ক্ষুদ্র ঘৃতের প্রদীপ আছে—তাহাতেই তাঁহার যথেষ্ট হয়। প্রদীপ নিবিয়া গেলে ভিতরে গভীর অন্ধকার জাগিয়া উঠে।”

বহুতর অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক বিচিত্র চিন্তায় আমার মন পূর্ণ হইয়া উঠিল—যে পথে সন্ন্যাসী জীবনে একবার মাত্র পাদক্ষেপ করিয়াছিলেন, যতীর নিকট বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে আমি সেই পথে চলিলাম। আমাদের সম্মুখে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত এই যে দৃশ্য—ইহা তাঁহার চক্ষুকে আর কোনো দিন আনন্দিত করিবে না! নীচে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিয়া ঊর্দ্ধে আশ্রম-উপত্যকার দিকে যতবার তাকাইয়া দেখিলাম ততবারই অন্ধকার গুহায় উপবিষ্ট সেই হতভাগ্য লোকটির কথা আমার মনে বাজিতে লাগিল।

নিঃস্ব, নামধামগোত্রহীন, অজ্ঞাত অখ্যাত সে, একটি গুহাগৃহ শূন্য পড়িয়া আছে শুনিয়া লিঙ্গায় আসিয়াছিল এবং আশ্রমে সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়া বলিয়াছিল চিরদিনের জন্য অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করিবার সংকল্প সে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পর অহঙ্কার এবং অভিমানের আবাসস্থলী এই ধরাতলে যে দিন তাহার শেষ সূর্য্য উদিত হইল, যেদিন লিঙ্গার সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় স্তব্ধভাবে তাহার গুহা-গহ্বরে শ্মশানের গাম্ভীর্য্য বহন করিয়া তাহাকে জীবন্তে সমাধি দিয়া আসিলেন—সেদিন তাহার দ্বারে যে অর্গল পড়িল জীবনের অবশিষ্ট কালের জন্য তাহা আর কখনও উন্মোচিত হইবার নহে! সেদিনকার সেই স্মরণীয় ‘শোভাযাত্রার’ ছবি আমার মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—রক্তবর্ণ-উত্তরীয় ভিক্ষুগণ, স্তব্ধ এবং গম্ভীর—সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি মৃত্তিকায় আবদ্ধ। পদবিক্ষেপ অত্যন্ত ধীর—দেখিলে মনে হয় যে পূজার যে বলিটি তাঁহারা লইয়া চলিয়াছেন যতক্ষণ সম্ভব সূর্য্য এবং আলোক সে উপভোগ করিয়া লয় এই তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা! যাহার সহিত তুলনা করিলে, আমি যাহা কিছু কল্পনা করি না কেন—যে বিপদ নিশ্চিত-মৃত্যুর মুখে লইয়া যায় তাহাও, আমার কাছে নগণ্য বলিয়া মনে হয়—তাহার সেই অমানুষিক স্থৈর্য্য কি সহযাত্রী সন্ন্যাসীদের বিস্ময়ে উচ্ছ্বসিত করিয়া দেয় নাই! চল্লিশ কি ষাট বৎসরের জন্য আপনাকে অন্ধকারে জীবন্তে সমাহিত করিবার তুলনায় উপরের কামানশ্রেণী নিজেকে একবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবে জানিয়াও হিরোশীর মত বীরের পোর্ট আর্থারের প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করিতে যে স্থৈর্য্য এবং শৌর্য্যের প্রয়োজন হয় তাহা স্বল্প মাত্র। শেষোক্ত ব্যাপারে যন্ত্রণা শুধু মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী হয় মাত্র এবং যে গৌরব লাভ হয় তাহা অনন্ত। প্রথমোক্ত ব্যাপারে আপনাকে যে এমন করিয়া উৎসৃষ্ট করিল সে মৃত্যুর পূর্ব্বে যেমন অখ্যাত অজ্ঞাত ছিল, তেমনি অজ্ঞাত অখ্যাতই থাকিয়া যায়—তাহার যে ক্লেশ তাহা অনন্ত এবং সে যন্ত্রণা যে ধৈর্য্যের বলে বহন করা চলে তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর অনুগমন-সময়ে ধর্ম্ম-যাজকের মনে যে করুণা এবং সহানুভূতির উদয় হয়, নিঃসন্দেহ সন্ন্যাসিগণ সেই স্নেহ এবং সেই সহানুভূতির সহিতই তাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু পৃথিবীতে এই শেষ যাত্রা করিতে করিতে তাহার মনে কি ভাব আসিতেছিল?—এ পথে আমাদের সকলকেই একবার চলিতে হয়, কিন্তু কখন যে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু সে জানিত এ সূর্য্য আর কখনও তাহার স্কন্ধে তপ্তকর দিয়া স্পর্শ করিবে না। যে সমাধি তাহাকে অপেক্ষা করিয়া আছে তাহার চারি পার্শ্বের আকাশচুম্বী এই সকল পর্ব্বতে সে সূর্য্য আর কখনও আলোক ও ছায়ার সমাবেশ করিবে না। এখন তাহারা তাহাদের গম্যস্থানে আসিয়া পৌছিয়াছে—সমাধির দ্বার উন্মুক্ত। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহারা এক কোণে টুকরা টুকরা কাপড়ের মিশ্রিত-বুনন একটি মাদুর পাতিতেছে, দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলির সহিত পবিত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলিকে যথাস্থানে রাখিতেছে। যে ধরণের ঠেলাগাড়িতে (Go-cart) শিশু প্রথম হাঁটিতে শেখে এবং যাহা মৃত্যু না আসা পর্য্যন্ত তাহার আর কোনো কাজেই লাগে না—

সেই ধরণের ঠেলা-গাড়ীর একটি ফ্রেম এক কোণে রহিয়াছে। সন্ন্যাসীরা উপবেশন করিলেন, তাঁহাদের প্রার্থনা শোনা যাইতেছে—কিন্তু মৃতের জন্য সাধারণত যে সকল প্রার্থনা হইয়া থাকে এ ত সে প্রার্থনা নহে—এগুলি নির্ব্বাণের গৌরব, উজ্জ্বল জীবন এবং আলোক সম্বন্ধে! তাঁহারা উঠিয়া তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ করিতেছেন, বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহারা দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এখন সে একাকী—এখন হইতে আর কখনও নিজের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনও মানুষের কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণগোচর হইবে না, তিনি যখন প্রার্থনা উচ্চারণ করিবেন তখন তাহা শুনিবার জন্য আর দ্বিতীয় কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিবে না।

সকলে যখন চলিয়া গেল এবং দরজা শেষবারের জন্য বন্ধ করিবার সময়--(সে দরজা তিনি শবে পরিণত না হইলে আর খুলিবে না)--মুহূর্ত্তের জন্য যে গম্ভীর শব্দ উঠিয়াছিল তাহার প্রতিধ্বনি যখন দূরে মিলাইয়া গেল, তখন তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইতেছিল কে জানে! —হয় ত ফ্রডিং যাহা কবিতায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন সেই ভাবেরই কিছু তাহার মনে আসিয়াছিল—

"যে সকল বন্ধনে আত্মার পক্ষকে এই জীবনের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আত্মা এখানে সে সমস্ত বন্ধন হইতে নিজকে ছিন্ন করিয়া লইল—ওপারের অন্ধকারের ভিতর সেই চিরবিস্মৃতির দেশে যাত্রা, এখান হইতেই আরম্ভ হইল!"

গুরুভার বৃহৎ পাথরগুলিকে ভ্রাতৃগণ উত্তোলকদণ্ডের সাহায্যে দরজার উপর গড়াইয়া আনিয়া স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিতেছিল—সেই স্তরের মধ্যে যে অবকাশ থাকিয়া যাইতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড দিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া দিতেছেন—এ শব্দ তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। এখনও সমস্ত একবারে অন্ধকার হইয়া যায় নাই—দরজার ফাঁক দিয়া উপরের দিকে অল্প অল্প সূর্য্যালোক এখনও দেখা যাইতেছে! কিন্তু বাহিরের দেয়াল ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে। অবশেষে একটিমাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র অবশিষ্ট রহিল—ইহার ভিতর দিয়া সূর্য্যের শেষ কিরণ সেই সমাধির মধ্যে এখনও প্রবেশ করিতেছে। অকস্মাৎ দারুণ নিরাশা আসিয়া কি তাহাকে আক্রমণ করিল? সে কি লাফাইয়া উঠিয়া, দরজার উপর নিজের হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া আর একটু পরেই তাহার চক্ষুর উপর হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হইয়া যাইবে যে সূর্য্য—তাহার একটু শেষ আভাস পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে নাই? কিন্তু সে কথা ত কেহ জানে না—সে কথা কেহ কখন জানিবেও না। যে সন্ন্যাসীরা সেখানে উপস্থিত থাকিয়া দেয়াল বন্ধ করিয়া দিতে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। কিন্তু সে বেচারি মানুষমাত্র, সে ত দেখিতে পাইতেছিল উপরের যে রন্ধ্রপথে একটি মাত্র শেষ আলোকরশ্মি ভিতরে আসিতেছিল একটি পাথরের টালিকে কি করিয়া সেখানে খাঁজে খাঁজে বসান হইল; তাহার পর এখন তাহার সম্মুখে প্রগাঢ় অন্ধকার! যে দিকেই ফিরুক না কেন তাহার চতুর্দ্দিকেই অভেদ্য অন্ধকার!

সে মনে করিতেছে অন্যান্য যতিগণ এতক্ষণ সামদেপুক ও লিঙ্গাতে ফিরিয়া গেছেন। কেমন করিয়া সে তাহার সন্ধ্যাটি কাটাইবে?—এখনই তাড়াতাড়ি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নের কোন প্রয়োজন নাই--তাহার জন্য প্রচুর সময় আছে, হয় ত চল্লিশ বৎসর! সে মাদুরের উপর বসিয়া পড়িয়াছে তাহার মাথাটি ধীরে ধীরে দেয়ালের উপর ঝুঁকিয়া আসিতেছে। গত জীবনের খুঁটিনাটি সব কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট আকারে তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে। সুকঠিন প্রস্তরে ক্ষোদিত সুবৃহৎ অক্ষরে "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ" তাহার মনে পড়িতেছে—অর্দ্ধস্বপ্নাবিষ্ট ভাবে সে এই পুণ্যকথাগুলি উচ্চারণ করিতেছে—"পদ্মের মধ্যে তুমি যে মণি, তোমাকে নমস্কার!" কিন্তু শুধু একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি সে মন্ত্রের সায় দেয়। সে একটু অপেক্ষা করে, আবার শব্দ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে, তাহার পর সে নিজের স্মৃতির স্বর শুনিতে থাকে। প্রথম রাত্রি আরম্ভ হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাহার কৌতুহল হয়—কিন্তু বাহিরের অন্ধকার—তাহার সমাধির ভিতরে যে অন্ধকার রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা গাঢ়তর কিছুতেই হইতে পারে না।—অন্তরের বেদনায় অভিভূত হইয়া সে শ্রান্ত অবসন্ন দেহে ঘরের এক কোণে ঘুমাইয়া পড়ে।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে নিজকে তাহার ক্ষুধিত বলিয়া মনে

হয়—রন্ধ্রের মুখে হামাগুঁড়ি দিয়া দেখে সুড়ঙ্গে বাটিতে ৎসম্বা রাখা আছে। প্রস্রবণ হইতে জল লইয়া সে আপনার আহার্য্য প্রস্তুত করে, আহার হইয়া গেলে পাত্রটি আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে রাখিয়া দেয়। তাহার পর আসন করিয়া বসিয়া, জপমালা হস্তে সে উপাসনা করিতে বসে। একদিন দেখে পাত্রে চা ও মাখন আছে—তাহার পাশে কয়েকখানি জ্বালানি কাঠের টুকরা। চারিদিকে হাতড়াইয়া চকমকি পাথর ইস্পাত এবং সোলা খুঁজিয়া সে চা-পাত্রের নীচে অল্প একটু আগুন জ্বালে। অগ্নিশিখার আলোকে ঘরের ভিতরটি আর একবার দেখিয়া লয় এবং বিগ্রহগুলির সম্মুখে বাতি জ্বালিয়া পড়িতে আরম্ভ করে; কিন্তু অগ্নি ক্রমশঃ নিবিয়া আসে, আরো ছয় দিন চলিয়া গেলে তাহার আর একবার চা আসিবে! দিনের পর দিন চলিয়া যায়—ক্রমশঃ হেমন্ত ঋতু তাহার মেঘভার এবং ঘনবর্ষণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে—বৃষ্টির শব্দ সে শুনিতে পাইতেছে না—কিন্তু তাহার গুহার দেয়ালগুলিকে একটু বেশী ভিজা ভিজা বোধ হইতেছে। যে দিন সূর্য্য এবং আলোককে শেষবারের মত দেখিয়াছিল সে দিনকে তাহার বহুদিন পূর্ব্বের বলিয়া বোধ হইতেছে। বৎসরের পর বৎসর এমনি করিয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে—তাহার স্মৃতি ক্রমশঃ ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। যে কয়টি পুস্তক সে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সেগুলি অনেকবার পড়া হইয়া গেছে—আর তাহাদের তাহার কোন প্রয়োজন নাই। এক কোণে আস্তে আস্তে সরিয়া গিয়া মৃদুস্বরে পুস্তকগুলির ভিতরকার পাঠ সে আবৃত্তি করিতেছে—সমস্তই তাহার বহুদিন পূর্ব্বে কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে। ক্রমশঃ কলের মত জপের মালা তাহার অঙ্গুলির ভিতর দিয়া আসে এবং যায়—ৎসম্বা-পাত্রের প্রতি এখন আর সে সজ্ঞানে হাত বাড়ায় না।

কনকনে ঠাণ্ডা পাথরগুলিকে হাত দিয়া অনুভব করিয়া দেয়ালের চারি পার্শ্বে আস্তে আস্তে হয়ত সে ঘুরিয়া ফিরিতেছে, যদি দৈবাৎ কোথাও একটু ফাটাল থাকে, যদি সেখান দিয়া সূর্য্যের একটু আলোককণা ভিতরে আসিয়া পড়িতে পারে! সূর্য্যালোকিত পথে বাহির যে কেমন সে সম্বন্ধে এখন আর কোনো ধারণাও হয়ত সে করিতে পারে না। শুধু নিদ্রার সময়টুকু সে তাহার অস্তিত্বের স্মৃতি ভুলিয়া থাকে—তখনই সে শুধু বর্ত্তমানের নৈরাশ্য হইতে মুক্তি পায়। সে হয়ত মনে করে—অন্ধকারে ক্ষণস্থায়ী এই ক্ষুদ্র মর্ত্ত্যজীবন গৌরব-উজ্জ্বল অনন্ত আলোকের তুলনায় কি, কতটুকুই বা?—এই যে অন্ধতমে বাস, এ শুধু পথে প্রস্তুত হইয়া লওয়া। দিন রাত্রি এবং বহু-বৎসরের নির্জ্জনতার ভিতর দিয়া এই ধ্যানপরায়ণ যতী জীবন এবং মৃত্যুর এই প্রহেলিকার অর্থ খুঁজিয়া ফিরিতেছেন, পরীক্ষার এই কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তিনি আবার যে অস্তিত্ব লাভ করিবেন তাহা বিরাট মহিমায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে, এ বিশ্বাসকে তিনি আঁকড়িয়া আছেন। ধারণার অতীত এই অমানুষিক স্থিরবিশ্বাস ব্যতীত আর কিসের বলে সম্ভব।

সেই ঘনান্ধকার গহ্বরের ভিতর বৎসরের পর বৎসর সন্ন্যাসী কি পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিতে থাকেন তাহা কল্পনা করাও সুকঠিন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নিশ্চয়ই ক্ষীণ হইয়া আসে, হয়ত একেবারে লোপ পায়। তাঁহার মাংসপেশী শুকাইয়া আসে, ইন্দ্রিয়গ্রাম অস্পষ্ট এবং নিস্তেজ হইয়া যায়। আলোকে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুলতা নিশ্চয়ই তাঁহার বরাবর থাকে না—কারণ নির্জ্জনবাসের এই যে পরীক্ষা, ইহার স্থায়িত্বের সময় কমাইয়া ফেলিবার অধিকার সংরুদ্ধ ব্যক্তিটির নিজের উপরেই আছে। পুস্তকের পাতায়, একটি কাঠির এক প্রান্তে ঝুল দিয়া, আপনার বক্তব্য লিখিয়া ৎসম্বা-পাত্রে ফেলিয়া রাখিলেই তিনি আলোকে ফিরিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু এরূপ কেহ করে না—আশ্রমের সন্ন্যাসীরা কেহই এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখেন নাই। —সন্ন্যাসীরা এরূপ একটি মাত্র ঘটনার কথা জানিতেন। উনসত্তর বৎসর ধরিয়া যে সন্ন্যাসী প্রাচীর-বেষ্টিত হইয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি, একবার সূর্য্যকে দেখিয়া মরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন—টংএ যে সকল যতী বাস করিতেন তাঁহাদের নিকট হইতে এ সংবাদ শুনিয়াছিলাম। যখন বাহির করিয়া আনিল তখন তাঁহাকে শিশুর মত ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল, কোমরের উপর তাঁহার শরীর একেবারে দুমড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঈষৎ একটু কপিশবর্ণের পার্চ্চমেণ্ট কাগজের মত খড়খড়ে চর্ম্ম

এবং কতকগুলি অস্থি—এ ছাড়া তাঁহার শরীরে আর কিছু ছিল না। তাঁহার চক্ষু দৃষ্টিশক্তিশূন্য—অত্যন্ত অনুজ্জ্বল এবং বর্ণহীন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মাথার শুভ্র কেশরাশি অসংস্কৃত এবং জমাট-বাঁধা ক্ষীণ শ্মশ্রুটি অমার্জ্জিত, দেহ শত-ছিন্ন কন্থায় আবৃত ছিল। কালক্রমে পুরাতন বস্ত্র জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু নূতন কোনো বস্ত্র তিনি পান নাই। এই সুদীর্ঘ উনসত্তর বৎসর কোনো দিন তিনি স্নান করেন নাই—নখও কাটেন নাই। বহুবর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার কিশোর বয়সে অন্ধকার গুহায় যে সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে রাখিয়া আসিয়াছিল তাহাদের কেহই এখন বাঁচিয়া নাই, শূন্য স্থান এখন নূতন সন্ন্যাসীরা আসিয়া অধিকার করিয়াছে, তিনি তাহাদের কাছে এখন সম্পূর্ণ অপরিচিত।—সূর্য্যালোকে আসিতে না আসিতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

এইরূপ একটি আত্মার অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে আমাদের কল্পনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়, কেননা এ সম্বন্ধে কিছুই আমরা জানি না। ক্যাপটেন ইয়ংহজব্যাণ্ড-এর লাসা অভিযানের সহযাত্রী ওয়াডেল এবং ল্যাণ্ডেল, নিয়াং-টো-কি-পু আশ্রমগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, যে সন্ন্যাসীরা চিরান্ধকারে প্রবেশলাভ করিয়াছেন প্রথমতঃ অল্প-দিনস্থায়ী নির্জ্জনবাসের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তাঁহা-দিগকে চলিতে হয়। এই অভিজ্ঞতার স্থায়িত্বকাল প্রথম-বার ছয় মাস, দ্বিতীয়বার তিন বৎসর তিরানব্বই দিন। এই দ্বিতীয় বারের নির্জ্জনবাস সমাপ্ত করিয়া যাহারা আসিয়াছে তাহারা অন্যান্য সন্ন্যাসীদের তুলনায় বুদ্ধিবৃত্তিতে নিকৃষ্ট হইয়া গেছে তাহার চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু এই ইংরাজ ভদ্রমহোদয় দুইটির কাছে যেরূপ শুনিলাম তাহাতে নিয়াং-টো-কি-পুর নির্জ্জনবাসকে, লিজায় আমি যেরূপ দেখিয়াছিলাম সেরূপ ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইল না। নিয়াং-টো-কি-পুতে সংরুদ্ধ সন্ন্যাসীর আহারাদির ভার যে লামার উপর ছিল তিনি, যে প্রস্তরখণ্ডে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ থাকিত যথাসময়ে তাহাতে অঙ্গুলি দিয়া আঘাত করি-তেন। সন্ন্যাসী এই সঙ্কেতে সুড়ঙ্গের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিতেন। এবং দ্বারের পাথরটি মুহূর্ত্তের জন্য সরাইয়া দিয়া আহার-পাত্রটি গ্রহণ করিয়া আবার পাথরটিকে যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। যাহাই হৌক এক্ষেত্রে দিনান্তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত সংরুদ্ধ ব্যক্তির চক্ষে আলোকের স্পর্শলাভ ঘটিত! ওয়াডেল "লামাতত্ত্ব" সম্বন্ধে অনেক কথা ভাল করিয়া জানেন। নিভৃতে আত্মানুসন্ধান, জীবনের জটিল তত্ত্বজালের মীমাংসা প্রভৃতির জন্য বৎসরে কোনো কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে সংসার হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার যে বিধান ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের ছিল, তাঁহাদের মতে তিব্বতের নির্জ্জনে অন্ধকারে বাসের প্রথা তাহারই অনুকরণ—কিন্তু ভারতবর্ষের কাছে যাহা লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়মাত্র ছিল, তিব্বতীরা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছে।

এই সকল মতবাদ যে সত্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না—কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না। সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছু হয় ত ধর্ম্মের মোহে অন্ধ হইয়া নিজেকে জীবন্ত কবর দিবার সংকল্পে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু সে যে কি করিতে যাইতেছে তখন কি তাহা তাহার ধারণায় আসে? কুঠুরির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে থাকিতে তাহার বুদ্ধি যদি সত্য সত্যই নিস্তেজ হইয়া যাইত, পশুর মত যদি তাহার বুদ্ধিশক্তি লোপ পাইত, তবে তাহার উদ্যম, তাহার ইচ্ছা-শক্তিও মরিয়া যাইত—গুহার অন্ধকারে প্রবেশ করিবার সময় জাগ্রতভাবে যাহার জন্য চেষ্টা করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া তাহার মনে হইয়াছিল, ক্রমশঃ সে সমস্তের প্রতি তাহার ঔদাসীন্য বাড়িয়া উঠিতে থাকিত। কিন্তু এরূপ ত হয় না—তাহার প্রথম সঙ্কল্পে সে শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় এবং অবিচলিত থাকে, তাহার উদ্যম তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে একথা কেমন করিয়া বলিব? অচলা ভক্তি, লক্ষ্যের প্রতি স্থির অচপল একটি নিষ্ঠা নিশ্চয়ই তাহার থাকে, কারণ এই হৃদয়বৃত্তিগুলিকে গুহার বাহিরে যে পরীক্ষায় পড়িতে হয়—গুহার ভিতরের পরীক্ষা তাহার তুলনায় অত্যন্ত কঠোর—কারণ সেখানে সে একান্তই একা, সেখানে একমাত্র মৃত্যুর সহিতই তাহার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা থাকে। ধীরে ধীরে হয় ত আত্মপ্রবঞ্চনা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে—তাহার সেই গুহার সুদীর্ঘরাত্রি অবসানের শেষ ঘণ্টার জন্য তীব্র

আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে—সে মনে করিতে থাকে সময়ের প্রায় শেষ প্রান্তে আসিয়া সে উপস্থিত হইয়াছে—এখন যে কোনো মুহূর্ত্তে সময় নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে। সময়ের বোধ নিশ্চয়ই তাহার কিছুমাত্র থাকে না, সমাধির অন্ধকারকে অনন্তকালের মধ্যে তাহার একটি মুহূর্ত্তমাত্র বলিয়া মনে হয়। কারণ সময়ের পরিমাণ করিয়া তাহা স্মৃতিপটে মুদ্রিত করিবার যেসকল উপায় তাহার পূর্ব্বে ছিল এখন তাহার আর কিছুই নাই। দিন রাত্রি, শীত গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তন, গুহার ভিতর নিজের শরীরে ঠাণ্ডা এবং গরম লাগার ভিতর দিয়াই সে অনুভব করে। তাহার মনে পড়ে কত বর্ষা তাহার মাথার উপর দিয়া ভাসিয়া গেছে—তাহার মস্তিষ্ক বৈচিত্র্য-হীন একটিমাত্র ভাবে পরিপূর্ণ থাকায় তাহার মনে হয় ঋতু হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুতবেগে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।—কেন সে যে উন্মাদ হইয়া যায় না,—কেন সে আলোকের জন্য চীৎকার করিয়া উঠে না, নৈরাশ্যের যন্ত্রণায় লাফাইয়া উঠিয়া কেন সে আপনার মাথা দেয়ালে আছড়ায় না, দেয়ালের তীক্ষ্ণ-ধার পাথরগুলির উপর নিজেকে আছড়াইয়া সে যে কেন আত্মহত্যা করে না, তাহা আমার ধারণারও অতীত!

কিন্তু সে শান্তভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।—মৃত্যু আসিতে হয়ত দশ, হয়ত বিশ বৎসর বিলম্ব করে। বাহিরের এই সংসার যাত্রা, এই পৃথিবীর স্মৃতি তাহার কাছে অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আসিতে থাকে। পূর্ব্ব প্রান্তে উষার উদয়, সূর্য্যাস্তের স্বর্ণাভ মেঘচ্ছটা, সে বহুদিন হইল ভুলিয়া গিয়াছে। রাত্রে যখন সে উর্দ্ধদিকে তাহার জ্যোতি-হীন চক্ষে চাহিয়া দেখে তখন অন্ধকার গহ্বরের অন্ধকার ছাদটিই সে দেখিতে পায়—নৃত্যচঞ্চল কোনো তারকা তাহার চক্ষে পড়ে না!—বহুবর্ষ এইরূপে অন্ধকারে অতীত হইবার পর সহসা একদিন মহোজ্জ্বল দীপ্তিরাশিতে তাহার সমস্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—অবশেষে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হন এবং হাত ধরিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যান। তাঁহার জন্য আসিয়া মৃত্যুকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না, সাধ্য সাধনারও প্রয়োজন হয় না—লামা তাঁহার এই একমাত্র অতিথি এবং পরিত্রাণকর্ত্তার জন্য বহুদিন ধরিয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য বহুবর্ষ হইতে তাঁহার মন আকুল হইয়া আছে।—তিব্বতের বৌদ্ধমঠের মন্দিরে চিত্র এবং প্রতিচ্ছবিগুলিতে যেভাবে বুদ্ধদেব অঙ্কিত হইয়াছেন—এখনও যদি সন্ন্যাসীর বুদ্ধি অনাবিল থাকে তবে অন্তিম সময়ে তিনি সেই পবিত্রভাবে কাষ্ঠাসনটি বাহুমূলের নিম্নে লইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

তাহার পর, দিনের পর দিন এত বৎসর যে ৎসম্বাপাত্র পর্য্যায়ক্রমে পূর্ণ এবং শূন্য হইয়াছে—অবশেষে হঠাৎ যখন তাহা অস্পৃষ্ট রহিয়া গেল—ছয় দিনও যখন কেহ তাহা স্পর্শ করিল না, তখন তাহারা রুদ্ধ গৃহটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, মঠের অধ্যক্ষ মৃতের পার্শ্বে আসিয়া তাহার জন্য প্রার্থনা করিলেন। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা ডুক্যাংএ পাঁচ ছয় দিন তাঁহার জন্য সমবেত হইয়া উপাসনা করিলেন। মৃত-দেহ শ্বেতবস্ত্রে আবৃত হইল, তাহার পর মাথায় একটি আবরণ (তিব্বতে ইহাকে "রিঙ্গা" বলে) দিয়া তাঁহাকে তাহারা চিতায় আরোহণ করাইল। ধীরে ধীরে সমস্ত ভস্ম হইয়া গেল। সংগৃহীত ভস্মরাশি কর্দ্দমে মাখিয়া সন্ন্যাসিগণ একটি ক্ষুদ্র পিরামিড গড়িয়া তুলিলেন অবশেষে তাহা প্রস্তরের কোনো মনুমেণ্টের মধ্যে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিল।

লিঙ্গার সন্ন্যাসীরা বলিয়াছিলেন সাধারণ একজন লামার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পাখীদের আহারের জন্য ফেলিয়া রাখা হয়। যে পাঁচজন লামা এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা আশ্রমভুক্ত; কিন্তু ডুক্যাংএ উপাসনা ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সহিত একত্র চা পানের অধিকারী হইলেও তাঁহাদিগকে অশুচি বলিয়া মনে করা হয়, অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের সহিত একত্রে ভোজন করিতে পারেন না। কাছাকাছি পশু-চারণানুজীবিগণের কেহ মারা গেলে ইহাদের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনগণকে এই সন্ন্যাসীদিগের জন্য পাঠাইতে হয়। মৃতের সর্ব্বস্ব আশ্রমের সম্পত্তিভুক্ত হইয়া যায়।

যে লামা রিমপোচির গুহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমরা বাক্যালাপ করিয়াছিলাম, তাঁহার চিত্র দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া আমার মনে ঘুরিয়া ফিরিতে-

ছিল—কিছুতেই তাহাকে আমি দূর করিতে পারি নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে লামা সেখানে চল্লিশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া ত' আরও কঠিন! আমার মনে হইত মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধবাসরে যে শঙ্খধ্বনি সন্ন্যাসীদিগকে আহ্বান করিয়াছিল, তাহা যেন আমি শুনিতে পাইতেছি। আমি মনে মনে সেই গুহার ছবি আঁকিতাম—যেখানে লামা অবনত দেহে ভূমিতলে ছিন্ন কন্থার মধ্য হইতে তাঁহার জীর্ণ শুষ্ক হস্তটি মৃত্যুর দিকে প্রসারিত করিতেছেন—মন্দিরের নৃমুণ্ডের মুখোসে যে করুণ হাসি লাগিয়া থাকে, মৃত্যুর মুখে তাহারই মত একটি করুণ হাসি—সে তাঁহাকে তাহার একটি হস্ত বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহার অপর হস্তে দীপ্ত উজ্জ্বল একটি আলোক। নির্ব্বাণে প্রতিফলিত হইয়া সন্ন্যাসীর মুখরেখা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেছে! এবং মন্দিরের ছাদ হইতে যে মুহূর্ত্তে দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই যে "ওঁ মণি পদ্মে হুম্" রাত্রি দিন,—কত দিন কত বৎসর ধরিয়া তাঁহার গুহার প্রাচীরগুলিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়াছে, আজ তাহা বিস্মৃত হইয়া সন্ন্যাসী জয়োল্লাসের সঙ্গীত গাহিয়া উঠিয়াছেন—সে সঙ্গীত আর এক জাতির পৌরাণিক গানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়:—

> "Hail ye deities bright!
> Ye Valhalla Sons!
> Earth fadeth away; to the heavenly feast
> Glad trumpets invite
> Me, and blessedness crowns,
> As fair, as with gold helm your hastening guest."

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

মধুস্রোতা

(কবি "বার্ণস্" হইতে)

ধীরে বহে যাও, তটিনী মধুর,
শ্যামগিরি মাঝখানে,
ধীরে বহে যাও, শুনাব তোমায়
তোমারি মহিমা গানে।
গর্জ্জনময় কল্লোলে তোর
প্রেয়সী ঘুমায়ে আছে,
ধীরে বহে যাও, তটিনী মধুর,
স্বপন ভাঙ্গে বা পাছে!

তোমার গাছের কপোতের বোলে
ধ্বনিত এ সানুতল,
কণ্টকময় গুহায় গুহায়
বন-পিক-কোলাহল।
মুকুট-মাথায় শ্যামা ফিঙ্গে তব
তুলিয়া উচ্চ তান,
দেখো যেন মোর প্রেয়সীর ঘুমে
নাহি করে বাধা দান।

কত না বিশাল, তটিনী মধুর,
তোমার পুলিন-গিরি,
পাছে পাছে তব, স্বচ্ছ-সলিলা,
সেও গেছে ঘুরি ফিরি।
সে পাহাড়গায়ে ভ্রমিয়া বেড়াই
দীপ্ত দুপুর বেলা,
প্রিয়ার শয্যা তখনো আমার
আঁখিতলে করে খেলা।

কত না রুচির তব তটদেশ,
শ্যাম সমতল ভূমি,
বন্যকুসুম-সুরভি মধুর
নিয়ত রয়েছে চুমি।
স্নিগ্ধ মধুর সন্ধ্যা-বাতাসে,
সুরভি বকুলতলে,
প্রাণের আমার প্রেয়সীর সাথে
আমি নিতি পড়ি ঢলে।

কত না স্বচ্ছ মাধুরী তরল
মধুরে বহিয়া যায়,
আঁকা বাঁকা হ'য়ে, প্রেয়সী আমার
শুয়ে যেথা বিছানায়।
মুগ্ধ চপল ঢেউগুলি তব
চুমে যায় পদতল,
চরণে প্রহৃত প্রবাহের মাঝে
ফুটে যেন শতদল।

ধীরে বহে যাও, তটিনী মধুর,
শ্যামগিরি মাঝখানে,
ধীরে বহে যাও, তটিনী রুচির,
আমার গানের তানে।
গর্জ্জনময় কল্লোলে তোর
প্রেয়সী ঘুমায়ে আছে,
ধীরে বহে যাও, তটিনী মধুর,
স্বপন ভাঙ্গে বা পাছে!

শ্রীযতীশগোবিন্দ সেন।

মোগলসম্রাটের রাজকর

(বৈদেশিক চিত্র)

মেনুষী বলেন যে তাঁহার বর্ণিত নিম্নলিখিত রাজস্বের হিসাব মোগলসাম্রাজ্যের রাজদপ্তর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে সুতরাং ঐ হিসাবে অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কিছু নাই—ইহার সহিত, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে, যখন মুসলমান ঐতিহাসিক-গণ-প্রদত্ত রাজস্বের তালিকা দিব তখন উভয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার সুযোগ হইবে। বর্জ্জাইস্ অক্ষরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদটীকা দ্বারা প্রবন্ধ সমাচ্ছন্ন ও সাধারণ পাঠকের দুরধিগম্য করা আমাদের আদৌ ইচ্ছা নহে সুতরাং উভয় শ্রেণীর ঐতিহাসিক ও পর্য্যটকদের প্রদত্ত তুলনামূলক তালিকা প্রবন্ধান্তরে দিয়া বিষয়টী বিশদ করিতে প্রয়াস পাইব।

মোগল-অধিকৃত সমস্ত ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কতক-গুলি 'সরকারে' বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল, এই সরকার-গুলি আবার পরগণায় বিভক্ত।

(১) রাজধানী দিল্লী ও তদন্তর্ভুক্ত প্রদেশ—৮টী সরকার ও ২২০টী পরগণায় বিভক্ত। এ প্রদেশের আয় ১ ক্রোর ২৫ লক্ষ ৫০ সহস্র মুদ্রা।

(২) লাহোর প্রদেশ—৫টী সরকার ও ৩১৪ পরগণায় বিভক্ত। ইহার রাজকর ২ ক্রোর, ৩৩ লক্ষ, ৫০ সহস্র মুদ্রা।

(৩) আস্মীর (আজ্মীর)—মেনুষী ইহার সরকার ও পরগণার উল্লেখ করেন নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকদের দত্ত তালিকা হইতে এ ভ্রম সংশোধিত হইবে। যাহা হউক এ প্রদেশ হইতে আয় ২ ক্রোর, ১৯ লক্ষ ও দুই মুদ্রা।

(৪) আগ্রা প্রদেশ—১৪টী সরকার ও ২৭৮টী পরগণায় বিভক্ত। এ প্রদেশ হইতে মোগলসম্রাট্দের আয় ২ ক্রোর ২২ লক্ষ ৫৫৫০ মুদ্রা।

(৫) গুঝুরাট (গুজ্রাত্) প্রদেশ—৯টী সরকার ও ১৯টী পরগণায় বিভক্ত। ইহা হইতে মোগলরাজ-ভাণ্ডারে আয় ২ ক্রোর ৩৩ লক্ষ ও ৯৫ সহস্র মুদ্রা।

(৬) মাল্লুয়া (মালব) প্রদেশ—১১টী সরকার ও ২৫০টী ক্ষুদ্র পরগণায় বিভক্ত। এ প্রদেশের রাজস্ব ৯৯ লক্ষ ৬২৫০ মুদ্রা।

(৭) বিয়ার (বিহার ?) প্রদেশ—৮টী সরকার ও ২৪৫টী ক্ষুদ্র পরগণায় বিভক্ত—ইহার আয়, ১ ক্রোর, ২১ লক্ষ, ৫০ সহস্র মুদ্রা।

(৮) মুলতান প্রদেশ—১৪টী সরকার ও ৯৬টী পরগণায় বিভক্ত। এত সরকার ও পরগণা সত্ত্বেও ইহার আয় অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক অল্প; কেবল মাত্র ৫০ লক্ষ, ২৫ সহস্র মুদ্রা।

(৯) কাবুল—৩৫টী পরগণায় বিভক্ত। ইহার রাজস্ব ৩২ লক্ষ, ৭২৫০ মুদ্রা।

(১০) টাটা প্রদেশের বিভাগের সংখ্যার মেনুষী উল্লেখ করেন নাই—পরবর্ত্তী প্রবন্ধে উক্ত তুলনামূলক তালিকায় এ ভ্রম সংশোধিত হইবে। ইহার আয় ৬০ লক্ষ ২ সহস্র মুদ্রা।

(১১) বাকর্ (?)—আয় ২৪ লক্ষ, বিভাগসংখ্যা প্রদত্ত হয় নাই।

(১২) উয়ছা (?)—ইহা একাদশটী সরকার ও অনেক পরগণায় বিভক্ত। ইহার আয় ৫৭,৭৫০০ মুদ্রা। বিভাগ-সংখ্যার অভাব।

(১৩) কাশ্মীর প্রদেশ—ভূস্বর্গ কাশ্মীর প্রদেশের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য মেনুষীর ভাস্বরচিত্রে কিরূপ ফুটিয়াছে গত বৎসরের চৈত্র সংখ্যার 'প্রবাসীতে' "জাহাঙ্গীরের রাজসভা" প্রবন্ধে তাহার কতক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রদেশ শাজাঁহার রাজত্বের শেষ সময়ে ও অওরঙ্গজেব্ নৃপতির রাজত্বের প্রারম্ভে (৪৬টী পরগণায় বিভক্ত ছিল) ইহার আয়, ৩৫,৫০০০।

(১৪) ইলাভাস (এলাহাবাদ) প্রদেশ—এ প্রদেশ ও

এতদ্ সংলগ্ন ও ইহার অন্তর্গত প্রদেশ (dependencies)। —বিভাগসংখ্যা দেওয়া নাই, আয় ৭৭ লক্ষ ৩৮সহস্র মুদ্রা।

(১৫) দাক্ষিণাত্য প্রদেশ—৮টী সরকার ও ৭৯টী পরগণায় বিভক্ত। ইহার রাজকর, ১ ক্রোর, ৬২ লক্ষ, ৪৭৫০ মুদ্রা।

(১৬) বেরার প্রদেশ—১০টী সরকার ও ১৯১টী ক্ষুদ্র পরগণায় বিভক্ত। এ প্রদেশের রাজস্বের আয় ১ ক্রোর, ৫৮ লক্ষ, ৭৫০০ মুদ্রা।

(১৭) ক্যাণ্ডিস্ (খান্দেশ) প্রদেশ এ প্রদেশকে মেনুষী বৃহৎ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। ইহা হইতে আয় ১ ক্রোর ১১ লক্ষ ৫ সহস্র মুদ্রা।

(১৮) বাগলানা—(?) প্রদেশের ৪৩টী পরগণা হইতে ৬৮ লক্ষ, ৮৫ সহস্র মুদ্রা রাজস্ব আদায় হইত।

(১৯) নন্দে (?)—বিভাগের উল্লেখ নাই। ৭২ লক্ষ মুদ্রা এ প্রদেশ হইতে আদায় হইত।

(২০) বাঙ্গালা প্রদেশ—দুঃখের বিষয় ইহার বিভিন্ন বিভাগের আদৌ উল্লেখ করেন নাই। প্রবন্ধান্তরে অন্যান্য দেশী ঐতিহাসিকের বর্ণনা হইতে এ ভ্রম সংশোধিত হইবে। এ প্রদেশের রাজস্ব অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক অধিক, প্রায় দ্বিগুণ। চিরদিনই বঙ্গভূমি রত্নপ্রসবিনী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত, "দুইশত বৎসর পূর্ব্বে" প্রবন্ধে, অন্য বৈদেশিক পর্য্যটক-প্রদত্ত বর্ণনায় এ অনন্ত ধনরত্নসমৃদ্ধা সুজলাসুফলাশস্যশ্যামলা প্রদেশের অগণিত ধনরত্নরাজির কথা বর্ণনা করিয়াছি। কৌতূহলী পাঠকেরা এ প্রসঙ্গে সে প্রবন্ধের অনুসরণ করিতে পারেন। এ প্রদেশের আয় ৪ ক্রোর মুদ্রা! সাধে বর্ণিয়ে ও আবুল ফজল্ ইহাকে স্বর্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন!

(২১) উঝেন্ (উজ্জয়িনী) প্রদেশ—বিভাগসংখ্যা নাই, আয় দুই ক্রোর।

(২২) রাগেমল্ (রাজমহল্?) প্রদেশ—বিভাগের উল্লেখ নাই, রাজস্ব আদায় এক ক্রোর পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা।

(২৩) বিজাপুর ও কর্ণাট প্রদেশের অধিকাংশ—বিভাগসংখ্যা নাই। রাজস্ব আদায় ৫ ক্রোর।

(২৪) গোলকুণ্ডা ও কর্ণাট প্রদেশের বাকী অংশ—বিভাগের উল্লেখ নাই, রাজস্ব আদায় ৫ ক্রোর। এ প্রসঙ্গে আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত "রঙ্গ্‌মহল্" প্রবন্ধে গোলকণ্ডা প্রদেশের হীরক-খনি হইতে সমাহৃত উৎকৃষ্ট হীরক রাজকর স্বরূপ গৃহীত হইয়া মোগলরাজভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিত এ কথার উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে পাঠক মহাশয়েরা সে কথার স্মরণ রাখিবেন।

এই চতুর্ব্বিংশতি প্রদেশ অর্থাৎ অওরঙ্গ্‌জেবের অধিকৃত সমগ্র মোগলশাসিত ভারতবর্ষের রাজকর ৩৮ কোটী ৭ লক্ষ ৯৪ সহস্র মুদ্রা। এতদ্ব্যতীত রাজ্যের যে অন্যান্য আয় ছিল তাহারও উল্লেখ করিতেছি। মেনুষী বলেন যে সে সব সূত্রে আয়ও প্রায় ইহার সমান বা কিঞ্চিদধিক। ইহার বিস্তৃত তুলনাসূচক তালিকা মেনুষী দেন নাই সুতরাং শেষোক্ত সূত্রে প্রাপ্ত রাজকর যে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে রীতিমত সংগৃহীত রাজকর হইতে অধিক হইবে এ কথায় কিছু সন্দেহ হয়। সত্য হইলেও, যদি সমগ্র ভারতের রাজকর সকল হিসাবে ৮০ ক্রোর ধরা হয় তাহা হইলে সে অনুমান অন্যায় হয় না। আমরা প্রবন্ধান্তরে আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান ও অওরঙ্গ্‌জেবের সময়ের মুসলমান ঐতিহাসিকগণের তালিকা ও উক্ত নৃপতিদের স্বলিখিত (যাঁহার স্বলিখিত জীবনী আছে) বৃত্তান্ত হইতে এবং বিদেশীয় পর্য্যটকদের পদত্ত বর্ণনা হইতে সংগ্রহ করিয়া মোগল-সম্রাট্‌দের গৃহীত রাজকরের এক তুলনা-মূলক তালিকা দিব। ইহার সহিত ইংরাজ-সংগৃহীত আধুনিক ভারতবর্ষের রাজকরের তুলনা করিলে আমরা বিষয়টী বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

যে সব প্রদেশের পার্শ্বে একটী প্রশ্নসূচক চিহ্ন (?) আছে তাহারও সম্বন্ধে সত্যাসত্য আগামী প্রবন্ধে নির্ণীত হইবে।

উক্ত তালিকায় আর একটী বিষয় প্রণিধানযোগ্য। রাজস্বের আদায় হিসাবে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা প্রথম ও বাঙ্গালা প্রদেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। বহুদিন হইতে বাঙ্গালা প্রদেশের ধনরত্নের খ্যাতি চলিয়া আসিতেছে! আমরা পরে দেখিব যে সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিক আবুলফজলও মেনুষীর একথার সমর্থন করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত যে সব সূত্রে রাজকর সংগৃহীত হইত মেনুষী তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। একে একে তাহারও কথা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। সে সূত্রগুলি প্রধানতঃ এই :—

(১ম) মূর্ত্তিপূজক প্রত্যেক ভারতবাসী প্রজার উপর একটী কর গৃহীত হইত। এ করের নামই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "জেজিয়া"। সমদর্শী মোগলশ্রেষ্ঠ আকবর এ ঘৃণিত কর-গ্রহণ-প্রথা তুলিয়া দেন। তাঁহার অদূরদর্শী প্রপৌত্র অওরঙ্গজেব এ কর পুনঃপ্রচলিত করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ স্বহস্তে বপণ করিয়া যান! এ প্রসঙ্গে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এ কথা বলিতে আমরা বাধ্য যে আধুনিক ভারতে হিন্দু মুসলমানের ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া রাজ্য করা যদি কেহ সুশাসন মনে করেন তবে তাঁহারা অওরঙ্গজেবের মতই ভ্রান্ত ও অদুরদর্শী। সর্ব্বত্র সমদর্শী মহাকাল অভ্রান্ত অঙ্গুলিসঙ্কেতে ভারতের ভাগ্য-ফলকে এ কথা অনল-অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন! দূরদর্শী বুদ্ধিমান সুশাসকের সে বিষয়ে ভ্রান্ত হইবার কোনোও কারণ নাই! যাহা হউক, মেনুষী বলেন যে এই "জেজিয়া" আদায়ের তালিকায় মৃত্যু, দেশান্তর গমন ও আগমন প্রভৃতি কারণের সত্তার প্রায় ভ্রম থাকিয়া যাইত। স্থানীয় ফৌজদারেরা এ সব কারণে যথার্থ সংগৃহীত আয় গোপন বা কমাইবার জন্য এক মিথ্যা হিসাব (return) রচনা করিয়া দিতেন। সুতরাং এরূপ তালিকার, তাঁহার মতে, সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার উপায় ছিল না।

(২য়) মোগল-সম্রাট্‌দের উক্ত মূর্ত্তিপূজক প্রজারা যে সব পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করিত, তাহার উপর শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে কর আদায় করা হইত। মুসলমানেরা অওরঙ্গজেব-কর্তৃক এ করের দায় হইতে মুক্ত হন।

(৩য়) কার্পাস ও অন্যান্য রঙ্গীন্ বস্ত্রের রঞ্জন কার্য্যের উপরও কর নির্দ্ধারিত ছিল। বাঙ্গালার এরূপ রঞ্জিত বস্ত্রাদি যে প্রধান পণ্য বলিয়া গণিত বর্ণিয়ে এ কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪র্থ) হীরকখনিগুলিও, মেনুষী বলেন, সম্রাটের আয়ের আর এক প্রধান উপায়। আয়তনে ও ঔজ্জ্বল্যে যেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট অর্থাৎ আয়তনে যেগুলি ½ অংশ (?)—কোন্ রাশির ইহা ভগ্নাংশ সে কথা মেনুষী স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই—সেইগুলিই সম্রাট্ নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিতেন।

(৫ম) ভারতের সমুদ্রোপকূলস্থিত প্রধান বন্দর (seaports) গুলি আয়ের আর একটী প্রধান উপায়। সেগুলির নাম সিন্দি (সিন্ধু ?) বরোচ্, সুরাট্ ও ক্যাম্বে। এক সুরাট্ বন্দর হইতেই, মেনুষী বলেন, বন্দরে সমাগত পণ্যদ্রব্যের উপর সালিয়ানা আয় ৩০ লক্ষ ও মুদ্রাদির প্রকাশজনিত (coinage) লাভ ১১ লক্ষ।

(৬ষ্ঠ) সমগ্র করোমাণ্ডাল উপকূল ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী বন্দরগুলি হইতেই প্রভূত রাজস্ব আদায় করা হইত।

(৭ম) মুসলমানমাত্রই যাঁহারা সম্রাটের বেতনভোগী ভৃত্য, তাহার মৃত্যু হইলে তাহার সমস্ত সম্পত্তির উপর সম্রাটের অধিকার। মোগলরাজ-অনুশাসনমতে সম্রাটই তাহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তাহাদের অর্থ, তৈজসপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তাহাদের মৃত্যুর পর সকলই সম্রাটের প্রাপ্য হইত। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের ফৌজ্‌দার ও মনসব্‌দারের পত্নীরা স্বামীদের মৃত্যুর পর অপেক্ষাকৃত অল্প পেন্সন্ ভোগ করিতেন এবং তাঁহাদের পুত্রেরা কোনও বিশেষ গুণসম্পন্ন না হইলে নিঃস্ব হইয়া পড়িত।

(৮ম) অধীন রাজপুত নৃপতিদের প্রদত্ত রাজকরও মোগল-রাজভাণ্ডারের একটী প্রধান উল্লেখযোগ্য আয়।

উল্লিখিত বিভিন্ন অনুকূল উপায়ে মোগল-রাজস্ব ভূমির ফসল হইতে সংগৃহীত পূর্ব্বোল্লিখিত করের প্রায় সমতুল্য বা কিঞ্চিদধিক হইত। এই অপরিমিত ধনাগমের কথা শুনিয়া, মেনুষী বলেন, লোকে সহজেই বিস্মিত হয় কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে এই রাজস্বের অধিকাংশই দেশের উন্নতির ও উপকারার্থে ব্যয়িত হইত। অর্থাৎ, আমাদের দেশের মহাকবির কথায়, মোগলসম্রাটেরা, প্রজাদের 'ভূত্যর্থং', উন্নতির জন্যই, তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করিতেন, কারণ,—

'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং রবিঃ!'

ভগবান্ সহস্রাংশু সহস্র ধারায় বর্ষণ করিবার জন্যই পৃথিবীর রস শোষণ করেন! বৈদেশিক পর্য্যটকের এ উচ্চ প্রশংসা আধুনিক শাসনকর্ত্তাদের প্রণিধানযোগ্য। মেনুষী

বলেন যে রাজ্যের অর্দ্ধেক লোক সম্রাটের বেতনভোগী। রাজ্যের অগণিত রাজপুরুষ ও সৈনিক ব্যতীত, কৃষকেরা যাহারা সম্রাটের নিয়োজিত হইয়া কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত তাহারাও রাজবেতনভোগী। এতদ্ব্যতীত প্রধান প্রধান সহরের শ্রমজীবী শিল্পীকুলও সম্রাটের পরিবারের কার্য্যে নিয়োজিত বলিয়া সম্রাটের বেতনভুক্ত প্রজা বলিয়া পরিগণিত হইত। মেস্থুবী বলেন যে তদানীন্তন ভারতের প্রজাসাধারণ কতটা ও কিরূপে সম্রাটের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত উল্লিখিত ঘটনায় সে কথা সহজেই অনুমিত হইবে।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন

পঞ্চম ভাগ।

রসকর্পূর।

রসকর্পূরের ইংরাজি নাম কেলমেল (calomel), বৈজ্ঞানিক নাম মার্‌কিউরস্ ক্লোরাইড্ (mercurous chloride)। ইউরোপে এই দ্রব্য ষোড়শ শতাব্দীতে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে* কিন্তু ভারতে তাহার বহুপূর্ব্বে রসেন্দ্রচিন্তামণিকার ঢুণ্ঢুকনাথ এই রসকর্পূরকে "সর্ব্বরোগহর" বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। রসেন্দ্রসারসংগ্রহকার গোপালকৃষ্ণ এই রসকর্পূর বা সুধানিধিরসের গুণ বর্ণনকালে লিখিয়াছেন "ইহা দ্বারা উর্দ্ধরেচন হয়, সুতরাং দুই প্রহরান্তে পুনঃপুন শীতল জল পান করিবে। ইহা এক বৎসর সেবন দ্বারা সর্ব্ববিধ বিষদোষ, ছয় মাস সেবন দ্বারা গরলবিষ এবং একমাস সেবন দ্বারা সিংহদংশনজনিত বিষ বিনষ্ট হয়।" † রসেন্দ্রচিন্তামণি এবং রসেন্দ্রসারসংগ্রহ এই উভয় গ্রন্থই চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া অধ্যাপক রায় মহাশয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শার্ঙ্গধরও তাঁহার সংগ্রহ-গ্রন্থে এই রসকর্পূর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই—তিনি চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সংগ্রহ-গ্রন্থ লিখেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে ইউরোপে রসকর্পূরের ঔষধরূপে প্রচলনের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে উহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত। বাস্তবিক রসায়ন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রাচীন ভারত তাৎকালিক ইউরোপ হইতে অনেক বিষয়ে উন্নতজ্ঞানসম্পন্ন ছিল। এই রসকর্পূর-প্রস্তুত-প্রণালী ও তাহার রাসায়নিক ব্যাখ্যা অধ্যাপক রায় মহাশয়ের হিন্দুরসায়নের ইতিহাসে (পৃঃ ১৩৭—১৪৩) বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। এখানে এই বিষয়ের সামান্য আলোচনা করিব।

রসেন্দ্রচিন্তামণি* নিম্নলিখিত উপায়ে রসকর্পূর প্রস্তুত করিয়াছেন। 'একটি সুদৃঢ় স্থালীর চতুর্থাংশ লবণ দ্বারা পূর্ণ করিবে, তদুপরি পারদের চতুর্থাংশ সৈন্ধব এবং তদুপরি সৈন্ধবের সমান ফটকিরি প্রদান করিবে। ফটকিরি, সৈন্ধব, ও শোধিত পারদ, সমান পরিমাণে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া পর্প্পটি করিবে। সেই পর্প্পটি ভাণ্ডস্থ ফটকিরির উপর প্রদানপূর্ব্বক তাহার উপর পুনর্ব্বার ফটকিরি ও সৈন্ধবচূর্ণ প্রদান করিয়া তাহার উপর কতকগুলি খাপরা দিয়া তদুপরি একটি দৃঢ় স্থালী আচ্ছাদন করিয়া রুদ্ধ করিবে। পরে তিন দিবস অগ্নিতে পাক করিবে।'

ভাবপ্রকাশ† শোধিত পারদ, গিরিমাটি, ইষ্টক, খড়ি, ফটকিরি, সৈন্ধব লবণ, উইয়ের মাটি, ক্ষার লবণ, ভাণ্ডরঞ্জক মৃত্তিকা, প্রত্যেক দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়া চারি দিবস জাল দিয়া উদ্ধপাতনের দ্বারা রসকর্পূর প্রস্তুত করিয়াছেন। উপরোক্ত দুইটি উপায়ে রসকর্পূর প্রস্তুত কালে যে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। পারদ, ফটকিরি এবং লবণ এই তিনটি দ্রব্যের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া রসকর্পূর প্রস্তুত

* "It appears to have been used in the sixteenth century as a medicine, known by the name of draco mitigatus, manua metallorum, aquila alba, or mercurius dulcis"—Roscoe and Schorlemmer's Treatise on Chemistry, Vol. II, p. 1., Mercurous salts.

† "উর্দ্ধং রেদয়তি দ্বিযামমসকৃৎ পেয়ং জলং শীতলং।
এতদ্বস্তি চ বৎসরাবধি বিষং ষাণ্মাসিকং মাসিকং।
শৈলেযং গরলং মৃগেন্দ্রকুটিলোদ্ভূতঞ্চ তৎকালিকং।"

* রসেন্দ্রচিন্তামণি (উমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরত্নের সংস্করণ)—পৃঃ ৮।

† ভাবপ্রকাশ—পৃঃ ৬৪০।

হয়। ফট্‌কিরি (alum) উত্তপ্ত হইলে সালফিউরিক এসিড (Sulphuric acid) উৎপন্ন করে। এই এসিড খানিকটা পারদের সহিত সংযুক্ত হইয়া সাল্‌ফেট অব মার্কারি (Sulphate of mercury) এবং খানিকটা লবণের সহিত সংযুক্ত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক এসিড (hydrochloric acid) উৎপন্ন করিয়া থাকে। তাহার পর উৎপন্ন সালফেট অব মার্কারি এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিডের রাসায়নিক সংযোগে রসকর্পূর (mercurous chloride) প্রস্তুত হয়; পারদ, ফট্‌কিরি ও লবণ এই তিন দ্রব্যের সংযোগেই রসকর্পূর প্রস্তুত হয়, বাকি দ্রব্যগুলির বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। কেবল ভাবপ্রকাশে ব্যবহৃত গৈরিক ও ইষ্টকচূর্ণের অন্যতম উপাদান ফেরিক অক্‌সাইড্‌ এক প্রকার Catalytic agentএর কাজ করে। এইরূপ প্রস্তুত রসকর্পূর বিশুদ্ধ কেলমেল হইবে না, কেলমেল ও পার্‌ক্লোরাইড অব মার্কারির (perchloride of mercury) একটি মিশ্রণ (mixture) হইবে। এই শেষোক্ত দ্রব্যটি অত্যন্ত বিষাক্ত সেই জন্য প্রায়ই দেখা যায় যে কেলমেল খাইয়া অনেক রোগীর মুখে শোথ, ক্ষত প্রভৃতি হইয়াছে, এমন কি সময় সময় রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য কেলমেল ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উষ্ণ জলে উহাকে বেশ করিয়া ধৌত করিয়া লইতে হইবে কারণ ঐ প্রক্রিয়ায় জলে দ্রবনীয় (Soluble) পারক্লোরাইড অব মার্কারি জলে দ্রব হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে তিন বা চারি দিবস অগ্নিজাল দিবার ব্যবস্থা আছে। উহা কেবল অতিশয়োক্তি মাত্র, তিন চারি ঘণ্টাই যথেষ্ট।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঃ—

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয় তাঁহার Materia Medica of the Hindus নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে বাজারের রসকর্পূর কেলমেল ও পারক্লোরাইডের মিশ্রিত পদার্থ। ডাক্তার ওসাউনেসী O'Shaughnessy তাঁহার Manual of Chemistry তে (২৮৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে তিনি রসকর্পূর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রায় সকল নমুনাগুলিই কেলমেল, একটি নমুনায় বিশুদ্ধ পারক্লোরাইড পাইয়াছিলেন। অধ্যাপক রায় মহাশয় বাজার হইতে পাঁচটি নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সকলগুলিই কেলমেল, তাহাতে পারক্লোরাইড আদৌ নাই। আমরা এইরূপ বিভিন্ন লেখকের মতের অনৈক্য দেখিয়া বাজার হইতে রসকর্পূর ক্রয় না করিয়া কবিরাজ মহাশয়দিগের নিকট হইতে ক্রয় করিবার ইচ্ছা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলিকাতায় অনেকগুলি বড় বড় কবিরাজী দোকান অনুসন্ধান করিয়া উহা ক্রয় করিতে পারি নাই। সকলেই বলেন যে তাঁহারা রসকর্পূর রাখেন না, বাজারে বেণের দোকানে পাইবেন। কেহ কেহ বলিলেন যে তাঁহারা রসকর্পূরের মত বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করেন না। অগত্যা বেণের দোকান হইতে রসকর্পূর ক্রয় করিতে হইল। দেখিতে চেপ্‌টান, ছোট ছোট দানাদার, ঈষৎ ময়লা রংযুক্ত পদার্থ। গুঁড়া করিয়া পরীক্ষায় জানা গেল যে তাহাতে পারক্লোরাইড্‌ আদৌ নাই। বেণেকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে সে বড়বাজারে পাইকারের নিকট কিনিয়াছে, এদেশ-জাত কি বিদেশ-জাত ঠিক বলিতে পারিল না। আরও কয়েক জায়গার রসকর্পূরে পার্‌ক্লোরাইড পাই নাই। সে যাহা হউক কেলমেল ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে গরম জলে বেশ করিয়া ধৌত করিয়া লইলে পারক্লোরাইডের কোন ভয় থাকিবে না।

রসপুষ্পম্‌ ও সাবরম্‌

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে আজ কাল কবিরাজ মহাশয়েরা শাস্ত্রানুযায়ী রসকর্পূর প্রস্তুত করেন না। তাঁহারা কজ্জলী (পারদ ও গন্ধক) এবং লবণ একত্রে মিশাইয়া উৰ্দ্ধপাতনের দ্বারা রসকর্পূর প্রস্তুত করেন। অধ্যাপক রায় মহাশয়* বলিয়াছেন যে তিনি ঐ দুই দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ উপায়ে রসকর্পূর প্রস্তুত হইতে পারে না, উৰ্দ্ধপাতন কালে রসসিন্দূর উৰ্দ্ধপাতিত হয় এবং লবণ নিম্নে পড়িয়া থাকে। কিন্তু ডাক্তার এন্‌স্‌লি (Sir Whitlow Ainslie) তাঁহার মেটিরিয়া মেডিকা নামক গ্রন্থে মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত "রসপুষ্প" নামক ঔষধ প্রস্তুতের যে উপায় লিখিয়াছেন

* Ray: History of Hindu Chemistry, Vol. 1, p. 143 and 144.

তাহাতে কজ্জলী, লবণ এবং ইষ্টকখণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে।* একটি পাত্রে ১২ ভাগ গন্ধক গলাইয়া ৮০ ভাগ পারদের সহিত কজ্জলী করিবে। আর একটি পাত্রের অর্দ্ধেক ছোট ছোট ইষ্টকখণ্ডে পূর্ণ করিয়া তাহার উপর লবণ দিবে। দুইটি পাত্র একত্র করিয়া মুখবন্ধ করিয়া দ্বাদশ ঘণ্টা জ্বাল দিলে রসপুষ্প বা রসকর্পূর ঊর্দ্ধপাতিত হইবে। এখানে বোধ হয় ইষ্টকখণ্ডের অন্যতম উপাদান ফেরিক অক্সাইড Catalytic agent এর কার্য্য করিয়া রসকর্পূর প্রস্তুত করিতেছে। এইরূপ উপায়ে প্রস্তুত "রসপুষ্প" কেলমেল ও পার্‌ক্লোরাইডের মিশ্রণ বলিয়া তিনি নির্ণয় করিয়াছেন। এখানে গন্ধক ও পারদের যে ভাগ লওয়া হইয়াছে তাহা আধুনিক atomic theoryর অনুযায়ী (৩২ : ২০০)। এ বিষয়ে পরীক্ষা চলিতেছে, পরীক্ষার ফল বারান্তরে প্রকাশ্য।

ডাক্তার এন্‌স্‌লি "রসপুষ্প" ভিন্ন আরও একটি ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার নাম "সবিরম্‌" (?) (সৌবীরম্‌)।† এই ঔষধ তামিল-বৈদ্যগণ অতি অল্পমাত্রায় ব্যবহার করেন এবং ইহার প্রস্তুতপ্রণালী "পুরাণশাস্ত্রে" (?) লিখিত আছে। এই প্রস্তুত প্রণালী হইতে বুঝা যায় যে বিশুদ্ধ পার্‌ক্লোরাইড অব মার্কারি প্রস্তুত করিবার উপায় ভারতবাসী অবগত ছিলেন। বঙ্গদেশ অঞ্চলে পারদের গন্ধকঘটিত যৌগিক (Sulphide of mercury) এবং রসকর্পূর এই দুইটি পারদঘটিত যৌগিকই প্রচলিত আছে। বিশুদ্ধ পার্‌ক্লোরাইড প্রস্তুত-প্রণালী যে তামিল বৈদ্যগণের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহা ডাক্তার এন্‌স্‌লির গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। নিম্নলিখিত উপায়ে তামিল বৈদ্যগণ পার্‌ক্লোরাইড প্রস্তুত করিয়া থাকেন। প্রথমে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে রসপুষ্প প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে সেই রসপুষ্প ৮০ ভাগ, সমপরিমাণ লবণ, ৪০ ভাগ তুঁতে, ২০ ভাগ ফট্‌কিরি, ২০ ভাগ সোরা, ২০ ভাগ পূণীর (ক্ষারাত্মক মৃত্তিকা), ১০ ভাগ হীরাকস এবং ৫ ভাগ নবসার (নিশাদল)—এই সকল দ্রব্য একত্রে মর্দ্দনপূর্ব্বক একটি বোতলের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ভর্ত্তি করিয়া ৩৬ ঘণ্টা জ্বাল দিতে হইবে। অবশ্য বোতলের গাত্রে কাদা লেপিয়া উহাকে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর বোতল ভাঙ্গিয়া গলদেশে সংলগ্ন পার্‌ক্লোরাইড্‌ গ্রহণ করিতে হইবে।* এই উপায়ে রসপুষ্পের অন্যতম উপাদান কেলমেলকে (mercurous chloride) পার্‌ক্লোরাইডে (mercuric chloride) পরিণত করা হইয়াছে। প্রথমে তুঁতে, ফট্‌কিরি এবং হীরাকস হইতে সাল্‌ফিউরিক এসিড উৎপন্ন হয়, সেই এসিড সোরার সহিত সংযুক্ত হইয়া নাইট্রিক এসিড (nitric acid) উৎপন্ন করে। খানিকটা সাল্‌ফিউরিক এসিড লবণ ও নিশাদলের সহিত সংযুক্ত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক এসিড (hydrochloric acid) উৎপন্ন করে। এই দুই উৎপন্ন এসিডের সংযোগে ক্লোরিন (chlorine) নামক গ্যাস উৎপন্ন হইয়া কেলমেলকে পার্‌ক্লোরাইডে পরিণত করে। হলাণ্ড (Holland) দেশে আজ পর্য্যন্ত এই উপায়ে পার্‌ক্লোরাইড্‌ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যবক্ষার।

যবক্ষার চরক ও সুশ্রুতের সময় হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যবক্ষারের অনেকগুলি প্রতিশব্দ আছে যথা—যবাগ্রজ, যবলাস, যবশূক, যবনালজ, যবজ, যবাপত্য।†

এই সকল প্রতিশব্দ হইতে বুঝা যায় যে যব ভস্ম করিয়া যে ক্ষার পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকেই যবক্ষার বলে। "যবের শুঁয়া দগ্ধ করিয়া একসের পরিমিত সেই ভস্ম, ৬৪ সের জলে গুলিবে, এবং একখানি মোটা কাপড় দিয়া সেই জল ক্রমে ক্রমে ২১ বার ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে সেই জল কোন পাত্রে করিয়া তীব্র অগ্নিতে জ্বাল দিবে; শেষে চূর্ণবৎ যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারই নাম যবক্ষার।"‡ এইরূপে প্রস্তুত ক্ষার অবশ্য অবিশুদ্ধ কার্ব্বনেট্‌ অব পটাশ (Carbonate of Potash) হইবে। কিন্তু অধিকাংশ অভিধানে যবক্ষারের অর্থ সোরা দেওয়া হইয়াছে, এমন কি উইল্‌সন (Wilson) এবং মনিয়ার উইলিয়ামস্‌ (Monier Williams) প্রণীত সংস্কৃত-ইংরাজী

* O'Shaughnessy's Manual of Chemistry, p. 288.

† Ibid. p. 289.

* O'Shaughnessy's Manual of Chemistry, p. 289-290.

† বিশ্বকোষ—যবক্ষার।

‡ কবিরাজী-শিক্ষা—প্রথম ভাগ, ৩৩৭ পৃঃ।

অভিধানেও যবক্ষারের ঐ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। এই অর্থ অনুযায়ী নাইট্রোজেন (nitrogen) নামক গ্যাস বাঙ্গালায় যবক্ষারজান নামে অভিহিত হইয়াছে। সোরার বৈজ্ঞানিক নাম নাইট্রেট অব পটাশ (nitrate of potash) এবং যব হইতে প্রস্তুত যবক্ষার, কার্ব্বনেট অব পটাশ—দুই দ্রব্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ—ভিন্ন ভিন্ন কবিরাজী দোকান ও বাজার হইতে যবক্ষার ক্রয় করা হয়। পরে পরীক্ষায় জানা গেল যে কবিরাজ মহাশয়েরা যে দ্রব্য যবক্ষার বলিয়া ব্যবহার করেন, তাহা নাইট্রেট অব পটাশও নহে কার্ব্বনেট অব পটাশও নহে।

প্রথম নমুনা। কলিকাতার কোন বিখ্যাত কবিরাজী দোকান হইতে ক্রীত। ইহা সলফেট্ অব পটাশ (Sulphate of potash) এবং ক্লোরাইড্ অব পটাশ (Chloride of potash)—এই দুই দ্রব্যের সংমিশ্রণ। সালফেটের ভাগই বেশী, ক্লোরাইডের ভাগ অনেক কম। কার্ব্বনেট নাই।

দ্বিতীয় নমুনা। কলিকাতার আর একটি বিখ্যাত কবিরাজী দোকান হইতে ক্রীত। ইহাও উপরোক্ত দুইটি দ্রব্যের সংমিশ্রণ।

তৃতীয় নমুনা। কলিকাতার সিমলা বাজারের কোন বেণের দোকান হইতে। ইহাও উপরোক্ত দুইটি দ্রব্যের সংমিশ্রণ। ইহাতে ক্লোরাইডের ভাগ খুব কম। দেখিতে শাদা ডেলার মত।

উপরোক্ত রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইতে দেখা যাইতেছে যে আজকাল বাজারে এবং কবিরাজ মহাশয়দের দোকানে যাহা যবক্ষার বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তাহা কার্ব্বনেট নহে, সলফেট ও ক্লোরাইডের সংমিশ্রণ।

ক্লোরাইড অব পটাশ হইতে সালফিউরিক্ এসিডের সংযোগে হাইড্রোক্লোরিক এসিড প্রস্তুত করিবার পর যে দ্রব্য পড়িয়া থাকে, তাহাই যবক্ষার বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে। এখন বুঝা যাইতেছে কেন কবিরাজ মহাশয়েরা যবক্ষারের দ্বারা হরিতালভস্ম প্রস্তুত করিতে সক্ষম নহেন। কার্ব্বনেট অব পটাশ হরিতালের সহিত রাসায়নিক ভাবে সংযুক্ত হয়, সলফেড বা ক্লোরাইড অব পটাশ হয় না। সেইজন্য কার্ব্বনেট না ব্যবহার করিয়া সলফেট্ বা ক্লোরাইডের সহিত হরিতাল উত্তপ্ত করিয়লে হরিতাল বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবে।

যব ভিন্ন আরও অনেক স্থলজ বৃক্ষ পোড়াইয়া তাহার ক্ষার ব্যবহৃত হইত। অধিকাংশ স্থলজ বৃক্ষ পোড়াইলে অবিশুদ্ধ পোটাসিয়াম কার্ব্বনেট পাওয়া যায়। অনেকেই জানেন যে কদলীবৃক্ষ পোড়াইয়া যে ক্ষার পাওয়া যায়, তাহা এখনও পর্য্যন্ত বস্ত্রাদি ধৌত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুশ্রুতে নিম্নলিখিত বৃক্ষলতা পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন* —ঘণ্টাপারুল, কুড়চি, অশ্বকর্ণ (লতাশাল বৃক্ষ), পরিভদ্রক (পালিদা মান্দার), বহেড়া, সোন্দাল, তিল্বক (লোধবৃক্ষ), আকন্দ, মনসাসীজ, আপাং, পারুল, ডহরকরঞ্জা, বাকস, কদলী, রক্তচিতা, নাটাকরঞ্জ, ইন্দ্রবৃক্ষ (কুটজ বিশেষ), আস্ফোতা (অনন্তমূল), অশ্বমারক (করবী), ছাতিম, গনিয়ারী, কুঁচ, এবং ঘোষাবৃক্ষ। যে সকল দেশে (যথা কেনেডা, উত্তর আমেরিকা, মোরেভিয়া, দক্ষিণ রুষিয়া, হঙ্গারী ইত্যাদি) স্থলজবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে সেই সকল দেশে এখনও পর্য্যন্ত বৃক্ষাদি দগ্ধ করিয়া তাহাদের ভস্ম হইতে কার্ব্বনেট অব পটাশ প্রস্তুত হয় †।

সর্জ্জিকাক্ষার।

যেমন স্থলজ বৃক্ষলতাদি দগ্ধ করিয়া তাহাদের ভস্ম হইতে কার্ব্বনেট অব **পটাশ** পাওয়া যায়, সেইরূপ জলজ এবং সমুদ্রতীরজাত বৃক্ষলতাদি দগ্ধ করিয়া তাহাদের ভস্ম হইতে কার্ব্বনেট অব সোডা (carbonate of soda) প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিশরদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে এই সেডা বা ট্রোনা (Trona) সাবান ও কাঁচ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। ভারতেও ইহা প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল, চরক ও সুশ্রুতে ইহার উল্লেখ আছে। বাজারে সাজিমাটি বলিয়া যাহা বিক্রয় হয়, তাহা মৃত্তিকামিশ্রিত কার্ব্বনেট অব সোডা। পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন লবণাক্ত মৃত্তিকার উপর এক প্রকার সামুদ্রিক লতা জন্মায়, তাহা দগ্ধ করিয়া

* সুশ্রুতে চিকিৎসিত-স্থান, ক্ষারপাকবিধি।

† Roscoe and Schorlemmer: Vol. II, p. 92.

সর্জ্জিকাক্ষার প্রস্তুত হয়। উহার প্রস্তুতপ্রণালী "Report on Punjab Products"এ বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।*

রাসায়নিক পরীক্ষা।—ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত সর্জ্জিকাক্ষার পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন যে উহা অবিশুদ্ধ কার্ব্বনেট অব সোডা। আবর্জ্জনা—সালফেট অব সোডা, পটাশ ইত্যাদি। আমি পরীক্ষা করিবার জন্য কতিপয় স্থান হইতে সর্জ্জিকাক্ষার আনয়ন করি কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে সর্জ্জিকাক্ষার লইয়া নমুনা-বিভ্রাটে পতিত হইতে হইয়াছে। কোনটি অপরটির সহিত বর্ণে মিলে না—কোনটি শ্বেত, কোনটি ধূসর, কোনটি জলে সম্পূর্ণ দ্রবণীয়, আবার কোনটি জলে দ্রবণীয় নহে।

প্রথম নমুনা। চট্টগ্রাম হইতে কোন কবিরাজ মহাশয়ের প্রদত্ত। উহাতে কার্ব্বনেট খুব কম। দেখিতে ধূসর বর্ণের গুঁড়া, কোনওরূপ মৃত্তিকা হইবে।

দ্বিতীয় নমুনা। কলিকাতার কোনও বেণের দোকানে ক্রীত। ইহা সাজিমাটি।

তৃতীয় নমুনা। কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ কবিরাজের দোকান হইতে ক্রীত। দেখিতে শ্বেতবর্ণ। কার্ব্বনেট নাই। জলে সম্পূর্ণ দ্রবণীয়। উহা সল্‌ফেট্ অব সোডা এবং ক্লোরাইড্ অব সোডা (Sulphate and Chloride of Sodium)—এই দুই দ্রব্যের সংমিশ্রণ, ক্লোরাইডের ভাগ খুব কম।

চতুর্থ নমুনা। কলিকাতার অপর কোন প্রসিদ্ধ কবিরাজের দোকান হইতে ক্রীত। ইহাও উপরোক্ত সালফেট ও ক্লোরাইড অব সোডার সংমিশ্রণ। ক্লোরাইডের ভাগ অল্প।

উপরোক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষা হইতে দেখা যাইতেছে যে কবিরাজ মহাশয়েরা সাল্‌ফেট্ অব সোডাকে (ক্লোরাইড অব সোডা মিশ্রিত) সর্জ্জিকাক্ষার বলিয়া ব্যবহার করিতেছেন। লী ব্লাঙ্ক (Le Blanc)এর মতে প্রস্তুত Salt cake নামক পদার্থই সর্জ্জিকাক্ষাররূপে প্রচলিত হইতেছে।

মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণ ক্ষার

এই তিনপ্রকার ক্ষার সুশ্রুত অস্ত্রচিকিৎসায় বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। আধুনিক আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসা হইতে অস্ত্রচিকিৎসা বহুকাল বিদায় গ্রহণ করাতে এই সকল ক্ষার পদার্থ আর ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু এই প্রাচীন ক্ষারপাকবিধি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া আমরা এখানে ইহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মৃদুক্ষার—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে যব ভিন্ন আরও অনেক স্থলজ বৃক্ষলতার ভস্ম হইতে ক্ষার প্রস্তুত করা হইত। ঘণ্টাপারুল, কুড়চি, অশ্বকর্ণ, পরিভদ্রক প্রভৃতি বৃক্ষকে দগ্ধ করিয়া তাহাদের ভস্ম হইতে এই মৃদুক্ষার প্রস্তুত হইত। সংক্ষেপে ইহার বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল, যাঁহারা সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানে ক্ষারপাকবিধি পাঠ করিবেন। ঘণ্টাপারুল ভস্ম দুই ভাগ, কুড়চি প্রভৃতির ভস্ম এক ভাগ মোট সমুদায় ৩২ সের মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক ১৯২ সের জল (বা গোমূত্র) সহ মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রদ্বারা ২১ বার ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে সিটেগুলি বাদ দিয়া ক্ষারজল একখানি বড় কড়ায় রাখিয়া চুল্লীর উপর জ্বাল দিবে ও ধীরে ধীরে হাতা দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে বেশ স্বচ্ছ, রক্তবর্ণ, তীক্ষ্ণ ও পিচ্ছিল হইবে তখন আবার বস্ত্র দ্বারা পুনরায় ছাঁকিয়া সিটে বাদ দিবে। এইরূপে প্রস্তুত ক্ষারজল মৃদুক্ষার (mild carbonated alkali) হইবে।

মধ্যমক্ষার—ঐ মৃদুক্ষার অর্থাৎ কার্ব্বনেট হইতে মধ্যমক্ষার (caustic alkali) প্রস্তুত করিতে হইলে আধুনিক রাসায়নিক, চূণের সহিত কার্ব্বনেটকে উত্তপ্ত করেন। সুশ্রুতও তাহাই করিয়াছেন। উপরোক্ত ক্ষারজলের ১॥০ সের আলাদা রাখিয়া বাকি জল চুল্লীর উপর চাপাইবে এবং বাটশর্করা (নাটা), ভস্মশর্করা (burnt limestone), ঝিনুক ও শঙ্খনাভি এই চারি দ্রব্য অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া যে চূর্ণ প্রস্তুত হইবে তাহার মোট ৪ সের উক্ত পৃথককৃত ১॥০ সের ক্ষারজলসহ পেষণপূর্ব্বক চুল্লীস্থ ক্ষার

---

* Dutt's Materia Medica ...

এমনভাবে পাক করিবে যে উহা অত্যন্ত তরল না হয়। তৎপরে উহা চুল্লী হইতে নামাইয়া একটি লৌহকলসীমধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করতঃ নির্জ্জনস্থানে রাখিয়া দিবে। ইহাকে মধ্যবীর্য্যক্ষার বলে। ইহাকে মধ্যবীর্য্যক্ষার না বলিয়া "তীক্ষ্ণ" (caustic) ক্ষার বলিলে আমরা সুখী হইতাম। সুশ্রুতের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় না, তিনি চূণ দিয়া পাক করিয়া যে অদ্রবণীয় কেলসিয়াম কার্ব্বনেট (insoluble calcium carbonate) হয় তাহা ছাঁকিয়া ফেলিবার উপদেশ দিয়াছেন কি না। ঐটুকু এই বর্ণনায় যোগ করিয়া লইতে হইবে।

তীক্ষ্ণক্ষার—ইহা একটি স্বতন্ত্র ক্ষার নহে। পূর্ব্বোক্ত মৃদুবীর্য্যক্ষারের সহিত কতকগুলি গাছগাছড়ার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। বাস্তবিক "তীক্ষ্ণ" শব্দ "মধ্য"বার্য্যক্ষারের প্রতিই প্রযোজ্য। মৃদুবীর্য্যক্ষারের দন্তী, দ্রবন্তী, রক্তচিতার মূল, গনিয়ারী, নাটাকরঞ্জের পল্লব, তালমূলী, বিটলবণ, সুবর্চ্চিকা (সাফাক্ষার বিশেষ), কর্ণকক্ষীরী, হিং, বক ও মিটাবিষ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক পাক করিয়া তীক্ষ্ণবীর্য্যক্ষার প্রস্তুত হয়।

ক্ষারপাকবিধিতে রসায়নের জ্ঞান।

এই ক্ষারপাকবিধিতে আধুনিক উন্নত রসায়নের জ্ঞান বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহার কয়েকটি নিদর্শন নিম্নে দিতেছি। আমরা দুইপ্রকার ক্ষারের অস্তিত্ব স্বীকার করি—মৃদু ও তীক্ষ্ণ। শাস্ত্রে যাহাকে "মধ্যম" বলা হইয়াছে তাহাকেই এখানে "তীক্ষ্ণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

১। তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত করিয়া "লৌহপাত্রে" রাখিয়া দিবার উপদেশ আছে। এই লৌহপাত্রে ক্ষাররক্ষা রসায়নসাপেক্ষ, কারণ লৌহ ক্ষারের দ্বারা অতি অল্প আক্রান্ত হয়।

২। ক্ষারকে "মুখবন্ধ" করিয়া রাখিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। মুখবন্ধ করিয়া না রাখিলে, তীক্ষ্ণক্ষার বায়ুর: কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের (carbonic acid gas) সহিত সংযুক্ত হইয়া মৃদুক্ষারে পরিণত হইবে।

৩। তীক্ষ্ণক্ষার কালবশতঃ ক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে একথা সুশ্রুতও বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য হীনবীর্য্য হইবার কারণ বায়ু হইতে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস আকর্ষণ করা। ক্ষার ঐরূপ হীনবীর্য্য হইয়া যাইলে তাহাকে বীর্য্যবান করিবার জন্য পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পাক করিতে হইবে এ উপদেশও সুশ্রুত দিয়াছেন।

৪। ক্ষারের যে সকল গুণ বর্ণনা আছে তাহার কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল—তীক্ষ্ণ (caustic), ঈষৎ শ্বেতবর্ণ, পিচ্ছিল (soapy to the touch), উষ্ণ ও জ্বালাকর।

৫। তেজ প্রশমন (neutralisation): সুশ্রুত বলিয়াছেন যে পীড়িত স্থান ক্ষারদ্বারা দগ্ধ করিলে দাহ বা জ্বালা উপস্থিত হয়, এই জ্বালা নিবারণের জন্য দগ্ধস্থানে ঘৃত ও মধুসহ অম্লবর্গ (acids) প্রয়োগ করিবে। পরে বলিতেছেন "এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে অগ্নিতুল্য ক্ষারের তেজ আগ্নেয় অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বীর্য্যহেতু অগ্নিগুণ-বিশিষ্ট কাঞ্জিকাদি দ্বারা কি প্রকারে প্রশমিত হয়? ইহার উত্তর এই যে ক্ষারদ্রব্যে অম্লরস ব্যতিরেকে আর সকল প্রকার রসই বর্ত্তমান আছে; আবার তন্মধ্যে ক্ষারদ্রব্যে কটুরস ও লবণরসের আধিক্য দেখা যায়। সুতরাং অম্লরসের সহিত লবণরস সংযুক্ত হওয়ায় মাধুর্য্যগুণ প্রাপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণতাবিহীন হইয়া থাকে। অতএব কাঞ্জিকাদি দ্বারা ক্ষারের তেজ নষ্ট হয়।" এই উক্তিতে অম্লের (acid) দ্বারা ক্ষারের (alkali) তেজপ্রশমনের (neutralisation) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আভাস পাওয়া যায়। সুশ্রুত বলিতেছেন যে এই তেজপ্রশমনের কারণ এই যে, অম্লের অম্লরস ক্ষারের লবণরসের সহিত সংযুক্ত হয়। আধুনিক রসায়ন পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে অম্ল ও ক্ষার সংযুক্ত হইয়া একপ্রকার সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করে, ঐ দ্রব্যকে সল্ট (salt) নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং উহাতে অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব উভয়ই নাই।

রাজসাহী কলেজ। শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

স্বপ্রকাশ

(উপনিষদের, "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥
শ্লোক অবলম্বনে)

পূজার শঙ্খ　　বাজিয়া স্তব্ধ
হয়েছে কতক্ষণ,
পড়া হ'য়ে গেছে　　পূজার মন্ত্র
নিদ্রিত তবু মন।
সন্ধ্যা আঁধার　　এসেছে ঘনায়ে
সারাটী বিশ্ব　　দেখি আবছায়ে,
কেহ নাই তবু পশে যেন কানে
গম্ভীর আবাহন,
মোহ-ঘোর সম　　ছুটিতে না চায়
নিদ্রিত তবু মন।

ওগো পুরোহিত　　কি আছে তোমার
মন্ত্র সম্মোহন?—
শুনায়ে আমায়　　কর সে মন্ত্রে
নিশ্বাসে সচেতন।
গাহ স্বর্গের　　মহা সঙ্গীত
কর এ চিত্তে　　সংশয়াতীত
মহাপুরোহিতে মেঘের মতন
ক'রোনা সংগোপন,
জাগ্রত কর　　নব আনন্দে
নিদ্রিত মোর মন!

তুচ্ছ সেথায়　　শাস্ত্রের কথা
মন্ত্র উচ্চারণ,
প্রকাশ তাঁহার　　সূর্য্যের মত
উজ্জ্বল দরশন!
অথবা তথায়　　চন্দ্র তারকা
সূর্য্যের ভাতি　　নাহি যায় দেখা
তাঁহারি দীপ্তি উজ্জ্বল করে
বিজলী, বহ্নি　　দীপ্তিবিহীন
নিদ্রিত যেথা মন!

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবীন সন্ন্যাসী

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা নয়টার সময় গদাই পাল দরিয়াপুরে পৌছিয়া, মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে কাযকর্ম্ম, কাগজপত্র ও তহবিল বুঝিয়া লইল। বৈকালে মথুরানাথ গৃহযাত্রা করিলেন।

নূতন কাযে ভর্ত্তি হইয়া গদাই অত্যন্ত সাধুভাব ধারণ করিল। নাপিত ডাকাইয়া নিজের গোঁফযোড়াটি কামাইয়া ফেলিল। কার্য্যের অবসরে একটি হরিনামের ঝুলি হাতে করিয়া খড়ম পায়ে দিয়া বেড়াইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ দেখিলেই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। সাধু সন্ন্যাসী পাইলে, কাছারিতে আনিয়া তাহাদের চর্ব্বচোষ্য আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। ছোট বড় সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোককে মাতৃ সম্বোধন করিয়া, অন্যায় উপার্জ্জনের সহিত গোরক্ত ও ব্রহ্মরক্তের তুলনা দিয়া, গরীব দুঃখী প্রজাকে নিজের পুত্রস্থানীয় স্বীকার করিয়া, অল্পদিনেই গদাধর গ্রামে বিলক্ষণ পশার করিয়া লইল। সকলেই তাহার দয়াধর্ম্ম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল।

এইরূপে এক সপ্তাহ অতীত হইল। সপ্তাহান্তে গদাই কল্যাণপুরে গিয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। একটি নির্জ্জন কক্ষে বাবু বসিয়া ছিলেন, সেইখানেই গদাধরের তলব হইল। বাবু বলিলেন—"কি হে গদাই—ওদিকের সব খবর কি?"

"আজ্ঞে আপনার শ্রীচরণ-আশীর্ব্বাদে সব মঙ্গল। আমি গিয়ে পর্য্যন্ত ২৭২৬৹ তসিল হয়েছে। পনেরো দিনের মধ্যে আরও তিন চারশো টাকা তসিল হবার আশা আছে। ছোটলোক প্রজা কিনা—বড় সব ঠেঁটা।"

"বেশ। মহালের সব গ্রাম দেখা হয়েছে?"

"আজ্ঞে না—সব হয়নি। কতকগুলো এখনও বাকী

[illegible] ১১টা অবধি কাছারি

করে, তার পর স্নানাহার করে নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে বেলা ১টার সময় মহাল দেখতে বেরুতাম। সন্ধ্যার সময় ফিরে আসতাম। সমস্ত গ্রামেই দেখলাম হুজুরের দোর্দ্দিণ্ড প্রতাপ—জমিদারের নামে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাচ্ছে। দেখে বড় আনন্দ হল।"

গদাই পালের চাটুবাক্যে গোপীকান্তবাবু অত্যন্ত খুসী হইলেন। বলিলেন—"বেশ, বেশ। তুমি যেমন পরিশ্রমী দেখছি, শীঘ্রই নিজের উন্নতি করে নিতে পারবে।"

গদাই নতমস্তকে বলিল—"হুজুরের দয়া হলে সবই হতে পারে।"

জমিদারী সংক্রান্ত আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তাহার পর বাবু বলিলেন—"তার পর, সে বিষয়টা সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করলে?"

"আজ্ঞে, হুজুরের যে রকম হুকুম ছিল, কেবল নজরটা মাত্র রেখেছিলাম—তাও অতি সাবধানে, কেউ সন্দেহটি না করতে পারে। কেনারামের বাড়ীর পাশ দিয়ে সর্ব্বদা যাতায়াত করতাম। মফস্বল পরিদর্শন শেষ হয়ে গেলে, একটু অসুবিধে হবে—কারণ বিনা ওজরে সর্ব্বদা কি করে যাব? তাই একটা উপায় ঠাউরেছি—কিন্তু হুজুরের অনুমতি সাপেক্ষ।"

বাবু বলিলেন—"কি উপায়, বল।"

"আজ্ঞে, ঐ কেনারামের বাড়ীর কাছেই, খানিকটে জায়গা পড়ে আছে। একঘর প্রজা ছিল, ফৌত হয়েছে, ওয়ারিশানও কেউ নেই—সে জমিটুকু সরকারেই অর্শেছে। তাই মনে করেছি, সেইখানটা পরিষ্কার করিয়ে একটা ফলের বাগান তৈরি করতে সুরু করি। চারিদিক বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরিয়ে, আতা, নেবু, কিছু কলা, গোলাপজাম, নারকুলে কুল—এই সব লাগিয়ে দিই, সেই উপলক্ষ্য করে সর্ব্বদাই ওদিকে যাতায়াত হবে—কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না।"

বাবু বলিলেন—"এ উত্তম প্রস্তাব। আমি মঞ্জুর করলাম। মাঝখানে একটা আটচালা গোছ তুলে দিও। মেঝেটা আধ হাত আন্দাজ উঁচু করে পাকা করে গাঁথিয়ে নিও। এমন কি মাঝে মাঝে সেখানে বসে কাছারিও করতে পারবে।"

"হ্যাঁ—তা হলে ত খুব ভালই হয়। ফলের চারার কি করি তাই ভাবছি।"

বাবু বলিলেন—"তার জন্যে চিন্তা কি? বাগানবাড়ীতে ফলের অনেক চারা আছে। কতকগুলো চারা তুলিয়ে খান দুই গোরুর গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে যেও।"

"হ্যাঁ। তাই করব। একটা কথা নিবেদন পাবার ছিল। একটা বিষয়ে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।"

"কি?"

"ঐ কেনারামের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে, একদিন দেখলাম একজন লোক, ওর বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে। লোকটি দেখতে নিতান্ত চাষাভূষো দলের মত নয়। তাই আমার মনে হটাৎ কেমন একটু সন্দেহ হল। বগলে ছাতি, গায়ে একটি হাতকাটা পিরাণ, গলায় উড়ানি জড়ান—বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। কেনারামের বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে। দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—'নিবাস কোথা?'—সে বল্লে—'আমার বাড়ী সাজিয়াড়া গ্রামে।' 'তোমার নাম কি?'—'শ্রীরমণচন্দ্র ঘোষ।'—'আপনারা?'—'আমরা গোয়ালা।' জিজ্ঞাসা করলাম—'তোমায় কোথা যেন দেখেছি দেখেছি না?'—সে বল্লে—'কোথা?'—'এই দিন আষ্টেক হল—বাবুদের বাড়ী, কল্যাণপুরে?'—কথাটা শুনে লোকটা যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। তাই দেখে আমার আরও সন্দেহ হল। জিজ্ঞাসা করলাম—'এখানে কি মনে করে আসা হয়েছিল?' বল্লে—'একটু বরাৎ ছিল।'—বলে লোকটা চলে গেল। আজ আবার আসবার সময় পথে দেখি, সেই লোকটা দরিয়াপুরের দিকে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম—'কি ঘোষের পো, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' —বল্লে—"যাচ্ছি খাজনা সাধতে হরবোলায়।'—ফিরে গিয়ে খবর নিতে হবে দরিয়াপুরে গিয়েছিল কি না।"

এই কথা বলিয়া গদাই পাল নীরব হইল। গোপীকান্ত বাবু একটু চিন্তিত স্বরে বলিলেন—"সাজিয়াড়ার রমণ ঘোষ?"

"আজ্ঞে তাই ত বল্লে।"

"কৈ সম্প্রতি ত তাকে এখানে দেখিনি।"

"আজ্ঞে আমি ত দুদিন উপরি উপরি এখানে তাকে দেখেছি। হয়ত দেওয়ানজির কাছে কোনও কাজে এসেছিল।"

বাবু দেওয়ানকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দেওয়ান আসিয়া বলিল—রমণ ঘোষ দুইদিন আসিয়াছিল বটে, কিন্তু কাছারিতে আসে নাই। ছোট বাবু মহাশয়ের বৈঠকখানায় গিয়াছিল। বলিয়া দেওয়ান চলিয়া গেল।

বাবু বলিলেন—"দেখ গদাই—তুমি গিয়ে গোপনে খবর নিও, রমণ ঘোষের সঙ্গে কেনারামের কোন রকম আত্মীয়তা আছে কি না। আর, আজকালই যাতায়াত আরম্ভ করেছে না পূর্ব্বে থেকে যাতায়াত ছিল।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি গিয়েই অনুসন্ধান করব। যে রকম হয় আপনাকে জানাব।" বলিয়া গদাই বাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

কাছারিবাড়ীর প্রাঙ্গন পার হইয়া, ছোট বাবুর বৈঠকখানার সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে গদাই দেখিল, বারান্দার নিম্নে সিঁড়ির পার্শ্বে কতকগুলা ঝাড়ু দেওয়া ময়লা জমা রহিয়াছে—তাহার সঙ্গে একখানা পোষ্টকার্ড। কৌতূহলবশতঃ গদাই সেখানা উঠাইয়া লইল। দেখিল একখানা পুরাতন চিঠি, মোহিতলাল বাবুর নামে ঠিকানা রহিয়াছে। আশে পাশে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া গদাই সেখানি নিজের পকেটে রাখিয়া দিল।

বাসায় গিয়া, আহারাদি করিয়া, কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর বৈকালে উঠিয়া গদাই অশ্বারোহণে বাগানবাড়ীতে গিয়া দর্শন দিল। ফটক পার হইয়া, বরাবর মালীর কুটীরের নিকট গিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। নিকটে একটা পেয়ারাগাছ ছিল, মালী তাহাতেই অশ্বকে বাঁধিয়া দিল।

গদাই বলিল—"কি মালী, ভাল আছ ত?"

"আজ্ঞে আপনার আশীর্ব্বাদে।"

"বাবু কিছু হুকুম পাঠিয়েছেন?"

"হ্যাঁ—একজন দরোয়ান এসে বলে গেছে যে দরিয়াপুরের কাছারিতে কিছু ফলের চারা পাঠাতে হবে।"

"হ্যাঁ—তাই আমি এসেছি। চল বাগানে, কতক-রোদ্দুর হে! ততক্ষণ বরং এক ছিলিম তামাক সাজ—রোদ্দুরটা পড়ুক।"

মালী তামাক সাজিতে গেল। ইতিমধ্যে তাহার পুত্র রামদাসোয়া নৃত্য করিতে করিতে কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গদাই পালের গোঁফ নাই দেখিয়া প্রথমটা সে চিনিতে পারে নাই। গদাই তাহার নাম বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল—বলিল—"কি রে বদমাসোয়া।"—তখন বালক আসিয়া গদাধরের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিল এবং দুইটি পয়সা আদায় করিয়া মনের আনন্দে ঘুরপাক দিতে দিতে তথা হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তামাক সাজিয়া আসিয়া মালী বলিল—"আমার মাইনে বাড়াবার কথা বাবুর কাছে কিছু বলেছিলেন?"

"না মালী—এখনও কথা পাড়বার সুযোগ পাইনি। এই যে দরিয়াপুরের বাগানখানা কচ্ছি—এই সুযোগে বাবুকে বলব। একটা কোনও সূত্র না পেলে বলি কি করে? দেখ, দরিয়াপুরের এই বাগানের জন্যে একজন ভাল মালী আবশ্যক। বাবুকে যদি বলি, তবে তিনি কি তোমায় ছেড়ে দেবেন মনে কর! তাহলে দরিয়াপুরে নিয়ে গিয়ে তোমার মোটা মাইনে করে দিতে পারি। সে ত আমারই হাতে কি না। কিন্তু বাবু যে তোমায় ছাড়েন এমন ত বোধ হয় না।"

মালী বলিল—"কি জানি বাবু!"

গদাই মাথাটি নাড়িয়া বলিল "উঁহু তোমায় ছাড়বেন না। তুমি গেলে গঙ্গামণির খবরদারী করবে কে? তোমার মতন আর একটি বিশ্বাসী লোক কোথায় পাবেন?"

মালী সন্দিগ্ধভাবে গদাধরের পানে চাহিয়া বলিল "গঙ্গামণি কে বাবু?"

গদাই মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল "বেশ, বেশ। এই রকম সাবধান হয়ে থাকাই ত চাই! গঙ্গামণি কে এখনও জানতে পারনি? দরিয়াপুরের কেনারাম গয়লার ভাই-বৌ—তোমরা যাকে ভৌজি বল।"

মালী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"আপনাকে কে বল্লে?"

"আর কে বলবে?—খোদ বাবুই বলেছেন। তুমি

আমার সঙ্গে বাবুর একবারে হরিহর এক আত্মা—এমন কি একত্র বসে (গদাই কাল্পনিক গেলাস হাতে ধরিয়া পান করিবার ইসারা করিল)—এও হয়েছে। নইলে এত লোক থাকতে আমাকেই দরিয়াপুরের নায়েব করে পাঠাবেন কেন? শুদ্ধ কেনারাম ঘোষকে শাসনে রাখবার জন্য। এ সব কায, ধর, বিশ্বাসী লোক ভিন্ন আর ত কারু হাতে দিতে পারেন না। আমলাদের মধ্যে এক আমার উপর, আর চাকরবাকরের মধ্যে তোমার উপর,—এই দুজনের উপর তাঁর বিশ্বাস। নৈলে দেখ, আমি কদিনই বা বাবুর চাকরি নিয়েছি। এখনও তিন মাস পুরো হয় নি। পনেরো টাকা মাইনেয় ঢুকেছিলাম—দু মাস পরে ত্রিশ টাকা মাইনেতে নায়েবী পদে বাহাল হলাম। কে বিশ্বাসী কে অবিশ্বাসী তা বাবু বিলক্ষণ জানেন।"

মালী দুঃখিতস্বরে বলিল—"বিশ্বাসী চাকর বলে আপনার ত ভাল হল বাবু—আমার কি হল?"

"হবে—হবে—মালী তোমারও হবে সবুর কর আমি বাবুকে বলে তোমার মাইনে নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দেব। বেশ মন দিয়ে কাযকর্ম্ম করে যাও—আর ও বিষয়ে খুব হুঁসিয়ার থাকবে—বুঝেছ?"

"আজ্ঞে তা আমায় বলতে হবে না।"

"আচ্ছা এখনও কি গঙ্গামণি কাঁদাকাটি করে?"

"করে বৈকি।"

"একটু ফাঁক পেলেই তা হলে পালাবে বল?"

"পালাবে বৈ কি।"

"চাবিটে খুব সাবধান। সে বুড়ী তোমার শাশুড়ী হয় বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাবু তাই বলছিলেন। তাকে বেশ করে বলে দিও যে নদীতে যখন জল আনতে যাবে, পেছনের দরজাটায় চাবিটি বন্ধ করে তবে যেন যায়। এ রকম যেন মনে না করে, এই ত কাছেই নদী, চট্ করে আসব এখনি, তালা না—ই বন্ধ করলাম।"

"তাই ত করা হয়, বাবুর হুকুমই তাই।"

বলে সাবধানের বিনাশ নেই। চাবিটে তোমারই কাছে রাখ ত? যখন বুড়ীর দরকার হবে, তখন সে যেন চেয়ে নেয়। আবার কায হয়ে গেলেই তোমায় ফিরে দেবে। নইলে বুড়ো মানুষ, অসাবধান, কোথায় ফেলে দেবে বলা যায় কি?"

"চাবি আমিই রাখি।"

"কোথায় রাখ? ঘরে অমনি এক জায়গায় ফেলে রেখ না যেন। নিজের কোমরের ঘুন্সীতে বেশ শক্ত করে বেঁধে রাখবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—তাই ত বেঁধে রাখি।"—বলিয়া মালী কোমর হইতে চাবিটি বাহির করিয়া দেখাইল।

গদাই বলিল—"চাবিটি ত তেমন মজবুদ বোধ হচ্ছে না। দেখি?"

মালী চাবিটি খুলিয়া দিল। গদাই সেটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল—"না, নিতান্ত খেলো নয়। এই-তেই এখন কায চলুক। পরে, বাবুকে বলে একটা বিলিতী তালা পাঠিয়ে দেব এখন।—আর যদি এর মধ্যে পোষ মানে, তা হলে আর তালা চাবির দরকারও হবে না।"

মালী বলিল—"পোষ মানবার লক্ষণ নয়। একদিন বাবুকে বলেছিল, তুমি যদি আমায় বিরক্ত করবে—আমি ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরব।"

গদাই শিহরিয়া বলিল—"ইস্—কি সর্ব্বনাশ!—আচ্ছা, বাবুর নামটাম সে জানে?"

মালী হাসিয়া বলিল—"না। প্রথম থেকেই বাবু বুড়ীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে যদি জিজ্ঞাসা করে এ কোন গাঁ—ত বলিস্ বকুলগঞ্জ—আর আমি কে যদি জিজ্ঞাসা করে ত বলিস বকুলগঞ্জের মেজ বাবু।"

শুনিয়া গদাধর হাসিতে লাগিল। বলিল—"বাবু ফন্দি করেছেন ভাল। বকুলগঞ্জের মেজ বাবু! হা হা হাঃ—কোথায় বকুলগঞ্জ কোথায় কল্যাণপুর!—রৌদ্রও পড়ে এল। চল কতকগুলো চারা দেখিয়ে দিই।"

উভয়ে তখন উঠিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। নানা ফলের বহুসংখ্যক চারা গাছ গদাই মালীকে দেখাইয়া দিল। অবশেষে বলিল—"কাল গরুর গাড়ী পাঠিয়ে

দিও।"

সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছিল। গদাই বলিল—"আজ তবে চল্লাম। সমুখ অন্ধকার—অনেকদূর যেতে হবে। আর একদিন এসে আরও কিছু চারা দেখিয়ে দেব।"

"আপনি আবার কবে আসবেন বাবু?"

"কালীপূজার দিন। সে দিন কাছারি বন্ধ কিনা। পারি যদি ত তার আগের দিনই আসব।"—বলিয়া গদাই অশ্বারোহণ করিল। অগ্রসর হইয়া, ঘোড়া থামাইয়া, মালীকে কাছে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল—"ওহে শোন, একটা কায করতে পার? কালীপূজোর সময় বাবুর বাড়ী থেকে মাংস টাংস পাওয়া যাবে। আমরা শাক্ত কিনা, কালীপূজোর রাতে আমাদের একটু ইয়ে খেতে হয়। তোমরা কি তাকে বল ভাল, আমার আবার হিন্দি মিন্দি ভাল আসে না—দারু দারু। বেশ ভাল এক বোতল—বুঝেছ—দোয়াস্তা, এক টাকা দিয়ে কিনে এনে রাখতে পার? সেই একটা, আর দু বোতল আট আনা ওয়ালা, বুঝেছ,—যদি এনে রাখ, বড় ভাল হয়।"

মালী স্বীকৃত হইল। গদাই তাহার হাতে দুইটি টাকা দিয়া প্রস্থান করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেত চতুর্দ্দশীর দিন বৈকালে, পদব্রজে গদাই পাল আবার বাগানবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাতে একটি মাঝারি আকারের ক্যাম্বিসের ব্যাগ। মালী কুটীরের সম্মুখে বসিয়া তামাক খাইতেছিল—গদাইকে দেখিয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—"বাবু আসুন।"

"তামাক তৈরি যে"—বলিয়া গদাই ব্যাগটি খাটিয়ার উপর রাখিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিল।

মালী বলিল—"একটা কলার ডাঁটা কেটে আনি?"

"না—আমার সঙ্গেই হুঁকা আছে"—বলিয়া গদাই ব্যাগটি হইতে একটি হুঁকা বাহির করিল। দুই চারি টান টানিয়া বলিল—"হাঁহে—রমণচন্দ্র ঘোষ বলে কাউকে জান?"

মালী চিন্তা করিয়া বলিল—"রমণচন্দ্র ঘোষ? কৈ না—মনে ত পড়ছে না। কেন বাবু?"

"আমি যখন এই মাত্র বাগানের মধ্যে দিয়ে আসছি, তখন দেখি, বগলে ছাতি, গায়ে একটা হাতকাটা পিরাণ, একখানা চাদর গলায় জড়ান, একটা আধবয়সী লোক, আমবাগানে দাঁড়িয়ে বাগানবাড়ীর পানে হাঁ করে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ভাবলাম কে লোকটা? আমি পেছন থেকে আসছি, চৈতন্যই নেই। কাছে এসে চোখোচোখি হতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'কে হে তুমি?'—সে থতমত খেয়ে বল্লে—'আমার নাম রমণচন্দ্র ঘোষ।'—আমি বল্লাম—'এখানে কি করছ?'—'আজ্ঞে কিছু নয়'—বলে লোকটা হন্ হন্ করে চলে গেল।"

মালী বলিল—"কি জানি বাবু—কাউকে কখনও ত এ রকম দেখিনি বাবু। কি মৎলবে এসেছিল কে জানে।"

গদাই গম্ভীরভাবে বলিল—"আমার কিন্তু ভারি সন্দেহ হয়। তাড়াতাড়িতে একটা ভুল হয়ে গেল—তার বাড়ী কোথা জিজ্ঞাসা করলাম না। খোঁজ নাও দিকিন, আশে পাশে কোনও গাঁয়ে রমণচন্দ্র ঘোষ বলে কেউ আছে কি না।"

"আজ্ঞে তা খোঁজ নেব বৈকি। এ খবরটা ত বাবুকে দেওয়া উচিত।"

"উচিত-ই ত। কিন্তু আমি ত কাল বাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারছিনে। আজ আমি এসেছি নিজের একটু কাযে। আবার ভোর বেলা চলে যাব। এক রকম লুকিয়ে এসেছি বল্লেই হয়। তার চেয়ে বরং ইয়ে কর। কাল তুমি সকাল বেলা যেও। বাবুকে বোলো। আমার নাম করবার দরকার নেই—তুমি বোলো যেন তুমিই দেখেছ। তা হলে তোমার হুঁসিয়ারিতে বাবু খুসীও হবেন। বলবে আমবাগানের ভিতর দিয়ে তুমি আসছিলে, এমন সময় তুমিই যেন দেখলে—বুঝেছ—আমি যা যা দেখেছি তুমি সেইগুলো সব নিজের করে বলবে।"

মালী বলিল—"বলব, নাম জিজ্ঞাসা করতে বল্লে রমণচন্দ্র ঘোষ। আর কি বলব? বগলে চাদর"—

গদাই বলিল—"আরে না না। বলবে বগলে ছাতি, গলায় চাদর জড়ানো, গায়ে একটা হাতকাটা পিরাণ। আধবয়সী লোক। নাম রমণচন্দ্র ঘোষ। মনে থাকবে ত?"

"তা মনে থাকবে।"

গদাধর তখন মালীকে উত্তমরূপে তালিম দিল। সকলকে তালিম দেওয়া তাহার বহুদিনের অভ্যাস।

অবশেষে গদাই বলিল—"ভাল কথা যা আনতে বলেছিলাম তা এনে রেখেছ মালী ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"—বলিয়া মালী বোতল তিনটি আনিয়া দিল।

গদাই বলিল—"এর কোনটি এক টাকা ওয়ালা ?"

"যেটিতে গালার শীলমোহর রয়েছে—এইটিই দোয়াস্তা—এক টাকা ওয়ালা। আর যে দুটিতে শুধু ক্যাগ আঁটা, সেই দুটি আট আনা বোতলের।"

গদাই শীল-করা বোতলটি ব্যাগে পূরিল। বাকী দুইটি মালীকে দিয়া বলিল—"এ দুটি তুমি নাও।"

এই অপ্রত্যাশিত উপহারে মালীর দুই পাটি দন্তই বাহির হইয়া পড়িল। বলিল—"দুনো বোতল ?"

"হ্যাঁ। দু বোতলই তোমার জন্যে। তোমার স্ত্রী আছে—শাশুড়ী আছে—তারাও ত খায় টায় ? তার আর লজ্জা কি ? তোমাদের দেশে এরকম চলন আছে তা কি আমি জানিনে ? তোমরা ত মালী—পশ্চিমে কায়েথরা পর্য্যন্ত—ভদ্র ঘরের কায়স্থ—কোন ক্রিয়া কর্ম্ম হলে স্ত্রী-পুরুষে মদ খায়।"

মালী বহুকাল বঙ্গদেশে বাস করিতেছে, তাই এসম্বন্ধে তাহার সংস্কার কিছু উন্নত হইয়াছিল। লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিল—"হ্যাঁ বাবু—আমাদের দেশে এরকম চলন আছে বটে।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। মালী আর এক ছিলিম তামাক সাজবার জন্য ভিতরে গেল। বোতল দুইটিও লইয়া গেল। গদাই বাহিরে বসিয়া শুনিতে পাইল—বৃদ্ধা বলিতেছে—হাঁ, তুমি একলা দুবোতল খাইবে বৈ কি! তুমি একবোতল খাইও—আমরা মা বেটিতে একবোতল খাইব।

দ্বিতীয় ছিলিম তামাক খাইয়া গদাই বিদায় গ্রহণ করিল—"কাল আপনি তবে কখন আসবেন বাবু ?"

গদাই বলিল—"আজ রাত ত কল্যাণপুরে থাকব। কাল ভোরে ভোরে উঠে চম্পট—কাল শো তিনেক টাকা খাজনা আদায় হবার কথা আছে দাঁড়িয়াপুরে। সেই টাকাগুলো আদায় করে—ঘোড়ায় চড়ে—বেলা দুপুর একটা আন্দাজ মনিববাড়ী পৌঁছে যাব। মা কালীর প্রসাদটা ফাঁক যাবে না।"

মালী বলিল—"আমিও যাব। ফি বছরই যাই। কাল সকালেই যাব—বাবুকে সেই রমণঘোষের কথাটা বলতে হবে কি না। তার পর প্রসাদ পেয়ে বাড়ী আসব।"

"যাবে বৈকি। বরং রামদাসোয়াকে নিয়ে যেও, বাঙ্গালীর পূজা ত কখনও দেখেনি, দেখে আসবে।"—বলিয়া গদাই হুঁকায় দুইটি "সুখটান" টানিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কল্যাণপুরে নিজ বাসায় পৌঁছিয়া গদাই প্রদীপ জ্বালিল। তাহার পর, দীঘি হইতে জল আনিয়া উনান জ্বালিয়া, রান্না চড়াইয়া দিল। অধিক কিছু নয়, কেবল ভাতেভাত। আজ রাত্রে গদাই পালের অনেক কায—বিপজ্জনক কাজ করিতে হইবে।

রাত্রি আন্দাজ নয়টা বাজিলে, হরিদাসী আসিয়া দর্শন দিল। গদাই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল—"এসেছ হরি-দাসী ? আমি ভাবছিলাম—তোমার মনে আছে কি না আছে।"

হরিদাসী বলিল—"আমার তেমন মন নয়।"

"বস বস। বাড়ীর সব ভাল ? বড়বাবু, ছোটবাবু সবাই ভাল আছেন ?"

"হ্যাঁ—সবাই ভাল আছে। ছোটবাবু এখানে নেই—আজ খাওয়া দাওয়া করে কোথায় গেছেন।"

"কোথায় গেলেন ?"

"বাড়ীতে কিছু বলে যান নি। আজ কর্ত্তা গিন্নীতে বৈকালে সেই কথা হচ্ছিল কিনা। বাবু বল্লেন—এমন ভাই,—বিছানা বাক্স বেঁধে কোথায় চলে গেল—একবার জিজ্ঞাসাও করলে না। বলেও গেল না কতদিনে ফিরবে, কোথায় যাচ্ছে !"

গদাই বলিল—"তাইত ! ভাইয়ে ভাইয়ে এখনও ভাব হল না।"

হরিদাসী হাসিয়া বলিল—"ভাব একেবারে আদায় কাঁচকলায়।"

"বড়লোকের সবই শোভা পায়। তোমার আমার ঘরে এ রকম হলে কত নিন্দে হ'ত।"—বলিয়া গদাই ভাতের হাঁড়িতে কাঠি ঘুরাইতে লাগিল।

হরিদাসী একটু মৃদু হাস্য করিল। বলিল—"সেই যা বলেছিলে, তা আজ হবে ত ?

"হবে বৈ কি। সেইজন্যেই ত আজ আসা।"

"দেরি কত ? আমি কিন্তু বেশী রাত অবধি থাকতে পারব না।"

"দেরী কিছু নেই। তুমি এক কায করদিকিন হরিদাসী। ঐ রোয়াকটায়, বেশ করে জল ছিটিয়ে ঝাঁট দিয়ে ফেল। ঘরে একখানি কুশাসন আছে, সেইখানি বিছিয়ে দাও। ধুনুচিটে নিয়ে এস, আগুন দিচ্ছি। শোবার ঘরের কুলুঙ্গিতে একটা বালির টিনে ধুনো আছে। আসনখানির কাছে ধুনো দাও। আমি ততক্ষণ ভাতের ফ্যানটা গেলে ফেলি। ভাল কথা,—দরজার দোরে খিল দিয়ে এসেছ ত ? কেউ এসে না পড়ে।"

"খিল দিয়েছি।"—বলিয়া হরিদাসী নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে গেল।

ইতিমধ্যে গদাই ভাতের হাঁড়ি নামাইল। সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া হরিদাসী আসিয়া বলিল—"হয়েছে।"

"হয়েছে ? আচ্ছা বেশ। তা, তুমি বেশ শুদ্ধ হয়ে, কাপড় ছেড়ে এসেছ ত হরিদাসী ?"

"কাপড় ছেড়েছি।"

গদাই উঠিয়া গিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, একখানি লাল চেলির কাপড় পরিধান করিল। পঞ্চপাত্র হইতে একটু গঙ্গাজল লইয়া, নিজের ও হরিদাসীর গাত্রে ছিটাইয়া দিল। শেষে বলিল—"চল, এইবার ঘলঘসার শিকড় একটা তুলতে হবে।"

গদাই প্রদীপ হাতে করিল। উঠানের কোণে দুই জনে গিয়া দাঁড়াইল। হরিদাসী চুল খুলিয়া দিয়া মাটীতে পড়িয়া, একটা ঘলঘসের ডাঁটায় আঁচল জড়াইয়া, কামড় দিয়া একটা গাছ উঠাইয়া ফেলিল। গদাই বলিল—"জয় মা কালী। দেখিস্ মা মুখ রাখিস্।"

হরিদাসী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া, গাছটি হাতে করিয়া, কাপড় দিয়া নিজের মুখের ধুলা মাটী ঝাড়িয়া ফেলিল। দুইজনে আবার রোয়াকে ফিরিয়া আসিল। গদাই একটি কাঠের হাতবাক্স বাহির করিয়া আনিল। পিতলের তালা আনিল। সিন্দুক খুলিয়া, টাকাভরা একটি খেরোর থলি বাহির করিল। খানিকটা লালসূতাও আনিল।

তখন আসনে উপবেশন করিয়া, ধুনাচিতে আরও কিঞ্চিৎ ধুনা নিক্ষেপ করিল। চক্ষু বুজিয়া, উর্দ্ধমুখ হইয়া, বুকের কাছে হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে কালীনাম জপ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এইরূপ করিয়া, কাঠের বাক্সটি খুলিয়া সম্মুখে স্থাপন করিল। তাহার মধ্যে গঙ্গাজলের ছিটা দিল। থলি হইতে টাকাগুলি ঢালিয়া, কুড়িটাকার করিয়া তিনটি থাক সাজাইল। বলিল—"দেখ হরিদাসী—একটা বিষম সমিস্যেয় পড়েছি।"

"কি বল দেখি ?"

"এই ত ষাটটি টাকা আছে। ভাবছি সব টাকাই কি বাক্সে দেব—না গোটাকতক বাইরে থাকবে ?"

"কেন, যত বেশী টাকা দেবে—আরও তত বেশী হবে।"

"তুমি বোঝ না হরিদাসী। এসব ভূত প্রেতের কাণ্ড কারখানা কিনা। কি জানি বলাই যায় কি, যদি সব টাকাগুলি উড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন কি বুক চাপড়ে মরব ? তার চেয়ে বরং পঞ্চাশটি টাকা বাক্সে দিই। দশটি টাকা বাইরে থাক। সন্ন্যাসী বাবা যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয়, তবে এই পঞ্চাশ টাকাতে আমার দুশো টাকা হবে। তখন বাকী দশ টাকা বাড়িয়ে চল্লিশ টাকা করে নিলেই হবে। কি বল, তোমার কি মত ?"

"আচ্ছা, তখন আবার দুশো টাকা বাড়িয়ে আটশো টাকা করা যাবে ত ?"

গদাই হাসিয়া বলিল—"তা কি হয় ক্ষেপি! এ টাকা উচ্ছুগ্গু হয়ে গেল কিনা—এতে আর হবে না। আবার নতুন টাকা দিতে হবে।"

"তবে তাই কর। দশটি টাকা বাইরে রাখ।"

গদাই তখন গণিয়া পঞ্চাশটি টাকা বাক্সে ভরিল। বন্ধ করিতে যাইতেছে, এমন সময় হরিদাসী বলিল—"থাম, থাম।"

গদাই বিস্মিত হইয়া, চক্ষু তুলিয়া বলিল—"কি ?"

হরিদাসী আঁচলের গিরো খুলিয়া, দুইটি টাকা বাহির করিয়া বলিল—"আমার এ দুটিও রেখে দাও। আমার আট টাকা হবে ত ?"

"তা আমি কি করে বলব? আমার হয়, তোমারও হবে। আর, আমার টাকাগুলি যদি উড়ে যায়, তোমারও যাবে। তখন আমায় দোষ দিতে পাবে না—বলে রাখছি কিন্তু।"

"না, দোষ দেব না।"—বলিয়া হরিদাসী টাকা দুইটি দিল।

সে দুইটি টাকাও বাক্সে রাখিয়া গদাই তালা বন্ধ করিতে যাইতেছিল। হরিদাসী বলিল—"আমি একটা ভাল তালা এনেছি—খুব মজবুদ। এইটিই লাগাও।"

মুহূর্ত্তের জন্য গদাধরের মুখ বিপন্নের মত দেখাইল। তৎক্ষণাৎ সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—"তা বেশ ত। তোমার তালাই দাও।"

তালা বন্ধ হইলে হরিদাসী চাবিটি লইয়া আপনার আঁচলে বাঁধিয়া রাখিল। তখন লাল সূতা দিয়া, শিকড়টি বাক্সের গায়ে বাঁধিয়া গদাই বলিল—"জয় মা কালী, মুখ তুলে চাস্ মা।"

হরিদাসী বলিল—"রাত হল। এখন তবে আমি উঠি।"

"এস। রাত দুপুরে বাক্সের উপর একশো আট বার মন্তর জপ করতে হবে। একমাস পরে, চতুর্দ্দশীর রাত্রে আবার আসব। খুলে দেখতে হবে মা কালী কি করেছেন। তুমি আসতে ভুলো না যেন।"

"না ভুলব না।"—বলিয়া হরিদাসী চলিল। দ্বার অবধি তাহার সঙ্গে আসিয়া গদাই বলিল—"আজ ভূত-চতুর্দ্দশীর রাত্রি। ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী আজ রাতে বেরুবে। সাবধানে যেও।"

হরিদাসী চলিয়া গেলে, সদর দরজায় খিল দিয়া গদাই আসিয়া বসিল। বোতলটি খুলিয়া কিঞ্চিৎ পান করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—"মাগী কি সেয়ানা! নিজের তালাটি এনেছে। আমি যেন আর এ বাক্স খুলতে পারব না। আমার কাছে একশো চাবি আছে,—একটা না একটা কি লাগবে না?"

আরও দুই এক পাত্র পান করিতে করিতে রাত্রি দশটা বাজিল। গদাই তখন ভাত বাড়িয়া আহার করিল।

একছিলিম তামাক খাইতে খাইতে, গদাই নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। গদাই তখন উঠিয়া, লাল চেলিখানি শাড়ীর মত করিয়া পরিল। সিন্ধুক হইতে একটা লম্বা লম্বা জটাওয়ালা পরচুল বাহির করিয়া মাথায় দিল। একটা ত্রিশূল বাহির করিয়া, তাহার অগ্রভাগে সিন্দুর লেপিয়া দিল। তাহার পর দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজ ছদ্মবেশ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লইল। আর একপাত্র মদ্য পান করিয়া, একশত চাবির গুচ্ছটি নিজের কোমরে বাঁধিয়া, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সদর দরজায় তালা বন্ধ করিতে করিতে মনে মনে হাসিয়া বলিল—"হরিদাসীকে বলছিলাম—আজ রাতে অনেক ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী বেরুবে। অনেক না বেরুক্, একজন ডাকিনী ত বেরুল। মালী বেটা সপরিবারে এতক্ষণ নেশায় ভোঁ হয়ে পড়ে আছে। যাই নদীর ধারে গিয়ে দেখি আমার খাবার উপযুক্ত মড়াটড়া এক আধটা মেলে কি না।"—বলিয়া সে ক্ষিপ্রগতিতে অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

চিত্র-কলাবিদ্যা ও মিঃ উইলিয়াম রদেন্‌ষ্টাইনের চিত্রাবলী

The History of Modern Painting নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের প্রণয়নকর্ত্তা, জর্ম্মন পণ্ডিত Richard Muther গ্রন্থের প্রারম্ভেই এক স্থলে বলিয়াছেন যে "Commerce and Navigation discovered new worlds, painting discovered life." কথাটী কেমন সুন্দর! এক কথায় চিত্র-কলার এমন ব্যাপক ও মহত্ত্বব্যঞ্জক ব্যাখ্যা বোধ হয় আর কেহই প্রদান করেন নাই। এই অত্যাশ্চর্য্য জগতে সুখদুঃখপূর্ণ নানা ঘটনার স্রোতে মানব যখন ভাসিতে থাকে, তখন কে তাহাকে এই আশার বাণী শুনাইয়া দেয় 'না—এই শেষ নয়,—চল—আগে চল;—তোমার গম্যস্থান সম্মুখে; তাহা প্রেমমণ্ডিত, সুশোভন;

শ্রীযুক্ত উইলিয়ম রদেন্‌ষ্টাইন।

সেখানকার রাজা জীবের অনন্ত তৃপ্তির হেতু,—তিনি সুন্দরম্।' এই মধুবাণী দুঃখজ্বালাপূর্ণ সংসারে জীবের কর্ণকুহরে কে ঢালিয়া দেয়?—তাহা এই সুকুমার-কলা!

সুন্দরই আনন্দের আকর। এবং আনন্দই জীবের জীবনের উৎস। এই চির আনন্দ এবং অনন্ত তৃপ্তির বার্ত্তা সুকুমার-কলা জগতে আনয়ন করিয়া মানবের জীবন আবিষ্কার করিয়াছে। এই জন্য মুথার সাহেব বলিয়াছেন 'Painting discovered life.'

এই ভবজলধিতে ভবের কাণ্ডারীর লীলা-তরঙ্গের যে অসংখ্য লহরী দিবানিশি অবিশ্রান্ত ভাবে প্রেম-কিরণে ঝল'সত হইতেছে, প্রেমময়ের এই যে রূপলহরীমালা—স্নিগ্ধ মলয়ান্দোলিত অতি ক্ষুদ্র বৃক্ষপত্র হইতে প্রাতঃসূর্য্য-কিরণমণ্ডিত-সুবর্ণমুকুট-পরিহিত উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ অবধি এবং বাণবিদ্ধ মৃগের বেদনাক্লিষ্ট দৃষ্টি হইতে প্রেমিক পর্য্যন্ত, জগতের অসংখ্য বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যাপারে অহরহ সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে খেলা করিতেছে, সুকুমার-কলা সেই লহরীমালার এক একটীকে ধরিয়া রাখিয়া সংসারান্ধ মানবের জন্য অপূর্ব্ব সুধাভাণ্ড রচনা ক'রবার প্রয়াস পাইয়াছে। এই বিদ্যা সামান্য নহে। গভীর প্রেম ভক্তির সঙ্গে শিল্প-কুশল (Technical) দক্ষতা সম্মিলিত হইয়া এই অপূর্ব্ব সম্পদের সৃষ্টি করিয়া থাকে। একখানা যথার্থ চিত্র বা ভাস্কর-মূর্ত্তি (Sculpture) বহু সাধনার ধন; কোন প্রকার কায়ক্লেশে গুটিকতক শব্দ যোজনা করিতে পারিলেই যেমন কাব্য হয় না, তেমনি কোন প্রকারে একটী চিত্র বর্ণতুলিকার সাহায্যে অঙ্কিত করিয়া তুলিলেই তাহা যথার্থ চিত্র-কলা হয় না কিম্বা পাথরের একটা অবয়ব গড়িয়া তুলিলেই তাহাকে একটী উচ্চ শ্রেণীর মূর্ত্তি-কলা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এই বিদ্যায় সার্থকতা লাভ করিতে হইলে শিল্পাংশে যতদূর নৈপুণ্য লাভ করা প্রয়োজন তাহা করিতে হইবেই। একটী সুন্দর ফুল কিম্বা মানুষের একখানি চাঁদমুখ গড়িয়া তুলিতে স্বয়ং বিশ্বশিল্পীকে কতটা সময়ক্ষেপ ও অধ্যবসায় নিয়োগ করিতে হয় আমরা কি দিবানিশি তাহার অজস্র নিদর্শন দেখিতে পাই না? আজকাল ইয়োরোপে দ্রুত চিত্রাঙ্কণও একটী বিশেষ গুণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। অবশ্যই কেহ যদি দু দণ্ডে একখানা চিত্র অঙ্কিত করিয়া ফেলিতে পারেন তাহাতে কাহারও আপত্তির কারণ নাই, কিন্তু এই সমস্ত অবান্তর বিষয়ে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার ফলেই বর্ত্তমান যুগে ইয়োরোপে চিত্র বা মূর্ত্তিকলা ভাবসম্পদে ম্লান হইয়া পড়িতেছে। বাহ্যিক কারুকার্য্যে সম্পূর্ণতা লাভ করাই যেন প্রধান লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে আজকাল যথার্থ চিত্র বা মূর্ত্তিকলার পরিবর্ত্তে বৎসর বৎসর অসংখ্য ছবি এবং প্রস্তরমূর্ত্তির সৃষ্টি হইতেছে।

এই শুধু বাহ্যিক আড়ম্বর ও শিল্পকুশলতার দিনে মিঃ রদেনষ্টাইনের ভাবময় চিত্রাবলী যে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? এই উদীয়মান সরল-চিত্ত প্রতিভাসম্পন্ন চিত্রবিৎ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রাবলী ইংলণ্ড, [illegible] [illegible] অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার চিত্রশালা-

য়িহুদিদের ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্ম্মবিধি বহন।

সমূহে উচ্চ মূল্যে ক্রীত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠালাভ তাঁহার প্রতিভা ও তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলীর সম্পদের পরিচয় প্রদান করিতেছে। লণ্ডনের 'ষ্টুডিও' পত্রে অনেকবার তাঁহার চিত্রাবলীর প্রশংসা ও প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রত্যেকখানি চিত্রেই যেন একটী সরল আড়ম্বরশূন্য অনাবিল ভাবের মৃদুল স্পর্শ প্রাণে অনুভব করা যায়। কোথাও জটিলতা বা কষ্টকল্পনা নাই। তাঁহার চিত্রাবলীর বাহ্যিক শিল্পাংশের নিপুণতা সকলের তৃপ্তিদায়ক না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অঙ্কিত প্রত্যেকখানি চিত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবা মাত্রই, ক্যানবিসের ভিতর দিয়া চিত্রবিদের ভাব আসিয়া যেন দর্শকের প্রাণকে স্পন্দিত করিয়া তোলে। এই স্থলেই চিত্রকরের প্রতিভার পরিচয় এবং চিত্রেরও সার্থকতা। যে চিত্রে প্রথম দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্রই দর্শক তন্ময় হইয়া

ভজনালয়ে শোকার্ত্ত য়িহুদিগণ।

In the National Gallery British Art.

যায় না, সে চিত্র চিত্র বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য নয়। যে চিত্রে প্রথম দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকরের শিল্প-নৈপুণ্যের ক্রটীর দিকেই দর্শকের প্রথম নজর পড়ে সেরূপ চিত্র লোকের সম্মুখে বাহির করিতে চিত্রকরের সঙ্কুচিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই সঙ্গে প্রকাশিত মিঃ রদেনষ্টাইনের চিত্রে হয়ত অনেক জায়গায় পাঠক তুলির আঁচড় দেখিতে পাইবেন—হয়ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাস করিয়া দেখিলে আরও খুটিনাটি ক্রটী বাহির করা যাইবে, কিন্তু এগুলির প্রতি তত মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। চিত্রের ভাবে প্রাণটা বড় পূর্ণ হয়। চিত্রগুলি দেখিলেই মনে হয় যখনই চিত্রকর ভাবটী পাইয়াছেন তখনই যেন তুলি হাত হইতে ফেলিয়া [illegible]

য়িহুদিদের "ইস্থারের কথা" নামক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ।

চিত্রাবলীতে বর্ণসংযোজনায় স্বাধীনতা (bold texture of colour) ছাড়া অন্যের মতভেদের আর কোনও কারণই দেখা যায় না। কিন্তু এই স্বাধীনতাই তাঁহার চিত্রে প্রাণ দান করিয়াছে। তাঁহার মূল চিত্রগুলি কয়েক হাত দূর হইতে দেখিলে অন্তরে বাহিরে প্রাণকে যেন মাতাইয়া তোলে। প্রত্যেকটী তুলির টান যেন এক অপূর্ব্ব স্বাধীনতায় মণ্ডিত (Complete freeness of touch) বলিয়া মনে হয়।

তাঁহার রেখাজ্ঞান অত্যন্ত গভীর। এই রেখাজ্ঞানের উপরেই চিত্রের সমস্ত ভাব নির্ভর করে। দেহের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অবস্থিতির উপরই ভাবপ্রকাশ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। শোকে মানবদেহের যে অবস্থা হয়, আনন্দে বা ভক্তিতে সেরূপ হয় না। আবার স্নেহে বা ভীতির সময়ও সমস্ত অবস্থিতির বিভিন্নতার (difference of positions) উপরই ভাব নির্ভর করে। এই মানবচিত্র অঙ্কনে রেখাজ্ঞানে গভীর পারদর্শিতা চাই। আবার রেখাজ্ঞান (drawing) আয়ত্ত করিতে হইলেই মানবশরীরের গঠন-কৌশল জানা প্রয়োজন। অবশ্যই চিকিৎসকদিগের মত আমাদের শরীর-বিজ্ঞানে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানবদেহের সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে বহির্গঠন-রেখার যে অহরহ পরিবর্ত্তন হয় (difference of contourtine in movements of the body) সে বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা লাভ করিবার জন্য মানবদেহের অস্থিসমূহের অবস্থা ও মাংসপেশীর ক্রিয়ার একটা মোটামুটী জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। তার পর বর্ণ-বিন্যাস বস্ত্র-বিন্যাস প্রভৃতির বিষয়েও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান

দুরূহ ব্যাপার। ইহা যদি শুধু ভাবেরই খেলা হইত তবে আর কথা ছিল না; শুধু স্বপ্ন দেখায়ই হয়ত পর্য্যবসান হইত। কিন্তু তাহা ত না। ইহা ভাব এবং শিল্পকুশলতার এক মহা সমন্বয়ক্ষেত্র। শিল্প ইহার দেহ, ভাব ইহার প্রাণ। কলা-বিদ্যা দেহময়-ভাব। চিত্র ভাবের জীবন্ত মূর্ত্তি সুতরাং ইহাকে শুধু ভাব বলাও যা শুধু শিল্প বলাও ঠিক তাই, উভয়ই ভ্রমাত্মক। ইহা ভাব এবং শিল্পের সংযোগ, দৃশ্যকাব্য।

মিঃ রদেনষ্টাইনের চিত্রাবলী দেখিলেই রেখা-জ্ঞানের গভীরতা ও ভাব প্রকাশের একটা সহজ সরল অথচ স্বাধীন পন্থার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। চিত্রবিদের পক্ষে এই দুটী জিনিষই অতি প্রয়োজনীয়। এই দুটী ভাবই উন্নত চিত্র-সম্পাদনে ভিত্তি-স্বরূপ। এই সরল এবং প্রেমিক চিত্রবিদের নিকট আমাদের অনেক বিষয় শিক্ষা করিবার আছে। তিনি ভারতের সাধনা, ভারতের ভাবের প্রতি বড় অনুরক্ত। তিনি একদিন বলিতেছিলেন "Your art and literature to me are inspirations" অর্থাৎ "আপনাদের সাহিত্য এবং সুকুমার কলা যেন আমার প্রাণে প্রেরণা আনিয়া দেয়"। তিনি আপাততঃ ভারতযাত্রা করিয়াছেন। বোধ হয় নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারতে পৌছিবেন। তিনি অজণ্টাগুহা, আবু পাহাড়, বেনারস প্রভৃতি স্থান দেখিয়া পরে বাঙ্গালায় যাইবেন। আমার বিশ্বাস প্রত্যেক শিক্ষিত বঙ্গবাসী এই সরলচিত্ত ও শ্রদ্ধাবান পর্য্যটকের সাক্ষাৎলাভে পরমাহ্লাদিত হইবেন।

ইউনিভার্সিটী কলেজ, লণ্ডন। শ্রীঅশ্বিনীকুমার বর্ম্মণ।

শ্রীযুক্ত আবদুল রসুল

মত অরন্ধন প্রতিপালিত হইয়াছিল। এই সকল নিয়ম সকলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পালন করিয়াছিলেন। ইহা সন্তোষের বিষয়।

অপরাহ্ণের সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত আবদুল্ রসুল মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা বেশ সারগর্ভ হইয়াছিল। বঙ্গবিভাগের দ্বারা বাঙ্গালী মুসলমানদেরও যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন।

রাখীবন্ধন

গত ৩০শে আশ্বিন বাঙ্গালীর রাখীবন্ধনের দিন ছিল। ইন্দ্রদেব ও সার্ এডওয়ার্ড্ বেকার উভয়েই প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে দিনকার কার্য্য যে ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা অসন্তোষজনক নহে। হগসাহেবের বাজার ছাড়া আর সব বাজার বন্ধ হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, কোন কোন মুসলমানের দোকান ছাড়া, আর সমস্ত বাঙ্গালীর দোকান বন্ধ হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের

বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র

আমরা বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত কতিপয় ছাত্রের সফলতার সংবাদ সানন্দে পত্রস্থ করিতেছি। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের যুবকদিগকে উৎসাহিত করুক।

(১)

শান্তিপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষাসমিতি কর্তৃক দুই বৎসর পূর্ব্বে জাপানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি তিনটি প্রধান

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

ছাতার কারখানায় ছাতা তৈরি ও আনুষঙ্গিক আরো দুটি কর্ম্ম—গিল্টি (electro plating) করা ও লেসতৈরি শিখিয়াছেন। জাপান প্রবাসকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, এবং তাঁহার সাংসারিক কারণে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। তথাপি ইনি শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়া দেশে ফিরেন নাই। ইঁহার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র। ইনি শীঘ্রই দেশে আসিয়া আমাদের স্বদেশী শিল্পের অভাব মোচনে সক্ষম হইবেন।

(২)

ময়মনসিংহনিবাসী শ্রীযুক্ত জি, সি, দাসও শিল্পবিজ্ঞান-শিক্ষাসমিতির প্রেরিত ছাত্র। ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে তিন বৎসর পড়িয়া আমেরিকায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করিতে যান। তিনি প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন।

(৩)

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বর্ম্মন ভাস্করশিল্প ও চিত্রশিল্প শিক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া আপনার মেধা ও নিপুণতার পরিচয় দিয়া বিলাতের শ্রেষ্ঠ

শ্রীযুক্ত জি, সি, দাস।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বর্ম্মণ

শিল্পিগণের সাহায্য ও বন্ধুত্ব লাভ করিতেছেন। বিলাতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর শ্রীযুক্ত ডবলিউ সি মে তাঁহাকে নিজের কারখানায় ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ চিত্রকর রদেনষ্টাইন অশ্বিনী বাবুর বন্ধু। এই সংখ্যায় অশ্বিনী বাবু রদেনষ্টাইনের চিত্রাবলী সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি সাহিত্যচর্চ্চা করিতেও খুব ভালোবাসেন। The City of London Illustrated নামক পত্রিকায় অশ্বিনী বাবুর সম্বন্ধে এক সচিত্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। আমরা সেই চিত্র এস্থলে প্রকাশিত করিতেছি। তিনি আপনার শিক্ষকের কারখানায় সাপুড়ের মূর্ত্তি গড়িতেছেন। ভারতবাসী হাতের কাজের সূক্ষ্মতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। অশ্বিনী বাবুর সেই প্রাচ্য নিপুণতা পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শিক্ষার গুণে জয়যুক্ত হইবে আশা করা যায়। ভারতবর্ষের ভাস্কর্য্য চিরপ্রসিদ্ধ; তাহা লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আশিক্ষিতপটু শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বলবন্ত ক্ষাত্রে উহার াগরণের আভাস দিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও একদিন বাঙালীকে আশান্বিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই অশ্বিনী বাবুর মতো সাধনা অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা তিনি উত্তম ভাস্কর হইবেন, অত্যুত্তম চিত্রকর হইবেন। যাহার হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত উদ্যম থাকে তাহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভব। ইঁহার বয়স এক্ষণে ২৮ বৎসর মাত্র।

(৪)

শ্রীযুক্ত জে, সি, চৌধুরী ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার লোক। তিনি রেশমশিল্প শিখিবার জন্য শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষা-সমিতি কর্ত্তৃক বিদেশে প্রেরিত হন। ত্রিপুরার বদান্য মহারাজা ইঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। তিনি লেখাপড়া শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া রাজসাহী রেশমবিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। দুই বৎসরে তিনি সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তৎপরে তিনি বাংলা প্রভৃতি প্রদেশের যাবতীয় রেশমকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তৎপরে তিনি বাঙ্গালোরে মহাত্মা টাটার রেশম কারখানায় রেশমপোকা পালন ও গুটি হইতে রেশম বাহির করার জাপানী রীতি শিক্ষা করিতে যান। সেখান হইতে তিনি ত্রিপুরার মহারাজার রেশমকারখানার অধ্যক্ষ (Superintendent) নিযুক্ত হইয়া ঐ কার্য্য দক্ষতার

শ্রীযুক্ত জে সি চৌধুরী।

সহিত পরিচালন করেন। এই সময় বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানির ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ডবলিউ ভাল ওয়েষ্টন, রাজসাহী-কাজিলা সিল্ক ফাইলেচারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এফ, এল, পেরিন, রাজসাহী-মতিহার রেশমকুঠির ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এফ মর্টন, এবং পূর্ব্ববঙ্গের কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত এইচ, সি, বার্ণেস, আই-সি-এস তাঁহার নিপুণতায় খুব প্রীত হন। ত্রিপুরা হইতে তিনি জাপানে গিয়া তোকিয়ো রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শিল্প শিক্ষা করেন এবং জাপানের সকল প্রধান রেশমকেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া শিক্ষার চূড়ান্ত করিয়াছেন।

কুস্তিগির পালোয়ান গামা

ভারতের পালোয়ান গামা ইংলণ্ডে গিয়া সে দেশের বহু পালোয়ানকে পরাজিত করাতে বিলাতে গামার ধন্য ধন্য পড়িয়া গেছে। গামা খুব বড় পালোয়ান হইতে পারে, কিন্তু তথাপি সে ভারতের শ্রেষ্ঠ পালোয়ান নয় বোধ হয়। সুতরাং ভারতের নামজাদা পালোয়ানেরা যে বিদেশী

পালোয়ান অপেক্ষা আরো শ্রেষ্ঠ তার আর কোনো ভুল নাই। এইরূপ আমাদের সকল বিষয়ে বিদেশের প্রতি-যোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে। আত্মশক্তির উপর আস্থা থাকি-লেই মানুষ যে কোনো বিষয়ে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। চাই শুধু উদ্যম ও সাধনা। এবং ভারতবর্ষ ফলত্যাগী সাধনাকারীদেরই দেশ।

সমাধি-সাধ

উর্ম্মি-মালিনী
তটিনীর তীরে
যেথানে দোয়েল গাহে,
দখিন বাতাস
ফুলের সুবাস
লুটিয়া যেথানে বহে,
উষা আগমনে
বনে বনে বনে
শতেক কুসুম ফুটে,
কোকিল পাপিয়া
উঠেরে জাগিয়া
মধু গীতে প্রাণ লুঠে.
অরুণ পরশে
নলিনী সরসে
ফুটে ওঠে যেইখানে,
আপনা ভুলিয়ে
সদা রয় চেয়ে
এ উহার মুখপানে,
এই নিবেদন
শেষের শয়ন
সেথায় রচিয়ো মোর,
জীবনের শেষে
বাঞ্ছিত দেশে
ঘুমাব সুখেতে ঘোর।

স্বর্গীয়া প্রতিভা দত্ত।

হেমন্তে

হেমন্তের কুহেলি-ওড়না উড়ে আজ পড়িয়াছে গায়,
প্রভাতের অরুণ-আলোক স্পর্শে তার মুরছিয়া যায়;
হিম-বায়ু আসে ধীরে ধীরে মৃত্যুসম উত্তাপবিহীন,
পত্রপুষ্পে আঁকি দিয়া যায় অশ্রুজল তুষার-কঠিন!
বাঁচাও এ মৃত্যু হ'তে মোরে, হে আমার হিমর্তু-দেবতা,
মাধব তো নহ তুমি শুধু, মধু রিক্ত-ঋতুরা-বারতা!

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোল আলু—Potato

মূলজ—Root Crop. Botanical name Solanum Tuberosum.

আলু চাষের নিয়মপ্রণালী পাঠকবর্গের গোচর করিলে অনেকে তাহা হইতে ফল লাভ করিতে পারেন। সাধারণ গৃহস্থের বৎসরে ২০ মণ আন্দাজ আলু খরচ হইয়া থাকে। ইহা বেহারের ৩ কাঠা জমিতে এবং বঙ্গদেশের ৭॥০ কাঠা জমিতে সহজে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। নিজের বাগানে বা বাসবাটীর সংলগ্ন স্থানে আলু চাষ করিলে যেমন সংসারের ব্যবহার্য্য আলু পাওয়া যায়, তেমনি আবার নিজের তত্ত্বাবধানে চাষ করাতে মনে এক প্রকার আনন্দ অনুভব হয়। এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ জীবনের পক্ষে উপকারী।

এক একর জমিতে আলু চাষ করিলে ন্যূনকল্পে ১০০৲ লাভ হয়। সুতরাং ৩ একর জমী চাষ করিলে ২৫৲ মাহিনার চাকুরী করার সমান; অথচ পরের দাসত্ব করিতে হয় না। বঙ্গদেশের ৩ বিঘায় এবং বেহারের ১।০ বিঘায় এক একর। বাঙ্গালা ও বেহারের স্থানে স্থানে বিঘার পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। এক একর সর্ব্বত্রই ৪৮৪০ বর্গগজ পরিমাণ; সুতরাং একরের হিসাব দেওয়াই সুবিধা।

মৃত্তিকা বঙ্গদেশের আউসের ক্ষেত এবং বেহারের ভিট অর্থাৎ উচ্চ জমিতে আলু জন্মে। দোআঁশা মৃত্তিকা অর্থাৎ যাহাতে অল্প বালি আছে, আলুর পক্ষে উপযুক্ত। মেটেল মাটী বা সেঁতা জমী আলুর পক্ষে অপকারী। আলুর জমী জলাশয় বা কূপের নিকট হওয়া আবশ্যক, কারণ তাহাতে সর্ব্বদা জলসেচনের প্রয়োজন হয়। আলুক্ষেত্রের নিকট আওতা থাকিলে তাহাতে অপকার করে।

বীজ—বীজ নির্ব্বাচনের উপর আলুর ফলনের আধিক্য নির্ভর করে। পাহাড়ী আলুর মধ্যে নাইনিতাল ও দার্জিলিঙ্গের এবং দেশী আলুর মধ্যে পাটনা ও বেথিয়ার আলুর বীজ উত্তম। এই কয় জাতীয় বীজে ফলও অধিক হয়। নাইনিতাল দার্জিলিং এবং পাটনাই আলুর বীজে যে ফসল হয় তাহার বর্ণ শ্বেত এবং শাঁস দানাযুক্ত। বেথিয়া বীজের ফসলের বর্ণ লালের আভাবিশিষ্ট হয়, এবং তাহার শস্য দানাযুক্ত হয় না।

পাহাড়ী জাতীয় বীজই উত্তম। নাইনিতাল বা দার্জিলিঙ্গের আলু ভাদ্র আশ্বিন মাসে বাজারে তরকারির জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই বিক্রয় হয়। উক্ত প্রকার আলু ক্রয় করিয়া তাহা হইতে মাঝারী আকারের আলু বাছিয়া লইতে হইবে। ১০।১২ দিন সেঁতা স্থানে বালির মধ্যে ঐ আলু রাখিলেই তাহাতে অঙ্কুর বাহির হয়। উক্ত অঙ্কুর-বিশিষ্ট আলুর বীজ বপন করিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট।

বীজগুলি পক্ক আমড়ার আকারের হইলে তাহাতে ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। ছোট আকারের বীজের মূল্য অল্প কিন্তু তাহাতে ফলন ভাল হয় না। বড় আকারের আলু খণ্ড খণ্ড করিয়া (যাহাতে প্রত্যেক খণ্ডে ২টী করিয়া চক্ষু থাকে) বপনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহাতেও ফলন অধিক হয় না। খণ্ড খণ্ড আলু বপন করিতে হইলে কর্ত্তিত স্থানে গুঁড়া চূণ মাখাইয়া দিলে পোকা ধরিবার ভয় থাকে না।

প্রথম বৎসরে পাহাড়ী জাতীয় আলু বপন করিয়া, তাহা হইতে বীজ রক্ষা করিলে তাহাকে acclamatized বীজ কহে। এই বীজে সর্ব্বাপেক্ষা ফলন অধিক হয়। বাঁকিপুর অঞ্চলে চাষীরা এইরূপ বীজ উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করে, তাহাই পাটনাই আলুর বীজ নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই acclamatized বীজ হইতে যে ফসল হয় তাহার বীজ রক্ষা করিলে তাহাতে আর সেরূপ ফলন হয় না। বীজের গুণ প্রতি বৎসর ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে।

বীজের পরিমাণ—মাঝারী আকারের আলুবীজ প্রতি একরে ১৫ মণ হিসাবে আবশ্যক হয়।

জমী প্রস্তুত—আশ্বিন মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি সপ্তাহে দুই বার চাষ ও একবার মই দিয়া জমী সমান করিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসের প্রথম পর্য্যন্ত এইরূপে ৮ চাষ ও ৪ বার মই দেওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যে ক্ষেত্রে ঘাস থাকিলে তাহা বিদে বা কাঁটা দিয়া একত্র করিতে হইবে এবং তাহা শুকাইয়া আগুন দিয়া পোড়াইয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হইবে। ক্ষেত্রে ঢেলা থাকিলে এই সময় তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়াও আবশ্যক।

জমী এইরূপে প্রস্তুত হইলে তাহাতে ২০ হাত দীর্ঘ প্রস্থ বা যেরূপ সুবিধা হয় ছোট ছোট পটী বা কেয়ারি করিতে হইবে। প্রত্যেক কেয়ারি এরূপভাবে করা আবশ্যক যাহাতে জলের নালার সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ থাকে। অনন্তর প্রত্যেক কেয়ারিতে কোদাল দিয়া ১ হাত অন্তর অন্তর এবং ২ আঙ্গুল গভীর জুলি এরূপভাবে টানিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক জুলির সহিত জলের নালার যোগ থাকে। এইরূপে প্রস্তুত ক্ষেত্র আলু বপনের উপযুক্ত হইল।

বীজবপন ও পাট—উপরোক্ত প্রকারে জুলি টানা হইলে এবং নিম্নের লিখিত মতে সার দেওয়া হইলে জুলিতে সারবন্দি করিয়া ১ ফুট অন্তর অন্তর এক একটী আলুবীজ ফেলিয়া যাইতে হয়। তৎপরে কোদাল দ্বারা পার্শ্বের মাটী জুলির আকারে টানিয়া তাহা দ্বারা বীজের জুলি ঢাকা দিতে হইবে। এরূপ করিলে বীজের স্থান ঢাকা পড়িয়া তাহার পার্শ্বে নূতন জুলি টানা হইবে।

বীজবপনের ৭।৮ দিন পরে আলুর গাছ বাহির হইতে থাকে। এই সময় জুলিতে একবার জলসেচন করিলে সমস্ত গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া যায়। গাছগুলি আধ হাত বড়

হইলে পার্শ্বের জুলির মাটী লইয়া তাহার গোড়ায় দিতে হইবে। ইহাকে মাটী ধরান কহে। আলুর ক্ষেত্রে ১০ দিন অন্তর অন্তর জলসেচন আবশ্যক হয়। বৃষ্টি হইলে সে সময় জলসেচনের প্রয়োজন হয় না। গাছের গোড়ায় দুইবার মাটী ধরাইয়া দিতে হয়। ক্ষেত্রে ঘাস হইলে একবার নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। আলু সুপক্ক হইয়া গাছ অল্প শুকাইতে আরম্ভ হইলে আর জলসেচনের প্রয়োজন হয় না।

সার—আলুর পক্ষে খইলের সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নিম্নের তালিকা মত যে কোন সার আলুর ক্ষেত্রে দেওয়া যাইতে পারে।

১। বর্ষাকালে ক্ষেত্রে ৪।৫ হাত অন্তর অন্তর গর্ত্ত করিয়া তাহাতে এক এক ঝুড়ি কাঁচা গোবর ফেলিয়া মাটী চাপা দিলে তাহা ক্ষেত্রে পচিয়া উত্তম সার হয়। এরূপ সুবিধা না হইলে আশ্বিন মাসে পচা গোবর প্রতি একরে ৫০ গাড়ী পরিমাণ দিতে পারা যায়।

২। রেড়ির খইল প্রতি একরে ১৫ মণ অথবা সরিসার খইল প্রতি একরে ২০ মণ আলুর পক্ষে উত্তম সার।

৩। লোনা মাটী বা সোরার মাটী, প্রতিবার আলুতে মাটী ধরাইবার সময় প্রতি গাছের গোড়ায় আধসের হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে।

৪। হাড়ের গুঁড়া দিলে প্রতি একরে ২০ মণ প্রয়োজন হয়। ইহা বর্ষাকালে ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হয়।

৫। ভাদ্র মাসের প্রথমে ধঞ্চেবীজ প্রতি একরে আধ মণ অথবা শণবীজ প্রতি একরে ১ মণ হিসাবে ছড়াইয়া দিয়া তাহার গাছ বড় হইলে আশ্বিনের প্রথমে তাহা কাটিয়া ক্ষেত্রে পুড়াইয়া দিলে পচিয়া অতি উত্তম সার হয়।

খইলের সার ক্ষেত্রে দিবার নিয়ম—ক্ষেত্রে যে জুলি কাটিবার কথা উপরে লেখা হইয়াছে খইল গুঁড়া করিয়া সেই জুলিতে ছড়াইয়া দিতে হইবে। তৎপরে জুলিতে জলসেচন করিয়া দুই দিন ফেলিয়া রাখিতে হইবে। অনন্তর মাটীতে জো* হইলে তাহা কোদাল বা হো দিয়া খুঁড়িয়া তাহাতে আলু বপন করা হয়। পুনরায়, আলুর গাছ যখন আধ হাত বড় হইবে, সেই সময় পার্শ্বস্থ জুলিতে খইলের গুঁড়া ছড়াইয়া তাহাতে জলসেচন করিয়া দুই দিবস পরে সে জুলির মাটী গাছের গোড়ায় ধরাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে অর্দ্ধেক খইল আলু বপনের পূর্ব্বে এবং বাকী অর্দ্ধেক প্রথম মাটী ধরাইবার সময় প্রয়োগ করা হয়। এই প্রণালীতে সার দিলে আলুর ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়।

আলু সংগ্রহ ও রক্ষা—বীজ বপনের পর তিন মাসে আলু তুলিবার উপযুক্ত হয়। যে সময় গাছ ক্রমে শুকাইতে থাকে, তাহাই আলু তুলিবার উপযুক্ত সময় বুঝিতে হইবে।

আলুর অর্দ্ধশুষ্ক গাছগুলি উত্তম পশুখাদ্য। আলু তুলিবার পূর্ব্বে গাছগুলি কাটিয়া লইতে পারা যায়। তৎপরে সুরপী বা কোদাল দিয়া আলু তুলিতে হইবে।

আলু তুলিয়া বাছিয়া ছোট বড় পৃথক পৃথক করিতে হইবে। তৎপরে মেঝেতে বালি রাখিয়া তাহার উপর আলু সাজাইয়া রাখিলে বর্ষা হইলে তাহা নষ্ট হয় না। যে ঘরে আলু থাকিবে, সেখানে বাতাস যাওয়া আবশ্যক।

আলুর বীজ ঝুড়িতে রাখিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা যাইতে পারে। যত আলুবীজ প্রয়োজন, তাহার দ্বিগুণ আলু বীজের জন্য রাখিতে হইবে। কারণ অনেক আলু পচিয়া যায় এবং শুকাইয়াও পরিমাণে অল্প হয়। জমীর কতক অংশে পাহাড়ী আলু এবং কতক অংশে acclamatized আলু বপন করিলে নিজের ক্ষেত্রের acclamatized বীজ রাখা যাইতে পারে।

আলু পচিবামাত্র তাহা বাছিয়া ফেলিতে হইবে। কারণ পচা আলুর সংস্রবে অন্য আলু নষ্ট হয়।

আয় ব্যয়—আলুচাষের সুবিধার জন্য নিম্নে একটী আয় ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইল। প্রথম বৎসরে এইরূপ ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু তৎপর বৎসর নিজের ক্ষেত্রের caclamatized বীজ রাখিতে পারিলে অনেক ব্যয় কমিয়া যায়। ধঞ্চে, শণ, লোনা মাটী, পাঁক প্রভৃতি সার বিবেচনা করিয়া দিতে পারিলে সারের খরচও অনেক অল্প করিতে পারা যায়। আলু কিছুদিন রাখিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে বা বীজ বিক্রয় করিলে আরও লাভ হইয়া থাকে।

এক একরে ব্যয়ের তালিকা—

৮ চাষের লাঙ্গল ও মই ...	৮৲
বীজ ক্রয় ১৫ মণ, দর ৬॥০ হিঃ	৯৭॥০
খইল ২০ মণ	৪০৲
১০ বার জলসেচন ...	৮৲
অন্যান্য খরচ ...	৮৲
খাজনা	৫॥০
	১৬৭৲

আয় এক একরে—

আলু উৎপন্ন ২০০ মণ, দর ৩০ সের হিঃ	২৬৭৲
লাভ ...	১০০৲

পর্য্যায়—প্রতি বৎসর এক ক্ষেত্রে আলু বপন করা উচিত নহে। ৩ বৎসরের অধিক এক ক্ষেত্রে আলু উৎপন্ন করিলে ফসলে পোকা ধরিবার বিশেষ ভয় থাকে।

আলুর ক্ষেত্রে অন্য ফসল দেওয়ায় ক্ষেত্রের তেজ কমিয়া যায়। কিন্তু বর্ষাকালে পাট বপন করিলে আলুর ক্ষেত্রের অপকার না হইয়া বরং উপকারই হইয়া থাকে।

মজফ্‌ফরপুর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

* মাটী শুকাইয়া ফাঁপা হইলে তাহাকে জো কহে। বৃষ্টির পরে ২।১ দিন রৌদ্র লাগিলে মাটীতে জো হয়।

আলোচনা

ভারতীয় চিত্রকলা

আশ্বিনের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ভারতশিল্প-সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি যদি আমার বক্তব্যগুলিকে একটু বুঝিতে চেষ্টা করিতেন তবে কতকটা সুবিধা হইত। কুসংস্কার ও শ্রদ্ধাহীনতা যে সত্য নির্ণয়ের পক্ষে মস্ত বাধা তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আমার ধারণা এই যে, শিক্ষিতসমাজ-কর্ত্তৃক ভারতশিল্পের প্রকৃত মর্ম্মোপলব্ধির পথে অর্দ্ধেন্দ্রবাবু প্রমুখ শিল্পোৎসাহিগণের ব্যাখ্যাদিও একটা কম অন্তরায় নহে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষেপতঃ এই :—(১) ভারতশিল্পের আদর্শ ও বিশেষত্ব বিষয়ে ইঁহারা যাহা বলিতেছেন তাহা খুব সমীচীন বোধ হয় না। যে বস্তুটাকে ইঁহারা "ভারতশিল্প" আখ্যা দিয়াছেন সেটা শিল্পের একটা অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। (২) উক্ত আদর্শের সহিত পাশ্চাত্য বাস্তব শিল্পের যে অহি-নকুল সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক ও অযৌক্তিক, এবং প্রকৃতি ও শিল্পের সম্বন্ধ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা সম্ভূত। "শিল্প-জগতের সূক্ষ্মতত্ত্ব" সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এই সকল বিষয়ে একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন।

শিল্পজগতের বাজারে ভারত শিল্প বা অপর কোন শিল্পের দর কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য আমার কিছুমাত্র ব্যস্ততা নাই। Rosseti, Burne-Jones, Spencer বা বৈষ্ণব-কবিদিগের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নাই, সুতরাং বর্ত্তমান আলোচনা ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে সদলে হাজির করিবার কারণ বুঝিলাম না। হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণ-বিদ্বেষী, পৌত্তলিক শিল্পের বিরুদ্ধে উদ্যতমুষল কোন অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে প্রচণ্ড কটাক্ষপাত করিয়াছেন উপস্থিত আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। শিল্পের উৎকর্ষ পরিমাপক কোন আইন বা আদর্শ মাপকাঠি সম্বন্ধে আমি কোথাও কোন মত জাহির করি নাই। কিন্তু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ছাড়িবেন কেন? তিনি স্বয়ং কতকগুলি "উদ্ভট" মত খাড়া করিয়া আমার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন।

অর্দ্ধেন্দ্রবাবুর মতে পুরাণাদিবর্ণিত কল্পলোকের বস্তুকল্পনাকে চিত্রে যথাযথ ভাবে (অর্থাৎ "অক্ষরে অক্ষরে!") অনুবাদ করাই ভারতশিল্পের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই। উক্ত কল্পনাগুলিকে উদ্ভট জ্ঞানে "ছাঁটিয়া ফেলিবার" প্রস্তাব কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু সত্যসত্যই "পৌরাণিক কল্পলোকে বিচরণ করিবার যাঁহাদের রুচি নাই" সে দুর্ভাগাদের অবস্থা কি হইবে? তাঁহাদের পক্ষে কি শিল্পচর্চ্চা নিষিদ্ধ হইবে? বাস্তব জগতে কি "উচ্চশিল্পের" উপযোগী মালমসলার কিছু অভাব পড়িয়াছে? প্রকৃতির রাজ্যে যিনি উচ্চ সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, অর্দ্ধেন্দ্রবাবুর ভারতশিল্পে যদি তাঁহার কোন স্থান না থাকে, তবে সে শিল্পকে নিতান্তই অসম্পূর্ণ বলিতে হইবে।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন 'আজানুলম্বিত বাহু' প্রভৃতি বর্ণনার দ্বারা নায়ককে "উচ্চশ্রেণীর মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, যাহার আদর্শ বাস্তবিক জগতের সাধারণ অবয়বী মানুষের আদর্শ হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন!" এই "আদর্শ" জিনিষটা কোথা হইতে আসিল? এই সকল অতিশয়োক্তি কি কেবলই নিরঙ্কুশ কল্পনামাত্র? যেটা 'আছে' সেটার সহিত সম্যক্ পরিচয় না হইলে, যেটা 'হইতে পারিত' বা 'হইলে ভাল হইত' সেটাকে পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় না। অতিপ্রাকৃত ও অবাস্তব আদর্শকে বুঝিতে হইলে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা প্রয়োজন, বাস্তব জগতের অসম্পূর্ণতার সহিত পরিচয় আবশ্যক। প্রকৃতির অর্থাৎ জড়প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের মধ্যেই পূর্ণতার আদর্শ ও idea নিহিত রহিয়াছে। Realism ও Idealism, বাস্তব শিল্প ও ভাবপ্রধান শিল্প, শিল্পের দুই দিক মাত্র। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ থাকা দূরে থাকুক একটার সহায়তা ব্যতীত আর একটা কখনও সম্যক সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। Realism শিল্পের মূল ভিত্তি, Idealism-এ তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, এবং উভয়ের সমন্বয়ে তাহার পূর্ণ সফলতা। অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর ভারতশিল্প যদি পাশ্চাত্য বাস্তবশিল্পের সংঘর্ষে আসিলেই আশু শিল্পলীলা সংবরণের আশঙ্কা থাকে, তবে সে শিল্পের রীতিমত এলোপ্যাথি চিকিৎসা আবশ্যক বুঝিতে হইবে।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "রায় মহাশয় চিত্রবিজ্ঞান বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা য়ুরোপীয় শিল্পের ... ... প্রথা বিশেষ মাত্র।" বিলক্ষণ! "প্রথা বিশেষ মাত্র"ই যদি বুঝিব, তবে তাহাকে "বিজ্ঞান" নামে অভিহিত করিব কেন? অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর অভিধানে "বিজ্ঞান" শব্দের অর্থ কি তাহা জানি না, কিন্তু সাধারণ লোকে বিজ্ঞান বলিতে Systematized knowledge বা সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান বুঝিয়া থাকে। চিত্রবিজ্ঞান অর্থে "যদ্দৃষ্টংতল্লিখিতং"নীতি নহে। অস্থিবিদ্যার পাণ্ডিত্যকেও চিত্রবিজ্ঞান বলা যায় না। 'মানবজাতির বহুমুখী শিল্পসাধনার' সীমা বা সমষ্টির নামও চিত্রবিজ্ঞান নহে আলোক-বিজ্ঞান (Optics) ও তৎ সংক্রান্ত শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সার্ব্বজনীন সত্যের উপর চিত্রবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। চিত্রবিজ্ঞানকে বুঝিতে হইলে কেবল কতকগুলি "আইন" মুখস্থ করিলে চলিবে না—দৃশ্য সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে সকল বিচিত্র নিয়ম কার্য্য করিতেছে "উহার সহিত সহৃদয় সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় আবশ্যক," (ভাব প্রকাশের সহায়তার জন্যই আবশ্যক, অনুকরণবিদ্যা জাহির করিবার জন্য নহে)। অবশ্য বিজ্ঞানই শিল্পরাজ্যের নিয়ন্তা নহে, এবং প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের ঘানিতে নিংড়াইলেই খাঁটি শিল্পরস নিস্যন্দিত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া শিল্পের বিজ্ঞানাংশকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। বিজ্ঞানের facts ইংরাজের পক্ষে যেরূপ সত্য, অর্দ্ধেন্দ্র বাবুর পক্ষেও তদ্রূপ। শিল্পে কেবল বাস্তব সৌন্দর্য্যটাই যে সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়া উচিত নয়, এ সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তন্মধ্যে প্রাকৃতিক সত্য বিষয়ে অজ্ঞতা বা তৎপ্রকাশে অক্ষমতা একটা খুব উঁচুদরের কৈফিয়ৎ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। শিল্প ও প্রকৃতির মধ্যে যখন একটা কৃত্রিম বিরোধ জাগিয়া উঠে, তখনই শিল্প উৎকেন্দ্র হইয়া কতকগুলি ফ্যাশান রচনাভঙ্গী ও ভড়ং (Mannerism) মাত্রে পর্য্যবসিত হইতে থাকে। শিল্পের সার্ব্বজনীনতার কথা উঠিলেই এক শ্রেণীর লোকে ভারতশিল্পের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব লোপের অমূলক আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন, এবং "ভারতের শিল্পসাধনার নিজস্ব অক্ষুণ্ণ রাখা কত বড় ধর্ম্ম, কত বড় দায়িত্ব" তাহা বুঝাইবার জন্য অনর্থক আকাশ পাতাল তোলপাড় করিয়া তোলেন।

কোনও বস্তু বা ভাব ও তৎসূচক ভাষাগত সঙ্কেতের মধ্যে কোনও সম্পর্ক বা সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না। 'পা' এই লিপি বা শব্দটির সহিত শরীরের অবয়ব বিশেষের কোনও সাক্ষাৎ যোগ নাই; একজন বিদেশীয়ের পক্ষে শব্দটা শব্দ মাত্র, লিপিটা আঁচড় মাত্র—[illegible]

চিত্রের ভাষায় মূলতঃ এরূপ কোন কৃত্রিমতা নাই।" 'পা' বুঝাইতে হইলে পা আঁকিয়া দেখাইতে হইবে। জগতে হাজার হাজার পা দেখিতে পাই, তাহার কোন দুটিই এক রকম নহে, অথচ সবগুলির মধ্যেই একটা মৌলিক সাদৃশ্য রহিয়াছে— অর্থাৎ সবগুলিই একটা আদর্শ pattern বা ছাঁচের রূপান্তর (variation) মাত্র। সকল বস্তুরই patternটীকে বজায় রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের আদর্শের কল্পনা করিয়া থাকে; কিন্তু "আদর্শ ও উপায়ের আত্যন্তিক অনৈক্য সত্ত্বেও" এক শিল্পী "মানুষ" বুঝাইতে চাহিলে অপর শিল্পীর তৎস্থানে "হস্তী" বা "ঢেঁকি" বুঝিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ইহা অবশ্য নিতান্ত স্থূল বিষয়ের কথা হইল—কিন্তু মানসিক ভাব বর্ণনের সম্বন্ধে কি হইবে? মানসিক অবস্থাকে আমরা সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতে পাই না। মানুষের মনে দুঃখ, ক্রোধ, হিংসা, ভয় প্রভৃতি ভাবের উদয় হইলে তাহার মুখশ্রী ও শরীরভঙ্গীর যে সকল বিকার লক্ষিত হয়, মানসিক ভাবের ঐ সকল বহিঃপ্রকাশ হইতেই চিত্রে সেই ভাবগুলি ব্যক্ত করিবার সঙ্কেত পাওয়া যায়। অবাস্তব কল্পনা সম্বন্ধেও সেই কথা। অবাস্তবকে কতকগুলি জ্ঞাত বাস্তবের রূপান্তর বা নূতন রকম সমাবেশ রূপেই (in terms of known Realities) আমরা কল্পনা করিয়া থাকি। সুতরাং, "অলৌকিক রসের অবতারণা" করিতে হইলে লৌকিকের জ্ঞানটা একটু বিশেষ মাত্রায়ই আবশ্যক। একই বস্তুর অসংখ্য বিচিত্র রূপের মধ্য হইতে তাহার আদর্শ চেহারা বা মূল ভাবটিকে ধরিবার চেষ্টা হইতেই Conventionএর উৎপত্তি। এই Conventionএর অর্থ কৃত্রিমতা নহে। কিন্তু অর্দ্ধেন্দ্রবাবু আশ্বাস দিয়াছেন যে, "ইংরাজী চিত্রবিজ্ঞানের পাতা উল্টাইলেই" দেখিতে পাইব যে "কৃত্রিমতা চিত্রবিজ্ঞানের প্রাণ বা প্রধান সম্পত্তি!" সেই অপরূপ চিত্রবিজ্ঞানের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায় জানাইলে বাধিত হইব। চিত্রের ভাষার যেখানে উৎপত্তি, যেটা তাহার মূল ভিত্তি, অর্দ্ধেন্দ্রবাবুর ভারতশিল্প, তাহার সহিত পরিচয় স্থাপন দূরে থাকুক, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেও নারাজ! অথচ এদিকে খুব একটা "বিশিষ্ট ভাষায়" আত্মপ্রকাশ করিবার উৎকট চেষ্টাও রহিয়াছে। "ঢাল নাই তলোয়ার নাই খামচা মারেঙ্গে!"

শিল্পে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বের স্থান আছে—কিন্তু, সেটা "মৌলিক ভাষাগত অনৈক্য" নহে—অলঙ্কার, রচনাভঙ্গী, আদর্শ ও বক্তব্য বিষয়ের পার্থক্য মাত্র। এই পার্থক্য খুব গুরুতর হইতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি ইউরোপীয় Pre-Raphaelitেগণ যে ভাষার ব্যবহার করেন Impressionistগণও সেই ভাষাই ব্যবহার করেন; প্রকৃতির নিখুঁৎ নকলনবীশের যে ভাষা নব্য-ভারতশিল্পের উদ্ভটতম কল্পনানবীশেরও সেই ভাষা। অবশ্য শিল্পকে উপলব্ধি করিতে হইলে শিল্পের আখ্যানবস্তুর সহিত সম্যক পরিচয় আবশ্যক শিল্পী আলো ও ছায়ার বৈচিত্র্যমূলক কোনও সৌন্দর্য্যকে চিত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু আমার উক্ত বিষয়ক বিদ্যার দৌড় হয়ত "গাছের পাতা সবুজ," "আকাশের রং নীল" ইত্যাদিবৎ কতকগুলি স্থূল সংস্কার পর্য্যন্ত। সুতরাং চিত্রবর্ণিত নিতান্ত স্বাভাবিক সত্যটিও আমার নিকট অদ্ভুত প্রতীয়মান হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু অর্দ্ধেন্দ্র বাবু এই ব্যাপার হইতে এই তত্ত্বোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন যে চিত্রের Light and Shade, আলো ও ছায়া জিনিসটাও একটা Convention বা "বিশিষ্ট ভাষা"!! এই মৌলিক তত্ত্বাবিষ্কারের বাহাদুরীটা কাহার জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

শ্রীসুকুমার রায়।

[এই লেখাটি গত মাসে স্থানাভাবে মুদ্রিত হয় নাই।—প্রবাসী-সম্পাদক।]

বঙ্গভাষায় বাণান-সমস্যা

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে "বাঙ্গালা শব্দের বানান"—শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়া এ বিষয়ে "প্রবাসী"র বিজ্ঞ পাঠক ও সমালোচক মহাশয়দিগের উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছেন। আমি সমালোচক তো নহিই অর্থাভাববশতঃ 'প্রবাসী'র গ্রাহকও নহি। তবে মাঝে মাঝে পাঠক বটি, যদিও 'বিজ্ঞ'-বিশেষণটী-বিরহিত; আর তাই বলিয়া 'উপদেশ'-দানেও অশক্ত। তবে যোগেশ বাবু নাকি তাঁহার ব্যাকারণ ও 'কোশ' প্রেসে দিয়াছেন, তাই গরজে, আর মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার সকলেরই আছে এই ভরসায়, অদ্য কলম ধরিলাম।

অক্ষরগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিরই দ্যোতক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; সুতরাং কোন ভাষায় যতগুলি ধ্বনির ব্যবহার আছে ততগুলিই অক্ষর থাকা আবশ্যক,—বেশীও নয়, কমও নয়,—ইহাই স্বভাবানুগত। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি যতটাই থাকুক, লেখায় ব্যবহৃত বর্ণমালা কিন্তু প্রায় ষোল আনি (৯ বর্ণ নাই বলিয়া 'প্রায়' বলা হইল) সংস্কৃত বর্ণমালার অনুরূপ। ধ্বনি অনুসারে অক্ষর রাখিতে গেলে বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে অন্তঃস্থ ব (ব) শ ও দীর্ঘস্বরগুলি একেবারেই বাদ দিতে হয়, আর ঙ, ঞ, দন্ত্য ন, ও স, এই কয়টি বর্ণ কেবল ফলায় ব্যবহারের জন্য রাখিতে হয়। আমরা য-এর উচ্চারণ কখন বা অযথা স্থানে করি (যথা, 'পদ্য' লিখিয়া উচ্চারণ করি 'পয়দ্দ') কখন বা একেবারেই করি না (যথা 'বাদ্য'কে বলি 'বাইদ্দ'), ফলা না হইলে জ-এর উচ্চারণ মত করি (যথা যেমন, যান, যম, সংযম ইত্যাদি স্থলে)। ন আর শ এর প্রকৃত ধ্বনির সঙ্গে তো আমাদের পরিচয় নাই। যোগেশ বাবু যে লিখিয়াছেন "রাশি-শব্দ লিখনে ও উচ্চারণে অবিকল সংস্কৃত" একথা ঠিক বোধ হয় না,—শ-এর প্রকৃত উচ্চারণ আমরা কখনও করি না,—শ-এর উচ্চারণ জিহ্বাগ্র সাহায্যে হইবে না, চকারাদি অন্যান্য তালব্য-বর্ণের ন্যায় উহারও উচ্চারণ জিহ্বার মধ্যভাগ দ্বারা হইবে। সমস্ত কণ্ঠ্যবর্ণগুলিই যেমন জিহ্বামূলীয় সমস্ত তালব্যবর্ণগুলিও তেমন জিহ্বা-মধ্যভাগীয়; কেবল মূর্দ্ধণ্য ও দন্ত্যবর্ণগুলি জিহ্বাগ্রীয়। সংস্কৃত বর্ণমালার শৃঙ্খলা বাগিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরভাগ হইতে ক্রমে বহির্দ্দিকে গমন,- (১) সর্ব্বপ্রথম জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্যবর্ণ, তার পর (২) জিহ্বা-মধ্যভাগীয় বা তালব্যবর্ণ, (৩) জিহ্বাগ্রীয় মূর্দ্ধণ্য বর্ণ, (৪) জিহ্বাগ্রীয় দন্ত্যবর্ণ (৫) সর্ব্বশেষে জিহ্বা-সাহায্য হীন ওষ্ঠ্যবর্ণ। আমরা যুক্তাক্ষরে, বাধ্য হইয়া, ন ও স-এর প্রকৃত উচ্চারণ করিয়া থাকি (যেমন দন্ত, সন্ধ্যা, মদনা, বস্তু, সস্তা, ইত্যাদি শব্দে,) কিন্তু ঐরূপ অবস্থায়ও শ-এর প্রকৃত উচ্চারণ করা হয় না। 'নিশ্চয়' বলিতেও সাধারণতঃ জিহ্বাগ্র দ্বারা শ-এর উচ্চারণ করা হয়, আর তাহা করিয়াই আমরা মনে করি শ এর প্রকৃত উচ্চারণ করিলাম, কিন্তু তাহা যে ভুল তাহা লক্ষ্য করি না।

শ, ব ও দীর্ঘস্বরগুলি বাদ দিয়াও আমরা আমাদের মাতৃভাষায় প্রচলিত সমস্ত ধ্বনিগুলি প্রকাশ করিতে পারি, আর পূর্ব্বোক্তরূপ বর্ণসংযোগ-স্থল ভিন্ন অন্যত্র ন ও স-এর পরিবর্ত্তে যথাক্রমে ণ ও ষ ব্যবহার করিলেই আমাদের প্রচলিত ধ্বনি ঠিক থাকে (যথা, বৎষ, ষকল, ণকল, ষণ, ইত্যাদি)। তবেই দেখা যায়, বাঙ্গালা ভাষায় শব্দের উচ্চারণ যেরূপ, বর্ণবিন্যাসপ্রণালী সেরূপ নহে। এখন এ সমস্যার মীমাংসা কি? কেহ কেহ বলেন "বর্ণবিন্যাসপ্রণালীকে ধ্বনির অনুরূপ করিয়া পরিবর্ত্তিত করিয়া লও।" কেহ কেহ বলেন "না অত

বড় মস্ত একটা রিবলিউষণে কাজ নাই, যাহা আছে তাহাই থাকুক।" এখন কোন্ পথ শ্রেয় ?

বাঙ্গালা একটী জীবিত ভাষা, এখন পর্য্যন্ত ইহার অনেক অপূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং এ ভাষায়, কি লিখনভঙ্গিতে, কি শব্দ গঠনে, কি শব্দোচ্চারণে, কি ব্যাকরণের নানা বিষয়ে ক্রমপরিবর্ত্তন অনিবার্য্য; বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়েও দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে উচ্চারণবিষয়ে অনেক বৈষম্য দেখা যায়। সুতরাং দেশ কালের ব্যবধান যখন ধ্বনি স্থির রাখিবার পক্ষে অন্তরায়, তখন বর্ণবিন্যাসই বা কিরূপে ধ্বনির অনুযায়ী স্থির হইবে? আজ সংস্কৃত অক্ষরের প্রকৃত ধ্বনি বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই, এই জন্যই না এত গোল? এখনকার ধ্বনি অনুসারে বর্ণবিন্যাসপ্রণালী স্থির করিলে দুদিন পরে ধ্বনির পরিবর্ত্তন হইলে, আবার এইরূপ গোলেই পড়িতে হইবে। তা ছাড়া, বর্ত্তমানেই বা দেশের কোন অঞ্চলের ধ্বনির অনুরূপ করিয়া বাণান ঠিক করা হইবে? এক অঞ্চলের ধ্বনি রাখিলে কি অন্যান্য অঞ্চলের লোকের ঐরূপ গোলেই পড়িতে হইবে না? যদি বলা যায়, 'কোন এক অঞ্চলের ধ্বনিকে স্টাণ্ডার্ড * (Standard) ধরিয়া বর্ণবিন্যাস নির্দ্দিষ্ট হউক, অন্যান্য অঞ্চলের লোকে ঐ স্টাণ্ডার্ডের অনুরূপ করিয়া নিজ নিজ ধ্বনিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবে, আর তাহা না পারিলেও নিজ ধ্বনি নিরপেক্ষভাবে ঐ নির্দ্দিষ্ট বাণানই চালাইবে,' তাহা হইলেই বা সমস্যার সমাধান হয় কোথায়? কারণ এত বড় দেশে সকল অঞ্চলের লোকের পক্ষেই কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্টাণ্ডার্ড ধরিয়া ধ্বনি পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া সম্ভব নহে বিশেষতঃ সাধারণকে সেরূপ করিতে বলিবার অধিকার কাহারও নাই, আর ধ্বনি পরিবর্ত্তিত না করিয়া স্টাণ্ডার্ড অনুযায়ী বাণান রাখিতে হইলে সংস্কৃত স্টাণ্ডার্ডেরই বা দোষ কি? সংস্কৃত শব্দগুলির পক্ষে সংস্কৃত বাণানকেই নিঃসন্দেহে স্টাণ্ডার্ড ধরা যাইতে পারে; ধ্বনির পরিবর্ত্তন করিতে হইলেও এক অঞ্চলের ধ্বনি অনুসারে অন্যান্য অঞ্চলের ধ্বনির পরিবর্ত্তন না করিয়া, তাহাও সংস্কৃতের ধ্বনির অনুযায়ী করিবারই চেষ্টা করা বরং কর্ত্তব্য। মোটের উপর পুরুষ পরম্পরাগত ব্যবহার দ্বারা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত স্টাণ্ডার্ড স্থাপনে আর তেমন লাভটা কি? লাভ তো কিছু নাই-ই, তাতে আবার একটা অসুবিধাও আছে,—আজকাল ভারতে সকল বিষয়েই জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, প্রদেশে প্রদেশে একটা ধীর অথচ স্থির একতার সাধন চলিতেছে, সকলের মধ্যে পরস্পর ভাব বিনিময়ের একটা প্রবল আবশ্যকতা ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, এইজন্য দিকে দিকে নানাপ্রকার চেষ্টাচরিত্র চলিতেছে. এইজন্যই Common script (একলিপি) প্রচলনের চেষ্টা চলিতেছে; এমন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষায় একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন বাণান চলিলে কি উদ্দেশ্যবিষয়ে বিঘ্ন উপস্থিত হয় না? সংস্কৃতের স্টাণ্ডার্ড ঠিক রাখিলেই এ বিষয়ে কোন গোল নাই। এই গেল খাঁটি সংস্কৃত শব্দগুলির সম্বন্ধে।

সংস্কৃতমূলক অপভ্রষ্ট শব্দগুলির সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, ধ্বনির আমূল পরিবর্ত্তনই অপভ্রংশের কারণ; সুতরাং ধ্বনি অনুসারেই অপভ্রষ্ট শব্দগুলির বাণান করা উচিত, নতুবা তাহাদের অপভ্রষ্টতা কি? 'মধ্য' শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া 'মাঝ' হইয়া গিয়াছে এখন কি 'মাধ' লিখিয়া 'মাঝ' পড়িতে হইবে,—যেহেতু মূলে ধ আছে? এই কারণেই 'কায' না লিখিয়া 'কাজ' লিখাই আমাদের মত। *

অন্য ভাষা হইতে গৃহীত ও দেশজ শব্দগুলির বাণান নিশ্চয়ই ধ্বনির অনুরূপ হইবে, কারণ তদ্ব্যতীত তাহাদের আর কোন প্রকৃত স্টাণ্ডার্ড বা আদর্শ নাই। ই আ, উ আ প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি খাঁটি বাঙ্গলা সুতরাং ইহাদিগকে (তাহাদের যেমন ধ্বনি) 'ইআ', 'উআ'ই লেখা উচিত,—'ইয়া', 'উয়া' নহে; যথা, 'পড়ুয়া' না লিখিয়া 'পড়ুআ' লেখা উচিত। +

বলা বাহুল্য যে প্রচলিত ধ্বনিই সকল শব্দের বাণানের স্টাণ্ডার্ড হইবে, দেশকালানুসারে ধ্বনির পরিবর্ত্তনে তাহাদের মধ্যে কদাচিৎ দুই চারিটি শব্দের বাণানেরও পরিবর্ত্তন হইবে সত্য, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় খুব বেশী হইবে না, সুতরাং তাহাতে তেমন কিছু আসিয়া যাইবে না। এরূপ কারণে কদাচিৎ কোন কোন শব্দের একাধিক প্রকার বাণান প্রচলিত হইবে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি কি? এমন যে সংস্কৃত ভাষা, তাহাতেও অনেক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি অনুসারে দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ বাণান গ্রাহ্য হয়। ইহা অপরিহার্য্য।

তারপর আর একটা কথা। আমরা অনুস্বারের আল্‌গা লেজটা বরং ফেলিয়া দিতে স্বীকৃত আছি কিন্তু ঙ, ঞ, ণ, ইত্যাদি অনুনাসিক

* আমি 'স্টাণ্ডার্ড' শব্দটী বার বার ব্যবহার করিয়াছি, কারণ এই শব্দটীর ঠিক্ ঠিক্ ভাব প্রকাশক দেশী শব্দ পাইলাম না। আদর্শ শব্দে এভাব প্রকাশ হয় না। এরূপে ভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করার আমরা পক্ষপাতী। ধ্বনি ঠিক্ রাখিবার জন্য এখানে ষ না দিয়া স দেওয়া হইল।

প্রবন্ধ লেখক।

* যোগেশবাবু 'সোণার কাণ' কি 'সোনার কান' লিখার পক্ষপাতী বুঝিলাম না। 'সোনার কান' কিন্তু না মূলের অনুযায়ী, না ধ্বনির অনুযায়ী। অন্য ব্যঞ্জনের অব্যবহিত না হইলে, বাঙ্গালীরা ন এর দন্ত্য উচ্চারণ করেন না।

\+ যোগেশবাবু যে বলেন, আমরা 'পাহাড়িয়া' শব্দ সংক্ষেপে 'পাহাড়ে', 'শান্তিপুরিয়া' সংক্ষেপে 'শান্তিপুরে', 'মোটিয়া' সংক্ষেপে 'মুটে', 'জলুয়া' সংক্ষেপে 'জলো' লিখিতেছি, তাহাও ঠিক বোধ হয় না। ঐ সংক্ষিপ্ত শব্দগুলি পশ্চিম বাঙ্গালায় প্রচলিত ধ্বনির কথঞ্চিৎ অনুসরণ মাত্র। ঐরূপ স্থলে শেষ অক্ষরটির পূর্ব্বে একটি অর্দ্ধ ই, বা অর্দ্ধ উকারের ধ্বনি আছে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য অনেকে (') এইরূপ একটি চিহ্ন দেন। অর্দ্ধ ধ্বনি প্রকাশের জন্য এরূপ একটা চিহ্ন দেওয়ার পদ্ধতি ভালই মনে করি, তবে সেটা কমার মত না হইয়া ইকারের চৈতনটির মত হইলেই ভাল হয়; এরূপ চিহ্নও যোগেশবাবুই যেন একবার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন মনে পড়ে। হ'ল, ক'রে প্রভৃতি অনেক স্থলেই ঐরূপ অর্দ্ধ ইকারের উচ্চারণ আছে,—পুরা ইকারেরও ধ্বনি নাই, অথচ তাহার একবারে লোপও হয় নাই।

যোগেশবাবু হ'লো, ক'রে, জ'লো, প্রভৃতি স্থানে 'হল্য', 'কর্য়ে', 'জল্য', এরূপ লেখার পক্ষপাতী দেখা যায়। কিন্তু ঐরূপ লিখিলেই প্রকৃত ধ্বনির অনুরূপ লেখা হয় বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। সংস্কৃতে যফলার ধ্বনি যেরূপ তাহা ধরিলে তো মিলেই না, যফলা দিলে বাঙ্গালায় যেরূপ (ভুল) ধ্বনি করা হয়, তাহা ধরিলেও মিলে না;—'পদ্য' শব্দের উচ্চারণ যেখানে 'পদ্দ', 'হল্য'র উচ্চারণ সেখানে 'হল্ল' হইতে পারে। 'পদ্দ' ও 'হল্ল' দুইই অশুদ্ধ উচ্চারণ বটে, কিন্তু 'হল' লিখিয়া হ'লো বা হইল উচ্চারণ করিলেও শুদ্ধ উচ্চারণ করা হইল না। প্রাচীন বাঙ্গলায় এরূপ ব্যবহার ছিল বলিয়াই যে তাহা শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে এমন কোন কথা নাই। প্রাচীনেরা 'হল্য' লেখায় যেমন উচ্চারণ করিতেন, আধুনিকেরা হ'লো লেখায়ও তেমনটিই উচ্চারণ করেন, কোন গোল হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথাই ভুল বোধ হয়।

প্রবন্ধ লেখক।

বর্ণগুলি একমাত্র চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করিবার তেমন প্রকৃত হেতু আছে মনে করি না। ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উচ্চারণস্থান, সুতরাং ধ্বনিও, ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রচলিত থাকাই তো ভাল; যাহাদের ভাষায় তাহা নাই, তাহাদের বরং নূতন বানাইয়া লওয়া উচিত; যাহাদের আছে, তাহাদের বাদ দেওয়ার প্রয়োজন কি? মারহাট্টা দেশীয় দেবনাগরী পুস্তকে এরূপ আছে দেখিয়াছি, ইংরেজীতেও এক গৎ দ্বারাই সকল অনুনাসিক বর্ণের কাজ সারিয়া দেয়; কিন্তু এ বিষয়ে তাহাদের অনুসরণ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখিতে পাই না।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু,
বাঙ্গালা ভাষার প্রধান শিক্ষক, হরিনা উচ্চ ইং বিদ্যালয়।

কুমীর পোষা

কার্ত্তিকের সংখ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ফরাসী ভদ্রলোক পার্ণলের কুমীর পোষার কথা লিখিয়াছেন। আমাদের দেশেও এই প্রকার কুমীর পোষার কথা শোনা ও দেখা যায়। খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট মহকুমায় "খান জেহান আলির দর্গা" নামক সুপ্রসিদ্ধ স্থানে আমি দেখিয়াছি যে পুষ্করিণীবাসী "কালাপাহাড়" ও "ধলাপাহাড়" নামক বৃহৎ দুইটী কুমীরকে দর্গার ফকীরগণ নাম ধরিয়া ডাকিলে ঘাটে আসিয়া যাত্রিগণ-প্রদত্ত আহার্য্য গ্রহণ করে। ঘাটে নামিয়া স্নান করিলেও এই কুমীরগণ কিছুই বলে না। তবে, সাতিশয় বিরক্ত করিলে সামান্য আঘাত করিয়া পুষ্করিণীর অন্যদিকে গমন করে। প্রবাদ এই যে খান জেহান আলি নামক ফকীর এই কুমীরদিগকে নিজবশে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতেই ইহারা নিজেদের প্রকৃতিগত হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছে।

দর্গার সন্নিকটস্থ যে পুষ্করিণীতে এই বৃহৎ কুমীরদ্বয় বাস করে, তথায় আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুমীর বাস করে। ইহারা পূর্ব্বোক্ত কালাপাহাড় ও ধলাপাহাড়ের সন্তান। কুমীরদিগের ডিমে তা দেওয়া অদ্ভুত। আমি এই দর্গায় দেখিয়াছি যে নাসিকার পুরোভাগে স্বকীয় ডিমগুলি স্থাপন করিয়া উহাতে নিশ্বাস ত্যাগ করে। এই উত্তপ্ত নিশ্বাসেই ডিম হইতে ছা বহির্গত হয়। কুমীরগুলি সকল আহারই গিলিয়া খায়। উহাদের মুখাভ্যন্তরের চর্ম্মগুলি ঈষৎ লালবর্ণ, অনেকটা শ্যাময় চামড়ার (Chamois leather-এর) ন্যায়। ডিমে তা দেওয়া ও উহার মুখাভ্যন্তরের ফটোগ্রাফ আমি লইয়াছিলাম। গৃহদাহে নেগেটিভগুলি পুড়িয়া গিয়াছে নতুবা প্রবাসীর পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিতাম।

কুমীরের সম্বন্ধে জনশ্রুতি এইরূপ যে ইহারা শীকার সূর্য্যদেবকে একবার দেখাইয়া তবে গ্রহণ করে। বস্তুতঃই তাই। শীকার মুখে করিয়া ইহারা সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া শীকার উত্তোলন করিয়া পরে গলাধঃকরণ করে। কুমীরের চক্ষুজলের (Crocodile tears-এর) কথা সকলেই অবগত আছেন।

কুমীরের গায়ে গুলি লাগিলে ডুব দিয়া "মাটী কামড়াইয়া ধরে।" তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি একটী সাড়েদশ হাত কুমীরকে গুলি করিয়াছিলাম। গুলি লাগিবামাত্র কুমীরটী চিৎ হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় আর একটী গুলি লাগাই। এই গুলি লাগিবামাত্র কুমীরটী প্রায় পনর মিনিট আধ মাইল স্থান লইয়া উলোট পালট করিয়া পরে ডুব দেয়। আমার সামান্য ডিঙ্গি ডুবাইয়া দিবার যোগাড় করিয়া তুলিয়াছিল। তিন দিবস পরে প্রায় ৫ মাইল দূরে কুমীরটী ভাসিয়া উঠে।

সুন্দরবন অঞ্চলে কুমীর মারিতে এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ভেলার উপর পাঁঠা বা তদ্রূপ কোন মৃত জন্তুকে রাখা হয়। উহার উদরে বৃহৎ বড়শী রাখা হয়। মাংসলোভে কুমীর উহা উদরস্থ করিলেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়। ঐ বড়শীর সহিত ৩০।৪০ হাত লম্বা ও বেশ মোটা "কাছা" বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ কাছার সহিত ২০০।২৫০ হাত "গুণ" বাঁধিয়া দেওয়া হয়। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কুমীর যতদূর ইচ্ছা যাতায়াত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুণ ধরিয়া গ্রামের লোকও ছুটাছুটী করে। কিছুক্ষণ পরে—সাধারণতঃ ২।৩ ঘণ্টা পরে—কাছা ধরিয়া কুমীরকে উপরে আনা হয় এবং পরে কুঠার দ্বারা তাহাকে নিহত করা হয়।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

প্রাপ্তপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সুনীতিসার—'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' ও অন্যান্য বহু গ্রন্থলেখক শ্রীযুক্ত গুরুনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক দাস গুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪-৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সাথী প্রেসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য অনুল্লিখিত। কামন্দকীয় নীতিসার, চাণক্যশ্লোক ও অপরবিধ নানা শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত কতিপয় নীতিপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গানুবাদ মূলানুগত ও আক্ষরিক হইলেও সকল স্থলে প্রাঞ্জল ও শিশুবোধ্য হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকগুলি বঙ্গানুবাদ হইতে কিঞ্চিৎ বৃহদাকারের হরপে মুদ্রিত হইলে ভাল হইত। পুস্তকের প্রারম্ভে কয়েকটি অশ্লীল চাণক্যশ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে। তজ্জন্য গ্রন্থকারের কৈফিয়ৎ এই:—'শিশুপাঠ্য গ্রন্থে যে যে শ্লোক প্রকাশ করা বর্ত্তমান রুচিসঙ্গত নহে, আমি কেবল সেইগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। পরিত্যাগ করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া এই বিজ্ঞাপনের শেষভাগে সেগুলির মূলমাত্র সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম।' এই কৈফিয়ৎ পড়িয়া আমাদের মহাভারতোক্ত মুষলপর্ব্বের কথা স্মরণ হইল। যাহা অনিষ্টকর, তাহার কণামাত্র রক্ষিত হইলেও কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, গ্রন্থকার যদুবংশধ্বংসকারী মুষলের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিতেন। আমাদের বিশ্বাস, গ্রন্থকারের উপরি উক্ত কৈফিয়ৎই শিশুগণকে সর্ব্ব প্রথমে বর্জ্জনযোগ্য অশ্লীল শ্লোকগুলি পাঠে প্রলুব্ধ করিবে।

চাণক্যশ্লোক অর্থাৎ মহাত্মা চাণক্যপ্রণীত নীতিপূর্ণ একশত আটটি শ্লোকপূর্ণ ক্ষুদ্র পুস্তক। বঙ্গদেশীয় বালকদিগের পাঠের জন্য। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত। দাস গুপ্ত এণ্ড কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত। সাথীপ্রেসে মুদ্রিত। তৃতীয় সংস্করণ। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ নাই। এই পুস্তকে মূল চাণক্যশ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পদ্য ও গদ্য অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুবাদ প্রাঞ্জল ও মূলানুগত হইয়াছে। উপদেশগুলি স্থলে স্থলে আর একটু বিশদ ও সরল হইলে ভাল হইত। মূল শ্লোকগুলি অনুবাদ ও উপদেশ হইতে কিঞ্চিৎ বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় পাঠের পক্ষে সুবিধা হইয়াছে। এই গ্রন্থে কুরুচিপূর্ণ শ্লোকগুলির অশ্লীলাংশ সাধুভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় বহিখানি মোটের উপর নির্দ্দোষ ও শিশু-পাঠের উপযোগী হইয়াছে।

শিল্পবান্ধব—শ্রীযুত শীতলচন্দ্র দত্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীরজনীকান্ত ধর। কলিকাতা ফাইন্ আর্ট প্রেসে মুদ্রিত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ২৪ পৃষ্ঠা। মূল্য অনুল্লিখিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কর্ম্মকার, তাঁতি ও বৈষ্ণবপ্রমুখ শিল্পজীবিগণের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা ও তন্নিবারণের কয়েকটি উপায় স্থূলভাবে অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। অল্প পরিসরের মধ্যে গুরু বিষয়ের অবতারণা করিতে যাইয়া গ্রন্থকার সকলস্থানে বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারেন নাই; অধিকন্তু দৃষ্টান্ত ও প্রমাণাদির অভাবে বর্ণনা নিরস ও একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। দু একটি গ্রাম্যশব্দের সংমিশ্রণও ভাষার স্বচ্ছ প্রবাহকে স্থলে স্থলে আবিল করিয়া তুলিয়াছে। গ্রন্থকারের মতে শিল্পিগণের বিদ্যাশিক্ষার অভাবই আধুনিক শিল্পদুর্দ্দশার অন্যতম প্রধান কারণ। কথাটি খাঁটি সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে শিল্পিসমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ও বাল্যবিবাহ-দূরীকরণার্থে তিনি যে সকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার সমতা সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই। বাল্যবিবাহ অর্থে গ্রন্থকার, বোধ হয়, পুরুষেরই বাল্যবিবাহ লক্ষ্য করিয়াছেন; কারণ, গ্রন্থের একস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে—'ছেলের ২৫ বৎসর ও মেয়ের ১২ বৎসর বয়সের সময় বিবাহ দেওয়া উচিত।' গ্রন্থকারের এ বিধি স্ত্রীজাতির বাল্যবিবাহ সমর্থনই করিতেছে। অথচ এই বয়সের মধ্যে রমণীকে বিদুষী করিয়া লওয়ার আবশ্যকতাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ইহা একান্ত অসম্ভব। স্ত্রীজাতির বাল্যবিবাহ স্ত্রীশিক্ষার বিষম অন্তরায় এবং 'মেয়ের ১২ বৎসর বয়সের সময় বিবাহ দেওয়া' বাল্যবিবাহেরই বাস্তব অভিনয়।

মাতৃভক্তি (মায়ের পাঁচালী)—শ্রীযুক্ত বাবু যামিনীমোহন সেন মহাশয়ের যত্নে ও সাহায্যে শ্রীরাইমোহন কর্ম্মকার দাস প্রণীত। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকিশোর দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৴০ আনা। পুস্তকের ভিতরের কাগজ সবুজরঙের, মলাট শোণিতবর্ণের। মলাটে কাউস্বরূপ একটি 'গীত'। সমালোচনার্থ পাইবার পূর্ব্বেই এই পাঁচালীখানির সহিত আমাদের একবার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং তখন ইহাকে আবর্জ্জনা-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া সোয়াস্তিলাভ করিয়াছিলাম। এমন অদ্ভুত ধরণের লেখা ও উদ্ভট ধরণের পাঁচালী আমরা অতি কমই পড়িয়াছি। ইহাতে 'গণপতিপদে প্রণতি' হইতে সুরু করিয়া বহু বিচিত্র পয়ার ও ত্রিপদা-ছন্দে 'জয়ধ্বনি,' পর্য্যন্ত সকলই আছে, এমন কি জয়ধ্বনির পরে কীর্ত্তনাঙ্গও বাদ পড়ে নাই; অথচ সেই 'জয়ধ্বনি' ও কীর্ত্তনের' মূল যে কি, তাহা

'অভাজন রাইমোহন ক'রেভক্তি মন।
মায়ের পাঁচালী' যবে 'কৈল সমাপন॥'

তখনও আমরা ঠাহর করিতে পারি নাই।

ফুলের ডালা—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। ময়মনসিংহ সুহৃদ-যন্ত্রে মুদ্রিত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ১০ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই পয়সা। এই পুস্তকে 'উষা,' 'আমার ছোটবেলা' 'প্রার্থনা' প্রভৃতি এগারটি ক্ষুদ্র কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলির অধিকাংশস্থলই ছন্দভঙ্গে পঙ্গু হইয়াছে; কোন কোন স্থল সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনাংশের খাঁটি অম্বয়—পরবর্ত্তী অংশের গোঁজামিল কদর্য্যভাবে তাহার সহিত সংমিলিত হইয়া সমগ্র রচনাটিকে মূল্যহীন করিয়া ফেলিয়াছে। তার উপর অপভাষার প্রয়োগে ও বর্ণাশুদ্ধিতে পুস্তকের কলেবর পূর্ণ। গ্রন্থকার ময়মনসিংহ এ, এম, কলেজের আই, এ, ক্লাশের ছাত্র বলিয়া সমালোচকের অনুগ্রহের দাবী রাখেন। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে আমরা তাঁহাকে সে অনুগ্রহ প্রদান করিতে অক্ষম। সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা বহু সাধনাসাপেক্ষ; গ্রন্থকার উপযুক্ত সাধনার পর আসরে নামুন—প্রত্যাখ্যাত হইবেন না, ভবিষ্যতের জন্য এ উৎসাহ তাঁহাকে প্রদান করিতেছি। খাতির নদারত।

'নখশিখাস্তম্'—শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী বিরচিত। ১৯ পৃষ্ঠা। শরীরের বিভিন্ন অংশ সংক্রান্ত—৫০টী শ্লোক।

সমস্যা-শতকম্—শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী বিরচিত। রায় শিবেন্দ্র সিংহ, বি-এ, কর্ত্তৃক টিপ্পনি সহ প্রকাশিত Bangra, Gopalganja, P. O. Chapra; ৪০ পৃঃ। মূল্য অজ্ঞাত। সমস্যা-দ্বারা পাদপূরণ করিয়া শতটী শ্লোক রচিত হইয়াছে।

"মহাত্মা পওহারীবাবা"—প্রকাশক শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র রায়, গাজীপুর। ৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য অজ্ঞাত।

জৌনপুর জেলার অন্তর্গত প্রেমাপুর গ্রামে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে পওহারী বাবার জন্ম হয়। এই মহাত্মা রামানুজীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। লেখক বলেন "পওহারী" শব্দের অর্থ 'পবন আহারী কিম্বা পয় (দুগ্ধ) আহারী"। বহুদিবস কেবলমাত্র বিল্বপত্র খাইয়া থাকিতেন বলিয়া লোকে "পওহারী" বাবা বলিয়া ডাকিত। ইঁহার জীবনে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। দুইএকটী ঘটনা এই:—

"একবার তিনি কুটীরের মধ্যে বসিয়াছিলেন, এমন সময় একটা ইন্দুর তাঁহার পিঠের উপর আসিয়া পড়ে, ইন্দুরের পশ্চাতে একটা সাপ আক্রমণ করিতে আসিতেছিল, হঠাৎ ইন্দুর লাফাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে পড়িল। তিনি সর্পের আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার জন্য স্বীয় অঙ্গাবরণ আলখিল্লা দ্বারা ইন্দুরকে আবৃত করিলেন, কিন্তু সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার স্কন্ধদেশে দংশন করিল, প্রায় দুই তিন দিন পওহারী বাবা সর্পাঘাতে অচেতন ছিলেন, পরে চেতনা হইলে কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আশ্রমবাসী-দিগকে আশ্বস্ত করিলেন, যে, সাপ বাবার কোন দোষ নাই, ইন্দুর বাবাকে দাস রক্ষা করিতে গিয়াছিল, এই জন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।"

"এক সময়ে আশ্রমে চোরের উপদ্রব হয়। কয়েকজন চোর প্রাচীর-গাত্রে সিঁদ কাটিয়া কুটীরে প্রবেশ করে এবং তৈজসপত্রাদি ইচ্ছামত অপহরণ করিয়া পলায়নের উদ্যোগ করে। এমন সময়ে পওহারী বাবা প্রাঙ্গন হইতে কোন প্রয়োজন উপলক্ষে কুটীরমধ্যে উপস্থিত হইলেন; চোরেরা তাঁহাকে দেখিয়াই অত্যন্ত ভীত ও লজ্জিত হইয়া জিনিষপত্র ফেলিয়া চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল; কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন, দ্বারপথ রোধ করিয়া চোরগণকে বলিতে লাগিলেন যে বাবাসকল কৃপা করিয়া যদি কুটীরে দর্শন দিয়াছেন তখন নিরাশ হইয়া ফিরিতে পারিবেন না, আপনাদের ইচ্ছামত দ্রব্যসকল দয়া করিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে, আপনারা অমনি ফিরিয়া গেলে দাসের অপরাধ হইবে। দস্যুগণ তখন মহালজ্জায় পড়িল। তাঁহার সেই দেবমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেববাণীর স্থায় আদেশ লঙ্ঘন করিতে কাহারও সাধ্য হইল না; অগত্যা জিনিষপত্র সহ তাড়াতাড়ি কুটীরের বাহিরে আসিয়া আশ্রম-দ্বারে সকল দ্রব্য ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।"

পওহারী বাবা স্বকৃত হোমাগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

শতদল—শ্রীসরোজকুমারী দেবী-বিরচিত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং-হাউস হইতে প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ষোড়শাংশিত ১০২ পৃষ্ঠা। ছাপা কাগজ ভালো। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি সুন্দর। মূল্য আট আনা, এখানি কবিতার বই। ১০০টি ভগবদ্ বিষয়ক কবিতা আছে। কবিতাগুলি চলনসই।

বিশ্রাম—রজনীকান্ত সেন প্রণীত। প্রকাশক, এস কে লাহিড়ী। ডবলক্রাউন ষোড়শাংশিত ৮৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা। এখানিও

কবিতার বই। কবিতাগুলি বিষয় অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত—কৌতুক ও পরিণয়মঙ্গল। কৌতুকবিভাগে সামাজিক, নৈতিক, ব্যবহারিক বিষয়ের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার প্রতি কটাক্ষ আছে। সকল বিদ্রূপগুলির মধ্যে কবির সহৃদয়তা, উদারতা ও দর্শনশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় আছে। তবে এ কবিতাগুলি রচনাহিসাবে কবির আগেকার কবিতার সমকক্ষ হয় নাই। বহুস্থলে ছন্দভঙ্গ দেখা যায়। পরিণয়মঙ্গল বিভাগে পরিণয় সম্পর্কে লিখিত কবিতা আছে। এগুলি অপেক্ষাকৃত সরস ও সুখপাঠ্য। ইহাই বোধ হয় পরলোকগত কবির শেষ রচনা। ইহার প্রতি সাধারণের সহানুভূতি হইবেই।

মঞ্জীর—শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরি প্রণীত, প্রকাশক সিটিবুক সোসাইটি। ডবলক্রাউন ষোড়শাংশ ২১৯ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷০ মাত্র। এখানিও কবিতাপুস্তক। বিভিন্ন বিষয়ের বহু খণ্ড কবিতা আছে। কবিতাগুলি সম্বন্ধে প্রশংসা বা নি[illegible] করিবার কিছু নাই।

জাপান প্রবাস—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক এম্পায়ার লাইব্রেরী। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৭৯ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্য ১৷০ আনা। কয়েকখানি ছবিও আছে। ইহাতে জাপানের পথ ও জাপানের অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কথা ও বর্ণনা আছে। কিন্তু সকল কথার মধ্যে গ্রন্থকারের অহং ভাবটি বড় বেশি প্রকাশ পাইয়াছে। আপনার কৃতিত্বের বিজ্ঞাপন ও দেশবাসীদের উপদেশ প্রদান একটু খাটো করিয়া জাপানের রীতিনীতি সম্বন্ধে আরো তথ্য দিতে পারিলে ভালো হইত। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন—তাহাতেও বিশেষত্ব কিছু নাই।

টুকটুকে রামায়ণ—শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক সিটিবুক সোসাইটি। মূল্য সাধারণ সংস্করণ আট আনা। উৎকৃষ্ট বারো আনা। অনেকগুলি ছবি আছে—তার মধ্যে কয়েকখানি ভালো, বাকি চলনসই। পদ্যে রামায়ণের উপাখ্যান। রচনা গ্রন্থকারের মৌলিক। ছন্দের সরসতা, ভাবের কবিত্ব, ভাষার সরলতা বইখানি বয়স্ক শিশু সকলেরই প্রীতিপ্রদ করিয়াছে। বইয়ের ছাপা কাগজ বেশ। উপহার দিবার মতন বই। গ্রন্থকার শিশুদিগকে কবিত্বরসে বঞ্চিত করিয়া শুধু যে ঘটনার আড়ম্বর করেন নাই, ইহাই তাঁহার সবচেয়ে প্রশংসার বিষয়। বইখানি দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। ছন্দের সামান্য একটু আধটু স্খলন পরবর্ত্তী সংখ্যায় সংশোধিত হইয়া যাইবে আশা করি।

মুদ্রা-রাক্ষস।

জেলের খাতা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। জেলে অবস্থানকালে বিপিন বাবুর হৃদয়ে যে সকল ধর্ম্মচিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং নামটা নিতান্তই ভ্রমোৎপাদক। মানুষ যখন কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়া চলে, যখন তাহার আত্মচিন্তার অবসর থাকে না, তখন সে নিজেকে যাহা ভাবে, অনেক সময়ে সে ভাবনা যে ভ্রান্ত তাহা আত্মচিন্তার দ্বারা ধরা পড়ে। নিজের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধেও মানুষের ভ্রান্ত ধারণা থাকিতে পারে—এই পুস্তকে তাহা কিয়ৎপরিমাণে স্বীকৃত ও বর্ণিত হইয়াছে। যদিও বিশেষ মত লইয়া বিপিন বাবু ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কর্ম্মস্রোতের মধ্যে সে মত কখনও কিনারা ধরিয়া বসিতে পারে নাই, তাহা এতকাল ভাসিয়াই চলিতেছিল। এখন হঠাৎ সেই কর্ম্মস্রোতে বাধা দিয়া যে ভগবান্ তাঁহাকে আত্মচিন্তার সুযোগ দিয়াছিলেন এবং এই সুযোগে তাঁহাকে তাঁহার "স্বরূপ" অবধারণ করিবার অবসর আনিয়া দিয়াছিলেন তাঁহাকে তিনি এ জন্য ধন্যবাদ না দিবেন কেন? এই পুস্তকে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগলাভ করিবার একটা তীব্র ব্যাকুলতা উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাকুলতা যদি ধর্ম্মলাভের একমাত্র উপকরণ হয় তবে ব্যাকুলআত্মা সত্বরই অভীষ্টলাভে সমর্থ হইবেন, তাহাতে সংশয় করিবার কিছুই নাই।

প্রকাশক গ্রন্থ-মুদ্রণের ত্রুটী পূর্ব্ব হইতেই স্বীকার করিয়া রাখিয়াছেন। নতুবা সে বিষয়ে সমালোচনার যথেষ্ট অবসর ছিল। মুদ্রণ-দোষে গ্রন্থখানি পাঠ করা দুরূহ ব্যাপার হইয়াছে। স্থানে স্থানে অর্থান্তর ঘটিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলির দুর্দ্দশা হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

গ্রন্থের সর্ব্বপ্রথমে আলোচ্য বিষয় "গোটা দুই তিন কঠিন কথা।" তাহার মধ্যে সাকার ও নিরাকার বিষয়ক বিচার প্রধান। তাঁহার বিচারপ্রণালী অবশ্য আমরা অনুসরণ করিতে পারি নাই। সাকার ও নিরাকার সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বিপিন বাবু তাহাতে অর্থান্তর ঘটাইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং বুঝা ও বুঝান দুইই কষ্টকর ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে। তিনি নিজেই বুঝিয়াছেন কি না সে বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না। কেন না, তিনি বলিতেছেন যে ঈশ্বরকে স্রষ্টা বলিলেই তিনি সাকার হইলেন—যেহেতু, সৃষ্টির দ্বারা স্রষ্টা পরিচ্ছিন্ন। অথচ পঞ্চভূতের এক ভূত আকাশকে তিনি নিরাকার বলিতেছেন। যদি সৃষ্টির দ্বারা স্রষ্টা পরিচ্ছিন্ন হয়েন, তবে অন্যান্য ভূতের দ্বারা একভূত পরিচ্ছিন্ন না হয় কেন? তিনি নিজেই লিখিতেছেন "dimension"ই আকারের মৌলিক লক্ষণ। যাহার dimension নাই তাহার আকার নাই। ইহাতে কি আধ্যাত্মিকভাবে সসীম বস্তুও সাকার হইল? মানবাত্মাকে তো সসীম ধরা হয়। তাই বলিয়া আত্মাকে কেহ সাকার বলে না। বিপিন বাবু সগুণকে সাকার ধরিয়া ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। জ্ঞাতৃত্ব একটা আত্মার গুণ। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণে ইহার dimension ধরা পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। সগুণ হইলেই সাকার হইবে ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। ইহা যে ভ্রান্ত, তাহা লেখক নিজেই প্রমাণ করিয়াছেন। "দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান" হইল তাঁহার মতে নির্গুণের পরাকাষ্ঠা, তাহাই নিরাকার। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, দ্রষ্টৃত্ব কি একটা গুণ নহে? দৃষ্ট বস্তু ছাড়া কি দ্রষ্টাস্বরূপ একটা কথার কথা নহে? আর যদি দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান দ্বারা নিরাকারত্ব নষ্ট না হয় তবে স্রষ্টা বা পাতা স্বরূপে নষ্ট হইবে কেন? দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থিতি করিতে গেলে যে পরিমাণ দ্বৈতের প্রয়োজন, স্রষ্টাস্বরূপে তদপেক্ষা কিছুই বেশী প্রয়োজন হইবে না। বিপিন বাবুর প্রধান ভ্রান্তি এই যে তিনি সগুণ ও নির্গুণ বা দ্বৈত ও অদ্বৈতকে দুই বিচ্ছিন্ন কোটিতে বিভক্ত করিয়া কূল কিনারা হারাইয়াছেন। সগুণ ও নির্গুণের একান্ত বিরোধ কল্পনা করিলে মীমাংসায় যে সমস্ত স্ববিরোধ উপস্থিত হয়, বিপিন বাবুর পুস্তকে সে সমস্তই পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। গ্রন্থকার যে বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে তৎপ্রতিষ্ঠিত নিরাকারেরও নিরাকারত্ব বজায় থাকিতে পারে না। যদি জীবতত্ত্বের দ্বারা ঈশ্বরত্বে সীমাবদ্ধ হন বলিয়া ঈশ্বরের নিরাকারত্ব নষ্ট হয়, তবে গুণ বা বিশেষকে পরিহার করেন বলিয়া নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ, পরিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ বা সাকার না হইবেন কেন? দুইটা সসীম বস্তুর একটা অপরটার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, ইহা সহজবোধ্য, কিন্তু যে অসীম সসীমকে আপনার অন্তর্ভূত করে না, অর্থাৎ যিনি নিতান্ত নির্গুণ, তিনিও কি সসীমের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন? সুতরাং বিপিন বাবুর প্রণালীতে একেবারে নাস্তিতত্ত্বে না পৌঁছাইলে আর নিরাকারতত্ত্ব মিলিবে না। নির্গুণবাদীদিগের গুরু শঙ্করও অদ্বৈততত্ত্বকে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিপিন বাবুর হাতে সেটুকুও টিঁকিতেছে না। আসল কথা এই, সগুণকে ছাড়িয়া নির্গুণের পশ্চাতে ছুটিলে বৌদ্ধশূন্যবাদই শেষ গতি। অন্য গতি নাই। সগুণ ও নির্গুণ যে একই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তত্ত্বের দুই দিক্

তাহা ধরিতে না পরিয়া তিনি এক দিকে পৌত্তলিকতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন অন্যদিকে আবার একেবারে শূন্যবাদের সোজা রাস্তা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং দাঁড়াইবার স্থান পান নাই।

মতের দিকে তো এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। জীবনের দিকেও মতের প্রভাব তাঁহাকে ঠিক হইয়া বসিতে দেয় নাই। তাঁহার ঈশ্বর লাভের ব্যাকুলতা যেমন আমাদিগকে সুখ দেয়, তাঁহার মতগত ভ্রান্তি যে তাঁহার জীবনকে শত সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত করিতেছে তাহা দেখিয়াও আবার আমাদের দারুণ দুঃখ হয়। মতে তিনি সগুণ নিগুর্ণের কোন সামঞ্জস্য পান নাই। জীবনেও তেমনি স্বরূপ ও প্রকাশ, নিত্য ও লীলার সামঞ্জস্যের অভাবে সংশয়সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। শক্ত করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছেন না। এই পুত্রসংস্পর্শে ঈশ্বরস্পর্শানুভব করিয়া আনন্দলাভ করিতে না করিতেই সন্দেহ হইতেছে—এ তো অনিত্য, ইহার মধ্যে কি ভগবান্ আছেন? আবার পরক্ষণেই প্রার্থনা করিতেছেন—"এবার যদি তুমি সুযোগ দাও, তবে, ঠাকুর, ভগবদ্ভাবে স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, সমাজ ও স্বদেশ—সকলের সেবা করিব।" স্বরূপের সঙ্গে প্রকাশের কি সম্বন্ধ, লীলার মধ্যে নিত্য কোন্‌খানে, তাহার স্পষ্ট অনুভূতি না থাকায়ই এরূপ সকল অসঙ্গতি উপস্থিত হইয়াছে। লীলার মধ্যেই নিত্য রহিয়াছেন, অথচ লীলাতে নিত্য পর্য্যবসিত হইয়া যাইতেছেন না, অনিত্য লীলার এই অনিত্য অস্তিত্বও যে নিত্যের প্রতিষ্ঠাতেই সম্ভাবিত হইয়াছে, অনিত্যের মধ্যেই যে নিত্য বিরাজিত অথচ নিত্য লীলার সমষ্টিমাত্র নহেন, ইহার সুস্পষ্ট ধারণা 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ'—ব্যতীত এ সংশয়তিমির কখনও দূরীভূত হইবে না। এই ধারণার অভাব বশতঃই তিনি ব্রহ্মচিন্তা এবং হেগেল দর্শনের বামমার্গীয় চিন্তাকে এক ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন। অথচ এই সগুণ ও নিগুর্ণ, নিত্য ও লীলার সামঞ্জস্যের কথা বিপিন বাবু একেবারেই উপস্থিত করেন নাই। তিনি একজায়গায় ইষ্টদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"যদি কৃষ্ণভজনাতেই আমায় টানিতে চাহ, তবে তোমার ভজনাই বা করিব কেমন করিয়া?" এই "তুমি" আর "কৃষ্ণ" কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমরা সম্যক অবধারণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে এ দুয়ের মধ্যে যে একটা antithesis আছে, তাহা বুঝা যায়। আমরা যত দূর বুঝি তাহাতে এই মনে হয় যে তুমি নিগুর্ণ আর কৃষ্ণ সগুণ একটা ধরিতে গেলে অন্যটা থাকে না। এই যে সগুণ নিগুণের মধ্যে একটা একান্ত বিরোধ কল্পিত হইয়াছে ইহাই তাঁহার ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবন উভয়ের বুকে শক্তিশেল রূপে বিঁধিয়া গিয়াছে, থাকিলেও জীবন সংশয়, তুলিয়া ফেলিলেও মৃত্যু। কখন বিশল্যকরণীর ব্যবস্থা হইবে, কে জানে?

ইতিহাসের দিক হইতেও তাঁহার বিচার ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে। বেদান্তের মতকে একেবারে নিগুর্ণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ কল্পনা করিয়া তিনি যে তাহার সঙ্গে আধুনিক নিরাকার ব্রহ্মবাদের একটা অখণ্ডনীয় পার্থক্যের আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহাও আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বেদান্তের নিগুর্ণবাদী ব্যাখ্যাকার আছেন। কিন্তু তাহাতে বেদান্ত নিগুর্ণবাদী হইলেন না। বেদান্তের তিন প্রস্থান। গীতা নিগুর্ণবাদী নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা ব্রহ্মসূত্রে মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সাক্ষ্য দিবেন, শঙ্কর অপেক্ষা রামানুজ সূত্রকারের মত অধিকতর ন্যায্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তারপর উপনিষদের কথা। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে অবশ্যই নিগুর্ণের দিকে বিশেষ ঝোঁক দৃষ্ট হয়। ইহারা সর্ব্বপ্রাচীন। ইহাদের সঙ্গে যে বুদ্ধের নির্ব্বাণবাদের একটা নৈকট্য সম্বন্ধ, সে বিষয়ের বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। কিন্তু এরূপ নিগুর্ণবাদ যে টিকিতে পারে না, তাহা ঋষিগণের অবিদিত ছিল না। তাই তাঁহারা আশু সে পথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্যান্য উপনিষদ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পরিশেষে তাঁহারা সগুণ ও নিগুর্ণকে একত্র করিয়া বেদান্তের ব্রহ্মবাদকে সফলতা দান করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে অতি স্পষ্ট ভাষায় এই সমন্বয় সাধিত হইয়াছে—

> একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
> কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলো নিগুর্ণশ্চ॥

গীতা ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

> সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্।
> অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নিগুর্ণং গুণভোক্তৃ চ॥

যাঁহাকে নিগুর্ণ বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই আবার নানা গুণে বিশেষিত করা হইতেছে। ঋষি কোনই দ্বিধা মনে করিতেছেন না। সুতরাং আধুনিক ব্রহ্মবাদীরা যদি বেদান্তের সর্ব্বভূতান্তরাত্মা কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বভৃৎ গুণভোক্তৃ নিগুর্ণ ব্রহ্মকে স্রষ্টা পাতা পরিত্রাতা বলিয়া থাকেন তবে যে তাঁহারা বেদান্তের পথ হইতে চুল মাত্রও সরিয়া গিয়াছেন, তাহাতো মনে হয় না। তবে তাঁহারা বেদান্তের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা পরিহার করিয়াছেন, তাহা ঠিক। বেদান্তের কোন একটা বিশেষ ব্যাখ্যাকে বেদান্তের আসনে তুলিয়া দিলে, বেদান্ত বলিয়া কিছুই থাকিবে না। বিপিন বাবু এই ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। ঈশ্বরের static ও dynamic, নিত্য ও লীলা এই দুই দিক। যাঁহারা লীলাকে মায়া বলিয়া নিত্যকে ধরিতে গিয়াছেন, তাঁহারা পরিণামে শূন্যে যাইয়া ঠেকিয়াছেন, আবার যাঁহারা নিত্যকে ছাড়িয়া লীলা লইয়া ব্যস্ত হইতে গিয়াছেন, খৃষ্টান বা বৈষ্ণবের ন্যায় তাঁহারা ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক লীলা বিশেষকেই নিত্যের আসনে বসাইয়া পৌত্তলিকতাদি নানা ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ ভ্রান্তির ইহাই পরিণাম। ব্রহ্ম অদ্বৈত অখণ্ড বস্তু, তাঁহার উপাসনায় ভাগাভাগি চলে না। সমগ্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

বিপিন বাবু নিরাকার ও সাকার সম্বন্ধে একটী কূটতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাঁহার আকার নাই তাঁহাকে আকার দিলে তাঁহার কোনও মর্য্যাদাহানি হয় না। যাঁহার এক আকার আছে তাঁহাকে অন্য আকার দিলে তাঁহার অবমাননা হইতে পারে। তর্কটা কূট সন্দেহ নাই। কিন্তু এখানে বাহাদুরী এই, যে, ইহার কূটত্বটা লুকাইয়া ফেলা হইয়াছে। নিরাকারবাদী যে ঈশ্বরে আকার আরোপ করিলে আপত্তি করেন, তাহার কারণটা এখানে প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই। যিনি অসীম, তাঁহাকে যে আকারই দাও না কেন, তাহাতে তাঁহার অসামঞ্জস্য নষ্ট করা হয়। অসীমকে সসীম করিলে যে তাঁহার গৌরবের হানি হয়, তাহা বোধ হয় বিপিনবাবুও অস্বীকার করিবেন না। অবশ্য তিনি যে নিরাকারবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে ঈশ্বর শূন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। শূন্যে যা কিছু আরোপ কর না কেন, তাহাতে তাহার গৌরবহানি হয় না। কিন্তু আধুনিক নিরাকারবাদীর ব্রহ্ম তো অসীম অখণ্ড চিদ্বস্তু। সুতরাং তাঁহাকে সসীম করার চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়া নিরাকারবাদী কেন যে প্রচ্ছন্ন সাকারবাদী হইবেন তাহাতো আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অধিগম্য নহে। ইহাকে কূটতর্ক ছাড়া আর কি বলিব?

তারপর উপাসনার কথা। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল, সুতরাং বেশী কথার অবসর নাই। উপাসনার শ্রেণীবিভাগ ঠিক হয় নাই। বিভূতির উল্লেখই নাই। প্রতিকোপাসনার ব্যাখ্যা একেবারেই ভুল। প্রাণরূপে ব্রহ্মোপাসনা যে প্রাচীন প্রাণময় কোষের প্রাণ নহে, এ কথা

বিপিনবাবু জানেন না, ইহাতে বাস্তবিকই আমাদের বিস্ময় উৎপন্ন হইল। যাহা হউক তিনি এ বিষয়ে আরও বলিবেন বলিয়া আমাদিগকে আশা দিয়াছেন, সেইজন্য বিস্তৃত আলোচনা হইতে ক্ষান্ত রহিলাম।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সারভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্যবিধি ও সরল জরিপপ্রণালী—শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্‌-এ, বি-এল, প্রণীত। দাস গুপ্ত কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা। ১৬২ পৃষ্ঠা।

সারভে, সেটেলমেণ্ট ও জরিপ সম্বন্ধে এপ্রকার গ্রন্থ-বাঙ্গালায় এই নূতন দেখিলাম। এই বিষয়ে ইহা অতি উত্তম গ্রন্থ হইয়াছে, বলিতে পারা যায়।

সারভে স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, সারভেয়ার ও আমিনগণ, জমিদার ও ভূম্যধিকারিগণ, এবং সারভে ও সেটেলমেণ্ট কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। কার্য্যপ্রণালী ও এতদ্দেশীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক এত জ্ঞাতব্য কথা, সরল ও সহজ বাঙ্গালায় এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে অন্য পুস্তক না পাঠ করিলেও, সাধারণ লোকের ইহাতেই চলিতে পারে।

জরিপ, খানপুরী, তজ্‌দিক, যাঁচ, মোকদ্দমা, খরচ আদায়, ক্ষুদ্র সেটেলমেণ্ট, খাসমাহাল, দিয়ারা বন্দোবস্ত, সীমানায় স্থিরচিহ্ন স্থাপন, খেওট মিলন;—স্কেল, চেইন্‌, চেইন মাপ, কম্পাস, ট্রাভার্স, প্লেন টেবেল ও ট্রাভার্স, সীমানা মাপ, মোরোব্বা ও কিস্তওয়ার, সাইট্‌ভোন্‌ ও সবট্রাভার্স, নকসায় কালী দেওয়া ও কালী কসা, নক্‌সা ভাঁওয়ান, ও সেটেলমেণ্ট আফিসের কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক অনেক মূল্যবান উপদেশে এই পুস্তক পরিপূর্ণ।

সারভে সম্বন্ধীয় নক্‌সাগুলিও অতি সুন্দর হইয়াছে। সারভে, জরীপ, ও জমাবন্দী বিষয়ে যাঁহাদের কোন বিষয় জানিবার আছে তাঁহাদের নিকট এই পুস্তকখানি বিশেষভাবে আদৃত হইবার যোগ্য।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

চিত্রপরিচয়

রদেনষ্টাইন-অঙ্কিত চিত্রাবলীর মধ্যে ইস্থারের কাহিনী পাঠ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

মর্ডেকাই নামে এক ব্যক্তির পালিতা কন্যা ইস্থার। পারস্যরাজ তাঁহাকে বিবাহ করেন। তিনি যে য়িহুদি, রাজা তাহা জানিতেন না। রাজার মন্ত্রী হামান সমস্ত য়িহুদি জাতিকে ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু মর্ডেকাই ইতিপূর্ব্বে রাজার জীবন রক্ষা করাতে তিনি রাজসম্মান প্রাপ্ত হন, এবং হামান নিহত হন। তখন ইস্থার নিজের জাতি প্রকাশ করেন। তাঁহার সুপারিশে সমগ্র য়িহুদি জাতি দেশে প্রতিপত্তি লাভ করেন। এইজন্য ইস্থারের কাহিনী য়িহুদিজাতির কাছে পুণ্যকাহিনী—ইস্থার তাঁহাদের জাতীয় দুর্দ্দশার মোচনকারিণী দেবীরূপে পূজ্যা। য়িহুদিরা যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দ্বারাই প্রপীড়িত তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা।

বীণা চিত্রখানির নীচে যে দুটি কবিতা-পংক্তি উদ্ধৃত আছে তাহাই কবিতার অর্থ প্রকাশ করিতেছে। বীণাপাণির অন্তর বাহির সঙ্গীতের সুরে বাঁধা। ভাবতন্ময় ভাবটি শিল্পী নিপুণতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে ৯৬ পৃষ্ঠায় "স্বর্ণসিন্দুর রহস্য" অর্দ্ধেক অংশ মাত্র ছাপা হইয়াছিল, বাকি অর্দ্ধেক ভুলক্রমে ছাপা হয় নাই। সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্য ইহার বাকি অংশ মুদ্রিত করা হইল।

বোতলের মধ্যে রাখিতে হয়। তৎপর পাক করিলে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও স্বর্ণ শিশির নীচে পড়ে না। স্বর্ণসিন্দুরে সোনা একেবারে মিলাইয়া যায়। একজন মান্দ্রাজী কবিরাজও আমাকে স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুতের এই প্রক্রিয়া বলিয়াছিলেন।

অবশ্য এ বিষয় নিজে আমি কখনও পরীক্ষা করি নাই। আমি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী নহি, স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুত করার আমার কোন সুযোগ হয় নাই। তবে এই প্রক্রিয়ার সফলতা সম্বন্ধে আরও একটি বিশ্বস্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ম্মা স্যাণ্ডোয়ের ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন ঢাকার বর্ত্তমান লব্ধপ্রতিষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এক সময় স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুত করিতেছিলেন। কজ্জলী পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইলে, হঠাৎ কোন প্রতিবন্ধক বশতঃ ঔষধ জাল দেওয়া বন্ধ রাখিতে বাধ্য হন। প্রায় এক বৎসর পরে যখন ঐ কজ্জলী দ্বারা স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুত করা হয়, তখন আর বরাবরের মত সম্পূর্ণ স্বর্ণ শিশির নীচে পাওয়া যায় নাই। ওজনে প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্বর্ণ কম ছিল। অবিনাশবাবু স্বয়ং এ বৃত্তান্ত আমাকে বলিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, পূর্ণ তিন বৎসর রাখিলে সম্পূর্ণ সোনাই মিলাইয়া যাইত।

বিষয়টি কঠিন নহে। সকলেরই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। হয়,—উত্তম; লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধের উদ্ধার সাধন হইবে। আর না হইলেও,—ক্ষতি নাই। কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া সদ্য সদ্য ঔষধ জাল দেওয়া হয়, তাহা না করিয়া বরং তিন বৎসর পরেই জাল দেওয়া হইল।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই—আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে অনেক ঔষধই বহুকাল হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই যে চ্যবনপ্রাশ,—ইহার জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি, মেদা—এই চারিটি প্রধান উপাদানের বিষয় এখন কেহই অবগত নহেন। স্বর্ণসিন্দুর পাকের প্রক্রিয়ার মধ্যের এই অংশটুকু যে এই প্রকারে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী সরস্বতী।

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বেণুবাদিনী।

অজণ্টা গুহা চিত্রাবলী হইতে শ্রীগণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কর্তৃক গৃহীত প্রতিলিপি।

Three colour blocks by U. Ray & Sons. *Kuntaline Press, Calcutta.*

"সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১০ম ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩১৭

৩য় সংখ্যা

ভক্ত ও অবমান

কবিগুরু একস্থানে বলিয়াছেন—

"বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া॥" *

ভগবানের ইচ্ছায় বিষও কখনো অমৃত হয়, অথবা অমৃতও কখনো বিষ হয়।

যাঁহারা ভগবানের ইচ্ছা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রে আমরা এই ভাব পরিস্ফুট দেখিতে পাই। দেখিতে পাই তাঁহাদের নিকট বিষ অমৃত হইয়াছে, এবং অমৃত হইয়াছে বিষ। অবমান আমাদের নিকট তীব্র বিষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আর সম্মানকে আমরা অমৃত বলিয়া আস্বাদ করিয়া থাকি; কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানের চরণ-কমলে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত; তাঁহারা অবমানকেই অমৃত, এবং সম্মান-কেই বিষ বলিয়া গণ্য করেন।† যত বড়ই তীব্র অবমান, নিদারুণ অবজ্ঞা হউক না, ভক্তগণ অবলীলাক্রমে ধৈর্য্যের সহিত আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া লন।

তাঁহারা নিতান্ত নির্লজ্জ বলিয়া যে এরূপ অবমান সহ্য করেন, তাহা নহে; কেন না, ভগবদ্ভক্তেরা লজ্জাহীন নহেন, কারণ লজ্জা দৈবী সম্পদের মধ্যে, এবং দৈবী সম্পৎ থাকিলেই লোকে ভক্ত হইতে পারে।*

দুর্ব্বলতাও তাহার কারণ নহে; কেননা, যদি তাহাই হইত, যদি তাঁহারা শারীরিক বলের দ্বারা অবমানের প্রতীকার করিতে অসমর্থ হইয়া অগত্যা তাহা নীরবে সহ্য করিতেন, তাহা হইলে অন্তত মনে মনেও অবমানকারীর প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষভাব লক্ষিত হইত। কিন্তু আমরা ভক্তচরিত্রে দেখিতে পাই, যাহারা ইঁহাদিগকে অবমান করিয়াছে, তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য ইঁহারা ভগবানের নিকট দীনভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, নিজের জন্য নহে। সমর্থ হইলেও ইঁহারা শক্তি প্রদর্শনে অবমানের প্রতীকার করেন না।† ইহা পরে আরো বিশদভাবে প্রদর্শিত হইবে।

* রঘু, ৮—৪৬।

† দ্রষ্টব্য:—

"সম্মানাদ্‌ ব্রাহ্মণোনিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥"

মনু, ২,১৬২।

* দ্রষ্টব্য:—

"...অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্‌।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্‌॥
* * *
ভবন্তি সম্পদং দৈবীম্‌ অভিজাতস্য ভারত॥
* * *
দৈবী সম্পদ্‌ বিমোক্ষায়, নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৬,১-৫।

"ক্বচিদ্‌ রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ।...বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ॥" এবং "ক্বচিদ্‌ রুদত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ...লোকবাহ্যঃ॥" ইত্যাদি। শ্রীমদ্‌-ভাগবতীয় শ্লোকের (৭,৪,৩০—৩১; ১১,৩,৩২; ১১,২,৩৯—৪০) বিষয় অস্ত।

† দ্রষ্টব্য:—শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১, ১৮, ৪৮।

তবে ইহার কারণ কি? ইহাই ত এই প্রবন্ধে আলোচনার বিষয়। ইহা এক মহীয়সী শক্তি, যাহা প্রকৃতিতে কুসুমকোমল হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে কুলিশের ন্যায় কঠোরও হইতে পারে; কিন্তু কঠোর হইলেও তাহা পরপীড়নের জন্য নহে, নিজেই পরপীড়নকে সহ্য করিবার জন্য। এই শক্তির স্থান দেহ নহে, ইহার স্থান হৃদয়। ইহার কার্য্যে কোনো কলরব নাই, ইহা নীরবে কার্য্য করে। ইহা বহিরুপকরণে উৎপন্ন হয় না, ইহার সমস্ত উপকরণই আন্তরিক। এবং তখনই ইহা উৎপন্ন হয়, যখন জীব নিজের সেই পরম গতি, পরম সম্পৎ, পরম লোক, পরম আনন্দ শ্রীভগবানের চরণকমলসন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে; যখন তাহার হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ভিন্ন, এবং সংশয়সমূহ ছিন্ন হইয়া যায়; এবং যখন সে সেই বস্তুকে লাভ করিতে পারে,—যাহার পর আর কিছু লভ্য বলিয়া গণ্যই হইতে পারে না। এই মহাভাগবত মহাপুরুষ তখন সেই অভয়-অমর শ্রীভগবানের চরণরেণুসম্পর্কে আসিয়া সত্য সত্যই অভয়-অমর হইয়া উঠেন। তিনি তখন স্থিতপ্রজ্ঞ; এবং সেই জন্যই তখন তাঁহার মন দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, বা সুখেও সস্পৃহ থাকে না; তাঁহার রাগ, ভয় ও ক্রোধ তখন সম্পূর্ণরূপে অতীত; তিনি তখন শুভকেও অভিনন্দন করেন না, বা অশুভকেও দ্বেষ করেন না। তিনি তখন হৃদয়কমলে যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি ধ্যান করেন, তাঁহারই প্রভাবে তাঁহার শত্রু ও মিত্র, নিন্দা ও স্তুতি, এবং মান ও অবমান সমস্তই সমান হইয়া যায়, এবং তাহাতেই তিনি সেই শ্রীমূর্ত্তি-চিন্তায় স্থিরচিত্ত হইয়া থাকিতে পারেন।*

কাঞ্চন যেমন অনলে দগ্ধ হইয়া বিশুদ্ধি লাভ করে, ভক্তও সেইরূপ দুঃখ ও অবমানের তীব্র জ্বালায় বিশুদ্ধ হন। বিশুদ্ধির জন্য কাঞ্চনকে যেরূপ দহনযন্ত্রণা সহ্য না করিলে চলে না, ভক্তেরও সেইরূপ দুঃখ ও অবমানকে মাথায় করিয়া গ্রহণ না করিলে হয় না।

মান যতদিন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া না যায়, যতদিন অবমানকে আলিঙ্গন করিতে পারা না যায়, ততদিন শ্রীভগবানের নিকট অগ্রসর হওয়া যায় না। মানের বিষয় অন্য, এবং মৌন বা নীরবে অবমান সহ্য করার বিষয় অন্য; পূর্ব্বের দ্বারা সংসার, এবং পরের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়। মানের দ্বারা শ্রীলাভ হইতে পারে, কিন্তু সেই শ্রী শ্রেয়োমার্গের বিরোধিনী; যে ব্যক্তির এই প্রজ্ঞা নাই, তাহার পক্ষে ব্রাহ্মী শ্রী সুদুর্লভ।*

এই নিমিত্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা এই পথের পথিক, তাঁহাদিগকে যদি কেহ সম্মান করে, তাহা হইলেও তাঁহারা তাহাতে নিজেকে সম্মানিত বোধ করেন না, এবং অপর পক্ষে, কেহ অবমান করিলেও, তাঁহারা তাহাতে সন্তপ্ত হন না। তাঁহারা যখন সম্মানিত হন, তখন মনে করেন যে, নয়নের নিমেষ-উন্মেষ যেমন স্বাভাবিক সম্মান করাও বিদ্বদ্গণের তেমনি স্বভাব। আবার যখন তাঁহারা অবজ্ঞাত হন, তখনো মনে করেন যে, 'ইহারা ত ধর্ম্ম বা শাস্ত্র জানে না, এবং লোকজ্ঞানও ইহাদের নাই অতএব ইহারা ত মান্য ব্যক্তির মান করিবেই না!'† তাঁহারা যে পথে চলিয়াছেন, সম্মান সে পথের বিষম বিঘ্ন তাহাতে সিদ্ধিলাভ হয় না; এই জন্য তাঁহারা লোককর্ত্তৃক

---

* "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"
গীতা, ২,৫৬-৫৭।

"যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥"
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ
* * * *
.....................তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী...॥ ঐ ১২,১৭-১৯।

* দ্রষ্টব্য—
"ন বৈ মানশ্চ মৌনঞ্চ সহিতৌ বসতঃ সদা।
অয়ং মানস্য বিষয়ো হ্যসৌ মৌনস্য তদ্বিদুঃ॥
শ্রীর্হি মানার্থসংবাসাৎ সা চাপি পরিপন্থিনী।
ব্রাহ্মী সুদুর্লভা শ্রীর্হি প্রজ্ঞাহীনেন ক্ষত্রিয়॥"
"অন্নাঙ্গনাদিভোগেষু ভাবো মান ইতি স্মৃতঃ।
ব্রহ্মানন্দসুখপ্রাপ্তিহেতুর্মৌনমিতিস্মৃতঃ (?)॥"
সনৎসুজাতীয় ও তত্রত্য শাঙ্করভাষ্য, ১,৪১-৪২।

† "যত্রপ্রযতমানং তু মানয়ন্তি স মানিতঃ।
ন মন্যমানো মন্যেত নাবমানে বিসংজ্বরেৎ॥
লোকস্বভাববৃত্তির্হি নিমেষোন্মেষবৎ সদা।
বিদ্বাংসো মানয়ন্তীহ ইতি মন্যেত মানিতঃ॥
অধর্ম্মবিদুষো মূঢ়া লোকশাস্ত্রবিবর্জ্জিতাঃ।
ন মান্যং মানয়িষ্যন্তি ইতি মন্যেদমানিতঃ॥"
সনৎসুজাতীয়, ১,৩৮—৪০।

অবমানই প্রার্থনা করেন, এবং তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। + কিছু না বলিলেও যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে অকল্যাণ অবমানাদি ব্যবহার করে, বা ভয়প্রদর্শন করে, তাঁহারা তাহাকে সম্মানকারী ব্যক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করেন। ‡

মানত্যাগ ও অবমানগ্রহণের ভাব ও উপদেশে ভক্তিগ্রন্থসমূহ পরিপূর্ণ। ভূয়োভূয় উক্ত হইয়াছে যে, নিজে সর্ব্বতোভাবে মান পরিত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু অন্যকে সবিশেষ সম্মান করিতে হইবে; চরম ক্ষান্তি, চরম সহিষ্ণুতা স্বীকার করিতে হইবে; তাহা না হইলে সাধু বা ভক্ত হওয়া যায় না। § মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই জন্যই সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ইহাই অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন—

"তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্তে দিবে মান॥

+ "সম্মাননা পরাং হানিং যোগর্দ্ধেঃ কুরুতে যতঃ।
জনেনাবমতো যোগী যোগসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি॥"
বিষ্ণুপুরাণ, ২,১৩-৪২।

‡ "যত্রাকথয়মানস্য প্রযচ্ছতাশিবং ভয়ম্।
অতিরিক্তমিবাকুর্ব্বন্ স শ্রেয়ান্নেতরো জনঃ॥"
সনৎসুজাতীয়, ১,২৯।

" 'অশিবং ভয়ং' অকল্যাণমবমানাদিকং"—ইতি তত্রত্য ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য।

§ শ্রীমদ্ভাগবতে (১১, ১১.) 'সাধু কে?' এই প্রশ্নে শ্রীভগবান্ সাধুর অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে বলিয়াছেন :

"কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
* * *
অমানী মানদঃ ... ... ॥"

"সর্ব্বদেহিনাং তিতিক্ষুঃ উত্তমাধমনীচানাং অপরাধসহিষ্ণুঃ"—ইতি তট্টীকা।

"তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥"
ঐ, ৩, ২৫, ২০।

"শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ।
গীতা, ৬,৭।

"তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্য-নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।
মানাপমানয়োস্তুলস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ॥"
গীতা, ১৪,২৪-২৫।

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কাঞ্চন॥"
যতিধর্ম্মপ্রকরণে মনু, ৬,৪৭।

"ক্ষান্তি-রব্যর্থকালত্বং বিরক্তি-র্মা ন শূ ন্য তা।"
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্বভাগ, রতিভক্তিলহরী, ১১শ শ্লোক।

তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।
তাড়ন ভর্ৎসনে কারে কিছু না বলিব॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।
সুখাইয়া মৈলে কারে পাণি না মাঙ্গয়॥"
আদিলীলা, ১৭ পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানী ভগবদ্ভক্তগণ শুভাশুভ, নিন্দাস্তুতি ও মানাপমানে কতদূর সমবুদ্ধি হন, এবং কতদূর তাঁহাদের সহিষ্ণুতা থাকে তাহা এই শ্লোকটি প্রকাশ করিতেছে—

"বাহ্বৈকস্তক্ষ্যমাণঃ স্যাচ্চন্দনেনোক্ষিতোঽপরঃ।
নাকল্যাণং ন কল্যাণং স বৈ জ্ঞানী প্রকীর্ত্তিতঃ॥" *

এক বাহু কুঠারের দ্বারা ছিন্ন হইতেছে, এবং অপর বাহু চন্দনের দ্বারা লিপ্ত হইতেছে, এই অবস্থায় যে ব্যক্তি বাহুচ্ছেদনজন্য অকল্যাণ এবং চন্দনলেপনজন্য কল্যাণ মনে করেন না, তিনিই জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আমি জানি না কোন্ মহাত্মা এই দুই পংক্তি লিখিয়া জ্ঞানী ভক্তের আদর্শ প্রকৃতি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন তিনিই যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ ভক্তি অনুভব করিয়া কিরূপে তাহা প্রকাশপূর্ব্বক লোককে বুঝাইতে হয়, তাহা জানিতেন। সত্য সত্যই এই দুই পংক্তির অতিক্ষুদ্র কবিতাটির দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতের বৈষ্ণবধর্ম্মে ও বৈষ্ণবসাহিত্যে এই ভাবটি ক্রমশ এত প্রবল ও এত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যে, যাঁহারা কথনো একবার সাধু বৈষ্ণব দর্শন করিয়াছেন, বা বৈষ্ণবসাহিত্যের কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের

* যখন কাশীতে ছিলাম, সেই সময় একদিন সায়ংকালে গঙ্গাতীরে মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট এই শ্লোকটি শুনিয়াছিলাম। ন্যায়রত্ন মহাশয় ইহাকে একটি প্রাচীন শ্লোক বলেন। কোনো পাঠক অনুগ্রহ করিয়া যদি ইহার আকর-স্থান জানাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট অতি কৃতজ্ঞ হইব। মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব, ৩২০ অঃ, ৩৬ শ্লোঃ) রাজর্ষি জনক ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

"যশ্চ মে দক্ষিণং বাহুং চন্দনেন সমুক্ষয়েৎ।
সব্যং বাস্যাপি যস্তক্ষেৎ সমাবেতাবুভৌ মম।"

আমি অতিকৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, "অমৃতবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার" সম্পাদক ভগবদ্ভক্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাকে এই শ্লোকটির কথা বলিয়া দিয়াছেন। গরুড়পুরাণেও (পূর্ব্বখণ্ড, ১০২ অঃ, ৭ শ্লো) এইরূপ একটি শ্লোক দৃষ্ট হয় :—

"যঃ কণ্টকৈর্বিতুদতি চন্দনৈর্যশ্চ লিম্পতি।
অক্রুদ্ধঃ পরিতুষ্টশ্চ সমস্তস্য চ তস্য চ॥"

তাহা দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া থাকে না। এমন দৈন্য অন্যত্র বড়ই দুর্লভ।

ইহা যে কেবল ভারতেই আবদ্ধ আছে, তাহা নহে; ভারতের বাহিরেও ইহা স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অগ্নি যেথানেই কেন থাকুক না, তাহা নিজের উষ্ণতা ও আলোক অবশ্য প্রকাশ করিবে। সেইরূপ যেথানেই ভক্তির মধুর মূর্ত্তি ও প্রেমের ললিত কান্তির উদয় হইয়াছে, সেইখানেই তাহার সেই স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা ক্রমশ তাহা দেখিতে পাইব।

এখন আমরা দুই একটি ভগবদ্ভক্তের চরিত্র উল্লেখ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব যে, তাঁহারা কিরূপ অবজ্ঞাত হইয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা তাহা সহ্য করিয়াছিলেন।

যে গ্রন্থে নির্ম্মৎসর সজ্জনগণের পরম ও কৈতববিহীন ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, যাহাতে তাপত্রয়ের উন্মূলনকারী কল্যাণপ্রদ বাস্তব বস্তু জানিতে পারা যায়, এবং যাহার শ্রবণে শ্রবণেচ্ছু কৃতিগণ সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে পরমেশ্বরকে ধারণ করিতে পারেন, এবং সেই জন্যই যাহা বর্ত্তমান থাকিলে অপর শাস্ত্রের আর প্রয়োজন থাকে না বলিয়া উক্ত হয়, সেই মহামুনি-কৃত শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রথম স্কন্ধে পরীক্ষিতের শাপবৃত্তান্তে ঐ অবমানস্বীকার-ভাবের বীজ বপন করা হইয়াছে, সপ্তম স্কন্ধে মহাভাগবত প্রহ্লাদের চরিত্রে তাহা পল্লবিত করা হইয়াছে, এবং অবশেষে একাদশ স্কন্ধে ভিক্ষুগীতায় তাহার চরম পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ একদিন মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মৃগের অনুসরণে বন হইতে বনান্তরে বিচরণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া পড়েন। তিনি নিকটে কোনো জলাশয় দেখিতে না পাইয়া মহামুনি শমীকের আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি তখন "প্রতিরুদ্ধেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধি" হইয়া সমাধিস্থ। মহারাজ পরীক্ষিৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত ও শুষ্কতালু হইয়া তদবস্থায় সেই মুনির নিকট জল প্রার্থনা করিয়াও পাইলেন না। তিনি স্বয়ং মহাভাগবত হইলেও সেই অবস্থায় নিজেকে অবজ্ঞাত মনে করিয়া সহসা অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন, এবং ধনুষ্কোটিদ্বারা সেই মহামুনির গ্রীবাদেশে এক মৃতসর্প জড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে অন্যত্র শমীকের ক্রীড়াব্যাপৃত অতিতেজস্বী পুত্র শৃঙ্গী পিতার সেই অবস্থা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে শাপ প্রদান করিলেন যে, তক্ষক সপ্তম দিবসে মহারাজ পরীক্ষিৎকে দংশন করিবে। অনন্তর আশ্রমে প্রত্যাগত পুত্রের ক্রন্দনধ্বনিতে মহামুনির সমাধি ভগ্ন হইলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শাপপ্রদান জন্য পুত্রকে তিরস্কার করিলেন, তৃষ্ণার সময় জলপ্রদান না করায় নিজেকেই অপরাধী মনে করিলেন, এবং অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। তিনি শ্রীভগবানের নিকটে বালক পুত্রের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন—"হে ভগবন্, আমার এই অপক্কবুদ্ধি বালক-পুত্র আপনার নিরপরাধ ভক্তের প্রতি যে পাপাচরণ করিয়াছে, আপনি সর্ব্বান্তর্যামী, আপনি তাহা ক্ষমা করুন!" তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন যে, রাজা যদি আজ প্রতিশাপ প্রদান করেন, তবেই আমাদের নিষ্কৃতি হইতে পারে। কিন্তু রাজর্ষি পরীক্ষিৎকে মহাভাগবত মনে করিয়া সেই প্রতিশাপের আশাও পরিত্যাগ করিলেন। কেননা, 'ভগবদ্ভক্ত সাধুপুরুষসমূহ তিরস্কৃত বঞ্চিত অভিশপ্ত অবজ্ঞাত ও তাড়িত হইয়া সামর্থ্য সত্বেও তাহার প্রতীকারে প্রবৃত্ত হন না।*

শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে দুঃখপ্রতীকারের উদ্যমও পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরনিষ্ঠ হইবার উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিতেছেন:—

"যিনি শ্রেয়ঃ কামনা করেন, তাঁহাকে যদি অজ্ঞ অসাধু ব্যক্তিরা তিরস্কার করে, অবমান করে, উপহাস করে, অসূয়া করে, তাড়না করে, আবদ্ধ করিয়া রাখে, সম্পৎ হইতে বর্জ্জিত করে, অথবা

* ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোহত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।"

ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোক, এবং তাহার ভূমিকা। ইহার প্রত্যেকটি শব্দ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে তাহাতে কি আছে, এবং কেনই বা তাহার এত গৌরব।

* তিরস্কৃতা বিপ্রলব্ধাঃ শপ্তাঃ ক্ষিপ্তা হতা অপি।
নাস্য তৎ প্রতিকুর্ব্বন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রভবোঽপি হি॥"
শ্রীমদ্ভাগবত, ১, ১৮, ৪৮; অত্রত্য শ্রীধর-টীকাও দ্রষ্টব্য।

ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকটিও আলোচ্য—
"প্রায়শঃ সাধবো লোকে পরৈর্দ্বন্দ্বেষু যোজিতাঃ।
ন ব্যথন্তে ন হৃষ্যন্তি যত আত্মা গুণাশ্রয়ঃ॥" ঐ ৪৯।

গাত্রে নিষ্ঠীবন বা মূত্র ত্যাগ করে, তথাপি তিনি কৃচ্ছ্রগত হইয়া নিজে আত্মাকে উদ্ধার করিবেন (ভগবানকে ধ্যান করিবেন)। +

শ্রীযিশুখ্রীষ্টের ভাগ্যে ইহার অনেকগুলি লাভ হইয়াছিল :— "Andthe men that held Jesus mocked him and smote him. And when they had blindfolded him they struck him on the face."—Luke, XXII. 63-64. "Then did they spit on his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands"—Matthew XXVII. 67-68. See also "I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair; I hid not my face from shame and spitting"—Isaiah, L. 6.

উদ্ধব এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন -

"হে বিশ্বাত্মন্, যাঁহারা তোমার ধর্ম্মে নিরত হইয়া শান্ত, এবং যাঁহারা তোমার চরণ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই এই অসাধুজনকৃত অতিক্রমকে সহ্য করিতে পারেন, তাঁহারা ভিন্ন অপর বিদ্বদ্গণের পক্ষে আমি ইহা সুদুঃসহ মনে করিতেছি। যাহাতে আমরা ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি, হে বাগ্মিবর, তাহা আমাদিগকে বল!" ‡

ভাগবতমুখ্য উদ্ধবের দ্বারা এইরূপ পৃষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ তিরস্কার সহ্য করিবার যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা ভাগবতের পরবর্ত্তী চারিটি অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে ভিক্ষুগীতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। §

শ্রীভগবান্ ভৃত্য উদ্ধবের বাক্য অভিনন্দন করিয়া বলিলেন—

"হে বৃহস্পতিশিষ্য, দুর্জ্জনগণের দুর্বাক্যে ক্ষুভিত চিত্তকে সমাধান (শান্ত) করিতে পারেন, এরূপ সাধু এখানে নাই। পরুষবাক্যরূপ শরসমূহ মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া যে বেদনা প্রদান করে, মর্ম্মভেদী যথার্থ শরসমূহের দ্বারা বিদ্ধ হইলেও সেরূপ বেদনা উৎপন্ন হয় না। হে উদ্ধব, এতৎসম্বন্ধে (প্রাচীনেরা) এক পবিত্র ইতিহাস বলিয়া থাকেন. আমি তাহা বর্ণন করিব, তুমি সমাহিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর।"

তিনি এই বলিয়া বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন—

"অবন্তীদেশে এক অতি ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত লুব্ধ, ক্রোধী ও কৃপণ ছিলেন। তিনি নিজের বন্ধুবর্গ বা অতিথিগণকে বাক্য দ্বারাও অর্চ্চনা করিতেন না, এমন কি নিজেও নিজের অভিলষিত বিষয় উপভোগ করিতেন না। এইরূপ ব্যবহারে তাঁহার পুত্র-কন্যা, স্ত্রী-ভৃত্য-প্রভৃতি সমস্ত পরিবার অপ্রিয় হইয়া উঠিল। তিনি যথোচিত পঞ্চযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতেন না বলিয়া সেই সেই দেবতারাও কুপিত হইয়া উঠিলেন। এই সব কারণে ক্রমশ তাঁহার বহু-আয়াস-উপার্জ্জিত ধনরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল; কতক জ্ঞাতিগণ, কতক দস্যুগণ, কতক অপর লোক, কতক বা রাজা গ্রহণ করিলেন। তিনি এইরূপে ধনহীন ও স্বজনকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া কষ্টে রোদন ও নানা চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে পরম নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন 'নিশ্চয়ত সর্ব্বদেবময় ভগবান্ হরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট, এবং সেই জন্যই আজ আমি এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমার এই প্লবরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে।* অতএব যদি আমার কাল অবশিষ্ট থাকে, তবে আমি নিজেতেই সন্তুষ্ট ও ধর্ম্মাদি সাধনে অপ্রমত্ত হইয়া তপস্যা দ্বারা শরীর শোষণ করিব। ত্রিভুবনেশ্বর দেবগণ আমাকে অনুগ্রহ করুন।' তিনি মনে মনে এই অভিপ্রায় স্থির করিয়া হৃদয়গ্রন্থিকে উন্মুক্ত করিলেন, এবং শান্ত ও ভিক্ষু মুনি হইলেন।

তিনি সর্ব্ব প্রকারে সংযত হইয়া ভিক্ষার জন্য নগর ও গ্রামে গমন করিতেন। অসজ্জনেরা সেই সময়ে ঐ অতিবৃদ্ধ অবধূত ভিক্ষুকে দর্শন করিয়া বহুবিধ তিরস্কারে অবমান করিত। কেহ কেহ তাঁহার ত্রিদণ্ড, কেহ কেহ ভিক্ষাপাত্র, কেহ কেহ কমণ্ডলু, কেহ বা পীঠ, কেহ অক্ষসূত্র, কেহ কন্থা এবং কেহ বা চীরসমূহ গ্রহণ করিত। আবার কখন কখন তাহারা তাঁহাকে ঐ সমুদয় প্রদান করিয়া বা দেখাইয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিত। কখন কখন তিনি যখন সরিৎতটে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিতেন, পাপিষ্ঠগণ সেই সময়ে ঐ অন্নে মূত্রত্যাগ করিয়া দিত, ও মস্তকে নিষ্ঠীবন করিত। তিনি বাকসংযম করিয়া থাকিতেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক কথা বলাইত আর যদি তিনি কথা না বলিতেন, তাহা হইলে তাড়ন করিত। কেহ কেহ বা চোর বলিয়া তাঁহাকে বাক্যের দ্বারা তর্জ্জন করিত। কেহ বা 'বাঁধ! বাঁধ!' বলিয়া রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিত; কেহ কেহ বা 'এ ধর্ম্মধ্বজী শঠ!' এই বলিয়া অবমান ও নিন্দা করিত; আবার কেহ কেহ বলিত 'এ এখন ক্ষীণবিত্ত ও স্বজনত্যক্ত হইয়া এই বৃত্তি ধারণ করিয়াছে!' কোনো কোন ব্যক্তি বলিত যে. 'অহো! এ কি মহাসার! গিরিরাজের ন্যায় কি ধৃতিমান্! এ বকের ন্যায় দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া মৌন দ্বারা নিজের অর্থ সিদ্ধি করিতেছে!' এই প্রকারে তাঁহাকে দুর্জ্জনেরা উপহাস করিত ও ক্রীড়নকের ন্যায় বন্ধন ও নিরোধ করিত।

কিন্তু তাঁহার নিকট ভৌতিক, দৈহিক, বা দৈবিক যে দুঃখই আসিত, তিনি মনে করিতেন যে ইহা আমার অদৃষ্টেই উপস্থিত হইয়াছে. এবং আমাকে ইহা ভোগ করিতেই হইবে। নরাধমেরা যখন তাঁহাকে ঐরূপে ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করিত, তখন তিনি অবজ্ঞাত হইয়াও সাত্ত্বিকী ধৃতিকে অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্মে অবস্থিত থাকিতেন। তিনি গাহিয়া-

---

+ "ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলুব্ধোঽসূয়িতোঽথবা।
তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ॥
নিষ্ঠ্যুতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ।
শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগত আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ॥"
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১, ২২, ৫৮-৫৯।

"আত্মানমুদ্ধরেৎ=শ্রীনারায়ণং স্মরেদিতি—" শ্রীধরস্বামী।

‡ "যথৈবমনুবুধ্যেয়ং বদ নো বদতাং বর।
সুদুঃসহমিমং মান্য আত্মন্যসদতিক্রমং॥
বিদুষামপি বিশ্বাত্মন্ প্রকৃতির্হি বলীয়সী।
ঋতে ত্বদ্ধর্ম্মনিরতাঞ্ শান্তাংস্তে চরণালয়ান্॥"
১১, ২২, ৬০-৬১।

§ এ সম্বন্ধে শ্রীধর স্বামীর উক্তি এই—
"ত্রয়োবিংশে তিরস্কারসহনোপায় ঈর্য্যতে।
ভিক্ষুগীতাপ্রকারেণ মনসঃ সংযমো ধিয়া॥
দুর্জ্জনোপদ্রবো নূনং দুঃসহোঽপি মহীয়সাং।
অতশ্চতুর্ভিরধ্যায়ৈঃ সহনোপায়বর্ণনম্॥"

* "নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ॥" ১১-২৩-২৫।

ছিলেন—'আমার এই সুখ-দুঃখের কারণ এই লোকেরা নহে, অথবা দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম বা কালও নহে; (তত্ত্বদর্শিগণ) বলিয়া থাকেন যে, ইহার কারণ কেবল মন; মন সংসারচক্রকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। * ...অহঙ্কার সংসারকে প্রকাশ করে, এই অহঙ্কারেরই সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের সহিত যোগ হয়, কিন্তু প্রকৃতির পরভূত আত্মার কোথাও কোনরূপে কাহারো দ্বারা সেই দ্বন্দ্বসংযোগ হয় না। যাহারা এই চিন্তা করিয়া প্রবুদ্ধ হয়, তাহারা আর ভূতসমূহ হইতে ভীত হয় না। অতএব আমিও পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ সেবিত সেই পরাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া মুকুন্দের চরণসেবার দ্বারাই এই দুরন্তপার তিমির উত্তীর্ণ হইবে।'

হে উদ্ধব সেই ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রথমে ধনহীন হন, তাহার পর নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন, তাহার পর দুঃখমুক্ত হন, ও তদনন্তর প্রব্রজিত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন, এবং অসজ্জনকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই। + অতএব বৎস, নিজ বুদ্ধি আমাতে স্থাপন করিয়া যোগযুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে মনকে নিগৃহীত কর; সংক্ষেপ ভাবে বলিতে গেলে যোগ এই পর্য্যন্তই (ইহার পর আর যোগ নাই)।" ‡

শ্রীভগবান্ ভিক্ষুগীতায় ভক্তের অপমানগ্রহণ-সম্বন্ধে যে "পুণ্য ইতিহাস" কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেইরূপ ইতিহাসের বিষয় ভক্তির ধর্ম্মে প্রেমের ধর্ম্মে বিরল নহে; কত কত মহাত্মা এইরূপ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সেই মধুরোজ্জ্বলচরিত্রপ্রভায় ভক্তিশাস্ত্রসমূহ চির সমুদ্ভাসিত। এই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষগণের অদ্ভুত চরিত্রামৃতের রসাস্বাদ-লুব্ধ হইয়া আর একটি "পুণ্য ইতিহাসের" উল্লেখ করিতেছি।

ভক্তিশাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র শ্রীহরিদাস কতদূর ভগবৎ-পরায়ণ ছিলেন, তাহা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কয়েকটি কথাতেই প্রকাশিত রহিয়াছে। গৌড় দেশ হইতে ভক্তগণ নীলাচলে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু যখন অন্যান্য ভক্তের সহিত দেখা করিয়া হরিদাসের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন হরিদাস—

"প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গন দিল তারে উঠাইঞা॥
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্যগুণে॥
হরিদাস কহে প্রভু না ছুইহ মোরে।
মুই নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥ *
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা।

এই পরমভক্তাবতংস হরিদাসকে স্বকীয় ভক্তির সামান্য পরীক্ষা দিতে হয় নাই, সাধারণ দুঃখযন্ত্রণা ও অবজ্ঞা-অপমান সহ্য করিতে হয় নাই। ইনি যবনবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিভক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া যবনগণের তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়াছিল। এইজন্য তাঁহার পরিপীড়ন-উদ্দেশ্যে মুলুকপতির নিকট কাজি অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, হরিদাস—

"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার॥"
শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড।

মুলুকপতি হরিদাসকে ধরাইয়া আনাইলেন। কিন্তু হরিদাস তজ্জন্য কিছুমাত্র বিচলিত বা ভীত হন নাই:—

"কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায়, কালেরো নাহি ভয়॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে চলিলা সেইক্ষণে।
মুলুকপতির দ্বারে দিলা দরশনে॥"

মুলুকপতি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, যবনের মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই জাতির জাতিধর্ম্ম আচার-ব্যবহার লঙ্ঘনপূর্ব্বক হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দুর আচার গ্রহণ করা তাঁহার ভাল হয় নাই। অতএব যাহা করিয়াছেন, করিয়াছেন; এখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া আবার পূর্ব্ব ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক তিনি নিজের কলঙ্ক ক্ষালন করুন। হরিদাস মুলুকপতির বাক্য শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং যাহা বলিলেন, তাহা সকলেরই সর্ব্বদা স্মরণযোগ্য—

'শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর॥
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে।" +

* "নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতু-
র্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি
সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যৎ॥" ১১-২৩-৩৯।

\+ "নির্বিদ্য নষ্টদ্রবিণো গতক্লমঃ
প্রব্রজ্য গাং পর্য্যটমান ইত্থং।
নিরাকৃতোঽসদ্ভিরপি স্বধর্ম্মা-
দকম্পিতোঽমুং মুনিরাহ গাথাম্॥" ১১-২৩-৫৫।

‡ "তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনোধিয়া।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ॥" ঐ ৫৭।

* "তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা।
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥" শ্রীমদ্ভাগবত, ৩-৩৩-৭।

\+ তুল:—"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥" মহিম্নস্তব।

কিন্তু অবশেষে যখন তাঁহাকে বলা হইল যে, তিনি যদি হিন্দুর ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে কাজিগণ তাঁহাকে শাস্তিপ্রদান করিবেন, তাঁহাকে অবজ্ঞাত ও লঘু হইতে হইবে, তখন হরিদাস হরিদাসেরই মত উত্তর করিয়াছিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥" *

ভগবদ্ভক্তির কি অপূর্ব্ব মহীয়সী শক্তি! কি অনুপ-পীড়ক অত্যাশ্চর্য্য তেজঃপ্রভাব! ধন্য হরিদাস! তুমিই যথার্থ ভক্ত! তুমিই ভগবৎপ্রেমামৃতের যথার্থ আস্বাদ পাইয়াছিলে!

বিচারে স্থির হইল ও পাইকগণকে আদেশ প্রদত্ত হইল, নগরের বাইশ বাজারে লইয়া গিয়া হরিদাসকে এরূপভাবে প্রহার করিতে হইবে, যেন তাহাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

অবিলম্বে পাইকেরা আসিয়া হরিদাসকে ধরিল, এবং বাজারে বাজারে লইয়া গিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার সেই মর্ম্মঘাতী দারুণ প্রহার অবলোকন করিয়া, দর্শকেরা পরম দুঃখে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজা ও উজির-গণকে শাপ দিতে লাগিলেন কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হইয়া পাইকগণের সহিত মারামারি করিতে উদ্যত হইলেন; এবং কেহ কেহ বা আকুলহৃদয়ে পদধারণপূর্ব্বক অর্থ-প্রদানের লোভ দেখাইয়া অল্প করিয়া প্রহার করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার বলিয়াছেন—

"কেহ গিয়া যবনগণের পায়ে ধরে।
'কিছু দিব অল্প করি মারহ উহারে॥'
তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে পাপগণে।
বাজারে বাজারে মারে মহাক্রোধ মনে॥"

পাইকেরা ঠাকুর হরিদাসকে যখন এইরূপ কঠোরভাবে প্রহার করিতেছিল, তখন স্বয়ং তিনি কি ভাবে ছিলেন?

"'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহদুঃখ না হয় প্রকাশ॥
* * *
সবে যে সকল পাপিগণ তাঁরে মারে।
তার লাগি দুঃখমাত্র ভাবেন অন্তরে।
এ সব জীবের কৃষ্ণ, করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সভার অপরাধ॥"

পাঠক, এস্থানে আর কি বক্তব্য হইতে পারে! মহাভাগবত হরিদাস এখানে যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দিবার শক্তি লেখনীর নাই; ইহার এখানে নীরবতাই শ্রেয়। কেবল বিস্ময়বিমুগ্ধ হৃদয় যদি পারে, গভীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখুক!

উনবিংশতি শতাব্দী পূর্ব্বে আর এক মহাপুরুষের শান্তোজ্জ্বল বদনকমল হইতে ঠিক ঐরূপ অবস্থায় ঐ কথাটিই বহির্গত হইয়াছিল :—

"Father, forgive them; for they know not what they do."—Luke, XXIII. 34.

সত্য সত্যই সেই অজর-অমর অভয়কে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে ভক্তের আর ভয়ের সম্বন্ধ থাকে না; তিনি যে তখন "অভয়ং গতো ভবতি!"

পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভে ভক্তির ভয়-নিবারকত্ব-প্রসঙ্গে অন্যান্য বচনের মধ্যে গরুড়পুরাণ হইতে এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ন চ দুর্ব্বাসসঃ শাপো বজ্রঞ্চাপি শচীপতেঃ।
হন্তুং সমর্থং পুরুষং হৃদিস্থে মধুসূদনে॥"
ভক্তিসন্দর্ভ, ৫১৪ পৃষ্ঠা।

শ্রীমদ্ভাগবতে এ বিষয়ে বিবিধ মনোরম বাক্য দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটি এই—

"শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে (=হে বিদুর), যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্॥" ৩-২২-৩৭।

শ্রীভগবান্ প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন যে, 'তুমি আমার সমস্ত ভক্তের প্রতিমূর্ত্তি!' * এই মহা ভক্তরাজ প্রহ্লাদের চরিত্র কেবল দুঃখ-যন্ত্রণা-নির্যাতনে পরিপূর্ণ; কিন্তু তথাপি, তিনি যাঁহাকে শরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই, এবং সেই জন্যই তাঁহারই প্রভাবে নির্ব্বিকার হইয়া অবলীলাক্রমে সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন; কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। †

---

* শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ১১শ অধ্যায়।

* "ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্।" ৭-১০-২১।

† "দিগ্গজৈর্দ্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ।
মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ॥
হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্ব্বতাক্রমণৈরপি।
ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরঃ সুতং॥
চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তৎ কর্ত্তুং নাভ্যপদ্যত॥"

আরো অনেক ভক্তের উল্লেখ করিতে পারা যায়; তাঁহারা কত কষ্ট, কত দুঃখ, কত অবমান মাথায় পাতিয়া আনন্দের সহিত সহ্য করিয়াছেন। এই সমস্ত আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ভারতে ভক্তগণের এই ভাবটি কিরূপ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কেবল ভারতে নহে, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে ভক্তির অভ্যুদয় ও প্রেমের আবির্ভাব, সেইখানেই ঐ ভাব; ইহার অন্যথা হইবার উপায় নাই।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে এ ভাবের সম্বন্ধে আর কিছু না বলিলেও চলে; কেন না, পূর্ব্বে যে দুই চারিটি কথা প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। তথাপি আরো কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে, ইহাতে বুঝা যাইবে যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত এ বিষয়ে ইহার কোনো ভেদ নাই। ভক্তকে কিরূপ হইতে হইবে, প্রভু খ্রীষ্ট তাহা বলিতেছেন:—

"Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are Ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you."— St. Matthew, V. 10—12.

"Ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also." *Ibid*, 39.

এই ত ঈশ্বরাশ্রিত ধর্ম্মে ঈশ্বরভক্তের কথা। কিন্তু যে ধর্ম্মে ঈশ্বর নাই, দেখা যায়, সে ধর্ম্মেও এই ভাব প্রবেশ করিয়াছে; সেখানেও উপদিষ্ট পরমপুরুষার্থের জন্য গভীর ধর্ম্মভক্তি হেতু মহাপুরুষগণ ঐরূপই পরকৃত অবমাননা নীরবে সহ্য করিতেছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে আমরা ইহা দেখিতে পাই। সংযুত্তনিকায়ে * ভগবান্ পূর্ণকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন:—

'পূর্ণ, তবে তুমি এখন কোন জনপদে বিহরণ করিবে?'

'ভগবন্, সুনাপরান্ত নামে এক জনপদ আছে, সেখানেই আমি বিহরণ করিব।'

'সুনাপরান্তবাসী লোকেরা বড় চণ্ড, বড় পরুষ; পূর্ণ, তাহারা যদি তোমার প্রতি ক্রোধ করে বা তিরস্কার করে, তবে কি করিবে?'

'ভগবন্, তাহা হইলে আমি মনে মনে ভাবিব যে, তাহারা অতি-ভদ্র ব্যক্তি; কেননা, তাহারা আমাকে হস্ত দ্বারা প্রহার করে নাই।'

* * * * *

'আচ্ছা পূর্ণ, তাহারা যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা তোমার প্রাণ হরণ করে, তবে কি করিবে?'

'তাহা হইলে ভগবন্, আমি এই মনে করিব যে, ভগবানের ত এরূপ অনেক শ্রাবক আছেন, যাঁহাদিগের নিকট কেহ তাঁহাদের শরীর ও জীবন প্রার্থনা করিলে (তাঁহারা যে স্বয়ং তাহা পূর্ব্বে দিতে পারেন নাই, এই জন্য লজ্জিত হন, ও সেই শরীর ও জীবনের প্রতি) ঘৃণা-ভাব ধারণ করিয়া তাহা প্রদান করিবার জন্য শস্ত্রধারীকে অন্বেষণ করিয়া বেড়ান; কিন্তু আমি তাহাকে অন্বেষণ করিয়া না বেড়াইলেও স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অতএব (ইহা ত আমার সৌভাগ্য)। হে সুগত, হে ভগবন্, ইহাই আমার মনে হইবে।"

'সাধু পূর্ণ, সাধু! তুমি এই দম ও উপশম-যুক্ত হইয়া সেই স্থানে বিহরণ করিতে পারিবে।' *

পরিব্রাজক সুপ্রিয় ও তাঁহার অন্তেবাসী ব্রহ্মদত্ত যখন বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের নিন্দাকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এবং ভিক্ষুগণ তাহাতে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, তখন ভগবান্ শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"ভিক্ষুগণ, অপর লোকেরা যদি আমার বা ধর্ম্মের, বা সঙ্ঘের অবর্ণ কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তোমরা তাহাদের প্রতি কোপ করিও না, দৌর্ম্মনস্য করিও না, এবং দ্রোহবুদ্ধিও করিও না। ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি তাহাতে কুপিত বা অসন্তুষ্ট হও, তাহা হইলে তাহা যে তোমাদেরই অন্তরায়; তোমরা যে তাহাদের সুভাষিত-দুর্ভাষিত কিছুই বুঝিতে পারিবে না! তাহারা কোনো বিষয়ে নিন্দা করিলে, এই মাত্র বলিয়া তাহা অপনীত করিতে পার যে, 'ইহা ত হয় নাই, ইহা ত অসত্য, ইহা ত আমাদের মধ্যে নাই।' আর ভিক্ষুগণ যদি কোনো লোকেরা আমার, ধর্ম্মের, বা সঙ্ঘের প্রশংসা করে, তাহাতেও তোমরা আনন্দ, বা সৌমনস্য, বা ঔদ্ধত্যজনক প্রীতি বোধ করিবে না। তোমরা তাহা স্বীকার করিয়া লইতে পার যে, 'হাঁ, ইহা হইয়াছে, ইহা সত্য, ইহা আমাদের মধ্যে আছে।"†

বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমৈত্রী কিরূপ উজ্জ্বল, তাহা আমি পূর্ব্বে এই পত্রিকাতে যথা ক্রমে "বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বপ্রেম," এবং "বিশ্বমৈত্রী" প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বুদ্ধশিষ্যগণ এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া কিরূপ অবমান স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাহা এই কয় পংক্তি প্রকাশ করিবে:—

"স্তুবন্তু নিন্দন্তু বা নিত্যমাকিরন্তু চ পাংসুভিঃ॥
ক্রীড়ন্তু মমাকায়েন হসন্তু বিনসন্তু চ॥

* (Published by the Pali Text Society), Part IV. p. 61.

* "সচে মন্তক্তে সুনাপরন্তকা মনুস্‌সা তিণ্‌হেন সত্থেন জীবিতা বোরোপেস্‌সন্তি, তত্র মে ইদং ভবিস্‌সতি—সন্তি খো তস্‌স ভগবতো সাবকা কায়েন চ জীবিতেন চ অট্টীয়মানা হরায়মানা জিগুচ্ছমানা সত্থহারকং পরিয়েসন্তি। ইদং আপরিয়িট্ঠএঞ্ঞেব সত্থহারকং লদ্ধন্তি এবমেত্থ ভগবা ভবিস্‌সতি, এবমেত্থ সুগত, ভবিস্‌সতি।

সাধু সাধু পুন্ন, সক্খসি খো ত্বমিমিনা দমূপসমেন সমন্নাগতো...... সুনাপরন্তকস্মিং জনপদে বত্থুং, যস্‌সদানি ত্বং পুন্ন কালং মঞ্‌ঞসীতি।' ঐ, ৬২ পৃঃ।

† দীঘনিকায় ব্রহ্মজালসুত্ত, Vol. I, p. p, p-3 (D. i. 56).

দণ্ডস্তেভ্যো ময়া কায়শ্চিন্তয়া কিং মমানয়া।
কারয়ন্তু চ কর্ম্মাণি যানি তেষাং সুখাবহং।
অনর্থঃ কস্যচিন্মা ভূন্মামালম্ব্য কদাচন।
অভ্যাখ্যাস্যন্তি মাং যে চ, যে চান্যেঽপ্যপকারিণঃ।
উৎপ্রাসকাস্তথান্যেঽপি সর্ব্বে স্যুর্ব্বোধিভাগিনঃ॥"

বোধিচর্য্যাবতার, ৩-১২, ১৪, ১৬।

লোকেরা আমাকে প্রহার করুন, নিন্দা করুন, বা ধূলি নিক্ষেপ করুন, তাঁহারা আমার শরীরের দ্বারা ক্রীড়া করুন, হাস্য করুন, বা আমোদ করুন। আমি তাঁহাদের নিকট শরীর অর্পণ করিয়াছি, আমার সে চিন্তার প্রয়োজন কি? তাঁহাদের যাহাতে সুখ হয়, সেইরূপেই তাঁহারা আমাকে কার্য্য করান। আমাকে লইয়া কাহারো যেন কখনো কোন অনর্থ না হয়। যাঁহারা আমাকে মিথ্যা দোষে দূষিত করিবেন, বা যাঁহারা আমার অপকারী বা উপহাসকারী, তাঁহারা সকলেই যেন বোধি (সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান) লাভ করিতে পারেন।

ভক্তির মাহাত্ম্য আশ্চর্য্য! ভক্তের চরিত্র অদ্ভুত! ভক্তি ও ভক্তের জয় হউক! আর জয় হউক সেই ভাষার, যাহা ঐ ভক্তি ও ভক্তের সেই রমণীয় মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া নিজেকে পবিত্র করিতে পারিয়াছে, ও নিজের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছে!

অন্য ভাষার সম্বন্ধে যাহাই হউক, আমাদের বঙ্গভাষার অভ্যুদয়ের মূলে ঐ ভক্তি ও ভক্ত; এবং এখনো তাহার নবনব কাব্যসৌন্দর্য্যের মূলে ঐ ভক্তি ও ভক্তকেই দেখিতে পাই। আজকাল বঙ্গভাষার অভিনব কবিতাসমূহের মধ্যে একটি বিলক্ষণ ভক্তিভাব পরিলক্ষিত হয়; অধিকাংশ কবিতাতেই ভগবানের জন্য ভক্তের দুঃখস্বীকার ও অবমানগ্রহণাদির ভাব বেশ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। অতি বালকও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলে দেখিয়াছি, এই ভাবেই তাহার কল্পনাদেবীকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লেখকেরা যে সকলেই সত্য-সত্য সেই ভগবদ্ভক্তিকে অনুভব করিয়া রচনা করে, তাহা নহে; কিন্তু আধুনিক প্রচলিত সাহিত্যে এই ভাবটি এত বিস্তার লাভ করিয়াছে যে, ইহাই প্রথমে নবকবির হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে যাঁহার অনভিভবনীয় প্রভাবে এই ভাবের পুণ্য জাগরণ হইয়াছে, সেই ভগবদ্ভক্ত মহাকবি রবীন্দ্রনাথেরই ভক্তিগাথায় এখানে উপসংহার করি—

"আমার মাথা নত ক'রে দাও তোমার চরণধূলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার ঘুচাও চক্ষের জলে!"

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

স্নেহের বন্ধন

(গল্প)

"কাকা, ও জমিটুকু আমাকে ছাড়িয়া না দিলে আমার বড়ই অসুবিধা হইবে, আমার ঘরের পাশের জমি, ও টুকু আপনার বিশেষ কোন কাজে লাগিবে না, কিন্তু উহা না পাইলে আমার এ বাড়ীতে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।"

কাকা বলিলেন, "কিছুতেই যে তোমার পেট ভরে না দেখিতেছি! ষোল আনা সম্পত্তির দশ আনা তোমাকে ছাড়িয়া দিয়া আমি পাঁচ জনের অনুরোধে ছয় আনা মাত্র লইলাম, ইহাও তোমার সহ্য হইতেছে না? ও জমি আমার ভাগে পড়িয়াছে, উহা তোমাকে দিতে পারিব না; সরকারী পায়খানাটি তোমার ভাগে পড়িয়াছে, আমার একটা পায়খানা না করিলে চলিবে না, আমি ওখানে পায়খানা করিব।"

ভাইপো বলিল, "কি সর্ব্বনাশ, তাহা হইলে আমাকে যে পৈত্রিক ভিটা ত্যাগ করিতে হয়! আমার রান্নাঘরের পাশে আপনি পায়খানা করিলে আমি কি করিয়া এ বাড়ীতে বাস করি?"

কাকা বলিলেন, "বাস করিতে না পার, উঠিয়া যাও।"

খুড়া ভাইপোতে ইহার পর আর কোন কথা হইল না।

দরবেশপুরের মজুমদারেরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। হরিশ্চন্দ্র ও মুকুন্দচন্দ্র উভয়ে সহোদর ভ্রাতা; তাঁহাদের পৈত্রিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু জ্যেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র শুভক্ষণে সাহেব জমীদারদের ডিহী সনাতনপুরের নায়েবী পদ লাভ করিয়াছিলেন; এই কার্য্যে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন, সেই অর্থে তিনি পৈত্রিক খড়ো বাড়ী ভাঙ্গিয়া প্রকাণ্ড পাকা ইমারত প্রস্তুত করিয়াছিলেন; বাগান, পুকুর ও জমীজমাও প্রচুর করিয়াছিলেন। জমীদারের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তিনি সর্ব্বদা বাড়ী আসিতে পারিতেন না, কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দচন্দ্রের উপর তিনি সংসারের কর্তৃত্ব ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

মুকুন্দচন্দ্র বাড়ী বসিয়া গ্রাম্য সবরেজেষ্ট্রী আফিসে কুড়ি টাকা বেতনের কেরাণীগিরি করিতেন। কুড়ি টাকা বেতনে এ কালে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন; কিন্তু দাদার উপার্জ্জিত অর্থেই সংসার চলিত, তাঁহার কুড়ি টাকার কুড়ি পয়সাও খরচ হইত না, বরং দাদার প্রেরিত সংসার-খরচের টাকা হইতেও কিছু কিছু সঞ্চিত হইত; তাহা ডাকঘরের সেবিংস্ ব্যাঙ্কে জমিত; সেবিংস্ ব্যাঙ্কের দুই খানি খাতার একখানি খাতা মুকুন্দের স্ত্রী মুক্তকেশীর নামে, অন্য খানি পুত্র মুরারীমোহনের নামে। এতদ্ভিন্ন মুক্তকেশী গহনাপত্র বন্ধক রাখিয়া পল্লীবাসিনীগণকে মাসিক অর্দ্ধ আনা সুদে নিত্য টাকা ধার দিতেন। কয়েক বৎসরের মহাজনীতে সুদের টাকা আসল ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামের সকলেরই বিশ্বাস ছিল মজুমদারদের ছোট গিন্নির হাতে যে টাকা আছে তাহাতে তালুক মুলুক কিনিতে পারা যায়।

গ্রামের লোক যাহা জানিত, বড় গিন্নি অর্থাৎ হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী তাহা যে না জানিতেন এমন নয়; কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও অগত্যা তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত; পরম শত্রুতেও হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রৈণ অপবাদ দিতে পারিত না। মাতঙ্গিনী দেবরের কপট ব্যবহারের কথা অনেকবার স্বামীর গোচর করিয়াছিলেন; অভিমান, অশ্রুত্যাগ, ভূমিশয্যাগ্রহণ, বাপেরবাড়ী চলিয়া যাইবার ভয় প্রদর্শন প্রভৃতি সাংঘাতিক অস্ত্রে স্বামীর মর্ম্মভেদ করিবার চেষ্টারও ক্রটী করেন নাই, কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের ভ্রাতৃবাৎসল্যের সুদৃঢ় বর্ম্মে তাহা সকলই চূর্ণ হইয়াছিল। 'সদাশিব' হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীর অভিযোগে কোন দিন কর্ণপাত করেন নাই; ঘ্যান-ঘ্যানানি নিতান্ত অসহ্য হইলে তিনি বলিতেন, "তোমার কথা শুনিয়া কি আমার ছোট ভাইটিকে পৃথক করিয়া দিব? তাহা হইলে গ্রামের লোকের কাছে মুখ দেখাইব কি করিয়া? এ সকল কথা আর তুমি মুখে আনিও না।"—স্বামীর অন্ধত্ব দূর করিবার আশা নাই বুঝিয়া মাতঙ্গিনী হতাশ ভাবে অশ্রুবর্ষণ পূর্ব্বক মনের জ্বালা নিবারণ করিতেন। সুতরাং সংসারের সুখের অভাব না থাকিলেও শান্তি ছিল না।

মুকুন্দ খুব সাংসারিক লোক, তাঁহার বাহ্যিক সরলতা আন্তরিক কুটিলতার নির্ভরদণ্ডস্বরূপ ছিল। তিনি দিব্য চক্ষুতে দেখিতেছিলেন, দাদা তাঁহাকে যতই স্নেহ করুন, বিশ্বাস করুন, তাসের সুন্দর প্রাসাদ এতদিন চূর্ণ হইবেই, একদিন তাঁহাকে পৃথক হইতেই হইবে; সুতরাং তিনি সাধ্যানুসারে বেশ গুছাইয়া লইতেছিলেন, কিন্তু দাদা যাহাতে মনে কষ্ট পান বা তিনি বিরক্ত হন, প্রকাশ্যে এরূপ কোন কার্য্য করিতেন না, দাদার প্রতি মুকুন্দ ইষ্ট দেবতার ন্যায় ভক্তি প্রকাশ করিতেন। নিজের পুত্রের জন্য বিলাতী কাপড় কিনিতেন, কিন্তু ভাইপো হারাণের জন্য মিহি ফরাসডাঙ্গার ধুতি ভিন্ন অন্য কাপড় কিনিতেন না। হরিশ্চন্দ্রও জানিতেন সংসারে তাঁহার ভাই ভিন্ন অধিক আপনার জন আর কেহই নাই, মুকুন্দের সঙ্গেই তাঁহার সকল বৈষয়িক পরামর্শ হইত। তিনি সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভ্রাতার নিকট প্রচুর অর্থ পাঠাইতেন, কিন্তু 'ভাই কি মনে করিবে' ভাবিয়া কোনদিন তাঁহার নিকট জমা খরচ চাহেন নাই; বরং মুকুন্দ নিষ্কলঙ্ক থাকিবার জন্য জমা খরচ দেখাইতে আসিলে তিনি বলিতেন, "মুকুন্দ, তুমি কি আমার পর যে গোমস্তা মুহুরীর মত তোমার কাছে খরচের হিসাব লইব?"—মুকুন্দ বলিতেন, "না দাদা, পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলিতে পারে, আপনার কান ভারি করিতে পারে, হিসাব পত্র দেখাই ভাল।"—হরিশ্চন্দ্র বলিতেন, "আমি কি স্ত্রীলোক যে পরের কথায় নাচিব? তোমাকে অবিশ্বাস করিলে সংসারে আর কাহাকে বিশ্বাস করিব? বিশেষতঃ তুমি ও তোমার স্ত্রী পুত্র আমার অবশ্য প্রতিপাল্য, তোমরা আমার খাইবে না ত কোন্ পরের খাইতে যাইবে?"

এ সকল কথা হরিশ্চন্দ্রের বন্ধুগণেরও অবিদিত ছিল না; তাঁহারা তাঁহার সদাশয়তায় মুগ্ধ হইতেন বটে, কিন্তু গোপনে বলাবলি করিতেন, "ভায়া একটা পরগণার নায়েবী করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার একেবারেই বৈষয়িক জ্ঞান নাই, কলিকালে এমন সংসার-জ্ঞানবর্জ্জিত লোক প্রায় দেখা যায় না; দায়ে না ঠেকিলে হরিশের শিক্ষা হইবে না।"

(২)

বলা বাহুল্য, হরিশ্চন্দ্রের পরিবারবর্গ বাড়ীতেই থাকিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি [illegible]

আমাদের পল্লী অঞ্চলের লোক এ কালের মত এত সভ্য বা 'সহর ঘেঁসা' হয় নাই ; বাড়ীর দরজায় তালা দিয়া স্ত্রী পুত্রাদি সঙ্গে লইয়া বিদেশে চাকরী করিতে যাওয়া পল্লীবাসীরা তখন নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হরিশ্চন্দ্র সনাতনপুরের কাছারীতে নায়েবী করিতেন ; সনাতনপুর তাঁহার বাসগ্রাম দরবেশপুরের দশ ক্রোশ উত্তরে ; সনাতনপুরের কাছারী বাড়ীতে একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও পরিচারক লইয়া তিনি বাস করিতেন, ইহাতে যে তাঁহার ব্যয় সংক্ষেপ হইত এরূপ নহে, তাঁহার বাসায় দু বেলা বিশ খানি পাতা পড়িত, অল্প বেতনের কোন কোন কর্ম্মচারী তাঁহার অন্নেই প্রতিপালিত হইত ; এতদ্ভিন্ন উমেদার, ভিক্ষুক, অতিথি অভ্যাগত ভদ্র লোক যে কত আসিত, তাহার সংখ্যা নাই। কেহ তাঁহার ব্যয় বাহুল্যের উল্লেখ করিলে তিনি বলিতেন, "মা অন্নপূর্ণা উহাদিগকে দু'বেলা দুটি খাইতে দিতেছেন, আমি উপলক্ষ্য মাত্র।"

সরকারী কার্য্যোপলক্ষে হরিশ্চন্দ্রকে প্রায়ই মফস্বলে যাইতে হইত বলিয়া কাছারী বাড়ীতে তাঁহার জন্য সর্ব্বদা পাল্কী বেহারা মোতায়েন থাকিত। পূজা পার্ব্বণে তিনি সেই পাল্কীতে বাড়ী আসিতেন। বারোটা দুলে বেহারা যখন হরিশ্চন্দ্রের পাল্কী লইয়া উড়িয়া আসিত, তখন পথপ্রান্তবর্ত্তী দশখানা গ্রামের লোক বেহারাদের ঐকতানিক ভৈরব হুঙ্কার শুনিয়া বুঝিতে পারিত নায়েবমশায় ডিহীর কাছারী হইতে বাড়ী যাইতেছেন। বেহারাদের সেই হুঙ্কার নৈশপ্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া যখন গ্রামবাসিগণের কর্ণে প্রবেশ করিত, তখন গ্রামের আড্ডাধারীরা হুঁকার নল হইতে মুখ তুলিয়া বলিত, "হরিশ মজুমদার কি দাপটেই নায়েবী করচে! বাপ, বছরে দেড়টা সদরালার সমান পয়সা রোজগার করে!"

দাদা বাড়ী আসিলে মুকুন্দ মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, কি করিয়া যে তাঁহার মনোরঞ্জন করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেন না ; দধি দুগ্ধ মৎস্য তরকারী প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য এমন ছুটাছুটি করিতেন যে, সময়মত আফিসে উপস্থিত হইতে পারিতেন না, এবং সবরেজিষ্ট্রার মৌলবী ইলাহিবক্স মিঞার নিকট গালাগালি খাইতেন।

হরিশ্চন্দ্রের পুত্র শ্রীমান্ হারাণচন্দ্র গ্রামের ইস্কুল হইতে ক্রমান্বয়ে তিনবার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়া প্রবেশিকা-জলধি উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই ; সে মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া গ্রামের 'এমেচিয়োর থিয়েটার পার্টির' দলপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল ; তাহার একটি পুত্র ছিল—তাহার নাম মাণিক, মাণিকের বয়স চারি বৎসর।

মাণিক মুকুন্দের একান্ত অনুগত ছিল ; মুকুন্দও তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, সে স্নেহে কৃত্রিমতা ছিল না ; মুকুন্দের ন্যায় কূটবুদ্ধি বৈষয়িক লোক কেন যে এইপ্রকার দুর্ব্বলতার অধীন হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। মনুষ্যের হৃদয় দুর্ভেদ্য রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন! অফিসের কাজ শেষ করিয়া অপরাহ্নে মুকুন্দ গৃহপ্রাঙ্গনে পদার্পণ করিবামাত্র মাণিক "ঠাকুরদাদা ঠাকুরদাদা" বলিয়া ব্যগ্রভাবে তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইত, এবং তাঁহার কোলে উঠিতে না পারিলে তাহার ব্যাকুলতা দূর হইত না। সে সময় অন্য কেহ তাহাকে কোলে লইতে আসিলে সে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিত ; ঠাকুরদাদার কোলে উঠিয়া সে দুই হাতে তাঁহার কাঁচা পাকা গোঁফ লইয়া খেলা করিত, এবং নানা আবদারে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। নিজের পুত্র অপেক্ষা ভ্রাতার পৌত্রের প্রতি তাঁহার প্রাণের টান দেখিয়া মুক্তকেশী এক একদিন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেন, কিন্তু সেবিংস ব্যাঙ্কের খাতা তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের নামে, ইহা স্মরণ করিয়া সাধ্বী অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিতেন।

ঠাকুরদাদার কোলে মাণিক ক্রমে বাড়িতে লাগিল। হারাণ পুত্রকে তেমন আদর করিত না, দিবসের অধিকাংশ সময় বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইত ; পিতামহের সহিতও তাহার বিশেষ পরিচয়ের সুযোগ ছিল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাণিক বুঝিল ঠাকুরদাদার মত আর কেহ তাহাকে ভালবাসে না। ঠাকুরদাদাকে না দেখিতে পাইলে সে চারিদিক অন্ধকার দেখিত, এবং রাত্রে তাঁহার নিকট না শুইলে তাহার ঘুম আসিত না।

(৩)

সংসারে সুখ চিরস্থায়ী নহে ; দিবসের পর রাত্রির ন্যায়, সুখের পর দুঃখ সংসারে অনতিক্রমণীয়। বিধাতার অমোঘ

বিধান। বিধাতার নির্ব্বন্ধে কিছুদিনের পরে দরবেশপুরের মজুমদার পরিবারে দুঃখের কালরাত্রি ঘনাইয়া আসিল। নায়েব হরিশ্চন্দ্র মজুমদার দুশ্চিকিৎস্য বাতরোগে পঙ্গু হইয়া জীবনের সন্ধ্যা সমাগমের বহু পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

হরিশ্চন্দ্র অমিতব্যয়ী ছিলেন; সঞ্চয় আয়ের বাহুল্যে নহে, ব্যয়ের সংকোচে; তিনি কোন দিন ব্যয় সঙ্কোচ করিতে শেখেন নাই, তাই মৃত্যুকালে নগদ টাকাকড়ি বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; যে কিছু নগদ টাকা ছিল, মহা সমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতেই তাহা নিঃশেষিত হইল। তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য তিন দল কীর্ত্তনওয়ালা মৃদঙ্গধ্বনিতে ক্ষুদ্র দরবেশপুর গ্রামখানি মুখরিত করিয়া তুলিল।

পিতার মৃত্যুর পর হারাণচন্দ্র পিতার চাকরীটি পাইবার জন্য সাহেব সরকারে উমেদারী করিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। ম্যানেজার সাহেব তাহাকে জানাইলেন, তাহার ন্যায় জমিদারী কার্য্যে অনভিজ্ঞ তরুণ-বয়স্ক যুবক দায়িত্বপূর্ণ নায়েবী পদ প্রথমেই পাইতে পারে না, তিনি তাহাকে পেস্কারের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন, ক্রমে জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিলে ভবিষ্যতে সে নায়েবী পাইতে পারে।

নায়েবের পুত্র নায়েবীর পরিবর্ত্তে পেস্কারী লইতে সম্মত হইল না, কারণ এই পদের বেতন তেমন অধিক নহে, তাহার উপর তাহাতে কিছুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না; বিশেষতঃ সর্ব্বদা সাহেবের নিকট থাকা তেমন প্রার্থনীয় নহে। এই সকল ভাবিয়া হারাণচন্দ্র হতাশ মনে বাড়ী আসিয়া গৃহিণীর অঞ্চলচ্ছায়ার আশ্রয় লইল।

অতঃপর পিতৃব্য মুকুন্দচন্দ্রের পক্ষে মাসিক কুড়ি টাকা আয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠিল; তিনি দুই একবার হারাণকে সাহেবদের পেস্কারীটা লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু হারাণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না; সে বলিল, পঁচিশ টাকার কেরাণীগিরি করিবার জন্য সে বিদেশে গিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিবে না, তাহাতে জাতিও যাইবে, পেটও ভরিবে না।

মুক্তকেশী দেখিলেন, তাঁহার স্বামীর উপার্জ্জিত টাকাগুলি আর সেবিংস্ ব্যাঙ্কের খাতায় প্রবেশ করিতে পারে না, সংসার খরচেই সকল ফুরাইয়া যায়! তাঁহার চাঞ্চল্য বর্দ্ধিত হইল। অবশেষে তিনি আর অসন্তোষ গোপন করিতে পারিলেন না, ঘাটে পথে পল্লীবাসিনীগণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখদেখি হারাণের আক্কেল-খানা! দু পয়সা রোজগার করবার 'ক্ষ্যামতা' নেই, সাত গুষ্টিতে মিলে গিল্‌বে। আমাদের উনি মাসে কুড়ি টাকা মাইনে পান, সংসারে রাজ্যের মনুষ্যি, বুড়ো মানুষ ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গিয়েছেন।"

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর দুই মাস পরে মুকুন্দ হাল ছাড়িয়া দিলেন, হরাণকে বলিলেন, "বাপু, আমি যতদিন পারিলাম, আমার সামান্য আয়ে সংসার চালাইলাম, এত বড় সংসার প্রতিপালন করা আর আমার অসাধ্য। তুমি ত চাকরী-বাকরী কিছু করিবে না; তুমি নিজের সংসারের ভার নিজে লও, আমাদের যে কিঞ্চিৎ জমীজমা আছে পাঁচজনকে ডাকিয়া ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লও।"

হারাণ বলিল, "বাবা এতকাল আপনাদের পুষিলেন, আর তিনি মরিতে না মরিতে আপনি আমাকে পৃথক করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন! উত্তম, আমি পৃথকই হইব, কিন্তু বাবা যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন আমি আপনাকে তাহার অংশ দিব না। ভদ্রাসন বলুন, বাগান বলুন, জোতজমা পুষ্করিণী, সকলই বাবার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি, এ সকল তাঁহার উপার্জ্জনের টাকায় হইয়াছে, আপনি কোন্ হিসাবে তাহার অংশ চান? ঘোল খাবে হরিদাস, আর মাধাই দেবে কড়ি?"

বৃদ্ধ পিতৃব্যের সহিত এরূপ উদ্ধত আলাপ শিষ্টাচার-সঙ্গত নহে, কিন্তু সামাজিক শিষ্টাচারের সহিত হারাণের পরিচয় ছিল না; সে মনে করিত, তাহার পিতার গলগ্রহ গ্রাম্য সব্‌রেজেষ্ট্রী আফিসের বিশ টাকা মূল্যের কেরাণী তাহার নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের দাবী করিতে পারে না!

মুকুন্দ ভ্রাতুষ্পুত্রের কটূক্তিতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "আমি যে আজ এই বিশ বাইশ বৎসর ধরিয়া চাকরী করিতেছি, আমি কি সংসারের জন্য কিছুই ব্যয় করি নাই? তোমার বাবা বিদেশে চাকরী করিতেন, মধ্যে মধ্যে পাল্কী হাঁকাইয়া বাড়ী আসিতেন আর আপনার

উপর হুকুম চালাইতেন, আমি চাকরের মত তাঁহার হুকুমে খাটিয়াছি, টাকার অনাটন হইলে নিজের উপার্জ্জনের টাকা দিয়া সংসার চালাইয়াছি।—বাড়ীতে একটা গোমস্তা মুহুরী রাখিলে তাহাকে শালিয়ানা কত টাকা দিতে হয়?"

হারাণ বলিল, "বাবা মরিয়াছেন তাই আজ আপনি নিজমূর্ত্তি ধরিয়াছেন। আমার পিতার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে আপনার কোন অধিকার নাই, আমি সমস্ত দখল করিব, আপনার ইচ্ছা হয় আপনি (Partition Suit) 'পার্টিশন সুট' করিতে পারেন।"

মুকুন্দ বলিলেন, "আমি তোমাকে কোলে পিঠে লইয়া মানুষ করিয়াছিলাম, তুমি তাহার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে বসিয়াছ, কলির ধর্ম্ম কি না?"

হারাণ বলিল, "আপনি আমাকে একটু স্নেহ করিতেন এই হেতুবাদে আমার পৈত্রিক সম্পত্তি অধিকার করিতে চান, চমৎকার যুক্তি বটে! এমন স্নেহ প্রকাশের কোনও আবশ্যক ছিল না। আপনি বিশ বাইশ বৎসর ধরিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন—সে সমস্ত টাকাই জমাইয়াছেন; কাকী মা শুনিয়াছি আট দশ হাজার টাকা লইয়া মহাজনী করিতেছেন, আমি কি সে টাকাব ভাগ চাহিতেছি, না, ভাগ চাহিলেই তা দিবেন? কুড়ি টাকার চাকরী করিয়া আজকাল সংসার প্রতিপালন করা যায় না, কাকী মা কি বাপের বাড়ী হইতে টাকা আনিয়াছিলেন?"

"তোমার মত অকৃতজ্ঞের আর মুখ দর্শন করিব না"—বলিয়া মুকুন্দচন্দ্র সক্রোধে তামাক টানিতে লাগিলেন।

(৪)

মহা সমারোহে একটা প্রকাণ্ড বাটোয়ারার মামলার আয়োজন চলিতে লাগিল। গ্রামে হরিশ্চন্দ্রের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর অভাব ছিল না। তাঁহারা মজুমদারদের গৃহ-বিবাদ মিটাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মুকুন্দকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তোমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই তোমার দাদার উপার্জ্জিত এ কথা আমরা সকলেই জানি, ধর্ম্মের দিক চাহিয়া কথা বলিতে হয়। কিন্তু তোমরা দুই ভাই চিরদিন একান্নে ছিলে, যাহা কিছু আছে তাহার দশ আনা অংশ হারাণকে ছাড়িয়া দাও।"—তাঁহারা হারাণকে বলিলেন, "সম্পত্তি তোমার পিতার স্বোপার্জ্জিত তাহা আমরা জানি, কিন্তু তোমার বাবা ও কাকা বরাবর একান্নে ছিলেন, মুকুন্দও দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তোমাদের সংসারের উন্নতির জন্য ভূতের মত খাটিয়াছেন, তাঁহাকে একেবারে বঞ্চিত করিলে বড় অন্যায় হইবে; যদি তোমার কাকা মামলা করেন তাহা হইলে অর্দ্ধেক সম্পত্তি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। অনর্থক কতকগুলা টাকা মামলায় নষ্ট করিবে কেন? আমরা তোমার কাকাকে বলিয়াছি তিনি স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তির দশ আনা অংশ তোমাকে দিবেন, তিনি ছয় ভাগ পাইবেন। বাটোয়ারা-মামলা হাতীর খোরাক, মামলা করিলে শেষে তোমাদের দুজনকেই পথে দাঁড়াইতে হইবে।"

গ্রামের বৃদ্ধ রায় মহাশয়কে হরিশ্চন্দ্র মুরুব্বী মনে করিতেন, কখন তাঁহার কথার অন্যথাচরণ করিতেন না, হারাণ তাহা জানিত; সে তাঁহার সৎপরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। মধ্যস্থগণের আপোষে সমস্ত সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা হইয়া গেল। কিন্তু ঘরের পাশে তিন কাঠা জমি লইয়া উভয়ের মধ্যে বিশেষ বিরোধ রহিয়া গেল। এই তিন কাঠা জমি কাকার ভাগে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহা না পাইলে হারাণের অত্যন্ত অসুবিধা হয়, সেইজন্য তাহা ছাড়িয়া দিবার জন্য হারাণ কাকাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল; এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, পাঠক গল্পারম্ভে তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

হারাণ পাছে জোর করিয়া জমিটুকু দখল করে এই ভয়ে মুকুন্দ সেই দিন রাত্রেই মজুর দিয়া জমিটুকু ঘিরিয়া লইলেন, এবং তাহাতে কতকগুলি সরিষা ছড়াইয়া প্রবেশ-দ্বারে তালা চাবি লাগাইলেন।

হারাণ বলিল, "উনি ভিটায় শরষে বুনিলেন, আমি ঘুঘু না চরাইয়া ছাড়িব না।"—সেই দিন হইতে খুড়া ভাইপোতে মুখ দর্শন বন্ধ হইল; বলা বাহুল্য হাঁড়ি পূর্ব্বেই পৃথক হইয়াছিল। এবার কথা পর্য্যন্ত বন্ধ হইল।

(৫)

কিন্তু এক বাড়ীতে বাস করিয়া এ ভাবে কালযাপন করা বড় কষ্টকর; তথাপি উভয়ের দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু সংসারে অশান্তির সীমা রহিল না, এই তিন কাঠা

জমি খুড়া ভাইপোর মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া বিধাতার অভিশাপের মত পড়িয়া রহিল। এবং সামান্য সামান্য ব্যাপার লইয়া উভয় পরিবারে তুমুল কলহের উৎপত্তি হইতে লাগিল। মা লক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন।

মুকুন্দ ও হারাণ উভয়েই পরস্পরকে অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন, কিন্তু জমিটুকুর লোভ ছাড়িয়া শান্তিলাভ করা কাহারও সঙ্গত মনে হইল না। সকল অপেক্ষা বিপদ হইল মাণিকের; ঠাকুরদাদার কোলটি হঠাৎ বাজেয়াপ্ত হওয়ায় সে মনে বড় বেদনা পাইল, ইহাই সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্যের বিষয় মনে করিতে লাগিল। কিন্তু যে ক্রোড়ে সে আজন্ম বর্দ্ধিত হইয়াছে—সহজে তাহার লোভ ছাড়িতে পারিল না, তিন কাঠা বিবাদী জমি অপেক্ষা তাহার মূল্য তাহার নিকট অনেক অধিক।

একদিন অপরাহ্ণে হারাণ ভ্রমণে বাহির হইবে, এমন সময় সে দেখিতে পাইল মাণিক ধীরে ধীরে নামিয়া তাহার ঠাকুরদাদার ঘরের দিকে যাইতেছে।—অদূরে পিতাকে দেখিয়া মাণিক ভয়ে জড় সড় হইয়া দাঁড়াইল।

হারাণ জিজ্ঞাসা করিল, "মাণ্‌কে, কোথায় যাচ্ছিস্ রে?"

মাণিকের বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র, সে তখনও মিথ্যা কথা বলিতে শেখে নাই, ভয়ে ভয়ে বলিল, "ঠাকুরদাদার কাছে।"

হারাণ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আর ঠাকুরদাদার কাছে যেতে হবে না। ঠাকুরদাদা বড্ড ভালবাসে! ফের যদি ওমুখো হবি ত জুতিয়ে হাড় গুঁড়ো করে দেব।"

হারাণের কঠোর কথাগুলি মুকুন্দের কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি তখন ঘরে বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। মুক্ত বাতায়ন পথে তিনি দেখিতে পাইলেন, মাণিক তাঁহার নিকট যাইতে যাইতে পিতার তিরস্কারে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কাতর ভাবে ফিরিয়া গেল। তিনি হৃদয়ে বড় বেদনা পাইলেন।

মুকুন্দ মাণিককে তাহার ছয় মাস বয়সের সময় হইতে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, মাণিক বিশ্বসংসারে ঠাকুরদাদাকেই একমাত্র বন্ধু জানিত, তাঁহার উপর নানা দৌরাত্ম্য করিত; ঠাকুরদাদা যত আবদার সহ্য করিতেন, তাহার পিতা মাতাও তাহার তত [illegible] না। সেই ঠাকুরদাদার সঙ্গে মাণিকের একবার দেখা করিবারও উপায় নাই! মাণিক ঘরে আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ঠাকুরদাদা ভাগবত বন্ধ করিয়া বসিয়া বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু দুটি অশ্রুভারে ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিল। মাণিককে দিনান্তে একবার কোলে না লইলে তাঁহার মন স্থির হইত না, তাঁহার কাজ কর্ম্ম ভাল লাগিত না। কিন্তু মাণিককে আর কোলে লইবার উপায় নাই; তাহার কচি মুখের মিষ্ট কথা আর শুনিতে পান না।—মুকুন্দের বুকের উপর একটা গুরুতর পাষাণভার চাপিয়া রহিল।

(৬)

এই ভাবে কয়েকমাস কাটিয়া গেল। পূজা আসিল। মুকুন্দ প্রতি বৎসর পূজার সময় মাণিকের জন্য ভাল জুতা জামা কাপড় কিনিতেন। এবার কিনিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ষষ্ঠীর দিন তিনি পরিবারবর্গের জন্য নব বস্ত্রাদি কিনিয়া আনিলেন, একটি ভৃত্য কাপড়ের মোট মাথায় লইয়া আসিতেছিল, মাণিক তখন একখানি ময়লা কাপড় পরিয়া নিতান্ত বিষণ্ণভাবে পথে দাঁড়াইয়া ছিল; ঠাকুরদাদাকে দেখিবামাত্র আনন্দে তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে একবার চঞ্চল দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিল, তাহার পিতাকে কোন দিকে দেখিতে পাইল না; সে ভয়ে ভয়ে ঠাকুরদাদার কাছে আসিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, আমাকে একবার কোলে নেওনা; তুমি আমার পূজোর কাপড় এনেছ?"

ঠাকুরদাদা মাণিককে কোলে লইয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন কিন্তু পাছে হারাণ দেখিতে পাইয়া মাণিককে প্রহার করে এই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, "কাল তোমাকে জুতো কাপড় দেব দাদা!"

সপ্তমীর দিন মুকুন্দ মাণিকের জন্য জুতা, একটা সাটিনের জামা ও একখানি ভাল ধুতি কিনিয়া আনিলেন। গৃহিণী তাহা দেখিয়াই তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোমার মত নিঘিন্নে বেটা ছেলে দুনিয়ায় আর

জুতো জামা কাপড় দেওয়া কেন? পয়সা রাখ্‌বার বুঝি যায়গা পাচ্ছ না? কথায় কথায় ওরা এত অপমান করে, তবু মাণিক মাণিক করে খুন! মাণিক যেন 'স্বগ্‌গে' বাতি দেবে!"

মুকুন্দ বলিলেন, "গিন্নি, সংসার একদিকে আর মাণিক একদিকে। এই পুজোর দিন মাণিককে একখান কাপড় না দিয়ে আমি কি করে থাকবো? মাণিককে আমি যে দিন পর মনে করবো, সে দিন সংসার ছেড়ে বনে যাব।"

মুক্তকেশী বলিলেন, "সে দিন কেন, আজ এখনই যাও, তা হ'লে আমার হাড় জুড়োয়।"

সন্ধ্যার পর হারাণ গ্রামের "বীণাপাণি থিয়েটারের" মজলিসে আড্ডা দিতে গেল। সেই অবসরে মুকুন্দ মাণিককে জুতা জামা কাপড় পরাইয়া তাহাকে কোলে লইয়া গাঙ্গুলী বাড়ী ঠাকুর দেখিতে চলিলেন। মাণিক আরতি দেখিয়া বাড়ী আসিয়াও সে জামা কাপড় ছাড়িল না, সেই পোষাক পরিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল।

(৭)

মহাষ্টমীর দিন অতি প্রত্যুষে মুকুন্দ তাঁহার ঘরের পাশে 'বেড়ার' মধ্যে বসিয়া বেগুনের চারাগুলি নিড়াইয়া দিতেছিলেন, এমন সময় মাণিক তাঁহার প্রদত্ত জুতা জামায় সজ্জিত হইয়া মহা উল্লাসে বাহিরে আসিল, এবং সেফালিকা বৃক্ষমূলে বসিয়া বৃন্তচ্যুত শিশিরসিক্ত সেফালিকাগুলি কুড়াইতে লাগিল।

হারাণ প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া 'দাঁতন' করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "মানকে, এ জুতো জামা কোথায় পেলিরে?"

ভয়ে মাণিকের প্রাণ উড়িয়া গেল। সে কাতর ভাবে বলিল, "ঠাকুরদাদা দিয়েছে।"

হারাণ সরোষে বলিল, "কেন তুই এ জুতো জামা নিতে গেলি? আমি যা বারণ করে দিয়েছি, ফের তাই করেছিস্ লক্ষ্মীছাড়া পাজী!" হারাণ দাঁতন ফেলিয়া বীরদর্পে মাণিকের কাছে গিয়া সজোরে তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিল, এবং জুতা জামা কাপড় কাড়িয়া লইয়া ঝির হাত দিয়া তাহা মুকুন্দের স্ত্রীর নিকট ফেরত পাঠাইল। মাণিক সেফালিকা বৃক্ষমূলে পড়িয়া ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বেড়ার ভিতর বসিয়া মুকুন্দ তাহা দেখিলেন, বেদনায় তাঁহার হৃদয় টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল, তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, হাতের 'নিড়ানী' মাটিতে ফেলিয়া তিনি দুই হাত মাথায় দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "হা ভগবান!" শিশুর কাতর আর্ত্তনাদে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। মধ্যাহ্নে আহারে বসিয়া মাণিকের অশ্রুসিক্ত কাতর মুখ তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ভাল করিয়া আহার করিতে পারিলেন না।

দশমী আসিল। আজ বিজয়া দশমী; সায়ংকালে গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীজলে দুর্গা প্রতিমার বিসর্জ্জনের পর গৃহে গৃহে প্রণাম আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদের ধুম পড়িয়া গেল। আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশিগণ পরস্পরকে মিষ্ট মুখ করাইতে লাগিলেন।

প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর হারাণচন্দ্র বাড়ী আসিয়া জননীকে প্রণাম করিল, তাহার পর প্রতিবেশিগৃহে গমনে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় মাণিক বলিল, "বাবা, ঠাকুরদাদাকে প্রণাম করে আস্‌বো?"

হারাণ ধমক দিয়া বলিল, "তুই ওদের ঘরে যাস তো তোর কান ছিঁড়ে দেব, হতভাগাকে এক কথা একশ দিন বল্‌তে হয়!"

শিশু দূরে দাঁড়াইয়া কাতর দৃষ্টিতে ঠাকুরদাদার ঘরের দিকে চাহিয়া রহিল। সে দেখিল পাড়ার বালকবালিকাগণ নূতন ধুতি চাদরে সজ্জিত হইয়া হাসি মুখে তাহার ঠাকুরদাদার ঘরে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে, তাঁহার সহিত আলিঙ্গন করিতেছে, লাড়ু সন্দেশ খাইতেছে; আর সে কি অপরাধ করিয়াছে যে ঠাকুরদাদার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিবে না? সে পিতার প্রহার ও তিরস্কারের কথা ভুলিয়া গেল; অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন দেখিল নিকটে কেহ নাই, তখন সে ডাকিল, "ঠাকুরদাদা, তোমাকে প্রণাম করতে যাব?"

ঠাকুরদাদা সস্নেহে ডাকিলেন, "আয়!"

এই নির্ব্বোধ বালক ও কুটবুদ্ধি বৃদ্ধ উভয়ের মধ্যে কে অধিক নির্লজ্জ কে বলিবে?

হঠাৎ পিতার নিষেধাজ্ঞা মাণিকের মনে পড়িল;

সে জানিত ঘরের পাশের তিন কাঠা জমি লইয়াই ঠাকুরদাদার সহিত তাহার পিতার বিবাদ।—মাণিক কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, ঐ জমিটুকু বাবাকে ছেড়ে দেও না কেন, তা হ'লে আমি তোমার কোলে উঠ্‌তে পাবো।"

শিশুকণ্ঠোচ্চারিত এই কথা কয়টি মুকুন্দচন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করিল। তাঁহার মনে পড়িল তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি পরম স্নেহ যত্নে পরিধারবর্গকে প্রতিপালন করিয়াছেন; এই ঘর বাড়ী জমিজমা সমস্তই তিনি দাদার অনুগ্রহে লাভ করিয়াছেন; জ্যেষ্ঠ সহোদর সকলের প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছিলেন। সেই বড় ভাই এখন স্বর্গে গিয়াছেন, তিনি এক টুকরা জমি লইয়া তাঁহার পুত্রের সহিত কলহে প্রবৃত্ত! আজ বিজয়া দশমীর দিন পরম শত্রুও শত্রুতা ভুলিয়া হাসি মুখে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে, আর তিনি শরীকি বিবাদে মাতিয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছেন, স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিয়াছেন! এ পৃথিবীতে জীবন কয়দিনের জন্য? কেশ পক্ক হইয়াছে, দাঁত পড়িতেছে, দেহের চর্ম্ম শিথিল ও চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে, মৃত্যুর তামসী বিভাবরী অদূরে সমাগত প্রায়; জীবনের এই সন্ধ্যাকালেও এত লোভ, এত আসক্তি! তুচ্ছ এক টুক্‌রা জমির জন্য পুত্রতুল্য পরম স্নেহাস্পদ আত্মীয়ের হৃদয়ে আঘাত করিতেছেন, অথচ আর দুই দিন পরে যেথানকার জমি সেইখানেই পড়িয়া থাকিবে, সংসারের কোনও আকর্ষণ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না।—বৃদ্ধের হৃদয়ে মুহূর্ত্তে দপ্ করিয়া অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন; বিজয়া দশমীর মিলনানন্দ তাঁহার নিকট বিদ্রূপের কশাঘাত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

(৮)

অনেক রাত্রে হারাণ বাড়ী ফিরিলে মুকুন্দ অপরাধীর ন্যায় হারাণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন; পিতৃব্যকে গৃহদ্বারে দেখিয়া হারাণ অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এখন কর্ত্তব্য আজ বিজয়া দশমী, বিবাদ বিসম্বাদের কথা বিস্মৃত হইয়া আজ সর্ব্ব প্রথমে পিতৃতুল্য পূজ্য বৃদ্ধ পিতৃব্যকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে যাওয়া তাহার উচিত ছিল; এমন দিনেও কি গৃহবিবাদের কথা মনে করিতে আছে? হারাণ কি বলিবে কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া নত মস্তকে কাকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মুকুন্দ বলিলেন, "হারাণ, আজ বিজয়া দশমী, আমাদের হিন্দুর নিকট এমন শুভ দিন আর নাই, আজ তুমি আমাকে প্রণাম করিতে যাও নাই কেন? আমি কি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম? আমি তোমাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছি, ছেলেবেলায় তুমি তোমার বাবাকে চিনিতে না, আমাকেই চিনিতে; এখন আমি বুড়া হইয়াছি, তুমিও ছেলের বাপ হইয়াছ, স্বার্থের মোহে জড়িত হইয়া এখন আমাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি সেই কাকাই আছি—তুমি আমার সেই ভাইপোই আছ। আমি যদি কঠোর ব্যবহারে তোমার মনে কোন কষ্ট দিয়া থাকি, তবে সে কথা কি এমন আনন্দের দিনে তোমার মনে করিয়া থাকা উচিত? আমি মরিলে তোমাকে কাচা পরিতে হইবে, তোমার সঙ্গে আমার এই রকম সম্বন্ধ। আমি তোমার মনের কষ্ট দূর করিব, যে তিন কাঠা জমি লইয়া আমার সঙ্গে তোমার বিবাদ—আজ আমি সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিব, আমার বেড়ের চাবি তুমি লও, আজ হইতে উহা তোমার। এখন আমার জলে এক পা ডাঙ্গায় এক পা, আমার এই শেষ জীবনের ভুলচুক তুমি ক্ষমা কর; তুমি আমাদের বংশের প্রদীপ, আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া তোমার বাপের সুনাম রক্ষা কর।"

বৃদ্ধ ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন, তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। হারাণের যে চক্ষু হইতে একদিন ক্রোধ ও প্রতিহিংসার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়াছিল, আজ সেই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে পিতৃব্যচরণে প্রণত হইয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিল, গদ্গদ স্বরে বলিল, "কাকা, আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

দাদার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে শয্যা ত্যাগ করিয়া মহা উৎসাহে বাহিরে আসিল, আনন্দোচ্ছ্বসিত স্বরে ডাকিল, "ঠাকুর-দাদা, এই যে তুমি আমাদের ঘরে এসেছ! বাবা, ঠাকুরদাদার কোলে যাই ?"

হারাণ বলিল, "যা।"

বালক হাসিতে হাসিতে ঠাকুরদাদার কোলে লাফাইয়া উঠিল, দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চল, দিদিমাকে প্রণাম করবো।"

মুকুন্দ সস্নেহে মাণিকের মুখচুম্বন করিলেন, অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার উভয় গণ্ড প্লাবিত হইতে লাগিল, এবং তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের দীর্ঘকালসঞ্চিত বিষাদ ও বেদনা ধৌত হইয়া গেল।

দশমীর চন্দ্র শরতের মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশে বসিয়া কৌতুকভরে বালক ও বৃদ্ধের এই মধুর মিলন দর্শনে হাসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার শুভ্র হাস্য দুর্ব্বাদলসঞ্চিত শিশিরবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল।

মেহেরপুর, নদীয়া। শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

গলিত পত্র

"একে একে সব সাথী করেছে প্রয়াণ,
শীতের শীতল বায়ু সতত কাঁপায়।
আর কেন ওহে পত্র পাণ্ডু ম্রিয়মাণ ;
এখনো তরুর গায়ে আছ কি আশায় ?"
"গেছে সব! তাহে কিবা ? শীতের সমীর
পলে পলে মৃত্যু আনে শিহরিয়া কায়া ;
ভাবিয়াছি শেষ বিন্দু বুকের রুধির,
শুকাইয়া কিশলয়ে দিয়ে যাব ছায়া।"

শ্রীকালিদাস রায়।

জেবুন্নেসা বেগম

রমণীকুলগৌরব, সাধ্বীগণের আদর্শ, কৌমার্য্যব্রতের শিরোমণি প্রাতঃস্মরণীয়া দেবী জেবুন্নেসা হিজরী ১০৫৭ অব্দে জন্মলাভ করেন। তিনি শাহানশাহ্ আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহের পঞ্চম দুহিতা ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম নওয়াব বাই বেগম।

শৈশবেই জেবুন্নেসার মেধাশক্তি ও সরল স্বভাব বিক-শিত হওয়ায় সম্রাটমহল আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জেবুন্নেসার আধ আধ ভাষায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা মিষ্ট কথায় বিশাল ভারতের রাজ-কর্ম্ম-ক্লিষ্ট সম্রাট্ আওরঙ্গজেব ক্লান্তি দূর করিতেন। এই মধুর ভাষার জন্য সম্রাট্-অন্তঃপুরের সকলেই জেবুন্নেসাকে অনেক অধিক স্নেহ করিতেন।

জেবুন্নেসার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় সম্রাট্ ইস্‌লামের সনাতন প্রথামত জনৈক উচ্চশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া কোরান-শরীফ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। জেবুন্নেসা স্বাভাবিক উচ্চ প্রতিভা লইয়াই জন্ম লইয়া-ছিলেন। কিছু দিন কোরান-শরীফ পাঠ করিলে তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা কোরান কণ্ঠস্থ করিবার জন্য বেগবতী হয়। শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় যে, পাঁচ বৎসরের বালিকা অসাধারণ অধ্যবসায় অবলম্বনে দুই বৎসর মধ্যে কোরান-শরীফ মুখস্থ করিয়া ফেলেন। সম্রাট্ ইহাতে এতই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন যে, এক প্রকাণ্ড 'জসন' করিয়া সমস্ত আমীর উমরা ও সিপাইদিগকে বহু খেলাত বক্‌শিস করিয়াছিলেন।

জেবুন্নেসার কণ্ঠস্বর এমনই মধুর ছিল যে, যিনি তাহা একবার শুনিতে পাইতেন, তাঁহার কর্ণ কেবলি উৎসুক হইয়া সেই মিষ্ট স্বর শুনিতে ব্যাকুল হইত। একদা জেবুন্নেসা প্রাতরুপাসনা সমাপনান্তে প্রাসাদসংলগ্ন বাগানের 'সেহনে' বসিয়া বিভোর প্রাণে কোরান-শরীফ পাঠ করিতেছিলেন, তখন চারিদিকে ধীরে ধীরে প্রভাত-বায়ু বহিতেছিল, পূর্ব্ব গগনে সূর্য্য উদিত হইয়া সোনার আভা ছড়াইয়া দিতেছিল, শীতল বাতাস মৃদু মন্দ গতিতে বাগানে প্রবেশ করিয়া গাছ নাড়িয়া নাড়িয়া ফুল নাচাইতে-

ভাঙ্গিয়া দিতেছিল; এমন সোনার স্নিগ্ধ প্রভাতে জেবুন্নেসার অমৃতবর্ষিণী কোকিল-কূজনসদৃশ কোরান-পাঠের স্বর-মাধুরী উঠিয়া পড়িয়া উদ্যানকে স্বর্গীয় নন্দনকানন করিয়া তুলিয়াছিল। এমন মধুর রমণীয় চিত্তবিনোদন প্রভাত-কালে সম্রাট্ আলমগীরও নামাজ শেষে বাগানে ভ্রমণ করিতে আসিয়া জেবুন্নেসার সুললিত কোরান পাঠ হর্ষাপ্লুত প্রাণে অনন্যমনে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। জেবুন্নেসা কোরাণ-শরীফের যে অংশ আবৃত্তি করিতেছিলেন, উহার অর্থ অতি মহৎ ও হৃদয়োন্মাদকর ছিল, পাদশাহ্ কোরানের অর্থসৌন্দর্য্যে ও পাঠমিষ্টতায় আত্মহারা হইলেন! এইরূপে জেবুন্নেসা দৈনিক নির্দ্দিষ্ট পাঠ অর্দ্ধ-ঘণ্টাকাল পড়িয়া নীরব হইলে, ধর্ম্ম-পিপাসু বাদশাহ্ উন্মাদপ্রায় ছুটিয়া গিয়া জেবুন্নেসাকে কোলে লইয়া তাঁহার কপোলদেশে অপরিমিত আহ্লাদে চুম্বন করিতে করিতে দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া তাঁহার কল্যাণ কামনা করিরলেন।

অতঃপর সম্রাট্ জেবুন্নেসাকে আরবী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। চারি বৎসর মধ্যে আরবী সাহিত্যেও তিনি সম্পূর্ণ দক্ষতা লাভ করিলেন। এই সময় জেবুন্নেসা পারস ভাষাও অধ্যয়ন করেন। সময় সময় জেবুন্নেসাকে সম্রাট্ কঠিন প্রশ্ন করিতেন, আর জেবুন্নেসা অবলীলাক্রমে তাহার অতি সুন্দর উত্তর প্রদান করিতেন। সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া তখন তদীয় শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতেন।

অতঃপর সম্রাট্, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়াইতে ইচ্ছা করিলে, জেবুন্নেসা স্বীয় ধর্ম্মগ্রন্থাবলী ব্যতীত অন্য কোন বিষয় পাঠ করিতে অমত প্রকাশ করেন, তখন হইতে কেবল তিনি কোরান, হাদিস ও ফেকাগ্রন্থ পাঠে মনো-নিবেশ করেন। জেবুন্নেসা কোরান-শরীফের শুধু নীরস পাঠিকা ছিলেন না, তিনি একজন কোরান-মর্ম্মজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ অসাধারণ পণ্ডিতা ছিলেন। কোরান-শরীফ ও হাদিস প্রভৃতি পাঠ শেষ করিয়া তিনি উহা বস্তায় বাঁধিয়া রাখিয়া দেন নাই, সর্ব্বদাই এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতেন, এবং আজিফার (ঈশ-স্তোত্রপাঠ) জন্য বহু সময় নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া-ছিলেন। জেবুন্নেসা বিদ্যাগুণে পণ্ডিতসমাজের মনোহারিণী এবং জ্ঞানের গুণে রাজভবনে সন্ন্যাসিনী ছিলেন। সম্রাট্ আলমগীর এক জন প্রকৃত ধার্ম্মিক এবং আদর্শ-রাজনীতিজ্ঞ নরপতি ছিলেন, তিনি এ হেন পূতমনা সুপণ্ডিতা কন্যারত্ন লাভ করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

বিশাল ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাটের অতি আদরের দুহিতা, নিষ্কাম জীবন কাটাইয়া, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিয়া, ২৩ বৎসর কুমারীব্রত পালন করিয়া, সোনার দেবপ্রতিমা, ঐশ্বর্য্যশালিনী ব্রহ্মচারিণী জেবুন্নেসা হিজরী ১০৭৯ অব্দে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন।

পূতশীলা জেবুন্নেসা বিপুল ঐশ্বর্য্য ও সুখ স্বচ্ছন্দতার মধ্যে লালিত পালিত হইলেও তিনি খোদার প্রদত্ত শক্তির অপচয় করেন নাই, বিলাস ব্যসনে বা আমোদ প্রমোদে কখনো তিনি যোগদান করেন নাই। জেবুন্নেসা শুধু বিদ্যানুরাগী ছিলেন, এমন নহে; গুণবান্ ও শিক্ষিত লোকদিগকে তিনি প্রচুর পরিমাণে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। তদীয় অর্থে প্রতিপালিত হইয়া বহু ধার্ম্মিক, কবি, লেখক স্বীয় স্বীয় কার্য্যে দেহমন ঢালিয়া দিতে পারিয়া যশস্বী ও সম্মানী হইয়া গিয়াছেন। জেবুন্নেসার অর্থ সাহায্যে মোল্লা সাফিউদ্দিন অরজবেগ কাশ্মীরে বসিয়া কোরানের ভাষ্য তফসিরি কবিরীর অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত সমাজে জেবুন্নেসার প্রভাব এজন্য অনেক অধিক।

আবাল্য সন্ন্যাসিনী জেবুন্নেসার অসাধারণ প্রতিভার দুইটি নিদর্শনের উল্লেখ করিতেছি।—

শাহী মহলে ও বহির্ব্বাটিতে অধিকাংশ লোক সুন্নি ও কেহ কেহ শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের উভয় সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা চলিত। সম্রাট্ আলমগীর স্বয়ং সুন্নি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যম পুত্র বাহাদুর শাহ্ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এইরূপে সুন্নিদের প্রতি শিয়াদের আন্তরিক বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত হইতেছিল। এই বিবাদ মীমাংসা করণার্থে সকলে এক মত হইয়া জেবুন্নেসাকে মধ্যস্থ স্বরূপ নির্ব্বাচিত করিলেন। জেবুন্নেসা ইহার মীমাংসার্থে সুন্নি মতের পোষকতায় বহুবিধ উদাহরণ ও সার-গর্ভ উপদেশ ও শাস্ত্রোক্ত বচনাবলীর দ্বারা অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করত এরূপ একটি অখণ্ডনীয় ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া-ছিলেন যে, শিয়াগণ তদুত্তরে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইয়া নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিলেন; তখন সর্ব্বতোভাবে সুন্নিমতের প্রাধান্যই বলবৎ হইল। শিবাবোধ সমোবা

অনেকেই সুন্নিমত অবলম্বন করিলেন। জেবুন্নেসার এই ব্যবস্থার তুমুল আন্দোলন অচিরেই চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। এই ব্যবস্থার প্রতিলিপি হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইয়া ক্রমে ইরান ও তুরানেও কতিপয় প্রতিলিপি সমুপস্থিত হইল। ইরাণবাসিগণ এই ব্যবস্থা খণ্ডনার্থে কতরূপ চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তৎকালে জেবুন্নেসার সেই ব্যবস্থা এতদূর কার্য্যকরী হইয়া উঠিয়াছিল যে, শিয়া-সম্প্রদায়ের আন্তরিক ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

হিন্দুস্থানের মহিলাগণ যে কাঁচলী (আঙ্গিয়া কুর্ত্তী) ব্যবহার করেন, ইহা জেবুন্নেসা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

রাজনীতিতেও জেবুন্নেসার দক্ষতা অসীম ছিল। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব প্রায় প্রত্যেক গুরুতর কাজেই এই বুদ্ধিমতী শাহজাদীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

জেবুন্নেসা কোরান শরীফের এক উত্তম ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাটের আদেশে এই দুরূহ কার্য্য হইতে তিনি অবশেষে নিবৃত্ত হন। জেবুন্নেসা পারস্য ভাষায়ও সুপণ্ডিতা ছিলেন। তিনি উদাস বৈরাগ্যপূর্ণ ঈশ-প্রেমময় বহু কবিতামালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে সব কবিতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে বড় বড় পণ্ডিতকেও গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয়। রুচির নির্ম্মলতা এবং ভাষার মাধুর্য্যই তাঁহার রচনার বিশেষত্ব। তদীয় কবিতা আজিও পণ্ডিতসমাজের মুখে মুখে সুর-লয়ে আবৃত্তি হইতেছে। আমরা নিম্নে তাঁহার কতিপয় কবিতা ও উহার সুন্দর অর্থ পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিয়া পুণ্যময়ীর পবিত্র আখ্যায়িকা সমাপন করিলাম।

১। গারচে মন্ লায়লী হাস্তাম্,
দেল চু মজ্‌নুদার হাওয়াস্ত।
সের্ বসাহ্‌রা মী জনম,
লেকিন হায়া জেঞ্জির্ পাস্ত।

যদিও আমি লায়লীর মত, কিন্তু হৃদয় মজনুর ন্যায় বায়ুর ভিতর।—(ইচ্ছা হয়) মস্তক উত্তোলন করিয়া বাহির হইয়া পড়ি, কিন্তু লজ্জায় চরণ বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

২। বুলবুল্ আজ সাগির্‌দিরম্
শুদ্ হাম্‌নেশিনে গুল্ বযাখ্;
দিদার্ মহব্বত্ কাবিলম্
পরওয়ানা হাম্ সাগির্দে মাস্ত।

মিলন ভালবাসার জিনিষ—(প্রদীপে ঝাঁপ দিয়া যে পতঙ্গ প্রাণ দেয়, সেই) পতঙ্গও আমার পাগল শিষ্য।

৩। দখ্‌তরে শাহাম ও লেকিন্
রূহ্ মুসাফের্ আওয়ার্‌দা আম্;
জেব্ ও জিনাত্ বস্ হামিনাম্.
নামে মন্ জেবুন্নেসাস্ত্।

বাদশাহার দুহিতা বটি, কিন্তু অতিথির ন্যায় প্রাণ লইয়া আছি, সৌন্দর্য্য ও বেশভূষা ইহাই আমার যথেষ্ট—আমার নাম জেবুন্নেসা (সুন্দরীশ্রেষ্ঠা রমণী।)

৪। গুফ্‌তাম্ আজ্ এশ্‌কে বুতাঁ,
আয় দেল্! চেহ্ হাসেল্ কর্‌দাই?
গুফ্‌ত্ মারা হাসেলে জুজ্
নালাহায়ে হার্ নিস্ত্।

ভালবাসার অনেক কথাই বলা হইল, কিন্তু হে মন। লাভ কি করিলে? (মন) উত্তর করিল, "অশ্রুমালা ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

৫। হর্‌কস্ দার্ আমদ্ দার্ জাহাঁ
আখির বমত্‌লব হা রশিদ্;
পীর শুদ্ জেবুন্নেসা
উহা খরিদার্ ন শুদ্।

যে ব্যক্তিই এই পৃথিবীতে আসিয়াছে, সেই নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছে, জেবুন্নেসা বৃদ্ধা হইয়া গেল কেহ তাহাকে ক্রয় করিল না। অর্থাৎ খোদার প্রিয় এমন কোন কাজ করিতে পারেন নাই যে, তদ্বিনিময়ে তিনি খোদার প্রিয় হইতে পারেন।

এইরূপ অসংখ্য কবিতায় জেবুন্নেসার অগাধ ঈশপ্রেমের নিদর্শন রহিয়াছে।

বিদুষী জেবুন্নেসার হিতোপদেশমূলক কবিতার একটি নমুনা দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

৬। আগর দুশ্‌মন্ দুতা গর্‌দাদ, যে তাজিমাশ্ মস্ত্ গাফেল;
কামাঁ চাল্‌াঁকে খম্ গর্‌দাদ্ মকাশ কার্‌গর্ আয়েদ।

যদি তোমার শত্রু তোমার নিকট নম্রতা স্বীকার করে, তবুও তাহার সেই নম্রতায় ভুলিও না; কারণ (কুটিল) ধনু যত নত হয়, তাহার বাণক্ষেপ ততই দ্রুত হয়।

মৌলভী শেখ আবদুল জব্বার।

সন্ধ্যায়

আজ যেন জীবনের সর্ব্ববাধা টুটে
তোমার আমার মাঝে এসেছে সংযোগ,
তাই এই অবনত সন্ধ্যা-পক্ষ-পুটে

সহস্র তারার চোখে নীল নভঃ হ'তে
তুমি যেন দেখিতেছ মোর অন্তঃস্থল,
সুখ দুঃখ আশা ভয় যাহা জীবনেতে
ঘনিয়াছে চিরদিন—প্রকাশি' সকল!
মুক্ত করি' দিলে লাজ, লুকানো দীনতা
প্রেমের গৌরবালোকে করিলে মগন;
লয়ে জীবনের সব ত্রুটী সফলতা
যেমন জানিনু তোমা'—জানিনি কখন!
অগুরু-চন্দন-বাসে শান্ত সন্ধ্যাক্ষণে
তোমারে লভিনু আজি সম্পূর্ণ মিলনে!

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

মহাত্মা কেশবচন্দ্রের কর্ম্মযোগ

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে মোটামুটি এক রকম বর্ণনা করা গেছে। এখন তাঁহার কর্ম্মযোগের বিষয় বর্ণনা করিব। তিনি দলবল লইয়া মহা উৎসাহের সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে এরূপ কর্ম্মোদ্যম এদেশে কোথাও দেখা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তদ্ভিন্ন তাঁহার এই কর্ম্মের মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। সেই জন্যই তাঁহার কর্ম্মকে কর্ম্মযোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। সংসারে বিস্তর কর্ম্মী পুরুষ রহিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহবা স্বার্থের জন্য, কেহবা কীর্ত্তি স্থাপনের জন্য, কেহবা প্রভুর আজ্ঞার অধীন হইয়া, কেহবা আপনার হৃদয়ের করুণায় আপনি আর্দ্র হইয়া, নানা প্রকার কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন। এ সকল কর্ম্মের দ্বারা জগতের কল্যাণ হইতেছে। কিন্তু তথাপি ইহাকে কর্ম্মযোগ বলা যায় না। গীতায় কর্ম্মযোগের উল্লেখ আছে। উহার অর্থ ই হইতেছে এই যে, ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তিযোগে যুক্ত হইয়া, তাঁহার আদেশে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; তবেই সেই কর্ম্মকে কর্ম্মযোগ বলা যাইবে। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের ভক্ত; ঈশ্বরের আদেশেই তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন: স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহাকে ভারতের সেবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি সেই আহ্বান শুনিয়া

আর আপনার জন্য রাখিলেন না; আপনার দেহ মন ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিলেন; ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে তাঁহার "আমিত্ব" বিলীন হইয়া গেল। তিনি আত্মশক্তিতে নয়, কিন্তু ঐশীশক্তিতে শক্তিশালী হইয়া ভারতের মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কার্য্য সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র স্বয়ংই একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

"আমি বলিয়া কোন বস্তু আমাতে নাই। অনেক দিন হইল সেই ক্ষুদ্র পাখী উড়িয়া গিয়াছে। আর সে ফিরিয়া আসিবে না। * * ভারতের সেবা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য আমি জানি না। আমাকে কি তোমরা অবিশ্বাসী ঈশ্বরভ্রষ্ট করিয়া তোমাদের আজ্ঞাধীন করিতে চাও? কেশবচন্দ্র সেন তাহা পারেন না। * * আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়া তাঁহারই সেবা করিব।"

কেশবচন্দ্র দেশের প্রায় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি মহাত্মা রামমোহন রায়ের ন্যায় রাজনৈতিক আন্দোলন করেন নাই বটে; কিন্তু রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যে কোন চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে। তিনি বিলাতে গমন করিয়া "ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য" বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা করেন। ঐ দুই বক্তৃতায় নির্ভীক চিত্তে ভারতের রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহেই ত "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকা বাহির হয় এবং কিছুদিন পরে উহা দৈনিক হইয়া প্রকাশিত হয়। "সুলভ সমাচার" পত্রও তিনিই প্রকাশ করেন। সে কথা যা'ক। আমরা একটি প্রবন্ধে তাঁহার সকল কার্য্যের যে উল্লেখ করিতে পারিব, এরূপ আশা নাই। এজন্য ছোট বড় কতকগুলি কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবার পর অভিভাবকদিগের মনোরঞ্জনের জন্য বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন দেশের যুবকদিগের উচ্ছৃঙ্খল ভাব ও নৈতিক দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এই সময় কলিকাতা সহরের ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই মদ্য পান করিতেন; অনেকের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল; অনেকের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। কেশবচন্দ্র যুবকদিগকে সুপথে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত "Young Bengal, this is for you"

খানা চটি বই ছাপাইয়া প্রচার করিলেন। কেশবচন্দ্রের এই রকম ও অন্য প্রকার চেষ্টায় বিস্তর লোকের মন যে ধর্ম্মের দিকে ফিরিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সকলেই জানেন, এদেশের যুবকগণ যাহাতে সরল, সচ্চরিত্র, সত্যনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ধার্ম্মিক হয়, সেজন্য ব্রাহ্মসমাজ নানা রকম চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সেই চেষ্টায় দেশের দুর্নীতির দূষিত বাষ্প যে অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে, তাহা আর কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু এই চেষ্টার মূলে যাঁহারা ছিলেন, কেশবচন্দ্রই তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি।

কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ দেশের মধ্যে বিবেকের মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি আছে। অন্তর্যামী ঈশ্বর সেই বিবেকের ভিতর দিয়া তাঁহার ন্যায়-আদেশ, অথবা ধর্ম্মবুদ্ধির ভিতর দিয়া তাঁহার শুভইচ্ছা আমাদিগকে জ্ঞাপন করেন; সত্য কি, অসত্য কি, পাপ কি, পুণ্য কি, ন্যায় কি, অন্যায় কি, এবং আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা স্বয়ং ঈশ্বর বিবেকের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে বলিয়া দেন। অতএব কাণ পাতিয়া বিবেকের বাণী শুনিতে হইবে এবং তদনুসারে ইচ্ছা নিয়মিত ও জীবন গঠন করিয়া তুলিতে হইবে।

কেশবচন্দ্র আপনার উন্নত জীবনের প্রভাবে এই বিবেকের কথা যুবকদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। এমন এক সময় ছিল, যখন নব্য যুবকগণ প্রাণপণ করিয়া বিবেকের আদেশ পালন করিতেন। তাঁহারা কথায় কথায় বলিতেন, যাহা অসত্য, যাহা বিশ্বাস করি না, যাহা পাপ, তাহা কেমন করিয়া করিব? বিবেক যে তাহা করিতে বাধা দেয়। আমরা কি বিবেকবাণী অগ্রাহ্য করিতে পারি? তখন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি যুবক ছিলেন; তাঁহারা বিবেকের দোহাই দিয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিতেন:—

> "কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা নির্ভয়ে করিব তাহা,
> যায় যা'ক থাকে থাক ধন প্রাণ মান,
> সত্যকে ধরিয়া রব পর্ব্বতসমান।"

পূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের বিষয়কর্ম্মের কথা লিখিয়াছি। করিয়াছেন, তাঁহাকে কে বিষয়কর্ম্মে বাঁধিয়া রাখিবে? আপিসের উপরওয়ালা সাহেব তাঁহার আব্দার রক্ষা করিলেন, বেতন বাড়াইয়া দিলেন; সময়ে যে তিনি আপিসের বড় বাবু হইবেন, সে কথাও বুঝিতে বাকী রহিল না; তবু কেশবচন্দ্র চাকুরী ত্যাগ করিয়া আপনাকে ঈশ্বরের কার্য্যে অর্পণ করিলেন। অগ্রে যুবকদিগের দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল; এই বার স্ত্রীলোকদিগের দুঃখ অসহ্য হইল। তিনি নারীজাতির উন্নতির জন্য সংকল্প গ্রহণ করিলেন। ১৮৬৩ সালে তাঁহারই উদ্যোগে "ব্রাহ্মবন্ধু-সভা" স্থাপিত হইল। এই সভার সভ্যগণ কেশবচন্দ্রের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। ইঁহারা দেশের উন্নতির জন্য নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কেশবচন্দ্র ইঁহাদিগকে লইয়া স্ত্রীজাতির সুশিক্ষা ও উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার পর কেশবচন্দ্র নারীদিগের ধর্ম্মোন্নতির জন্য ব্রাহ্মিকাসমাজ স্থাপন করিলেন; তিনি স্বয়ং এই ব্রাহ্মিকাসমাজের মহিলাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। উক্ত সমাজের বার্ষিক রিপোর্টে লেখা আছে—

> "স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা দূরীকরণ জন্য গত বর্ষে ব্রাহ্মিকাসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। সেখানে কতকগুলি ব্রাহ্মিকা একত্র হইয়া উপাসনা করেন এবং প্রচারক বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট উপদেশ শ্রবণ করেন। একটি ভদ্রবংশীয়া ইউরোপীয় মহিলা এখানে ভূগোল, অঙ্কবিদ্যা ও শিল্পবিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন।"

১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্র মহিলাদিগের স্বাধীনতার পথ মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি আপনার তরুণবয়স্কা স্ত্রীকে লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে গমন করেন ও সস্ত্রীক উপাসনায় যোগ দেন। তাঁহার অভিভাবকগণ এই ঘটনাটিকে একটা ভয়ানক ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এজন্য কেশবচন্দ্রকে তাঁহারা বর্জ্জন করেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া অনেক দিন দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও মহিলাগণ উপাসনা-মন্দিরে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে পারিবেন কি না, সেই বিষয়েই অনেকের সন্দেহ ছিল। তাহার পর কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় আদি

এই ঘটনা সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম নারীগণ এই প্রকাশ্য উপাসনা-মন্দিরে পুরুষদিগের সহিত বসিলেন। মহিলাদিগের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্র মহিলাদিগকে লইয়া ডাক্তার রবসন নামক খ্রীষ্টীয় পাদরীর ভবনে প্রকাশ্যে সান্ধ্য-সমিতিতে গেলেন। সহরে খুব আলোচনা উঠিল।"

১৮৬৬ সালে জনহিতৈষিণী ইংরেজরমণী কুমারী মেরী কার্পেণ্টার কলিকাতায় আগমন করেন। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় সংস্থাপনই তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বর্গীয় প্যারিচাঁদ মিত্র ও কেশবচন্দ্র উক্ত কার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশেষে কুমারী কার্পেণ্টারের অনুরোধে কেশবচন্দ্র "স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়" সংস্থাপিত করেন।

১৮৭০ সালের অক্টোবর মাসে কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই সময় তিনি রণোন্মত্ত সৈন্যের ন্যায় কর্ম্মোৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। দেশের বহু কার্য্যে হস্তার্পণ করিলেন। মনস্বী প্রতাপচন্দ্র, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ, সাধু অঘোরনাথ, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ, গায়ক ত্রৈলোক্যনাথ—এই সকল শক্তিশালী ব্যক্তিদিগের সহায়তায় অধিকাংশ কার্য্যেই তিনি আশানুরূপ ফললাভ করিলেন। ঐ সকল কার্য্য সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করা অসম্ভব। আমরা সংক্ষেপে গুটিকয়েক কার্য্যের উল্লেখ করিতেছি। কেশবচন্দ্র এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য "ভারত-সংস্কার-সভা" স্থাপন করিলেন। উক্ত সভা হইতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য মহিলাবিদ্যালয়, শ্রমজীবীদিগের জন্য নৈশবিদ্যালয়, দুঃখী ছাত্রদিগের সাহায্যের জন্য দাতব্যভাণ্ডার খোলা হইল; অল্প মূল্যে "সুলভ সমাচার" পত্রিকা প্রকাশিত হইল; সকলেই জানেন এ দেশে সর্ব্বপ্রথম কেশবচন্দ্রই সুলভ মূল্যে সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন। এক সময় এই কাগজের বিস্তর গ্রাহক জুটিয়াছিল।

ঐ সকল কার্য্য ব্যতীত কেশবচন্দ্র "ভারত-সংস্কার-সভা" হইতে শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। আজ স্বদেশী আন্দোলনের জন্য আমরা বুঝিতেছি, ভদ্রলোকের ছেলে-দেরও শিল্পশিক্ষা প্রয়োজন। নচেৎ দেশের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কেশবচন্দ্র একথা অনেক দিন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। এজন্য "ভারত-সংস্কার-সভা"র শিল্পবিভাগ হইতে যুবকদিগকে সূত্রধরের কার্য্য, ঘড়ি মেরামতের কার্য্য, শেলাই, লিথোগ্রাফ, এন্‌গ্রেবিং শিক্ষা দেওয়া হইত। যে সকল ছাত্র ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করিত, বৎসরান্তে তাহা-দিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হইত। পুরস্কার বিতরণের সভায় একবার জষ্টিস ফিয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"ইউরোপীয়গণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন যে, এ দেশের শিক্ষিত লোকেরা শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যগুলিকে নিতান্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন। * * তাঁহার নিজের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলে যদি অহঙ্কার প্রকাশ না পায়, তবে বলিতে পারেন, তিনি কাস্তে ব্যবহার করিতে জানেন এবং লাঙ্গল দিতে পারেন। তিনি নিজে কাষ্ঠ, ধাতু প্রভৃতির দ্রব্য গঠন করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং নিজে এক-খানা নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া বন্ধুগণ সহ তাহাতে জলবিহার করিয়াছেন। * * তাঁহার নিজের প্রস্তুত এক জোড়া জুতাও আছে।"

অতঃপর আমরা কেশবচন্দ্রের সমাজসংস্কার সম্বন্ধে দু একটি কথা বলিব। এ দেশের বিস্তর লোক এই সংস্কার কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। অনেকে বলিবেন কেশবচন্দ্র যদি কেবল প্রাচীন ঋষিদিগের একেশ্বরবাদ, তাঁহাদের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি সাধনতত্ত্ব সকল প্রচার করিতেন এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীকে খ্রীষ্টানধর্ম্মের আকর্ষণ হইতে ফিরাইয়া আনিতেন, সে জন্য কেহই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি প্রাচীন সামাজিক নিয়মের উপর হস্তার্পণ করিতে যাওয়ায়, দেশের লোক তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে।

এই রকম কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের জানা উচিত, সমাজসংস্কার কেশবচন্দ্রের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না; তিনি শুধু সংস্কারের জন্যই সামাজিক ব্যাপারে লিপ্ত হন নাই; তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইতে হইয়াছে। তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য জগতে ধর্ম্মসমন্বয় ও বিবিধ জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপন। তিনি ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব—ধর্ম্মের এই বিশ্বজনীন ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া, উহা জগতের লোকের নিকট প্রচার করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান

ও ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং যাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম পৃথিবীতে সাম্য ও উদার ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত করিবে,—তিনি কিরূপে জাতিভেদ মানিবেন? কিরূপে নারীজাতির উচ্চ-অধিকার অস্বীকার করিবেন? তাঁহার ধর্ম্ম কিরূপে হিন্দুকে আলিঙ্গন করিয়া খ্রীষ্টান ও মুসলমানদিগকে দূরে সরাইয়া দিবে? কিরূপে পুরুষ জাতিকে উন্নত করিয়া নারীর জন্য নিকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রচার করিবে? শুধু কেশবচন্দ্র কেন, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জাতিভেদ কিম্বা কোন প্রকার অন্যায় ভেদনীতি স্বীকার করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের মহাত্মা বুদ্ধ, মহাত্মা নানক, ভক্ত শ্রীচৈতন্য অথবা ইদানীন্তন কালের মহাত্মা রামমোহন, মহাত্মা দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ কি জাতিভেদ স্বীকার করিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা জাতিভেদ স্বীকার করেন নাই। এবং নারীজাতির জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতি যে অনাবশ্যক, এরূপ অনুদার মতও প্রচার করেন নাই।

কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহচরগণ জাতিভেদের লৌহ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া এবং সমাজে উদার প্রেমের পথ পরিষ্কার করিয়া, দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যের জন্য কত উৎপীড়ন সহ্য করিলেন, লোকের নিকট লাঞ্ছিত হইলেন; ঘরের লোক পর হইয়া গেল; তবুও তাঁহারা পশ্চাতে ফিরিতে পারিলেন না, জাতিভেদও মানিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সুরঞ্জিত পতাকা হস্তে লইয়া নরনারীদিগকে বলিতে লাগিলেন—"এস ভাই হিন্দু, এস ভাই খৃষ্টান, এস ভাই মুসলমান, আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান, কেহই কাহারও অবজ্ঞার পাত্র নই; আমরা সকলেই প্রেমে মিলিত হইয়া পিতার মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিব।"

অনেকে ত স্বদেশী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াই দেখিতেছেন, জাতিভেদ মানিলে আর চলে না। জাতিভেদ মানিলে কেমন করিয়া মুসলমানকে এক মায়ের সন্তান বলিবেন? কেমন করিয়া সকল জাতি একত্র হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিবেন? সেই জন্য বাঙ্গালাদেশে জাতিভেদের প্রাচীর খসিয়া পড়িতেছে; হিন্দু, মুসলমান ও সাহেব বাঙ্গালীর মধ্যে ভোজ চলিতেছে। সুতরাং কেশবচন্দ্র জাতিভেদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া এবং নারীদিগকে শিক্ষা ও কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া, দেশের কল্যাণ ভিন্ন কিছুই অকল্যাণ করেন নাই।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

বিদায়

এবার তবে বিদায় দেহ
অধীনে;
সকল কাজ সারা তো ভাই
সহজ নয় দুদিনে।
যতটুকুন সময় হাতে
পেয়েছিলাম ভাগ্যক্রমে,
অধিকাংশ গিয়াছে তার
বাধা বিপদ অতিক্রমে;
এখন বাকি আছে কেবল
ফেরার মত সময় টুক্,
তাই বলি গো বিদায় দেহ
ফুরায়ে যাক সকল চুক্॥
এখন তবে বিদায় দেহ
এ দীনে
বিরস কেহ থেকোনা ভাই
ফিরে যাবার সুদিনে।
একা যখন এসেছিলাম
ছিলে না কেউ সাথী বটে—
আছাড় খেয়ে পড়েছিলাম
অনাদি এই নদীতটে;
পরে তো ভাই কাজের ফেরে
মিলন হল অনেকক্ষণ,
এখন ফেরে বিদায় দেহ—
এযে আমার শুভ লগন॥

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মিত্র

রণা বৃক্ষ

গত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসীতে' শ্রীযুত মোজাফ্‌ফর আহমদ সন্দ্বীপের "পুন্নাগ-বৃক্ষ ও পুন্নাগ-তৈল" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমাদের বঙ্গদেশের বনে, জঙ্গলে ও বাগানে ঐ প্রকার আয়কর ও প্রয়োজনীয় অনেক রকম বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। রণা বৃক্ষ তাহাদের মধ্যে একটী।

কেরোসিন তৈল প্রচলনের পূর্ব্বে পূর্ব্ব-বঙ্গের (বিশেষতঃ কুমিল্লা ও নোয়াখালির) প্রায় প্রত্যেক পরিবারে রণার তৈলের ব্যবহার ছিল। আজকালও অনেক দুঃস্থ গৃহস্থ কেরোসিন তৈলের পরিবর্ত্তে রণার তৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। রণা বৃক্ষ পূর্ব্ব বঙ্গেই অধিক জন্মায়। ইহার পত্রগুলি গাঢ় সবুজবর্ণ এবং ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের অগ্রভাগ সূচল। এই বৃক্ষ আম, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষের ন্যায় বহু শাখা বিশিষ্ট এবং উচ্চতায়ও তাহাদেরই মত। এই গাছ জন্মাইতে লোকের অধিক ক্লেশ পাইতে হয় না। ইহা বাগানে আপনা-আপনি হইয়া থাকে। গো, মহিষ প্রভৃতি ইহার পাতা খায় না, কাজেই চারা গাছগুলি নির্ব্বিঘ্নে বাড়িতে থাকে। ৬।৭ বৎসরের মধ্যেই এই গাছে ফল ফলিতে আরম্ভ করে। ভাদ্র আশ্বিনে ইহার প্রশাখা হইতে সফুল ডাঁটা বাহির হয়, এক একটা ডাঁটা প্রায় এক হস্ত পরিমাণ লম্বা হইয়া থাকে। ফুলগুলি সাদা, দেখিতে অতি সুন্দর। সেই ফুল হইতে ফল হইয়া ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে ফাল্গুন মাসে ফল পাকা আরম্ভ হয়। ফলগুলি দেখিতে বয়ড়ার মত, কিন্তু ইহা বয়ড়া অপেক্ষাও বড় হয়। বয়ড়া মেটে বর্ণের, আর রণার বর্ণ পীতাভ সাদা। একটা ফলের মধ্যে সাধারণতঃ ৩টার বেশী বীচি হয় না। তিনটা আবরণ ভেদ করিয়া তবে উহার সারাংশ পাওয়া যায়। উপরের আবরণটা পুরু, ফল পাকিলে উহা ফাটিয়া যায়। তখনই লালবর্ণের বীচিগুলি দৃষ্ট হয়, ঐ লাল জিনিষটা একটা পাতলা আবরণ। তাহার নীচে কাল রঙ্গের একটা তেলতেলে কঠিন আবরণ আছে, তারপরই সারাংশ, ইহা হুবহু সাদা ছোট মারবলের ন্যায় দেখায়।

তৈল প্রস্তুতের প্রক্রিয়া। ফল পাকিলে উহা ফাটিয়া কুড়াইয়া আনিয়া ২।৩ দিন রৌদ্রে দিবার পর, পায় মাড়াইয়া উপরের লাল খোসা ছাড়াইলে ভিতর হইতে কাল রঙ্গের মসৃণ রণা বাহির হয় তারপর ৩।৪ দিন রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া লইলে কাল আবরণটা শাঁস হইতে পৃথক হইয়া যায়। এখন কুলায় ঝাড়িয়া, কালো আবরণটা ফেলিয়া দিতে হয়। ভিতরের সাদা জিনিষগুলিকে পুনরায় ঢেঁকিতে কুটিয়া গুঁড়া গুঁড়া হইলে জল মাখিয়া রৌদ্রে দিতে হয়; খুব শুষ্ক হইলে আবার ঢেঁকিতে কুটিতে হয়; তখন ঐ গুঁড়া জিনিষগুলি ডেলা ডেলা হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উনানে এক হাঁড়ি জল ফুটাইয়া রাখিতে হয়। এই জলে উপর্য্যুক্ত ডেলাগুলি ফেলিয়া দিয়া কাঠির সাহায্যে নাড়িতে হয়, এইরূপ কিছুক্ষণ নাড়িয়া হাঁড়ির মুখে সরা ঢাকা দিতে হয়। খানিকক্ষণ পরে জাল হইতে নামাইয়া হাঁড়িটা নাড়িলে, তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে। এই ভাসমান তৈল নিপুণতার সহিত পাত্রান্তরে ঢালিয়া লইলেই হইল।

এই তৈল রেড়ির তৈলের মত গাঢ় এবং ইহার আলোও তাহারই মত স্নিগ্ধ। বর্ষাকালে চাষীগণ সর্ব্বাঙ্গে এই তৈল মাখিয়া, ধান, পাট প্রভৃতি কাটিতে জলে নামে; ইহাতে মাঠের বিষমিশ্রিত জলের উপদ্রব এবং জলৌকার আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা পায়।

রণাগাছে উৎকৃষ্ট তক্তা প্রস্তুত হয়; এবং এই তক্তা দ্বারা তক্তপোষ, চৌকি, কবাট, জানালা, বাক্স প্রভৃতি তৈয়ার করিলে অনেক দিন স্থায়ী হইতে পারে।

বাবুর হাট। শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় চৌধুরী।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ত্রুটি

আমরা সাহিত্যসেবক নহি;—সাহিত্যসেবিবৃন্দের রচনার পাঠক মাত্র। এমত অবস্থায় আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষার কথা বঙ্গীয় লেখকসমাজে নিবেদন করিলে বোধ হয় তাহা নিতান্ত অবান্তর বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম ও প্রধানতম প্রয়োজন লোক-শিক্ষা—লোকের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তা করা। নিজের চেষ্টায় যে জ্ঞান আহরিত হয় অন্যকে সেই জ্ঞানের

পরোপকার করিবার আকাঙ্ক্ষার নিমিত্তই বোধ হয় জনসমাজে সাহিত্যসেবীর এত আদর ও সম্মান। এই প্রকার পরোপকার যাহার সহজ বৃত্তিতে পরিণত হয় তাহাকেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলা যায়। সুতরাং বঙ্গীয় সাহিত্যসেবকগণ যদি প্রকৃত পক্ষেই আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তা করেন তবেই তাঁহাদের সেই পরম কর্ত্তব্য প্রতিপালন করা হয়। সেই কর্ত্তব্য প্রকৃত পক্ষে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহারই আলোচনার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

আত্মার উন্নতিসাধনই জ্ঞানের কার্য্য। যে জ্ঞান সেই কার্য্যে সহায়তা করে না তাহা পুস্তকনিবদ্ধ হইলেও জ্ঞানপদবাচ্য হইতে পারে না।

বাঙ্গালা ভাষায় উপন্যাস বিভাগই পর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। অথচ অধিক সংখ্যক উপন্যাসই এমন এক প্রকার চিত্র অঙ্কিত করে যাহার ফলে সমাজে কুপ্রবৃত্তির অধিকতর সম্প্রসারণ হয়। বিনা শিক্ষায় আমাদের সমাজে কুপ্রবৃত্তির যে প্রকার তেজ তাহাতে বোধ হয় সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া আমাদের তাহা বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। মধ্যে দিনকতক সাহিত্যে দেশভক্তি-প্রাধান্যময় উপন্যাস আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু আইনের ভয়ে সে পবিত্রতা লোপ পাইয়া পুস্তকাকারে এবং মাসিকের পৃষ্ঠায় পুনরায় সেই আবিলতাময় চিত্ররচনা চলিতেছে। উপন্যাস সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে গীতি কবিতা সম্বন্ধেও সেই কথা অনেকাংশে প্রযোজ্য। সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর বঙ্গভাষায় গবেষণাত্মক সাহিত্যবিভাগ সম্বন্ধে দু এক কথা বলা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ, ইতিহাস। বাঙ্গালা মাসিকে বহু ঐতিহাসিকের সাক্ষাৎ পাই। দুর্ভাগ্যের বিষয়—তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যতীত অন্য সকলে ঐতিহাসিকরূপী অনুবাদক। অথচ স্পষ্টতঃ তাহা স্বীকার না করিয়া ফুটনোটে reference দেওয়া হয়;—যেন কত অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়া লেখা হইয়াছে! ইঁহারা নিজের গৃহপার্শ্বস্থ স্থানের দশ বৎসর পূর্ব্বেরও ইতিহাস জানেন না অথচ সুদূর শ্রীরঙ্গপত্তনের অথবা গান্ধারের ইতিহাস লিখিতে বড়ই পটু; নিজের বাড়ীর নিকট বর্ত্তমানে কি কি শিল্প আছে তাহা জানেন না কিন্তু প্রাচীন অবন্তীর শিল্পসম্বন্ধে অসীম গবেষণাপূর্ব্বক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন। হাভেল সাহেবের পুস্তক রচিত হইবার পূর্ব্বে যে কেহ ভারতীয় প্রস্তরমূর্ত্তিতে বিশেষ সৌন্দর্য্য দেখিয়া কিছু লিখিয়াছেন এরূপ স্মরণ হয় না। অথচ যিনি শিল্পের ক খ ও জানেন না তিনিও সেই সব মূর্ত্তিতে এখন কত সৌন্দর্য্য ও ভাব দেখিতেছেন! কিন্তু সেই সব মূর্ত্তির অনেকগুলিই তিনি চিত্রে ব্যতীত দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ! অনুবাদের প্রয়োজন থাকিতে পারে বটে কিন্তু এরূপ কৃত্রিমতাপূর্ণ সাহিত্য দেশের অপকারক। কারণ ইহাতে প্রায়ই পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করে না। যেহেতু পাঠক ত পাঠক। তাঁহারাও পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন। পরিশ্রম করিয়া যে লেখক নূতন তথ্যসংগ্রহ করিয়া পাঠককে দেন তিনিই সম্মানের পাত্র। যিনি পরস্বাপহারী তথাকথিত সাহিত্যসেবক তিনি ঘৃণার পাত্র।

বাঙ্গালা ভাষায় বঙ্গদেশের ভূগোলের কত অভাব। এত লোক বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছেন কিন্তু বঙ্গের প্রতি জেলার বিস্তৃত ভূগোল ত কৈ দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে যে শুধু অনুবাদে চলে না। হাতে কলমে অনুসন্ধান দরকার—তাই বুঝি সে ভূগোল এত বিরল। তাই মনে হয় বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক লেখককে সাহিত্যসেবক না বলিয়া সাহিত্যামোদী বলা সমীচীন। ইঁহারা আমোদের জন্য লেখনী ধারণ করেন—লোকশিক্ষার জন্য নহে।

বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার পৃথক্ ভূগোল প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। তাহাতে যেমন গ্রাম, নদী প্রভৃতির নাম থাকিবে—তেমনি আচার, ভাষা, বৃক্ষাদির নাম, শিল্পসংবাদ, পশু পক্ষী প্রভৃতির নাম প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট থাকিবে। আমরা পাঠকবর্গ ইহা চাই। বাঙ্গালার সাহিত্যসেবকগণ কি এ দিকে পরিশ্রম করিতে অগ্রসর হইবেন না?

অধুনা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র-প্রমুখ জনকয়েক কর্ম্মবীর সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া বিজ্ঞানালোচনার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন; আর আমাদের সাহিত্যামোদিগণ ইংরাজী গ্রন্থ তর্জ্জমা করিয়া বাহবা লইবার চেষ্টায় আছেন। প্রাণিবিজ্ঞান বঙ্গসাহিত্যে প্রয়োজন. অতএব বিদেশী পশু

পক্ষীর প্রসাধনরহস্য কিংবা "কড়" মৎস্যের বাসস্থানের আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের পশু পক্ষী কিংবা কই, মাগুর মৎস্যের কথা যেন লিখিত হইবার চেষ্টা না হয়! তাহা হইলে যে নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। হায় বঙ্গভাষা! সুখের বিষয় শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ মনীষিবর্গ এই দীন দেশের দীন হীন উদ্ভিদ প্রভৃতির কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। যদি বঙ্গীয় সাহিত্যসেবকগণ প্রত্যেকে একটী উদ্ভিদ কি প্রাণী সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করেন তবে বোধ হয় অচিরকাল মধ্যে বাঙ্গালা দেশে আমাদের নিজেদের প্রাণি-বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান সৃষ্ট হইতে পারে।

তারপর জাতিতত্ত্ব। আমরা আমেরিকা, নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিবর্গের সম্বন্ধে অনেক কথাই অবগত আছি, কিংবা বঙ্গদেশের কোন্ জাতি পুরাণে কোন্ জাতি বলিয়া বর্ণিত তাহা বেশ অবগত আছি। যেহেতু সে যে ছাপার বইয়ে আছে! কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বঙ্গদেশে কোন্ জাতির মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা কিরূপ, তাহাদের ব্যবসায়ের সহিত মৃত্যু-সংখ্যার সম্বন্ধ আছে কি না, কোন্ জাতির সন্তান উৎপাদন কি পরিমাণে হয়—তাহার কম বেশীর সহিত তাহাদের জাতিগত কি ব্যবসায়গত কোন সম্পর্ক আছে কি না, সে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করি না। আমরা বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বচন সংগ্রহ করিতে পারি। কোন দেশে কি সংখ্যায় বিধবা-বিবাহ হয় তাহা জানি, কিন্তু সেই বিধবা-বিবাহ-সমস্যা মীমাংসার্থে যে পুরুষের কোন্ বয়সে বেশী মৃত্যু হয় সেই তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন তাহা দেখি না ও কষ্ট করিয়া সে তথ্য সংগ্রহে মনোযোগী হই না। আমাদের দেশে জাতির মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ আছে তাহাতে বিবাহাদি চলে না। সুতরাং বিধবা-বিবাহ সমস্যায় যে শ্রেণীগত পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা স্থির করা প্রয়োজন তাহা চিন্তা করি না এবং সে তথ্য সংগ্রহ করি না, যতটুকু গবর্ণমেণ্টের সেন্সসে আছে তাহা লইয়াই নাড়া চাড়া!

হিন্দুজাতি ধ্বংসোন্মুখ! এই সংবাদে আমরা ব্যতিব্যস্ত! কিন্তু কৈ গবর্ণমেণ্টের সেন্সস ব্যতীত লোকের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে তাহার কি কোন তালিকা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি? কি ব্যবসায়ে মৃত্যু বেশী এবং সন্তান উৎপাদন কম হয়—কোন জেলায় কোন জাতিতে কি ভাবে জন্ম-মৃত্যু, তাহার কোন তথ্যই আমরা সংগ্রহ করি নাই।

বঙ্গসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগও আলোচনা করিলে এইরূপ স্বাধীন অনুসন্ধানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। আমরা আধুনিক বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিয়া অনেকটা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। সে সিদ্ধান্ত প্রকৃত কি না তাহা চিন্তাশীল পাঠকবর্গ ও লেখকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

অনুবাদ করা ভাল বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে অনুবাদকেরা একটু স্বাধীন অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের পুস্তকস্থ বিজ্ঞানের আলোচনা কার্য্যে প্রয়োগ করিতেছেন ইহা বুঝিতে না পারিলে পাঠকের তৃপ্তি হয় না এবং লেখকের উপর শ্রদ্ধা হয় না। দুইই সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলজনক।

আশা করি ধীমানগণ যাহাতে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে আরও অধিক পরিমাণে স্বাধীন অনুসন্ধান চলিতে পারে তাহার পন্থা অবধারণ করিবেন এবং সেই সমস্ত অনুসন্ধানের বিভাগ ও বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। তাহা হইলে হয়ত অনেকে তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া অচিরে বঙ্গসাহিত্যকে এক স্বাধীন সাহিত্যরূপে জগতের সমক্ষে প্রচার করিতে সমর্থ হইবেন।

অপ্রীতিকর সমালোচনার জন্য সাহিত্যসেবিগণের নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আশা করি আমার এই আলোচনার উত্তরে আমার অকর্ম্মণ্যতার উল্লেখ করিয়া কেহ আমাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিবেন না। সেরূপ চেষ্টা তর্কশাস্ত্রে দূষণীয় বলিয়া উল্লিখিত আছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত।

"বাঙ্গালা ন্যাসনালিটি"

(NATIONALITY)

কোন এক সময়ে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বলিয়া

ইহা এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, আর্য্যেরা যখন সরস্বতী-দৃষদ্বতীতীরে বাস করিয়া ঋক্ সাম বেদ গান করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। মধ্য-দেশে যখন অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ আরম্ভ হইল দেখা যায় বটে, কিন্তু তখনও পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বন্ধ হয় নাই। কেহ কি বলিতে পারেন যে, এই সময়ও তাঁহারা অনার্য্য কন্যা গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহাদের দাস দাসী দরকার হয় নাই? তাহা হইলে আমরা কি বুঝিতে পারি না যে, একদিকে যেমন শ্রেণীবিভাগ হইতেছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের মধ্যে মিশ্র-বিবাহও (Mixed marriages) চলিতেছিল! ঠিক কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত চারিশ্রেণীর উৎপত্তি হইল, তাহার পর মিশ্র-বিবাহ আরম্ভ হইল, এমন কল্পনা করার কারণ দেখা যায় না। বরং ইহাই স্বভাবিক বলিয়া মনে হয় যে, যে সময়ে অনার্য্যেরা কখনও বা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, কখনও বা আর্য্যদের নিকটে বাস করিয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া-ছেন, সেই সময়ে একদিকে যেমন মিশ্র-বিবাহ হইতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি ব্যবসায় বাণিজ্যের খাতিরে সকলের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের উৎপত্তি আরম্ভ হইল। মিশ্রণ ও শ্রেণীবিভাগ, দুইই একসঙ্গে চলিতে লাগিল। এইজন্য বলিতে হয় যে, ঠিক কোন্ সময়ে যে চতুর্বর্ণ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া বড় কঠিন হইতেছে। সংহিতা-কারদের আরও একটী বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। যাঁহারা অমিশ্র অনার্য্য বর্ণ হইতে উৎপন্ন তাঁহারা কিরূপে আর্য্যসমাজে গৃহীত হইলেন ইহার একটা কারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইয়াছিল। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা ব্রাত্য কথাটী ব্যবহার করিয়া চীন, হূণ, খস, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন। তাহা হইলে ইহা মানিতে হয় যে, অনার্য্যবংশ হইতেও ক্ষত্রিয়বংশ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও দেখাইয়াছেন যে, ব্রাত্যষ্টোম যজ্ঞ করিয়া এই ব্রাত্যেরা স্বজাতিতে প্রবেশ করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান কালেও কায়স্থেরা নিজেদের ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণ করিয়া পুনরায় ক্ষত্রিয়দলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অনার্য্যদের আর্য্যদের সহিত মিশিবার পথ ছিল—ইহা যদি স্বীকার করিতে হয় ও মিশ্র-বিবাহ অবারিত চলিত স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ভারতবর্ষে আর অধিক অমিশ্র আদিবংশ নাই। একে-বারে অমিশ্র আদি খুব বেশী আছে, স্বীকার না করিলেও, ইহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ভারতবর্ষের উত্তর অংশে অর্থাৎ সাধারণতঃ পুরাকালে যাহাকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিত, সেখানে উচ্চশ্রেণীর ধমনীতে যে আর্য্যরক্ত আছে, তাহা কাহারও অস্বীকার করার অধিকার নাই। আমরা মনুর মতের আলোচনা করিতে গিয়া দেখিলাম যে, সংহিতাকারগণ সঙ্কর ও ব্রাত্য, এই দুইটী theories দিয়া আমাদের দেশের জাতিভেদের উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এদেশে যে মিশ্র-বিবাহ হয় নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না বা আচারভ্রষ্ট হইয়া কোন শ্রেণী হইতে নূতন শ্রেণী গঠন হয় নাই বা ব্রাত্যনামে অনার্য্যজাতি হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া নূতন জাতি গঠন করে নাই, তাহাও মনে করি না। তবে কেবল এই দুইটী কারণে যে ভারতবর্ষে এই বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমরা মনে করি না।

Nesfield, Crookes প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষে আর্য্য অনার্য্য এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, এখন তাহাদের স্বতন্ত্র করা কঠিন। তবে এই জাতি-ভেদের কারণ কি? তাঁহারা বলেন, এই সকল জাতি ব্যবসায় ভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা বলিবেন যে, যাঁহারা যজন যাজন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন। নিজ জাতির কার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহারা কেবল ব্রাহ্মণদের সহিত আদান প্রদান করা বেশী সুবিধাজনক মনে করিতে লাগিলেন। কালক্রমে এই জাতিভেদ বেশ পাকা হইয়া দাঁড়াইলে পর তাঁহারা নিজ জাতির বাহিরে বিবাহসম্বন্ধ একেবারে বন্ধ করিলেন। ক্রমেই জাতিভেদ Crystallized হইয়া পড়িল। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্যবসায় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইল। এই কারণে এক জাতি সব স্থানে দেখা যায় না, সব জাতিও এক প্রদেশে দেখা যায় না। যে সব

স্থানে লবণ বা সোরা প্রস্তুত করা আবশ্যক ছিল, সেখানে নুনিয়া (Nunia) জাতির গঠন হইল। যেখানে লবণের ব্যবসায় নাই, সেখানে আর নুনিয়া জাতির চিহ্নও পাওয়া যায় না। এই দলের লোকেরা আরও বলেন যে যখন অনার্য্যেরা আর্য্যদের সঙ্গে বেশী মিশিয়াছিলেন তখন আর্য্য দ্বিজ ও অনার্য্য শূদ্র এই দুই বিভাগ চলিয়া গিয়া ভারত-বাসীরা ব্যবসায়ভেদে জল-আচরণীয় ও জল-অনাচরণীয় দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। এই দুই ভাগ হইল বটে, তবে ইহার মধ্যে উচ্চ নীচ উৎপত্তির কারণ কি? তাঁহারা বলিবেন যে, সব ব্যবসায় ত ভাল ছিল না। যাহারা চামড়ার ব্যবসায় করিল, তাহারা যজন যাজন পদে ক্ত লোকদের সঙ্গে সমাজে সমান সম্মান কখনও পাইল না। এইরূপ ব্যবসায় ভেদে উচ্চ নীচ জাতির উৎপত্তি হইল। এই জন্য তাঁহারা বলেন যে, এক এক প্রদেশে এক এক ব্যবসায় ঘৃণিত না হওয়ায়, এক জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সমাজে উচ্চ নীচ স্থান অধিকার করিয়াছে। কৈবর্ত্তজাতি বাঙ্গালা দেশে কোন স্থানে জল-আচরণীয়, কোন স্থানে অচল। এই শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন যে ব্যবসায়ভেদে জাতিভেদের সূত্রপাত হইতেই শকজাতীয় পরাক্রান্ত রাজারা যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া ভারতে তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজপুত বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। এই theory মধ্যে যে সত্য আংশিক ভাবে নিহিত আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেবল তবে এই theory দ্বারা জাতিভেদের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা আমরা মানিতে পারি না। কারণ সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণসন্তান ও জেলে, মালা, বাগদী, বাউড়িকে কেহ এক স্থানে দাঁড় করাইলেই যদি কেহ তাহাদের সকলকে এক বংশসম্ভূত মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের চক্ষুর দোষ দিতে আমাদের কোন ভয় হয় না। আমরা এই functional origin of castes সম্পূর্ণ গ্রাহ্য না করিলেও আমাদের আর কোন theory আছে কি না?

Risley, Gait প্রভৃতি পণ্ডিতেরা আর এক theory উপস্থিত করিতেছেন। ইহারা বলিতেছেন যে, সংহিতা-কারদের literary theory বা Nesfield প্রভৃতি সাহেবদের functional theory মধ্যে সত্য নিহিত আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে আর দুইটী কারণ প্রধানতঃ ভারতবর্ষে জাতিভেদের আরম্ভ হইতে কার্য্য করিতেছে; সে দুইটী কারণ উপস্থিত আছে বলিয়া এদেশে মিশ্র-বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও, আচারভ্রষ্ট হইয়া নূতন জাতির গঠন হইলেও, চীন, হূণ প্রভৃতি জাতিকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লইলেও, বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মণিপুর প্রভৃতি স্থানে নূতন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইলেও, ব্যবসায় ভেদে জাতিভেদের উৎপত্তি হইলেও, ভারতবর্ষে অতি পুরাকাল হইতে জাতিভেদের উৎপত্তি হইয়াছে ও বর্ত্তমানে হইতেছে। এই দুইটীর মধ্যে একটীকে আমরা facts বলিব, অপরটীকে fiction বলিব। Facts গুলি এই যে, "pride of blood" and "idea of ceremonial purity." উচ্চ শ্রেণীর লোকদের বিশ্বাস যে, তাঁহাদের যে বংশে জন্ম তাহা অন্য সব বংশ হইতে উন্নত এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সংস্রবে আসিলে, তাহাদের স্পর্শ করিলে ও তাহাদের অন্ন আহার করিলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়, তাঁহাদের রক্ত দূষিত হয়। ভাল রক্তে (pride of blood) বিশ্বাস লইয়া এখনও পৃথিবীর অন্যস্থানে সংগ্রাম চলিতেছে। Americaতে Europeans ও colourd races, Australiaতে Europeans and Asiatics,—South Africaতে Europeans and Blacks মধ্যে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা আপনারা অবগত আছেন। এই দেশেও এখন ইংরাজ ও এদেশীয়দের মধ্যে যে সংগ্রাম যাইতেছে, এক সময়ে আর্য্য ও অনার্য্যদের মধ্যে যে সংগ্রাম গিয়াছে, এখনও ব্রাহ্মণেরা যে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের ঘৃণার চক্ষে দেখেন, ইহা তাহারই আভাস মাত্র। যেখানে এক শ্রেণীর লোক culture ও civilization লইয়া অন্য uncultured ও barbarous জাতির সহিত একদেশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেইখানেই এই সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর অনেক স্থানেই এই সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোথাও এই কারণে ভাল করিয়া জাতিভেদ পাকা হইয়া দাঁড়ায় নাই। ভারতবর্ষে ইহা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেন দাঁড়াইল, তাহারই অনুসন্ধান করা দরকার। আমি আর একটী factএর কথা তুলিয়াছি—তাহাকে আমি

Idea of ceremonial purity বলিয়াছি। জিনিষটা কি, তাহা আপনারা সকলেই ভাল বুঝেন; আজ যদি সদ্বংশজাত, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিয়া কোন কায়স্থ-সন্তান ভাত রাঁধিয়া দেন, তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণ তাহা খাইবেন না। এমন কি, পশ্চিমের কোন ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা দেশের কোন ব্রাহ্মণের ঘরেও ভাত খাইবেন না। ইহার কারণ কি? এই বিষয়ে আমি এখানে আর বেশী কিছু বলিব না। কারণ বেশী বলিতে গেলে এই প্রবন্ধ এত বড় হইয়া যাইবে যে, তাহাতে সভার অন্য কার্য্যের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। এই ভাবটী দক্ষিণ ভারতে এমন বদ্ধমূল হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণে আহার করিতেছে, ইহা যদি কোন Pariah দেখে, এবং তখনই যদি ব্রাহ্মণ আহার ত্যাগ করিয়া হাত মুখ না ধোন, তাহা হইলে তিনি জাতিভ্রষ্ট হইবেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতিতে যদি জল তুলে, সে জলে পা ধুইলেও ব্রাহ্মণের জাত যাইবে। কোন রাস্তা দিয়া যদি ব্রাহ্মণ যান, তাহা হইলে Pariah তাহা হইতে ৪০ হাত দূরে দাঁড়াইয়া থাকিবে। কি কঠোর Idea of ceremonal purity! এই ভাবটী কি করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষ অনুসন্ধান করিতে চান তাহা হইলে Frazer's Golden Bough প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলে সবিশেষ অবগত হইবেন।

জাতিভেদের মূলে যে দুইটী facts আছে তাহাই যে আমাদের স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আপনারা এখন ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন। Sir Alfred Lyall এই জন্য বলিয়াছেন যে,—

"The wedges which have riven asunder, and are keeping separate, the general mass of the Indian People are furnished and applied by the system of caste. The two great outward and visible signs of caste-fellowship—intermarriage and the sharing of food—are the bonds which unite or isolate groups."

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে Purity of blood সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসটী এমন দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, আমরা ভুলিয়াও একবার মনে করিতে পারি না যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলন করিয়া (Intermarriage) ভারতবর্ষের সব জাতি এক হইয়া যাইবে। এবং Idea of ceremonial purity এমন কঠিন ভাবে আমাদের গ্রাস করিয়াছে যে, ভিন্ন জাতির অন্নগ্রহণ দূরে থাকুক, উচ্চ-শ্রেণীরা নিম্নশ্রেণীর কাছেও আসিবেন না। স্বজাতির মধ্যে বিবাহ ও তাহাদের মধ্যে আহার বিহার আবদ্ধ থাকে বলিয়া যেমন নিজ নিজ জাতির ভিতর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে তেমনি এই দুই কারণে অন্য জাতির সহিত স্বতন্ত্রতা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে।

অপর একটী কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেটী Fiction. ইহাও জাতিভেদের মূলে আছে। একটী উদাহরণ দিলে এই কথাটী পরিষ্কার হইবে। কৈবর্ত্তজাতির কথা আলোচনা করা যাউক। যাঁহারা এই জাতির Physical characteristics পরীক্ষা করিবেন, তাঁহারাই বলিবেন যে ইহাদের মধ্যে Dravidian element খুব বেশী।

এই Dravidian Elementএর আর একটী প্রমাণ আছে। বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমে অন্য কোন প্রদেশে ইহাদের দেখিতেও পাইবেন না। মধ্য বাঙ্গালায় মেদিনীপুর নদীয়া প্রভৃতি জেলায় ইহাদের সংখ্যা যেমন অধিক, এই সব স্থানে ইহাদের অবস্থাও তেমন উন্নত। পূর্ব্বদিকে ইহারা আসামে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। এই জাতির উৎপত্তি এই বাঙ্গালা দেশেই। ইহারা যখন কোনদিন পশ্চিম হইতে আসে নাই এবং ইহাদের নিকটেই যখন দ্রাবিড়ী জাতীয় সাঁওতাল, কোলেরা বাস করিতেছে, তখন তাহাদের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ আছে ইহা অনুমান করিয়া Risley ও Gait ভুল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এখন এই জাতীয় লোকদের আমরা দুইটী কার্য্যে নিযুক্ত দেখি, কতকগুলি চাষের কার্য্যে নিযুক্ত, অপরগুলি মাছধরা কাজে নিযুক্ত। যাঁহারা চাষ করিতে-ছেন, তাঁহাদের ব্যবসায়টী তাদৃশ নিকৃষ্ট নয় বলিয়া সমাজে ইহাদের তেমন নিম্ন স্থান নয়। এই জন্য তাঁহারা, তাঁহাদের আত্মীয় যাঁহারা মাছধরা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের সহিত আহার ত্যাগ করিয়াছেন। ক্রমে এই কৈবর্ত্ত জাতি দুইটী স্বতন্ত্র জাতি হইয়া পড়িয়াছে। যখন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত, অমনি একটা fiction উপস্থিত হইয়াছে যে,

ইহাদের উৎপত্তিও ভিন্ন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাব হইল না—একটা genealogy প্রস্তুত হইয়া গেল। চাষী ব্যবসায়ীরা মনুসংহিতার মাহিষ্য নাম গ্রহণ করিলেন, ও নিজ আত্মীয়দের নিকট হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন। বাঙ্গালা দেশে জেলে কৈবর্ত্তেরা নূতন নাম আজিও লন নাই বটে, কিন্তু আসামে ইহারা "নদিয়াল" নাম গ্রহণ করিয়া একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। মূলে যাহা এক জাতি ছিল, ক্রমে তাহা দুই জাতি হইয়া পড়িল। ব্যবসায় ভেদে ইহাদের প্রথমে স্বাতন্ত্র্য আরম্ভ হইল বটে, এখন fictionও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যখন দুই শ্রেণীর ব্যবসায় ভিন্ন তখন ইহাদের উৎপত্তিও ভিন্ন। আর এক হইবার উপায় নাই। জাতিভেদের মূলে যে স্বতন্ত্র হইবার প্রবৃত্তি (fission) রহিয়াছে তাহাই কার্য্য করিতেছে।

কেহ কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন—অনার্য্যবংশ (Dravidian) কিরূপে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিল? এই শ্রেণীর আপত্তিকারীদের বিশ্বাস যে, হিন্দুসমাজের প্রসারণ নাই। লোকে খ্রীষ্টান হয়. মুসলমান হয়—অহিন্দু যে আবার হিন্দু হয়, ইহা ত কখনও শুনি নাই। হিন্দু বলিতেই আর্য্য জাতীয় বুঝিতে হইবে। বাহিরের কেহ কখনও হিন্দু হইতে পারে না। আমি মণিপুরীদের বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, হিন্দু হইবার শুধু নয়, হিন্দু ব্রাহ্মণ হইবার কথা বলিয়াছি। মনুতে দেখিবেন চীন, শক, দ্রাবিড়, যবন, খসেরাও ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। কেবল অতীত কালের কথা বলিতেছি না—বর্ত্তমানেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আপনারা কেহ যদি ছোটনাগপুর বেড়াইতে যান, এবং আপনাদের নিকট সাঁওতাল, মহিলী ও ভূমিজ, এই জাতির তিনজন লোক যদি উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে আপনারা আকারে ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পাইবেন না। তবে আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদে প্রভেদ দেখিতে পাইবেন। ভূমিজ বা ভুঁইয়ারা বাঙ্গালী সাজিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষায় কথা কয়, হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে—এক কথায় ইহাদের বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে ধরা যায়। হিন্দুর মধ্যে একটী নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। মহিলীরা (Mahili) যখন আপনাদের মধ্যে কথা কয়, তখন সাঁওতালী ভাষায় কথা কয়; অন্য কাহারও সহিত কথা কহিবার সময় ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি বা বাঙ্গালায় কথা কহিবে। নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ ভাবে বঙ্গা বঙ্গির (Bonga Bongi) পূজা ছাড়ে নাই। পরিধানে বিলাতী কাপড় হিন্দুস্থানিদের মতন করিয়া পরিতে শিখিয়াছে। সাঁওতালেরা কিন্তু হিন্দুনাম লইতে ঘৃণা করে; নিজেদের "হর" বলিয়া জানে, আর সব "দিকু"; ব্রাহ্মণ জাতির উপর একেবারে শ্রদ্ধা নাই, হিন্দুদেবদেবীর নামও সহ্য করিতে পারে না। পরিধানে মোটাসূতার হাতে-বোনা কাপড়। কিন্তু যেমন চেহারায়, তেমনি আর একটী বিষয়ে ইহাদের একতা বুঝা যায়। হিন্দুদের গোত্রনাম ঋষিমুনি দিয়া। আমাদের কাহারও গোত্র কি, জিজ্ঞাসা করিলে "গৌতম" কি "বিশ্বামিত্র" বলিব। এবং কখন কোন গৌতম গোত্রের বালক নিজ গোত্রের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। ইহাকে eponym বলে। কিন্তু এই সব শ্রেণীর মধ্যে এই গোত্রনাম কোন জীবজন্তু বা গাছপালা দিয়া। কেহ "হাঁসদা", কেহ "মুম"। ইহাকে totem বলে। "হাঁসদা" বংশের কেহ কখনও হাঁসদাবংশে বিবাহ করিতে পারিবে না। দেখা যায়, কোন কোন স্থানে অসভ্যজাতি হিন্দুসমাজ মধ্যে প্রবেশ কালে এই সব totem নাম ত্যাগ করিয়া একটী একটী হিন্দু eponym নাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তন্মধ্যে তাহাদের "কাছওয়া" (অর্থাৎ কচ্ছপ) নামটী "কশ্যপ" হইতে প্রায় অভিন্ন বলিয়া প্রায়ই এই গোত্রটী হিন্দু হইবার সময় পছন্দ করিয়া লয়। এই শ্রেণীর মধ্যে এই জন্য "কশ্যপ" গোত্রের আধিক্য দেখা যায়। একদিন একজন "ঘাটওয়ার" (ghatwar)কে তাহার গোত্রের কথা আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; সে বলিল, তাহার "গোৎ" "কাছওয়া"। ঘাটওয়াররা কিন্তু জল-আচরণীয় শুদ্ধ জাতি। কোন প্রকার হিন্দুর অখাদ্য খায় না। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিলাম যে, তাহারা কখনও কচ্ছপ খায় না। তাহাদের বিশ্বাস যে তাহারা সকলে "কচ্ছপ" হইতে উৎপন্ন, এই জন্য তাহারা কচ্ছপ পূজা করিবে ও তাহা কখন বধ করিবে না বা তাহা আহার করিবে না। যে জাতি যখন যে totem নাম গ্রহণ করে, তখন তাহারা আর সে জন্তু বা গাছ নষ্ট

করে না। যে হাঁসদা, সে কখন হাঁস মারিবে না। তাহাদের বিশ্বাস যে হাঁস হইতে তাহাদের বংশ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পূজ্য, তাহাকে কি কখনও মারা যায়, খাওয়া যায়? এই গোত্রনামগুলিতে অনার্য্য বংশ হইতে তাহাদের উৎপত্তির চিহ্নও রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারা জল-আচরণীয় হিন্দুজাতিতে পরিগণিত হইয়াছে। এই ঘাটওয়ারদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা ভাল হইয়াছে তাহারা বড় জমিদার বা রাজা হইয়া সূর্য্য বংশীয় ক্ষত্রিয় হইয়া পড়িয়াছে, ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইসব কথা লইয়া আলোচনা করিবার সময় একদিন আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলিলেন যে, পৃথিবীতে যেখানে ইউরোপীয়েরা গিয়া বাস করিতেছে, তাহারা সেই দেশের আদিম অসভ্যদের ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে; ভারতবর্ষে আর্য্যদের উপনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে আদিম অধিবাসীদের ধ্বংস হয় নাই, বরং এক একটী নূতন জাতি গঠন করিয়া তাঁহারা ইহাদের হিন্দুসমাজে আশ্রয় দিয়াছেন; ইহা extinction নয়, incorporation. কথাটীর ভিতর যে কিছু সত্য নাই, তাহা বলিতেছি না। তবে ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক না হইলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু যে pride of blood লইয়া আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার একটুও তাঁহারা কমান নাই। তাহাদের স্থান দিয়াছেন, সমাজের নিম্ন স্থানে। নিজেদের কাছেও আসিতে দেন নাই। ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন যে যদি অনার্য্যদের সমান স্থান দেওয়া হইত তাহা হইলে আর্য্যেরা যে Culture লইয়া আসিয়াছিলেন অনার্য্য-সংস্রবে তাহার অবনতি হইত। বরং তাঁহারা স্বতন্ত্র ছিলেন বলিয়া এদেশে সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতি হইয়াছিল। নিম্ন সংস্রবে কিছু পরিমাণে আর্য্যদের যে সাময়িক ক্ষতি হইত তাহা স্বীকার করিতে হয়। তবে ভারতে সব অনার্য্যেরাই যে বর্ব্বর ছিল তাহা নয়। পুরাবৃত্তকারেরা এখন বলিতেছেন যে দ্রাবিড়ীয় জাতির নিকট আর্য্যদের অনেক শিখিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা Culture নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ রাখায়, দেশের সাধারণ লোক যে অন্ধকারে ছিল তাহারা সেই অবস্থায় রহিয়া গেল। অধিকন্তু এই সাধারণ মূর্খ লোকদের মধ্যে বাস করিয়া ও প্রতিযোগিতার অভাবে ব্রাহ্মণদের অবনতি হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে ভারতেরও অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। অনার্য্যদের মূর্খ রাখিবার জন্য কি কঠোর নিয়ম করিতে হইয়াছিল মনুসংহিতা ও রামায়ণের শূদ্রকের গল্পে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ইহারই ফলে সমস্ত ভারত নিদ্রা গিয়াছিল।

এইরূপ অবস্থায় ইংলণ্ডের কি হইয়াছিল দেখা যাউক। এখানে Celtic races প্রথমে বাস করিতেছিল—যখন Teutons, Angles Saxons Jutes প্রভৃতি জাতিরা আসিয়া বাস করিতে লাগিল, তখন প্রথমে খুব সংগ্রাম হইল, কিন্তু পরে দুই জাতি মিশিয়া এক হইয়া গেল। তাহার পর যখন Normans আসিয়া বসিল, তখন প্রথমে অত্যাচার অবিচার চলিতে লাগিল। কিন্তু ২০০।৩০০ বৎসরের মধ্যে সব একাকার হইয়া গেল। ইহার মূলে দুইটী কারণ দেখা যায়। একটী এই যে, ইহাদের সকলেরই রং প্রায় এক রকম ছিল, সকলেরই সভ্যতাও প্রায় এক রকম ছিল। ভাষা ভিন্ন হইলেও আমাদের দেশের আর্য্য অনার্য্যের মতন এত বিভিন্ন ছিল না। আর একটী কথা সকলেরই ধর্ম্ম এক ছিল। Pride of blood ছিল না—ধর্ম্ম এক হওয়ায় আদান প্রদান সহজেই চলিতে লাগিল। সব এক হইয়া যাইবার পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। এই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ ও বুয়ার অতি অল্পদিনের মধ্যে এক হইয়া যাইবে। কিন্তু Blacksদের সঙ্গে এক হওয়া বড় কঠিন। সেখানে Pride of blood এক হইবার পথে দাঁড়াইয়া আছে। ভারতবর্ষে এই Pride of blood জাতিভেদের মূলে রহিয়াছে। এখনও আমরা এই বাঙ্গালা দেশে মনুসংহিতার Theory লইয়া সেই পুরাতন তিন দ্বিজবর্গের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি। হিন্দু-সমাজের নিম্ন জাতিরা ভাল আর্য্যবংশ সম্ভূত জাতি বলিয়া প্রমাণ করিয়া উচ্চ হইতে চেষ্টা করিতেছেন। সেই Pride of blood এখন আমাদের মধ্যে কাজ করিতেছে। চারিদিকেই এই movement দেখা যাইতেছে। আমাদের আর্য্য হইতেই হইবে। অনার্য্যদের প্রতি আমাদের এত ঘৃণা যে, আমাদের ধমনীতে যে অনার্য্য রক্ত আছে তাহা

স্বীকার করিতেও আমাদের লজ্জা হয়। আমাদের Idea of ceremonial purity বলিয়া দিতেছে, অনার্য্যদের স্পর্শেও পাপ আছে। যে সব অনার্য্যবংশ আমাদের ভাষা, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজে নূতন জাতি গঠন করিয়াছে, তাহারাও আর্য্য সাজিবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু যাঁহারা বড়, তাঁহারা ছোটদের দাবী গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নন্। পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ কমিবার কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না। অধিকন্তু ব্যবসায় ভেদে নূতন নূতন প্রদেশে বাস করিয়া নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি হইয়া জাতিসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া যাইতেছে। আমাদের Nation হইবার পথে বিঘ্নই উপস্থিত হইতেছে—আমরা এক হইতে পারিতেছি না। আমি আর দুইটী উদাহরণ দিয়া আমার এই বিষয়ে যাহা বক্তব্য আছে, তাহার শেষ করিব।

আপনারা যদি Census Report পাঠ করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে (আমি শ্রীহট্টকে বাঙ্গালার ভিতর ধরিতেছি) বৈদ্যজাতি দেখিতে পাইবেন না। তাহা হইলে বৈদ্যজাতির এই বাঙ্গালা দেশেই উৎপত্তি। ইহাদের জাতিগত ব্যবসায় চিকিৎসা করা। আমাদের দেশে এই শাস্ত্রের সহিত তন্ত্রের কিরূপ নিগূঢ় সম্পর্ক, তাহা আমার বন্ধু এই সভার সভাপতি (Dr. P. C. Ray) তাঁহার History of Hindu Chemistry পুস্তকে দেখাইয়াছেন। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা একপ্রকার এই বাঙ্গালা দেশেই নিবদ্ধ। বৈদ্যদের মধ্যে অধিকাংশই যে তান্ত্রিক, তাহাও আপনাদের অবিদিত নাই। এই সব কথাগুলি একত্র করিলে কি আমরা বুঝিতে পারি না, যে, বাঙ্গালাদেশে তন্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে ও চিকিৎসা ব্যবসায় নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া গেলে এই বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে? ইহা একটী functional caste. বাঙ্গালা দেশের বাহিরে বৈদ্য বলিলে আজিও জাতি বুঝায় না—একটী ব্যবসায় বুঝায়। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য সব জাতিতেই এই ব্যবসায় করিতে পারে। আপনারা এখন একটা কথা তুলিবেন, ইহারা যখন বৈদ্য বলিয়া জাতিতে পরিণত হন নাই, তাহার পূর্ব্বে ইহারা কি জাতি ছিলেন? একটা ভিন্ন জাতি পরিবর্ত্তিত হইয়া ত বৈদ্য জাতি হইয়াছে? সে জাতি কি জাতি ছিল?

অতীতের কথা বলা সর্ব্বদাই কঠিন। তবে যদি কিছু চিহ্ন থাকে তাহা লইয়া কল্পনার সাহায্যে আমরা কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারি। আপনারা যদি চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট জেলা ও ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার পূর্ব্ব অংশে গমন করেন, তাহা হইলে দেখিবেন, ঐ প্রদেশে কতকগুলি বংশ বৈদ্য ও কতকগুলি বংশ কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। আহার ও আদান প্রদানে তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার ভেদ নাই। এমন কি, কোন কোন বংশ কিছু দিন কায়স্থ, তাহার পর কিছুদিন বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দুই জাতির বিবাহ হইতে সম্ভূত সন্তানেরা তাহাদের পিতা মাতার বৈধ সন্তান, তাহা High Courtএ এক মকর্দ্দমায় স্থির হইয়া গিয়াছে। কেহ বলিবেন যে, যথেষ্ট লোকসংখ্যা না থাকায় এই অবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্বে পার্থক্য ছিল, কিন্তু এখন উভয় জাতি বাধ্য হইয়া এইরূপ সম্বন্ধ করিতেছেন। সমস্ত বাঙ্গালা দেশে বৈদ্যসংখ্যা প্রায় ৮৫ হাজার। তাহার মধ্যে এই কয়েক স্থানে প্রায় ৪০ হাজার বৈদ্য। তাঁহাদের মধ্যে যে ছেলে মেয়ে পাওয়া না যায়, তাহা কে বলিবে। এই সব স্থানে কায়স্থ প্রায় ২ লক্ষের কম হইবে না। তাঁহাদের যে নিজ জাতির ভিতর বিবাহের সুবিধা হয় না, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। আর কৈ সেখানে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণে বা কায়স্থ ও ব্রাহ্মণে ত বিবাহ দেখা যায় না। হিন্দুসমাজে এই দুই জাতির সমান সম্মান ও উভয়ের উৎপত্তি এক মূল হইতে বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কেবল বর্ত্তমানে এই স্থানেই কি এইরূপ হয়? আপনারা যদি বৈদ্যদের আদি কুলজিলেখক ভরতমল্লিকের "চন্দ্রপ্রভা" পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, তিনি অসঙ্কোচ-চিত্তে বৈদ্য-কায়স্থের বিবাহের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সে আজ প্রায় ৪০০।৪৫০ বৎসরের কথা। তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গালার বৈদ্যদের এইরূপ সম্বন্ধের কথা লিখিয়াছেন। পশ্চিম বাঙ্গালার বৈদ্যদের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিতেছেন, "এমন কি, সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্য-পণ্ডিত ভরত মল্লিক তাঁহার

চন্দ্রপ্রভা নামক বৈদ্যকুল-পঞ্জিকায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, সেনভূমের রাজবংশ মধ্যে যাঁহারা অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী, তাঁহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন, তাঁহারাই বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হন।" কায়স্থবৈদ্যের মধ্যে যখন এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তখন ইঁহারা দুইটী জাতি হইয়া কেন মারামারি আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করা উচিত।

কায়স্থজাতিও একটী functional caste. পুরাতন সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিলে জানা যায় যে, রাজসরকারে যাঁহারা লেখাপড়ার কাজ করিতেন, খাজনা আদায় করিতেন, তাঁহারাই কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতেন। অবশ্য তাঁহারা উচ্চশ্রেণী হইতে জন্মগ্রহণ করিতেন। নতুবা Idea of ceremonial purity অনুসারে রাজদরবারে কখন বসিতে স্থান পাইতেন না।

এই শ্রেণীর লোকে হিন্দু-রাজাদের সময় ও তাহার পর মুসলমানদের সময় "পার্শি" ভাষা শিখিয়া রাজদরবারে লেখকের কাজ করিয়াছেন। আইন-ই-আকবরীতে কায়স্থদের কথা সকলেই পাঠ করিয়াছেন। হুসেন সাহা প্রভৃতি বাঙ্গালার নবাবদের আমলে যে কায়স্থেরা রাজদরবারে প্রধান স্থান গ্রহণ করিতেন, তাহাও আপনাদের অবিদিত নাই। ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন যে, The head ministerial officer of the Visaya office was the Jyestha Kyestha (J. A. S. B., 1894, p. 44). শ্রীহট্টবাসী আমার এক বন্ধু বলিয়াছেন যে এখনও ঐ জেলায় জমিদার সরকারের প্রধান লেখককে পূরকায়স্থ বলিয়া ডাকা হয়। যখন বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ ছিল এবং সেই বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে তান্ত্রিকধর্ম্ম যখন এদেশ হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের লোপ সাধন করে, তখন আদিশূর যে ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত কায়স্থদেরও এদেশে আসার প্রবাদ শুনা যায়। তাহার পর যখন বল্লাল সেন কৌলীন্য-প্রথার সূত্রপাত করেন, তখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যেই সেই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া ব্রাহ্মণ কুলজিকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন। বল্লাল ও তৎপুত্র লক্ষ্মণের রাজসরকারে কায়স্থ কর্ম্মচারীদের কথা শুনা যায়। তখনকার কোন পুস্তকে বা কুলজিতে বৈদ্যদের কথা ত জানা যায় না। তখন বোধ হয় বৈদ্যজাতির গঠন হয় নাই। তখন বোধ হয় ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন ও এই ব্যবসায় করিতেন। এদেশে ব্রাহ্মণেরা চিরকালই সমাজের প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। আমার মনে হয় যে তাঁহাদের পরই যাঁহারা সমাজে দ্বিতীয় স্থান পাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রাজসরকারে লেখকের কাজ করিতেন, তাঁহারা "কায়স্থ" নামে পরিচিত হইতেন। অন্যদিকে এই দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ অপর কতক ব্যক্তি তান্ত্রিক-সাধন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বৈদ্যজাতি-গঠনের সূত্রপাত করেন। ক্রমে যখন মুসলমানদের সময় কায়স্থেরা রাজসভায় বসিয়া পার্শী ভাষা চর্চ্চা করিয়া রাজানুগ্রহ পাইতে লাগিলেন—তাঁহাদের আত্মীয়েরা তান্ত্রিক সাধন ও সংস্কৃত চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করিয়া সমাজে সম্মান পাইতে লাগিলেন। এদেশে সেই সময়ে তন্ত্রের খুব প্রভাব ছিল, কাজেই এই তান্ত্রিক সাধকেরা ব্রাহ্মণের পরই সমাজে স্থান পাইতে লাগিলেন। ক্রমে দুইটী স্বতন্ত্র জাতি গড়িয়া উঠিল। পার্শী ভাষায় অভিজ্ঞ কায়স্থেরা রাজানুগ্রহে ধন-সম্মান পাইয়া সমাজে বড় রহিলেন। বৈদ্যেরা তন্ত্রসাধনা ও সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া সমাজে বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইতেন। আমার এক সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু বলেন এখন যেমন বিদ্বানলোককে ও চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের Dr. উপাধি দেওয়া হয় তেমনি বিদ্বান ও বৈদ্য এই উভয় কথাই এক ধাতু হইতে উৎপন্ন। এমন পরাক্রান্ত দুইটী জাতি যখন একবার গড়িয়া উঠিল, তখন Fiction উপস্থিত হইল। ইহারা যখন ভিন্ন ব্যবসায়ী, তখন ইহাদের উৎপত্তিও ভিন্ন। কায়স্থেরা ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইলেন, বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ হইলেন। "কায়স্থ" কথার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার এক বিশেষ বন্ধু বলিয়াছেন যে, মনু যে শক (Sak) জাতিকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন —তাঁহারা সকলে Scythian or Skythian বা কায়থীর বংশ-সম্ভূত। যে শকজাতি এক সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম ও উত্তর অংশে মথুরা পর্য্যন্ত রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রমে

ভারতের অন্য জাতির সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছেন। আর্য্যেরা যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও সে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন—আর্য্যদের সহিত অনার্য্যদের যেরূপ রং আচার ব্যবহারের পার্থক্য ছিল, তাঁহাদের সহিতও অনার্য্যদের সেইরূপ পার্থক্য ছিল। উভয়ের মধ্যে cultureও প্রায় এক রকম ছিল। কাজেই তাঁহারা অনার্য্যদের সহিত না মিশিয়া আর্য্যদের সহিত সহজে মিশিতে পারিয়াছিলেন। এই শক জাতীয় রুদ্রদমন Rudradaman প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় সংস্কৃত চর্চ্চায় জীবন দান করেন। তিনি বলেন যে এই কায়থীর জাতি হইতেই কায়স্থ কথাটীর উৎপত্তি। Jackson প্রভৃতি পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন রাজপুতানার অনেক সম্ভ্রান্ত বংশ এই স্কাইথীয় শক জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের আত্মীয়েরা রাজসরকারে লেখা পড়ার কাজ করিত বলিয়া তাহারা কায়স্থ নামে পরিচিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে সত্য নিহিত আছে কি না, তাহা বিশেষ বিচারের বিষয়। বৈদ্যেরা কেন অম্বষ্ঠ হইয়াছেন তাহার কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়। বৈদ্যেরা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, মনুসংহিতার অম্বষ্ঠেরাও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। অতএব তাঁহারা স্থির করিলেন, তাঁহারাও অম্বষ্ঠ। অম্বষ্ঠ একটা দেশ ছিল—সেই দেশবাসীরা অম্বষ্ঠ জাতি ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া যে, ঐ সব অম্বষ্ঠ বৈদ্য ছিলেন বা সব বৈদ্য অম্বষ্ঠ ছিলেন, এরূপ স্থির করা যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয় না। মনুর অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তির Theory ঠিক কি না, তাহাতেও সন্দেহ করিবার বিষয় রহিয়াছে, কারণ এখনও পশ্চিমে অম্বষ্ঠ জাতীয় কায়স্থ দেখা যাইতেছে

বাঙ্গালা দেশে দুইটী functional castes—কায়স্থ ও বৈদ্যের উৎপত্তি সম্ভবতঃ এক হইলেও তাঁহারা ক্রমে দুই জাতি হইয়া পড়িলেন—পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বন্ধ হইল, আহার বন্ধ হইল। দাস সেন প্রভৃতি উপাধি দ্বারাই ইহাদের উৎপত্তি এক বলিয়া মনে হয় বটে। কিন্তু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াই উভয় জাতি পরস্পরের উপর সমাজে প্রধান স্থান পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। Fiction আসিয়া উভয়ের উৎপত্তি ভিন্ন স্থির হইয়া গেল। জাতি-শক্রর ঝগড়া ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছে। এখন এই দুই জাতির মধ্যে এমন বিদ্বেষ দেখা যায়, তাহাতে মনে হয় না যে, ইহারা শীঘ্র আর এক হইতে পারিবেন।

হুয়েং সাং (Hiouen Tsang) যখন বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন, তখনও তিনি এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত দেখিয়াছিলেন। তখন কর্ণসুবর্ণের (বর্ত্তমান কালে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী রাঙ্গামাটি কাণসোণা) রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত এদেশে বৌদ্ধদের নির্য্যাতন করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহার পর আদিশূর এদেশে সদ্‌ব্রাহ্মণের আচার দেখিয়া উত্তরপশ্চিম হইতে ভাল ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন বলিয়া এদেশে প্রবাদ আছে। তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল, আমরা তাহা আজও জানিতে পারি নাই। আমার মনে হয়, শূর বংশীয় রাজারা গঙ্গা ভাগীরথীর তীরে কোথায়ও (খুব সম্ভবতঃ গৌড়ে) রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আদিশূর ঠিক পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত ঘটনা মনে না করিলেও, ইহা বিশ্বাস করা যায় যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহার ও তাঁহার বংশধরদের সময় এদেশে আসিয়াছিলেন। উড়িষ্যা দেশেও এইরূপ প্রবাদ রহিয়াছে। সেখানেও যজ্ঞ করিবার জন্য ১০০০০ দশ হাজার ব্রাহ্মণের আগমনের কথা প্রচারিত। আমরা জানি যে, কোন নূতন দেশে যখন বিদেশীয় লোক আগমন করে, তখন তাহারা নদীর ধার (river valley) দিয়াই অগ্রসর হয়। যে ব্রাহ্মণেরা উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন তাঁহারা মিথিলা মগধ হইতে বাঙ্গালা দেশে না আসিয়া এই সুবর্ণরেখার তীর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা গঙ্গা ভাগীরথীর ধার দিয়া আগমন করিয়াছিলেন। যাঁহারা কামরূপ (আসামে) যান, তাঁহারা করতোয়া নদীর ধার দিয়া উত্তর দিকে গিয়া পরে লোহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদীর ধার দিয়া অগ্রসর হন। এক মিথিলা মগধ হইতে সকলের আগমন বলিয়া উড়িয়া, বাঙ্গালা, ও আসামী ভাষার নৈকট্য এত অধিক। যাঁহারা এই তিন

ভাষার ও বিহারী ভাষার পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে জানিতে চান, তাঁহারা Grierson সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত Linguistic Survey of India পুস্তক পাঠ করিলে সবিশেষ অবগত হইবেন। বিহারীদের বিশ্বাস, তাহারা হিন্দি ভাষায় কথা কয় ও তাহাদের নিকট সম্পর্ক উত্তরপশ্চিমের লোকদের সহিত। যাহারা লেখাপড়া শিখিতেছে, তাহারা হিন্দি ভাষার চর্চ্চা করিতেছে সত্য, কিন্তু সহরের বাহিরে গ্রামে সাধারণতঃ যে ভাষায় কথা কয়, তাহাকে তাহারা গাঁওয়ারী (Ganwari) ভাষা বলেন। এই গাঁওয়ারী ভাষার সহিত আমাদের বাঙ্গালা ভাষার সহিত নিকট সম্পর্ক। মিথিলাতে ব্রাহ্মণেরা যে অক্ষর এখনও ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার নমুনা Grierson সাহেবের Linguistic Survey of India পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা বাঙ্গালা অক্ষর হইতে অভিন্ন। এই অক্ষর সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, “এখনকার পুস্তকে মুদ্রিত যে বাঙ্গালা অক্ষর দেখা যায়, তাহাই যে প্রাচীনকালের বাঙ্গালা অক্ষর নহে, তদ্বিষয়ে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়-দিগের গৃহে ৩।৪ শত বৎসরের হস্তলিখিত যে সকল সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অক্ষর সকল এখনকার অক্ষর অপেক্ষা অনেকাংশে বিভিন্ন। সচরাচর ঐ সকল অক্ষরকে “তিরুটে (বোধ হয় ত্রিহুটে) অক্ষর বলে। ঐ অক্ষরে দেবনাগরের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।” শ্রীকার্ত্তিকেয়-চন্দ্র রায় মহাশয় লিখিত “ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিত” পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি, এদেশে নবদ্বীপেই প্রথম ন্যায় ও স্মৃতির চর্চ্চা হয় এবং মিথিলা দেশ হইতে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চ্চার সূত্রপাত করেন। তাহার পূর্ব্বে মিথিলা প্রদেশের বাচস্পতি মিশ্র, বিবেকার শূলপাণি, ধর্ম্মরত্ন সংগ্রাহক জীমূতবাহন প্রভৃতি স্মৃতিসংগ্রহকারগণের ব্যবস্থানুসারে বঙ্গদেশে কর্ম্মকাণ্ড ইত্যাদি চলিয়া আসিত। লেখা পড়ার সব মিথিলা হইতে আসিয়াছিল বলিয়া আমরা বিদ্যাপতিকে প্রথমে বাঙ্গালী কবি বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম।

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, এই গঙ্গা ভাগীরথীর তীরই প্রথমে বাঙ্গালা দেশের আর্য্যদের বাসস্থান ও সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। আমরা স্থানান্তরে দেখাইব যে এক সময় ভাগীরথী দিয়াই গঙ্গার প্রধান প্রবাহ বহিত। তখন পদ্মার কোন অস্তিত্ব ছিল না। গৌড় বা নবদ্বীপ এই নদীর তীরেই অবস্থিত ছিল। এস্থান হইতেই বাঙ্গালা দেশের চারিদিকে সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হইয়াছে। এই নদীর একদিকে রাঢ় দেশ ও অপর দিকে বারেন্দ্র ভূম। যখন এই নদীর উভয় তীরে উত্তরপশ্চিম হইতে আগত ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, তখন ক্রমেই এই বৃহৎ নদী পার হইয়া পরস্পরের মধ্যে আহারাদি ও বিবাহ সম্বন্ধ কমিয়া যাইতে লাগিল। কিছুদিনের মধ্যে দুইস্থানে বাসজনিত আচার ব্যবহারেরও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। একটী কারণে এই প্রভেদ ক্রমে বদ্ধমূল হইল। সেটী বংশ নামের উপাধি। আপনারা যদি বম্বে প্রদেশে যান, সেখানে ব্রাহ্মণের নামে তাঁহাদের গ্রামের নাম দেখিতে পাইবেন। যেমন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার। এখানে রামকৃষ্ণ নামটী তাঁহার নিজের, গোপাল তাঁহার পিতার নাম, ভাণ্ডারকার গ্রামের নাম। অর্থাৎ ভাণ্ডারকার-নিবাসী গোপালের পুত্র রামকৃষ্ণ। মান্দ্রাজেও ব্রাহ্মণদের নামে ঐরূপ স্থানের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ Sir T. Madhav Rao নামে যে স্থানের নাম আছে, তাহা কেহ সন্দেহ করেন না। কিন্তু ঐ T-টী Tanjore অর্থাৎ তাঞ্জোরের মাধব রাও। বাঙ্গালোরের এক সুপ্রসিদ্ধ ধনীর নাম ধর্ম্মরত্নাকর আর্কট নারায়ণ স্বামী মুদালিয়। ইহার মধ্যে আর্কট কথাটী জ্ঞাপন করিতেছে যে তিনি ঐ সহরবাসী ছিলেন। এদেশেও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের সেরূপ ঘটিয়াছে। রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,—রামচন্দ্র “বন্দঘাটী” স্থানের “উপাধ্যায়”, হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ “চট্ট” গ্রামের “উপাধ্যায়।” পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ৫৬টী “গাঁই” অর্থাৎ “গ্রামিন” বা গ্রামের অধিকাংশ রাঢ় দেশের মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহার বাঙ্গালা দেশের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণখণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। যখন হইতে এই নামের পশ্চাতে প্রথম “বন্দ্যোপাধ্যায়” বা “চট্টোপাধ্যায়” লিখিত হইতে

লাগিল, তখন হইতেই তাঁহারা বারেন্দ্র দেশবাসী ব্রাহ্মণদের হইতে স্বতন্ত্র বংশসম্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইলেন। আমাদের সেই Fiction আসিয়া উপস্থিত হইল। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র তখন স্বতন্ত্র বংশসম্ভূত বলিয়া স্থির হইয়া গেল। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ বাড়িতে লাগিল। এখন এই দুইটী দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত। পরস্পরের মধ্যে আহারাদি বন্ধ হইয়াছে। বিবাহ-সম্বন্ধ ত চলিতেই পারে না। (ক্রমশঃ)

দেয়ালের আড়াল

(গল্প)

সহরের সে এক টেরে, নদীর ধারে, বাদশাহের সেই কয়েদখানা—বিশাল কালো পাষাণময় দেয়াল ঘেরা। নদীর চঞ্চল ঢেউগুলি বাহিরের ব্যথিত হৃদয়ের ব্যাকুলতার মতন দেয়ালের গায়ে আছাড় খায়, চূর্ণ হয়,—পাষাণ প্রাচীর বিশ্বনিখিলের স্নেহবিচ্যুত নরনারীকে আগুলিয়া অটল গাম্ভীর্য্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, সেই হৃদয়ভাঙা কাণ্ড-খানা দেখে।

এটি সাধারণ অপরাধীদের কয়েদখানা নয়—এটি রাজ-নৈতিক কয়েদখানা। এখানে থাকে তাহারাই নজরবন্দী, যাহারা রাজরোষে অভিশপ্ত, যাহারা যে-সে লোক নয়, যাহাদের আটক রাখায় বাদশাহী স্বার্থ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

কত নিরপরাধী প্রাণ রাজনীতির কূট-চক্রে পড়িয়া গিয়া এখানে আটক আছে। শাদা সেই প্রাণগুলি কালো দেয়ালের আড়ালে, কালো হাবসীর পাহারায়, কালো আঁধারের মাঝখানে, আজকে একা বন্দী। প্রত্যেক লোকের একটি একটি পৃথক ঘর—এক বাড়ীতে থাকে তাহারা এই পর্য্যন্ত, কেহ কাহাকেও দেখে না, কেহ কাহারো নাম জানে না।

তবু এদের পরস্পরের পরিচয়ের অভাব নাই। দেয়া-লের গায়ে আঙুলের টোকা মারিয়া ঘরে ঘরে এদের আলাপ চলে। আঙুলের টোকার ভিতর দিয়া প্রাণের ভাষা আপনাকে ব্যক্ত করে। এমনি ভাবে কত বন্ধুর সন্ধান মিলে, কত অজানা বন্ধু হয়, কত আলাপ জমিয়া উঠে।

মাঝে মাঝে ঘরের বাহিরের বারান্দায় হাবসী খোজার নাল-বাঁধানো নাগরা জুতোর ঠকাস ঠকাস শব্দ যেই তাহাদের কানে আসে অমনি এই নির্বাক আলাপ থামিয়া যায়,—হাবসী খোজার পায়চারির আওয়াজ আবার যখন দূরে সরে তখন আবার টোকার শব্দে দেয়ালগুলি মুখর হইয়া উঠে।

চোখে না দেখিয়া, কথা না শুনিয়া, তাহারা টোকার আওয়াজে বুঝিত কে কেমন লোক—কাহার প্রাণে কেমন ব্যথা লুকানো আছে, কেবা জ্ঞানী কেবা অবোধ, কে প্রশান্ত কেবা অধীর, কে কোন ভাবের কেমন ভাবুক। টোকার ভিতর দিয়া তাহাদের হাসিকান্না, সুখদুঃখ, সান্ত্বনা সহানুভূতি, এঘর ওঘর আনাগোনা করিত।

এমনি এক ঘরে বন্দী ছিল এক তরুণী। দোষ শুধু তার রূপ আছে, যৌবন আছে, আর আছে একখানি স্বচ্ছ সরল প্রণয়পাগল প্রাণ। সে অথের কাছে প্রণয়কে, বাদশাহী শাসনের কাছে নারীত্বকে খাটো করিতে পারে নাই, তাইতে সে বন্দী! ভীরু পাখীর মতন পিঞ্জরে অসহায় সে বন্দিনী—তবু তার তনুখানি আনন্দ উল্লাসে ডগমগ, প্রাণখানি গীতে হাস্যে ভরপুর!

বেচারী যে দিন প্রথম এই কয়েদখানায় আসে—তাহার মনে হইল এ এক নূতনতর মজা! বাদশাহের সে বন্দিনী—তবে তো সে যে-সে লোক নয়! ভাবিতে ভাবিতে তাহার ভারি হাসি আসিল—সে গলা ছাড়িয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার সেই গানের মতন তরল মধুর হাসিখানি স্তব্ধ কারার ঘরে ঘরে যেন অমৃতবৃষ্টি করিয়া গেল। কয়েদিরা সব চমকিয়া কান খাড়া করিল।

হাবসী খোজার মিস কালো মুখের মাঝে লাল লাল চোখ দুটো এক মালসা কয়লার মাঝে আগুনের দুটো ফুলকির মতন রাগে জ্বলিয়া উঠিল। সে দরজার গায়ে জালির উপর চোখ রাঙাইয়া বলিতে গেল—চোপ রও। কিন্তু সেই আনন্দমূর্ত্তির রূপের নেশায় হাবসী খোজারও ভাবহীন অন্তরে রমণীপ্রভাব সাড়া দিল, কঠিন কুটিল দৃষ্টি তাহার সরল তরল হইয়া পড়িল, চুপ করাইতে গিয়া নিজেই সে চুপ রহিয়া গেল, তাহার কালো পুরু ঠোঁটের উপর সুখাবেশের সরস হাসির রেখা ছাড়া আর কিছু

ফুটিল না। আজ এই প্রথম হাবসী শান্ত্রীর কাজের ত্রুটি কিছুতেই আর নিবারণ করা গেল না।

ঘরে ঘরে টোকায় টোকায় প্রশ্ন চলিল—এ কে, এ কে রে? এমন কঠিন জায়গায় এমন মধুর ভুবনভুলানো হাসি হাসে কে রে?

কেহই জানে না—তাহাকে তো কেহই দেখে নাই। এই পর্য্যন্ত তাহারা বুঝিল সে রমণী—আর সে তরুণী! সুন্দরী কি না কে জানে! কয়েদি প্রহরী সকলেই নিজেদের মধ্যে রমণীর মধুসঙ্গ অনুভব করিয়া আনন্দিত হইল।

তাহার কামরার পাশে বন্দী ছিল এক তরুণ। কালো কালো চারখানি দেয়ালের মাঝে তাহার তরুণ জীবনের অনেকগুলি মাস নিরানন্দে নিষ্ফল গেছে—তবু তাহার অন্তরের তারুণ্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

যেইমাত্র সেই তরুণীর হাসির ঢেউ তাহার প্রাণের তটে আঘাত করিল অমনি তাহার সমস্ত প্রাণ বসন্ত-স্পর্শে বিপত্র তরুর মতন আপনার তারুণ্যে পরিপূর্ণ সুন্দর হইয়া উঠিল। বিচিত্র ভাব পুষ্পপুটে সুরভির মতো তাহার প্রাণখানি ভরিয়া তুলিল।

সে অনুভব করিল সেই কঠিন দেয়ালের আড়ালে একখানি কোমল প্রাণের মধুর স্পন্দন; সে শুনিতে পাইল পরীর মতন লঘু তাহার পায়ের ধ্বনি, কবিতার ছন্দের মতন তাহার নিশ্বাস! তরুণ তরুণী পাশাপাশি—মাঝে শুধু ব্যবধান একখানি মাত্র দেয়াল! কিন্তু সে-ই কত দুর্লঙ্ঘ্য!

দেয়ালের গায়ে কান পাতিয়া যুবক শুইয়া পড়িল। তরুণীর ওড়নার স্পন্দন, তাহার ভূষণের শিঞ্জন, তাহার আনন্দের গুঞ্জন, সব শোনা গেল। শুধু দেখা গেল না তাহার রূপ।

সে মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল এ তরুণী না জানি কেমন? লতার মতন তন্বী, মূর্চ্ছার মতন মনোহারিণী, ইন্দুলেখার মতন অপরূপ সুন্দরী! তাহার পরনে নীল পেশোয়াজ, রাঙা আঙিয়া, ফিরোজা ওড়না—বুটিদার, চুমকিওলা, স্বচ্ছ লঘু হাওয়ার মতন। তাহার কালো টানা চোখের কোলে সুর্ম্মা আঁকা, পাতার মতন ঠোঁট দুখানি পানের রসে টুকটুকে, চাঁপার গুচ্ছ হাত দুখানি মেহেদি-মাখা! ভ্রূ দুখানি যেন স্বচ্ছ শাদা মেঘের উপর কালো কুচকুচে রামধনু। পিঠের উপর রেশম-কোমল কালো চুলের দীর্ঘ বেণী মুক্তার মালায় বেষ্টিত। মুখখানি তার হাসির মতো, হৃদয় তাহার ঢেউয়ের ন্যায়। তার হাসি যেন এসবাজের সুর, কথা যেন সেতারের ঝঙ্কার! সে সজীব আনন্দমূর্ত্তি! কয়েদখানার তরুণী সে—তার জীবনখানি না জানি কি অসীম রহস্যে মাখানো,—সে যেন কোন স্বপ্ন-লোকের কল্পনা!

তরুণ যুবক আস্তে আস্তে দেয়ালের গায়ে আঙুল দিয়া টোকা মারিল। টোকার মধ্যে সে বলিতে চাহিল—ওগো তুমি কে গো? তুমি তরুণী, তুমি সুন্দরী, তুমি একাকী—এ নির্ম্মম পুরীতে আমার বন্দী-প্রাণের ক্ষুধিত-প্রণয় আমি তোমায় দিব, শুধু তোমায় দিব!

তরুণী সেই টোকার শব্দ শুনিল—কিন্তু সেই নির্ব্বাক ভাষা সে বুঝিল না কিছুই। শুধু এইটুকু সে বুঝিল এই দেয়ালের ওপারে আছে এমন একজন লোক যে তাহার জন্য ভাবিতেছে, যে তাহাকে আপনার করিতে চাহিতেছে, যে তাহার কাছে আলাপ মাগিতেছে। সে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল শুধু টুক টুক টুক। যত শোনে ততই সেই অস্ফুট ভাষা ব্যক্ততর হয়, তাহার কানে তাহা প্রণয়-সঙ্গীতের মতো বাজিতে থাকে। সে কান পাতিয়া শুনিল একখানি উৎসুক হৃদয় তাহারই জন্য ললিতছন্দে স্পন্দিত হইতেছে। সেও তখন তাহার সরমসঙ্কোচ-ভয়ভাবনায় কম্পিত কোমল আঙুল দিয়া দেয়ালের গায়ে মৃদু মৃদু আঘাত করিল—সে আঘাতে তাহার প্রাণের সমস্ত প্রণয় বীণার মতো বাজিতে লাগিল। কী যে তার ধ্বনি! কী যে তার অনুরণন!

এমন করিয়া তরুণ দুটি প্রাণ তাহাদের প্রণয়গান দিনের পর দিন জুড়িয়া পরস্পরকে শোনায়।

তরুণী ক্রমে এই আলাপে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে জানিল না দেয়ালপারের তাহার বন্ধুটি তরুণ কি বৃদ্ধ, বিবাহিত কি অবিবাহিত, কেমন কোন অপরাধে সে এখানে আজ বন্দী। শুধু সে জানিল দেয়ালপারে এক প্রাণ প্রণয় তাহারই অপেক্ষায় আকুলিবিকুলি করিতেছে; সে তাহার বন্ধু! সে তাহার প্রণয়প্রার্থী!

রাতের পর রাত জাগিয়া তাহাদের এমনি অবুঝ আলাপ চলে। কারাগারের বিজনতা এমনি করিয়া সঙ্গ-সোহাগে

রসালো হয়। দেয়ালের পাশে বসিয়া বসিয়া আঙুলের টোকায় আলাপ করিতে করিতে তরুণী তাহার ক্লান্ত মাথাটি দেয়ালের গায়ে রাখে, সর্ব্বশরীর এলাইয়া দেয়ালে সে ঠেসান দেয়, সেই কঠিন কালো পাষাণ প্রাচীর যেন তাহারই বন্ধুর প্রণয়কোমল বক্ষতট,—ভাবিতে ভাবিতে সুখাবেশে তাহার বিনিদ্র নয়ন মুদিয়া আসে।

এমনিতর পরিপূর্ণ সুখের সময় থাকে থাকে সে আপন মনে উচ্চরবে হাসিয়া উঠে, হৃদয় ছাপাইয়া গান ছুটে, সারা ঘরময় লঘুতালে সে নাচিয়া ফিরে। এই আনন্দের অমৃতপরশ কারাগারের সকল লোকের দুঃখবেদনা যেন মুছিয়া দেয়—হাবসী শাস্ত্রী এমনতর নিয়মভঙ্গ শাসন করিবার মতন কঠোরতা সঞ্চয় করিতে পারে না।

একদিনকার প্রভাতে একজন কে কয়েদি দরজার জালি দিয়া দেখিল বাহিরের আঙিনায় "কৎল্" করিবার আয়োজন হইতেছে। দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইল, বুক কাঁপিল। তখন টোকায় টোকায় এঘর থেকে ওঘর, ওঘর থেকে সেঘর প্রশ্ন চলিল—কে রে, কে সে হতভাগা যাহার জীবনের অবসান এমনতর আসন্ন?

সবাই নিজেকেই সেই মৃত্যুর নিমন্ত্রিত মনে করিতে লাগিল। সকলেই সঙ্গীদের কাছে বিদায় লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। ক্রমে ক্রমে টোকার শব্দ থামিয়া গেল। সবাই স্তব্ধ—যেন জনপ্রাণী জীবিত নাই, সবাই সেথায় মরিয়াছে।

তরুণীর দেয়ালে আজ তাহার বন্ধুর করাঘাত বড় কম্পিত, বড় ব্যগ্র, বড় গুরু। আগেকার মতন এ চুরিকরা প্রণয়বাণী নয়, আজ যেন এ জীবন মৃত্যুর সমস্যা, প্রাণের সকল কথা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিবার প্রাণপণ এ চেষ্টা, আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন করিবার উদগ্র এ আকাঙ্ক্ষা। দেয়ালের গায়ে ঘুসি মারিয়া, লাথি কসিয়া, মাথা ঠুকিয়া পাষাণ প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিতে সে চায়!

তরুণী কিন্তু বুঝিল না তাহার হৃদয়বন্ধু হৃদয় ভাঙিয়া কি বলিয়া গেল—শুধু সে বুঝিল একটি চুম্বনের শব্দ, একটি বিষাদগভীর দীর্ঘশ্বাস। তারপর সব চুপচাপ।

তরুণী ভয়স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল। প্রতীক্ষা করিয়া রহিল আবার তাহার বন্ধু তাহাকে ডাকিবে, আবার তাহার কানে প্রণয়গাথা ঢালিয়া দিবে। কিন্তু বৃথা তাহার আশা, বৃথা তখন প্রতীক্ষা। সমস্ত দিন গেল, রাত্রি ঘনাইল, তবু তো কৈ পাশের ঘরে কোনো সাড়া শব্দ নাই। সে অজ্ঞাত আশঙ্কায় বিমূঢ় হইয়া বসিয়া বসিয়া কি যে ভাবিতেছিল তাহা সেই জানে না।

তখন বাহিরেও সে কী দুর্য্যোগ! ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ বজ্র! ঝড়ের হাহাকার, বৃষ্টির ক্রন্দন, বিদ্যুতের জ্বালা, বজ্রের হুঙ্কার তাহাকে নূতন করিয়া আঘাত করিতে লাগিল। সেই আঘাতে তরুণী চেতনা পাইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

অন্ধকার ঘরের মাঝখানে সে বসিয়া আছে একা। তাহার এতদিনের সঙ্গীর, তাহার দুঃখদিনের বন্ধুর এখনো কোনো সাড়া নাই। সে ধীরে ধীরে দেয়ালের গায়ে টোকা মারিল। তবু কোনো সাড়া নাই। তাহার বন্ধু যখন তাহাকে ব্যগ্রভাবে ডাকিয়াছিল তখন সে সাড়া দেয় নাই, তাই কি বন্ধু রাগ করিয়াছে? সে সোহাগভরে আবার ডাকিল। নাই নাই—কোনো সাড়া নাই। তখন সে দুঃখে অভিমানে কাতর হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া কত কি ভাবিল, ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ঘুম তো কিছুতেই আসিল না। তখন তাহার ভারি একা একা বোধ হইতে লাগিল—এতদিন পরে আজ সে কারাগারে একা বন্দিনী! সে এক-একবার ভাবে আবার একবার ডাকি; আবার ভাবে, না, সেই আগে ডাকুক। কিন্তু অভিমান করিয়া আর কতক্ষণ থাকা যায়,—সে বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দেয়ালময় আঘাত করিয়া ফিরিল—ওগো বন্ধু, কোথায় তুমি, তুমি কোথায়, কোথায় গেলে? বল বল—একবার তুমি একটি কথা বল!

সেই আনন্দময়ীর করুণক্রন্দন আজ সমস্ত কারাগারকে আবার হঠাৎ চমকিত করিয়া তুলিল। হায় হায়! এমন হাসির প্রতিমাকে কাঁদাইল আজ সে কোন নিষ্ঠুর! সকল কয়েদি চোখ মুছিল। হাবসী খোজার পায়চারিও ভারি মন্থর হইয়া পড়িল।

আনন্দময়ীর কান্নার খবর বাদশাহের কানে গেল। আনন্দিত বাদশাহ তরুণীর ঘরে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন—

সুন্দরী, এইবার বোধ হয় তুমি আমার বশ মানিবে। এতদিন আমার শাসন হাসিয়া হাসিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছ; সুখের খবর, তোমার চোখে আজ জল পড়িয়াছে। বল সুন্দরী, এখন তোমার কোন প্রিয়কার্য্য সাধন করিব।

তরুণী শুধু জিজ্ঞাসা করিল—"পাশের ঘরে যে বন্দী ছিল সে কোথায়?"

"সে নাই।"

"সে কোথায়?"

"জানি না।"

তরুণী ভ্রূকুটি করিয়া কহিল—"এখন ওঘরে কে আছে?"

"কেহ না।"

"তবে আমাকে ঐ ঘরে বন্দী করিয়া রাখিতে আজ্ঞা করুন।"

এবার বাদশাহ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—"এস।"

তরুণী বাদশাহের অনুসরণ করিয়া পাশের কামরায় গিয়া দেখিল দেয়ালের গায়ে রক্ত দিয়া বড় বড় হরপে লেখা আছে—

আগর মন্ বাজ্ বিনম্ রূ-এ জার্-এ-খেশ্‌রা।
তা কেয়ামৎ শুক্‌র গুজ্জারম্ কির্দ্দিগার্-এ-খেশ্‌রা।

ওগো আমি যদি আমার প্রতিবেশিনীর মুখখানি একটি-বার দেখিতে পাইতাম, তবে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত দয়াময় জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিতাম!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার চীন-প্রবাস

সে আজ দশ বৎসরের কথা। কেহ সখ করিয়া কেহবা জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য সুদূর বিদেশে গমন করে, কিন্তু আমার এই প্রবাস এতদুভয়ের কোনটীর অন্তর্গত নহে, উহা খাঁটী পেটের দায়ে।

ইংরাজী ১৯০০ সালের আগষ্ট মাসে শনিবার অমাবস্যা তিথিতে মঘা নক্ষত্রে আমি খিদিরপুর ডক হইতে তল্পিতল্পা বাঁধিয়া পেনিনসুলার ওরিয়েন্টাল কোম্পানীর "মণ্ডা" নামক জাহাজে চাপিয়া একবারে চীনে রওনা হইলাম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি সে সময় কলিকাতায় প্লেগের কিম্বা ঐরূপ কোন সংক্রামক পীড়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব থাকায় আমাদিগকে গন্ধকে মিশ্রিত জলীয় বাষ্পের মধ্য দিয়া সুসংস্কৃত হইয়া জাহাজে আরোহণ করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য ঐ সঙ্গে আমাদের তল্পিতল্পাগুলিকেও ঐ ভাবে রোগবীজ হইতে মুক্ত করা হইয়াছিল। "হস্ত দ্বারা স্পর্শিত নহে" টিনে অবস্থিত গোয়ালিনী মার্কা খাঁটি গাঢ় দুগ্ধের ন্যায় আমরা বিশুদ্ধ হইয়া জাহাজে আরোহণ করিলাম। জাহাজে উঠিয়াই দেখিলাম আমাদের স্ব স্ব নাম-লেখা কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে। একদিন এক রাত্রি বাদে আমরা বঙ্গোপসাগরে পড়িলাম। জাহাজ অজগর সর্পের ন্যায় গর্জ্জাইতে লাগিল। চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত নীল বারিরাশি এবং উর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। এখান হইতেই আমাদের মধ্যে অনেকে সমুদ্র-পীড়াতে (Sea-sickness) কাতর হইয়া পড়িল। আমিও প্রথম ধাক্কা সামলাইতে পারি নাই। একবার বমন হইবার পর শরীর অনেকটা সুস্থ বোধ হইল। ইহার পর আমি আর কখনও ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হই নাই। তাহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, আমি অনবরত জাহাজে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কখনও নিশ্চেষ্ট-ভাবে বসিয়া থাকিতাম না। ৪।৫ বার আহার করিতাম, পাকস্থলী প্রায়ই খালি থাকিত না। দ্বিতীয়তঃ কখনও মাথা ঘোরা বোধ হইলে পাতিলেবুর আঘ্রাণ লইতাম এবং একটু একটু লেহন করিতাম। সমুদ্র যাত্রা করিতে হইলে সকলেরই শেষোক্ত জিনিষটী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া লওয়া উচিত। আমার ধারণা কথিত উপায়দ্বয় অবলম্বন করিলে অনেকে উল্লিখিত পীড়ার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। কারণ সমুদ্রযাত্রীদিগের উল্লিখিত পীড়ায় আক্রান্ত হওয়া একরূপ অনিবার্য্য। হোমিওপ্যাথিক নক্স ভমিকা সেবনে অনেক সময় বেশ উপকার হয়।

সাতদিন পরে নারিকেল-তাল-পরিশোভিত সিঙ্গাপুর দ্বীপ অদূরে নয়নপথে পতিত হইল। সে যে কি মনোরম দৃশ্য তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান কঠিন। সপ্ত দিবারাত্রি নীল জল এবং অসীম নীলাকাশ ব্যতীত অপর কিছুই

চক্ষুর গোচরীভূত হয় নাই। এক্ষণে শ্যামল-বৃক্ষরাজি-পরিশোভিত দ্বীপ দর্শনে হৃদয়ে অননুভূত আনন্দের উদয় হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। সিঙ্গাপুর ছাড়িয়া অনেক উড্ডীয়মান মৎস্য দেখা গেল। মৎস্যগুলি কিঞ্চিদুন অর্দ্ধহস্ত পরিমিত। দেখিতে অনেকটা পঙ্গপালের ন্যায়, রৌদ্র কিরণে ঝিক্‌মিক্ করে। জাহাজের শব্দ পাইয়া সমুদ্র হইতে উঠিয়া এক কি দেড় হস্ত উপর দিয়া উক্ত মৎস্যের ঝাঁক উড়িয়া পনর বিশ হাত তফাতে গিয়া পুনরায় সাগর-গর্ভে লীন হয়। দেখিতে বেশ আনন্দপ্রদ। সমুদ্র হইতে সূর্য্যের উদয়াস্তদৃশ্য অতীব নয়নানন্দদায়ক। দিগন্তপ্রসারিত অম্বুনিধি এবং উত্তুঙ্গ শৈলশ্রেণী দর্শন না করিলে হৃদয়ের প্রশস্ততা বর্দ্ধিত হয় না এবং অসীম ক্ষমতাশীল ভগবানের অনন্ত শক্তিরও আভাস পাওয়া যায় না। এই সকল দৃশ্য দর্শনে মনে স্বতই ভগবৎপ্রেম উদ্রিক্ত হয়। বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর, শ্যাম উপসাগর এবং চীন সাগর পার হইয়া চৌদ্দ দিনে হংকং নগরে পৌঁছিলাম। এই স্থান ইংরাজাধিকৃত উপনিবেশ। সমুদ্রতীরে পর্ব্বতসানুদেশে হংকং নগরী স্থাপিত। দৃশ্য অতি মনোহর—অর্ণবপোত হইতে একখানি ছবির মত দেখায়।

হংকংয়ের সর্ব্বোচ্চ পাহাড় প্রায় ২০০০ ফুট উচ্চ। এই স্থান লেঃ ২২°-১৭′ উত্তর এবং লং ১১৪°-১২′ পূর্ব্ব; উপসাগরের মুখে অবস্থিত। দ্বীপটী আট মাইল লম্বা এবং পরিসর যেখানে খুব বেশি আড়াই মাইল হইবে। সকল সময়েই এখানে স্বাদু পানীয়জল পাওয়া যায়। ইহার দৃশ্য অতি সুন্দর। এক দিকে অত্যুচ্চ পাহাড়, অন্য দিকে উপসাগর। পাহাড়ের নিম্নস্থান কতকাংশ বন্ধুর এবং কতকাংশ সমতল, এই স্থানে হংকং সহর। জাহাজ নঙ্গর করিলে প্রাতরাশ সমাপন করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া সহর দেখিতে কূলে অবতরণ করিলাম। জাহাজ তীরে না লাগায় শাম্পান-যোগে তীরে যাইতে হইয়াছিল। শাম্পান ক্ষুদ্র নৌকা, চীন স্ত্রীলোকদ্বারা বাহিত। কচি ছেলেগুলিকে পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া ঐ সকল স্ত্রীলোক আশ্চার্য্যরূপে নৌকা পরিচালনা করিয়া থাকে। কূলে পৌঁছিতে প্রত্যেককে বিশ সেণ্ট করিয়া ভাড়া দিতে হইল। এক সেণ্ট কিঞ্চিদুন এক পয়সা। হংকংয়ের রাস্তাঘাট উঁচুনীচু কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এস্থানের গবর্ণমেণ্ট বোটানিক্যাল উদ্যান দর্শনযোগ্য। আম কাঁঠালের গাছ পর্য্যন্ত দেখিলাম, ফল হয় কি না কেহ বলিতে পারিল না। এই স্থান কলিকাতার সমসূত্রপাতে অবস্থিত, কিন্তু সমুদ্রতীরবর্ত্তী বলিয়া গ্রীষ্মাধিক্য অত উৎকট নয়। বাজারে শাক সব্‌জী, ফলমূল, তরিতরকারি অপর্য্যাপ্ত দেখিলাম, দাম খুব বেশি বলিয়া বোধ হইল না। ভারতের মুদ্রা এখানে চলে না, 'ডলার' মুদ্রার প্রচলন (এক 'ডলার' প্রায় ১৸০ টাকা)। কতকগুলি ভারতীয় মুদ্রা বাটা দিয়া হংকং ব্যাঙ্ক হইতে আমাদিগকে ডলার ভাঙ্গাইতে হইল। এখানে বেতের এবং বাঁশের আসবাব পত্র অতি পরিপাটী এবং যথেষ্ট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যানের মধ্যে "রিক্‌সা" বা টানা গাড়ীর প্রচলন খুবই বেশি। বড়-লোকেরা বেতের "সিডান-চেয়ার" ব্যবহার করে। এই যান আমাদের দেশের পাল্কির মত আরামের, প্রভেদ এই, না শুইয়া ইহাতে শুধু উপবিষ্ট হইয়া যাইতে হয়। রিক্‌সা একজন লোক টানিয়া লইয়া যায়। আমাদের দেশে যুড়ি-গাড়ী থাকা (আজকাল মটর গাড়ী) যেমন বড়মানুষীর চিহ্ন, চীনদেশে ২।১ খানি ষ্টিমার থাকা তদ্রূপ। আমাদের দেশের অধিকাংশ বড়লোক যেমন ভুঁড়ি-সার, কুড়ের বাদ্‌সা, ব্যবসায়বুদ্ধিহীন, তোষামোদপ্রিয় এবং স্থূলবুদ্ধি, চীনের বড়মানুষগুলি ঠিক ইহার বিপরীত। তাহারা পরিশ্রমী, ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান।

এখানে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ জন্য "পিক ট্রাম" আছে। তাহাতে আধিরোহণ এবং অবতরণ বেশ আনন্দপ্রদ। পাহাড়ের উপরে কলঘর। মোটা তার ট্রামের নীচে সংলগ্ন। পাশাপাশি রেলপথ। একখানি ট্রাম যেমন উপরে উঠিতে থাকে অপরখানি নামিয়া আসে। জাহাজ হইতে দেখিয়া বোধ হয় যেন দুইটী বন্য মহিষ পাহাড়ের গা দিয়া উঠিতেছে এবং নামিতেছে। মাঝে ষ্টেশন আছে, ষ্টেসন নিকটবর্ত্তী হইলে ট্রামের এবং কলঘরের ঘণ্টা একই সময়ে বাজিয়া উঠে, তদনুসারে থামান হয়। এই ট্রাম প্রায় ১৫০০ শত ফুট উচ্চে উঠিয়াছে। শিখর দেশে একটী হোটেল, গবর্ণরের বাংলা এবং 'মানমন্দির' আছে। অনেক বড়লোক পাহাড়ের উপর বাংলা তৈয়ারী

করিয়াছে। সান্ধ্যবায়ুসেবনের জন্য অনেকেই তথায় গিয়া থাকে। বসিবার জন্য এক এক স্থানে কাষ্ঠাসন পাতা আছে। শিখরদেশ হইতে হংকং দ্বীপ অতি সুদৃশ্য এবং মনোরম দেখায়। অদূরে জাহাজগুলি ছোট ছোট 'জালি-বোট' বলিয়া মনে হয়। সন্ধ্যা সমাগমে যখন হংকংনগরী আলোকমালায় সজ্জিত হয় জাহাজ হইতে ঐ দৃশ্য বর্ণনাতীত সুন্দর দেখায়। অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ যেন পর্ব্বতগাত্রে ফুটিয়া রহিয়াছে। এই দ্বীপের উত্তর দিকে পর্ব্বতমালা। কতক-গুলি পাহাড় খাড়াভাবে উপসাগর হইতে উঠিয়াছে। দ্বীপের মধ্যভাগ ও দক্ষিণাংশে সহর অবস্থিত। হংকংএ যথেষ্ট লোক নৌকায় বাস করে। ইহার উত্তরপূর্ব্ব সীমার অপর পারে "কউলুন"। এখানে কেল্লা এবং সেনানিবাস আছে। এই স্থানও পর্ব্বতময়। 'ফেরি ষ্টিমার' যাতায়াত করে। কালে যে এই স্থানও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে তাহার বেশ আভাস পাওয়া যায়। ১৮৪০ খ্রীঃ অঃ আফিম লইয়া ইংরাজের সহিত চীনের যে যুদ্ধ হয় তাহার ফলে হংকং দ্বীপ ব্রিটিস-সিংহের করকবলগত হয়। হংকং হইতে ক্যাণ্টন সহর প্রায় একশত মাইল দূরে। প্রত্যহ দুইখানি ষ্টিমার এবং অনেক নৌকা যাতায়াত করে। দক্ষিণ প্রদেশের মধ্যে ক্যাণ্টন একটী বিখ্যাত প্রধান ব্যবসায়ের স্থান এবং সন্ধিবন্দর। স্বনামখ্যাত নদীতীরে অবস্থিত। এখানে অসংখ্য লোক নৌকার উপর বাস করিয়া থাকে। অনে-কের অনুমান, স্থলে ইহাদের স্থান সঙ্কুলান হয় না বলিয়া ইহারা নৌকায় বাস করে। আমার বোধ হয় নৌকায় বাস তাহাদের সাতিশয় প্রীতিপ্রদ বলিয়াই ইহারা নদীর উপর আজন্ম অতিবাহিত করে। এই নৌকাচর মানবের সংখ্যা বড় কম নহে, প্রায় পাঁচলক্ষ হইবে। ক্যাণ্টনের লোকসংখ্যা ত্রিশলক্ষের কম নয়, কলিকাতার কিন্তু লোকসংখ্যা দশলক্ষের অধিক নয়। এখান হইতেই চীন সম্রাটের একাধিপত্য আরম্ভ। বিদেশীদিগের কোন কথা এখানে খাটে না। সকলকেই চীনেদেশের আইন মানিয়া চলিতে হয়। ইংলণ্ডের যেমন "ইউনিয়ান জ্যাক"-অঙ্কিত পতাকা, চীনের তেমনি "ড্রাগন"-আঁকা নিশান। এই "ড্রাগন" পক্ষযুক্ত কল্পিত একপ্রকার সরীসৃপ। মুখ ব্যাদান করিয়া যেন গিলিতে আসিতেছে। এই অদ্ভুত জীব সম্বন্ধে বারান্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রধান বাণিজ্যস্থান হইলেও ক্যাণ্টনের রাস্তা ঘাটের আদৌ পারিপাট্য নাই। হংকংএর কাছে উহা ঘেঁসিতেই পারে না। বড় বড় চীনে সওদাগরের এখানে কারবার। কতিপয় মসজিদ দেখিলাম। ২।১টী মুসলমানের সহিত পরিচয় হইল, তাহাদিগকে দেখিয়া মুসলমান বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। দোভাষার নিকট শুনিলাম তাহারা মুসলমান, কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদ এবং লম্বা বেণী সকলই এক রক-মের, কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। ২।৪টী পার্সী 'বয়াতের' আবৃত্তি শুনিলাম। সে এক নূতন ভাবের সুর, বেশ মিষ্ট লাগিল। দোকানদারের দোকানের সম্মুখে এক এক খানি লম্বা কাষ্ঠখণ্ড ঝুলান, লম্বাভাবে লেখা। তাহাতে দোকানের তালিকা এবং দোকানদারের সততা এবং সত্যনিষ্ঠা 'মটো' দ্বারা বিশেষভাবে বর্ণিত। ক্যাণ্টনের অপর নাম কুয়াংটুন। চীন-রাজপ্রতিনিধি চাং-চি-টুং এই স্থানে সর্ব্ব প্রথম টাঁকশাল প্রস্তুত করেন।

প্রচণ্ড 'টাইফুন' ঝড়ের জন্য চীন সমুদ্রের ভারি দুর্নাম। টাইফুন, চীন শব্দ 'টাইফেং', প্রবল ঝটিকার নাম। এই ঝড়ের প্রকোপে আমাদের জাহাজ দুই দিন হংকং বন্দর হইতে বাহির হইতে পারে নাই। ঝড়ের লক্ষণ বুঝিয়া বন্দর হইতে 'টাইফুন নিশান' উড়াইয়া জাহাজ-গুলিকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহারা এই ঝড়ের মধ্যে পতিত হয় তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ এবং কখন কখন প্রাণসংশয় হইয়া থাকে।

হংকং ছাড়িয়া পীতসাগর দিয়া 'সাংঘাই' যাইতে হয়। এই স্থানে আগমন-কালে আমাদের জাহাজ তীরে লাগে নাই, চীন হইতে ফিরিবার সময় দেখিবার সুযোগ পাইয়া-ছিলাম। এমন সুন্দর স্থান না দেখিলে চীন দেশ দেখা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। সুতরাং এস্থলে ইহার বর্ণনা দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই স্থান একটী সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। প্রাচ্য দেশের মধ্যে এই স্থান (জাপান ছাড়া) সুন্দরতম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই স্থানের মনোহারিত্বে ইহা 'ক্ষুদ্র লণ্ডন' আখ্যায় পরিচিত। ইয়াংসেকিয়াং নামক স্বনামপ্রসিদ্ধ নদীতীরে

এই নগরী অবস্থিত। ডক এবং চীন সহরের মধ্যস্থলে নদী-পুলিনে ইংরাজ ফরাসী ও আমেরিকান গণ্ডী (concession)। রাস্তাগুলি সুপ্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন, দুই ধার সুসজ্জিত দোকানপাটে পরিপূর্ণ। রাস্তায় একটী পিন পড়িলেও তুলিয়া লইতে কষ্ট হয় না। পৃথিবীস্থ প্রত্যেক জাতিই বাণিজ্যব্যপদেশে এখানে অবস্থিতি করিতেছে। যুদ্ধের এই সময়ে সকল দেশের সৈনিক ও নাবিকের সমাবেশে এই স্থান এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। ইংরাজ, জর্ম্মান, ফরাসী, রুসীয়, ইতালীয়, জাপানী, আমেরিকান সকলেই যেন এক সূত্রে গ্রথিত, এক উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। অল্পকাল মধ্যে যদি কেহ মানব-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিতে ইচ্ছা করে তাহাকে আমি একবার সাংঘাই দেখিতে অনুরোধ করি।

(ক্রমশঃ)

আশুতোষ রায়।

জীবন-বৈচিত্র্য

বার্দ্ধক্য।

"চাহার্ দর্ব্বেশ্" নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে রুমের বাদশাহ আজাদ্ বখ্ত্ দর্পণে মুখ দেখিতে দেখিতে একদিন একগাছি পাকা চুল দর্শনে মৃত্যুর দূত উপস্থিত ভাবিয়া বিষম শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন। এই গল্পটি নিতান্ত অমূলক নহে। এমন মধ্যবয়স্ক বা প্রৌঢ় ব্যক্তি নাই যাঁহার জীবনে আজাদ্ বখ্তের দশা কিয়ৎ পরিমাণে ঘটে নাই। মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র জরা রাক্ষসীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করে বটে এবং জন্ম-দিন হইতেই তিল তিল করিয়া মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে বটে, কিন্তু শিশুর সুকোমল কপোলে কিম্বা তরুণের নিটোল ললাটে মৃত্যুর পদাঙ্ক সহজে দৃষ্ট হয় না। অতুল বিভবের উচ্ছৃঙ্খল উত্তরাধিকারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হয় না এবং মনেও ভাবে না যে অপব্যয়ে কুবেরের ভাণ্ডারও এক দিন রিক্ত হইতে পারে, সেইরূপ জীবনের নববসন্ত-সমাগমে মানুষ জীবন-ব্যাঙ্কের উপর অবাধে চেক্ কাটিতে থাকে এবং ওভার-ড্রয়িঙ্গের আশঙ্কাকে মনেও স্থান দেয় না। এই রমণীয় ঋতুর প্রভাবে মানুষ অজরামরবৎ অদম্য উদ্যমের সহিত সংসার-ক্ষেত্রে ধাবমান হয় ও অপরিসীম আশার ভিত্তির উপর বিচিত্র কল্পনাপুরী নির্ম্মাণ করিতে থাকে। মনে করে সে বুঝি কালের একাধিপত্যের বহির্ভূত। কিন্তু হায়! একদিন হঠাৎ তাহার এই ভ্রম দূর হয়। হঠাৎ দেখে তাড়ামান বীণার তার ছিঁড়িয়াছে, হঠাৎ অনুভব করে বাহুবল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টির আর সে তীক্ষ্ণতা নাই, পদযুগের আর সে ক্ষিপ্রগতিত্ব নাই, মস্তিষ্কের আর সেরূপ কার্য্যকারিতা নাই, আশার আশুগতিও মন্দীভূত হইয়াছে, জীবনের খরস্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে। সংক্ষেপতঃ সে বার্দ্ধক্যের সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছে। এই পদার্পণ যে একদিনে ঘটে তাহা বলিতেছি না—ইহা নিশ্চয়ই বহুদিন-সাপেক্ষ, কিন্তু ইহার উপলব্ধি অত্যন্ত অতর্কিতভাবে ও সহসা ঘটিয়া থাকে। তাহার কারণ এই, যে, আমরা সচরাচর কর্ম্মক্ষেত্রে নিজশক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করি না, উহার চরমসীমার পরিচয় কেবল নিতান্ত দুরূহ ব্যাপারেই পাওয়া যায়, সুতরাং সামর্থ্যের সমধিক অপচয় না হইলে শনৈঃসঞ্চিত শক্তির লাঘব সহজে ধরা পড়ে না এবং তাহাও কোন বিশেষ-ঘটনা-সাপেক্ষ। আর এক কথা—মানব-প্রকৃতিই এই যে নিজের হীনাবস্থা কেহ সহজে বিশ্বাস বা উপলব্ধি করিতে প্রস্তুত নহে; এরূপ অপ্রীতিকর সত্য অনেক সময়ে আমরা অপরের মুখ হইতে প্রথমে অবগত হই। আমার নিজের জীবনী হইতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। কয়েক বৎসর অতীত হইল আমি একদিন সায়ংকালে লালদীঘির ধারে ট্রামগাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। গাড়ী আসিলে আমি উহাতে উঠিবার জন্য অগ্রসর হইলাম ও চালককে গাড়ী থামাইতে বলিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে অথবা চালকের অনবধানতাবশতঃ গাড়ীর বেগ একেবারে থামিল না, এবং আমারও গাড়ীতে উঠা অসম্ভব হইল। আমার দুরবস্থা দেখিয়া একজন দয়াশীল আরোহী কণ্ডাক্টারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গাড়ী একেবারে বাঁধো, দেখিতেছ না বুড়া মানুষটি উঠিতে পারিতেছে না।" কথাগুলি আমার কর্ণে শেল বিদ্ধ করিল,

এবং কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে আমার হৃদয় বিরাগে ভরিয়া গেল। আমি আজাদ্ বখ্তের ন্যায় সহসা মৃত্যুর ছায়া দেখিতে পাইলাম। এই ঘটনার অল্পদিন পরে আরো কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যদ্দ্বারা নিজের বার্দ্ধক্যকল্পনা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া গেল। এখন বার্দ্ধক্যের বিজয়-পতাকা শিরোদেশে বাঁধিয়া প্রশান্তচিত্তে এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি।

আমরা সম্বৎসরকে ঋতুভেদে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি, কিন্তু সকল ঋতুই একসূত্রে গ্রথিত। একঋতু অপরের রূপান্তর মাত্র। অতি দুরন্ত শীত অতি রমণীয় বসন্তের নিত্য-সন্নিহিত এবং শীতের তুষারবাতে বসন্তের মলয় মারুত অতি প্রচ্ছন্নভাবে বহিতে থাকে। অমাবস্যার মসিময় ক্রোড়ে পূর্ণশশী লুক্কায়িত থাকে। সেইরূপ জীবনের ঋতু পরম্পরাও পরস্পর ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ। শৈশব-যৌবনাদি ক্রমে বার্দ্ধক্যে পরিণত হয়, কিন্তু একেবারে বিলীন হয় না। এইজন্য কবি বলিয়াছেন—"মানুষ বাড়ন্ত শিশু বই আর কিছুই নয়।" এই জন্য বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার তিন-বৎসর-বয়স্ক নাতিটি তাঁহার প্রধান কেলি-সহচর। বৃদ্ধত্বের মুখস হইতে যৌবনও কতবার উঁকিঝুঁকি মারে, কিন্তু কয়জন যুবা তাহা দেখিতে পায়? কোন্ যুবা পলিতকেশ, বিগলিতদশন, লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের নিকট সহানুভূতি পাইবার প্রত্যাশা করে? কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমি একদিন সান্ধ্যসমীরণ সেবন করিবার জন্য এই মহানগরীর কোনও রাজোদ্যানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম উদ্যানের একপ্রান্তে দুইটি যুবক একখানি বেঞ্চে বসিয়া কথোপকথন করিতেছে। আমি তাহাদিগের কথা-বার্ত্তা শুনিবার ঔৎসুক্যে নিকটবর্ত্তী একখানি বেঞ্চে আসীন হইলাম। যাহা শুনিলাম তাহাতে গোপন করিবার বিষয় কিছুই ছিল না। উহাদের মধ্যে একজন, তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে সপরিবারে কলিকাতায় আসিবার সময় কর্দ্দমাক্ত গ্রাম্য পথে কিরূপ গাড়ীবিভ্রাট ঘটিয়াছিল তাহা, সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "চাকরী বাকরীর বাজার দিন দিন যেরূপ মন্দ হইয়া উঠিতেছে তাহাতে মনে হয় বৃথা চাকরীর চেষ্টা না করিয়া একখানা ষ্টেসনারীর দোকান খুলি। গ্ল্যাস-কেস্ কিনিবার প্রয়োজন নাই। দাদার কয়েকটা পুরাতন আলমারি আছে, আপাততঃ তাহাই কাজে লাগাইব।" ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাগুলির কোনও বিশেষত্ব না থাকিলেও কে জানে কেন আমার প্রাণ ঐ যুবকদ্বয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। পূর্ণ সহানুভূতির আবেগে আমি উহাদিগের অধিকৃত বেঞ্চে গিয়া বসিলাম। কিন্তু হায়! সেজের মুখে আবরণী দিবা মাত্র যেমন বাতি নিবিয়া যায়, আমার আগমনে উহাদের গল্পস্রোত তেমনি বন্ধ হইল, এবং "রাত্রি অধিক হইয়াছে, গৃহে চল," বলিয়া উহারা উভয়েই আমাকে একাকী ফেলিয়া চলিয়া গেল। আমিও এই ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিলাম যে ইহারা আমার মাথায় সিরাজগঞ্জের পাটের ক্ষেত দেখিয়া ভয় পাইল, স্বপ্নেও ভাবিল না যে আমার প্রাণ এখনও হামাগুড়ি দিতেছে। এস্থলে আমার একটি গল্প মনে পড়িল। একদা এক ব্রাহ্মণ এক গৃহস্থের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়া রাত্রি যাপন করেন। গতার্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে ব্রাহ্মণের হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলেন এক শুক্লবসনা সুন্দরী (শঙ্খচূর্ণী) মশারির কিয়দংশ ফাঁক করিয়া তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা হারাইবার উপক্রম হইল। তদ্দর্শনে সুন্দরী হী হী করিয়া হাস্য করিল ও এই বলিয়া চলিয়া গেল—"ভয় পেলে বাপু?"

একজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বলেন যে যৌবনই মনুষ্যের স্বাভাবিক ও নিত্য অবস্থা; যৌবনের বহ্নি বার্দ্ধক্যের ভস্ম দ্বারা কেবল ঢাকা থাকে মাত্র। এই সত্যটির পূর্ণ পরিচয় প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্রের জীবনে পাওয়া যায়। কি এক চির-বিকসিত সৌন্দর্য্যবোধ লইয়া তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, যে, বিশ্বসংসার তাঁহাদের চক্ষে নিত্য নবীন—"নবরে নব নিতুই নব।" তাঁহাদের চির-প্রজ্বলিত উৎসাহানল রোগে, শোকে, দারিদ্র্যে, বার্দ্ধক্যে কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় না। বাস্তবিক উৎসাহশীলতা যেমন যৌবনের একটি প্রধান লক্ষণ, তেমনি উৎসাহহীনতা বার্দ্ধক্যের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। মানুষ উৎসাহভঙ্গে যত বুড়া হয় এমন আর কিছুতেই নয়। মিসরের প্রাচীন রাজ-সমাধির মধ্যে পরচুলা পাওয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীন কালেও চুলে

কলপ লাগাইয়া লোকে বার্দ্ধক্য ঢাকিবার চেষ্টা করিত। বরাহ-মিহির-কৃত বৃহৎ সংহিতাতে কলপ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশেষরূপে বিবৃত আছে। কিন্তু যদি যথার্থ চির-যৌবন লাভ করিতে চাও, তবে কলপ বর্জ্জন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক হৃদয়ে উৎসাহ ও আনন্দ পোষণ কর। আমি এক সদানন্দ বর্ষীয়ান্ মহাপুরুষকে জানিতাম, যিনি আজীবন তরুণের ন্যায় উৎসাহশীল ছিলেন। আরবর্ব্বাসিগণের সংস্কার এই, যে, বালিকার নিশ্বাস সেবন করিলে বৃদ্ধের জীর্ণদেহে বল-সঞ্চার হয়। এ সংস্কার কতদূর সত্য তাহা জানি না। কিন্তু শিশুর সংসর্গ যে বৃদ্ধের পক্ষে বিশেষ হিতকর, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমার তিন বৎসরের নাতিনীর রঙ্গভঙ্গ দেখিয়া আমি অনেক সময়ে বিষণ্ণ চিত্তের প্রফুল্লতা সম্পাদন করি, এবং তাহার সেই ক্ষুদ্র, নিষ্কলঙ্ক প্রাণটি এই বুড়া প্রাণে মিশাইয়া শুষ্ক তরুকে কিশলয়িত ও কুসুম-শোভিত করি। ডাক্তার জনসন্ এই জন্যই প্রাচীন বয়সে তরুণ বন্ধুর বড় সমাদর করিতেন। তিনি বলিতেন যে, তরুণ-সহবাসে আমি আপনাকেও তরুণ বোধ করি। এইরূপে বৃদ্ধবয়সে জীবনের সকল ঋতুর একত্র সমাবেশ ঘটে এবং উহা কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! তিনকুড়ি বৎসরের বোঝা কাঁধে করিয়া বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে কীর্ত্তনাঙ্গনে বালকের ন্যায় আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়া কি অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইয়াছি! লাপ্লাণ্ডের ছয়মাস-ব্যাপিনী রজনী সূর্য্যবিবর্জ্জিতা হইলে কি পরিতাপের বিষয় হইত! নিরানন্দ বার্দ্ধক্য তদধিক ভয়াবহ। অনেকের ধারণা যে যৌবনকালই সুখভোগের সময়। কিন্তু এ সংস্কার ভ্রমাত্মক। জীবনের অপরাহ্নই প্রকৃত সুখের সময়। যৌবনের আবেগ ও চাঞ্চল্য সুখভোগের প্রধান অন্তরায়। তখন সুখ বেগবতী-স্রোতস্বতী-বক্ষে প্রতিবিম্বিত সুধাংশুর ন্যায় শতধা বিভক্ত ও বিচলিত হয়। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে শান্তির ছায়া কোথায় মিলিবে? যুবা প্রেমের উন্মাদনী শক্তি মাত্র অনুভব করে। প্রেমের পবিত্র স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ কেবল জীবনের অপরাহ্নে দেখা দেয়। যুবার সমক্ষে প্রমদা মোহিনী-প্রতিমারূপে প্রতিভাত হয়। নারীর দেবীমূর্ত্তি দর্শন কেবল সংযমী মধ্যবয়স্কের ভাগ্যে ঘটে। ফলকথা এই, যে, প্রকৃত সুখভোগ করিতে গেলে তরুণকে প্রৌঢ়ের নিকট সংযম শিখিতে হইবে, এবং প্রৌঢ়কে তরুণের নিকট জলন্ত উৎসাহ ও অনুরাগ ধার করিতে হইবে। জীবন-মহাকাব্যের প্রত্যেক সর্গের মধ্যে এক একটি বিশেষ গুণ নিহিত থাকা আবশ্যক—যথা শৈশবে প্রসাদগুণ, যৌবনে ওজোগুণ, প্রৌঢ় বয়সে গাম্ভীর্য্য, বার্দ্ধক্যে শান্তি। এই সকল গুণের সমাহারে সমগ্র জীবন-কাব্যের সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হয়। দ্রাক্ষালতার ফল পাকিলে পাতা শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে। যৌবনান্তে যেমন শারীরিক সৌন্দর্য্য ও শক্তির হ্রাস হইতে থাকে সেই সঙ্গে যদি প্রবীণোচিত জ্ঞান ও চরিত্রোৎকর্ষতা লাভ করিতে পারি তাহা হইলে যৌবন হারাইয়াছি বলিয়া কেন দুঃখ করিব? বেগবতী নদী যেমন এক কূল ভাঙ্গে ও অপর কূল গড়ে, সেইরূপ কাল-তস্কর এক হস্তে যাহা অপহরণ করে অপর হস্তে তাহার ক্ষতিপূরণ করে। যৌবনের উদ্দাম প্রেম হারাইয়াছি বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ পারিবারিক প্রেমের কত উৎস চারিদিকে উৎসারিত হইয়াছে। প্রৌঢ় ঠাকুরদাদার নাতি নাতিনী লইয়া আমোদ যৌবনে কবে সম্ভোগ করিয়াছিলাম? নিজের সামর্থ্য পরিমাণ করিতে শিখিয়াছি। যৌবনে কত অসম্ভব আশা পোষণ করিতাম ও তজ্জন্য কতবার নৈরাশ্য-সাগরে নিমগ্ন হইতাম! এখন নিজের ওজন বুঝিয়া চলি। যে-সকল বিষয়ে ভগ্নমনোরথ হইয়া জীবন বিফল হইল বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছি, জীবনাচলের শিখরে উঠিয়া তাহাদিগকে কত অকিঞ্চিৎকর, কত ক্ষুদ্র দেখিতেছি! কত অভিসম্পাত এখন বর বলিয়া বোধ হইতেছে! একই বস্তুকে মানুষ বিভিন্ন বয়সে কত বিভিন্ন চক্ষে দেখে! যৌবনে যে বস্তুকে কুৎসিত ও অপ্রীতিকর ভাবিতাম, এখন তাহার ভিতরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হই। যৌবনের ঔদ্ধত্যে লোকের দোষগুণ প্রশান্তভাবে বিচার করিতে পারিতাম না। লঘুপাপে গুরুদণ্ড বিধান করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিতাম না। সংসারে বারম্বার টোল খাইয়া ও ঠেকিয়া শিখিয়া এখন মানুষের দুর্ব্বলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে ও ক্ষমা করিতে শিখিয়াছি। মহাযাত্রার চরমমঞ্জিলের যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছি ততই সহযাত্রীদিগের প্রতি সহানুভূতি বাড়িতেছে। প্রৌঢ় বয়সে রিপুগণ নিস্তেজ হইয়া আসে। সিসিরো প্রৌঢ় বয়সের গুণকীর্ত্তনে বিশেষ

করিয়া বলিয়াছেন যে এই বয়সে মানুষ দুরন্ত কামরিপুর অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করে। ইহা যে কত বড় লাভ তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। প্রৌঢ় বয়সে মানুষের ধীশক্তির পূর্ণ-বিকাশ হয় ইহা বলা বাহুল্য। একজন সুলেখক বলেন যে কোনও গ্রন্থকারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ প্রায় লেখকের জীবনের শেষ সপ্তদশবর্ষের মধ্যে প্রকাশিত হয়

শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একজন ইংরাজ পণ্ডিত বলেন, যে, পঞ্চাশৎবর্ষ অতিক্রম করিবার পর মানুষ যে দিন ভাল থাকে তাহার সেই দিনই ভাল। আমাদের দেশের লোকে পঞ্চাশ পার হইলে বৃদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। নানা কারণে এ দেশের স্থবিরেরা শীঘ্রই স্বাস্থ্য-সুখে বঞ্চিত হন। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অধুনা যেরূপ অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় না যে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে বৃদ্ধের অবস্থা তরুণের অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়। বরং অনেক বৃদ্ধকে যত্নপূর্ব্বক স্বাস্থ্য-নিয়ম পালন করিয়া দীর্ঘজীবী হইতে দেখিয়াছি।

শরদাগমে গঙ্গায় মরালমালার ন্যায় বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তদুপযোগী সদ্‌গুণসমূহ আপনা হইতে উদয় হইবে এ বিশ্বাস ভিত্তিহীন। জ্ঞান ও চরিত্রের উন্নতি পূর্ব্ববয়সের সাধনা-সাপেক্ষ। চুল পাকিলেই বুদ্ধি পাকে না।

কয়েক বৎসর অতীত হইল আমি এক বন্ধুর সহিত জলপথে মুর্শিদাবাদে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিবার সময় আমরা আজিমগঞ্জ ষ্টেশন হইতে রেলগাড়ীর আশ্রয় গ্রহণ করি। আমাদের কম্পার্ট্‌মেণ্টের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কম্পার্ট্‌মেণ্ট্ মুর্শিদাবাদ জেলার এক সম্ভ্রান্ত বিপ্র পরিবার অধিকার করেন। তাঁহাদের সঙ্গে বিস্তর লটবহর ছিল। অসংখ্য আম-সত্ত্বের হাঁড়ী ও আম্রের চারা একে একে গাড়ীর ভিতর সাজাইতে অনেক সময় লাগিল। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে এমন সময়ে প্ল্যাটফর্ম্মের অনতিদূরে একখানি শিবিকা দেখা গেল। বাহকেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পঁহুছিবা মাত্র গাড়ী ছাড়িল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরবর্ত্তী কক্ষ হইতে বামাকণ্ঠোত্থিত করুণ আর্ত্তনাদ শুনা গেল। দয়ালু ষ্টেশন্-মাষ্টার (একজন মধ্যবয়স্ক হিন্দু) তৎক্ষণাৎ নিজের দায়িত্বে গার্ডকে গাড়ী থামাইতে ইঙ্গিত করিলেন। গাড়ী থামিলে জানা গেল যে শিবিকায় একটি শিশু ছিল। সে যে পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহা আমাদের সহযাত্রী বিপ্রপরিবারের পলিতকেশ তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় জিনিষপত্র গুছাইতে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত লক্ষ্য করেন নাই। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে শিশুর জননী সন্তানকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন। শিশুটি মাতার ক্রোড়স্থ হইলে ষ্টেশন্-মাষ্টার পুনর্ব্বার গাড়ী ছাড়িবার অনুমতি দিলেন এবং প্রাগুক্ত তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়কে বলিলেন, "আপনার চুল পাকিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে নাই।"

কোনও পরিহাসরসিক পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি কখনও সাবালগ হইব না। একজন ইংরাজ কবি বলেন, "যে ব্যক্তি চল্লিশবৎসর বয়সেও নির্ব্বোধ থাকে সেই যথার্থ নির্ব্বোধ।" বাস্তবিক এক এক জন লোক চির-জীবন নাবালগ থাকে। বার্দ্ধক্য তাহাদের মাথার কেবল উপরিভাগে চুণকাম করে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। তুষারমণ্ডিত গিরি-শৃঙ্গ উচ্চতার পরিচায়ক বলিয়া তুষার-ধবল মানব-মস্তক সকল সময়ে উন্নত-চিত্ততার পরিচয় দেয় না। এক একজন লঘুচেতা এত অসার-আমোদপ্রিয় যে বৃদ্ধবয়সেও তরুণোচিত বেশভূষা করিয়া যৌবনসুলভ ইন্দ্রিয়সুখে রত থাকে। তাহাদের এরূপ বিসদৃশ আচরণ যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডণীয় তাহা তাহারা ভুলিয়া যায়। সংস্কৃত কবি এই শ্রেণীর একজনের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, যে, "চুল পাকিয়াছে দাঁত পড়িয়াছে বলিয়া একবারও দুঃখ করি না, কিন্তু হরিণ লোচনারা যে আমাকে তাত-সম্ভাষণ করে ইহাই আমার পক্ষে কুঠারাঘাত।" এক-জন সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত বলেন, "কিরূপে বৃদ্ধ হইতে হয় ইহা যিনি জানেন তিনি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠার পরিচয় দেন।" বস্তুতঃ মানুষ সংসারে ডুবিয়া থাকিতে এত ভালবাসে, যে, চরম দশা উপস্থিত হইয়াছে, এখন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইতে হইবে, এ জ্ঞান তাহার জন্মিয়াও জন্মায় না। চির-অভ্যস্ত অভিনয়-মদে মত্ত হইয়া রঙ্গমঞ্চ ছাড়িতে চায় না। শেষে দর্শকবৃন্দ বিরক্ত হইয়া বলে, এই বুড়াটা সরিয়া পড়ুক না, আর কেন? যখন দেখি মৃত্যু অপরের কপালে

খানা কাটিয়া সাজ্ঘাতিক আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে তখন মনে হয় না যে আমারও ঐ দশা উপস্থিত। জীবনের ভোজে সুক্তা, শাকের ঘণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া পায়স, পিষ্টক পর্য্যন্ত নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য উদর পুরিয়া খাইয়াও ভোজন-প্রাঙ্গনে গড়িমাসি করি। একি বিষম কুহক! সুবিখ্যাত সম্রাট্ পঞ্চম চার্লসের একজন উচ্চপদস্থ প্রিয় সেনা-নায়ক কর্ম্ম হইতে অবসর প্রার্থনা করাতে সম্রাট্ সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াও কেন আমাকে পরিত্যাগ করিতে চাও?" তাহাতে ঐ বীরপুরুষ উত্তর দেন, "মহারাজ! আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, কিন্তু আমি যুদ্ধকরণ ও মরণ এই দু'য়ের মধ্যে কিয়ৎকালের ব্যবধান থাকা আবশ্যক মনে করি।"

প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার্ তাঁহার আত্মচরিতের এক স্থানে লিখিয়াছেন, যে, জীবন কর্ম্মের জন্য নহে, কর্ম্ম জীবনের জন্য। কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া আমরা অনেক সময়ে এই অমূল্য সত্যটি ভুলিয়া যাই। একজন মানব-চরিত্রবেত্তা ঠিক বলিয়াছেন, যে, মানুষ কিরূপে ভবিষ্যতে জীবন যাপন করিবে চিরদিন তাহারই বন্দোবস্ত করে, কিন্তু বর্ত্তমান কোনও কালে জীবনের দিকে লক্ষ্য করে না। চিরকালই যদি কাজ করিবে তবে জীবন ভোগ করিবে কবে? অনেক কর্ম্মগত-প্রাণ লোকে বলিয়া থাকেন তাঁহাদের মরিবারও অবকাশ নাই। কিন্তু মরণ ত কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন দিন থাকিতে আত্ম-চিন্তা ও আত্মোৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। যবনিকা পতনের পূর্ব্বে জীবন-নাট্যের শেষাঙ্কে যাহা করণীয় তাহা সমাপ্ত না করিলে নাটক অঙ্গহীন হইবে। অনেক চলা ফেরা করিয়াছ, এখন কিছুদিন স্থির হইয়া বসিয়া "স্থবির" নামের সার্থকতা কর। পালভরে পূরা-বোঝাই জাহাজ এতদিন চালাইয়াছ; এখন ঝড় আসিবার পূর্ব্বে পাল খাটো করিতে হইবে, কতক বোঝাই জলে ফেলিয়া দিয়া ভার কমাইতে হইবে, নতুবা জাহাজ ত্বরায় ডুবিবে। এখন বহির্দৃষ্টিকে অন্তর্দৃষ্টিতে পরিণত কর। এখন আর দূরদেশে ভ্রমণ চলিবে না; দেখিতেছ না অন্তঃকরণের কোমল বৃত্তিগুলিও দূরে যাইতে শ্রান্তিবোধ করে এবং ক্রমেই ... জনের অভিমুখে অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে। দয়া দাক্ষিণ্য ক্রমেই বাড়িতেছে ও হৃদয়কে সুপক্ক রসালের ন্যায় মধুর ও কোমল করিয়া তুলিতেছে। ভগ্ন কুটীরের ছিদ্রবহুল চালের ভিতর দিয়া যেমন চাঁদের আলো প্রবেশ করে, সেইরূপ বার্দ্ধক্য-বিপাটিত মনের ফাটাল দিয়া নূতন নূতন সত্য উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। আর কাল-বিলম্ব করিলে চলিবে না। এখন মনে যে-কোনও সৎসঙ্কল্পের উদয় হয় তাহা অচিরাৎ কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে কাল নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাহার ব্যাঘাত ঘটাইবে। বর্ষে বর্ষে কাল আমাদের কি না চুরি করে? অবশেষে আমরা নিজেই অপহৃত হই। দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সকলেই চায়, অথচ বৃদ্ধ হইতে কেহই রাজি নহে; কারণ, "বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা" কেবল কবি-কল্পিত ওষধি-প্রস্থেই সম্ভব। জগদীশপুরের বিদ্রোহী রাজপুত জমিদার কুমার সিংহ সত্তর বৎসর বয়সেও বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং বীরের ন্যায় রণক্ষেত্রে ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু কে বলিবে তাঁহার যৌবনের বলবীর্য্য বৃদ্ধবয়সে অক্ষুণ্ণ ছিল? এই মরজগতে জরা বার্দ্ধক্যের নিত্যসহচরী; তবে শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্যভেদে জরা-জনিত ক্ষয়ের তারতম্য ঘটে মাত্র। এক হিসাবে বৃদ্ধ হওয়া অপেক্ষা মরা সহজ। মৃত্যু-যন্ত্রণা যতই ভয়ঙ্কর হউক না কেন, মৃত্যু একবার বই দুইবার হয় না। কিন্তু জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের পলে পলে ও তিলে তিলে মরণ। মৃত্যু-ঋণের কিস্তিবন্দী নাই। মৃত্যু এক কোপেই কর্ম্মশেষ করে। কিন্তু জরার অসংখ্য কিস্তি। জরার অগণিত ছোট ছোট কোপে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ। অত্যাচারী ভূস্বামীর ন্যায় জরার দাবীর ইয়ত্তা নাই; কর-বৃদ্ধি হাজা শুকা মানে না। মগ্নপোত-নাবিক যেমন সমুদ্রগর্ভোত্থিত গণ্ডশৈলে আশ্রয়লাভ করিয়া ভীতি-বিহ্বলচিত্তে দেখিতে থাকে যে উত্তাল তরঙ্গমালা ক্রমে শৈলের পাদদেশ হইতে শিখরাভিমুখী হইতেছে এবং সে যতই কেন স্থান পরিবর্ত্তন করুক না তাহাকে অচিরাৎ জলমগ্ন হইতে হইবে, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের ঠিক সেই দশা। তাঁহাকে প্রতিদিন অভিনব ত্যাগস্বীকারের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, প্রতিদিন নিজ শক্তির আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য নূতন করিয়া ঠিক করিতে হইবে। পূর্ব্বে প্রত্যহ এক

ক্রোশ বেড়াইতাম, এখন অর্দ্ধক্রোশের অধিক পথ চলিতে শ্রান্তিবোধ করি; কিছুকাল পরে ইহাও সাধ্যাতীত হইবে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে বৃদ্ধবয়সে এমন কতকগুলি অভ্যাস ক্রমশঃ সংগঠিত হয়, যাহার সাহায্যে মানুষ জরা-জনিত দৌর্ব্বল্যসত্ত্বেও কলের পুত্তলির ন্যায় দৈনিক নিত্য-কর্ম্ম কথঞ্চিৎ সমাধা করিতে সক্ষম হয়; নূতন কিছু করিতে হইলেই বিপদে পড়ে। অভ্যাস-নির্ম্মিত পথ দিয়া চলা অপেক্ষাকৃত সহজ; নূতন পথ খুলিতে গেলে অধিক সামর্থ্যের প্রয়োজন। গুটিপোকা যেমন গুটির ভিতর নিরাপদে থাকে, সেইরূপ অভ্যাসগুটির আশ্রয়ে বৃদ্ধও কতকটা নিশ্চিন্ত হয়। এতদ্ভিন্ন চসমা প্রভৃতি নানাবিধ কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বিশেষের দৌর্ব্বল্য কিয়ৎ-পরিমাণে দূর করা যায়। আর্থিক সচ্ছলতাও বৃদ্ধের পক্ষে এক প্রকার লুপ্তযৌবনাবশেষ বলিলে বলা যায়। যৌবনে মানুষ সমধিক কষ্টসহিষ্ণু থাকে। যৌবনমদে মত্ত হইয়া মানুষ কোনও কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ করে না। কিন্তু নিস্তেজ বৃদ্ধদেহ কোনও প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে একেবারে অস-মর্থ। অর্থদ্বারা অশেষবিধ কষ্টের লাঘব হয়। অতএব বৃদ্ধবয়সে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। সুখপাচ্য অথচ পুষ্টি-কর আহার, সুকোমল দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যা, শীতগ্রীষ্মোপ-যোগী পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ, যত্নশীল পরিচারক, রোগনাশক ও বলকারক নানাবিধ ঔষধপত্র এবং বিশুদ্ধবায়ু-সেবনার্থ যানাদি-ভ্রমণসৌকর্য্য বৃদ্ধবয়সে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। বলা বাহুল্য যে এই উপায়-গুলি সকলেই অর্থ-সাপেক্ষ। সুতরাং আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধের শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রতিবিধানের অন্যতম মুখ্য হেতু বা উপায়। কিন্তু হায়! বার্দ্ধক্যের আনুষঙ্গিক অনিষ্ট কেবল দৈহিক দৌর্ব্বল্যে পর্য্যবসিত হয় না। মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধকে কত মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যখনই দেখে যে—

"ভূতরূপ সিন্ধুজলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ,————"

তখনই তাহার মনে কত মৃত আত্মীয় বন্ধুর জন্য শোকসিন্ধু উদ্বেলিত হয়! জীবনের সেই হাস্যময়, মধুময় প্রভাত স্মৃতিপথে উদয় হয়, যখন সে সংসারের সকল বস্তুই সোনার চক্ষে দেখিত, যখন তাহার মস্তকের উপর স্নেহের অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইত। যাহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে ভাল বাসিতে শিখিয়াছিল, তাহাদিগকেই সর্ব্বপ্রথমে হারাইয়াছে। কোথায় সেই পরমারাধ্য পিতৃদেব? মমতা ও করুণার অনন্ত প্রস্রবণ সেই জননীই বা কোথায়? কোথায় সেই সরলপ্রাণ, প্রাণপ্রতিম শৈশব-সহচরগণ? যৌবনের উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে যৌবন-সুহৃদগণও প্রায় সকলেই একে একে অন্তর্হিত হইয়াছে। বৃদ্ধের সুবিচারের জন্য তাহার সমসাময়িক "জুরি" মিলা ভার। যাহারা তাহাকে চিনিত ও সমাদর করিত তাহারা প্রায় সকলেই কাল-কবলিত। বৃদ্ধ যেখানে যায় সেইখানেই দেখে সে এক নূতন রাজ্যে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কোনও পরিচিত মুখ দেখিতে পায় না। সংসার তাহার চক্ষে এক মহাশ্মশান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে সকল বাটীতে সে এককালে বন্ধুসহবাসে কত আমোদ উপভোগ করিয়াছে, সে সকল বাটী এখন তাহার পক্ষে এক প্রকার "হানা বাড়ী"—কেবল পূর্ব্বস্মৃতির সমাধি-মন্দির। এখন বৃদ্ধের শীর্ণ কণ্ঠে যশের মন্দার-মালা দোলাইলেই বা তাহার কি লাভ? যাহারা তাহার সুখে সুখী হইত, তাহার দুঃখে দুঃখ বোধ করিত, তাহারা ত চলিয়া গিয়াছে। মশালের আলোকে ভগ্ন-প্রাসাদের সৌন্দর্য্যাবশেষ দেখিলে মনে যেমন যুগপৎ শোক ও হর্ষের আবির্ভাব হয় সেইরূপ অতীত সুখস্মৃতি বৃদ্ধের মনে এক কালে হর্ষ ও বিষাদ আনিয়া দেয়। তাহার মনে হয় সে যেন এক নির্ব্বাণদীপ নিবৃত্তোৎসব বিশাল নাট্য-মন্দিরে একাকী দাঁড়াইয়া আছে। কালের খরস্রোতে বর্ষে বর্ষে তাহাকে কত আত্মীয়ের পর আত্মীয় ও বন্ধুর পর বন্ধু বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে। যাহাদিগকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসিত তাহাদের প্রত্যেকের বিয়োগে হৃদয়ের এক একটি তন্তু ছিঁড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ছিন্ন তন্তুর সহিত বিজড়িত ভালবাসা ত যাইবার নহে। কৃপণের ধনের ন্যায় বৃদ্ধ এখন অহরহ সেই ভালবাসা অতি সন্তর্পণের সহিত নাড়াচাড়া করিয়া দিনপাত করে। মৃত্যুর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়িতেছে। মৃত্যুর স্মরণে হৃৎকম্প উপস্থিত হওয়া দূরে থাকুক, সংসার-গারদের এই দীর্ঘ-মেয়াদী কয়েদীটি এখন খালাসের আশায় সতৃষ্ণ চিত্তে

বন্ধু ভাবিয়া বার বার ডাকে। শিশির-সিক্ত বৃক্ষ-পত্রে যেমন ক্রমে পচ্ ধরে এবং অবশেষে তাহা বিনায়াসে ঝরিয়া পড়ে, সেইরূপ শোকের পচ্ ধরিলে মানুষের জীবনের প্রতি আস্থা ক্রমে প্রাতঃকালের কুন্দকুসুমের ন্যায় শিথিল হইয়া পড়ে, এবং সে অনায়াসে মৃত্যুর শরণাপন্ন হয়। বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে এই খানেই ইতি করিলাম।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা *

ভারতবর্ষ জটিল সমস্যার দেশ। এদেশ নানা ধর্ম্মের ও নানা জাতির দেশ। এখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জল বায়ুর ভিন্নতা মানুষের শরীর বুদ্ধি ও প্রকৃতির উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বস্তুত এখানে এক সমাজের সহিত অন্য সমাজের পার্থক্য যে অত্যন্ত প্রবল, এখানকার জল বায়ু অনেক পরিমাণে সে জন্য দায়ী। পুরাকাল হইতেই অনৈক্য ভারতবর্ষের কালস্বরূপ হইয়াছে। এখানকার মাটীতে ভেদবুদ্ধি যেন সহজেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। উহা এ দেশের একটি চিরস্থায়ী ব্যাধির মত। এই অনৈক্যই ভারতকে শত্রুর পদানত করিয়াছে। মুসলমানেরা সমগ্র ভারতবর্ষ একেবারে জয় করে নাই, খণ্ড খণ্ড করিয়া জিতিয়া লইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঘরোয়া বিবাদ বাধাইয়া এক পক্ষের সাহায্যে অন্য পক্ষকে পরাস্ত করিয়াছে।

কিন্তু তখনও হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার উদয় হয় নাই। ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর দেশে যখন শান্তি স্থাপিত হইল তখনই এই সমস্যাটি কণ্টকিত হইয়া উঠিল। যখন মিউটিনি চুকিয়া গেল তখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কে এই বিপ্লবের প্রধান হেতু সেই বাদ প্রতিবাদের সংঘর্ষেই হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ সর্ব্ব প্রথম বাহিরে, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিল। কেবল যে হিন্দু মুসলমান পরস্পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতেছিল তাহা নহে, অনেক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানও ইহাদের কোনো না কোনো দলের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল।

মোগল সাম্রাজ্যের শেষাবস্থায় দিল্লির দুর্ব্বল শাসন-কর্ত্তাদের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য প্রবল হইয়া উঠিল। অবশেষে যখন অদৃষ্টের ফেরে ইংরাজ আসিয়া বিজেতা বিজিতকে সমক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়া দিল তখন তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটি বিচ্ছেদের ভাব ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। উভয়েরই মন অশান্ত হইয়া উঠিল; হিন্দু মুসলমান উভয়েই অনুভব করিতে লাগিল যে আর ভ্রাতৃভাব রক্ষা করা চলে না। মুসলমান-শাসন-কালীন কল্পিত ও সত্য দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধস্পৃহা সময় পাইয়া হিন্দুর মনে আগুনের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল এবং দশাবিপর্য্যয়ে মুসলমানকে আজ হিন্দুর সহিত সমান ক্ষেত্রে নামিতে হইল এই চিত্তদাহ মুসলমানকে অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু হিন্দুরা তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রাখর্য্য-বশত বুঝিল যে রাষ্ট্রচালনার মধ্যে অধিকার লাভ করিতে হইলে নূতন যুগের জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে এবং তাহারা সেই সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মুসলমানগণ তাহাদের হৃত সম্পদ ফিরিয়া পাইবার জন্য অবজ্ঞাভরে কোন উপায় অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিল না। হিন্দুরা কালের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল আর মুসলমানগণ কেবলই পিছাইয়া পড়িল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যে দু একজন মুসলমান তাঁহাদের স্বজাতির ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারা মুসলমান সমাজকে ঠিক পথে লইয়া যাইতে পারিলেন না। সমস্ত মুসলমান সমাজের ন্যায় তাহার নেতারাও অন্ধ ছিলেন। পূর্ব্বকালীন অধীনস্থ হিন্দু জাতির সহিত এক ক্ষেত্রে একাসনে স্থাপিত হইবার ক্ষোভ লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা ব্রিটিশ রাজপুরুষদের দলে ভিড়িয়া তাঁহাদের সহিত একত্রে হিন্দুদিগকে শাসন করিবার মিথ্যা আশাতে স্বজাতিকে ভুলাইতেছিলেন। এই পলিসিটি নিতান্তই হীনতা ও সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক ও শিশুজনোচিত হাস্যকর ব্যাপার। এই পলিসি ও আইডিয়া লইয়া বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তি এবং সমাজের একটি সঙ্কীর্ণ অংশ খুব নামজাদা হইয়া উঠিতেছিল বটে কিন্তু তাহা সমস্ত জাতিকে তাহার উচিত পথ হইতে ভ্রষ্ট এবং

* ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের ইণ্ডিয়ান রিভিয়ুতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত মুশীর হোসেন কিদবাই লিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

সার্ব্বজনীন স্বার্থকে আঘাত করিতেছিল। ইঁহাদের মৎলব মন্দ ছিল এ কথা বলিলে অন্যায় করা হইবে কিন্তু ইহা নিশ্চিত সত্য যে প্রাচীন মুসলমান নেতাদের পলিসি বশতই হিন্দু-মুসলমান-সমস্যাটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং উহাই মুসলমান সমাজের লক্ষ্যকে অপর উন্নতিশীল সমাজের সম্পূর্ণ উল্টাদিকে ফিরাইয়া দিয়া বিষম জঞ্জাল ঘটাইয়াছে। ভারতবর্ষের মুসলমানগণ সাধারণতান্ত্রিক মহান্ ইসলাম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী-ভাব ধারণ করিল; তাহারা প্রবল পক্ষের মন যোগাইবার কাজে লাগিয়া গেল। এইরূপে দুই সমাজের আদর্শ যখন ভিন্ন দিকে গেল তখন উভয়ের বিচ্ছেদ একেবারে সম্পূর্ণ হইল। কেহ কেহ বলেন যে অদূরদর্শিতার ফলে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতাগণ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিচ্ছেদকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছেন আমাদের কোন কোন রাজপুরুষ ইহাকেই রাজ্য চালনার পক্ষে একটি মহাস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। মুসলমানগণ এই সকল রাষ্ট্রচালকের হাতে ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া দাঁড়াইলেন এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কাছে সমস্ত জাতির স্বার্থকে বলি দিলেন। কিন্তু হিন্দুদিগকেও অপরাধী না করিয়া থাকা যায় না। ভারতবর্ষে এমন অল্পই হিন্দু আছেন যাঁহারা মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া বিশ্ব-হিন্দু আধিপত্যকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে না চাহেন। উর্দ্দু হিন্দি ভাষা লইয়া বিরোধ ও গোহত্যা ইত্যাদি ব্যাপার লইয়া যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল তাহা কেবল অন্তর্গূঢ় বহ্নির বাহ্য-ধূমবিস্তার। যদিচ হিন্দুরা বলে যে জাতীয় স্বার্থের প্রতি তাহাদের লক্ষ্য স্থির আছে, যদিচ তাহারা উচ্চস্বরে জানাইয়া আসিতেছে যে সমস্ত ভারতের ঐক্যই তাহাদের প্রার্থনার বিষয়, ও যদিচ তাহারা অধিকতর শিক্ষিত ও সেইজন্য মহাজাতি বন্ধনের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাহারা অধিকতর সচেতন, যদিচ তাহাদের সংখ্যা অধিক, ক্ষমতা অধিক এবং তাহারা সভাসমিতির দ্বারা ব্যূহবদ্ধ ও সেইজন্যই তাহাদের পক্ষে কথঞ্চিৎ ত্যাগস্বীকার সহজসাধ্য হওয়া উচিত, তথাপি তাহারা এই অল্পসংখ্যক মুসলমানদের প্রতি কোনোকালেই বদান্যতা প্রকাশ করে নাই ও তাহারা মুসলমান সমাজের বিশ্বাস আকর্ষণ করিবার জন্য সামান্যই চেষ্টা করিয়াছে। অপর পক্ষে সমস্ত পাব্‌লিক বিষয়ে হিন্দুদের নিজের দিকেই টানিয়া চলিবার চেষ্টা দেখিয়া পার্থক্যবাদী মুসলমানদলের একথা বলিবার জোর হইয়াছে যে হিন্দুরা রাষ্ট্রব্যাপারে প্রবল হইয়া উঠিলে সে দিকে মুসলমানের প্রভাব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু মুসলমান উভয়ে বিচ্ছিন্ন এবং উভয়েই একথা ভুলিয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত না মাতৃভূমির সুসন্তান হইয়া তাহারা জন্মভূমির নিকট নিজের স্বার্থ, এমন কি, প্রয়োজন হইলে নিজ সমাজের স্বার্থও বলি দিবার জন্য উভয়ে সম্মিলিত চেষ্টায় ব্রতী হইবে সে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও ইহার সন্তানগণ কদাচ পৃথিবীর অগ্রগামী দেশ ও জাতি সকলের মহাদরবারে সম্মানের আসন গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবে না।

শ্রীঅতসী দেবী।

ভারতবর্ষীয় মুসলমান-সমাজে হিন্দুয়ানীর মিশ্রণ*

মুসলমানধর্ম্মপ্রধান দেশগুলিতে মুসলমানধর্ম্মের মূল আদর্শের সহিত প্রচলিত আচার ব্যবহারের যে সকল পার্থক্য ঘটিয়াছে সেই সম্বন্ধে সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া আলোচনা করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

সাইবিরিয়া, আলজিরিয়া, ম্যাডাগাস্কার, ডাচ-পূর্ব্ব-ভারত প্রভৃতি মুসলমানপ্রদেশে যে আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে ঐ সকল দেশের পূর্ব্বপ্রচলিত ধর্ম্মের লুপ্তাবশেষ খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। মধ্যএসিয়ার যে সকল প্রদেশে অধিবাসীরা পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল ও পরে মুসলমান হইয়াছে সেইখানে মুসলমান সাধুদিগের ভজন মন্দিরের সহিত স্থানীয় বিশেষ বিশেষ প্রাচীন পীঠস্থানের ঐক্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

ইংরাজশাসিত ভারতে, মুসলমানগণের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মমতের যে সকল স্খলন প্রকাশ পাইয়াছে নিম্নে তাহারই দু চারটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ভারতে মুসলমান-সম্প্রদায় প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, এক এই দেশবাসীদের

* ধর্ম্মইতিহাস আলোচনার আন্তর্জাতিক সভায় পঠিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

মধ্যে যাঁহারা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের বংশীয়গণ, আর, যাঁহারা মুসলমান আক্রমণকারী ও ঔপনিবেশিকদিগের বংশসম্ভূত। তের শতাব্দী ধরিয়া এই বিদেশীদল নিরবচ্ছিন্নধারায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ইহার জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই শেষোক্ত দলের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। মুসলমানধর্ম্মের মত ও আচার ব্যবহারের বিশুদ্ধতা ইঁহারাই বিশেষভাবে রক্ষা করিয়াছেন। অধিকাংশ মুসলমানধর্ম্মাচার্য্য ও শাস্ত্রবিধিপ্রবর্ত্তকেরা ইঁহাদেরই বংশজাত।

যে সকল মুসলমানপরিবার দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে হিন্দুআচার-ব্যবহার ও রীতি-পদ্ধতি আংশিক ভাবে সংক্রামিত হইতে দেখা গিয়াছে। প্রধানতঃ বর্ণভেদপ্রথা মুসলমানসমাজ-ব্যবস্থায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি জাতিগত পার্থক্যকে মুসলমানগণ প্রায়ই বর্ণভেদ স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। যদিও হিন্দুদিগের ন্যায় এই সকল বিদেশীদলের মধ্যে বর্ণভেদের কঠোরতা সেরূপ প্রবল নহে তথাপি ভারতবর্ষীয় সৈয়দ পরিবারগুলি, ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়, তাহাদের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক এবং তাহাদের সমাজে স্বশ্রেণীর বাহিরে বিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ। বহুকাল হিন্দুদের সহিত একত্র বাস করাতে অনেক আফ্‌গান এতদূর পর্য্যন্ত আপনাদের পূর্ব্বসংস্কার বিস্মৃত হইয়াছে যে তাহারা গোমাংস ভক্ষণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সকল মুসলমানেরা তাহাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের ধর্ম্মসংস্কারও অনেক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছে এমন দৃষ্টান্তও বিস্তর দেখানো যাইতে পারে।

হিন্দুবংশজাত নবদীক্ষিতদিগের মধ্যে যেসকল মুসলমানবিধি-বহির্ভূত আচার অনুষ্ঠান দেখা যায় এ স্থলে বিশেষ ভাবে কেবল সেই গুলিরই কথা বলিতে ইচ্ছা করি। এই নবদীক্ষিতদের মধ্যে কেহ কেহ সম্পূর্ণভাবেই মুসলমানীভূত হইয়া গিয়াছে, নিষ্ঠা ভক্তিতে, এবং শাস্ত্রসঙ্গত বিধি-ব্যবস্থা সকল পালনে কেহই ইহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না। এই সকল উৎসাহিগণ আপনাদের হিন্দু উৎপত্তি গোপন করিয়া প্রাচীন মুসলমান জাতীয়দের সহিত আত্মীয়তা দাবী করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় খ্যাত মুসলমান-ধর্ম্মাচার্য্য ও সমাজের নেতাগণ কেহ কেহ হিন্দুবংশসম্ভূত। নব ধর্ম্মে এরূপ নিষ্ঠা ভক্তি কেবল যে ব্যক্তিবিশেষেই আবদ্ধ তাহা নহে কোন কোন স্থলে এক একটি সমগ্র সমাজের মধ্যে ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। যেমন মালাবারের মাপিল্লাগণ,—মুসলমানধর্ম্ম ও আচার পালনে তাহাদের লেশমাত্র স্খলন নাই। আবার অন্যপক্ষে হিন্দুবংশোদ্ভব মুসলমানদিগের মধ্যে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে যাহারা হিন্দুসমাজের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তাহারা যতই দৃঢ় হউক না কেন, মুসলমানবিধি নিষিদ্ধ হইলেও, তাহাদের পূর্ব্বতন আত্মীয়দের সামাজিক রীতিনীতি পরিত্যাগ করিতে তাহারা এখনও অনিচ্ছুক। পঞ্জাবী মুসলমানগণের মধ্যে ইহার প্রমাণ সুস্পষ্ট। পঞ্জাব যদিও গত সাত শতাব্দী ধরিয়া মুসলমান আক্রমণকারী দলের পথের মুখে পড়িয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর মুসলমানপ্রভাবের অধীনে ছিল, তথাপ বিবাহপ্রথা, উত্তরাধিকারবিধি প্রভৃতি সম্বন্ধে মুসলমান অনুশাসন সেখানে একেবারেই খাটে না। হিন্দুপূর্ব্বপুরুষগণের রীতিনীতিই ইহাদের মধ্যে মুসলমানবিধিব্যবস্থা সকলের স্থান অধিকার করিয়া আছে। মুসলমানব্যবস্থা অনুসারে, পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারে, পুত্রের অংশের অর্দ্ধাংশ কন্যার প্রাপ্য হইলেও, পাঞ্জাবী মুসলমানগণের মধ্যে কোন কোন সমাজে কন্যা কোন অংশই পায় না এবং পুত্রবতী বিধবারও কোন অংশ নাই, এবং সেখানে স্ত্রীধন বলিয়াও কোন কিছু নাই। স্বজাতীয় গণ্ডীর বাহিরে বিবাহ তাহাদের চলে না; তাহাদের হিন্দুভ্রাতাদের পক্ষে যে যে ক্ষেত্রে বিবাহ প্রশস্ত তাহাদের পক্ষেও তদ্রূপ। এইরূপ আরো অন্য অন্য হিন্দুবংশীয় মুসলমানসম্প্রদায়ে হিন্দুবিধিই বলবৎ দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানেও ভগ্নী এবং কন্যাগণ উত্তরাধিকারসূত্রে বঞ্চিত। বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে হিন্দুদের যে সংস্কার আছে ইহারা তাহা অনেকটা মান্য করে এবং সেই কারণেই বাঙ্গালা দেশের এক ষষ্ঠাংশ মুসলমান-বিধবা অবিবাহিত থাকে।

হিন্দুপূর্ব্বপুরুষগণের আচার ব্যবহারের প্রতি একান্ত

নিষ্ঠাবশতঃ ইহারা অনেক সময় মুসলমানসমাজের অনেক মূলগত ব্যবস্থাকেও পরিহার করিয়াছে। আলজিরিয়া, সুমাত্রা প্রভৃতি মুসলমানজগতের আর আর অংশেও, পূর্ব্বতন জাতির রীতিনীতির নিকট মুসলমানবিধিসকল এইরূপ পরাস্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে মুসলমান জাঠ ও রাজপুতদলের মধ্যে সনাতন মুসলমানশাস্ত্রবিধির যে শৈথিল্য দেখা যায় তাহাতে করিয়া এমন সকল স্বজাতীয়ের সহিত তাহাদের যোগ রক্ষিত হইয়াছে যাহাদিগকে মুসলমান প্রভাব স্পর্শ করে নাই এবং যাহারা ভারতে মুসলমান-শাসন বিস্তারে চিরকালই প্রাণপণে বাধা দিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব-পঞ্জাবে, রাজপুত ও গুজার অর্থাৎ জাঠ মুসলমানগণের সহিত তাহাদের স্বজাতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে প্রভেদের মধ্যে কেবল এই দেখা যায় যে, মুসলমানগণ গুম্ফের অগ্রভাগ ছাঁটিয়া ফেলে, নমাজ পড়ে এবং বিবাহের সময় হিন্দু-অনুষ্ঠানের সহিত মুসলমান অনুষ্ঠান-পদ্ধতি যুক্ত করিয়া থাকে। ইহারা বিবাহ ও দায়ভাগে হিন্দুঅনুশাসনই মানিয়া চলে এবং আপন আপন কুলপ্রচলিত চিরাগত সামাজিক রীতিনীতিসকল সম্পূর্ণ বজায় রাখে। অনেক স্থলে, এই জাতীয়-গৌরব-বোধই রাজপুতদিগের ন্যায় উক্ত শ্রেণীর নবদীক্ষিতদিগকে তাহাদের হিন্দু জাত-ভাইদের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইতে দেয় না। তাহারা হিন্দুবীর ও রাজাগণের সন্তান সন্ততি বলিয়া এখনও গর্ব্ব করিয়া থাকে। হিন্দুভাইদিগের সহিত ইহাদের যোগ এতই ঘনিষ্ঠ যে সম্প্রতি উন্নতিশীল আর্য্যসমাজ এই সকল পিতৃধর্ম্মত্যাগী হিন্দুসন্তানগণকে পুনরায় হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে। বহু রাজপুত মুসলমান এক্ষণে হিন্দুদিগের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে স্থান পাওয়ায় মুসলমানধর্ম্মের ক্ষীণতম বন্ধনটুকু ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

জাতিগত ও সমাজগত রীতিনীতিসকলের আলোচনা ছাড়িয়া যখন আমরা ধর্ম্মগত অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন সনাতন-মুসলমান-ধর্ম্মমতের আরো অদ্ভুত স্খলন লক্ষ্যগোচর হয়। বহুতর রাজপুত মুসলমান বিবাহের সময় ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে ও পারিবারিক ক্রিয়াকর্ম্মে মন্ত্র পাঠ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ কুল-পুরোহিত রাখে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে মুসলমান বিবাহে ব্রাহ্মণগণকে আংশিক ভাবে অনুষ্ঠানকার্য্য সম্পন্ন করিতে দেখা যায়। রাজপুতানায় প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণ ও মোল্লাগণ পাশাপাশি বসিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। এবং যেখানে শাস্ত্রশাসন প্রবলতর সেখানে ইহা গুপ্তভাবে সাধিত হয়। কখনো কখনো আরম্ভে হিন্দু-অনুষ্ঠান করিয়া শেষে "নিকা" করা হয়। মধ্য-ভারতের "সিয়োনি" জেলায় পিঞ্জারাগণ প্রথমে হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া পরে "কাজির" সম্মুখে নিকা করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময় কাজিকে গোপন করিয়াই বিবাহের এই অংশ সম্পন্ন করা হয়।

হিন্দুসমাজের নীচজাতি হইতে যাহারা মুসলমান হইয়াছে তাহাদের মধ্যে হিন্দুআচার-অনুষ্ঠানের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক। ইহাদের মধ্যে অতি সামান্যই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহাতে বোধ হয় যে মুসলমানধর্ম্মমত সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা ও উপদেশ তাহারা প্রথম হইতেই পায় নাই। পূর্ব্বপুরুষদিগের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাহারা বিদেশী প্রভাব হইতে সুরক্ষিত রহিয়াছে—এমন কি যে সকল ধর্ম্মনিয়মের প্রভাবে মুসলমানজগতের প্রায় অধিকাংশ স্থলেই ধর্ম্ম সমাজের জীবনযাত্রায় ও চিন্তাপ্রণালীতে ঐক্য সাধিত হইয়াছে এখানে তাহা কোনো কার্য্য করিবার অবকাশ পায় নাই।

প্রধানতঃ বৃত্তিভেদের ভিত্তি আশ্রয় করিয়াই হিন্দুজাতির বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও যে সকল হিন্দু আপনার পূর্ব্ব ব্যবসায় রক্ষা করে হিন্দু-জাত-ভাইদের সহিত তাহাদের অতি সামান্যই প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। পশ্চিমভারতে, হিন্দুবংশীয় মুসলমানগণের বংশোৎপন্ন রাজমিস্ত্রী, মালাকার, কসাই প্রভৃতিরা গোমাংস ভক্ষণ করিতে—এমন কি স্পর্শ করিতেও বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করে এবং তাহারা প্রকাশ্যভাবে হিন্দুদেবদেবীগণের পূজা ও মানত করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দুপরিচ্ছদ পরিধান করে এবং প্রায় মসজিদে যায় না ও আচার অনুষ্ঠান সকলও পালন করে না। যে "ষঠ্‌বাই" দেবী (ষষ্ঠী) জন্মের ষষ্ঠ রাত্রিতে শিশুর ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেন বলিয়া কথিত, তাঁহাকে ইহারা অনেকেই বিশ্বাস করে। ওলাউঠা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহারা "মরিয়াই" অর্থাৎ মৃত্যুদেবীর পূজা দেয়। বর্ষারম্ভে শস্য বপন করিবার সময় ক্ষেত্রাধিষ্ঠাত্রী

"মহাসোগ" দেবীর উদ্দেশে ছাগ মুরগী প্রভৃতি বলি দিয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল লুণ্ঠনকারী দস্যুদলের নামে সমস্ত পশ্চিমভারত ভীত হইত, তাহাদের বংশধর, মুসলমান পিণ্ডারাগণ, বিশেষ ভাবে "আলাম্মা" দেবীর উপাসক। ইহারা এক্ষণে শান্তভাবে ঘাসিয়াড়ার কাজ করিয়া থাকে। পিণ্ডারাগণ "হানাফী" সম্প্রদায়ের সুন্নী শাখা ভুক্ত। বিজাপুর জেলায় "আলাম্মা" দেবীর পূজার জন্য ইহারা একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে। ঐ অঞ্চলের মুসলমান রজকগণ জলদেবতা বরুণের উদ্দেশে মানত করিয়া থাকে। নিম্ন শ্রেণীস্থ সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বসন্তরোগের দেবতা শীতলা দেবীর পূজা সমস্ত ভারতবর্ষময় বিস্তৃত। বিশেষতঃ ইহা স্ত্রীলোকদের মধ্যেই অধিকতর প্রবল। পূর্ব্বপঞ্জাবের গ্রামগুলিতে, মুসলমান রমণীরা শীতলা দেবীর পূজা না দেওয়া পর্য্যন্ত সন্তানের জীবন নিরাপদ জ্ঞান করে না।

বাঙ্গালাদেশেও এমন সকল মুসলমান আছে যাহারা হিন্দুদিগের ন্যায় সূর্য্যের পূজা ও তর্পণ করে। বাঙ্গালী মুসলমান যে সত্যপীরের মানত করে তাহাই হিন্দুর সত্যনারায়ণ। সাঁওতাল পরগণার অনেক মুসলমানকে বৈদ্যনাথের মন্দিরে পূজার জল লইয়া যাইতে দেখা যায় এবং মন্দিরের ভিতরে তাহাদের প্রবেশাধিকার না থাকাতে বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহারা সেই জল ঢালিয়া তর্পণ করে। ধান্য রোপণ অথবা বপন করিবার পূর্ব্বে মুসলমান কৃষকগণও গ্রাম্য দেবতার নিকট পূজা দিয়া থাকে। মুসলমান-ভারতের সর্ব্বত্রই এইরূপ আচরণসকল লক্ষ্য-গোচর হয়। যখন "মিয়ো" মুসলমানেরা কূপ খনন করে তখন প্রথমে তাহারা "ভৈরো" অথবা হনুমানের পূজার জন্য একটী চবুতরা বা মঞ্চ নির্ম্মাণ করে। আসামের কামরূপে সর্পদেবতা বিষহরীর পূজায় মুসলমানগণ প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে। মান্দ্রাজ বিভাগে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান স্ত্রীলোকগণ মানত পূর্ণ হইলে হিন্দুদেবমন্দিরে গিয়া নারিকেল ভাঙ্গিয়া দেয়।

সমাজে সনাতন মুসলমান ভাবের প্রাবল্য ও শৈথিল্য অনুসারে হিন্দুদেবতা ও উপদেবতাগণের পূজা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সাধিত হইয়া থাকে। বেরারে "দেশমুখ" ও "দেশপাণ্ডাগণ" প্রকাশ্যতঃ মুসলমানধর্ম্ম স্বীকার করিয়া পুরাতন ইষ্টদেবতাগুলির পূজার জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে। মুসলমানধর্ম্মমত শিক্ষার কেন্দ্রগুলি হইতে সুদূরবর্ত্তী স্থান সকলে প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান বজায় থাকা সেরূপ আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ইহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয় যে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী "হিসার" জেলায় কোন মুসলমানপাড়ায় একবার একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী সেই গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদিগকে একটী প্রতিমার গাত্রে তেল মাখাইতে ও একজন ব্রাহ্মণকে সেইখানে বসিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে দেখিয়াছিলেন। তাহারা বলিয়াছিল যে সম্প্রতি তাহাদের মোল্লা আসিয়া ঠাকুর দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত রাগ করে ও তাহাদিগকে দিয়া ঠাকুরকে মাটির নীচে পুঁতাইয়া ফেলে। এক্ষণে মোল্লা চলিয়া যাওয়ায়, ঠাকুরের কোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

হিন্দুপর্ব্বগুলিতে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিবার প্রবল ঝোঁক মুসলমানদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া কিছুই আশ্চর্য্য কথা নহে। বোম্বাই বিভাগে "পাখালীরা" (ভিস্তি) দশহরার সময় তাহাদের মোসকবাহী ষাঁড়গুলিকে ফুল দিয়া সাজায়। এবং সবুজ ও হরিদ্রা বর্ণে চিত্রিত করিয়া হিন্দুদের ষাঁড়গুলির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় বাহির করে। বাঙ্গালায় নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা দুর্গোৎসবে রীতিমত যোগ দেয় ও হিন্দুদের ন্যায় নূতন কাপড় প্রভৃতি কিনে। বোম্বাই বিভাগের স্থানে স্থানে হিন্দুদের সকল পর্ব্বেই মুসলমানেরা যোগ দিয়া থাকে। "মিয়ো" মুসলমানেরা হিন্দুদের "হোলি" পর্ব্বকে কোন একটী মুসলমানপর্ব্বেরই ন্যায় গণ্য করে এবং জন্মাষ্টমী, দশহরা, দেওয়ালীতেও উৎসব করিয়া থাকে।

নিম্ন শ্রেণীস্থ অনেক মুসলমান হিন্দুপর্ব্বে যোগ দেওয়া ছাড়া অনেক হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠানকে মুসলমানপর্ব্বে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে। উত্তরভারতে "ঠবাই" নামক রাজমিস্ত্রী-ব্যবসায়ী মুসলমানগণ ঐ অঞ্চলের হিন্দুকারিকরদের অনুকরণে আপনাদের যন্ত্রগুলির পূজা করে ও তাহাদের উদ্দেশে নৈবেদ্য দেয়। শ্রাদ্ধের সময় মৃতপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদানপ্রথা অনেক বাঙ্গালী মুসলমান তাহাদের "শবীবরাৎ" উপলক্ষে পালন করিয়া থাকে। মুসলমানদের

বিশ্বাস "শবীবরাতের" রাত্রিতে, আগামী বৎসরে যাহারা জন্মিবে ও মরিবে বিধাতা তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করেন।

বলা বাহুল্য যে এই সকল মুসলমান আপনাদের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে নিতান্তই অজ্ঞ। অনেক স্থলে নমাজের কয়েকটী শব্দ ছাড়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের আর কোন বোধই নাই। আসাম উপত্যকায় কৃষকগণের মধ্যে এই অজ্ঞতা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছে। তাহাদের অনেকে মহম্মদের নাম পর্য্যন্ত কখনো শুনে নাই এবং কেহ কেহ মনে করে তিনি মুসলমানধর্ম্মতন্ত্রে রাম লক্ষ্মণের স্থানীয়। তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতেরা মহম্মদকে আপনাদের প্রধান পীর মনে করে, এবং "হোজা" "খোজা" আউলিয়া ও আম্বিয়াকে ছোট ছোট পীর বলিয়া থাকে।

খাঁটি মুসলমানগণ তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সকল পৌত্তলিক আচারের প্রাদুর্ভাবকে নিয়তই নিন্দা করিয়া থাকেন এবং উৎসাহী মোল্লারা প্রায়ই এই সকল বিরুদ্ধাচার দূর করিবার জন্য প্রচারে বাহির হন। হীন ব্যবসায়ী, পতিত, ও অশিক্ষিত গ্রামবাসী মুসলমানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের মধ্যেই এই সকল আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন দেখা যায়। ইউরোপের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়েও ইহাদেরই অনুরূপ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রাচীনতর ধর্ম্মতন্ত্রের অবশেষ, সন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে এরূপ আশা করা যায়।

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রয়াগ বা এলাহাবাদ

প্রয়াগ বা এলাহাবাদ হিন্দুর নিকট তীর্থরাজ। ভক্ত হিন্দুর বিশ্বাস "প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা, মরগে পাপী যথাতথা।" সেই মহাতীর্থ প্রয়াগ এ বৎসর নানাবিধ মেলার সম্মিলনে সকলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, সকলের মুখেই আলোচনা প্রয়াগ বা এলাহাবাদের।

এবার প্রয়াগে কংগ্রেস, জাতীয় সমাজসংস্কার সভা, একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলনী, প্রভৃতির অধিবেশন হইবে। এ সকল তো লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেই, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ প্রয়াগের প্রদর্শনী। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া প্রয়াগের কেল্লার ধারে বিস্তৃত ক্ষেত্রে যাহার গৃহ নির্ম্মাণ হইয়াছে, দিগ্দেশ হইতে যেখানে সুন্দর অদ্ভুত ও হিতকারী দ্রব্যসমূহ সমাহৃত হইতেছে, যেখানে উড়ো জাহাজের সহিত চাক্ষুষ পরিচয় হইবে, সে স্থান যে সকলের নিকট আলোচ্য হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি।

এই উপলক্ষে অনেকেই প্রয়াগে পদার্পণ করিবেন। সেখানকার এই সব সাময়িক দর্শনীয় ছাড়া চিরন্তন পুরাতন যে সব দর্শনীয় ও জ্ঞাতব্য স্থান ও বিষয় আছে, তাহাও গন্তকামদিগের জানা দরকার। এজন্য আমরা নিম্নে এলাহাবাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

বাংলা দেশ হইতে প্রয়াগে যাইতে হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলে যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ ৫১৪ মাইল। যাত্রীদের সুবিধার জন্য রেল কোম্পানী তৃতীয় শ্রেণীর যাতায়াতের ভাড়া মাত্র ৪৲ টাকা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রেলগাড়ীতে থাকিয়া যমুনার এপার হইতে এলাহাবাদের দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। যমুনার উপর একটি দুতলা পুল আছে, তাহার উপর তলা দিয়া ট্রেন ও নীচের তলা দিয়া মানুষ গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি যাতায়াত করে।

এলাহাবাদের দক্ষিণে যমুনা, পশ্চিমে, উত্তরে ও পূর্ব্বে গঙ্গা। গঙ্গার উপরেও উত্তরদিকে একটি দুতলা পুল আছে, তাহার উপরে চলে মানুষ, নীচে চলে ট্রেন। গঙ্গার উপর পূর্ব্বদিকে আর একটি পুল তৈরি হইতেছে।

এলাহাবাদ আগ্রা অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশের রাজধানী। সেখানকার ছোট লাটের প্রধান আড্ডা এলাহাবাদ। সুতরাং এখানে আপিস আদালত সমস্তই। কর্ম্ম উপলক্ষে এখানে নানা ভিন্ন প্রদেশের লোক বাস করিতেছে; তন্মধ্যে বাঙালীই প্রধান। ১৯০১ সালের লোকগণনা অনুসারে এখানকার মোট জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৩২। এলাহাবাদ প্রকাণ্ড সহর কিন্তু বিরলবসতি। এক এক বাড়ীর মধ্যেই প্রশস্ত ব্যবধান, পাড়ায় পাড়ায় তো কথাই নাই; সহরের পুরাতন অংশ অবশ্য ঘিঞ্জি। যুক্ত প্রদেশের মধ্যে এলাহাবাদ জনসংখ্যার অনুপাতে চতুর্থ—লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, কানপুর ও আগ্রা সহরের জনসংখ্যা ইহা অপেক্ষা অধিক। জনসংখ্যার হিসাবে ভারত সাম্রাজ্যে

যমুনার পুল, এলাহাবাদ।

এলাহাবাদের স্থান চতুর্দ্দশ, এবং বসতির ঘনত্ব হিসাবে ষড়্‌বিংশ, যুক্ত প্রদেশে সপ্তম। কলিকাতায় প্রতি বর্গ মাইলে ৪২৩৯০ জন লোকের বাস; কানপুরে ৩৭৫৩৮ জন; এবং এলাহাবাদে মাত্র ৩৮১৭ জন। এলাহাবাদের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৯১৭৬২ জন পুরুষ ও ৪০২৭০ জন স্ত্রীলোক। তাহার মধ্যে

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
হিন্দু	৬১৫৭০	৫৩১০৯	১১৪৬৭৯
জৈন	২৫০	৩০৪	৫৫৪
মুসলমান	২৬১০১	২৪১৭৩	৫০২৭৪
খ্রীষ্টান	১৯৮১	২৩২৬	৪৩০৭
অন্যান্যধর্ম্মী	১৮৬০	৩৫৮	২২১৮

এলাহাবাদের প্রধান ভাষা হিন্দি এবং হিন্দিরই ভগ্নী উর্দ্দ। তারপর অনেক নীচে বাংলা। মারাঠী গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাভাষীর সংখ্যা অল্প।

এলাহাবাদের দক্ষিণ অংশে সহরের প্রধান বাজার চক; এবং ইহারই আশে পাশে খুব ঘন বসতি। এদিককার শাহাগঞ্জ, বাদশাহী মুণ্ডি, আতরসুইয়া প্রভৃতি পাড়ায় বহু বাঙালীর বাস। সহরের উত্তরাংশে কটরা ও কর্ণেলগঞ্জ [illegible] ব্যবধান—এবং সেই ব্যবধান স্থলে সহরের প্রধান স্কুল কলেজ ও উদ্যান প্রভৃতি। সহরের পূর্ব্বে গঙ্গার ধারে দারাগঞ্জ ও যমুনার ধারে কীডগঞ্জ। সকল পাড়াতেই বাঙালী বাসিন্দা যথেষ্ট। পশ্চিম দিকে দেশী লোকের বসতি নাই—সেদিক সাহেব পাড়া—আপিস আদালত, ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে সুসজ্জিত। খসরুবাগের পশ্চিমে একটি নূতন পল্লী লুকারগঞ্জের পত্তন হইয়াছে; সেখানে বহু বাঙালী বাস করিয়াছেন। এলাহাবাদের বিশেষত্ব বিস্তৃত হাতা-ওলা বাংলা বাড়ীগুলি এবং চৌড়া সরল রাস্তাগুলি। চৌড়া রাস্তার ধারে ধারে মালঞ্চ ও তৃণক্ষেত্রশোভিত বাংলাগুলি নয়ন মনকে শান্তি দেয়। বাংলাগুলি ছাড়া-ছাড়া—আলো বাতাস লইয়া কাহারো কাড়াকাড়ি মারামারি করিতে হয় না।

সহরের প্রধান বিদ্যামন্দির মিওর সেণ্ট্রাল কলেজ। এই মন্দিরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য ও অধিবেশন হয়। এই কলেজের সম্মুখেই কলেজের হিন্দুছাত্রাবাস; পশ্চাতে মুসলমানছাত্রাবাস। আর একটি ভালো ছাত্রাবাস Oxford and Cambridge Hostel মিশনরীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এলাহাবাদে আরো দুটি কলেজ আছে—খ্রীষ্টান কলেজ ও কায়স্থ পাঠশালা।
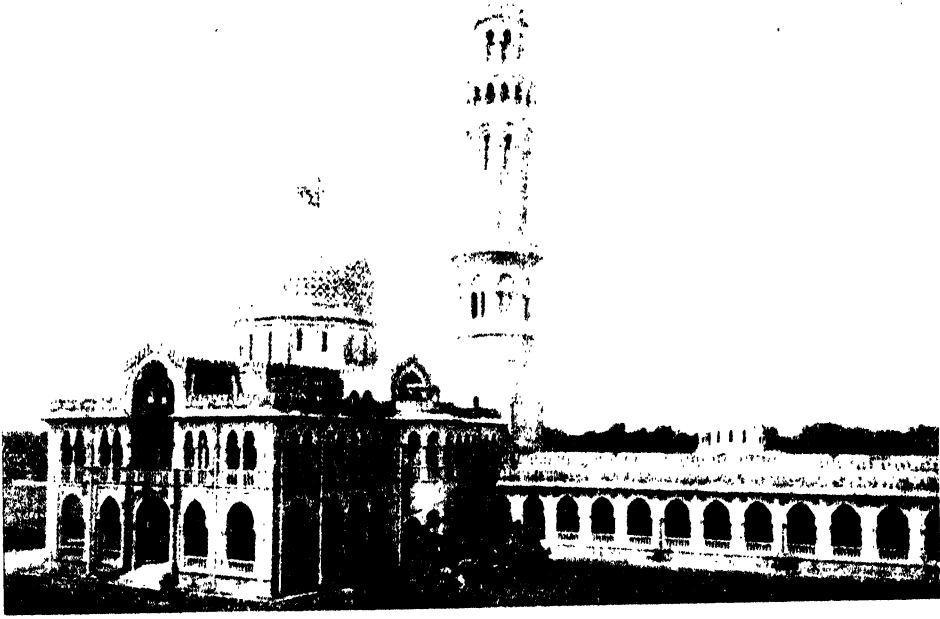
মিওর সেণ্ট্রাল কলেজ, এলাহাবাদ।
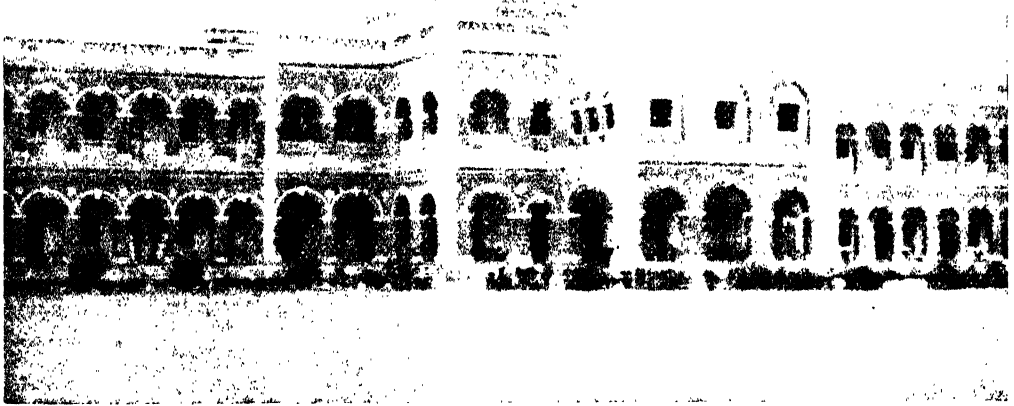
হিন্দু ছাত্রাবাস, এলাহাবাদ।

খ্রীষ্টান কলেজ মিশনরীদের কীর্ত্তি এবং কায়স্থ পাঠশালা স্বর্গীয় মুন্সি কালীপ্রসাদ কুলভাস্করের অক্ষয়কীর্ত্তি। মুন্সি কালীপ্রসাদ ওকালতি ব্যবসায়ে সঞ্চিত পাঁচলক্ষ টাকার সম্পত্তি মায় মাথার টুপিটি আপনার স্বজাতিদের শিক্ষার জন্য দান করিয়া গিয়াছিলেন। শেষোক্ত দুটি কলেজই দ্বিতীয় শ্রেণীর। এলাহাবাদে একটি আইন কলেজ আছে।

কিন্তু এখানে চিকিৎসা বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা শিল্প শিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান নাই। শিক্ষকতা শিক্ষার একটি কলেজ আছে। স্কুলের মধ্যে ইংঙ্গ-বঙ্গ স্কুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ইহা বাঙালীর উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত এবং বাংলার বাহিরে বাঙালীর ছেলেকে বাংলা পড়াইবার কেন্দ্র।

এলাহাবাদে বালিকা বিদ্যালয়ের বিশেষ অভাব আছে। খৃষ্টান মেয়েরা Intermediate-in-arts পর্য্যন্ত পড়িতে পারে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান-মেয়েদের এমন সুবিধাও নাই। ছোট খাটো মেয়ে-পাঠশালা কয়েকটি আছে।

কলেজ ও স্কুল সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী ছাড়া এখানে একটি বেশ ভালো রকমের লাইব্রেরী আছে। ইহার নাম পাবলিক লাইব্রেরী ; ইহা আলফ্রেড পার্ক নামক প্রকাণ্ড উদ্যানের একাংশে একটি অতি সুদর্শন অট্টালিকায় অবস্থিত—শান্ত স্নিগ্ধ কোলাহলহীন পাঠাগারটি যেন দেবী সরস্বতীর বিশ্রামকুঞ্জ। দেশী লোকের চেষ্টার ফল হিন্দি ও সংস্কৃত পুস্তকের পাঠাগার "ভারতীভবন" ও বাংলা পুস্তকের পাঠাগার "বাঙ্গালী সমিতি" উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় ব্রিজমোহন লাল মহাশয়ের বদান্যতায় ভারতীভবন স্বকীয় অট্টালিকায়

স্বর্গীয় মুন্সি কালীপ্রসাদ কুলভাস্কর।

পাবলিক লাইব্রেরী, এলাহাবাদ।

অবস্থিত ও অবস্থাপন্ন। বাঙ্গালী সমিতির আশ্রয় ভাড়াটিয়া ঘর।

এলাহাবাদের পাইয়োনিয়র প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র। কিন্তু ইহা দেশীয় স্বার্থের বিরুদ্ধ বলিয়া কলঙ্কিত। দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত একখানি ইংরাজি দৈনিক আছে—তাহার নাম লীডর। "অভ্যুদয়" হিন্দি সাপ্তাহিক; কোনো প্রসিদ্ধ উর্দ্দু সাপ্তাহিক নাই। ইংরাজি মাসিক পত্র হিন্দুস্থান রিভিয়ু অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্র। হিন্দি সরস্বতী ও উর্দ্দু আদীব সচিত্র সুন্দর মাসিক পত্রিকা। স্ত্রীদর্পণ নামক হিন্দি মাসিক পত্রিকা মহিলা কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও পরিচালিত।

ছাপাখানা ও পুস্তক প্রকাশকের মধ্যে ইণ্ডিয়ান প্রেসের সমকক্ষ দেশী কারখানা এলাহাবাদে তো নাই-ই, বঙ্গেও বাঙালীর অতবড় ও সুব্যবস্থ ছাপাখানা নাই। এই প্রেস সুশ্রী ও পরিষ্কার ছাপার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে ইংরাজি, বাংলা, হিন্দি ও সংস্কৃত, উর্দ্দু ও পার্সী এই চারি প্রকার হরপে ছাপা হয়। রঙিন লিথো ছবিও এখানে সুন্দর ছাপা হইতেছে।

ভরদ্বাজ-আশ্রম।

এলাহাবাদের প্রাচীন ও তীর্থযাত্রীর পরিচিত নাম প্রয়াগ। ব্রহ্মা এখানে যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া এ স্থানের ঐ নাম হইয়াছিল।

প্রয়াগ তীর্থরাজ; পুরাকালে সকল তীর্থ এক দিকে রাখিয়াও তুলদাঁড়ি প্রয়াগের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

দুই নদীর সঙ্গমক্ষেত্রকে প্রয়াগ বলে। এখানে যমুনা আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। কিম্বদন্তী যে সরস্বতী নদীও এখানে মিলিত হইয়াছিল, তাই সঙ্গমক্ষেত্রের নাম ত্রিবেণী। কিন্তু এখন সরস্বতীর কোনো অস্তিত্বই নাই—ভক্তগণের বিশ্বাস সরস্বতী অন্তঃসলিলা।

আর্য্য জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে এই গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের উল্লেখ আছে। তারপর রামায়ণ মহাভারতেও উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র বনগমন-পথে এখানে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম গঙ্গাতীরে ছিল। এখন যে স্থান ভরদ্বাজ-আশ্রম বলিয়া পরিচিত তাহা গঙ্গা হইতে অনেক দূরে।

পদ্মপুরাণে প্রয়াগে তীর্থযাত্রার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণেও প্রয়াগ-মাহাত্ম্য দেখা যায়। এই প্রয়াগ-মাহাত্ম্য প্রক্ষিপ্ত রচনা, অথবা উক্ত পুরাণদ্বয়ই আধুনিক। প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে তীর্থরাজ প্রয়াগের ঐশ্বর্য্যের বর্ণনাটি বেশ—

> সিতাসিতে যত্র তরঙ্গ চামরে
> নদ্যৌ বিভাতে মুনি-ভানু কন্যকে।
> নীলাতপত্রং বট এব সাক্ষাৎ
> স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ॥

তীর্থরাজ প্রয়াগের জয়জয়কার—তাঁহার দুই পাশে জহ্নুমুনি-কন্যা গঙ্গা ও ভানুসুতা যমুনা শুভ্র ও কৃষ্ণ তরঙ্গ আন্দোলন করিয়া চামর বীজন করিতেছেন; সাক্ষাৎ অক্ষয়বট নীল ছত্র।

গঙ্গার জল সাদা এবং যমুনার জল কালো, বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। এবং শীতকালে সঙ্গমস্থানে কালো ও সাদাজলের মেশামিশির ঠেলাঠেলি খেলা দেখিবার মতন জিনিষ। রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে কালিদাস ইহার বর্ণনা করিয়াছেন—
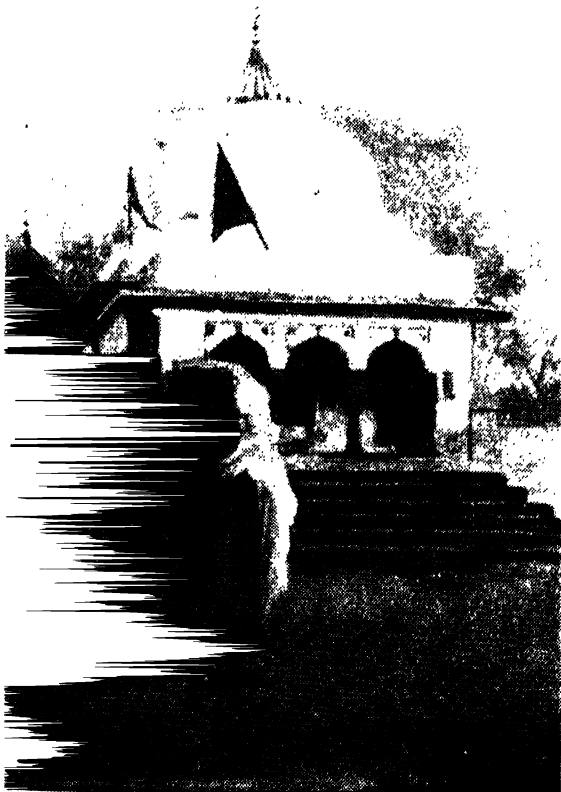
স্বহস্তো মম মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষস্য।

মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষের স্বাক্ষর।

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈঃ
মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানাম্
ইন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব॥
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং
কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্‌ক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা
ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব॥
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিঃ
ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা
রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা॥
ক্বচিৎ কৃষ্ণোরগভূষণেব
ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা
ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥

হে অনিন্দ্য সুন্দরী সীতা দেবি, গঙ্গা যমুনা একত্র সম্মিলিত হইয়া বিভিন্ন বর্ণের প্রবাহে কোথাও বা সমুজ্জ্বল ইন্দ্রনীলমণিগ্রথিত মুক্তাহার-যষ্টির ন্যায় শোভমানা এবং কোথাও বা ইন্দীবরখচিত শ্বেত পঙ্কজমালার মতো শুভ্রকান্তি। কোন স্থলে মৃনালবর্ণের হংসমালার সহিত মানস-সরোবরপ্রিয় শ্বেতহংসমালার সংসর্গের ন্যায় শোভা, আবার কোন স্থানে কৃষ্ণ অগুরু-বিরচিত পত্রলেখার মধ্যে শ্বেতচন্দনকল্পিত পৃথিবীর অলকা-তিলকার মতো শ্রী। কোনস্থানে বৃক্ষতলের ছায়ার মধ্যে পত্রাবকাশে পতিত জ্যোৎস্না সন্নিবিষ্ট আলো ছায়ার খেলা, অন্যত্র শরৎকালের শুভ্র ছিন্নমেঘের ফাঁক দিয়া নীল আকাশের প্রকাশের মতো শোভা। কোনস্থানে বা রক্তবর্ণ মহাদেবের অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ সর্প ও ভস্মানুলেপন তুল্য বোধ হইতেছে।

এই সমস্ত বর্ণনা ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক ও সমর্থিত হইয়াছে। চৈন পরিব্রাজক ফা হিয়ান ও হিউয়েন স্যাং এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। হিউয়েন স্যাং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে প্রয়াগেরও বিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তখন অক্ষয়বট শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিদ্যমান ছিল। তীর্থযাত্রিগণ তাহার উচ্চ শাখা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া আত্মহত্যা করিত—তাহাদের বিশ্বাস ছিল প্রয়াগে যে কামনা করিয়া আত্মহত্যা করা যায় পরজন্মে তাহা সফল হয়। ইহার বর্ণনায় কালিদাস রঘুবংশে বলিয়াছেন—

ত্বয়া পুরস্তাদুপযাচিতো যঃ
সোহয়ং বটঃ শ্যাম ইতি প্রতীতঃ।
রাশির্মণীনামিব গারুড়ানাং
সপদ্মরাগঃ ফলিতো বিভাতি॥

হে সীতা, তুমি পূর্ব্বে যে বটবৃক্ষের নিকট কামনা করিয়াছিলে, এই সেই শ্যাম নামে প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ। পক্বফলশোভিত হইয়া এই বৃক্ষ পদ্মরাগ মণিখচিত হরিৎ বর্ণের মণিস্তূপের মতো শ্রী ধারণ করিয়াছে।

বটবৃক্ষের নিকট এক দেবমন্দির ছিল; সেখানকার সামান্য দান অন্যস্থানের ভূরিদান অপেক্ষাও পুণ্যপ্রদ বলিয়া লোকের বিশ্বাস। সুতরাং সকলেই সেখানে গিয়া যথাসাধ্য দান
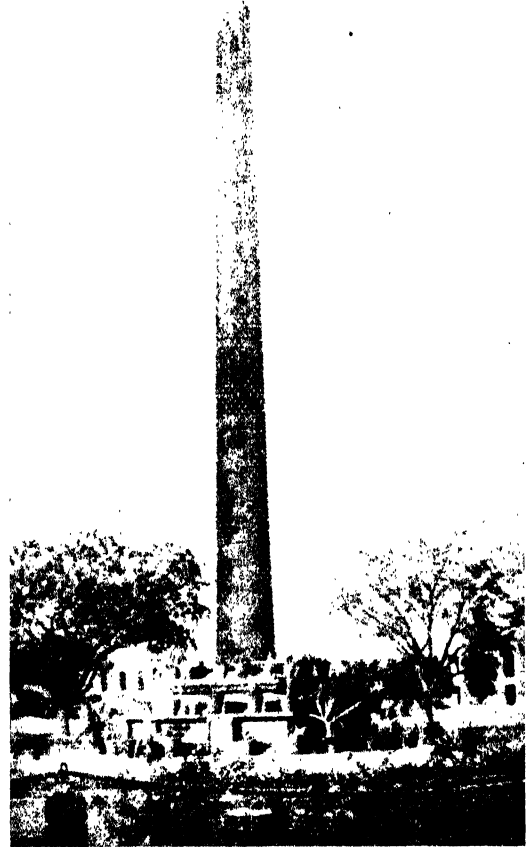
অশোকস্তম্ভ, এলাহাবাদ।

করিত। মহারাজা হর্ষবর্দ্ধন প্রতি পঞ্চবৎসরে আপনার সঞ্চিত সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিতেন। এরূপ এক দানব্যাপার চীন পরিব্রাজক প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

প্রয়াগে বুদ্ধদেব তাঁহার পুণ্যপদধূলি দিয়া তীর্থকে পবিত্রতর করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার ভক্ত রাজা অশোক প্রভুর প্রভাব স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য এক চম্পককুঞ্জে

কেল্লা, এলাহাবাদ।

স্তূপ রচনা করেন। এবং আপনার ধর্ম্মরাজ্য বিস্তারের জন্য এখানে এক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন। স্তম্ভগাত্রে রাজার প্রজার প্রতি অনুশাসন খোদিত রহিয়াছে। ধর্ম্মচর্য্যা, প্রাণিহিত, সামাজিক কর্ত্তব্য, রাজকর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতার সীমা প্রভৃতি বিষয় স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ—ইহা দ্বারা প্রজারা নিজেরা সংযত হইতে ও রাজকর্ম্মচারীর যথেচ্ছাচার দমন করিতে পারিত।

এই স্তম্ভগাত্রে সমুদ্র গুপ্তের বিজয়বার্ত্তা, বীরবলের তীর্থযাত্রা, জাহাঁগীরের রাজ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি বহু পরবর্ত্তী ঘটনার বিবরণও ক্রমে ক্রমে উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই স্তম্ভ এক্ষণে কেল্লার মধ্যে আছে।

এই স্তম্ভের অনুকরণে ইংরাজসম্রাটদিগেরও এক অনুশাসনস্তম্ভ প্রয়াগে কেল্লার সম্মুখে এক নবরচিত উদ্যানের মধ্যে শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আকবর সম্রাটের রাজত্বকালে প্রয়াগের নাম রাখা হয় ইলাহাবাস—ঈশ্বরের আবাস—অর্দ্ধেক আরবী, অর্দ্ধেক সংস্কৃত। পরে এই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া হইয়াছে এলাহাবাদ।

আকবর বড় দূরদর্শী ও প্রজাহিতৈষী সম্রাট ছিলেন। তিনি সতীদাহ নিবারণ করেন। এবং প্রয়াগে আত্মহত্যা নিবারণেরও এক সহজ উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি অক্ষয়বটকে ঘিরিয়া গঙ্গা যমুনার সঙ্গমক্ষেত্রে কেল্লা প্রস্তুত করিলেন; লোকের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত না করিয়া তিনি কৌশলে ধর্ম্মান্ধদিগকে নিবারণ করিলেন। এই কেল্লা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে এক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ত্রিবেণীসঙ্গমে মুকুন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি দুগ্ধের সহিত অজ্ঞাতসারে গোলোম গলাধঃকরণ করিয়া যবনত্ব প্রাপ্ত হন। যবনত্ব যদি হইলেন, তবে শ্রেষ্ঠ যবন না হইবেন কেন, এই মনে করিয়া তিনি প্রয়াগক্ষেত্রে আত্মহত্যা করিলেন। তাহার ফলে মুকুন্দ ব্রহ্মচারী আকবররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। [illegible] অপর কেহ তাঁহার মতো পরজন্মে স্থাপনা [illegible] তিনি

যোগীবেশে সম্রাট আকবর।

অক্ষয়বট কেল্লায় ঘিরিয়া ফেলিলেন। হিন্দুদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে আকবর পূর্ব্বজন্মে হিন্দু সাধু ছিলেন বলিয়াই পরজন্মে হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী সাধু হইয়াছিলেন।

খসরুবাগ, এলাহাবাদ।

আকবরের সভাসদ হাস্যরসিক বীরবল প্রায়ই প্রয়াগে আসিতেন। তাঁহার তীর্থযাত্রার কথা অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে, যথা—

"সম্বৎ ১৬৩২ শকে ১৪৯৩ মাগবদী পঞ্চমী সোমবার, গঙ্গাদাস-সুত মহারাজ বীরবর শ্রীতীর্থরাজ প্রয়াগকে যাত্রা সফল লিখিতম্।"

এইরূপ কিম্বদন্তী যে, কেল্লা নির্ম্মাণের সময় নদীর ভাঙনে গাঁথনি টিঁকিতেছিল না। লোকে বলিল নদীকে নরবলি না দিলে তাহার ক্রোধ শান্ত হইবে না, সে বন্ধন স্বীকার করিবে না। আকবর চিন্তিত হইলেন। তখন এক ব্রাহ্মণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলি হইল, কিন্তু এই সর্ত্তে যে তাহার বংশধরেরাই *প্রয়াগের পাণ্ডার কার্য্য* করিবে, অপরে নহে। এখন সেই আত্মত্যাগী ব্রাহ্মণের কর্ম্মবিমুখ ও অশিক্ষিত বংশধরেরা যাত্রীদিগের মাথায় হাত বুলাইয়া নিশ্চিন্ত মনে উদরান্নের সংস্থান করিতেছে। ইহারা পুঁথির চেয়ে লাঠির চর্চ্চাই বেশি করে এবং সময়ে সময়ে সকল যাত্রীদের উপর জোর জুলুম করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ধর্ম্মের নামে নির্ব্বিশেষ দান আমাদের দেশকে ক্রমশ হীনবল অলস ও কুক্রিয়ারত করিয়া তুলিতেছে।

গঙ্গার জলোচ্ছ্বাস নিবারণের জন্য আকবর কেল্লার সম্মুখে এক উচ্চ বাঁধ দিয়াছিলেন। তাহা এক্ষণে আকবরের বাঁধ নামে প্রসিদ্ধ। ফ্যানি পার্কস নাম্নী এক ইংরেজ মহিলা ৮০ বৎসর পূর্ব্বে ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন—তাঁহার রচিত Wanderings of a Pilgrim নামক পুস্তকে এই বাঁধ মহারাষ্ট্র-বাঁধ নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

আকবরের পর জাহাঁগীর বাদশাহ এলাহাবাদে অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। জাহাঁগীরের প্রথম বনিতা শাহ্ বেগম তাঁহার গর্ভজাত পুত্র খসরু ও স্বামীর মনোমালিন্যে মর্ম্মাহত হইয়া অহিফেন সেবনে এলাহাবাদে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র খসরু ও তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়ের মৃত্যুও এলাহাবাদে হয়। ইহাদের সমাধি একটি সুন্দর উদ্যানের মধ্যস্থলে আছে। সেই উদ্যানের নাম খসরু বাগ। বর্ষা ও শীতকালে বাগান যখন ফুলে ফুলে ফুলময় হইয়া যায় তখনকার দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন তিনি কখনো ভুলিবেন না। এই বাগানের মধ্যে কয়েকটি ফোয়ারা আছে—কূপ হইতে জল তুলিয়া উঁচু দেয়ালের মাথায় নহরে ঢালিয়া দেওয়া হইত, সেই জল নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে গড়াইয়া আসিয়া চৌবাচ্চার মধ্য হইতে উৎসারিত

হইয়া উঠিত। এই বাগানের মধ্যে এখন সহরের জলের কলের চৌবাচ্চা ও কারখানা করা হইয়াছে।

মুসলমান বাদশাহের নিকট হইতে ইংরেজ কোম্পানি যখন বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানির সনন্দ লাভ করেন তাহার লেখাপড়া এলাহাবাদ জেলার কাড়া মাণিকপুর নামক স্থানে হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের ফৌজ প্রথম এলাহাবাদের কেল্লা দখল করে। তার পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পরে ঐ কেল্লার সম্মুখেই ভারতের প্রথম বড় লাট লর্ড ক্যানিং ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পাঠ করেন। সেই স্থানটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য সেই স্থানে মিণ্টো পার্ক নামক উদ্যান রচনা হইবে, এবং তাহার মধ্যে ঘোষণাস্তম্ভের গাত্রে ভিক্টোরিয়া, এডোয়ার্ড ও জর্জ সম্রাটের অনুশাসন উৎকীর্ণ হইবে।

ইংরাজেরা এলাহাবাদকে বলেন The City of Gardens. বস্তুত এখানে যতগুলি সুন্দর বাগান আছে এমন আর কোনো সহরে নাই। খসরু বাগের কথা বলিয়াছি। মিণ্টো পার্ক নূতন হইবে। ভূতপূর্ব্ব ডিউক অফ এডিনবরার ভারত অগামন উপলক্ষে তাঁহার নামে এলফ্রেড পার্ক তৈরি হয়। ১৩৩ একর জমি জুড়িয়া প্রকাণ্ড বাগান। ইহার একাংশে সাধারণ পাঠাগার। মধ্যস্থলে প্রয়াগের খ্যাতনামা বাঙ্গালী পরলোকগত নীলকমল মিত্র মহাশয়ের দত্ত একটি ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড আছে, তাহার সম্মুখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মর্ম্মর মূর্ত্তি। এই স্থান শষ্পের হরিতাভা ও বিচিত্র ফুলের কেয়ারিতে নয়নানন্দদায়ক। ইহার দক্ষিণে বিস্তৃত ক্রীড়াক্ষেত্র।

এলাহাবাদের পশ্চিমে গঙ্গার ধারে ম্যাকফার্সন পার্ক নামক আর একটি উদ্যান আছে এবং তাহার পশ্চাতে একটি বড় হ্রদ ম্যাকফার্সন লেক আছে। সেখানকার দৃশ্যও খুব সুন্দর।

এ সব ছাড়া এলাহাবাদের এক একটি বাংলা এক একটি ছোট খাটো উদ্যান। শষ্পক্ষেত্র ও ফুলে পাতায় চির অভিরাম।

মুসলমান সম্রাট হীনবল হইয়া পড়িলে মহারাষ্ট্র জাতি প্রবল হইয়া উঠে। বাজিরাও পেশোয়া হিন্দুর তিনটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ—প্রয়াগ, বারাণসী ও মথুরা মুসলমানের হস্ত

ভিক্টোরিয়া-মূর্ত্তি, এলাহাবাদ।

হইতে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করেন। মহারাষ্ট্রগণ বহুবার এলাহাবাদ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাজিরাওয়ের সঙ্কল্প পূর্ণ হয় নাই। এলাহাবাদে এখনো মহারাষ্ট্র প্রভাবের অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। দারাগঞ্জে অহল্যা বাঈ-এর মন্দির ও ভোঁসলার বাদা, এবং কোঠাপার্চ্চায় বায়জা বাঈ-এর মন্দির মহারাষ্ট্র-স্মৃতি বহন করিতেছে। বায়জা বাঈ মহারাজা দৌলত রাও সিন্ধিয়ার পত্নী। বিধবা অবস্থায় পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া তিনি অনেক দিন এলাহাবাদে ছিলেন।

বাংলার শ্রেষ্ঠ রত্ন মহাত্মা চৈতন্যদেবের পদধূলি প্রয়াগকে পবিত্রতর করিয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। এখানেই চৈতন্যদেব দশদিন দশাশ্বমেধ মন্দিরে অবস্থিতি করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীকে ধর্ম্ম

উপদেশ দিয়াছিলেন। যমুনার পরপারে বৈষ্ণব বল্লভভট্টের আলয়েও কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু বাঙালী প্রয়াগে গিয়াছেন। অনেকে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের পুত্র-কন্যারা বাংলা অপেক্ষা হিন্দিই ভালো বলিতে পারে। আজকাল বাংলা ভাষার চর্চ্চা প্রসারলাভ করিতেছে বোধ হয়।

পশ্চিমের সহরের মধ্যে বারাণসী ও বৃন্দাবনের পরেই এলাহাবাদের বাঙালী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। প্রথম দুই সহরে ধর্ম্মার্থী ও মুমুক্ষুর বাস, এলাহাবাদে সব বিষয়-কর্ম্মীর বাস। ইংরেজ যখন প্রথম এই প্রদেশে অধিকার লাভ করিলেন তখন তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচিত বাঙালী কর্ম্মচারীদিগকে সঙ্গে করিয়া সে দেশে লইয়া যান। সেই সূত্রে এলাহাবাদে বাঙালীর প্রাধান্য। অনেক বাঙালী সে দেশে নিজেদের সদ্‌গুণে ইংরেজ ও হিন্দুস্থানীর শ্রদ্ধা-পাত্র হইয়াছিলেন।

এলাহাবাদে প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাঙালীর দ্বারা। পরলোকগত নীলকমল মিত্র ও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ ব্যয়ে দুইটি স্কুল চালাইতেন। এই কালী বাবু সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ পক্ষে থাকায় যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। ১৮৭২ সালে বাঙালী ও হিন্দুস্থানীর চেষ্টায় এলাহাবাদের প্রধান কলেজ স্থাপিত হয়। মিওর সেণ্ট্রাল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী বাঙালীদের মধ্যে পরলোকগত প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামেশ্বর চৌধুরী প্রধান।

যমুনার উপর প্রথম পাকা ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন রামধন মুখোপাধ্যায়। তাহা বহু বৎসর হইল যমুনার স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। অধুনা লালা রামচরণ লাল যমুনার উপর আর একটি সুন্দর ঘাট করিয়া দিয়াছেন। রামেশ্বর চৌধুরীর দানে এলাহাবাদের বহু প্রতিষ্ঠান—Alfred Park, Thornhill and Mayne Memorial Building, চকের বাজার প্রভৃতি—পরিপুষ্ট।

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Fighting Munsif—যোদ্ধা মুন্সেফ—নামে সমধিক পরিচিত। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি বিদ্রোহীদের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

যোদ্ধা মুন্সেফ প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁহার অকাল মৃত্যু না হইলে তিনি হাইকোর্টের জজ হইতে পারিতেন। এক্ষণে তাহারই আত্মীয় শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের সুযোগ্য বাঙালী জজ।

বাবা মাধো দাস তাঁহার সাধুতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য বলিতে গেলে এলাহাবাদের শ্রেষ্ঠ বাঙালী। তিনি মুসলমান-সুফিসাহিত্যে সুপাণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্বধর্ম্মে সমদর্শিতার জন্য হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান, পণ্ডিত মৌলবী পাদ্রী, প্রভৃতি বহু দূরদেশ হইতে তাঁহার সৎসঙ্গ সম্ভোগের জন্য আসিতেন।

বর্ত্তমান বাঙালীর মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় সকলের পরম শ্রদ্ধেয়। তাঁহার দাদা শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য বৃদ্ধতম বাঙালী। তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজের সৈন্যবিভাগে কর্ম্ম করিতেন। এখনো তিনি বেশ কর্ম্মঠ আছেন।

ফ্যানি পার্কস নাম্নী একজন ইংরেজ পর্য্যটিকা প্রাচীন এলাহাবাদের একটি কৌতুককর বর্ণনা তাঁহার Wanderings of a Pilgrim in quest of the Picturesque নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায়
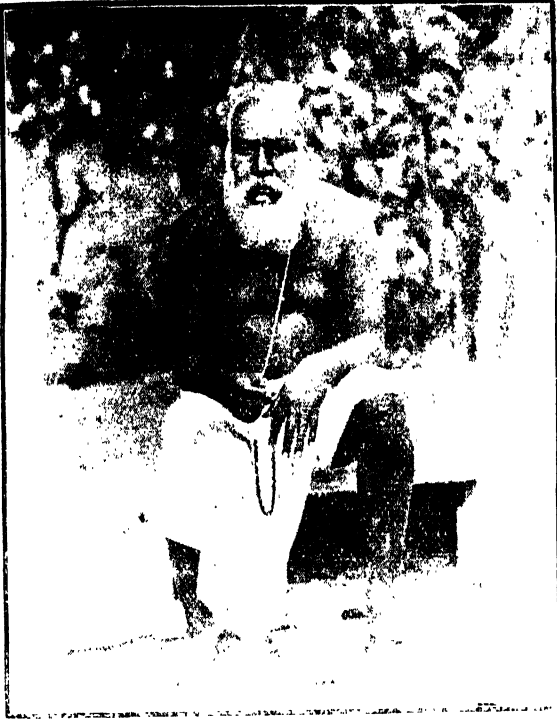
বাবা মাধোদাস।

কালে নৌকায় বা পাল্কীতে ভ্রমণ করিতে হইত; এবং অনেক সময় যাত্রার অবসানে সাহেবের মৃতদেহ পাল্কী হইতে বাহির করিতে হইত। এজন্য সাহেবেরা এলাহাবাদকে Oven of India (ভারতের তন্দুর) বা ছোট জাহান্নম (নরক) বলিতেন। তখন এক এক সাহেবের ১৫০।২০০ চাকর থাকিত। ফ্যানি পার্কসেরই ৫৪ জন ভৃত্য মাসে মোট ২৫০৲ টাকা বেতন পাইত। ভৃত্যদের মধ্যে দর্জি, ছুতার প্রভৃতিও মাহিনা করা থাকিত। সাহেব মেমেরা তখন দেশীয়দের সঙ্গে খুব প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন এবং মেমেদের অন্তঃপুরিকার সহিত সখিত্ব সাধারণ ঘটনার মধ্যেই ছিল। সাহেবেরা তখন একাধিক মুসলমান রমণীকে বিবাহ করিতেন -বিবাহজ সন্তানের মধ্যে ছেলেরা পিতার ও মেয়েরা মায়ের ধর্ম্ম আচরণ করিত। সাহেবেরা হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে কাছারি দরবার প্রভৃতি রাজকার্য্য করিতেন।

প্রয়াগে তীর্থ হিসাবে দর্শনীয় এইগুলি --

ত্রিবেণীং মাধবং সোমং ভরদ্বাজঞ্চ বাসুকিম্।
বন্দেঽক্ষয়বটং শেষং প্রয়াগে তীর্থনায়কম্॥

কাছারী—ফ্যানি পার্কসের Wanderings of a Pilgrim হইতে।

প্রথম, ত্রিবেণীতে মস্তক মুণ্ডন ও স্নান। ও পিতৃপুরুষকে পিণ্ড ও পাণ্ডাকে গাভীদান। সকলেই গাভীদানে সমর্থ নয়; তথাপি গাভীদানের অভিনয় করিয়া যথাকথঞ্চিৎ দান করিতে হয়।

দ্বিতীয়, বেণীমাধবের মন্দির। দুইটি মন্দির আছে—একটি যমুনার দক্ষিণপাড়ে সঙ্গমক্ষেত্রের নিকটেই, এবং আর একটি দারাগঞ্জে।

তৃতীয়, সোমেশ্বর মহাদেব। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বেণীমাধবের দ্বিতীয় মন্দিরের সন্নিকটে।

যে পশ্চিমের গ্রীষ্ম য়ুরোপীয়দিগের সহ্য হইত না। তখনকার

চতুর্থ, ভরদ্বাজ-আশ্রম। কর্ণেলগঞ্জে।

পঞ্চম, নাগবাসুকির মন্দির। দারাগঞ্জে। নাগদেবতার ইহাই বোধ হয় এক মাত্র মন্দির; ভারতের আর কোনো স্থানে নাগদেবতার মন্দির আছে কি না জানি না। এখানকার দৃশ্য বেশ মনোরম। মন্দিরের তিন দিকে গঙ্গার বেষ্টনী, সম্মুখে বাঁধা ঘাট—এলাহাবাদের গঙ্গার উপর এই একটি মাত্র বাঁধা ঘাট। এখানে বর্ষাকালে নাগপঞ্চমীর দিনে মেলা হয়।

ষষ্ঠ, অক্ষয়বট। প্রাচীন অক্ষয়বটের একটা গুঁড়ি কেল্লার মধ্যে মাটির নীচে এক মন্দিরের মধ্যে আছে।

অক্ষয় বট, এলাহাবাদ।

চতুর পাণ্ডারা মাঝে মাঝে এক একটা কাঁচা বটের ডাল ইহার গায়ে লাগাইয়া প্রচার করে যে এই বট অক্ষয় অমর, মন্দিরের মধ্যে আলো বাতাস না পাইয়াও বাঁচিয়া থাকে। এবং অজ্ঞ যাত্রীরা তাহাই বিশ্বাস করে।

সপ্তম, শেষনাগের মন্দির। ইহা ত্রিবেণী হইতে তিন মাইল দূরে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এক্ষণে ইহার নাম দেশীভাষায় অপভ্রংশ হইয়া হইয়াছে ছটনাগ।

এইগুলি প্রধান তীর্থক্ষেত্র ছাড়া আরো কতকগুলি দর্শনীয় আছে। তাহার মধ্যে সমুদ্রকূপ ও হংসকূপ এবং অলোপীদেবীর মন্দির প্রধান।

সমুদ্রকূপ সম্ভবত সমুদ্র গুপ্তের নির্ম্মিত। অজ্ঞ পাণ্ডারা ইতিহাস না জানিয়া বলে ইহার জলের সঙ্গে তলে তলে সমুদ্রের সংযোগ আছে। সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল কৌশাম্বীতে। এই কৌশাম্বীর বর্ত্তমান নাম কোশাম। ইহা এক্ষণে একটি গ্রাম মাত্র, এলাহাবাদ জেলায় যমুনার তীরে অবস্থিত। এলাহাবাদ হইতে ৩০ মাইল পশ্চিমে।

সমুদ্রকূপ একটা ছোট পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। পাহাড়ের পাদদেশে এক মুসলমান ফকিরের সমাধি আছে। তিনি নাকি কবীর সাহেবের সমসাময়িক ছিলেন। এখানে প্রতি বৎসর নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের এক মেলা বসে।

হংসতীর্থ সমুদ্রকূপের নিকটেই। পুরাতন হংসকূপ এক্ষণে জীর্ণদশা প্রাপ্ত। একজন ক্ষত্রিয় জমিদার ইহার নিকটে একটি নূতন কূপ করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে হংসকূপ নামে পরিচিত হইতেছে। হংসকূপ ও সমুদ্রকূপের উপর দুইটি উৎকীর্ণ শিলাপট্ট আছে।

ইহারই নিকটে ঝুঁসি গ্রাম। ঝুঁসিতে গঙ্গার পাড় পাহাড়ের মতো উঁচু। এই উঁচু পাড়ের উপর ঠিক গঙ্গার ধারে একটি পরম রমণীয় শান্ত আশ্রম আছে, সেখানে বহু সাধু সন্ন্যাসী কৃত্রিম গুহার মধ্যে বাস করেন। শতাধিক সোপান অতিক্রম করিয়া এই আশ্রমে উঠিতে হয়। অতিথি ও যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য পাকা বাড়ী আছে। এই স্থানটি বোধ হয় কোনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিহার ছিল; এক্ষণে বৈষ্ণব সাধুদের সাধনক্ষেত্র হইয়াছে। এই আশ্রমটি অবশ্যদর্শনীয়।

ঝুঁসির প্রাচীন নাম প্রতিষ্ঠান। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের দৃশ্যস্থান এই প্রতিষ্ঠান। সেই নাটকেও গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমের সুন্দর বর্ণনা আছে। এখানকার রাজাদের কোনো ইতিহাসই পাওয়া যায় না। বাংলায় যেমন হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর কথা প্রচলিত আছে, ঝুঁসির রাজার সম্বন্ধেও সেইরূপ বহু হাস্যকর গল্প শুনা

ঝুঁসি, এলাহাবাদ।

আরাইল, এলাহাবাদ।

যায়। সে রাজার রাজ্যে বিচারপ্রণালী ভারি অদ্ভুত ছিল।

অন্ধের নগরী চৌপট রাজা।
টকা সের ভাজী টকা সের খাজা।

অন্ধকারপূর্ণ নগরীর রাজা বড় চৌপট অর্থাৎ চৌকস্ (square);

বীহ্টায় আবিষ্কৃত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ।

তাঁহার বিচারে সে রাজ্যে টকায়সা সের তরকারী এবং খাজাও টকায়সা সের। সেখানে মুড়ি মুড়কির এক দর।

হিন্দি কবি হরিশ্চন্দ্রের অন্ধের নগরী নামক প্রহসন অতি সুন্দর।

প্রতিষ্ঠানের রাজার নির্ব্বুদ্ধিতার ভরা পূর্ণ হইলে নগর উল্টাইয়া যায় এবং তখনও যা কিছু বাকি ছিল পুড়িয়া শেষ হয়। দহনার্থক "ঝৌস্না" ক্রিয়া হইতে ঝু সি নামের উৎপত্তি।

ঝুঁসিতে ফকিরের সমাধির কাছে একটি গাছ আছে, তেমন গাছ এদেশে আর দেখা যায় না। এজন্য সে গাছের নাম একেলা পেড়। এরূপ গাছ আফ্রিকায় জন্মে; সেদেশী নাম বেয়োবাব।

যমুনার দক্ষিণ পারে কেল্লার সম্মুখেই আরাইল গ্রাম। ইহাও প্রাচীন অলর্ক নামক নগরের অবশেষ। এলাহাবাদের নিকটে জব্বলপুর লাইনে জশরা ষ্টেসনের ধারে বীহ্টা গ্রামে খুঁড়িয়া প্রাচীন এক নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে। এলাহাবাদের আশে পাশে আরো প্রাচীন কীর্ত্তি থাকিতে পারে, তাহারা অনুসন্ধিৎসুর পর্য্যবেক্ষণের অপেক্ষা করিতেছে।

এলাহাবাদে হিন্দুদের ধর্ম্মমন্দির ভিন্ন, আর্য্য-সমাজের উপাসনামন্দির, রাধাস্বামী-সম্প্রদায়ের সৎসঙ্গ, মুসলমানের মস্জিদ ও খৃষ্টানের বহু সাম্প্রদায়িক গির্জ্জা আছে। এখানকার মসজিদ-গুলির কোনোটিই পশ্চিমের অপর সহরের মসজিদের মতো প্রসিদ্ধ বা সুন্দর নহে। এলাহাবাদ ষ্টেসনে পৌছিবার পুর্ব্বে ট্রেণ হইতে ইদ্গার বিস্তৃত উপাসনাক্ষেত্র দেখা যায়।

প্রয়াগে তীর্থযাত্রার পক্ষে মাঘ মাস প্রশস্ত। এই সময় বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় বলিয়া যাত্রী সমাগমকে মাঘমেলা বলে। মকর সংক্রান্তি হইতে মাঘমেলা আরম্ভ হয়। অনেক তীর্থযাত্রী "সঙ্কল্প" করিয়া সমস্ত মাঘমাস ত্রিবেণীর চড়ায় কুঁড়ে ঘরে বাস করেন। ইহাকে কল্পবাস বলে। মাঘের দারুণ শীতে কুঁড়ে ঘরে নদীর ধারে বাস করা শুধু ধর্ম্মবিশ্বাসীদেরই সাধ্যায়ত্ত। এই কৃচ্ছ্র সাধনব্রত পালন করিতে গিয়া অনেকের প্রাণান্ত ঘটে। অগ্নিদাহে কুটীরপল্লী প্রায়ই ধ্বংস হয় এবং অনেকের প্রাণও যায়। আবার পর বৎসর কল্পবাসীদের যে ভিড় সেই ভিড়ই।

মেলার মধ্যে মকর সংক্রান্তি, মাঘী অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এবং বসন্ত পঞ্চমী শুভলগ্ন।

প্রতি বারো বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা হয়। এবং ছয় বৎসর অন্তর অর্দ্ধকুম্ভ হয়। কুম্ভরাশির সময় মেলা হয় বলিয়া ইহার ঐ নাম। কুম্ভমেলায় অসম্ভব জনতা হয়;

ভৈরবীদের স্নানযাত্রা (১৯০৬ সালের কুম্ভমেলা, এলাহাবাদ।)

কুম্ভমেলা, জনতা।

সমগ্র ভারতবর্ষের নরনারী ও সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী একত্র হয়। এই জনতায় কত শিশু হারাইয়া যায়, কত রমণী চুরি হয়, কত লোক ভিড়ের চাপে পিষিয়া মারা পড়ে। লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক দলে বিভক্ত হইয়া ধ্বজা পতাকা উড়াইয়া, তুরী ভেরী শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে ত্রিবেণীতে স্নানযাত্রা করে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ নাগা; স্ত্রী সন্ন্যাসী ভৈরবীদল; কম্বলবস্ত্র; কৌপীনবস্ত্র; কতবিধ সন্ন্যাসী। এই সব মেলা আমাদের দেশী কংগ্রেস; ধর্ম্মক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ একাত্মতা অনুভব করে। ১৯০৬ সালে কুম্ভমেলা হইয়া গিয়াছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কথন

(লাইট বিরচিত "এ্যানি"র অনুকরণে।)

দেখেছি তাহারে　　ছোট বালিকাটি
শৈশবক্রীড়া-রত,
স্নিগ্ধ যেমন　　ঊষার আলোক,
ফুল্ল ফুলেরি মত।

প্রজাপতি তার খেলিবার সাথী—
ছুটাছুটি তারি সনে,
ফুলটি তাহার খেলার জিনিষ—
চেয়ে থাকে আনমনে।

দেখেছি তাহারে ষোড়শ বর্ষে
যুবতী লাবণ্য ভবা,
রূপবাশি যেন চাঁদেব কিবণ
জগৎ-প্লাবিত-কবা।
লজ্জা-আনত আঁখি দুটি সদা,
নম্র মন্দ গতি,
বচনে তাহাব হর্ষগীতিব
ব'য়ে যেত সুধানদী।

তাব পরে তাবে দেখিয়াছি পুনঃ
স্নেহ-বিগলিতা মাতা—
করুণা বিভল, স্নেহ ছলছল
অনিমেষ আঁখিপাতা।
স্তনন্ধয় শিশু আশ্রিত বুকে
কবিতেছে সুধা পান,
মুদে' আসে আঁখি শুনি মাব মুখে
ঘুম পাড়ানিয়া গান।

দেখিলাম তাবে অন্তিম-কালে—
সুখাশ্রু বহিছে ধাবে,
বিদায় মাগিছে স্বামী পুত্র কাছে—
পাব হ'য়ে যাবে পাবে।
করুণ দৃশ্য— ত্যাজল পবাণ
স্বামীব চবণে নমি',
মাধুরী কথন বাড়িল অধিক
বুঝিতে নাবিনু আমি।

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত।

ভাগ্যচক্র

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ফ্র্যাঙ্ক যখন বার্টিকে কিছু না বলিয়া বাড়ির বাহিব হইয়া গেলেন তখন বার্টিব অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল—ফ্র্যাঙ্ক গেল কোথায়? ইভাব ওখানে যায় নাই তো। সে অধৈর্য্যেব সহিত বসিয়া বসিয়া ফ্র্যাঙ্কেব প্রতীক্ষা কবিতে লাগিল।

আব অল্প দিন,—যাত্রাব আয়োজন শেষ হইয়া গেলেই তাহাবা লণ্ডন হইতে বহুদূবে গিয়া পড়িবে—তখন তাহাদেব পায় কে।

একেলা বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে বার্টিব মনে হইতে লাগিল—সে কী পাষণ্ড। সামান্য একটু সুখৈশ্বর্য্যের জন্য সে কী না অপকর্ম্ম কবিতেছে। আশ্রয়দাতাব বন্ধুর সর্ব্বনাশ, নির্ম্মমতা বিশ্বাসঘাতকতা—কোন্‌টাতে সে পশ্চাৎপদ। এ সব কিসেব জন্য? একটু বিলাসিতা? তাহাব মধ্যে কী এমন সুখ। তবে কেন? হায সে জীবন—আমেবিকাব সে স্বাধীন, মুক্ত, যথেচ্ছাব জীবন। এব চেয়ে সে সহস্রগুণে ভালো। সে দুর্গতি, সে দৈন্য, সে দুঃখ,—এ ঐশ্বর্য্য, বিলাসিতাব চেয়ে লক্ষগুণে শ্রেয়। এখন তাহাব কী পাববর্ত্তন কী অধঃপতন। তখন সে জীবন সুপথে চালায় নাই বটে কিন্তু এখনকাব মতো নীচতা, ক্রূবতা তাহাব ছিল না,—এ সব কিসেব জন্য? সামান্য একটু অসাব বিলাসিতাব জন্য বই তো নয়। অসার বিলাসিতা? তাহাব কোনো মূল্য নাই? তবে কেন সে তাহাব পলোভনে আকৃষ্ট হইয়া থাকে? যাউক না সে এ মায়াজাল ছিন্ন কবিয়া সেই দৈন্যেব মাঝে? দুটিমাত্র কথা ফ্র্যাঙ্ককে লিখিয়া জানাইলেই তো সব আপদ চুকিয়া যায়। তবে তাহাই সে করুক না—এতো তাহাব ক্ষমতাব মধ্যে।

বার্টি এই সব কথা ভাবিতে লাগিল, ভাবিয়া তাহাব হাসি পাইল। এ অসম্ভব—একেবাবে অসম্ভব। কিন্তু কেন যে অসম্ভব তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না; তবুও তাহার মনে হইতে লাগিল—এ অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব—এ কাজ কিছুতেই করা যায় না—ইহা মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে—

ইহার মধ্যে বাধা ঢের—দৈবের অলঙ্ঘনীয় বিধানে সব চেষ্টা পণ্ড হইয়া যাইবে নিশ্চয়ই! কিন্তু কি করিয়া যে সব পণ্ড হইয়া যাইবে কিছুতেই সে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল না; সে তখন মনে মনে বলিল—এ বুঝা যাইবে না, থাক্ বুঝিবার চেষ্টায় কাজ নাই, দৈবের মায়া ভেদ করে কাহার সাধ্য!

দাসী আসিয়া তাহাকে বলিল—"বাইরে একটি লোক আপনাকে খুঁজচে।"

"কে সে?"

দাসী বলিতে পারিল না; বার্টি তখন বৈঠকখানায় উঠিয়া গেল। গিয়া দেখে ইভাদের বাড়ীর সেই চাকরটা বসিয়া আছে। সে ভদ্রলোকের মতো পরিচ্ছদ করিয়া আসিয়াছিল—কিন্তু তাহার সেই দীর্ঘ বক্র নাসা, পেঁচার মতো কোটরাবিষ্ট পাংশুল চক্ষু, গণ্ডারের চামড়ার মতো কঠিন মুখখানার মধ্য হইতে ভদ্রতার পোষাকের আবরণ ভেদ করিয়া একটা নীচতা জাগিয়া উঠিতেছিল। বার্টি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"এখানে কিসের জন্য? আমি তোমায় বার বার না বলেচি খবরদার এখানে এস না! তবে কি মনে করে?"

বিশেষ কিছু মনে করিয়া সে আসে নাই—শুধু অনেক দিনের পুরানো বন্ধু বলিয়া সে একবার দেখা করিতে আসিয়াছে মাত্র। সেদিনকার কথা বার্টি নিশ্চয়ই ভোলে নাই—সেই আমেরিকার কথা—সেখানে সে ও বার্টি দুজনে একই হোটেলে বহুদিন এক সঙ্গে চাকরের কাজ করিয়াছে। এখন তাহার অবস্থা ভালো তাই একবার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। এ পৃথিবীটা নিতান্তই ছোটো—নইলে আবার তাহাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ কি করিয়া হইল? যেখানেই যাও ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই পরিচিতদের সঙ্গে আবার মিলন! যদি মনে কর অমুক লোকটাকে এড়াইয়া চলিব কিছুতেই তাহা হইবার যো নাই—যেমন করিয়াই হউক তুমি তাহার দৃষ্টিপথে গিয়া পড়িবে! কী আপদ! আবার সে যদি বিপন্ন হয় তোমার নিকট সাহায্য চাহিয়া বসিবেই!......................দুখানা মারাত্মক চিঠি যে বাড়িতে সে আছে সেই বাড়িতে গিয়া পড়ে—তার জন্য সে কিছু লাভ করিয়াছে বটে! লণ্ডনের খরচ অনেক—সময়ও তাহার ভালো নহে—একটু আধটু আমোদ প্রমোদ করিতে গেলেই ব্যয় ভয়ঙ্কর! ইহার মধ্যে আর একখানি চিঠি আসিয়া পৌঁছিয়াছে আর্চিবল্ডের নামে। কে জানে কাহার লেখা! সে চিঠিখানি সরাইতে তাহার বিশেষ ইচ্ছা নাই—আহা বুড়া মানুষ! কিন্তু কি জানি তাহার মধ্যে যদি কিছু গোল থাকে এই মনে করিয়া সে বার্টিকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে!—আর কিছু নয়!

বার্টির মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সে হাতখানা অধীরভাবে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"কই! দাও সে চিঠি!'

হ্যাঃ—কিন্তু মোটে ত্রিশটি পাউণ্ড—তাতে কি হয় বল এতো যে সে চিঠি নয়—এ আর্চিবল্ডের নামের চিঠি—এর তো একটা দাম আছে! সত্য কথা বলিতে কি তাহার আর্থিক অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়। বার্টির তো পয়সার ভাবনা নাই—সে এখন দুহাতে পয়সা ছড়াইতে পারে—পুরানো বন্ধুর প্রতি তাহার টানও আছে, বন্ধুকে কি আর সে এমনি করিয়া দুঃখ দৈন্যের মধ্যে ফেলিয়া রাখিবে? এ পৃথিবীতে, কি জানো, পরস্পরের সাহায্য না থাকিলে চলে না। সে বন্ধুকে সাহায্য করিতেছে, বার্টিরও করা উচিত। বেশি নয়—মাত্র একশ পাউণ্ড!

বার্টি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"রাস্কেল! ত্রিশ পাউণ্ডে না আমাদের চুক্তি? একশ পাউণ্ড—আমার অত টাকা নেই!"

তা সে জানে। কিন্তু ফ্রাঙ্কের তো টাকার অভাব নাই! বার্টির উচিত ভালো করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখা - বন্ধুর জন্য কি সে এতটুকু কষ্ট স্বীকার করিবে না। আর একশ পাউণ্ড, এমনই বা কি বেশি!

বার্টি কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"কিন্তু আমার কাছে তো এখন একশ পাউণ্ড নেই।"

বেশ—সে না হয় অন্য সময় আসিবে—চিঠি তার হাতে নিরাপদ!

বার্টি উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিল—"টাকা আমি দেবো—চিঠিখানা আমায় দাও!"

ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই—তাহার বন্ধু তাহাকে বিপদে ফেলিবে না, পরস্পরে একটু বিশ্বাস থাকা চাই। টাকা দিলেই চিঠি!

—"কিন্তু খবরদার এখানে আর এস না !"

বেশ! তাহাতে তাহার কোনো আপত্তি নাই। বার্টিই না হয় তাহার বাড়ি পায়ের ধুলা দিবে। এবং কাজটা না হয় কালই হইবে।"

—"আচ্ছা, কালই যাবো—এখন যাও—বেরোও !" বলিয়া বার্টি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিল। তাহার পর দাসীকে ডাকিয়া ভয়ে ভয়ে সে সন্ধান করিতে লাগিল লোকটাকে সে চেনে কি না। জুয়ারী যেমন খেলার সঙিন্ অবস্থায় অধৈর্য্য হইয়া উঠে তেমনি অধৈর্য্যভাবে বার্টি দাসীকে রুঢ়তার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"লোকটা কে ?"

দাসী জানাইল সে চেনে না সে অবাক হইয়া গিয়াছিল—বার্টিও তাহাকে চেনে না ! সে জিজ্ঞাসা করিল —"লোকটাকে কি রকম বুঝলেন ?"

—"একটা ভিখারী !"

—"ভিখারী ? কিন্তু আপনাদের মতো ভদ্রলোকের যে পোষাক !"

বার্টি বলিল—"সাবধান ! ও রকম লোক কক্ষনো এ বাড়িতে ঢুকতে দিও না !"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বার্টি ফ্র্যাঙ্কের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। আজ তাহার হৃদয়টা যেন কেমন করিতেছে ! সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে অশ্রুস্রোত আজ কোনো বাধা মানিতেছে না,—হৃদয় প্লাবিত করিয়া, মর্ম্ম শূন্য করিয়া, লীলাভরে সে কেবলই ছুটিতেছে—বার্টির যত বেদনা যত রুদ্ধ আবেগ আজ যেন বুকের মধ্যে আর না স্থান পাইয়া উপচাইয়া পড়িতেছে। আজ তাহার মনে হইতেছে তাহার জীবনের এ কী দুর্দ্দিন ! বিশ্বের সমস্ত বেদনা আজ জাগ্রত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে ! হৃদয়ের এ কী নিষ্পেষণ। সে কি করে ? কোথায় যায় ? আত্মহত্যা ? সেই ভালো ! সে ছুটাছুটি করিয়া আত্মহত্যার জন্য একটা অস্ত্র সন্ধান করিতে লাগিল। হাতের কাছে কিছু না পাইয়া সে গলাটাকে দু হাত দিয়া সজোরে টিপিয়া ধরিল। চক্ষু কপালের দিকে উঠিতেছে. রুদ্ধ নিশ্বাস দেহের সমস্ত শিরা ছিঁড়িয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, চক্ষু অন্ধকার ; —আর একটু জোর চাই, ব্যস ! কিন্তু কৈ সে জোর— কৈ সে সাহস !

বার্টি নিজের অক্ষমতায় ব্যথিত, লজ্জিত হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

তখন রাত্রি একটা। এতক্ষণে নিশ্চয় ফ্র্যাঙ্কের আসিবার সময় হইয়াছে। বার্টির চমক ভাঙিল। আয়নার দিকে ফিরিতেই নজরে পড়িল তাহার সেই বিশ্রী চেহারা- রক্তহীন মুখশ্রী, ক্রন্দনস্ফীত চক্ষু, উদ্বেগচঞ্চল নীল কপোল ! না, না, ফ্র্যাঙ্ককে এ মূর্ত্তি দেখানো নয় ! সে তাড়াতাড়ি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কম্পিত দেহে শয্যা গ্রহণ করিল। কিন্তু ঘুমাইল না ;—কখন সদর দরজা খোলার শব্দ হয় তাহাই শুনিবার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ফ্র্যাঙ্ক ফিরিল। অ্যাঁ ! ইভাদের বাড়ি নয় ত ! না, না, না—নিশ্চয়ই ক্লাবে গিয়াছিল।

ফ্র্যাঙ্ক বরাবর নিজের শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন— নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বাহির হইতে দ্বার বন্ধের শব্দ উঠিল।

আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া বার্টি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। এতক্ষণে ফ্র্যাঙ্কের ঘরের বাতি নিশ্চয় নিবিয়াছে ! তাহার সেই বিবর্ণ মূর্ত্তি ফ্র্যাঙ্কের চোখে না পড়ে ! বার্টি কম্পিত হস্তে দরজায় টোকা মারিল।

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"কে বার্টি ? এস।"

বার্টি প্রবেশ করিল। ঘর প্রায় অন্ধকার—সামান্য একটা আলো মিট্ মিট্ করিয়া এক কোণে জ্বলিতেছে। বার্টি সেই আলোর দিকে পিঠ রাখিয়া দাঁড়াইল। বার্টির কেবলই ভয় হইতে লাগিল—এই বুঝি ফ্র্যাঙ্ক বলে সে ইভাদেরই বাড়ি গিয়াছিল। না। ফ্র্যাঙ্ক শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে বার্টি ?"

বার্টি বলিল—"বড় জরুরি দরকার তাই এত রাত্রেই এসেচি। অনেক দিনের একটা দেনা আছে, এখন শোধ না করলেই নয়। তোমার উপর অত্যাচার করা হচ্ছে বুঝচি ; কিন্তু উপায় নেই। কিছু টাকা দিতে পারবে ?"

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"এখন আমার বড় টানাটানির সময়, জান তো ! কত চাই ?"

—"একশ পাউণ্ড।"

—"একশ পাউণ্ড! এত টাকা এখন পাবো কোথায়? তোমার কি এখনই দরকার—দুদিন সবুর করলে চলে না?"

বার্টি কাতর হইয়া বলিল—"না দেরী করবার যো নেই।" তাহার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ, ভয়, নৈরাশ্য মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল!

বার্টির সে অবস্থা দেখিয়া ফ্র্যাঙ্কের মায়া করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা দাঁড়াও দেখি—আচ্ছা, কোনো রকমে যোগাড় করে দেবো। কাল বলব।"

"কাল সকালেই চাই।"

—"কাল সকালেই—এত তাড়া? আচ্ছা সে হবে। এখন শোওগে, আমার ঘুম পেয়েচে। কাল সকালেই টাকা পাবে—যেমন করে পারি যোগাড় করে দেবো—ভয় নেই, তোমায় মুস্কলে ফেলবো না। কিন্তু বলে রাখি তুমি বড় বাড়িয়েচ—এই সে দিন ত্রিশ পাউণ্ড দিলুম, দুদিন যেতে না যেতেই আবার ত্রিশ পাউণ্ড নিলে!"

মুহূর্ত্তের জন্য বার্টি আলোর পশ্চাতে ছায়ার মতো শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তার পর ফ্র্যাঙ্কের বিছানার উপর আছড়াইয়া পড়িয়া রুদ্ধশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল।

ফ্র্যাঙ্ক অধীর ভাবে উঠিয়া বসিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন—"বার্টি, কি হয়েচে? কান্না কিসের?"

বার্টি মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তোমার উপর ভারি অত্যাচার করচি—আমি নরাধম! তোমার নিজের দুঃখেই তুমি কাতর তার উপর আমার দুঃখের বোঝা। আমি বড় বিপদে পড়েচি নইলে তোমায় বিরক্ত করতুম না। আমার এ কিসের দেনা সে কথা বলতেও লজ্জা করে—সেই যে দিনকতক পালিয়েছিলুম এ সেই সময়কার দেনা। বুঝেচ—বুঝতে পেরেচ?"

ফ্র্যাঙ্ক একটু হাসিয়া বলিলেন—"ও-ও! বুঝেছি ভবিষ্যতে সাবধান থেকো! তোমার কোনো ভাবনা নেই, কাল আমি সব ঠিক করে দেবো—এখন শোওগে—যাও।"

বার্টি দাঁড়াইয়া উঠিল—হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য ফ্র্যাঙ্কের হাতখানা একবার নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইল।

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"যাও আর দেরী কোরো না—ঘুমোওগে।"

বার্টি নিজের ঘরে গেল। তাহার চক্ষে ঘুম নাই—সে বসিয়া বসিয়া ফ্র্যাঙ্কের নাসিকাধ্বনি শুনিতে লাগিল। তাহার প্রাণের মধ্যে তখনো একটা ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। আর সহ্য হয় না! সে আর একবার সজোরে নিজের গলাটা টিপিয়া ধরিল—জোরের পর জোর দিতে লাগিল—প্রাণটা বাহির হইবার উপক্রম!

চতুর্থ ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুই বৎসর কাটিয়া গেছে। আমেরিকা হইতে অষ্ট্রেলিয়া, অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমেরিকা তারপর ইউরোপ এই করিয়া ঘুরিয়াই দিনগুলা গেল। কিন্তু তবু মনের শান্তি কই? নূতন নূতন দেশে গিয়া জীবনের স্রোত তো কই নূতন দিকে ফিরিল না;—সেই অতৃপ্তি, সেই হাহুতাশ, সেই বেদনা বুকে বিঁধিয়াই রহিল! কোনো নূতন উদ্দেশ্য, কোনো নূতন কাজ, কোনো নূতন চিন্তা অতীতের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে তো নূতনের মধ্যে ডুবাইয়া দিতে পারিল না! ফ্র্যাঙ্ক যেমনই ছিলেন তেমনই রহিলেন। নূতনের মধ্যে এইটুকু হইয়াছে যে এত দিন জীবনযাত্রার যে দুর্ভাবনা ছিলনা এখন তাহা ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিতেছে! মাসের পর মাস গেলেই টাকা আপনি আসিয়া পড়িবে এই নিশ্চিন্ততা দূর হইয়া যাইতেছে—এখন টাকা কেমন করিয়া সংগ্রহ হইবে তাহার জন্য একটা চেষ্টা—একটা নিদারুণ চেষ্টা চাই! অর্থগুলা কর্পূরের মতো এই কবছরে উবিয়া গেছে! এখন খাটিয়া পয়সা না আনিলে জীবন বাঁচে না। জীবনের মধ্যে কোনো তৃপ্তি, কোনো সুখ নাই, তবুও তো সেই জীবনটাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আজ এ আপিসে কাল ও আপিসে চাকুরির সন্ধানে ঘুরিতে হইতেছে!

দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম;—ক্ষুধার তাড়না, অন্নবস্ত্রের দৈন্য, আশ্রয়ের হীনতা এ সমস্ত দুঃখের সহিত স্বীকার

করিয়া তাঁহারা দিন কাটাইতে লাগিলেন ;—হায় কোথায় এখন সেই বিলাসভবন হোয়াইট রোজ কটেজ!

প্রথমে যতটা লাগিয়াছিল কিছু দিন যাইতে আর ততটা বেদনা রহিল না। ক্রমেই দৈন্যের পীড়ন সহিয়া আসিতে লাগিল ;—ভবিষ্যতের ভয়, জীবনযাত্রার দুঃখ কষ্ট সবই সহজ হইয়া আসিল। দিন রাত যে একটা জীবন মরণের সংগ্রাম, একটা নিদারুণ চেষ্টা চলিয়াছে এমন আর বোধ হইতে লাগিল না—ক্রমে সে সমস্ত স্বাভাবিক হইয়া আসিল।

এত দুঃখেও কিন্তু বার্টি দমে নাই। সে মনে মনে একটা আত্মগৌরব বোধ করিতেছিল—ফ্র্যাঙ্কের এ দৈন্যের দিনে, তাহার এই দুরবস্থায় বার্টির মুহূর্ত্তের জন্যেও মনে হয় নাই যে সে ফ্র্যাঙ্ককে এইবার ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সে যে বিলাসিতাটুকুর জন্য ছিল তাহা যখন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে তখন আর কেন সেখানে সে পড়িয়া থাকিবে এ চিন্তা একবারও তাহার মনে উঠে নাই ;—ইহার জন্য, সে সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহিয়াও, নিজের উপর ভারি খুসী ছিল—সে এই বলিয়া এখন নিজের নীচতা, স্বার্থপরতাকে ধিক্কার দিত যে এতদিন তাহার বিবেক যাহাকে নীচতা স্বার্থপরতা বলিয়াছে তাহা নীচতা নহে, তাহা স্বার্থপরতাও নহে—তাহা বন্ধুর প্রতি নিঃস্বার্থ, পবিত্র, স্বর্গীয়, আদর্শ, প্রেম! নইলে বন্ধুর এ দুঃখের দিনে সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে না কেন!

সত্যই বার্টি আনন্দেব সহিত ফ্র্যাঙ্কের এ দুঃখ দৈন্য বণ্টন করিয়া ভোগ করিতেছিল—একদিনের জন্যও সে কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ হয় নাই, পরিশ্রমকে পরিশ্রম জ্ঞান করে নাই, নিজের উপার্জ্জনের অংশ ফ্র্যাঙ্ককে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই—মনের মধ্যে কোথাও এতটুকু অসন্তোষ রাখে নাই। ফ্র্যাঙ্কের দুর্ভাগ্যকে নিজের ভাগ্যের সহিত জড়িত করিয়া সে বেশ তৃপ্তিতে ছিল। তাহার স্বভাবটা ছিল লতার মতো পরমুখাপেক্ষী—ঝড়ের সময় লতা যেমন বৃক্ষকে আঁকড়াইয়া বৃক্ষের সহিত পড়িয়া মরে সেও তেমনি করিয়া মরিতে প্রস্তুত ছিল। সে সত্যই ফ্র্যাঙ্ককে ভালোবাসিত।

আরো দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তখন হাতে কিছু পয়সা জমিয়াছে। এত দিন বিদেশে থাকিয়া দেশে ফিরিবার জন্য কেমন একটা ঔৎসুক্য তাহাদের মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—মনে হইল যেন জীবনের সমস্ত গ্লানি সেই জন্মভূমির স্নেহস্পর্শের আরামের অপেক্ষায় এখনও দূর হইতেছে না,—শৈশবের লীলাভূমি তাহাদিগকে আবার যেন সেই শৈশবের জীবন—শৈশবের আনন্দ, সরলতা ফিরাইয়া দিবে।

হাতে যতটুকু অর্থ জমিয়াছে সেইটুকুতে কয়েকটা মাস বেশ নিশ্চিন্তে বিশ্রাম লইবার জন্য তাহারা হলাণ্ডের এক গ্রামে—সমুদ্রতীরে—বাড়ি ভাড়া লইয়া নির্জ্জনবাসে রহিল। জনতা, আমোদ প্রমোদ মেলা মেশা আর ভালো লাগেনা ;—সমুদ্রের দৃশ্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব রূপে প্রতিভাত হইয়া তাহাদের অলস দিনগুলাকে বেশ সরস করিয়া তুলিত। ফ্র্যাঙ্ক তো মোটেই বাড়ির বাহির হইতেন না—বারান্দার রেলিংএ পা তুলিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া—মুখের সামনে কুণ্ডলীকৃত সিগারেটের ধূম উড়াইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া সমস্ত দিন বসিয়া থাকিতেন। তাহাতে ফ্র্যাঙ্কের একটা বেশ শান্তি ছিল—হৃদয়ের বেদনাগুলা যেন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের আঘাতে নিস্তেজ হইয়া আসিত ; অতীতের দুঃখস্মৃতি তরঙ্গগানে ঘুমাইয়া পড়িত, নিজের সত্তা নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া যাইত!

কিন্তু বার্টির প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিত। সে যখন দেখিত তরঙ্গের পর তরঙ্গ বিশাল বিপুল হইয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে ছুটিয়া আসিতেছে, যখন দেখিত উপরের আকাশ নীল, সমুদ্রের জল নীল ;—বিশ্বব্যাপী নীলিমা! বিশ্বের সমস্ত ভয় যেন সেখানে স্তব্ধভাবে জড়ো হইয়া আছে, তখন তাহার মনে হইত সমুদ্রের আকাশ হইতে যেন তাহার ভাগ্যবিধাতা নামিয়া আসিতেছেন—ক্রমেই নিকটে আরো নিকটে আসিতেছেন। সে ভয়ে নিশ্চল হইয়া ভাগ্যপুরুষের সেই ভৈরব আগমন দেখিত—সে শুনিত সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মধ্য হইতে যেন তাঁহারই আগমনী বাজিয়া উঠিয়াছে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন বার্টি সমুদ্রের উপকূলে আনমনে বসিয়া আছে হঠাৎ দেখে বহুদূরে কালো ছায়ার মতো দুটি মূর্ত্তি! তাহাদিগকে ভালো করিয়া চেনা যাইতেছিল না, কিন্তু দেখিয়াই

বার্টি'র বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল—কেমন একটা অস্পষ্ট ভয় ও বেদনার স্পন্দন সমস্ত দেহের মধ্যে বিদ্যুৎ গতিতে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বার্টি' স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণে সমুদ্রের উপর হইতে বাতাসের একটা ঝটিকা আসিতেই যেন তাহার চমক ভাঙিল; সে তখন ভালো করিয়া দেখিবার জন্য একাগ্র নয়নে চারি দিকে চাহিল। তাহার চোখে তখন সবই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—ঐ দূরে চক্রবালের দিকে ধূসরবর্ণ বঙ্কিম আকাশ;—সমুদ্রের শ্বেত ফেনিল জলোচ্ছ্বাস তাহার গায়ে গিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে—ভাঙিয়া পাড়িয়া দিকে দিকে নানা বর্ণে ফুটিয়া উঠিতেছে; দক্ষিণে দৈত্যের মতো একটা প্রকাণ্ড জাহাজ অসংখ্য চক্ষু বাহির করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, দূরে সমুদ্রের ধারে ধারে জেলেদের নৌকাগুলা নানা রঙ্গে হেলিতেছে, দুলিতেছে; বালির চরের উপর ছেলে মেয়েদের খেলা জমিয়াছে, তাহার কিছু দূরে একটা জনতা—কেহ চলিতেছে, কেহ বসিয়া আছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কাহারো মাথার লাল ফিতা বাতাসে আকাশের গায়ে উড়িতেছে, কাহারো ওড়না স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। বার্টি'র চোখে এসব কিছুই বাদ পড়িল না—সে সমস্ত জিনিষ খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু সকলকার চেয়ে বেশি করিয়া এবং বড় ও স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল দুটি মূর্ত্তি—একটি পুরুষ ও একটি রমণী!

তাহাদিগকে চিনিতে বার্টির বেশি বিলম্ব হইল না—তাহার মাথাটা কেমন ঘুরিয়া গেল, মনে হইল এখনই বুঝি জলের মধ্যে পড়িয়া যায়, সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল—এবং সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে চোখের সামনে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কী উপায়! কী উপায়! এমন কি কোনো উপায় নাই যাহার দ্বারা ফ্র্যাঙ্ককে এই মুহূর্ত্তে এই স্থান ত্যাগ করানো যায়! ওঃ পৃথিবীটা কী ক্ষুদ্র! যাহাকে এড়াইবার জন্য এত দেশ পালাইয়া বেড়ানো হইল, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারই সহিত সাক্ষাৎ! কিছুতেই তাহার দৃষ্টির বাহিরে থাকা গেল না! এ কী? এ একটা হঠাৎ ঘটনা? না এ দৈবপুরুষের চাতুরী? না—না—এ আর কিছু নয় নিঃসন্দেহ এ নিদারুণ ভাগ্যচক্রের খেলা!

তবে বার্টি' কি করিবে? দৈবেরই জয় হোক! ভয় করিয়া লাভ কি—চেষ্টা করিয়া ফল কি? যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাকে কে ঠেকাইতে পারে? সে তো চেষ্টার ক্রটি করে নাই তবু ভাগ্য ফিরিল কই?

এই ভাবিয়া বার্টি' হতাশায় নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল—মনের মধ্যে বাধা দিবার কোনো প্রবৃত্তি, চেষ্টার কোনো উদ্যোগ রহিল না! সম্মুখে সমুদ্রের চঞ্চল জল খেলা করিতেছে সে তাহারই পানে চাহিয়া যাহা হইবে তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। স্বার্থের জন্য সংগ্রামের আর আবশ্যক নাই- কি হয় তাহাই বসিয়া বসিয়া দেখ। তাহার মনে হইল সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন করিয়া কূলে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে তেমনি করিয়া দৈবদুর্ব্বিপাক তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে,—তরঙ্গের যেমন প্লাবন তেমনি প্লাবনে তাহাকে কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিবে!

তাহারা তাহার সমুখ দিয়া চলিয়া গেল। বার্টি'র বুকের এ কী স্পন্দন! নৈরাশ্য, ভয়, দুর্ভাবনা তাহার হৃৎপিণ্ডটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে! সে কি করিবে? পালাইবে? না, না কোনো ফল নাই পালাইয়া! দৈবের হাতে নিস্তার কোথায়? তবে ভাগ্যবিধানের জন্য স্থির হইয়া অপেক্ষা করাই শ্রেয়! কিন্তু আর কত দিন? হে ভগবান্ যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছ তাহা দাও—শীঘ্র দাও—আর অপেক্ষার যন্ত্রণা সহ্য হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাচীনকালে শবব্যবচ্ছেদ

(আশুমৃতক পরীক্ষা)

চাণক্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত।

অকস্মাৎ কাহারও মৃত্যু হইলে, তাহার মৃতদেহ তৈলচর্চ্চিত করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।

যে শব শ্লেষ্মা এবং মূত্রদ্বারা কলঙ্কিত, যাহার ইন্দ্রিয়গুলি বায়ুপরিপূর্ণ, হস্তপদ স্ফীত, চক্ষু উন্মীলিত, এবং কণ্ঠদেশে বন্ধনচিহ্ন প্রতীয়মান হয়, সেই ব্যক্তি শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।

যাহার হস্ত ও জঙ্ঘা সঙ্কুচিত দেখা যায়, সেই ব্যক্তি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে।

মৃত ব্যক্তির হস্ত ও চক্ষু কঠিন হইলে, দন্তদ্বারা জিহ্বা দংশিত অবস্থায় থাকিলে এবং উদর স্ফীত হইলে বিবেচনা করিতে হইবে যে সে জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

শোণিতসিক্ত এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষত ও ভগ্ন হইলে বুঝিতে হইবে যে ঐ ব্যক্তিকে কাষ্ঠ ও রশ্মিদ্বারা হত করা হইয়াছে।

অস্থি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভগ্ন থাকিলে বিবেচনা করিতে হইবে যে মৃত ব্যক্তিকে নিক্ষেপ করিয়া মৃত্যুমুখে প্রেরণ করা হইয়াছে।

হস্ত, পদ, দন্ত ও নখ কৃষ্ণবর্ণ, চর্ম্ম শিথিল এবং মুখমণ্ডল লালা ও ফেনযুক্ত হইলে মৃত ব্যক্তির প্রতি বিষপ্রয়োগ হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। মৃত ব্যক্তির শরীরে শোণিতদষ্ট চিহ্ন থাকিলে সর্প অথবা বিষাক্ত কীটের দংশনে মৃত্যু হইয়াছে এইরূপ অনুমান করিতে হইবে।

অতিরিক্ত বমি ও বিরেচনের পরে গাত্রবস্ত্র বিক্ষিপ্ত হইয়াছে যে ব্যক্তির তাহার মদন বৃক্ষের রস প্রয়োগে মৃত্যু হইয়াছে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রকারে মৃত্যু হইলেও, অনেক সময় দণ্ডের ভয়ে, কণ্ঠদেশে বন্ধনচিহ্ন করিয়া মৃতব্যক্তি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে এইরূপও করা হয়।

বিষপ্রয়োগে মৃত্যু হইলে ভুক্ত দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ দুগ্ধে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। অথবা উহা উদর হইতে বাহির করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি চিট্‌চিট শব্দ হয় এবং ইন্দ্রধনুর বর্ণ হয় তাহা হইলে উহাতে বিষ আছে এইরূপ প্রকাশ করা যাইতে পারে।

অথবা, যখন হৃদয় ব্যতীত শরীরের অন্যান্য সকল অংশই ভস্মীভূত হয়, তখন মৃতব্যক্তির ভৃত্যগণ মৃতব্যক্তির নিকট দণ্ড্য এবং পৌরুষ ভাবে ব্যবহৃত হইত কিনা এই বিষয় উহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। এই প্রকারে, মৃত ব্যক্তির যে সকল আত্মীয় কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করে, অন্যের প্রতি যে আত্মীয়া স্ত্রীলোক আসক্তা, অথবা যে আত্মীয় মৃতব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন স্ত্রীলোকের অপহৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে নিযুক্ত—ইহাদের প্রশ্ন করিতে হইবে।

উদ্বন্ধনে মৃত ব্যক্তির শরীর সম্বন্ধেও এইরূপ প্রশ্ন করিতে হইবে। (ইচ্ছা পূর্ব্বক) উদ্বন্ধনে মৃত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপরের যে ক্ষতি বা অনিষ্ট হইয়াছে সে বিষয়গুলিও অনুসন্ধান করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত কারণে অকস্মাৎ মৃত্যু হইতে পারে।—স্ত্রীলোক অথবা আত্মীয়ের প্রতি বিরাগ, স্বব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিপক্ষের প্রতি দ্বেষ, পণ্যসংস্থান, সমবায়, এবং আইনঘটিত বিবাদ—এই সকল কারণে রোষান্বিত হইয়া মৃত্যু সংঘটন হয়।

যখন, শত্রুর আকৃতির সহিত সাদৃশ্য থাকার জন্য মৃতব্যক্তি কর্ত্তৃকই নিযুক্ত লোক, কিংবা অর্থের নিমিত্ত চোর অথবা তৃতীয় ব্যক্তির শত্রু কোন ব্যক্তিকে নিহত করে, তখন মৃত ব্যক্তির আত্মীয়ের নিকট নিম্নলিখিত প্রকারে প্রশ্ন করিতে হইবে।

কে মৃত ব্যক্তিকে ডাকিয়াছিল? তাহার সঙ্গে কে ছিল? পর্য্যটনকালে কে তাহার অনুবর্ত্তী ছিল? অকুস্থানে কে তাহাকে লইয়া গিয়াছিল?

হত্যাভূমির নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিগণকে ব্যক্তিগত ভাবে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করিতে হইবে।—মৃত ব্যক্তিকে কে তথায় লইয়া গিয়াছিল? সাক্ষিগণ ঘটনাস্থলে অস্ত্রধারী চিন্তাক্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে লুক্কায়িত থাকিতে দেখিয়াছিল কি না? সঙ্গিগণের নিকট হইতে কোন সূত্র পাইলে সে সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করিতে হইবে।

মৃত্যুকালে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যে সকল দ্রব্যাদি ছিল—যথা, ভ্রমণোপযোগী দ্রব্যাদি, বস্ত্র ও রত্নাদি যাহা মৃতব্যক্তির অঙ্গে ছিল, যাহারা ঐ সকল দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়াছিল অথবা উক্ত দ্রব্যাদির সহিত কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট ছিল তাহাদের ও মৃতব্যক্তির সহকারীদের, বাস ও ভ্রমণের কারণ, এবং ব্যবসায় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

যদি কোন স্ত্রী বা পুরুষ, কাম, ক্রোধ অথবা অন্য কোন পাপের বশবর্ত্তী হইয়া রজ্জু অস্ত্র বা বিষপ্রয়োগে আত্মহত্যা করে বা অপরকে আত্মহত্যা করিতে প্ররোচিত করে, তবে ঐ স্ত্রী বা পুরুষকে চণ্ডালদ্বারা রাজপথ দিয়া টানিয়া

লইতে হইবে। উপরোক্ত হত্যাকারিগণের আত্মীয়গণ কোন প্রকার শবদাহ বা শ্রাদ্ধাদি করিতে পারিবে না। এই সকল হতভাগাগণের কোন আত্মীয় যদি শ্রাদ্ধাদি করে, তবে তাহার নিজের শ্রাদ্ধাদি রহিত করিতে হইবে অথবা তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যাহারা নিষিদ্ধ ধর্ম্মাচার (উপরোক্ত ক্ষেত্রে) আচরণ করে, তাহাদের সহিত যাহারা সম্মিলিত হইবে তাহারা এবং তাহাদের সহযোগীবর্গও একবৎসর পতিতের ন্যায় যাজন, অধ্যাপনা এবং দান ও দান গ্রহণের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

গরু ও জরু

(একটি ফরাসী কবিতার অনুসরণে)

একটি জোড়া বলদ আমার দুধে ধোয়া অঙ্গ,
অমন জুড়ি মিল্‌ল না আর,—খুঁজে এলাম বঙ্গ।
চালার নীচে দাঁড়িয়ে আছে ঐ দুটি মোর লক্ষ্মী,
ওরাই আমার দুখের দুখী, ওরাই পোহায় ঝক্কি;
ওরাই চষে, ওরাই মাড়ে, ওরাই জোগায় অন্ন,
ভূতের মতন খাটে, কিন্তু দুধের মতন বর্ণ!
যে দাম দিয়ে কিনেছিলাম হরিহরের ছত্তরে
চতুর্গুণ তার দিচ্ছে আদায়—দিচ্ছে প্রতি বচ্ছরে।
মোড়লের ঝি মারা গেলে মনে খুবই লাগ্‌বে,
(কিন্তু) গরুর ভাল মন্দ হ'লে দাগা বুকে থাক্‌বে।

থাকমণির বিয়ের খরচ রীতিমতই করব,
নগদ দেব দেড়শো টাকা গয়নাতে গা' ভরব;
বাজু দেব, সাঁথি দেব, দেব রূপার পৈঁচে,
জানিয়ে দেব দশ জনেরে কৃপণ আমি নই যে;
দুধুলি গাই দেব তারে—দেব বাছুর সুদ্ধ,
থাকর সুখের জন্যে আমি করব হদ্দ মুদ্দ;
কিন্তু যদি বলদ জোড়ার উপর সে দ্যায় দৃষ্টি,
বল্‌ব সোজা—'রেখে দে তোর বায়না অনাসৃষ্টি।'
থাকর মা—সে মারা গেলে মনে খুবই লাগ্‌বে,
(কিন্তু) গরুর ভাল মন্দ হ'লে দাগা বুকে থাক্‌বে।

নধর দেহ, দুধের বরণ,—দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায় গো,
এম্‌নি শান্ত—চড়ুই এসে বসে শিঙের চূড়ায়ও!
কেনা গোলাম কেবল খাটে!—জোয়াল নিয়ে স্কন্ধে,
জাব্‌না খায়, আর জাবর কাটে ঘনায় যখন সন্ধ্যে,
বছর বছর সহর থেকে কতক আসে কসাই যে,
কিন্‌বে বলে' বলদ জোড়া! আমায় বলে "মশাই হে,
এত দেব! অত দেব!" আমি বলি "নমস্কার!
গরু আমি বেচ্‌বনাকো, গরুর ভিতর প্রাণ আমার।"
মোড়লের ঝি মারা গেলে মনে খুবই লাগ্‌বে,
(কিন্তু) জরুর চেয়ে গরুর কথাই বেশী বেশী জাগ্‌বে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

নবীন সন্ন্যাসী

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গঙ্গামণির মুক্তি

গদাই পাল চলিয়া গেলে, সন্ধ্যার পর বাগানবাড়ীতে মালী আপনার কুটীরের সম্মুখস্থিত চারপাইখানিতে বসিয়া গদাই-প্রদত্ত একটি বোতল খুলিল। মালীবধূ একটা পিতলের ছিপায় খানকতক টেংরামাছ ভাজা ও কিছু বেসমের ফুলুরী দিয়া গেল। তৎসংযোগে মালী বসিয়া বসিয়া বোতলটির রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইল।

মালীর শ্বাশুড়ী সেই পথে যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া সে বলিল—"মাঈ, ভিতরে বন্ধ করিয়া আসিয়াছিস্?"

বৃদ্ধা বলিল—"না বেটা, জল দিয়া আসিয়াছি, এখনও চুলায় আগুন দেওয়া হয় নাই।"

"তবে বেশী দেরী করিস না। সব কাজ করিয়া, চাবি আনিয়া আমাকে দে।"

বৃদ্ধা তখন ধীরে ধীরে বাটীর পশ্চাৎদিকে গিয়া পূর্ব্ব-বর্ণিত দ্বারের তালাটি খুলিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া, সেই তালাটি আবার ভিতরের দিকের কড়ায় লাগাইয়া বন্ধ করিয়া দিল। সেখানটায় বিষম অন্ধকার। দেওয়া-লের গায়ে হাৎড়াইয়া, একটা কুলুঙ্গী হইতে বৃদ্ধা দিয়াশলাই বাহির করিয়া প্রদীপ জ্বালিল। তখন দেখা গেল, সেটি

একটি অল্প পরিসর কক্ষ বা চলন-ঘর। তাহার একপ্রান্তে উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। প্রদীপটি হাতে করিয়া সেই সিঁড়ি দিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া গেল।

দ্বিতলের উপর একটি লম্বা সরু বারান্দা। তাহার একদিকে সমস্তটা কাঠের ঝিলমিল দিয়া আবদ্ধ। অপর প্রান্তে একটি দ্বার, তাহাতেও শিকল লাগান রহিয়াছে। শিকল খুলিয়া বৃদ্ধা ভিতরে প্রবেশ করিল।

সে স্থানে খানিকটা আবরণশূন্য ছাদ—উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এখানে ওখানে দুই তিনটি কক্ষের দ্বার দেখা যাইতেছে। তাহার একটি তখন খোলা ছিল, ভিতর হইতে অল্প আলোক বাহির হইতেছিল। বৃদ্ধা তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

কক্ষখানি সুন্দরভাবে সজ্জিত। টেবিল, চৌকি, ছবি, কাচের পুতুল প্রভৃতি ইহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। ভাল খাট বিছানা রহিয়াছে, তথাপি একটি কৃশাঙ্গী যুবতী একখানি মাদুর পাতিয়া মেঝের উপর শয়ান ছিল। একস্থানে টেবিলের উপর একখানি বৃহৎ আয়না এবং নানা-বর্ণের কেশতৈল সাজান রহিয়াছে, কিন্তু এই রমণীর কেশ-রাশি রুক্ষ, আলুলায়িত। মাদুরখানির উপর স্বীয় বাম করকে উপাধান করিয়া গঙ্গামণি শুইয়া ছিল।

বৃদ্ধাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া গঙ্গামণি চকিতভাবে উঠিয়া বসিল। প্রদীপটা উজ্জ্বল করিয়া দিল। তখন সেই আলোকে দেখা গেল, অভাগিনী পরমা সুন্দরী। বয়ক্রম বিংশতি বর্ষের অধিক হইবে না। চক্ষু দুইটি বৃহৎ ও কোমল। মুখখানি বড় বিষণ্ণ।

বৃদ্ধাকে দেখিয়া গঙ্গামণি বলিল—"কি মাঈ, আজ যে এত দেরী?"

"কাল আমাদের পরব কি না, তাই খাবার প্রস্তুত করিতেছিলাম।"

"পরব?—পরব কি?"

"পরব এই যাকে বলে তেহওয়ার। কাল দেওয়ালী।"

"কি হয়?"

"খানাপিনা হয়। রাত্রে সবাই ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালায়। তোদের বাঙ্গালীদের পূজা হয়—কালীমাঈর পূজা—জানিস্ না?"

"ওঃ—কাল বুঝি কালীপূজা? আজ চতুর্দ্দশী—তাই এত অন্ধকার।"

"হ্যাঁ বেটি কাল কালীপূজা। বাবুর বাড়ীতে পূজা হয়। অনেক পাঁঠা বলি হয়। কাল সেখান থেকে পরসাদি আসবে—তুই খাবি ত?"

"মাংস?"

"হ্যাঁ—পাঁঠার মাংস।"

"আমায় কি মাছ মাংস খেতে আছে? আমি যে বিধবা।"

"হলেই বা বিধবা। তুই ত বামুন কায়েথের মেয়ে নস্। আমাদের দেশে গোয়ালা জাতের মেয়ে বিধবা হলেও মাছ মাংস সব খায়।"

"আমাদের খেতে নেই। পাপ হয়।"

"তোদের দেশের দস্তুর ভারি খারাপ। আমাদের মুলুকে গোয়ালার মেয়ে বেওয়া হলে আবার তার সাদি হয়। একবার ছেড়ে পাঁচ বার হয়। কেমন ভাল! তুই যদি বাঙ্গালী না হতিস্ ত তোরও সাদি হত। তোর এই কাঁচা বয়স, এমন খাপসুরত চেহারা, কত লোকে তোকে সাদি করবার জন্য পাগল হত।"

গঙ্গামণি শিহরিয়া বলিল—"না—না—ছি—ছি। ও কথা বলিস্‌নে।"

বৃদ্ধা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। গঙ্গামণি বলিল—"মাঈ—এ বকুলগঞ্জ থেকে আমাদের দরিয়াপুর কতদূর?"

"অনেকদূর। সাত আট কোশ হবে।"

"বকুলগঞ্জের বাবু আমায় কত দিন আর আটকে রাখবে? আমায় ছেড়ে দিক না এখন।"

বৃদ্ধা বলিল—"যদি ছেড়ে দেয় ত তুই কোথা যাবি?"

"কেন, আমার শ্বশুরবাড়ী রয়েছে—বাপের বাড়ী রয়েছে—এক জায়গায় যাব।"

"তারা কি আর তোকে ঘরে নেবে?"

এই কথা শুনিয়া গঙ্গামণি নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পলাইবার কোনও ভরসা না থাকিলেও, সে মাঝে মাঝে মনে করিত, যদি কোন দিন কোনও সুযোগে পলাইতে পারি, তবে কোথায় যাইব—আমার আশ্রয় কোথায়। কে বিশ্বাস করিবে যে আমি নিষ্কলঙ্ক? আজ বৃদ্ধার মুখেও

এই কথা শুনিয়া গঙ্গামণির হৃদয়ে দারুণ নৈরাশ্য উপস্থিত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা বলিল—"রাত হল। আয়, ময়দা মেখে নে—আমি উনান জ্বেলে দিই।"

গঙ্গামণি বলিল—"না মাঈ—থাক্। আজ আর উনান জ্বালতে হবে না।"

"খাবিনে?"

"না, আজ আর কিছু খাব না। ক্ষিধে নেই।"

"কিছু খাবিনে?"

"দুটো পেয়ারা আছে তাই খাব এখন।"

বৃদ্ধা বেশী পীড়াপীড়ি করিল না। তাহার কতকটা মেহনৎ বাঁচিয়া গেল—তাহাতে সে খুসীই হইল। কুটীরে সেই অনাস্বাদিত বোতলটির কাছে বুড়ীর মনটি পড়িয়াছিল। তাই সে বিদায় চাহিল।

গঙ্গামণি বলিল—"একটু বোস্ না—যাবি এখন। এত তাড়াতাড়ি কি? তোর হুঁকোটা কোথা গেল, তামাক খাবিনে?"

বৃদ্ধা বলিল—"আচ্ছা—এক ছিলিম তামাক খেয়ে নিই। তুই তোর শ্বশুর বাড়ীর গপ্প বল।"

বৃদ্ধা তামাক সাজিতে বসিল। গঙ্গামণি বলিল—"আমার শ্বশুর বাড়ীর কি গল্প শুনবি?"

"সেখানে কে কে আছে?"

"আমার ভাসুর আছে, যা আছে, দুটি ভাসুরপো আছে।"

"ভাসুরপো দুটি কত বড়?"

"একটির বয়স দশ—একটি চার বছরের। আমি বিধবা হয়ে গেলাম—আমার ত ছেলেপিলে হল না—তাই ছোট ছেলেটিকে মানুষ করতে লাগলাম। সে আমার কাছে থাকত, আমার কাছে শুতো, আমায় মা বলত।"—বলিতে বলিতে গঙ্গামণির চক্ষু দুইটি অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধা বলিল—"এরা তোকে কি করে ধরে আন্‌লে?"

"আমার বুদ্ধির দোষে। ছোট ছেলেটি আমার নেওটো—আমায় মা বলত বলে—আমার যা আমায় দুচক্ষে দেখতে পারত না। আমার ভাসুর—সেও যখন তখন আমায় গালিমন্দ দিত। আমার কোনও কাজে একতিল দোষ পেলে আমার ভাসুর আমার যা—দুজনেই রেগে চেঁচিয়ে বাড়া মাথায় করত। অনেক দিন ধরে এই রকম জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে করে ক্রমে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি তখন তাদের বল্লাম—আমি বাপের বাড়ী যাব—এখানে থাকব না। তা শুনে তারা আমার উপর আরও রেগে উঠল, আমাকে বেশী করে জ্বালাযন্ত্রণা দিতে লাগল। শেষে যখন আমার অসহ্য হয়ে উঠল, তখন ভাবলেম এখান থেকে পালিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাই। কে আমায় পৌঁছে দেবে? সঙ্গী কোথা পাব? গ্রামে একজন বুড়ী ছিল—সদ্‌গোপের মেয়ে—তারই সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করতে লাগলাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলাম। সে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমায় এখানে এনে ফেল্লে। যে যন্ত্রণার হাত এড়াবার জন্য পালিয়েছিলাম, তার দশগুণ যন্ত্রণা এখানে এসে আরম্ভ হল। ভগবান এ পর্য্যন্ত আমার ধর্ম্মরক্ষা করেছেন—এখন কোন রকমে এখান থেকে উদ্ধার হতে পারলে বাঁচি।"

গঙ্গামণি যে সময় কথা শেষ করিল, তখন তাহার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিতেছে। বৃদ্ধা বলিল—"বেটী—কাঁদিস্ না—কাঁদিস না। কালী মাঈ তোর ভাল করবেন।" তাহার পর নিস্তব্ধ হইয়া বৃদ্ধা ধূমপান শেষ করিল। তখন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। বাহিরের দ্বারে তালাটি উত্তম রূপে বন্ধ করিয়া দুই তিন বার সেটিকে টানিয়া দেখিল। কুটীরে গিয়া চাবিটি জামাতার হস্তে দিয়া রন্ধন কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

বৃদ্ধা চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ অবধি গঙ্গামণি গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। বৃদ্ধার শেষ কথাগুলি—"কালী মাঈ তোর ভাল করবেন"—তাহার মনে বারম্বার ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। জানালা খুলিয়া দেখিল, বাহিরে বিষম অন্ধকার। জঙ্গলের মধ্যে অবিশ্রাম ঝিল্লিধ্বনি হইতেছে। ঝোপে ঝোপে অসংখ্য জোনাকি পোকা জ্বলিতেছে। জানালার কাছে—ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গঙ্গামণি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, সেই অগাধ অন্ধকারের মধ্যে নিজ সজল নেত্রযুগল ডুবাইয়া দিয়া,

অর্দ্ধস্ফুট স্বরে গঙ্গামণি বলিতে লাগিল—"মা কালী—আমি ছেলেবেলা থেকে তোমায় কত প্রণাম করেছি—কত ভক্তি করেছি। কাল তোমার পূজা হবে—তাই আজ রাতে তুমি অন্ধকারের বেশ ধরে এসে সমস্ত পৃথিবী ভরিয়ে ফেলেছ। মা, আমি ত কোনও অপরাধ করিনি—তবে কেন এত কষ্ট পাচ্ছি? অসময়ে আমার স্বামীকে কেড়ে নিলে—যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম—সেখান থেকেও আমায় তাড়ালে। মা, যদি আমি দোষ করে থাকি—তবে আমায় ক্ষমা কর। এ বিপদ থেকে আমায় উদ্ধার কর। যাতে আমার ধর্ম্ম রক্ষা হয়, এমন কর। আর তা যদি না কর—তবে তোমার ডাকিনী যোগিনীদের বলে দাও—আজ রাতেই যেন তারা এসে আমায় মেরে ফেলে—তা হলেও আমি পরিত্রাণ পাই। মা রক্ষাকালী—আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর মা!"

এইরূপে প্রার্থনা করার পর অভাগিনীর হৃদয়ভার অনেকটা লাঘব হইল। তখন সে জানালাটি বন্ধ করিয়া, মাদুরখানিতে আবার শয়ন করিল। প্রদীপটি মিট মিট করিয়া জলিতেছিল—কপাট খোলাই রহিল—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গঙ্গামণি মনে মনে বলিতে লাগিল—"মা কালী, আমায় রক্ষা কর মা—আমায় রক্ষা কর।"—এইরূপ মানসিক প্রার্থনার অবস্থায়, নিদ্রাদেবী আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে নিজ পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিয়া তাহার চেতনা হরণ করিলেন।

* * * * *

রাত্রি গভীর হইল। গঙ্গামণি সেই অবস্থায় নিদ্রিত। হঠাৎ যেন মস্তকে কি একটা কঠিন দ্রব্যের স্পর্শ অনুভব করিল—তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল, প্রদীপের আলোক খুব উজ্জ্বল হইয়াছে। রক্তাম্বরধারিণী কৃষ্ণবর্ণা একটি স্ত্রীলোক যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—তাহার হস্তের ত্রিশূল মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছে। গঙ্গামণি দেখিল, সেই ত্রিশূলের অগ্রভাগ যেন শোণিতরঞ্জিত। মুহূর্ত্তকাল মাত্র এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া, আবার সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। ভয়ে তাহার সকল অঙ্গ হিম হইয়া গেল। সে বাস্তবিক জাগিয়াছে অথবা স্বপ্নে একটা বিভীষিকা দেখিতেছে—কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে অস্বাভাবিক বিকৃত বিকট কণ্ঠে কে যেন বলিল—"ভয় নাই।"

এই কথা শুনিয়া গঙ্গামণি আবার চক্ষুরুন্মীলন করিল। ছদ্মবেশী গদাধর তখন ধীরে ধীরে মাথা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া বলিল—"ভয় নাই। আমি—মা—কালীর—ডাকিনী। ভয়—নাই।"

শয়নের পূর্ব্বের প্রার্থনা তখন গঙ্গামণির মনে পড়িল। মনে পড়িল সে বলিয়াছিল, মা, হয় আমায় উদ্ধার কর নয় ত তোমার ডাকিনী যোগিনী কেহ আসিয়া আমায় মারিয়া ফেলুক। তাই গঙ্গামণি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিল। হাত জোড় করিয়া, কম্পিতস্বরে বলিল—"মা, আমায় মেরে ফেলো না।"

এই কথা শুনিয়া ডাকিনী খল্ খল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"ভয় নাই—আমি তোকে মারব না। কাল মা কালীর পূজো। আজ রাত্রে তিনি কৈলাস থেকে পৃথিবীতে এসেছেন। মা আমায় জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন—তুই কাঁদিস কেন? তোর কান্নায় মার আসন টলেছে। বল তুই কাঁদিস কেন?"

সেই রূপ হাতজোড় অবস্থায় গঙ্গামণি বলিতে লাগিল—"মা, আমি গরীব গৃহস্থের ঘরের বিধবা। আমাকে এরা ধরে এনে এখানে বন্ধ করে রেখেছে।"

"কে বন্ধ করে রেখেছে?"

"বকুলগঞ্জের মেঝ বাবু।"

"বকুলগঞ্জের মেঝ বাবু মা কালীর পরম ভক্ত। অনেক মদ—অনেক মাংস দিয়ে ফি বছর মার পূজো দেয়। আমি তোকে ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু তুই এক প্রতিজ্ঞা কর।"

মুক্তির আশ্বাসে গঙ্গামণির ভয় দূরে গেল। যুক্তকরে সে বলিল—"কি প্রতিজ্ঞা, মা?"

"তুই যত দিন বেঁচে থাকবি—কখনও কারুর কাছে বকুলগঞ্জের মেঝবাবুর নাম করবিনে।"

গঙ্গামণি বলিল—"প্রতিজ্ঞা করছি—কারু কাছে নাম করব না।"

"যদি নাম করিস তবে আমি এসে এই ত্রিশূল তোর বুকে বিঁধে দেব।"

"না মা—আমি প্রাণ থাকতে কারু কাছে মেঝ বাবুর নাম করব না। আমায় উদ্ধার কর।"

"তবে আয়"—বলিয়া গদাই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কম্পিত পদে গঙ্গামণিও তাহার অনুসরণ করিল।

ঝিলমিল-বদ্ধ বারান্দায় আসিয়া গদাই বলিল—"প্রদীপটা নিয়ে আসি।" ফিরিয়া আসিয়া প্রদীপ লইল এবং নিজ বস্ত্র হইতে, মোতিতের-নামে-ঠিকানা-লেখা সেই কুড়াইয়া-পাওয়া পোষ্টকার্ডখানি বাহির করিয়া, গঙ্গামণির মাদুরের উপর রাখিয়া দিল।

গৃহের বাহির হইয়া গদাই প্রদীপটা ফেলিয়া দিল। ত্রিশূলের পশ্চাৎভাগ গঙ্গামণির হাতে দিয়া বলিল—"শক্ত করে ধর। আমার পিছু পিছু আয়।"

তখন সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে দুইজনে মিলাইয়া গেল।

বাহিরের মুক্ত বাতাসে আসিয়া গঙ্গামণি যেন নবজীবন পাইল। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেন নববলের সঞ্চার হইল। ত্রিশূল মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, ত্বরিত পদক্ষেপে সে অনেক পথ অতিবাহন করিল। পথশ্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম্ম ঝরিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি সে ক্লান্তি অনুভব করিল না।

এইরূপ প্রায় দুই ঘণ্টা চলিয়া, পথের ধারে একটা মন্দির দেখা গেল। গদাই বলিল—"এই ঘণ্টেশ্বরের মন্দির, চিনিস্?"

গঙ্গামণি বলিল—"মহাদেবপুরের ঘণ্টেশ্বর?"

"হ্যাঁ। মহাদেবপুর গ্রাম ঐ দূরে আছে—এখন অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। এ মন্দিরে কখনও এসেছিলি?"

"হ্যাঁ—কতবার এসেছি পূজো দিতে। এখান থেকে আমাদের গাঁ দু ক্রোশ।"

"আমি ত আর থাকতে পারিনে—আর বেশী রাত নেই। ভোর বেলাই মার বোধন বসবে। আমরা সবাই ডাকিনী যোগিনী মিলে মাকে সাজিয়ে দেবো। আমি এখন চল্লাম। এই সোজা রাস্তা ধরে চলে যা। দু ক্রোশ পরে দরিয়াপুর গ্রাম। ভোরে ভোরে বাড়ী পৌঁছে যাবি।"

গঙ্গামণি তখন ভূমিতে জানু পাতিয়া বসিয়া, ডাকিনীর চরণ স্পর্শ করিয়া বলিল—"মা—আমায় যদি তারা বাড়ীতে না নেয় কি উপায় হবে?"

গদাই বলিল—"তারা লোককে বলেছে—তুই বাপের বাড়ী গিয়েছিস। কোন কলঙ্কের ভয় নেই। তবু যদি না নেয়—তুই বলিস, তবে আমার স্বামীর জোৎজমি অর্দ্ধেক আমায় ভাগ করে দাও—আমি গিয়ে কাশীবাস করি।"

"তবু যদি মা, তারা না শোনে? আমায় যদি বাড়ীতে স্থান না দেয়?"

"না দেয়, তোদের গাঁয়ের নায়েব মশাইয়ের কাছে গিয়ে নালিশ্ করবি। নায়েব গদাধর পাল অতি সদাশয় ধার্ম্মিক ব্যক্তি—মা কালীর একজন প্রধান ভক্ত। সে তোর ভাসুরকে ডাকিয়ে এনে জুতিয়ে সোজা করে দেবে। এখন যা।"

গঙ্গামণি তাহাকে প্রণাম করিয়া দরিয়াপুর অভিমুখে চলিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে গদাই গাত্রোত্থান করিল। মনে মনে বলিল—"কাণ্ডটি করলাম, মন্দ নয়। তবু যদি যৌবনের সে বল গায়ে থাকত। রাত আর বেশী নেই—বোধ হয় আড়াইটা বেজে গিয়েছে। দু ঘণ্টার মধ্যে কল্যাণপুরে পৌঁছান চাই। ভোরের বেলা গ্রামের লোকজন বেরিয়ে এ ডাকিনীর মূর্ত্তি দেখে মূর্চ্ছা না যায়। পা চালিয়ে চলে গেলে অন্ধকারে অন্ধকারে বাড়ী পৌঁছব এখন।"—বলিয়া গদাই ক্ষিপ্রপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

গোপীকান্ত বাবুর দুশ্চিন্তা

রাত্রি প্রভাত হইল। গত রজনীর "খানাপিনার" প্রভাবে মালী-পরিবারের কাহারও এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই—কেবল রামদাসোয়া উঠিয়া বাগানে গিয়া বাঁশের লগী হস্তে নিজ প্রাতরাশের উপযুক্ত সুস্বাদু ফল অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।

ক্রমে রৌদ্র দেখা দিল। বেশ বেলা হইল। তখন মালীর কুটীরে বয়স্ক লোকের কণ্ঠস্বর একটু আধটু শুনা যাইতে লাগিল। মালীর স্ত্রী উঠিয়া দুই ছিলিম তামাক সাজিয়া,—এক ছিলিম স্বামীকে ও এক ছিলিম মাতাকে দিল। বৃদ্ধা নিজ চাটাইয়ের উপর বসিয়া, দুই একবার

হাই তুলিয়া, দুই একবার চক্ষু রগড়াইয়া, কিঞ্চিৎ কাসিয়া, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ধূমপান আরম্ভ করিল।

মালী বলিল—"মাঈ—আজ বাবুর বাড়ী কালীপূজা। একটু বেলা হইলেই, স্নান করিয়া, খরাই মারিয়া, আমি সেখানে যাইব।"

পেয়ারা চর্ব্বণ করিতে করিতে, বোঁ করিয়া একপাক ঘুরিয়া, রামদাসোয়া বলিল—"হামু যায়ব।"

মালী বলিল—"তুই যাইবি, তোকে কোলে করিয়া লইয়া যাইবে কে?"

আর একটা ঘুরপাক দিয়া রামদাসোয়া বলিল—"তোরা কান্ধাপর চঢ়কে যায়ব।"

বৃদ্ধা বলিল—"আহা লইয়া যাইও। ছেলেমানুষ, পূজা দেখিবে না?"

মালী বলিল—"তবে তুইও চল্ মাঈ। রামদাসোয়াকে কোলে করিয়া লইয়া যাইবি।"

"দুজনেই গেলে 'উহার' খবরদারী করিবে কে? বাবু যদি রাগ করেন?"

"সে কথা ঠিক্।"—বলিয়া মালী নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল, বৃদ্ধা প্রথমে রামদাসোয়াকে লইয়া গিয়া পূজা দেখিয়া আসিবে—দ্বিপ্রহরে সে ফিরিলে তখন মালী যাইবে।

পূজা দেখিতে যাইবে বলিয়া রামদাসোয়ার মাতা তাহার বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হইল। তাহার মেরজাই প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিয়া, এক ছটাক পরিমাণ সর্ষপ তৈল তাহার ধূলিধূসর কেশবহুল মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া যখন দুই হাতে সবলে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল, তখন রামদাসোয়া বিশেষ আপত্তি করে নাই। উঠানের কোণে এক কলসী জল রাখা ছিল। জ্ঞানোদয়ের পর দুই তিনবার তাহাকে স্নান করিতে হইয়াছে। মাতা তাহার হস্ত ধারণ করিয়া ছড় ছড় করিয়া টানিয়া সেই কলসীর নিকটবর্ত্তী করিবামাত্র তাই সে তারস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। সজলনেত্রে বারম্বার আবেদন করিতে লাগিল, পূজা দেখিবার জন্য সে কিছুমাত্র উৎসুক নহে—এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচে। কিন্তু তাহার এ "এজিটেশনে" কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। ঘটী ঘটী শীতল জল তাহার মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। স্নানান্তে মাতা তাহার চুল আঁচড়াইয়া, কাজল দিয়া, একখানি হলুদে ছোপান ধুতি এবং একটি ছিটের কুর্ত্তা পরাইয়া দিল। তখন আবার রামদাসোয়ার মুখে হাসি ফুটিল। মনের আনন্দে রৌদ্রে খেলা করিতে লাগিল।

ক্রমে বৃদ্ধা মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া, বেশমের বাসি ফুলুরি খাইয়া 'খরাই মারিল।' বলিল—"তবে ওখানে জল দিয়া, উনুন ধরাইয়া আসি। আসিয়াই বাহির হইব।"

বৃদ্ধা তখন জামাতার নিকট হইতে চাবিটি চাহিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে বাগানবাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে চলিল। গিয়া দেখিল শিকল খোলা, তালাটা নাই। দেখিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভাবিল—"কি সর্ব্বনাশ! দুয়ার খোলা কেন? গঙ্গামণি আছে ত?"

রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বৃদ্ধা উপরে গেল। দেখিল কেহ কোথাও নাই।

প্রত্যেক ঘর দুই তিন বার করিয়া খুঁজিল—কেহ কোথাও নাই। "গঙ্গামণি"—"গঙ্গামণি"—বলিয়া বার বার চীৎকার করিল, কেহ উত্তর দিল না। তখন বৃদ্ধা হতাশ হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে জামাতাকে গিয়া সংবাদ দিল।

শুনিয়া মালী আকাশ হইতে পড়িল। তাহার চক্ষু বসিয়া গেল। গলার স্বর বিকৃত হইয়া গেল। বলিল—"চল্—দেখি গিয়া।"

দুইজনে তখন ধীরে ধীরে বাগানবাড়ীর পশ্চাতে উপস্থিত হইল। বহির্দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া, মালীর মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাহার দুই চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া, বৃদ্ধার কেশ সবলে ধারণ করিয়া বলিল—"হারামজাদি, তোরই দোষে এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

বৃদ্ধা এই আকস্মিক অপমানে আগুন হইয়া বলিল—"কেন রে ছোঁড়াপুতা—আমার কি দোষ? পাজি—আমার চুল ছাড়।"

"তোর দোষ নয়? নিশ্চয় তোর দোষ। কাল সন্ধ্যাপের নেশায় ছিলি, তালাবদ্ধ করিস নাই। এই দেখ,

একটা কড়ায় তালাবন্ধ রহিয়াছে। দুয়ার খোলা পাইয়া গঙ্গামণি পলাইয়াছে।"

বৃদ্ধা দেখিল, তালাটা একটা কড়ায় বন্ধ হইয়া ঝুলিতেছে। বলিল :-"কখনও নয়, আমি দুইটা কড়ায় ঠিক তালাবন্ধ করিয়াছিলাম। আর, সে সময় আমি সরাপ ছুঁইও নাই। তুই নেশায় ভোঁ হইয়া পড়িয়া ছিলি—চাবি কোথায় ফেলিয়া রাখিয়াছিলি, কে লইয়া তালা খুলিয়াছে।"

মালী চুল ছাড়িয়া দিল। তখন দুই জনে উপরে গেল। গঙ্গামণির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, মালী দেখিল মাদুরের উপর পোষ্টকার্ডখানা পড়িয়া আছে। তুলিয়া লইয়া বলিল "এখানা কি? এ চিঠি কোথা হইতে আসিল? এ যে ডাকের চিঠি দেখিতেছি।"

বৃদ্ধা বলিল—"তাহা ত জানি না। এ চিঠি ত কোন দিন এখানে দেখি নাই।"

মালী বলিল—"গঙ্গামণিকে কেহ চিঠি লিখিয়াছিল বোধ হয়। এই চিঠি পড়াইলেই, কে তাহাকে লইয়া গিয়াছে কিনারা হইবে।"

বৃদ্ধা বলিল--"দূর বেকুব। গঙ্গামণিকে চিঠি দিয়া যাইবে কে? এ বোধ হয়, যাহারা তাহাকে লইতে আসিয়াছিল, তাহারাই ফেলিয়া গিয়াছে।"

মালী পোষ্টকার্ডখানি লইয়া সযত্নে নিজের কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিল। বলিল "বড়ই সর্ব্বনাশ হইল। এতদিন এখানে চাকরি করিয়া খাইতেছি—এইবার চাকরিটি গেল। আর কি বাবু আমায় রাখিবে—এখনি তাড়াইয়া দিবে। এখন এ বৃদ্ধ বয়সে, কাচ্চা বাচ্চা লইয়া যাই কোথায়?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুই জনেই কিছুক্ষণ নীরব রহিল। শেষে বুড়ী বলিল—"পলাইয়া হয় ত এখনও বেশী দূর যাইতে পারে নাই। কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়ই লুকাইয়া আছে। একবার খুঁজিয়া দেখ্।"

দুইজনে আবার বাহির হইল। তালাটি বন্ধ করিয়া বিষণ্ণ বদনে মালী বলিল—"তবে যাই। খুঁজিয়া দেখি।"

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেলে, মালী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"কোথাও তাহাকে পাইলাম না। এখন যাই—বাবুর নিকট সংবাদ দিই।"

বুড়ী বলিল—"কি বলিবি?"

"বলিব—কোনও দুষ্ট লোক, অন্য চাবি দিয়া তালা খুলিয়া, গঙ্গামণিকে লইয়া গিয়াছে।"

বৃদ্ধা বলিল—"তোর যেমন বুদ্ধি! ও কথা বলিলে বাবু কি বিশ্বাস করিবে? বলিবে আমরা তালা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

"তবে কি বলিব?"

"একটা কিছু আনিয়া, তালাটা ভাঙ্গিয়া ফেল। সেই ভাঙ্গা তালা হাতে করিয়া লইয়া যাইবি। বলিবি কল্য রাত্রে কে তালা ভাঙ্গিয়া গঙ্গামণিকে লইয়া গিয়াছে।"

মালী বলিল -"এই পরামর্শই ঠিক।"—তখন নিজ কুটীর হইতে দুইটা লোহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিল। সেই লোহার সাহায্যে অনেক কষ্টে এক দণ্ড ধরিয়া তালাটা ভাঙ্গিল। তাহার পর আহারাদি করিয়া, বেলা যখন তৃতীয় প্রহর সেই সময় কাঁদ কাঁদ মুখে বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

মধ্যাহ্ন পূজা তখন শেষ হইয়া গিয়াছে—ব্রাহ্মণ-ভোজনও সমাপ্ত। কাঙ্গালী-ভোজন হইতেছে—কর্ম্মচারীরা পরিবেষণ করিতেছে। গদাই এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তদারক ও হুকুম করিতেছিল। মালী তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইল।

গদাই বলিল—"কি হে মালীর পো—এত দেরী করে এলে?"

মালী চুপি চুপি বলিল "আজ্ঞা বাবু সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।"

যেন কতই আশ্চর্য্য হইয়াছে এইরূপ ভাবে বলিল—"কেন? রামদাসোয়া ভাল আছে ত?"

"সে ভাল আছে। গঙ্গামণি পলাইয়াছে।"

"অ্যাঁ! বল কি!—কেমন করিয়া পলাইল?"

"কল্য রাত্রে কোনও দুষ্টলোক তালা ভাঙ্গিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছে।"

গদাই বলিল—"কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায়? কে এমন কার্য্য করিল?"

"কি জানি বাবু তা ত জানি না। তবে গঙ্গামণির ঘরে এই চিঠিখানা কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে।"—বলিয়া মালী চিঠি দিল। গদাই সেখানি উল্টাইয়া দেখিয়া মালীকে ফিরিয়া দিল, বলিল—"চশমা সঙ্গে নেই। পড়্‌তে পারলাম না। কে এ কায করলে তাই ভাবছি। আচ্ছা সেই

যে লোকটা, যার নাম রমণচন্দ্র ঘোষ, বাড়ীর পানে হাঁ করে তাকিয়েছিল—সে ত নয় ?"

"কি জানি বাবু। এখন কর্ত্তা মহাশয়ের কাছে খবর ত দিতে হয়।"

"তা দিতে হবে বই কি। বাবু যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করেন কারু উপর তোমার সন্দেহ হয় কি না, তুমি সাফ্ বলে দিও, হুজুর কাল বৈকালে একজন আধবয়সী লোক, গায়ে হাতকাটা পিরান, গলায় চাদর জড়ানো, বগলে ছাতি, বাগানে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বাড়ীর পানে চেয়ে ছিল, নাম জিজ্ঞাসা করলাম, বল্লে রমণচন্দ্র ঘোষ—তারই উপর আমার সন্দেহ হয়। তা না বল্লে বাবু হয়ত মনে করতে পারেন, তুমিই টাকা খেয়ে গঙ্গামণিকে ছেড়ে দিয়েছ।"

মালী বলিল—"আমি হলে তালা ভাঙ্গিব ক্যেন ? চাবি ত আমারই কাছে ছিল।"—বলিয়া মালী ভাঙ্গা তালাটি দেখাইল।

মালীর বুদ্ধি দেখিয়া গদাই মনে মনে হাস্য করিল। বলিল—"ঠিক কথাই ত। আচ্ছা, তা আমি গিয়ে দেখি, বাবু কি করছেন কোথায় আছেন। তারপর তোমায় নিয়ে যাব। একটু নিরিবিলি না হলে ত বলা যাবে না। তুমি এইখানে দাঁড়াও।"

মালী বলিল—"বাবু, গরীবের চাকরিটি থাকবে ত ?"

"চাকরি ? এ অবস্থায় চাকরি থাকা শক্ত বটে। আমি বলে কয়ে দেখব। আমি তোমার জন্যে বিশেষ করেই বলব। তুমি এখানে দাঁড়াও—আমি বাবুর সন্ধান করে আসি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে গদাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"এস। এইটে বেশ করে মনে করে রেখ—রমণচন্দ্র ঘোষ, আধবয়সী লোক, গায়ে হাতকাটা পিরান, বগলে ছাতি, গলায় চাদর জড়ানো,—বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছ। ভাঙ্গা তালাটা আর চিঠিখানাও বাবুকে দিয়ে এস।"

বৈঠকখানার পাশে একটি ক্ষুদ্র শয়নকক্ষে বাবু ছিলেন। গদাই মালীকে লইয়া গিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করাইয়া দিল। নিজে বৈঠকখানার বাহিরে বসিয়া রহিল।

দশ মিনিট পরে মালী বাহির হইয়া আসিল। গদাই জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে—কি হল ?"

"সব কথা বল্লাম।"

"বাবু কি খুব রেগেছেন ?"

"আজ্ঞে না। বল্লেন—তুই বেটা ভারি অসাবধান—আচ্ছা এখন যা, পরে যা হয় করব।"

"তুমি যাও। প্রসাদ পাওগে। যাতে তোমার চাকরি থাকে, বাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমি সেই বন্দোবস্ত করছি।"

মালী চলিয়া গেল। গদাই তখন গোপীকান্ত বাবুর নিকট গিয়া মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহাকে দেখিয়াই বাবু বলিলেন—"গদাই দুয়ারটা বন্ধ করে দাও।"

গদাই দ্বার বন্ধ করিল। বাবুর পানে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বলিলেন—"তোমার কথামত, মালীর সুমুখে কোনও উৎকণ্ঠার ভাব প্রকাশ করলাম না। কিন্তু আমার মন বড় উতলা হয়েছে। কি করি ?"

গদাই বলিল—"আজ্ঞা, উতলা হবার ত কথাই বটে। যদি থানায় যায়, তা হলে সঙ্গীন মোকর্দ্দমা হয়ে দাঁড়াবে। একবারে দায়রার মোকর্দ্দমা।"

"থানায় যাবে কি ?"

"আজ্ঞে—কারা এর ভিতর আছে—কারা তাকে নিয়ে গেল, সেটা না জানতে পারলে বলা শক্ত।"

"আমি তা জেনেছি। রমণ ঘোষ আর আমার ভাই।"

"আপনার ভাই ? ছোট বাবু ? আজ্ঞে, তাও কি সম্ভব হয় ?"

"সম্ভব ছেড়ে নিশ্চয়। গঙ্গামণির ঘরে, মোহিতের নামের এই পোষ্টকার্ডখানা মালী কুড়িয়ে পেয়েছে। আর, কাল বৈকালে, মালী দেখেছিল, বাগানে রমণ ঘোষ দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে গঙ্গামণির ঘরের পানে চেয়ে রয়েছে।"—বলিয়া বাবু পোষ্টকার্ডখানি গদাধরের হস্তে দিলেন।

গদাধর সেখানি দেখিয়া, বাবুকে ফিরিয়া দিল। বলিল—"তবে এই মতলবেই রমণ ঘোষ ঘন ঘন ছোট বাবুর কাছে আসত। এখন বোঝা গেল।"

বাবু বলিলেন—"নিশ্চয়। আর, কাল এমনি সময় মোহিতও বাক্স বিছানা বেঁধে কোথায় চলে গেছে—কাউকে বলেও যায় নি।"

একটু নীরব থাকিয়া গদাই বলিল—"ভাই হয়ে কি আর ভাইয়ের হাতে দড়ি দেবে ? থানায় যাবে ?"

"তুমি তাকে জান না গদাই। সে সর্ব্বনেশে লোক। কিছু আশ্চর্য্য নয়। আর, সেও নিজে যদি না খবর দেয়, গঙ্গামণির আত্মীয় স্বজন খবর দিতে পারে। কি করি বল দেখি ?"

গদাই বিষণ্ণ বদনে চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে বলিল—"আজ খবর দিয়েছে বলে বোধ হয় না। তা হলে এতক্ষণ থানা পুলিস এসে পড়তো। কিম্বা এও হতে পারে, দারোগা থানায় নেই, জমাদার এজেহার লিখে নিয়েছে, দারোগা এসে তদন্ত আরম্ভ করবে।"

"এখন উপায় ?"

গদাধর আবার চিন্তা করিল। শেষে বলিল—"এ অধমকে যদি উপায় জিজ্ঞাসা করলেন, তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা হয় নিবেদন করি। আজ রাত্রেই এ স্থান আপনার পরিত্যাগ করা উচিত। চাই কি কাল সকালেই দলবল নিয়ে দারোগা এসে হাজির হতে পারে। আপনি মানী লোক—তারা একটা উঁচু কথা বল্লেই মরমে মরে যাবেন। আজ রাত্রেই আপনি স্থানান্তরে যান। আমায় কিছু টাকা দিয়ে যান, আমি কাল সকালেই থানায় গিয়ে দারোগাকে ঠিক করে নেব। পৃথিবী টাকার বশ। পুলিশ ত কথাই নেই। আপনি এখানে প্রচার করে দিন যে আপনি কলকাতা রওনা হলেন। ষ্টেশনে গিয়ে কলকাতার একখানা সেকেন কেলাস টিকিট কিনে, শেয়ালদহে নেবেই, প্রথম গাড়ীতে হাওড়া থেকে পশ্চিম রওনা হন। একখানা লম্বা রকম টিকিট কিনবেন—যেমন কাশী কি এলাহাবাদ। কিন্তু রাস্তায় কোনও এক জায়গায় নেমে পড়বেন। টিকিটখানা ষ্টেশনে দেবেন না। বলবেন আমি এখানে ব্রেকজর্ণি করলাম। তা হলেই আর কোনও চিহ্ন থাকবে না। তার পর এদিকে সব ঠিকঠাক হলে, সমস্ত চুকে বুকে গেলে তখন আসবেন এখানে যা কিছু করতে কর্ম্মাতে হয়, সব আমি করব।"

বাবু বলিলেন—"দেখ, সে স্ত্রীলোকটা জানে, বকুলগঞ্জের মেজ বাবু, বকুলগঞ্জে তাকে বন্ধ করে রেখেছে।"

গদাই বলিল—"আজ্ঞা হাঁ···কিন্তু রমণ ঘোষ আর ছোট বাবু—"

"ঠিক বলেছ। ওটা আমার মনে আসে নি। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তুমি যা বলছ তাই করব। আজ রাত্রেই রওনা হব। এখন, কত টাকা তোমার চাই বল দেখি ?"

গদাই বলিল—"সঙ্গীন মোকদ্দমা—বড়লোক আসামী। পুলিশ একেবারে পেয়ে বসবে। শো পাঁচেক দিয়ে যান।"

সেই কক্ষে দেওয়ালে গাঁথা লোহার সিন্দুক ছিল। বাবু উঠিয়া, চাবি খুলিয়া একতাড়া নোট বাহির করিয়া আনিলেন। একশো খানি দশটাকার নোট গণিয়া গদাধরকে দিয়া বলিলেন—"এই হাজার টাকা রাখ। যা দরকার হয় খরচ করবে। আমাকে এ যাত্রা বাঁচাও। তুমি আমার চাকর নও—তুমি আমার সহোদর ভাই।"

গদাই বলিল—"আমি হুজুরের দাসানুদাস। হুজুরের নিমক খেয়েছি। প্রাণ থাকতে নিমকহারামী করব না।"—বলিয়া সে বাবুর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিল।

তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। বাবু গদাইকে উঠাইয়া বলিলেন—"আমি যেখানে থাকব, সেখান থেকে তোমায় চিঠি লিখব। আর যদি টাকা কড়ি দরকার হয়, আমায় লিখো—আমি তার বন্দোবস্ত করব। যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই—তোমার উপকার ভুলব না। এর পুরস্কার তুমি পাবে।"

গদাই বলিল—"হুজুরের স্নেহই আমার পুরস্কার। অন্য পুরস্কার তুচ্ছজ্ঞান করি।"

বাবু তখন গদাইকে বিদায় দিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভারতের খটখটি-তাঁত

যখন জগতের নরগণ ঘোর অন্ধকারের ঘুমঘোরে নিদ্রিত ছিল, বন্য জন্তুর গাত্রচর্ম্ম যখন তাহাদের গাত্রাবরণের কার্য্য করিত, পশুমাংস ভিন্ন যখন আর তাহাদের উদর পূর্ণ করিবার কোনপ্রকার সুব্যবস্থা ছিল না, তখন ভারতক্ষেত্রের জনগণ সভ্যতালোক বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে রাজ্যবিস্তার করিতেছিলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন গাত্রাবরণ পশুচর্ম্মদ্বারা সংসাধিত হয় না এবং পশুমাংস

ভক্ষণ করিয়া প্রকৃত মানব-পদবাচ্য হওয়া যায় না তখন তাঁহারা মস্তিষ্ক পরিচালন দ্বারা বস্ত্রবয়নপ্রথা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে বস্ত্রবয়ন জন্য খট্‌খটি-তাঁতের আবিষ্কার হইল। সেই তাঁত কয়েক সহস্র বৎসরের মধ্যে জগতীতলে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমশঃ ইহা উন্নতাবস্থায় পরিণত হইল। এই প্রণালী গ্রহণ করিয়া অধুনা অধিকতর উন্নতাবস্থায় বাষ্পীয় ক্রিয়া দ্বারা এবং কোথাও বা বৈদ্যুতিক ক্রিয়াদ্বারা তাঁত চালিত হইতেছে। আমরা ক্রমে ক্রমে আজ পাঠকপাঠিকাগণকে সে সকল সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

মিঃ হুজিওয়ার্ফ (Mr. Hoogewerf) Quarterly Journal-এ বলিতেছেন,—

"The origin of this ancient craft (hand-loom weaving) seems to have found birth in India some thousand of years ago, as we read from history that the princes and nobility of India were clothed in gorgeous product of its looms long before civilisation had yet reached the shores of Europe. This added greatly to the wealth of India. The only other country where weaving was known was Egypt, but India stood unrivalled for its fabrics. Moreover, it appears that looms were first invented in the East. India may, therefore, justly claim to be the birthplace of the weaving industry. It seems a deplorable fact, then, that the once famous hand-loom weaving industry of India, should be allowed to fall into decadence. Some of the clothes of India, such as the Dacca Muslins, still remain unrivalled both as regards texture and the fineness of the hand-spun yarns, from which they were made. I have it on good authority that the counts of these hand-spun yarns although rather uneven, registered on an average 500 counts, and were spun by hand from a short staple cotton with a very large percentage of natural twist in it. Yarns of such high counts cannot be spun except perhaps with the greatest difficulty, on the most improved machinery of the present age."

অর্থাৎ কতিপয় সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই হস্তচালিত খট্‌খটি-তাঁত ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। উহা আমরা ইতিহাস পাঠে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। ভারতের রাজপুত্রগণ এবং ধনীব্যক্তি-বৃন্দ হস্তনির্ম্মিত বহুমূল্য পোষাক পরিধান করিতেন। তখন সভ্যতালোক ইউরোপকে উদ্ভাসিত করে নাই। এই কার্য্যে বহু অর্থ উপার্জ্জিত হইয়া ভারতমাতার ক্রোড় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। অপর একটি দেশে বয়নপ্রথা প্রচলিত ছিল। উহা মিসর দেশ। কিন্তু ভারতের নিকট উহাকে নত হইতে হইয়াছিল। ভারতের সূক্ষ্মসূতার তুল্য জগতে আর কোথাও সূতা প্রস্তুত হইতে পারিত না। আরও আমরা দেখিতে পাই প্রাচ্যজগতেই সর্ব্ব প্রথম হাতের তাঁতে বস্ত্রবয়নপ্রথা আবিষ্কৃত হয়। সেই প্রাচ্যজগতের মধ্যে ভারতবর্ষকেই তাঁতের জন্মস্থান ধরিতে হইবে। এমত সুন্দর হস্তনির্ম্মিত বয়নব্যবসায়ের অবনতি দর্শন অতি পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে। ঢাকাই মসলীন প্রভৃতি ভারতীয় বস্ত্রাদির এখনও জগতে তুলনা নাই। এমত সূক্ষ্ম সূতা এবং বস্ত্রের জমির সমতা পৃথিবীর আর কোন স্থানে সম্ভবপর নহে। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে ইহার বয়ন কিঞ্চিৎ বিসদৃশ হইলেও গড়ে ৫০০ নম্বর বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ঐ সূতা খর্ব্ব আঁশযুক্ত মন্দ তুলা হইতে হস্তের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়। তন্মধ্যে শতকরা অধিকাংশই স্বাভাবিক বক্রভাবাপন্ন। এই প্রকার উচ্চ নম্বরের সূতা বর্ত্তমান সময়ের উন্নত কল হইতে অতি কষ্টে প্রস্তুত হইতে পারে। সহজে উক্ত কার্য্য সাধন হইবার উপায় নাই।"

উক্ত সাহেব বলিতেছেন উন্নত কলের সাহায্যে যে উচ্চ নম্বরের সূতা প্রস্তুত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন সেই সূতা ঢাকার কারিকরগণ কিপ্রকারে হস্তের সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া থাকে। বাস্তাবকপক্ষে আশ্চর্য্য হইবারই কথা বটে। জগতের মধ্যে এমত সুন্দর কীর্ত্তি প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যখন ইউরোপখণ্ডে অপেক্ষাকৃত তাঁতের উন্নতি লক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল তখন হইতে ভারতের বহু পুরাতন হস্তের তাঁতের প্রসারের হ্রাস হইয়া পড়িল। উহা প্রায় দুই শত বৎসরের কথা। এইপ্রকার অনুমান নিতান্ত ভিত্তিশূন্য নহে। আমাদেরও সেইরূপ বোধ হয়। দিনেমার উপনিবেশিকগণ শ্রীরামপুরে ইউরোপ-প্রবর্ত্তিত খটখটি-তাঁতের প্রচলন করেন কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই ঐ তাঁত উঠিয়া যায়। ইহার কারণ কেহই নিরাকরণ করিতে পারেন নাই। যখন কলের তাঁতের ব্যবস্থা হইল তখন আর ভারতীয় তন্তুবায়গণ ঐ কলের সঙ্গে সমকক্ষ হইতে পারিল না। হতাশ্বাস হইয়া অনেকে জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিল। স্বল্প মূল্যে কলের ধুতি ক্রয় করিয়া ভারতবাসিগণ যেন সোয়াস্তি পাইল। এইরূপে হাতের তাঁতের অবনতি লক্ষিত হইতে আরম্ভ হইল। তারপর কয়েকশত বৎসর যেন ভারতের তাঁতিকুল সভ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে নিত্য নব নব উন্নত তাঁতের উদ্ভাবন হইতেছে দেখিয়াও নিদ্রিত হইয়া ছিল। আপনাদের উন্নতির তাহারা কোন উপায়ই স্থির করে নাই। অবশেষে দৈবঅনুগ্রহে আবার যেন

তাহারা ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হইয়াছে। সকলই ভগবানের লীলা। মানুষের কি সাধ্য আছে যে তাঁহার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করে। এইরূপে ইউরোপীয় খটখটির তাঁতগুলি ভারতীয় তাঁতের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ উন্নত হইয়া উঠিল। তাঁত এইরূপে উন্নত হইবার পূর্ব্বে তন্তুবায়গণকে হস্ত দ্বারা "মাকু" টানিতে হইত। "তানা" সূতার মধ্য দিয়া "মাকু" ছুড়িয়া ফেলিয়া অপর হস্ত দ্বারা ইহাকে থামাইতে হয়। এই প্রকার কার্য্য বারংবার করিতে হয়। কাপড় বয়ন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপে কার্য্য চালাইতে হইবে। এই প্রথা দ্বারা কার্য্য সুচারুরূপে হয় বটে কিন্তু বয়নকার্য্যে অধিক সময় লাগিয়া যায়। ১৭৩৩ সালে জন কে অপেক্ষাকৃত উন্নত উপায়ে এক তাঁত প্রস্তুত করিলেন। এই তাঁতের সঙ্গে একটি হ্যাণ্ডেল আছে তদ্দ্বারা তাঁত পরিচালন করিতে হয়। ঐ হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে যদ্দ্বারা মাকু উভয় দিকে পরিচালিত হইতে পারে এমন দুইটি সূত্রের সংযোগ আছে। সূতার দুইদিকে দুইখানি চর্ম্মের সংযোগ থাকায় উহা ইস্পাত নির্ম্মিত "টাকুর" দ্বয়ের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পারে। যখন তন্তুবায় মাকুটি কোন দিকে লইতে ইচ্ছা করে তখন উহা সেই দিকে কিঞ্চিৎ টানিলেই হইল। অথবা মাকুর সন্নিকটবর্ত্তী সূত্রটি ধরিয়া আপনার অভীপ্সিত দিকে সামান্য টানিলেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই উপায়ে বয়নকার্য্য শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। তাহার ফলে সূতাকাটুনীরা আর সূতা যোগাইতে পারে না। এইপ্রকারে সূতার অভাবে কাপড় বয়নাদি বহু সময় বন্ধ রাখিতে হয়। কে সাহেব এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া আর একটি নূতন ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাঁতের উভয় পার্শ্বে মাকুর বাক্স প্রস্তুত করিলেন তন্মধ্যে বহু পরিমাণ খান্‌চা থাকিবে। ঐ খান্‌চা উপর্য্যুপরি সজ্জিত করিয়া রাখিতে হইবে। অভিলাষানুযায়ী যত সূতা এবং যে রংয়ের সূতার আবশ্যক হইবে তাহা ঐ বাক্সদ্বয় হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এবং সূতার অভাবে আর অসুবিধা ভোগ এবং কার্য্যনাশ হইবে না। কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সূতা সংগ্রহ করিয়া তবে কার্য্য আরম্ভ করিলেই হইল। পূর্ব্বকথিত খানচায় সূতা গুটাইয়া উহার একটি ধার বাহির করিয়া রাখিতে হয়। সূতার "স্লের" মধ্যভাগে লিভারের সঙ্গে যোগ থাকে। বয়নকারীর ইচ্ছানুসারে উহা উচ্চ বা নিম্ন করিয়া রাখা যায়। উহাতে ঊর্দ্ধদিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করিলেই কোন্ বর্ণের সূতার আবশ্যক তাহা বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মাকু পরিচালনের সমভূমিতে সূতা রাখিবার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন। উহা দ্বারা বয়নকারীর ইচ্ছানুসারে সূতা খুলিয়া আসিয়া মাকু পরিচালনের সহায়তা করিয়া থাকে। তাঁতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বয়নকারীরও বসিবার সুব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে বেশ সূক্ষ্ম ধুতি প্রস্তুত হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীনকালের প্রথানুসারে বয়নবস্ত্রে দাগ দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বাঁশ বা বেত্র দ্বারা চিহ্ন প্রদান করিবার যন্ত্র প্রস্তুত হইত, এক্ষণে আর সেরূপ হয় না। উহার স্থলে ইস্পাত দ্বারা যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। রিডগুলি কলের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। উহা এত তাড়াতাড়ি নিষ্পন্ন হয় যে প্রতি মিনিটে ৩ হইতে ৪ শত দাগ দেওয়া যাইতে পারে। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম "পাওয়ার-লুম" বা কলের তাঁত প্রস্তুত হয়। মিঃ দর্শিক তাহার আবিষ্কারক। উহা তত ভাল হয় নাই বলিয়া ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী নৌ বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী অপর একখানি কলের তাঁত প্রস্তুত করেন। ইহাতে যেরূপ ভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত তদপেক্ষা আরও সুগম উপায়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য নানা দেশের লোকে নব নব কলের আবিষ্কারকল্পে মস্তিষ্ক পরিচালনে বদ্ধপরিকর হইল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার কার্টরাইট একখানি চলন-সহি তাঁত প্রস্তুত করিলেন। তিনি বিলক্ষণ বহুদর্শী লোক ছিলেন তজ্জন্য সাধারণের উপযোগী তাঁতের ব্যবস্থা করিলেন। কারখানায় যাহাতে তাঁতগুলির প্রচলন হইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থারও ক্রটী হইল না। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না। সেইজন্য তিনি এইরূপ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার কতিপয় তন্তুবায় বন্ধুর পরামর্শে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার স্বহস্তনির্ম্মিত তাঁত দেশবাসিগণের নিকট প্রচার করিলেন। তাহাও তত কৃতকার্য্যতার পরিচয় প্রদান করিল না বলিয়া আবার ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় প্রণালীর তাঁত বাহির হইল। ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কৃতকার্য্যতার লক্ষণ দৃষ্ট হইল। ক্রমশ তিনি "মাকু" বিনা সাহায্যে

চলিতে পারে এমন ব্যবস্থা করিলেন। তাহাকে "অটোমেটিক-সাট্‌ল" কহে। পরে "তানা" ও "পড়িয়ান" সূত্রের গতিরোধ যদ্দারা স্বল্লায়াসে হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকল লোকে টাকা সংগ্রহ করিয়া ইচ্ছাসত্ত্বেও তাঁত ক্রয় করিতে পারে না বলিয়া তিনি তাহাদের নিকট তাঁত ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। হাতের তাঁতের ব্যবসায়ী তন্তুবায়গণ যখন দেখিল তাহাদের ব্যবসায় কলের তাঁতে নষ্ট হইয়া যাইবে তখন যাহারা ঐ তাঁত ভাড়া বা ক্রয় করে তাহাদিগকে তাহারা নানাবিধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। তখন তিনি ইয়র্কসায়ারে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। ইহা ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কেহ কোন কার্য্য হাতে কলমে না করিলে তাহার সুবিধা অসুবিধা বুঝিতে পারে না। কার্টরাইট এক্ষণে কলের গলদ এবং প্রকৃত অভাব কি তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিলেন। তাহার বিমোচনের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার শেষ চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিলেন। তাঁহার সেই তাঁতটি "পেটেণ্ট" করিয়া লইলেন। এই তাঁতের বিশেষত্ব এই, খান্‌চা হইতে সূত্র সংযোগে বহু "মাকু" পরিচালিত হইতে পারিবে। ঐ "মাকু"গুলি কানাচে ভাবে থাকিতে পারে না। উহাদিগকে সোজা ভাবে থাকিতে হইবে। যাহা হউক, ইহাও তত কার্য্যকরী হইল না। হাতের তাঁতে যে প্রকার সূতা প্রস্তুত হইতে পারে ইহাতেও তদপেক্ষা উত্তম সূতা প্রস্তুত হইল না। কিন্তু উহাতে প্রতি মিনিটে ঊর্দ্ধ ৫৫টি "পিক" প্রস্তুত হইতে পারে ও অনূর্দ্ধ ৩৭·৮ হইতে পারে। তিনি "অটোমেটিক লুম" প্রস্তুতকল্পে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু তিনি ইহাতে বিফল মনোরথ হইয়াছেন। তিনি এই কার্য্যের পর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আর কোন-রূপ চেষ্টা করেন নাই। "তানার" সুবন্দোবস্ত থাকায় একজন তন্তুবায় দুই বা ততোধিক কলের তাঁত চালাইতে পারে। বিশেষ অসুবিধা সত্ত্বেও এবং তাঁত অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেলেও একজন লোক দ্বারা ইহাতে অধিক কার্য্য সম্পন্ন করান যাইতে পারে। ইহাতেই যে তাঁতের উন্নতির পর্য্যবসান হইল তাহা নহে। ক্রমশ উন্নত উপায়ে তাঁতের কার্য্য চলিতে লাগিল।

কিন্তু এই কার্য্যে আর একটি বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকের মজুরী বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। একটি তাঁত চালাইতে ব্যয় অধিক হইতে আরম্ভ হইল। কলের তাঁতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সূতা-কাটা, বয়ন শেষ করা, পরিষ্কার করা, রং করা প্রভৃতিরও বিলক্ষণ উন্নতি লক্ষিত হইল। এ সমস্ত কার্য্যই বাষ্পীয় কলের সাহায্যে সম্পন্ন হইতে লাগিল। তুলা উৎপন্নকারী শ্রমজীবিগণকেও উত্তম এবং অধিক তুলা উৎপন্নার্থে বদ্ধপরিকর হইতে হইল। নতুবা আর উক্ত কলের সঙ্গে সমকক্ষ হইতে পারা যাইবে না। কারণ কলওয়ালাগণের অভাব পরিপূরণ করিতে না পারিলে আর কোন ক্রমেই চলি-তেছে না। সুতরাং তুলা পরিবর্দ্ধন করিতে সবিশেষ যত্ন হইতে লাগিল। এইরূপে কলের তাঁত ও তুলার উন্নতির জন্য অনেকের মস্তিষ্ক পরিচালিত হইতে ত্রুটী হইল না। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ ১৭০১ হইতে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার মণ তুলা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ৪ লক্ষ ৫০ হাজার মণে দাঁড়াইয়াছিল।

১৭৮০	১৬,৭৫০ বেল	তুলা কাট্‌তি হয়।
১৭৯০	৭৭,৫০০ "	" "
১৮০০	১,৪০,০০০ "	" "

এই প্রকার উন্নতি যে কলের তাঁতের সংখ্যা বাড়িয়া-ছিল বলিয়াই কেবল হইয়াছে তাহা নহে। উহা হইয়াছে হাতের তাঁতের পরিমাণও অতিরিক্ত রূপে বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে বলিয়া। ডাক্তার কার্টরাইটের পরে গ্লাসগো সহরের রবার্টমিলার ও ষ্টকফোর্ডের উইলিয়ম হরক্‌স্‌ নামক দুইটি সাহেব তাঁতের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছিলেন। কার্টরাইটের অবসর গ্রহণ করিবার চারি বৎসর পরে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রবার্টমিলার অপেক্ষাকৃত উন্নত উপায়ে কলের তাঁতের উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি মাকু চালাইবার জন্য স্প্রিংয়ের ব্যবহার না করিয়া চলিতে পারে কিনা তাহারই উপায় স্থির করিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ হরক্‌স্‌ তাঁতের চুঙ্গি প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উন্নতি করিয়া তাঁত চালাইতে আরম্ভ করেন।

১৮৩০ সালে কলে সূতা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইল। পুরাতন প্রথানুসারে ২০০ শত লোকে যত সূতা কাটিতে

পারে ইহার এক একটি ফ্রেমে ততোধিক সূতা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু তখনও হাতের তাঁত অপেক্ষা কলের তাঁতে তিনগুণ কার্য্য হইত। ১৮১৩ হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ম্যান ও চানেল দ্বীপাদিতে সর্ব্বসুদ্ধ ১১ হাজার ৭ শত ৫০টি কলের তাঁত ছিল।

১৮২০ খ্রীঃ ১৪,১৫০ টি
১৮৩৩ „ ১০০,০০০ „
১৮৬০ „ ৪০০,০০০ „
১৮৮২ „ ৫০০,০০০ „

১৯০৫ „ ৬৫০১৬৬ টিতে দাঁড়াইয়াছিল। তখন মোট ৪ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭২ হাজার ৯ শত ৫১টি সূতা কাটিবার চরকা ছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার শ্রমজীবি তথায় এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। ১৮০০ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১ লক্ষ ৪০ হাজার বেল তুলা ক্রমশ বাড়িয়া ৮ লক্ষ বেলে দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৬০ খ্রীঃ ২৭ লক্ষ ৯ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হয়। ১৮৮২ খ্রীঃ ৪৪ লক্ষ, ২৩ হাজার বেল পাওয়া গিয়াছিল। ১৯০৩ সালে প্রধান তুলা উৎপন্নের স্থান আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, মিশর দেশে ও ভারতবর্ষে সর্ব্বসুদ্ধ ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩০ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। পাঠকগণের যেন স্মরণ থাকে যে তুলার এক একটি "বেলে" ৫০ মণ করিয়া তুলা থাকে। ১৮২০ হইতে ১৮৩৩ সালের মধ্যে হাতের তাঁত ২ লক্ষ ৪০ হাজার হইতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার হইয়াছিল। কল পরিচালনায় আরও অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং তদ্দ্বারাই বর্ত্তমান অবস্থায় এতাদৃশ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে।

এইগুলি ইউরোপের কথা। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ভারতে এই সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। তবে স্বদেশী আন্দোলন হইয়া হাতের তাঁতের কিঞ্চিৎ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে বটে। ভারতবর্ষে যত কলের তাঁত আছে তদপেক্ষা হাতের তাঁত তিনগুণ অধিক। ইহাতে বোধ হয় হাতের তাঁতের মৃতাবস্থায় যেন কিঞ্চিৎ জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

স্থানে স্থানে গভর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের দ্বারা তন্তুবায়-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তথায় ছাত্রগণকে বাণিজ্যোপযোগী শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। কারখানায় যে প্রকারে কার্য্য করিতে হয় তাহার নমুনা এই স্থান হইতে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। এই বিদ্যালয়সমূহে কেবল যে বর্ত্তমান সময়োপযোগী খটখটি-তাঁতের শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে তাহা নহে। তাঁতের জন্য মুক্তি ফৌজের (Salvation Army) কমিশনার বুথ্ টাকার অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য এই, যাহাতে দুঃস্থ তন্তুবায়গণ অপর ব্যবসায়াদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে তদুপায় বিধান করা। কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। গভর্ণমেণ্টেরও উদ্দেশ্য ঐ প্রকারই বটে। যাহাতে দীনদরিদ্রগণ ব্যবসায় অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারে গভর্ণমেণ্টেরও সেইরূপ অভিপ্রায়। প্রত্যেক ছাত্রই যাহাতে এক একটি সুদক্ষ তন্তুবয়ন-কার্য্যক্ষম হইতে পারে তাহার জন্য যত্ন হইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীরামপুরের গভর্ণমেণ্টের তন্তুবিদ্যালয়ে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে দুই শ্রেণীতে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। (১) উচ্চশ্রেণী এবং (২) নিম্নশ্রেণী। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকে হাতে-কলমে বয়নবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। এই বয়নবিদ্যা বহু শাখায় বিভক্ত আনুষঙ্গিক শিল্পাদি হইতে শিক্ষা করিতে হয়। উচ্চ বংশীয় ছাত্রগণকে (ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ) তন্তু সম্বন্ধে বহুতথ্য শিক্ষা করিতে হয়। সূত্র-প্রস্তুতপ্রণালী, উহার স্বাভাবিক অবস্থা, উহার আকৃতি, নব নব বিধানে কাপড় প্রস্তুতের কৌশল বহির্গত করিবার প্রণালী, বস্ত্রের সূতা বিশ্লেষণ, মূল্যনির্দ্ধারণ, হস্তে বস্ত্র বয়ন, মডেল চিত্রাদি অঙ্কন, যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত চিত্রাঙ্কন, সূত্র-প্রস্তুতের যন্ত্র অঙ্কন, ইঞ্জিনিয়ারীং চিত্রাদি অঙ্কন, রসায়ন সাহায্যে সূত্রাদির ক্রিয়া প্রভৃতি বহু বিষয় এই উচ্চশ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষা ইংরাজী ভাষায় প্রদান করা হয়। কারণ বিভিন্ন দেশের ছাত্রগণকে একস্থানে শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে ঐরূপ উপায়ই আবশ্যক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এই উচ্চ-শ্রেণীতে তাহাদেরই প্রবেশাধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে। উচ্চ-

শ্রেণীর ছাত্রগণকে ইংরাজীতে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে সিটি গিল্ডস্ লণ্ডন ইনিষ্টিটিউটের (City Guilds London Institute) পরীক্ষা বিলাতে না যাইয়া বোম্বাই সহরেই দিতে পারে এমন বন্দোবস্ত আছে। ঐ পরীক্ষা যাহাতে বাঙ্গলাদেশ হইতেও দেওয়া যাইতে পারে তাহার উদ্যোগ করা হইতেছে। কার্য্যে কি হইবে বলা যায় না।

এক্ষণে নিম্নশ্রেণীতে যে প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহাই বলিব। এই শ্রেণীতে তন্তুবায়গণই ভর্ত্তি হইয়া থাকে। ইহারা নানাবিধ তাঁত পরিচালন শিক্ষা করে। আরও তাহাদের যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত চিত্রাঙ্কন ও বস্ত্রবয়ন শিক্ষা করিতে হয়। অবশ্য যে বস্ত্র বাজারে বিশেষ কাটতি এমত বস্ত্রই বুঝিয়া লইতে হইবে। উহার বিশ্লেষণও সামান্য কিছু শিক্ষা করিবার নিয়ম আছে। এই বিদ্যালয়ই যে কেবল বিদ্যমান আছে আর দ্বিতীয়টি হইবার উপায় নাই তাহা নহে। বাঙ্গলা-দেশে আরও পাঁচটি বয়নবিদ্যালয় শীঘ্রই খুলিবার কথা হইতেছে। সেই বিদ্যালয়সমূহের ইহাই কেন্দ্রস্থানীয় হইবে এবং এই প্রধান বিদ্যালয়ই সেইগুলিকে পরিচালিত করিবে। শ্রীরামপুরে যে প্রকার উচ্চ ধরণের শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে ঐ সকল বিদ্যালয়ে তদ্রূপ উচ্চ শিক্ষা আদবেই প্রদান করা হইবে না। এই বয়নবিদ্যালয়গুলি স্থাপন করিয়া তন্তুবায় শ্রেণীর শিক্ষার পথ প্রসারিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যদ্যপি এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয় হইতে অতি বুদ্ধিমান ছাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে শ্রীরামপুরের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থাও করা হইবে। তথায় তাহাকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হইবে। এই সকল বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষায়ই শিক্ষা প্রদান করা হইবে। এই স্থানে প্রায় চারিমাস শিক্ষার কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। নিম্নশ্রেণীর বালকগণ ও তন্তুবায়সন্তানগণকে বয়ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবার জন্যই কেবল ভর্ত্তি করা হইবে। শ্রীরামপুর বা অপর প্রস্তাবিত বিদ্যালয়সমূহে বিনা বেতনে ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে। ছাত্রগণকে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য ৪৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ৮০টি ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হইবে, স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলাদেশের ছাত্র হইলে তাহাকে বোর্ডিং ভাড়া করিয়া থাকিতে হইবে। পশ্চিম দেশীয় (অযোধ্যা, বিহার প্রভৃতি দেশের) ছাত্রগণকে বোর্ডিং খরচা দিতে হইবে না। উচ্চ এবং নিম্নশ্রেণীতে শ্রীরামপুর বয়নবিদ্যালয়ে মোট ৯০ জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। ইহা ভারতবাসীর পক্ষে সুখের সংবাদ বটে। ভারতের প্রিয় চিকীর্ষুগণ গভর্ণমেণ্টের ন্যায় স্থানে স্থানে এইরূপ বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিম্নশ্রেণীর জনগণের মধ্যে শিক্ষা-প্রভাব বিস্তার করিলে বহু ইষ্ট সাধিত হইতে পারে।

শ্রীগণপতি রায়।

আসামে আহোম

মানব জাতির মঙ্গোলীয় শাখাভুক্ত তাতার, হুন, লিচ্ছিবি, শক প্রভৃতি জাতিরা পশ্চিমোত্তর ভারতে সময়ে সময়ে প্রবেশ করিয়া যেরূপে আপন আপন আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক পরিশেষে ভারতীয় হইয়া গিয়াছে—পূর্ব্বোত্তর ভারতপ্রান্তেও এক জাতি আসিয়া তদ্রূপ হইয়াছে। এই জাতি আহোম নামে অভিহিত। ৺রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর তাঁহার আসাম বুড়ঞ্জির ২৮ পৃষ্ঠায় আহোম-দিগের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

—"প্রায় ৬৫০ বছর হল এই জাতি শ্যাম দেশর পরা আহি এই দেশ অধিকার করে। ইহঁতর অনেকে হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করি বড় নিষ্ঠাপর হিন্দু হইছে। ইহঁতে এতিয়া পর্ব্বত বাস ন করে—।"

ত্রয়োদশ শতাব্দিতে উত্তর ব্রহ্মের শান প্রদেশ হইতে একদল বলশালী শান ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত পর্ব্বতমালা উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় প্রবেশ ও রাজ্য স্থাপন করে। সুবিস্তৃত উপত্যকাভূমিতে আসিবার সময় মিথি (মনিপুরী) নাগা প্রভৃতি জাতিদিগের বাধা অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছিল এবং উপত্যকাস্থিত তাৎকালিক জাতিদিগের সহিত সংঘর্ষ করিতে না হইয়াছিল এমন নহে। কিন্তু সেই সংঘর্ষ সহজেই দমিত হইয়াছিল অনুমান হয়, কেননা তখন বিশেষ তেজস্বী জাতি শিবসাগর

ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল না—থাকিলে নবাগতদিগের পক্ষে প্রবেশলাভ অত সহজসাধ্য হইত না। কারণ শান নবাগতদিগের সংখ্যা মোটে ১০৮০ জন, ও সঙ্গে মাত্র একটী দাঁতাল হস্তী, ১টী মাখুন্দী হস্তী, আর ৩০০ ঘোড়া ছিল। ইহারা প্রথমে শিবসাগরের সমীপবর্ত্তী স্থান ও তৎ পুর্ব্বভাগ আপনাদিগের শাসনাধীন করে এবং পরে ক্রমশ পশ্চিম ভাগেও শাসন বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে ইংাদের ক্ষমতা তত অগ্রসর হয় নাই, কারণ উহা ভোট প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ জাতির করায়ত্ত ছিল। আহোমেরা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করায় হিন্দুদিগের বিশেষ সহানুভূতি পাইয়াছিল। ইহারা ১২২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫৯৫ বৎসর আসাম শাসন ও আসামের পুষ্টি সাধন করিয়াছিল। ইহারা হিন্দু হইয়া অনেক দেবালয় পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এখনো সেই সমুদয় তাহাদের যশঃগীতি কীর্ত্তন করিতেছে। ইহাদের আদি রাজা চুকাফা ও শেষ রাজা যোগেশ্বর সিংহ। সর্ব্বসুদ্ধ ৪০ জন রাজা হইয়াছিল।

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ।

আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন

স্বর্ণবঙ্গ।

"পারদ, নিশাদল ও গন্ধক—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, প্রথমতঃ বঙ্গ অগ্নিতাপে গলাইয়া, তাহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে এবং উভয়ে মিশ্রিত হইলে, তাহাতে নিশাদল ও গন্ধকচূর্ণ দিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। পরে একটি কাঁচের শিশিতে তাহা পুরিয়া শিশির উপরে বস্ত্র ও মৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে মকরধ্বজ পাকের ন্যায় বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে এবং স্বর্ণকণার ন্যায় উজ্জ্বল পদার্থ প্রস্তুত হইলেই স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।" *

স্বর্ণবঙ্গ কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছে ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। ইউরোপে কন্‌কেল (Kunkel) নামক এক রাসায়নিক উহা আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্তুতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে উহা ইউরোপে mosaic gold নামে প্রচলিত হইয়াছে।

পদার্থটি দেখিতে স্বর্ণের ন্যায় এবং আজকাল সোনালি রং করিবার জন্য বহুল পারমাণে ব্যবহৃত হয়। এই স্বর্ণবঙ্গ-প্রস্তুতপ্রণালী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। আয়ুর্ব্বেদোক্ত উপায় অনুযায়ী প্রণালীতে ইউরোপেও উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুতকালে নিশাদল ব্যবহার উন্নত রসায়নজ্ঞান সাপেক্ষ। ঐ প্রস্তুতপ্রণালীতে নিম্নলিখিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। বঙ্গ পারদের সহিত সংযুক্ত হওয়াতে tin amalgam প্রস্তুত হয়। পরে ঐ বঙ্গ নিশাদলের সহিত সংযুক্ত হইয়া একটি মিশ্রযৌগিক (double compound) উৎপন্ন করে। এই যৌগিকটি পরে গন্ধকের সহিত সংযুক্ত হইলে স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত হয় এবং উত্তাপবশতঃ নিশাদল, মার্কিউরিক ক্লোরাইড এবং ষ্টানস্ ক্লোরাইড (Tin cloride) বোতলের গলদেশে উদ্ধপাতিত হয়। নিম্নে কেবল স্বর্ণসদৃশ স্বর্ণবঙ্গ পড়িয়া থাকে। স্বর্ণবঙ্গের বৈজ্ঞানিক নাম ষ্টানিক সল্‌ফাইড্ (stannic sulphide)। দুঃখের বিষয় কবিরাজ মহাশয়েরা স্বর্ণবঙ্গ অন্যূনপক্ষে ৪৲ টাকা ভরি অর্থাৎ ৩২০৲ সের হিসাবে বিক্রয় করেন, ইউরোপজাত স্বর্ণবঙ্গ (mosaic gold) অত্যন্ত সস্তায় বিক্রীত হয়।

রাসায়নিক পরীক্ষা—আমি দুইটি নমুনা পরীক্ষা করিয়াছি। স্বর্ণ নাই। নিশাদল বা পারদ নাই। দেখিতে স্বর্ণের ন্যায় চক্‌চকে। বেশ বিশুদ্ধ দ্রব্য বলিয়া মনে হইল।

প্রবাল, কপর্দ্দক, শঙ্খ ও শুক্তি প্রভৃতি ভস্ম।

মুক্তা, প্রবাল, কপর্দ্দক প্রভৃতি ক্যালসিয়াম্ (calcium) ধাতুর যৌগিকবিশিষ্ট পদার্থের ভস্ম আয়ুর্ব্বেদে বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মুক্তার মূল্যাধিক্যের জন্য উহার ভস্ম সর্ব্বাধিক গুণযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ ভস্মের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে জানা যায় যে উহার উপাদান স্বল্পমূল্যের শঙ্খ, কপর্দ্দক, শুক্তি প্রভৃতির ভস্ম হইতে পৃথক্ নহে। এই সকল দ্রব্য

* কবিরাজী-শিক্ষা, দ্বিতীয় ভাগ। পৃঃ ৬১৮।

সাধারণতঃ লেবুর রস প্রভৃতি অম্লবর্গের দ্বারা শোধিত হয়, পরে মৃদু উত্তাপে অন্ধমূষায় ভস্মীভূত হইয়া থাকে। শোধনকালে অম্লবর্গের রসের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যের রঞ্জক পদার্থ (colouring matter) দূরীভূত হয় এবং ভস্ম হইলে চূণে (calcium oxideএ) পরিণত হয়।

কপর্দ্দক—"তক্র, আমরুলরস ও জম্বীর রস দ্বারা অথবা অন্যান্য অম্লদ্রব্য দ্বারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত পীতবর্ণতা দূর না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবনা দিলে কড়ি শোধিত হইবে।" এইরূপে বর্ণহীন কপর্দ্দককে "মূষার মধ্যে পুরিয়া একটি গর্ত্তে তুষ-মধ্যগত করতঃ ঘুঁটের আগুনে জ্বাল দিবে। ইহাতে কড়ি ভস্ম হইবে"।*

প্রবাল—উহার মারণ মুক্তার ন্যায়। মতান্তরে অন্য-বিধ উপায়ও আছে।

শঙ্খ—"জম্বীর রসে সূর্য্যতাপে সাতদিন ভাবনা দিয়া ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া লইলে, উহা শোধিত হয়।" এইরূপে বিশোধিত শঙ্খ অন্ধমূষায় পাক করিলে ভস্মীভূত হয়।†

শুক্তি- শঙ্খ, কপর্দ্দকের মত শোধিত ও জারিত হয়।‡

রাসায়নিক পরীক্ষা।

মুক্তাভস্মের পরীক্ষা পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে।

(১) প্রবালভস্ম। দেখিতে শ্বেতবর্ণ, ঈষৎ লাল আভা আছে। চূণ এবং কেল্‌সিয়াম্ কার্ব্বনেটের মিশ্রণ। অতি সামান্য লৌহ আছে।

(২) শঙ্খভস্ম। প্রথম নমুনা। দেখিতে ধব্‌ধবে সাদা। ডাইলিউট্ হাইড্রোক্লোরিক এসিড (dilute hydrochloric acid) দিলে সবটা দ্রবীভূত হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায় সমস্ত শঙ্খ ভস্মীভূত হয় নাই। অদ্রবণীয় অংশ-টুকু ভিন্ন বাকি অংশ কেল্‌সিয়াম্ কার্ব্বনেট্ ও চূণের সংমিশ্রণ।

দ্বিতীয় নমুনা। দেখিতে ধব্‌ধবে সাদা। ইহাতে অদ্রবণীয় অংশ নাই। কেলসিয়াম কার্ব্বনেট ও চূণের সংমিশ্রণ। সমস্ত শঙ্খ কপর্দ্দক প্রভৃতি ভস্মীভূত হইল কি না তাহা পরীক্ষা সহজেই করা যায়—জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিলে গ্যাস বাহির হইবে এবং সমস্তটা দ্রবীভূত হইয়া যাইবে।

৩) কপর্দ্দকভস্ম। দেখিতে শ্বেতবর্ণ, অল্প ময়লাটে। কেল্‌সিয়াম্ কার্ব্বনেট্ ও চূণের সংমিশ্রণ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই সকল ভস্ম হয়ত প্রস্তুত কালে চূণে পরিণত হয়, পরে বায়ুর কার্ব্বনিক এসিডের সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্ব্বনেটে পরিণত হয়। কবিরাজ মহাশয়েরা কাগজের পুরিয়া করিয়া সকল ঔষধ বিক্রয় করেন। এইরূপ পুরি-য়াতে দিনকতক এই সকল ভস্ম থাকিলে সম্পূর্ণরূপে কার্ব্বনেটে পরিণত হইয়া যাইবে।

শোধিত তুঁতে।

তুঁতের বৈজ্ঞানিক নাম কপার সালফেট্ (copper sulphate)—তাম্রের একটি যৌগিক। তুঁতে শোধন করিতে হইলে "সম পরিমাণ বিড়ালের বিষ্ঠা ও পায়রার বিষ্ঠা সহ তুঁতে মর্দ্দন পূর্ব্বক দশাংশ সোহাগা সহ মিশ্রিত করিয়া মৃদু পুটে পাক করতঃ পুনরায় চতুর্থাংশ সৈন্ধব ও কিঞ্চিৎ মধু সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিয়া লইলে উহা বিশোধিত হয়।"*

বিড়ালের "বিষ্ঠা" ও পায়রার "বিষ্ঠা" দ্বারা তুঁতেকে "শোধিত" করার ব্যবস্থা দেখিয়া পাঠকবর্গ হয়ত কখনও শোধিত তুঁতে ঔষধরূপে সেবন করিয়াছেন কি না স্মরণ করিতেছেন ও বিষ্ঠা-ভক্ষণ-জনিত প্রায়শ্চিত্ত করিবেন কি না বলিয়া মনে মনে তর্ক করিতেছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া জানাইতেছি যে তুঁতে অবিকৃত অবস্থায় সেবন করিলে তাঁহাদিগকে বমি করিতে করিতে এতক্ষণ "প্রবাসী" পাঠ করা বন্ধ করিতে হইত। তুঁতে বমিকারক একটি বিষ পদার্থ, অতএব অবিকৃত অবস্থায় বিষের ক্রিয়া করিবে। আমি পরীক্ষার জন্য দুই স্থান হইতে শোধিত তুঁতে আনাইয়াছিলাম। কলিকাতার একজন বিখ্যাত কবিরাজ অবিকৃত তুঁতে গুঁড়া করিয়া শোধিত তুঁতে বলিয়া আমাকে দিয়াছেন। তাঁহার নমুনা ও ছাপা লেবেল আমার নিকট আছে।

---

* রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ—৪২ পৃঃ।

† রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ—৪১ পৃঃ।

‡ রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ—৪৮ পৃঃ।

* রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ—৩৯পৃঃ।

রাসায়নিক পরীক্ষা ঃ—

প্রথম নমুনা। চট্টগ্রামের কোন কবিরাজ মহাশয়ের প্রদত্ত। দেখিতে কালবর্ণের নরম পদার্থ। জলে দ্রবণীয় অংশে সোহাগা ও লবণ পাওয়া যায়। আসল দ্রব্য কপার অক্‌সাইড্ (black copper oxide)। বিষ্ঠার দরুণ তখনও জৈব পদাথ অদগ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। মূষায় উত্তপ্ত করিলে জৈব পদার্থ পুড়িতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কপার অক্‌সাইড প্রস্তুত করিবার জন্য আশা করি এখন হইতে বিড়াল ও কপোতের বিষ্ঠার শরণ লইবার প্রয়োজন হইবে না। আধুনিক রসায়নশাস্ত্র পাঠ করিলে কপার অক্‌সাইড্ প্রস্তুত করিবার সহজ উপায় যে কেহ জানিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় নমুনা পূর্ব্বোক্ত অবিকৃত তুঁতে।

মতান্তরে তুঁতে শোধন। তুঁতে শোধন করিবার আর একটি প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। "অর্দ্ধেক পরিমিত গন্ধক সহ তুঁতে মর্দ্দন পূর্ব্বক অর্দ্ধ প্রহর পর্য্যন্ত পুটপাক করিবে। অর্থাৎ যতক্ষণ উহার বান্তি ও ভ্রান্তি দোষ দূরীভূত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুটপাক করিবে।"* এই গন্ধকের সহিত অনেকক্ষণ তুঁতেকে পুটপাক করিলে কপার সাল্‌ফাইড্ (copper sulphide) প্রস্তুত হইবে। তুঁতে জলে দ্রবণীয় কিন্তু কপার অক্‌সাইড্ ও সাল্‌ফাইড্ জলে আদৌ দ্রবণীয় নহে। শেষোক্ত দ্রব্য দুইটি তুঁতের মত বমিকারক নহে। তাম্রভস্মও কপার সাল্‌ফাইড্—পরে প্রকাশ্য।

অজৈব অম্লবর্গ (Inorganic acids)।

ভারতবর্ষে অজৈব (inorganic) অম্লবর্গ পুরাকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল কি না সে বিষয়ে এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে। অনুসন্ধানফলে যতটুকু জানা গিয়াছে তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

সুশ্রুত যে অম্লবর্গের তালিকা দিয়াছেন তাহাতে অম্ল-রস-সংযুক্ত ফলাদির রসের নাম যথা—আম্রাতক (আমড়া), কুল, তেঁতুল, ভব্য (চাল্‌তা), জম্বীর ইত্যাদি এবং দধি, তক্র, সুরা, তুষোদক এবং ধান্যাম্লের উল্লেখ আছে। কোন অজৈব অম্লের উল্লেখ নাই। রসার্ণব নামক গ্রন্থে আমরা সর্ব্বপ্রথম অজৈব অম্লের সন্ধান পাই। ঐ গ্রন্থখানি অধ্যাপক রায় মহাশয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে সৌরাষ্ট্রী (ফট্‌কিরি) চোয়াইয়া তাহার সত্ত্ব বাহির করিবার ব্যবস্থা আছে। * ফট্‌কিরিকে চোয়াইলে জলমিশ্রিত সাল্‌-ফিউরিক অ্যাসিড্ (sulphuric acid) প্রস্তুত হইয়া থাকে। আরও ঐ গ্রন্থে "বিড়" নামক আরও একটি দ্রব্যের প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণিত আছে—ইহা প্রস্তুত করিবার জন্য অন্যান্য দ্রব্যের সংযোগে কাসীস (হিরাকস) সৈন্ধব এবং সোরা এই তিন দ্রব্য উত্তপ্ত করিয়া তাহাদের সত্ত্ব বাহির করিবার ব্যবস্থা আছে। এইরূপে যে দ্রব পদার্থ পাওয়া যাইবে তাহা "সর্ব্বজারণঃ" অর্থাৎ সকল দ্রব্যই দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হইবে। † রাসায়নিক বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই দ্রব পদার্থে জলমিশ্রিত নাইট্রো-মিউরিয়াটিক অ্যাসিড (nitro-muriatic acid) প্রস্তুত হইয়াছে। হিরাকসকে উত্তপ্ত করাতে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং উহা সৈন্ধব ও সোরার সহিত সংযুক্ত হইয়া যথাক্রমে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (hydro-chloric acid) এবং নাইট্রিক অ্যাসিড (nitric acid) প্রস্তুত করে। নাইট্রো-মিউরিয়াটিক অ্যাসিড উপরোক্ত ঐ দুইটি অ্যাসিডের সংমিশ্রণ। ঐ অ্যাসিডের "সর্ব্বজারণঃ" নাম বেশ উপযুক্ত হইয়াছে। স্বর্ণ ঐ অ্যাসিড ভিন্ন অন্য সাধারণ কোন অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় না, সেই জন্য ইংরাজিতে ঐ অ্যাসিডকে aqua regia (অর্থাৎ "জলের রাজা") বলা হইয়া থাকে। উহাকে এখন হইতে বাঙ্গালা ভাষায় "সর্ব্বজারণঃ" বলিলে প্রাচীন গবেষণার স্মৃতির মান রক্ষা করা হইবে।

অতএব রসার্ণব হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে দ্বাদশ শতাব্দীতে সাল্‌ফিউরিক এবং নাইট্রো-মিউরিয়াটিক্ অ্যাসিড ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রসরত্নসমুচ্চয় নামক গ্রন্থেও এই দুই অম্লের উল্লেখ আছে। ঐ গ্রন্থে

* রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ—৩৯ পৃঃ।

* গোপিত্তেন শতং বারান্ সৌরাষ্ট্রীং ভাবয়েৎ ততঃ।
ঘর্মিত্বা পাতয়েৎ সত্ত্বং ক্রামণং চাতিশুল্বকম্॥ রসার্ণব, ৭—৭৩ ও ৭৪

† কাসীসং সৈন্ধবং মাক্ষী সৌবীরং ব্যোষগন্ধকম্।
সৌবর্চলং ব্যোষকা চ মালতীরসসংভবঃ॥
শিগ্রুমূলরসৈঃ সিক্তো বিড়োহয়ং সর্ব্বজারণঃ॥ রসার্ণব, ৯—২ ও ৩

হিরাকসকেও ফটকিরির মত চোয়াইয়া তাহার সত্ত্ব বাহির করিবার ব্যবস্থা আছে।* হীরাকসকে চোয়াইলেও সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়। অধ্যাপক রায় মহাশয় এই গ্রন্থকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নাইট্রো মিউরিয়াটিক অ্যাসিড, দুইটি অ্যাসিডের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঐ অ্যাসিডের পৃথক ভাবে প্রস্তুতপ্রণালীর আয়ুর্ব্বেদে কোথাও উল্লেখ আছে বলিয়া বোধ হইল না। এমন কি পরবর্ত্তীকালের রসপ্রদীপ, গোবিন্দদাসের ভৈষজ্য-রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে মহাদ্রাবক রস, শঙ্খদ্রাবক রস প্রভৃতি যে সকল দ্রাবকের (solvent) উল্লেখ আছে তাহাতে ঐ নাইট্রো-মিউরিয়াটিক অ্যাসিডই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে আকবরের রাজত্বকালে আবুল ফজলের লিখিত আইন্-ই আকবরী নামক গ্রন্থে স্বর্ণ হইতে রৌপ্য পৃথক করিবার জন্য "রসী" নামক দ্রব্যের উল্লেখ আছে। এই "রসী" এক প্রকার নাইট্রিক অ্যাসিড হইতে পারে। গ্লাডউইন সাহেব (Gladwin) কৃত আইন-ই আকবরীর ইংরাজী অনুবাদে লিখিত হইয়াছে—"Ressy is a kind of aqua fortis (nitric acid) made from soap-ashes and saltpetre earth."† ডাক্তার ওসানেউসী বলিয়াছেন যে "সোরা কি তেজাব" (nitric acid), এবং "গন্ধক কি আতর" (sulphuric acid) প্রস্তুত করিতে হিন্দুরা অনেক দিন হইতে জানিতেন।‡ ডাক্তার এনস্‌লি (Ainslie) লিখিয়াছেন যে মান্দ্রাজ অঞ্চলে তামিল বৈদ্যগণ সোরা ও গন্ধক উত্তপ্ত করিয়া সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে জানিতেন।

ইউরোপে সুপ্রসিদ্ধ আরব রাসায়নিক গেবার (Geber) এই সকল অজৈব অম্লের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক বার্থেলো সাহেব (Berthelot) সপ্রমাণ করিয়াছেন যে এই গেবারের নামে প্রচলিত ল্যাটিন ভাষায় লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থই ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন লেখকের দ্বারা লিখিত এবং সুপ্রসিদ্ধ গেবারের নামে প্রচলিত। এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে ইউরোপে অজৈব অম্লবর্গের আবিষ্কার ভারতের সহিত প্রায় সমকালেই হইয়াছিল। বিশেষত্বের মধ্যে এই যে গেবারের গ্রন্থনিচয়ে সাল্‌ফিউরিক, নাইট্রিক ও নাইট্রো-মিউরিয়াটিক এই তিনটি অম্লের প্রস্তুতপ্রণালী সূচিত হইয়াছে। গেবারের পরে বেসিল ভেলেণ্টাইন (Basil Valentine) নামক ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর একজন সন্ন্যাসী এই সকল অম্ল বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি লবণ ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সংযোগে হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিডও প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইঁহাদের আবিষ্কৃত প্রস্তুতপ্রণালী ভারতে আবিষ্কৃত প্রণালী হইতে বিভিন্ন নহে। ইঁহারা হিরাকস চোয়াইয়া সাল্‌-ফিউরিক অ্যাসিড, এবং হিরাকস নিশাদল ও সোরা চোয়াইয়া নাইট্রো-মিউরিয়াটিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদে আজকাল কেবল নাইট্রো-মিউরিয়াটিক অ্যাসিডই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শঙ্খদ্রাবক, মহাদ্রাবক, মহাশঙ্খদ্রাবক প্রভৃতি ঔষধের যেরূপ প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণিত আছে, তাহার সকলটিতেই পূর্ব্বোক্ত অ্যাসিডটিই প্রস্তুত হয়। স্থানাভাবে সকলগুলির প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হইল না। অন্য নানা অবাস্তব ও নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহিত হিরাকস (অথবা ফটকিরি), সোরা এবং লবণকে (অথবা নিশাদল) বারুণী যন্ত্রে চোয়াইয়া সকল দ্রাবক-গুলিই প্রস্তুত হইয়াছে।

আমি শঙ্খদ্রাবক ও মহাশঙ্খদ্রাবক এই দুইটি দ্রাবক পরীক্ষা করিয়াছিলাম। দুইটিতেই হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড (অর্থাৎ নাইট্রো-মিউরিয়াটিক অ্যাসিড) ভিন্ন কিছু পাওয়া যায় নাই।

এখানে আমার নিবেদন এই যে এই দ্রাবকগুলির প্রস্তুতপ্রণালী এখন ইতিহাস বা প্রাচীন তত্ত্বালোচনের সামগ্রী হওয়া উচিত। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঐ সকল প্রণালী যে সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল সেই সময়েই শোভনীয় ছিল, এখন উহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদ হইতে বিদায় দিবার সময়

* "তুবরীসত্ত্ববৎ সত্ত্বমেতস্যাপি (কাসীসস্য) সমাহরেৎ।" রসরত্ন-সমুচ্চয়, ৩, ৫৪।

† Gladwin's Ain-Akbery, Vol. I, P. 17.

‡ O'Shaughnessy's "Manual of Chemistry", P. 50 and 101.

আসিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে আধুনিক রসায়নসাপেক্ষ অনন্য-সুলভ প্রস্তুতপ্রণালীগুলিকে সাদরে বরণ করিয়া লইতে হইবে।

জৈব অম্ল (Organic Acids)।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে আয়ুর্ব্বেদে যে অম্লবর্গের উল্লেখ আছে সেগুলি অম্লরসসংযুক্ত ফলের রসমাত্র। সে সকল ফলের রসের অম্লত্ব কোন্ কোন্ দ্রব্যের অস্তিত্ব হেতু সংঘটিত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান আয়ুর্ব্বেদে কোনও কালে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইউরোপেও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই সকল অম্লরসযুক্ত ফলের উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই। সুইডেন-নিবাসী প্রসিদ্ধ রাসায়নিক সিল (Scheele) সর্ব্বপ্রথমে তেঁতুল হইতে টার্টারিক অ্যাসিড (tartaric acid), লেবু হইতে সাইট্রিক অ্যাসিড (citric acid), দধি হইতে ল্যাকটিক্ অ্যাসিড (lactic acid) প্রভৃতি জৈব অম্লবর্গ বাহির করেন। ভারতে (এবং প্রাচীন ইউরোপেও) কঞ্জিকা বা ধান্যাম্লই (vinegar) একমাত্র আবিষ্কৃত জৈব অম্ল ছিল। সুশ্রুতে সৌবিরকাঞ্জিক, তুষোদক ও ধান্যাম্ল প্রভৃতির প্রস্তুতপ্রণালীর যে উল্লেখ আছে, তাহাতে অন্য নানা দ্রব্যের সহিত যবের (barley) ক্বাথকে ছয় সাত দিবস কলসীমধ্যে রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। ঐ প্রক্রিয়ায় বোধহয় সুরা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুশ্রুতেও তুষোদক ও ধান্যাম্লকে মদ্যবর্গের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে দুই সের আশুধান্য আট সের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সেই জল কলসীমধ্যে পনের দিবস বা তদূর্দ্ধকাল রাখিয়া দিয়া ধান্যাম্ল প্রস্তুত করা হইত। এইরূপে ধান্য হইতে সুরা এবং সুরা হইতে এসেটিক অ্যাসিড্ (acetic acid) উৎপন্ন হইয়া থাকে। আজকাল ভাতের মাড়ের দ্রবকে কাঁজি বা কঞ্জিকা বলে, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের কঞ্জিকা বা ধান্যাম্ল ভাতের মাড় নহে, উহা অবিশুদ্ধ ভিনিগার বা জলমিশ্রিত এসেটিক অ্যাসিড্।

গন্ধক।

গন্ধক প্রাচীনকাল হইতে আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে। চরকেও গন্ধকের উল্লেখ আছে।* কিন্তু চক্রপাণির সময় (একাদশ শতাব্দী) হইতে ধাতুঘটিত ঔষধের প্রচলন হওয়া অবধি গন্ধক বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহৃত হইতেছে। বিশেষতঃ তান্ত্রিকযুগ হইতে পারদের বহুল ব্যবহারের সহিত গন্ধক ব্যবহার সমধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এমন কি এক্ষণে ধাতুঘটিত ঔষধের শতকরা নব্বই ভাগ ঔষধ পারদ ও গন্ধকঘটিত। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে আয়ুর্ব্বেদে যখন এত অধিক সংখ্যক ঔষধ পারদঘটিত, তখন আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ খাইয়া গাত্রে পারদচিহ্ন বাহির হয় না কেন। কবিরাজ মহাশয়েরা বলিয়াছেন যে পারদের "শোধন" করা হইয়া থাকে সেই জন্য এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ঐ মতটী অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। পারদের সহিত "সর্ব্বত্র গন্ধক" দেওয়া হইয়া থাকে বলিয়া এইরূপ হইয়া থাকে। পারদ ও গন্ধক মিলিত হইয়া মার্কিউরিক সালফাইড্ (mercuric sulphide) উৎপন্ন হয় এবং উহা আদৌ দ্রবণীয় নহে বলিয়া শরীরে বিষক্রিয়া করিতে পারে না। গন্ধক না দিয়া "শোধিত" পারদ যে কেহ ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন--তাহাতে পারদের বিষক্রিয়া নিশ্চয়ই সংঘটিত হইবে।

রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে গন্ধকের চারি প্রকার ভেদের উল্লেখ আছে—রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেত-বর্ণ। পীতবর্ণ ভিন্ন অন্য তিনটি বর্ণবিশিষ্ট গন্ধক অর্থে কি কি দ্রব্যকে বুঝাইতেছে তাহা বুঝা যায় না। আজকাল দুই প্রকার গন্ধক আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—সাধারণ ও আমলাসার। দুইই পীতবর্ণ। সাধারণ গন্ধককে ইংরাজিতে roll sulphur বলে। আমলাসার গন্ধক অনেকটা স্বচ্ছ (transparent) ও দানাদার (crystal-line)—ঠিক দানাদার নহে, ইংরাজীতে যাহাকে vitreous বলে সেইরূপ। উহার আংশিকস্বচ্ছতা নিবন্ধন দেখিতে রসাল পক্ক আমলকীর মত বলিয়া উহাকে আমলাসার বলে। গন্ধককে গলাইয়া ধীরে ধীরে শীতল করিয়া এই আমলাসার গন্ধক প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিসিলি (Sicily) দেশ হইতে- "ভারজিন সালফার" (virgin sulphur) নামক যে আংশিকস্বচ্ছ দানাদার খনিজ গন্ধক আমদানি হয় তাহাও আমলাসার গন্ধক বলিয়া ব্যবহৃত হয়।†

* চরক চিকিৎসা-স্থান, ১৭, ৪০।

† "When a large mass of molten sulphur is allowed

এই দুইপ্রকার গন্ধকের মধ্যে একটি আংশিকস্বচ্ছ ও দানাদার ও অপরটি অস্বচ্ছ ও দানাদার নহে। সুতরাং অন্য ধাতুর সহিত সংযুক্ত না করিয়া ব্যবহার করিলে দুইয়ের মধ্যে গুণের পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু উভয়কে গলাইয়া দুগ্ধে ফেলিয়া "শোধিত" করিয়া লইলে বা অন্য ধাতুর সহিত সংযুক্ত করিয়া যৌগিক (compound) প্রস্তুত করাইলে উভয়ের মধ্যে যেটি ইচ্ছা সেইটিই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

গন্ধকের শোধন—"একটি লৌহপাত্রে ঘৃত রাখিয়া সেই ঘৃত কুলকাঠের অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করতঃ তাহাতে ঘৃতের সমান গন্ধক নিক্ষেপ পূর্ব্বক লৌহশলাকা দ্বারা নাড়িয়া গন্ধক গলিয়া যাইলে, উহা একটি দুগ্ধপূর্ণ পাত্রের মুখ ঘৃতাক্ত বস্ত্র দ্বারা রুদ্ধ করতঃ তদুপরি ঢালিবে। ইহাতে ঐ গন্ধক উক্ত দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে পতিত হইবে। তখন ঐ গন্ধক গ্রহণ পূর্ব্বক ধৌত করতঃ রৌদ্রে শুকাইয়া সর্ব্ববিধ রোগে প্রয়োগ করিবে।"* রাসায়নিক বুঝিতে পারিতেছেন যে এই শোধন প্রক্রিয়ায় "প্লেষ্টিক সলফার" (plastic sulphur) প্রস্তুত করিবার নিষ্ফল প্রয়াস সূচিত হইয়াছে। গন্ধক গলাইয়া দুগ্ধে বা জলে ঢালিয়া দিলে সাধারণ গন্ধকেই পরিণত হইবে। তবে এই শোধনের কি আবশ্যকতা আছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

রাসায়নিক পরীক্ষা:—পরীক্ষার্থ শোধিত ও অশোধিত সাধারণ গন্ধক এবং শোধিত ও অশোধিত আমলাসার গন্ধক আনান হইয়াছিল। অশোধিত আমলাসার গন্ধক দেখিতে পীতবর্ণ, ঈষৎ স্বচ্ছ ও ঈষৎ দানাদার। শোধিত সাধারণ ও আমলাসা গন্ধক দেখিতে একরূপ ছোট ছোট অস্বচ্ছ পীতবর্ণ গুলির মত। এই চারিপ্রকার গন্ধকই কার্ব্বন-ডাইসলফাইডে (carbon disulphide) সম্পূর্ণ ভাবে দ্রবণীয়। কেবল সকলটিতেই অতি সামান্য (traces) সাদা গুঁড়ার মত আবর্জ্জনা আছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে এই কয় প্রকারের গন্ধকের মধ্যে কোনটিতেই অদ্রবণীয় এমর্ফস গন্ধক (amorphous sulpnur) নাই। কিন্তু ফ্লাওয়ার্স অব সালফার (flowers of sulphur) নামক গুঁড়া গন্ধক কার্ব্বন-ডাইসলফাইডে সম্পূর্ণ দ্রবণীয় নহে। শোধিত হইলে সাধারণ ও আমলাসার গন্ধকের কোনও বিভিন্নতা থাকে না, কারণ শেষোক্ত গন্ধক গলিয়া তাহার স্বচ্ছ দানাদার অবস্থা হারাইয়া ফেলে।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

---

to cool slowly, rhombic crystals are also formed and these cannot be distinguished from the natural crystal."—Roscoe and Schorlemmer, Vol. 1, Sulphur.

* রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ—২৩ পৃঃ।

আলোচনা

স্বর্জ্জিকাক্ষার।

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে মাননীয় শ্রীযুত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় "আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন" নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে দেখিলাম তিনি কলিকাতার বেণের দোকান ও কবিরাজী দোকান হইতে স্বর্জ্জিকাক্ষার সংগ্রহ করিয়া নমুনা-বিভ্রাটে পতিত হইয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস স্বর্জ্জিকাক্ষার দ্রব্যটী কি তাহা না জানাতেই নিয়োগী মহাশয়কে এইরূপ বিভ্রাটে পড়িতে হইয়াছিল। কল্পতরু বেণের অভিধানে নাস্তি কথাটী নাই বলিয়াই তাঁহার ভাগ্যে স্বর্জ্জিকাক্ষার সংগ্রহ করিতে যাইয়া সাজিমাটি মিলিয়াছিল। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে অনেক কবিরাজী দোকানও ঐ দোষে দূষিত। সুতরাং নিয়োগী মহাশয় প্রকৃত স্বর্জ্জিকাক্ষারের নমুনা পাইয়াছেন কি বলিতে পারিনা। আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজগুলির মধ্যে অধিকাংশই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যগণ স্বর্জ্জিকাক্ষারকে সাচিক্ষার বলিয়া থাকেন। পূজ্যপাদ মদাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহাশয়ের মুখেও আমি ঐ কথা শুনিয়াছিলাম।

আমিও এক সময় নিয়োগী মহাশয়ের ন্যায় স্বর্জ্জিকাক্ষার লইয়া বিভ্রাটে পড়িয়াছিলাম। ভগবানের কৃপায় আমার সন্দেহ মিটিয়া যায়।

মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় আয়ুর্ব্বেদের যে কয়েকখানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন বহু অমূল্য গ্রন্থ এখনও ভারতবাসীর গৃহকোণে জীর্ণ কলেবর পোষণ করিতেছে। ঐ সকল পুস্তকে শিখিবার অনেক বিষয় আছে।

এক সময় আমি প্রাচীন তুলট কাগজে হাতের লেখা একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহ পুঁথি পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তাহার মধ্যে "ক্ষার প্রস্তুত বিধি"তে স্বর্জ্জিকাক্ষার-প্রস্তুতবিধি দেখিতে পাইলাম। ঐ পুস্তকে সাচিশাক হইতে যবক্ষার-প্রস্তুতবিধি অনুসারে স্বর্জ্জিকাক্ষার প্রস্তুত করিবার নিয়মের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ সাচিশাকের ভস্ম /২ দুই সের ১।৪ এককষ চব্বিশ সের জলে উত্তমরূপ গুলিয়া মোটা বস্ত্র দ্বারা

ঐ জল একুশবার ছাঁকিয়া লইবে এবং পরে কোন পাত্রে রাখিয়া তীব্র অগ্নিতে পাক করিবে। জল শুকাইয়া গেলে পাত্রে যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে তাহাই স্বর্জ্জিকাক্ষার। সাচিশাক হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়াই স্বর্জ্জিকাক্ষার; সাচিক্ষার নামে পূর্ব্ববঙ্গে বিখ্যাত।

সাচিশাক বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র সকল সময়ই পাওয়া যায়। এবং প্রায়ই আনুপ ভূমিতে জন্মিয়া থাকে। ইহা একপ্রকার লালবর্ণ লতা বিশেষ। অনেকে এই শাক খাইয়া থাকেন। খাইতেও বেশ মুখরোচক। অন্য শাকের ন্যায় উদরাময়প্রদ নহে। ইহার রস উদরাময় ও পেটফাঁপা রোগে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

আমি আশা করি শ্রীযু৺ পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় যদি উল্লিখিত বিধি অনুসারে প্রস্তুত স্বর্জ্জিকাক্ষার পরীক্ষা করিতে পারেন তবে তাঁহার পরিশ্রম সফল হইবে।

ফরিদপুর। কবিরাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুপ্ত, ভিষগরত্ন।

চিত্রপরিচয়

এবারকার রঙিন চিত্রখানি অজন্টা গুহাগাত্রের একখানি চিত্রের একাংশ মাত্র। ঐকতান বাদ্যের একটি অপ্সরাদল আকাশপথে যাইতেছে, এই বেণুবাদিনী তাহাদের অন্যতমা। এই চিত্র-রচনার ভঙ্গিটি ভারি কবিত্বপূর্ণ—বেণুবাদিনীর সর্ব্বাঙ্গে একটি গতির হিল্লোল আছে। দুহাজার বৎসর পূর্ব্বে রমণীর পরিচ্ছদ, ভূষণ, কেশপ্রসাধনের রীতি প্রভৃতি অনেক কৌতুককর তথ্য ইহা হইতে পাওয়া যায়। অনেকে প্রাচ্য শিল্পকে অস্বাভাবিক বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। এই চিত্র তাঁহাদের কথা অস্বীকার করিতেছে।

প্রাপ্তপুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

The Present State of Sanskrit Learning in Bengal—by Vanamali Chakravarti, M.A., &c. Published by Bhattacharyya and Sons, 65 College Street, Calcutta. D.Cr, 16 mo 68 pp. Price 8 as. 1910.

এই বইখানি ইংরেজিতে লেখা। ইহাতে বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশে সংস্কৃত শিক্ষার অবস্থা পর্য্যালোচিত হইয়াছে। আমরা এই বইখানি আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। গ্রন্থকারের ভাষা বিশুদ্ধ, মত উদার, এবং উদ্দেশ্য মহৎ। গ্রন্থ মধ্যে টোল ও আধুনিক বিদ্যালয়ের পাঠকদের তারতম্য সমালোচিত হইয়াছে। টোলে বিবিধ বিষয়ে স্বল্প জ্ঞানলাভ করা অপেক্ষা এক বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করাই শিক্ষারীতির উদ্দেশ্য। ইহাতে টুলো পণ্ডিতেরা Professional শিক্ষা প্রাপ্ত হন, নিজের গণ্ডির বাহিরের কোনো সংবাদই তাঁহারা রাখিতে পারেন না। যিনি স্মার্ত্ত তিনি ন্যায়ের ধার ধারেন না, যিনি নৈয়ায়িক তিনি জ্যোতিষের ধার ধারেন না; এমনি সকল বিভাগেই। টোলের আর একটি দোষ পাঠ মুখস্থ করিবার ঝোঁক বড় বেশী। টুলো পণ্ডিত এজন্য শাস্ত্রের দোহাই দিতে পটু, স্বাধীন চিন্তা কাহাকে বলে জানেন না। গ্রন্থকার টোলে পাশ্চাত্য শিক্ষারীতি প্রচলনের উপদেশ দেন। তিনি তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে টুলো পণ্ডিত অপেক্ষা পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। সকল শিক্ষনীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে টুলো পণ্ডিতেরা নিজেদের জ্ঞান ও মত বিশ্বজনীন ভাবে গঠন না করিলে তাঁহাদের আর ভদ্রস্থতা নাই—যজমান শিষ্যেরা তাঁহাদের অপেক্ষা জ্ঞানে চিন্তায় উন্নততর হইলে তাঁহারা আর কিসের জোরে শ্রদ্ধার দাবি করিবেন। প্রাচীন সমাজের তন্ত্রমন্ত্র আইনকানুন স্মৃতিব্যবস্থা বিসর্জ্জন দিয়া নূতন পথ ধরিবার সময় আসিয়াছে—শাস্ত্রের দোহাই আর চলিবে না। এইরূপ নবভাবে সঞ্জীবিত স্বাধীনবুদ্ধি-পরিচালিত উন্নত পদ্ধতিতে টোলের সংস্কার না করিলে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার নিশ্চয় ব্যাহত হইবে। যাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী তাঁহাদের এই পুস্তকখানি অবশ্যপাঠ্য। ইহার মধ্যে শিখিবার ভাবিবার অনেক কথা আছে।

চড়া ও গল্প—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ প্রণীত। প্রাকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য চার আনা। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ হইতে গৃহীত দশটি গল্প, কতক ছড়ায়, কতক সহজ গদ্যে শিশুদের উপযোগী করিয়া লিখিত। গ্রন্থকার অনাবিল হাস্যরসের জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি সেই রস শিশুদিগকে পরিবেষণ করিয়া শিশুদের আনন্দকারণ ও অভিভাবকদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। পুস্তকে অনেকগুলি ছবি আছে—তার মধ্যে প্রচ্ছদপট ও মুখপত্র দুইখানি রঙিন। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি সুন্দর হইয়াছে, ইহার দ্বারা শিশুদের বহু পশু পক্ষীর সহিত পরিচয় হইবে। মুখপত্রের ছবিখানি রঙিন কিন্তু কদর্য্য। গ্রন্থ মধ্যে ২।৩ খানি ছবি ভালো, বাকি চলনসই। পদ্য রচনায় মধ্যে বহুস্থানে ছন্দের স্খলন হইয়াছে—তবে মনে রাখিতে হইবে গ্রন্থকার ছড়া লিখিতেছেন, কবিতা নহে। গল্পের উপদেশ (moral) টুকু লাল কালিতে বর্ডারের মধ্যে ছাপা—তাহাতে শিশুদের সহজে বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভালো। দামও খুব সস্তা। এ বই শিশুরাজ্যে সমাদৃত হইবে নিশ্চয়। গ্রন্থকার আমাদের ঘরের জিনিষকে শিশুদের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়া সূক্ষ্মদর্শী অধ্যাপকের মতোই কার্য্য করিয়াছেন।

পরিণাম—শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীমতী তরঙ্গিণীসুন্দরী দাসী সম্পাদিত। প্রকাশক ও বিক্রেতা টি, কে, দাস, রায় বাহাদুর ষ্ট্রীট,

ঢাকা, মূল্য দুই আনা। এখানি প্রহসন শ্রেণীর নাটক। ছাপা কাগজ কদর্য্য। লেখাও তথৈবচ।

বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না—মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রণীত। ২৫ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। মূল্যের উল্লেখ নাই। গ্রন্থকার অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক হইয়াও বিধবা বিবাহ সমর্থন করিয়া পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন—ইহা তাঁহার সৎসাহসের পরিচায়ক। তাঁহার যুক্তি সকল যথার্থ। তবে রচনা-পারিপাট্যের অভাব আছে। গ্রন্থপরিশিষ্টে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্কিম বাবুর মত উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। বিধবা বিবাহ আমাদের একটি কঠিনতম সামাজিক সমস্যা। ইহার যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল।

সান্ত্বনা—শ্রীকেশবচন্দ্র বসু প্রণীত। প্রকাশক গিরিশ লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। গ্রন্থকারের স্ত্রী-বিয়োগে দুঃখবিগলিত অশ্রুধার পদ্য রচনার মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল। এ পুস্তকখানি সেই পদ্যগুলির সমষ্টি। নিজের হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে যাহা পরিব্যক্ত হয় তাহা নিজের কাছে উপাদেয়, জনসাধারণ তাহা হইতে তৃপ্তি না পাইতেও পারে। এরূপ অবস্থায় বিবেচনা করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করা উচিত। ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী তখনই লোকরঞ্জিনী হয় যখন তাহা বিশেষত্বে মণ্ডিত থাকে। এ পুস্তকে সেরূপ কিছু পাইলাম না।

পুষ্পহার—শ্রীসরসীবালা বসু প্রণীত। প্রকাশক হিতবাদী লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-পুস্তক। কবিতাগুলি চলনসই।

পাপ ও পুণ্য—শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্র-লাল ভাদুড়ী, বি, এ,—১০ কাশী ঘোষের লেন, কলিকাতা। মূল্য চার আনা। কবিতা-পুস্তক। বৌদ্ধ উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। ছন্দ অমিত্রাক্ষর।

চণ্ডিকা-বিজয়—রঙ্গপুরের কবি দ্বিজ কমললোচন প্রণীত প্রাচীন শক্তি বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ শাখা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই। ডিমাই অষ্টাংশিত ৪২২ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু গ্রন্থের আলোচনা লিখিয়াছেন আর সম্পাদন করিয়াছেন শ্রীপঞ্চানন সরকার। বাংলা সাহিত্যে শক্তি-বিষয়ক গ্রন্থ বেশি নাই। এজন্য এই গ্রন্থ অনেকের নিকট সমাদৃত হইবে। কবি কমললোচন আনুমানিক ২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুরের অন্তর্গত ঘর্ঘট নদীতীরবর্ত্তী চড়কাবাড়ী গ্রামে প্রাদুর্ভূত হইয়া-ছিলেন। এই গ্রন্থে সে কালের বাংলা সমাজের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। রচনায় কবিত্বেরও অসদ্ভাব নাই। গ্রন্থখানি দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। সূচী ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থতালিকা পাঠকের বহু সাহায্য করিবে। প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করিয়া সাহিত্য পরিষৎ আমাদের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিতেছেন।

Prayag or Allahabad—প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। এই পুস্তকখানি ইংরাজীতে লেখা। প্রয়াগ বা এলাহাবাদের যাবতীয় দর্শনীয়, তীর্থ ও হিন্দুকৃত্য এবং ইতিহাস বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পুরু চিক্কণ কাগজে কুন্তলীন প্রেসের পরিষ্কার ছাপা। ৫৭ খানি হাফটোন ছবি আছে, তাহার একখানি নানা বর্ণে মুদ্রিত। সুন্দর মজবুত মলাট। মূল্য দেড় টাকা। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুএর গ্রাহকগণ মাত্র এক টাকায় পাইবেন। মুদ্রারাক্ষস।

Kumar Parivrajak Series No. 5. A Simple Means of Mass Education. For free distribution. To be had of the Manager, Yogasram, Benares City.

ভারতবর্ষে ২৭ কোটী লোক অশিক্ষিত। লেখক বলেন "স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ যদি অবসর মত ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই আপাতঃ অসম্ভব কার্য্যও সম্ভবপর হইবে।" ইহা কিয়ৎপরিমাণে সত্য বটে; কিন্তু যাঁহারা নিজেই বিদ্যার্থী, তাঁহা-দের উপর এত বড় কাজের ভার দেওয়া উচিত নয়। আর কাহারও কি কোন কর্ত্তব্য নাই?

সৃষ্টিরহস্য—শ্রীমতী ফুলকুমারী গুপ্ত প্রণীত। ১১২ পৃঃ; মূল্য ১৲ প্রাপ্তিস্থল—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত, ৯।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা;

ভারতীয় প্রাচীনপন্থা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থের পাঁচটী অধ্যায় আলোচ্য বিষয় এই :—

(১) স্বাভাবিক অবস্থা প্রাথমিক ত্রিতত্ত্ব—আত্মস্থ, আত্মজ্ঞ; আত্মানন্দ।

(২) জগতের প্রথম অবস্থা—মৌলিক ত্রিতত্ত্ব—সৎ-চিৎ আনন্দ বা শব্দ-গতি জ্যোতি।

(৩) জগতের দ্বিতীয়াবস্থা—সত্ত্ব, রজ, তম।

(৪) জগতের তৃতীয় অবস্থা—সত্তা, শক্তি, বস্তু।

(৫) জগতের চতুর্থাবস্থা—কারণ, কার্য্য ও আকার।

মহিলাগণও যে আজকাল এই সমুদয় সূক্ষ্মবিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

এই গ্রন্থ গ্রন্থকর্ত্রীর অধ্যবসায় ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন-বৃত্তান্ত—শ্রীবঙ্কবিহারী কর প্রণীত। ঢাকা ভারতমহিলা প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৪১৯ পৃষ্ঠা। মূল্য কাগজের মলাট ১৷৷০ ও কাপড়ে বাঁধা ১৸০। পুস্তক মধ্যে অনেকগুলি হাফটোন চিত্র আছে। কলি-কাতার বাহিরে বই ছাপা হইয়াছে—ছাপা কাগজ পরিষ্কার ও প্রায় নির্ভুল। গ্রন্থের কলেবর ও গুণ হিসাবে মূল্য সুলভ। এ যে মহাত্মার জীবনচরিত তাঁহার কথা যেমন করিয়াই বলা হউক চমৎকার—তাহা হৃদয় মনের রসায়ন। গ্রন্থকার বহু অনুসন্ধানে এই প্রেমিক ভক্ত সাধু পুরুষের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের

ভাষা সরল ও জীবনচরিত বর্ণনার উপযোগী অনাড়ম্বর। দুই এক স্থলে প্রাদেশিকতার ত্রুটি আছে, তাহা ধর্তব্যের মধ্যে নহে। এ বইখানি সম্বন্ধে অল্প কথায় কিছু বলা বড় দুঃসাধ্য। গোস্বামী মহাশয় বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন—এবং সে ধর্ম্ম তাঁহার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বোদার সত্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এজন্য তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তৃপ্ত না হইয়া উদারতর ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন—সে জন্য কত লাঞ্ছনা, কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন; কিন্তু তখনো ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল সংস্কার সকল গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইতে পারে নাই। সত্যধর্ম্মী গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক সত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট সংস্কার ও গণ্ডি অসহ্য বোধ হইল, তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত আদি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উদারতর ভিত্তির উপর নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সে সমাজেও যখন কালক্রমে স্বাধীন চিন্তার বিরোধী মতবাদ আশ্রয় লইল তখন আবার তিনি নিজের গুরু ও বন্ধুস্থানীয় কেশবচন্দ্রের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া আরো উদার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের জীবনীর ভিতর দিয়া গ্রন্থকার তিনটি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস অতি সুন্দররূপে ও সংযতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও গোস্বামী মহাশয়ের স্থান হইল না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মমতে বিশ্বোদার, সকল ধর্ম্মের চিরন্তন সত্য যাহা তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম বা যথার্থ হিন্দুধর্ম্ম। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ রীতিনীতি সংস্কার প্রভৃতিতে গণ্ডি-আবদ্ধ এবং তাহা না হইলেও সমাজ-বন্ধন অসম্ভব। বিমুক্তাত্মা গোস্বামী মহাশয় এ গণ্ডিও স্বীকার করিতে পারিলেন না—যাহার প্রকৃত ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হয়, তিনি সর্ব্বঘটে ব্রহ্মদর্শন করেন, সর্ব্ব ধর্ম্মে সত্যলাভ করেন, কাহারো সহিত তাঁহার বিরোধ থাকে না। গোস্বামী মহাশয় এই অবস্থায় উপনীত হইয়া সাধারণ লোকের কাছে প্রহেলিকার মতো হইয়া উঠিয়াছিলেন, গ্রন্থকার যথেষ্ট ধীরতা ও বিচক্ষণতার সহিত এই অবস্থার কারণ এবং ফল বিশ্লেষণ ও নির্ণয় করিয়া দেখাইয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থ স্বাধীন বিচার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে অনুস্যূত। গোস্বামী মহাশয়ের মতন এমনতর অদ্ভুত জীবন জগতে দুর্লভ। আত্মার উন্নতিকাম ব্যক্তিগণ এই জীবনচরিত পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন।

জোলেখা—শ্রীআবদুল লতিফ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক হিতবাদী লাইব্রেরী, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ২৩২ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। কোনো ভাষা তখনই পুষ্ট হয় যখন তাহার সহিত বিশ্ব-সাহিত্যের যোগ সাধন হয়। বিশ্বকে যাহা আলিঙ্গন করে না তাহা আজ কাল সমাদরের যোগ্য নয়—একথা ধর্ম্ম, সমাজ, মত, সাহিত্য, শিক্ষা, প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সত্য। ইংরাজি সাহিত্য জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট সাহিত্য—তাহাতে নাই এমন জিনিষ নাই। সেই ইংরাজি ভাগ্যক্রমে আমাদের রাজভাষা হওয়ায় উহার চর্চ্চা আমাদের দেশে হইতেছে এবং উহার ফলে বঙ্গভাষায় বহু রত্ন বিদেশ হইতে সমাহৃত হইয়া ঘরের জিনিষ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক জিনিষ second-hand or third-hand ঘুরিয়া আসিতেছে। ইংরেজ পণ্ডিতেরা বহু ভাষা আলোচনা করিয়া যিনি যে ভাষায় সুপণ্ডিত তিনি সেই ভাষার রত্নসমূহ স্বদেশী সাহিত্যে আমদানি করেন। আমাদের দেশে সেরূপ-ভাবে জ্ঞানচর্চ্চার নিতান্ত অভাব। দায়ে পড়িয়া আমরা ইংরাজি শিখি তারপর সখ হইলে ইংরাজির কল্পভাণ্ডার হইতে রত্ন আহরণ করি—নিজের স্বাধীন অনুসন্ধান কোথাও করি না। ইহার ফলে আহৃত সামগ্রী যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি হয় না। ইংরাজি আমলের অব্যবহিত পূর্ব্বে পারস্যভাষা আমাদের রাজভাষা ছিল—সে ভাষা কাব্যসম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী। দুর্ভাগ্য আমাদের, যখন সে ভাষা এদেশে ঘরে ঘরে আলোচিত হইত তখন বাংলা সাহিত্য ছিল না; এবং যখন বাংলা সাহিত্য হইল তখন পারস্যভাষার আলোচনা দেশ হইতে বিদায় লইল। ইহার ফলে আমাদের সাহিত্য সেই প্রতিবেশী ভাষার সম্পদলাভে বঞ্চিত আছে। যদিও বাংলা ভাষার সিকি শব্দ পারস্যভাষা হইতে ধার করা। এই অভাব যাঁহারা সম্পূরণ করিবেন তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদভাজন। শ্রীযুক্ত আবদুল লতিফ, ফিরদৌসী ও জামীকবির পারস্যকাব্য হইতে জোলেখা ও ইউসুফের প্রণয়কাহিনী বিশুদ্ধ বাংলায় বর্ণনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন। ইহা শুধু ঐ কাব্যদ্বয়বর্ণিত উপাখ্যান নহে, ইহার মধ্যে সমসাময়িক কালের বহু ঐতিহাসিক তথ্যও প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রণয় ও নিষ্ঠা, সংযম ও চারিত্র, মোসলেম জগতের রীতিনীতি প্রভৃতির বহু মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা ও বর্ণনা সংস্কৃতবহুল হওয়ায় ইহা যেন সংস্কৃতকাব্যের রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়—মুসলমান গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা প্রশংসার কথা—কিন্তু গ্রন্থকারের এই গুণটি আমাদের নিকট দোষ বলিয়া মনে হইতেছে। সংস্কৃতবহুল রচনায় পারস্যকবিতার আসল রসটুকু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাংলা ভাষা বহু পারস্যশব্দ আত্মসাৎ করিয়াছে—সেই সব শব্দ দিয়া, পারস্যকবিতার নিজস্ব ভঙ্গি অনুসরণ করিয়া রচনা করিলে পুস্তক নিঃসন্দেহ অধিকতর মনোজ্ঞ ও রসালো হইত। পারস্য কবিরা নারগীস ফুলের সঙ্গে চোখের তুলনা করেন; অলককে তাঁহারা জুলফ বলেন; এই রকম ছোটখাটো সহজ সরল সেদেশী উপমা, বাক্য ও রস, রচনার মধ্যে জুড়িয়া দিতে পারিলে গ্রন্থখানি অধিকতর উপাদেয় হইত। গ্রন্থকার ভবিষ্যতে এই পন্থা অবলম্বন করিয়া পারস্য সাহিত্যের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ পুস্তকের আখ্যায়িকায় বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি করিলে আমরা সুখী হইব।

মুদ্রা-রাক্ষস।

ইডেন-হিন্দু-হোষ্টেল-কবি-সম্মিলনী—চতুর্দ্দশপদী কবিতা প্রতি-যোগিতা। পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১৩১৭ সাল। ডবল ফুলস্ক্যাপ ষোড়শাংশিত ৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য অজ্ঞাত। সম্মিলনীর 'নব পর্য্যায় প্রথম বর্ষ হইতে তৃতীয় বর্ষ পর্য্যন্ত' যতগুলি কবিতা 'পুরস্কৃত' ও 'সম্মানের সহিত উল্লিখিত' হইয়াছে, এই পুস্তকে তাহা সমস্তই 'একত্র প্রকাশিত' হইয়াছে। কবিতাগুলির অধিকাংশই ভাবে-রসে-সৌন্দর্য্যে বিশেষত্ববর্জ্জিত। 'হিমাদ্রির প্রতি' ও 'অভিনন্দন' শীর্ষক কবিতা দুইটির প্রায় সর্ব্বাঙ্গেই প্রায় আঁটা—ঠিক যেন একজোড়া বিলাতী carpet knight! উঁহাদের 'বৃষস্কন্ধ' আবৃত ও 'বাহুবল' গুপ্ত রাখিয়া সম্পাদক দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়াছেন! ইডেন হিন্দুহোষ্টেল কবি-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য চর্চ্চার যে উর্ব্বর-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা দিন দিন আগাছায় পূর্ণ হইতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

শ্রীমন্ত সওদাগর—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ২৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হরিমোহন লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত। দুই খণ্ডে সমাপ্ত। ডবল ক্রাউন্ ষোড়শাংশিত ১৭০+ ভূমিকা ৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য অনুল্লিখিত। প্রসিদ্ধ কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর শ্রীমন্ত-চরিত্র-অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা সরল সুন্দর, বর্ণনাভঙ্গী চিত্তহারী। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

খাতির-নদারত।

লেখকগণের প্রতি নিবেদন

প্রবাসীতে যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া রচনা প্রেরণ করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিলে বাধিত হইব।

রিপ্লাই কার্ড অথবা টিকিট না পাঠাইলে সাধারণতঃ কোনো চিঠির জবাব দেওয়া যায় না।

টিকিট ও ঠিকানা দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। মনোনীত হইলে লেখককে সংবাদ দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোনো উত্তর দিতে অসমর্থ। রচনা মনোনীত না হইলে ফেরত চাই কি না, তাহা রচনা পাঠাইবার সময়ই লিখিতে হইবে; নতুবা অমনোনীত রচনা ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। রচনা পৌঁছা সম্বন্ধে আমরা দায়ী নহি। কোনো লেখা কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাপিতে সম্পাদক অঙ্গীকার করিতে অসমর্থ।

কোনো রচনা প্রবাসীতে পাঠাইয়া তাহার সম্বন্ধে সম্পাদকীয় অভিমত না জানা পর্য্যন্ত লেখক সে প্রবন্ধ যেন অন্য কোনো পত্রিকায় না দেন। রচনা অমনোনীত হইলে লেখক সে রচনা যথেচ্ছ প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্তু মনোনীত রচনা প্রকাশ করিতে বিলম্ব হওয়ার জন্য প্রবাসীকে না জানাইয়া সেই রচনা অন্য পত্রিকায় প্রেরণ করা লেখকের পক্ষে ভদ্ররীতি-সঙ্গত কার্য্য নহে। বিলম্বে অধৈর্য্য হইলে লেখক প্রবাসীতে প্রেরিত রচনা ফেরত লইতে পারেন, অথবা পত্র লিখিয়া ঐ রচনা প্রকাশ করিতে বারণ করিতে পারেন। এরূপ না করিলে অনেক সময় একই রচনা দুই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; ইহা পত্রিকা ও লেখক উভয়েরই লজ্জার কারণ, এবং লেখকের ভদ্ররীতির উল্লঙ্ঘন।

রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, যথেষ্ট মার্জ্জিন রাখিয়া লিখিলে সুবিধা হয়। নাম ও অপ্রচলিত শব্দ খুব স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত, কারণ অন্য শব্দের ন্যায় উহাদের স্বরূপ উদ্ধার করা সহজ নয়।

প্রবাসী-সম্পাদক।

গিরিডি উচ্চশ্রেণী বালিকা-বিদ্যালয়

কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বালিকাদের উচ্চ শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয়ের অভাব অনেকেই দীর্ঘকাল হইতে অনুভব করিতেছেন। বড় বড় সহরে বালিকাদের যে কয়েকটী বোর্ডিং স্কুল আছে, তাহাতে বালিকাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হইতেছে সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। গিরিডির মত স্বাস্থ্যকর স্থানে বালিকারা থাকিলে মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া এবং স্বাস্থ্যকর অকৃত্রিম খাদ্য পাইয়া শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে পারিবে এবং সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষাও প্রাপ্ত হইবে। এজন্য স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আগামী ১৯১১ সালের জানুয়ারী মাসে গিরিডিতে বালিকাদের জন্য একটী উচ্চ-শ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং স্থানান্তর হইতে যে সমুদায় বালিকা আসিবে তাহাদের জন্য একটী ছাত্রী-আবাস খোলা হইবে। এই বিদ্যালয়ে প্রথম চারি শ্রেণী থাকিবে; নিম্ন শ্রেণীগুলি থাকিবে না। সচ্চরিত্র উপযুক্ত শিক্ষকগণের হস্তে শিক্ষার ভার দেওয়া হইবে এবং

একজন উপযুক্ত মহিলা ছাত্রী-আবাসে থাকিয়া বালিকাদের তত্ত্বাবধান করিবেন। অভিভাবকগণের ইচ্ছানুসারে বালিকাদিগকে ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হইবে। এবং যে সমুদয় বালিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না হইয়া বালিকাদের উপযোগী ভাষাশিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিবে তাহাদিগের জন্য সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

ছাত্রী-আবাসে যে বালিকারা থাকিবে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট মাসিক ১০॥০ (সাড়ে দশ টাকা) লওয়া হইবে। ভর্ত্তি হইবার ফি ৫৲ (পাঁচ টাকা)। যে বালিকারা ছাত্রী-আবাসে থাকিবে না তাহাদের প্রত্যেকের স্কুলের বেতন ৩৲ ও ভর্ত্তি হইবার ফি ২৲ লাগিবে।

সম্প্রতি কার্য্যারম্ভের জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া অস্থায়ীভাবে একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে :—

শ্রীযুক্ত বাবু তিনকড়ি বসু
" " রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
" " শশিভূষণ বসু
" ডাক্তার ভি, রায়
" ম ডি, এন্, মল্লিক
শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী
" " আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
" " বামনদাস মজুমদার
" " যোগেন্দ্রনাথ সরকার
" " কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে স্থানীয় উপযুক্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী স্থায়ী কমিটি গঠিত হইবে।

যে সমুদয় পিতামাতা ও অভিভাবকগণ তাঁহাদের বালিকাদিগকে প্রস্তাবিত বোর্ডিং স্কুলে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ফারমে আপনাদের অভিমত জানাইবেন।

১ লা ডিসেম্বর ১৯১০। গিরিডি। } শ্রীতিনকড়ি বসু, সভাপতি।

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বসাক। } সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত গিরিডি উচ্চশ্রেণী বালিকা-বিদ্যালয়ের
সম্পাদক মহাশয়গণ সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

আমার নিম্নলিখিত কন্যা বা আত্মীয়াকে আপনাদের ছাত্রী-আবাসে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছি। ছাত্রী আবাস কোন তারিখে খোলা হইবে জানাইলেই আমি ইহাকে গিরিডি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। ইতি

নাম　　শ্রেণী

বশম্বদ
নাম শ্রী
ধাম
তারিখ

নর-নারায়ণ

ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ সমাজ শরীরে
পাপ যবে প্রবেশিল ধীরে অগোচরে
আপন অমিত তেজে করিবারে ম্লান
কতশত বরষের সাধন সম্মান—
সে প্রদীপ্ত প্রতিমার পুণ্য জ্যোতি-শিখা,
বরেণ্য বিধাতৃদত্ত রাজহস্তটীকা ;—
যবে দৃপ্ত স্বার্থবুদ্ধি ব্রাহ্মণকুমার
আপন অখণ্ড শক্তি করিতে প্রচার
ভারতের রাজাসন করিল গ্রহণ
দেবতার পুণ্য নামে—উঠিলে তখন
হে যুগল কর্ম্মবীর, ভারত-গগনে
প্রখর রক্তিম রাগে,—মেঘ-আবরণে
আপন কিরণপাতে ছিন্ন করি দিতে।
ন্যায় ধর্ম্ম সত্য জ্ঞানে দেখালে জগতে
অমৃতের পুত্র মোরা—সম অধিকারী
এ নিখিল বিশ্বমাঝে ; কেন তবে ফিরি
জাগ্রত বিবেক-কণ্ঠ রুদ্ধ করিবারে
অসত্যের উদ্বোধনে ?
　　　　　আজ দেখি দূরে
কল্পনায় ঋষিমূর্ত্তি ; শুনি সিংহনাদ
ভেঙ্গে দিতে ভারতের জড় অবসাদ,
তুচ্ছ আত্ম-অবিশ্বাস, পরনির্ভরতা।
হে অতীত ! আন তুমি সে শুভ বারতা
যেদিন এ উদ্ভাসিত নীলাকাশতলে
কি অনিন্দ্য গৌরকান্তি উঠেছিল জ্বলে

অলস অদৃষ্টবাদী ভারতসন্তানে
মনুষ্যত্ব গৌরবের সমুচ্চ সোপানে
দিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠান। গাও তাঁরি গান
যে দেবতা সারা বিশ্বে দিতে মহাপ্রাণ
পরিপূর্ণ স্নেহভরে দিল বরষণ
আনন্দ অমৃত হ'তে শুভ পরশন।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সৈয়দ আলি ইমাম

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাসচিবের পদ ত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে ব্যারিষ্টার ও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সেল্ শ্রীযুক্ত সৈয়দ আলি ইমাম নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি যোগ্যতম ব্যক্তি না হইলেও অযোগ্য নহেন। ইনি সুবক্তা, বিবেচক ও আইনজ্ঞ। সুতরাং ইহাঁর নিয়োগে অসন্তুষ্ট হইবার বিশেষ কারণ নাই। ভারতবাসী গবর্ণমেণ্টের যে কোন পদেই নিযুক্ত হউক, শাসননীতির কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। যেরূপ উচ্চপদস্থই হউন তাঁহাকে কেবল হুকুম তামিল করিতে হইবে মাত্র। সুতরাং নিযুক্ত ব্যক্তির যোগ্যতা নিক্তিতে ওজন করা একপ্রকার পণ্ডশ্রম। যাহাই হউক, গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও দেশের হিতসাধন কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভবপর। আশা করি সৈয়দ সাহেব তাহা করিবেন। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের একান্ত স্বাতন্ত্র্যবাদী নহেন। ইহাও আশার কথা।

মাননীয় সৈয়দ আলি ইমাম।

সিন্ধুর মাতৃত্ব

অনন্ত বপুল সিন্ধু চলোর্ম্মি-মুখর,
কল্লোলিয়া লুটিতেছে অনন্ত বেলায়।
হিল্লোলে হিল্লোলে উঠে একাগ্র-সুন্দর
ফেন-পুষ্প পূত অর্ঘ্য দেবতার পায়।
দীর্ণ বক্ষ-বন্ধ টুটি ফুটে আর্ত্তনাদ,—
কহে, "দেহ ফিরাইয়া অভাগীর ধন।
সমুদ্র মন্থন এ ত নহে বিশ্বনাথ,
হায় এ যে জননীর অন্তর মন্থন!"
উন্মাদিনী বিবসনা উর্ম্মি-বাহু তুলি
তনয়ে কাড়িতে চাহে হৃদয়ে কৌতুকে;
নিষ্ফল আবেগ শুধু দিগন্ত আকুলি'
আপনি ফিরিয়া আসে আপনার বুকে।
ঊর্দ্ধে গৃহহারা চন্দ্র পলকবিহীন,
আর্ত্ত মাতৃ-অঙ্ক চাহি' আড়ষ্ট তুহিন!

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

---

৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নাদির শাহ কর্তৃক দিল্লীবাসীদিগকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান।

হাকিম মহম্মদ খাঁ কর্তৃক অঙ্কিত মূল চিত্র হইতে।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

১০ম ভাগ
২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩১৭ | ৪র্থ সংখ্যা

বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য*

যখন এই মহাসভার নেতা হইবার জন্য অনুরোধ পত্র পাই, তখন প্রথমে ভাবি যে অসম্মত হইব, কারণ সাহিত্য-জগতে পণ্ডিতের চেয়ে লেখক বড়, পরিশ্রমের চেয়ে প্রতিভার আসন উচ্চে; নিজের জন্য জ্ঞান অর্জ্জন অপেক্ষা পরের জন্য, ভবিষ্যৎ যুগের জন্য, জগতের জন্য জ্ঞানের সৃষ্টি ও জ্ঞানের বিস্তার মহত্তর কার্য্য। যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ তাঁহার প্রতিভাবলে মানবহৃদয়ের নিভৃত কক্ষ আলোকিত, উদ্‌ঘাটিত করেন, যে সব সাহিত্য-সেবক মাতৃভাষার উপাসনায় ব্রতী হইয়া আজীবন নিজ পরিশ্রমে প্রস্তুত ও সংগৃহীত রত্নরাজি তাঁহার চরণে উপহার দিতেছেন, তাঁহাদের কাছে সমাজ অধিক উপকার পায়, তাঁহারাই উচ্চতম সম্মানের যোগ্য।

তবে কেন এ আসন গ্রহণ করিলাম? প্রথম কারণ মাতৃভূমির আহ্বান। যে প্রদেশে আমার জন্ম, যাহার জল-বায়ুতে আমার শরীর বর্দ্ধিত, যেখানে জীবনপ্রভাতের বন্ধুগণকে লাভ করি, যাহার প্রাদেশিক সুর ভুলিতে না পারায় কলিকাতায় পড়িবার সময় "বাঙ্গাল" বলিয়া গণ্য হইতাম, সে প্রদেশের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না। এ সম্মিলনের অধ্যক্ষগণ যদি বিবেচনা করেন যে আমার সভাপতিত্বে এই প্রদেশের কোন উপকার হইবে, তবে এ আসন গ্রহণ করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; ইহা অস্বীকার করার অধিকার আমার নাই। এখন যদি আমার অনভিজ্ঞতার জন্য এ সভার কার্য্যে ত্রুটি হয়, তাহার জন্য আপনারাই দায়ী, কারণ আপনাদেরই আহ্বান,—আহ্বান নহে, আজ্ঞা—আমাকে এখানে আনিয়াছে।

আর এক কারণ এই যে, সম্মিলনের প্রকৃত কার্য্য সাহিত্য-সৃজন নহে, সাহিত্যের পরিচালনা, জ্ঞান বিস্তারের আয়োজন, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে সমবেত চেষ্টার গ্রন্থিবন্ধন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সাহিত্যের জ্ঞান এবং জগতের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমার যেটুকু আছে, তাহা এই কার্য্যের সহায়তা করিলেও করিতে পারে। বঙ্গসাহিত্যের একটু বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি যে সমালোচনা ও উপদেশ প্রয়োগ করিতে পারিব, তাহা আমার যে সব বন্ধুগণ এই সাহিত্যে ডুবিয়া আছেন তাঁহাদের পক্ষে নূতন এবং হয়ত মূল্যবানও হইতে পারে।

যাঁহারা বাঙ্গলাকে নিজের দেশ করিয়াছেন, যাঁহারা 'বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জল' হইতেই শক্তি সঞ্চয় করেন, এই 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' দেশ ভিন্ন যাঁহারা অনন্য-মাতৃক, এদেশ ভিন্ন যাঁহাদের অন্যত্র গতি নাই,—তাঁহারাই বাঙ্গালী, আর তাঁহাদের ভাষাই বাঙ্গলা। জাতি বা ধর্ম্মের উপর ভাষা নির্ভর করে না। এক পক্ষে এই ভাষা বাঙ্গালীর সৃষ্টি, অপর পক্ষে ইহা বাঙ্গালীর অন্তরের পোষক,—বাঙ্গালীর বিশেষগুণ, অন্তরতম ভাব, চিন্তা, তেজ, এক কথায় বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব—শুধু এই বঙ্গসাহিত্যের ভিতর

* মালদহ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ, ২৮এ পৌষ পঠিত।

দিয়া আসিতে পারে। তাই আজ পাটনা, কাশী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, নাগপুর, লাহোর, এমন কি সুদূর কোয়েটো প্রবাসী বাঙ্গালীরা বাঙ্গালীই রহিয়াছেন। বরং গত বিশ বৎসরের মধ্যে রেল বিস্তারে এবং শিক্ষিত সমাজে বঙ্গ-সাহিত্যের আদর ও চর্চ্চা বাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহারা বাঙ্গলার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন হইয়াছেন; তাঁহাদের দেহ প্রবাস করিতেছে, কিন্তু হৃদয় যেন বঙ্গদেশে রহিয়াছে। এই সব উপনিবেশগুলি বাঙ্গালীর চিন্তা ও প্রভাব ভারতময় বিস্তার করিতেছে, কিন্তু বঙ্গমাতা তাঁহাকে হারান নাই। আর ভারতীয় যে সব জাতির সাহিত্য নাই, তাহারা অপর প্রদেশে কয়েক পুরুষ, এমন কি কয়েক বৎসর থাকিলেই নিজ ভাষা ভুলিয়া গিয়া স্থানীয় ভাষা শিখিয়া, একেবারে সেই প্রদেশের লোক হইয়া যায়। তাহাদের জাতিগত বিশেষত্ব লোপ পায়, এবং সেই প্রবাসভূমি বৈচিত্র্য লাভ করিতে পারে না।

বাঙ্গলা সাহিত্য প্রবাসী বাঙ্গালীকে এই রূপান্তর হইতে বাঁচাইয়াছে। আর আমাদের মা তাঁহার উদার বক্ষে অনেক দূরাগত ভাগিনেয়কে স্থান দিয়া একেবারে আপনার ছেলে করিয়া লইয়াছেন। এই সব বাঙ্গলা লেখককে পরদেশী বলিয়া কে চিনিতে পারে? দোবে মহারাজ দার্জিলিঙ্গের বর্ণনা হিন্দীতে লেখেন নাই, বাঙ্গলায় লিখিয়াছেন। আমাদের আদরের অনেক পাঁড়ে ও মিশ্র সাহিত্যিক মহাশয়দিগকে 'এ পাণ্ডে' কিম্বা 'মিছির হো' বলিয়া ডাকিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই অপমানিত বোধ করিবেন, কারণ তাঁহারা পুরো বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন। আর গণেশপুত্র সখারামের বাঙ্গলা লেখা পড়িলে তিনি যে দেউস্ নগর হইতে আসিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করিতে বড়ই কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। তেওয়ারিজি যে কতকাল হইল টিকি কাটিয়া ত্রিবেদী নাম লইয়া বাঙ্গালীদের মধ্যে গা ঢাকা দিয়াছেন তাহা ইতিহাসের একটা লুপ্ত তত্ত্ব।

বঙ্গভাষা যখন এত উদার, এত প্রভাবান্বিত, এত বর্দ্ধনশীল, তখন যাঁহারা যুগযুগান্তর ধরিয়া বাঙ্গলার অধিবাসী, বাঙ্গলার ভাত ও মাছে পুষ্ট দেহ, এরূপ একটি সম্প্রদায়ের কয়েকজন নেতা যে বাঙ্গলা ভাষা ত্যাগ করিবার জন্য এক নূতন চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা কি সুফল প্রদান করিবে? ফলের কথা দূরে থাকুক, এরূপ চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব কিনা তাহাই দেখা যাউক।

ভাষার উৎপত্তি ও গতি কিরূপ তাহা ইতিহাস হইতে জানা যায়। খাল কাটিতে হইলে ইঞ্জিনিয়ার ডাকিতে হয়; কিন্তু নদীর জন্য ইঞ্জিনিয়ারের দরকার নাই, সে নিজেই নিজের পথ করিয়া চলে। সেই মত ভাষাও প্রকৃতি দেবীর অজ্ঞাত পথ-প্রদর্শনে অগ্রসর হয়। আমরা নিত্য জীবনের কথা হইতে, আশপাশের লোকের আলাপ হইতে ভাষা শিখি। জোর করিয়া এক ভাষার জায়গায় আর এক ভাষা চালান যায় না। কারণ মনে রাখিবেন ব্যাকরণেই ভাষার বিশেষত্ব, বাক্যাবলীতে নহে। যেমন, বাঙ্গলা ব্যাকরণ অনুযায়ী কর্ত্তা ক্রিয়া প্রভৃতি দিয়া একটি পদ রচনা করিয়া সেই পদে লৌহবর্ত্মের বদলে 'রেলওয়ে' শব্দ ব্যবহার করিলে পদটি বাঙ্গলাই থাকিবে, ইংরাজী হইবে না। বিদেশীয় ভাষা হইতে অসংখ্য শব্দ লইয়া তাহা যদি নিজের করিয়া জনসমাজে দৈনিক ব্যবহারে প্রচলিত করা যায়, তবে তাহাতে ভাষার বিশেষত্বের কিছু হানি হয় না। যেমন দাবা খেলার প্রণালী যতক্ষণ এক থাকে, ততক্ষণ আপনি দিশী বোড়ে রাজা উজীর কিস্তী গজ ব্যবহার করুন আর ইংরাজী বোড়ে রাজা রাণী দুর্গ বিশপ্ লইয়াই খেলুন, ফলে কিছুমাত্র তফাৎ হইবে না। তেমনি বাঙ্গলায় অনেক ফারসী ও আরবী শব্দ ব্যবহার করিলেও ভাষাটি উর্দ্দু হইবে না। একেবারে এক নূতন ব্যাকরণ এবং নূতন শব্দাবলী প্রচলিত করিতে পারিলে তবে উর্দ্দুকে বাঙ্গালার মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাষা করা সম্ভব।

সমস্ত বাঙ্গালীর প্রকৃতি-অনুমোদিত ভাষা বাঙ্গলা; এটা তাঁহাদের নিজস্ব জিনিষ, মাছের বাচ্চার সাঁতার শেখার মত অনায়াসলব্ধ। যে কোন ধর্ম্মের বাঙ্গালীই হউন না কেন, বঙ্গভাষাকে ত্যাগ করিতে গেলে তাঁহাকে স্বভাবের বিরুদ্ধে প্রত্যহ যুদ্ধ করিতে হইবে, স্রোতের বিপক্ষে অনবরত সাঁতরাইতে হইবে।

জনসাধারণের নিত্য ব্যবহারের ভাষার কথা হইল এই। সাহিত্যের ভাষার নিয়মও ভিন্ন নহে। একদিকে পণ্ডিতেরা বাঙ্গলাকে বিভক্তিহীন সংস্কৃত করিয়া তুলিতে চান, যেন তাহাতে অমরকোষের বাহিরের কোন কথাই

না থাকে, যেন মাঘ কবির কটমট বাক্যবিন্যাসের যথাসাধ্য অনুকরণ করা হয়। আর এক দিকে শিল্পচর্চ্চার অধীর প্রচারকেরা একেবারে গেঁয়ো ভাষায় বই ছাপাইতে চান। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে এই দুই চেষ্টাই বিফল হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও বিফল হইবে। তাহার কারণ, ভাষা জনসাধারণের সম্পত্তি। যদি রচনা অত্যন্ত কঠিন হয়, যদি পদে পদে অভিধান খুলিতে হয়, তবে সেরূপ লেখা শুধু দুই একজন পণ্ডিতই পড়িবেন, জনসমূহ কখন তাহা চাহিবে না। সেই মত, গ্রাম্য ভাষাও শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ, এবং ভিন্ন স্থানে ভিন্ন আকারের, এক জেলার গ্রাম্যভাষা অন্য জেলায় বুঝা যায় না। সাহিত্যের উপকরণ অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ চিন্তা, মহৎ ভাব, গ্রাম্যভাষায় ঠিক ব্যক্ত করা যায় না। যে ভাষা আমাদের হৃদয়কে অনন্তের সঙ্গে যোগ করিয়া দিবে তাহাকে অতি সূক্ষ্ম অতি কোমল ভাবগুলি প্রকাশ করিতে হইবে। সরল কথায় এই কাজ করা যাইতে পারে, কিন্তু গ্রাম্য কথায় নহে। গ্রাম্যভাষা সাহিত্যের ভাষা হইতে পারে না।

ফলতঃ ভাষার উপর জোর খাটে না। ভাষার গতি ফিরাইতে হইলে, আগে জনসমষ্টিকে সেই মতে দীক্ষিত করিতে হয়। মহালেখকেরা ভাষায় যে পরিবর্ত্তন করাইয়া দেন তাহা ঠিক এইরূপে ঘটে। তাঁহারা যাহা বলেন সেই মধুময় বাক্য সব লোকের হৃদয় অধিকার করে. তাহারা মন্ত্রের মত সেই কথাগুলি ব্যবহার করিতে থাকে, প্রতিভার আকর্ষণে তাহারা বাধ্য হইয়া কবির পথে চলিতে থাকে। এইরূপে ভাষায় নব নব প্রথা, নব নব শব্দ প্রবেশ করে। এই জাদুকরী শক্তি শুধু প্রতিভাবান্ লেখকের আছে,—শিক্ষকের নাই, সংস্কারকের নাই, রাজপুরুষের নাই, ইতিহাস ইহাই প্রমাণ করিতেছে।

প্রথম দৃষ্টান্ত গ্রীস দেশ। প্রাচীন গ্রীসের বীরত্বকাহিনী, রাজনৈতিক-প্রণালী, সাহিত্য-ভাণ্ডার, জগতে অমর হইয়া রহিয়াছে, পরবর্ত্তী কত জাতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছে। তারপর দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া রাজার অত্যাচারে ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সেই জগতের আলো গ্রীকজাতি লোপ পাইল, সে দেশে স্লাভোনীয় জাতীয় লোকেরা আসিয়া বসতি করিল; তাহাদের ভাষা প্রাচীন গ্রীকের এক বিকৃত অপভ্রংশ। আশী বৎসর হইল যখন এই নব গ্রীস স্বাধীন হইল, তখন স্বদেশপ্রেমিকেরা চাহিলেন যে সেই প্রাতঃস্মরণীয় জগৎপূজ্য প্রাচীন গ্রীকভাষা আবার ফিরাইয়া আনি। দেশের নেতারা সকলে ঠিক করিলেন যে নব্য গ্রীককে জোর করিয়া পুরাতনের আকার দিতে হইবে। তখন সমস্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক স্কুলের শিক্ষক এবং লেখক জোট করিয়া শুধু প্রাচীন গ্রীকভাষা ব্যবহার করিতে লাগিলেন, যেন লোকে নব্য গ্রীকের দৃষ্টান্ত না দেখিতে পাইয়া তাহা ভুলিয়া যায়। এই অস্বাভাবিক চেষ্টার কি ফল হইল? পাঁচ ছয় বৎসর পরে দেখা গেল যে সাধারণ লোকেরা ত প্রাচীন গ্রীকভাষা শেখেই নাই, বরং নব্য গ্রীকে লেখা বন্ধ করায় তাহাদের পড়া শুনার অভ্যাস ও গৃহশিক্ষা একেবারে কমিয়া গিয়াছে; তাহারা দুকুল হারাইয়াছে। তখন নব্য গ্রীকের ব্যবহার ফিরিয়া আসিল।

আর এক দৃষ্টান্ত দেখুন। নর্ম্মানগণ ইংলণ্ড জয় করিয়া প্রথমে তাঁহাদের পৈত্রিক ফরাসী ভাষা ব্যবহার করিতেন;—রাজসভায়, আদালতে, গির্জ্জায়, পুস্তকে ঐ ভাষা চলিত। কিন্তু ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক তাহা বুঝিত না। তাহাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া এবং ক্রমে ফ্রান্সের সহিত সম্বন্ধ হারাইয়া ইংলণ্ডীয় নর্ম্মানদের ভাষা এমন বিকৃত হইয়া গেল যে তাহা শুনিলে ফরাসীরা হাসিত, সে ভাষায় ভাল বই লেখা বন্ধ হইল। তিন শত বৎসর পরে এই অস্বাভাবিক চেষ্টা ছাড়িয়া নর্ম্মানেরা স্বীকার করিলেন, "আমরা ইংলণ্ডবাসী, সুতরাং নর্ম্মানবংশজ হইলেও ইংরাজ, আমরা ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিব।" সেই দিন ইংলণ্ডে আশ্চর্য্য সাহিত্যের অভ্যুদয় হইল। ইংরাজী কবিতার প্রভাত-নক্ষত্র মহাকবি চসার রাজসভায় দেখা দিলেন। তাঁহার ভাষা সামান্য একটু আদটু বদলাইয়া আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে।

এ যে শুধু ইংলণ্ডে হইয়াছে তাহা নয়। আরবেরা নাহাবন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে (৬৪৪ খৃঃ) পারস্য দেশ জয় করিয়া তথায় মহম্মদীয় ধর্ম্ম ও আরবী ভাষার প্রতিষ্ঠা করিলেন। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পারস্যের পণ্ডিতেরা ও রাজকর্ম্মচারীরা

কষ্টে স্পষ্টে আর্‌বীভাষায় গ্রন্থ ও দলিল লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের ফল হইল যে পারস্যে লিখিত আরবী গ্রন্থগুলির তেমন মূল্য নাই, এবং পার্সী প্রজাদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার ও সাহিত্য চর্চ্চা বন্ধ হইল। তখন ফির্দৌসী দেখা দিলেন; তিনি দেশী ভাষায় তাঁহার অমর কাব্য লিখিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের মন চুরি করিলেন; তখন হইতে ফারসী ভাষাই পারস্যের সাহিত্যের ভাষা হইল এবং আজ পর্য্যন্তও তাহাই রহিয়াছে।

আবার, এক দিকে যেমন পারস্যে ফারসী ভাষার জয়, অন্য দিকে ঠিক সেই কারণেই তুরস্কে তাহার পরাজয়। ফারসী ভাষা মুসলমানজগতে ভদ্রভাষা বলিয়া গণ্য, তাই প্রথমে তুর্কী কবিগণ ফারসী পদ্য লেখেন, কিন্তু তাহাতে ঠিক মনের কথা মনের মত ভাবে প্রকাশ পায় না। শেষে তাঁহারা ফারসী ছাড়িয়া তুর্কীভাষাতেই পদ্য লেখেন এবং তাহা বেশ সরস ও সজীব হইয়াছে।

অন্যান্য দেশের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দিতেছে। এখন দেখা যাক্ ভারতে কি ঘটিয়াছে। মুসলমানেরা উত্তর ভারত জয় করিয়া বসতি করিতে আরম্ভ করিলে পর প্রথমে তাঁহাদের ইতিহাসগুলি আরবীতে লেখা হইত। কিন্তু এক শত বৎসর যাইতে না যাইতেই দেখা গেল যে সে ভাষা পণ্ডিত ভিন্ন আর কেহ বুঝে না, এবং ভারতীয় পণ্ডিতগণকেও বিশুদ্ধ ভাবে আর্‌বী লিখিতে বেগ পাইতে হয়। তখন ফারসীতে বই লেখা আরম্ভ হইল, এবং আগেকার আর্‌বী বইগুলি ফারসীতে অনুবাদ করা হইল। এইরূপে চারিশত বৎসর কাটিয়া গেল, তখন ফারসীও ভারতীয় মুসলমানদের নিকট বিদেশীয় ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। মোঘল বাদশাহেরা তিন পুরুষ ভারতে থাকিতে না থাকিতেই এমন পাকা ভারতবাসী হইয়া উঠিলেন যে পৈতৃক চাঘ্‌তাই তুর্কী ভাষা ত্যাগ করিয়া ভারতীয় উর্দ্দুতে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ছেলেরা পরস্পরকে ডাকিতে হইলে আরবী 'আখ্' বা ফারসী 'বেরাদর্' না বলিয়া হিন্দী 'ভাই' ও 'দাদা' বলিত। এইরূপে আওরাংজীবের কুমার অবস্থায় লিখিত ফারসী চিঠিতে 'ভাই মুরাদ বখ্‌শ্', 'দাদা ভাই' অর্থাৎ অগ্রজ দারাশুকো, এইরূপ ভারতীয় শব্দ পাওয়া যায়। এ দেশী অনেক নাম তাঁহাদের পরিবারে প্রবেশ করিল, যেমন 'পুটী বেগম্', 'মতি বিবি।' শাহজাহান উর্দ্দুতে অতি সুন্দর গান রচনা করিতেন ও গাহিতেন, এ কথা পাদিশাহনামাতে লেখা আছে। আপনারা জানেন যে যাহা প্রাণের ভাষা তাহাই গানের ভাষা। আমরা জোর করিয়া বিদেশী ভাষায় গদ্য এবং কোন কোন শ্রেণীর পদ্যও রচনা করিতে পারি, কিন্তু নিজের ভাষায় গান না গাহিলে প্রাণের পিপাসা মিটে না, মনের তৃপ্তি হয় না। সুতরাং শাহজাহানের সময়েই যে উর্দ্দু বাদশাহদের পর্য্যন্ত ঘরের ভাষা হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। আবার মাসির্‌-ই-আলমগিরি নামক ইতিহাসে পড়া যায় যে একজন বাঙ্গালী মুসলমান দাক্ষিণাত্যে গিয়া আওরাংজীবের শিষ্য হইতে চায়, কিন্তু বাদশাহ অস্বীকার করিয়া একটী হিন্দি পদ্য আওড়ান। ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহার স্বাভাবিক ভাষা ফারসী ছিল না। আর আওরাংজীবের মৃত্যুর কিছু দিন পরে ত কাগজ পত্র ইতিহাস পদ্য, সমস্তই উর্দ্দুতে লেখা হইতে লাগিল।

যদি দিল্লীর বাদশাহগণ তুর্কী ছাড়িয়া ফারসী ছাড়িয়া উর্দ্দু ব্যবহার করায় তাঁহাদের খান্‌দান বা ধর্ম্মের কিছুমাত্র ক্ষতি না হইয়া থাকে, তবে বঙ্গের মুসলমানগণ উর্দ্দু ছাড়িয়া বাঙ্গলা বলিলে যে তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা বা মুসলমানত্ব কেন কমিয়া যাইবে তাহার সন্তোষজনক কারণ এ পর্য্যন্ত পাই নাই। যে কারণে বাবরের উত্তরাধিকারিগণ একশত বৎসরের মধ্যে ভারতীয় ভাষা উর্দ্দু অবলম্বন করেন, সেই কারণেই বঙ্গীয় মুসলমানগণের বাঙ্গলা ভাষা অবলম্বন করা অনিবার্য্য, ইহাই ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এ প্রদেশটা পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া যে এখানে প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে, এরূপ আশা করিবার কোন কারণ নাই।

এখন দেখা যাক্ এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতারা কি লাভ করিতেছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে জোর করিয়া বাঙ্গলা সাধুভাষা ছাড়ার (১) প্রথম ফল তাঁহাদের ছেলেদের শিক্ষার বিভ্রাট। এ বিষয়ে বিজ্ঞ সুলেখক স্কুল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত আবদুল করিমের মত আপনারা জানেন। তিনি অতি পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া

দিয়াছেন যে বাঙ্গালী মুসলমানের ছেলেদের উর্দ্দুর মধ্যে দিয়া উচ্চ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করায় তাঁহাদেক পাঁচটী ভাষা শিখিতে বাধ্য করা হয়। অথচ হিন্দুর ছেলেদের শুধু তিনটী ভাষা শিখিলেই সংসার ও ধর্ম্মের সব কাজ চলিয়া যায়। সুতরাং জীবন-সংগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই প্রকাণ্ড ভাষার বোঝায় নত হইয়া মুসলমান বালকেরা পিছু পড়িয়া রহিতেছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা হইতে বি,এ পর্য্যন্ত প্রতি পরীক্ষায় একটা মাতৃভাষায় রচনা লিখিতে হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যকে তাচ্ছিল্য করায় অনেক বাঙ্গালী মুসলমান যুবক না বাঙ্গলা না উর্দ্দু রচনা করিতে পারে। তাহারা উর্দ্দু সাধুভাষা শেখে নাই, অথচ বাঙ্গলা চর্চ্চা করিতেও যেন লজ্জা পায়। ইহার এই হাস্যজনক ফল হইয়াছে যে এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন কয়েকটী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে দরখাস্ত করিয়া নিজেদের "ইংলিশ ভার্ণাকুলার" মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের কোন মাতৃভাষা নাই, ইংরাজীতে একটা অতিরিক্ত প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। আচ্ছা, এরূপ করিয়া তাহারা না হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ হইল; কিন্তু জগতের পরীক্ষাগারে, কর্ম্মের পরীক্ষাগারে, যে প্রত্যহ মাতৃভাষার আবশ্যক হয়, সেখানে ইহাদের কি গতি হইবে?

(২) পারত্রিক ক্ষতিও কম হইতেছে না। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে প্রায় কেহই গভীরভাবে আরবী বুঝেন না। কোরাণ ও হদিস্ উর্দ্দুতে অনুবাদ করিয়া উর্দ্দু তফসীর বা ব্যাখ্যার সাহায্যে তাঁহাদেক পড়ান হয়। ইহার ফল এই হয় যে ধর্ম্মপুস্তক অপরিচিত ভাষায় থাকিয়া যায়, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাহা পড়িতে পরিশ্রম লাগে। অথচ এই সব আরবী গ্রন্থের যে বাঙ্গলা অনুবাদ হইয়াছে তাহা যদি মুল্লাগণ ঘৃণার চক্ষে না দেখিতেন, তবে লক্ষ লক্ষ মুসলমান সহজ সুপাঠ্য মাতৃভাষার ধর্ম্মপুস্তকে দিনরাত্রি ডুবিয়া থাকিয়া ভক্ত হইবার অবসর পাইত। মধ্যযুগে ইউরোপেও ঠিক এই মত বিভ্রাট ঘটে। আদি বাইবেল-খানা হিব্রু ও গ্রীক্ হইতে লাটিনে অনুবাদ করিয়া তাহাই গির্জ্জায় পড়া হইত, লাটিন ভাষায় পূজা, প্রার্থনা স্তোত্রগান হইত। পুরোহিতেরাই সব সময় তাহার ঠিক মানে বুঝিতেন না, সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। অথচ ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ ভাবিতেন যে লাটিন পবিত্র ভাষা, ধর্ম্মগ্রন্থ বা স্তোত্র প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া পাঠ করাইলে ধর্ম্মের অপমান করা হইবে। ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ নরনারী তোতাপাখীর মত লাটিন ভজন শুনিত, লাটিন স্তোত্র আওড়াইত, এক কথাও বুঝিত না, ধর্ম্ম তাহাদের অন্তরে ঢুকিত না। বাঙ্গালী মুসলমানদের নিকট উর্দ্দুতে কোরাণ-ব্যাখ্যা এবং ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করায় ঠিক এই ফল হইতেছে। তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে লুথার উঠিয়া ধর্ম্মসংস্কার করিলেন, দেশে শুধু দেশীয় ভাষায় বাইবেল পাঠ, স্তোত্র গান ও পূজা সম্পন্ন হইতে লাগিল। তখন ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্ম প্রাণময়, অকপট, বিশ্বাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণ! ইতিহাসের এই দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষালাভ করুন, সজাগ হউন। আপনাদেরই প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন—"নমাজের সময় পূর্ব্ব বা পশ্চিমদিকে মুখ ফিরানতে ধর্ম্ম হয় না; প্রকৃত ধর্ম্ম হয় ঈশ্বরে, শেষ বিচারের দিনে, ধর্ম্মগ্রন্থে ও প্রেরিত পুরুষগণে বিশ্বাস করাতে।" (কোরান, ২য় অধ্যায়, ১৭৭ শ্লোক)। আপনাদের প্রধান ভাষ্যকার ঘজ্জালী লিখিয়াছেন—"হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে নোয়াইয়া আনাই নমাজের মূল উদ্দেশ্য, নমাজের অন্তরাত্মা।" অর্থাৎ আমরা যেমন সংস্কৃতে বলি "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ"। ভাল করিয়া না বুঝিয়া আরবী বা উর্দ্দু আয়াৎ আওড়াইলে তাহাতেই প্রকৃত ধর্ম্ম হইবে, এবং তাহা বাঙ্গলা স্তোত্র অপেক্ষা বেশী সফল হইবে এ ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করুন। কারণ এই ভ্রান্তির ফল বড় বিষময়, একেবারে নরক; এই জন্য কোরাণে আছে—"কপট বিশ্বাসী নরনারীরা ঈশ্বরকে ভুলিয়াছে, এজন্য তিনিও তাহাদিগকে ভুলিয়াছেন।... তাহাদের প্রতি তিনি নরকের আগুনে বাস করার দণ্ড দিয়াছেন।" (৯ অধ্যায়, ৬৮।৬৯ শ্লোক)। ফলতঃ ধর্ম্মের সঙ্গে ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্ম প্রাদেশিক বা কোন বিশেষ ভাষায় লিখিত পুঁথিতে আবদ্ধ—এমন সংস্কারকে মনে স্থান দিয়া পবিত্র ধর্ম্মকে হীন করিবেন না। ধর্ম্ম সার্ব্বজনিক, ধর্ম্ম সনাতন, ধর্ম্ম হৃদয়ের ভাষায় হৃদয়েশ্বরের সঙ্গে কথা বলে।

(৩) তারপর, যদি বা আপনারা অনেক চেষ্টায় উর্দ্দু

অভ্যাস করিলেন, কিন্তু আপনাদের সমাজের অর্দ্ধাঙ্গের কি গতি হইবে? একেই ত মেয়েদের লেখাপড়া করিবার সময় কম, তাহাতে আবার তাঁহারা অন্তঃপুরের মধ্যে শুধু বাঙ্গলাভাষী দাসদাসী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ পান। এরূপ অবস্থায় কি তাঁহাদেক বই পড়া ও প্রবন্ধ লেখার মত উচ্চ উর্দ্দু শেখান সম্ভবপর? তাঁহাদের পক্ষে বাঙ্গলাবর্জ্জনের আজ্ঞা হইবে জ্ঞানবর্জ্জনের দণ্ডাজ্ঞা। অথচ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিলে তাঁহারা অতি উৎকৃষ্ট মধুর বিচিত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া নানাবিধ জ্ঞান লাভ করিবেন। তাঁহাদিগকে প্রয়াস করিয়া পড়াইতে হইবে না। বঙ্গসাহিত্যের আকর্ষণে তাঁহারা 'নূতন বই দাও, নূতন বই দাও' বলিয়া আপনাদেক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন, স্থানীয় সাধারণ পুস্তকালয়ের ভাণ্ডার শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিবেন। আপনারা না হয় যেন উচ্চ অঙ্গের উর্দ্দু সাহিত্য পড়িলেন, কিন্তু আপনাদের সহধর্ম্মিণীদের সঙ্গে তাহার আলোচনা করিতে পারিলেন না, তাঁহারা আপনাদের মনের এক প্রকোষ্ঠ হইতে একেবারে বাহিরে রহিলেন, ইহার চেয়ে বেশী দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? প্রাচীন আরবদেশে রমণী ভ্রমণে স্বামীর সহচরী ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া পতি পুত্র ভ্রাতাকে বীরগীতি বা উচ্চবাক্যে উৎসাহিত করিতেন। আর বাঙ্গলায় সেই ধর্ম্মের লোকেরা কি স্ত্রীলোকদিগকে জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিয়া দাসীর দলে ফেলিয়া রাখিবে? সুখের বিষয়, চিন্তাশীল মুসলমানগণ স্ত্রীশিক্ষার সহজ পথটী ধরিয়াছেন, তাঁহাদের গৃহিণীগণ বাঙ্গলাসাহিত্য চর্চ্চা করিতেছেন। আমার সমপাঠী একজন রাজসাহীর মুসলমান ভদ্রলোকের পত্নী (বরিশালের মেয়ে) বেশ সুন্দর বাঙ্গলা রচনাপূর্ণ একখানি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছেন।

(৪) বাঙ্গালী মুসলমান ভদ্রলোকদের উর্দ্দু ব্যবহারের চেষ্টার ফল দেখিয়া অনেক সময় হাসির চেয়ে কান্না বেশী পায়। উঃ, কি অযথা সময় ও পরিশ্রম নষ্ট! কি বিফলতা! প্রকৃতিদেবী তাঁহাদেক সফল হইতে দিতেছেন না। এই দেখুন বিশুদ্ধ উর্দ্দুর কেন্দ্র লক্ষ্ণৌ সহর হইতে তাঁহারা কতদূরে বাস করিতেছেন। লক্ষ্ণৌবাসীদের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের পৌনে দু'কোটি মুসলমানদের মধ্যে কজনের দেখা সাক্ষাৎ হয়? অথচ সাধু বাঙ্গলার উৎস তাঁহাদের দ্বারের কাছে বহিতেছে; তাঁহারা গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় বিশুদ্ধ বাঙ্গলা শুনিবার, বলিবার, পড়িবার সুবিধা পাইতেছেন; শুধু ইচ্ছা করিলেই হইল। বঙ্গভাষা নিশ্বাসের বায়ুর সঙ্গে, পানীয় জলের সঙ্গে, তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তবে কেন তাহা দূরে রাখার জন্য বৃথা চেষ্টা?

আরা জেলার একজন মৌলবী এবং চাটগেঁয়ে আর এক মৌলবী বিহারের কোন স্কুলে কাজ করিতেন। প্রথম জন লক্ষ্ণৌয়ে পড়িয়াছিলেন; তিনি একদিন আমার সঙ্গে কথায় কথায় বলিলেন যে তাঁহার চাটগেঁয়ে বন্ধু একদিন তাঁহার সঙ্গে বাঁকিপুরে দেখা করিতে আসিয়া বলেন "আপ্‌কা মোকাম হাম্ কেৎনা ধোঁড়া"। এই কথাগুলি বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিয়া তিনি চাটগাঁয়ের উর্দ্দু উচ্চারণ ও ব্যাকরণের উপহাস করিলেন। তাহাতে আমার মনে কষ্ট হইল, কারণ চাটগেঁয়ে মৌলবী যে আমার স্বদেশী। কিন্তু কি উত্তর দিব?

আবার, একটী প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ের ফারসী হস্তলিপির বর্ণনা ও তালিকা করিবার জন্য একজন শিক্ষিত মুসলমান যুবককে পাঠান হয়। তিনি আমার সঙ্গে প্রথমে ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিতেন; আমি ভাবিলাম তিনি বুঝি পশ্চিমে। পরে একদিন তাঁহার কতকগুলি লেখা কাগজ আমার নিকট আসে, তাহাতে দু'তিন জায়গায় 'আলিখ্' (যাহার মানে 'ইত্যাদি') এই আরবী শব্দটী লেখা ছিল। আপনারা জানেন আরবী ও ফারসী হস্তাক্ষরের গতি বামের দিকে; সুতরাং ঐ শব্দটী লিখিতে বামে 'খ', মধ্যে 'লি' এবং দক্ষিণে 'আ' বসিবে। আমি কাগজগুলি পড়িয়া দেখি যে কয়েকস্থানে মৌলবী 'আলিখ্' কথার ঠিক ফারসীর উল্টো অর্থাৎ বাঙ্গলার অনুযায়ী বর্ণবিন্যাস করিয়াছেন! এটা অবশ্য লেখকের তাড়াতাড়ির ভুল। কিন্তু আমি ইহাতেই টের পাইলাম যে তিনি বাঙ্গালী, এবং তারপর আমরা বাঙ্গলায় কথা কহিয়াছি।

যদি শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানদের উর্দ্দুর এই দশা তবে সাধারণ লোকে আর কত ভাল উর্দ্দু শিখিবে? কারণ, মনে রাখিবেন যে আমরা রেলের মুটেকে বা পশ্চিমে

কোচোয়ানকে বুঝাইবার জন্য যেমন হিন্দি বলি, শুধু সেই ধরণের কথা শিখিলে ভাষা শিক্ষা হয় না, সাহিত্যচর্চ্চা সম্ভবে না। সাহিত্যে সূক্ষ্ম কোমল বিচিত্র ভাবগুলি প্রকাশ করিবার জন্য অনেক কথার আবশ্যক, যথাস্থানে ঠিক কথাটী দিতে হইবে, নহিলে কাব্যের জাদুমন্ত্র নষ্ট হইল, কাব্য আর কাব্য রহিল না, দোকানের খাতাপত্রে পরিণত হইল; তাহার রস ও শিক্ষাশক্তি একসঙ্গে লোপ পাইল। সাহিত্যের উপযোগী উর্দ্দু খুব কম বাঙ্গালী মুসলমানই শিখিয়াছেন, এবং আরও কম লোকে লিখিতে পারেন। ঠিক এই কারণে ভারতীয় ফারসী পদ্য সাহিত্য নির্জীব অসার পরদেশী গাছের মত শুকাইয়া গিয়াছে। সহস্রাধিক ভারতবাসী ফারসী পদ্য লিখিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেবল দুজনের নাম কিছু বিখ্যাত হইয়াছে,—আমির খসরু এবং ফৈজী; এবং এ দুজনও পারস্যের তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের মধ্যে আসন পান। সেই মত কোন বাঙ্গালী মুসলমান মূল্যবান্ উর্দ্দু গ্রন্থ রচনা করেন নাই।

ফলতঃ বাঙ্গলা সব বাঙ্গালীর স্বাভাবিক ভাষা, বাঙ্গলা না ব'লতে পারিলে আমাদের প্রাণের সুখ হয় না। রোহিলখন্দের রাজধানীতে একজন ঢাকার মুসলমান যুবক আরবী পাড়তে গিয়াছিল। নগরের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে সে একদিন তথাকার একমাত্র বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বিদ্যুতের ইঞ্জিনিয়ার দেবেন বাবুকে দেখিয়া বলে "আপনার সঙ্গে একটু বাঙ্গলা কথা কয়ে বাঁচি!" আবার, কলিকাতা হইতে একজন বাঙ্গালী মুসলমান শিক্ষক পাটনার ট্রেনিং কলেজে উর্দ্দুতে শিক্ষাপ্রণালী শিখিতে যান, এবং সেখানকার ছাত্রাবাসে থাকিয়া উর্দ্দু বলেন, অথচ পথে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বাঙ্গলায় আলাপ আরম্ভ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গলাই বাঙ্গালী মুসলমানদের ঘরের ভাষা, তবে তাহাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে আপত্তি কেন, লজ্জা কেন?

(৫) সাধু বাঙ্গলার চর্চ্চা না করায়, বঙ্গসাহিত্যে যোগ না দেওয়ায়, মুসলমানসমাজের যে আর একটী মহা অনিষ্ট হইতেছে, তাহা উর্দ্দুর মরীচিকা ধরিতে গিয়া তাঁহাদের নেতারা একবারও ভাবেন না। বাঙ্গলা ভাষা বর্দ্ধিষ্ণু, বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাণ্ডার বিচিত্র দেশী বিদেশী রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ, নবভাবে অনুপ্রাণিত। এমন সাহিত্য ভারতের আর কোন অংশে এবং জাপান ভিন্ন এশিয়ার আর কোন দেশে নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রভাব ও দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া পঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং দ্রাবিড় পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতেছে। বাঙ্গলার মহাগ্রন্থগুলি, এমন কি বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকার অনেক প্রবন্ধ ঐ সব প্রদেশের ভাষায় দ্রুত অনুবাদিত হইতেছে। মারাঠা অনুবাদকেরা বঙ্কিম রমেশ এর মধ্যেই শেষ করিয়া দামোদর ও হরপ্রসাদকে ধরিয়াছেন। মুসলমান ভ্রাতাগণ! আপনাদের ধর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, আপনাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে দেশ হইতেই আসিয়া থাকুন না কেন, এখন আপনারা বাঙ্গালী হইয়াছেন। আপনাদের পক্ষে এ কেন বাঙ্গলাভাষা ত্যাগ করিয়া উর্দ্দু ধরিবার চেষ্টা যেন নিজের সোনার বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া পরের কুঁড়ে ঘরের এক কোণে অতিথির মত পরদেশীর মত একটু থাকিবার স্থান ভিক্ষা করা।

কেহ যেন মনে না করেন যে আমি উর্দ্দু সাহিত্যকে হেয় জ্ঞান করি। ইহাতে ভদ্রতা, প্রাচ্য সভ্যতা যথেষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু ইহার আদর্শ অতি পুরাতন, বহু শতাব্দী পূর্ব্বের ফারসী কবিগণ। উর্দ্দু পদ্যে সেই মোহ-মুদ্গর ও শান্তিশতকের ভাব, সেই মধ্য যুগের অবসাদ, নিরাশা, অশ্রু রহিয়াছে। জগৎ অসার, জীবন ক্ষণভঙ্গুর, প্রকৃত জ্ঞানীই উদাসীন—এই ভাব ব্যক্ত হয়। ইউরোপে যে নবভাব উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবাহিত হইয়াছে, যাহাতে নব নব ক্ষেত্রে নবতেজে উদ্দীপ্ত হইয়া ইউরোপীয়গণ আজ জগতের আকৃতি ফিরাইয়া দিতেছে, সেই ভাবের স্রোত শুধু বঙ্গসাহিত্যেই প্রবেশ করিয়াছে। ইউরোপে যাহা গেটে শিখাইয়াছেন, এশিয়াখণ্ডের ভাগ্যবান্ বঙ্গদেশ তাহা রবীন্দ্রনাথের নিকট লাভ করিতেছে। নবীন অগ্রসর জাতির মধ্যে গণ্য হইতে হইলে পুরাতনের জড়তা, যুগযুগান্তরব্যাপী নিদ্রার অলসতা, উদাসীন ভাব ও নৈরাশ্য ত্যাগ করিতে হইবে। এই সব নবযুগের সৈনিকগণের জীবন-সংগ্রামে সাময়িক গীত শুধু বাঙ্গালা

হইতেই আসিতে পারে। উর্দ্দুতে সবে দুই এক বৎসর হইল কয়েকজন লেখক এই নবীন তত্ত্ব শিখাইতেছেন, তাহাও গদ্যে। বাঙ্গালী মুসলমানগণ বাঙ্গালা ভাষা ছাড়িলে এই বর্দ্ধনশীল নবতেজে তেজীয়ান্ বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পর্কও হারাইবেন—পিছু পড়িয়া থাকিবেন। অথচ জগৎও সভ্যসমাজ অবিরাম গতিতে অগ্রসর হইবে, তাঁহাদের জন্য থামিয়া থাকিবে না, দেরী করিবে না। মুসলমান ভ্রাতাগণ আমাদের ঘরের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক; তাঁহারা ক্রমে হীনতর প্রাচীনতর হইয়া যাইতেছেন ইহা দেখিয়া কোন স্বদেশহিতৈষী নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন?

অতএব বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা ইতিহাস হইতে শিক্ষালাভ করুন, প্রকৃতির বিরুদ্ধে বৃথা সংগ্রাম ছাড়িয়া দিন, ইচ্ছা করিয়া জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছু পড়িয়া থাকিবেন না। জগতের উন্নতির প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে ভাসুন; বঙ্গসাহিত্যের সাহায্যে জ্ঞান বিস্তার করিয়া নব্যভাব গ্রহণ করিয়া, উন্নতিশীল জাতির মধ্যে গণ্য হউন। এই গৌড়ে হুসেন শাহের সভায় কত বাঙ্গালী কবি পালিত হইয়াছিলেন; একদিন এই গৌড় নগরী কি হিন্দু, কি মুসলমান সব বাঙ্গালীর সভ্যতার কেন্দ্র, মিলনের ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু এ যুগে সাহিত্য প্রজাতন্ত্র, রাজার কাজ সম্মিলনকে করিতে হয়। তাই আজ এই প্রজাতন্ত্রের ফোরাম্ বা সভাপ্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতাদের জন্য আমি নবযুগের "আজান" পাঠ করিতেছি—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—আমাদের সঙ্গে আসুন, বঙ্গসাহিত্যকে নিজের জিনিষ করিয়া তুলুন, স্রোতে যোগ দিন, সঙ্কীর্ণতা নির্জীবতা আবিলতা আপনা হইতে দূর হইবে—আপনারা আবার সমবেত জাতীয় জীবনের অংশী হইয়া উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে, কীর্ত্তির হিমাদ্রিশিখরে আরোহণ করিতে পারিবেন!"

এখন সম্প্রদায় বিশেষকে ছাড়িয়া সমগ্র সাহিত্যিকমণ্ডলীর নিকট একটি নিবেদন করিব। এই সব সভা সম্মিলন শুধু সমালোচনায় কার্য্য পথপ্রদর্শনের কার্য্য করিতে পারে, সৃজনের কার্য্য নহে। যাহা একান্ত মৌলিক, যাহা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য তাহা শুধু প্রতিভা হইতে জন্মিতে পারে, চেষ্টা হইতে নহে। আর প্রতিভার অশ্ব কোন শিক্ষকের, কোন সমালোচকের বল্গা মানে না। কিন্তু যাহা চেষ্টার সাধ্য এমন অনেক কাজ আমাদের বাকী আছে। সম্মিলন তাহাই করিবেন। বাঙ্গালা সাহিত্য একটি বর্দ্ধিষ্ণু চঞ্চল দুরন্ত বালক; দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে; যাহা পায় তাই মুখে দেয় কিম্বা নিজের অধিকারে আনিবার চেষ্টা করে। এই শিশুকে বিচার শিক্ষা দেওয়া, সংযম শিক্ষা দেওয়া, পথ দেখান আমাদের পরিষদের কর্ত্তব্য। জ্ঞানের ক্ষেত্র বড় বৃহৎ—পৃথিবীতে কোন জিনিষ এত বড় নয় বা এত ক্ষুদ্র নয় যে তাহা অনুসন্ধান ও চর্চ্চার বাহিরে পড়ে। নবযুগের ভাব ও জ্ঞান দিন দিন অধিক বিচিত্র হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেক লেখককে নিজের বিশেষ বিষয় বাছিয়া লইতে হইবে; সার্ব্বভৌমের দিন আর নাই। এই সব লেখককে উপদেশ দেওয়া পথ দেখাইয়া দেওয়া, তাঁহাদের ব্যক্তিগত কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করা সম্মিলনে মিলিত পণ্ডিতমণ্ডলীর কর্ত্তব্য। তবেই পরিশ্রম সফল হইবে, সময় ও চেষ্টা বৃথা নষ্ট হইবে না। পরিষদ ও সম্মিলনের কার্য্যই এই যে জ্ঞানের ক্ষেত্র বিভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশের জন্য উপযুক্ত লেখক নির্দ্দেশ করা, তাঁহাদিগকে খাটাইয়া লওয়া, এবং ব্যক্তিগত চেষ্টার সমবায় করিয়া বিপুল ব্যাপার সম্পূর্ণ করা।

দ্বিতীয়তঃ, এটি উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সম্মিলন, সুতরাং এই প্রদেশের বিশেষ তত্ত্ব উদ্ধার না করিতে পারিলে ইহার নাম সার্থক হইবে না। স্থানীয় লোকের দ্বারাই স্থানীয় ইতিহাস ভাষা ধর্ম্ম প্রথা লোকতত্ত্ব প্রাচীন কীর্ত্তি, প্রভৃতির সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান সম্ভব ও সহজসাধ্য। এরূপ কার্য্যে উপযুক্ত স্থানীয় লেখক নিযুক্ত করিতে এবং তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতে প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনই ভালরূপে পারেন।

উত্তরবঙ্গে খুঁজিবার ভাবিবার শিখিবার অনেক জিনিষ আছে। ইতিহাসের পাঠকেরা জানেন যে উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়া দুইটি পুরাতন পথ আছে, যাহা ধরিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী জনস্রোত সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। একটি গঙ্গা। প্রথমে এই নদীর সাহায্যে আর্য্য সভ্যতা ধর্ম্ম ভাষা বঙ্গে প্রবেশ করে, এই পথ বহিয়াই যুগে যুগে

নব শিক্ষক নব প্রচারক নব বিজেতা নব উপনিবেশ-স্থাপন-কর্ত্তা বঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আর এক পথ মুসলমান সময়ের। মুর্শিদাবাদের উত্তর এবং রাজমহলের দক্ষিণ সুতী হইতে আরম্ভ করিয়া ঘোড়াঘাটের ভিতর দিয়া ব্রহ্মপুত্রের ধারে চিলমারি এবং রাঙ্গামাটি এমন কি মোঘল রাজ্য ও আসামের সীমা করোবাড়ী পর্য্যন্ত আর একটি পথ। ঢাকার দিক হইতে হাজরাহাটী হইয়া এ পথ ধরা যাইত। এই দুই পথ দিয়া মানবের অতি বিশাল, অতি বিরামহীন গতি চলিয়াছিল। নদীর স্রোত দুই পারে কত কত জিনিষ, লতা প্রাণী ফেলিয়া দিয়া যায়, তাহা বালুতে চাপা পড়িয়া থাকে, পরে বহু শতাব্দীর পর ভূতত্ত্ববিদেরা আসিয়া বালি খুঁড়িয়া তাহা বাহির করিয়া প্রাচীনকালের বৃক্ষ লতা প্রাণীর ইতিহাস উদ্ধার করেন। তেমনি এই দুই রাস্তার জনস্রোত দুধারে অসংখ্য ছোট ছোট জাতিকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া গিয়াছে। সেখানেই তাহারা স্থির ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। অলঙ্ঘ্য হিমালয় ও দুর্ভেদ্য মণিপুর পর্ব্বতের মিলনে উত্তর-বঙ্গে যে কোণ হইয়াছে তাহাতে অনেক অসভ্য, অনেক অনার্য্য, অনেক অহিন্দু ও অমুসলমান জাতি ধর্ম্ম ভাষা প্রথা ভাব ও লোককাহিনী দক্ষিণ ও পশ্চিম হইতে ক্রমে ঠেলা খাইতে খাইতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। অতি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ভাষার বিচিত্র ক্রমবিকাশের ইতিহাস, ধর্ম্মজগতের স্তরগুলির ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য উত্তরবঙ্গের মত উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র আর নাই। দক্ষ লেখক শ্রম করিলে এখান হইতে মহামূল্য তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এরূপ সুবিধা পশ্চিম ভারতে মিলে না, সেখানে পরিবর্ত্তন বড়ই বেশী হইয়া গিয়াছে, পুরাতনের চিহ্ন লোপ পাইয়াছে।

উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত সমাজ স্থানীয় নিম্ন ও অনার্য্য জাতিদের প্রেতে বিশ্বাস, পূজাপদ্ধতি, ছড়া ও লোক-প্রচলিত গল্প, আচার ব্যবহার (বিশেষতঃ শ্রাদ্ধ ও বিবাহের প্রথা,) মৃত্যুর সম্মুখে দুর্ব্বল, ভীত মানবহৃদয়ের ভয় ও ভক্তি মিশ্রিত প্রতিকার বা আবেদনের চেষ্টা, উপভাষার বিশেষত্ব, উপভাষার শব্দগুলির শ্রেণী বিভাগ হইতে সেই সেই জাতির আদি প্রদেশ ও সভ্যতার ইতিহাস নির্দ্ধারণ, বিদ্যমান প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির ঠিক বর্ণনা ও
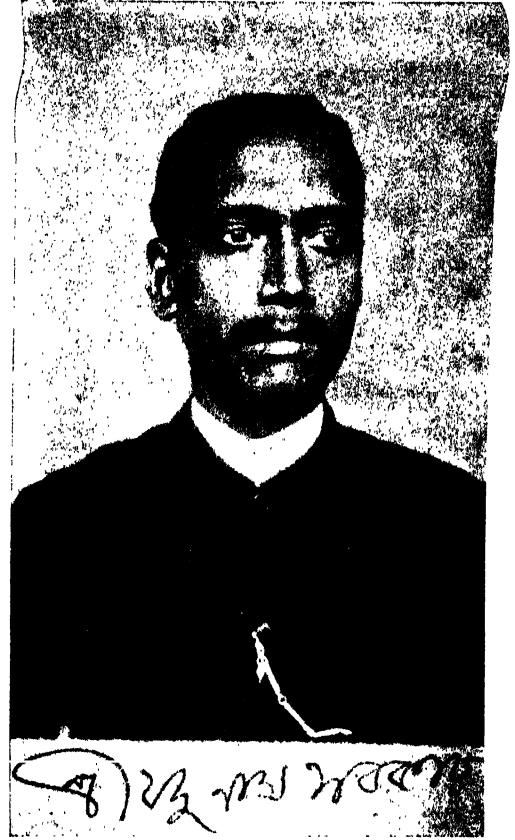
চিত্রসংগ্রহ—এই সব কার্য্যে অধ্যবসায়ের সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে লাগিয়া যাউন।

আমাদের চিন্তাশীল যুবকবৃন্দের সম্মুখে এর চেয়ে বেশী আবশ্যকীয়, বেশী উপকারী কাজ ধরা যাইতে পারে না। প্রায়ই দেখিতে পাই যে আমাদের অসংখ্য নূতন লেখক একটা দুটা ছোট গল্প বা ছোট কবিতা লিখিয়া মাসিক পত্রিকায় ছাপান এবং মনে করেন যে ইহাতেই সাহিত্য-সেবা হইল। কিন্তু যেমন শুধু পান খাইয়াই কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, সেই মত এই সব চুটকি রচনায় সাহিত্যের পুষ্টি হয় না—হয় শুধু লেখকের সময় ও অন্তর্নিহিত প্রতিভার অপচয়।

প্রকৃত সাহিত্য-সেবায় অধ্যবসায়ের দরকার, জ্ঞানের দরকার। মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায় যে যে ছেলেটার বাঙ্গালা বা ইংরাজি কোন লেখাপড়াই ভালমত হইল না সে বাঙ্গলালেখক বা ততোহধিক মারাত্মক সমালোচক হয়।

এটা মন্দের ভাল বটে, কিন্তু আমি চাই ভালর ভাল। প্রতিভাব কথা ছাড়িয়া দিন, কারণ তাহাতে বিস্তার দরকার হয় না। কিন্তু তাহা ভিন্ন সাহিত্যের সমস্ত বিভাগেই সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানের দরকার। যাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল না সে-ই বাঙ্গলালেখক হইবার উপযুক্ত, মাতৃভাষার অপমানজনক এই মত আমি কিছুতেই স্বীকার করিব না। না, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার, সবচেয়ে কঠিন সাধনার ফল, শীতকালের নীলপদ্ম, আনিয়া মাতৃভাষার পদতলে দিলে তবে তাঁহাকে প্রকৃত ভক্তি দেখান হয়।

যুবকবৃন্দ! আপনাদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন, কেহ যেন মনে না করেন যে বাঙ্গলা ভিন্ন অন্য সব সাহিত্যের জ্ঞান অবহেলার জিনিষ, অথবা শুধু বঙ্গভাষার চর্চ্চা দ্বারাই বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সেবা করা যায়। মনে রাখিবেন, যাহা সর্ব্বোচ্চ সত্য বা প্রাকৃতিক তত্ত্ব তাহা সনাতন, তাহা বিশ্বজনীন; তাহা বাঙ্গলাতেই থাকুক আর অন্য ভাষাতেই থাকুক আমরা সমান আদর করিয়া লইব। এই জন্য আমাদের প্রাচীন কবিগণ সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিয়া সুধা আনিয়া এবং মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত নব্য কবিগণ বিদেশীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার লুটিয়া রত্নরাজি বাছিয়া বঙ্গমাতার অঙ্গের আভরণ দিয়াছেন। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি, বঙ্গভাষার প্রত্যেক প্রকৃত সেবক সেই পথ অবলম্বন করুন—শুধু কাব্যে নহে, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্পকলা প্রভৃতি জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগেই সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করাই আদর্শ বলিয়া গণ্য করিবেন।

এই সম্মিলন আমাদের লেখকদিগকে, আমাদের পাঠকদিগকে, আমাদের সকলকেই বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই উচ্চ আদর্শে লইয়া যাউক, ইহাই আমার প্রার্থনা। যেন আমাদের প্রাদেশিকত্ব, আমাদের জাতিগত ভেদবুদ্ধি, ধর্ম্মগত বিদ্বেষ, আমাদের সংকীর্ণতা ঘুচিয়া যায়, যেন আমরা সকলে অতি বিশুদ্ধ, অতি মহান্, অতি শান্ত সর্ব্বোচ্চ সাহিত্যজগতে প্রবেশ করিতে পারি,—যে জগতে দুঃখ নাই, জরা নাই, দৈন্য নাই, ভেদবুদ্ধি নাই; আছে শুধু বিশ্বব্যাপী মহান্ শান্তি, মহা সংযম, মহা আনন্দ, মহা শক্তি, বিপুল স্বাধীনতা। তাই কবির ভাষায় আমরা প্রার্থনা করি—

"মোরে, ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে—
তোমার বিশ্বের সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে!
উদয়গিরি হতে উচ্চে কহ মোরে—
তিমির লয় হল দীপ্তি-সাগরে,
স্বার্থ হতে জাগ, দৈন্য হতে জাগ,
সব জড়তা হতে জাগ রে,
সতেজ উন্নত শোভাতে!"

শ্রীযদুনাথ সরকার।

ভারতের কয়লা

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ভূপৃষ্ঠের শিলামৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া পৃথিবীর অনেক অংশেই কয়লা বা উদ্ভিদ্‌দেহজাত অপর কিছুর একটা স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। ভূতলে এই স্তরের গভীরতা অবশ্য সকল স্থানে সমান দেখা যায় না। ভূগর্ভের তাপে স্তরটা উঁচু নীচু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ছোটনাগপুরের ঝেরিয়া অঞ্চলে দুই তিন শত মাটি খুঁড়িলেই কয়লা বাহির হইয়া পড়ে। আবার রাণীগঞ্জের স্থানে স্থানে শত শত ফুট নীচে না নামিলে কয়লার সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা দেখিয়া ঝেরিয়ার কয়লা অপেক্ষা রাণীগঞ্জের কয়লা প্রাচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা চলে না। খুব সম্ভবতঃ একই সময়ে উভয় স্থানের কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল। তারপর পৃথিবীর ভিতরকার তাপের উৎপাতে ঝেরিয়ার কয়লা উপরে উঠিয়াছে এবং রাণীগঞ্জের কয়লা নীচে নামিয়াছে, এই স্থির করাই যুক্তিসঙ্গত। অতি প্রাচীনকালে পৃথিবী এখনকার মত ঠাণ্ডা ছিল না। সেই জন্য তখন মাটি পাথর এখনকার মত কোন নির্দ্দিষ্ট আকার গ্রহণ করিয়া থাকিত না। ভূগর্ভের তাপে ভূমিকম্প ইত্যাদি উৎপাতও খুব ঘন ঘন হইত। কাজেই স্তরগুলিও চঞ্চল হইয়া এলোমেলো হইয়া পড়িত।

যাহা হউক সর্ব্বত্রই একটা কয়লার স্তরের সন্ধান পাইয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পৃথিবীর কৈশোর জীবনের এক অংশকে অঙ্গার-যুগ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এই

যুগে দুই একটি অতিকায় অদ্ভুত জন্তু ছাড়া বোধ হয় অপর কোন প্রাণী ভূতলে বিচরণ করিত না। সে সময়ে পৃথিবীতে কেবল উদ্ভিদেরই রাজত্ব ছিল। গগনস্পর্শী বড় বড় গাছের পত্রপল্লবের নিবিড় আবরণকে অতিক্রম করিয়া সূর্য্যালোকই বোধ হয় ভাল করিয়া ভূমি স্পর্শ করিতে পারিত না। গাছের মূলদেশ নানা প্রকার শৈবাল ও ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদে আবৃত থাকিত। তার উপর আবার তখনকার সেই কোমল মৃত্তিকারাশিকে ভূমিকম্প ইত্যাদিতে ক্রমাগত উঁচু নীচু করিতে থাকিত। ইহার ফলে উঁচু স্থান হইতে জল ও কাদামাটি আসিয়া নীচু স্থানের পচা বৃক্ষলতাগুল্ম ইত্যাদিকে ঢাকিয়া ফেলিত। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, এই মাটি-চাপা উদ্ভিদই কালক্রমে নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া এখন কয়লার মূর্ত্তি পাইয়াছে। পচা উদ্ভিদকে কয়লায় পরিণত করিতে হইলে চাপের প্রয়োজন। উপরে যে মৃত্তিকা সঞ্চিত হইত তাহা যথেষ্ট চাপ দিত। তা ছাড়া পচা উদ্ভিদ হইতে যে বাষ্প উৎপন্ন হইত, তাহাও বহির্গত হইবার কোন পথ না পাইয়া, চাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে থাকিত। এখনো কয়লার খনিতে ঐ বাষ্পের সন্ধান পাওয়া যায়। আকরিকগণ যখন কয়লাগুলিকে খুঁড়িয়া মুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে আনে, তখন সচ্ছিদ্র কয়লার ফাঁকে ফাঁকে যে বাষ্প আবদ্ধ থাকে তাহা বাহির হইতে আরম্ভ হয়। গভীর খনিগুলিতে যে বিষ-বায়ু (Fire damp) দেখা যায়, তাহাও সেই অতি প্রাচীনকালের আবদ্ধ বাষ্প ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহা আগুনের সংস্পর্শে আসিবামাত্র হঠাৎ জ্বলিয়া কয়লার খাদে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বড় বড় কয়লার খনি বড় বড় অরণ্যের গাছপালার জমাট অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কয়লার যুগে আমাদের আকাশের বায়ু এখনকার মত নির্ম্মল ছিল না। উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য অঙ্গারক বায়ুই আকাশে খুব অধিক পরিমাণে থাকিত। কাজেই গাছপালা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া মরিয়া যাইত, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দেহ পচিয়া কয়লার উৎপত্তির সূচনা করিত।

অতি প্রাচীনকালে যে সকল উদ্ভিদের দেহ দ্বারা কয়লার উৎপত্তি হইয়াছিল, এখন কয়লা পরীক্ষা করিয়া তাহাদের জাতিনির্ণয় করা হইতেছে। গলিত লতাপাতা বৃক্ষকাণ্ডের ছবি কয়লাতেই অঙ্কিত থাকে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নানা দেশের কয়লার সহিত ভারতের কয়লার তুলনা করিয়া ইহাতে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের উদ্ভিদের চিহ্ন পাইয়াছেন। সুতরাং বলিতে হয় পৃথিবীর অপর অংশ যখন নিবিড় অরণ্যে আবৃত ছিল, তখন আমাদের দেশটায় কোন কারণে উদ্ভিদ জন্মাইতে পারে নাই। অধ্যাপক হক্সলি সাহেব বলিয়াছেন, অতি প্রাচীন কালে অন্ততঃ ষাট লক্ষ বৎসর পৃথিবীতে কেবল উদ্ভিদেরই রাজত্ব ছিল। সুতরাং আমাদের দেশে নিশ্চয়ই এই ষাটলক্ষ বৎসর পরে উদ্ভিদের রাজত্ব সুরু হইয়াছিল।

নানাপ্রকার কয়লার মধ্যে কোন্‌টি অতি প্রাচীন এবং কোন্‌টিই বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা যায়। ভারতের কয়লা লইয়া এ প্রকার পরীক্ষা করা হইয়াছে। ইহাতেও আমাদের দেশের কয়লার আধুনিকতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। রাণীগঞ্জ প্রভৃতির কয়লাতে আকরিক পদার্থের বিশেষ আধিক্য আছে। আকরিক জিনিস সহজে পুড়িতে চায় না। পোড়াইতে গেলে উহা ভস্মাকারে নীচে পড়িয়া থাকে। বাংলা দেশের কয়লায় ভস্মই নাকি অধিক হয়। ইহা আধুনিকতার আর একটা লক্ষণ। আসাম অঞ্চলে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহা বাংলার কয়লার ন্যায় আধুনিক নয়। আগুন দিলে ইহার অধিকাংশই বাষ্পীভূত হইয়া পুড়িয়া যায়। বাংলার স্থানে স্থানে আজ কাল এক শ্রেণীর ভাল কয়লা পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ অতি অল্প। অপর দেশের সাধারণ কয়লা যে সকল উপাদানে গঠিত, বিশ্লেষ করিলে বাংলা দেশের কয়লাতে তাহার সকলগুলিকে উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন, আরো কয়েক সহস্র বৎসর মাটি চাপা থাকিলে হয় ত এই কয়লা খুব ভাল হইয়া দাঁড়াইত।

ভারতে প্রায় ৩৫ হাজার বর্গ মাইল স্থানে কয়লা আছে। অপর দেশের তুলনায় এই পরিমাণটাকে কখনই খুব অধিক বলা যায় না। চীনে চারি লক্ষ এবং আমেরিকায় প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গ মাইল কয়লার জমি রহিয়াছে,

এবং ইহার সকল স্থান হইতেই কয়লা উঠান হইতেছে। ভারতের ৩৫ হাজার বর্গ মাইল কয়লার জমির মধ্যে কেবল কয়েক হাজার মাইল হইতে আজ কাল কয়লা তোলা হইতেছে। অবশিষ্ট জমি হইতে যে কখনো কয়লা উঠানো হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এ সকল জমিতে কয়লার স্তর ভূগর্ভের অতি গভীর প্রদেশে অবস্থিত। কাজেই বহুব্যয়ে মাটি পাথর কাটিয়া কয়লা উদ্ধার করিতে গেলে, খরচে পোষায় না।

ঝেরিয়া ও রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের কয়লা নিঃশেষে উঠিয়া গেলে, দেশের কলকারখানার খোরাক যে কোথা হইতে সংগ্রহ করা হইবে, তাহা একটা চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমেরিকায় প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়, কাঠও প্রচুর জন্মায়। কয়লা উঠাইবার ব্যয় অপেক্ষা কাষ্ঠ সংগ্রহের খরচ অল্প দেখিয়া কিছু দিন পূর্ব্বেও আমেরিকার রেলের ইন্‌জিন্ এবং কারখানার চুলোতে কাঠই পোড়ানো হইত। আমাদের ভারতবর্ষেও এককালে খুব বড় বড় জঙ্গল ছিল। একে একে সেগুলিও লোপ পাইয়াছে। সুতরাং কোন কালে কাঠ যে কয়লার স্থান অধিকার করিতে পারিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

পুষ্পসার

পুষ্পসার বাহির করা একটী মিশ্র শিল্প। পুষ্পের ক্ষীণত্ব, গন্ধের দুর্ব্বলতা, স্ফুটনের দ্রুততা ও সার পাইবার জন্য অত্যধিক পুষ্পের আবশ্যকতাই এই শিল্পের কাঠিন্যের বিষয় প্রমাণ করিয়া থাকে। একই গাছের পুষ্পে ফুটিবার সময় অনুযায়ী গন্ধের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; গরম বাতাস ও অত্যধিক আলো ক্ষণিকের জন্য গন্ধের প্রখরতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়, এবং ইহাদের প্রভাব অধিককাল স্থায়ী হইলে, গন্ধ একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলে। প্রখর সূর্য্যতাপে চয়িত পুষ্প অত্যল্প মাত্রায় গন্ধ দান করিয়া থাকে, প্রত্যুষে চয়িত পুষ্প অধিক মাত্রায় গন্ধ দেয়। নিম্ন ও শুষ্ক ভূমি অপেক্ষা উচ্চ ও আর্দ্র ভূমিতে ইহার গন্ধ অতি সুমিষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে পুষ্পসার প্রস্তুত একটী মিশ্র শিল্পের অন্তর্গত; অনেক প্রস্তুতকারকের অল্পদর্শিতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অনেক গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে, উপযুক্ত সময়ে চয়িত ও উপযুক্ত স্থানে রোপিত পুষ্প হইতে অনেক গন্ধ পাওয়া যায়। বহুদর্শিতার অভাবে অনেক সময় পুষ্পচয়নের সময় স্থির করিতে পারে না, এই জন্যও অনেক গন্ধের লোকসান হয়।

ফ্রান্সের Maritime Alpsই পৃথিবীর পুষ্পের বাগান, এই স্থানের পুষ্পই ফরাসী সুগন্ধকে অবিবাদী শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছে, এবং এই স্থানকে সমস্ত বিদেশীয় পুষ্পসারের গোলাঘর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীস্থ পুষ্পের কেন্দ্রভূমির সুন্দর গ্রাম ও নগর কয়েক শতাব্দী যাবৎ এই আমোদজনক ও মন-প্রফুল্লকারী বাণিজ্যের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পুষ্পচয়নকারী স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাগণ অতি প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, ফুল গাছের উপর নত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের মিশ্র সঙ্গীত-ধ্বনি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, প্রফুল্লমনে পুষ্পচয়ন করিতে থাকে। ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা থাকিলে কখনও কখনও তাহাদিগকে শিঙ্গাধ্বনির দ্বারা রাত্রিতেও পুষ্পচয়নের জন্য আহ্বান করা হইয়া থাকে। অনেক স্থানে পুষ্পচয়নের কার্য্য ইটালিয়ানদের দ্বারা সম্পাদিত হয়, কারণ দেশস্থ লোক যথেষ্ট পাওয়া যায় না, প্রায় সমস্ত খন্দের সময় এই সমস্ত ঠিকা মজুর ভাড়া করিতে হয়। চয়িত পুষ্প ছালায় ভরিয়া গর্দ্দভপৃষ্ঠে কারখানায় আনা হইয়া থাকে, সেখানে ইহা বাছুনী স্ত্রীলোকদের নিকট দেওয়া হয়; এবং তাহারা ফুলগুলি বাছিয়া পাকা গৃহের ঠাণ্ডা মেঝের উপর রাখে। সেখান হইতে প্রস্তুতকারক এইগুলিকে সার বাহির করিবার জন্য লইয়া যায়।

প্রস্তুত করিবার বিবিধ প্রণালী বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বে, পুষ্পের গন্ধ কোথায় অবস্থান করে, এবং কোন কোন অবস্থায় মুক্ত হইয়া থাকে তাহা বলিবার প্রয়াস করা বোধহয় অসঙ্গত হইবে না। গন্ধ-তৈল পাপড়ির উপরিভাগস্থ কোষে (cells), বাহ্য অংশে, প্রধান প্রধান গ্রন্থিতে (gland) এবং ঐ যন্ত্রস্থ (organ)

ক্ষুদ্র আধারের মধ্যে অবস্থান করে। ইহা ঐ সকল স্থানে স্থির তৈল (fixed oils), resin, gum, এবং tanninএর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

প্রত্যেক কোষই (cell) কেবল মাত্র গন্ধতৈলের আধার নহে, ইহা নিজেই একটী গন্ধ প্রস্তুতের কারখানা। কখনও কখনও গন্ধতৈল সূক্ষ্ম বিন্দুর আকারে পাপড়ির মসৃণ চর্ম্মের উপরে একত্র হয়; আবার কখনও ইহা গন্ধ-বাষ্পাকারে মুক্ত হইতে থাকে; সেই জন্যই সাধারণতঃ দুই প্রকারের পুষ্প দেখা যায়। কোন কোন পুষ্পের গন্ধ বাষ্পীভূত হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত গাঢ় (condensed) অবস্থায় থাকে, এবং আবার কোন কোন পুষ্পে ইহা মুক্ত হইবার পূর্ব্বে কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র জন্মিয়া থাকে। এই প্রকারের প্রভেদ অতি সহজেই জানা যাইতে পারে। যদি কেহ গোলাপের একটি পাপড়ি অঙ্গুলী দ্বারা মর্দ্দন করেন তাহা হইলে তাঁহার হাতে গোলাপের অতি স্পষ্ট সুমিষ্ট গন্ধ বর্ত্তমান থাকিবে, কিন্তু যদি একটি যুঁইফুল ঐ প্রকারে মর্দ্দন করা যায় তাহা হইলে হাতে শাক মর্দ্দনের অপ্রিয় গন্ধ ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। সেই জন্যই প্রস্তুতের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী উত্থিত হইয়াছে। যে পুষ্প অতি সহজেই গন্ধ প্রদান করিয়া থাকে, তাহার সার চ্যবন দ্বারা বাহির করা হইয়া থাকে, আর যেগুলিকে কোমল ভাবে ব্যবহার করা দরকার ও যাহারা সহজে গন্ধ দেয় না, তাহাদের জন্য কোমল ও বহুসময়ব্যাপী প্রণালীর আবশ্যক হইয়া থাকে।—ইহা কোন প্রকার দ্রাবক দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়।

এখানে আবার আরেকটী অন্তরায় উপস্থিত হইয়া থাকে—resin, tannin ও অন্যান্য অশুদ্ধ পদার্থ হইতে মুক্ত করা। দ্রাবক সাধারণতঃ এই সমস্ত পদার্থকেও দ্রব করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে দ্রাবক অত্যন্ত শীঘ্র কার্য্যকারী হইলে, শীঘ্রই ফুলের জীবনী শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলে, সেই জন্যই গন্ধও অধিক মুক্ত হইতে পারে না। এই সমস্ত কারণে দ্রাবক গন্ধশূন্য উদাসীন এবং কেবল মাত্র গন্ধতৈলকেই মুক্ত করিবার ক্ষমতাপন্ন হওয়া আবশ্যক। এই প্রকারের দ্রাবক বহুকাল হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখনো আমরা তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট আছি।

অত্যন্ত পরিষ্কৃত চর্ব্বি এই দ্রাবকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সময় সময় পরিষ্কৃত জলপাই-তৈল ও অন্য কোনও প্রকারের গন্ধশূন্য তৈল এই কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে; অধিকাংশ স্থানেই চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চ্যবন (distillation) এবং solution এই দুইটাই সুগন্ধ প্রস্তুতের প্রধান উপায়; শেষোক্তটী যখন তরল চর্ব্বিতে করা হইয়া থাকে, তাহাকে মাসিরেষন (maceration) বলে, যখন জমাট চর্ব্বিতে করা হইয়া থাকে তাহাকে এনফ্লুরেজ (enfleurage) বলা হইয়া থাকে।

কেবল মাত্র দুই প্রকারের ফুলই চ্যবন সহ্য করিতে সমর্থ, গোলাপ ও কমলা ফুল। পঁচিশ গেলন জল ও একশত পঁচিশ পাউণ্ড পুষ্প চ্যবকের মধ্যে প্রদত্ত হইয়া উত্তপ্ত হইতে থাকে; উত্তাপ ঐ ফুলস্থিত গন্ধকে মুক্ত করিয়া ফেলে; এবং ঐ সমস্ত বাষ্প ঠাণ্ডা নলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া জমাট করা হইয়া থাকে এবং ঐ জমাট পদার্থ florence flask নামক পাত্রে রক্ষিত হয়। তারপর গুরুত্বই জল হইতে তৈলকে মুক্ত করিয়া ফেলে। চ্যবক ডবল তলা যুক্ত হইয়া থাকে। ইহা অগ্নিশিখা অথবা ষ্টিম্ (steam) দ্বারায় উত্তপ্ত করা হয়। গ্র্যাসিসীরা স্বভাব দ্বারা এতদূর অনুগৃহীত যে এই সমস্ত কার্য্যের জন্য উহাদিগকে কৃত্রিম উপায়ে জল সরবরাহ করিতে হয় না, উহারা পাহাড়ের ঝরণা হইতে জল ধরিয়া থাকে। এই জল ইহারা পাইপ দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রে আনয়ন করে, ইহাতে ইহাদের খরচ ও পরিশ্রমের অনেক সংক্ষেপ হইয়াছে।

ভায়লেট্, Cassia, Janquil, গোলাপ এবং কমলা পুষ্পের সার বাহির করিবার জন্য maceration প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে; Water bath stove-এ টিনের পাত্রে করিয়া চর্ব্বিগুলি গলান হয়, সে পাত্রকে bugadurs বলে। এ পাত্রে পুষ্পগুলি নিক্ষিপ্ত হইয়া ৬৫০ ডিগ্রি উত্তাপে স্পেটুলার (spetula) সাহায্যে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল নিমগ্ন রাখা হয়, অবশেষে ফুলগুলিকে পৃথক করা হইয়া থাকে, ও পুষ্প হইতে তৈলের শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত Hydraulic press দ্বারা পৃথক করা হয়। একবারের maceration ই গন্ধশূন্য চর্ব্বিকে সুগন্ধ করিতে সমর্থ হয় না, ইচ্ছানুযায়ী

গন্ধ না পাওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ এই প্রণালীর আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে এক পাউণ্ড চর্ব্বিকে এই প্রণালীতে সুগন্ধ করিতে পাঁচ পাউণ্ডেরও অধিক পুষ্পের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কোন কোন পুষ্পের জন্য পঁচিশ ত্রিশবারও ম্যাসিরেসন করিতে হয়।

Jasmine ও Tube rose পুষ্পের সারের জন্যই সাধারণতঃ Enfleurage প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রথমে ইহা ডবল প্লেটের ভিতর করা হইত যাহাকে tiames বলা হয়। এই tiames ১২ আউন্সের অধিক চর্ব্বি ধারণ করিতে পারিত না। এখন ইহা ৩ ইঞ্চি গভীর, ২৪ ইঞ্চি প্রশস্ত, ও ৩৮ ইঞ্চি লম্বা কাঁচের তলি যুক্ত কাঠের কাঠাম (Wooden frame) দ্বারায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই কাচের তলার উপরে প্রথমে এক স্তবক জমাট চর্ব্বি বিস্তৃত করিয়া তদুপরি পুষ্প বিস্তৃত হইয়া থাকে, তদুপরি আবার আর একটী ফ্রেম্ সজ্জিত হয়, তদুপরি চর্ব্বি আবার পুষ্প, আবার ফ্রেম্ আবার পুষ্প এই প্রকারে উপর্য্যুপরি চল্লিশটি ফ্রেম্ সজ্জিত হইয়া থাকে; ইহাতে বিস্তৃত চর্ব্বির উপর পুষ্প রক্ষিত হইয়া দুইটী ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ থাকে; ফ্রেম্‌গুলি এই প্রকারে প্রস্তুত যে ইহা পুষ্পকে চাপ দেয় না, ফ্রেমের ভিতরে একটু ফাঁক থাকে, কারণ চাপে পুষ্পের সমস্ত গন্ধ মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই ফুলের জীবন নষ্ট হইয়া যায়। ইচ্ছানুযায়ী সুফল না পাওয়া পর্য্যন্ত বাসি পুষ্পগুলি ফেলিয়া দিয়া প্রতিদিন সদ্যচয়িত পুষ্প সংযোগ করিতে হয়। কোন কোন স্থানে কাচের পরিবর্ত্তে লোহার জাল মোড়া ফ্রেমও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং সেই জালের উপরে চর্ব্বিসিক্ত পশম রক্ষিত হয়, তদুপরি পূর্ব্বের ন্যায় পুষ্প সজ্জিত হইয়া থাকে, অবশেষে চাপ দ্বারা পশম হইতে গন্ধসিক্ত চর্ব্বি বহিষ্কৃত করা হয়। এই প্রণালীতে গন্ধ বাহির করা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ হইলেও, ইহা দ্বারা অত্যন্ত বিশুদ্ধ গন্ধ পাওয়া যায়। ছোট কারখানায় এই প্রণালী অবলম্বন করা বিশেষ লাভজনক নহে।

এখন এই সমস্ত তৈলকে রুমালে ও শরীরে ব্যবহারের জন্য extract-এ পরিণত করা হইয়া থাকে। তৈল রুমালে ও পরিচ্ছদাদিতে ব্যবহার করিলে দাগ লাগিয়া যায়, সেজন্য ব্যবহার করা সুবিধাজনক নহে; পাশ্চাত্য জাতিগণ কখনও উহা এই অবস্থায় ব্যবহার করে না। প্রস্তুতকারকেরা রুমালে ও পরিচ্ছদাদিতে ব্যবহারের এসেন্সকে extract বলিয়া থাকে।

গন্ধতৈলকে extractএ পরিণত করিবার জন্য, গন্ধ-তৈলের সহিত (alcohol) সুরাসার মিশ্রিত করিয়া receptacleএর ভিতর আলোড়িত করা হইয়া থাকে; এইরূপ করাতে সমস্ত গন্ধ সুরাসারে দ্রব হইয়া যায়, অবশেষে decantation দ্বারা গন্ধযুক্ত সুরাসার ভিন্ন করা হইয়া থাকে।

গন্ধ-সার বাহির করিবার জন্য আর একটী প্রণালী অনেক স্থলে পরীক্ষিত হইতেছে, ইহা এখনো কার্য্যকরী হয় নাই। কোন দ্রাবক দ্বারা গন্ধপুষ্প কিম্বা গাছগাছড়া হইতে সুগন্ধ দ্রব করাই এই প্রণালীর মূল। এই প্রণালী দ্বারা এখনো অতি বিশুদ্ধ সুগন্ধ পাওয়া যাইতেছে না।

পুস্তক পাঠ করিয়া উপরোক্ত প্রণালীসমূহ অত্যন্ত সহজ বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু জল বায়ু আব হাওয়া শীত গ্রীষ্মের তারতম্য অনুসারে ইহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে ইহার কাঠিন্যের বিষয় বোধগম্য হয় না; পথে হাজার হাজার অন্তরায় উপস্থিত হইতে থাকে। বিশেষ বহুদর্শিতা না হইলে সে সমস্ত উত্তীর্ণ হওয়া বড় কঠিন। কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে, হাতে কলমে না করিলে পুস্তক পড়িয়া সে সমস্ত শিক্ষা হয় না।

অবশেষে Maritime Alpsএ উৎপন্ন বাৎসরিক পুষ্প-সংখ্যা ও তৈলের মূল্যাদি দিতেছি, বোধ হয় পাঠকের অপ্রীতিকর হইবে না।

৪,৪০০,০০০	পাউণ্ড	গোলাপ
৫,৫০০,০০০	„	কমলা পুষ্প
৪৪০,০০০	„	যূথিকা (Jasmines)
৩৩০,০০০	„	কাশিয়া পুষ্প (Cassia flowers)
৩৩০,০০০	„	টুবা রোজ্ (Tube roses)
৪৪০,০০০	„	ভায়লেট্ (Violet)

নিম্নলিখিত মূল্যে প্রতি পাউণ্ড পুষ্প বিক্রয় হইয়া থাকে।

ভায়লেট্ (Violet) ১।০ পাঁচসিকা।

টুবা রোজ্ (Tube rose) ১৲ এক টাকা।

কাসিয়া (Cassia) ১।০ পাঁচসিকা।

যূথিকা (Jasmine) ৷৷৵০ দশ আনা।

গোলাপ ... ৵০ আনা।

কমলা পুষ্প ... ।১০ সাড়ে চার আনা।

একটী ভায়লেট্ চারা ৫ আউন্স পুষ্প প্রদান করিতে সমর্থ, একটী কমলা বৃক্ষ আড়াই আউন্স দিতে সমর্থ। পুষ্পচয়কগণ সমস্ত ভোরে প্রতিজনে গড়ে ৪৪ পাউণ্ড গোলাপ, সাড়ে ছয় পাউণ্ড জেস্‌মিন্ এবং তের পাউণ্ড টুবা রোজ সংগ্রহ করিতে পারে; এবং সমস্ত দিনে বাইশ পাউণ্ড ভায়লেট্ ও কমলা পুষ্প সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

এক পাউণ্ড নিরোলি (neroli) প্রস্তুতের জন্য পাঁচ শত পাউণ্ডেরও অধিক কমলা পুষ্পের অর্থাৎ গড়ে প্রায় ১,২০০,০০০ পুষ্প আবশ্যক হইয়া থাকে এবং এক পাউণ্ড গোলাপের তৈল প্রস্তুতের জন্য ৮,০০০ পাউণ্ড গোলাপের আবশ্যক হইয়া থাকে, অথবা ৫,০০০,০০০ পুষ্প।

Maritime Alpsএ প্রতি বৎসর ১,০০০,০০০ পাউণ্ড গন্ধ তৈল ও ১,০০০,০০০ গেলন সুগন্ধ জল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশস্থ কোন্ ফুলের সার কোন্ প্রণালীতে বাহির করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই।

শ্রীনিরুপম চন্দ্র গুহ।

"বাঙ্গালা ন্যাসনালিটি"

(NATIONALITY)

শূরবংশীয় রাজাদের পর আবার বৌদ্ধধর্ম্ম ও তাহার সহিত অতি নকট সম্পর্কিত তান্ত্রিকধর্ম্ম এদেশকে গ্রাস করিবার আয়োজন করিল। এদিকে দাক্ষিণাত্য হইতে আগত সেন রাজগণ গঙ্গাতীরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া বসিলেন। তাঁহারা শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের সহিত উড়িষ্যা দেশ হইতে বৈদিকক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশে আসিলেন। ইঁহারা এখনকার দাক্ষিণাত্য বৈদিক। পশ্চিম হইতে যে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আসিয়া বাস করিলেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু আমরা এখন জানিতে পারি যে, উড়িষ্যা দেশে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যে স্থান হইতে উড়িষ্যায় যান, বাঙ্গালাদেশের পাশ্চাত্য বৈদিকেরাও সেইস্থান হইতে আসিয়াছেন। একদল উড়িষ্যা দেশ ঘুরিয়া এখানে আসিয়াছেন, আর একদল বরাবর সোজা এখানে আসিয়াছেন। এখানেও Fiction উপস্থিত হইয়া দুইটী স্বতন্ত্র জাতি গঠন করিয়াছে।

আর অধিক উদাহরণ দেওয়ার আবশ্যক মনে হয় না। আপনারা এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, প্রথমে আর্য্যেরা যখন এদেশে আগমন করেন, তখন তাঁহারা অনার্য্যদের ঘৃণা করিতেন, তাঁহাদের pride of blood জন্য তাঁহারা ইহাদের সহিত স্বতন্ত্র থাকিবার চেষ্টা করিতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের Idea of ceremonial purityও তাঁহাদের স্বতন্ত্র রাখিত। অনার্য্যদের স্পর্শেও তাঁহাদের জাতিভ্রষ্ট হইতে হইত। কিন্তু এই অনার্য্যদের কন্যা গ্রহণ বন্ধ হয় নাই। কাজেই মিশ্র জাতির উৎপত্তি হইতে লাগিল। স্থানভেদে বাস ও ব্যবসায় ভেদের জন্য জাতি বিভিন্নতাও আরম্ভ হইল। অপরদিকে অনার্য্য জাতি সকল আর্য্যদিগের ভাষা, আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া এবং ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া হিন্দুসমাজের প্রসারতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ক্রমে সমাজের নানা শ্রেণীর লোক দেখা যাইতে লাগিল। এই নানা শ্রেণীর লোকের উৎপত্তি স্থির করিবার জন্য fiction উপস্থিত হইল। ইহারা যখন সকলে স্বতন্ত্র, ইহাদের উৎপত্তিও স্বতন্ত্র। Fiction জাতিভেদ পাকা করিয়া দিল। ক্রমে ইহা আমাদের সমাজের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিল। একদেশে বাস ও এক ভাষায় কথা কহিয়াও আমরা কেবল, পরস্পর হইতে স্বতন্ত্রই হইতেছি —আমাদের পার্থক্য বাড়িয়াই যাইতেছে।

এইজন্য বলিতে হইতেছে যে আমরা বাঙ্গালাদেশে বাস করিয়া ও সকলে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিয়াও কিন্তু

বাঙ্গালী nation হইতে পারিতেছি না। এক ভাষায় কথা কহিলেও আমি দেখিয়াছি যে, আমাদের ধমনীতে আর্য্য, দ্রাবিড়ীয়, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি নানা শ্রেণীর রক্ত চলিতেছে। জাতিভেদ প্রথা এরূপ প্রবল থাকায় সকল শ্রেণী মিশিয়া আমরা এক nationএ পরিগণিত হইতে পারিতেছি না। এখন আমাদের সভাসমিতি হইতেছে। শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে, রেল, ষ্টীমার, ডাক, telegram প্রভৃতির সুবিধা হওয়াতে আমরা এখন কতক পরিমাণে দেশের common interestএর বিষয়গুলি আলোচনা করিবার সুবিধা পাইতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহার কিছুই ছিল না। তখন ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও কথা জানিতেন না, কায়স্থেরা স্বজাতির কথা ভিন্ন অন্য কিছুই জানিতেন না। আমাদের সব interests were confined to one's own caste, এইজন্য জাতিভেদের আর একটী বিষময় ফল ফলিয়াছে। আমাদের দেশের অধোগতির পথ আরও প্রশস্ত হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মনে করিতেন, রাজকার্য্য ও দেশরক্ষা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। সেই ক্ষত্রিয় জাতির অর্থাৎ রাজাদের যখন অধোগতি হইল, তখন অন্য কোন জাতি ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নিজেদের কার্য্য মনে করেন নাই। তাঁহাদের নিজেদের জাতিগত ব্যবসায় লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। এক রাজা গিয়া অন্য রাজা আসিলেন—সমাজের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। ব্রাহ্মণেতর সব জাতিতেই রাজাকে কর দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া, যে রাজা হইলেন—তাঁহাকেই কর দিতে লাগিলেন। রাজা আর্য্য হউন বা অনার্য্য হউন, হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, বা খ্রীষ্টান হউন, সমাজের তাহাতে কিছু আসিয়া গেল না। আমরা ত nation নহি, আমরা এক একটা জাতির (caste) অন্তর্গত। আমাদের জাতীয় ব্যবসায় আছে। তাহার কোন বিঘ্ন না হইলেই হইল। আমাদের National interest কিছুই ছিল না। সমস্ত জাতির জন্য সে জন্য ভাবনাও ছিল না। শিবাজী এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন—এইজন্য তিনি হিন্দুসমাজের আর কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া এই মহামন্ত্র প্রচার করিলেন যে, "ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয় হউন, বৈশ্য হউন, শূদ্র হউন, সকলেই মাতৃভূমির নিকট ঋণী। দেশের জন্য খাটা, দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া সকলের common interest," এই ভাবটী মহারাষ্ট্রী জাতিকে ভাল করিয়া ধরিল। একটী মহারাষ্ট্রী nationality গঠনের আরম্ভ হইল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সেই পুরাতন জাতিভেদ তাঁহার মৃত্যুর পর প্রবল হইয়া আবার ঐ nationality গঠনের পথে দাঁড়াইল। পঞ্জাবেও এইরূপ ঘটিয়াছিল। Sir D. Ibbetson তাঁহার Census Report of the Punjab, 1881, পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, শিখদের দশম গুরু,

Guru Gobinda "at first lived in retirement, then preached *khalsa*, 'the pure, the elect, the liberated', openly attacked all distinctions of caste, instituted a ceremony of initiation, he proclaimed it as a *pahul* or gate by which all might enter the society, he gave *parshad*, or communion (four castes should eat out of one dish), he taught the Brahman's thread must be broken. These he inspired with military ardour, with the hope of social freedom, and of national independence and with the abhorrence of the hated Mahomedan.

"Thus for the second time in history, a religion became a political power and for the first time in India, a nation arose embracing all races and all classes and grades of society, and banded together in the face of a foreign foe. The Maharatta and the Sikhs would appear to afford the only two instances of really national movements in India."

কি কি কারণে শিখদেরও অবনতি হইল, তাহা আলোচনা করার স্থান এখন নয় বলিয়া আর ইহার উল্লেখ করিলাম না। জাতিভেদের কথা আলোচনা করিয়া আমরা ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের এই প্রথার পরিবর্ত্তন না হইলে আমরা একটা nation হইতে পারিব না। আমাদের ভাষা এক হইলে আমাদের nationalityর ভাব বদ্ধমূল হওয়া একটী প্রধান সহায় বটে, কিন্তু জাতিভেদ না গেলে এক হওয়ার আশা কম। মনে করুন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক সভায় বসিয়া বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সহিত দেশের কোন হিতকর কাজ করা স্থির করিলেন। কিন্তু সভা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া যখন বাড়ীতে পৌছিলেন, তখন তিনি "ব্রাহ্মণ", আহার, ব্যবহার, পুত্রকন্যার বিবাহ প্রভৃতি

সে সব কার্য্য তাঁহার সম্পূর্ণ আপনার, আর তাহার সহিত ভূপেন্দ্র বাবুর সহিত কোন সম্পর্ক নাই। বাহিরের কাজে সম্পর্ক আছে বটে কিন্তু যাহাতে পরস্পরকে আত্মীয় করে, তাহাতে কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই। এইজন্য ১৮৮৯ সালে Sir Comer Petheram, late Chief Justice of Bengal বলিয়াছেন যে,—

"Above all, it should be borne in mind by those who aspire to lead the people of this country into the untried regions of political life, that all the recognized nations of the world have been produced by the freest possible intermingling and fusing of the different race stocks inhabiting a common territory. The horde, the tribe, the caste, the clan, all the smaller separate and often warring groups characteristic of the earlier stages of civilisation must, it would seem, be welded together by a process of unrestricted crossing before a nation can be produced. Can we suppose that Germany would ever have arrived at her present greatness or would indeed have come to be a nation at all, if the numerous tribes mentioned by Tacitus, or the three hundred petty kingdoms of the last century, had been stereotyped and their social fusion rendered impossible by a system forbidding intermarriage between the members of different tribes or the inhabitants of different jurisdictions? If the tribe in Germany had, as in India, developed into the caste, would German unity ever had been heard of? Everywhere in history we see the same contest going forward between the earlier, the more barbarous instinct of separation, and the modern civilizing tendency towards unity, but we can point in no instance where the former principle, the principle of disunion and isolation, has succeeded in producing anything resembling a nation. History, it may be said, abounds in surprises, but I do not believe that what has happened nowhere else is likely to happen in India in the present generation."

ঠিক এইপ্রকার মত Risley সাহেবও তাঁহার পুস্তকে (The People of India) লিখিয়াছেন—

"So long as the regime of caste persists, it is difficult to see how the sentiment of unity and solidarity can penetrate and inspire all classes of the community, from the highest to the lowest, in the manner that it has done in Japan where, if true caste ever existed, restrictions on intermarriage have long ago disappeared."

আমরা বাঙ্গালা দেশের Ethnology আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, আমাদের nation হইবার পক্ষে জাতিভেদ একটী প্রধান বিঘ্ন। সামাজিক আচার ব্যবহার (social custom) এখন পর্য্যন্তও এক হইবার পক্ষে আমাদের সহায় হয় নাই। Railway, Steamer প্রভৃতির সাহায্যে বাঙ্গালা দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাওয়া আসা সহজ হওয়ায়, আমরা এখন নানা কার্য্যে বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইতেছি ও নানা স্থানের লোকের সহিত মিশিতেছি, তাহাতে আমাদের আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন আমাদের জাতীয় জীবন গঠন কার্য্যে সুবিধা করিয়া দিতেছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণী হিন্দু ও নিম্নশ্রেণী হিন্দু এবং এদেশবাসী মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহার এত বিভিন্ন রহিয়াছে যে, তাহাতে আমরা একবারও মনে করিতে পারি না যে, আমরা শীঘ্র সকলে একভাবাপন্ন হইব। তবে ক্রমে যতই বাঙ্গালা দেশের নানা প্রকারের আচার ব্যবহার এক হইয়া যাইবে, ততই আমাদের nationality গড়িবার পক্ষে তাহা সাহায্য করিবে।

এখন ইতিহাসের কথা উঠিতেছে। আমাদের ইতিহাসও আমাদের সহায় না হইয়া বরং আমাদের এক হইবার পথের বিঘ্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল হিন্দু মুসলমানের সংগ্রাম ভিন্ন আর অধিক কিছুই নয়। তাহা দ্বারা এদেশে হিন্দু মুসলমান এক হইবার পক্ষে কোন সাহায্য হইবে না। আমাদের কোন কোন বন্ধু "প্রতাপাদিত্য" উৎসব প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া দেশের অকল্যাণ ভিন্ন কোন উপকার করেন না, আমার বিশ্বাস। ইহাদের এই কার্য্যটীর বিশেষ আলোচনা করা আবশ্যক।

শেষ আর এক কথার আলোচনা করিয়া আমার এই প্রবন্ধ শেষ করিব। তাহা এই—কোন দেশে সকলে এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে সেই ধর্ম্মভাব nation গড়ার পক্ষে খুব সাহায্যকারী হয়। আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা এইরূপ দেখা যায়—হিন্দু পশ্চিম বাঙ্গালায় ৩৯২ লক্ষ, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ১১৩ লক্ষ, মোট হিন্দু ৫ কোটী ৫ লক্ষ। মুসলমান পশ্চিম বাঙ্গালায়

৯০ লক্ষ, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ১৭৮ লক্ষ, মোট ২ কোটী ৬৮ লক্ষ। খ্রীষ্টান প্রায় আড়াই লক্ষ, বৌদ্ধ প্রায় পৌনে দুই লক্ষ। খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধদের কথা ছাড়িয়া দিয়া হিন্দু ও মুসলমানদের কথা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, তিন ভাগের ১ ভাগ মুসলমান ও ২ ভাগ হিন্দু। এই দুইটী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের আদর্শ একেবারে এমন স্বতন্ত্র যে, কখনও যে ইহারা এক হইতে পারিবে, তাহা সহজে কল্পনাও করা যায় না। অথচ এই দুই ধর্ম্মাবলম্বী লোক এক বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেছেন—ইহাঁদের উৎপত্তি প্রায় এক। ইহারা জাতীয় উন্নতির পথে কিন্তু একমত হইতে পারিতেছেন না। মুসলমানেরা যে হিন্দু হইবে না তাহা ত আমরা ভাল করিয়া জানি। তবে সব হিন্দুও যে মুসলমান হইয়া এক জাতিতে পরিগণিত হইবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই। পৃথিবীর অন্য অন্য স্থানে দেখা গিয়াছে যে, যেখানে মুসলমান রাজা হইয়াছে, সেখানে দেশের সাধারণ লোক ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভারতবর্ষে কেবল তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল দুইটী স্থানে মুসলমান ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখা যায়। প্রথম মালবর উপকূলে, দ্বিতীয় পূর্ব্ব বাঙ্গালায়। মালবর উপকূলে আরবেরা ব্যবসায় করিতে আসিয়া বসতি করিয়াছে এই জন্য সেখানে মুসলমানধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় কেন মুসলমানধর্ম্ম এত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন কারণ দর্শিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন যে, ঐ প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সেন রাজাদের সময় হইতে আবার যখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হইল, তখন তাঁহাদিগকে সমাজে অতি নিম্ন স্থান দেওয়া হইল। এই সময়ে মুসলমান রাজাদের প্রতাপ সংস্থাপিত হওয়ায় তাঁহারা উচ্চশ্রেণী হিন্দুদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের Bengal Census Reportএ Beverley সাহেব লেখেন যে, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় অনার্য্য জাতির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। হিন্দুরা ইহাদের কোন দিন মাথা তুলিতে দেন নাই। এখনও যাহারা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তাহারা অস্পৃশ্য নমঃশূদ্র বা চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণিত হইতেছে। কাজেই যখন পূর্ব্ব বাঙ্গালায় মুসলমান রাজার প্রতাপ বাড়িল, তখনই ইহারা দলে দলে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এখনও সেইরূপ মান্দ্রাজ প্রদেশে ব্রাহ্মণদের কঠোর শাসনে নিম্নশ্রেণীর Pariah জাতির লোকেরা হাজারে হাজারে খ্রীষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। Lyall সাহেব তাঁহার Asiatic Studies নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, পাঠান ও মোগলেরা এদেশ জয় করিয়া বসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা নিজেরাই তেমন বিশ্বাসী মুসলমান ছিল না; কাজেই সেই ধর্ম্ম প্রচারে তাহাদের তেমন উৎসাহ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তাহারা এদেশে আসিয়া দেশ জয় করিয়া কেবল নিজেদের সুখ সুবিধার কথা ভাবিয়াছিল, দেশ শাসনের ভার এদেশের লোকের উপর দিয়া নিজেরা কেবল আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়াছিল। দেশের অবস্থার কথা আলোচনা করার তাহাদের সময়ও ছিল না। কাজেই তাহারা মুসলমানধর্ম্ম প্রচারের জন্য ব্যস্ত হয় নাই। কেবল পূর্ব্ব বাঙ্গালার নবাবেরা সাহা জালাল (Shah Jalal), বাবা আদম (Baba Adam) প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকের ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে দেখা যায়; এই জন্য পূর্ব্ব বাঙ্গালায় মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এখন আর মুসলমানধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা নাই এবং সমস্ত দেশ যে আর মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তাহার আশাও নাই। খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করেন যে, একদিন সমস্ত পৃথিবী খ্রীষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। ইহা একটা ধর্ম্মবিশ্বাস মাত্র, কাজের কথা নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম একদিন এদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু যে কারণে তাহার লোপ হইয়াছে, তাহার আলোচনা না করিয়া ইহা আমরা বলিতে পারি যে, বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরায় দেশকে গ্রাস করিতে পারিতেছে না। Lyall সাহেব তাঁহার Asiatic Studies নামক পুস্তকে খ্রীষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত ভারতবর্ষের একমাত্র ধর্ম্ম হইতে পারে কি না আলোচনা করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই :—

"Seventeen centuries ago the outcome and conclusion of all these things in Europe and Asia Minor was Christianity, which absorbed all the nations of the

Empire as they insensibly melted away into the Roman name and people......... But history does not repeat itself on so vast a scale; the seasons and the intellectual condition of the modern world are unfavourable to religious flood-tides; it is incredible that Islam or Buddhism should ever again invade or occupy a great and highly civilized country, and the mind of Europe is turning to other things more exciting in these days than religious proselytism. It may be even doubted whether Brahmanism has to fear destruction at the hands of the three great missionary religions though it is quite possible that more difficult and dangerous experiences than wholsale religious conversion are before India."

আমরা সকলে যদি কোন এক ধর্ম্মাবলম্বী না হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের এক nation হইবার পক্ষে একটা প্রধান অন্তরায় উপস্থিত দেখিতেছি। এই দেশে এত প্রকার ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক থাকায় আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাব কত বেশী, তাহা ভাল করিয়া আমরা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি। দেশের সকলে এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে nationality গঠনের সাহায্য হয়, ইহা ঠিক; তবে ধর্ম্মমত বিভিন্ন হইলেও যে এক nation হওয়া যায়, এইরূপ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় কিছু কিছু দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ যে সহজে ঘটিবে, তাহার আশা কম। Sir Henry Cotton তাঁহার New India পুস্তকে লিখিয়াছেন যে :—

"It is impossible to be blind to the general character of the relations between Hindus and Muhammadans; to the jealousy which exists and manifests itself so frequently, even under British Rule, in local outbursts of popular fanaticism; to the kine-killing riots and to the religious friction which occasionally accompanies the celebration of the Ram Lila or the Bakr-Id or the Muharram."

Sir Theodore Morison, যিনি অনেক দিন আলিগড়-কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি শিক্ষিত মুসলমানদের সহিত ভাল করিয়া মিশিয়াছেন। তিনিও লিখিতেছেন যে,—

"The possibility of fusion with the Hindus and the creation by this fusion of an Indian nationality, does not commend itself to Muhammadan sentiment. The idea has been brought forward only to be flouted; the pride of Muhammadans revolts at such a sacrifice of their individuality."

একথা অতি ঠিক যে, যতদিন হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন—তাঁহার আচার ব্যবহারের স্বতন্ত্রতা দেখিয়া তাঁহাকে বিদেশীয় ও নিকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী মনে করিবেন, এবং অপর দিকে মুসলমানও হিন্দুকে কাফের মনে করিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিবেন, হিন্দুকে দেবদেবীর উপাসক বলিয়া তাঁহার প্রতিমা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিবেন, যতদিন হিন্দু মুসলমানের গোবধে আপত্তি করিবেন—অপরদিকে মুসলমানও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর শূকর বধে আপত্তি করিবেন, ততদিন—passions of religious animosity will overpower the weaker sentiment of common nationality.

তবে কি আমাদের nationality গঠনের কোন আশা নাই? একথা আমি বলিতেছি না। হিন্দুদের অনেক পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে, নতুবা তাঁহারা মুসলমানদের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন না। শিক্ষার প্রভাবে মুসলমানেরা যে পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত মিলিতে পারেন, তাহা আমরা New Turkeyর অবস্থা দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি। আমাদের দেশে শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে ইহা ঠিক এবং এই উভয় দলেরই এক হইবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে তাহাও সত্য, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন এত অল্প ও এত ধীরে ধীরে উভয় সমাজে কার্য্য করিতেছে যে, আমরা সহজে বুঝিতে পারি না যে, কত দিনে দুই দল এক হইয়া এক nationএ পরিণত হইবে।

এক দিকে না মিশিলে আমরা nation গড়িতে পারিব না—তাহা বুঝিতেছি, অপর দিকে ইহাও বুঝি যে, সহস্র সহস্র বৎসরের সামাজিক ও ধর্ম্মভাবের পরিবর্ত্তনও বড় সহজ নয়। শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আমরা কিছু কিছু বুঝিতেছি, কিন্তু আমাদের যাহা করিলে ভাল হয়, তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না। এই জন্য একটা ভয়ানক অশান্তির মধ্যে আমরা পড়িয়াছি—এই অবস্থার মতন কথা De Tocqueville তাঁহার Democracy in America নামক পুস্তকে অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন :—

"But epochs sometimes occur, in the course of the existence of a nation, at which the ancient customs of a people are changed, religious belief disturbed, and the spell of tradition broken; while the diffusion of knowledge is yet imperfect and the civil rights of the community are ill secured or confined within very narrow limits. The country then assumes a dim and dubious shape in the eyes of the citizens; they no longer behold it in the soil which they inhabit, for that soil is to them a dull inanimate clod; nor in the usages of their forefathers, which they have been taught to look upon as a debasing yoke; nor in religion for of that they doubt; nor in the laws which do not originate in their own authority. They entrench themselves within the dull precincts of a narrow egotism. They are emancipated from prejudice, without having acknowledged the empire of reason; they are animated neither by instinctiv patriotism nor by thinking patriotism but they have stopped half way between the two in the midst of confusion and distress."

ইংরাজী শিক্ষার অভাবে ও ধর্ম্ম বিশ্বাস খুব কঠোর বলিয়া মুসলমানদের অবস্থা কিছু স্বতন্ত্র—তাঁহারা এইরূপ অশান্তির মধ্যে বাস করিতেছেন না।

জাতিভেদ, ধর্ম্মের পার্থক্য ও বিভিন্ন প্রকারের আচার ব্যবহার আমাদের nationality গঠনের অন্তরায় তাহা আমরা বুঝিয়াছি। পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন অবস্থার লোকের সহিত যত আমরা মিশিব আমাদের আচার ব্যবহার ততই এক প্রকার হইয়া যাইবে, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা যতই পরস্পরের ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান ও উদারতা দেখাইবেন, ততই আমরা ধর্ম্ম বিশ্বাসের পার্থক্য সত্ত্বেও আমাদের common interest সম্বন্ধে সকলে একমত হইতে পারিব ও জাতীয় জীবন গঠনে কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। অধিকন্তু যতদিন বংশগত জাতিভেদ এদেশ হইতে লোপ না পাইবে, ততদিন আমরা একটী nationই হইতে পারিব না। ততদিন এদেশের উন্নতির পথও ভাল করিয়া খুলিবে না। এদেশের Ethnology পাঠ করিতে করিতে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। আমার ধারণা আপনাদের নিকট সংক্ষেপে উপস্থিত করিলাম। আমরা সকলে এই সভায় বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য সম্মিলিত হইয়াছি—এই ভাষা আমাদের Idea of Nationility গঠনে যে সাহায্য করে, তাহাও আমরা বুঝিতেছি। কিন্তু তাহার ভিতরও যে গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত, আমি তাহার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমার বিশ্বাস মত আমি এই বিষয়টী আপনাদের বিচারার্থ উপস্থিত করিলাম। আপনারা সকলে যে আমার মতে মত দিবেন, তাহা আমি আশা করি না। তবে যদি আমার মত ঠিক কি না, তাহা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইল মনে করিব। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, অন্তরায়গুলির কথা উল্লেখ করা হইল, কি উপায়ে সেগুলি দূরীভূত হয়, তাহারও উল্লেখ করা উচিত ছিল। আমার মনে হয়, এই প্রশ্নের আলোচনা করা এই সভার উদ্দেশ্য নয়, এই জন্য আমি সে বিষয়েব আলোচনা করিলাম না। তবে নিরাশ হৃদয়ে এই প্রশ্ন আপনাদের নিকট উপস্থিত করি নাই। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি সে দিন আসিতেছে যখন আমরা আর ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই থাকিব না।

(সমাপ্ত)

শ্রীশশিভূষণ বসু।

জাবন্ত আগ্নেয়গিরি*

.. ...Strange, rumbling, hoarse and distant sounds might be heard, while ever and anon, with a loud and grating noise which, to use a homely but faithful simile, seemed to resemble the grinding of steel upon wheels, volumes of streaming and dark smoke issued forth, and rushed spirally along the cavern.

Lytton's, 'The Last Days of Pompeii.'

তখন আমরা সন্ধ্যাভোজনে ব্যস্ত। সন্ধ্যার আকাশে কিছুক্ষণ থেকে মেঘ জমা হচ্ছিল, অবশেষে মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হল। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের কড়্‌কড়ানি ও বাতাসের হা-হুতাশ মিশে চারিদিকের পাহাড়ে একটা বিকট প্রতিধ্বনি জাগিয়ে দিলে। মেঘ ও বৃষ্টি আমাদের সকলের মনেই একটা অজানা বিষাদের সৃষ্টি করলে।

* ১৯০৮ সালের নভেম্বর সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিউ'এ মৎলিখিত "Karuizawa,—The Ideal Summer Resort in Japan"—শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ুন।

আমি কিন্তু নির্ব্বাক হয়ে বজ্রের ডাক ও বৃষ্টির ঝাপটের মাঝ থেকে, সাগরপারে স্বদেশের একখানি বর্ষাসন্ধ্যার ছবি মনে মনে এঁকে তুলে'ছিলাম, তাই উপস্থিত বিষাদের মধ্যেও হর্ষের সন্ধান খুঁজে পাচ্ছিলাম।

কথাটা একটু খুলে বলা ভাল। গ্রীষ্মাবকাশে তকিও সহর ছেড়ে 'কারুইজাওয়া'তে এসেছিলাম। স্থানটি সমুদ্র হতে ৩২৭০ ফুট উচ্চে অবস্থিত, বাতাসটা খুব শুষ্ক ও ঠাণ্ডা। তাই গ্রীষ্মারম্ভ হলেই নানা দিক থেকে বিদেশীয়েরা এসে উপস্থিত হন। বস্তুত, এখানে জাপানী অপেক্ষা য়ুরোপীয়ানই বেশী আমদানী হয়। পথে ঘাটে যেখানে সেখানে য়ুরোপীয়ানদের গা ঘেঁষে চলতে হয়, তাই সহসা এখানে এসে য়ুরোপের কোন গ্রামে এসেছি বলে ভ্রম হয়। এ স্থানটির চারিদিকেই পাহাড়, ও পাখীর গানে, প্রস্রবণের মৃদুতানে সর্ব্বদা মুখরিত। যে দিন চারিদিক পরিষ্কার থাকে, পাহাড়ের মাথায় মেঘ বা কুয়াসা টুপির মত না বসে থাকে, সেদিন দূরে 'আসামা' আগ্নেয়গিরির ধূমান্বিত মস্তক বেশ দেখা যায়। এ পাহাড়টি সমুদ্র হতে ৮,১৩৪ ফুট উঁচু, সব সময়েই ধূম নির্গত হচ্ছে। অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণ কিরণ যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন শ্বেত-নীল-পীত-লোহিত রঙ্গের একটা বর্ণচিত্রের মাধুরী দর্শককে কোন এক অজানা দেশে নিয়ে যায়। জগতের সব ঝঞ্ঝাবাত ভুলে গিয়ে মনটা তখন বাতাসের গান, পাখীর কলরব, মেঘের বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্যে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে নিতান্তই উন্মুখ হয়ে ওঠে।

সে দিন ঠিক হয়েছিল আমরা জন চার মিলে আগ্নেয়-গিরির খাত দেখ্‌তে যাব। কারুইজাওয়া থেকে প্রায় ছয় ঘণ্টার রাস্তা, অর্দ্ধেক পথ ঘোড়ায় ও শেষার্দ্ধ পদব্রজে যেতে হয়। সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া করে রওয়ানা হবার ইচ্ছা ছিল, তাই সন্ধ্যায় আকাশ ভেঙ্গে যখন বৃষ্টি নাম্‌ল, তখন প্রকৃতিদেবীর বিপক্ষতা দেখে সকলেই ভগ্নমনোরথ হলেন। মধ্যে মধ্যে টেবিলের উপর থেকে জানালার দিকে সকলেই দৃষ্টিনিক্ষেপ কচ্ছিলেন ও মনটাকে কথঞ্চিত নিশ্চিন্ত করবার জন্য বোধ হয় মনে মনে বলছিলেন,—'এ পাহাড়ে মেঘ, শীঘ্রই কেটে যাবে।' মিস্ ট—আমার পাশে বসেছিলেন; হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, —'Are you a weather-prophet? Do you think 'twould clear up?—আপনি কি আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন? পরিষ্কার হয়ে যাবে মনে করেন নাকি?' মেঘ তখনো চারিদিকে ভেসে বেড়াচ্ছিল, বৃষ্টি থামবার ত কোন উপক্রম দেখলাম না। তবুও সাহসে ভর করে বলে দিলাম,—Guess 'tis going to clear up right now,—'আমার মনে হচ্ছে এখনই পরিষ্কার হয়ে যাবে।' সত্য সত্যই আমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল। দু' একটা করে তারা দেখা দিতে লাগ্‌ল, দেখতে দেখতে চাঁদও বাহিরে এলেন ও বৃষ্টিধৌতা প্রকৃতিদেবী জ্যোৎস্নালিঙ্গনে বিভোর হয়ে উঠ্‌লেন।

রাত্রি প্রায় ৯॥০টার সময় কুলির স্কন্ধে আমাদের জলখাবার, একখানা কম্বল ও পর্ব্বতারোহণের জন্য খড়ের জুতা উঠিয়ে দিয়ে রওয়ানা হলাম। আমাদের দলে সর্ব্বসমেত নয় জন। মিঃ ও মিসেস গ, মিস ট—, ও আমি; তা' ছাড়া তিনটা ঘোড়ার তিন জন সহিস ও দুই জন কুলি বা পথপ্রদর্শক। মহিলা দুইজনের জন্য দুইটা ঘোড়া, ও আর একটা মিঃ গ ও আমি পনের মিনিট করে চড়্‌ব স্থির হয়েছিল। প্রথমেই বলে রাখা ভাল ঘোড়াগুলো বড়ই আহাম্মক ধরণের, দৌড়িবার ত নামই করে না অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে বিনা কারণে দাঁড়িয়ে যায়, তখন চালান দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আমরা ঘোড়ার উপর চড়ে খালি লাগাম ধরে রইলাম, আর আগে আগে জাপানী ছোকরারা ঘোড়ার মুখে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। ঘোড়ার পিঠের উপর বসে থাকা ভিন্ন ঘোড়ার সঙ্গে আমাদের যে আর কোন সম্বন্ধ ছিল তা বোধ হচ্ছিল না। অন্য সময় হলে এরূপে ঘোড়ায় চড়ায় আপত্তি করতাম, কিন্তু যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ,—সকলেই এইরূপে যায় তাই লজ্জার কোন কারণ ছিল না।

মাঠের মাঝ দিয়ে অনতিপ্রশস্ত রাস্তা ধরে যেতে লাগ-লাম। দুধারে নানা রকম ফুল ফুটে চাঁদের অস্পষ্ট আলোকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। একটা মৃদু শীতল বাতাস উঠে আমাদের সকলের গায়ে যেন হাত বুলাতে লাগ্‌ল। দু'

চারটে ঝিঁঝিঁ পোকা রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করবার জন্য তাদের ক্ষুদ্র শক্তি সত্ত্বেও যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল। মিসেস গ—সকলের আগে যাচ্ছিলেন, তিনি ত আনন্দে গান ধরে দিলেন। একে নবীন বয়স, তাতে সম্প্রতি বিবাহ হয়েছে, তার উপর এত চাঁদের আলো, সঙ্গে আবার প্রিয়তম! এতেও গান গাবেন না ত কখন গাবেন! কবি যথার্থই বলেছেন—অমন অবস্থায় পড়লে—!

আমি ছিলাম সকলের পিছনে। সেখান হ'তে স্তব্ধ হয়ে জ্যোৎস্নার নির্ব্বাক মুখরতা উপভোগ করতে লাগলুম। ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়ে গেলাম, বসতি বিরল হয়ে এল। এখন কেবল মাঝে মাঝে ঝরণা; দু চারটে পাখী ঘোড়ার পায়ের শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে একটু ডাকাডাকি করে আবার বুদ্ধিমানের মত ঘুমিয়ে পড়্‌ল। আমাদের চখে ঘুম ছিল না, অন্তত আমার চখে ত নয়। কতক্ষণে পৌঁছিব, এই চিন্তাই আমার মন অধিকার করে বসেছিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রে একটা সরু রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ এসে ঘোড়াগুলো থেমে গেল। কুলিরা বল্‌লে সেখানেই নেমে পদব্রজে যাত্রা করতে হবে। একটা ঝোপের মধ্যে একটুখানি পরিষ্কৃত জায়গা, সেখানে আর কতকগুলা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে দেখ্‌লুম। আমাদের অগ্রবর্ত্তী একদল ইংরাজ রমণী ও পুরুষ এই ঘোড়াতে এসেছিলেন। আমরা যখন পৌঁছিলাম, তাঁরা তখন গাছতলায় জলযোগ কচ্ছেন। আমরাও তাঁদের সুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অনতিদূরে কম্বল বিছিয়ে, খাবারের ঝুড়ি নিয়ে বসে গেলাম। সেই অবসরে কুলিরা আমাদের জুতার তলায় খড়ের আবরণ পরিয়ে দিলে। খাবার সময় অনুচ্চস্বরে ঠিক করা গেল, ঐ ইংরাজদলের অগ্রেই যাত্রা করা যাক্‌। আমি ত খুব রাজি, শুভস্য শীঘ্রং। আমাদের দলের রমণীদ্বয় আগে যাবার আর একটা কারণ দেখালেন, সেটা হচ্ছে এই:—অদূরে গাছতলায় ইংরাজ পুরুষেরা মুখে মোটা পাইপ্‌ লাগিয়ে ধূমপান করছিলেন। ধূমনির্গমের পরিমাণ দেখে তাঁরা যে ধূমপানটা উপভোগ কচ্ছেন তাতে আর কোন সন্দেহ ছিল না। তা দেখে মিসেস গ—ও মিস্‌ ট—বলে উঠ্‌লেন, 'ওরা যে আমাদের আগে ধূমপান করতে করতে যাবে ও ধূমগুলা পশ্চাদ্গামী আমাদের মুখে এসে পড়্‌বে, এ কোনোমতেই সহ্য করা যাবে না।' এ কথার উপর আর বাদানুবাদ চলে না, আমরা যাত্রা করলাম। কিছু দূর অগ্রসর হতেই দলস্থ একজনের জুতার আবরণ ছিঁড়ে গেল, সেটা পরাবার অবসরে, যা ভয় করেছিলাম তাই হল, ইংরাজের দল আমাদের আগিয়ে গেল। আমাদের ভাগ্য সেদিন সুপ্রসন্ন ছিল তাই কিছুক্ষণ চলে আবার আমরা অগ্রবর্ত্তী হলাম। এবার আমরা যথাসম্ভব দ্রুত চলতে লাগলাম, ইংরাজের দল ক্রমশ পিছিয়ে পড়ল। রাত্রে পথ চেনা বড় কষ্টসাধ্য কিন্তু কুলিরা আগে আগে কাগজের লণ্ঠন নিয়ে পথ দেখিয়ে চলল। সর্ব্বদা যাতায়াতে পথগুলা যেন তাদের মুখস্থ—ঠিক করে বলতে হলে পদস্থ—হয়ে গেছে।

এইবার মাঝে মাঝে 'আসামা'র ধোঁয়া ও ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা রক্তিম আভা দেখা যেতে লাগ্‌ল। আমরা ক্রমশই ধোঁয়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। পাহাড়ের উপর পাহাড়, তার উপর পাহাড়। কেবলই মনে হচ্ছিল, বুঝি এই পাহাড়টা উঠ্‌লেই একেবারে খাতের কাছে পৌঁছিব। আলেয়ার মত লাল আগুনের শিখাটা কখন নিকটে কখন দূরে বোধ হচ্ছিল। এই ধরি ধরি আবার দূরে চলে যায়! মধ্যে মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পাঁচ সাত মিনিট পাহাড়ের গায়ে বসে বিশ্রাম কচ্ছিলাম। নীচে অনেক দূরে ইংরাজের দলের আলো দেখা যাচ্ছিল। আমাদের দলের মহিলারা এ নিয়ে বেশ একটু পরিহাস করছিলেন। তাঁরা বল্লেন:—'ওরা হল ইংরাজ, আর আমরা আমেরিকান ও ভারতীয়; কিছুতেই আমাদিগকে হারাতে পারে না।' আবার দ্বিগুণ উৎসাহে চল্‌তে আরম্ভ করি। পিছনের দলকে পরাজিত করবার ইচ্ছা আমাদের উত্তেজিত করে তুললে। মহিলারা বল্লেন—'twill never do to be caught up by the Englishmen! 'ইংরাজেরা আমাদের যে ধরে ফেলবে এ কোনো-মতেই হতে পারে না।' আমরা সমস্বরে উত্তর করলাম, 'না কখনই না'। এইরূপ হাস্য পরিহাসে সময় বেশ কাটতে লাগল।

আগুনের শিখা ক্রমশ স্পষ্টতর হচ্ছিল। চতুর্দ্দিকস্থ অন্ধকারের মাঝ দিয়ে এই যে বহু উর্দ্ধে একটা আলোকের সন্ধানে ছুটে চলেছি, বিশ্বসংসারেও ত ঠিক এইরূপ। সংসারের অন্ধকারের মাঝ থেকে মহাপুরুষেরা আলোকের সন্ধান পেয়ে থাকেন, সে আলোকের সন্ধানে কত বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে ছুটে যান! আজ এই অন্ধকার রাত্রে পাহাড় তাহার মাথায় মশাল জ্বেলে আমাদিগকে ডাক্‌ছে, 'ছুটে আলোকের কাছে এস, অন্ধকারে পড়ে থেকনা। অন্ধকারে পথ ভুলোনা, আমাকে লক্ষ্য করে ছুটে এস!'

আকাশে তারাগুলো একে একে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল। কোথা থেকে আলোকের একটা ঈষৎ আভা যেন উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল। দিবাগমের যে বিশেষ দেরী নাই তা বুঝতে পারলাম। এখন পাহাড়ে উদ্ভিদজীবনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ক্রমে পাহাড়ের মাটি বড় শিথিল হয়ে আসাতে পা ফেলা কষ্টকর হয়ে উঠ্‌ল। পাহাড়ের গায়ে বড়, ছোট, মাঝারি নানা রকম কিম্ভূতকিমাকার পাথর চারিধারে এলোমেলো ছড়ান। পাহাড়ের রঙ ছাইয়ের মত। একটা বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এসে হঠাৎ গন্ধকের গন্ধ পেলাম। সকলেই বুঝতে পারলেন খাত আর বেশী দূর নয়। কুলিরা বললে আর একটা পাহাড় উঠলেই খালাশ। সমস্ত রাত্রি পর্ব্বতারোহণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, পা ত আর চলেনা। মিঃ গ—আগে আগে ছুটলেন, আমি যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে তাঁর পশ্চাতে চললাম। কিছু দূর গিয়ে মিঃ গ—একটা পাথরের উপর বসে পড়েছেন দেখলাম। সেই দিকে চল্‌লাম, গন্ধকের গন্ধে নিশ্বাস ফেলা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল, তবুও ভ্রূক্ষেপ ছিলনা। হাঁপাতে হাঁপাতে যখন মিঃ গ-র কাছে পৌঁছিলাম, তখন অন্ধকার ও আলোকের সন্ধিক্ষণ। রাত্রির অন্ধকার তখন লজ্জিতভাবে নবাগত আলোকের নিকট হতে সরে যাবার চেষ্টা করছে।

আমি ত নির্ব্বাক! কথা কি কইব, সম্মুখে যা দেখলাম তা যে কখনও স্বপ্নেও অনুভব করিনি! ছেলেবেলায় ভূগোলে যখন আগ্নেয়গিরির কথা পড়েছিলাম, তখন ত এমন দৃশ্য কিছু ভাবিনি। খাতের বিপুলত্ব আমাকে অভিভূত করে ফেললে। একটা বিশাল চৌবাচ্চা, গভীরতা প্রায় ১০০০ ফুট, ব্যাস ১৩০০ ফুট! তলায় প্রস্তরাকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গন্ধকের খণ্ড ছড়ান। পুকুর শুকিয়ে গেলে তলার মাটি ফেটে যেরূপ আকার ধারণ করে অনেকটা সেইরূপ। আর সেই ফাটার মাঝ হতে রক্তাগ্নি তার লোলজিহ্বা বাহির করে অবিরাম ধূম উদ্গিরণ কচ্ছে। সমুদ্রগর্জ্জনের মত গভীর গর্জ্জনে পাহাড় কাঁপিয়ে গন্ধকের ধূম আমাদের শ্বাসরোধ করবার উপক্রম কর্‌ল। আমরা জলে রুমাল ভিজিয়ে নাক ও মুখ বন্ধ করলাম। মেঘের উপর এই পাহাড়ের মাথায় যখন দাঁড়িয়ে, তখন ধীরে ধীরে উষার প্রকাশ হচ্ছিল। এমন ভয়াবহ সুন্দর দৃশ্য ত জীবনে কখন দেখিনি! যেন একটা দাবানলের মত, একটা আগুনের দীর্ঘিকার মত! নরকাগ্নির কথা পড়েছিলাম, এ যেন তাহারই মত!

১৭৮৩ সালে এই স্থান কি প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করেছিল! আগুনের লোলজিহ্বা তখন বর্দ্ধিত হয়ে বুঝিবা আকাশস্পর্শী হয়েছিল! ধাতুনিঃস্রব এই খাত হতে বহির্গত হয়েছিল; ভীষণবেগে নিম্নগামী হয়ে একটা বন ও দুইখানা গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই দহ্যমান নদীর ঢেউগুলা আকারে সাগরোর্ম্মির চেয়ে হয় ত কম ছিল না; কোনটা দোতালার সমান, কোনটা তার চেয়েও বড়। শতাধিক বৎসর পরে আজও কয়েক ক্রোশ ব্যাপ্ত করে এই 'কঠিন' নদী পর্য্যটককে বিস্ময়ে অভিভূত করে। ঢেউগুলা ঠিক তেমনই আছে: নানা আকারের—কোনটা ঘোড়ার মত, কোনটা সিংহের মুখের মত; কেবল এখন প্রস্তরবৎ কঠিন হয়ে গেছে। আজ সম্মুখে এই যে অগ্নি-পুষ্করিণী দেখ্‌ছি, এ যে আবার কোনো ভবিষ্যত দিনে আকাশের দিকে জিহ্বা বিস্তার করে প্রলয়তাণ্ডবে নেচে উঠবেনা তা কে বলতে পারে!

একটা শিরশিরে শীতবাতাস গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। চারিদিকে চেয়ে দেখি অপূর্ব্ব দৃশ্য। আমরা মেঘের বহু উর্দ্ধে। নিম্নে সাদা কালো মেঘগুলা নিতান্ত কর্ম্মহীনের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! যেদিকে চাই সেদিকেই পাহাড়; তারপর আবার পাহাড়। কিছুক্ষণ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে হল চারিদিকে বিশাল সমুদ্র। পাহাড়ের সবুজ মাথাগুলো ঊর্ম্মিমালার মত থরে থরে সাজান, আর মাঝে মাঝে পর্ব্বত-

গাত্রে শ্বেত কুঝটিকা, ঢেউয়ের ঘর্ষণে উত্থিত সাদা ফেনার মত বড় সুন্দর। সেই পাহাড়-সমুদ্রের পরপারে জাপানের মহিমার নিদর্শনরূপে তুষারমুকুট-শোভিত ফুজি-সান* সগৌরবে মহারাজার মত দাঁড়িয়ে। কবির লেখনী ও চিত্রকরের তুলিকা এর মহিমা কীর্ত্তন করে শেষ করতে পারেনি। এই জাপানের গৌরবমুকুট। আজ নবারুণ-রাগরঞ্জিত প্রভাতালোকে জাপানের যা কিছু মহৎ ও সুন্দর তারই মূর্ত্তিরূপে আমাদের নয়নসমক্ষে প্রকাশিত হল। আকাশে ও বাতাসে তখন একটা পুলক ছুটেছে। তার আঘাতে শরীর ও মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। প্রাতঃ-কালীন শীতবাতাস তার কোমল হস্তস্পর্শে কতদিনের রুদ্ধ আনন্দ ও বেদনা যুগপৎ জাগিয়ে দিলে।

কিছুক্ষণ থেকে পূর্ব্বদিক রাঙা হয়ে উঠ্‌ছিল। আমরা সকলে সূর্য্যোদয় দেখবার জন্য সেইদিকে ফিরলাম। জমাটবাঁধা নানা রঙের মেঘের ভিতর থেকে সূর্য্য একটুখানি উঁকি দিলেন। যেন রঙিন পর্দ্দার আড়ালে লোহিতাম্বরা সুন্দরী! একটু একটু করে পর্দ্দা তুলে অবশেষে লজ্জা সরম বিসর্জ্জন দিয়ে হঠাৎ আকাশে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। চারিদিকে অসীম সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে আমাদিগকে লজ্জায় অভিভূত করে দিলেন। পাহাড়সমুদ্রের উপর একটা স্বর্ণধারা বয়ে গেল। একদিকে কোমল, শীতল প্রভাতের উন্মেষ; অন্যদিকে নির্ম্মম উষ্ণ আগুনের বিকটগর্জ্জনে হৃদয়ের জ্বালা প্রকাশ। জগতের সর্ব্বত্রই এইরূপ। একা-ধারে কোমল ও কঠোর, শীতল ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখের সমাবেশ! তাই বোধ হয় অনেকে জগৎকে রহস্যময় বলে থাকেন।

ক্রমে বেলা বেড়ে গেল। রোদ্ ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগ্‌ল। একটা বড় পাথরের ধারে বসে উদরানলে কিছু আহুতি দিয়ে নাম্‌তে আরম্ভ করলাম। সকালবেলা যতক্ষণ খাতের ধারে ছিলাম, তার মধ্যে পূর্ব্বরাত্রের ইংরাজদলের কোন পাত্তাই পাইনি। আমাদের মহা আনন্দ, স্থির হল তাঁরা উঠ্‌তেই পারেন নি। শত্রুর সম্পূর্ণ পরাজয়! নাম্‌বার সময় কোন কষ্টই নাই, একবার ছুটে নাম্‌তে আরম্ভ করলে থামা দায় হয়। পশ্চাদ্ভাগ থেকে কে যেন অর্দ্ধচন্দ্র দিচ্ছে। এক একটা পাহাড় নেমে আসি আর পিছনদিকে দেখি। রাত্রির অন্ধকারে কতখানি উঠেছিলাম কিছু বুঝতেই পারি নি; দিবালোকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই আমেরিকান মহিলারা কেমন করে উঠলেন! রাত্রে একবারও ক্লান্ত হয়েছেন একথা বলেননি। আমরা ভারতীয় 'পুরুষ' ইঁহাদিগের নিকট অনেক শিক্ষা করতে পারি।

ঘোড়াওয়ালাদের কাছে শুনলাম গত রাত্রের ইংরাজদল ইতিপূর্ব্বেই ঘোড়া নিয়ে ফিরেছেন। তখন আর কিছু সন্দেহ রইল না। যখন বাসায় ফিরলাম তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়েছে; স্নানাহার সেরে শুয়ে পড়া গেল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানিনা। চোখ মেলে জানালা দিয়ে দেখি বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। চারিদিককার পাহাড় থেকে সাদা কুয়াসাগুলো শুভ্রবসনা অভিসারিকার মত নিঃশব্দে নেমে আস্‌ছে। ঠিক সেই সময়ে সান্ধ্য-ভোজনের ঘণ্টার ডাক আমার চমক ভাঙিয়ে দিলে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* জাপানের সর্ব্বোচ্চ পাহাড়।

উৎসব

নীলাকাশে হাসে তারা, ঘিরে আছে গহন তিমির,
মন্দিরের উচ্চ-চূড়া লক্ষ্যপথে নাহি হয় স্থির,—
তবু শুনি দূর হ'তে ভেসে আসে হর্ষ-কোলাহল,
জাগরণক্লান্তপদে চলিয়াছে তীর্থযাত্রীদল;
পথখানি হিমসিক্ত, চারিদিক কুহেলিকাময়
তুষার-শীতল বায়ু তারি মাঝে করে অভিনয়,
কাঁপে চারু দেবদারু-তোরণ্ সজ্জিত পথপাশে,
বিশ্ব আজি ভরপূর অসময়-জাত ফুলবাসে!

কে তোমরা তীর্থযাত্রী? কার লাগি' ঘোর অন্ধকার
ভেদ করি' চলিয়াছ দলে দলে করিয়া হুঙ্কার?
বিজলী খেলিছে ওই মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায়
মুহুর্মুহু আলোকিয়া দশদিক স্বর্গের প্রভায়!
মর্ত্ত্য আজি স্বর্গ সনে করিতেছে দৃষ্টি-বিনিময়
তারি লাগি' এ উৎসব! আর কিছু? আর কিছু নয়।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাগ্যচক্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আরো সপ্তাহ দুই কাটিয়া গেল; কিন্তু ফ্র্যাঙ্ককে স্থান ত্যাগ করাইবার কোনো চেষ্টা বার্টির দেখা গেল না। হয় ত একটা কথা বলিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইত, কিন্তু সেই একটা মাত্র কথা বলিতে বার্টির কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না। কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তাহাই দেখিবার জন্য সে অলসভাবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। একটা রহস্যময় গল্পের কোথায় রহস্য-সমাধান হয় তাহা শুনিবার জন্য শ্রোতা যেমন আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করে তেমনি করিয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ফ্র্যাঙ্ক বাড়ির বাহির হইতেন না—সমুদ্রের ধারে কে আসে, কে যায়, তাহার কোনো খোঁজই রাখিতেন না। কাজেই, দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল তবুও বার্টি যাহাকে ভয় করিতেছে তাহার নামগন্ধও তিনি পাইলেন না—কোনো সন্দেহ পর্য্যন্ত তাঁহার মনে উঠে নাই! সমুদ্রের বাতাসে তাহার বুকের নিশ্বাস কতবার ফ্র্যাঙ্কের বুকের উপরে আসিয়া লাগিয়াছে তবুও তাঁহার হৃদয়ে ইভার সঙ্গ-অনুভব জাগিয়া উঠে নাই; বালির উপর তাহার পায়ের চিহ্ন ফ্র্যাঙ্ক কতবার দেখিয়াছেন তবুও তাহা চিনিতে পারেন নাই, কতবার তাহার গায়ের বসন তাঁহার চোখের সমুখে খেলিয়া গিয়াছে তাঁহার নজরে পড়ে নাই!

সে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—বৃষ্টির ভয়ে কেহ বাড়ির বাহির হয় নাই। সমুদ্রকূল নির্জ্জন দেখিয়া ফ্র্যাঙ্ক বাহির হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে কেহ কোথাও নাই—সমুখে অনন্ত সমুদ্র! তাহার বুকের উপর দিয়া দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা করুণ বাতাস বহিয়া আসিতেছে, আকাশের উপর হইতে মেঘের কালো ছায়া নামিয়া আসিয়াছে!

ফ্র্যাঙ্ক চলিতে লাগিলেন—তাঁহার কানে আসিয়া কান্নার শব্দে সমুদ্রের বাতাস লাগিতে লাগিল!

দূর হইতে তাঁহার দিকে আসিতেছে ওড়না উড়াইয়া ও কে! হা ভগবান! এ যে সেই!

ফ্র্যাঙ্কের বোধ হইল তাঁহার বুকের উপর যেন জগদ্দল পাথর চাপিয়া বসিয়াছে! একটা বেদনা ও আনন্দ এক-সঙ্গে তাঁহার শরীরের মধ্যে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন,—তাঁহার কম্পিত কণ্ঠ হইতে অস্ফুটস্বরে বাহির হইয়া পড়িল—"ইভা! ইভা!"

ক্রমেই ব্যবধান কমিয়া আসিল। ইভা তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন;—তাঁহার মুখে কোনো উত্তেজনার চিহ্ন নাই; কারণ এ তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ নয়—আজ সকালে আর একবার তিনি ফ্র্যাঙ্ককে দেখিয়াছেন, প্রথম দেখার যে উত্তেজনা তাহা তখন কাটিয়া গেছে!

ফ্র্যাঙ্ক দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন—কি করেন? কি বলিয়া ইভাকে সম্ভাষণ করেন? অপরিচিতের মতো চলিয়া যাইবেন? না সমস্ত মনোমালিন্য দূর করিয়া দিয়া আবার প্রেমের সহিত আহ্বান করিবেন?

ফ্র্যাঙ্ক বিস্মিত হইয়া গেলেন। এ কি! তাঁহার সম্মুখে আসিতে ইভার এতটুকু সঙ্কোচ নাই! কেমন নির্ব্বিকার ভাবে, কেমন শান্ত চিত্তে তাঁহার কাছে আসিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছেন!

ফ্র্যাঙ্ক দেখিতে লাগিলেন—নয়ন ভরিয়া ইভাকে দেখিতে লাগিলেন;—সেই লতার মতো ক্ষীণ তনু-শ্রী, পুষ্পের মতো কোমল অঙ্গ, হীরার মতো উজ্জ্বল চক্ষু!

ইভা কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক!"

ফ্র্যাঙ্কের সমস্ত হৃদয়টা ঝড়ের মতো আকুল হইয়া উঠিল—তন্দ্রার মতো একটা আবেশ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না—চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিয়া তাঁহাকে আর কিছুই দেখিতে দিল না।

ইভা মলিনভাবে একটু হাসিলেন;—আবার ডাকিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক!"

ফ্র্যাঙ্কের চমক ভাঙিল—কিন্তু এবারও মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না, তিনি ইভার দিকে শুধু হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন—ইভা আবেগের সহিত সেই হাতখানি আঁকড়াইয়া ধরিলেন। তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো

হল। আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বিবাদ জমে আছে—আমি তা দূর করে ফেলতে চাই। আমি অপরাধ করেছি—আমায় ক্ষমা কর।”

আর কথা বাহির হইল না—অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, সমস্ত দেহের মধ্যে একটা আবেগের স্পন্দন চলিতে লাগিল—নৈরাশ্যে স্তব্ধ হইয়া পাথরের মূর্ত্তির মতো ইভা দাঁড়াইয়া রহিলেন!

—“আমার কথা ভুল বুঝ না, আমি সত্যই অনুতপ্ত—আমি সত্যই ক্ষমা চাই—”

“ইভা! ইভা!” ফ্র্যাঙ্ক গুমরাইয়া উঠিলেন—“ক্ষমা তুমি চাচ্চ? ক্ষমার পাত্র আমি—আমিই দোষ করেচি!”

“না—না—না” ইভা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—“না—দোষ আমার! সে কথা আমায় স্বীকার করতে দাও।” বলিয়া ইভা ফ্র্যাঙ্কের দিকে সাদরে কর প্রসারণ করিলেন—ফ্র্যাঙ্ক সে হাতখানি হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন;—তাঁহার চোখ ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

ইভা বলিলেন—“দোষ আমার,—আমি স্পষ্টই স্বীকার করচি দোষ আমার! তুমি ক্ষমা করেচ বুঝে আমি সুখী হলুম। একদিন আমাদের বাড়ী আসবে না?”

“যাবো বই কি!” বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক আগ্রহের সহিত ইভার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

ইভা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন; ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—“কিন্তু কারুর কাছে থেকে তোমায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না তো! হয় ত কেউ তোমার জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করচে—হয় ত তুমি এতদিনে—বিবাহিত—”

বলিয়া ইভা একটু করুণ হাসি হাসিয়া চেষ্টার সহিত ফ্র্যাঙ্কের মুখের দিকে একবার চাহিলেন। সে চাহনিতে কী ভয়, কী বেদনা!

ফ্র্যাঙ্ক চমকিয়া উঠিলেন—আজ পর্য্যন্ত যে সন্দেহটা তাঁহার মনে আসে নাই, সেই সন্দেহ তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল—ইভার প্রশ্নটা ইভাকেই ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার মনের মধ্যে ব্যাকুলতা জন্মিতে লাগিল! কিন্তু সে সন্দেহ বেশি ক্ষণ রহিল না!

ফ্র্যাঙ্ক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—“বিবাহ! না—এ জীবনে নয়!”

দুজনের মুখ দিয়া আর কোনো কথা বাহির হইল না। ইভার মনের বাঁধ ভাঙিয়া গেছে—হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল—ইভা ওড়নায় চোখ মুছিতে মুছিতে চলিতে লাগিলেন। আবেগে ফ্র্যাঙ্কেরও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

বাড়ির সামনে আসিয়া ইভা নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। লজ্জানত হইয়া বলিলেন—“ফ্র্যাঙ্ক! কি বলব! তোমার কাছে দোষ স্বীকার করবার জন্য, ক্ষমা চাইবার জন্য এতদিন আমার প্রাণ যে কী ব্যাকুল হয়েছিল! ক্ষমা না চেয়ে আমি পারলুম না! তার জন্যে কি আমায় ঘৃণা করবে?”

“তার জন্যে ঘৃণা! তোমাকে ঘৃণা!”—ফ্র্যাঙ্ক আর বলিতে পারিলেন না, সম্মুখে লোক আসিয়া পড়িল। তাঁহারা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আর্চিবল্ড ফ্র্যাঙ্ককে অভ্যর্থনা করিলেন বটে কিন্তু তেমন স্নেহের সহিত নহে। তিনি ইভা ও ফ্র্যাঙ্ককে একত্রে রাখিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। ইভা তখন বলিলেন—“ফ্র্যাঙ্ক বোসো—তোমার সঙ্গে কথা আছে!”

ফ্র্যাঙ্ক বিস্মিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন—ইভার কণ্ঠস্বর যেন কেমন কঠিন, তাহাতে আবেগের স্পন্দন নাই, প্রেমের প্রগল্‌ভতা নাই, প্রণয়ের সরসতা নাই—তাঁহার বক্তব্য যেন নিতান্তই সাধারণ!

ফ্র্যাঙ্ক বসিলে তিনি ধীর ভাবে বলিলেন—“ফ্র্যাঙ্ক! বাবাকে তুমি একখানা চিঠি লিখেছিলে?”

ফ্র্যাঙ্ক বিমর্ষ ভাবে বলিলেন—“হাঁ!”

—“অ্যাঁ! লিখেছিলে?”

—“হাঁ—বাবাকে একখানা—তোমাকে দুখানা!”

“কি! আমাকেও লিখেছিলে?”

—“হাঁ।”

—“কিন্তু জবাব পাওনি?—কেন বল দেখি?”

—“কেন আর কি! তুমি আমার উপর রাগ করেছিলে তাই। আমি সত্যই অপরাধ—”

—"না, না সে জন্ম নয়—চিঠি আমরা পাইনি ?"

—"পাওনি ?"

—"না। বাবার চাকরটা লুকিয়ে ফেলেছিল—বোধ হয় তার কোনো উদ্দেশ্য থাকবে !"

—"উদ্দেশ্য !—কি উদ্দেশ্য ?"

—"তা আমি জানিনে। আমি যা জানি বলচি। আমার দাসী একদিন কাঁদতে কাঁদতে এসে বল্লে সে আর আমাদের বাড়ি থাকবে না—বাবার চাকর তাকে ভয় দেখিয়েছে খুন করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম ব্যাপার কি ? সে বল্লে একদিন তোমার হাতে লেখা বাবার নামে একখানা চিঠি সে আনছিল এমন সময় চাকরটা কোত্থেকে দৌড়ে এসে চিঠিখানা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়—বলে সে নিজে গিয়ে দেবে; কিন্তু তা না করে চিঠি নিজের কাছেই রেখে দিলে। দাসী তাকে সে কথা বলতে সে ধমকে উঠে বল্লে খবরদার একথা যদি কাউকে বলবি তো তোকে খুন করব। দাসী ভয়ে আমাকে বলতে পারেনি। শেষে একদিন বলে ফেল্লে। আমরা তখন চাকরটার কাছে খোঁজ নিলুম। শুনে সে চটে আগুন! দাসীর সব কথা সে অস্বীকার করলে। বাবা রেগে তাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিলেন। তার থাকবার ঘর, তার জিনিস পত্র সমস্ত উলটপালট করে খোঁজা হল কিন্তু তোমার চিঠি বেরুল না। সেইখানাই তোমার শেষ চিঠি ? না ?

—"হাঁ।"

—"তুমি তিন বার লিখেছিলে !"

—"হাঁ—তিন বার !"

—"আমাকে দুখানা।"

—"হাঁ, তোমাকে দুখানা।"

ইভার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙিয়া গেল—তাঁহার চোখে জল আসিতে লাগিল, তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—"কি লিখেছিলে ?"

—"লিখেছিলুম—ক্ষমা চাই—ক্ষমা করো—দোষ আমার।"

—"না। দোষ তোমার নয়।"

—"জানি না দোষ কার—কিন্তু তখন মনে হয়েছিল যত অপরাধ সব আমার, তাই ব্যাকুল হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলুম। প্রতিদিন অপেক্ষা করেচি—অধৈর্য্য হয়ে অপেক্ষা করেচি—কিন্তু ক্ষমার একটি কথাও তোমার কাছ থেকে পাইনি !"

ইভা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"জানি পাওনি। তার জন্যে কি করলে ?"

—"কি করব ?"

—"আমার কাছে একবার এলে না কেন ?"

ফ্র্যাঙ্ক স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কি উত্তর করিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না। ইভা আবার বলিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক বল—কেন এলে না।"

ফ্র্যাঙ্ক হতবুদ্ধির মতো হইয়া বলিলেন—"কি জানি কেন এলুম না !"

—"আসবার কথা একবারও মনে হয়েছিল ?"

—"হাঁ হয়েছিল বৈকি !"

—"তবে এলে না কেন ?"

ফ্র্যাঙ্ক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল, অনুতাপে বুক ভাঙিয়া যাইতেছিল।

—"ইভা, কি বলব—সে দুঃখের কথা কি বলব—কি করে দিন গেছে—কি বেদনায়"—

—"তবে—কেন একবার আমার কাছে এলে না ?"

—"না আসতে পারিনি।"

—"কিন্তু কেন ?"

—"আসব ভেবেছিলুম।"

—"তবু যে এলে না ?"

ফ্র্যাঙ্ক হতাশ হইয়া ইভার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে লাগিলেন। সত্যই তো! তিনি আসেন নাই কেন! তাঁহার মনে হইতে লাগিল স্মৃতি হইতে যেন সব কথা মুছিয়া যাইতেছে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে আবার সব কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"হাঁ! আমি আসতে চেয়েছিলুম কিন্তু বারণ করলে বার্টি।"

—"বার্টি বারণ করলে ?"

—"হাঁ। সে বল্লে তোমার কাছে এসে ক্ষমা চাওয়া কাপুরুষতা !"

—"কেন ?"

—"তুমি আমায় অবিশ্বাস কর তাই।"

—"তার পর ?"

—"আমার মনে হল বাটির কথা সত্য। সেই জন্য গার আসতে পারলুম না।"

ইভা মর্ম্মাহত হইয়া সোফার উপর আছড়াইয়া পড়িলেন—দুই চোখ দিয়া বেদনার অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

—"বাটি আর কিছু বল্লে ?"

—"না, আর কিচ্ছু বলেনি।"

দুই জনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ইভা কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিলেন —তাঁহার মুখ রক্তহীন, চক্ষু কপালের দিকে উঠিয়াছে—দৃষ্টিশূন্য, কি একটা ভয়ের উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কম্পিত, চোখের পলক পড়ে না—তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! ফ্র্যাঙ্ক! রক্ষা কর—ঐ এলো!"

ফ্র্যাঙ্ক চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি? কি? —ইভা!"

"ঐ এলো—এলো—মেঘগর্জ্জনের মতো শব্দ করে ঐ আসচে, আমাকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলচে—বজ্রের মতো আমার মাথায় এসে পড়বে—ফ্র্যাঙ্ক! রক্ষা কর!" বলিতে বলিতে ইভা ফ্র্যাঙ্কের দিকে ছুটিয়া আসিলেন, তাঁহার মুখে যেন মৃত্যুর ছায়া! ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন বলিলেন—"কি ইভা? কি হয়েছে।"

ইভা ফ্র্যাঙ্কের বুকে মাথা রাখিয়া অবসন্ন ভাবে ঢুলিয়া পড়িলেন, উত্তর করিতে পারিলেন না। ফ্র্যাঙ্ক আবার প্রশ্ন করিলেন।

ইভা অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"যাক্, গেছে! দিনকতক থেকে ঘন ঘন আসচে। সে যে কী আমি বলতে পারিনা। থেকে থেকে আসে—ভীষণ গর্জ্জন করতে করতে ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে আমার দিকে আসে, মাথার কাছে এসে শতধা হয়ে যায়—তখন সে কী ভীষণ শব্দ, সে কী অগ্নিময় স্ফুলিঙ্গ, কী স্পন্দন! আমার হৃৎকম্প হতে থাকে। যেন একটা দৈত্য ঝড় উড়িয়ে আমার দিকে আসে—কি সে আমি বুঝতে পারিনা। সে কি ফ্র্যাঙ্ক?"

—"কি করে জানব? বোধ হয় এ তোমার শরীরের দুর্ব্বলতা!"

—"ফ্র্যাঙ্ক! সরে এস—কাছে এস। আমাকে আর একলা ফেলে যেয়োনা, একলা থাকলে আমার বড় ভয় করে। আর আমার ভয় কি—তোমাকে পেয়েছি আর ভয় কি। আমি জানতে পেরেছিলুম—আমার মন আমায় বলেছিল,—একদিন তুমি আসবে—ফিরে আমার কাছে তুমি আসবে। তাইতো কেবলই ঘুরেচি তোমার জন্যে। যতই দিন গেছে মনে হয়েছে ততই তোমার কাছে এসে পড়চি—ততই তুমি আমার কাছে আসচ—সেই আশায় বেঁচেছিলুম। এই দেখ সত্যই তুমি এলে। আর যেয়োনা চলে—অভাগিনী ইভাকে ফেলে আর যেয়োনা!" বলিয়া ইভা ফ্র্যাঙ্কের বুকের উপর মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিলেন—

"ফ্র্যাঙ্ক! এই দেখ!"

"কি ?"

—"এই দেখ, সেই তোমার হাতের দাগ! সেই যাবার দিন তুমি আমার হাত ধরেছিলে সে চিহ্ন এখনো রয়েচে!"

ফ্র্যাঙ্ক ইভার হাতের পানে চাহিলেন। তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

ইভা বলিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক, কাঁদো কেন? এ আঘাত নয়—এ আমার অলঙ্কার—এ আমার কঙ্কণ!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অল্পক্ষণ পরেই ফ্র্যাঙ্ক চমকাইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ইভা ?"

—"কি ?"

—"আচ্ছা বল দেখি কেন— ?"

—"কি কেন ?"

—"চাকরটা আমার চিঠি লুকিয়েছিল কেন ?"

—"সে কথাই তো অনেক দিন থেকে ভাবচি।"

—"তার দরকার কি লুকোবার? কি লেখা আছে তাই দেখবার জন্তে কৌতূহল ?"

—"তাহ'লে কি দাসীর হাত থেকে অমন করে ছিনিয়ে নেয়।"

—"তবে তার কোনো স্বার্থ ছিল ?"

—"নিশ্চয়!"

—"কিন্তু কিসের স্বার্থ? আমি তোমায় লিখলুম, না লিখলুম তাতে তার কি স্বার্থ?"

—"হয়ত আর কেউ—"

—"কি?"

—"আর কারুর জন্যে করেচে।"

—"কিন্তু কার জন্যে? কার তাতে কি উপকার হতে পারে!"

ইভা উঠিয়া বসিলেন—ফ্র্যাঙ্কের পানে অনেকক্ষণ নীরবে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। যে প্রশ্ন মনে উঠিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার কেমন ভয় হইতেছিল। তবুও তিনি সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"আচ্ছা এমন কি কেউ নেই যার এতে কোনো স্বার্থ আছে?"

—"আমি তো জানিনা।"

—"কেউ কি জানত তুমি আমায় চিঠি লিখেছিলে?"

—"না। জানত কেবল বার্টি।"

—"ওঃ! কেবল বার্টি!" ইভা কথাগুলায় একটু জোর দিয়া আবার বলিলেন—"কেবল বার্টি!"

—"বার্টি? না, না, কখনোই না!" বার্টির উপর কোনো সন্দেহ ফ্র্যাঙ্কের মনে কিছুতেই স্থান পাইলনা, তিনি আবার বলিলেন—"তুমি কি সত্যই মনে কর, বার্টি?"

—"আমার তো তাই মনে হয়।"

—"অসম্ভব! ইভা, অসম্ভব! সে কেন করতে যাবে?"

—"তা আমি জানিনা।" বলিয়া ইভা নিরুৎসাহে হেলিয়া পড়িলেন। তাঁহার বুকটা কেমন দুরদুর করিতে লাগিল। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"আমি ঠিক বলতে পারিনা এ বার্টির কাজ কি না, কিন্তু তারই উপর আমার কেমন সন্দেহ হয়। এক বচ্ছর ধরে আমি অনেক ভেবেছি—কেন তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হল। যতই ভেবেছি প্রথমে কোনো কারণ পাইনি, সবই যেন রহস্যময়, অন্ধকারময় বলে বোধ হয়েছে, মনে হয়েছে যেন কে একজন—যেন একটা দৈত্য আমাদের দুজনের মিলন ভেঙে দেবার জন্য কেবলই কৌশল পেতেচে—আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো দোষ, কোন ত্রুটি ছিলনা! তারপর ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন যেন একটু একটু অন্ধকার দূর হয়ে গেল—প্রহেলিকার মধ্যে থেকে মনে হল যেন চোখের সম্মুখে অস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল এক মূর্ত্তি—সে তোমার বার্টি! মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। আগে যা বুঝতে পারিনি তা যেন একটু একটু বুঝতে পারলুম। তখন মনে হতে লাগল প্রতিদিন বার্টি আমায় যে কথা বলেচে সে কথাগুলার অর্থ সে যা বুঝিয়েচে তা নয়। আমার প্রতি কেন তার এত সহানুভূতি? আমার সুখ-দুঃখের উপর কেন তার এ দৃষ্টি? সে কি স্নেহের জন্য? তোমার সম্বন্ধেও কেন সে আমার কাছে ঐ সব কথা—"

—"কি কথা?"

—"যে কথা বলেচে আমার তো মনে হয় প্রকৃত বন্ধুর তা বলা উচিত নয়। তখন আমি তাকে ভায়ের মতো দেখতুম, তাকে বিশ্বাস করতুম, মনে করতুম সত্যই সে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। সে দিনরাতই আমার সামনে একটা ভয় জাগিয়ে তুলতো—তোমার সঙ্গে মিলন হলে যেন একটা বিপ্লব কাণ্ড বেধে যাবে—যেন আমার জীবন চিরদিনের জন্য অশান্তিময় হয়ে উঠবে। আমাদের বিবাহ না হওয়াই ভালো—হাঁ, সেই কথা সে বার বার, স্পষ্ট করে না বল্লেও, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেচে। কিন্তু কেন? কেন?"

ফ্র্যাঙ্কের চোখের সামনে অতীতের প্রহেলিকাচ্ছন্ন দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। অনেকক্ষণ তিনি এ রহস্যের কোনো সূত্র ধরিতে পারিলেন না। হঠাৎ মনে পড়িল সেই দিন—যে দিন ফ্র্যাঙ্ক ইভার নিকট হইতে কোনো পত্র না পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা বার্টিকে জানাইয়াছিলেন। বার্টির সে কী দৃঢ় প্রতিবন্ধকতা! ফ্র্যাঙ্ককে লণ্ডন ত্যাগ করাইবার জন্য কী ব্যস্ততা! কেন? কি তাহার উদ্দেশ্য? ফ্র্যাঙ্ক কিছুতেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহার সরলতা, তাঁহার অবিচক্ষণতা, সর্ব্বোপরি বন্ধুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভালোবাসা কিছুতেই বার্টির উপর কোনো সন্দেহকে মনে স্থান দিতে চাহিল না। সেই বার্টি যে সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে সমান ভাবে অবিচ্ছিন্ন হইয়া ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে সে কি কোনো অনিষ্ট করিতে পারে? এ কি সম্ভব?

ইভা অলসভাবে শুইয়া ভাবিতেছিলেন, তাঁহারও মনের উপর অনেক জটিল প্রশ্ন খেলিয়া বেড়াইতেছিল, কোনোটাকেই তিনি আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না।

কেন বার্টির অভিপ্রায় তাঁহাদের বিবাহ না হয়? কেন, কেন? কি তাহার স্বার্থ? কি তাহার উদ্দেশ্য? সে কে? তাইতো সে কে? ইভা যেন স্বপ্ন ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! কে সে? বার্টি কে? কেন তার কোনো পরিচয় আমার কাছে তুমি বল না?"

ফ্র্যাঙ্ক থতমত খাইয়া গেলেন। একটা অনুশোচনা তাঁহার বুকে বিঁধিতে লাগিল। কেন তিনি ইভার কাছে বার্টির পরিচয় দেন নাই—কেন তিনি বলেন নাই সে কপর্দ্দকহীন পথের ভিক্ষুক—তাঁহারই অন্নে পালিত!

"তাঁহারই অন্নে পালিত!" তাই তো হঠাৎ তাঁহার মনের উপর দিয়া সত্যের একটা আভাস বিদ্যুৎগতিতে খেলিয়া গেল।

তিনি বলিলেন—"ইভা! আমি চল্লুম—বার্টির কাছে।"

"বার্টির কাছে?" ইভা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বার্টির কাছে? সে কি এখানে?"

"হাঁ।"

"সে এখানে! তা তো আমি জানতুম না। আমি ভেবেছিলুম সে বুঝি নেই—সে এখন বহু দূরে—হয় ত সে মৃত! হা ভগবান! সে এখানে! ফ্র্যাঙ্ক! যেয়োনা—আমি মিনতি করি তুমি তার কাছে আর যেয়োনা, যেয়োনা।"

—"কিন্তু তাকে সব কথা একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে ত!"

"না—না—ফ্র্যাঙ্ক যেয়োনা। আমার বড় ভয় করে তাকে—তার কাছে তুমি যেয়ো না।"

ফ্র্যাঙ্ক কিছু বলিলেন না, তাঁহার দিকে শুধু সপ্রেম নয়নে একবার চাহিলেন—সে চাহনিতে কত আশ্বাস।

তারপর ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"ইভা, কোনো ভয় নেই—স্থির হও। তাকে আমায় সব কথা জিজ্ঞাসা করতেই হবে। কিছু ভেবো না—আমি রাগব না—শান্ত থাকব।"

—"রাগবে না? পারবে শান্ত থাকতে? না, না। যেয়ো না।"

"আমি তোমায় বলচি ইভা!—রাগবো না। কোনো ভয় নেই। সন্ধ্যার সময় আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক ইভাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন।

—"ইভা! তবে তুমি আমার?"

ইভা চক্ষু নত করিয়া বলিলেন—"হাঁ, আমি তোমারই।"

ফ্র্যাঙ্ক চলিয়া গেলেন।

ইভা একলা বসিয়া রহিলেন। একটা ভীষণ আতঙ্ক তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। মনে হইল চারিদিক হইতে যেন একটা বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে। তাঁহার অত্যন্ত ভয় করিতে লাগিল—তাঁহার নিজের জন্য তার চেয়ে বেশি ফ্র্যাঙ্কের জন্য ভাবনা হইতে লাগিল। কি করেন খুঁজিয়া পাইলেন না, অস্থির হইয়া উঠিলেন। এমন সময় দূরে পিতার পদশব্দ শোনা গেল, এ অবস্থায় বাপের সঙ্গে দেখা হইলে বিপদ! ইভা তাড়াতাড়ি একটা বড় কোর্ত্তা উঠাইয়া লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া পড়িলেন।

তখন অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে! (ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

মণি

(একটি শিশুর প্রতি)

১

হে সুন্দর! বল্ বল্, কোন্ স্বপ্ন-লোকে,
নাগিনী-অলকে,
হাসিয়া উজ্জ্বল হাসি, ছড়ায়ে চন্দ্রিকারাশি,
ছিলি তোর নিজেরি ঝলকে?
কোন্ নীল অম্বরেতে, নীহারিকা-ঝালরেতে,
ছি'ল তুই লগ্ন?
উজলিয়া বিভাবরী, সারা বিশ্ব আলো করি',
আপন আনন্দে আহা আপনি নিমগ্ন!
কোন্ নব অলকাতে, বাসন্তী উষাতে,
ফুটেছিলি তারারত্ন! ভুবন ভুলাতে?

২

তোরে হেরি', একি হেরি? রঙ্গিনী পার্ব্বতী,
বাসন্তভূষণা!
অঙ্গে অঙ্গে ফুল ফোটে, অলি ঝঙ্কারিয়া ছোটে,
লীলাময়ী, ললিতগমনা!

জিনি রক্ত পদ্মরাগ, তনুতে অশোক-রাগ,
যায় গিরিকন্যা,—
সুন্দরীর পদস্পর্শে, কাঁপিয়া রাঙিয়া হর্ষে,
গিরি-অশোকের শাখা হইল সুধন্যা!
জিনি সেই পদ্মরাগ, জিনি সে অশোক,
রে সুন্দর! তোর ওই রঙ্গিন আলোক!

৩

হেরি ও চিকণ হাসি, অনিন্দ্য বদন,
ওরে মনোহর!
ভেদি এ পাষাণ প্রাণ, ঝঙ্কারি ললিত তান,
ছুটে মোর কবিতা-নির্ঝর!
দিব্য নেত্রে হেরি আমি, মোহিতে দিল্লির স্বামী,
সাজিছে সুন্দরী!
মুকুরে হেরিয়া মুখ, পাইল অপূর্ব্ব সুখ;
জ্বল্ জ্বল্ কোহিনুরে ভূষিল কবরী!
নুরজাহানের সেই কোহিনুর মণি
জিনি তুই, ওরে মণি! লাবণ্যের খনি!

৪

তোরে হেরি রে সুন্দর! আমার এ প্রাণে
বহিল মলয়!
হিম ঋতু অবসান, কোকিল ধরিল গান;
আকালিক বসন্ত উদয়!
হেরিতেছি—দুঃখী যক্ষ, পেয়েছে প্রিয়ার বক্ষ,
ফিরিয়া হরষে!
জায়াপতি কুতূহলে, হের দেখ গলে গলে!
চন্দ্রকান্তমণি গলে চন্দ্রিকা-পরশে!
অলকার জ্বল্ জ্বল্ চন্দ্রকান্ত মণি
জিনি তুই, ওরে মণি, লাবণ্যের খনি!

৫

কি যাদু জানিস্ জাদু? রে পরশমণি,
ও তোর পরশে,
হীনকান্তি লৌহনিভা, ধরিল কাঞ্চন-বিভা,
ভাবপদ্ম মানস-সরসে!
কোন্ অজানিত টানে টানিলি আমার প্রাণে,
অয়স্কান্ত মণি?
ঘুচিল কলুষজ্বর, ব্যাধিহীন এ অন্তর,
স্পর্শে তোর, ওরে মোর চারু চিন্তামণি!
মুমূর্ষু কবিতা ছিল নয়ন মুদিয়া:
স্পর্শে তোর হর্ষে ধনী উঠিল বসিয়া!

৬

কোন সে বৈকুণ্ঠে ছিলি, বিষ্ণুর উরসে
কৌস্তুভ রতন?
তোরে পেয়ে, ওরে মণি, পাইল নয়নমণি
আমার এ আঁধার নয়ন!
একি আলোকের বন্যা! চারিধারে চুনি, পান্না
হীরক মোহন!
ঘুচিল, ঘুচিল ত্রাস, টুটিল মায়ার ফাঁস,
একি! একি! একি হেরি অপূর্ব্ব দর্শন!
প্রাণ-বৃন্দাবনে আহা হাসিছে দুলাল,
নীলকান্ত মণি মোর!—ননীচোরা লাল!

হুসঙ্গাবাদ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

ইক্ষুচাষ

ইক্ষুর জন্ম ভারতে হইলেও, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এখন ইক্ষুর চাষ হইতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কৃষিপদ্ধতির উন্নতির ফলে, বিদেশী চিনি সুলভতায় ভারতীয় চিনিকে পরাস্ত করিয়াছে। সুতরাং ভারতের বহু অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। সম্প্রতি গভর্মেণ্ট ও নীলকরগণ ইক্ষুচাষের প্রতি মনোযোগ দেওয়ায় ভারতে বিদেশী চিনির আমদানী কিছু কমিয়াছে বটে কিন্তু বিদেশী চিনিকে পরাভূত করিতে ভারতীয় চিনির এখনও বহু বিলম্ব আছে।

ইক্ষু ও দুর্ব্বা প্রভৃতি তৃণ এক বংশীয়। অনেকে বলেন ইক্ষুর জন্মস্থান ভারতবর্ষ। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ চীন, কেহ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, ইহার জন্মস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। পৃথিবীর যে সমস্ত প্রদেশে সম্বৎসরে গড়্পড়্তা ৬৫ ডিগ্রি হইতে ৮৬ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ তাপমান যন্ত্রে দেখা যায়, সে সমস্ত দেশে ইক্ষুচাষ হইতে পারে। সমুদ্রবায়ু ইক্ষুচাষের অনুকূল; এজন্যই যবদ্বীপ মরিসিয়স্ প্রভৃতি দ্বীপসমূহের ইক্ষু অতি উৎকৃষ্ট।

৫০ হইতে ৬০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত ইক্ষুচাষের জন্য প্রয়োজন। বৃষ্টিপাত অল্প হইলে, জলসেকের দ্বারা সে অভাবটুকু পূরণ করিতে হয়। ধান্যেরও প্রায় এই পরিমাণ বৃষ্টিপাতের আবশ্যক, কিন্তু ধান্যমূল যেমন জলে নিমজ্জিত হইয়া থাকিতে পারে ইক্ষুমূল সেরূপ থাকিলে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ইক্ষুচাষ করিতে হইলে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত—১ম, ইক্ষু যে জমিতে চাষ করিতে হইবে সে জমিতে বর্ষাকালে জল দাঁড়ায় কি না? ২য়, উক্ত জমিতে জলসেকের প্রকৃষ্ট উপায় আছে কি না?

ক্ষেত্র।

উর্ব্বর আঁটাল মৃত্তিকা ইক্ষুচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সুতরাং বঙ্গের অধিকাংশ স্থলই ইক্ষুচাষের উপযুক্ত। বর্দ্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি কতকগুলি জেলার লাল মাটি বালুকাসংযুক্ত হইলেও ইক্ষুচাষের বিশেষ উপযোগী।

এক জমিতে ৩।৪ বৎসরের বেশী ইক্ষুচাষ করা বিধেয় নয়। সুতরাং ইক্ষু কাটিয়া সেই জমিতে মটর, অড়হর, সীম, ধনিচা কিম্বা শণ চাষ করিলে উক্ত জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। ৺নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন "ধনিচা, বর্ব্বটি কিম্বা শণ ভাদ্র মাসে ফুটন্ত অবস্থায় কাটিয়া আশ্বিন মাসে আলু লাগাইবে। মাঘ মাসে আলু তুলিয়া ইক্ষু রোপণ করিবে। পরবর্ত্তী মাঘে ইক্ষু তুলিয়া, বৈশাখে আউস ধান্য বা অড়হর বপন করিবে। আউস ধান্যের পর আলু এবং আলুর পর পুনরায় ইক্ষু দেওয়া সুব্যবস্থা। অড়হর কাটিয়াও ইক্ষু দেওয়া চলে।" ইক্ষুর পর নীল এবং নীলের পর ইক্ষু দেওয়া এখন নীলকরদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে—কারণ নীলের দিকে যে-সময় বেশী মনোযোগ দিতে হয় সে-সময় ইক্ষুর দিকে সামান্য দৃষ্টি রাখিলেই চলে এবং ইক্ষুর পালা পড়িলে নীলের দিকে সামান্য দৃষ্টি দিলে ক্ষতি হয় না। অধিকন্তু নীলের "সিঠি" ইক্ষুর উত্তম সার।

ইক্ষু উৎপাদন-উপায়।

ইক্ষু তিন প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে—

১ম—ইক্ষুর কর্ত্তিত মূল হইতে নূতন ইক্ষু উৎপাদন।

২য়—বীজ হইতে সাধারণ প্রণালীতে নূতন ইক্ষু উৎপাদন।

৩য়—ইক্ষুগ্রন্থি হইতে নূতন ইক্ষু উৎপাদন।

প্রথম প্রণালী।

ইক্ষু কাটিয়া লইলে তাহার মূল হইতে পুনরায় নূতন ইক্ষু উৎপন্ন হয়। একই ক্ষেত্রে এরূপে ৩।৪ বার পর্য্যন্ত নূতন ইক্ষু উৎপাদন সম্ভব। নূতন ইক্ষু উৎপন্ন হইলে অন্যান্য প্রণালীর ন্যায়, এ প্রণালীতেও জমির পাইটের আবশ্যক। কিন্তু ৩য় ও ৪র্থ বারে ইক্ষুর রসোৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রণালী।

পুরাকাল হইতে ইক্ষু অন্যান্য প্রণালীতে উৎপন্ন হইলেও, কেবল অধুনাই প্রমাণিত হইয়াছে যে ইক্ষুবীজ হইতে নূতন ইক্ষু উৎপন্ন হইতে পারে। এমন কি বিখ্যাত পণ্ডিত ডারউইন তাঁহার 'Variation of Animals and Plants under Domestication' নামক গ্রন্থে ইক্ষুতে বীজ হয় না বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ডিকান্-ডোলে নামক অন্য এক পণ্ডিতও তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Origin of Plants'এ এ মতের সমর্থন করিয়াছেন। ১৮৫৮ খৃঃ অঃ বার্‌বেডসের মহাত্মা প্যারিস্ প্রথমে আবিষ্কার করেন যে ইক্ষুবীজ হইতে নূতন ইক্ষু উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। ১৮৮৭ খৃঃ অঃ যবদ্বীপে প্রথমে ইক্ষুবীজ হইতে ইক্ষুচাষ আরম্ভ হয়। বঙ্গদেশে 'খরি' ইক্ষুর বীজ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে ইক্ষুচাষও সম্ভব। যবদ্বীপে আরড্‌ম্যান ও সিল্কেন (Messrs. Erdmann and Sielcken) নামক পণ্ডিতদ্বয় বলেন সকল ইক্ষুরই বীজে উৎপাদিকা শক্তি আছে তবে কতকগুলি অধিকতর শক্তিশালী বীজ উৎপাদন করিতে পারে এবং উক্ত ইক্ষুগুলিই বীজ উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী। ইক্ষুবীজ পক্ব হইলেই, বাতাসে উড়িয়া যায়—ইহাই বীজ সংগ্রহের প্রধান অন্তরায়। সুতরাং ইক্ষুশীর্ষের নীচেকার পত্রগুলি হরিদ্রাবর্ণ হইলেই শীর্ষটি কাটিয়া বীজগুলি যত্নপূর্ব্বক পৃথক পৃথক করিতে হয়। গোময় সারযুক্ত মৃত্তিকা একটি কাঠের বাক্সে সমতল করিয়া রাখিয়া

তাহার উপর উক্ত বীজগুলি কর্পূরবাসিত জলে ধুইয়া ছড়াইয়া দাও। বীজগুলির উপরে যেন আর মাটি দেওয়া না হয়, সে বিষয় লক্ষ্য রাখ। পরে সূক্ষ্ম জলধারায় বীজগুলি সিক্ত করিয়া, বাক্সটি রৌদ্রে রাখ। মাটি শুকাইলে পুনরায় জলসিক্ত কর। এইরূপে ৫।৭ দিনের মধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণোদ্গম হইবে। যদি এ সময়ের মধ্যে তৃণোদ্গম না হয় তবে বুঝিতে হইবে যে বীজের উৎপাদিকা শক্তি ছিল না। তৃণগুলি এক আঙ্গুল লম্বা হইলেই তাহাদিগকে পুনরায় অন্য বাক্সে পূর্ব্বোপায়ে প্রোথিত কর। ক্রমে সেগুলি এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইলে তাহাদিগকে সাধারণ উপায়ানুসারে ক্ষেত্রে প্রোথিত কর। বলা বাহুল্য এ উপায়ে নূতন বলিষ্ঠ ইক্ষু উৎপাদন করাই মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং ক্ষেত্রে প্রোথিত করিবার সময় সবল তৃণগুলি বাছিয়া, প্রোথিত করা আবশ্যক।”

ভারতে উক্ত উপায়ে নূতন ইক্ষু প্রায়ই উৎপাদিত হয় না। এ উপায়ে, ইক্ষু হইতে চৈত্র মাসে বীজ সংগ্রহ করিয়া, বৈশাখ মাসে ইক্ষুবীজগুলি কর্পূরবাসিত জলে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পূর্ব্বোপায়ে প্রোথিত করা আবশ্যক। আষাঢ় মাসে ক্ষেত্রটি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া জলসেকের পর, তৃণগুলি বপন করিলে, সেগুলি ১৷৷০ বৎসর পরে কর্ত্তনের উপযোগী হইবে। বর্ষা না হইলে, এ প্রণালীতে জলসেকের বিশেষ আবশ্যক হয়।

তৃতীয় প্রণালী।

ইক্ষুগ্রন্থি হইতে নূতন ইক্ষু উৎপাদন—ইহা বহুকাল-প্রচলিত সাধারণ উপায়। ইক্ষু কর্ত্তিত হইলে, উহার উপরিভাগের কিয়দংশ কাটিয়া লওয়া হয়। এই অংশ হইতে পত্রাদি ছাড়াইয়া দ্বিতীয় গ্রন্থি পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড করা হয়। পরে একটি গহ্বর খনন করিয়া তাহার তলদেশে সিক্ত খড় ও ছাই বিছাইয়া কতকগুলি কর্ত্তিত অংশ রাখা হয়। তাহার উপর পুনরায় ছাই ও খড় বিছাইয়া দেওয়া হয়, এইরূপে স্তরে স্তরে গহ্বরমুখ পর্য্যন্ত ইক্ষুখণ্ড ও খড় ও ছাই বিছাইয়া, সর্ব্বোপরি পুনরায় খড় ও মৃত্তিকা চাপা দিতে হয়। এ প্রক্রিয়ায়, এক সপ্তাহ মধ্যে ইক্ষুগ্রন্থিসমূহ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয়। প্রায় একমাস পর্য্যন্ত উক্ত ইক্ষুবীজ এরূপ গহ্বরে থাকিতে পারে। ইতিমধ্যে ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া ইক্ষু রোপণোপযোগী করিয়া লওয়া হয়। রোপণের পূর্ব্বে বীজগুলি কীটনাশক পদার্থে নিমজ্জিত করা আবশ্যক। কীটনাশক পদার্থ প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইরূপ :—

(১) অর্দ্ধসের চূণ উত্তমরূপে ৫০ সের গরমজলের সহিত মিশ্রিত কর। (২) ৫০ সের রেড়ীর খৈল, ১ সের ছাই ও অর্দ্ধ সের ঝুল উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লও। ইক্ষুবীজ প্রথমে ১নং জলে ডুবাইয়া লও পরে ২নং গুঁড়া বীজে মাখাও। ১নং জলে অর্দ্ধ আউন্স হিং দিলে আরও ভাল হয়। বীজগুলি গুঁড়া মাখাইবার পর ক্ষেত্রে রোপণোপযোগী হয়।

রোপণ-সময় ও প্রণালী।

ইক্ষু সচরাচর মাঘ কিম্বা ফাল্গুন মাসে ক্ষেত্রে রোপিত হয়। চৈত্র মাসে রোপণ করিলে একবার জলসেকের খরচা বাঁচিয়া যায় কিন্তু ঐ ইক্ষু পরবর্ত্তী ফাল্গুন মাসের পূর্ব্বে কাটিতে পারা যায় না। ইক্ষু রোপণ করিবার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রণালী আছে। নিম্নে কয়েকটি দেওয়া গেল :—

প্রথম প্রণালী।

বঙ্গদেশে :—ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে ১ হইতে ১৷৷০ হস্ত অন্তর অর্দ্ধহস্ত পরিমিত গহ্বর খনন করা হয়। প্রত্যেক গহ্বরে হেলাইয়া ইক্ষু রাখা হয় ও তাহার উপর মাটি চাপা দেওয়া হয়। এ প্রণালীর অসুবিধা এই যে ইক্ষুর তলদেশ যখন আল্‌গা করিবার আবশ্যক হয় তখন কেবল খুরপা ও কোদালী ভিন্ন অন্য যন্ত্রের সাহায্য লওয়া যায় না। বিহারাঞ্চলে ‘ভুলি’ ও ‘হেম্‌জা’ ইক্ষু এত ঘন করিয়া রোপণ করা হয় যে তাহাতে শৃগাল বন্যশূকর প্রভৃতি জন্তু প্রবেশ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রণালী।

মরিসিয়স্ দ্বীপে প্রায়ই ঝড় হয়। এ জন্য সেখানে অন্যরূপ রোপণপ্রণালী প্রচলিত। তাহা এইরূপ :— ক্ষেত্রটির এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ৪।৫ ফুট অন্তর ১ ফুট চওড়া ও ১ ফুট গভীর করিয়া

গহ্বর করা হয়। এইরূপ গহ্বরের ৩ ইঞ্চি প্রথমে মাটি দিয়া ভরাইয়া দেওয়া হয় ও জলসিক্ত করা হয়। এই সিক্ত মৃত্তিকায় ৯ ইঞ্চি অন্তর ৩টি করিয়া ইক্ষুবীজ তীরাগ্রভাগের মত রোপিত হয়। পরে তাহার উপর আরও ৩ ইঞ্চি মাটি চাপাইয়া দেওয়া হয়। যখন চারাগুলি বর্দ্ধিত হইয়া এক ফুট হয়, সে সময় অবশিষ্ট গহ্বর সার দিয়া ভরাট করা হয় ও ক্ষেত্র সমতল করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বার সার দিবার সময়ও প্রত্যেক ইক্ষুচারার চতুষ্পার্শ্বে যাহাতে সার পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

তৃতীয় প্রণালী।

অষ্ট্রেলিয়া ও নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে, ক্ষেত্রটি ৪ হাত অন্তর ১ হাত করিয়া বিভাগ করিয়া লওয়া হয়। এই ১ হাত জমির উভয় পার্শ্বে ২ সারিতে ইক্ষু রোপণ করা হয়। এ প্রণালীর সুবিধা এই যে উক্ত ৪ হাত জমিতে অন্য চাষ চলিতে পারে। আর যখন ইক্ষুর তলদেশ আল্‌গা করিতে হয় তখন মধ্যে পরিসর থাকায়, বলদ সাহায্যে লাঙ্গল দেওয়া যাইতে পারে।

চতুর্থ প্রণালী।

ইহা মলিসন্ সাহেব এ দেশে প্রচলিত করিয়াছেন। ইক্ষুক্ষেত্র গোময় সারাদি দিয়া উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে লাঙ্গল সাহায্যে ২ ফুট অন্তর মৃত্তিকা উচ্চ করিয়া দেওয়া হয়; পরে সমুদয় ক্ষেত্রটি ১০ ফুট লম্বা ও ১০ ফুট চওড়া ভাগে লাঙ্গল সাহায্যে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ভাগের চারিদিকে জল আটক করিবার জন্য ৯ ইঞ্চি বাঁধ দেওয়া হয়। এরূপে প্রত্যেক বিভক্ত অংশগুলিতে ৪টি উচ্চ ও ৫টি নিম্নাংশ থাকে। এই নিম্নাংশে প্রথম ইক্ষু প্রোথিত করা হয়। ইক্ষুচারা বর্দ্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ উচ্চাংশ হইতে মৃত্তিকা ইক্ষুমূলে দেওয়া হয়। এরূপে ক্রমশঃ উচ্চাংশগুলি খাদে পরিণত হইয়া জলপ্রণালীর কার্য্য করে।

চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ইক্ষুক্ষেত্রে আবশ্যক মত ৪।৫ বার জলসেক করা বিধেয়। বর্ষাকালে জলসেকের কোন আবশ্যক হয় না। কার্ত্তিক মাস হইতে ইক্ষু কর্ত্তনের পূর্ব্বে আরও ৪।৫ বার জলসেক করিতে হয়। বোম্বাই প্রদেশে উক্ত সময়ে অধিক জলসেকের আবশ্যক হয়। কৃষিবিভাগের কর্ত্তা মলিসন্ সাহেব তাঁহার Indian Agriculture গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ৩৪ বার জলসেকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এ প্রক্রিয়ায় ৫০ ইঞ্চি ও বারিপাতে ৫০ ইঞ্চি মোট ১০০ ইঞ্চি জল ইক্ষুচাষের জন্য আবশ্যক।

চৈত্র হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ইক্ষুর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। ইক্ষু বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জলসেক করা এ সময়ের প্রধান কার্য্য। বর্ষা আরম্ভ হইলে কেবল আবশ্যক মত গোড়ায় মাটি দিতে হয়। কিন্তু যাহাতে গোড়ার মাটি শিথিল থাকে সে বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রচুর বারিপাতের পর, ইক্ষুর গোড়ার মাটি প্রায় চাপ বাঁধিয়া যায়, সে সময় খুরপা, কোদালি বা হো (Hunter Hoe) সাহায্যে চাপ ভাঙ্গিয়া মাটি বেশ আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। ইহাতে ইক্ষুমূলে বায়বীয় ক্রিয়া উত্তম রূপে সাধিত হইতে পারে।

শ্রাবণ মাসে যখন ইক্ষু বেশ বড় হয়, তখন সাধারণতঃ ২টি প্রণালী অবলম্বিত হয়—১ম, ক্রমশঃ বৃদ্ধির সহিত ইক্ষুগাত্র হইতে পুরাতন পত্র ছিঁড়িয়া লওয়া। এ প্রণালীতে ইক্ষু বেশ সমান ও পরিষ্কার রূপে জন্মায়। কিন্তু শৃগাল ও শূকর শীঘ্রই এরূপ ইক্ষু নষ্ট করে। অধিকন্তু ট্রাইস্পোপেরিয়া (ধসা) নামক রোগ ইক্ষুতে জন্মাইবার সুবিধা হয়। সুতরাং দ্বিতীয় প্রণালীই প্রকৃষ্ট—এ প্রণালীতে ইক্ষু বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন শুষ্ক ইক্ষুপত্র দিয়া ২।৩টি ইক্ষু বন্ধন করিয়া দিতে হয়। বর্দ্ধমান ও শিবপুর কৃষিক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে এরূপ প্রণালীতে বিঘা প্রতি ২।৩ টাকা অধিক খরচা পড়িলেও পূর্ব্বপ্রণালী অপেক্ষা এ প্রণালীতে অধিক গুড় উৎপন্ন হয়। অধিকন্তু শৃগাল ও শূকরে অধিক নষ্ট করিতে পারে না, আরও সামান্য ঝড়ে এরূপ ইক্ষু ধরাশায়ী হয় না।

শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত অন্ততঃ ২।৩ বার ইক্ষু বাঁধিবার আবশ্যক হয়।

ডাক্তার লেদার বলেন ইক্ষুতে ৩০০ হইতে ৩৫০ পাউণ্ড যবক্ষারজানের আবশ্যক। সুতরাং খৈল ইক্ষুর প্রকৃত

সার। ৺নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত সারগুলি ইক্ষুতে দিতে পরামর্শ দিয়াছেন—

	সার	ক্ষেত্রে দিবার সময় ও কত দিতে হইবে।
১।	হাড়ের গুঁড়া	ইক্ষুক্ষেত্রে রোপণ করিবার পূর্ব্বে একার (=বাঙ্গালা ৩১/২ বিঘা) প্রতি ১০ মন।
	ও	
	রেড়ীর খৈল	বিঘা প্রতি ১০ মন। দুই বারে ৫৴ মন করিয়া দিতে হইবে।
২।	হাড়ের গুঁড়া	ইক্ষু প্রোথিত করিবার পূর্ব্বে একার প্রতি ১০ মন।
	ও	
	গোময়	জমি কর্ষিত হইবার পূর্ব্বে ২০০৴ মন।
৩।	শুষ্ক বিষ্ঠা	ইক্ষু রোপণ করিবার পূর্ব্বে একার প্রতি ৩৫০৴ মন।
৪।	(১) গুঁড়া অ্যাপেটাইট্	ইক্ষু প্রোথিত করিবার পূর্ব্বে বিঘা প্রতি ২৴ মন।
	(২) রেড়ীর খৈল	একার প্রতি ২০৴ মন ২ বারে দিতে হইবে।
	ও	
	(৩) সোরা	একার প্রতি ২৴ মন। ইক্ষুচারা ১ফুট উচ্চ হইবার পর বর্ষার পূর্ব্বে ২ বারে দিতে হইবে।
৫।	রেড়ীর খৈল	একার প্রতি ৩৫৴ মন। ইক্ষুর গোড়ায় মাটি দিবার পূর্ব্বে ২ বারে দিতে হইবে।
৬।	পচা মৎস্যসার	ইক্ষু রোপণ করিবার পর বিঘা প্রতি ১০৴মন।
৭।	কুসুম-খৈল	ইক্ষু রোপণ করিবার পূর্ব্বে বিঘা প্রতি ৫৴ মন ও পরে ৫৴ মন।
৮।	সরিষা-খৈল	একার প্রতি ৫০৴ মন। ইক্ষু রোপণের পূর্ব্বে অর্দ্ধেক ও পরে অর্দ্ধেক পরিমাণ দেওয়া আবশ্যক।
৯।	(১) সুপার	একার প্রতি ৫৴ মন। ইক্ষু চারা ১ ফুট উচ্চ হইলে প্রত্যেক ইক্ষুমূলে মুষ্টিমাত্র প্রয়োগ বিধেয়।
	(২) সলফেট অফ্ এ্যামোনিয়া (Sulphate of Ammonia)	একার প্রতি ১১/২ মন। ইক্ষুচারা ১ ফুট উচ্চ হইলে প্রত্যেক ইক্ষুমূলে মুষ্টিমাত্র প্রয়োগ বিধেয়।
	(৩) সলফেট অফ্ পটাস্ (Sulphate of Potash)	একার প্রতি ১১/২ মন। প্রত্যেক ইক্ষুমূলে মুষ্টিমাত্র প্রয়োগ বিধেয়।

বিষ্ঠা ইক্ষুর পক্ষে উত্তম সার। ফট্‌কিরী, রক্ত ও কাদা মিশাইয়া বিষ্ঠা শুষ্ক ও গন্ধশূন্য করিবার পর, উহা গুঁড়াইয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

গোময় সকল শস্যেরই উত্তম সার। সাধারণতঃ ইহা স্তূপাকারে রক্ষিত হইয়া থাকে। বৃষ্টি ও সূর্য্যের উত্তাপে এই স্তূপ হইতে শস্যবর্দ্ধক অনেক দ্রব্য নষ্ট হয়। এজন্য গোময় রক্ষার প্রকৃষ্ট প্রণালী এই :—

একটি গহ্বর খনন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে খড় বা দরমা দিতে হইবে। উক্ত দরমা বা খড়ে মৃত্তিকার উত্তমরূপে প্রলেপ দিবে। ইহারই মধ্যে প্রাত্যহিক গোময় সংগ্রহ করিবে। গহ্বরের উপরে সূর্য্যোত্তাপ ও বৃষ্টি নিবারণের জন্য ছোট একটি চালা ছাইয়া দিবে। উক্ত প্রকারে যে গোময় রক্ষিত হয় তাহা সাধারণভাবে রক্ষিত গোময় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ইক্ষুতে গোময় দিতে হইলে উপরোক্ত প্রকারে গোময় পচাইয়া পরে শুষ্ক ও গুঁড়া করিয়া ইক্ষুমূলে দিলে শীঘ্র ফলপ্রদ হয়। ৯নং সার—আমেরিকায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। উক্ত সারের দ্রব্যত্রয় কোন্নগরে ডি, ওয়ালডি কোম্পানীর নিকট পাওয়া যায়। সুপার ৩৲ টাকা মন, সলফেট অফ্ এ্যামোনিয়া ৯৲ ও সলফেট অফ্ পটাস ৪৲ টাকা মন। উক্ত কোম্পানীকে লিখিলে তাঁহারা দ্রব্যত্রয়ের বাজার দর দিতে পারেন।

হাড়ের গুঁড়ার ভারতবর্ষে অভাব হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্যান্য শস্যের, বিশেষ ভাবে ইক্ষুর, উত্তম সার

হইলেও, পল্লীসমূহ হইতে হাড় সংগ্রহ করিয়া বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। ইহাতে ভারতের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। হাড় বিদেশে না পাঠাইয়া বরং উহাকে সুপারে পরিণত করিয়া বিদেশে পাঠাইলে কতক লাভ হয়।

ইক্ষুর ধ্বংসকারী কীট ও তাহাদের দমনোপায়।

১। ইক্ষুর সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী কীট, বঙ্গদেশে "মাজেরা পোকা" বলিয়া পরিচিত।* ইক্ষুর শীর্ষপত্র শুষ্ক হওয়া, ইহার আক্রমণের চিহ্ন স্বরূপ। ইহারা ইক্ষুকাণ্ড ছেদন করিয়া ইক্ষু একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। একরূপ ক্ষুদ্র প্রজাপতি হইতে এই পোকার জন্ম হয়। এই প্রজাপতি (chilo simplex moth) ইক্ষুশীর্ষে নূতন পত্রে ডিম্ব পাড়িয়া যায়। একসঙ্গে চারি পাঁচটি হইতে ২০।২৫টি ডিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ডিম্বগুলি প্রথমে শ্বেত কিন্তু ক্রমে হরিদ্রাবর্ণ ও ফুটিবার পূর্ব্বে কমলা রঙে পরিণত হয়। ডিম্ব প্রসবের পর হইতে ডিম্ব হইতে পোকা বাহির হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে। পোকা ডিম্ব হইতে বাহির হইয়া প্রথম ৫।৭ দিন শীর্ষপত্র খায় পরে ক্রমশঃ ইক্ষুকাণ্ডে গর্ত্ত করিয়া প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। শীতকাল ভিন্ন অন্য সময়ে এ অবস্থায় প্রায় ১ মাস থাকে। এ সময়ে ইহারা ইক্ষুকাণ্ড ক্রমশঃ ভেদ করিতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কলেবরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পূর্ণাবয়ব কীট প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা। এসময়ে ইহাদের ১৬টি পা, মস্তকটি কাল, দেহ মেটে রঙের ও ছোট ছোট কালদাগ বিশিষ্ট ও কেশে আবৃত দেখা যায়। "গুটি"তে পরিণত হইবার পূর্ব্বে ইহারা কাণ্ডের বহির্ভাগে একটি ছিদ্র করিয়া রাখে। পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তির পর ইহারা ২ দিন বিশ্রাম করে। তাহার পর ইহারা "গুটি"তে পরিণত হয়। এ অবস্থায় ৬।৭ দিন গেলে পুনরায় প্রজাপতি হইয়া কাণ্ডের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। প্রজাপতিগুলি মেটে রঙের ও "শুঁড়"যুক্ত হয়। সঙ্গমের পর "নর" প্রজাপতি মারা যায়, "স্ত্রী" প্রজাপতি ডিম্ব প্রসবের জন্য আরও ২।৪ দিন বাঁচে।

* বীরভূম জেলায় ইহাকে "টোটা" বলে।

শীতকালে অনেক সময় পোকা "গুটি"তে পরিণত না হইয়া "সুপ্তাবস্থায়" থাকে। এরূপ অবস্থায় প্রায় ৫।৬ মাস যায়। ইক্ষুমূল হইতে নূতন ইক্ষু উৎপন্ন হইলে ইহাদের আহারের পুনরায় সুবিধা হয়।

অন্য একরূপ পোকা (White Borus) আছে, দেখিতে প্রায় "মাজেরা"র মত—কেবল প্রজাপতিটি সাদা ; ইহারাও "মাজেরা"র ন্যায় অনিষ্টকারী।

ইক্ষু "মাজেরা" কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গে "ধসা" দেখা দেয়। "ধসা" ধরিলে ইক্ষুর মধ্যে লাল হইয়া যায় ও ইক্ষুরসের মিষ্টত্ব থাকে না। "ধসা" ও "মাজেরা" অনেক জায়গায় এক সঙ্গে দেখা দেয় বলিয়া কখনও কখনও পোকাকেই "ধসা" বলে।

"মাজেরা"র দমনোপায়।

মাজেরা দমনের কতকগুলি উপায় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) "মাজেরা" ধরিলে ইক্ষুর মধ্যবর্ত্তী পত্র প্রথমেই শুষ্ক হইয়া যায়। এরূপ শুষ্ক পত্র দেখিলেই বুঝা যায় যে ইক্ষুতে "মাজেরা" ধরিয়াছে। আক্রান্ত ইক্ষুগুলি গোড়া হইতে কাটিয়া জড়ো করিয়া আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া "মাজেরা" দমনের প্রধান উপায়।

(২) ইক্ষু বপনের সহিত ক্ষেত্রের ভুট্টা (মক্কা) বপন কর। এরূপ করিলে "মাজেরা" ইক্ষু ছাড়িয়া প্রথমে ভুট্টা আক্রমণ করিবে। আক্রান্ত মক্কাগুলি গোড়া হইতে কাটিয়া পোড়াইয়া দিলে ইক্ষুতে "মাজেরা" ধরিতে পায় না।

(৩) শীর্ষপত্রে ডিম্ব দেখিলে নষ্ট করা "মাজেরা" দমনের অন্য এক উপায়।

২। উইপোকা—অনেক সময় ইক্ষুক্ষেত্র ইহাদের দ্বারা নষ্ট হয়।

(১) ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে "উই"র বাসা ভাঙ্গিয়া যাওয়া সম্ভব।

(২) ইক্ষু বপনের পূর্ব্বে কীটনাশক দ্রব্য ইক্ষুতে লাগাইয়া দিলে ইক্ষুতে "উই" ধরে না।

(৩) রেড়ীর খৈল ইক্ষুতে সার দিলে "উই" দমন হয়।

(৪) "উইর" বাসা খুঁজিয়া সেস্থল উত্তমরূপে খুঁড়িয়া শুষ্ক পত্রাদিসহ আগুন ধরাইলে "উই" নষ্ট হয়। বাসা

মৃত্তিকার অধিক নিম্নে হইলে কেরোসিন তৈল বা স্যানিটারি ফ্লুইড (Sanitary Fluid) সেস্থলে ঢালিয়া দিলে "উই" নষ্ট হয়।

(৫) ইক্ষুতে জলসেক করিবার সময় জলপ্রণালীর সম্মুখে কাপড়ের পুঁটুলিতে কতকটা হিং বাঁধিয়া রাখিলে "উই" দমন হয়।

(৬) বাসার নিকট বিষাক্ত মিষ্টদ্রব্য গুঁড়াইয়া ছড়াইয়া দিলেও "উই" দমন হয়।

৩। আঁইস পোকা—বিহারে ইহা "লাহি" বলিয়া পরিচিত।

৪। ছাত্‌রা—ইক্ষুকাণ্ডে একজায়গায় ইহাদের অনেক-গুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

"আঁইস পোকা" ইক্ষুপত্র হইতে ও "ছাত্‌রা" ইক্ষুকাণ্ড হইতে রস চুষিয়া খাইয়া ইক্ষুকে নির্জীব করিয়া ফেলে। কেরোসিন্ ইমল্‌সন (Kerosine Emulsion) বা অন্য কোন কীটনাশক দ্রব্য* দিয়া স্প্রেইং মেসিন (Spraying Machine) সাহায্যে ইক্ষুতে দিলে "আঁইস পোকা" বা "ছাত্‌রা" দমন হয়।

কেরোসিন্ ইমল্‌সন্ তৈয়ারী করিবার প্রণালী এই-রূপ—এক পোয়া বার্‌সোপ্ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ৪ বোতল জলের সহিত সিদ্ধ কর। সাবান ও জল উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে, ৮ বোতল কেরোসিন্ তৈল উহাতে দাও এবং বেশ করিয়া ঘাঁটিতে থাক। এরূপে যখন তৈল, জল ও সাবান উত্তমরূপে মিশ্রিত হইবে, সে সময় এই মিশ্র পদার্থ ১ ভাগ লইয়া ৯ ভাগ জল মিশাও। পরে স্প্রেইং মেসিন সাহায্যে গাছে ছিটাইয়া দাও।

উপরোক্ত কীটগুলি ইক্ষুর বিশেষ অনিষ্টকারী। নিম্ন-লিখিত পোকাগুলি অধিক পরিমাণে না জন্মাইলে তেমন ক্ষতি করিতে পারে না।

৫। ধেনো ফড়িং—কখনও কখনও ইক্ষুর পাতায় দেখা যায়। ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে ও ক্ষেত্রপার্শ্বে তৃণাদি না জন্মাইতে দিলে ইহারা ইক্ষু আক্রমণ করিয়া অনিষ্ট করিতে পারে না।

৬। শোষক পোকা—ইহারা ইক্ষুর পত্রের রস চুষিয়া খায়। সুতরাং ইহারা পত্রের অনিষ্টকারী। কেরোসিন্ ইমল্‌সন্ ইহাদের দমন করে।

৭। ইক্ষুমক্ষিকা—ইহাদের প্রায়ই পুরাতন ইক্ষুক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী মক্ষিকা ইক্ষুপত্রের মধ্যদেশে ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র (প্রায় $\frac{১}{২৫}$ ইঞ্চি লম্বা) হরিদ্রাবর্ণ কিম্বা সবুজ আভাযুক্ত। ১০।১৫টি ডিম এক সঙ্গে দেখা যায়। ডিম্বগুলির উপরে শ্বেত আচ্ছাদন থাকায় সহজেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ২।৪ দিনের মধ্যে ডিম্ব হইতে ক্ষুদ্র কীট বাহির হয়। ইহাদের দেহের শেষভাগে ছোট 'লেজের' মত আছে, তাহা ইচ্ছানুসারে ইহারা গুটাইয়া লইতে বা বাড়াইতে পারে। এই "লেজ" সাদা গুঁড়ায় আবৃত থাকে। ৫ বার "খোলস্" বদলাইবার পর ইহারা পূর্ণাবয়ব লাভ করে। অত্যধিক পরিমাণে না জন্মাইলে ইহারা তত অনিষ্ট করে না। অনিষ্টকর হইলে, ডিম্বগুলি সংগ্রহ করিয়া ধ্বংস করাই ইহাদের দমনের প্রধান উপায়।

৮। গুবরে পোকা ও অন্যান্য ২।৪ রকমের পোকা কখনও কখনও ইক্ষুতে দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের দ্বারা এত কম অনিষ্ট হয় যে এ স্থলে তাহাদের বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

লাভালাভ।

৺নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'Indian Agriculture' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন এক একার (=৩$\frac{১}{২}$৳ বিঘা) ইক্ষুচাষে মোট ১৬৬৲ টাকা খরচ পড়ে। তিনি ৪০মন চিনি ও ৫ মন ঝোলাগুড় ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ হিসাব দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে ইহা হইতে সর্ব্বসমেত ২১৬৲ টাকা আয় হইতে পারে। সুতরাং লাভ একার প্রতি ৫০৲ টাকা। বিহারে মজুরের হার কম বলিয়া লাভ ১২০৲ পর্য্যন্ত হইতে পারে। সহরের নিকট আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইক্ষু কাটিয়া বিক্রয় করিলে ২০০৲ পর্য্যন্ত লাভ হয়। বর্দ্ধমান অঞ্চলে বিঘা প্রতি ৬০।৭০ মন গুড় হয়। সুতরাং একার প্রতি গড়ে ২০০ মন গুড় পাওয়া যাইতে পারে। মন প্রতি ৬৲ টাকা

* Resin Wash, Crude Oil Emulsion, Mac Dougal's Insecticide.

হিসাবে ১২০০৲ টাকা আয় হইতে পারে। সুতরাং খরচা বাদ দিয়া প্রায় একার প্রতি ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। সুতরাং কম করিয়া ধরিলেও অন্ততঃ ইক্ষুতে বিঘা প্রতি ২০০৲ টাকা লাভ হইতে পারে।

ভারতে ২৫০০০০ একার ভূমিতে ইক্ষুচাষ সত্ত্বেও বিদেশ হইতে প্রায় ৫০ লক্ষ মন চিনি আমদানী হইয়া থাকে। আরও তামাকের জন্য ৫ লক্ষ মন চিটাগুড় আমদানী হয়। সুতরাং ইক্ষুচাষের আবশ্যকতার বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

বেথিয়া। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ধৈর্য্যলাভ

সাগর কহিল ডাকি চাঁদেরে চাহিয়া
জোয়ারে ভাটাতে ওগো হাসিয়া কাঁদিয়া,
উঠিয়াছি পড়িয়াছি কত শত বার
নাগাল তবুও আমি পাইনি তোমার।
আজি তাই ভাবিয়াছি মহা উর্ম্মি তুলি
তোমারে ধরিব বুকে, সব বাধা ভুলি।
চন্দ্র কহে স্থির থাক ওহে পারাবার
তাহলেই পাবে মোরে বুকেতে তোমার॥

শ্রীমতী শশিবালা দেবী।

ভক্ত ও ভাক্ত

ভূতপূর্ব্ব ভারত সংস্কারকের সম্পাদক অধুনা লোকান্তরিত কালীনাথ দত্ত মহাশয় ও বামাবোধিনী-সম্পাদক স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আবাল্য সুহৃদ ছিলেন। উভয়ে উভয়কে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমাদের দৃষ্টিতে স্বর্গীয় মহাত্মাদ্বয় সাধুপুরুষ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাদের সহবাসসুখে আত্মার আনন্দ বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই আমার সঙ্গে একমত হইয়া তাঁহাদিগকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া সমাদর করিয়া থাকেন! স্বর্গীয় সাধু উমেশচন্দ্রকে কালীনাথ বাবু বলিতেন "উমেশ, উমেশ, তোমার কাছে যে যখন থাকে, সে চোর হয়।" এরূপ সাধু মহাত্মার নিকটে থাকিয়া লোক 'চোর' হয়, স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত মহাশয় এমন একটা কথা কেন বলিয়াছেন এ বিষয় অনেক সময়ে চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বে ভাসা ভাসা ভাবে বুঝিতাম, কথাটাকে বিদ্রূপ বলিয়া মনে করিতাম, কিন্তু এখন এ বয়সে আর বিদ্রূপ বলিয়া মনে হয় না। এখন দেখিতেছি, "Nearer to Church farther from God" একথা অতি সত্য কথা। ময়রা যেমন মিঠাই খায় না, সেইরূপ দেবমন্দিরের দেবসেবকেরা ধর্ম্মের ধার ধারে না। আশা করি এ কথাটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না। অনেক ব্যথিতহৃদয় ভুক্তভোগী আমার একথার সাক্ষ্য দিবেন।

এই গেল তীর্থস্থান দেবমন্দির, তীর্থপাণ্ডা ও দেবসেবকদের অবস্থা। আমাদের নিজ জীবনের আধ্যাত্মিক অবস্থা যতই শোচনীয় হউক না, এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে একটা বস্তুকে আমরা জীবনের মহামূল্য সম্পদ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। সে সম্পদ এই যে আমাদের মর্ত্ত্য-জীবন ধারণের এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে আমরা সৌভাগ্য-বশে কতকগুলি ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাত্মার আবির্ভাব সন্দর্শন করিলাম, যে সন্দর্শন লাভের উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিতেও আমরা সক্ষম নহি। এরূপ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। মর্ত্ত্যবাসী জীবমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ থাকিলেও কতকগুলি বিষয়ে বিষম একতা বর্ত্তমান। জীবের নিত্য জীবনযাপনে এই একতার পরিচয় পাওয়া যায়। আহার নিদ্রা প্রভৃতি কতকগুলি শারীরিক ও দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক বৃত্তির পরিচালনায় আমরা এই এক-তার সাক্ষ্য পাইয়া থাকি। এইরূপ কতকগুলি বিষয়ে মানব ও অন্যান্য জীবে একতা বিদ্যমান। মানুষ তবে কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ? আহার বিহারের পদ্ধতি ও সুসভ্য-ভাবে সামাজিক জীবন যাপনের মধ্যেই কি এই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ত্তমান? আমরা তাহা মনে করি না। মানবেই কেবল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনশীল জ্ঞানের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জাগতিক জীবনযাত্রার মহামেলার মধ্যস্থলে মানবেই কেবল বিবিধ গুণনিচয়ের উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রাম দেখিতে

পাওয়া যায়। জীবজগতের অনুন্নত অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা ও স্থিতিশীলতা নিবন্ধন আলস্য মানবে বিদ্যমান থাকিলেও মানবেই কেবল উচ্চতর বিকাশ সন্দর্শন করিয়া আমরা অনেক সময়েই ধন্য বোধ করিয়াছি। একতা সত্ত্বেও যেমন জীবমণ্ডলের মধ্যে মানব কতকগুলি গুণের পরিচর্য্যায় পরিতৃপ্ত বলিয়া শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ মানবমণ্ডলের মধ্যেও আবার কতকগুলি জীবমণ্ডলের গোত্রভুক্ত না হইয়াও গোত্রভুক্ত হইয়া জীবনধারণ করিতেছে, আর কতকগুলি নিজ শক্তিবলে নিজকে ভাগবতী কৃপার অধীন করিয়া মানবসমাজে উচ্চ আদর্শ স্থাপনে ব্যস্ত। এই শ্রেণীর মানুষকে তিনটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণী সিদ্ধ পুরুষ, দ্বিতীয় শ্রেণী সাধক, আর তৃতীয় শ্রেণী লোক-সেবা-পরায়ণ বিষয়ী বীর। প্রাচীন কালের ইতিহাস ও জীবনী-সংবাদ পর্য্যালোচনা করিলে প্রথম শ্রেণীর অনেকগুলি মহাপুরুষের বিষয় অবগত হওয়া যায়। দেবর্ষি নারদ ও রাজর্ষি জনক এই সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রাচীনকালে বুদ্ধদেব সাধনবলে সেই উচ্চপদের অধিকারী হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় জগতের অসামান্য আদর্শ-পুরুষ যিশু খৃষ্ট সাধনের অবস্থা অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতেছেন, এমন সময় আততায়ীর হস্তে তাঁহার মর্ত্ত্যজীবন পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্র ও জীবন লোকশিক্ষার উপযোগী উপাদানে পরিপূর্ণ হইলেও তিনি সাধনার অবস্থা পূর্ণরূপে অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিলেন। সমগ্র সভ্যজগৎব্যাপী তাঁহার সমাদর ও সম্মানের সর্ব্বপ্রধান কারণ তাঁহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচারপূর্ণ মৃত্যুর ব্যবস্থা। লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহার পরবর্ত্তী মহাপুরুষ হজরৎ মহম্মদও ঐ যিশুর শ্রেণীভুক্ত। আমি এখানে ইহার একটিমাত্র কারণের উল্লেখ করিতেছি। এই দুই ভগবদ্‌ভক্ত মহাপুরুষ সাধনের অবস্থা পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া সিদ্ধপুরুষে পরিণত হইলে নির্য্যাতনগ্রস্ত হইয়া আততায়ীর অত্যাচার পরিহার মানসে ইঁহাদিগকে নানাস্থানী হইতে হইত না। সিদ্ধপুরুষের ব্রহ্মশক্তির সম্মুখে, সংসারের সকল শক্তিই পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য। অজেয় ব্রহ্মশক্তি যখন পূর্ণরূপে মানবকে আক্রমণ ও অধিকার করে, তখন সে মানবসন্তান ব্রহ্মশক্তিতে পরিণত হইয়া ধ্রুব প্রহ্লাদের ন্যায় সকল শক্তিকে জয় করে। সংসারের দানবশক্তি সে অজেয়শক্তির নিকট নিত্য পরাজিত। যিশু ও মহম্মদের নানাস্থানে পলায়ন এই দিব্যসত্যের বিরোধী। তাঁহাদিগকে সাধকের উচ্চ অবস্থার মহাপুরুষ বলিয়া মনে হয়।

আপ্ত-বাক্য-সম্পন্ন ভারতীয় ঋষিকুলের অনেকেই সাধনার অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও সাধকের অবস্থায় দেহপাত করিয়াছিলেন। নিজেকে তিনি ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেই প্রীতিলাভ করিতেন। বিশ্বাসবলে বলীয়ান নানক, কবীর ও ভক্ত রামপ্রসাদ সেন ভক্তিপথের পথিক ছিলেন। গীতার টীকাকার মহানুভব রামানুজও সেই ভক্তিপথের যাত্রী।

এখন এই সকল বিষয়ের আলোচনাতে আমাদের লঘুচিত্ত আত্মার কিঞ্চিৎ কল্যাণ সাধন হইলেও হইতে পারে কিন্তু এই উচ্চ বিষয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মহত্ত্বাবের আলোচনাতে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে জ্বালারও সঞ্চার হয়। ইহাই দারুণ পরিতাপের বিষয়। আজ কাল "স্বামী" "আনন্দ" "প্রভুপাদ" "শাস্ত্রী" ও "বিদ্যাসাগর"-এর ছড়া-ছড়ি। এমন দিনে মহাপুরুষদিগের গুণাবলীর আলোচনা ও তদ্দারা আত্মার আনন্দবর্দ্ধন এক কঠিন ব্যাপার হইয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে হিতবাদী পত্রিকায় পাঠ করিয়াছিলাম, ঢাকার বুড়ীগঙ্গায় "সাগরের" তরঙ্গতুফান উঠিয়াছিল। আজ কাল আমরা সংস্কৃত কলেজের বাহিরেও অনেক "শাস্ত্রী" দেখিতে পাই। আজ কাল কণ্ঠ ভরা তুলসীর মালা থাকিলেই তাঁহাকে "প্রভুপাদ" অভিধানে সমাদর করিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। যাঁহার আনন্দের লেশমাত্র নাই তিনিও "আনন্দ"। এক বিবেকানন্দকে "স্বামী" বলিলে বা "আনন্দ" বলিলে সহ্য হয় কারণ স্বামীত্বের ও আনন্দের আভাস অনুসন্ধান করিলে তাঁহার জীবনলীলায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তাই বলিয়া এই মহা-মর্য্যাদার পরিচায়ক আখ্যাগুলি অবাধে মানুষ আপন আপন নামে সংযুক্ত করিয়া নিজ নিজ আত্মার অকল্যাণ ও ঐসকল পদবীর মূল্য হ্রাস করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন না

ইহাই গভীর আক্ষেপের বিষয়। এটা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে উচ্চ প্রকৃতির লক্ষণ নহে, আর মানবসমাজের পক্ষেও অগ্রগমন নহে। এটা দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের ন্যায়। আর এইসকল আচরণে উচ্চ-লোক-প্রাপ্তির সম্ভাবনাও বড় অল্প।

সৌভাগ্যের বিষয়, রাজর্ষি রামমোহন রায়ের স্তাবক বা ভাক্ত অনুগামী নাই, তাই বেওয়ারিশ মালের মত যাঁহার যখন যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে পারেন। রামমোহন রায়ের সকল প্রকার দেশহিতকর অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা সর্ব্বপ্রধান। এই কার্য্য সমর্থন কল্পে তাঁহার ধারণা, উক্তি ও অনুষ্ঠান বিষয়ে ব্রাহ্মেরা অনেকেই কোন সংবাদ রাখেন না, আর রামমোহনের বংশের শেষ প্রদীপ ক্ষীণালোক বিতরণ করিলেও নির্ব্বাণপ্রায়। যিশু খৃষ্টের কেহই ছিল না। সেণ্ট পল অনেক পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু খৃষ্ট সম্বন্ধে কোন কথা অসাবধানভাবেও বলিয়া চলিয়া যাইবার উপায় নাই। কারণ তাঁহার উপাসকমণ্ডলী মর্ত্ত্যমণ্ডলের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই উপাসকমণ্ডলীই মানুষকে দেবতা করে, অভক্তকে ভক্ত করে, ভক্তকে সিদ্ধপুরুষ করে, সিদ্ধপুরুষকে বিধাতা-পুরুষে পরিণত করে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবমণ্ডলীর উচ্চগ্রামে আরোহণে বাধা প্রদান করে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ জীবনে ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। "কৃষ্ণচরিত্র" সেই অনুরাগের আংশিক ফল। তাঁহার গীতার বঙ্গানুবাদ-চেষ্টাও অপর একাংশ। তাঁহার প্রচারিত শেষ মাসিক-পত্র "প্রচার" তাঁহার পরিণত বয়সের পরিপক্ক ফলস্বরূপ বর্ত্তমান। তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের অনুকরণে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরমালার এক স্থানে তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলে পর, শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শাস্ত্র-সঙ্কলিত আদর্শ অনুসারে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কোন্ কোন্ ভাগ্যবান পুরুষ ব্রাহ্মণলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপনি নির্দ্দেশ করেন?" তদুত্তরে গুরু বাঙ্গালাদেশে সে সময়ে অসংখ্য স্মৃতিরত্ন, বিদ্যারত্ন বর্ত্তমান থাকিলেও, কেবলমাত্র অধুনা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয়কে ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বহু ব্রাহ্মণপূর্ণ বাঙ্গালাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত হইয়াও স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁহার লোকান্তর গমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উক্তির অঙ্গহানি করিতে তাঁহার আত্মীয়েরা কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ঐ দুই মহৎ ব্যক্তির পবিত্র নামের উল্লেখ স্থলে অধুনা কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যে দেশের লোক এইরূপ মহাজনের মহদুক্তি সকলের মর্য্যাদাহানি করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, তাহাদিগকে বঙ্কিমভক্ত বলিব কি বঙ্কিম-ভাক্ত বলিব, ইহাই বিচার্য্য। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেক বেল্লীকপণাও আছে, সেগুলি গ্রন্থবিশেষের বিশেষ বিশেষ স্থানে বেশ সুন্দর স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়াছে। তাই বলিয়া যদি এখন কোন লেখক, আস্‌মানীর অসামান্য রূপবর্ণনা ও বিদ্যাদিগ্‌গজের প্রেমের কাহিনী অথবা হরিদাসী বৈষ্ণবীর নগেন্দ্রনাথ দত্তের অন্দরমহলে প্রবেশ পূর্ব্বক চতুরতার খরপ্রবাহ প্রবাহিত করা, বা গোবিন্দলালের বিলাসবিভ্রমের বর্ণনপারিপাট্য আরও উজ্জ্বল ভাবে, আরও সুন্দর ভাবে আলোচনা করেন, তবে বোধ হয় আসমুদ্র হিমালয় সমগ্র বঙ্গদেশে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইবেন এবং এগুলি যে বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চচিত্র অঙ্কনের ইতরাংশ বোধ হয় বাঙ্গালী তাহা একবারে ভুলিয়া যাইবে। আর বঙ্কিম-চন্দ্রের স্থির বুদ্ধি ও শান্ত স্বভাব যখন জীবনের উচ্চ গ্রামে আরোহণ করিয়া জীবনের মহামূল্য মহদ্ভাব সকলের আলোচনায় রত, তখনকার সেই উচ্চস্বভাব সৌন্দর্য্যের খনির মণিময় হারের রত্নবিশেষ অপহরণ করিতে, বাধা দিবার, নিষেধ করিবার, দণ্ড দিবার লোক তখনও ছিল না, এখনও নাই। ইহাই জাতীয় জীবনের অধঃপতনের লক্ষণ। এই অসামান্য গুণসম্পন্ন পুরুষপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উক্তির আলোচনা স্বাধীনভাবে করিবার উপায় নাই। স্বকর্ণে শ্রুত অনেক কথাই বর্ত্তমান, কিন্তু সেগুলির আলোচনায় তাঁহার মহত্ত্ব ও উচ্চ উদার প্রকৃতির পরিচয় প্রকাশ পাইলেও তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও সামাজিকগণের পক্ষে সেগুলি তত প্রীতিকর না হইতে

পারে। সুতরাং বঙ্কিমচরিত্রের মহত্ত্বাব সকলের রেখাচিত্র অঙ্কনও অসম্ভব।

তাহার পর কেশবচন্দ্র সেন। ইঁহার অভিব্যক্ত ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা ও সেই সূত্রে গ্রথিত সুবিস্তৃত জীবন-চরিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ দুইখানি পুস্তকই বাঙ্গালাদেশের দুই অসামান্য পুরুষ-প্রধানের রচিত। ইংরাজীখানি কেশবের বাল্যসুহৃদ ও দীর্ঘজীবনব্যাপী সহচর অধুনা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক ও অপরখানি অধুনা রোগশয্যায় শায়িত নববিধানভক্ত ও বিশ্বাসী ভক্তিভাজন গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত। ইংরাজী গ্রন্থে কেবশচন্দ্রের বাল্য ও যৌবনের সাধারণ সংবাদ কিছু কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু মোটের উপর ঐ গ্রন্থ ও ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয়ের বহু বৃহৎ গ্রন্থে কেশবচন্দ্রের নিত্যজীবন যাপনের অসামান্য চরিত্রচিত্র জানিতে পারা যায় না। কেশবচন্দ্রের দেবভাব পরিস্ফুটনে ও তজ্জাত বিষয় সকলের আলোচনাতেই ঐ বৃহৎ গ্রন্থ দ্বয় পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে সকল উপকরণের সমাবেশে মানবদেবতার উচ্চ চরিত্রের ক্রমবিকাশ প্রকাশ পায়, ও যাহা পাঠে, এই রক্তমাংসময় সাধারণ মানুষের অগ্রগমনে সহায়তা করে, উক্ত দুই গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তারা এরূপ উপকরণ সকল আলোচনার বিষয়ীভূত করেন নাই। মানুষ মানুষই, সেই মানুষে ভাগবতী কৃপা কিরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এবং নরের নরাংশ কেমন করিয়া দেবাংশে পরিস্ফুট হয়, তাহার উপকরণ কেশব-চরিত্রে ত্রুটি দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও কেমন করিয়া স্থান পাইয়া ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া-ছিল, এ তত্ত্বের আলোচনা কেহই করেন নাই। এখন যদি কোন মহানুভব ব্যক্তি রেখা চিত্রে অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে চাহেন যে কেশবচন্দ্র নিত্য জীবনে এমনটি ছিলেন, আর সেগুলি ঠিক খাঁটি সত্য কথা হইলেও তাহা মিথ্যা ও ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ বলিয়া প্রচারিত হইবে, এবং সেরূপ ব্যক্তিকে দল বা সম্প্রদায় বিশেষ একবারে মানব সমাজের অধম পদবীতে স্থাপন করিয়া হৃদয়ে শান্তি লাভ করিবে। সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি:—সম্ভবতঃ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে তদানীন্তন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের কয়েকজন একত্র মিলিত হইয়া উৎসবান্তে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও তাঁহাদের পূর্ব্ব পরিচালক ভক্তিভাজন স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মপূজার অবসানে হৃদয়ের সদ্ভাব পরিচালিত হইয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতির প্রফুল্ল কুসুমপাত্র লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের "ব্রহ্মানন্দ" দর্শনে তাঁহার ভবন "কমল-কুটীরে" উপস্থিত হইবামাত্র, গৃহস্বামী ইঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের আবেগ তাঁহার চিরপ্রফুল্ল মুখমণ্ডলে প্রীতির তরঙ্গ-তুফান তুলিয়াছে। তিনি সকলকেই স্নেহ-ভরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতে না বসাইতে তাঁহার মণ্ডলীভুক্ত প্রধানগণের এক জন তথায় উপস্থিত হইয়া তীব্র শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন "কি বিরোধী মহাশয়গণ! নমস্কার, এখানে কি মনে করিয়া?" ব্যথিতহৃদয় ব্রহ্মানন্দ বলিলেন—"ইঁহারা উৎসবান্তে অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন কোন প্রকার রূঢ় বাক্য এ সময়ের উপযোগী নহে।" তদুত্তরে একান্ত অনুগত ভক্ত শিষ্য মহাশয় গুরুর ইঙ্গিত অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিয়া বিরোধী মহাশয়গণের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। বিরোধী মহাশয়গণ এতাদৃশ ব্যবহারবৈষম্যে স্তম্ভিত হইয়াও অবিচলিত ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ সাধু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় পুনরায় কাতর বাক্যে বলিলেন,—"এটা আমার আশ্রম; আশ্রমধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি অনুসারে ইঁহারা আমার সম্মান ও পূজার পাত্র, তুমি এক্ষণে স্থানান্তরে গেলেই ভাল হয়।" কিন্তু এ সেবক শুনিবার পাত্র ছিলেন না। শেষে রীতিবিরুদ্ধ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। তখন কেশবচন্দ্র সাশ্রুনয়নে অভ্যাগত বন্ধুদের বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে এক্ষণে বাধ্য হইয়া বিদায় দিতেছি। আমার গৃহে আমার সম্মুখে ইহাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকিবে না। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন।" এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির মধ্যে ব্রহ্মানন্দের যে মহত্ত্বাব প্রকাশ পাইতেছে, সেরূপ কত শত মহত্ত্বাব, পার্শ্বচর, সহচর, শিষ্য, ভক্ত ও ভক্তগণের অনুগ্রহে চিরলুক্কায়িত রহিল? মানুষ মুক্ত-জগতে মানবের মুক্তির সংবাদ প্রচার করিবার ভার

লইয়া যখন দ'লো হয়, তখন সে ব্যক্তি নিজের, নিজের দলের, নিজের সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ সাধনই করিয়া থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে দলের মধ্যবিন্দু মানবশিশুর মহত্ত্বরূপ মহামূল্য মূলধন জগতের শিক্ষাক্ষেত্র হইতে অপহরণ করিয়া দস্যু তস্করের ন্যায় ব্যবহার করে। কেশবচন্দ্রের মনুষ্যত্ব ধর্ম্মের পথে পদার্পণ করিয়া কিরূপে ধীরে ধীরে কতটা দেবত্বে পরিণত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা কোথাও পাওয়া যায় না। কিছু কিছু কেবল তাঁহার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার বিবরণ মধ্যে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার শিষ্য জীবনীপ্রণেতাদ্বয়ের পরম লক্ষ্য ছিল তাঁহার শেষ জীবনে প্রচারিত "নব বিধান" ধর্ম্মের বিজ্ঞানতত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে যত্ন করা। ধর্ম্মবিজ্ঞানের বিকাশসাধনের চেষ্টা অবশ্য-প্রয়োজনীয় হইলেও সে পরম বস্তুর তত্ত্বালোচনা এ ভারতে যথেষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষের যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, রাজর্ষি রামমোহন যাহার প্রতিকারের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের উত্তরসাধকগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যে ভাবে জীবনের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, সেই সকলের আলোচনা দ্বারা আপামর সাধারণ জনমণ্ডলীকে জীবনের পথে অগ্রগমনে সহায়তা করাই ব্রাহ্মসমাজের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু হায়! সকলেই লক্ষ্যভ্রষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে সেই শাদাসিধা ধর্ম্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মানন্দের যাপিত জীবনের মধ্যমণি তাঁহার মহচ্চরিত্র সংসারের শিক্ষাক্ষেত্রের বাহিরেই রহিয়া গেল।

তাহার পর সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংস। স্বর্গীয় কেশব-চন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা সূত্রে আমরা সর্ব্বপ্রথম রামকৃষ্ণের নাম শুনি। ক্রমশ তাঁহার ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মজীবনের সংবাদ সকল অবগত হই। আজ আমরা এই সত্য কথাটি বলিয়া রামকৃষ্ণ-সেবকগণের অপ্রিয় হইব, কথাটি এই যে ব্রাহ্মসমাজের সংবাদপত্র সকলই সর্ব্বাগ্রে পরমহংসকে এ দেশের শিক্ষিত জনমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। ঐ সকল অতীত ঘটনা হইলেও সত্য ঘটনা। স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গায়কমণ্ডলী মধ্যে বসিয়া ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতে দেখিয়াছি, তখনও তিনি ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যাকুল-হৃদয় যুবাপুরুষ। ক্রমবিকাশের প্রণালীতে নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দে পরিণত হইয়াছিলেন।

এখন হয়ত পরমহংস-শিষ্যগণ বলিবেন, রামকৃষ্ণ শুকদেবের ন্যায় সিদ্ধপুরুষ লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। যিশুর ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে যেমন নানাবিধ অলৌকিক "রূপকথা" প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, রামকৃষ্ণের জীবনাভিনয় সম্বন্ধেও তাঁহার সেবক ও শিষ্যবর্গ ঐরূপ নানা জল্পনা ও কল্পনার সংযোগ করিয়া আপাততঃ তাঁহাকে অবতারে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে ধর্ম্মের নামে এরূপ পরিণতি একবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই সকল প্রয়াসে মানবসাধারণের অগ্রগমনে দারুণ বিঘ্ন উৎপাদন ভিন্ন অন্য কোন লাভ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা রামকৃষ্ণকে দেখিয়াছি, সেই নরদেবতার সঙ্গসুখও (অল্প হইলেও) ভোগ করিয়াছি, এবং সময়ে সময়ে তাঁহার বাক্যামৃতও আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। রামকৃষ্ণ দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। মাতৃগর্ভে সকল মানবশিশুই সাধারণভাবেই জন্মগ্রহণ করে, এবং পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত প্রকৃতি ও তৎপরবর্ত্তী শিক্ষার গুণে কেহ বা নিজ মনুষ্যত্বকে পশুত্বে পরিণত করে, আর কেহ বা মহামনুষ্যত্বের মর্য্যাদা অনুভব করিয়া তাহার পরি-রক্ষণে ও বিকাশসাধনে ব্রতী হইয়া ধন্য হইয়া থাকেন। সৌভাগ্যবশে পরমহংস রামকৃষ্ণ ধর্ম্ম লাভের জন্য তপস্যা-নিরত হইয়া আমাদের সম্মুখে যে উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই আমাদের অমূল্য সম্পদ। আমরা অলস ও স্বার্থপর, তাই সে কঠোর তপশ্চারণের পথে পদার্পণ করিতে ভয় পাই, অথচ ধর্ম্মপ্রবণতাবশে মূলধনের অভাবে "ফড়েগিরি" করিয়া ধন্য হইতে চাই, এই "ফড়ে-গিরি"তেই মানবসমাজের সমূহ অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে। এই "ফড়েগিরি"র ফলেই পরমহংস রামকৃষ্ণ আজ নূতন একটি অবতারে পরিণত। এ সম্বন্ধেও একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। বরাহনগরের নিকটবর্ত্তী সিঁতি-নিবাসী বাবু বেণীমাধব পাল পরমহংস দেবের শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেরই পরিচিত। আমাদেরও পরিচিত। ধর্ম্ম-

জীবনের উন্নতি বিষয়ে বেণী বাবু পরমহংসকে গুরুস্থানীয় ব্যক্তি বলিয়াই অনুভব করিতেন ও তদনুরূপ ভক্তিও করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে যখন পরমহংস রামকৃষ্ণের আসন্ন কাল উপস্থিত হইল; তাঁহার দারুণ ব্যাধির আক্রমণ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় কাশীপুরের বৃক্ষবাটিকায় দুই বেলা যাতায়াত করিতেছিলেন; ঠিক সেই সময়ে এক দিন পরমহংস-শিষ্যগণের অন্যতম অধুনা লোকান্তরিত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় করজোড়ে ও অতি বিনীতভাবে গুরুচরণে নিবেদন করিলেন "প্রভু আপনি আমাদের উদ্ধারের জন্য স্বয়ং নরদেহ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যে পূর্ণাবতারে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই সংবাদ আমাদিগকে দিয়া নিশ্চিন্ত করুন। আমরা আশ্বস্ত হইয়া কৃতার্থ হই।" বেণী বাবু সে দিন সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরমহংস দারুণ রোগযন্ত্রণায় অধীর হইয়া বেণী বাবুকেই সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বেণী, বেণী, দেখ্‌চিস্, আমি যন্ত্রণায় ছটফট কচ্ছি, আর শালারা বলে কিনা অবতীর্ণ হয়েছি।" পরমহংসের ন্যায় জিতেন্দ্রিয়, সাধু, ভগবদ্ভক্তের মুখে এইরূপ উক্তিই সঙ্গত। তিনি অতি স্পষ্টবাদী, যথার্থবাদী ও হিতবাদী ছিলেন। তিনি স্তব বন্দনা বা মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইবার পাত্র ছিলেন না। সরল সত্যপথে বিচরণ করাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য ছিল। এমন মানুষটিকে অবতার করিয়া ভক্তের স্বার্থপরতাজাত সুখসম্ভোগ হয় হউক, কিন্তু এই অসত্য প্রচারের ফলে জনসমাজের বিষম অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে। আর পরমহংস-শিষ্যগণের এই ভক্তির মাত্রাধিক্যে আমরা সাধু মহাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ সাধক রামকৃষ্ণকে হারাইয়াছি। রাশি রাশি কথামৃত প্রচারিত হইতে পারে, কিন্তু জীবমানবের সংগ্রাম,—মানব-দেবতার সংগ্রামের সংবাদ আর জানিবার উপায় রহিল না।

রামকৃষ্ণ পথের পথিক অসামান্যগুণসম্পন্ন বিবেকানন্দেরও সেই দশা ঘটিয়াছে। বিবেকানন্দের ন্যায় প্রবলশক্তিশালী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আজকাল বড় বেশী দেখা যায় না। রাজা রামমোহন রায় প্রবাসকালে ইউরোপীয় জনমণ্ডলীর নিকট প্রাচ্য রত্নখনির দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন কি না জানি না। সম্ভবতঃ কিছু করিয়াছিলেন। কারণ তাহা না হইলে, ঠিক তাঁহার লোকান্তর গমনের পর স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাতে অবস্থিতিকালে তাঁহার ইংলণ্ডীয় বন্ধুগণ কর্ত্তৃক ভারতীয় নীতিধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এবং এ বিষয়ের অজ্ঞতানিবন্ধন তিনি নিতান্ত বিপন্ন হইয়া বাল্যেপঠিত চাণক্যশ্লোক সকলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিপদে পরিত্রাণলাভ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যজ্ঞান বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের মণিময় মুকুটও লাভ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের পর ও বিবেকানন্দের পূর্ব্বে যাঁহারা ধর্ম্মধ্বজা হস্তে লইয়া প্রতীচ্য পরিভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহই মাতৃভূমির ধর্ম্মসম্পদের সংবাদ প্রচার করেন নাই। পরোপকারপরায়ণ ইংরাজজাতির বেদ বিধিরই উচ্চতর আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং ভারতধর্ম্ম-সংবাদের বার্ত্তাবহন কার্য্য বিবেকানন্দের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যজগতে তিনিই হিন্দুপ্রচারকরূপে দেখাইয়াছেন যে বাইবেলই একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, আর যিশুও একমাত্র সাধু নহেন। বাইবেল ও যিশু আছেন, আরও আছে। আর ভারতবর্ষই সেই অমূল্য ধর্ম্মসম্পদের মাতৃভূমি। এমন গুণবান পুরুষের স্বল্প জীবন আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই অল্পায়ু বিবেকানন্দ অত্যল্প সময়ে যাহা করিয়াছেন অনেক জ্ঞানবৃদ্ধ অশীতিপরেরও সাধ্য নাই যে তাহা সম্পন্ন করেন।

আমরা কি অসাধ্যসাধনপটু মানুষ দেখিলেই দেবতা করিয়া তুলিব? অবতার শ্রেণীভুক্ত করিয়া দীনাত্মার তৃপ্তি লাভের প্রয়াস পাইব? একটা পাঁচ সের ওজনের বেগুন দশ সের ওজনের একটা ফুলকপি বা আধমণ ওজনের একটা বাঁধাকপি দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া থাকি। কৃষকের গুণপনারও ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকি। কিন্তু কি উপায়ে এরূপ উত্তম ফল ফলাইল, তাহা জানিবার জন্য কয়টি লোক ব্যস্ত হয়? উপায় শিক্ষা করিয়া, কাজে ফলাইয়া তুলিতে চেষ্টা কয়জন লোক করিয়া থাকে? ইহারও একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি :—পূর্ব্বেই একস্থানে বলিয়া রাখিয়াছি—ক্রমবিকাশের প্রণালীতে নরেন্দ্রনাথ দত্ত বিবেকানন্দে পরিণত হইয়াছিলেন। এই ক্রমবিকাশের প্রণালীসূত্রে বিবেকানন্দের জীবনগঠন সম্বন্ধে তাঁহার সে

সময়ের এক সুহৃদ মহাত্মা দুই বৎসর পূর্ব্বে বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া বিবেকানন্দ-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। আক্ষেপের বিষয় যে পরিচালকগণ পরামর্শ করিয়া বিবেকানন্দের জীবনের প্রাথমিক সংগ্রাম-সংবাদটুকু লেখকের অজ্ঞাতসারে চুপে চুপে পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই সুহৃদকর্ত্তৃক অঙ্কিত জীবনীর স্থিরসৌদামিনী-শোভা দেখাইতেই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। যে সকল উপায় পদ্ধতি—যে সকল উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে হৃদয়মনের উত্থান পতনের বিষম সংগ্রামের পর ঐ স্থিরসৌদামিনী-লীলা বিবেকানন্দের জীবনে সম্ভবপর হইয়াছিল সে উপকরণগুলি পাঠকের নয়নপথের অন্তরালে লুক্কায়িত রাখা হইল। কেন হইল? পাছে শিষ্যবর্গের পরমদেবতাকে পাঠক মানুষ ভাবে। সংগ্রাম ত মানুষেরই হয় সুতরাং মানবের অপেক্ষা কোন এক উচ্চ গ্রামে বিবেকানন্দকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস-পরিচালিত বুদ্ধি-বিশিষ্ট সেবকগণ বিবেকানন্দের সংগ্রামপূর্ণ জীবনকাহিনী সহ্য করিতে পারিলেন না। আলস্যপরবশ ও বিলাসপ্রিয় মানুষ এই জন্যই উপায় পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া মানুষকে দেবতা করে। তাই রামকৃষ্ণ বড়ঠাকুর ও বিবেকানন্দ ছোটঠাকুর হইয়া অসংখ্য মানবসন্তানের পূজা ও নৈবেদ্য সম্ভোগ করিতেছেন।

তাহার পর সাধু দেবেন্দ্রনাথ। ইনি ধর্ম্মজীবন ও সাধুতার সমাদরে এ দেশের জনসাধারণের নিকট মহর্ষি বলিয়া পরিগৃহীত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সত্যের সেবক। সত্য তাঁহাকে এরূপভাবে আশ্রয় করিয়াছিল যে তিনি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়া মর্ত্ত্যলোকে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। "সত্যং" বলিতে তাঁহার সমগ্র দেহ মন হর্ষোৎফুল্ল হইত। রোমাঞ্চিত কলেবরে ব্রহ্মানন্দের মধুর-ধারা-সিঞ্চিত মহর্ষি-মূর্ত্তি বহু বহুবার সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু এমন সাধুপুরুষের সম্বন্ধেও সকল প্রত্যক্ষীভূত সত্য ঘটনার আলোচনার উপায় নাই। দেবতা থাকিলেই যেমন উপদেবতা থাকে, উত্তম যেমন অধমের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, ঠিক সেই-রূপ মহর্ষির পার্শ্বচররূপে এমন কোন কোন ব্যক্তির অবস্থিতি সম্ভবপর হইয়াছিল যে তাঁহাদের অনুগ্রহে অনেক সময়ে মহর্ষি-দর্শনও অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হইত। একাধিক-বার সবান্ধবে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যে তাঁহার কোন সেবক আমাদের ৩।৪ জন বন্ধুকে চুচুড়ার নির্জ্জন বাসভবন হইতে "দেখা হইবে না" বলিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু দৈবক্রমে মহর্ষি জানিতে পারিয়া লোক পাঠাইয়া আমাদিগকে পথ হইতে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছেন, দূর হইতে সমাগত বলিয়া জলযোগ করাইয়াছেন, কথাবার্ত্তা, স্নেহ ও উপাদেশাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিয়াছেন। এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। নূতন বৃক্ষবাটিকার মালিক নূতন রোপিত চারা গাছগুলির রক্ষার জন্যই বেষ্টনী দিয়া থাকে, কিন্তু গগনস্পর্শী সমুন্নত পাদপরাজের কাণ্ডপ্রাচীর হইয়া ভক্ত-মণ্ডলী সর্ব্বদাই বিরাজ করেন এবং আশ্রয়প্রার্থীদিগকে দূরে সুদূরে রাখিতে সর্ব্বদাই প্রাণপণ প্রয়াস পান।

জ্ঞান ও ভক্তির মিশ্রণে যে সাধুচরিত্র গঠিত হয়, মহর্ষি এই নাস্তিকতার দিনে সেই ভক্তিসিক্ত জ্ঞানধর্ম্মের পথ-প্রদর্শক। তাঁহার সাধিত ধর্ম্ম উচ্চ ও গভীর। কিন্তু অতিভক্তির বেষ্টনী উঠাইয়া না লইলে মহর্ষির মহচ্চরিত্রের বিশ্লেষণ ও আলোচনা সম্ভবপর নহে। আমি জানি এই অন্তরায় বিদ্যমান বলিয়াই মহর্ষির একখানি পূর্ণাবয়ব জীবনচরিত রচিত হইতেছে না। কি পরিতাপের বিষয় যে এইসকল সাধুপুরুষদের পার্শ্বচরেরা জনসমাজের সুশিক্ষা লাভের পথে, ঠিক সত্য সংবাদ লাভের পথে বাধা দেয় ও উচ্চগ্রামের মানবসন্তানগণের আচরিত জীবনের সৌরভ-মাধুরী সম্ভোগে নিজেরা বঞ্চিত থাকিয়া যায় ও জনসমাজকে বঞ্চিত করে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্ণ ও অগ্নি

স্বর্ণ বলে "অগ্নি তুমি বড় নিরদয়,
বিনা দোষে কেন মোর দেহ কর ক্ষয়।"
অগ্নি বলে "স্বর্ণ তুমি কেন নিন্দ মোরে
ক্ষয় নাহি করি আমি শুদ্ধ করি তোরে।"

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ।

দুর্ঘটনা

[গল্প]

(S. Kerval এর ফরাসী হইতে)

১

উত্তরাধিকারসূত্রে কতকগুলা 'শেয়ারের' কাগজ আমার হাতে আসিয়া পড়িল। আমি লক্ষপতি হইলাম। লক্ষপতির চালে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু এই ধন ঐশ্বর্য্য মায়া-মরীচিকার ন্যায় অল্পদিনের মধ্যেই তিরোহিত হইল··· যখন আমার ২৩ বৎসর বয়স, তখন আমার সমস্ত ধন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—হাতে একটি পয়সা নাই। যত রকম উপায় হইতে পারে, যত রকম ফন্দি হইতে পারে, সব একে একে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না। এখন আমি একেবারে নিঃসম্বল।

এখন একটা অসমসাহসিক কাজ, একটা নিতান্ত কঠোর কাজ না করিলে আর চলিতেছে না:—প্যারিস হইতে পলায়ন করিতে হইবে। আমার বিলাসের লীলা-স্থলী, আমার ক্রীড়া কৌতুকের রঙ্গভূমি—সেই প্যারিস নগরী হইতে আত্মনির্ব্বাসিত হইয়া, একটা সামান্য জীবিকার উদ্দেশে, এমন একটা অপরিচিত লক্ষ্মীছাড়া দেশে গেলাম যেখানকার খবরাখবর কেহ বড় রাখে না। আবার যদি কখন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, তখন আবার প্যারিসের আমোদ আহ্লাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিব। এই আশা-ভরে কোন প্রকারে কাল কাটাইতে লাগিলাম।

সেই অপরিচিত দেশটি এসিয়া-মাইনর। সেইখানে একটা রেলগাড়ীর কোম্পানী, নূতন রেল বসাইবার উদ্যোগ করিতেছে। তাহাদেরই অধীনে একটা সামান্য কাজে নিযুক্ত হইলাম। এসিয়া-মাইনরে, অ্যাঙ্গোরা বলিয়া একটা স্থান আছে, সেইখানে আমার শিক্ষানবীসি কাজ আরম্ভ হইল। এই অ্যাঙ্গোরা, রোমশ 'আঙ্গোরা'-বিড়ালের জন্য প্রসিদ্ধ।

এইখানে দুইটী লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হইল। স্বামী স্ত্রী। দুই জনই খুব ভদ্র। জাতিতে গ্রীক্। ইহাঁদের বেশ স্বচ্ছল অবস্থা। স্ত্রীর বয়স ৪০ বৎসর; স্বামীর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; ইহাঁরা একদিন বসন্তের অপরাহ্ণে বেড়াইতে বেড়াইতে ষ্টেশান পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন··।

আমি কি তাঁদের কোন মিষ্ট বাক্য বলিয়াছিলাম? আমি কি আমাদের বাগানের মল্লিকাকুঞ্জে বিশ্রাম করিবার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম?···আমার মুখখানি ইহাঁদের কি ভাল লাগিয়াছিল?—ইতিপূর্ব্বে কত লোকের ত ভাল লাগে নাই জানি··কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না···কি জানি কি জন্য আমি ইহাঁদের নেক্‌-নজরে পড়িয়া গিয়াছি, ইহাঁরা আমার প্রতি সানুভূতি প্রকাশ করেন, খুব যত্ন করেন, যাতে আমার ভাল হয় তার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করেন ।

আমি যে তিন মাস অ্যাঙ্গোরায় ছিলাম—প্রতিদিন প্রাতে ইহারা আমাকে ডিম, টাট্‌কা মাখন, ভাল-ভাল পাখী পাঠাইয়া দিতেন···আর, সায়াহ্নে, অবসর পাইলে, প্রায়ই ষ্টেশানে আসিয়া আমাকে জোর করিয়া তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইতেন এবং আমাকে আমোদ দিবার জন্য ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ওলট্ পালট্ করিয়া ফেলিতেন।

ইহাঁরা দুজনেই আঙ্গোরার লোক, এসিয়া-মাইনরের বাহিরে কখন যান নাই, জীবনে রেলগাড়ীতে কখন চড়েন নাই···ইহাঁরা এই ষ্টেশানের আশপাশে কখন কখন বেড়াইতে আসেন এই মাত্র—ইহা অপেক্ষা দূরে আর কোথাও যান নাই।

বড় একটা বাড়ীর বাহির হন না, আপনাদের ঘরকন্না লইয়াই থাকেন, দুষ্ট লোকের সংস্রবে—স্বার্থপর ধূর্ত্ত লোকের সংস্রবে কখন আসেন নাই, এই জন্যই বোধ হয় ইহাঁদের এইরূপ সরল অন্তঃকরণ···।

ইহাঁদের একটি মাত্র সন্তান; ১৬ বৎসরের একটি বালক; ছিপ্‌ছিপে লম্বা, পাত্‌লা, সুশ্রী, নিরীহ শান্ত, তরল স্বচ্ছ নীল চোখ্···।

এই পুত্রটিই তাঁহাদের দিগন্ত-সীমা, তাঁহাদের সুখ সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের প্রাণ, তাঁহাদের প্রাণাধিক!

একদিন তাঁহারা একটা গোপনীয় কথা—তাঁহাদের মস্ত একটা গোপনীয় কথা—বিশ্বস্তভাবে আমাকে বলিলেন!

পুত্রটি রেলের কোন কাজে ভর্ত্তি হয় ইহাই তাঁহাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ।

এই বয়সে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, পদোন্নতি হইয়া কালক্রমে ষ্টেশান-মাষ্টার হইতে পারিবে, এমন কি, ইন্স্পেক্টারের পদও লাভ করিতে পারিবে!

ইহাই তাঁহাদের ভবিষ্যতের আশা—তাঁহাদের সুখস্বপ্ন! এই কথা ভাবিয়া তাঁহাদের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কোন উপায়ে তাঁহারা এই রেল-কোম্পানীর কর্ম্মক্ষেত্রে পুত্রটিকে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু,—তাঁহাদের স্নেহময় অন্তঃকরণের নিকট এই "কিন্তু"টি একটা বিষম "কিন্তু;"—প্রাণাধিক "খোকার" বিচ্ছেদ তাঁহারা কি করিয়া সহ্য করিবেন!···ভারী-ভারী মাল-গাড়ির সংস্পর্শে, অনলোদ্গারী এঞ্জিনের সংস্পর্শে, তাহাকে কোন্ প্রাণে আসিতে দিবেন? কিছুকাল পূর্ব্বে, যখন এদেশে রেলগাড়ী প্রথম চলিতে আরম্ভ করে, তখন এদেশের লোকেরা তাহাদের গরুবাছুর লইয়া ভয়ে পলাইয়া যায় নাই কি?···

এইরূপ নানা ভাবনা ও আশঙ্কায় তাঁহাদের চিত্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল! মনকে যুক্তির দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, দম্পতি পরস্পরকে আশ্বাস ও ভরসা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! কোনরূপেই উহাঁরা মনস্থির করিতে পারিলেন না! রেলের বড়-কর্ত্তাদের আফিসে কাজ পাইলে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু সে সব কাজে কোন চটক্ নাই—তাঁহাদের ছেলে জম্কালো উর্দ্দি পরিতে পাইবে না—পরিচ্ছদে ঝকমকে বোদাম থাকিবে না, সোনার তারা থাকিবে না!···

তারপর, যখন আমাকে অ্যাঙ্গোরা হইতে প্রস্থান করিতে হইল, আমি দম্পতির নিকট বিদায় লইলাম। তাঁহারা আমায় যেরূপ আদর যত্ন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য খুব উচ্ছ্বাসভরে তাঁহাদের নিকট আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইলাম; তাঁহারা উভয়েই ছলছল-চোখে পুত্রের মত' আমাকে বিদায়-আলিঙ্গন দিলেন···পুত্রটির পিতা, কণ্ঠস্বর একটু বদ্লাইয়া, আমাকে এই কথা বলিলেন:—

—"এখন বোধ হয় তোমার উপর বিশ্বাস করে' আমরা মনস্থির করতে পারব...শুধু তোমার উপর বিশ্বাস ক'রে।—যতক্ষণ ষ্টেশানের কর্ত্তৃত্ব তোমার হাতে থাক্‌বে, ততক্ষণ আমাদের কোন ভয় থাক্‌বে না"··· পুত্রটির মাতা, উদ্বেলিত হৃদয়ে, শুধু মাথা নাড়িয়া এই কথায় সায় দিল। "কিন্তু হায়! এ আর কত দিনের জন্য, ষ্টেশানের কর্ত্তৃত্ব কিছুদিন পরে, নিশ্চয়ই আবার অন্যের হাতে আস্‌বে, তখন কি হবে?..." আমি বলিলাম "ততদিনে আপনারা কতকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন। দেখুন, আর একটা বড় সরেশ কথা আমার মাথায় এসেছে—একটা ছোট-খাটো জায়গায় ষ্টেশান মাষ্টার আমি শীঘ্রই হব—অন্তত আমি এইরূপ আশা করচি—যাতে আপনাদের পুত্রটি সেই সময় আমার অধীনে শিক্ষা-নবীসি কাজে নিযুক্ত হয় তার জন্য আপনারা একটু চেষ্টা তদ্‌বির করবেন।···আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি তার যথোচিত তত্ত্বাবধান করব!" খুব দৃঢ়তা সহকারে আমি এই কথা বলিলাম।

"খোকা"কে সস্নেহভাবে আলিঙ্গন করিলাম। আমি যাইতেছি শুনিয়া "খোকার" গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। আমারও একটু মন ভিজিল। অবশেষে এই সজ্জনদিগের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলাম।

"লেফ্‌কে"!—এই ক্ষুদ্র গ্রামের নামে এই ষ্টেশানের নাম। ষ্টেশানের ঘরটি সাদা—উদ্দাম উদ্ভিজ্জের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সম্মুখে একটি সুনীল সরোবর! কিন্তু বাপ্‌রে কি নিস্তব্ধতা!—কি একঘেয়ে-ভাব!

"একলাটি" এই শব্দের যে প্রকৃত অর্থ—যে উদাস বিষাদময় অর্থ—তাহা এইখানে আসিয়াই প্রথম জানিতে পারিলাম!

এখানকার লোকের মধ্যে,—একজন মুসলমান রেল-যোজক ও আর একজন মুসলমান কুলি—তারপর, আমি!

এখান হইতে প্রতিদিন দুইটা করিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেণ ছাড়ে,—একটা ইস্তাম্বুলের অভিমুখে, আর একটা তার উল্টাদিকে—অ্যাঙ্গোরার অভিমুখে যায়···কিন্তু এই ট্রেণে কোন আরোহীকে উঠিতে কিংবা নামিতে প্রায়ই দেখা যায় না।

কখন কখন দেখা যায়, ষ্টেশানের কুলি ছোট ছোট রেশমের বস্তা বহিয়া আনিতেছে। বণিকেরা এই রেশম শকটে করিয়া গ্রাম হইতে আনয়ন করে। গ্রামে গুটি-পোকার একটা সামান্য কারবার আছে।

যাই হোক্, লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন এই জনহীন

অ-জানা ক্ষুদ্র স্থানটিতে, একদিন বসন্ত-অপরাহ্নে এমন একটা লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিল যাহা আমি কখন ভুলিব না, যাহার দুঃখময় স্মৃতি—যত দিন বাঁচিব—পাষাণ-ভারের মত আমার বুকে চাপিয়া থাকিবে !...

২

প্রায় ছয় সপ্তাহকাল এখানে আমি ষ্টেশান মাষ্টারের কাজ করিতেছি—এমন সময়ে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ হইতে একখানা পত্র পাইলাম; তাহাতে আমাকে জানানো হইয়াছে, তাঁহারা একজন শিক্ষানবীস্‌কে পাঠাইতেছেন, সে টেলিগ্রাফের কাজ শিখিতে চাহে। আরও একটু অনুরোধ করিয়াছেন, যেন আমি তাহাকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিই।

এই শিক্ষানবীসটি আমার সেই অ্যাঙ্গোরার বালক-বন্ধু—"খোকা"।

ইহার দুই দিন পরে, "খোকার" বাপ্ মা খোকাকে আমার নিকট লইয়া আসিল।

তাঁহাদের নিকট ইহা একটা মস্ত ঘটনা !

এই দৃশ্যটিতে যেমন বাৎসল্য রস আছে, তেমনি একটু হাস্যরসও আছে !

ইহা তাঁহাদের প্রথম রেলপথের ভ্রমণ। স্বামী স্ত্রী দুজনেই যথাসাধ্য ভাল বেশভূষা করিয়া আসিয়াছেন... তাহার পর দুজনেই, তাঁহাদের সেই সর্ব্বস্বধন একমাত্র পুত্রের—একজন বাম হস্ত ও আর একজন দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া গম্ভীরভাবে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলেন !

এই বালককেই তাঁহারা আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন !...

এই "সঁপিয়া দেওয়া"র মধ্যে কত কথাই নিহিত আছে—আমার দায়িত্বগ্রহণ এবং তাঁহাদের তীব্র আবেগ, উৎকণ্ঠা, ঐকান্তিক অনুরোধ, যাচ্ঞা, কাতর প্রার্থনা ও মর্ম্মভেদী অশ্রুধারা !...

সেই দিনেই সায়াহ্নে আবার তাঁহারা স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন...ট্রেন্‌টা যখন কাছাকাছি আসিল, বালকের পিতা মাতা, বালককে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমার লঘু প্রকৃতি, আমি এ পর্য্যন্ত জীবনকে কখনই গম্ভীর ভাবে দেখি নাই; কিন্তু এই প্রথম বার আমার হৃদয়ে এক প্রকার অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য-রসের আবির্ভাব হইল। আমি খুব গম্ভীরভাবে তাঁহাদিগকে বলিলাম:—"আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে যান, আমি আপনাদের ছেলের তত্ত্বাবধান করব...।"

এই বালকের উপর আমার টান্ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, উহাকে আমার ছোট ভাইটির মত ভালবাসিতে লাগিলাম। বালকটি খুব স্নেহশীল, খুব বাধ্য; বুদ্ধিও সচরাচরের চেয়ে একটু বেশী; সুনম্র প্রকৃতি, সহজেই সমস্ত আপনার করিয়া লইতে পারে, এক কথায়, ছেলেটি বড় ভাল। যদিও সামান্য ঘরে জন্ম, যদিও একটা সামান্য গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা পাইয়াছে, তথাপি এই টেলিগ্রাফের কাজে নিযুক্ত হইয়া, টেলিগ্রাফের কাজ এত শীঘ্র শিখিয়া ফেলিল, এমন লঘু হস্তে টেলিগ্রাফের যন্ত্র নাড়াচাড়া করিতে লাগিল যে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। শিখাইতে আমার একটুও কষ্ট পাইতে হয় নাই। উহার পিতা মাতা যে আশা করিয়াছিল,—এক দিন তাঁহাদের পুত্রটি "উপরিতন কর্ম্মচারী"র পদে নিযুক্ত হইয়া জমকাল জরির-কাজ-করা উর্দ্দি পরিতে পারিবে, আমার মনে হইল—তাঁহাদের সে আশা অচিরাৎ পূর্ণ হইবে !

আমাদের অবসর সময়ে, আমরা দুজনে রেল-লাইনের ধার দিয়া বেড়াইতাম; পার্শ্ববর্ত্তী ছোট ছোট পাহাড়ে উঠিতাম,—পাহাড়গুলি পুষ্পিত তরুলতায় আচ্ছন্ন। সেখান হইতে দিগন্তের চমৎকার দৃশ্য আমাদের নেত্রসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইত...আবার নিকটস্থ নীল সরোবরে রেল-ষ্টেশানের একটা ডিঙ্গি করিয়া আমরা বেড়াইতাম—সরোবরে আকাশের নীল ছায়া পড়িয়াছে—সরোবরটি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ও মসৃণ !...

আমরা দুইজন ছিলাম, হঠাৎ আমাদের আর একটি সঙ্গী জুটিয়া গেল, এখন আমরা তিনটি হইলাম। একদিন প্রাতঃকালে, ষ্টেশানের দরজার সাম্‌নে, একটা কুকুর দেখিতে পাইলাম—নীচু লেজ, চোখে মৃদুতা ও যাচ্ঞার ভাব; বড় জাতের কুকুর, গায়ের রোঁয়াগুলা খাড়া হইয়া আছে, সাদার উপর ধূসর রঙ্গের দাগ, সেণ্টবার্ণার্ড ও রাখাল-কুকুরের মিশ্রণ।

কুকুরটা কোথা হইতে আসিল, গলার চর্ম্ম-বন্ধন নাই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ দিকে দেখিতে বেশ জমকালো ও হৃষ্টপুষ্ট। এই অ-চেনা কুকুরটাকে আমাদের নিজস্ব করিয়া লইলাম। পরে ইহার দরুণ আমাদের কখন অনুতাপ করিতে হয় নাই।

উহার পূর্ব্বেকার নাম আমরা জানিতাম না; আমরা উহার নূতন নাম দিলাম—"ফিলস্"। গ্রীক্ ভাষায় ফিলসের অর্থ—বন্ধু।

আমাদের এই সঙ্গীটি খুব প্রভুভক্ত হইয়া উঠিল—বিশেষত বেশ পাহারা দিত। ক্রমে এমনি হইল, যেন উহাকে নইলে আমাদের চলে না। এক দিকে আমাদের কাছে যেমন নিরীহ ও প্রভু-বৎসল, তেমনি আবার অন্য জন্তুর পক্ষে ভীষণ ও দুর্দ্দান্ত।

গ্রীষ্ম-রাত্রে আমরা কখন কখন যখন বেড়াইতে যাইতাম, এই কুকুর আমাদের রক্ষক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিত। ইতি পূর্ব্বে আমরা শৃগালের ভয়ে বাড়ী হইতে বেশী দূর যাইতে পারিতাম না। এখানে শৃগালেরা রাত্রে দল বাঁধিয়া বাহির হয়, কখন কখন মানুষকেও আক্রমণ করে; কিন্তু ইহারা কুকুরকে বড় ভয় করে। তাই ফিলস্ আমাদের সঙ্গে থাকিলে, আমরা যেখানে সেখানে নির্ভয়ে যাইতে পারিতাম।

বিশেষত আমার বালক-সঙ্গী "খোকা", কুকুরটাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত,—অতিরিক্ত রকম ভাল বাসিত। উহাকে কত রকম করিয়াই যে আদর করিত তা বলা যায় না। ফিলস্‌ও সেই আদর যত্নের যেরূপ প্রতিদান করিত—দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। ফিলসের প্রভুসেবার একটা দৃষ্টান্ত দিই। ট্রেন্ ষ্টেশানের কাছাকাছি হইবার সময় দৈবাৎ যদি কখন আমার বালক-সঙ্গীর রেলের মাঝখানে, কিংবা ঠিক্ ধারে দাঁড়ান আবশ্যক হইত, ঐ কুকুরটা তার কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিত, যতক্ষণ না পিছু হটিয়া আসিত, ততক্ষণ ছাড়িত না—এমন কি, পায়ের কাছে সটান শুইয়া পড়িত—যেন সে নীরব ভাষায় এইরূপভাবে বলিত:—"আর ওদিকে যাইও না, ট্রেন আসিবার সময় হইয়াছে।"

বালকের পিতা মাতা অ্যাঙ্গোরা হইতে বালককে প্রায়ই পত্র লিখিতেন ও সেই সঙ্গে খাদ্যসামগ্রী মিষ্টান্ন প্রভৃতিও পাঠাইতেন। সেই পত্রগুলিতে স্নেহ যেন উছলিয়া পড়িতেছে; তাতে কত উপরোধ, কত উপদেশ, কত সুপরামর্শই থাকিত! একমাস হইল, বালক তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছে; বড় ইচ্ছা, তাহাকে একবার দেখিয়া আসেন। অনেক সময় নিশ্চয় যাইবেন বলিয়া স্থির করেন—কিন্তু প্রতিবারই, একদিনের দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিতে হইবে, মনে করিয়া ইতস্তত করেন! অবশেষে একদিন পত্রের দ্বারা জানাইলেন, আগামী রবিবারে তাঁহারা পুত্রকে দেখিতে আসিবেন।

ওঃ! পিতামাতা আসিতেছেন বলিয়া "খোকার" কি আনন্দ! সেই প্রত্যাশায় সে এক জায়গায় স্থির থাকিতে পারিল না, তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল। আমারও মনে কত আনন্দ হইল। যাঁহারা আমার প্রতি কত মমতা, কত যত্ন করিয়াছিলেন, যাঁহাদের অকপট বন্ধুতার ঋণ আমি কখনই শুধিতে পারিব না, যাঁহারা তাঁহাদের প্রাণাধিক পুত্রটিকে আমার হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন, সেই সদাশয় লোকদুটিকে আবার আমি দেখিতে পাইব! তাঁহাদিগকে আমার বাড়িতে রাখিব, তাঁহাদিগের আতিথ্যসৎকার করিব, তাঁহাদিগকে দেখাইব,—আমার ছাত্রের কতটা শিক্ষা হইয়াছে, কতটা উন্নতি হইয়াছে—ইহাতে আমার মনের কতটা সন্তোষ হইবে···।

এই শুভদিনের উপলক্ষে আমাদের ক্ষুদ্র ষ্টেশানটী উৎসবের ভাব ধারণ করিল। আমাদের আফিস-ঘর, আমাদের "ওয়েটীং-রুম্" যাহাতে একটু প্রফুল্ল ভাব ধারণ করে, এই জন্য আমরা খুব ভোরে পাহাড়ের উপর উঠিয়া শিশির-সিক্ত কতকগুলি তাজা ফুল আনিয়া ঘর সাজাইলাম।

গ্রাম হইতে সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী ও ইস্তাম্বুল হইতে উৎকৃষ্ট মদিরা ও সরস ফলমূল আনাইলাম। শয়ন-কক্ষে যাহাতে তাঁহারা আরামে শুইতে পারেন, তজ্জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিলাম। এমন কি ফিলস্‌ও কি একটা আনন্দের ব্যাপার হইতেছে—তাহার সহজ বুদ্ধিতে অনুভব করিয়া আনন্দে লেজ নাড়িতে লাগিল।

৩

ট্রেণ আসিতেছে—নিকটবর্ত্তী অন্য ষ্টেশন হইতে সংকেত পাইলাম। ষ্টেশনের পীঠভূমিতে দাঁড়াইয়া অধীরভাবে আমরা ট্রেণের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। "খোকা" নীল রঙ্গের উর্দ্দি পরিয়াছে—তাহার জরির বোদাম সূর্য্যকিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। সে ভয়ানক উদ্বিগ্ন ও ব্যস্তসমস্ত! রেলের লাইন—যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর চলিয়া গিয়াছে ও সূর্য্যকিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে... আর "ফিলস্"—যাহার লেজ নাড়ার বিরাম নাই—সে সেই লাইনের উপর শুইয়া আছে। একটা শিটি শোনা গেল—শব্দটা এখনও দূর হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইল। দিগন্তে একটা কালো বিন্দু দেখা দিল...শীঘ্রই সেই বিন্দুটা বড় হইয়া উঠিল এবং একটা অস্ফুট শব্দ সহকারে ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল!

কুকুরটার হইল কি? এখনও যে উঠে না—দুই রেলের মাঝখানে সটান শুইয়া আছে।

মাটী কাঁপাইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে এঞ্জিনটা সেইখানে আসিয়া পড়িল—"ফিলস্ এদিকে আয়"—এই বলিয়া আমি কুকুরটাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম।

"ফিলস্!···ফিলস্!"—এই বলিয়া খোকাও উৎকণ্ঠিত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বারংবার ডাকিতে লাগিল।

কুকুরটা আমাদের দিকে ফিরিয়া কাতর অনুনয়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল···মনে হইল, মাথা নাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে—উঠিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না—যেন হঠাৎ কোন পীড়ায় তাহার শরীর অবশ হইয়া পড়িয়াছে।

এঞ্জিন চালক কুকুরটাকে দেখিতে পাইয়া সজোরে শিটি মারিতেছে।

তখন—সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত্তে—"খোকা" বিদ্যুৎবেগে সেইখানে ছুটিয়া আসিল—আমি যে তাহাকে ধরিয়া রাখিব, সেটুকুও সময় পাইলাম না। খোকা আসিয়া কুকুরটাকে জাপটাইয়া ধরিল,—তাহাকে টানিয়া আনিবার জন্য—উঠাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল!

এঞ্জিন-চালক কল টিপিয়া গাড়ীকে থামাইবার চেষ্টা করিল।

আমিও হতবুদ্ধি হইয়া খোকাকে বাঁচাইবার জন্য সেই-খানে ছুটিয়া গেলাম...এঞ্জিনের গতি তখন একটু শ্লথ হইয়াছে—আমাকে একটু ধাক্কা দিয়া, সেই এঞ্জিন খোকার বাহু-পাশবদ্ধ কুকুর ও খোকার উপর দিয়া চলিয়া গেল!

আর, আমার বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়ালে, আমি যেন চখের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম,—প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর দ্বারদেশে, আধা-হাসিমুখ ও আধা-উৎকণ্ঠিত দুটি হত-ভাগ্য, সতৃষ্ণনয়নে তাহাদের পুত্রটিকে খুঁজিতেছে!...

এই ভীষণ দুর্ঘটনার কথা তাহারা কিছুই জানে না। এখন আমি—কোন্ সাহসে হাসি-মুখে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব?...তাহাদের ষ্টেশান-ঘরে টানিয়া লইয়া যাইব—এরূপ মনের বল আমার কোথায়?—তাহাদিগকে এইরূপ বলিব কি, "খোকা একটা জরুরি কাজে গ্রামে গিয়াছে, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি ট্রেন্‌টা চালান্ করেই এখনি আস্‌চি"।

এদিকে বাহিরে—ভীষণ দৃশ্য! রেলের পথ পরিষ্কার করা হইতেছে।

দেখিলাম—ছিন্নভিন্ন একরাশ নীল কাপড়···রক্তাক্ত কতকটা মাংসপিণ্ড...আর কতকটা সাদা রোঁয়া!

এই সময়ে একজন রেল-কর্ম্মচারী আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে reserve শ্রেণীর কর্ম্মচারী। আমার সাহস পৌরুষ সব চলিয়া গিয়াছে—আমি এখন ভীরু কাপুরুষের মতন হইয়া পড়িয়াছি।

আমার মাথা ঘুরিতেছে। এই সময়ে একটা উপায় আমার হঠাৎ মনে হইল,—আমার মুখ দিয়া একটা মিথ্যা কথা বাহির হইয়া পড়িল! আমার সহকারীকে বলিলাম; "কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে এইমাত্র একটা আদেশ-পত্র পাইয়াছি, আমার জায়গায় তোমার এইখানে থাকিতে হইবে—আমি এই ট্রেণেই রওনা হইব...কোন জরুরি কাজের জন্য আমাকে তলব হইয়াছে...এখানকার আবশ্যকীয় কাজ তোমাকে নির্ব্বাহ করিতে হইবে···রিপোর্ট লিখিতে হইবে—আমার ছাত্র, একটা কুকুরকে বাঁচাইতে গিয়া এঞ্জিনে চাপা পড়িয়াছে!"

পরে, ষ্টেশান-মাষ্টারকে বলিলাম :—

"আর কি, এখন ত সব কাজ শেষ হইয়াছে, এইবার তবে গাড়ী ছাড়া যাক্।"

ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল।

এঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করে আর কি—এমন সময়ে আমার একটিং-এর বাহু সজোরে ধরিয়া গাড়ীর সেই কামরার দ্বারের দিকে তাহাকে ঠেলিয়া দিলাম,—যে কামরার দ্বারদেশে সেই বুড়া ও বুড়ী অপেক্ষা করিতেছিল: "দেখ!… ঐ কামরার ভিতরে "খোকা"র বাপ মা আছেন—পুত্রকে দেখবার জন্যই এসেছেন…দুর্ঘটনার কথাটা ওঁদের জানিয়ে দিও…খুব ধীরে ধীরে—খুব সন্তর্পণে জানিয়ে দিও… কেননা সংবাদ পেয়ে যে আঘাত লাগবে তাতে বুড়া বুড়ী মারা যেতে পারে!…"

এই বলিয়া ট্রেণের মাল-গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। এবং সমস্ত পথটা বিষাদে মগ্ন হইয়া রহিলাম।

পরে কি হইল আমি আর কিছুই জানিতে পারি নাই… সেই পর্য্যন্ত আমি এসিয়া মাইনরে আর ফিরিয়া যাই নাই …আমার মনে হইল, আমি যেন একটা কি মহাপাপ করিয়াছি!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবকুমার

শিশুকাল মাতৃকোলে দিগম্বর বেশ,
নবীন নধরমূর্ত্তি নাহি চিন্তা লেশ,
আধ আধ মৃদুভাষ সৌম্য দেবদ্যুতি,
সদানন্দ আত্মারাম অমিয় প্রকৃতি,
ললিত ভঙ্গিমাময় অস্থির গমন,
যুগল নয়ন নিত্য পুণ্য প্রস্রবণ,
ঊষার নীহার সম পূর্ণ পবিত্রতা,
সুদীর্ঘ সাধনলভ্য মাতৃ-নির্ভরতা,
হেন অপরূপ বেশে করি বিমণ্ডিত,
কোথা হ'তে কে তোদের প্রেরিছে নিয়ত!
কোথাকার পুণ্যস্মৃতি করিতে বোধন,
নিশিদিন শ্রান্তিহীন ব্রত আয়োজন!
নিভৃত প্রচ্ছন্ন শান্ত কোন নিকুঞ্জের,
স্নিগ্ধ পরিমলবাহী উৎস আনন্দের!

শ্রীহরিদাস দত্ত।

জাগরণ*

প্রতিদিন আমাদের যে আশ্রমদেবতা আমাদের নানা কাজের আড়ালেই গোপনে থেকে যান, তাঁকে স্পষ্ট করে দেখা যায় না, তিনি আজ এই পুণ্যদিনের প্রথম ভোরের আলোতে উৎসবদেবতার উজ্জ্বলবেশ পরে আমাদের সকলের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছেন—জাগো, আজ, আশ্রমবাসী সকলে জাগো!

যখন আমাদের চোখে-দেখার সঙ্গে বিশ্বের আলোকের যোগ হয়, যখন আমাদের কানে-শোনার সঙ্গে বিশ্বের গানের মিলন ঘটে, যখন আমাদের স্পর্শস্নায়ুর তন্তুতে তন্তুতে বিশ্বের কত হাজার রকম আঘাতের ঢেউ আমাদের চেতনার উপরে ঢেউ খেলিয়ে উঠ্‌তে থাকে তখনি আমাদের জাগা;—আমাদের শক্তির সঙ্গে যখন বিশ্বের শক্তির যোগ দুইদিক থেকেই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখনি জাগা।

অতিথি যেমন নিদ্রিত ঘরের দ্বারে ঘা মারে, সমস্ত জগৎ অহরহ তেমনি করে আমাদের জীবনের দ্বারে ঘা মারচে, বল্‌চে জাগো। প্রত্যেক শক্তির উপরে বিরাট শক্তির স্পর্শ আস্‌চে বল্‌চে জাগো। যেখানে সেই বড়র আহ্বানে আমাদের ছোটটি তখনি সাড়া দিচ্চে সেইখানেই প্রাণ, সেইখানেই বল, সেইখানেই আনন্দ। আমাদের হাজার তারের বীণার প্রত্যেক তারেই ওস্তাদের আঙুল পড়চে, প্রত্যেক তারটিকেই বল্‌চে, জাগো। যে তারটি জাগ্‌চে সেই তারেই সুর, সেই তারেই সঙ্গীত। যে তার শিথিল, যে তার জাগচে না, সেই তারে আনন্দ নেই, সেই তারটিকে সেরে-তোলা বেঁধে-তোলার অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে তবে সেই সঙ্গীতের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে হয়।

এই রকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমরা যে কত শত জাগার মধ্যে দিয়ে জাগ্‌তে জাগ্‌তে এসেছি তা কি আমরা জানি! প্রত্যেক জাগার সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব্ব আনন্দ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা কি আমাদের স্মরণ আছে? জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে আনন্দের মাঝখানে

* বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে ৭ই পৌষ প্রাতঃকালে পঠিত।

স্তরে স্তরে কত ঘুমের পর্দ্দা একটি একটি করে খুলে গিয়েছে তা অতীত যুগযুগান্তরের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে—মহাকালের দপ্তরের সেই বই কে আজ খুলে পড়তে পারবে? অনন্তের মধ্যে আমাদের এই যে জাগরণ, এই যে নানাদিকের জাগরণ, গভীর থেকে গভীরে, উদার থেকে উদারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা ত এখনো শেষ হয় নি। সেই চিরজাগ্রত পুরুষ, যিনি কালে কালে আমাদের চিরদিন জাগিয়ে এসেছেন—তিনি তাঁর হাজার-মহল বিশ্বভবনের মধ্যে আজ এই মনুষ্যত্বের সিংহদ্বারটা খুলে আমাদের ডাক দিয়েছেন—এই মনুষ্যত্বের মুক্তদ্বারে অনন্তের সঙ্গে মিলনের জাগরণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করচে—সেই জাগরণে এবার যার সম্পূর্ণ জাগা হল না—ঘুমের সকল আবরণগুলি খুলে যেতে না যেতে মানবজন্মের অবকাশ যার ফুরিয়ে গেল স কৃপণঃ, সে কৃপাপাত্র।

মনুষ্যত্বের এই যে জাগা, এও কি একটিমাত্র জাগরণ? গোড়াতেই ত আমাদের দেহশক্তির জাগা আছে—সেই জাগাটাই সম্পূর্ণ হওয়া কি কম কথা! আমাদের চোখ-কান আমাদের হাত-পা তার সম্পূর্ণ শক্তিকে লাভ করে সজাগভাবে শক্তির ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের মধ্যে এমন কয় জন আছে? তারপর মনের জাগা আছে, হৃদয়ের জাগা আছে, আত্মার জাগা আছে—বুদ্ধিতে জাগা, প্রেমেতে জাগা, ভূমানন্দে জাগা আছে—এই বিচিত্র জাগায় মানুষকে ডাক পড়েছে—যেখানে সাড়া দিচ্চে না সেইখানেই সে বঞ্চিত হচ্চে—যেখানে সাড়া দিচ্চে সেই-খানেই ভূমার মধ্যে তার আত্মউপলব্ধি সম্পূর্ণ হচ্চে, সেই-খানেই তার চারিদিকে শ্রী সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। মানুষের ইতিহাসে কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে জাতির পর জাতির উত্থানপতনের বজ্রনির্ঘোষে মনুষ্যত্বের প্রত্যেক দ্বারে-বাতায়নে এই মহাউদ্বোধনের আহ্বানবাণী ধ্বনিত হয়ে এসেছে—বল্‌চে, ভূমার মধ্যে জাগ্রত হও, আপনাকে বড় করে জান! বল্‌চে, নিজের কৃত্রিম আচারের কাল্পনিক বিশ্বাসের অন্ধসংস্কারের তমিস্র আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখো না—উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোকের মধ্য জাগ্রত হও—আত্মানং বিদ্ধি।

এই যে জাগরণ, যে জাগরণে আমরা আপনাকে সত্যের মধ্যে দেখি, জ্যোতির মধ্যে দেখি, অমৃতের মধ্যে দেখি—যে জাগরণে আমরা প্রতিদিনের স্বরচিত তুচ্ছতার সঙ্কোচ বিদীর্ণ করে আপনাকে পূর্ণতার মধ্যে বিকশিত করে দেখি—সেই জাগরণেই আমাদের উৎসব। তাই আমাদের উৎসবদেবতা প্রতিদিনের নিদ্রা থেকে আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের জাগিয়ে তোলবার জন্যে দ্বারে এসে তাঁর ভৈরব রাগিণীর প্রভাতীগান ধরেছেন—আজ আমাদের উৎসব সার্থক হোক্।

আমরা প্রত্যেকেই একদিকে অত্যন্ত ছোট আর-একদিকে অত্যন্ত বড়। যে দিকটায় আমি কেবল মাত্রই আমি—সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলই আমি—কেবল আমার সুখ দুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা—যেদিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখ্‌তে চাই, সেদিকটাতে আমি ত একটি বিন্দুমাত্র, সেদিকটাতে আমার মত ছোট আর কে আছে! আর যে দিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা, যে দিকে সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শত সহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ির সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে,—আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোক-লোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে, তুমি আমার যেমন এমনটি কোথাও আর কেউ নেই, অনন্তের মধ্যে তুমিই কেবল তুমি; সেই খানে আমার চেয়ে বড় আর কে আছে! এই বড়র দিকে যখন আমি জাগ্রত হই, সেই দিকে আমার যেমন শক্তি, যেমন প্রেম, যেমন আনন্দ, সেই দিকে আমার নিজের কাছে নিজের উপলব্ধি যেমন পরিপূর্ণ, এমন ছোটর দিকে কখনই নয়। সকল স্বার্থের সকল অহঙ্কারের অতীত সেই আমার বড় আমিকে সকলের চেয়ে বড় আমির মধ্যে ধরে দেখবার দিনই হচ্চে আমাদের বড় দিন।

জগতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ আমি। সেই বিশেষত্ব একেবারে অটল অটুট; অনন্ত কালে অনন্ত বিশ্বে আমি যা' আর-কেউ তা নয়।

তা হলে দেখা যাচ্চে এই যে আমিত্ব বলে' একটি

জিনিষ এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জান্‌চি যে আমি আছি, এই জানাটি যেখানে জাগ্‌চে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমিই হচ্চি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চির-বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল-চরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু এই যে ঘর ভাঙাবার মূল আমি, মিলিয়ে দেবার মূলও হচ্চেন উনি: পৃথক্ না হলে মিলনও হয় না। তাই দেখ্‌তে পাচ্চি সমস্ত জগৎজুড়ে বিচ্ছেদের শক্তি আর মিলনের শক্তি, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ, প্রত্যেক অণু পরমাণুর মধ্যে কেবলি পরস্পর বোঝাপড়া করচে। আমার আমির মধ্যেও সেই বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড দুই শক্তির খেলা;—তার এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে ঠেলে ফেল্‌চে আর এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে টেনে নিচ্চে। এম্‌নি করে আমি এবং আমি-নার মধ্যে কেবলই আনাগোনার জোয়ার ভাটা চলেচে। এম্‌নি করে আমি আমাকে জান্‌চি বলেই তার প্রতিঘাতে সকলকে জান্‌চি এবং সকলকে জানচি বলেই তার প্রতিঘাতে আমাকে জানচি। বিশ্ব-আমির সঙ্গে আমার আমির এই নিত্যকালের ঢেউ-খেলাখেলি।

এই এক আমিকে অবলম্বন করে বিচ্ছেদ ও মিলন উভয় তত্ত্বই আছে বলে' আমিটুকুর মধ্যে অনন্ত দ্বন্দ্ব! যে-দিকে সে পৃথক্ সেইদিকে তার চিরদিনের দুঃখ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার চিরকালের আনন্দ; যেদিকে সে পৃথক সেইদিকে তার স্বার্থ সেইদিকে তার পাপ, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকে তার ত্যাগ সেদিকে তার পুণ্য; যেদিকে সে পৃথক সেই দিকেই তার কঠোর অহঙ্কার, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকেই তার সকল মাধুর্য্যের সার প্রেম। মানুষের এই আমির একদিকে ভেদ এবং আরএকদিকে অভেদ আছে বলেই মানুষের সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা হচ্চে দ্বন্দ্ব সমাধানের প্রার্থনা; অসতোমা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সাধক কবি কবীর দুটিমাত্র ছত্রে আমি-রহস্যের এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন:—

যব হম রহল রহা নহি কোঈ,
হমরে মাহ রহল সব কোঈ।

অর্থাৎ, আমির মধ্যে কিছুই নেই কিন্তু আমার মধ্যে সমস্তই আছে। অর্থাৎ এই আমি একদিকে সমস্ত হতে পৃথক হয়ে অন্যদিকে সমস্তকেই আমার করে নিচ্চে।

এই আমার দ্বন্দ্বনিকেতন আমিকে আমার ভগবান নিজের মধ্যে লোপ করে ফেল্‌তে চাননা, এ'কে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চান। এই আমি তাঁর প্রেমের সামগ্রী; এ'কে তিনি অসীম বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল পর করে অসীম প্রেমের দ্বারা চিরকাল আপন করে নিচ্চেন।

এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম আমির অনন্ত আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠ্‌চে। অথচ এই অন্তহীন আমি-মণ্ডলীর প্রত্যেক আমির মধ্যেই তাঁর এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ, যা জগতে আর কোনোখানেই নেই। সেই জন্যে আমি যত ক্ষুদ্রই হই আমার মত তাঁর আর দ্বিতীয় কিছুই নেই; আমি যদি হারাই তবে লোক-লোকান্তরের সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে যাবে। সেই জন্যেই আমাকে নইলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নয়, সেই জন্যেই সমস্ত জগতের ভগবান বিশেষ-রূপেই আমার ভগবান, সেই জন্যেই আমি আছি এবং অনন্ত প্রেমের বাঁধনে চিরকালই থাক্‌ব।

আমির এই চরম গৌরবের কথাটি প্রতিদিন আমাদের মনে থাকে না। তাই প্রতিদিন আমরা ছোট হয়ে সংসারী হয়ে সম্প্রদায়বদ্ধ হয়ে থাকি।

কিন্তু মানুষ আমির এই বড়দিকের কথাটি দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ভুলে থেকে বাঁচবে কি করে? তাই প্রতিদিনের মধ্যে মধ্যে এক একটি বড়দিনের দরকার হয়। আগাগোড়া সমস্তই দেয়াল গেঁথে গৃহস্থ বাঁচে না, তার মাঝে মাঝে জানলা দরজা বসিয়ে সে বাহিরকে ঘরের ও ঘরকে বাহিরের করে রাখ্‌তে চায়। বড়দিনগুলি হচ্চে সেই প্রতিদিনের দেয়ালের মধ্যে বড় দরজা। আমাদের প্রতিদিনের সূত্রে এই বড়দিনগুলি সূর্য্যকান্ত মণির মত গাঁথা হয়ে যাচ্চে; জীবনের মালায় এই দিনগুলি যত বেশি, যত খাঁটি, যত বড়, আমাদের জীবনের মূল্য তত বেশি, আমাদের জীবনে সংসারের শোভা তত বেড়ে ওঠে।

তাই বলছিলুম আজ আমাদের উৎসবের প্রাতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দিকে আশ্রমের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে; আজ, নিখিল মানবের সঙ্গে আমাদের যে যোগ, সেই যোগটি ঘোষণা করবার রসনচৌকি এই প্রান্তরের আকাশ পূর্ণ করে বাজ্চে, কেবলি বাজ্চে, ভোর থেকে বাজচে। আজ আমাদের এই আশ্রমের ক্ষেত্র সকলেরই আনন্দক্ষেত্র। কেন? কেন না, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাধনায় সমস্ত মানুষের সাধনা চল্চে। এখানকার তপস্যায় সমস্ত পৃথিবীর লোকের ভাগ আছে। আশ্রমের সেই বড় কথাটিকে আজ আমাদের হৃদয়মনের মধ্যে আমাদের জীবনের সমস্ত সঙ্কল্পের মধ্যে পরিপূর্ণ করে নেব।

সকলের সঙ্গে আমাদের এই যোগের সঙ্গীতটি আজ কে বাজাবেন? সেই মহাযোগী, জগতের অসংখ্য বীণাতন্ত্রী যাঁর কোলের উপরে অনন্তকাল ধরে স্পন্দিত হচ্চে। তিনিই একের সঙ্গে অন্যের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের, যুগের সঙ্গে যুগান্তরের, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ঘটিয়ে মিলন ঘটিয়ে তুলচেন; তাঁরই হাতের সেই বিচ্ছেদ-মিলনের ঝঙ্কারে বৈচিত্র্যের শত শত তান কেবলি উৎসারিত হয়ে আকাশ পরিপূর্ণ করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়চে; একই ধুয়ো থেকে তানের পর তান ছুটে বেরিয়ে যাচ্চে, এবং একই ধুয়োতে তানের পর তান এসে পরিসমাপ্ত হচ্চে।

বীণার তারগুলো যখন বাজেনা তখন তারা পাশাপাশি পড়ে থাকে, তবুও তাদের মিলন হয় না, তখনো তারা কেউ কাউকে আপন বলে জানে না। যেই বেজে ওঠে অমনি সুরে সুরে তানে তানে তাদের মিলিয়ে মিলিয়ে দেয়—তাদের সমস্ত ফাঁকগুলো রাগরাগিণীর মাধুর্য্যে ভরে ভরে ওঠে। তখন তারা স্বতন্ত্র তবু এক, কেউবা লোহার কেউবা পিতলের তবু এক, কেউবা সরু সুরের কেউবা মোটা সুরের তবু এক—তখন তারা কেউ কাউকে আর ছাড়তে পারে না। তাদের প্রত্যেকের ভিতরের সত্য বাণীটি যেই প্রকাশ হয়ে পড়ে অমনি সত্যের সঙ্গে সত্যের, প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশের অন্তরতর মিলটি সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাসে ধরা পড়ে যায়, দেখা যায় আপনার মধ্যে সুর যতই স্বতন্ত্র হোক্, গানের মধ্যে তারা এক।

আমাদের জীবনের বীণাতে সংসারের বীণাতে প্রতিদিন তার বাঁধা চল্চে, সুর বাঁধা এগচ্চে। সেই বাঁধবার মুখে কত কঠিন আঘাত, কত তীব্র বেসুর! তখন চেষ্টার মূর্ত্তি কষ্টের মূর্ত্তিটাই বারবার করে দেখা যায়। সেই বেসুরকে সমগ্রের সুরে মিলিয়ে তুলতে এত টান পড়ে যে এক এক সময় মনে হয় যেন তার আর সইতে পারল না, গেল বুঝি ছিঁড়ে!

এমনি করে চেয়ে দেখতে দেখতে শেষকালে মনে হয় তবে বুঝি সার্থকতা কোথাও নেই—কেবলি বুঝি এই টানাটানি বাঁধাবাঁধি, দিনের পর দিন কেবলি খেটে মরা, কেবলি ওঠা পড়া, কেবলি অহং যন্ত্রটার অচল খোঁটার মধ্যে বাঁধা থেকে মোচড় খাওয়া—কোনো অর্থ নেই, কোনো পরিণাম নেই—কেবলি দিনযাপন মাত্র!

কিন্তু যিনি আমাদের বাজিয়ে তিনি কেবলি কি কঠিন হাতে নিয়মের খোঁটায় চড়িয়ে পাক দিয়ে দিয়ে আমাদের সুরই বাঁধ্চেন? তা ত নয়! সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঝঙ্কারও দিচ্চেন। কেবলি নিয়ম? তা ত নয়! তার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ! প্রতিদিন খেতে হচ্চে বটে পেটের দায়ের অত্যন্ত কঠোর নিয়মে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই মধুর স্বাদ-টুকুর রাগিণী রসনায় রসিত হয়ে উঠ্চে। আত্মরক্ষার বিষম চেষ্টায় প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বিশ্বজগতের শতসহস্র নিয়মকে প্রাণপণে মান্তে হচ্চে বটে কিন্তু সেই মেনে চলবার চেষ্টাতেই আমাদের শক্তির মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে উঠচে। দায়ও যেমন কঠোর, খুসিও তেমনি প্রবল।

সেই আমাদের ওস্তাদের হাতে বাজবার সুবিধেই হচ্চে ঐ! তিনি সব সুরের রাগিণীই জানেন। যে ক'টি তার বাঁধা হচ্চে, তাতে যে ক'টি সুর বাজে কেবলমাত্র সেই ক'টি নিয়েই তিনি রাগিণী ফলিয়ে তুলতে পারেন। পাপী হোক্ মূঢ় হোক্ স্বার্থপর হোক্ বিষয়ী হোক্, যে হোক্ না, বিশ্বের আনন্দের একটা সুরও বাজে না এমন চিত্ত কোথায়? তা হলেই হল; সেই সুযোগটুকু পেলেই তিনি আর ছাড়েন না। আমাদের অসাড়তমেরও হৃদয়ে প্রবল ঝঞ্ঝনার মাঝখানে হঠাৎ এমন একটা কিছু সুর বেজে ওঠে যার যোগে ক্ষণকালের জন্যে নিজের চারদিককে ছাড়িয়ে গিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে মিলে যাই। এমন একটা কোনো

সুর, নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে অহঙ্কারের সঙ্গে যার মিল নেই—যার মিল আছে আকাশের নীলিমার সঙ্গে, প্রভাতের আলোর সঙ্গে, যার মিল আছে ত্যাগীর ত্যাগের সঙ্গে, বীরের অভয়ের সঙ্গে, সাধুর প্রসন্নতার সঙ্গে, সেই সুরটি যখন বাজে তখন মায়ের কোলের অতি ক্ষুদ্র শিশুটিও আমাদের সকল স্বার্থের উপরে চেপে বসে; সেই সুরেই আমরা ভাইকে চিনি, বন্ধুকে টানি, দেশের কাজে প্রাণ দিই; সেই সুরে সত্য আমাদের দুঃসাধ্য সাধনের দুর্গম পথে অনায়াসে আহ্বান করে; সেই সুর যখন বেজে ওঠে তখন আমরা জন্মদরিদ্রের এই চিরাভ্যস্ত কথাটা মুহূর্ত্তেই ভুলে যাই যে, আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণার জীব, আমরা জন্মমরণের অধীন, আমরা স্তুতিনিন্দায় আন্দোলিত; সেই সুরের স্পন্দনে আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্র সীমা স্পন্দিত হয়ে উঠে আপনাকে লুকিয়ে অসীমকেই প্রকাশ করতে থাকে। সে সুর যখন বাজেনা তখন আমরা ধূলির ধূলি, তখন আমরা প্রকৃতির অতি ভীষণ প্রকাণ্ড যন্ত্রটার মধ্যে আবদ্ধ একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র চাকা, কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। তখন বিশ্বজগতের কল্পনাতীত বৃহত্ত্বের কাছে আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন লজ্জিত, বিশ্বশক্তির অপরিমেয় প্রবলতার কাছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি কুণ্ঠিত। তখন আমরা মাথা হেঁট করে দুই হাত জোড় করে অহোরাত্র ভয়ে ভয়ে বাতাসকে আলোকে সূর্য্যকে চন্দ্রকে পর্ব্বতকে নদীকে নিজের চেয়ে বড় বলে দেবতা বলে যখন-তখন যেখানে-সেখানে প্রণাম করে করে বেড়াই। তখন আমাদের সঙ্কল্প সঙ্কীর্ণ, আমাদের আশা ছোট, আকাঙ্ক্ষা ছোট, বিশ্বাস ছোট, আমাদের আরাধ্য দেবতাও ছোট। তখন কেবল খাও, পর, সুখে থাক, হেসে খেলে দিন কাটাও এইটেই আমাদের জীবনের মন্ত্র। কিন্তু সেই ভূমার সুর যখনি বৃহৎ আনন্দের রাগিণীতে আমাদের আত্মার মধ্যে মন্দ্রিত হয়ে ওঠে তখনি কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা থেকেও আমরা তার থেকে মুক্ত হই, তখন আমরা প্রকৃতির অধীন থেকেও অধীন নই, প্রকৃতির অংশ হয়েও তার চেয়ে বড়; তখন আমরা জগৎসৌন্দর্য্যের দর্শক, জগৎঐশ্বর্য্যের অধিকারী, জগৎপতির আনন্দভাণ্ডারের অংশী—তখন আমরা প্রকৃতির বিচারক, প্রকৃতির স্বামী।

আজ বাজুক ভূমানন্দের সেই মেঘমন্দ্র সুন্দর ভীষণ সঙ্গীত যাতে আমরা নিজেকে নিজে অতিক্রম করে অমৃতলোকে জাগ্রত হই! আজ আপনার অধিকারকে বিশ্বক্ষেত্রে প্রশস্ত করে দেখি, শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহযোগী করে দেখি, মর্ত্ত্যজীবনকে অনন্তজীবনের মধ্যে বিধৃতরূপে ধ্যান করি।

বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! কেবল আমার একলার বীণা নয়—লোকে লোকে জীবনবীণা বাজে! কত জীব, তার কত রূপ, তার কত ভাষা, তার কত সুর, কত দেশে কত কালে, সব মিলে অনন্ত আকাশে বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের নিরন্তর আন্দোলনে, সুখ দুঃখের, জন্ম মৃত্যুর, আলোক অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত অভিঘাতে বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! ধন্য আমার প্রাণ, যে, সেই অনন্ত আনন্দসঙ্গীতের মধ্যে আমারও সুরটুকু জড়িত হয়ে আছে; এই আমিটুকুর তান সকল-আমির গানে সুরের পর সুর জুগিয়ে মীড়ের পর মীড় টেনে চলেছে। এই আমিটুকুর তান কত সূর্য্যের আলোয় বাজ্‌চে, কত লোকে লোকে জন্মমরণের পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ হচ্চে, কত নব নব নিবিড় বেদনার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় রূপে বিচিত্র হয়ে উঠ্‌চে; সকল-আমির বিশ্বব্যাপী বিরাট্‌বীণায় এই আমি এবং আমার মত এমন কত আমির তার আকাশে আকাশে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌চে। কি সুন্দর আমি! কি মহৎ আমি! কি সার্থক আমি!

আজ আমাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিনে আমাদের সমস্ত মন প্রাণকে বিশ্বলোকের মাঝখানে উন্মুখ করে তুলে ধরে এই কথাটি স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের আশ্রমের প্রাতদিনের সাধনার লক্ষ্যটি এই যে, বিশ্বের সকল স্পর্শে আমাদের জীবনের সকল তার বাজতে থাক্‌বে অনন্তের আনন্দগানে। সঙ্কোচ নেই, কোথাও সঙ্কোচ নেই, কোথাও কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই;—স্বার্থের সঙ্কোচ, ক্ষুদ্র সংস্কারের সঙ্কোচ, ঘৃণাবিদ্বেষের সঙ্কোচ—কিছুমাত্র না! সমস্ত অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত পরিষ্কার, অত্যন্ত খোলা, সমস্তই আলোতে ঝল্‌মল্ করচে তার উপর বিশ্বপতির আঙুল যখন যেম্‌নি এসে পড়চে অকুণ্ঠিত সুর তৎক্ষণাৎ ঠিকটি বেজে উঠ্‌চে। জড় পৃথিবীর জলস্থলের

সঙ্গেও তার আনন্দ সাড়া দিচ্চে, তরুলতার সঙ্গেও তার আনন্দ মর্ম্মরিত হয়ে উঠ্‌চে, পশু পক্ষীর সঙ্গেও তার আনন্দের সুর মিল্‌চে, মানুষের মধ্যেও তার আনন্দ কোনো জায়গায় প্রতিহত হচ্চে না; সকল জাতির মধ্যে, সকলের সেবার মধ্যে, সকল জ্ঞানে সকল ধর্ম্মে তার উদার আত্ম-বিস্মৃত আনন্দ, সূর্য্যের সহস্র কিরণের মত অনায়াসে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়চে। সর্ব্বত্রই সে জাগ্রত, সে সচেতন, সে উন্মুখ; প্রস্তুত তার দেহ মন, উন্মুক্ত তার দ্বার বাতায়ন, উচ্ছ্বসিত তার আহ্বানধ্বনি। সে সকলের, এবং সেই বিশ্বরাজপথ দিয়েই সে তাঁর যিনি সকলেরই।

হে অমৃত আনন্দময়, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃত আনন্দরূপ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। কতকাল ধরে যে, তা আমি নিজেও জানিনে, কিন্তু অপেক্ষা করে আছি। যত দিন নিজেকে ক্ষুদ্র বলে জান্‌চি, ছোট চিন্তায় ছোট বাসনায় মৃত্যুর বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি ততদিন তোমার অমৃতরূপ আমার মধ্যে প্রত্যক্ষ হচ্চে না। ততদিন আমার দেহে দীপ্তি নেই, মনে নিষ্ঠা নেই, কর্ম্মে ব্যবস্থা নেই, চরিত্রে শক্তি নেই, চারিদিকে শ্রী নেই, ততদিন তোমার জগদ্ব্যাপী নিয়মের সঙ্গে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আমার মিল হচ্চে না। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না উপলব্ধি করচি ততদিন আমার ভয়ের অন্ত নেই, শোকের অবসান নেই, ততদিন মৃত্যুকেই চরম ভয় বলে মনে করি, ক্ষতিকেই চরম বিপদ বলে গণ্য করি, ততদিন সত্যের জন্যে সংগ্রাম করতে পারিনে, মঙ্গলের জন্যে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই, ততদিন আত্মাকে ক্ষুদ্র মনে করি বলেই কৃপণের মত আপনাকে কেবলি পায়ে পায়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চল্‌তে চাই; শ্রম বাঁচিয়ে চলি, কষ্ট বাঁচিয়ে চলি, নিন্দা বাঁচিয়ে চলি, কিন্তু সত্য বাঁচিয়ে চলিনে, ধর্ম্ম বাঁচিয়ে চলিনে, আত্মার সম্মান বাঁচিয়ে চলিনে। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃত-রূপ আনন্দরূপ না দেখি ততদিন চারিদিকের অনিয়ম, অস্বাস্থ্য, অজ্ঞান, অপূর্ণতা, অসৌন্দর্য্য, অপমান আমার জড়চিত্তকে আঘাতমাত্র করে না—চতুর্দ্দিকের প্রতি আমার সুগভীর আলস্যবিজড়িত অনাদর দূর হয় না, নিখিলের প্রতি আমার আত্মা পরিপূর্ণশক্তিতে প্রসারিত হতে পারে না; ততদিন পাপকে বিমুগ্ধ বিহ্বলভাবে অন্তরের মধ্যে দিনের পর দিন কেবল লালন করেই চলি এবং পাপকে উদাসীন দুর্ব্বলভাবে বাহিরে দিনের পর দিন কেবল প্রশ্রয় দিতেই থাকি—কঠিন এবং প্রবল সঙ্কল্প নিয়ে অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াতে পারিনে;—কী অব্যবস্থাকে কী অন্যায়কে আঘাত করার জন্যে প্রস্তুত হইনে পাছে তার লেশমাত্র প্রতিঘাত নিজের উপরে এসে পড়ে। তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ আমার এই আমিটুকুর মধ্যে বোধ করতে পারিনে বলেই ভীরুতার অধম ভীরুতা এবং দীনতার অধম দীনতার মধ্যে দিনে দিনে তলিয়ে যেতে থাকি, দেহে মনে গৃহে গ্রামে সমাজে স্বদেশে সর্ব্বত্রই নিদারুণ নৈষ্ফল্য মঙ্গলকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে থাকে, এবং অতি বীভৎস অচল জড়ত্ব ব্যাধিরূপে দুর্ভিক্ষরূপে, অনাচার ও অন্ধ সংস্কাররূপে, শতসহস্র কাল্পনিক বিভীষিকারূপে অকল্যাণ ও শ্রীহীনতাকে চারিদিকে স্তূপাকার করে তোলে।

হে ভূমা, আজকের এই উৎসবের দিন আমাদের জাগ-রণের দিন হোক—আজ তোমার এই আকাশে আলোকে বাতাসে উদ্বোধনের বিপুলবাণী উদ্গীত হতে থাক্, আমরা অতি দীর্ঘ দীনতার নিশাবসানে নেত্র উন্মীলন করে জ্যোতির্ম্ময় লোকে নিজেকে অমৃতস্য পুত্রাঃ বলে অনুভব করি, আনন্দ-সঙ্গীতের তালে তালে নির্ভয়ে যাত্রা করি সত্যের পথে, আলোকের পথে, অমৃতের পথে; আমাদের এই যাত্রার পথে আমাদের মুখে চক্ষে, আমাদের বাক্যে মনে, আমাদের সমস্ত কর্ম্মচেষ্টায়, হে রুদ্র! তোমার প্রসন্নমুখের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক্! আমরা এখানে সকলে যাত্রীর দল—তোমার আশীর্ব্বাদে লাভের জন্য দাঁড়িয়েছি; সম্মুখে আমাদের পথ, আকাশে নবীন সূর্য্যের আলোক, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আমাদের মন্ত্র, অন্তরে আমাদের আশার অন্ত নেই, আমরা মান্‌বনা পরাভব, আমরা জান্‌বনা অবসাদ, আমরা করবনা আত্মার অবমাননা, চল্‌ব দৃঢ়পদে, অসঙ্কুচিত চিত্তে—চল্‌ব সমস্ত সুখদুঃখের উপর দিয়ে, সমস্ত

স্বার্থ এবং দৈন্য এবং জড়তাকে দলিত করে—তোমার বিশ্বলোকে অনাহত তূরীতে জয়বাদ্য বাজ্‌তে থাকবে, চারিদিক থেকে আহ্বান আস্‌তে থাকবে, এস, এস, এস,—আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাবে চিরজীবনের সিংহদ্বার—কল্যাণ, কল্যাণ, কল্যাণ—অন্তরে বাহিরে কল্যাণ,—আনন্দং আনন্দং, পরিপূর্ণমানন্দং!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুখ ও দুঃখ

সুখ বলে "দুঃখ তুই কেন দিলি দেখা,
সবে সুখী হ'ত যদি থাকিতাম একা।"
দুঃখ বলে "সুখ তুই বড় অহঙ্কারী—
আমি আছি তাই তোরে চিনে নরনারী।"

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ।

আমার চীন-প্রবাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হংকং হইতে উই-হাই-উই পাঁচ দিনে পৌঁছিলাম। পীত সাগর তখন বড়ই অশান্ত। দ্বিতল ত্রিতল সমান উঁচু ঢেউগুলি আসিয়া প্রতিপদে জাহাজকে বাধা দিতেছিল। 'টেরিবল্' নামক মানওয়ারী জাহাজ তখন উই-হাই-উই বন্দর পাহারা দিতেছিল। আমাদের জাহাজ উক্ত রণ-তরীর নিকটে নঙ্গর করিল, কিন্তু আমাদের আগমন যে বড় কেউ আশা করিতেছিল এমন বলিয়া বোধ হইল না। এই স্থান ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে ইংরাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। এই স্থান শালটু প্রদেশের নিকটবর্ত্তী, এবং দক্ষিণ দিকের সমুদ্রপথ রক্ষা করিতেছে। এই পথ দিয়া টিনসিন এবং পিকিন যাইতে হয়। আমরা ছয় ঘণ্টা তথায় অবস্থান করিলে আরও অগ্রসর হইবার হুকুম আসিল। তথা হইতে এইবার জাহাজ টাকু অভিমুখে যাত্রা করিল। তিন দিনে 'টাকু বার' পৌঁছিলাম। জাহাজ যতই টাকুর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর জাতিনিবহের রণতরী সমুদ্রবক্ষ ছাইয়া রহিয়াছে দেখা গেল, সে দৃশ্য মনোহর, কিন্তু ভীতিপ্রদ। সকল জাহাজগুলিই শ্বেত বর্ণে রঞ্জিত। জাহাজের চতুর্দ্দিক ছিদ্রযুক্ত, ছিদ্রমুখে কামানের মুখগুলি দেখা যাইতেছে, বোধ হয় আগন্তুককে ইঙ্গিতে বলিতেছে 'সাবধান, আর বেশি অগ্রসর হইও না, ভস্মসাৎ হইবে, যেখানে আছ সেখানেই স্থির হইয়া থাক'। আমরা পৌঁছিবামাত্র চতুর্দ্দিকস্থ জাহাজ হইতে ঘন ঘন তোপধ্বনি হইতে লাগিল। সে আওয়াজ যে কি ভয়ানক, পাঠকের তাহা অনুমান করা অসম্ভব। কলিকাতা-কেল্লায় একটী মাত্র তোপের আওয়াজ শুনিয়াছেন, কিন্তু এ শব্দ এক সঙ্গে অনেকগুলির। ঐ শব্দ আবার সমুদ্রবক্ষে প্রতি-ধ্বনিত হইয়া আরও ভয়ানক হয়। রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোকমালায় ঐ সকল অর্ণবপোত এক অভিনব সুন্দর শ্রী ধারণ করে। ক্ষণে ক্ষণে আবার ঐ সকল যুদ্ধজাহাজ হইতে সুদূর দর্শনোপযোগী আলোক (Search light) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। টাকু হইতে ছোট বাষ্পতরীযোগে সিন্‌হো যাইতে হয়। জাহাজ তীরে লাগে না, কারণ ইহার তীরবর্ত্তী সমুদ্রের সকল স্থানই নাতিগভীর। সমুদ্র আজ দুই দিন তাণ্ডবনৃত্যে মাতিয়াছে, সুতরাং জাহাজ হইতে নামিবার সুযোগ হয় নাই। একজন সার্জ্জেণ্ট এবং আমি কতকগুলি অনুচর লইয়া প্রথমেই তীরে যাইতে আদিষ্ট হইলাম। সপ্তবিংশতি দিবসে ষ্টিম লঞ্চ যোগে পিহো নদী দিয়া আমরা সিন্‌হো রওনা হইলাম। পিহো নদীর মুখে দুই দিকে দুইটী অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত কেল্লা ছিল, তাহাতে দুইটী কামান পাতা, বিলক্ষণ বিপদ-সঙ্কুল ছিল। জাপানীদিগের বুদ্ধিচাতুরীতে ঐ দুইটী কেল্লা পূর্ব্বেই অধিকৃত হইয়াছিল, সুতরাং নদী দিয়া গমনাগমনে আর কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না। নদীর উভয় পার্শ্বে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র সকল নয়নপথে পতিত হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে কতিপয় চীনেদের বাড়ী এবং শস্যক্ষেত্র। এইরূপ প্রায় সমস্ত পথ দেখিলাম। কোন কোন স্থানে চীনেদের বাষ্পতরী অর্দ্ধনিমজ্জিত। এক স্থানে একখানি টরপেডো বোট জলমগ্ন, কতক অংশ বাহির হইয়া যেন জানাইয়া দিতেছে আমি এখনও এখানে আছি। এই সকল চিহ্ন

কিয়দ্দিন হইল যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার সাক্ষী দিতেছিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সিন্‌হো পৌঁছিলাম। সেখানে এক অদ্ভুত ব্যাপার, লোকজন, সৈন্যসামন্তে স্থানটী ছাইয়া রহিয়াছে। একটী বৃহৎ মেলাতেও বুঝি এত লোকের সমাগম হয় না। কোথাও শিবির সন্নিবেশ, কোথাও স্তূপাকৃতি জিনিষপত্র, কোন স্থানে বা অগণিত পশুপাল। কিন্তু এত যে কাণ্ডকারখানা, সবই যেন কাহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নীরব নিস্তব্ধ। আমাদের জাতভায়াদের মধ্যে চারিজন একত্র হইলেই যেন মনে হয় সেস্থানে কি যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে, কিন্তু এই যে নিবিড় জনতা এখানে টুঁ শব্দ নাই। ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? যে জাতির মধ্যে এত সুনিয়ম এমন সুবন্দোবস্ত, এমন কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, উন্নতি করিবে কি তাহারা না আমরা? শুধু মুণ্ডমালার দাঁতকপাটি করিয়া আমি বড় বলিয়া বসিয়া থাকিলে বড় হওয়া যায় না। আগে অন্ততঃ অনুকরণযোগ্য সদ্‌গুণাবলীতে ভূষিত হও, কাজের রীতিপদ্ধতি সম্যকরূপে শিক্ষা কর, তবে 'হাম্ বড়া' হইবার আশা করিও, নতুবা ঘৃণা এবং অবজ্ঞার পাত্র হইবে। মনের দুঃখে ২।৪ টী অবান্তর কথা বলিতে হইল, পাঠকগণ ক্ষমা কবিবেন। এখন যে জন্য আসরে নামা তাহাই বলা যাউক।

ষ্টিমার হইতে জেটিতে নামিয়াই প্রথমে খোঁজ করিলাম কোথায় কমিসেরিয়েট বা রসদ-গুদাম। কেননা ঐরূপ অসময়ে থাকিবার ত স্থান চাই। যাহোক উক্ত গুদাম খুঁজিয়া লইতে বড় বেশি বেগ পাইতে হইল না, কারণ উহার খবর সকলেই রাখে, ইহাই হইল যে 'জীবন মরণের কাঠি'। গুদামে সে রাত্রির মত আশ্রয় লইলাম। প্রায় একমাস জাহাজে চলাফেরা করিয়া প্রথম মাটিতে নামিয়া শরীর যেন কথঞ্চিৎ টলিতেছিল। সমুদ্রযাত্রার পর সকলেরই এরূপ অবস্থা হয় কিনা জানি না, তবে শর্ম্মাত নিজে বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। আরও কেহ কেহ হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে নাবিকগণের স্থলপথে চলন প্রায়ই ঈষৎ টলিত, স্খলিত! তাহাও জাহাজদোলনের ফলেই বোধ হয় ঐরূপ অভ্যাস হইয়া থাকিবে।

মধ্যে মধ্যে সুদূর দর্শনোপযোগী আলোক দ্বারায় এই স্থান উদ্ভাসিত হইতেছিল। মানসিক উত্তেজনা এবং নানারূপ চিন্তায় কিছুকাল নিদ্রাদেবীর দেখা পাইলাম না তখনও বোধ হইতেছিল জাহাজেই রহিয়াছি। দোলায় শোয়াইয়া কে যেন আমাকে ঘুম পাড়াইতেছে। পরদিন প্রাতঃকালে আমাদের বড় সাহেব অন্যান্য লোকজন লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চীনের রাজকীয় রেলপথ ইতঃপূর্ব্বেই বিদেশীয় শক্তিপুঞ্জ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। রসদ-গুদাম-ঘরের দেয়াল এবং ছাতের খানিকটা চীনেরা গোলা মারিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। গাড়ীগুলিরও দশা প্রায় তদ্রূপ, বন্দুকের গুলিতে শত শত ছিদ্র হইয়া গিয়াছে, ইঞ্জিনখানা ত 'ঝাঁঝরা' সদৃশ। মালপত্র নদীতীর হইতে ট্রেনে উঠাইবার জন্য এখানে একটী 'সাইডিং' প্রস্তুত হইয়াছিল। বারটার সময় রেলগাড়ী চাপিয়া তিনসিন রওনা হইলাম। রেললাইন এই সময়ে রুসিয়ার পরিচালনাধীন ছিল। কিছুদিন পরে আবার ইংরাজ নিজে পরিচালনা করেন। এই দুর্দ্দিনে এখানে একটী চীনেরও টিকি দেখিবার জো ছিল না। সকলেই প্রাণভয়ে পলায়িত। সন্ধ্যা সাতটার সময় তিনসিন ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। সহরে পৌঁছিতে প্রায় রাত্রি দশটা। লোক জন এবং মালপত্র সঙ্গে যথেষ্ট ছিল বলিয়াই এত বিলম্ব। যখন পিহো নদীর পুল পার হইয়া সহরে প্রবেশ করিলাম তখন বোধ হইল যেন এই স্থান জনমানবশূন্য। বিদেশীয় বিভিন্ন বিভিন্ন শক্তির শাস্ত্রী পাহারা সময়ে সময়ে আমাদের গতিরোধ করিয়া দেখিয়া যাইতেছিল, উদ্দেশ্য, শত্রু কি না? প্রাতঃকালে উঠিয়া স্থানটী যেন শ্মশান সদৃশ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বড় বড় বাড়ী আছে কিন্তু মনুষ্যসম্পর্কশূন্য। দোকানগুলিতে ক্রেতা বিক্রেতার নামগন্ধ নাই। খালি দোকান পড়িয়া আছে। কোন বাড়ীর ছাত উড়িয়া গিয়াছে। দেয়ালগুলিও যেন এখন যাই তখন যাই হইয়া আছে। গৃহপালিত কুকুরগুলি পর্য্যন্ত গোলাগুলির তর্জ্জন গর্জ্জনে ময়দানে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কি যে হৃদয়বিদারক দৃশ্য তাহা আর বলিয়া কাজ নাই। নিতান্ত দরিদ্র চীনেমান ব্যতীত সকলেই লুকায়িত কিম্বা
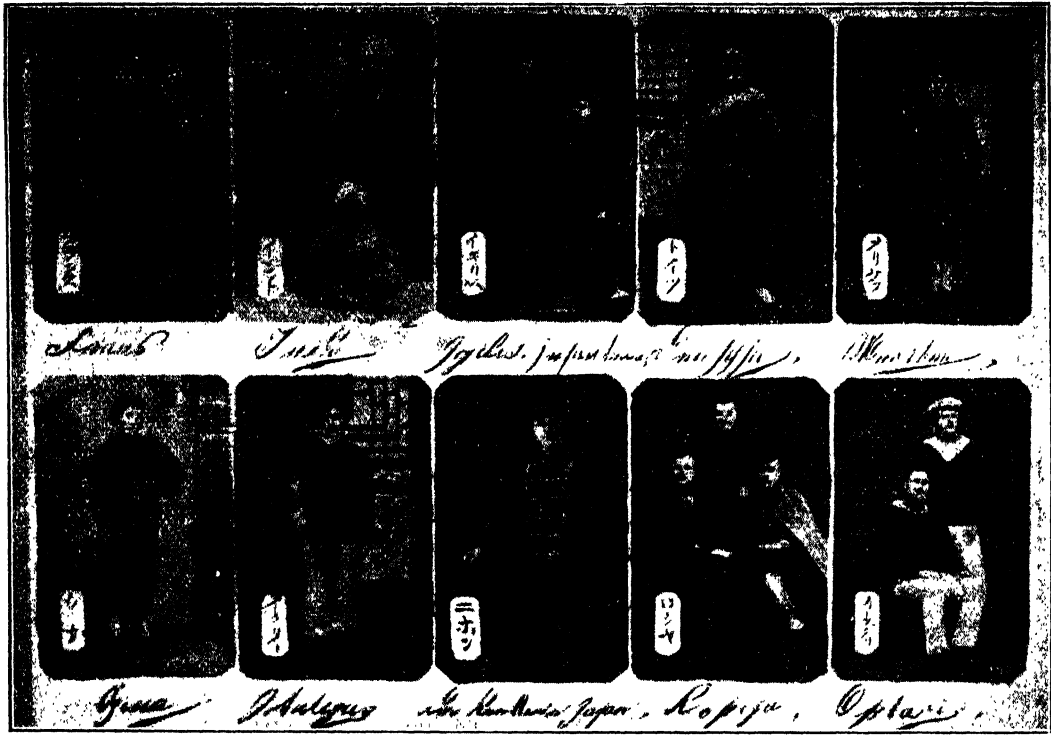
বিভিন্ন দেশের সৈন্য।

পাঠকের বামদিক হইতে প্রথম লাইনে—১। ফরাসিস, ২। ভারতীয়, ৩। ইংরাজ, ৪। জর্ম্মাণ, ৫। আমেরিকান।
দ্বিতীয় লাইনে—১। চীন, ২। ইটালীয়ান, ৩। জাপানী, ৪। রুষিয়ান, ৫। অষ্ট্রীয়ান:

পলায়িত। এই সময় চীন জাতির পক্ষে বড়ই দুর্দ্দিন। অষ্ট বজ্র একত্রিত। চীনাকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। ঘোর নিনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত। রণনিনাদ অহর্নিশি শ্রুতি-গোচর হইতেছে। কোথাও ইংরাজ, কোথাও জর্ম্মান, কোথাও রুস, কোথাও ফরাসী, কোথাও জাপান, কোথাও মার্কিন, কোথাও অষ্ট্রীয়, কোথাও বা ইতালীয়ান-সৈন্য মদগর্ব্বে পৃথ্বীতল কম্পিত করিয়া চলিয়াছে। এমন সর্ব্বজাতির সংমিশ্রণ আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। রাত্রিকালে ঘরের বাহির হইবার জো নাই। অনবরত প্রশ্ন 'খবরদার, কে যায়'। জবাব দেও গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে, নতুবা ক্ষণমাত্রে তোমার আত্মাপাখী দেহখাঁচা ছাড়া হইয়া কোন অজ্ঞানিত দেশে উড়িয়া যাইবে। এইত দেশের অবস্থা। এখানে আমার মত এক জন 'ভেতো বাঙ্গালী' যাহার প্লীহা আজন্ম বিবৃদ্ধ হইয়াই আছে, তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে তাহা পাঠকের সহজেই অনুমেয়। প্রত্যেক শক্তিই আপন আপন গণ্ডী ঠিক করিয়া লইয়াছিল। এই সব আন্তর্জাতিক গণ্ডীর (International Concessions) বাহিরে যাইবার জো ছিল না। ইহার মধ্যেই বেড়াইতে হইত। কড়া হুকুম, বাহিরে গেলে সামরিক আইনে দণ্ডিত হইতে হইবে। নিতান্ত প্রয়োজনে সরকারী কার্য্যানুরোধে যদি চীন সহরে যাইবার আবশ্যক হইত সৈনিক প্রহরী লইয়া যাইতে হইত। নতুবা এইরূপ গুজব —বিদেশীকে চীনেরা একাকী পাইলে ধরিয়া লইয়া গিয়া 'এক অজ্ঞাত দেশে' পাঠাইয়া দিত, পাঠাইবার প্রক্রিয়াও একটু নূতন রকমের। পাঠক শুনিয়া শিহরিবেন না— বিদেশীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া চীনেরা তাহাকে নির্জ্জলা উপবাসের ব্যবস্থা করিত, এবং প্রতিদিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এক এক অংশ বাদ দিয়া শরীরের ভার লঘু করিয়া দিত; আত্মারাম দেহপিঞ্জরের মমতা পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত

এই ব্যবস্থাই চলিত। মনুষ্যহৃদয় এতদূর নির্ম্মমতায় পূর্ণ হইতে পারে আমরা প্রথমে বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু দোভাষী আমাদিগকে এ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে বলিয়াছিল। জানি না সে নিজে চীনেমান, স্বজাতিপ্রীতি বশতঃ আমাদিগকে অযথা ভীত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিল কি না?

চীনেদের স্বজাতিপ্রীতি সাতিশয়। যদিও অনেক সময় ভ্রাতা ভ্রাতার শত্রু হয় কিন্তু বিদেশীয়ের সংঘর্ষে শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া এক হয়। মহাভারতে কথিত আছে গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধে দুর্য্যোধন বন্দী হইলে যুধিষ্ঠির উক্ত ঘটনা অবগত হইয়া ভীমার্জ্জুনকে এই মর্ম্মে বলিয়াছিলেন 'ভাই এই সংবাদে আহ্লাদিত হইও না। সুযোধন আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে বটে, কিন্তু তজ্জন্য বাহিরের শত্রু আসিয়া তাহাকে অপমানিত করিবে, আর আমরা নির্ব্বাক হইয়া তাহা অবলোকন করিব, এরূপ কখনই হইতে পারে না। অন্যের সঙ্গে শত্রুতায় আমরা একশত পাঁচ ভাই। অতএব গন্ধর্ব্বের হাত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে।'

> বয়ং পঞ্চ বয়ং পঞ্চ বয়ং পঞ্চ শতং চ তে।
> অন্যৈঃ সহ বিবাদে তু বয়ং পঞ্চ শতঞ্চ বৈ॥

চীনেরা স্বজাতি ছাড়া আর সকলকেই ঘৃণা করে এবং বিদেশী আখ্যায় অভিহিত করে। উক্ত শব্দের সহিত শয়তান কথাটীও যোগ করিয়া দেয়। তাহাদের জাতীয় মন্ত্র "কাং-টাই" বা 'শয়তানকে মার'। বিদেশীকে তাহারা অন্তরের সহিত ঘৃণা করে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে অতিথিসৎকার-বিমুখ বলা যায় না। নিজেদের প্রাচীন রীতিনীতি ছাড়া অপরের কিছু ভাল হইলেও তাহার অনুকরণ করিতে তাহারা নিতান্ত নারাজ। তজ্জন্যই এই প্রাচীন জাত আধুনিক সভ্যজগতে এত পিছাইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে বিজ্ঞানানুমোদিত উন্নতির সোপানাবলী আশ্রয় না করিলে চীন জাতির জাতীয় জীবন যে উন্নত হইতে পারিবে তাহার আশা সুদূর পরাহত। শুনিতে পাওয়া যায় আজ কাল জাপানের আদর্শে তাহারা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উন্নতি গ্রহণে সমধিক প্রয়াসী। এমতাবস্থায় তাহারা যে ক্ষিপ্রগতিতে উন্নতিমার্গে আরোহণ করিবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। চীনেরা শ্রমদক্ষ, বুদ্ধিমান এবং উদ্ভাবনীশক্তিসমন্বিত। ভাষা কথায় বলে 'হুনরে চীন, হুজ্জতে বাঙ্গাল।' চীন জাতির সহিষ্ণুতা অতুলনীয়। শিল্পকার্য্যে অসাধারণ। চীনেদের ধারণা, বুদ্ধি পেটের ভিতরে থাকে। তাহারা নিজেকে নির্দ্দোষ মনে করে। তাহাদের দেশকেই সভ্য, শিক্ষিত, উর্ব্বরা এবং অতি প্রাচীন বলিয়া বিশ্বাস। বিদেশীকে অসভ্য আখ্যা দিয়া থাকে। তাহাদের যুক্তি এই 'আমরা তোমাদের ছাড়া চলিতে পারি, কিন্তু তোমরা আমাদের ছাড়া পার না। তোমাদের দেশ যদি এত ভাল তবে আমাদের দেশে চা, রেশম ইত্যাদি লইতে আসিয়াছ কেন?' এ যুক্তির বিরুদ্ধে তাহারা কোন মতই শুনিতে চাহে না।

সামাজিক জীবনে তাহারা অনেক জাতিকে পরাভূত করিয়াছে। এবিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্নভাবাপন্ন। তাহাদের মধ্যে জাতিবিচার নাই। একজন অপরিচিত পথিক ও নিরাশ্রয় গরিবের সঙ্গে খাইতে কোন প্রকার দ্বিধা বোধ করে না। তাহাদের খাদ্য সাদাসিদে এবং সামান্য। ভাত, মাছ, এবং শাক সব্জিই তাহাদের প্রধান খাদ্য। তাহাদের পেটের আয়তন এবং রুচি দেখিয়া অবাক হইতে হয়। প্রাণীরাজ্যে চামড়া হইতে নাড়ীভুঁড়ি পর্য্যন্ত এবং উদ্ভিজ্জ বিষয়ে পত্র হইতে মূল পর্য্যন্ত জীবন ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ভেককুল সাধারণ খাদ্য মধ্যে পরিগণিত, কুকুরশাবক উপাদেয় খাদ্য। বিড়ালছানার মাংস বিলাসিতার উপকরণ এবং বড়লোকের বাড়ীতেই শুধু দেখা যায়। ইঁদুরবংশ গরীবদের প্রায় একচেটে, ইহাদের মাংস বাজারেই বিক্রয় হয়; বাজারে গেলেই ছাল ছাড়ান এবং অন্য রকমে প্রস্তুত ইঁদুর লম্বা সারিতে বারটী করিয়া ঝুলান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। পঙ্গপালভাজা জলখাবারের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। এই পঙ্গপালদল মাছ ধরার মত জাল দ্বারা ক্ষেত্র হইতে ধৃত হয়, এবং আস্ত ভর্জ্জিত হইয়া কাগজের ঠোঙ্গায় পুরিয়া ঘুংনিদানার ন্যায় হাঁকিয়া বিক্রয় করে। আমি প্রথম তথায় গিয়া ঘুংনিদানা খাওয়ার আশায় বাজারে বিক্রীত ফড়িংভাজা ঘুংনিদানা বোধে কিনিয়া আনিয়াছিলাম। কিন্তু ঠোঙ্গা খুলিয়া দেখিয়া ত

একবারে চক্ষুস্থির। তখনই চীনে ভৃত্যকে এই উপাদেয় দ্রব্য দেওয়ায় সে অম্লান বদনে উদরসাৎ করিল, এবং মাঝে মাঝে আমার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ভাবে বোধ হইল সে মনে ভাবিতেছিল এ কোন্ দেশী জীব, এমন অমৃতোপম খাদ্যের স্বাদ লইতেও কুণ্ঠিত। বাস্তবিক চীন-প্রবাসকালে তাহাদিগকে দেখিয়া মনে হইত এই জগতীতলে তাহাদিগের অখাদ্য বস্তু ভগবান সৃষ্টি করেন নাই। একজন ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন "চীনজাতি যদি ভারতবাসী হিন্দুদের মত খাদ্যবিষয়ে অৰ্দ্ধ কুসংস্কারাপন্নও হইত তাহা হইলে বহুকাল ইহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইত।" এই উক্তির উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক। তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় 'যা তা' না খাওয়া যদি কুসংস্কার হয়, সুসংস্কার কি তাহা জানি না। (ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ রায়।

ভুবনেশ্বর

('ইণ্ডিয়ান রিভিউ' হইতে)

ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত চিত্তাকর্ষক স্থানসমূহের মধ্যে ভুবনেশ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত বলিয়া পরিগণিত। ইহা পুরী হইতে রেলপথে ৩০ মাইল উত্তরে এবং কটক হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। স্থানটী এক্ষণে অতি ক্ষুদ্র; জনসংখ্যা ৩,০০০ তিন সহস্র মাত্র। প্রাচীন সময়ে— দুই সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে এস্থান একটী বিশিষ্ট নগর বলিয়া গণ্য হইত। অনেকে স্থিররূপে অনুমান করেন যে, ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাচীন তশালী নগর অবস্থিত ছিল। (এস্থান এক্ষণে 'ধৌলী' বলিয়া পরিচিত, ভুবনেশ্বরের ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে; এখানে সম্রাট অশোকের খোদিত শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়।) খৃষ্টীয় অব্দের ২৫৬ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধসম্রাট অশোক এই তশালীতেই তাঁহার শাসনকর্ত্তাগণকে তাঁহার বিশেষ রাজাজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছিলেন। দৃষ্টিমাত্রেই বুঝিতে পারা যায় যে নগরটী এককালে অতি বৃহৎ ছিল এবং এখনও যতখানি স্থান লইয়া তীর্থভূমিরূপে নির্দ্দেশ করা হয় তাহার পরিমাণও ৪ চারি বর্গমাইলের ন্যূন নহে। এই প্রাচীন নগরের স্থাপত্য ধ্বংসাবশেষের বিরাটত্ব এবং তাহাদিগের পৌরাণিকতায় বিশেষত্ব ইহাকে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান চিত্তাকর্ষক স্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম করিয়া রাখিয়াছে। ধ্বংসাবশেষগুলিকে তিনটী প্রধান প্রধান অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা (১)—ভুবনেশ্বরের ৩ তিন মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ খণ্ডগিরি, উদয়গিরি এবং নীলগিরি নামক পর্ব্বতত্রয়ের প্রস্তরখোদিত জৈন-ধ্বংসাবশেষ; (২) ভুবনেশ্বর-মন্দির ও তাহার পারিপার্শ্বিক মন্দিরসমূহ এবং (৩) অশোকের অনুশাসন-শিলালিপিযুক্ত ধৌলী পর্ব্বত। কালনির্ণয়ানুসারে এইসকলের মধ্যে শেষেরটী সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম; কিন্তু কয়েকটী কথা বলিলেই ইহার বিষয় বক্তব্য শেষ হইয়া যায়। এস্থানের শিলালিপিগুলি ধৌলী গ্রামের দক্ষিণস্থ 'অশ্বত্থামা' নামক পর্ব্বতের গাত্রে খোদিত। লিপিগুলি যেস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহা ১৫ ফুট্ দীর্ঘ এবং ১০ ফুট উচ্চ। এগুলি গভীরভাবে খোদিত এবং চারিটী ফলকে বিভক্ত। খোদিত লিপিগুলির ঠিক উপরেই ১৬ ফুট্ দীর্ঘ ও ১৪ ফুট্ প্রস্থের একটী সমতল ছাদ রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণে ৪ ফুট্ উচ্চ প্রস্তরখোদিত একটী হস্তীর সম্মুখভাগ অবস্থিত। এই মূর্ত্তিটী যদি শিলালিপিগুলির উৎকীর্ণ হইবার সময়ে নির্ম্মিত হইয়া থাকে (সে সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই যে এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই), তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ইহা একটী অতি প্রাচীনতম প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তি। পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি গৌতম বুদ্ধদেবের চিহ্ন-স্বরূপে খোদিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী সময় হইতে এই হস্তীচিহ্ন সাধারণের ভক্তির বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামটীর উত্তর দিকস্থ পর্ব্বতগাত্রে অনেক-গুলি গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক, কতকগুলি মনুষ্য-হস্ত-নির্ম্মিত; কতকগুলি সম্পূর্ণ, কতকগুলি অসম্পূর্ণ, কোনো কোনোটার সহিত আবার শিলালিপিও বর্ত্তমান। এস্থানের শিলালিপির অনুবাদ পাঠ করিতে হইলে স্মিথ্ সাহেবের "অশোক" নামক গ্রন্থ অনুসন্ধেয়।

খণ্ডগিরি এবং তাহার সন্নিহিত পর্ব্বতাবলীর শিলাকর্ত্তিত

ভুবনেশ্বরের মন্দির।

গুহাসমূহ পরবর্ত্তী সময়ে রচিত হইলেও সহজেই দর্শকের মনোযোগপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই গুহাগুলি সর্ব্বশুদ্ধ সংখ্যায় ৬৬টী; তাহার মধ্যে ৪৪টী উদয়গিরিতে, ১৯টী খণ্ডগিরিতে এবং ৩টী নীলগিরিতে। উদয়গিরির গুহাসমূহের মধ্যে 'রাণীহংসপুর' অথবা 'রাণীগুম্ফা' সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। সম্ভবতঃ গুহাটী অতি প্রাচীনতম কালে খোদিত হইয়াছিল; এতদ্ভিন্ন আকারে এবং সুচারুগঠনে ইহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহার তিন ধারে দ্বিতল-বিশিষ্ট কক্ষাবলী শ্রেণীবদ্ধ; কিন্তু ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত। এই বৃহৎ গুহাটী জৈন তীর্থঙ্কর পরেশ-নাথের প্রতি সম্মানার্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরেশনাথের জীবনের ঘটনাবলীর নানাবিধ চিত্রাদি বৃহৎ আকারে ইহার ভিত্তিমণ্ডলে খোদিত হইয়াছে। ম্যালী সাহেব ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে এটী জৈন-গুম্ফা। তাঁহারা তাঁহাদের পুরী বিষয়ক গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট বিবরণ লিখিয়াছেন। গুহাস্থিত ভাস্কর্য্য প্রতিমূর্ত্তি সকল প্রকৃতই তাঁহাদিগের বাক্য সপ্রমাণ করিয়া দেয়।

খণ্ডগিরির গুহাসমূহ পথের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। উত্তরদিক হইতে পারদর্শন করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমতঃ দুইটী গুহা নয়নগোচর হইবে। গুহার উপরিভাগে খোদিত চিত্র তোতাপাখীর নামানুসারে এই গুহাদ্বয় অভিহিত হইয়াছে। উভয়টীতেই উৎকীর্ণ লিপি রহিয়াছে। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে ইহাতে এক সময়ে বহুবিধ লোকসমাগম হইত। ইহার পর পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলে "তেতুলী গুহা" দৃষ্ট হইবে। তথা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে গমন করিলে "খণ্ডাগার" গুহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার ঠিক দক্ষিণেই আর একটী গুহা দেখা যায়; তাহার নাম "ধানঘর" গুহা। ইহাতে একখানি শিলালিপি আছে। যদিও লিপিগুলি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে তথাপি

কথিত হয় যে ইহার নির্ম্মাণের সময় ৭ম হইতে ৯ম শতাব্দীর মধ্যে। আর কিছুদূর দক্ষিণে "নবমুনি" গুহা নামক আর একটী গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে দুইটী কক্ষ এবং একটী সাধারণ রকমের বারান্দা আছে। অন্তর্ভাগে ইহার স্তম্ভের মস্তকের সুশোভিত অংশে একখানি উৎকীর্ণ লিপি দৃষ্ট হয়। এই উৎকীর্ণ লিপিখানিকে ম্যালী সাহেব ও চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১০ম শতাব্দীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমৎ উদ্যোত কেশরী দেবের প্রখ্যাত শাসনকালের অষ্টাদশ বর্ষের শুভচন্দ্র নামক কোন জৈন সন্ন্যাসীর বিষয় ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই গুহার পূর্ব্ব দিকের কক্ষটীতে দশ জন তীর্থঙ্কর ও নিম্নদেশে তাঁহাদিগের সাঙ্গোপাঙ্গের উৎকীর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ দিকের অধঃদেশে চারভুজি ও ত্রিশূল গুহাতেও এবম্প্রকার মূর্ত্তি সকল দৃষ্ট হইল। আরও কিছু দক্ষিণে কতিপয় ভগ্ন গুহা দেখিতে দেখিতে আমরা "ললাটেন্দু" গুহার নিকট উপস্থিত হইলাম। এই গুহার নাম ঐ নামীয় কোন রাজার নাম হইতে হইয়াছে। ইহাতেও কতকগুলি জৈন সিদ্ধ পুরুষের খোদিত মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহার অদূরেই "আকাশ-গঙ্গা" নামে একটী কুণ্ড অবস্থিত। এ স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার আমরা "বারভুজি" গুহার নিকট আসিলাম এবং তথা হইতে ক্রমশঃ অধিরোহণ করিয়া ইহার উত্তর পশ্চিমস্থ "অনন্ত" গুহার সমীপবর্ত্তী হইলাম। ইহা একটী সুবিস্তৃত কক্ষ। কক্ষটী দীর্ঘে ২৪ ফুট এবং উচ্চতায় ৬ ফুট। ছাদটী খিলানবিশিষ্ট। ইহার পশ্চাতের ভিত্তি-গাত্রে পবিত্র সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকল ব্যতীত একটী জীর্ণ মূর্ত্তিও দেখা গেল। সম্ভবতঃ ইহা পরেশনাথ দেবের। সম্মুখের ভিত্তিতেও বহুসংখ্যক মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে কিন্তু মূর্ত্তিগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। "বারভুজি" গুহার পশ্চিমে এবং গুহার ঠিক দক্ষিণে,—খণ্ডগিরির শিরোভাগে অবস্থিত জৈন মন্দির দেখিতে আমরা আরও উর্দ্ধে অধিরোহণ করিলাম। মন্দিরটী বিখ্যাত উৎকল আদর্শে নির্ম্মিত। ইহার দেবালয়স্থ উচ্চ প্রাচীরের ভিতরে পাঁচ জন জৈন মহাপুরুষের মূর্ত্তি স্থাপিত। ইহার পশ্চাৎভাগে ইহাপেক্ষা দেখিতে প্রাচীন একটী জীর্ণ মন্দির রহিয়াছে। এখন ইহা একটী মঞ্চ বিশেষ। উপরি-ভাগে কতকগুলি ব্রতপালনার্থ দত্ত স্তূপ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া আছে।

এক্ষণে ভুবনেশ্বর ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ মন্দিরসমূহের বিষয় আলোচনা করা যাউক। এই সুবৃহৎ মন্দিরটী উৎকলীয় পদ্ধতিতে নির্ম্মিত এবং আকারে ও বিরাটতায় অবিকল আর্য্যশিল্প আদর্শের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্বরূপ। উড়িষ্যা প্রদেশে, ফার্গুসনের কথা বলিতে গেলে "এই আদর্শ সম্পূর্ণ মৌলিক, অপর কোন প্রণালীর সহিত মিশ্রণে উৎপন্ন নহে; দৃঢ় এক শ্রেণীর ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।" উৎকলীয় স্থাপত্য মূলতঃ দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য হইতে বিভিন্ন। উড়িষ্যার দেউলের নক্সাগুলি বক্র খিলানবিশিষ্ট এবং তাহাতে স্তরবিশিষ্ট বা সোপানবিশিষ্ট গঠনপ্রণালীর চিহ্ন মাত্র নাই। গম্বুজ বা তদ্রূপ কোনো পদার্থ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। উড়িষ্যার প্রত্যেক মন্দিরে দুইটী হর্ম্ম্য বর্ত্তমান; একটীর সম্মুখে আর একটী অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে যেটি উচ্চতর তাহার উপরিভাগে দুর্গবৎ একটী চূড়া আছে এবং অভ্যন্তরে প্রধান প্রধান দেব দেবীর মূর্ত্তি সকল স্থাপিত। সম্মুখস্থ—যেটী অপেক্ষাকৃত কম উচ্চ তাহা একটী জগমোহন। ইহার ছাদটী অনেকটা পিরামিডের আকৃতির অনুরূপ; এই উভয় হর্ম্ম্যেই স্তম্ভ একেবারেই ব্যবহৃত হয় নাই। সময়ে সময়ে (যেমন ভুবনেশ্বরে) দেখিতে পাওয়া যায় যে একটী প্রাচীর মন্দিরের চারিদিক্ ঘেরিয়া আছে, কিন্তু ইহা এই শ্রেণীর স্থাপত্যের অঙ্গীভূত নহে। ভুবনেশ্বরের প্রাচীরের অন্তর্ব্বর্ত্তী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি বৃহৎ মন্দিরের অধিকারভুক্ত। বৃহৎ মন্দিরটি যেন সর্ব্বোপরি মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। ফার্গুসনের মতে, "সমস্ত শিল্প-কলার উপরে যেন একটী মিলনের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট। দাক্ষিণাত্যে সচরাচর ইহা বিরল।" ভুবনেশ্বর-মন্দিরে এই সমস্ত বিশেষত্ব এরূপভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয় যে ইহাকে উড়িষ্যার সমগ্র স্থাপত্য শিল্পকলার আদর্শরূপে নির্ব্বিবাদে গণ্য করা যাইতে পারে।

ভুবনেশ্বরে আরও উল্লেখযোগ্য অনেকগুলি মন্দির দর্শন করা যায়। দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের নিকট বিন্দুসরোবরও বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষক। সরোবরটী ১৩০০ ফুট দীর্ঘ,

বিন্দু-সরোবর।

৭০০ ফুট প্রস্থ, এবং জল ৬ হইতে ৭ ফুট গভীর। ইহা দেখিলে মাদুরায় "তেপ্পাকুলামের" কথা মনে পড়ে। ইহার অনেক অংশ অসংস্কৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

সম্ভবতঃ এ বিষয়ে শীঘ্রই 'প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের' দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রজাপতির পরিহাস

(গল্প)

পিতার মৃত্যুর পরদিন বারান্দায় বসে লেইনী ভাবছিল, 'এত দিনে অকূল সংসারে ভাসলেম।'

শৈশবে যখন মাতা মারা গেলেন, ভাই ভগ্নীগুলি যখন মারা গেল—একে একে স্নেহের সব বন্ধনগুলি যখন টুটে গেল, তখন তা'র খঞ্জ বৃদ্ধ পিতাকেই সে আঁকড়ে ধরলে। তারপর পিতা যখন শুধু বংশমর্য্যাদাটুকু রেখে লেইনীকে একবারে নিঃসম্বল অবস্থায় ফেলে অমর-ধামে চলে গেলেন—যখন লেইনীর শেষ বাঁধনটুকু টুটে গেল তখন সে বুঝতে পারলে ভগবান তা'কে এক বিষম পরীক্ষার ভিতর ফেলেছেন। তারপর আরো যখন দেখতে পেলে যে এই আঠার বছর বয়স পর্য্যন্ত সে লেখাপড়ার কিছুই শিখ্‌তে পারে নি, তখন সে বেশ বুঝতে পারলে যে সারাটি জীবন ধরে তা'কে দৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

একটি মাস কোন প্রকারে চলে গেল। আরতো খাওয়া যোটে না। কিছু সাহায্যের জন্যে বা সামান্য একটি চাকরীর জন্যে সে অনেকের দ্বারে ঘুরতে লাগল। লোকে যাদের বড় মানুষ বলে তাদের অনেকের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হল। কর্ণতৃপ্তিকর অনেক সাহায্য মিল্‌ল বটে কিন্তু যাতে পেটভরে এমন সাহায্য কোথাও পেলে না।

একদিন সে শুন্‌তে পেলে যে গির্জ্জার পুরোহিতরা বড় দয়ালু; তাদের কাছে গেলে পর কিছু মিলতে পারে। পর দিন ভোরেই সে এক গির্জ্জায় গিয়ে উঠল। সেখানে সে শুন্‌লে যে সেই গির্জ্জায় পাখাটানার একটি পদ খালি আছে এবং সে যদি চায় তা হলে তা'কে সে পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে। সে অনেক চিন্তা করলে কি করবে। লেখা পড়া এমন জানে না যে একটা কিছু করে খাবে; ওদিকে সে আবার ভদ্রবংশের সন্তান, এ কাজইবা কি করে নেয়।

যা হোক জঠরানল তার সে সমস্যার মীমাংসা করে দিলে। লেইনী অগত্যা সে চাকরীই গ্রহণ করলে।

দিনের পর দিন যেতে লাগ্‌ল। দেখতে দেখতে তার এখানে একটি বছর চলে গেল। আড়ম্বরহীন নীরব জীবন তার একঘেয়ে হয়ে উঠল। কি করা যায়, আরতো ভাল লাগে না। এ দরিদ্রতার ভিতর তো আর থাকা যায় না, অর্থ উপার্জ্জনেরও তো কোনো উপায় নেই। মন কেবল তার চিন্তাক্লিষ্ট হতে লাগল।

এরই মধ্যে একদিন তার জীবনের গতির পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। সে দিন রবিবার। সন্ধ্যা বেলা সে দেখলে যে ১৬।১৭ বছর বয়স্কা একটি সুন্দরী যুবতী উপাসনার জন্যে সেই গির্জ্জায় এসেছে। পূর্ব্বে সে কখনো তাকে দেখেনি। তাকে দেখামাত্রই তার হৃদি-তন্ত্রীগুলি যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। তার শরীর দিয়ে যেন এক বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুটে গেল।

অনুসন্ধান করে লেইনী জানতে পেলে যে তার নাম মিস্ স্মাইল, এক মহাধনবানের কন্যা।

তারপর প্রতি রবিবারই মিস্ স্মাইল গির্জ্জায় আস্‌ত। আর লেইনী তা'রই কাছ দিয়ে বারান্দায় বসে পাখাটানত আর তা'কে দেখে দেখে একবারে বিহ্বল হয়ে যেত। কি সুন্দর চোখ দুটি! কি সুন্দর চিবুকখানি! চুলগুলিও কি সুন্দর! আহা মুখখানি কি বিমল! স্বরটিই বা কি মিষ্টি! আর কোনটাই বা সে ভাব্‌বে? মিস্ স্মাইল যেন তার কাছে সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা নিয়ে উপস্থিত হত।

রবিবার আসলেই তা'র হৃদয়খানা নেচে উঠত। সকাল সকাল করে গির্জ্জায় যেত। কখন স্মাইল আসবে! তাকে দেখতে কত সুখ! কত আনন্দ!

এই ভাবে কয়েকটি মাস চলে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একরাশ নব পল্লব ও ফুল নিয়ে বসন্তকাল এসে উপস্থিত হলো। গির্জ্জার বাগানখানি ফুলে ফুলে ভরপুর হয়ে উঠল। স্বভাবতঃই মনটা সে সবের ভিতর কিছু রোমান্টিক হয়ে ওঠে। লেইনী বসে বসে কত কি আকাশ পাতাল চিন্তা করে। সে চিন্তার বিরাম নেই,—আদি নেই—অন্ত নেই।

বেচারী জীবনটা নিয়ে বড় কষ্টেই পড়েছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে স্মাইলের রূপে তা'র শুষ্ক জীবনটা বেশ একটু সরস হয়ে উঠেছিল। স্মাইলকে দেখে মনে একটা বেশ শান্তি পেত। স্মাইলের বিষয় চিন্তা করতে বেশ একটা আরাম অনুভব করত, বেচারী ভাব্‌ত, যা হোক

জীবনের ভারটা অনেক কমে গেছে—এ ভাবে যদি জীবন কেটে যায়, মন্দ কি ?

কিন্তু হারে বোকা! তাও কি হয়? তা'হলে যে জগতের অশ্রুজলের পরিমাণ অনেকটা কমে যেত। লেইনীরও তা হল না। কী এক যাতনায় তার মন এখন ক্লিষ্ট হ'তে লাগ্‌লো। তা'র মনে কীট প্রবেশ করেছে। এখন ভাবে, আমার জীবন ওর চরণে উৎসর্গ করেছি, সে কি আমার হবে না? সে ধনীর মেয়ে? হোক না সে ধনী, প্রেমের কাছে ধন কত তুচ্ছ! ছেলেবেলা গল্প শুনেছি কত সব রাজপুত্রীরা ভালবাসায় পড়ে' কত দরিদ্র যুবককে বিয়ে করেছে। আমার কপালে কি সেরূপ কিছু একটা হতে পারে না?

এক হাতে পাথার দড়িটি ধরে টান্‌তে টান্‌তে বারান্দায় বসে হতভাগা এইরূপ কত কি চিন্তা করত। এখন স্মাইলকে দেখলে আর তার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে না—হৃদিতন্ত্রীগুলির উপর দিয়ে হু হু করে একটা বিষাদের সুর বেজে' যায়। তা'র দরিদ্র হৃদয়ের উপর প্রেম যে এতটা আধিপত্য বিস্তার করেছে, তা ভেবে সে বিস্মিত হয়ে যেত।

আজ স্মাইলের বিবাহ। এই গির্জ্জাতেই বিয়ে হবে। ভোর হ'তে গির্জ্জা সাজান হচ্ছে। লেইনীও এ খবর শুনেছে—একজন 'লর্ডের' সঙ্গে তার বিয়ে। সংবাদটা তা'র হৃদয়খানা ভেদ করে' দিয়ে গেল—একটা যেন ছিদ্র করে দিয়ে গেল। লেইনী তা'র ক্ষুদ্র কুঠরীর দরজা এঁটে, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। আজ তার হৃদয় লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। কে যেন লোহা পুড়িয়ে তার হৃদয়ে দাগ দিচ্ছে। সারাটি দিন সে বিছানাতেই পড়ে রইল, এক ফোঁটা জলও মুখে দিলে না।

সন্ধ্যার সময় তা'র সঙ্গীরা এসে বল্‌লে, "কি হে লেইনী, আজ কাজে যাবে না? আজ যে একটা খুব বড় বিয়ে তা বুঝি ভুলে গেছ? চল, চল, আর দেরী করো না।"

লেইনী ধীরে ধীরে বল্‌লে, "না হে ভাই, আজ আমি কাজে যা'ব না।"

"আরে তোমার মত ত আর হাবা দেখিনি হে! জান আজ কত বখশীস মিলবে? চল, চল।" বল্‌তে বল্‌তে তারা লেইনীকে টেনে নিয়ে চল্‌ল।

লেইনী ভাবছিল, "হায়! স্মাইলের বিয়ে, আর সেখানে আমাকেই পাখা টানতে হবে! ভগবান! এ কী তোমার খেলা! আমার বক্ষের ধন যে ছিনিয়ে নিয়ে যায়—ছিনিয়ে নেবার মুহূর্ত্তে তাকেই আমার বাতাস করতে হবে! তার ছিনিয়ে নেবার ক্লান্তিটুকু আমাকেই বাতাস করে' দূর করতে হবে! ভগবান!" * * * *

পুরোহিত বর কন্যাকে একত্র করে দিলেন, বিয়ে হয়ে গেল। বর কন্যা আগে আগে বাহির হলেন। দরজার সামনে এসেই স্মাইল চীৎকার করে উঠল "Oh! my God!" বলেই ২।৩ হাত পিছিয়ে পড়ল। সকলে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখ্‌লে পাথার দড়ি হাতে করে একটা কুলি দরজার কাছে মরে পড়ে' রয়েছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

গুজরাতি সাহিত্য

গুজরাতি সাহিত্য প্রকৃষ্ট চারি যুগে বিভক্ত। আদি যুগের আদি কবি নরসিংহ মেহেতা—ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও শৃঙ্গার এই চতুর্ব্বিধ রসপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সুদামা-চরিত্র, মামেরু ও বাললীলা তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বিষ্ণুদাস নামক এক ব্যক্তিকে কেহ কেহ আদি কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার কাল ১৩০০ বিক্রম সম্বত বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তৎকালীন কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না, কাজেই নরসিংহ মেহেতা আদি কবির অমরসিংহাসন লাভ করিয়াছেন। ভালন তাঁহার সমসাময়িক কবি। নরসিংহ মেহেতার সময় সর্ব্বত্র হিন্দি ভাষার প্রচলন ছিল। একদিন কোন এক হিন্দি কবি, নরসিংহ মেহেতাকে একটী হিন্দি 'গজল' শুনাইয়া বলে, এমন সুমিষ্ট কবিতা গুজরাতি ভাষায় হয় না। সেই দিন নরসিংহ মেহেতা উষ্ণীষ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, যত দিন পর্য্যন্ত গুজরাতি ভাষার সম্যক উন্নতি বিধান করিতে না পারিবেন তত দিন উষ্ণীষ পরিধান করিবেন না। তারপর জীবনে তিনি

অনেক গ্রন্থ রচনা করেন কিন্তু উষ্ণীষ আর পরিধান করেন নাই। তিনিই গুজরাতি ভাষায় সঞ্জীবনী আনয়ন করেন। গুজরাতি কবিতার প্রভাতী গায়ক নরসিংহ মেহেতার বন্দনায় গুজরাতি সাহিত্য তরুণ অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া সৌন্দশ্রীতে প্রকটিত হইল। নরসিংহ মেহেতা কেবল মনীষী বলিয়া গুজরাতের সমস্ত নর নারীর হৃদয়ে স্থানলাভ করিয়াছেন তাহা নয়, মহর্ষি বলিয়া ভক্তহৃদয়ের সমুচ্চ স্থানও অধিকার করিয়াছেন। জুনাগড়ে নরসিংহ মেহেতার বাসগৃহ ও রাসমঞ্চ দেখিয়াছি, সে রাসমঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন আছে বলিয়া পূজা হইয়া থাকে। আর নরসিংহ মেহেতার প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির পার্শ্বেই নরসিংহ মেহেতার একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আবালবৃদ্ধ-বনিতার সভক্তি উপহার পূজা পুষ্পাঞ্জলি নিত্য তাঁহার চরণতলে পতিত হইতেছে। প্রেমময় কবি অতুল্য অমরতা লাভ করিয়াছেন। নরসিংহ মেহেতা চিরজীবন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসঙ্গীরূপে তাঁহার গুণগানে মত্ত হইয়া এখানে অবস্থান করিতেন। স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যটীও অতি সুন্দর, প্রাচীন রৈবতক বা গিরনার পর্ব্বতের পাদমূলেই তাঁহার বাসভবন অবস্থিত ছিল।

নরসিংহ মেহেতার কিছুকাল পরেই প্রেমানন্দ ভটের সরস কাব্যলহরীর সময়। নরসিংহ মেহেতা যেমন আদি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ, প্রেমানন্দ তেমনি গুজরাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিপদে আরূঢ়। তাঁহার কবিতা প্রেম ও ভক্তিবিষয়ে পূর্ণ এবং অতি সুললিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ওখাহরণ (ঊষাহরণ), দানলীলা, নলাখ্যান, সুদামা-চরিত্র, মামেরু, রণযজ্ঞ ইত্যাদি অতি সুন্দর গ্রন্থ। ওখাহরণ মধুর রসকাব্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রেম-ভক্তি-বিষয়ক কাব্যপাঠে মানবের মন বিগলিত ও সাধকের মন অপার আনন্দে আপ্লুত হয়।

ওখা তৎকালীন দার্শনিক কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৈরাগ্য, চেতন, মায়া, বিশ্বরূপ, জীব, ঈশ্বর, সগুণ, ভক্তি ইত্যাদি বিষয়ক কবিতায় রচনা পূর্ণ। জ্ঞানমার্গ অবলম্বী ওখার কবিতা এক স্বতন্ত্র ধরণের। "জ্ঞানীনা কবিমা ন গনীশ"—জ্ঞানীদিগকে কবির মধ্যে গণনা করিও না, তাঁহার উক্তি। কেহ কেহ তাঁহাকে কবি, কেহ কেহ বা তাঁহাকে জ্ঞানী বলিয়া থাকে। কাব্যচাতুর্য্যের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য অতি সামান্য কিন্তু জ্ঞানবিচার অতি উচ্চ।

তাহার পর কবি সামলভট। তাঁহার কবিতায় তর্ক ও বিচারশক্তি সবিশেষ প্রবল। নন্দবত্রীশী, পঞ্চদণ্ড, অঙ্গদ-বিষ্টি, রাবণ-মন্দোধরী-সংবাদ ইত্যাদি গ্রন্থ অতি সুন্দর।

দ্বিতীয় স্তরের কবিগণের মধ্যে বল্লভ ভট, রত্নো, কালিদাস, মুক্তানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ের কবিগণই প্রসিদ্ধ। বল্লভ, নরসিংহ মেহেতার পুত্র। তাঁহার কবিতায় তেজ গর্ব্ব সমধিক প্রবল; দেশভক্তির সুন্দর বিকাশও তাঁহার কবিতায় দেখা যায়। বীর রস ও বীর ভাবের কবিতায় বল্লভই শ্রেষ্ঠ। রত্নোর ঋতুবর্ণনা ও কৃষ্ণবিরহ বিষয়ক কবিতা ভিন্ন অন্য কবিতা পাওয়া যায় না। কলিদাসের প্রহ্লাদাখ্যান রৌদ্র ও বীর রসপূর্ণ। স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ের কবিগণের রচনা তাঁহাদের গুরু সহজানন্দের স্তুতি, কৃষ্ণোপাসনা ও বৈরাগ্য বিষয়ক কবিতায় পূর্ণ। ধীরা কবির পদ আত্মবোধ বিষয়ক। প্রীতমদাস বেদান্ত ও শৃঙ্গার উভয়বিধ বিষয়ে কবিতা রচনা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার বেদান্ত বিচার ওখার মত উচ্চ নয়।

স্ত্রীকবিগণের মধ্যে মিবারের রাণা কুম্ভের মহিষী মীরা-বাইয়ের প্রেমভক্তিপূর্ণ কবিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তিমান সাধারণ লোক তাঁহাকে প্রেমের সহিত পূজা করিয়া থাকে। মীরা মূর্ত্তিময়ী বৈষ্ণবী বাণী। মীরাবাইয়ের প্রথম কবিতাগুলি হিন্দি ভাষায় রচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ-প্রেমের জন্য স্বামীগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া মীরা দ্বারকায় আসিয়া বাস করেন। বোধ হয় তখন হইতে গুজরাতি কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হন। মীরাবাইয়ের পূর্ব্বের অনেক হিন্দি কবিতা গুজরাতি লোক দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে ক্রমে গুজরাতি কবিতার আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার সমস্ত কবিতা রস ও প্রেমপূর্ণ। প্রত্যেক বাণীতে প্রেম-তরঙ্গ উছলিয়া উঠে। গুজরাতের আবালবৃদ্ধরমণী গরবাগানে মীরাবাইয়ের রচিত গান গাইয়া থাকে।

পুরীবাই, গরবীবাই, কৃষ্ণাবাই নামে তিনজন স্ত্রীকবিও গুজরাতি সাহিত্যে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

তৃতীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি দয়ারাম। দয়ারাম মনুষ্যবৃত্তি

ও হৃদয়ভাবের চিত্র লইয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। দয়ারামের কবিতা গুজরাতি রমণীগণের হৃদয়স্বরূপ। নিরক্ষর কৃষকরমণীর মুখেও দয়ারামের কবিতা শ্রুত হইয়া থাকে।

বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভকাল হইতে গুজরাতি সাহিত্যের চতুর্থ যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এ যুগের প্রথম কবি দলপতরাম। দলপতরাম গুজরাতে নূতন বিদ্যা অনুশীলনের উদ্দীপনা আনয়ন করেন। তাঁহার বিশেষ চেষ্টা উদ্যোগে গুজরাতের সর্ব্বত্র স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁহার রচিত পদ্যেও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক বহুল উল্লেখ আছে। চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ সরস্বতী চন্দ্রিকা প্রণেতা গোবর্দ্ধনরাম ত্রিপাটী নব্যযুগের আদর্শ গদ্য লেখক। কাব্য লেখকদের মধ্যে বহুল-সংস্কৃতশব্দ-প্রয়োগকুশল নরসিংহ রাওএর কবিতা সুন্দর। শ্রীকেশব হর্ষ ধ্রুব গীতগোবিন্দের একখানি সুললিত পদ্য অনুবাদ করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। কলাপী প্রণীত কেকারবও সুন্দর গ্রন্থ।

এই চারি যুগে ভাষার অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। পুরাতন গুজরাতি শব্দ বর্ত্তমান সময়ে অনেক পরিত্যক্ত হইতেছে এবং নূতন শব্দের স্থান লাভ ঘটিতেছে।

গুজরাতি কাব্যে ছন্দ সর্ব্বত্রই সংস্কৃত ছন্দের অনুগামী। অষ্টপৃষ্ঠে অনুকরণ-প্রণোদিত ছন্দের বাঁধনে বদ্ধ হইয়া পদ্য অনেক অসরল হইয়াছে। ভাষার অবারিত প্রবাহ না থাকিলে হৃদয়ের ভাব পদে পদে খণ্ডিত হইয়া যায়।

গুজরাতের প্রাচীন সাহিত্য অত্যুৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। নূতনকালে পুরাতনের গভীর ভাবকে পরিত্যাগ ও নূতনের অগভীর ভাবকে সাথী করিয়া পদ্য রচিত হইতেছে। কাজেই মানবহৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করিতেছে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

প্রাচীন ভারতে বিদেশী*

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি যেরূপ আচরণ প্রকাশ পাইতেছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া দু হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিদেশীয়গণ ভারতবর্ষে কিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিত সেই কথা স্বভাবতই মনে উদিত হয়।

বহু কাল হইতেই বাণিজ্য ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হইয়া বিদেশী জাতি ভারতবর্ষে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মৌর্য্য বংশের রাজত্বকালে তখনকার রাজধানী পাটনায় বিদেশীদের, বিশেষত বহুসংখ্যক গ্রীকদের, সমাগম ঘটিয়াছিল। রাজা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে পাটনার পুরশাসনতন্ত্রের (মিউনিসিপালিটি) একটি বিশেষ বিভাগ কেবল মাত্র বিদেশীয়দের পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত ছিল। পাটনার এই পুরশাসনতন্ত্র ছয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল এবং তাহারই মধ্যে দ্বিতীয় বিভাগের উপর বিদেশীদের ভার স্থাপিত ছিল। ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন,—

"এই দ্বিতীয় বিভাগটি বিদেশীদের অভ্যর্থনা করে, তাঁহাদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দেয়, তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষার জন্য ভৃত্য নিয়োগ করে, দেশে ফিরিবার সময় তাঁহাদের রক্ষকতার জন্য পরিচারক সঙ্গে দেয়, আবশ্যক মত তাঁহাদের ধনসম্পত্তি তাঁহাদের স্বদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে, রোগের সময় শুশ্রূষা করে ও তাঁহাদের মৃত্যু হইলে অন্ত্যেষ্টি সৎকার সম্পন্ন করে।"

তখন বিদেশীয়গণ ভারতবর্ষে আসিতে কোন বাধা পাইত না। মৈসুরের শ্যাম শাস্ত্রী চাণক্যের যে অর্থনীতি শাস্ত্র অনুবাদে নিযুক্ত আছেন তাহাতে দেখা যায় যে সেকালে বাণিজ্য পরিদর্শক বিশেষ ভাবে বিদেশী পণ্যজীবীদিগকে অনুগ্রহ করার জন্য আদিষ্ট ছিলেন। বিদেশী বণিকগণকে বাণিজ্যের কর দিতে হইত না এবং ঋণের জন্য তাঁহাদের নামে নালিশ চলিত না।

অন্যান্য বিদেশীয়দিগের প্রতিও এইরূপ শিষ্টাচরণ করা হইত। মাদুরার ও ক্রাঙ্গানোরের উপনিবেশিকগণ যে এ দেশে সদ্ব্যবহার লাভ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

পশ্চিম উপকূলের সিরিয়ান খৃষ্টান ও ইহুদী অধিবাসীদের প্রতিও যেরূপ উদার আচরণ করা হইয়াছে তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে বৈদেশিকদের প্রতি হিন্দু রাজন্যগণের কিরূপ অনুকূল ভাব ছিল। যদিচ পাটনা মাদুরা প্রভৃতি স্থানের রোমান ও গ্রীক উপনিবেশিকদিগের ন্যায় ইহারা ইয়োরোপীয় নহে তথাপি, হিন্দু রাজগণের মনে এ প্রশ্ন কখনই উদয় হয় নাই যে ইহারা প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য; তাঁহাদের নিকট উভয়েই সমান ছিল। সিরিয়ান অথবা ইহুদী, রোমান অথবা গ্রীক, সকলেরই আচার ব্যবহার

* ইণ্ডিয়ান রিভিয় হইতে সঙ্কলিত।

ভাবভঙ্গী ভাষা পরিচ্ছদ সমস্তই দেশপ্রচলিত প্রথা হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

কোচিনের শ্বেতকায় ইহুদীদিগের সম্বন্ধে রাজা ভাস্কর রবিবর্ম্মার যে সকল তাম্রলিপি পাওয়া যায় তাহাতে তখনকার অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। অঞ্জুভান্নম্ নামক কোন একটি বণিক সম্প্রদায়কে যে বিশেষ সম্মান ও অধিকার দেওয়া হইয়াছিল এই সকল তাম্রলিপির মধ্যে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহুদীরা এখনও সেই সকল অধিকারের অনেকগুলি ভোগ করিতেছে। এই অধিকারগুলি রাজোচিত সম্মানসূচক। যেমন:— দিনের বেলায় দীপালোক ব্যবহার করিতে, ফরাস বিছাইতে, পাল্কী চড়িতে, ছাতা ব্যবহার করিতে এবং শিঙ্গা ও ঢাক বাজাইয়া চলিতে তাহাদের বাধা ছিল না। তাহা ছাড়া তাহাদিগকে কর দিতে হইত না।

ইংরাজি লিখিতে পড়িতে যে না জানে সে ইংরাজ উপনিবেশগুলিতে স্থান পায় না, ভারতবর্ষে এইরূপ নিষেধ যদি প্রচলিত থাকিত তবে পূর্ব্বতন ইয়ুরোপীয় বণিকদের কি উপায় হইত? যদি বিজয়নগরের ক্ষমতাশালী সম্রাট কৃষ্ণ রায় এমন কোন আইন তৈরী করিতেন যাহাতে প্রত্যেক বিদেশীকেই তখনকার রাজ-ভাষা তেলেগু শিখিতে বাধ্য হইতে হইত তবে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে কোন পর্ত্তুগীজ বণিক প্রবেশ করিতেই পারিত না।

ভারতবর্ষীয়গণ চিরদিন বিদেশীয়দিগের প্রতি বদান্যতা দেখাইয়াছে—তাহার সহিত ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারত-বর্ষীয়ের দুর্দ্দশা তুলনা করিয়া দেখিলে উভয়ের পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

শ্রীঅতসী দেবী।

ইস্‌লাম ও জাতিভেদ *

বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্মেরই ব্যাপ্তি অধিক সন্দেহ নাই—ইহা সমুদ্র পার হইয়া দেশে মহাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রধানতঃ আর্য্যজাতীয়ের সঙ্গেই তাহার সংস্রব এবং ইহাদেরই অনুসরণ করিয়া এই ধর্ম্ম এমন বিস্তারলাভ করিয়াছে। আর্য্যেতর জাতির মধ্যে কোথাও এই ধর্ম্ম সমগ্র সমাজ বা দেশকে অধিকার করিতে পারে নাই।

বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ আটটি প্রধান ধর্ম্মেরই উৎপত্তি আসিয়ায় এবং য়িহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলমান এই তিনটী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই "সেমিটিক"দের হইতে অভ্যুদিত। ইহাও আশ্চর্য্য যে খ্রীষ্টধর্ম্ম আপনার জন্মভূমি পরিত্যাগ করা পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে ইউরোপীয়দেরই এক-চেটে হইয়া পড়িয়াছে।

সেমিটিক চিত্ত-প্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞানবুদ্ধির অভাব আছে বলিয়া প্রবাদ শুনা যায়। হয়ত সেই কারণেই তাহারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত এবং সময়ে সময়ে স্বপ্নে ও জীবনের সাধারণ ঘটনা সকলের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার জীবগণের সহিত প্রায়ই আলাপ করিয়া থাকেন। প্রকৃতিকে ইহারা ঈশ্বরের ইচ্ছায় উৎপন্ন ও পরিচালিত জড়পদার্থ বলিয়া গণ্য করে। এই সকল সেমিটিকগণের নিকট গ্রীকদের সর্ব্বেশ্বরবাদের (Pantheism) ধারণা একেবারেই অপরিজ্ঞাত।

সেমিটিক চিত্তপ্রকৃতি হইতে উদ্ভূত মুসলমান ধর্ম্ম সমস্ত আকস্মিক ও বাহ্যিককে পরিত্যাগ করিয়া একেবারে মূলগত সত্য মানুষটিকে অন্বেষণ করে, এবং সেই জন্যই ইহা গোত্র, বর্ণ ও জাতির সমস্ত পার্থক্য বিলুপ্ত করিয়া দেয়। মহম্মদ তাঁহার অনুবর্ত্তীগণকে উপদেশ দিয়াছেন যে "তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিও এবং যে ব্যক্তি আমার উত্তরবর্ত্তী হইবে সে যদি কৃষ্ণকায় দাসও হয় তথাপি তাহার নিকট নত হইও"। আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাসে কোনো বিশেষ দেশে বাস বা কোন জাতিগত বিশেষত্ব উন্নতির পক্ষে বাধাস্বরূপ হয় নাই। গর্ব্বিত আরবেরা নিগ্রো জাতীয় মুসলমান ক্রীতদাসদেরও শাসন মানিয়া চলিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। মিঃ টালবয়েজ হুইলার তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে "দাস রাজ" কুতবুদ্দিনকে বিশেষ উচ্চ স্থান দিয়াছেন ও তৎকালীন তিন শতাব্দীর মধ্যে যে চারিজন

* ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের ব্লাকউড্ ম্যাগাজিনে এডোয়ার্ড ব্লাইডেন নামক নিগ্রো লেখকের প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

সুলতানকে তিনি স্মরণীয় বলিয়া মনে করেন ইঁহাকে তাঁহাদেরই মধ্যে একজন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ইজিপ্তের মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে যিনি বিখ্যাত তাঁহার নাম "কফুর"—তিনি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ও নিগ্রোজাতীয় ছিলেন এবং তিনি ক্রীতদাসের অবস্থা হইতে শাসনকর্ত্তার পদে উন্নীত হন। শাসননৈপুণ্য ও রণনৈপুণ্য উভয় দিকেই তিনি সমান মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যাধিকার দূর সাইরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং মক্কা, হিজাজ, ইজিপ্ত ও সাইরিয়া, দামাস্কাস, আলিপ্পো, আন্টিয়ক, তারসাস প্রভৃতি নগরগুলির উপাসনামণ্ডপ হইতে রাষ্ট্রপতি বলিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করা হইত।

আমেরিকার একজন মিশনরি ইজিপ্ত-বাসকালে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে সে দেশে জাতিমূলক বা বর্ণমূলক দৃঢ় সংস্কার একেবারেই নাই। এবং তাঁহার নিজের জন্মভূমিতে প্রচলিত বর্ণভেদঘটিত অন্ধসংস্কারের সহিত তুলনায় ইহা তাঁহার কাছে বিশেষ ভাবে বিস্ময়াবহ মনে হইয়াছিল।

মুসলমানধর্ম্মের মধ্যে এই সাধারণতান্ত্রিকতার ভাব থাকাতে ইহা বিদেশী জাতিসমূহের উপর যে সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রসিদ্ধ মুসলমান লেখক "ইবন খালদান" নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মুসলমানধর্ম্মের অধিকাংশ জ্ঞানী পণ্ডিতই আরব জাতীয় নহেন। বস্তুতঃ আরবদের মধ্যে নিতান্ত অল্প সংখ্যক লোকই আচারশাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অথচ একজন আরবই মুসলমানধর্ম্মবিধির মূল প্রবর্ত্তক, এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত সকল বিজ্ঞানের মূল উৎসস্বরূপ যে কোরাণগ্রন্থ তাহাও আরব ভাষায় লিখিত।"

মক্কা হইতে যে ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে তাহা পশ্চিমে আফ্রিকা পার হইয়া আটলান্টিকের তীর, পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম চীন, উত্তরে কনস্তান্তিনোপল্ ও দক্ষিণে মোজাম্বিক পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। ইহা পৃথিবীর সমস্ত সুপরিচিত জাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া—কেবল দু একটী মানুষকে নহে একেবারে বহুতর অখণ্ড সমাজ, জাতি, মহাজাতিকে অধিকার করিয়া, তাহাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে এবং ঐ সকল জাতির রাষ্ট্রীয় জীবন, সামাজিক জীবন ও ধর্ম্মজীবনকে আপন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে।

আঠারশত বৎসর পরেও খ্রীষ্টের ধর্ম্ম কার্য্যতঃ এরূপ বিশ্বগ্রাহী মিলনশক্তির পরিচয় দিতে পারে নাই। "মিঃ বসওয়ার্থ স্মিথ" বলেন ইহা খ্রীষ্টান জাতির দোষ—ধর্ম্মের দোষ নহে।

আর্য্যজাতীয় লোকেরা বিদেশী জাতিকে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে যে কতদূর অক্ষম তাহার সুস্পষ্ট ও শোচনীয় দৃষ্টান্ত আমেরিকায় ইউরোপীয়গণের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। তিন শত বৎসরেরও অধিককাল ইহারা ঐ দেশের মঙ্গোলীয় জাতীয় আদিম অধিবাসীদের সংস্রবে থাকিয়াও তাহাদের কিছুমাত্র উপকার সাধন করিতে পারে নাই। থিওডোর পার্কার তাঁহার "আমেরিকা সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তা" নামক পুস্তকে আপন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ইহার প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"গর্ব্বিত এ্যাংলোস্যাক্‌সানগণ বিবাহের দ্বারা নিকৃষ্ট জাতীয়দের সহিত আপনাদের রক্ত মিশ্রিত করিতে ঘৃণা বোধ করিয়া থাকে। সে কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ অসভ্যগণকে সর্ব্বদা দূরে রাখে। নব ইংলণ্ডে, পিউরিটানগণ যদিও ঐ সকল আদিম অধিবাসীকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে তথাপি তাহারা শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ—'আমার জাতি ও তোমার জাতি'র পার্থক্য রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নবান। তাহারা স্বতন্ত্র গ্রামে বাস করে, স্বতন্ত্র গির্জ্জায় উপাসনা করে এবং উভয় জাতির মধ্যে কখনও বিবাহ ঘটিতে দেয় না। মাসাচুসেট্‌সের সাধারণ বিচারসভা এক সময় এইরূপ সঙ্কর বিবাহ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার দ্বারা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। এ্যাংলোস্যাক্‌সানগণ একান্ত যত্নের সহিত এই আদিম অধিবাসীকে আপন রাজ্য হইতে সমূলে উৎপাটন করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। আফ্রিকা, ভ্যান্ ডীমন্‌স্ ল্যাণ্ড, নিউ জিল্যাণ্ড, নিউ হল্যাণ্ড প্রভৃতি যে কোন স্থানে খ্রীষ্টানবাসীরা ইহাদের দেখা পাইয়াছে সেই স্থানেই এইরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছে। পশ্চিমে আমেরিকাবাসীদেরও এইরূপ ব্যবহার। নব ইংলণ্ডে পিউরিটানগণ প্রথমে প্রবেশ করিয়া বনভূমি, বন্য জন্তু ও বন্য মানুষ দেখিতে পাইয়াছিল এবং এই তিনেরই উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল ইহাদের মধ্যে বন্য মানুষেরই উচ্ছেদ সম্বন্ধে সর্ব্বাধিক কৃতকার্য্য হইয়াছে। নব ইংলণ্ডে এক্ষণে বন্য মানুষ অপেক্ষা ভল্লুকের সংখ্যা অধিক। যুক্তরাজ্য সকলেও এই ধ্বংসনীতির অনুসরণ করা হয়। আর দুইশত বৎসরের মধ্যে সেখানে আদিম অধিবাসীর বোধ হয় চিহ্নমাত্রও থাকিবে না।

আমরা সাহস পূর্ব্বক ইহা বলিতে পারি যে তিন কোটী খ্রীষ্টানের পরিবর্ত্তে ইহারা যদি তিন কোটী মুসলমানের সংস্রবে আসিত তবে এমন দুর্ঘটনা কখনই ঘটিত না এবং ঐ কোটী কোটী আদিম অধিবাসীর বংশধরগণ অদ্যাবধি জীবিত থাকিয়া মুসলমান মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত। তাহা হইলে নব ইংলণ্ডে ভল্লুকগণের ধ্বংস হইত আদিম অধিবাসীরা বাঁচিয়া যাইত।"

মিঃ বসওয়ার্থ লিখিয়াছেন—

"ভারতবর্ষে, মুসলমানগণ শত শত হিন্দুকে মুসলমান করে অথচ সে পরিমাণে দশজনকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা কঠিন। ইহার অন্ততঃ একটা কারণ এই যে মুসলমানেরা নবদীক্ষিতগণকে সমাজে আপনাদের সহিত সম্পূর্ণ সমান অধিকার দিয়া থাকে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা তাহাদিগকে সমান ভাবে গ্রহণ করিতে নিতান্তই অক্ষম ও অনিচ্ছুক। কোন একজন হিন্দু খ্রীষ্টান হইলে নিজের সমাজও হারায় অথচ শাসনকর্ত্তাদের সমাজেও প্রবেশ করিতে পায় না। অথচ একজন হিন্দু মুসলমান হইলে আপন সঙ্কীর্ণ সমাজের পরিবর্ত্তে মুসলমান জাতির বিস্তীর্ণ ভ্রাতৃত্বের মধ্যে অধিকার লাভ করে।"

মুসলমান হইলে হিন্দুসমাজের পতিত জাতিভুক্ত ব্যক্তিও একদিন সিংহাসন লাভেরও আশা রাখিতে পারে কিন্তু খ্রীষ্টান হইলে সে পতিতই থাকে। আরো বলিয়াছেন যে—

"স্বজাতিগর্ব্বই, এদেশী খ্রীষ্টানগণের প্রতি ইউরোপীয়দের এরূপ বিরুদ্ধ সংস্কারের প্রধান কারণ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এ দেশীয়দের মধ্যে বর্ণাভিমান যেমন প্রবল ইউরোপীয়গণের মধ্যে স্বজাতি অভিমানও সেইরূপ প্রবল। এই কারণেই ভারতবর্ষে অনেক ইংরাজ ভারতবাসী মাত্রকেই নির্ব্বিচারে ঘৃণা করিয়া থাকে।"

শ্রীহেমলতা দেবী।

সাহিত্যসেবী*

মালদহেও একটা সম্মিলন হইয়া গেল। এইরূপে শিল্পে, সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদগুলি সুবিস্তৃত সমাজের সমগ্রতা ও ঐক্যের উপলব্ধি করিতেছে। ইহাতে প্রাচীন পল্লীগত জীবনের পরিবর্ত্তে অভিনব জাতীয় জীবনের বিকাশ হইতেছে।

আমরা ক্রমশঃ এই যে বিচিত্র ঐক্যের সন্ধান পাইতেছি তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারে নূতন জিনিষ। ধর্ম্মে, সমাজে, আচার ব্যবহারে আমাদের অনৈক্য ও বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্যের কোন দিনই অভাব ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষার প্রভাবে আমরা ক্রমশঃ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি তাহা রাষ্ট্রীয় জীবনের ঐক্য—একরাষ্ট্রীয়তা।

ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা আমাদের স্বকীয় সভ্যতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। ইংরাজ জাতি আমাদের ভারতবর্ষ গঠন করিয়াছে। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ভারতবাসীর স্থান খুঁজিয়া লইবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপীয়েরা যখন ব্যবসায়নীতির বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কার করে তখন তাহাদের এই কার্য্য একটী ভৌগলিক আবিষ্ক্রিয়ামাত্র রূপে বিবেচিত হইত। তাহার পর সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ-রাজ্য লইয়া যখন ইউরোপে রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তাহাতে ভারতবর্ষ আসিয়া ক্রমশঃ ইউরোপীয় জীবনসংগ্রামের আবর্ত্তে পতিত হইল। তাহার ফলে এক বিচিত্র রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার সংঘটন হইল—ইংলণ্ডের ভারতসাম্রাজ্য অধিকার ও ভারতবাসীর অধীনতা। ঐতিহাসিক ভাবে আলোচনা করিলে এই অধীনতাই সম্পূর্ণরূপে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার বিষয়। কারণ এইরূপে পরের বশে থাকিয়াই ভারতবর্ষ নিজের আত্মাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে। আজ দেখিতে পাইতেছি সুদূর অতীতের আকস্মিক এক ভৌগোলিক আবিষ্করণ মানব সমাজের এক বিচিত্র জাতির আত্ম প্রতিষ্ঠার সূচনা মাত্র।

গভীর ভাবে এবং দূরদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের সমাজে কোন অনিষ্টই সাধিত হয় নাই। বরং যাহা কিছু আজকাল আমরা আমাদের অভিনব জাতীয়তার গৌরবের সামগ্রী, আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিষয় বিবেচনা করি সমস্তই আমরা ইউরোপের সহিত সংঘর্ষণে লাভ করিয়াছি।

ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশে যে উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক এবং আমাদের সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রথমে যেরূপ ভাবেই গ্রহণ করুক না কেন,—যখন হইতে আমরা একটুকু স্বাধীনতার সহিত বিজ্ঞান, স্বায়ত্তশাসন, রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রভৃতি বিষয়ক বিদেশীয় ভাবগুলিকে স্বকীয় জাতীয় বিশেষত্বের অঙ্গীভূত করিতে কিয়ৎ পরিমাণে উপযুক্ত হইয়াছি তখন হইতেই আমাদের বিচিত্র সমাজ সকল বিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। আমরা একে একে স্বাধীন ভাবে জাতীয় সহাসমিতি কংগ্রেস, সাহিত্যপরিষৎ, শিক্ষাপরিষৎ, বিজ্ঞানপরিষৎ, বিদেশ-প্রেরণপরিষৎ প্রভৃতি বিচিত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে উপযোগিতা লাভ করিয়াছি। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মের আন্দোলনে তরঙ্গায়িত

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনের জন্য লিখিত।

হইতেছে। সকল দিকে আমাদের স্বতন্ত্র জীবনীশক্তি বিকাশ লাভ করিতেছে।

এমন কি সম্প্রতি আমাদের সমাজে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, পরোপকার, লোকহিত, মানবসেবা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সত্যগুলিকে জীবনে উপলব্ধি করিবার যে সকল প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রসূত। আমাদের প্রাচীন উপনিষদ ও বেদান্তের উপদেশ আমরা নূতনভাবে ইউরোপের নিকট প্রাপ্ত হইয়া গীতা-প্রচারে দর্শনালোচনায় এবং নিষ্কাম কর্ম্মে জীবন উৎসর্গীকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের আধুনিক সন্ন্যাসী ও কর্ম্মযোগিগণ গেটে, কার্লাইল, এমার্সন, রাস্কিন্, টলষ্টয় প্রভৃতি ইউরোপীয় ঋষিগণের শিষ্য। ফরাসীবিপ্লবের সময় হইতে ইউরোপ নানা কারণে বহু ঘাত প্রতিঘাতের পরে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীন চিন্তা, ব্যক্তিত্ব বিকাশ, আত্মার পরিপূর্ণতা, নিম্ন-জাতির অধিকার, ডিমক্রেসি, সোশ্যালিজম্ প্রভৃতি সম্যক্ অবধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ফলে ইউরোপের সাহিত্যক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে, ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনে যে ব্যাপক ও সর্ব্বতোমুখী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রভাবে সমাজে ভাবুকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং অতিপ্রাকৃত ও অভাবনীয় ভাব প্রবিষ্ট হইয়া ইউরোপে এক "অফ্-ক্লেরাঙ্গ" বা নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ইউরোপের এই "রোমাণ্টিক্" আধ্যাত্মিক বিপ্লবই আমাদের আধুনিক বৈদান্তিক আন্দোলনের মূল প্রস্রবণ।

ভারতবর্ষ ইউরোপের নিকট ঋণী একথা স্বীকার করিলে ভারতবর্ষের কোন গৌরব হানির আশঙ্কা নাই। মানবজাতির সভ্যতা এইরূপ পরস্পর আদান প্রদানেই পরিপুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করিয়া মানবের সভ্যতাভাণ্ডারে দান করিয়াছিল। আজকাল কতকগুলি নূতন সত্যের উপহার লইয়া আধুনিক ইউরোপ মানবজাতির দ্বারে দণ্ডায়মান। মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রীক প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন সমাজ নিজ নিজ দাতব্য দান করিতে করিতেই অতীতের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। তাহারা স্বতন্ত্র উপায়ে এই আধুনিক সভ্যতা গ্রহণ করিয়া নূতন সত্য দান করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারত এক বিচিত্র অমরতা লাভ করিয়া আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আধুনিক সত্যগুলিকে নিজ বিশেষত্বের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া মানবজাতির ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিবার আয়োজন করিতেছে। আধুনিক গ্রীস আধুনিক মিশর প্রাচীন জীবনের কোন সাক্ষ্যই বহন করে না, কিন্তু আধুনিক ভারত ইউরোপীয় জলে ধৌত হইয়াও প্রাচীনের পারম্পর্য্য রক্ষা করিতেছে। ভারতবর্ষই যথার্থ ভাবে প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনস্থল। এই সঙ্গমক্ষেত্রে যে অপূর্ব্ব সমন্বয়ের সংঘটন হইতেছে তাহা কেবলমাত্র ইউরোপেরই অভিনয় বা প্রাচীন ভারতেরই পুনরাবৃত্তি নহে, ইহা নূতন মূর্ত্তিতে ভারতবর্ষের অভিনব শক্তির প্রকাশ—নবযুগোপযোগী নবরূপ পরিগ্রহ।

আমাদের সমাজ যে জীবনীশক্তি হারাইয়া বিশ্বসভ্যতার এক অতি নিম্নস্তর-প্রোথিত অস্থিকঙ্কালের ন্যায় নিস্পন্দ অসাড় হইয়া পড়িয়া নাই তাহার প্রধান পরিচয় এই যে নূতন পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তন এবং নূতন নূতন সুযোগ-সমূহ ব্যবহার করিতে যাইয়াও আমাদের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হয় নাই। আমরা বেষ্টনীকে নিজের স্বতন্ত্র পুষ্টি সাধনের উপযোগীরূপে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইতেছি; ইহার ফলে যে এক নূতন জীবনে পদার্পণ করিতেছি তাহার অভিব্যক্তিস্বরূপ এক অভিনব সাহিত্যের গঠন আরম্ভ হইয়াছে। যে ভাষাসম্পদের অধিকারী হইয়া মানব নিজের বিশেষত্বের উপলব্ধি করে, এবং যে সাহিত্যশক্তির প্রভাবে মানবের জাতিগত বৈষম্য পরিপুষ্ট হয়, যে ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ফলে আধুনিক ইউরোপের বিভিন্ন জাতিসকল মধ্যযুগে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছিল, যাহার বিক্ষোভে আন্দোলিত হইয়া ফ্রান্সের রাষ্ট্র বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং যাহার ঐশ্বর্য্য ত্রিধা-বিভক্ত অস্তিত্ববিহীন পোলাণ্ড প্রদেশেরও অধিবাসীবৃন্দকে আলোকিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে, আমরা নূতন ভাব ও কর্ম্মশক্তিসমূহের সংস্পর্শে আসিয়া জীবন্ত জাতির বিশেষ লক্ষণ সেই ভাষাসম্পদ ও সাহিত্য-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছি। আমাদের নূতন স্বভাব, নূতন জীবন, নূতন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিবার

শক্তি ছিল বলিয়া আমাদের ভাষা ক্রমশঃ বৈচিত্র্য লাভ করিতেছে এবং সাহিত্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইতেছে।

প্রকৃত জীবন্ত জাতির লক্ষণ এই যে উহার বিকাশ স্বকীয় ইতিহাসগত বিশেষত্ব এবং চারিত্র-স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের অভ্যন্তরে প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র স্বভাব এবং নৈসর্গিক চরিত্রই পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ জন্য প্রকৃতিগত ভাষার অস্তিত্ব এবং ক্রমিক বিকাশই জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তির পরিচয়। যে স্থলে স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব নাই সেই স্থলে স্বতন্ত্র জাতীয় জীবনেরও অস্তিত্ব নাই বুঝিতে হইবে। এই জন্যই আধুনিক জগতের সর্ব্বত্র শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ভাষার স্থান অতি উচ্চ। সকল দেশেই জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থায় জাতীয় সভ্যতার বিবিধ অঙ্গের সহিত সুপরিচিত হইবার সুযোগ আছে এবং উচ্চতম শিক্ষার আয়োজনেও জাতীয় ভাষার ব্যবহারের বিধান আছে। জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার মূল উপাদান।

সুতরাং যাঁহারা এ দেশের নূতন পারিপার্শ্বিকের অনুরূপ নূতন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন এবং সমগ্র সমাজকে স্বাভাবিক রূপে আধুনিক জগতের সকল প্রকার সমস্যার মীমাংসার উপযোগিতা প্রদান করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে এক দিকে যেমন বিজ্ঞান, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া আধুনিক উপায়ে জাতীয় অভাব মোচনের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তেমনি অপর দিকে নিম্নশ্রেণীর এবং নৈশবিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের শিক্ষা পর্য্যন্ত সকল স্তরেই জাতীয় ভাষার ব্যবহারের আয়োজন করিতে হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের বিদ্যালয়সমূহের সকল পর্য্যায়ে মাতৃভাষা প্রচলিত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে না। জাতীয় বিদ্যালয়ের উন্নতি জাতীয় সাহিত্য বিকাশের উপর নির্ভর করিতেছে। কেবল মাত্র গৃহপ্রতিষ্ঠা বা নূতন পরিষদ গঠন করিলেই জাতীয় শিক্ষা দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না। যাঁহারা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারাই যথার্থভাবে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন। যে সকল সাহিত্যসেবী ও শিক্ষাপ্রচারক আমাদের সাহিত্যকে নানা উপায়ে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন তাঁহারই প্রকৃত পক্ষে ভবিষ্যৎ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রদূত।

আমাদের সাহিত্য এখনও অতি নগণ্য শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে। অত্যল্পকালের মধ্যেই আমাদের ভাষা বিচিত্র ভাব প্রকাশক হইয়া উঠিয়াছে বটে কিন্তু এখনও আমাদের সাহিত্য উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে নাই। এই জন্য আমাদের মাতৃভাষা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থায় দ্বিতীয় ভাষার মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র, প্রধান ভাষার গৌরবের অধিকারী হয় নাই; এবং এই জন্যই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্কল্প ও চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া কেবল মাত্র আকাঙ্ক্ষাতেই পর্য্যবসিত রহিয়াছে।

কাব্য, উপন্যাস ও কথাসাহিত্য পরিত্যাগ করিলে সাহিত্যপদবাচ্য রচনা অতি অল্পই আমাদের ভাণ্ডারে পড়িয়া থাকে। ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তুলনামূলক ঐতিহাসিক আলোচনাপ্রণালী কাহাকে বলে আমাদের জাতীয়সাহিত্যে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সমালোচনা-বিজ্ঞানের সূত্রপাতই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি মাসিক সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এবং বিদেশীয় সাহিত্য হইতে কাব্যাদির অনুবাদ মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা দার্শনিক জাতি বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি কিন্তু উচ্চ অঙ্গের দর্শন চর্চ্চা আমাদের সাহিত্যে অতি সামান্য স্থানই অধিকার করিয়াছে। যে সকল দেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য মুখ্য স্থান অধিকার করে তাহাদের সহিত তুলনা করিলে আমাদের সাহিত্যের দারিদ্র্য ও অপ্রাচুর্য্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু চারিদিকে আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। লোক শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষার গণ্ডিবিস্তারের প্রতি কর্ম্মীদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সাহিত্য চর্চ্চায়, ইতিহাসের তথ্য সঙ্কলনে, পুরাকাহিনী সংগ্রহে, ধনী নির্ধন, বিদ্বান মূর্খ, সকলেই আগ্রহান্বিত হইতেছেন। পাঠক-

সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণের মধ্যে জ্ঞান-পিপাসার উদ্রেক হইয়াছে। আমরা এক বিরাট সাহিত্যবিপ্লব ও চিন্তার আন্দোলনের পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইতেছি।

অনতিদূর ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় সাহিত্য পল্লবিত হইয়া আমাদের সমাজে যে বিচিত্র ফলদান করিবে তাহাতে সহায়তা করিবার জন্য বর্ত্তমানে সকল সাহিত্যিকের একটীমাত্র কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে এখন ভাবিতে হইবে কি উপায়ে এবং কতদিনে আমাদের সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি গভীর শিক্ষনীয় বিষয়সমূহে ফরাসী, জর্ম্মান, ও ইংরাজী সাহিত্যের স্থান অধিকার করিতে পারিবে। যাহাতে আমাদের সাহিত্যসেবা এখন হইতে এই একমাত্র লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে সাহিত্যিকগণের সাধনা ও আদর্শ সেইরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

কিন্তু সাহিত্য এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে গড়িয়া তুলিতে পারা যায় কিনা এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে অনেকে মনে করিতে পারেন ভাষা ও সাহিত্য নৈসর্গিক পদার্থ—ইহাদের বিকাশ বৃক্ষলতাদি প্রাকৃতিক পদার্থের বিকাশের অনুরূপ মানুষের ইচ্ছাধীন নহে। ইহারা স্বাভাবিকভাবে স্বতঃই সৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সামাজিক রীতি, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি মানবীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ মানবের চরিত্রের বিকাশের উপর নির্ভর করে। মানবের সাধারণ সভ্যতা অতিক্রম করিয়া এই সমুদয় বিষয় উৎকর্ষলাভ করিতে পারেনা। উন্নত ধর্ম্ম, রাষ্ট্র অথবা সামাজিক ব্যবস্থার উপযোগী হইতে হইলে মানবকে স্বয়ং উন্নত হইতে হইবে। জাতীয় জীবনের সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়াই এই সমুদয় বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীন চিন্তা, অবাধ বাণিজ্য, মূর্ত্তিপূজা, নিরাকার আরাধনা প্রভৃতি বিষয়ক বিধি নিষেধ ইতিহাসগত জাতীয় চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি যে চেষ্টা করিয়া সাধনা করিয়া অভাব সৃষ্টি করিয়া দেওয়া যায়। কি প্রাকৃতিক, কি আধ্যাত্মিক, কি সাংসারিক, কি রাষ্ট্রীয় সকল জগতেই আয়োজন প্রয়োজনের এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। উৎকটভাবে প্রয়োজন বোধ করিলেই এবং এই প্রয়োজন অধ্যবসায়ের সহিত সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচারিত করিতে পারিলেই আকাঙ্ক্ষা সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাতীয় ও সমাজগত হইয়া পড়ে। অভাবের কথা ভাবিতে ভাবিতেই অভাবের সৃষ্টি হয়। এই উপায়ে অনেক উন্নত জাতি অবনত হইয়াছে এবং অর্দ্ধ শিক্ষিত ও অসভ্যজাতি সভ্যজাতির প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিবার উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। যে ব্যক্তি অথবা যে সমাজকে কোন রাষ্ট্রীয় শিল্প অথবা ধর্ম্মবিষয়ক ব্যাপারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বিবেচনা করিতেছি অত্যল্পকালের মধ্যেই তাহার হৃদয়ে এই বিষয়ে বাসনা জাগরিত ও বদ্ধমূল হইয়া তাহাকে ইহার অধিকারী করিয়া তুলিতে পারে। আবার যে ব্যক্তি অথবা যে জাতি উন্নত বিদ্যাবান্ শিল্পনিপুণ ও ধর্ম্মভীরু, অল্পকালের মধ্যেই—বিচিত্র ঘটনা চক্রের মধ্যে পতিত হইয়া একেবারে অধঃপতিত ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িতে পারে। জগতের ইতিহাসে শিল্পবাণিজ্যের বিনাশ ও বিকাশ সাধন, ধর্ম্মের লোপ ও প্রচার, রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও অবনতি এবং সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও অধোগতির বিবরণে এইরূপ সচেষ্ট অভাব সৃষ্টি ও বশীকরণ নীতির যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রকৃত কথা এই যে—মানব অনুকূল চেষ্টার দ্বারা উন্নত হইতে পারে এবং প্রতিকূল শক্তির প্রভাবে অবনত হইতে পারে। স্পেনের শিল্পবাণিজ্য এইরূপেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের বৈষয়িক অবস্থার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহার শিল্প ও ব্যবসায় সংরক্ষণশীল ও উন্নতিকামী নরপতি এবং কর্ম্মীদিগের প্রয়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। রোমীয় সম্রাটেরা এইরূপ সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়াই রোমনগরীকে অতি অজ্ঞ অবস্থা হইতে বিদ্যার রাজধানীর পদে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং বশীকরণনীতি অবলম্বন করিয়া প্রাচীন গ্রীকের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হতবীর্য্য ও লুপ্তকীর্ত্তি করিয়াছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধি এইরূপ প্রয়াসেই সাধিত হইয়াছিল। রুশিয়ায় শিল্পবাণিজ্য এবং শিক্ষা বিস্তার এইরূপ অভাব-সৃষ্টিকরণনীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম প্রচারিত

হইয়াছে এবং প্রত্যেক ধর্ম্মের অভ্যন্তর হইতে কালে কালে কুসংস্কার ও আবর্জ্জনা বর্জ্জনের যত আন্দোলন হইয়াছে সকলগুলিই এইরূপ নূতন আকাঙ্ক্ষা ও নূতন অভাব সৃষ্টির ফল। এইরূপ প্রচারের প্রভাবেই সভ্যজগৎ হইতে দাসত্বপ্রথা দূরীভূত হইয়াছে। উন্নত রাষ্ট্রের লক্ষণগুলি স্বীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই প্রসিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্র-সমাজে উন্নত স্থান লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মপ্রচারক এবং সমাজ-সংস্কারকেরা স্বকীয় আদর্শগুলি বিভিন্ন সমাজে বিস্তার করিতে যাইয়া অনেক নিরক্ষর, অর্দ্ধসভ্য এবং কুশিক্ষিত জাতিকে সুসভ্য, সুশিক্ষিত এবং সাহিত্যবান্ করিয়া তুলিয়াছেন।

ভাষা ভাব প্রকাশের উপায় মাত্র। যত উপায়ে এবং যে যে প্রণালীতে মানব আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতে পারে সেই সমুদয় উপায় ও প্রণালীর সম্যক্ ব্যবহার করিলেই ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মনোভাব ব্যক্ত করিবার প্রণালীর বৈচিত্র্যে ভাষার বৈচিত্র্য। আবার ভাবই সাহিত্যের প্রাণ। যত উপায়ে মানবের ধারণা ও চিন্তার গণ্ডি বিস্তৃত ও গভীর হয়, যে উপায় অবলম্বন করিলে ভাবনার বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়, যাহাতে মানবচিত্ত বিবিধ আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার ক্ষেত্র হয়, সেই সকল উপায়েই সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও জটিলতা সৃষ্ট হয়, সাহিত্য-সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

মানবের কর্ম্মক্ষেত্রই সকলপ্রকার ভাব ও ধারণার কারণ। জীবনের বৈচিত্র্য ও গভীরতায়ই চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য জন্মে। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী করিতে হইলে বিবিধ উপায়ে প্রকৃত জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রকে বিচিত্র সমস্যাপূর্ণ ও ঘটনাবহুল করিয়া তুলিতে হইবে। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সমগ্রতা, সর্ব্বগ্রাহিতা এবং সচেষ্ট কর্ম্মপ্রবণতা প্রবিষ্ট না হইলে ভাষা নিজের সামর্থ্য প্রকটিত করিবার সুযোগ পায় না; সাহিত্যও নিজকে সর্ব্বত্র প্রসারিত করিয়া বিপুল ও বেগবান্ হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যগুলিকে পরিপূর্ণ বাসিগণের জীবন যাহাতে বিচিত্র কর্ত্তব্যময় এবং ঘটনা-বহুল হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বাঙ্গালাদেশ এবং মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও মান্দ্রাজ যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিনিতে পারে তাহার আয়োজন করিতে হইবে। এক প্রদেশের লোক অন্যপ্রদেশে যাইয়া যাহাতে কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে তাহার সহায়তা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাসমূহ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গালা, মারহাট্টি ও তামিল অন্ততঃ এই তিনটী ভাষা যাহাতে ভারতবর্ষের সকলস্থানে উচ্চ শিক্ষার বিষয় হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে আমাদের প্রত্যেক প্রদেশকে অন্যান্য প্রদেশের সহিত বিচিত্র উপায়ে কুটুম্বিতা স্থাপন করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ঘনিষ্ট করিতে হইবে। ভারতবাসীরা যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের সমাজে, বিদ্যায়, বাণিজ্যে এবং অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে কর্ম্মচারীর পদে নিয়োজিত হইয়া যাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বিদেশেই জীবন যাপন করিতে পারেন, বিভিন্ন দেশে যাহাতে আমাদের প্রচারকেরা ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম্ম ও সাহিত্য আলোচনা করিয়া শিক্ষিত জাতির সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে পারেন এবং যাহাতে বিভিন্ন সভ্যজাতির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সমাজের অবস্থা, সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ব্যবসায় এবং ধর্ম্মজীবন আমাদের প্রদেশসমূহে সুবিস্তৃত-রূপে আলোচিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফরাসী ও জার্ম্মান অন্ততঃ এই দুইটী ইউরোপীয় ভাষা ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষাপদ্ধতিতে সুপ্রচলিত করিতে হইবে।

এইরূপে আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইলে আমাদের ভাবনারাশি ক্রমশঃ বিচিত্র ও জটিল হইতে পারিবে। জীবনকে বৈচিত্র্যময় এবং কর্ম্মবহুল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে যে কেবল এক বিচিত্র সাহিত্যের উপাদান মাত্র সৃষ্ট হইবে তাহা নহে সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব

এবং বহুবিধ রীতিনীতির পরিচয় পাইয়া আমাদের দেশবাসীরা স্বতঃই পরস্পরের মধ্যে তুলনা-সাধন তারতম্য অন্বেষণ ও সামঞ্জস্য বিধানে চেষ্টিত হইতে থাকিবে। ইহার ফলে তুলনামূলক আলোচনা আরব্ধ হইয়া প্রকৃত সমালোচনা-বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিবে। ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি মানবীয় বিষয়গুলি ক্রমশঃ তুলনাসিদ্ধ বিজ্ঞানের আকার ধারণ করিবে। যুক্তি, তর্ক, রাগ দ্বেষ ও অন্ধবিশ্বাস বর্জ্জন, নূতন পন্থা আবিষ্কার প্রভৃতির ফলে এক প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুগের আরম্ভ হইবে। সাহিত্য নূতন গতিতে নূতন পথে ধাবিত হইতে থাকিবে। এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে সখ্য স্থাপিত হইলে এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে মিশ্রিত হইলে আমরা অজ্ঞাতসারেই ভাবপ্রকাশের বিবিধপ্রণালী অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিব। ইহাতে শব্দসম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া ভাষার সৌষ্ঠবসাধন করিবে। নানা শ্রেণীর নানা বিষয়ক শব্দ আসিয়া ভাষার অভাব মোচন করিবে। ভাষা নূতন রূপ ধারণ করিয়া বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি গূঢ়তম বিষয়গুলি অবাধে বহন করিতে পারিবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সাহিত্যের উৎকৃষ্ট ভাবগুলির সারাংশ সঙ্কলন এবং বিশিষ্ট গ্রন্থনিচয়ের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া স্বদেশবাসীদিগকে উপহার প্রদানের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। ইহার ফলে সাহিত্যের কলেবর বর্দ্ধিত ও সুশ্রী হইতে থাকিবে।

নানা দেশে নানা যুগে মহাপুরুষেরা অভিনব জগতের বার্ত্তা লইয়া পৃথিবীতে যেরূপ নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিবার সময় আসিয়াছে। জীবনকে পরিপুষ্ট ও বৈচিত্র্যময় এবং সাহিত্যকে বিপুল বিস্তৃত করিয়া তুলিবার বাসনা সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে। উচ্চশিক্ষা, নিম্নশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সর্ব্বত্র মহৎ অভাব উপলব্ধি করিয়া একমাত্র শিক্ষার জন্যই সমাজে এখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আন্দোলনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য সাহিত্যপুষ্টি, শিক্ষাবিস্তার এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রচারক ও বৃত্তিভুক্ নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। বিজ্ঞানচর্চ্চা, ইতিহাসালোচনা, শিল্পবিস্তার প্রভৃতি কর্ম্মক্ষেত্রে উপযুক্ত বিচক্ষণ অধ্যাপক ও ধুরন্ধরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া কতিপয় বিদ্যানুরাগী, কর্ম্মোপাসক ছাত্রদিগের দ্বারা বিশ্লেষণ, সমালোচনা, এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট, অনুবাদ প্রভৃতি কার্য্য সমাধা করিবার জন্য ভূমিসম্পত্তি-দানের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র য়্যাকাডেমী বা আলোচনা সমিতির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের জন্য যে সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাকে এই অভাবানুরূপ কার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইবে। এইজন্য সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শক্তি ও সম্পূর্ণ সময় প্রদান করিতে পারেন এরূপ সাহিত্যসেবী বিদ্বান ব্যক্তিকে উপযুক্ত মাসিক অর্থসাহায্য করিয়া তাঁহার সাহিত্যসাধনা সহজ ও নিরুদ্বেগ করিয়া দিতে হইবে। যদি বাঙ্গালা সাহিত্য সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং এই সম্মিলনের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়গণের সমগ্র চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি আকৃষ্ট করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় এবং ইঁহাদের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত, সাহিত্যানুরাগী যুবক নিশ্চিন্ত হইয়া সমবেতভাবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হয়েন তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থগুলি আমাদের জাতীয় সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে; প্লেটো, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, গীজো, হেগেল প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গবেষণা আমাদের স্বকীয় ভাষার ভিতর দিয়াই লাভ করিতে পারি; এবং অল্পকালের মধ্যেই বাঙ্গালাদেশের শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন ও জাতীয় হইয়া উঠিতে পারে।

আমাদের সমাজে এখন ভাবুকতার অভাব হইয়াছে।—যে ভাবুকতায় লোকে বর্ত্তমান ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের মহতী সিদ্ধি উপলব্ধি করিতে পারে, সামান্য আরম্ভের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমগ্রতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহাতেই সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিয়া সার্থকতা লাভ করিতে পারে; যে ভাবুকতায় উৎপ্রাণিত হইয়া বিদ্যাবান্ ব্যক্তি সমাজে কীর্ত্তি বা প্রতিষ্ঠা লাভের অপেক্ষা না করিয়া বিদ্যাদান ও শিক্ষা বিস্তারেই আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, স্বয়ং

বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষা খর্ব্ব করিয়া দশের জন্য শিক্ষালাভের সুবিধা সৃষ্টি করিতেই পরম প্রীতিলাভ করেন ; যে ভাবুকতায় ধনবান্ সমগ্র সমাজকে বিদ্যায়, ধনে, ধর্ম্মে উন্নীত করিবার জন্য স্বয়ং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া জলদান, অন্নদান, ঔষধ-দান ও বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন ; যে ভাবুকতায় ভগবান যাহাকে যে শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী করিয়া জগতে প্রেরণ করিয়াছেন তিনি পরোপকারে এবং সকল প্রকার দারিদ্র্য মোচনে সেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন ; সেইরূপ বৈরাগ্যস্রষ্ট্রী ভাবুকতার বন্যা না আসিলে কোন দিন কোন সমাজে নূতন অবস্থার সংঘটন হয় না। যে ভাবুকতায় চিত্তের উন্মাদনা না হইয়া উৎপ্রেরণা হয়, যাহার ফলে শক্তি বিক্ষিপ্ত না হইয়া সংহত ও সংক্ষিপ্ত হয়, যাহার বশে মানব গৃহত্যাগ করিয়া স্থির ও সংযতভাবে সমাজ ও সংসারের উন্নতিকামনা প্রচার করিতে সমর্থ হয় আমাদের এখন সেইরূপ ভাবপ্রবণ প্রচারক বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর প্রয়োজন হইয়াছে।

একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে স্বাধীন চিন্তার প্রবৃত্তিই হউক, অথবা ব্যবসায়ে লাভবান্ হইবার আশাই হউক, সাহিত্য চর্চ্চাই হউক অথবা শিক্ষা প্রচারই হউক, কোন সমাজেই কখনও অতি সত্বর প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় এই সকল বিষয়ও ক্রমে ক্রমে গণ্ডি বিস্তার করে। নূতন কোন দিকে চিন্তার গতি পরিবর্ত্তন করিতে সমধিক কষ্ট পাইতে হয়। নূতন পন্থার অনিশ্চয়তা ও সফলতার সংশয় সাধারণতঃ মনে ভয় সঞ্চার করে। দুই চারি জনের অকৃতকার্য্যতায় পরবর্ত্তী লোকেরা বিঘ্ন ভ্রম প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ করিয়া সফলকাম হইতে পারিলে ক্রমশঃ সমাজে নূতন চিন্তাপদ্ধতি ও কর্ম্মপ্রণালীর প্রতি বিশ্বাস জন্মে। তখন কৃতকার্য্য ব্যক্তিদিগের পথানুসরণ করিয়া তাঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া দলে দলে লোক আসিয়া চিন্তা ও কর্ম্মের কেন্দ্র পূর্ণ করিয়া তোলে। তাহার পরে এই নূতন প্রকৃতি লোকের চরিত্রগত এবং মজ্জাগত হইয়া বংশগত ভাবে সমাজের লক্ষণ হইয়া পড়ে।

সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত সাহিত্যালোচনা, বিজ্ঞানচর্চ্চা অথবা শিক্ষাপ্রচার এই অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত না হয় ; যতদিন পর্য্যন্ত নিজের স্বার্থের সহিত, নিজের গৌরবের সহিত, নিজ পরিবারের ইষ্টসাধন ও উপকারের সহিত এই সমুদয় কার্য্যে যোগদানের ফল বিশেষভাবে সংযুক্ত না হয় ; যতদিন পর্য্যন্ত লোকে এই সকল পন্থা অবলম্বন করিয়া লাভবান না হয় ; ততদিন পর্য্যন্ত অকৃতকার্য্যতা সহ্য করিয়া ক্ষতি স্বীকার করিয়া অগ্রগামী কর্ম্মীদিগকে ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য একাকী নীরবে তপস্যা করিতে হইবে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।
অধ্যাপক—বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ, কলিকাতা।

পার্লিয়ামেণ্টের কথা

প্রবাসীর সকল পাঠকই অবগত আছেন যে কয়েকদিবস পূর্ব্বে বিলাতে মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে যে সকল নগরে নির্ব্বাচন প্রথা আছে, তথাকার অধিবাসীবৃন্দ বিশেষরূপে জানেন যে মিউনিসিপালিটী বা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের নির্ব্বাচন প্রথার সময় নগরে কি প্রকার হুলস্থুল পড়িয়া যায়। চৌকিদারী ইউনিয়ন প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবাসী জনসাধারণও আজকাল নির্ব্বাচনের হুজুগ দেখিতে পান। সামান্য সামান্য নির্ব্বাচনে যদি এইরূপ উৎসাহ ও উদ্যোগ দেখা যায়, তবে বিলাতের মহাসভার নির্ব্বাচন-রূপ বৃহৎ ব্যাপারে যে বিশেষ উৎসাহ এবং ভোটপ্রার্থী ও ভোটদাতাগণের মধ্যে যে বিশেষ উদ্যোগ হয় সে কথা বলাই বাহুল্য। আমরা অদ্য পার্লিয়ামেণ্টের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রসঙ্গ পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব।

অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন যে বিলাতী মহা-সভায় প্রধানতঃ দুইটী পক্ষ আছে। সাধারণ ভাষায় ঐ দুইটী দলকে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল বলে। ইহাদের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে। উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল ব্যতীত লেবার (Labour,) ন্যাসানালিষ্ট (Nationalist) সোশিয়ালিষ্ট (Socialist) [illegible]

ইউনিয়নিষ্ট (Liberal Unionst), দল আছে। পার্লিয়ামেণ্টের ২টী বিভাগ আছে—একটী জনসাধারণের প্রতিনিধির (House of Commons) ও অন্যটী লর্ডদের। শেষোক্ত বিভাগে বড় বড় বিসপ (পাদরী)ও বসিতে অধিকারী।

এইক্ষণ, উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল যে দলেরই প্রভুত্ব মহাসভায় থাকুক না কেন, যদি কোন দলের ভোট অপর দল অপেক্ষা কম হইয়া যায় তবে সেই দল অর্থাৎ তাহাদের দলপতিগণ (ইংরাজিতে উহাকে ক্যাবিনেট Cabinet বলে) পদ পরিত্যাগ করিয়া জনসাধারণের মতামত চাহেন। ইহাকে Appeal to the Country বলে। সম্রাট যেই মহাসভা ভঙ্গ করেন, তৎক্ষণাৎ মহাসভার কেরাণীগণ রাজাদেশে পার্চ্চমেণ্ট কাগজে নূতন সভা আহ্বানের জন্য আদেশ প্রেরণ করেন। চলিত কথায় এই সকল আদেশকে Writ বলে। এই ডিসেম্বরে যে নির্ব্বাচন হইয়াছে তাহার পূর্ব্বের যে নির্ব্বাচন হইয়াছে উহাতে পরলোকগত সম্রাটের দস্তখতি নিম্নলিখিত আদেশ প্রেরিত হইয়াছিল—

"Edward the Seventh by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, King, Defender of the faith to the—of the County (or Borough) of Greeting. Whereas by the advice of our Council We have ordered a Parliament to be holden at Westminister on the—We command you that Notice of the time and place of election being first duly given you do cause Election to be made accordingly to Law of—members to serve in Parliament for the said—and that you do cause the name of such members (or member) when so elected whather they (or he) be present or absent to be certified to us in our Chancery without delay.

Witness Ourself at Westminister the—day of—in the—year of our Reign and in the—year of our Lord 19—.

উপরোক্ত আদেশ ছাপা হইয়া গেলে উহাদের শক্তখামে করিয়া নির্দ্ধারিত কর্ম্মচারীর ঠিকানা লেখা হয়। পরে, বিশিষ্ট কর্ম্মচারী দ্বারা এই খামগুলি ডাকঘরে প্রেরণ করা হইলে তাঁহাকে রীতিমত রসিদ দেওয়া হয়। লণ্ডনের জন্য আদেশগুলি হাতে হাতেই বিলি করা হয়। আয়র্লণ্ডের ও স্কটলণ্ডের লর্ডদিগকে আলাহিদারূপে আদেশ প্রেরণ করা হয়।

১৮৩২ সনে সদস্যের সংখ্যা কমন্স সভায় ছিল ৬৫৮ এখন হইয়াছে ৬৭০। ১৯০৬ সনে উদারনৈতিকগণ যে জয়লাভ করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী দুই নির্ব্বাচনেও তাঁহারা সেই অধিকার বজায় রাখিতেছেন।

নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গেলে যখন সকল সভ্যগণ মহাসভায় সমবেত হন, তখন তাঁহাদের প্রথম কার্য্য হইতেছে মুখপাত্র (Speaker) নির্ব্বাচন। এ নির্ব্বাচনে কিছু নূতনত্ব আছে। মহাসভার একজন বিশিষ্ট কেরাণী, সকল সদস্য সমবেত হইলে দণ্ডায়মান হইয়া কোন একজন সভ্যকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দেন। পূর্ব্বেই স্থির থাকে যে এই সভ্য মহাশয় মুখপাত্রের নাম প্রস্তাব করিবেন। এই সভ্য মহাশয় নাম প্রস্তাব করিলে অপর একজন সভ্য ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। যদি অন্য কোন সভ্য অন্য কোন নাম প্রস্তাব না করেন (এ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র ১৮৩৯ সনে ও ১৮৯৫ সনে—এই দুই বৎসরে মুখপাত্র নির্ব্বাচনে মতভেদ হইয়াছিল—এই দুই ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল দলের নির্ব্বাচিত সভ্যকে পরাজিত করিয়া উদারনৈতিক দলের সভ্যগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন) তবে এই নির্ব্বাচিত সভ্য মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে তাঁহাকে তাঁহার নির্দ্ধারিত আসনে লইয়া যাওয়া হয়। আসন পরিগ্রহ করিলে তুমুল আনন্দধ্বনি হয়। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আসাসোটা টেবিলের নিম্নে রক্ষিত ছিল—এইক্ষণ একজন কর্ম্মচারী (ইহাকে Sergeant-at-Arms বলে) আসাসোটাটী মুখপাত্রের সম্মুখস্থ টেবিলে স্থাপন করেন।

পরদিবস মুখপাত্র মহাশয় কমন্স সভার অন্যান্য সদস্যগণসহ লর্ড সভায় গমন করিয়া লর্ড চ্যানসেলরের মুখে রাজার সম্মতিসূচক আদেশ শ্রবণ করেন এবং স্পীকার মহোদয় তাঁহার ও অন্যান্য সদস্যগণের পক্ষে তাঁহাদের ন্যায্য দাবী প্রার্থনা করেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে মুখপাত্র মহাশয় সকলের দোষ নিজের ঘাড়ে লন। অর্থাৎ তিনি বলেন যে কমন্স সভা যদি কোন দোষ করেন, তবে সে দোষের জন্য তিনি একাই দায়ী অপর কাহাকেও যেন লর্ডসভা দোষী বিবেচনা না করেন। তৎপর প্রথমে

মুখপাত্র ও পরে অন্যান্য সভ্যগণ রাজার এবং তাঁহার পুত্র ও স্থলাভিষিক্তগণের ভক্ত থাকিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন।

অনেকেরই ধারণা যে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মাত্রেই অবৈতনিক। বর্ত্তমান বৎসরে বাৎসরিক ৫০০ শত পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৫০০ টাকা করিয়া প্রত্যেক সভ্যকে বেতন দিবার প্রস্তাব হইতেছে। কিন্তু সাধারণতঃ লর্ড ও কমন্সদিগের মধ্যে ৬৬ জন বেতনভুক্ত সভ্য আছেন। ইঁহারা বাৎসরিক একুনে দশলক্ষ মুদ্রারও অধিক বেতন পান। পার্লিয়ামেণ্টে কয়েকজন কেরাণী ও কার্য্যকারকও মোটা বেতন পান; কয়েকজন কেরাণী প্রত্যেকে বাৎসরিক ত্রিশসহস্র মুদ্রা বেতন এবং থাকিবার জন্য বিনা ভাড়ায় বাটী পান। কয়েকজন সহকারী কেরাণী আছেন ইঁহাদের কেহ ২২ হাজার, কেহ ১৫ হাজার মুদ্রা বেতন স্বরূপ পাইয়া থাকেন। কমন্স সভার মুখপাত্র ৭৫ হাজার, পুস্তকাধ্যক্ষ পঞ্চদশ সহস্র, এবং লর্ডসভার একাদশটী কেরাণী প্রায় ষোড়শ সহস্র মুদ্রা বেতন স্বরূপ বাৎসরিক পাইয়া থাকেন।

আর একটীমাত্র কথা বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব। সভ্যনির্ব্বাচনে কি প্রকার ব্যয় হয় আমরা তাহার সম্বন্ধে কয়টী কথা বলিতেছি। সাধারণ নির্ব্বাচনে অনেক সময় ৯,০০০,০০০ পৌণ্ড অর্থাৎ এক কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ইহা ছাড়া ভোটদাতাগণ এবং নির্ব্বাচনপ্রার্থী-গণের নিজ নিজ ব্যয় স্বতন্ত্র। কোন এক অভিজ্ঞ লেখক লিখিয়াছেন যে মোটের উপর প্রত্যেক নির্ব্বাচনে পনর কোটী টাকা ব্যয়ে এই সুমহান যজ্ঞের আহুতি হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যাহাতে নূতন নির্ব্বাচন না হয় সেইজন্য প্লানটার-(Planter) দিগকে ত্রিশ কোটী টাকা দেওয়া হয়। কেবলমাত্র একবার এক গিনি খরচে নূতন নির্ব্বাচন বন্ধ হইয়াছিল। ১৮০০ সনে গমের মূল্য এত চড়িয়া যায় যে মন্ত্রি-গণ ব্রাউন ব্রেড আইন (Brown Bread Act) বিধিবদ্ধ করেন, কিন্তু দেশের লোক ইহাতে মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে এত উত্তেজিত হইয়া উঠে যে ঐ আইন বাতিল করা ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না। তখন লর্ড ও কমন্স সভা উভয়েই এই আইন রহিত করিয়া দস্তখতের জন্য রাজচিকিৎসক উইলস সাহেবের মারফৎ এই আইনপত্র রাজার নিকট প্রেরণ করেন। রাজা তৃতীয় জর্জ তখন একপ্রকার উন্মত্ত ছিলেন। যাতায়াতের গাড়ীভাড়া বাবদ ডাক্তার মাত্র এক গিনি দাবী করায় সেবারকার মত এক গিনি ব্যয়েই নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

স্বপ্নলোকে

১

হেথায় তা'রা নাইতে নামে
ভাসিয়ে তরী জ্যো'স্না মাঝে;
গিরিদরীর মুক্তাধারা
নীরব রাতে উচ্চে বাজে।
লুটায় তাদের বসন-ঝালর
ধূসর পাষাণ-সীঁথির তটে—
অফুট-ভাষে পথের পাশে
ফুলেরা সব শিউরে ওঠে।
তাদের চুলের ফুলের বাসে
গন্ধ হারায় গোলাপ-বেলা—
কে অপ্সরী সারং বাজায়?
কী অপরূপ সুরের খেলা!

২

নিদাঘ সাঁঝে, রাখাল-ছেলে
চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে প'লে,
স্বপ্নে শোনে নূপুর তাদের
গুঞ্জরিছে গিরির কোলে—
তন্দ্রা ভেঙে' দেখে তাদের
দূর আকাশে মিলিয়ে যায়—
পাথায় ঝরে সোণার রেণু,
জ্যো'স্না মাখা মেঘের গায়।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঋষি টলষ্টয়

(সঙ্কলিত)

ভিক্তর হ্যুগো মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন—ধরণীর কোল শূন্য করিয়া বিদায় লইবার সময় আমার আসিয়াছে।

একথা আমরা সকলেই কখনো না কখনো স্বীকার করি। সকল বংশপরম্পরারই পৃথিবীতে স্থান হওয়া চাই; প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠতম মহর্ষিগণও যদি ধরণীর কোল ভরিয়া থাকিয়া আমাদের পক্ষে স্থানাভাব করিতেন, তাহাও কিন্তু আমাদের পক্ষে বিশেষ সান্ত্বনার কারণ হইত

ঋষি টলষ্টয়।

না। তথাপি মহৎ চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ যে প্রভাব বিস্তার করে, মরণাতীত যশ তাহার সমতুল্য হইতে পারে না। যখন ঋষি টলষ্টয়ের মতন লোক লোকান্তরে যাত্রা করেন, তখন ইহলোক শূন্য ও অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাঁহারা রবিচন্দ্রকিরণঝলকিত ইহলোক হইতে, ভক্তবন্ধুর হৃদ্য আলিঙ্গনের অতীত হইয়া কোন মহালোকে যাত্রা করেন, তাহা আমরা ভালো বুঝি না; তাঁহাদের অমর আত্মা অম্লান যশের পারিজাতমাল্য ধারণ করিয়া অমর-লোকে হয়ত অভিজিৎ নক্ষত্রের মতো ভাস্বররূপে বিরাজ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহারা স্থির, অচল। আমরা তখন বুঝিতে পারি না প্রতিদিবসের জীবনযাত্রার সাফল্য ও হতাশা, পুরস্কার ও প্রতিঘাত, বিরহ ও মিলন, আনন্দ ও ক্রন্দন, তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া উদ্বেজিত করে আর কোন পথে কি কারণে পরিচালিত করে। এইসকল লোকত্তর মহৎ চরিত্রের দুঃখে বিপদে আমরা আর ব্যাকুল হই না; তাঁহাদের সেখানকার সকল ঐশ্বর্য্যপ্রভাব তাঁহার নিজকৃত উপার্জ্জন বলিয়া মনে করিতে পারি না।

ঋষি টলষ্টয় তাঁহার যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ও ভাবুক ছিলেন—একথা তাহার শত্রুরাও স্বীকার করিতেছে। এমন লোকেরও বিরুদ্ধ পক্ষের অভাব নাই এই জন্য যে তাঁহার জীবন অত্যুন্নত আদর্শে পরিচালিত বলিয়া তাহা মহা রহস্যময়, দ্বন্দ্ববহুল, সাধারণ বুদ্ধির ধারণাতীত। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র রুসিয়াতে একদল লোক যেমন তাঁহাকে মানবরূপে দেবতা, সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার মনে করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পূজা করিত, অপর পক্ষে আর একদল তাঁহাকে সয়তানের অবতার মনে করিয়া ঘৃণা ও ভয় করিত। বাস্তবিকও তিনি অন্যায় ও অত্যা-চারের যম ছিলেন। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সকল অন্যায়কারী অত্যাচারীর হৃৎকম্প হইত। সকল স্বার্থপর রাজশক্তি, সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায়, অনুদার আইন আদালত, অত্যাচারী পুলিস ও রাজস্বকর্ম্মচারী, সুদখোর ও জমিদার তাঁহাকে সাক্ষাৎ যম মনে করিত। ইহাদের অত্যাচার ও সঙ্কীর্ণতা ধ্বংস করিবার জন্য তিনি যেন মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং ছিলেন। তাঁহার নাম লিয়ো টলষ্টয়—বাস্তবিকই তিনি পুরুষসিংহ। সকল গণ্ডি, সকল স্বার্থ, সকল সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ ঘোষণাই ঋষি টলষ্টয়ের সমগ্র জীবন। যাহা মানবাত্মার শাশ্বত নিয়মের প্রতিকূল তাঁহার কাছে তাহা নিয়ম নামের উপযুক্ত ছিল না, তা সে যতই কেন দলিল দস্তাবেজ, শাস্তি শাসন, বেদী মন্ত্র, গ্রন্থ সংস্কার প্রভৃতির দ্বারা সমর্থিত হউক না। যে আইনে কর অনাদায়ের জন্য রায়তদিগকে বেত্রাঘাত

করিবার ব্যবস্থা আছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

এ সম্বন্ধে একটিমাত্র কথা বলিবার আছে—এমন আইন কথনো হইতে পারে না; কোনো রাজসভা বা রাজাদেশ পাপকে আইন বলিয়া চালাইতে পারে না।

তেমনি ধর্ম্মসম্বন্ধেও সকলপ্রকার সংস্কারের গণ্ডি, সঙ্কীর্ণতা, ক্রিয়াকাণ্ড, অনুষ্ঠান—যা কিছু উন্নতবুদ্ধি ও আত্মার বিরুদ্ধ—তিনি অস্বীকার করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

আমি এসব তুচ্ছ মনে করিয়া অগ্রাহ্য করি। ক্রিয়াকলাপ, মন্ত্র-তন্ত্র, আচার অনুষ্ঠান আমার কাছে নিতান্ত ছেলেখেলা, ডাইনির কাণ্ড, পরমেশ্বরের প্রতিকূল বলিয়া মনে হয়।

আমি শুধু বিশ্বাস করি—ভগবানকে, যাঁহাকে আমি পরমাত্মারূপে, প্রেমরূপে সর্ব্ববীজরূপে অন্তরের অন্তরে অনুভব করি। আমি বিশ্বাস করি—আমি তাঁহাতে এবং তিনি আমাতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। *

আমি বিশ্বাস করি ভগবানের বাণী খুব স্পষ্টত ও সাধারণবোধ্যভাবে মানবের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে—এবং সেই সকল জগৎগুরুর মধ্যে যিশু একজন শ্রেষ্ঠ মানব। যিশু মানব, তাঁহাকে ভগবান মনে করিয়া তাঁহার উপাসনা করা হীনতম অধর্ম্ম। আমি বিশ্বাস করি—ভগবানের আদেশ পালন করাই মানবের পরমার্থ এবং বিশ্বপ্রেমই ভগবানের আদেশ। তুমি নিজে যেরূপ ব্যবহার অপরের নিকট প্রত্যাশা কর, অপরের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কর,—এই কথাই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান।

টলষ্টয় ঋষির অন্তর্দৃষ্টি শাসন সমাজ ও ধর্ম্মের গণ্ডি এইরূপে অতিক্রম করিয়া সত্য ও ন্যায়ের অসীম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় তাঁহাকে ম্লেচ্ছ মনে করিত। তিনি মন্দিরে প্রবেশের অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন—তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় কোনো পুরোহিত তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণের জন্য উপাসনা প্রার্থনা করে নাই। কোনো গোরস্থানে তাঁহার দেহের স্থান হয় নাই। ইহাতে টলষ্টয়ের আত্মার কোনই ক্ষতি হয় নাই—তিনি ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের উর্দ্ধে ছিলেন, তাঁহার অন্তর্যামীর কাছে অপরের ওকালতির কোনোদিনই আবশ্যক হয় না। দেশের সমস্ত কৃষকসমাজ তাঁহাকে সমাদরে বহন করিয়া পর্ব্বতশিখরে সাইপ্রাস বৃক্ষের ছায়ায় কবর দিয়াছে—এমন অকপট ভক্তিপূত সমাধি ঋষি টলষ্টয়ের মতন মহাপুরুষেরাই শুধু পাইয়া থাকেন।

প্রচলিত প্রথার এরূপ বিদ্রোহ রাজতন্ত্র, ধর্ম্মতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র আবহমানকাল বহুবার সহ্য করিয়াছে—এখন এমন বিদ্রোহ তাহাদের একরূপ অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছে, কিছুতেই আর তাহারা উদ্বেজিত হইতে চাহে না। রাজতন্ত্র আপনার মনের মতন আইন আদালত খলতা কপটতায় ভরিয়া নিজের খেয়াল ও সুবিধামতো রাজ্য শাসন করিতেছে; ধর্ম্মসমাজ বেদী সাজাইয়া কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া বাহ্যিক অনুষ্ঠানের বহ্বাড়ম্বরে লোক ভুলাইতেছে; সমাজ আপনার খেয়ালের বশে সমবেত শক্তির ভ্রূকুটি দেখাইয়া ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে দমন করিতেছে; মাঝে মাঝে কেহ প্রচলিত পথ হইতে ব্যতিক্রান্ত হইয়া ইহাদের উদ্বেগের কারণ হইলে হত্যা করিয়া বিতাড়িত করিয়া একঘরে করিয়া ইহারা তাহার শোধ তুলিতেছে। টলষ্টয় একাকী এই ত্রিশক্তির বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী হইয়াছিলেন—অথচ তিনি চরমপন্থী বিদ্রোহীদিগের সহিতও একমত হইতে পারেন নাই। তিনি সংস্কারক বলিয়া বিদ্রোহী।—অপর বিদ্রোহিগণ এক গণ্ডি নষ্ট করিয়া অপর গণ্ডি সংস্থাপনে প্রয়াসী, শুধু নামের ও রকমের প্রভেদমাত্র। তিনি বিদ্রোহীদের সর্দ্দার ছিলেন, অথচ তাঁহার নিজের কোনো দল ছিল না; কোনো উপদ্রবে তিনি যোগ দেন নাই,—এক অশুভ প্রতিকারের জন্য শত অশুভ অনুষ্ঠান তাঁহা অনুমোদিত ছিল না। সাধারণ বিদ্রোহ প্রায়ই প্রতিষ্ঠিত শক্তির সহিত রফা করিয়া মধ্য পথে স্থগিত হয়—এমন অর্দ্ধসম্পন্ন কর্ম্মও টলষ্টয়ের সহ্য হইত না। এজন্য তিনি বলিয়াছিলেন—

এখন আমি বুঝিতেছি যাহা সত্য ও ন্যায় তাহা স্থিরভাবে অথচ জোরের সহিত সম্পন্ন করাই উচিত; তাহার জন্য সরকারের সাহায্য তো চাই-ই না, সরকারের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিয়াও নহে। যে সকল সৎ ও শিক্ষিত লোক এখন বিবিধ বিদ্রোহ সূচনা করিয়া নিজেদের ও নিজেদের উদ্দেশ্যের ক্ষতিসাধন করিতেছেন, তাঁহাদের এই উপায়েই কাজ করা উচিত,—তাহাতে তাঁহাদের পার্শ্বচররূপে সৎ উন্নত ও চরিত্রবান একদল লোক সমভাব ও সমচিন্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া আবির্ভূত হইবে। তখনই লোকমত—একমাত্র যাহা সরকারকে যথেচ্ছ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত ও দমিত করিতে পারে—স্বপ্রকাশ হইয়া বাক্য ও বিবেকের স্বাধীনতা, ন্যায় ও মনুষ্যত্বের সমাদর দাবি করিয়া আদায় করিবে।

টলষ্টয় পাশ্চাত্য বিলাসবহুল অর্থগৃধ্ন বৈষয়িক সভ্যতার

* এই কথাই একদিন ভক্ত সাধু কবীর বলিয়াছিলেন—

জল-ভর কুম্ভ জলে বিচ ধরিয়া
বাহর ভিতর সোই।

জলভরা কুম্ভ জলের মধ্যে স্থাপিত; বাহিরেও জল ভিতরেও জল।

জটিল উপাদান—ধন, বাণিজ্য, শিল্পোন্নতি, আবিষ্কার প্রভৃতিকে রাজাদের খেলনা মনে করিতেন। এসকলের সহিত অন্তরের রাজার কি সম্পর্ক? এজন্য টলষ্টয় ন্যায় অন্যায় ছাড়া আর কিছুকেই গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি ধ্বংস অপেক্ষা ত্যাগের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সামাজিকপন্থীরা (Socialist) নির্ধনদের বলে অলস ধনীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে; কিন্তু টলষ্টয় ধনী, অলস, স্ফূর্ত্তিবাজ, সৌখীন লেখক, তুচ্ছ পদার্থের শিল্পী, কবি ও অর্ব্বাচীন জনসাধারণ সকলকেই নিজেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে আহ্বান করিতেন। এমন কঠিন কথা সকলে বুঝিত না, এমন মহৎ আদেশ পালন করিবার মতন বল কাহারো ছিল না, তাই সকলে টলষ্টয়কে পাগলা সন্ন্যাসী বলিয়া কানাঘুষা করিত।

কেহ তাঁহার কথা শুনিতে চাহিত না, কিন্তু না শুনিয়াও কাহারো নিস্তার ছিল না। তাঁহার বজ্রমন্ত্র একবার যাহার কানে গিয়াছে সেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—তাহার শান্তি আরাম সব ঘুচিয়া গিয়াছে। ইহা শুধু তাঁহার প্রবল ভাবুকতার প্রভাব নহে, ইহা তাঁহার সর্ব্বান্তঃকরণের অকপট ইচ্ছা, সত্যকে নিরন্তর জাগ্রত রাখা, ন্যায়ের বিধান অকুতোভয়ে পালন করা ও আধা-আধি রফা না করার ফল। সাধারণ লোকের মধ্যে যে রফার ভাব, হইতেছে-হউক-সহিয়া-থাকিব-রকমের কাজ-চালানো নিশ্চেষ্টতা ও অন্যায় প্রতিরোধের অদৃঢ়তা আছে তাহা টলষ্টয়ের বজ্রআঘাতে বেদনাতুর হইয়া কাঁপিয়া উঠিত।

এই জন্য তাঁহার চরিত্র-সমালোচকেরা তাঁহার চরিত্রের দুই দিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক আর্টিষ্ট টলষ্টয় আর এক সংস্কারক ঋষি টলষ্টয়। সমালোচকেরা এই বলিয়া তাঁহার নিন্দা করেন যে ঋষি টলষ্টয় তাঁহার আর্টের দিকটা বিশ্বমানবের জন্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন—যাহা আর্টে শোভন সুন্দর হইয়া উঠিত সেই শুভশক্তিকে তিনি নরসেবায় নিয়োজিত করিয়া খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু মানুষের জীবন শুধু আর্টের দিক হইতে বিচার করিবার নয়, তাহার বিশ্বের সহিত সংযোগের দিকটাও দেখিবার। আর্টিষ্ট ও সংস্কারক ঋষি—ইহাঁদের মধ্যে কোন দিকটার দ্বারা বিশ্বহিত অধিকতর হইয়াছে? এই রহস্য সমাধান করিতে গিয়া নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাতে করিয়া সমস্যা আরো জটিলই হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যথার্থ পক্ষে টলষ্টয়-চরিত্রের উভয় দিকের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই, উভয়েরই উদ্দেশ্য সত্য শিব সুন্দরকে লাভ করা। তাঁহার মহৎ প্রতিভা যে অপূর্ব্ব গল্প রচনার আর্টের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহারও উদ্দেশ্য সেই সত্য শিব সুন্দর। তাঁহার রচনা এক মহৎ ও উদার করুণ ও সদয় অন্তরের ভাবপ্রবাহে অনুস্যূত,—তিনি এমন কোনো চরিত্র চিত্র করেন নাই যে তাঁহার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত, যাহার ভিতর হইতে আসল মনুষ্যত্ব উঁকি মারে নাই; অথচ তিনি কোথাও রফা করিয়া চলেন নাই, মাঝারিকে কোথাও প্রশ্রয় দেন নাই।

টলষ্টয় নিজে নিজের জীবনকে চার অংশে ভাগ করিয়াছেন—

সেই চমৎকার, সরল, আনন্দময়, কবিত্বপূর্ণ শৈশব ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত; দ্বিতীয় অংশ তার পরের ভয়ঙ্কর বিশ বৎসর যে সময় কদর্য্য লালসা, দাসত্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দম্ভ ও সর্ব্বোপরি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা মনকে নিরন্তর উদ্বেজিত করিতে থাকে; তারপর তৃতীয় অংশ পরের আঠার বৎসর—আমার বিবাহ হইতে আমার আধ্যাত্ম জীবনের জন্ম পর্য্যন্ত—এই সময়টিকে সাংসারিক হিসাবে বেশ নৈতিক বলা গেলেও আমার নিজের কাছে জীবন স্বার্থপর পারিবারিক চিন্তায়, ধনসমৃদ্ধির চেষ্টায় ও সাহিত্যিক খ্যাতিতে পরিবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ ছিল; সবশেষে চতুর্থ অংশ, যে সময় এখন আমার চলিতেছে এবং যে অবস্থাতে আমার মৃত্যু হইবে আশা করিতেছি।

তাঁহার জীবনের শেষ অধ্যায়কে তিনি বিশদ করিয়া বলেন নাই। কিন্তু স্তম্ভিত বিশ্ব দেখিয়াছে সে অধ্যায় তাঁহার বিশ্বপ্রেমে, বিশ্বমৈত্রীতে, বিশ্বহিতে, পরিপূর্ণ। তিনি কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং তাহা দেশের দুঃস্থ কৃষকদের সঙ্গে সমান ভাগে বণ্টন করিয়া নিজের একাংশ মাত্র লইয়াছেন। তিনি যে বিশ্বপরিবারের আদর্শ কল্পনা করিয়াছিলেন তদনুসারে নিজের জীবনও উৎসর্গ করিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার মহত্ত্ব। জগতে যতদিন দারিদ্র্য অভাব থাকিবে ততদিন তিনি ভোগ বিলাসের অধিকারী নহেন, যতদিন দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার থাকিবে ততদিন তিনি নীরবে ক্ষান্ত থাকিবার নহেন ইহা তিনি নিজের আচরণে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। অতুল

ঋষি টলষ্টয় ও তাঁহায় পরিবার।

এই চিত্র ঋষি টলষ্টয়ের অশীতিতম জন্মদিনে লওয়া হইয়াছিল। ইহাতে পাঠকের বামদিক হইতে প্রথম লাইনে বসিয়া আছেন—১। ভ্রাতষ্পুত্রী প্রিন্সেস ক্লিয়োলেন্সকাজ। ২। অধুনা বিবাহিত কন্যা টাটজানা সুকোটিনা। ৩। ঋষি টলষ্টয়। ৪। পৌত্রী। ৫। কাউন্টেস টলষ্টয়। ৬। কাউন্টের ভগিনী সন্ন্যাসিনী মেরি, ইঁহারই আশ্রমে কাউন্ট গৃহত্যাগের পর প্রথম আশ্রয় লইয়াছিলেন। ৭। পৌত্র, দ্বিতীয় পুত্র মাইকেলের পুত্র। পশ্চাতে দণ্ডায়মান—১। কন্যা আলেকজান্দ্রা, কাউন্ট গৃহত্যাগের পর ষ্টেশনে পীড়িত হইয়া পড়িলে ইনিই গিয়া পিতার শুশ্রূষা করেন, ইনি কাউন্টের প্রিয়তমা কন্যা। ২। দ্বিতীয় পুত্র মাইকেল, ইঁহারই বৈষয়িক আচরণ কাউন্টের গৃহত্যাগের উত্তেজক কারণ। ৩। জামাতা সুকোটিন। ৪। পুত্র এণ্ডু।

বিভবের অধিকারী তিনি দীনতম সামান্য কৃষকের যোগ্য মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট ছিলেন, আর তাঁহারই পাশে তাঁহার পরিবারে বিলাস বাহুল্যের অভাব ছিল না।

জগতের নরনারীর দুঃখদৈন্য শেষকালে তাঁহার ভাবুকতাকে এমন তীক্ষ্ণভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিল যে ৮২ বৎসর বয়সে তিনি নিজের গৃহের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। মাত্র ৬০৲ টাকা আন্দাজ পুঁজি লইয়া এই দারুণ শীতে গৃহহারাদের সঙ্গে এক হইবার জন্য একদিন রাত্রে গৃহত্যাগ করিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে লিখিয়া গেলেন—

আমাকে ক্ষমা করিয়ো। আমাকে অনুসন্ধান করিয়ো না। আমি জগতের সকল দুঃখের অতীত হইতে চাই। ইহা আমার ৮২ বৎসরের ক্লান্ত দেহ ও আত্মার শান্তির জন্য নিতান্ত আবশ্যক।

তিনি এক সন্ন্যাসাশ্রমে গিয়া রাত্রিকার মতন আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া বলিলেন—আমি একঘরে সমাজচ্যুত লিয়ো টলষ্টয়; আমাকে আশ্রয় দিতে তোমাদের কোনো আপত্তি আছে?

এইরূপে তিনি পদব্রজে বা তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া গৃহ হইতে ৮০ মাইল দূরে একটি ছোট রেল ষ্টেশনে পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা পিতার নিকটে আসিয়া যখন তাঁহার শুশ্রূষা করিতে ব্যস্ত হন, তখন ঋষি টলষ্টয় বলিয়াছিলেন—"জগতে অগণ্য আর্ত্ত নরনারী থাকিতে তোমরা আমার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ কেন?" এমনি ভাবেই তিনি বিশ্বপরিবারের সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়াছিলেন। ঋষির মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাঁহার পত্নী বলিয়াছিলেন—"হায়! আজ জগতের আলোক নিভিয়া গেল!" একথা প্রতি বর্ণে সত্য। জগতের দুঃখে এমন করিয়া প্রাণপাত করিতে পারে কয়জনে? জগৎ এইরূপ করুণ অথচ মহৎ দৃশ্য একবার মাত্র [illegible]

গৃহত্যাগের সময় দেখিয়াছিল আর এই আজ দেখিল— একজন ধনশালী মহাপুরুষ জগতের বেদনায় আহত-হৃদয় হইয়া গৃহের বিলাস-সম্ভোগ তুচ্ছ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন !

এই গৃহত্যাগের উত্তেজক কারণ তাঁহার পুত্রেরই বৈষয়িক ব্যবহার। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের একটি জমিদারী আছে—আয়বৃদ্ধির জন্য সেখানে করবৃদ্ধি, সস্তা মজুরী ও অন্যান্য বৈষয়িক বিধি বিধিমতেই প্রচলিত হইয়াছে। এই সব কাণ্ড দেখিয়া কাউণ্টের করুণ হৃদয় কতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিল তাহার পরিচয় তাঁহার "তিন দিনের পল্লীবাস" নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সে পুস্তিকা রুষসরকার সত্বর বাজেয়াপ্ত করিয়া প্রচার বন্ধ করিয়াছেন, কারণ টলষ্টয়ের লেখার এমনি একটি মোহিনী আছে যে পড়িবামাত্র হৃদয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া ক্ষেপিয়া উঠে। সেই পুস্তিকায় টলষ্টয় লিখিয়াছেন—

সম্প্রতি গ্রামে গিয়া অভিনব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিলাম যাহা কেহ কখনো দেখে নাই, শুনে নাই। আমাদের গ্রামে ৮০ ঘর বাসিন্দা ; সেখানে প্রত্যহ দলে দলে শীতার্ত্ত ছিন্নবাস ক্ষুধার্ত্ত নরনারী আসিতেছে। তাহাদের কোথাও গৃহ নাই, আহারের সংস্থান নাই, শীত নিবারণের বস্ত্র নাই। অতি ময়লা ছিন্নবস্ত্রের অন্তরালে কঙ্কাল-সার দেহে সর্ব্বনাশী ক্ষুধা বহন করিয়া তাহারা গ্রামে আসিয়া পড়িতেছে। পুলিশ তাহাদের শীত ও অনশনে মৃত্যু নিবারণ করিবার জন্য গ্রাম-বাসীদের মধ্যে তাহাদিগকে বণ্টন করিয়া দিতেছে। গ্রামবাসী অর্থে এখানে কেবল কৃষকদিগকে বুঝিতে হইবে, জমিদার যিনি তিনি গ্রামে থাকিয়াও গ্রামবাসীদের দলভুক্ত নহেন। পুলিশ এইসকল আর্ত্ত নরনারীকে জমিদারের আশ্রয়ে লইয়া যায় না, যাহার প্রাসাদে দশটা শয়ন কক্ষ, আরো কত ঘর, আপিস, আস্তাবল, কত কি আশ্রয় আছে ; কিংবা উহাদিগকে পুরোহিত বা শ্রেষ্ঠীদের বাড়ীতেও লইয়া যায় না, যাহাদের গৃহে স্থান আছে অন্ন আছে। পুলিশ দুঃখীদিগকে লইয়া যায় দুঃখীদেরই ঘরে, যাহারা শাশুড়ি স্ত্রী মেয়ে জামাই ছোট বড় ছেলে মেয়ে লইয়া একটিমাত্র ঘরে বাস করে। কিন্তু এই অভাবগ্রস্ত কৃষক তাহার ক্ষুধাশীতপীড়িত নোংরা দুর্গন্ধ অতিথিকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া গৃহে স্থান ও অন্ন দিতেছে।

শুধু যে গৃহহীন বেদের দল এমন দুরবস্থাপন্ন তা নয়, গ্রামবাসীদেরও দুর্দ্দশার অন্ত নাই। একটি স্ত্রীলোক আমার সাহায্য ভিক্ষা করিতে আসিল। সরকার তাহার স্বামীকে ধরিয়া সৈন্যভুক্ত করিয়াছে, স্ত্রী বেচারী এখন ছেলেপুলে লইয়া নিরাশ্রয় এবং অন্নাভাবে মরিতে বসি-য়াছে। আমি সরকারের সঙ্গে দেখা করিয়া এই দুঃস্থ পরিবারের অন্নদাতা লোকটিকে মুক্ত করিবার চেষ্টায় রওনা হইলাম। পথে একটি অনাথ বালিকার সহিত দেখা হইল, তাহার বয়স মাত্র ১২ বৎসর, কিন্তু তাহার পোষ্য আর পাঁচটি শিশু, খনিতে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে ; মাতা তাহার দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে গিয়া মরিয়াছে। এখন এই শিশু মাতা তাহার সকলের ছোট কচি পোষ্যটিকে কোনো অনাথ-আশ্রমে দিয়া নিজে একটু মুক্ত হইতে চায়। আর এক কুটীরে দেখিলাম আর একজন লোক নিউমোনিয়ায় মরিতেছে, কিন্তু তাহার না আছে কিছু শয্যা, আর না আছে কোনো আবরণ।

আমি বিষণ্ণচিত্তে চিন্তামৌন হইয়া গৃহে ফিরিলাম। আমার গৃহ-দ্বারে কার্পেট মোড়া জুড়ি গাড়ী—তাহার মোটাসোটা ভুঁড়িওলা কোচমান পশমী পোষাকে আসর জাঁকাইয়া চমৎকার চকচকে আহারপুষ্ট ঘোড়া দুটির রাশ ধরিয়া বসিয়া আছে। আমারই পুত্রদ্বয় এই গাড়ীতে করিয়া তাঁহার জমিদারী হইতে আমাকে দর্শন দিতে আসিয়াছেন।

আমরা আহারে বসিলাম। দশজনের থালা পড়িল। একটি আসন শূন্য রহিল, সেটি আমার পৌত্রীর, সে পীড়িত, আজ তাহার সাগু পথ্য সে নিজের ঘরেই ধাত্রীর হাতে খাইবে।

আমাদের খুব গুরুভোজনই হইল, কারণ খাদ্য বিবিধ, পানীয় প্রচুর, দুজন খানসামা খাবার যোগাইতে হিমসিম খাইতেছে, টেবিলে ফুল, মুখে আলাপের ফোয়ারা।

আমার পুত্র প্রশ্ন করিলেন—এমন সুন্দর অরকিড কোথা হইতে আসিল ?

আমার গৃহিণী উত্তর করিলেন সেণ্ট পিটার্সবর্গ হইতে কোনো মহিলা নিজের নাম গোপন রাখিয়া ইহা পাঠাইয়াছেন।

আমার পুত্র বলিলেন—এ সব অর্কিড এক একটা দেড় রুবল দামে বিক্রী হয়। তারপর তিনি গল্প জুড়িয়া দিলেন কোথাকার কোন থিয়েটার একদিন এমনি সব দামি অর্কিড দিয়া ষ্টেজ ভারাক্রান্ত করিয়া দম বন্ধ করিবার উপক্রম করিয়া তুলিয়াছিল।

এই সব অসামঞ্জস্য হইতেই টলষ্টয় পলায়ন করিয়া-ছিলেন। অনেকে তাঁহার এই আচরণ ভাবুকতার খেয়াল বলিয়া লঘু করিয়া ফেলিতে চান ; তাঁহারা বলেন যে যদিও টলষ্টয় দারিদ্র্যের মধ্যেই নিজেকে রাখিয়াছিলেন, দরিদ্রের বেশ ও আহারই তাঁহার জীবনযাত্রার সম্বল ছিল, তথাপি দরিদ্রের যে নিরন্তর অভাবের বিভীষিকা তাহা তিনি জানিতেন না, কল্যকার ভাবনা ভাবিয়া তাঁহাকে কখনো ব্যাকুল হইতে হয় নাই ; মৃত্যুতেও তিনি সর্ব্বজনপরিত্যক্ত অনাথ হইয়া থাকেন নাই ; রুষিয়ার ধনী-সম্প্রদায় তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেও দরিদ্র কৃষক-সম্প্রদায় তাঁহাকে মৃত্যুর সময় অসাধারণ সম্মান দেখাইয়াছিল।

ইহা একদেশদর্শীদের কথা। এই আচরণের অপর দিকটি যেমন মহান তেমনি সুন্দর। তাঁহার এ সব আচরণ জগতের অকল্যাণের দৃঢ় প্রতিবাদ—আজ দেশে দেশে তাঁহার পুণ্যচরিত্র অকল্যাণের বিরুদ্ধে বজ্রভীষণ কণ্ঠে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ফিরিতেছে, কালে কালে তাঁহার এই পুণ্যকাহিনী সকল অশুভের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ফিরিবে। বিশ্বমানবের সকল গ্লানি সকল দৈন্য [illegible]

মাথায় লইয়া এই মহাপুরুষ যে জলন্ত বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা আজ বিলাস অত্যাচার অন্যায়-সহিষ্ণুতার ঘরে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে—তাহাদের স্নিগ্ধ-চ্ছায়ে সুষুপ্ত সভ্যসমাজ বিস্ময়স্তম্ভিত হইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। আজ সকল পতিত মানবসমাজের বুকের ভিতর আধুনিক কালের এই মহর্ষির অমর আহ্বান জাগিতেছে, যেমন কথা একদিন এই ভারতের ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুর্গং পথস্তৎ কবয়োর্বদন্তি॥

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবীন সন্ন্যাসী

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামী ও স্ত্রী।

খুলনা হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে, সাগরদীঘি নামক একখানি গ্রাম আছে। ডেপুটি পদাকাঙ্ক্ষী, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত প্রমথনাথের পিতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রামের জমিদার। গুরুদাস বাবুরা দুই ভাই ছিলেন। জ্যেষ্ঠ হরিদাস বাবু জমিদারী দেখিতেন,—কনিষ্ঠ ডেপুটিগিরি চাকরি করিতেন। একবৎসর হইল হরিদাসবাবু পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার দুইটি নাবালক পুত্র আছে। জমিদারী দেখে কে?—এই কারণে বাধ্য হইয়া গুরুদাস বাবু, ত্রিশ বৎসর চাকরি পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া পেন্সন লইয়া বাড়ী আসিয়াছেন।

গুরুদাস বাবুর দুইটি পুত্র, একটি কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র প্রমথনাথ। কনিষ্ঠের নাম বসন্ত। তাহার বয়স একাদশ বর্ষ। কন্যা সরোজিনী, বসন্ত অপেক্ষা দেড় বৎসরের বড়। ইহারই বিবাহের জন্য প্রমথনাথের পিতা কিছু উদ্বিগ্ন আছেন। সরোজিনীর আসল নামটি বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহাকে সকলে চিনি বলিয়া ডাকে। সরোজিনীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া কে কবে 'জিনি' বলিয়াছিল—'জিনি' হইতে শীঘ্রই চিনি হইয়া দাঁড়াইল।

গুরুদাস বাবু যৌবনকালে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং দীক্ষাগ্রহণ করিবেন ইহাও একপ্রকার স্থির হইয়াছিল। কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে ভয় দেখাইল,—হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবেন। এই কারণে তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বিরত রহিলেন—কিন্তু তাঁহার সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় উক্ত সম্প্রদায়ের সহিতই রহিল। মিশনারি মেম স্ত্রীকে লেখা পড়া ও শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর এইরূপ চলিলে,—অল্পে অল্পে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এখন তাঁহার টিকি আছে মাছ মাংস ছাড়িয়াছেন এবং চৈতন্যভাগবত প্রতিদিন অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।—মেয়েটিকে বিদ্যালয়ে পাঠান নাই—তবে সে মার কাছে লেখা পড়া এবং দাদার কাছে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতে শিখিতেছে। তাহাতে গুরুদাস বাবু আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

প্রমথ বাবুর স্ত্রীর নাম সুশীলা। সুশীলার পিতামাতাও নব্যতন্ত্রের লোক। হিন্দু গৃহস্থের পক্ষে একটু বেশী বয়স অবধি মেয়েকে তাঁহারা অবিবাহিতা রাখিয়াছিলেন এবং বিদ্যালয়ে না পাঠাইলেও, বাড়ীতে তাহাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। সুশীলা মেয়েটি সুন্দরী না হইলেও দেখিতে বেশ সুশ্রী—তাহার বয়স এখন সতেরো বৎসর।

প্রমথ বাবু যেদিন কল্যাণপুর হইতে ফিরিলেন, সেদিন বৈকালে তাঁহার স্ত্রী সুশীলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার বন্ধুবরের খবর কি?"

"খবর ভাল।"

"বিয়ের কথা বার্ত্তা কিছু হল?"

"কিছু না।"

"সে কি গো! তুমি তবে গিয়েছিলে কি জন্যে?"

"শুধু তার মন বুঝে দেখবার জন্যে।"

"মন বোঝা গেল?"

"গেল। বিয়ে করার গতিক নয়।"

"গতিক নয়? বল কি! চিরকাল কি আইবুড় থাকবে না কি?"

"সেই রকমই ত তার ভাবখানা। সে বলে, নিজের

আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হলে সংসারবন্ধনে থেকে তা হবার যো নেই—সন্ন্যাসী হতে হবে।”

শুনিয়া সুশীলা আপন মনে বলিতে লাগিল—“নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হলে সংসারবন্ধনে থেকে তা হবার যো নেই, সন্ন্যাসী হতে হবে। আচ্ছা, আধ্যাত্মিক উন্নতি কি ?”

প্রমথনাথ হাসিয়া বলিল—“আমি কি তোমার অভিধান না কি ? যাও অভিধান দেখ গে।”

সুশীলা বলিল—“আধ্যাত্মিক কথাটার মানে কি আর আমি জানিনে মশাই—তা জানি। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি—আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাপারটা কি। যেমন শারীরিক উন্নতি বল্লে বোঝা যায় যে তার গায়ে খুব জোর হয়েছে—সে খুব কুস্তী লড়তে পারে ইত্যাদি—মানসিক উন্নতি বল্লে বোঝা যায় যে তার খুব বুদ্ধি হয়েছে—খুব ভাল অঙ্ক কষতে পারে, খুব শক্ত শক্ত বিষয় পড়ে সহজেই বুঝতে পারে, ভাল ভাল বই লিখতে পারে —নৈতিক উন্নতি বল্লে যেমন বোঝা যায় সর্ব্বদা সত্য কথা কয়, কারো অনিষ্ট করে না, কোনও রকম পাপকার্য্য করে না—পাপচিন্তা মনে স্থান দেয় না—সেই রকম আমায় বলে দাও, আধ্যাত্মিক উন্নতি বলতে কি বোঝায়।”

প্রশ্নটি শুনিয়া প্রমথনাথ কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন—বলিলেন—“ওটা কি জান ?—এই ধর—যেমন—সেকালের মুনি ঋষিরে তাঁরা যে রকম নিজের উন্নতি করেছিলেন।”

সুশীলা একটু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল—“নারদ ঋষি বীণা বাজাতে বাজাতে আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে পারতেন। মোহিত বাবু হার্ম্মোনিয়ম বাজাতে বাজাতে উড়তে চান ?”

প্রমথনাথ হাসিয়া বলিলেন—“নারদ ঋষি শুধু যে উড়তে পারতেন তা নয়—ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেতেন। তাঁর মত ঈশ্বরভক্ত খুব কম।”

সুশীলা বলিল—“তা হলে মোহিত বাবুর মত, বিবাহ করলে ঈশ্বরকে ভাল করে ভক্তি করা যায় না।”

“তাই। তার মত, সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে সংসারের বাইরে গিয়ে না বসলে, ভক্তির একাগ্রতা হয় না।”

সুশীলা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল—“এ কি রকম জ্ঞান ?”

“কি রকম ?”

“বই না পড়ে সমালোচনা।”

প্রমথ বাবু একটু বিস্মিত হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। বলিলেন—“তোমার কথাটা বুঝলাম না।”

সুশীলা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—“ঈশ্বরকে ভক্তি করার মানে এ ত নয় যে রোজ একশো আটবার কি হাজারবার কি লক্ষবার তাঁর নাম জপ করতে হবে—কিম্বা ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে সন্দেশ মণ্ডা দিয়ে তাঁর পুজো দিতে হবে ?”

প্রমথ বাবু স্বীকার করিলেন—“তা ত নয়-ই।”

সুশীলা বলিল—“তিনি স্নেহ করে, করুণা করে, আমাদের যা কল্যাণসাধন করেছেন—তাঁর আশীর্ব্বাদ স্বরূপ তাঁর কাছ থেকে নিত্য যে সকল সুখের সামগ্রী আমরা পাচ্ছি—সেই সকলের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, তাঁর সমস্ত বিধান যে মঙ্গলময় এইটে মনে মনে উপলব্ধি করা—এরই নাম ত ভক্তি ?”

প্রমথনাথ বলিলেন—“অন্ততঃ আমি তাই মনে করি।”

“তবে দেখ—তুমি যদি বিবাহ না কর,—স্ত্রীর ভালবাসা, পুত্রকন্যার স্নেহ—তোমার জন্যে এই সকল সুন্দর উপহারগুলি হাতে করে এসে তিনি দাঁড়ালেন—আর তুমি যদি তা গ্রহণ না করে, বিমুখ হয়ে বনে চলে যাও, আর সেখানে বসে তাঁকে ভক্তি কর—তাহলে বই না পড়ে সমালোচনা, রান্না না চেখে রাঁধুনির প্রশংসা করা হল না কি ?”

স্ত্রীর মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া প্রমথনাথের চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি গভীর আনন্দে সুশীলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—“বড় সুন্দর উপমাটি দিয়েছ ত!—আমি ত এত পড়াশুনো করেছি—এ সকল বিষয়ে চিন্তাও করেছি—কিন্তু এমন সরল যুক্তিটি কখনও ত আমার মাথায় আসেনি।”

সুশীলা তাহার ক্ষণিক গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া চপলহাস্যের সহিত বলিল—“আসবে কি করে—পুরুষের মাথা বৈ ত নয়।”

প্রমথনাথ হাসিয়া বলিলেন—"তাই বটে। আমি মোহিতের সঙ্গে যখন তর্ক করেছিলাম—তখন এ উপমাটি জানা থাকলে এক মিনিটে তায়াকে নিরুত্তর করে দিতে পারতাম। আচ্ছা সে ত আসছে—আবার তর্ক হবে।"

সুশীলা বলিল—"মোহিত বাবু আসছেন এখানে?"

"হাঁ।"

"কবে?—কবে গো?"

"তিন চার দিনের মধ্যেই।"

প্রায় একমিনিট সুশীলা নীরবে চিন্তা করিল।—তখন অল্পে অল্পে তাহার অধরযুগলে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিল—"বেশ, বেশ!"

প্রমথনাথ স্ত্রীকে ভাল করিয়া চিনিতেন। বলিলেন—"কেন বল দেখি? তোমার মৎলবটা কি?"

"মৎলব আছে। এখন বলব না।"

"না, বলতে হবে।"

"এখন না। আঃ কি জালা—আঁচল ছাড়না। আমি এখন একখানা বই খুঁজতে যাচ্ছি।"

"কি বই।"

"Lamb's Tales from Shakespeare."

"হঠাৎ সেক্সপীয়রের উপর এত ভক্তি উথলে উঠল যে?"

"একটা গল্প এখনি আমার পড়া দরকার।"

"কোন গল্পটা?"

"Much Ado About Nothing"—বলিয়া সুশীলা ক্ষিপ্রগতিতে বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত রায় কিশোরীলাল গোস্বামী বাহাদুর, এম-এ, বি-এল, বাঙ্গালা শাসন-পরিষদের মাননীয় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভার সমর্পিত হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয় ধনীর সন্তান

মাননীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল গোস্বামী।

হইয়াও শিক্ষিত এবং পুরশাসনতন্ত্রে অভিজ্ঞ—কারণ তিনি বহু দিন তাঁহার স্বধাম শ্রীরামপুরে পুরশাসনতন্ত্রের (municipality) নেতৃত্ব করিয়াছেন। সরকারী আইন স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে যথেষ্ট উদার ও বদান্য না হইলেও সেই আইনের মতে যতটা সম্ভব ততটা অধিকার ইঁহার দ্বারা জনসাধারণ লাভ করিতে পারিবে—এমন আশা করা আমাদের দুরাশা বলিয়া মনে হয় না।

বিদেশে যে সব ছাত্র নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে

গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এবার আমরা নিম্নলিখিত কয়েক জনের সংবাদ পাইয়াছি—

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ৫৩ জন ভারতীয় ছাত্রের নাম আছে। তন্মধ্যে ১৭ জন বাঙালী, ৭ জন হিন্দুস্থানী, ৬ বিহারী, ৩ হায়দ্রাবাদী, ১ মান্দ্রাজী, বাকি ১৯ জন পাঞ্জাবী।

এই সকল ছাত্রদের মধ্যে ৯ জন বিজ্ঞানশিল্প সমিতির বৃত্তিভুক। ইঁহাদের একটি সমিতি আছে। ইহার নাম ভারত-সম্মিলনী বা Indian Union.

শ্রীযুক্ত এ, এন, সেন, ইঞ্জিনিয়ারিতে বি, এস-সি, পাশ করিয়াছেন। মিঃ ডি, এন, দাসও বি, এস সি, পাশ করিয়াছেন। আরও কয়েক জন শীঘ্র পাশ করিবেন।

শ্রীযুক্ত কেশরীপ্রসাদ।

শ্রীযুক্ত কেশরীপ্রসাদ পাঞ্জাবী ছাত্র। তিনি বস্ত্রবয়ন শিক্ষার জন্য ম্যাঞ্চেষ্টার স্কুলে ভর্ত্তি হন। প্রত্যেক পরীক্ষায় ইনি প্রথম হইয়া এক্ষণে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পণ্ডিত ভোলাদত্ত পাঁড়ে চার বৎসর পূর্ব্বে জাপানে বাতি, পেন্সিল, দিয়াশলাই প্রভৃতির প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করিতে যান। সেখানে ভাষার অসুবিধা হেতু তিনি আমেরিকা যাইতে বাধ্য হন। সেখানে কৃষি ও মৌমাছি

পণ্ডিত ভোলাদত্ত পাঁড়ে।

পালন শিক্ষা করিয়া তিনি দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বাঙালী অপেক্ষাও গোঁড়া ও প্রাচীন সংস্কারের পক্ষপাতী। তাঁহাদের গণ্ডি ভাঙিয়া যাঁহারা মুক্ত হইতেছেন তাঁহারা সৎসাহসী ও দেশের কল্যাণ-সাধক বলিতে হইবে।

বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ নিজের ব্যয়ে ৭ জন ছাত্রকে আমেরিকায় বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। এই সব ছাত্র জাতীয় বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ফল, সকলেই সুশিক্ষিত। ইহারা এই সর্ত্তে জাতীয়

পাঠকের বামদিক হইতে—১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বল। ২। শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকার। ৩। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শেঠ। ৪। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার সরকার। ৫। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন। ৬। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত। ৭। শ্রীযুক্ত হীরালাল রায়।

শিক্ষা পরিষদের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন যে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে অন্ততপক্ষে ৭ বৎসর কাল অনধিক একশত টাকা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিবেন। ইহার দ্বারা ৪০০০০ টাকা ব্যয়ে সাতজন সুশিক্ষিত শিক্ষকের সাহায্য সাত বৎসরের জন্য জাতীয় বিদ্যালয় সংগ্রহ করিলেন। এই সাত জন আত্মত্যাগী যুবকের নাম ও কে কি শিক্ষা করিতে গিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বল (Pharmacy অর্থাৎ ঔষধিবিদ্যা)।

২। শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকার (Economics and Sociology—অর্থ ও সমাজশাস্ত্র)।

৩। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শেঠ (Physics—জড়-বিজ্ঞান)।

৪। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার সরকার (Applied Chemistry—শিল্পসংশ্লিষ্ট রসায়ন)।

৫। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন (Philosophy and Experimental Psychology—দর্শন ও পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব)।

৬। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত (Mechanical Engineering—যন্ত্রবিজ্ঞান)।

৭। শ্রীযুক্ত হীরালাল রায় (Chemistry—রসায়ন)।

ইহারা তাঁহাদের আত্মত্যাগী অধ্যাপকদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। মাতৃভূমি এইরূপ সন্তান আরো

কামনা করিতেছেন। সে ডাকে সাড়া দিবার সময় আসিয়াছে। এইরূপ সন্ন্যাস এই কর্ম্মের যুগে একান্ত আবশ্যক।

নাগপুরে মুসলমানসভা

মুসলমানগণ নাগপুরে মস্‌লেম লীগ্, এবং মুসলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নবী-উল্লা মস্‌লেম লীগের এবং শ্রীযুক্ত ইউসফ্ আলি শিক্ষা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। হিন্দুমুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে যদি কিছু লিখিতে পারি, তাহা হইলে প্রসঙ্গত এই দুই অধিবেশনের সম্বন্ধেও কিছু বলিব।

আসামে শক্তিপূজা

বিগত আষাঢ় মাসে আমরা ব্রহ্মপুত্রতীরে বৈকালে বেড়াইতেছিলাম। একস্থানে দেখিলাম বহুসংখ্যক স্ত্রী-লোক ও পুরুষ একত্রিত হইয়া হরিধ্বনি করিতেছে, আমরা কারণানুসন্ধিৎসু হইয়া আমার একটী আসামী বন্ধুর নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগ্রহ করিলাম।

যখন কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারীতে বহুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন আসামে এইরূপ শক্তিপূজা হইয়া থাকে, এই পূজা সাধারণ ও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেই হইয়া থাকে, আবার কখন কখন কোন সংসারে কেহ পীড়িত হইলেও তাহার আত্মীয় স্বজনগণ শক্তির নিকট মানস করিয়া থাকে। পূজার পদ্ধতি একটু আশ্চর্য্য রকমের। আসামবাসিগণ এই পূজায় কালী কিম্বা অন্য কোন প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে না। অমাবস্যা তিথিতে শনি মঙ্গলবারে আসন স্থাপন করিয়া নানাপ্রকার নৈবেদ্যাদিসহ অর্চ্চনা করিয়া থাকে। পূজায় ছাগ এবং ৪।৫টী কবুতর শক্তির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। পূজা সমাপনান্তে কলাগাছের ভেলা (ভেউর) প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে একটী ছাপর (নৌকার ছইএর মত) তৈয়ার করিয়া কাগজ দিয়া মুড়িয়া দেয়। পরে জীবন্ত পাঁঠা ও কবুতর এবং এতদ্‌সঙ্গে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নারিকেল এবং একটী ঘিএর প্রদীপ ভিতরে রাখিয়া সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া দেয়। তারপর ২।৩ জন লোক সাঁতার কাটিয়া নদীর খরস্রোতে ভেলা ভাসাইয়া দিয়া আসে। অনেক সময় নদীগর্ভে জীবিত ছাগ ও কবুতরগুলি প্রাণ হারায়, আবার কখন কখন মাংসলোলুপ ব্যক্তিগণ দয়া পরবশ হইয়া উদ্ধার করিয়া স্বীয় উদরের পরিতৃপ্তি সাধন করে। মানসিক পূজা সাধারণত রোগ আরামের পর হইয়া থাকে। আমাদের মনে হয় এতো পূজা নহে ইহা জীবের প্রতি অনাবশ্যক নৃশংসতা; ইহার দ্বারা যাহারা মঙ্গল প্রত্যাশা করে তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

এলাহাবাদ প্রদর্শনী

আমরা এলাহাবাদের প্রদর্শনী দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে খবরের কাগজে নানা কথা পড়িতেছিলাম। একদিকে দেখিতেছিলাম প্রদর্শনীর কর্ত্তাদের বিজ্ঞাপন; তাহাতে ইহাকে এক অত্যাদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছিল; অপরদিকে দেখিতেছিলাম কয়েকখানি ইংরাজপরিচালিত কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্য; তাহাতে পাঠকবর্গকে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছিল, যে, প্রদর্শনীটা কিছু নয়, একটা লোকের মনভুলান তামাসা মাত্র; তাহাতে আবার প্রদর্শনী খুলিবার দিন পর্য্যন্ত জিনিস পত্র ভাল করিয়া সাজান হয় নাই, খুব বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল। আমরা যখন বড় দিনের বন্ধের সময় দেখিতে যাই, তখন এরূপ বিশৃঙ্খলা ছিলনা। সমস্ত জিনিস যথাস্থানে সাজান হইয়া গিয়াছে।

প্রদর্শনী দেখিয়া আমাদের এই ধারণা হইয়াছে যে কর্ত্তৃপক্ষের বিজ্ঞাপন অত্যুক্তিপূর্ণ। অপরদিকে নিন্দাকারী ইংরাজসম্পাদকগণ যেরূপ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়াছিলেন, প্রদর্শনী সেরূপ অবজ্ঞার উপযুক্তও নহে। এখানে একটা অবান্তর কথা উল্লেখ্য বোধ হইতেছে। নিন্দাকারী যেসকল ইংরাজ সম্পাদক যখন নিন্দা করিতেছিলেন তখন তাঁহাদের কাগজে প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছিল না, অন্য অন্য কোন কোন কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছিল। বিজ্ঞাপন না পাইয়া পূর্ব্বোক্ত সম্পাদকগণ ক্রোধবশে প্রতিকূল সমালোচনা করিতেছিলেন কিনা, তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন।

প্রদর্শনীতে দেখিবার জিনিস ও ভাবিবার বিষয় অনেক আছে। উহাতে ভারতবাসীর হস্তনির্ম্মিত যে সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং যে সকল জিনিস প্রদর্শনীর মধ্যেই দেশী কারিকরেরা হস্তদ্বারা নির্ম্মাণ করিতেছে তাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে ভারতবর্ষে শিল্পের অবনতি ও লোপ এবং শিল্পীর দারিদ্র্য ভারতবাসীর বুদ্ধির অভাব, শিল্পনৈপুণ্যের অভাব, সৌন্দর্য্যবোধ বা রুচির অভাব কিম্বা শ্রমবিমুখতায় হয় নাই। বিদেশীর হস্তে রাজনৈতিক শক্তির অপব্যবহারে কিছু হইয়াছে; আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে কিছু হইয়াছে; আধুনিক কলকারখানা যথাসময়ে ও যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলন না হওয়ায় কিছু হইয়াছে; বিকৃত শিক্ষার দোষে আমাদের রুচি বিগড়িয়া যাওয়ায় আমরা সুন্দর দেশী জিনিস ছাড়িয়া তদপেক্ষা কম সুন্দর কিম্বা বাস্তবিকই কুৎসিত বিদেশী জিনিস ব্যবহার করিতেছি বলিয়া কিছু হইয়াছে; আমাদের মধ্যে রাজা রাজড়া ও অবস্থাপন্ন লোকদের চালচলন পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হওয়ায় প্রাচ্যসভ্যতা ও ভদ্র-জীবনযাপন-প্রণালীর সহায় স্বরূপ অনেক জিনিস অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া কিছু হইয়াছে; আমাদের কারিকরেরা বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা নিজেদের জিনিস কাটাইতে না জানাতেও অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য অশিক্ষিত লোকদের হাতে থাকাও অন্যতম কারণ। সংক্ষেপে সকল কারণের উল্লেখও করা যায় না।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই নানাবিধ প্রাচীন শিল্প এখনও বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে যে সকল শিল্পদ্রব্য কারিকরেরা প্রদর্শনীক্ষেত্রেই প্রস্তুত করিয়া দেখাইতেছে, তাহার সমস্তই উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবের। অন্যান্য প্রদেশের শিল্পদ্রব্য কিছু কিছু প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাঙ্গলা, আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের কোন কারিকর দেখিলাম না। উত্তরভারত ছাড়া ভারতের অন্য অংশের জিনিস না থাকার মধ্যেই, কিন্তু বিলাতের ও জর্ম্মানীর জিনিস খুব আছে। সুতরাং এই প্রদর্শনীকে "স্বদেশী" ত বলা যায়ই না, বরং তাহার বিপরীত।

যাহা হৌক, দেশী কারিকরেরা যে সকল জিনিস প্রস্তুত করিতেছে, তৎসমুদয় খুব সুন্দর; দামও কিছু বেশী নয়। প্রদর্শিত অন্যান্য দেশী জিনিস দেখিয়াও আমাদের গৌরব বোধ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিষাদও আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সকল শিল্প আর কতদিন টিকিবে? আমরা ত নিজের জিনিসের যথেষ্ট আদর করি না; নূতন নূতন নির্ম্মাণোপায় এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির উপায়ও শিক্ষা করি না।

এই প্রদর্শনীর দ্বারা "স্বদেশী"র যে উপকার হইবে না তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। বাস্তবিক আমাদের এখন যেরূপ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, তাহাতে প্রদর্শনীর দ্বারা আমাদের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হয়। বিদেশী লোকেরা আমাদের ভাল জিনিসগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখে, ফোটোগ্রাফ নক্সা লয়, নির্ম্মাণ প্রণালী লক্ষ্য করিয়া টুকিয়া লয়, কোন জিনিসটার কিরূপ কাট্‌তি কোন্‌টা আমাদের পছন্দসই ও রুচিসঙ্গত তাহা জানিয়া লয়। তাহার পর তাহারা প্রভূত মূলধন ও কলকারখানার সাহায্যে এই সকল জিনিস প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া সস্তা দামে চালান করিয়া বাজার ছাইয়া ফেলে। ইহাদের দলবদ্ধ সুশিক্ষিত শক্তির কাছে, আমাদের দরিদ্র, অশিক্ষিত, অদলবদ্ধ, আধুনিক-ব্যবসা-জ্ঞানহীন কারিকরেরা দাঁড়াইবে কেমন করিয়া?

এত দর্শক ত প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছে ও যাইবে, তন্মধ্যে হাজারে একজনও কি শিখিতে গিয়াছে? মনে হইতেছিল যেন সকলেই আমোদের জন্য, তামাসা দেখিবার জন্য গিয়াছে। নতুবা যাহা হইতে শিখা যায়, যাহা হইতে লাভ হয়, সে সকল বিভাগে খুব কম লোক, কিন্তু অলঙ্কারের গৃহে খুব জনতা। এরূপ হইবে কেন? যে সকল ছোট ছোট দোকানে কারিকরেরা জিনিস প্রস্তুত করিতেছে, তদ্ভিন্ন আরণ্য বিভাগ (Forestry Court), কৃষি বিভাগ (Agricultural Court), এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ (Engineering Court), জলসেচন বিভাগ (Irrigation Court), চিকিৎসা স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ (Medical and Hygiene Court), ও বয়ন বিভাগ (Textile Court), প্রভৃতিতে দেখিবার, শিখিবার এবং কাজে লাগাইবার অনেক জিনিস আছে। কিন্তু এই সকল জিনিস দেখিবার লোক কম, বুঝিয়া কাজে লাগাইবার লোক আরও কম, এবং বুঝাইবার বন্দোবস্তও

না থাকার মধ্যে ;—অন্ততঃ আমার ত কিছু দেখিতে পাইলাম না। বড়দিনের পূর্ব্বে খুব কম লোকে এই প্রদর্শনী দেখিয়াছে। বড়দিনের ছুটিতে এলাহাবাদে নানা প্রকার সভাসমিতির অধিবেশন হওয়ায় লোকে একাগ্রচিত্তে বেশী সময় দিয়া উহা দেখিতে পায় নাই, দেখিতে গিয়া অতিরিক্ত জনতা বশতঃ কোন বিভাগই ভাল করিয়া দেখে নাই এবং কোন কোন গৃহে ঢুকিতেই পারে নাই। এখন জনতা নাই, সভাসমিতিও শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দর্শক কোথায়? সেইজন্য মনে হয় যে প্রদর্শনীতে সংগৃহীত শিক্ষার জিনিস ও বিষয়গুলি একটি মিউজিয়ম্ (Musium) করিয়া এলাহাবাদে রাখিলে বড় ভাল হয়। প্রদর্শনীর গৃহ রহিয়াছে, জিনিসগুলিও আছে, কেবল রক্ষণাবেক্ষণের খরচ সুদ হইতে চলিতে পারে এরূপ টাকা সংগৃহীত হইলেই হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অধিকাংশ লোকে আমোদের জন্য তামাসা দেখিতে গিয়াছিল ও যাইবে। আমোদের বন্দোবস্তও আছে বহুবিধ। সন্ধ্যা হইতে না হইতে বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সমুদয় প্রদর্শনী-গৃহ ও ক্ষেত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সিংহদ্বার ও ঘড়িস্তম্ভ (Clocktower) আলোকেই গঠিত বলিয়া মনে হয়। সতার ও তারবিহীন টেলিগ্রাফের গৃহের উপরের মাস্তলে Telegraph কথাটি পর্য্যায়ক্রমে শ্বেত ও লোহিত আলোকে সুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। পুষ্পকরথে আকাশে উড্ডয়ন, পালোয়ানের কুস্তি, নাগরদোলা, বিলাতী বাদ্য, দেশী সানাই, হাস্যোদ্দীপন গৃহ, প্রভৃতি আরও কত কি আমোদের বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত নাচওয়ালীর গানের বন্দোবস্ত করিয়া প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষেরা দুর্নীতির পরিপোষণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আগ্রা-অযোধ্যা ও অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের লোকের রুচি যথেষ্ট জঘন্য, তাহাতে ঘৃতাহুতি দিবার প্রয়োজন ছিল না। এই প্রদর্শনীটি বাস্তবিক সরকারী। সরকার বাহাদুর মনে করেন যে ছাত্র ও ছাত্রীরা একটা রাজনৈতিক বা স্বদেশী মিছিল দেখিলে এবং সুরেন্দ্র বাবু বা শ্রীযুক্ত গোখ্‌লের বক্তৃতা শুনিলে অধঃপাতে যাইবে। অথচ নাচ্‌ওয়ালীর গান শুনিতে কাহারও কোন নিষেধ নাই। ভিন্ন প্রদেশের ছাত্রীদের পর্য্যন্ত প্রদর্শনীতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সরকার বাহাদুরের আচরণের মধ্যে এই যে অসঙ্গতি ইহার কারণ সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ক্ষুদ্র হইলেও এই প্রসঙ্গে আর একটা কথার উল্লেখ করা উচিত। একটা ঘরে দুটা সীল (seal) নামক সামুদ্রিক জন্তু, তাহাদের পাখ্‌না (flippers) কাটিয়া ফেলিয়া, রাখা হইয়াছে। নাম দেওয়া হইয়াছে mermaid (মৎস্যনারী) ও merman (মৎস্যনর), এবং হিন্দীতে বড় বড় অক্ষরে "মচ্ছ অবতার" লেখা হইয়াছে। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে প্রদর্শনীর কর্ত্তারা জানিয়া শুনিয়া এই জুয়াচুরির প্রশ্রয় দিয়াছেন।

উপরে বিলাতী বাদ্য ও দেশী সানাইয়ের উল্লেখ করিয়াছি। এই উভয় প্রকার বাদ্যের বন্দোবস্ত আমাদের দুর্দ্দশার কথা মনে পড়াইয়া দেয়। কেমন সুন্দর বারদ্বারীতে বিলাতী বাদ্যের বন্দোবস্ত! তাহার বাহিরে চারিদিকে কেমন সুন্দর বসিবার বন্দোবস্ত। আর দেশী সানাই বাজিতেছে এক অনাবৃত স্থানে; বাদ্যকরদের দুইজন একটা বেঞ্চে বসিয়া আছে, এবং একজন মাটীতে বসিয়া আছে। আবার ভারতবাসীদেরও রসগ্রাহিতা ও স্বদেশপ্রেম এমনি যে দলে দলে তাহারা বিলাতী ব্যাণ্ড্ শুনিতেছে,—যদিও তাহা তাহারা কিছুই বুঝে না এবং তাহা তাহাদের ভালও লাগে না; কিন্তু দেশী বাদ্যের শ্রোতা এক হাতের আঙ্গুলেই গোণা যায়। অথচ আমরা নিজের কথা বলিতে পারি যে এমন সুমিষ্ট, এমন ভাবোদ্দীপক সানাই জীবনে কখনও শুনি নাই। আমাদের যে কেবল রাজনৈতিক পরাধীনতা ঘটিয়াছে তাহা নয়, হৃদয় মনও পাশ্চাত্য ফ্যাশানের দাস হইয়া পড়িয়াছে।

এই প্রদর্শনীতে দেখিবার জিনিস বিস্তর আছে। যাঁহাদের এলাহাবাদ পর্য্যন্ত গিয়া তথায় তিন চারি দিন থাকিবার সামর্থ্য ও সুবিধা আছে, তাঁহাদের সকলেরই যাওয়া উচিত। বিশেষতঃ এখন ভিড় না থাকায় আগেকার চেয়ে সকল জিনিস ভাল করিয়া দেখা যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে এলাহাবাদের মত প্রাচীন স্থানের সমুদয় তীর্থ এবং ঐতিহাসিক স্তম্ভাদিও দেখা যাইবে। আমরা কোন বিভাগের বিস্তারিত বৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা করিব না। কারণ, প্রবাসীর কয়েকখণ্ড কেবল প্রদর্শনীর বিবরণে

পূর্ণ করিলেও অনেক বৃত্তান্ত লিখিতে বাকী থাকিয়া যাইবে।

সিংহদ্বার দিয়া ঢুকিয়াই দর্শক দেখিতে পাইবেন, তিনদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরায় কারিকরেরা কাজ করিতেছে। এখানে আগ্রা অযোধ্যা ও পঞ্জাব প্রদেশের এবং তৎ-সন্নিহিত কোন কোন দেশীয় রাজ্যের প্রায় সর্ব্ববিধ হস্তশিল্পের নির্ম্মাণপ্রণালী দেখান হইতেছে। কিরূপ সামান্য যন্ত্রের সাহায্যে দেশী শিল্পিগণ কেমন সুন্দর জিনিস সকল প্রস্তুত করিতেছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

চিত্রশালায়, নানা দেশীয়-রাজ্যের গৃহে, অযোধ্যা বিভাগে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রের এমন সুন্দর সংগ্রহ সহজে দেখিবার সুযোগ ঘটা কঠিন। কাঠের কাজ, পাথরের কাজ ও ধাতুর কাজ যে কত প্রকার দেখান হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশীয় রাজ্যে শিল্পের উন্নতি কিরূপ হইয়াছে, তাহা এই প্রদর্শনী হইতে বুঝা যায়। আমাদের একবার দেখিয়া এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে জয়পুরে সৌখীন সুন্দর জিনিস খুব বেশী হয় এবং গোয়ালিয়ারে নিত্য ব্যবহার্য্য কাজের জিনিস বেশী হয়। বিকানীরে প্রস্তুত চীনামাটির বাসন দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম।

শিক্ষাবিভাগে আমাদের দেশের ও বিলাতের শিক্ষাদান প্রণালী ফোটোগ্রাফ দ্বারা দেখান হইয়াছে। বিলাতের ও আমাদের দেশের ছাত্র ও ছাত্রীদের অঙ্কিত ছবি ও প্রশ্নের লিখিত উত্তরের খাতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুত অন্যান্য জিনিসও প্রদর্শিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে ব্যবহার্য্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিও প্রদর্শিত হইয়াছে।

চিকিৎসা বিভাগে রঞ্জন (Rontgen) আলোকের সাহায্যে জীবিত মানুষের শরীরের ভিতরের অস্থি আদি দেখান হইতেছে। নানাবিধ আধুনিক বৈজ্ঞানিক অস্ত্র, রোগনিবারণোপায় প্রভৃতি দেখান হইতেছে। এই বিভাগে শিক্ষার একটী বিষয় আছে, যাহা লোকে দেখিতেছে না। ইহাতে বহু শত প্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে ব্যবহৃত উদ্ভিজ্জ পদার্থ সংগৃহীত হইয়াছে। যে সকল উদ্ভিদ্ হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়, তৎসমুদয়ের চিত্রও সংরক্ষিত হইয়াছে। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে বলিলেই তিনি সে সকল দেখাইয়া থাকেন।

আরণ্যবিভাগ ও কৃষিবিভাগ দেখিলে অবাক হইতে হয় যে ভারতবর্ষে ধনাগমের কত উপায় রহিয়াছে। অথচ আমরা দরিদ্র! আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়!

এলাহাবাদে পৌষমাস

প্রদর্শনী দেখিবার জন্যই পৌষমাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক এলাহাবাদ গিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস, সমাজ সংস্কার সভা, শিল্পোন্নতি সভা, ভারত মহিলাপরিষদ, একেশ্বরবাদীদিগের সভা, নানা ধর্ম্ম মহামণ্ডল, শুদ্ধিসভা স্বভা একলিপি প্রভৃতির জন্যও অনেক লোক এলাহাবাদ গিয়াছিলেন।

এবার কংগ্রেসে মোটে ৬৩৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। লাহোর কংগ্রেস্ অপেক্ষা ইহাতে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু সকল দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে এখন আর কংগ্রেস্ সম্বন্ধে লোকের পূর্ব্ববৎ উৎসাহ নাই। প্রয়াগ হিন্দুর তীর্থরাজ, প্রয়াগে এত বড় প্রদর্শনী হইতেছে, এই কংগ্রেসের সভাপতি ভারতবন্ধু সার্ উইলিয়ম্ ওয়েডার-বর্ণ্; অথচ প্রতিনিধির সংখ্যা ১০০০ও হইল না, ইহা খুব আশার কথা নহে। কেন এরূপ হইল, কংগ্রেসের নেতাদের তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

সার্ উইলিয়ম্ ওয়েডারবর্ণ, বৃদ্ধ বয়সে ভারতের হিতার্থ যে এতদূর আসিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার পরার্থপরতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করা ব্যতীত ওয়েডারবর্ণ সাহেবের ভারতাগমনের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। তাহা হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতিস্থাপন। এ বিষয়ে পরে কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

সমাজসংস্কার সভার সভাপতি হইয়াছিলেন রাজা রামপাল সিং। ইনি কলাকঙ্করের রাজা রামপাল সিং নহেন, তিনি পরলোকগত। ইনি অন্য ব্যক্তি। ইহাঁর
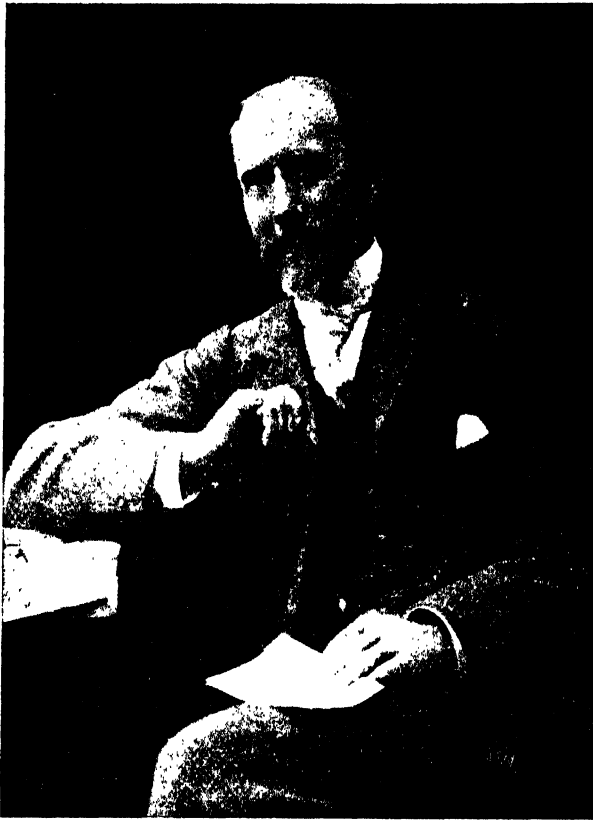
সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ।

মত প্রাচীন রক্ষণশীলবংশের লোক যে সমাজসংস্কার-চেষ্টায় যোগ দিতেছেন, ইহা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। অনেকে মনে করেন, বৎসরান্তে একবার সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রস্তাব ধার্য্য করিয়া কোন ফল হয় না। কিন্তু তাহা ভুল। সম্বৎসর কার্য্য করিলে অবশ্য ভালই হয়, এবং কাজও বেশী হয়, কিন্তু বৎসরান্তে একবার সংস্কারকগণ একত্র হইলেও দেশের মত গঠন পক্ষে কিছু সহায়তা হয়। কিন্তু বঙ্গের সমাজসংস্কার সভার মত অলস নামসর্ব্বস্ব সভা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে না থাকাই ভাল।

শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভারতনারীগণ যে নারীর গুরুতর কর্ত্তব্যের দিকে মন দিতেছেন, নারীর অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দলাদলির কি প্রয়োজন ছিল? এলাহাবাদে দেখিলাম, দুটি নারীসভা হইল। একটির নেতৃপদে ছিলেন বিজিয়ানাগ্রামের মহারাণী, দ্বিতীয়টির নেতৃত্ব করিয়াছিলেন জঞ্জিরার বেগম। ইহাঁরা সম্মিলিত ভাবে কাজ করিতে পারিলে বড় ভাল হইত।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শিল্পোন্নতি সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি নিজে এক্ষেত্রে একজন কৃতকর্ম্মা পুরুষ। সুতরাং তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে সারগর্ভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন, শিল্পোন্নতির জন্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তৃত হওয়া উচিত, বিদেশী শিল্পদ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া দেশী শিল্প রক্ষা করা উচিত, এবং বিদেশী মূলধন দ্বারা ভারতবর্ষের খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ নানা বস্তুকে মানুষের ব্যবহারযোগ্য করিয়া ভারতবক্ষ হইতে ধনাহরণ করা উচিত। শেষোক্ত প্রস্তাবটি ভিন্ন তাঁহার আর সকল প্রস্তাবে তাঁহার দেশবাসীরা সায় দিবে।

বিশুদ্ধধর্ম্মমত ও বিশুদ্ধধর্ম্মজীবন সকলপ্রকার সংস্কার কার্য্য ও উন্নতির ভিত্তি। যদিও একেশ্বরবাদীদিগের সভায় অন্য সকল সভা অপেক্ষা কম লোক যোগ দিয়াছিল, তথাপি এই জন্য উহার গুরুত্ব অন্য কোন সভা অপেক্ষা কম নহে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন।

যে সকল হিন্দুবংশজাত ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষগণ বা তাঁহারা নিজে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করায় এখন হিন্দু বলিয়া গণ্য নহেন, তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তানন্তর হিন্দুসমাজে গ্রহণ, এবং হিন্দুসমাজের "অস্পৃশ্য" ও অবনত জাতিসমূহের উন্নতিসাধন শুদ্ধিসভার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু সভাতে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে, কিম্বা সভাপতি শ্রীযুক্ত রামভজ দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের বক্তৃতায় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজে কি করা হইবে, কে টাকা দিবে, কে সংগ্রহ করিবে, কে প্রাণ দিয়া শিক্ষাদান ও অন্যান্য কার্য্য করিবে, তাহার কোন স্পষ্ট আভাস পাইলাম না। যাহার যতটুকু উন্নতি যে সদুপায়ে হয়, তাহাতেই আমরা সুখী। কিন্তু সকলেরই ইহা ভাবা উচিত যে উন্নতির পথ কোথাও গিয়া শেষ হয় নাই, হইতে পারে না। উন্নতি মাঝ রাস্তায় গিয়া থামিতে

পারে না। মনে করুন নমঃশূদ্র সৎশূদ্রের পদ পাইলেন। কিন্তু তিনি বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়ের বা ব্রাহ্মণের পদবী অতি সাধু ও সুশিক্ষিত হইলেও কেন পাইবেন না, তাহার কোন যুক্তিমূলক কারণ কেহ দেখাইতে পারেন কি? উন্নতি যে উপায়ে হইতে পারে হউক, কিন্তু ইহা যেন কেহ না ভুলেন যে যতদিন হিন্দুসমাজের ভিত্তি জন্মগত শ্রেণীভেদের উপর স্থাপিত থাকিবে, ততদিন হিন্দুগণ অন্যান্য শক্তিশালী জাতিদের মত নিবিড় দলবদ্ধ ও শক্তিশালী হইতে পারিবেন না।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা নানাধর্ম্মমহামণ্ডলের সভাপতি হইয়াছিলেন। ইহাতে হিন্দু বৌদ্ধ ইহুদী খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক অপর কোন ধর্ম্মকে আক্রমণ না করিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মমত সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এইরূপ ভ্রাতৃভাব যদি ক্ষণিক হয়, তথাপিও ইহা শুভফলপ্রদ। সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা উপর্য্যুপরি দুইবার এই মহামণ্ডলের সভাপতি হইলেন। এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে পরে পরে পর্য্যায়ক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন, এরূপ লোককেই সভাপতি করা উচিত, উন্নত চরিত্র, উন্নত ধর্ম্মজীবন, আধ্যাত্মিকতা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাঁহার জীবনের বিশেষত্ব।

কোন দেশে নানাপ্রকার ভাষা ও নানা প্রকার বর্ণমালা প্রচলিত থাকিলে তদ্দেশে প্রকৃতিপুঞ্জের ঐক্য ঘটা বড় কঠিন। এই জন্য ভারতবর্ষে একটি সাধারণ ভাষা ও সাধারণ বর্ণমালা প্রচলিত হইলে বড় ভাল হয়। প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যগুলির বিলোপসাধন না করিয়াও ইহা করা যাইতে পারে। একলিপি সভার ইহাই উদ্দেশ্য। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আইয়ার ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন এবং একটি যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এই সমুদয় ছাড়া প্রেমমহাবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা সভা বসিয়াছিল। তদ্ভিন্ন, বৈশ্য মহাসভা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অনেক বর্ণের সভা বসিয়াছিল। তাঁহাদের দ্বারা ভাল কাজ যে হইতেছে না তাহা নয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের সংকীর্ণভাব প্রবল হওয়ায় মহাজাতি গঠনে বিঘ্ন ঘটিতেছে।

নব্য কবিতা

মানুষের তীব্রতম দুঃখ এবং জগতের প্রধানতম অভিযোগ এই যে "কেহ কারো মন বোঝে না কাছে এসে ফিরে যায়।" মন বুঝিতে না পারিলে সহানুভূতি জন্মিতে পায় না, সহানুভূতির অভাব সহযোগিতাকে বিনষ্ট করে, ঐক্যকে স্থায়ী হইতে দেয় না। পৃথিবীর পনের আনা অসিযুদ্ধ ও পৌনে ষোল আনা মসীযুদ্ধের মূল মন বুঝিবার অক্ষমতা; সংসারে যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এ কথা নূতন নয়।

মন বুঝিবার মন্ত্র যাঁহারা জানেন, মানবসমাজ তাঁহাদিগকে মহাপুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছে। মহাপুরুষদের মানসিক ক্ষমতা এবং মস্তিষ্কের শক্তি সাধারণের তুলনায় অনেক বেশী; কিন্তু, মন বুঝিবার মন্ত্রটা ক্ষুদ্র মহৎ সকলের জীবনেই একান্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, কাঁটা গুল্মে গুলাব ফুটাইতে হইলে, সাধারণ মস্তিষ্ককে একটু বিশেষত্ব দান করিতে হইলে Culture বা সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষাই একমাত্র ব্যবস্থা; একটু ভাবের চাষ, একটু বুদ্ধির চাষ, একটু সহৃদয়তার চাষ। প্রকৃতি যাহার প্রতি কৃপণ, বিজ্ঞান তাহাকেও কৃপা করিতে প্রস্তুত।

Culture বা সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার দ্বারা চিত্তকে বিকশিত করিয়া তুলিতে না পারিলে, জগতের কোনো বড় ব্যাপারের মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না; কোন সমস্যার দুই দিক দেখিতে না পাইলে তাহার সম্বন্ধে কোনো ন্যায্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না; মানবজাতির বিচিত্র চিন্তা ও বিচিত্র ভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইতে না পারিলে সম্পূর্ণরূপে মানুষ হওয়া যায় না।

"বহ্‌তা পানী নির্ম্মলা বন্ধা গন্ধীলা হোয়।"

জগতের পরিবর্ত্তনশীল চিন্তাস্রোতের সঙ্গে যে নিজের সংযোগ রক্ষা করিতে পারে তাহার চিত্তই নির্ম্মল, সঙ্কীর্ণ মন বাঁধা জলের মত অল্পেই দুর্গন্ধ হইয়া উঠে।

বিচিত্রতার মধ্যে ঐক্য এবং ঐক্যের মধ্যে বিচিত্রতা

জগৎ সংসারের একটি সর্ব্ববাদীসম্মত লক্ষণ। মানুষের অন্তঃকরণ নামক জিনিষটি, অনেক সময়ে সৃষ্টিছাড়া বলিয়া মনে হইলেও ঐ লক্ষণোপেত; এবং অন্তঃকরণের সৃষ্ট সামগ্রী কাব্য-সাহিত্যেও ঐ লক্ষণ সংক্রামিত হইয়াছে। প্রাচীন কাব্য ও নব্য কবিতা তুলনা করিলে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায়। 'প্রাচীন' শব্দ আমরা এখানে 'আদিম' অর্থে ব্যবহার করিতেছি। কারণ, জগতের ইতিহাসে, যেখানেই সভ্যতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছে, যখনই ভাব ও চিন্তা জমিয়া উঠিয়াছে তখনই নব্য কবিতার লক্ষণাক্রান্ত রচনা জন্মিয়াছে। চীন দেশীয় প্রাচীন কবিতা ইহার দৃষ্টান্ত। পিণ্ডার ও স্যাফোর রচনার তুলনা করিলে, কথাটা স্পষ্ট হইবে; একটি আদিম, আরেকটি পরিণত; একটি Classic আরেকটি Romantic, একটি উদ্যম আরেকটি উচ্ছ্বাস। জর্ম্মনীর কবি হায়েন বলিয়াছেন—

"Classic art had to portray only the finite, and its form could be identical with the artist's idea. Romantic art had to represent or rather to typify the infinite and the spiritual."

প্রাচীনতন্ত্রের শিল্পীরা যাহা আঁকিয়াছেন তাহা সীমাবিশিষ্ট, আকার-যুক্ত; শিল্পীর ধারণা সহজেই তাহার নাগাল পাইয়াছে। নব্যতন্ত্রের শিল্পীরা অনন্তের আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন; আধ্যাত্মিক ভাবকে ছাঁচে তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

নব্য কবিতা আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির লীলাভূমি, বিশ্ব-প্রকৃতির মত সে ইঙ্গিতে অনেকখানি বলে, ফুটিয়া কিছুই বলিতে চায় না। ওড়্নার সূক্ষ্ম অন্তরালে সুন্দর চোখের মৌন দৃষ্টির মত, কিছু না বলিয়াও সে অনেক বলে; হেমন্তের হিমায়মান আকাশপটে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের নক্ষত্রপুঞ্জের নীরব সংক্রমণের মত আলোক হয় তো সে যথেষ্ট দেয় না, কিন্তু আনন্দ দেয় প্রচুর। একজন সমঝদার সমালোচক বলিয়াছেন—

"About the best poetry there floats an atmosphere of infinite suggestion.

"Suggestion is the indirect evocation of an idea in the mind as the starting point of a process of thought and feeling."

শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণই এই যে উহার চারিদিকে ভাবসূচনার একটা অপরিমেয় আব্‌হাওয়া উহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবেই।

যে কথা বা যে ভাব উল্লেখ মাত্রেই গৌণভাবে মনের মধ্যে ভাব ও চিন্তার প্রবাহ মুক্ত করিয়া দেয় তাহাকে ভাবসূচনা বলা হয়।

ফরাসীভূমির ভাবুক কবি পল্‌ভার্লেন্ বলেন—

"Que ton vers soit la chose envolèe
Qu'on sent qui fuit d'une âme en allèe
Vers d'autres cieux, á d'autres amours."

কবিতা হইবে পক্ষযুক্ত পাখীর মত, অপ্সরার মত সে উড়িয়া চলিবে; প্রয়ান-চঞ্চল চেতনার পরিচয় তাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে; অভিনব স্বর্গের অভিমুখে তাহার গতি; নূতন প্রেমের মাদকতা তাহার চক্ষে।

হায়! অন্তরের এই অন্তঃপুরিকা, এই রহস্যময়ী, গোপনচারিণী "চিত্তনন্দনের সুন্দরী কবিতা"-বধূটিকে তর্কের হাটে, যুক্তির হাঁসপাতালে হাজির করিয়া নেস্ত-ও-নাবুদ করিতে যাঁহারা কুণ্ঠিত হন না, তাঁহাদিগকে বিদগ্ধ বলিতে আমি কুণ্ঠা বোধ করিতেছি। সকল জিনিষ হাত দিয়া ঘাঁটিয়া নষ্ট করা অপোগণ্ড শিশুদিগকেই শোভা পায়; বয়স্ক লোকের পক্ষে চোখের দেখাই দেখা হওয়া উচিত। ক্ষুদ খুঁটিতে খুঁটিতে রত্নও পাওয়া যায়, কিন্তু, সে বস্তু যদি ঠোঁটের বলে না টুটে তাহা হইলেই কি উহাকে অপদার্থ মনে করিতে হইবে? মনে রাখা উচিত, জগতে ঠোঁটের বলই গুণ পরীক্ষার একমাত্র নিরিখ নহে।

সভ্যতার স্থায়িত্বের সঙ্গে, মস্তিষ্ক-কোষের পরিণতির সঙ্গে মানুষের সাহিত্যবোধের যে তারতম্য ঘটিয়াছে, তাহা অতীত যুগের অলঙ্কারশাস্ত্রের মাপকাঠিতে আর ঠিকমত মাপা যাইবে না। যুদ্ধের উত্তেজনা এবং হত্যাকাণ্ডের নৃশংস বর্ণনা এক সময়ে এই মানবজাতিকে আনন্দদান করিত, সে দিন কিন্তু অতীত। এখন সূক্ষ্মতর তারে মৃদুতর স্পর্শে গভীরতর সঙ্গীত উঠিয়াছে। এখন জাতীয় সঙ্গীত, অনেকের প্রিয় হইলেও, কবিতা হিসাবে উচ্চ আসন পায় না। বামনেও যাহার নাগাল পায় সে যে আকাশের চাঁদ নহে সে কথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না।

গান ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ গীতি কবিতার মধ্যে ভিতরে ভিতরে বেশ একটু সাদৃশ্য আছে। যাঁহারা রাগরাগিণীর ভাব জাগাইবার ক্ষমতা স্বীকার করেন নব্য কবিতার মর্ম্ম বুঝিতে তাঁহাদের কষ্ট হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সুর যেমন সূক্ষ্ম-সুকুমার আবেগ-বিভ্রমের পেলব ভাষা, নব্য কবিতাও তেমনি "subtle and delicate instrument of emotional expression." উহার ভাব ও ছন্দ জলের তরলতার মত, সূর্য্যের উজ্জ্বলতার মত একেবারেই অভিন্ন। সুরবাহার বাজাইতে হইলে যেমন

কয়েকটা মাত্র তার স্পর্শ করিতে হয়, বাকীগুলা ঝঙ্কারের স্পন্দনেই ঝঙ্কৃত হইতে থাকে, নব্য কবিতায় তেমনি আমাদের অস্থিমজ্জাগত কতকগুলি চিরন্তন ভাবের সূচনা দ্বারা আমাদের মস্তিষ্কের নিগূঢ় কোষ-সমূহ এবং অন্তরের বিচিত্র সূক্ষ্ম পর্দাসমূহকে আন্দোলিত করিয়া তোলে। যখন নানাদিক হইতে মনের মধ্যে এইরূপে সাড়া জাগিয়া ওঠে তখনই আমরা প্রকৃতরূপে কাব্যামৃতরসাস্বাদ করিতে পারি এবং কাব্য যে অমৃত তাহা শুধু এই অবস্থাতেই বুঝিতে পারি। আমাদের অন্তরের উন্মুকুলিত কুঞ্জবনে যে কবিতা 'বসন্তের বাতাসটুকুর মত' ছুঁইয়া যায়, নুইয়া যায়, এবং যেখানে এতদিন কেবল পাতাই গজাইতেছিল সেখানে একেবারে শত শত ফুল ফুটাইয়া যায়, তাহাই যথার্থ কবিতা, তাহাই শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং তাহাই নব্য কবিতা। উঁচুদরের সমঝদার না হইলে ইহার মানে বুঝিতে পারে না, মজা পায় না। "Only the finer nerve and keener touch can follow."* এইরূপ কাব্যামৃত বিতরণ করিয়াছেন বলিয়াই Shelley ও রবীন্দ্রনাথ Poet of Poets নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সাধারণে যাঁহাদের কবি বলিয়া মানে, সেই সমস্ত কবিরাই একমাত্র ইঁহাদের কাব্যামৃতের যথার্থ অধিকারী।

দুঃখের বিষয় এরূপ কবিতা বেশী জন্মিতে পারে না, না জন্মিবার কারণও অবশ্য আছে। মনস্বী ওকাকুরা বলেন—

"The beauty of flower or a cloud lies in its unconscious unfolding of itself."

আপনার অজ্ঞাতসারে ভাঁজের পর ভাঁজ খুলিয়া যাওয়ার মধ্যেই ফুলের সৌন্দর্য্য, মেঘের চমৎকারিত্ব।

হৃদয়-শতদলের দলগুলি এমনি করিয়া কবিতার মধ্যে খুলিয়া দিতে পারেন এরূপ কবি দুর্লভ, সেই জন্য এরূপ কবিতাও দুর্লভ।

অধ্যাপক ব্র্যাড্‌লে তাঁহার "Oxford Lectures on Poetry" নামক নব-প্রকাশিত গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

Pure Poetry is not the decoration of pre-conceived and clearly defined matter: It springs from the creative impulse of a vague imaginative mass pressing for development and definition. If the poet already knew exactly what he meant to say why should he write the poem? The poem would in fact already be written. For only its completion can reveal, even to him, exactly what he wanted. When he began and while he was at work, he did not possess his meaning; it possessed him. It was not a fully formed soul asking for a body, it was an inchoate soul in the inchoate body of perhaps two or three vague ideas and a few scattered phrases. The growing of this body into its full stature and perfect shape was the same thing as the gradual self-definition of the meaning. And this is the reason why such poems strike us as creations, not manufactures and have the magical effect which mere decoration can not produce. This is also the reason why, if we insist on asking for the meaning of such a poem, we can only be answered "It means itself."

সুস্পষ্ট পূর্ব্বধারণায় অলঙ্কৃত অনুবৃত্তিকে খাঁটি কবিতা বলা যায় না; রাশি রাশি অস্ফুট কল্পনা যখন মনের মজলিসে জমায়েৎ হয় এবং ক্রমশঃ দানা বাঁধিয়া স্ফুরণের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে অকৃত্রিম কাব্য-রসের উৎপত্তি কেবল তখনই সম্ভব। কবি যে কি কথা বলিতে চাহেন তাহা যদি তিনি রচনার পূর্ব্ব হইতেই পরিষ্কার রূপে জানিতেন, তবে তাহা লইয়া আর মাথা ঘামাইতে যাইতেন না। রচনা যতক্ষণ না পরিসমাপ্ত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত রচয়িতাও বলিতে পারেন না তিনি ঠিক কি কথাটি ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন। রচনাকার্য্য যখন শেষ হয় অর্থ ধরা পড়ে তখনই। লিখিবার সময় কবি উহার ভাব পান নাই, ভাবই তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। এক্ষেত্রে পরিণত আত্মা অবয়ব চাহিতেছে না; ভাবের ভ্রূণ দুই চারিটি বিশেষ বোল্ অবলম্বন করিয়া পরিণতির অপেক্ষা করিতেছে। শব্দ যোজনা যেমন চলিতে থাকে, কলেবর যেমন বাড়িতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে ভাবও তেমনি ঘনাইয়া ওঠে। সেই জন্যই এ শ্রেণীর কবিতাকে কারিকরের কারিগরি বলিতে ইচ্ছা হয় না; মনে হয়, ইহা এমনি আপনা হইতেই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে; ইহা সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়াধীন, জগৎ-পদ্মের পাপ্‌ড়ি। সেই জন্যই ইহা ইন্দ্রজালের মত মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে; সালঙ্কৃত কবিতা অলঙ্কার শাস্ত্র-সম্মত হইলেও, ঠিক তেমনটি পারে না। আর, ঠিক ঐ কারণেই যদি আমরা উহার অর্থ বাহির করিবার জন্য ক্রমাগত তাগিদ দিতে থাকি, তবে সকল দিক হইতে ঐ একই জবাব পাই "উহার যাহা অর্থ তাহা উহার নিজের মধ্যেই নিহিত আছে।"

এই ভোর-ভোর ঘোর-ঘোর ভাবের নীহারিকাই শ্রেষ্ঠ কবিতার মূল। ইহাকেই হায়েন বলিয়াছেন,—Nebulous twilight-thoughts and feelings.

যিনি অনন্যকর্ম্মা, লোকের চক্ষে যিনি অকর্ম্মণ্য, যাঁহার অগাধ অবসর ভাবের চর্চ্চায় ব্যয়িত হইয়াছে এবং এইরূপে যাঁহার সুকোমল মনোবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ বীণার তারের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দনে স্পন্দিত হইতে আরম্ভ

* Walter Pater.

করিয়াছে একমাত্র তিনিই মানুষের মনোরাজ্যের মধ্যে অবাধে বিহার করিতে পারেন।

"মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভরা,
ফুটে যেথা পারিজাত বিচরে গন্ধর্ব্ব অপ্সরা।
দলি স্বর্ণরেণু চরে কামধেনু,
কল্পতরু ছায়াতলে রঙ্গে হাসে ধরা।"*

এখানে কবি কৌতূহলের চকমকি ঠুকিয়া অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কার করিতে করিতে মানব-মনের গুহা হইতে গুহান্তরে ক্রমাগতই চলিয়াছেন। আলোকের এক একটা ঝলকে তিনি অনেকখানি দেখিয়া ফেলেন;—কত অতীত বৈভবের ভগ্নাবশেষ, কত বিগত যুগের কেয়ুর কঙ্কণ, মুকুটকুণ্ডল, প্রসাধনসামগ্রী, ভিক্ষাপাত্র; কত বন্দীর শৃঙ্খল, প্রহরীর লৌহযষ্টি, কত মগ্ন জাহাজের ভগ্ন নঙ্গর; কত জীর্ণ কঙ্কাল, কীটদষ্ট কপর্দ্দক, সিংহাসনের পুত্তলিকা; কত অস্ফুট ভাব, কত অশ্রুত কাহিনী, কত অপূর্ব্ব কাকলি! তাঁহার চক্ষে নব নব দৃশ্য, তাঁহার অন্তরে নব নব উন্মেষ। এই অবস্থায় তিনি কি যে গাহেন কি যে বলেন তাহা তিনি নিজেই জানেন না, সে কথার অর্থ আছে কি না তাহা তিনি একটুও ভাবেন না, ভাবা প্রয়োজন মনে করেন না। তখন তাঁহার কল্পনা "ভরা পালে চলে যায় কোনো দিকে নাহি চায়" এবং বিচিত্র ভাবের "ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু'ধারে।" কবিদিগের মনের এই অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া অধ্যাপক ব্র্যাড্‌লে উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে লিখিয়াছেন—

"The glowing metal rushes into the mould so vehemently that it overleaps the bounds and fails to find its way into all the little crevices. But no poetry is more manifestly inspired, and even when it is plainly imperfect it is sometimes so inspired that it is impossible to wish it changed. It has the rapture of the mystic, and that is too rare to lose."

তখন তাপদীপ্ত তরলায়মান ধাতুধারা ছাঁচের সীমা ছাড়াইয়া উপচিয়া পড়িতে থাকে, নক্সার সমস্ত রন্ধ্রে হয় তো প্রবেশই করে না। কিন্তু যে জিনিসটি তৈয়ার হইয়া বাহির হইল, তেমন জিনিস জগতে অল্পই জন্মে। "মৃত্তিকা উপরে জলের বসতি তাহার উপরে ঢেউ" এই সদ্যোজাত অপ্সরাটির আসন সেই চলমান ঢেউটির ঠিক উপরে।

"The light that never was on sea or land
The consecration, and the poet's dream."

ইহা সেই জ্যোতি যাহার স্পর্শ জলে স্থলে কোথাও পড়ে না, পড়ে শুধু কবির হৃদয়ে, স্বপ্নরাজ্যে।

* স্বপ্নপ্রয়াণ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এইরূপ রচনার মধ্যে যেগুলি স্পষ্টই সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাহার মধ্যেও কতকগুলি এমনি দৈব-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত বলিয়া মনে হয়, যে তাহার একটি পংক্তিও পরিবর্ত্তিত দেখিতে, ইচ্ছা হওয়া পর্য্যন্ত অসম্ভব। ইহা মন্ত্রদ্রষ্টার হর্ষোন্মাদে ওতঃপ্রোত, প্রত্যাদেশের মন্ত্রধ্বনিতে পূর্য্যমান, এ জিনিস নিত্য পাওয়া যায় না; এমন দুর্লভ জিনিস ভাবুক লোকে, cultured লোকে হেলায় ঠেলিতে পারে না।

শেলি বলিয়াছেন যাঁহারা প্রকৃত কবি

"They redeem from decay the visitations of divinity in man."

তাঁহারা মানুষের অন্তরে মাঝে মাঝে দেবতার যে আবির্ভাব হইয়া থাকে তাহা বিস্মৃতির কবল হইতে উদ্ধার করেন।

ইহাই তো চাই, কবির কাছে জগৎ ইহাই তো প্রত্যাশা করে।

মনস্তত্ত্ব-বিশারদ মনস্বী আলেকজাণ্ডর বেন্ বলেন—

"The æsthetic like the religious emotions send their roots far down into the opaque structure of the sub-conscious intelligence and hence the two are natural associates. Nature is not their standard, nor is objective truth their chief end."

সৌন্দর্য্যবোধের আনন্দ, ধর্ম্ম বিষয়ে উচ্ছ্বাসের মত, আমাদের চিত্তের যেখানটিতে শিকড় চালাইয়াছে সে জায়গাটি এক প্রকার অবচ্ছ, মগ্ন-চেতনার রাজ্য। সেখানকার কাজ জ্ঞানপূর্ব্বক চেষ্টার সাহায্যে সংসাধিত হয় না।

এই দুইটি ব্যাপারের উৎপত্তি এক জায়গায় বলিয়া বিকাশও প্রায় পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। বহিঃপ্রকৃতি ইহাদের নিরিখ্ নয়, প্রকৃতির মাপকাঠিতে ইহাদের মাপা যায় না এবং বাস্তব-জগতের সত্যও ইহাদের উদ্দিষ্ট নহে।

আমাদের মনের এই মগ্ন-চেতনার রাজ্যে যে কত ঐশ্বর্য্য লুক্কায়িত আছে তাহা কে বলিতে পারে?

"Who dare measure the height and depth of sub-conscious intelligence? It draws its knowledge from sources which elude scientific research, from the strange powers which we perceive in insects and other lower animals, almost, but not wholly obliterated in the human line of organic descent; and from others now merely nascent or embryonic, new senses, destined in some far off æon to endow our posterity with faculties as wondrous to us as would be sight to the sightless."*

* D. G. Brinton.

একদিকে ইহার মধ্যে আমাদের পতঙ্গ জন্মের ও পশু জন্মের লুপ্ত-প্রায়, নিগূঢ় রহস্যময়, বিজ্ঞানের অগম্য সহজ বুদ্ধির সূক্ষ্ম নিদর্শনসমূহ বর্ত্তমান; অন্যদিকে, ইহারই মধ্যে নব নব ইন্দ্রিয়ের বিকাশোন্মুখ মুকুলপুঞ্জ, বিধাতার বিধানে, আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য, সুদূর অনাগত যুগের দিকে তাকাইয়া, যথাসময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

হৃদয়ের এই গভীর অতলে যে কবিতা প্রবেশাধিকার পায় মনীষিগণের মতে তাহাই শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং তাহাই নব্য কবিতা। ইহাই আমাদের অনাদি অনন্ত সত্তাকে (যে সত্তা বিশ্বসৃষ্টির সহোদর) আনন্দে উৎপূর্ণ করিয়া তোলে। ইহা স্মৃতির বাসি ফুলে জলের ছিটা দেয়, বর্ত্তমানের টাট্‌কা ফুলে নূতন রকমের মালা গাঁথে, যে আশায় কুঁড়ি ফুটে নাই তাহাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে অভিনন্দিত করে। এইরূপ অপূর্ব্ব সঙ্গীত যে কবির মুখে মানুষ শুনিতে পায় তাহাকে সে আনন্দে অধীর হইয়া বলে—

"Sing again with thy sweet voice revealing
A tone
Of some world far from ours
Where music and moonlight and feeling
Are one."*

প্রকৃত কবিতার অর্থ, অভিধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহা উপলব্ধির বস্তু।

"Its meaning seems to beakon away beyond itself, or expands into something boundless which is only focussed in it; something which will satisfy not only our imagination, but our whole being."

সে ইশারায় আমাদের যতদূর অগ্রসর হইতে বলে, উহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য আমাদের যেখানে পৌঁছাইয়া দেয়, ততদূরে সে নিজেও নাই। দেখিতে দেখিতে, অতসী কাচের কেন্দ্রপরাঙ্মুখ রশ্মিরাশির মত সে অনন্তের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেয়। সে যে শুধু কল্পনাকেই পরিতৃপ্ত করে তাহা নহে, আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মাকে আনন্দে আপ্লুত করিয়া দেয়।

কাব্যের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে নিজের সঙ্কীর্ণ ধারণা, ব্যক্তিগত রুচি বা সম্প্রদায়গত বিশ্বাসের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করিলে একেবারেই চলে না।

"দর ময়কদা জুজ্‌ নময়্‌ ওজু নতোয়ান্‌ কর্দ্‌।"†

মদের দোকানে আচমন করিতে হইলে মদের সাগরেই সারিতে হয়। পূজার ঘরে প্রবেশ করিবার সময় কেহ লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া কিম্বা দাঁড়িপাল্লা সঙ্গে লইয়া যায় না। কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সেই রাজ্যের আইন কানুন মানিয়াই চলা উচিত; নহিলে পদে পদে হাস্যাস্পদ হইতে হয়; পদে পদেই বিপদ।

বিশ্বমানবের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে হইলে, জগতের বিচিত্রভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইতে গেলে, যথার্থ মানুষ হইবার ইচ্ছা থাকিলে, অনেক দুঃখ সহিতে হয়; কষ্ট করিয়া নিজের মানসিক ক্ষেত্র হইতে অনেক আগাছা উপ্‌ড়াইতে হয়; তাহাকে কোদলাইতে হয়, নিড়াইতে হয়, উর্ব্বর করিয়া রাখিতে হয়; নহিলে পরিণত মনের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়; কুণো হইয়া, সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকিতে হয়; মস্তিষ্কের সহস্রদল পদ্মটা রসের অভাবে, আলোকের অভাবে ভাল করিয়া ফুটিবার আগেই শুকাইয়া উঠিতে থাকে। "সংসার-বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎ ফলে।" কাব্যামৃত রসাস্বাদ তাহার অন্যতম। সেই অমৃত ফল লক্ষ্মণের ফল ধরার মত কেবল হাতে ধরিয়া বসিয়া থাকা ব্যর্থতারই নামান্তর। তাহাকে উপভোগ করিতে হইবে, যথার্থভাবে তাহাকে পাইতে হইবে। কবিতা বাগ্মিতা নয়, বাচালতা নয়, এমন কি রসিকতাও নহে। উহা শুধুই আন্তরিকতা; উহা একান্তরূপে অন্তরের সামগ্রী, এক অন্তরের অন্তঃপুর হইতে এই লজ্জাশীলা অন্তঃপুরিকা আরেক অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার জন্য যখন অভিসার করে তখন তাহার অবগুণ্ঠন ধরিয়া টানিলে সে দ্বিগুণ লজ্জায় মুখ এমনি করিয়াই ঢাকে যে তাহা কোনোমতেই আর খুলিতে পারা যায় না। ভাবার শিবিকায় সে রাজপথেও যাতায়াত করে, কিন্তু দুয়ার বন্ধ করিয়া।

আধুনিক মনস্তত্বের একটা গোড়াকার সিদ্ধান্ত এই যে "We do not think, but thinking simply goes on within us."

মানুষ চেষ্টা করিয়া ভাবে না; ভাবনার ফল মানুষের ভিতর আপনা হইতেই চলিয়া থাকে। এই সহজ কথাটা যিনি বুঝিয়াছেন, নব্য কবিতা তাঁহার কাছে দুর্ভেদ্য-কঠিন তো নহেই,—বরং নিতান্ত সুগম,—ঠিক বজ্রসমুৎকীর্ণ মণির মত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

* Shelley.

† ওমর খৈয়াম।

মাননীয় রাজা রামপাল সিংহ, সি. আই. ই.
করৃরি সুদৌলি এষ্টেট, রায় বেরেলি।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সি. আই. ই।

"এলাহাবাদে পৌষমাস" প্রবন্ধের চিত্র।

শীত

বিশ্বের বিরাট বক্ষে পাতি শবাসন
সাধিতেছ প্রলয় সাধন
কে তুমি সন্ন্যাসী!
বর্ণগন্ধগীত-বিচিত্রিত জগতের নিত্য প্রাণস্পন্দ
কি স্বতন্ত্র মন্ত্রবলে পলে পলে হয়ে আসে বন্ধ!
মরণের আবাহন তরে কেন এই তীব্র আরাধন,
চেষ্টা সর্ব্বনাশী।
বর্ষ পরে বিশ্বজুড়ি বসিলে আবার—কে রুদ্র সন্ন্যাসী!

তোমার বিশাল বক্ষ উঠিছে পড়িছে
পূরকে রেচকে দীর্ঘশ্বাসে,
ওগো যোগীশ্বর!
তব প্রতি পূরক নিশ্বাস আকর্ষিছে দুর্নিবার টানে
মৃত্যুভয়ভীত সর্ব্বজনে তব বক্ষ-গহ্বরের পানে।
হী হী কম্প লাগিয়াছে বিশ্বে স্বন্ স্বন্ তোমার নিশ্বাসে,
শীত ভয়ঙ্কর!
আকর্ষিছ মরণের পানে শবাসন কেগো যোগীশ্বর!

রেচক প্রশ্বাস তব ছড়ায় চৌদিকে
কর্ম্মহীন নির্ম্মম নির্ব্বেদ
শূন্যে জলে স্থলে;
পত্র-পুষ্প লতা-বন্ধ হীন বন—যেন সন্ন্যাসীর মেলা।
স্তব্ধ সিন্ধু ভাবে বালুতটে শুক্তি লয়ে মিছে ছেলেখেলা;
নিরুদ্ধ নির্ঝর গিরি; শৈলসিন্ধুময়ী পৃথ্বী ল'য়ে যেন
দণ্ড কমণ্ডলে
বাহিরায় ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে ব্যোমচারী ভৈরবীর দলে!

সদ্য-প্রজ্বালন-ধূমায়িত তব চিতা
উদ্গারিছে রাশি রাশি রাশি
কবোষ্ণ কুজ্ঝটি!
পীত-পাণ্ডু শ্যামলতা, শীর্ণ জরাজীর্ণ যৌবন নবীন,
মৃতপ্রাণ, দগ্ধ আশা, স্তব্ধ, চূর্ণ পূর্ণতা প্রবীন,
কোন মহা আকর্ষণবলে পড়ে তব চিতা প'রে আসি
দলে দলে ছুটি,
স্পর্শ করি মৃত্যুমন্ত্রপূত চিতোত্থিত কবোষ্ণ কুজ্ঝটি!

কবে শেষ হবে এই রুদ্র আহরণ
যজ্ঞাগ্নির ইন্ধনসম্ভার—
হে মহা ঋত্বিক!
কবে তব একটি ফুৎকারে এই ঘন পুঞ্জ ভেদি
লেলিহান প্রলয়াগ্নিশিখা সহসা উঠিবে অভ্রভেদি!
দহনান্তে রবে প'ড়ে চির একাকার,—করি ভস্মসার
নিত্য নৈমিত্তিক!
কতদিনে যজ্ঞে তব দিবে পূর্ণাহুতি হে মহা ঋত্বিক!

ফুটিয়াছে হিমস্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে তোমার
অন্তর্গূঢ় যোগচেষ্টা ভরে
বিন্দু বিন্দু বারি।
এখনো কি পূর্ণ নহে কাল? শুষ্ক শীর্ষে শস্য নাহি আর;
তৃণপর্ণশূন্য বসুন্ধরা হয়েছে কঙ্কাল মাত্র সার;
ভীত সূর্য্য গুটাইয়ে কিরণের পাল চ'লে যায় দূরে
নিজ পথ ছাড়ি;
এখনো তোমার সর্ব্ব অঙ্গে ফুটে উঠে হিম ঘর্ম্মবারি!

এবার কি ভাবিয়াছ ভুলিবে না আর
বসন্তের মোহিনী মায়ায়
হে রুক্ষ সংযমী!
এবার সে নামিবে যখন স্বর্গ হ'তে সুধালস তনু,
নীলাম্বরে উত্তরী উড়ায়ে উত্তরিবে করে পুষ্প ধনু,
মৃদুমন্দ নন্দনের বায় সঙ্গে তার আসিবে ধরায়
স্বর্গ অতিক্রমি,
তখনো কি মেলিবে না আঁখি দৃঢ়ব্রত হে রুক্ষ সংযমী?

পার্শ্বে দাঁড়াইবে তব রক্তাম্বর পরি
বরমাল্য ধরি বাম করে
সুন্দরী মরণ।
সম্মুখে ভূতলে পাতি জানু ফুলধনু সন্ধানিবে শর,
তখন কি অগ্নিনেত্রে তারে ভস্ম করি দিবে যোগীবর?
পার্শ্বে আসি প্রেয়সী তোমার বলিবে না কিগো হাতে ধ'রে
করি নিবারণ
ক্ষান্ত হও যোগী! দেখ আসিয়াছি আমি সুন্দরী মরণ!

সদ্যযোগভঙ্গরক্ত বিস্মিত লোচনে
চাহিবে না তুমি সন্ধ্যাকাশে
প্রেয়সীর পানে?
কল্প কল্পান্তের সুপ্তস্মৃতি মুহূর্ত্তে কি উঠিবে না ফুটি,
নিশীথের রহস্যবাসরে ধরিয়া প্রিয়ার হাত দুটি
এবার কি যাত্রা করিবে না নিরুদ্দেশ অনন্ত প্রবাসে?
অব্যর্থ সন্ধানে
বসন্ত কি নারিবে ফিরাতে এবার তোমারে প্রিয়াপানে?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

রাজা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন যোড়শাংশিত ১২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য আট আনা। এখানি কবিবরের নূতন নাটক। কবিবরের রচনার পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। বিচিত্র রসে গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পরিপূর্ণ। এমন পুস্তক যে কোনো ভাষার গৌরব। গানগুলি কবিত্বে ভাবে নূতন ধরণের। কবির প্রতিভা যেন পুনর্যৌবন লাভ করিয়াছে। বিষয়টি আধ্যাত্মিক সুতরাং অল্প কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব। যিনি পড়িবেন তৃপ্ত হইবেন। ভবিষ্যতে আমরা ইহার বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

পত্রলেখা—শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। এণ্টিককাগজে কাস্তিক প্রেসের ছাপা। মূল্য আট আনা। এখানি ছোট ছোট কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি পত্রলেখার মতনই বিচিত্র কারুকার্য্যে মণ্ডিত; একটি পবিত্র করুণ রসধারায় অনুস্যূত। ছোট কবিতার মধ্যে সম্পূর্ণ রস ও ভাবটি জমাইয়া তুলিতে প্রিয়ম্বদা দেবীর সমকক্ষ কবি আর কাহাকেও দেখি নাই। এ গ্রন্থে তাঁহার সে কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ ও উজ্জ্বল আছে। এরূপ খাঁটি কবিত্ব-রসাস্বাদ কদাচিৎ ভাগ্যে ঘটে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত। প্রকাশক শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য। ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দ নব্য বঙ্গের প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক ও সাধক মহাপুরুষ। শাস্ত্রী মহাশয় সেই দুই মহাত্মার সংসর্গে নিজের ধর্ম্মজীবন সংগঠন করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে সাধন করিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতায় ঐ দুই মহাত্মার অসাধারণ জীবনের যে আভাস আছে তাহা হৃদয় মনের রসায়ন, তাহার উপর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী ও ওজস্বিতা যেন সম্ভাবগুলিকে পাঠকের মনের মধ্যে তপ্ত স্বর্ণের মতো ঢালিয়া দেয়। ইহা পাঠ করিলে বর্ত্তমান যুগ ও প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা বুঝিবার যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম এ, প্রণীত। ৬ কলেজ-স্কোয়ার, কলিকাতা, সামাপ্রেস, হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা। এ গ্রন্থেও রাজর্ষি রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নবযুগের এই ত্রিশক্তি, এই মহাপ্রয়াগের বর্ণনা পরম শ্রদ্ধা ভক্তি ও দার্শনিক পর্য্যবেক্ষণের সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা কিছু আড়ম্বর-বহুল। বিশ্বোদার যুক্তিসাপেক্ষ ধর্ম্ম কি এবং কেমন করিয়া তাহা সাধন করিতে হয়, কেমন করিয়া সকল সংস্কার ও গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবের সহিত এক পরিবারভুক্ত হইতে পারা যায় তাহা এই গ্রন্থের অল্প পরিসরের মধ্যে পরিব্যক্ত হইয়াছে। ঐ তিন মহাত্মা যেন মূর্ত্তিমান জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম; তাঁহাদের জীবনের সমন্বয় ঐ তিন ভাবেরই সমন্বয়। এই গ্রন্থ যিনি পাঠ করিবেন তিনিই উপকৃত হইবেন।

আশ্রম চতুষ্টয়—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার হিন্দু আশ্রম চতুষ্টয়ের উদ্দেশ্য ও পালনবিধি যুক্তিমূলকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রকেই ভিত্তি করিয়া চলিয়াছেন।—ইহাতে প্রাচীনের সহিত আধুনিক কালের যুক্তির সমন্বয় করিতে গিয়া স্থানে স্থানে গ্রন্থকারকে গোঁজামিল দিতে হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে গ্রন্থকার বেশ যুক্তিমার্গাবলম্বী (rational) ও উদার মতের লোক, কিন্তু তিনি এখনো প্রাচীনের মায়া কাটাইতে পারেন নাই; তিনি হিন্দুর সমস্ত আচার অনুষ্ঠানকেই যুক্তিমূলক করার আকার 'rational light' দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই এ পুস্তকের বিশেষত্ব। চোখ বুজিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই মানিয়া যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা এ গ্রন্থে অনেক শিখিবার বিষয় পাইবেন। এ গ্রন্থ এই জন্যই প্রত্যেক হিন্দুর পাঠ করা উচিত। ইহা পাঠে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব জাগিবে, তর্ক জাগিবে, বিচার করিয়া বুঝিবার ইচ্ছা হইবে কেন কোন কাজ তেমন করিয়া না করিয়া এমন করিয়া করিতেছি। ধর্ম্মসাধনে এই সন্দেহ, এই বুদ্ধিমূলক বিচার, এই আপনার বুদ্ধিতে বুঝিয়া বুঝিয়া অগ্রসর হওয়া প্রধান ও প্রথম সোপান; ইহা ত্যাগ করিয়া যাহারা ধর্ম্মসাধন করিতে চায় তাহারা জড়ধর্ম্মী, তাহাদের অগ্রসর হইবার আশা নাই।

পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ, প্রণীত। সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা পরিষদে পঠিত প্রবন্ধের পুস্তিকাকার। মূল্য চার আনা। এই গ্রন্থে লেখক চন্দ্রনাথ বাবুর সাহিত্যকীর্ত্তি সম্বন্ধে খুব শ্রদ্ধা অথচ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সহিত সর্ব্বত্র একমত হইতে পারি নাই। কিন্তু তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কুন্তলীন পকেট ডায়েরী—কুন্তলীন আপিস হইতে সুদৃশ্য বাঁধা একটি সুন্দর পেন্সিল সুদ্ধ পরিষ্কার ছাপা ডায়ারি বিনামূল্যে তাঁহাদের খরিদদার ও ভদ্রসাধারণকে বিতরণ করিতেছেন। ডায়ারিখানি পকেট-বুক, পাঁজি ও সংক্ষিপ্ত দিনলিপির কাজে লাগিতে পারিবে।

মুদ্রা রাক্ষস।

প্রথম প্রবন্ধের ভ্রমসংশোধন

৪০১ পৃ,	১ স্তম্ভ,	ফুটনোট,	২৮ এ স্থলে	২৫ এ হইবে	
৪০২ „	১ „	৯ পংক্তি	তাঁহাকে „	তাঁহাদেক „	
৪০৪ „	১ „	২৩ „	ফারসীতে „	আরবীতে „	
„ „	২ „	১ „	করিল „	করিয়াছিল „	
৪০৫ „	১ „	২ „	তাঁহাদেক „	তাহাদেক „	
৪০৬ „	২ „	১৩ „	মোকাম „	মকান্ „	
৪০৭ „	২ „	১৫ „	উর্দ্দ „	উর্দ্দু „	
৪০৯ „	১ „	৬ „	করৌবাড়ী „	গৌহাটী „	
„ „	২ „	১৪ „	বাঙ্গলা বা ইংরাজি স্থলে সংস্কৃত বা ইংরাজি হইবে।		
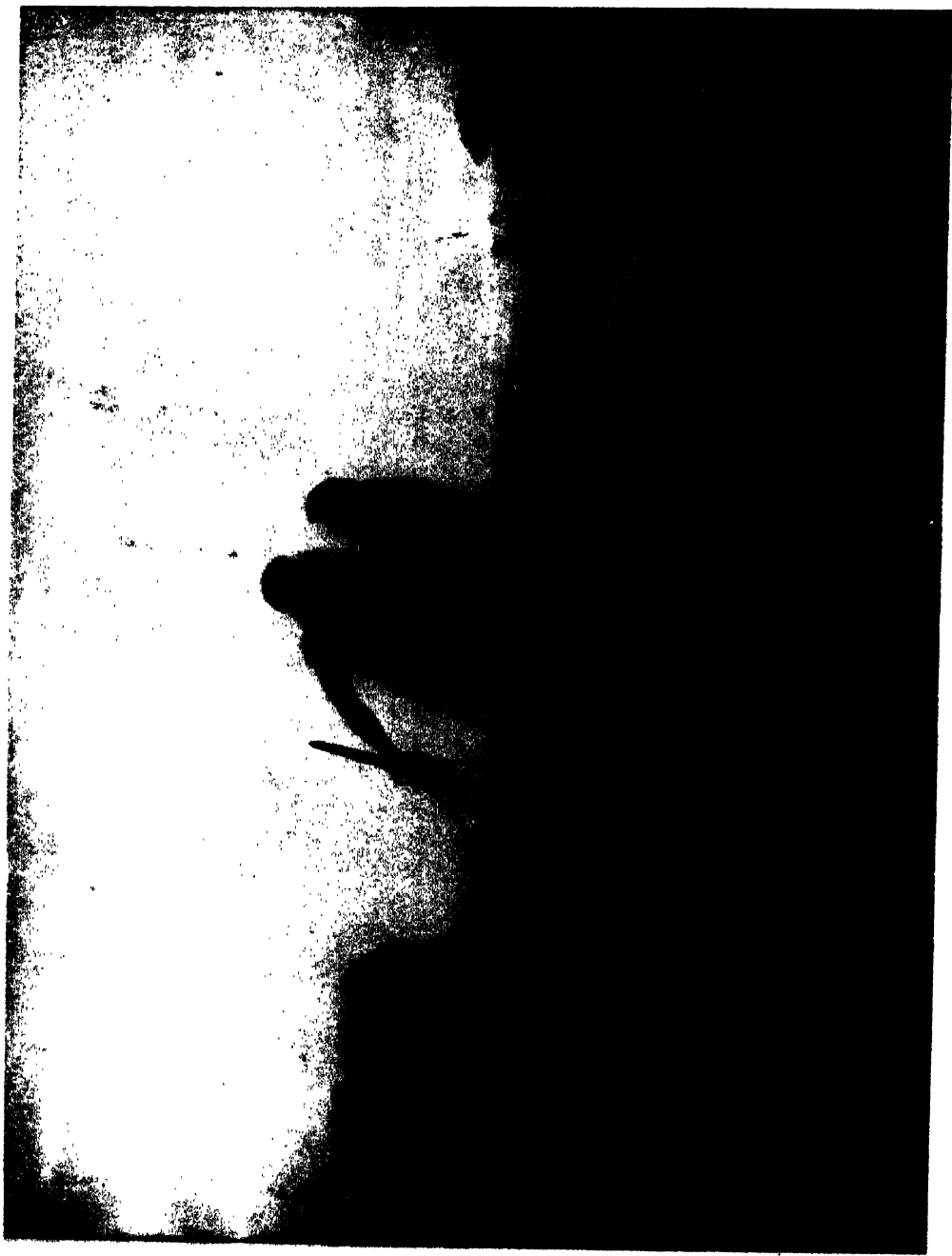
৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দিন-মজুরী।

শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত তৈলচিত্র হইতে।

ছবির স্বত্বাধিকারী বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অনুমতি [illegible]

" সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।"

" নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

১০ম ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩১৭

৫ম সংখ্যা

আত্মবোধ*

কয়েকদিন হল পল্লীগ্রামে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম তোমাদের ধর্ম্মের বিশেষত্বটি কি আমাকে বল্‌তে পার? একজন বল্লে, বলা বড় কঠিন, ঠিক বলা যায় না। আর একজন বল্লে, "বলা যায় বৈ কি—কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জান্‌তে হয়। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমাদের এই ধর্ম্মের কথা পৃথিবীর লোককে সবাইকে শোনাও না কেন?" সে বল্লে, "যার পিপাসা হবে, সে গঙ্গার কাছে আপনি আস্‌বে।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তাই কি দেখ্‌তে পাচ্চ? কেউ কি আস্‌চে?" সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বল্লে "সবাই আস্‌বে! সবাইকে আস্‌তে হবে!"

আমি এই কথা ভাব্‌লুম, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের শাস্ত্রশিক্ষাহীন এই বাউল, এ ত মিথ্যা বলে নি। আস্‌চে, সমস্ত মানুষই আস্‌চে! কেউ ত স্থির হয়ে নেই। আপনার পরিপূর্ণতার অভিমুখেই ত সবাইকে চল্‌তে হচ্চে, আর যাবে কোথায়? আমরা প্রসন্নমনে হাস্‌তে পারি—পৃথিবী জুড়ে সবাই যাত্রা করেছে। আমরা কি মনে করচি সবাই কেবল নিজের উদর পূরণের অন্ন খুঁজ্‌চে, নিজের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের চারদিকেই প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করে জীবন কাটিয়ে দিচ্চে? না, তা নয়। এই মুহূর্ত্তেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অন্নের জন্যে বস্ত্রের জন্যে, নিজের ছোট বড় কতশত দৈনিক আবশ্যকের জন্যে ছুটে বেড়াচ্চে—কিন্তু কেবল তার সেই আহ্নিক গতিতে নিজেকে প্রদক্ষিণ করা নয়—সেই সঙ্গে সঙ্গেই সে জেনে এবং না জেনে একটি প্রকাণ্ড কক্ষে মহাকাশে আর একটি কেন্দ্রের চারদিকে যাত্রা করে চলেছে · যে কেন্দ্রের সঙ্গে সে জ্যোতির্ম্ময় নাড়ির আকর্ষণে বিধৃত হয়ে রয়েছে, যেখান থেকে সে আলোক পাচ্চে, প্রাণ পাচ্চে, যার সঙ্গে একটি অদৃশ্য অথচ অবিচ্ছেদ্য সূত্রে তার চিরদিনের মহাযোগ রয়েছে।

মানুষ অন্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়েছে। কি সেই প্রয়োজন? তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি তার উত্তর দিয়েছেন, এবং বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে বাউলও তার উত্তর দিচ্চে। মানুষ আপনাকে পাবার জন্যে বেরিয়েছে—আপনাকে না পেলে, তার আপনার চেয়ে যিনি বড় আপন, তাঁকে পাবার জো নেই। তাই এই আপনাকেই বিশুদ্ধ করে, প্রবল করে, পরিপূর্ণ করে পাবার জন্যে মানুষ কত তপস্যা করচে! শিশুকাল থেকেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে শিক্ষিত ও সংযত করচে, এক একটি বড় বড় লক্ষ্যের চারদিকে সে আপনার ছোট ছোট সমস্ত বাসনাকে নিয়মিত করবার চেষ্টা করচে,

* ১১ই মাঘ বুধবার, উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যাকালে পঠিত।

এমন সকল আচার অনুষ্ঠানের সে সৃষ্টি করচে যাতে তাকে অহরহ স্মরণ করিয়ে দিচ্চে যে, দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে তার সমাপ্তি নেই, সমাজ ব্যবহারের মধ্যেও তার অবসান নেই। সে এমন একটি বৃহৎ আপনাকে চাচ্চে যে আপনি তার বর্ত্তমানকে, তার চারদিককে, তার প্রবৃত্তি ও বাসনাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

আমাদের বৈরাগী বাংলাদেশের একটি ছোট নদীর ধারে এক সামান্য কুটীরে বসে এই আপনির খোঁজ করচে, এবং নিশ্চিন্ত হাস্যে বল্‌চে, সবাইকেই আস্‌তে হবে এই আপনির খোঁজ করতে। কেন না, এ ত কোনো বিশেষ মতের, বিশেষ সম্প্রদায়ের ডাক নয়, সমস্ত মানবের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য আছে, এ যে তাঁরি ডাক। কলরবের ত অন্ত নেই—কত কল কারখানা, কত যুদ্ধ বিগ্রহ, কত বাণিজ্য ব্যবসায়ের কোলাহল আকাশকে মথিত করচে কিন্তু মানুষের ভিতর থেকে সেই সত্যের ডাককে কিছুতেই আচ্ছন্ন করতে পারচে না; মানুষের সমস্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্ত অর্জ্জন বর্জ্জনের মাঝখানে সে রয়েছে; কত ভাষায় সে কথা কইচে, কত কালে কত দেশে কতরূপে কত ভাবে সমস্ত আশু প্রয়োজনের উপর সে জাগ্রত হয়ে আছে। কত তর্ক তাকে আঘাত করচে, কত সংশয় তাকে অস্বীকার করচে, কত বিকৃতি তাকে আক্রমণ করচে, কিন্তু সে বেঁচেই আছে —সে কেবলি বল্‌চে, তোমার আপ্‌নিকে পাও, আত্মানং বিদ্ধি।

এই আপ্‌নিকে মানুষ সহজে আপন করে তুল্‌তে পারচেনা, সেই জন্যে মানুষ সূত্রচ্ছিন্ন মালার মত কেবলি খসে যাচ্চে, ধূলোয় ছড়িয়ে পড়চে। কিন্তু যে বিশ্বজগতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করচে সেই জগৎ ত মুহুর্মুহু এমন করে খসে পড়চে না, ছড়িয়ে পড়চে না।

অথচ এই জগৎটিত সহজ জিনিষ নয়। এর মধ্যে যে সকল বিরাট শক্তি কাজ করচে তাদের নিতান্ত নিরীহ বলা যায় না। আমাদের এতটুকু একটুখানি রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় যখন সামান্য একটা টেবিলের উপর দু'চার কণা গ্যাসকে অল্প একটু বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে তাদের লীলা দেখ্‌তে যাই তখন শঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়, তাদের গলাগলি জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি মারামারি যে কি অদ্ভুত এবং কি প্রচণ্ড তা দেখে বিস্মিত হই। বিশ্ব জুড়ে, আবিষ্কৃত এবং অনাবিষ্কৃত, এমন কত শত বাষ্প পদার্থ তাদের কত বিচিত্র প্রকৃতি নিয়ে কি কাণ্ড বাধিয়ে বেড়াচ্চে তা আমরা কল্পনা করতেও পারিনে। তার উপরে জগতের মূল শক্তিগুলিও পরস্পরের বিরুদ্ধ, আকর্ষণের উল্টো শক্তি বিকর্ষণ, কেন্দ্রানুগের উল্টো শক্তি কেন্দ্রাতিগ। এই সমস্ত বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের প্রকাণ্ড লীলাভূমি এই যে জগৎ, এখানকার আলোতে আমরা অনায়াসে চোখ মেলচি, এখানকার বাতাসে অনায়াসে নিশ্বাস নিচ্চি, এর জলে স্থলে অনায়াসে সঞ্চরণ করচি। যেমন আমাদের শরীরের ভিতরটাতে কত রকমের কত কি কাজ চল্‌চে তার ঠিকানা নেই কিন্তু আমরা সমস্তটাকে জড়িয়ে একটি অখণ্ড স্বাস্থ্যের মধ্যে এক করে জানচি—দেহটাকে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, পাকযন্ত্র প্রভৃতির জোড়াতাড়া ব্যাপার বলে জানচিনে।

জগতের রহস্যাগারের মধ্যে শক্তির ঘাত প্রতিঘাত যেমনি জটিল ও ভয়ঙ্কর হোক্‌না কেন, আমাদের কাছে তা নিতান্তই সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ জগৎটা আসলে যে কি তা যখন সন্ধান করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করি তখন কোথাও আর তল পাওয়া যায় না। সকলেই জানেন বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে এক সময় বিজ্ঞান ঠিক করে রেখেছিল যে পরমাণুর পিছনে আর যাবার জো নেই—সেই সকল সূক্ষ্মতম মূল বস্তুর যোগবিয়োগেই জগৎ তৈরি হচ্চে। কিন্তু বিজ্ঞানের সেই মূলবস্তুর দুর্গও আজ আর টেঁকে না। আদিকারণের মহাসমুদ্রের দিকে বিজ্ঞান যতই এক এক পা এগোচ্চে ততই বস্তুত্বের কূলকিনারা কোন্ দিগন্তরালে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্চে,—সমস্ত বৈচিত্র্য সমস্ত আকার আয়তন একটা বিরাট শক্তির মধ্যে একেবারে সীমা হারিয়ে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত হয়ে উঠ্‌চে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যা একদিকে আমাদের ধারণার একেবারেই অতীত তাই আর একদিকে নিতান্ত সহজেই আমাদের ধারণাগম্য হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। সেই হচ্চে আমাদের এই জগৎ। এই জগতে শক্তিকে শক্তিরূপে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের জান্‌তে

হচ্চে না—আমরা তাকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চি,—জল স্থল তরু লতা পশু পক্ষী। জল মানে বাষ্পবিশেষের যোগবিয়োগ বা শক্তিবিশেষের ক্রিয়ামাত্র নয়—জল মানে আমারই একটি আপন সামগ্রী; সে আমার চোখের জিনিষ, স্পর্শের জিনিষ; সে আমার স্নানের জিনিষ, পানের জিনিষ; সে বিবিধ প্রকারেই আমার আপন। বিশ্বজগৎ বল্‌তেও তাই;—স্বরূপত তার একটি বালুকণাও যে কি তা আমরা ধারণা করতে পারিনে—কিন্তু সম্বন্ধত সে বিচিত্রভাবে বিশেষভাবে আমার আপন।

যাকে ধরা যায় না সে আপনিই আমার আপন হয়ে ধরা দিয়েছে। এতই আপন হয়ে ধরা দিয়েছে, যে, দুর্ব্বল উলঙ্গ শিশু এই অচিন্ত্য শক্তিকে নিশ্চিন্ত মনে আপনার ধুলোখেলার ঘরের মত ব্যবহার করচে, কোথাও কিছু বাধ্‌চে না।

জড়-জগতে যেমন, মানুষেও তেমনি। প্রাণশক্তি যে কি তা কেমন করে বল্‌ব! পর্দ্দার উপর পর্দ্দা যতই তুলব ততই অচিন্ত্য অনন্ত অনির্ব্বচনীয়ে গিয়ে পড়ব! সেই প্রাণ এক দিকে যত বড় প্রকাণ্ড রহস্যই হোক্ না কেন, আর এক দিকে তাকে আমরা কি সহজেই বহন করচি—সে আমার আপন প্রাণ। পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়কে ব্যাপ্ত করে প্রাণের ধারা এই মুহূর্ত্তে অগণ্য জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্চে, নূতন নূতন শাখা প্রশাখায় ক্রমাগতই দুর্ভেদ্য নির্জ্জনতাকে সজন করে তুল্‌চে—এই প্রাণের প্রবাহের উপর লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহের তরঙ্গ কতকাল ধরে অহোরাত্র অন্ধকার থেকে সূর্য্যালোকে উঠ্‌চে এবং সূর্য্যালোক থেকে অন্ধকারে নেবে পড়চে! এ কি তেজ, কি বেগ, কি নিশ্বাস মানুষের মধ্যে আপনাকে উচ্ছ্বসিত, আন্দোলিত, নব নব বৈচিত্র্যে বিস্তীর্ণ করে দিচ্চে! যেখানে অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে তার রহস্য চিরকাল প্রচ্ছন্ন হয়ে রক্ষিত, সেখানে আমাদের প্রবেশ নেই,—আবার যেখানে দেশকালের মধ্যে তার প্রকাশ নিরন্তর গর্জ্জিত উন্মথিত হয়ে উঠ্‌চে সেখানেও সে কেবল লেশমাত্র আমাদের গোচরে আছে, সমস্তটাকে একসঙ্গে আমরা দেখ্‌তে পাচ্চিনে। কিন্তু এখানেই সে আছে, এখনি সে আছে, আমার হয়ে আছে; তার সমস্ত অতীতকে আকর্ষণ করে', তার সমস্ত ভবিষ্যৎকে বহন করে' সে আছে; সেই অদৃশ্য অথচ দৃশ্য, সেই এক অথচ বহু, সেই বদ্ধ অথচ মুক্ত, সেই বিরাট্ মানবপ্রাণ তার পৃথিবী-জোড়া ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিশ্বাস প্রশ্বাস, শীত গ্রীষ্ম, হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন, শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোতের জোয়ার ভাঁটা নিয়ে দেশে দেশান্তরে বংশে বংশান্তরে বিরাজ করচে। এই অনির্ব্বচনীয় প্রাণশক্তি তার অপরিসীম রহস্য নিয়েও সদ্যোজাত শিশুর মধ্যেও আপন হ'য়ে ধরা দিতে কুণ্ঠিত হয়নি।

তাই বল্‌ছিলুম, অসংখ্য বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে মহাশক্তির যে অনির্ব্বচনীয় ক্রিয়া চল্‌চে তাই আমাদের কাছে জগৎরূপে প্রাণরূপে নিতান্ত সহজ হয়ে আপন হয়ে ধরা দিয়েছে, তাই আমরা কেবল যে তাদের ব্যবহার করচি তা নয়, তাদের ভালবাস্‌চি, তাদের কোনো মতেই ছাড়তে চাইনে। তারা আমার এতই আপন যে তাদের যদি বাদ দিতে যাই তবে আমার আমিত্ব একেবারে বস্তুশূন্য হয়ে পড়ে।

জগৎ সম্বন্ধে ত এই রকম সমস্ত সহজ, কিন্তু যেখানে মানুষ আপ্‌নি, সেখানে সে এমন সহজে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তুল্‌তে পারচে না। মানুষ আপনাকে এমন অখণ্ডভাবে সমগ্র করে' আপন করে লাভ করচে না। যাকে মাঝখানে নিয়ে সবাই মানুষের এত আপন, তাকেই আপন করে তোলা মানুষের পক্ষে কি কঠিন হয়েছে।

অন্তরে বাহিরে মানুষ নানাখানা নিয়ে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত; তারি মাঝখানে সে আপনাকে ধরতে পারচে না—চারিদিকে সে কেবল টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছিটকে পড়চে। কিন্তু আপনাকেই তার সব চেয়ে দরকার—তার যত কিছু দুঃখ তার গোড়াতেই এই আপনাকে না পাওয়া। যতক্ষণ এই আপনাকে পরিপূর্ণ করে না পাওয়া যায় ততক্ষণ কেবলি মনে হয় এটা পাইনি, ওটা পাইনি, ততক্ষণ যা কিছু পাই তাতে তৃপ্তি হয় না। কেন না, যতক্ষণ আমরা আপনাকে না পাই ততক্ষণ নিত্যভাবে আমরা কোনো জিনিষকেই পাইনে; এমন কোনো আধার থাকে না, যার মধ্যে কোনো কিছুকে স্থিরভাবে ধরে রাখ্‌তে পারি। তখন আমরা বলি সবই মায়া—সবই

ছায়ার মত চলে যাচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আত্মাকে যখনি পাই, নিজের মধ্যে ধ্রুব এককে যখনি নিশ্চিত করে ধরতে পারি তখনি সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করে চারিদিকের সমস্ত বিধৃত হয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠে। আপনাকে যখন পাইনি তখন যা কিছু অসত্য ছিল, আপনাকে পাবামাত্রই সেই সমস্তই সত্য হয়ে ওঠে। আমার বাসনার কাছে প্রবৃত্তির কাছে যারা মরীচিকার মত ধরা দিচ্ছে অথচ দিচ্ছে না, কেবলি এড়িয়ে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে, তারাই আমার আত্মাকে সত্যভাবে বেষ্টন করে আত্মারই আপন হয়ে ওঠে; এই জন্যে যে লোক আত্মাকে পেয়েছে, জলে স্থলে আকাশে তার আনন্দ, সকল অবস্থার মধ্যেই তার আনন্দ; কেননা, সে আপনার অমর সত্যের মধ্যে সমস্তকেই অমর সত্যরূপে পেয়েছে। সে কিছুকেই ছায়া বলে না, মায়া বলে না, কারণ জগতের সমস্ত পদার্থেরই সত্য ধরা দিয়েছে। সে নিজে সত্য হয়েছে, এই জন্য তার কাছে কোন সত্যই বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন স্খলিত নয়। এমনি করে আপনাকে পাওয়ার মধ্যে সমস্তকে পাওয়া, আপনার সত্যের দ্বারা সকল সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সমগ্র হয়ে ওঠা, নিজেকে কেবল কতকগুলো বাসনা এবং কতকগুলো অনুভূতির স্তূপরূপে না জানা, নিজেকে কেবল বিচ্ছিন্ন কতকগুলো বিষয়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে না বেড়ানো এই হচ্ছে আত্মবোধের, আত্মোপলব্ধির লক্ষণ।

পৃথিবী একদিন বাষ্প ছিল, তখন তার পরমাণুগুলো আপনার তাপের বেগে বিশ্লিষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন পৃথিবী আপনার আকার পায়নি, প্রাণ পায়নি, তখন পৃথিবী কিছুকেই জন্ম দিতে পারত না, কিছুকেই ধরে রাখ্‌তে পারত না—তখন তার সৌন্দর্য্য ছিল না, সার্থকতা ছিল না, কেবল ছিল তাপ আর বেগ। যখন সে সংহত হয়ে এক হল তখনি জগতের গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সেও একটি বিশেষ স্থান লাভ করে বিশ্বের মণিমালায় নূতন একটি মরকত মাণিক গেঁথে দিলে। আমাদের চিত্তও সেইরকম প্রবৃত্তির তাপে ও বেগে চারিদিকে কেবল যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন যথার্থভাবে কিছুই পাইনে কিছুই দিইনে; যখনি সমস্তকে সংহত সংযত করে এক করে আত্মাকে পাই, যখনি আমি সত্য যে কি তা জানি, তখনি আমার সমস্ত বিচ্ছিন্ন জানা একটি প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাসনা একটি প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জীবনের ছোট বড় সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়—তখন আমার সকল চিন্তা ও সকল কর্ম্মের মধ্যেই একটি আত্মানন্দের অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকে —তখনি আমি আধ্যাত্মিক ধ্রুবলোকে আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ নির্ভয় হই। তখন আমার সেই ভ্রম ঘুচে যায় যে আমি সংসারের অনিশ্চয়তার মধ্যে মৃত্যুর আবর্ত্তের মধ্যে ভ্রাম্যমান, তখন আত্মা অতি সহজেই জানে যে সে পরমাত্মার মধ্যে চিরসত্যে বিধৃত হয়ে আছে।

এই আমার সকলের চেয়ে সত্য আপনাটিকে নিজের ইচ্ছার জোরে আমাকে পেতে হবে—অসংখ্যের ভিড় ঠেলে টানাটানি কাটিয়ে এই আমার অত্যন্ত সহজ সমগ্রতাকে সহজ করে নিতে হবে। আমার ভিতরকার এই অখণ্ড সামঞ্জস্যটি কেবল জগতের নিয়মের দ্বারা ঘটবে না, আমার ইচ্ছার দ্বারা ঘটে উঠ্‌বে।

এই জন্যে মানুষের সামঞ্জস্য বিশ্বজগতের সামঞ্জস্যের মত সহজ নয়। মানুষের চেতনা আছে, বেদনা আছে বলেই নিজের ভিতরকার সমস্ত বিরুদ্ধতাকে সে একেবারে গোড়া থেকেই অনুভব করে—বেদনার পীড়ায় সেইগুলোই তার কাছে অত্যন্ত বড় হয়ে ওঠে—নিজের ভিতরকার এই সমস্ত বিরুদ্ধতার দুঃখ তার পক্ষে এত একান্ত যে, এতেই তার চিত্ত প্রতিহত হয়—কোনো একটি বৃহৎ সত্যের মধ্যে তার এইসকল বিরুদ্ধতার বৃহৎ সমাধান আছে, সমস্ত দুঃখবেদনার একটি আনন্দ-পরিণাম আছে এটা সে সহজে দেখ্‌তে পায় না। আমরা একেবারে গোড়া থেকেই দেখ্‌তে পাচ্চি যাতে আমার সুখ তাতেই আমার মঙ্গল নয়, যাকে আমি মঙ্গল বলে জান্‌চি চারদিক থেকে তায় বাধা পাচ্চি; আমার শরীর যা দাবি করে আমার মনের দাবি সকল সময় তার সঙ্গে মেলে না, আমি একলা যা দাবি করি আমার সমাজের দাবির সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে, আমার বর্ত্তমানের দাবি আমার ভবিষ্যতের দাবিকে

অস্বীকার করতে চায়। অন্তরে বাহিরে এই সমস্ত দুঃসহ বাধাবিরোধ ছিন্নবিচ্ছিন্নতা নিয়ে মানুষকে চল্‌তে হচ্চে;—অন্তরে বাহিরে এই ঘোরতর অসামঞ্জস্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতেই মানুষ আপনার অন্তরতম ঐক্যশক্তিকে প্রাণপণে প্রার্থনা করচে;—যাতে তার এই সমস্ত বিক্ষিপ্ততাকে মিলিয়ে এক করে দেবে সহজ করে দেবে তার প্রতি সে আপনার বিশ্বাসকে ও লক্ষ্যকে কেবলি স্থির রাখবার চেষ্টা করচে। মানুষ আপনার অন্তর বাহিরের এই প্রভূত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে বৃহৎ ঐক্যসাধনের চেষ্টা প্রতিদিনই করচে,—সেই চেষ্টাই তার জ্ঞান-বিজ্ঞান সমাজ-সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, সেই চেষ্টাই তার ধর্ম্মকর্ম্ম পূজা-অর্চ্চনা—সেই চেষ্টাই কেবল মানুষকে তার নিজের স্বভাব নিজের সত্য জানিয়ে দিচ্চে—সেই চেষ্টা খানিকটা সফল হচ্চে খানিকটা নিষ্ফল হচ্চে, বার বার ভাংচে বারবার গড়চে,—কিন্তু বারম্বার এই সমস্ত ভাঙাগড়ার মধ্যে মানুষ আপনার এই স্বাভাবিক ঐক্যচেষ্টার দ্বারাতেই আপনার ভিতরকার সেই একক্রে ক্রমশ সুস্পষ্ট করে দেখ্‌চে— এবং সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপারেও সেই মহৎ এক তার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠ্‌চে,—সেই এক যতই স্পষ্ট হচ্চে ততই মানুষ স্বভাবতই জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ম্মে ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে ভূমাকে আশ্রয় করচে।

তাই বল্‌ছিলুম, ঘুরে ফিরে মানুষ যা কিছু করচে—কখনো বা ভুল করে' কখনো বা ভুল ভেঙে—সমস্তর মূলে আছে এই আত্মবোধের সাধনা। সে যাকেই চাক্ না সত্য করে চাচ্চে এই আপ্‌নাকে, জেনে চাচ্চে, না জেনে চাচ্চে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তকে বিরাট ভাবে একটি জায়গায় মিলিয়ে জড়িয়ে নিয়ে মানুষ আত্মার একটি অখণ্ড উপলব্ধিকে পেতে চাচ্চে। সে এক রকম করে বুঝতে পারচে কোনোখানেই বিরোধ সত্য নয়, বিচ্ছিন্নতা সত্য নয়, নিরন্তর অবিরোধের মধ্যে মিলে উঠে একটি বিশ্বসঙ্গীতকে প্রকাশ করবার জন্যেই বিরোধের সার্থকতা—সেই সঙ্গীতেই পরিপূর্ণ আনন্দ। নিজের ইতিহাসে মানুষ সেই তানটাকেই কেবল সাধ্‌চে, সুরের যতই স্খলন হোক্ তবু কিছুতেই নিরস্ত হচ্চে না। উপনিষদের বাণীর দ্বারা সে কেবলি বল্‌চে "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্' সেই একক্রে জান, সেই আত্মাকে। অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ইহাই অমৃতের সেতু।

আপনার মধ্যে এই একক্রে পেয়ে মানুষ যখন ধীর হয়, যখন তার প্রবৃত্তি শান্ত হয় সংযত হয় তখন তার বুঝতে বাকি থাকে না এই তার এক কাকে খুঁজ্‌চে। তার প্রবৃত্তি খুঁজে মরে নানা বিষয়কে—কেন না নানা বিষয়কে নিয়েই সে বাঁচে, নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই তার সার্থকতা। কিন্তু যেটি হচ্চে মানুষের এক, মানুষের আপনি—সে স্বভাবতই একটি অসীম একক্রে, একটি অসীম আপ্‌নিকে খুঁজ্‌চে—আপনার ঐক্যের মধ্যে অসীম ঐক্যকে অনুভব করলে তবেই তার সুখের স্পৃহা শান্তি লাভ করে। তাই উপনিষদ বলেন—"একং রূপং বহুধা যঃ করোতি" যিনি একরূপকে বিশ্বজগতে বহুধা করে প্রকাশ করচেন "তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ" তাঁকে যে ধীরেরা আত্মস্থ করে দেখেন, অর্থাৎ যাঁরা তাঁকে আপনার একের মধ্যে এক করে দেখেন, "তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং" তাঁদেরই সুখ নিত্য, আর কারো না।

আত্মার সঙ্গে এই পরমাত্মাকে দেখা, এ অত্যন্ত একটি সহজ দৃষ্টি, এ একেবারেই যুক্তি তর্কের দৃষ্টি নয়। এ হচ্চে "দিবীব চক্ষুরাততং"—চক্ষু যেমন একেবারে সহজেই আকাশে বিস্তীর্ণ পদার্থকে দেখ্‌তে পায় এ সেই রকম দেখা। আমাদের চক্ষুর স্বভাবই হচ্চে সে কোনো জিনিষকে ভেঙে ভেঙে দেখে না, একেবারে সমগ্র করে দেখে। সে স্পেক্‌ট্রস্কোপ যন্ত্র দিয়ে দেখার মত করে দেখে না—সে আপনার মধ্যে সমস্তকে বেঁধে নিয়ে আপন করে দেখ্‌তে জানে। আমাদের আত্মবোধের দৃষ্টি যখন খুলে যায় তখন সেও তেমনি অত্যন্ত সহজেই আপনাকে এক করে এবং পরম একের সঙ্গে আনন্দে সম্মিলিত করে দেখ্‌তে পায়। সেই রকম করে সমগ্র করে দেখাই তার সহজ ধর্ম্ম। তিনি যে পরম আত্মা, আমাদের পরম আপনি। সেই পরম আপনিকে যদি আপন করেই না জানা যায়, তা হলে আর যেমন করেই জানা যাক্ তাঁকে জানাই হল না। জ্ঞানে জানাকে আপন করে জানা বলে না, ঠিক উল্টো—জ্ঞান সহজেই তফাৎ করে জানে—আপন করে জানবার শক্তি তার হাতে নেই।

উপনিষৎ বল্‌চেন- "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা,"—এই দেবতা বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বের অসংখ্য কর্ম্মে আপনাকে অসংখ্য আকারে ব্যক্ত করচেন—কিন্তু তিনিই "মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" মহান্ আপনরূপে পরম একরূপে সর্ব্বদাই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। "হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌ল্‌প্তো য এতৎ"—সেই হৃদয়ের যে জ্ঞান—যে জ্ঞান একেবারে সংশয়রহিত অব্যবহিত জ্ঞান সেই জ্ঞানে যাঁরা এঁকে পেয়ে থাকেন "অমৃতাস্তে ভবন্তি" তাঁরাই অমৃত হন।

আমাদের চোখ যেমন একেবারে দেখে আমাদের হৃদয় তেমনি স্বভাবত একেবারে অনুভব করে,—মধুরকে তার মিষ্ট লাগে, রুদ্রকে তার ভীষণ বোধ হয়, সেই বোধের জন্যে তাকে কিছুই চিন্তা করতে হয় না। সেই আমাদের হৃদয় যখন তার স্বাভাবিক সংশয়রহিত বোধশক্তির দ্বারাই পরম একেকে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করে তখন মানুষ চিরকালের জন্যে বেঁচে যায়। জোড়া দিয়ে দিয়ে অনন্তকালেও আমরা একেকে পেতে পারিনে, হৃদয়ের সহজ বোধে এক মুহূর্ত্তেই তাঁকে একান্ত আপন করে পাওয়া যায়। তাই উপনিষৎ বলেছেন তিনি আমাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, তাই একেবারেই রসরূপে আনন্দরূপে তাঁকে অব্যবহিত করে পাই, আর কিছুতে পাবার জো নেই—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

বাক্যমন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দকে হৃদয় যখন বোধ করে তখন আর কিছুতেই ভয় থাকে না।

এই সহজ বোধটি হচ্ছে প্রকাশ—এ জানা নয়, সংগ্রহ করা নয়, জোড়া দেওয়া নয়—আলো যেমন একেবারে প্রকাশ হয় এ তেম্‌নি প্রকাশ। প্রভাত যখন হয়েছে তখন আলোর খোঁজে হাটে বাজারে ছুট্‌তে হবে না, জ্ঞানীর দ্বারে ঘা মারতে হবে না—যা কিছু বাধা আছে সেইগুলো কেবল মোচন করতে হবে—দরজা খুলে দিতে হবে, তাহলেই আলো একেবারে অখণ্ড হয়ে প্রকাশ পাবে।

সেই জন্যেই এই প্রার্থনাই মানুষের গভীরতম প্রার্থনা—আবিরাবীর্ম্মএধি—হে আবিঃ হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও! মানুষের যা দুঃখ, সে অপ্রকাশের দুঃখ—যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি এখনো তার মধ্যে ব্যক্ত হচ্চেন না; তার হৃদয়ের উপর অনেকগুলো আবরণ রয়ে গেছে; এখনো তার মধ্যে বাধা বিরোধের সীমা নেই; এখনো সে আপনার প্রকৃতির নানা অংশের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারচে না, এখনো তার একভাগ অন্য ভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করচে, তার স্বার্থের সঙ্গে পরমার্থের মিল হচ্চে না, এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যিনি আবিঃ তাঁর আবির্ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌চেনা; ভয় দুঃখ শোক অবসাদ অকৃতার্থতা এসে পড়চে, যা গিয়েছে তার জন্যে বেদনা, যা আসবে তার জন্য ভাবনা চিত্তকে মথিত করচে, আপনার অন্তর বাহির সমস্তকে নিয়ে জীবন প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌চে না; এই জন্যেই মানুষের প্রার্থনা,—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে নিয়ত রক্ষা কর। যেখানে সেই আবিঃর আবির্ভাব সম্পূর্ণ নয় সেখানে প্রসন্নতা নেই; যে দেশে সেই আবিঃর আবির্ভাব বাধাগ্রস্ত সেই দেশ থেকে প্রসন্নতা চলে গেছে. যে গৃহে তাঁর আবির্ভাব প্রতিহত সেখানে ধন ধান্য থাকলেও শ্রী নেই, যে চিত্তে তাঁর প্রকাশ সমাচ্ছন্ন সে চিত্ত দীপ্তিহীন প্রতিষ্ঠাহীন, সে কেবল স্রোতের শৈবালের মত ভেসে বেড়াচ্চে। এই জন্যে যে কোনো প্রার্থনা নিয়েই মানুষ ঘুরে বেড়াক্ না কেন তার আসল প্রার্থনাটি হচ্চে, আবিরাবীর্ম্মএধি, হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ সম্পূর্ণ হোক্। এই জন্যে মানুষের সকল কান্নার মধ্যে বড় কান্না, পাপের কান্না; সে যে আপনার সমস্তটাকে নিয়ে সেই পরম একের সুরে মেলাতে পারচে না, সেই অমিলের বেসুর, সেই পাপ তাকে আঘাত করচে; মানুষের নানা ভাগ নানা দিকে যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্চে, তার একটা অংশ যখন তার অন্য সকল অংশকে ছাড়িয়ে গিয়ে উৎপাতের আকার ধারণ করচে তখন সে নিজেকে সেই পরম একের শাসনে বিধৃত দেখ্‌তে পাচ্চে না, তখন সেই বিচ্ছিন্নতার বেদনায় কেঁদে উঠে সে বলচে মামাহিংসীঃ—আমাকে আর আঘাত কোরো না, আঘাত কোরো না, বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব, আমার সমস্ত পাপ দূর কর,

তোমার সঙ্গে আমার সমগ্রকে মিলিয়ে দাও, তাহলেই আমার আপনার মধ্যে আমার মিল হবে, সকলের মধ্যে আমার মিল হবে, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হবে, জীবনের মধ্যে সমস্ত রুদ্রতা প্রসন্নতায় দীপ্যমান হয়ে উঠবে।

মানুষের নানা জাতি আজ নানা অবস্থার মধ্যে আছে, তাদের জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ এক রকমের নয়, তাদের ইতিহাস বিচিত্র, তাদের সভ্যতা ভিন্ন রকমের কিন্তু যে জাতি যে রকম পরিণতিই পাক্‌না কেন সকলেই কোনো না কোনো আকারে আপনার চেয়ে বড় আপনকে চাচ্চে। এমন একটি বড়, যা তার সমস্তকে আপনার মধ্যে অধিকার করে সমস্তকে বাঁধবে, জীবনকে অর্থদান করবে। যা সে পেয়েছে, যা তার প্রতিদিনের, যা নিয়ে তাকে ঘরকন্না করতে হচ্চে, যা তার কেনা বেচার সামগ্রী তা নিয়ে ত তাকে থাক্‌তেই হয়, সেই সঙ্গে, যা তার সমস্তের অতীত, যা তার দেখা শোনা খাওয়া পরার চেয়ে বেশি, যা নিজেকে অতিক্রম করবার দিকে তাকে টানে, যা তাকে দুঃসাধ্যের দিকে আহ্বান করে, যা তাকে ত্যাগ করতে বলে, যা তার পূজা গ্রহণ করে, মানুষ তাকেই আপনার মধ্যে উপলব্ধি করতে চাচ্চে, তাকেই আপনার সমস্ত সুখ দুঃখের চেয়ে বড় বলে স্বীকার করচে। কেন না মানুষ জান্‌চে মনুষ্যত্বের প্রকাশ সেই দিকেই; তার প্রতিদিনের খাওয়া পরা আরাম বিরামের দিকে নয়। সেই দিকেই চেয়ে মানুষ দু হাত তুলে বল্‌চে, আবিরাবীর্ম্ম এধি—হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। সেই দিকে চেয়েই মানুষ বুঝতে পারচে যে, তার মনুষ্যত্ব তার প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার প্রবৃত্তির আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে—তাকে মুক্ত করতে হবে, তাকে যুক্ত করতে হবে; সেই দিকে চেয়েই মানুষ একদিকে আপনার দীনতা আর-একদিকে আপনার সুমহৎ অধিকারকে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চে এবং সেইদিকে চেয়েই মানুষের কণ্ঠ চিরদিন নানা ভাষায় ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌চে—আবিরাবীর্ম্ম এধি, হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও! প্রকাশ চায়, মানুষ প্রকাশ চায়—ভূমাকে আপনার মধ্যে দেখ্‌তে চায়—তার পরম আপনকে আপনার মধ্যে পেতে চায়। এই প্রকাশ তার আহার বিহারের চেয়ে বেশি, তার প্রাণের চেয়ে বেশি—এই প্রকাশই তার প্রাণের প্রাণে, তার মনের মনে, এই প্রকাশই তার সমস্ত অস্তিত্বের পরমার্থ।

মানুষের জীবনে এই ভূমার উপলব্ধিকে পূর্ণতর করবার জন্যেই পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কি সেটা তাঁরাই প্রকাশ করতে আসেন। এই প্রকাশ সর্ব্বাঙ্গীনরূপে কোনো ভক্তের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে এমন কথা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই প্রকাশকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করে তোলাই তাঁদের কাজ। অসীমের মধ্যে সকল দিক দিয়ে মানুষের আত্মোপলব্ধিকে তাঁরা অখণ্ড করে তোলবার পথ কেবলি সুগম করে দিচ্চেন—সমস্ত গানটাকে তার সমস্ত তালে লয়ে জাগাতে না পারলেও তাঁরা মূল সুরটিকে কেবলি বিশুদ্ধ করে তুল্‌চেন—সেই সুরটি তাঁরা ধরিয়ে দিচ্চেন।

যিনি ভক্ত তিনি অসীমকে মানুষের মধ্যে ধরে মানুষের আপন সামগ্রী করে তোলেন। আমরা আকাশে সমুদ্রে পর্ব্বতে জ্যোতিষ্কলোকে, বিশ্বব্যাপী অমোঘ নিয়মতন্ত্রের মধ্যে, অসীমকে দেখি কিন্তু সেখানে আমরা অসীমকে আমার সমস্ত দিয়ে দেখ্‌তে পাইনে। মানুষের মধ্যে যখন অসীমের প্রকাশ দেখি তখন আমরা অসীমকে আমার সকল দিক দিয়েই দেখি, এবং যে দেখা সকলের চেয়ে অন্তরতম সেই দেখা দিয়ে দেখি। সেই দেখা হচ্চে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছাকে দেখ্‌তে পাওয়া। জগতের নিয়মের মধ্যে আমরা শক্তিকে দেখ্‌তে পাই—কিন্তু ইচ্ছাশক্তিকে দেখ্‌তে গেলে ইচ্ছার মধ্যে ছাড়া আর কোথায় দেখ্‌ব? ভক্তের ইচ্ছা যখন ভগবানের ইচ্ছাকে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে প্রকাশ করতে থাকে তখন যে অপরূপ পদার্থ দেখি জগতে সে আর কোথায় দেখ্‌তে পাব? অগ্নি, জল, বায়ু, সূর্য্য, তারা যত উজ্জ্বল যত প্রবল যত বৃহৎ হোক্ এই প্রকাশকে সে ত দেখাতে পারে না। তারা শক্তিকে দেখায় কিন্তু শক্তিকে দেখানর মধ্যে একটা বন্ধন একটা পরাভব আছে—তারা নিয়মকে রেখামাত্র লঙ্ঘন করতে পারে না—তারা যা' তাদের তাই হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই, কেন না তাদের লেশমাত্র ইচ্ছা নেই। এমনতর

জড়যন্ত্রের মধ্যে ইচ্ছার আনন্দ পূর্ণভাবে প্রকাশ হতে পারে না।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এই ইচ্ছার জায়গাটাতে আপনার সর্ব্বশক্তিমত্তাকে সংহরণ করেছেন—এইখানে তাঁর থেকে তাকে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন, সেই স্বাতন্ত্র্যে তিনি তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেন না। কেন না সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রটুকুতে দাসের সঙ্গে প্রভুর সম্বন্ধ নয়, সেখানে প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ের মিলন—সেইখানেই সকলের চেয়ে বড় প্রকাশ—ইচ্ছার প্রকাশ প্রেমের প্রকাশ। সেখানে আমরা তাঁকে মান্‌তেও পারি, না মান্‌তেও পারি, সেখানে আমরা তাঁকে আঘাত দিতে পারি। সেখানে আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁর ইচ্ছাকে গ্রহণ করব, প্রীতির দ্বারা তাঁর প্রেমকে স্বীকার করব সেই একটি মস্ত অপেক্ষা, একটি মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেবলমাত্র এই ফাঁকটুকুতেই সর্ব্বশক্তিমানের সিংহাসন পড়ে নি। কেন না, এইখানে প্রেমের আসন পাতা হবে।

এই যেখানে ফাঁক রয়ে গেছে এইখানেই যত অসত্য অন্যায় পাপমলিনতার অবকাশ ঘটেছে—কেন না, এইখান থেকেই তিনি ইচ্ছা করেই একটু সরে গিয়েছেন। এইখানে মানুষ এতদূর পর্য্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠতে পারে যে আমরা সংশয়ে পীড়িত হয়ে বলে উঠি জগদীশ্বর যদি থাক্‌তেন তবে এমনটি ঘট্‌তে পারত না—বস্তুত সে জায়গায় জগদীশ্বর আচ্ছন্নই আছেন—সে জায়গা তিনি মানুষকেই ছেড়ে দিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁর নিয়ম একেবারে চলে গেছে তা নয়—কিন্তু মা যেমন শিশুকে স্বাধীনভাবে চল্‌তে শেখাবার সময় তার কাছে থাকেন অথচ তাকে ধরে থাকেন না, তাকে খানিকটা পরিমাণে পড়ে যেতে এবং আঘাত পেতে অবকাশ দেন এও সেই রকম। মানুষের ইচ্ছার ক্ষেত্রটুকুতে তিনি আছেন অথচ নেই। এই জন্য সেই জায়গাটাতে আমরা এত আঘাত করচি আঘাত পাচ্চি, ধূলায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গ মলিন হয়ে উঠ্‌চে, সেখানে আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের আর অন্ত নেই, সেইখানেই আমাদের যত পাপ। সেইখান থেকেই মানুষের এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌চে—আবিরাবীর্ম্মএধি—হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক্‌! বৈদিক ঋষির ভাষার এই প্রার্থনাটাই এই বাংলাদেশে পথ চল্‌তে চল্‌তে শোনা যায়—এমন গানে যে গান সাহিত্যে স্থান পায় নি, এমন লোকের কণ্ঠে যার কোনো অক্ষরবোধ হয় নি—সেই বাংলাদেশের নিতান্ত সরল-চিত্তের সরল সুরের সারি গান,—

"মাঝি, তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না!"
তোমার হাল তুমি ধর, এই তোমার জায়গায় তুমি এস, আমার ইচ্ছা নিয়ে আমি আর পেরে উঠ্‌লুম না! আমার মধ্যে যে বিচ্ছেদটুকু আছে সেখানে তুমি আমাকে একলা বসিয়ে রেখ না—হে প্রকাশ, সেখানে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক্‌!

এত বাধা বিরোধ এত অসত্য এত জড়তা এত পাপ কাটিয়ে উঠে তবে ভক্তের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। জড়জগতে তাঁর প্রকাশের যে বাধা নেই তা নয়—কারণ, বাধা না হলে প্রকাশ হতেই পাবে না;—জড়জগতে তাঁর নিয়মই তাঁর শক্তিকে বাধা দিয়ে তাকে প্রকাশ করে তুল্‌চে—এই নিয়মকে তিনি স্বীকার করেছেন। আমাদের চিত্তজগতে যেখানে তাঁর প্রেমের মিলনকে তিনি প্রকাশ করবেন সেখানে সেই প্রকাশের বাধাকে তিনি স্বীকার করেছেন, সে হচ্চে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। এই বাধার ভিতর দিয়ে যখন প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়—যখন ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা, প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ মিলে যায় তখন ভক্তের মধ্যে ভগবানের এমন একটি আবির্ভাব হয় যা আর কোথাও হতে পারে না।

এই জন্যই আমাদের দেশে ভক্তের গৌরব এমন করে কীর্ত্তন করেছে যা অন্য দেশে উচ্চারণ করতে লোকে সঙ্কোচ বোধ করে। যিনি আনন্দময়, আপনাকে যিনি প্রকাশ করেন, সেই প্রকাশে যাঁর আনন্দ—তিনি তাঁর সেই আনন্দকে বিশুদ্ধ আনন্দরূপে প্রকাশ করেন ভক্তের জীবনে; এই প্রকাশের জন্যে তাঁকে ভক্তের ইচ্ছার অপেক্ষা করতে হয়—এখানে জোর খাটে না;—রাজার পেয়াদা প্রেমের রাজ্যে পা বাড়াতে পারে না! প্রেম ছাড়া প্রেমের গতি নেই। এই জন্যে ভক্ত যে দিন আপনার অহঙ্কারকে বিসর্জ্জন দেয়, ইচ্ছা করে' আপনার ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেয় সেই দিন মানুষের মধ্যে

তাঁর আনন্দের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্চেন। সেই জন্যেই মানুষের হৃদয়ের দ্বারে নিত্য নিত্যই তাঁর সৌন্দর্য্যের লিপি এসে পৌঁচচ্চে, তাঁর রসের আঘাত কত রকম করে আমাদের চিত্তে এসে পড়চে—এবং ঘুম থেকে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে বিপদ মৃত্যু দুঃখ শোক ক্ষণে ক্ষণে নাড়া দিয়ে যাচ্চে। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্চেন, সেই জন্যেই আমাদের চিত্তও সকল বিস্মৃতি সকল অসাড়তার মধ্যেও গভীরতর ভাবে সেই প্রকাশকে চাচ্চে—বলচে আবিরাবীর্ম্মএধি!

আমাদের দেশের ভক্তিশাস্ত্রের এই স্পর্দ্ধার কথা, অর্থাৎ অনন্তের ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে এই কথা, আজ কাল অন্য দেশের অন্য ভাষাতেও আভাস দিচ্চে। সেদিন একজন ইংরেজ ভক্ত কবির কবিতায় এই কথাই দেখ্‌লুম—তিনি ভগবানকে ডেকে বল্‌চেন—

Thou hast need of thy meanest creature;
　　thou hast need of what once was thine:
The thirst that consumes my spirit
　　is the thirst of thy heart for mine.

তিনি বল্‌চেন, তোমার দীনতম জীবটিকেও তোমার প্রয়োজন আছে; সে যে একদিন তোমাতেই ছিল, আবার তুমি তাকে তোমারই করে নিতে চাও; আমার চিত্তকে যে তৃষায় দগ্ধ করচে—সে যে তোমারই তৃষা, আমার জন্যে তোমার হৃদয়ের তৃষা।

পশ্চিম হিন্দুস্থানের পুরাকালের এক সাধক কবি—তাঁর নাম জ্ঞানদাস বঘেলি—তিনিও ঠিক এই কথাই বলেছেন—আমার এক বন্ধু তার বাংলা অনুবাদ করেছেন—

অসীম ক্ষুধায় অসীম তৃষায়
বহ প্রভু অসীম ভাষায়,
(তাই দীননাথ) আমি ক্ষুধিত্ আমি তৃষিত্
তাইতো আমি দীন।

আমার জন্যে তাঁরই যে তৃষা, তাই তাঁর জন্যে আমার তৃষার মধ্যে প্রকাশ পাচ্চে। তাঁর অসীম তৃষাকে তিনি অসীম ভাষায় প্রকাশ করচেন—সেই ভাষাই ত উষার আলোকে নিশীথের নক্ষত্রে, বসন্তের সৌরভে, শরতের স্বর্ণকিরণে। জগতে এই ভাষার ত আর কোনোই কাজ নেই সে ত কেবলি হৃদয়ের প্রতি হৃদয়-মহাসমুদ্রের ডাক। সে কবি বলরাম দাসের ভাষায় বল্‌চে—"তোমার হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির"—তুমি আমার হৃদয়ের ভিতরেই ছিলে কিন্তু বিচ্ছেদ হয়েছে—সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে আবার ফিরে এস, সমস্ত দুঃখের পথটা মাড়িয়ে আবার আমাতে ফিরে এস—হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন সম্পূর্ণ হোক!—এই একটি বিরহবেদনা অনন্তের মধ্যে রয়েছে, সেই জন্যেই আমার মধ্যেও আছে।

I have come from thee,—why I know not; but
　　thou art, O God! what thou art;
And the round of eternal being is the
　　pulse of thy beating heart.

আমি তোমার মধ্য থেকে এসেছি, কেন যে তা জানিনে, কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি যেমন তেমনিই আছ; এই যে একবার তোমা থেকে বেরিয়ে আবার যুগযুগান্তের মধ্য দিয়ে তোমাতেই ফিরে আসা এই হচ্চে তোমার অসীম হৃদয়ের এক-একটি হৃৎস্পন্দন।

অনন্তের মধ্যে এই যে বিরহবেদনা সমস্ত বিশ্বকাব্যকে রচনা করে তুল্‌চে—কবি জ্ঞানদাস তাঁর ভগবানকে বল্‌চেন এই বেদনা তোমাতে আমাতে ভাগ করে ভোগ করব—এ বেদনা যেমন তোমার তেমনি আমার; তাই কবি বল্‌চেন, আমি যে দুঃখ পাচ্চি তাতে তুমি লজ্জা কোরো না, প্রভু!

প্রেমের পত্নী তোমার আমি,
আমার কাছে লাজ কি স্বামী!
তোমার　সকল ব্যথার ব্যথী আমায়
কোরো নিশিদিন!
নিদ্রা নাহি চক্ষে তব,
আমিই কেন ঘুমিয়ে রব!
বিশ্ব তোমার বিরাট গেহ
আমিও বিশ্বে লীন।

ভোগের সুখ ত আমি চাইনে—যারা দাসী তাদের সেই সুখের বেতন দিয়ো,—আমি যে তোমার পত্নী—আমি তোমার বিশ্বের সমস্ত দুঃখের ভার তোমার সঙ্গে বহন করব; সেই দুঃখের ভিতর দিয়েই সেই দুঃখকে উত্তীর্ণ হব—আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ অখণ্ড মিলনে সম্পূর্ণ হবে। সেই জন্যেই, আমি বল্‌চিনে আমাকে সুখ

দাও—আমি বলচি, আবিরাবীর্ম্মএধি—হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তুমি প্রকাশিত হও!

আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী,
ভোগের দাসী নহি।
আমার কাছে লাজ কি স্বামী
নিষ্কপটে কহি।
আমায় প্রভু দেখাইয়োনা
সুখের প্রলোভন,
তোমার সাথে দুঃখ বহি
সেই ত পরম ধন।
ভোগের দাসী তোমার নহি
তাই ত ভুলাও নাকো,
মিথ্যা সুখে মিথ্যা মানে
দূরে ফেলাও নাকো।
পতিব্রতা সতী আমি
তাই ত তোমার ঘরে
হে ভিখারী, সব দারিদ্র্য
আমার সেবা করে!
সুখের ভৃত্য নই তব, তাই
পাইনা সুখের দান,—
আমি তোমার প্রেমের পত্নী
এই ত আমার মান॥

মানুষ যখন প্রকাশের সম্পূর্ণতাকে চাবার জন্যে সচেতন হয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সে সুখকে সুখই বলে না—তখন সে বলে "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং" যা ভূমা তাই সুখ। আপনার মধ্যে যখন সে ভূমাকে চায়—তখন আর আরামকে চাইলে চল্‌বে না, স্বার্থকে চাইলে চল্‌বে না, তখন আর কোণে লুকোবার জো নেই, তখন কেবল আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাস নিয়ে আপনার আঙিনায় কেঁদে লুটিয়ে বেড়াবার দিন আর থাকে না—তখন নিজের চোখের জল মুছে ফেলে বিশ্বের দুঃখের ভার কাঁধে তুলে নেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে, তখন কর্ম্মের আর অন্ত নেই, ত্যাগের আর সীমা নেই—তখন ভক্ত বিশ্ববোধের মধ্যে, বিশ্বপ্রেমের মধ্যে, বিশ্বসেবার মধ্যে আপনাকে ভূমার প্রকাশে প্রকাশিত করতে থাকে।

ভক্তের জীবনের মধ্যে যখন সেই প্রকাশকে আমরা দেখি তখন কি দেখি? দেখি, সে তর্কবিতর্ক নয়, সে তত্ত্বজ্ঞানের টীকাভাষ্য বাদপ্রতিবাদ নয়—সে বিজ্ঞান নয়, দর্শন নয়—সে একটি একের সম্পূর্ণতা, অখণ্ডতার পরিব্যক্তি। যেমন জগৎকে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালায় যাবার দরকার হয় না—সেও তেমনি; ভক্তের সমস্ত জীবনটিকে এক করে মিলিয়ে নিয়ে অসীম সেখানে একেবারে সহজরূপে দেখা দেন। তখন ভক্তের জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে আর বিরুদ্ধতা দেখ্‌তে পাইনে—তার আগাগোড়াই সেই একের মধ্যে সুন্দর হয়ে মহৎ হয়ে শক্তিশালী হয়ে মেলে। জ্ঞান মেলে, ভক্তি মেলে, কর্ম্ম মেলে; বাহির মেলে, অন্তর মেলে; কেবল যে সুখ মেলে তা নয়, দুঃখও মেলে; কেবল যে জীবন মেলে তা নয়, মৃত্যুও মেলে; কেবল যে বন্ধু মেলে তা নয়, শত্রুও মেলে; সমস্তই আনন্দে মিলে যায়; রাগিণীতে মিলে ওঠে; তখন জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদের পরিপূর্ণ সার্থকতা সুডোল হয়ে নিটোল অবিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকাশমান হয়। সেই প্রকাশেরই অনির্ব্বচনীয় রূপ হচ্চে প্রেমের রূপ। সেই প্রেমের রূপে সুখ এবং দুঃখ দুই-ই সুন্দর, ত্যাগ এবং ভোগ দুই-ই পবিত্র, ক্ষতি এবং লাভ দুই-ই সার্থক;—এই প্রেমে সমস্ত বিরোধের আঘাত, বীণার তারে অঙ্গুলির আঘাতের মত, মধুর সুরে বাজ্‌তে থাকে;—এই প্রেমের মৃদুতাও যেমন সুকুমার, বীরত্বও তেম্‌নি সুকঠিন; এই প্রেম, দূরকে এবং নিকটকে, আত্মীয়কে এবং পরকে, জীবন-সমুদ্রের এপারকে এবং ওপারকে প্রবল মাধুর্য্যে এক করে দিয়ে, দিগদিগন্তরের ব্যবধানকে আপন বিপুল সুন্দর হাস্যের ছটায় পরাহত করে দিয়ে উষার মত উদিত হয়; অসীম তখন মানুষের নিতান্ত আপনার সামগ্রী হয়ে দেখা দেন পিতা হয়ে, বন্ধু হয়ে, স্বামী হয়ে, তাঁর সুখদুঃখের ভাগী হয়ে, তার মনের মানুষ হয়ে;—তখন অসীমে সসীমে যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ কেবলি অমৃতে ভরে ভরে উঠ্‌তে থাকে, সেই ফাঁকটুকুর ভিতর দিয়ে মিলনের পারিজাত আপনার পাপ্‌ড়ি একটির পর একটি ক'রে বিকশিত করতে থাকে—তখন জগতের সকল প্রকাশ, সকল আকাশের সকল

তারা, সকল ঋতুর সকল ফুল, সেই প্রকাশের উৎসবে বাঁশি বাজাবার জন্যে ছুটে আসে,—তখন হে রুদ্র, হে চিরদিনের পরম দুঃখ, হে চিরজীবনের বিচ্ছেদবেদনা, তোমার এ কী মূর্ত্তি! এ কী দক্ষিণং মুখং! তখন তুমি নিত্য পরিত্রাণ করচ, সসীমতার নিত্য দুঃখ হতে নিত্য বিচ্ছেদ হতে তুমি নিত্যই পরিত্রাণ করে চলেছ এই গূঢ় কথা আর গোপন থাকে না! তখন ভক্তের উদ্‌ঘাটিত হৃদয়ের ভিতর দিয়ে মানব-লোকে তোমার সিংহদ্বার খুলে যায়—ছুটে আসে সমস্ত বালক বৃদ্ধ—যারা মূঢ় তারাও বাধা পায় না—যারা পতিত তারাও নিমন্ত্রণ পায়—লোকাচারের কৃত্রিম শাস্ত্রবিধি টল্‌মল্ করতে থাকে এবং শ্রেণীভেদের নিষ্ঠুর পাষাণ-প্রাচীর করুণায় বিগলিত হয়ে পড়ে। তোমার বিশ্বজগৎ আকাশে এই কথাটা বলে বেড়াচ্চে যে, "আমি তোমার", এই কথা বলে' সে নতশিরে তোমার নিয়ম পালন করে চল্‌চে—মানুষ তার চেয়ে ঢের বড় কথা বলবার জন্য অনন্ত আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—সে বল্‌তে চায় "তুমি আমার";—কেবল তোমার মধ্যে আমার স্থান তা নয়, আমার মধ্যেও তোমার স্থান; তুমি আমার প্রেমিক, আমি তোমার প্রেমিক;—আমার ইচ্ছায় আমি তোমার ইচ্ছাকে স্থান দেব, আমার আনন্দে আমি তোমার আনন্দকে গ্রহণ করব এই জন্যেই আমার এত দুঃখ, এত বেদনা, এত আয়োজন; এ দুঃখ তোমার জগতে আর কারো নেই; নিজের অন্তর বাহিরের সঙ্গে দিনরাত্রি লড়াই করতে করতে এ কথা আর কেউ বল্‌চে না আবিরাবীর্ম্মএধি—তোমার বিচ্ছেদবেদনা বহন করে জগতে আর কেউ এমন করে কাঁদ্‌চেনা যে, মামাহিংসীঃ; তোমার পশু পক্ষীরা বল্‌চে আমার ক্ষুধা দূর কর, আমার শীত দূর কর, আমার তাপ দূর কর; আমরাই বলচি—বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—আমার সমস্ত পাপ দূর কর। কেন বলচি? নইলে, হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হয় না। সেই মিলন না হওয়ার যে দুঃখ সে দুঃখ কেবল আমার নয়, সে দুঃখ অনন্তের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই জন্যে, মানুষ যে দিকেই ঘুরুক্ যাই করুক্ তার সকল চেষ্টার মধ্যেই সে চিরদিন এই সাধনার মন্ত্রটি বহন করে নিয়ে চলেছে, আবিরাবীর্ম্ম এধি, এ তার কিছুতেই ভোলবার নয়—আরাম ঐশ্বর্য্যের পুষ্পশয্যার মধ্যে শুয়েও সে ভুল্‌তে পারে না, দুঃখ যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়েও সে ভুল্‌তে পারে না। প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও, তুমি আমার হও, আমার সমস্তকে অধিকার করে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত সুখ দুঃখের উপরে দাঁড়িয়ে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত পাপকে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে তুমি আমার হও,—সমস্ত অসংখ্য লোকলোকান্তর যুগযুগান্তরের উপরে নিস্তব্ধ বিরাজমান যে পরম এক তুমি, সেই মহা এক তুমি, আমার মধ্যে আমার হও, সেই এক তুমি পিতানোসি, আমার পিতা, সেই এক তুমি পিতা নো বোধি, আমার বোধের মধ্যে আমার পিতা হও, আমার প্রবৃত্তির মধ্যে প্রভু হও, আমার প্রেমের মধ্যে প্রিয়তম হও, এই প্রার্থনা জানাবার যে গৌরব মানুষ আপনার অন্তরাত্মার মধ্যে বহন করুবেছে, এই প্রার্থনা সফল করবার যে গৌরব আপন ভক্ত-পরম্পরার মধ্য দিয়ে কত কাল হতে লাভ করে এসেছে—মানুষের সেই শ্রেষ্ঠতম গভীরতম চিরন্তন গৌরবের উৎসব আজ এই সন্ধ্যাবেলায়, এই লোকালয়ের প্রান্তে, অদ্যকার পৃথিবীর নানা জন্মমৃত্যু, হাসিকান্না, কাজকর্ম্ম, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে এই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনটিতে;—মানুষের সেই গৌরবের আনন্দধ্বনিকে আলোকে, সঙ্গীতে, পুষ্পমালায়, স্তবগানে উদ্‌ঘোষিত করবার এই উৎসব। বিশ্বের মধ্যে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং, মানুষের ইতিহাসে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং, আমার হৃদয়ের সত্যতম প্রেমে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং এই কথা জান্‌তে এবং জানাতে আমরা এখানে এসেছি—তর্কের দ্বারা নয়, যুক্তির দ্বারা নয়—আনন্দের দ্বারা—শিশু যেমন সহজবোধে তার পিতামাতাকে জানে এবং জানায় সেই রকম পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের দ্বারা। হে উৎসবের অধিদেবতা, আমাদের প্রত্যেকের কাছে এই উৎসবকে সফল কর, এই উৎসবের মধ্যে, হে আবিঃ, তুমি আবির্ভূত হও, আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্তাকাশে তোমার দক্ষিণমুখ প্রকাশিত হোক্, প্রতি দিন আপনাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র জেনে যে দুঃখ পেয়েছি, সেই বোধ হতে সেই দুঃখ হতে এখনি আমাদের পরিত্রাণ কর—সমস্ত লোভ ক্ষোভের

ঊর্দ্ধে ভূমার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করে' বিশ্বমানবের বিরাট্‌ সাধনমন্দিরে আজ এখনি তোমাকে নত হয়ে নমস্কার করি—নমস্তেঽস্তু—তোমাতে আমাদের নমস্কার সত্য হোক্‌, নমস্কার সত্য হোক্‌!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলা-বিদ্যা

সুন্দর কল্প-পাদপের শাখায় বসিয়া দুটী পাখী মধুর স্বরে একই গান দিবানিশি গাহিতেছে—অনন্তের যাত্রী মোরা এ জগত পান্থনিবাসে! ইঁহারা কে? ইঁহাদের একজন কবি এবং আর একজন কলা-বিৎ। সংসারী ও বিষয়াসক্ত মানুষ সচরাচর যে কথা ভাবে না, ভাবিতে চাহে না, সেই কথা ইঁহারা দুজনে ভাবিয়া থাকেন। সেই কথা সেই ভাব ইঁহাদের হাতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মক্লান্ত মানুষের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে। মানুষ তখন বলে—কি সুন্দর! আহা! কি সুন্দর! সে চিত্র ভাল কি মন্দ বিচার করিয়া দেখিবার আর তাহাদের অবসর থাকে না। সমালোচনার মাপকাটী লোকের আবেশ-বিহ্বল হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়। সকল চিন্তার অতীত একটী মহাভাবময় সঙ্গীতের একটী পদ, একটী তান, হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিয়া নিমিষে চলিয়া যায়। মানুষের মনোবীণা তারস্বরে বাজিয়া উঠে—অনন্তের যাত্রী মোরা এ জগত পান্থনিবাসে! মানুষ তখন স্তব্ধ হইয়া যায়। বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না; একটী প্রবল অনুভূতিতে প্রাণ মন বিহ্বল হইয়া উঠে। যথার্থ চিত্র, কাব্য বা মূর্ত্তি-কলার (Sculptors) মূল্য নিরূপণ এই ভাবেই জগতে চিরকাল হইয়া আসিয়াছে।

কাব্য এবং সুকুমার কলা উদ্দেশ্যসাধনে এক হইলেও প্রকৃতিতে বিভিন্ন। কাব্য প্রচ্ছন্ন, ভাষার দুর্গে আবদ্ধ; ইহাকে সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বলোক-উপভোগ্য করিতে হইলে ব্যাখ্যা কিম্বা ভাষান্তরিত করিবার প্রয়োজন হয়। সকল মানব জাতির ভাষা এক নয়। আবার সকল মানুষ কাব্য-রস পানে সমান অধিকারীও নয়। কিন্তু সুকুমার-কলা স্বপ্রকাশ, আপন দীপ্তিতে আপনি সমুজ্জ্বল। কাব্যের টীকা কাব্যের গম্ভীরতা-জ্ঞাপক; চিত্র বা মূর্ত্তিকলার সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা ইহাদের অপূর্ণতা ও চিত্রবিৎ কিম্বা মূর্ত্তিকলাবিদের অক্ষমতার পরিচায়ক। ঐতিহাসিক, সামাজিক কিম্বা সাহিত্য সম্বন্ধীয় চিত্রের বিষয় উল্লেখই নিতান্ত অজ্ঞ দর্শকের পক্ষে যথেষ্ট। কল্পিত ভাবময় চিত্রের নামোল্লেখ মাত্রেই দর্শক তন্ময় হইয়া যাইবে। টীকা কিম্বা সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা সাহায্যে চিত্র বা মূর্ত্তিকলা দর্শককে বুঝাইতে যাওয়া বিফল প্রয়াস। কলাবিদের কৃতিত্ব, ভাবকে সজীব মূর্ত্তিতে মানব-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তোলাতে, ভাবকে প্রচ্ছন্ন বা কুজ্ঝাটিকা-ময় করিয়া রাখাতে নহে।

ভাবকে সজীব মূর্ত্তি দান করা একটা কথার কথা নয়। অতীব কঠিন ব্যাপার। সুকুমার কলা (Art) বলিতে আমরা কি বুঝি। যে ভাব বর্ণ, গঠন এবং রেখা-জ্ঞানের সাহায্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তাহাই সুকুমার কলা। বর্ণজ্ঞান, গঠনজ্ঞান এবং রেখাজ্ঞানের ফলে চিত্র-কলার জন্ম। এবং গঠন ও রেখা-জ্ঞানের ফলে মূর্ত্তিকলার আবির্ভাব। এই দুই-ই, গভীর প্রেম, প্রবল অনু-ভূতি (feeling) ও শিল্পকুশলতায় গভীর পারদর্শিতার ফল স্বরূপ। একদিকে যেমন কলাবিদকে গভীর প্রেমিক ভাবুক কবি হইতে হইবে তেমনি অন্যদিকে তাঁহার সেই ভাবকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার মত বাহ্যিক শিল্পনৈপুণ্যেও (Technique) প্রবল অধিকার লাভ করিতে হইবে। এই দুই দিকেই চরমোৎকর্ষতা লাভ করিলে তবে তাঁহার পক্ষে যথার্থ চিত্র বা মূর্ত্তি-কলা সম্পাদন সম্ভবপর হইবে। এ দুইএর কোনও একটীতে অধিকতর উৎকর্ষতা লাভ করিলে কলা অঙ্গহীন থাকিয়া যাইবে। আগেই বলিয়াছি সুকুমার-কলা ভাবের সজীব মূর্ত্তি। কোন একটা সজীব মূর্ত্তির কল্পনা মাত্রেই একটী প্রাণবিশিষ্ট দেহী আমাদের চোখের সম্মুখে আসিয়া পড়ে। সুকুমার-কলাও প্রাণময় দেহী। অসুস্থ বা বিকলাঙ্গে যেমন প্রবল প্রাণ সঞ্চার কল্পনা সম্ভবে না, তেমনি শিল্পাংশে হীন চিত্র বা মূর্ত্তি-কলাতেও গভীর ভাব শুধু কল্পনারই বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ এবং পরিস্ফুট পদার্থ বিষয়ে মতবিরোধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না; কিন্তু প্রচ্ছন্ন, কুজ্ঝাটিকাময় যবনিকার অন্তরালবর্ত্তী জিনিষ সম্বন্ধে মতবিরোধ যে এ জন্মে আর ঘুচে না। যাহা সপ্রকাশ তাহা চিরদিনই মানবচক্ষে প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত

স্তন্য-পীযূষ-দায়িনী।
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বর্ম্মণ কৃত প্রতিমূর্ত্তি।

হইয়া থাকিবে। তাহাকে আবিলতায় আচ্ছাদিত করিতে গেলেও ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় বাহির হইয়া পড়িবে। সুকুমার-কলা ভাবের সজীব মূর্ত্তি, কিন্তু শুধু ভাব বা স্বপ্নের খেলা নহে। ভাবকে যখন দেহ ধারণ করিয়া মানব-চক্ষে প্রতিভাত হইতে হয় তখন সে দেহ সুস্থ সবল ও প্রাণ-প্রকাশোপযোগী হওয়া চাই-ই। অপুষ্ট বিকল অপরিণত দেহে ভাব জন্মগ্রহণ করিলেও সঙ্গে সঙ্গে সদ্যপাতিরও আশঙ্কা থাকিয়া যায়। সুকুমার-কলার দুই অঙ্গ—প্রকৃতি ও প্রাণ (Nature and Soul)। প্রকৃতি ভিত্তি, প্রাণ সৌধচূড়া। একে অন্যের সহিত অকাট্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। ইহার প্রকৃতি-অঙ্গের অনুশীলন চাই, প্রাণ-অঙ্গ স্বভাবজাত। Soulএর জন্য কাহাকেও ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। কিন্তু Nature আপনি আসে না। তাহাকে তাহার চিরপ্রতিষ্ঠিত আসন হইতে অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া পায়ে ধরিয়া নামাইয়া আনিতে হয়। Soulকে বুকে লইয়া সাধক কলাবিৎ যখন প্রকৃতিরাণীর দুয়ারে উপস্থিত হয়েন তখন তিনি কি আর না আসিয়া থাকিতে পারেন? কাজেই তখন মণিকাঞ্চন যোগ হয়। এই ভাবেই যুগে যুগে প্রতিভাবান চিত্রবিৎ জন্মগ্রহণ করিয়া জগতকে অপূর্ব্ব কণ্ঠমালায় ভূষিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

আজকাল একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে কলা-বিদ্যায় প্রকৃতির বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। জাপানে কথাটার জন্ম, ভারতেও আসিয়া ইহার ঢেউ পঁহুছিয়াছে। কথাটা শুনিতে বড় আমোদজনক। ভিত্তিহীন প্রাসাদ নির্ম্মাণের মত। আমার মনে হয় অধুনা ইয়োরোপে অত্যধিক প্রকৃতির দিকে ঝোঁক দেওয়ার ফলেই এই কথাটার সৃষ্টি হইয়াছে। পশ্চিমে যেমন কলাদেবীর শুধুই কাঠাম লইয়া মারামারি তেমনি পূর্ব্বে আবার সব ত্যাগ করিয়া একেবারে বায়বীয় দেহ ধারণ করিবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে। এই দুই অতি বিষম ক্ষেত্রের কোনও দিকে ভারতবাসীর পদস্খলন হয় তাহা অবশ্য কোনও ভারতবাসী ইচ্ছা করেন না। ভারতের কলা-বিদের জন্য এই দুইএর মধ্যস্থল নির্দ্দিষ্ট। দুইদিক হইতে পরস্পর-সংঘাতে যেমন মধ্যস্থল উর্দ্ধে উঠিয়া যায় তেমনি এই দুই পরস্পর বিষম দিকের সমন্বয়ের ফলে ভারত-চিত্র-বিৎ বা মূর্ত্তিকলাবিদের স্থান অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধে যেন ভগবান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের চক্ষু মোহ-তমসাচ্ছন্ন হইলে চলিবে না। লক্ষ্যস্থান ধ্রুবতারার ন্যায় সকল কুয়াসা, সকল অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাদের নয়ন-সমক্ষে জাগিয়া উঠুক। আমরা স্থিরচিত্তে ধীর পাদ-বিক্ষেপে গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি।

আগেই বলিয়াছি যে কলাবিদ্যা একটা ভাবের খেলা নহে। ইহা একটী উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মাত্রেই সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বজ্ঞানব্যাপী। জ্ঞানবিজ্ঞানের আদিও নাই অন্তও নাই। দেশ এবং কাল ইহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। বিজ্ঞানে দেশ এবং কালের গণ্ডি কাটিতে যাওয়া বালির বাঁধ দিয়া নদীপ্রবাহ রোধ করার মত। উন্নত কলাবিদ্যায় যে দক্ষতা যে নৈপুণ্য অর্জ্জন করা দর-কার তাহা কি ইউরোপীয়, কি জাপানী, কি ভারতবাসী কি চীনবাসী সকলকেই করিতে হইবে। এবং তাহা হই-লেই সেই সেই ব্যক্তি ঠিক তত্তৎ দেশীয় কলাবিৎ হইতে পারিবেন। জাপানী ভারতীয় বা ইয়োরোপীয় চিত্র বলিতে সাধারণ আদর্শ হইতে বিচ্যুত একটা অস্বাভাবিক 'অন্য কিছু' ভাবিবার কারণ দেখা যায় না। প্রতাপ-সিংহের চিত্র যথার্থভাবে অঙ্কিত হইলে তাহাকে Crom-wellএর চিত্র বলিয়া ভ্রম জন্মিবার কোনই কারণ নাই, এবং কন্‌ফিউসিয়সের চিত্রকেও নানকের চিত্র বলিয়া ভ্রমে পতিত হইবার আশঙ্কা দেখা যায় না। তবে কি না আপন আপন দেশের বিষয় সেই সেই দেশবাসী কর্ত্তৃক যথার্থভাবে অঙ্কিত হওয়া চাই। এ সমস্ত দেশবাচক বিষয় ছাড়াও এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহা মানব সাধারণের সম্পত্তি। তাহা চন্দ্র-সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় সর্ব্বলোকে বিস্তৃত। এইরূপ বিষয় লইয়া আমি তিনটি মূর্ত্তি রচনা করিবাব চেষ্টা করিয়াছি। যথা (১) "তুমি মা বিশ্বজননী জনমে মরণে"—(২) "স্তন্য-পীযূস-দায়িনী" (৩) "প্রথম যেদিন স্নেহের ধারা আসিল জগতে নামি"। এই বিষয়গুলি মানব সাধারণের সম্পত্তি; তবে বিশেষ দেশবাসী কর্ত্তৃক সম্পাদিত বলিয়া সেই দেশের একটু ভাব থাকিয়া যাইবেই। এগুলি সবই Sculpture বা মৃত্তিকায় করা হইয়াছে। পাঠক এইগুলির প্রতিলিপি ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবেন। সুতরাং বলিতে-

ছিলাম বিজ্ঞানে গণ্ডি কাটিতে যাওয়া অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। সময় এবং সামর্থ্যের অপব্যবহার। মহৎ এবং সার্ব্বভৌম বিষয়কে কোনও দেশবিশেষে বিশেষ আকার দান করিতে গেলে তাহা বিকৃত হইয়া পড়ে এবং আদর্শচ্যুত হইয়া উদ্দেশ্যসাধন পক্ষে ম্লান হইয়া পড়ে। সাময়িক উত্তেজনার বশে বড় জিনিষকে ছোট করিয়া ফেলা কখনও যুক্তিসঙ্গত নহে।

তবে একটা কথা সর্ব্বদাই মনে হয়। বর্ত্তমান চিত্র-জগতে যেন একটা প্রাণসঞ্চারের দিন আসিতেছে। ইয়োরোপে কলাদেবীর দেহব্যবচ্ছেদ-ক্রিয়া এত উৎসাহের সঙ্গে চলিয়াছে যে প্রাণ-সঞ্চার না হইলে ক্রমে ইহা একটা অন্য জিনিষে পরিণত হওয়াও বিচিত্র নয়। এখনই ত দেখা যায় ইয়োরোপের হাটে মাঠে বাজারে ব্যবসায় বাণিজ্যে চিত্রকলা নেহাৎ একটা বাজারে জিনিষে যেন পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। এই দুর্দ্দিনে ভক্ত ভারতসন্তান ভিন্ন কে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবে—এক একবার বলিতে ইচ্ছা হয়—চল মা সেই পুণ্যভূমে যেখানে তোমার মন্দির শুধু রং তুলি ক্যানবীস্ কিম্বা শুধু পাথরে নির্ম্মিত হইবে না—যেখানে অপূর্ব্ব ইতিহাস ও মহিমাময় লোকচরিত্রের ভিত্তির উপরে তোমার প্রাণময় মন্দির গড়িয়া উঠিবে, তুমি মা সন্তানের চিরপোষিত শ্রদ্ধা ও প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইয়োরোপে সুকুমার-কলার বহিরঙ্গে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার ফলে দেহ অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আজ এই সুন্দর দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে জগৎ বিমোহিত হইবে। সে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে কে? ভারতীয় চিত্রবিৎ। কিন্তু কঠোর সাধনা চাই, শিল্পনৈপুণ্যে গভীর জ্ঞান চাই। প্রাণ ভগবৎপ্রেমে সুন্দরম্‌এর সুন্দর মূর্ত্তিতে ভরপুর হইয়া উঠা চাই। তবেই যথার্থ চিত্রকলা বা মূর্ত্তিকলা জগতের সমক্ষে আবার নূতন আকারে উপস্থিত হইবে। ভারতের যে সার্ব্বভৌম ভাব ও শিক্ষা পুস্তক লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া, সংবাদপত্র চালাইয়া জগতের লোককে উপলব্ধি করাইতে পারা যায় নাই, তাহা এই 'সুন্দরম্'-এর ভিতর দিয়াই হইবে। অধিকারী ভেদে ব্যবস্থা। আজকাল সভ্যতার যে অবস্থা তাহাতে এই কলাবিদ্যার সাহায্য ব্যতীত এই মদগর্ব্বিত সভ্যতার খুব প্রাণের কাছে পৌঁছিবার আর কোনও পথই নাই। এর প্রমাণও ত যথেষ্ট দেখা যায়। একখণ্ড সুগঠিত প্রস্তরমূর্ত্তি বা একখানা রঙ্গ-মাখান ক্যানবীস্ লোকে লাখ্ লাখ্ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেছে। ধনমত্ততা জাহির করিবার উদ্দেশ্যেই হউক আর প্রকৃত গুণগ্রাহিতার জন্যই হউক আজ পর্য্যন্ত জগতে এই সুকুমার-কলার জন্য এত অর্থ ব্যয় হইয়াছে যে সেই সমস্ত অর্থরাশি এক জায়গায় পুঞ্জীভূত করিলে একটা পর্ব্বতের আকার ধারণ করে। একেবারে শূন্যের উপরে কি আর এত বড় একটা বৃহৎ কাণ্ড ঘটিতে পারে? যেটুকু গুণগ্রাহিতা ও প্রভাব এর অন্তরালে নিহিত রহিয়াছে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বিষয়টী কত গুরুতর। এবং মানুষের এই বৃত্তির ভিতর দিয়া কাজ করিবার কত প্রশস্ত একটা ক্ষেত্র রহিয়াছে।

শিল্পনৈপুণ্যে সিদ্ধহস্ত না হইলে ভারতের চিত্র অঙ্কিত করিতে যাওয়া পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘন-চেষ্টার ন্যায় ব্যর্থ হইবে। আগেই বলিয়াছি ভারতীয় কলাবিদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর। বিষয়গুলি নিতান্ত গভীর, ভাব সীমাহীন। কাজেই তাহা সম্পাদন করিতে যেমনি ভাবুক ও প্রেমিক হওয়া চাই, তেমনি আবার শিক্ষাংশেও প্রচুর দক্ষতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ভারতে কলা-বিদ্যার এই নব অভ্যুদয় বা পুনরুত্থানের মুহূর্ত্তে কলাবিদ্‌কে আদর্শচ্যুত হইলে চলিবে না। আমাদের দায়িত্বের কথা সর্ব্বদা মনে মনে জাগরূক রাখিয়া লক্ষ্য সন্ধানে অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতবাসী চিরদিনই সাধনপ্রিয়। ভারতের কলাবিৎ কখনও শুধু চিত্র-শিল্পী বা মূর্ত্তিকলা-শিল্পী বলিয়াই নিজেকে কর্ত্তব্যমুক্ত মনে করিতে পারেন না, তাহাকে 'সুন্দরম্'এর সাধক এবং মহা প্রেমিক হইতে হইবে। কোন বিষয় অনায়াসে লাভ করিবার প্রবৃত্তি কখনও ভারতবাসীর দেখা যায় নাই। আজ এই গুরুতর বিষয়েই বা কেন আমরা সাধনবিমুখ হইব? ভারতের ভাব ভারতের গভীরতা সুকুমারকলায় জীবন্ত হইয়া উঠিলে তাহা আপন মহিমায় জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। চৈতন্যের বিশ্ব বিমোহন প্রেম, বুদ্ধের শান্ত ও ত্রিতাপহারী নির্ব্বাণবাণী তখন এক নূতন আকারে নূতন তত্ত্বমণ্ডিত হইয়া সংসার-দাবদগ্ধ মানুষের

চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে। শ্যামের বাঁশরী আবার বাজিয়া উঠিবে। কোন কালে কোন যুগে সেই মোহন মুরলীর রবে যমুনা উজান বহিয়াছিল কি না সেই তত্ত্ব লইয়া বাদানুবাদ করিবার আর অবসর থাকিবে না—সে মোহন বংশীধ্বনি আবার আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে, আবার প্রাণ আকুল করিয়া তুলিবে। কল্পনা সত্যে পরিণত হইবে—পুরাণো গাথা আবার নূতন ভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। সত্যসত্যই এই রাজ্যলুব্ধ পর-পীড়নকারী সভ্যতার স্রোত আবার উজান বহিবে। জগতে শান্তির বার্ত্তা প্রচারিত হইবে। তখন কি দেব-মন্দির কি গির্জ্জা, কি রাজপ্রাসাদ কি দরিদ্রের পর্ণকুটীর, কি বিচারালয় কি কারখানা সর্ব্বত্র একই সুরে একই তানে বাজিয়া উঠিবে—অনন্তের যাত্রী মোরা এ জগত পান্থনিবাসে!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বর্ম্মণ,
ইউনিভার্সিটি কলেজ, লণ্ডন।

মহাত্মা কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রচার

আজ আমরা কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এইটিই কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রধান কার্য্য। শুধু কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রধান কার্য্য বলি কেন? এইটি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। দেশের রাজনৈতিক উন্নতি, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি, দরিদ্রকে অর্থদান ও রুগ্নব্যক্তির সেবা;—এ সকল কর্ম্মের মূল্য যে কিছু কম, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু এ সকলের চেয়ে নরনারীর অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করা, মানুষকে পাপের পথ হইতে পুণ্যের পথে লইয়া যাওয়া, মানুষের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে মানবত্বের মহা আদর্শ প্রকাশ করা এবং মানুষের চিত্তকে এই সসীম জগৎ হইতে অসীম ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাওয়া শ্রেষ্ঠ কার্য্য। এই শ্রেষ্ঠ কার্য্য যে-সে লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয় না। এই জন্য জগতের ধর্ম্মভাব ম্লান হইয়া পড়িলেই, বিধাতা এক একজন মহাপুরুষ এবং আরও কতকগুলি মহৎ ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। এই সকল লোকের দ্বারাই যথার্থ ধর্ম্মপ্রচার হইয়া থাকে। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনেক সহচর এই শ্রেণীর লোক ছিলেন বলিয়াই ভারতে এবং ইংলণ্ডে ধর্ম্মপ্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র যখন তরুণবয়স্ক যুবক, যখন সবেমাত্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, তখনই তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর স্বাস্থ্য লাভের জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করেন। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টার মহাশয়ের পিতা কৃষ্ণনগরের সদরালা ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতেই কেশবচন্দ্র বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় কৃষ্ণনগর অঞ্চলে খ্রীষ্টান পাদ্রীদিগের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। কেশবচন্দ্র সুযোগ বুঝিয়া কৃষ্ণনগরে একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে, আরম্ভ করিলেন। এইজন্য খ্রীষ্টানদিগের সহিত তাঁহার ঘোর বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এ যুদ্ধ সহজে আর থামিল না। কৃষ্ণনগরের পর কলিকাতা সহরেও পাদ্রীদিগের সহিত সংগ্রাম চলিতে লাগিল। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয় বিদ্রূপের সুতীক্ষ্ণ বাণ কেশবচন্দ্রের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাণবর্ষণ করিয়া কি হইবে? দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেশবচন্দ্রের কণ্ঠেই জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন।

ইহার পরই কেশবচন্দ্র দেশের মধ্যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। দেশের শিক্ষিত যুবকেরা তাঁহার বাগ্মিতাশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর কেশবচন্দ্র ১৮৬৪ সালে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য মান্দ্রাজ ও বোম্বাই সহরে যাত্রা করিলেন। এতদিন কেশবচন্দ্রের কার্য্য শুধুই বাঙ্গলা দেশের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; এখন মান্দ্রাজ ও বোম্বাই সহরের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। উভয় স্থানেই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। বোধ হয় এই সময় হইতেই বাঙ্গালীর সঙ্গে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ের যোগ হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রের দ্বারাই এই সুমহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হইল। আজ আমরা জাতীয় মহাসমিতির

মিলনক্ষেত্রে সমগ্র ভারতবাসীকে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইতে দেখিতেছি এবং তাহা দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারাই এই মিলনের সূচনা হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন, বোম্বাইবাসী, মান্দ্রাজবাসী, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, উড়িষ্যাবাসী ও আসামের পুরুষ এবং নারীগণ ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন; ইহাতেই ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইল। অদ্যাপি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের মধ্যে কি চমৎকার মিলন দৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়! উপাসনার সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি, এমন কি, খাসিয়া পাহাড়ের অর্দ্ধসভ্য খাসিয়াগণ পর্য্যন্ত এক স্থানে বসিয়া উপাসনা করেন; তৎপরে আনন্দবাজারে সকলে মিলিত হইয়া আহার করেন। বস্তুত এই মিলনদৃশ্য দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করা যায় না।

কেশবচন্দ্র মান্দ্রাজ ও বোম্বাই যাইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৬২ সালের ২রা আগষ্ট তারিখে হিন্দুজাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ সঙ্ঘটিত হইল। বিবাহটি কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুদিগের উদ্যোগেই হইয়াছিল। বিবাহের পাত্র স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ দাস গুপ্ত, বি, এল,। পার্ব্বতী বাবু যশোহর জেলার অতি সম্মানিত বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই পার্ব্বতী বাবু পুর্ণিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

ইহার পর কেশবচন্দ্র ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং পঞ্জাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলেন। পঞ্জাবের হিন্দু, শিখ, মুসলমান ও সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণ কেশবচন্দ্রের হৃদয়োন্মাদকারিণী বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন; এবং তাঁহার ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে কেশবচন্দ্র যেন এক অলৌকিক শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন। সেই শক্তির সাহায্যে ধর্ম্মরাজ্যে ভেল্কিবাজি খেলাইতে লাগিলেন; এক শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকের হৃদয়ে এমনই মায়াকুহক বিস্তার করিলেন যে, তাঁহারা ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় সহস্র সহস্র লোক কেশবচন্দ্রের প্রাণস্পর্শী উপদেশ শুনিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে গমন করিতেন; কিন্তু গোলোকধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিলে যেমন আর বাহির হইবার পথ পাওয়া যায় না, তেমনি একবার যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন, তাঁহারা আর ফিরিবার পথ পাইতেন না। এইজন্য কত যুবকের ঘর পর হইল, পিতামাতার স্নেহের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল; বিষয় সম্পদ পড়িয়া রহিল; তাঁহারা সকল ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজেই বাস করিতে লাগিলেন। শুধু কি তাই? কেশবচন্দ্রের আকর্ষণে কত শিক্ষিত ব্যক্তি চাকুরী ত্যাগ করিয়া, সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় লইয়া ধর্ম্মের জন্য পাগল হইলেন এবং ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার এখন বিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা হয় না,—স্বপ্নের কাহিনী বলিয়াই মনে হয়।

দেখিতে দেখিতে ১৮৬৯ সালের ২২শে আগষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন কেশবচন্দ্রের নূতন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। মন্দিরে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। স্বয়ং কেশবচন্দ্র উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। তাহার পর স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, এম্, এ, স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন, এম্, এ, স্বর্গীয় রজনীনাথ রায়, এম্, এ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম্, এ, সুলেখক শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম্, এ, এইরূপ একুশ জন যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সকলেই জানেন, ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞানে, গুণে ও ধর্ম্মে দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

এই ত গেল কলিকাতার কথা। ইহার কয়েক মাস পরে অর্থাৎ উক্ত সালের ডিসেম্বর মাসে কেশবচন্দ্র ঢাকায় গমন করিলেন। সেখানে ঢাকার বড় বড় সাহেব ও সুপ্রসিদ্ধ নবাব আবদুলগণি হইতে আরম্ভ করিয়া ডালবাজারের টিকিধারী বৈষ্ণব পর্য্যন্ত কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইহার ফল হইল এই

যে, ঢাকার নববিধান সমাজের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়, সুপ্রসিদ্ধ সিবিলিয়ান মিষ্টার কে. জি. গুপ্ত, তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার পি. এম্. গুপ্ত, তাঁহার পিতা সাধক কালীনারায়ণ, ডাক্তার পি, কে, রায়, জজ মিষ্টার এ, সি, সেন, বিখ্যাত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, মুন্সী জালালুদ্দীন মিয়া প্রভৃতি চল্লিশ ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

এই সময় ঢাকা সহরে কিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, সি, আই, ই, মহাশয় স্বয়ং আমাকে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা এই :—

"স্বনামধন্য কেশব তাঁহার কতিপয় শিষ্য সহ ঢাকায় আগমন করিলেন। কেশব প্রথম ইংরাজিতে তৎপরে বাঙ্গলায় বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ঢাকার সকল সম্প্রদায়ের লোক মোহিত ও বিস্মিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা ঢাকার নগরসঙ্কীর্ত্তনে প্রথম উত্তোলিত হইল। যাঁহারা কোন অংশেও ব্রাহ্ম নহেন, তাঁহারাও নগরকীর্ত্তনে বহির্গত, ঋষিবেশে সুশোভিত, রিক্তপদ কেশবচন্দ্রকে ধর্ম্মপুরুষ মনে করিয়া নমস্কার করিল; এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটা আশ্চর্য্য ও অতি পবিত্র বস্তু জ্ঞানে সম্মান করিতে শিখিল।"

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে, অর্থাৎ ১৮৭০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম প্রচারার্থ ইংলণ্ডে গমন করিলেন। কেশবচন্দ্র প্রথমতঃ ইংলণ্ডের জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ইংরাজদিগের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লর্ড লরেন্স স্বয়ং গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করাইয়া দিলেন। অবশেষে কেশবচন্দ্র বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশের মধ্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিলেন না, প্রত্নতত্ত্ব অথবা দর্শন বিজ্ঞানের কথাও উপস্থিত করিলেন না; কিন্তু অমৃতময়ী ভাষায় ধর্ম্মের সুমধুর ও চিত্তাকর্ষক বিষয়গুলি বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টের ন্যায় এমনই এক স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া সরল ভাষায় ধর্ম্মের কথা বলিয়া যাইতেন যে, তাঁহার প্রত্যেকটি কথা ইংরাজ নরনারীর হৃদয় স্পর্শ করিত; তাঁহাদের অন্তরে ভক্তিরস উচ্ছলিত হইয়া উঠিত; তাঁহাদের চিত্ত আর্দ্র হইয়া যাইত। এ জন্য কেশবচন্দ্রের যত্ন আদর ও প্রশংসার সীমা রহিল না। তিনি ছয় মাস ইংলণ্ডে বাস করিয়া চুয়াত্তরটি উপদেশ ও বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ইংলণ্ডের নানা সম্প্রদায়ের শত শত পুরুষ ও নারী প্রকাশ্য সভা করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রকাশ করিলেন। বোধ হয় কেশবচন্দ্র ব্যতীত আর কোন বাঙ্গালী ইংরাজ জাতির নিকট এইরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। এ বিষয়ে কলিকাতার "ইংলিশম্যান" কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"তাঁহার ন্যায় কোন হিন্দুই স্বদেশের বাহিরে এত অধিক প্রখ্যাত হইতে পারেন নাই এবং সমকালে জীবনের সামান্য সামান্য কার্য্য-কলাপেও সর্ব্বসাধারণের এত মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। * * তাঁহার অনর্গল বক্তৃতা প্রভাবে এবং সাগ্রহ নিবেদনে ইংলণ্ডের জনসমাজ চমৎকৃত হইয়াছিল; এবং কখনও বা অজ্ঞাতসারে বিভ্রান্তও হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই তিনি তাঁহার সমুন্নত চরিত্র ও সদ্‌-গুণাবলী দ্বারা লোকের মনে এক গভীর ভাবের উদ্দীপনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বদেশের প্রতি ইংরাজদিগের নবতর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন।"

কেশবচন্দ্র যখন ইংলণ্ডে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। তৎকালে বিলাতের অধিকাংশ সংবাদপত্র তাঁহার যশোগান করিয়াছেন। ঐ সময় বিলাতের "গ্রাফিক" পত্রে কেশব-চন্দ্রের ছবি ও তাঁহার সঙ্গে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধের কিয়দংশের অনুবাদ এই :—

"ভারত হইতে আলোকসম্পন্ন ইউরোপকে ধর্ম্ম নীতির সৌন্দর্য্য, সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দিবার জন্য একব্যক্তি আসিলেন। যে ধর্ম্মসংস্কারকের নাম এই রচনার শিরোদেশে প্রকাশিত, তিনি নিশ্চয়ই এ যুগের সুবিখ্যাত লোকদিগের মধ্যে একজন। * * কলিকাতা কেশবচন্দ্রের জন্মভূমি। সেখানে তাঁহার পত্নী ও চারিটি সন্তান তাঁহার প্রতিগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই তাঁহার ৩৩ বৎসর বয়স চলিতেছে। * * তিনি খাঁটি নিরামিষভোজী ও মাদক-ত্যাগী, মৎস্য মাংস স্পর্শ করেন না। তিনি উদ্যম ও সুগপূর্ণ ধাতুর লোক; যতই তাঁহার সহিত পরিচয় হয়, ততই তাঁহাকে ভালবাসা যায়। সাধুতা, নির্ম্মলতা, হিতকারিতা, তাঁহার চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ।"

কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করিয়া ভারতের কল্যাণের জন্য চিন্তা করিয়াছেন। তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার "ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য" শীর্ষক বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ হইতে দু চারিটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ব্রিটিশ জাতি যদি ভারতের মঙ্গল করিতে চান, তাহা হইলে সকল শ্রেণীর লোকের উপরে সমান দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ইংরাজ-গণের মনে রাখা উচিত যে, ঈশ্বর ভারতবর্ষকে তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়াছেন। * * ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের প্রথম কর্ত্তব্য—শিক্ষা-কার্য্যের আরও উৎকর্ষ সাধন করা। ভারতবাসীদিগকে রাজভক্ত

করিতে অভিলাষ করিলে তাঁহাদের শিক্ষিত করা প্রয়োজন। প্রকাণ্ড দুর্গাপেক্ষা ব্রিটিশজাতির ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি রক্ষার পক্ষে স্কুল কলেজ প্রকৃষ্ট উপায়। * * বঙ্গদেশেই প্রতি তিন শত আটাশ জনের মধ্যে একজন মাত্র শিক্ষালাভ করে। যাহারা দীন দরিদ্র তাহাদের শিক্ষার কোন উপায় নাই। * * গবর্ণমেণ্ট ভারতের নারীগণকে যদি শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে শিক্ষাকার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিবে। ভারতকে শিক্ষিতা মাতা না দিলে ভাবীবংশকে কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত করা হইবে না, সন্তানগণ প্রথম বয়স হইতে ঈশ্বরানুরাগী, সত্যনিষ্ঠ হইতে পারিবে না, গৃহ জ্ঞান ও সুখের আলয় হইবে না।"

কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার নবোৎসাহে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহার পর যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন সাধনের দ্বারা ধর্ম্মের নব নব তত্ত্ব উদ্ভাবন পূর্ব্বক, তাহা জগতের নিকট প্রচার করিয়াছেন। আজ কত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি তাঁহার সাধনপ্রণালী অনুসারে সাধন করিয়া, তাঁহার উপাসনা প্রণালী অনুসারে উপাসনা করিয়া, তাঁহার উপদেশ অনুসারে ধর্ম্মপথে চলিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

আমরা সকলেই জানি মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই ধর্ম্মের ঋষি; কেশবচন্দ্র এই ধর্ম্মের সাধক ও প্রধান প্রচারক। তাঁহার জীবনে এই বিশ্বজনীন্ ধর্ম্মের সুমহৎ ভাব সকল পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রাচীন ঋষির অধ্যাত্ম যোগ সাধন করিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের মৈত্রী ও করুণার ভাব গ্রহণ করিলেন, ভক্ত শ্রীচৈতন্যের হৃদয়োন্মাদিনী ভক্তিতে প্রমত্ত হইলেন; এবং তাঁহাদের মাহাত্ম্য উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করিলেন। আবার খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের সুগভীর বিশ্বাস, আত্মত্যাগ ও বাধ্যতার ভাবগুলি স্বীয় জীবনে বিকশিত করিয়া তুলিলেন; তদ্ভিন্ন নির্ভীক চিত্তে হিন্দু নরনারীর নিকট খ্রীষ্ট ও মহম্মদের মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। যথার্থই কেশবচন্দ্রের প্রচারিত ধর্ম্মের মধ্যে বেদ, ললিত বিস্তর, বাইবেল ও কোরাণের সমন্বয় হইয়াছিল। এই সমন্বয়ের ধর্ম্ম প্রচার করাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কেশবচন্দ্র আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রচারিত বিশ্বজনীন্ ধর্ম্মের মধ্যে সকল ধর্ম্ম, সকল জাতি এক হইয়া যাইবে। এজন্য তিনি তাঁহার একটি বক্তৃতায় বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া বলিয়াছেন—

"এস, আমরা এক ঈশ্বর, এক জাতি, এক মণ্ডলী, এক সত্যে আবদ্ধ হই, সমস্ত মনুষ্য জাতিকে এক করিয়া ফেলি। * * বহু তান মিলিত হইয়া বিবিধ-স্বরে একই তানলয় উপস্থিত করে; ঈশ্বরের ভিন্নতার মধ্যে একতা আছে। * * বহু জাতি, বহু সম্প্রদায়, বহু মণ্ডলী, বহু মতের মধ্যে একতা সম্ভব। সকলে মিলিত হউন। * * আমি আমার সম্মুখে সেই জাতি সম্মিলনের ব্যাপার দেখিতে পাইতেছি, যাহা এক দিন অতি সুন্দর একতা সম্পাদন করিবে এবং এবং সমুদায় শত্রুতা বিনষ্ট করিবে। * * আমি দেখিতেছি কাল-প্রবাহে সমস্ত ধর্ম্ম মিশিয়া যাইতেছে।"

আমরা এখন কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়াই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। "তত্ত্ববোধিনী" বলিয়াছেন:—

"অনেকেরই জন্ম স্ত্রীপুত্র পরিবারের জন্য, কিন্তু মহাত্মা কেশবচন্দ্রের জন্ম সমস্ত পৃথিবীর জন্য। * * ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষা ইঁহার দাস; কবিত্ব ইঁহার সহোদর, বাগ্মিতা ইঁহার বাল্যসখা এবং প্রতিভা দৈবপুরস্কার।"

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

জীবন-নাট্য

(গল্প)

পাকা আমের সময়। সে তখন বালক মাত্র। গিয়াছিল সে মামার বাড়ী বেড়াইতে। বাগানে আম কুড়াইতে গিয়া পাড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। মেয়েটিও বালিকা। তাহাকে দেখিয়াই বালকের চিত্ত যেন বলিয়া উঠিল— এই এই, একেই আমি খুঁজিতেছিলাম, একেই আমি চাই।

কিন্তু সে বালক কিনা, মেয়েটিকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। শুধু অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, মেয়েটি তাহার রকম দেখিয়া একটু শুধু হাসিল।

এবার এই পর্য্যন্ত। বালক মামার বাড়ী হইতে চলিয়া গেল, কিন্তু সেই একদিনের-দেখা মেয়েটির সেই হাসিটুকু সে ভুলিল না।

আবার যখন সে মামার বাড়ী ফিরিল, তখন সে কলেজের ছেলে। তবু তখনো বালক। এবারও সেই মেয়েটির সঙ্গে পুকুর-ঘাটে দেখা। তার বয়স এখন চৌদ্দ বছর। কিন্তু তখনি তার হৃদয়খানি মাতৃত্বের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। মেয়েটির আগেকার সেই চঞ্চল গতি মন্থর ও স্থির দৃষ্টি বিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—

সমস্ত দেহে একটি লাবণ্যময় লীলা পারদরাশির মতো টলটল করিতেছিল।

সে এবার আরো অবাক হইয়া মেয়েটিকে দেখিতে লাগিল; এবারও মেয়েটি তাহার রকম দেখিয়া হাসিল, কিন্তু তেমন সহজভাবে মুখের দিকে তাকাইয়া নয়—ঘাড় অন্যদিকে বাঁকাইয়া কিন্তু দৃষ্টিখানি তারই দিকে হানিয়া।

তাদের আলাপ হইতে দেরি হইল না, এবং আলাপ যদি হইল তো তাহার মধ্যে এমন কথাও হইল যাহা শুধু সেই দুটি মুখেরই বলিবার মতো আর সেই চারটি কানেরই শুনিবার—আর কারো কাছে সে বলিবার নয়, আর কারো সে শুনিবারও নয়।

মেয়েটি বিধবা। তাকে বিয়ে করা অসাধ্যসাধন। কিন্তু সর্ব্বস্ব যেখানে বাঁধা পড়িয়াছে, প্রাণপণ করিয়াই তো সে-সব উদ্ধার করিতে হয়। ছেলেটি উপার্জ্জন করিবার জন্য আপনাকে প্রাণপণ যত্নে তৈরি করিতে লাগিল। সে ইঞ্জিনিয়ার হইবে—তার জন্যে অন্তত পক্ষে আট বছর দরকার। আট বচ্ছর!

ছেলেটি মাঝে মাঝে মামার বাড়ী আসে আর মেয়েটিকে দেখে—সে দিনে দিনে নব নব শ্রীতে পরিমণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে। এমনি আশায় আনন্দে বাধায় চুরিতে প্রণয় তাহাদের প্রগাঢ় হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন বছর গেল। চতুর্থ বছরে মেয়েটির জ্বর-বিকার হইল।

তারপর ছেলেটি যখন তাহাকে দেখিল, তখন মেয়েটির রং বিবর্ণ, চোখ কোটরগত ও উদাস, মাথার চুল কাটা, সুগোল দেহের লাবণ্য কঙ্কালসার বিশ্রী। অমন রূপ হতশ্রী হওয়াতে ছেলেটির দুঃখ হইল, কিন্তু তাহার অনুরাগের হ্রাস হইল না।

ক্রমে ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার হইল। অর্থ প্রতিপত্তিও হইল। কত সুন্দরী কিশোরীর পিতা তাহাকে দুবেলা সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল—কিন্তু সে সেই চৌদ্দ বছরের মেয়ের কাছে প্রতিজ্ঞাকরা ভুলিল না। সে বিধবাকেই বিয়ে করিল।

মেয়েটির আবার চুল হইয়াছিল, কিন্তু তেমন ঘন লম্বা গোছ বাঁধে নাই; তার চোখের কোল ভরিয়াছিল, কিন্তু দৃষ্টিতে সে চঞ্চল আবেশ ছিল না; রং ফিরিয়াছিল কিন্তু আগেকার সেই চৌদ্দ বছরের মেয়ের উচ্ছল লাবণ্য ফিরে নাই; হৃদয়ের অন্তরে প্রণয় জমাট বাঁধিয়াছিল, কিন্তু বাহিরের সেই উচ্ছ্বসিত শ্রী এখন শিথিল হইয়া গিয়াছিল। চোদ্দ বছরের মেয়েকে ভালো বাসিয়া ছেলেটি বাইশ বছরের মেয়েকে বিবাহ করিল—তবু তাহাকে ভালো বাসিত।

ভালো বাসিত; কিন্তু আগেকার সেই ব্যগ্রতা আর ছিল না; অনাবশ্যক বকুনি থামিয়া গিয়াছিল; পলকে পলকে চাওয়াচাওয়ি ও চুরি করিয়া হাসাহাসি বিদায় লইয়াছিল; মুহূর্ত্ত অদর্শনে প্রলয়বোধ এখন ঘরকন্নার কাজের মাঝে ডুব দিয়াছিল।

ক্রমে ক্রমে দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে হইল। মেয়েটি বাপের প্রাণ, তার নয়নতারা, তার অনন্ত সান্ত্বনা।

মেয়েটি যত বড় হইতে লাগিল তত তার মধ্যে তার মায়ের অতীত ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; আর ততই সে বাপের হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। দশ বৎসর বয়সে তার মায়ের সেই চোদ্দ বৎসরের ছবি বাপের চোখে নূতন হইয়া দেখা দিল।

বাপ সময় পাইলেই মেয়ের কাছছাড়া হইত না; মেয়েকে যতটা পারে চোখে চোখে রাখে। মেয়েকে লইয়াই বাপ ব্যস্ত, মেয়ের মায়ের খবর বড় একটা লওয়া ঘটিয়া উঠিত না।

দুর্ব্বল শরীরে সন্তান প্রসব ও ঘরকন্নার খাটুনিতে মায়ের শরীর ভাঙিয়া গিয়াছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজে ব্যস্ত, দেখা সাক্ষাৎ বড় একটা ঘটিত না। তবু ভালোবাসা ছিল। কিন্তু যেমনটি ছিল তেমন কি?

একদিন প্রভাতে মেয়েটি বিছানা হইতে উঠিল না। মা বলিল—স্কুলে না যাইবার ছুতো। বাবা কিন্তু তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিল।

মৃত্যুর দূত মেয়েটিকে ডাক দিয়াছে—মেয়েটির যক্ষ্মা হইয়াছে। মা ঘরকন্না লইয়া ব্যস্ত। বাবা তাহার শুশ্রূষার জন্য আহার নিদ্রা কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিল। অর্থে শ্রমে চেষ্টা যত্নে যত রকম আরাম দিতে পারা যায়

মেয়েটির কিছুরই অভাব রহিল না। বাপের সঙ্গে সে যখন কথা কহিত বাপের বুক দুঃখবেদনায় ভরিয়া উঠিত; তবু সে নিজের কষ্ট চাপিয়া রাখিয়া মেয়েকে হাসাইতে চেষ্টা করিত।

একদিন আর মেয়েটি হাসিল না, কথাও বলিল না। সব শেষ হইয়া গেল!

সে শোকের দৃশ্য চিত্র করা অসম্ভব। যখন লোকে মৃতদেহ লইতে আসিল, তখন বাপ একেবারে ক্ষেপিয়া গেল—লোককে মারিতে যায়—অমন দুধের মেয়ে মরিয়া গেছে এ সে বিশ্বাসই করিতে পারে না, এখনো আশা থাকিতে পারে, সে বাঁচিতে পারে।

লোকেরা তাহার মিনতি শুনিল না, বাধা অগ্রাহ্য করিল, অমন সোনার মেয়েকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিল।

পাগল পিতা এক মুঠি ছাইয়ের উপর সমাধি রচনা করিল। শাদা পাথরের সুন্দর সমাধি। রোজ সে একগাছি শাদা সুগন্ধি ফুলের মালা পরাইয়া সমাধির কাছে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া আসিত।

এমনিভাবে বছরখানেক গেল। দ্বিতীয় বৎসরে কন্যার সমাধির কাছে নিত্য আর শোক করার সময় হয় না, কাজের বড় ঝঞ্ঝাট। মনে মনে এক একবার লজ্জা হয় যে মেয়ের প্রতি ঠিক মতো স্নেহ প্রকাশ করা হইতেছে না। তবু সময় বড় চিকিৎসক, সকল শোক, সকল লজ্জা, সকল স্মৃতি সে অল্পে অল্পে অলক্ষ্যে মুছিয়া ফেলিতে লাগিল।

আরো দুটি কন্যা জন্মিয়াছে কিন্তু তারা তাহার মতো নয়, এ কথা তার বাপের মনে জাগে।

আর স্ত্রী? যার তুল্য নারী এ জগতে আর ছিল না, এখন তার সে মোহিনী ঘুচিয়া গেছে, বিশুষ্কমঞ্জরী লতার মতো একদিনের যা শ্রী এখন নষ্ট হইয়া তাই তাহাকে অধিকতর কুশ্রী করিয়া তুলিয়াছে।

জীবনেরও স্ফূর্ত্তি আনন্দে ভাটা ধরিয়াছে। বার্দ্ধক্য চুপি চুপি ঘাড় ধরিয়া পিঠ কুঁজা করিয়া দিতেছে, পা বাঁকা ও কম্পিত করিয়া তুলিতেছে।

ঘরকন্নারও সে শ্রী নাই। একা গিন্নি অনেকগুলি ছেলেপুলে সামলাইতে পারে না। তাহারা চেয়ারের ঠ্যাং ভাঙে, বালিসের তুলো বাহির করে, চুনকাম করা দেয়ালে কালি ছড়ায়, গানের বদলে ছেলেদের কান্না গৃহখানিকে ভরিয়া রাখে। কাজেকাজেই কর্ত্তা গিন্নির মেজাজ চটা, কথা কড়া, ব্যবহার রূঢ় হইয়া উঠিতেছে। কর্ত্তা-গিন্নিও এখন ছাড়াছাড়ি, আগেকার সে সোহাগসম্ভাষণ এখন খুঁজিয়া মনে করিতে হয়।

কর্ত্তার বয়স যখন পঞ্চাশ, তখন গিন্নির মৃত্যু হইল। তখন বুড়োর মনে অতীত যৌবনের সকল স্মৃতি নূতন হইয়া উঠিল, চোখের সামনে সেই চোদ্দ বছরের ফুটন্ত কলি মেয়েটিরই ছবি জাগিতে লাগিল। বুড়ো শোকে বড় কাতর হইল—সে শোক বুড়ীর মৃত্যুতে নয়, সেই বাইশ বছরের বধূর জন্যেও নয়,—এ শোক সেই চোদ্দ বছরের কিশোরীর স্মৃতির জন্য;—সেই বাইশ বছরের বধূর ভালোবাসার জন্য এবং বুড়ীর গিন্নিপনার জন্য অল্প স্বল্প।

বুড়ো ছেলেমেয়েগুলিকে লইয়া থাকে। মেয়েগুলির বিয়ে হইল; ছেলেগুলি যে যার কাজে দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িল; শ্মশান আগুলিয়া রহিল শুধু সেই বুড়ো।

বছরখানেক ধরিয়া বুড়ীর এক একটি গুণের কথা একশবার বলিয়া বলিয়া সে তার বন্ধুদের বিরক্ত করিয়া তুলিল। তারপর যা ঘটিল সে বড় চমৎকার!

একটি আঠারো বছরের সুন্দরীর সঙ্গে তার আলাপ হইল। তাহার আকৃতির মধ্যে—কি আশ্চর্য্য!—বুড়ো তার মৃত পত্নীর চোদ্দ বছর বয়সের ছবিখানির চমৎকার সাদৃশ্য দেখিতে পাইল। সেই কোন সুদূর অতীতে আমবাগানের চোদ্দ বছরের মেয়েকে দেখিয়া যেমন সেদিন মনে হইয়াছিল এমনটি বুঝি আর জগতে নাই, আজ এই অষ্টাদশীকে দেখিয়াও তেমনি মনে হইল। আর মনে হইল এ প্রজাপতিরই নির্ব্বন্ধ! এ বিধাতারই লীলা!

শুধু যে বুড়োই যুবতীকে দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল তা নয়, যুবতীও বুড়োকে ভালোবাসে। বুড়োর শূন্য ভাঙা মন সুখে গর্ব্বে ভরাট হইয়া উঠিল—এখনো সে একেবারে অপদার্থ নয়, পঞ্চাশ বছরেও সে অষ্টাদশীর হৃদয়জয়ী!

বুড়ো আবার বিয়ে করিল, নইলে যে সংসার চলে না; বুড়ো বয়সে তাকে দেখে কে? ছেলেমেয়েগুলোকে মাতৃহীন রাখাও তো বাপের প্রাণে সহ্য হয় না।

কিন্তু ছেলেমেয়েগুলো এমনি অকৃতজ্ঞ, বাপের এত বড় স্নেহের নিদর্শনটাকে তারা তাদের মায়ের প্রতি অপমান মনে করিল বুড়ো বয়সে বাপের কাণ্ড দেখিয়া তাদের মাথা হেঁট হইল, লজ্জায় তাদের নাকি লোকালয়ে মুখ দেখানো ভার হইল। শোন একবার কথা !

এমন অকৃতজ্ঞতা কি বরদাস্ত হয় ! বুড়ো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক তুলিয়া দিল। নূতন উৎসাহে নূতন গিন্নি লইয়া নূতন পাতা ঘরকন্নায় বুড়ো মন দিল। বুড়োর বুড়ো বন্ধুরা বলাবলি করিল—বুড়ো গাছে দোফলা ফসল রকমারির বাহার বটে, কিন্তু সে না মিষ্টি না টক, পানসে !

বছর ফিরিতে না ফিরিতে নববধূর সন্তান হইল ! বুড়ো-বয়সে একেই ঘুম কম হয়, তাহাতে আবার শিশুর কান্নায় বুড়োর ভারি ঘুমের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। এ বয়সে কি এসব ঝঞ্ঝাট ভালো লাগে। বুড়ো পৃথক ঘরে শয্যা রচনা করিল।

বধূ ইহাতে নারীভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া কাঁদিল; রমণীর জীবন কি দুঃখদুর্ভর; বছরখানেক আগে বুড়ো তাহার কানে যেসব সৃষ্টিছাড়া মনভুলানো কথা বলিয়াছিল এখন তাহার আগাগোড়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন তাহার মনে তাহার ভাগ্যবতী সতীনের উপর হিংসা জাগিতে লাগিল; এটা যেন সম্পূর্ণ তার সতীনেরই দোষ, যে, সে তার স্বামীর সকল মাধুর্য্য সকল সোহাগ নিঃশেষে উপভোগ করিয়া মরিয়াছে এবং তাহার জন্য রাখিয়া গেছে শুধু অনাদর আর উপেক্ষা। সে মনে করিতে লাগিল তাহাকে যে বিবাহ করা সে কেবল তাহার সতীনের শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য, তাহার যতটুকু আদর সে সতীনেরই স্মৃতির উদ্দেশে। তাহার নিজের কিছু নাই, মনে করিয়া সে ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল।

এখন সে স্বামীর মনোহরণের জন্য যে সব বিলাসকলা, প্রণয়লীলার অনুষ্ঠান করিতে সুরু করিল তাহা বুড়োর কাছে বড় বাড়াবাড়ি ও ন্যাকামি ঠেকিতে লাগিল। বুড়ো মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল। এখন কথায় কথায় বুড়োর মনে তুলনায় সমালোচনা জাগে—মনে হয় আগেরটি যেমন সরল সোহাগী ছিল এটি তেমন নয়, এর মেজাজটা চটা, ঢংটা পাকামি, ব্যবহারটা অসঙ্গত। তখন বুড়োর মনে তার পূর্ব্ব পক্ষের ছেলেমেয়েগুলির প্রতি মমতা ফিরিয়া আসিল। গৃহ তার অতিরিক্ত অস্বাস্তকর মনে হইতে লাগিল। তার বুড়ো বয়সের কাণ্ডখানা আগাগোড়া মূর্খতারই নামান্তর বলিয়া প্রতিভাত হইল। এমন ভুলটা না করিলেই ছিল ভালো। তাহার সমস্ত জীবন ভার হইয়া উঠিল।

এতদিন তাহার মনের মধ্যে সেই আমবাগানের চোদ্দ বছরের মেয়েটির রূপই শুধু জাগিতেছিল—যাহার সাদৃশ্য সে দুজনার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল এবং দুবারই সেজন্য বেদনা পাইয়াছে,—একবার তাহার কন্যার আকৃতিতে, আরবার এই দ্বিতীয় পত্নীর মধ্যে। কিন্তু এখন, এই জীবনের অবসান-সময়ে, এই নিরানন্দ সংসারে, পত্নীর কর্কশ ভৎসনা পরিপাক করিতে করিতে, তাহার সম্মুখে জাগিয়া উঠিল সেই ধৈর্য্যশীলা কর্ম্মপটু গৃহিণীমূর্ত্তি—যে নীরবে শুধু সংসার দেখিয়াছে, স্বামী পুত্রের সেবা করিয়া গিয়াছে, যে কখনো একটি অপ্রিয় বা রূঢ় কথা উচ্চারণ করে নাই। সে যে তুচ্ছ মোহে চোদ্দ বছরের তরুণীর রূপে মজিয়াছিল, আজ বৃদ্ধ বয়সে ধাক্কা খাইয়া সে মোহ কাটিয়া গেল, এখন বুড়ো বুঝিল চোদ্দ বছরের তরুণীরই প্রণয় পরিণতি পাইয়াছিল, সেই সেবা-নিপুণা গৃহিণীতে, বৃথাই সে তাহাকে তুচ্ছ করিয়া শুধু আকৃতির সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ভুগিয়াছে। এখন সে মৃত্যুতে তাহারই সহিত মিলনের অপেক্ষা করিয়া দিন গণিতে লাগিল।*

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংগলা শব্দের য়

বহু সংস্কৃত শব্দ বাংগলায় চলিত আছে। আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে বাংগলা শব্দের বানান প্রসংগে এ বিষয় সংক্ষেপে দেখা গিয়াছে। অনেক সংস্কৃত শব্দ লিখনে সংস্কৃত,

---

* সুইডেনের লেখক—August Strindberg—তাঁহার রচনায় নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্য্য ও রম্যতার জন্য 'The Swedish Ibsen' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারই আদর্শে এই গল্পটি লিখিত হইয়াছে। এরূপ গল্প 'ছোট নভেল' শ্রেণীর।—লেখক।

পঠনে ও কথনে বাংগলা হইয়াছে। অনেক সংস্কৃত শব্দ কথনে বিকৃত হইয়া লিখনেও বিকৃত হইয়াছে। এখানে বাংগলার য়্ বর্ণের উচ্চারণ এবং আগমন আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমে সংস্কৃত শব্দের য়্-এর বাংগলা উচ্চারণ স্মরণ করিলে দেখা যায়, য়্ অক্ষরের উচ্চারণ কোথাও য (জ), কোথাও য় (প্রায় অ্) হয়। শব্দের আদিস্থিত য়্ উচ্চারণে জ হয়। যথা—জথা, যদি—জদি, যোগ—জোগ। অন্যত্র প্রায়ই স্বরবর্ণতুল্য উচ্চারিত হয়। যথা, নিয়ত—নিঅত, প্রায়—প্রাঅ্, নিয়োগ—নিওগ। য়্ সংস্কৃতে ই+অ বা ইঅ। অর্থাৎ দুই স্বরসংযোগে য়কার। নিয়ত শব্দে য়্ বর্ণের পূর্বে ই স্বর থাকাতে অল্প চেষ্টায় শব্দটির সংস্কৃত উচ্চারণ আসে। এইরূপ প্রিয়, আত্মীয়, বিয়োগ ইত্যাদি শব্দের। বায়ু শব্দের উচ্চারণও ঠিক আছে, যদিও গ্রাম্যজন করে বাউ। বায়ু শব্দের উ লোপে পদ্যে বায়, এবং অপভ্রষ্ট হইয়া বাই (যেমন বাই-রোগ)। আয়ু শব্দও এইরূপে আই, এবং পরমায়ু শব্দের গ্রাম্য উচ্চারণ পরমাই, এমন কি প্রমাই হইয়াছে। সং আর্য্যিকা হইতে আয়ী, অনেকে লেখেন আই। প্রাচীন বাংগলায় মাতা অর্থে আই শব্দ পাই, এবং আসামীতে অদ্যাপি এই অর্থে আই শব্দ চলিত আছে। অন্যদিকে, সং আর্য্যক শব্দ হইতে আজা বংগের স্থানে স্থানে এবং ওড়িশায় চলিত আছে। এখানে একই সং শব্দের বাংগলা রূপান্তরে য় এবং জ পাইতেছি। এইরূপ, প্রয়োগ শব্দে য়, কিন্তু সংযোগ শব্দে জ হইয়াছে।

সংযুক্ত য্য অধিকাংশ শব্দে ইঅ, কয়েকটা শব্দে জ উচ্চারিত হয়। বাক্য—বাক্ইঅ এরূপ উচ্চারিত না হইয়া বাক্কি হয়। অর্থাৎ ইঅ পৃথক হইয়া ই পূর্বে যায়, শেষের অকার জানাইতে গিয়া ক দ্বিত্ব হইয়া পড়ে। এইরূপ, সত্য—সত্ত্ব, পদ্য—পদ্দ। ব্যঞ্জনে ই যুক্ত হইয়া বাক্কি, সত্তি। এইরূপ, দিব্য—দিব্বি, পথ্য—পথ্থি, সাক্ষ্য—সাক্খি। যজ্ঞ হইতে জগ্‌গি, কারণ জ্ঞ বাংগলায় গঁ্য হইয়াছে। এ সকল উদাহরণে ইঅ-এর অকার ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব করিয়াছে। পরে ই থাকিলে পূববর্তী অ প্রায়ই ঈষৎ ওকার হয়। এই হেতু অনেকে সত্য উচ্চারণ করে সোত্ত, পদ্য—পোদ্দ। সত্ত, পদ্দ উচ্চারণ অবশ্য মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

কয়েকটা শব্দে য়ফলার য়্ উচ্চারণে জ হয়। বিদ্যুৎ-বিদ্দুৎ, উদ্যম—উদ্দম; কিন্তু উদ্যোগ—উদ্‌জোগ, উদ্যাপন —উদ্‌জাপন, সূর্য—সুজ। যোগ শব্দ প্রায়ই জোগ থাকিয়া যায়। উৎ-জোগ, অভিজোগ, অনুজোগ, সংজোগ, বিজোগ (কেহ কেহ বিয়োগ); কিন্তু নিয়োগ, প্রয়োগ। নিয়োগ—কিন্তু নিজুকৃত, প্রয়োগ কিন্তু প্রজুক্ত। এইরূপ, কোথায় য় কোথায় জ, তাহা বলা দুষ্কর। (য়্ স্থানে জ উচ্চারণের কারণ এবং য়্ বর্ণাদির উচ্চারণ-সূত্র বংগীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রচারিত আমার লিখিত শব্দ-শিক্ষাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত রীতিতে বানান করা হইয়া থাকে। ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ইহার বহু ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। সংস্কৃতে জ য য়্ তিন বর্ণ কিংবা তিন বর্ণের তিন অক্ষর নাই। আছে জ য্। সংস্কৃতে ব ব দুই বর্ণ এবং দুই অক্ষর আছে। বাংগলায় আছে কেবল ব। সংস্কৃতে ড় ঢ় বর্ণ নাই, বাংগলায় আছে। সংস্কৃতে অকারের দীর্ঘ আকার, বাংগলায় অকার আকার দুই পৃথক্ স্বর। এইরূপ আর দুই এক বিষয়ে সংস্কৃত ও বাংগলা পৃথক হইয়াছে। তথাপি কেহ কেহ সংস্কৃত হইতে অপভ্রষ্ট শব্দেও সংস্কৃত বর্ণবিন্যাস রাখিতে চান। আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে বাংগলা শব্দের বানান প্রসংগ উত্থাপন করিয়া-ছিলাম। দুঃখের বিষয়, একজন মাত্র এবিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। (অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসী দেখুন।)

সংস্কৃত শব্দের ব্যঞ্জন লুপ্ত হইলে বাংগলায় লুপ্ত বর্ণের স্থানে য়্ আসে। সং গোপালক—গোআলা—গোয়ালা, সং খদির—খইর—খয়র, সং শৃগাল—শিআল—শিয়াল, সং কৃত্বা—করিআ—করিয়া। ই স্থানে য়্ এবং য়্ স্থানে ই এ আসিয়াছে। সং করোতি পদের প্রাচীন বাংগলা রূপ করোই। পরে করয়—কর্এ বা করয়ে—কর্এ—করে। সং সাগর—সায়র, অনেকে বলে সাএর। এইরূপ, সং কায়স্থ—কায়থ—কাএত। উপরের দৃষ্টান্তের সাদৃশ্যে, কত+এক=কঅ+এক=কয়+এক=কয়েক। প্রাচীন

বাংগলা করিহ—করিঅ—করিও। কেহ কেহ লেখেন করিয়ো, আসামীতে লেখা হয় করিয়ো। সং মাতৃ হইতে মাই। মাই+এর=মায়ের। এইরূপ, ভাইএর=ভায়ের, দুইএর=দুয়ের।

এ সকল স্থলে বানানের নিয়ম পাওয়া যায়, এবং সে নিয়ম উচ্চারণে বাধা দেয় না। ইয়া উয়া তদ্ধিত-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দে ইয়া উয়া লিখিলে বানান ও উচ্চারণ ঠিক থাকে। ইহাদের সংক্ষিপ্ত রূপ লিখিবার সময় ফাঁপরে পড়িতে হয়। মাই+ইয়া (বা মা+ইয়া)=মাইয়া (মাতৃজাতি-সম্বন্ধীয় বা মাতৃতুল্য)। সংক্ষেপে প্রাচীন বানান মায়া, বংগের স্থানে স্থানে অদ্যাপি এই উচ্চারণ আছে। কিন্তু রাঢ়ে হইয়াছে মেয়ে। এইরূপ, ভাই-তুল্য—ভাইয়া—ভায়া। ইহারও রূপান্তরে ভাইয়ে—ভেয়ে। এইরূপ, বালিয়া—বেলে, কাঠিয়া—কেঠে, চীনিয়া (চীন দেশীয়)—চীনে, ধর্মিয়া—ধর্মে, পাহাড়িয়া—পাহাড়ে, শান্তিপুরিয়া—শান্তিপুরে ইত্যাদি বানান বিচার্য। এইরূপ, করিয়া—করে, হাসিয়া—হেসে, যাইয়া—যেয়ে, লিখিয়া—লিখে, শুনিয়া—শুনে ইত্যাদি বানানও বিচার্য। মেয়ে যেয়ে প্রভৃতি শব্দের বিকারের নিয়ম এই। শব্দটি এক কিংবা দুই অক্ষরের হইলে এবং প্রথম অক্ষরে আ থাকিলে ইয়া যোগের পর আ স্থানে এ, এবং ইয়া স্থানে এ হয়। ইয়া স্থানে বস্তুতঃ য়ে কিংবা ে্য হয়। হেসে বস্তুতঃ হেস্যে। এইরূপ, বেল্যে, পাহাড়্যে, ধর্ম্যে, শান্তিপুর্যে, চীন্যে। এই প্রকার বানান উচ্চারণের কাছে কাছে যায়। য-ফলা লোপ করিলে অর্থ-গ্রহণে বিঘ্ন হয়। শান্তিপুরে শান্তিপুর্যে কাপড় হয়, ধর্মে ধর্ম্যের স্থিতি, বেল্যে পাথরে রুটি বেলে না, পাহাড়ে পাহাড়্যে সাপ বেড়ায়, চীনে চীন্যে বেণী কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইত্যাদি বানান ভাল বোধ হয়। শুনে হেসে চলে গেল—না, শুন্যে হেস্যে চল্যে গেল ? কেহ কেহ করিতেছেন, শু'নে হে'সে চ'লে গেল। কিন্তু উহাকে পড়িতে হয় শুইনে হেইসে চইলে গেল। অর্থাৎ শেষের য-ফলা ই করিয়া পূর্বে আসিতে হয়। তিন অক্ষরের শব্দে এ নিয়ম চলে না। পাহাড়িয়া শব্দ পাহাড়ে লিখিলে চলে না, পাহা'ড়ে লিখিলেও চলে না; কারণ উচ্চারণের ধার দিয়াও গেল না। মুখ সামলে কথা কহে, কাদা হাতড়ে মাছ ধরে, ইত্যাদি উদাহরণে সামলে হাতড়ে বানান ঠিক হইল কি ? এখানে সাম'লে, হাত'ড়ে চলে না। কেহ কেহ এই অসুবিধা দেখিয়া কিংবা না ভাবিয়া পাথরিয়া কাঠরিয়া সাপড়িয়া প্রভৃতি শব্দ পাথুরে, কাঠুরে, সাপুড়ে লেখেন। এইরূপ, শান্তিপুরিয়া স্থলে শান্তিপুরী, চীনিয়া স্থলে চীনা লেখেন। এইরূপ, হলুদিয়া হলুদা, বেগুনিয়া—বেগুনা ইত্যাদি লেখা চলে, কিন্তু তদ্দ্বারা ভাষার অসম্পূর্ণতা দূর হয় না।

প্রাচীন পুথীর বানান দেখিলে য-ফলা দেওয়া ভাষার নিয়ম পাওয়া যায়। বার-মাসিয়া শব্দ বারমাস্যা আকারে অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। এইরূপ অন্য বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন হইতে বিচ্ছেদ-ঘটনা যুক্তি-যুক্ত নহে। বাস্তবিক সকলদিক বিবেচনা করিলে বাংগলা ভাষায় য-ফলার প্রকৃত উচ্চারণ আনা আবশ্যক বোধ হইবে।

কয়েকটি শব্দে য় আগম হইয়াছে। মলা হইতে ময়লা, কলা (বা কালা) হইতে কয়লা, শির হইতে শিয়র। ময়লা উচ্চারণে মঅ্লা, কিন্তু শিয়র—শিঅর। এক অক্ষরের দুই তিন প্রকার উচ্চারণ ভাল হইতে পারে না। বাংগলা-ভাষা শব্দের মধ্যে সুধু স্বরাক্ষর বসাইতে যেন কুণ্ঠিত। সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষা এমন ছিল না। ওড়িয়া ভাষা সংস্কৃত-প্রাকৃতের নিয়ম রক্ষা করিয়া শব্দের মধ্যে শেষে স্বরাক্ষর লিখিয়া আসিতেছে। সং নগর হইতে ওড়িয়া নঅর। বাংগলায় লিখিতে হইলে অনেকে লিখিবেন নয়র। কিন্তু কোথায় নঅর আর কোথায় নয়র ! ওড়িয়া শব্দটির ওড়িয়া বানান ওড়িআ। অর্থাৎ ইয়া উয়া না লিখিয়া লেখা হয় ইআ উআ। হিন্দী আসামী ইয়া লেখে, কিন্তু উয়া না লিখিয়া লেখে উবা কিংবা ওবা। ব অক্ষর থাকিলে পাওয়া খাওয়া জলুয়া প্রভৃতি সচ্ছন্দে পাবা খাবা জলবা লেখা চলিত। কেহ কেহ হিন্দী ভাষাকে ভারতভাষা করিতে অভিলাষী। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হউক না হউক, বাংগলা ওড়িয়া আসামী হিন্দী ভাষার সাধারণ শব্দসম্পত্তির বানানে ঐক্য ঘটিলে অনেক লাভ। য়-ফলা ও ব-ফলার প্রকৃত উচ্চারণ হিন্দী ওড়িয়াতে আছে, আসামীতে ব যেমন আছে, য় তেমন নাই। মরাঠী ও দ্রাবিড়ী যাবতীয় ভাষায় ঠিক আছে। নাই কেবল বাংগলা ভাষায়।

বস্তুতঃ শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে বাংগলা ভাষা নিকৃষ্ট, এবং ইহা দেখিয়া ভারতের অন্যান্যভাষী বাংগালীকে উপহাস করে। বাংগালীর মধ্যে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত আছেন, অথচ উচ্চারণ-বিষয়ে তাঁহারা উদাসীন কেন, একথা অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। সংস্কৃতমূলক যাবতীয় ভাষার মধ্যে বাংগলা ভাষা অধিক সংস্কৃতমুখী, অথচ উচ্চারণে অযোগ্য। সময়ে সময়ে বাংগালী পণ্ডিত বাংগলাকে আরও সংস্কৃত দেখিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ভুলিয়া যান শব্দের ধ্বনিতে ভাষা, স্রোতকে নহে। উচ্চারণের প্রতি মন দিলে বানান আপনি আসিবে। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি বানান ঠিক, না জান্যুআরি ফেব্রুআরি ঠিক? এখানে শব্দের ধ্বনি প্রধান। কারণ ভাষায় শব্দ নূতন প্রবেশ করিতেছে। বহুয়ারী ঝিয়ারী বানান এখন পরিবর্তন করিতে পারা যায় না। কারণ এই বানানের সহিত পুরাতনের যোগ আছে। এইরূপ, মেনেজার, কেষিআর বানান ঠিক, না ম্যানেজার ক্যাশিয়ার ঠিক? পুরাতনের সাদৃশ্যে অনেক নূতন শব্দের বানান করা হইয়া থাকে। তথাপি শব্দটা কি, এবং বাংগলা উচ্চারণে ধ্বনি কি, এবং কি কি অক্ষরযোগে সে ধ্বনি ঠিক প্রকাশিত হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। লেখা ধ্বনিকে স্থায়ী করে, একথা লেখককুল বিস্মৃত হইলে ভাষা রক্ষা করিবে কে?

কটক। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

প্রবাসী-বাঙ্গালী

বাবু যমুনাদাস।

আগ্রা নসীম নামক উর্দ্দু পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় বাবু যমুনাদাস বিশ্বাস এতদঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে "বাবু যমুনাদাস" বলিয়াই পরিচিত। আগ্রার জনৈক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সহিত কথা-প্রসঙ্গে সে-দিন বিশ্বাস মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিলে ভদ্র লোকটী বলিলেন "বাবু যমুনাদাস সাহেবের কথা বিলক্ষণ জানি, সম্ভবতঃ তিনিই বিশ্বাস বাবু। বাবু যমুনাদাস একজন নামী ও সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তি ছিলেন। এখনও তাঁহার পরিবারবর্গ আগ্রাতেই আছেন।" আমরা বিশ্বাস মহাশয়ের বিষয় ইতিপূর্ব্বেই অবগত ছিলাম সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিলাম না।

উচ্চাভিলাষের সহিত অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও সাধুতার মিলন হইলে যে ভাগ্যবিপর্য্যয় অতিক্রম করিয়া এবং দারিদ্র্যের শত বন্ধন ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়, প্রবাসী বাঙ্গলী বাবু যমুনাদাস বিশ্বাস তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইনি হাবড়া জেলার অন্তঃপাতী আঁদুল বিপ্রোণাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম দাস বিশ্বাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের অনেকে মুর্শিদাবাদ নবাবসরকারে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহারা নবাবের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া "বিশ্বাস" এই পদবী লাভ করেন। তদবধি তাঁহারা বিপ্রোণার বিশ্বাস বলিয়া খ্যাত। বলরাম দে মহাশয় ইংরাজী ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি তাঁহার খুল্লতাতগণের ন্যায় নবাবসরকারে কর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া ইংরাজ সরকারে রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত হন এবং সেই সূত্রে জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া আলিগড়ে প্রবাসী হন। তিনি উত্তর-পশ্চিমের নানা স্থান ভ্রমণ করেন। কিন্তু আগ্রা ও সাহারাণপুরেই অধিকাংশ কাল অবস্থিতি করিতেন। বাবু যমুনাদাসের জীবনের সহিত এই দুই প্রবাসস্থানই অধিক ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ। ১৮৪১ অব্দে যখন বলরাম বাবু আগ্রার 'ভৈরোঁ বেলনগঞ্জ' পাড়ায় অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন যমুনাদাস বাবুর জন্ম হয়। তাহার পরেই সাহারাণপুরে তিনি বদলি হন। তথায় তাঁহার দুই কন্যা ও দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়। কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স যখন পাঁচ বৎসর মাত্র তখন বলরাম বাবুকে কর্ম্মসূত্রে রুড়কী যাইতে হয়। রুড়কীতে আসিয়া হঠাৎ তিনি পীড়িত হন এবং পরিবারবর্গকে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করেন। যমুনাদাস বাবু তখন ১২ বৎসরের বালক। সে সময় তাঁহাদের কয়েকজন আত্মীয় আগ্রায় বাস করিতেছিলেন। সুতরাং বলরাম বাবুর পরিবারবর্গ আর বঙ্গদেশে ফিরিয়া না গিয়া আগ্রাতেই রহিলেন।

সাহারাণপুরে অবস্থান কালে যমুনাদাস বাবুর শিক্ষা

আরম্ভ হয়। এই স্থানেই তিনি মৌলবীর নিকট পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। আগ্রায় আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হন; কিন্তু উপযুক্ত অভিভাবকের অভাবে তাঁহার লেখা পড়ার বড় সুবিধা হয় নাই। তিনি ব্যায়াম ও সঙ্গীত বিদ্যায় অধিক মনোনিবেশ করায় তাহাতে বিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। যমুনাদাস বাবুর বয়স যখন ১৪ বৎসর তখন সিপাহীবিদ্রোহ হয়। সেই ভয়ানক দুর্দ্দিনে লোকে গৃহের বাহিরে যাইতে সাহস করিত না কিন্তু তিনি নির্ভয়ে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং তাহাতেই আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার এই নির্ভীক ভাব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। কিন্তু এরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে চিরদিন কাটে না। সংসারের ভার তাঁহার মস্তকে পতিত হইলে তাঁহাকে কর্ম্মান্বেষণ করিতে হইল। তিনি অনূপসহরে তাঁহার ভগ্নীপতি শান্তিপুর-নিবাসী বাবু চিন্তামণি বসুর নিকট গমন করিলেন। এখানে বিদ্রোহীরা অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তাঁহার ভগ্নীপতি অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। কথিত আছে যমুনাদাস বাবু সৎসাহস ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে বিদ্রোহীদিগকে অতি অল্প কালের মধ্যে সহর ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করেন। অনূপ-সহরে চাকরির সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি আগ্রা ফিরিয়া আসিলেন এবং পাব্লিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টে মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। অল্প দিনেই তাঁহাকে মৈনপুরী যাইতে হইল। কিন্তু এখানকার জলবায়ু তাঁহার সহ্য না হওয়ায় তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া এলাহাবাদ চলিয়া যান। তিনি এস্রাজ ও সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এলাহাবাদে তাঁহার বহু শিষ্য ও বন্ধু জুটিল কিন্তু উপার্জ্জনের বিশেষ সুবিধা হইল না, সুতরাং তিনি সপরিবারে বঙ্গদেশে চলিয়া গেলেন। পরে কলিকাতায় রুগ্ন হইয়া পড়ায় বারাণসী যাইতে বাধ্য হন এবং এখানে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া লক্ষ্ণৌ সুলতানপুর প্রভৃতি অযোধ্যার নানা স্থানে চাকরীর অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। এই সময় তাঁহার জননী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিধবা ভগ্নী এবং শিশু ভাগিনেয় দেশে অবস্থান করিতেছিলেন কিন্তু সহানুভূতির অভাবে সকলে বহু ক্লেশ পাইতে থাকেন এবং জ্ঞাতিবর্গের নির্দ্দয় ব্যবহারে মনস্তাপ সহ্য করেন। পরিবারবর্গের এই অবস্থা, এদিকে তিনি উদরান্ন সংস্থানের জন্য লালায়িত হইয়া বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

একদা সুলতানপুরের পথিপার্শ্বে এক বৃক্ষতলে বসিয়া একাকী আপনার দুঃখের দিন ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গাঢ় চিন্তায় মগ্ন আছেন এমন সময় অনতিদূরে সুলতানপুরের জমীদারের কোন কর্ম্মচারী ও জনৈক প্রজার মধ্যে কোন বিষয় লইয়া বিবাদ হইতেছিল। চীৎকার শুনিয়া তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি তখন উভয় পক্ষের বাদানুবাদ শুনিয়া তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতে চাহিলেন; উভয়ে সম্মত হইলে তিনি ক্ষেত্রের ফসলের এরূপ উচিত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন যে দুই পক্ষই সন্তুষ্ট হইল। এই সূত্রে স্থানীয় জমীদারগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহাদের অনুরোধে তিনি তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করেন। কিন্তু এখানেও উপার্জ্জনের বিশেষ সুবিধা না পাইয়া অন্যত্র প্রস্থান করেন। এদিকে অর্থাভাবে, অনাহারে এবং অনিদ্রায় তিনি যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে থাকেন। এরূপ অবস্থায় অনেকেরই সদসৎ বিচার ও সুবুদ্ধি লোপ পায় এবং কুপথ অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু সাধুতা এবং সৎসাহস, অন্তর্নিহিত উচ্চাভিলাষ এবং অধ্যবসায় তাঁহাকে সকল অবস্থাতেই সাহায্য করিয়াছিল। তিনি প্রাণপণ করিয়া সদুপায়ে উদরান্নের সংস্থান করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন এবং অনতিবিলম্বে জনৈক জমীদারের আস্তাবলে সহিসের কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন! এ অবস্থায় অবশ্য তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই, কিন্তু শ্রমবিমুখ ভেকধারী গর্ব্বিত ভিক্ষুকপরিপূর্ণ দেশে তাঁহার সৎসাহসের দৃষ্টান্ত বহু দরিদ্র অসহায়ের পথপ্রদর্শকরূপে বিদ্যমান থাকিবে। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় এই যুবক সহিসের প্রতিভা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তিনি সহিসের পদ হইতে জমীদারীতে মুন্সেরিমের পদে উন্নীত হইলেন। গুণজ্ঞ জমীদার গুণীর আদর করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া নূতন মুন্সেরিমের অনিষ্টসাধনে যত্ন করিতে লাগিল। অবশেষে এখানে থাকা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িল, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে বুন্দেলখণ্ডের

অন্তর্গত ওরাই নামক স্থানে ব্যবস্থাবিভাগে একটী কর্ম্ম পাইলেন এবং শীঘ্রই নিকটস্থ দেশীয় রাজ্য সাম্‌থারে ওয়াশীলবাকী-নবিশের পদ প্রাপ্ত হইলেন। সাম্‌থার রাজ্যে তিনি অল্পদিনেই যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এখানে তিনি একজন উৎকৃষ্ট কুস্তিগির ও সেতারবাদক বলিয়া বিখ্যাত হন। ক্রমে তিনি জনসাধারণ এবং রাজা ও প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের এতদূর প্রিয় হইয়া উঠিলেন যে একেবারে রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল। এখানেও নিম্নস্থ কর্ম্মচারীবর্গ ঈর্ষাবশে তাঁহাকে অপদস্ত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল কিন্তু তিনি সম্মানের সহিত কর্ম্ম করিতে করিতেই ঝাঁসির পূর্ত্তবিভাগে চলিয়া যান। এখানে কিছুদিন কর্ম্ম করিবার পর তথাকার এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ারের উর্দ্দূ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া শিপ্রী গমন করেন। ১৮৭১ অব্দে তিনি পণ্ডিত শিবচরণ লালের সহায়তায় শিপ্রীবাসী বালকগণকে ইংরাজী, পারস্য ও হিন্দী শিক্ষা দিবার মত একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। যমুনাদাস বাবু বিদ্যালয়ে অল্পই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু পরে অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। উত্তরকালে তাঁহাকে গ্রন্থ ছাড়া দেখা যাইত না। পারস্য ভাষা ও সাহিত্য তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল এবং তাহাতেই তাঁহার যত্ন অধিক ছিল। শিপ্রী অবস্থানকালে তিনি কিছুদিন "আগ্রা আখবার" প্রমুখ কয়েকখানি সাময়িক পত্রে উর্দ্দূ প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার ছাত্র এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ার স্থানান্তরে গমন করিলে তিনি পুনরায় কর্ম্মহীন হন এবং দিবান, গুনা, ইন্দোর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া ১৮৭৫ অব্দে আগ্রায় জননীর নিকট ফিরিয়া আসেন। এখানে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা বাবু উমাচরণ বিশ্বাস যমুনার সেতু-নির্ম্মাণ-কার্য্যবিভাগে কর্ম্ম করিতেছিলেন। যমুনাদাস বাবু এখানে আসিয়া উপার্জ্জনের নূতন পন্থা আবিষ্কার করিলেন। যে সকল য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী উর্দ্দূ ও হিন্দীতে পরীক্ষা দিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সময়ের ছাত্রদিগের মধ্যে মীরাটের ভূতপূর্ব্ব সেসন জজ শ্রীযুক্ত ম্যাকলীন্ সাহেব তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। আগ্রায় তাঁহার বহু উচ্চ পদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন বন্ধুর মধ্যে একজনের সহায়তায় তিনি আগ্রা মুন্সেফ আদালতের মুন্সেরিমের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদে তিনি বহুদিন সম্মানের সহিত কার্য্য করেন। প্রবাসী বাঙ্গালী-গৌরব স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন আগ্রার মুন্সেফ ছিলেন। অবিনাশ বাবু উর্দ্দূ ভাষায় ইহাঁর অসাধারণ অধিকার দেখিয়া ইহাঁকে "Civil Procedure Code" এবং "Specific Relief Act" উর্দ্দূ ভাষায় অনুবাদ করিতে দেন। যমুনাদাস বাবুর ঐ দুই অনুবাদ গ্রন্থ পরে আদালতে যথেষ্ট আদর পাইয়াছিল।

১৮৭৬ অব্দে যমুনাদাস বাবু তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর সহযোগে "ইন্দুপ্রকাশ" নামে একটী "লিথোগ্রাফিক প্রেস" প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই যন্ত্রালয় হইতে "আগ্রা নসীম" নামে একখানি উর্দ্দূ সংবাদপত্র সম্পাদন করিতে থাকেন। এই কাগজ এক্ষণে প্রতি মাসে আট সংখ্যা অর্থাৎ সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত হয়। তাঁহার বন্ধু সবজজ অবিনাশ বাবুর পরামর্শে তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন এবং ১৮৭৯ অব্দে মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পরবর্ত্তী পরীক্ষায় ওকালতী পাস করিয়া জেলা আদালতে ওকালতী করিতে থাকেন। অল্প দিনেই তাঁহার প্রতিভা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রসার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৮২ অব্দে স্বর্গীয় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আগ্রা আসিয়া ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ইহাঁর আলয়ে দুই মাস অবস্থিতি করেন। এই সময় যমুনাদাস বাবু স্বামীজীর ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া আর্য্যসমাজভুক্ত হন এবং শেষ পর্য্যন্ত স্বীয় বিশ্বাসে অটল থাকেন। আগ্রায় গোচারণ উৎসব ও মহরম লইয়া হিন্দু-মুসলমানে দুই তিন বৎসর ধরিয়া ভয়ানক কলহ চলিতেছিল, তখন ইনি কর্ত্তৃপক্ষ ও জন সাধারণের মধ্যে মধ্যস্থ স্বরূপ হইয়া বহু চেষ্টা, কৌশল এবং সাহসের সহিত উভয় পক্ষের মনোমালিন্য দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সূত্রে তাঁহার সহিত তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফিন্‌লের মনান্তর ঘটে এবং এই ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষের বিষনয়নে পড়িয়া যমুনাদাস বাবুকে কিছু কাল বিব্রত হইতে হয় কিন্তু তাঁহার সৎসাহস, সত্যপরায়ণতা ও সাধুতার পুরস্কার

স্বরূপ মাননীয় হাইকোর্ট তাঁহাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করেন।

যমুনাদাস বাবু বহুকাল মিউনিসিপাল বোর্ডের মেম্বর থাকিয়া জনসাধারণের অনুকূল কার্য্যসমূহে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দী ও উর্দ্দূ সাহিত্যে সুলেখক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং হিন্দী ভাষায় হিন্দুস্থানী মহিলাবৃন্দের হিতার্থ "ধাত্রীপ্রবোধিনী" নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত সটীক "মজমুনে জাবতা দিবাণী" এবং "মজমুনে জাবতা ফৌজদারী" আদালতে ও উকীলমহলে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। "নসীম আগ্রার" সম্পাদন কার্য্যে তিনি এতদঞ্চলে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং অসীম শ্রম ও ধৈর্য্য সহকারে এই পত্র পরিচালিত করিয়া লোকের বিশ্বাস ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং দারিদ্র্যের কঠোরতার মধ্যে মানুষ হইয়া উত্তরকালে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং আজীবন দরিদ্র নরনারীর সহিত আন্তরিক সহানুভূতিবশে প্রকৃত অভাবগ্রস্তকে মুক্তহস্তে সাহায্য দান করিয়া গিয়াছেন। বহু দরিদ্র বালক তাঁহার অর্থে শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহু বিধবা নারী তাঁহার অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায় ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হন নাই। তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া স্থানীয় ফিমেল মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই সকল মহিলার অনেকে Female Hospital Assistant হইয়া নারী-সমাজের প্রভূত হিতসাধন করিতেছেন। ১৯০০ অব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার জন্মস্থান আগ্রাতেই মৃত্যু হয়। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন।

কথিত আছে বাবু যমুনাদাস বিশ্বাস হিন্দুস্থানী পোষাক পরিধান করিয়া উর্দ্দূভাষায় কথোপকথন করিলে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিলেও কেহ তাহা সহসা বিশ্বাস করিতেন না এবং বিশ্বাস করিলেও তাঁহার উর্দ্দূভাষা ও পারস্য জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত "নসীম আগ্রা" এক্ষণে আগ্রা প্রবাসী উকীল শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সান্ন্যাল মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে।

হিন্দুস্থানী পোষাকে বাবু যমুনা দাস।

দারিদ্র্যের তীব্র জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া অনেকেই যে সাধু পথ হইতে বিচ্যুত, সত্যভ্রষ্ট এবং মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়ে, তাহাতে বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু যাঁহাদের অন্তরে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎ প্রতিভার অনল লুক্কায়িত থাকে, সাধুতার সহিত অধ্যবসায়, একাগ্রতা, স্বাবলম্বন, উচ্চাভিলাষ যাঁহাদের অন্তরে ধূমায়িত হইতে থাকে, তাঁহারা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মধ্যে আপনার উন্নতিপথ অন্বেষণ করিতে থাকেন, দারিদ্র্যের তীব্রতা তাঁহাদের নিকট উপহসিত হয় এবং তাঁহারা অদৃষ্টকে জয় করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত

করেন। তাঁহাদের জীবনে অলৌকিক বা ঔপন্যাসিক ঘটনার সমাবেশ না থাকিলেও তাঁহাদের সামান্য সামান্য কার্য্যকলাপ ও দৈনন্দিন জীবনের মধ্য দিয়া অপর সাধারণ হইতে তাঁহাদের বিশেষত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমরা এই উদ্যোগী ও স্বাবলম্বী পুরুষগণের সাধারণ জীবন হইতেই জাতীয় জীবনগঠনের উপযোগী শিক্ষা ও আদর্শ প্রাপ্ত হই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

বল্লাল সেনের তাম্রশাসন

কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তক বলিয়া বল্লাল সেনের নাম বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। নদীয়া জেলায় বর্ত্তমান নবদ্বীপের প্রায় তিনক্রোশ উত্তরপূর্ব্বদিকে বল্লালদীঘি নামক গ্রাম আছে। সেখানে অতি উচ্চ এক ভূমিখণ্ড আছে। তাহাকে লোকে "বল্লাল ঢিবি" বলিয়া থাকে। শুনা যায় সেখানে বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদ ছিল। কিন্তু তাহাতে কিছু আছে কিনা, বা থাকিলে কি আছে তাহার কোন অনুসন্ধান এপর্য্যন্ত হয় নাই। সেন বংশের লক্ষ্মণ ব্যতীত অপর কোন রাজার প্রদত্ত তাম্রশাসন ইতিপূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বল্লাল সেন লক্ষ্মণ সেনের পিতা। সম্প্রতি কাটোয়া মহকুমার ৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গ্রামে ভূমি খনন করিতে করিতে এক তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। পাঠ উদ্ধার করিয়া দেখা গেল তাহা বল্লাল সেনের প্রদত্ত। ইহাই এক্ষণ সেন বংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তাম্রশাসন, সুতরাং ঐতিহাসিকভাবে ইহার মূল্য খুব বেশী।

ইহা দীর্ঘে ১৫ ও প্রস্থে ১৩॥ ইঞ্চি। একটী চক্রে দশভুজ নানাস্ত্রধারী পদ্মাসনে উপবিষ্ট উৎকীর্ণ সদাশিব মূর্ত্তি ফলকের শীর্ষদেশে একটি ছিদ্রে কীলক দ্বারা সন্নদ্ধ আছে।

তাম্রশাসনের ভাষা সংস্কৃত। যে অক্ষরে লিখিত তাহা দেবনাগরও নয় বর্ত্তমান বাঙ্গলাও নয়; দেবনাগর ও বাঙ্গলা অক্ষরের মধ্যবর্ত্তী আকার বরং বাঙ্গলারই অধিক অনুরূপ।

তাম্রশাসনে যাহা উৎকীর্ণ আছে তাহার পাঠোদ্ধার যাহা হইয়াছে তাহা কোনো পরিবর্ত্তন না করিয়া অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি :—

ওঁ নমঃ শিবায়।

সন্ধ্যাতাণ্ডব সম্বিধান বিলসন্নান্দী নিনাদোর্ম্মিভি
র্নিস্মরী দরসাশ্রবোদি শতবঃ শেয়োর্দ্ধি নারীশ্বরঃ।
যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গ হার বলনৈ রর্দ্ধে চ ভীমোদ্ভটৈ
র্ন্নাট্যারম্ভ বায়ৈর্জ্জয়ত্যভিনয়দ্বৈধাম্নু বোধ শ্রমঃ॥

হর্ষোচ্ছালয় বিপ্লবো নিধিচয়াং ত্রৈলকাবীরস্মরো
নিস্তন্দ্রাঃ কুমুদাকরা মৃগদৃশো বিশ্রান্তমানাধয়ঃ।
যস্মিন্নভ্যুদিতে চকোর নগরাভোগেষু ভিক্ষোৎসবঃ
স শ্রীকণ্ঠ শিরোমণির্ব্বিজয়তে দেবস্তমীবল্লভঃ॥

বংশে তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচার চর্য্যানি রূঢ়ি
প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈ র্ভূষয়ন্তোনুভাবৈঃ।
শশ্বদ্বিশ্বাভয় বিতরণ স্থূল লক্ষ্যাবলক্ষৈঃ
কীর্ত্তুল্লোলৈ স্নপিত বিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ॥

তেষাম্বংশে মহৌজঃ প্রতিভট পৃতনাম্ভোধি কল্যান্ত সূরঃ
কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লাসলীলামৃগাঙ্কঃ।
আসীদাজন্ম রক্ত প্রণয়িজন মনোরাজ্যাসিদ্ধি প্রতিষ্ঠা
শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নিরুপধিকরুণাধাম সামন্তসেনঃ॥

তস্মাদজনি বৃষধ্বজচরণাম্বুজ ষটাদো গুণাভরণঃ।
হেমন্তসেন দেবো বৈরিসরঃ প্রলয় হেমন্তঃ॥

লক্ষ্মীস্নেহার্ত্ত দুগ্ধাম্বুধি বলন বয় শ্রদ্ধয়া মাধবেন
প্রত্যাবৃত্ত প্রবাহোচ্ছলিত সুরধুনী শঙ্কয়া শঙ্করেণ।
হংসশ্রেণী বিলাসোজ্জলিত নিজপদাহংযুনা বিশ্বধাত্রা
সূত্রামারাম সীমা বিহরণ ললিতাঃ কীর্ত্তয়ো যস্য দৃপ্তাঃ॥

তস্মাদভূদখিল পার্থিব চক্রবর্ত্তী
নির্ব্যাজ বিক্রম তিরস্কৃত সাহসাঙ্কঃ।
দিক্যাল চক্রপুটভিদন গীতকীর্ত্তিঃ
পৃথ্বীপতির্ব্বিজয় সেন পদ প্রকাশঃ॥

ভ্রাম্যন্তীনামূনান্তে পদবিম্বগদৃশাং হারমুক্তাফলানি
চ্ছিন্নাকীর্ণাণি ভূমৌ নয়নজল মিলৎকজ্জলৈ র্লাঞ্ছিতানি।
যত্নাৎ চম্বস্তি দর্ভক্ষতচরণ তলাস্থখিলিপ্তা নিগুঞ্জা
স্রস্থ সারস্য রামাস্তনকলশঘনাশ্লেষলোলাঃ পুলিন্দাঃ॥

প্রত্যাদিশন্ন বিনয়ং প্রতিবেশ্যরাজ
বভ্রাম কার্ম্ম কধরঃ কিল কার্ত্তবীর্য্যঃ।
অস্যাভিষেক বিধিমন্ত্র পদৈ স্ত্রিবীতি
রারোপিতো বিনয়বর্ত্মনি জীবলোকঃ॥

পদ্মালয়ে বদয়িতা পুরোত্তমস্য
গৌরীব বালয়জনীকর-শেখরস্য।
অস্য প্রধান মহিষী জগদীশ্বরস্য
শুদ্ধান্ত-মৌলিমণি রাস বিলাস দেবী।

এষা সুতং সুতপসাং সুকৃতৈ রসূত
বল্লালসেনমতুলং গুণ গৌরবেণ।
অধ্যাস্তপঃ পিতুরনন্তরমেক বীর
সিংহাসনাদ্রিশিখরং নরদেব সিংহঃ॥

যস্যারি রাজশিশবঃ শবরালয়েষু
বালৈরলীক নরনাথ পদেভিষিক্তাঃ।
দৃপ্তাঃ প্রমোদ তরলেক্ষণয়া জনন্যা
নিশ্বস্য বৎসলতয়া সভয়ং নিষিদ্ধাঃ॥

ক্রীতাঃ প্রাণতৃণব্যয়েণ রভসাদালিঙ্গ্য বিদ্যাধরী
বাকল্যাং বিহরন্তি নন্দন বনাভোগেষু সংসপ্তকাঃ
ইত্যালোচ্য নৃপৈঃ স্মর প্রণয়িতা ভীতৈঃশ্রিত সুর্ব্বধু
নেত্রেন্দীবর তোরণা বলিময়ো যস্যাসিধারা পথঃ॥

দদানাসৌবর্ণ্ণং তুরগমুপরাগে মুরমণে
যদস্তোদস্রাক্ষীদহনি জননী শাসন পদম্।
নৃপস্তাম্রোৎকীর্ণ্ণং তদয়মদিতো রাম বিদুষে
সতাং দৈন্যোত্তাপ প্রসমনফলা কাল জলদঃ॥

স খলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয় সেন দেব পাদানুধ্যাৎ পরমেশ্বর পরম মাহেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজা ধরাজ শ্রীমদ্বল্লাল সেন দেবঃ কুশলী। সমুপগতাশেষ রাজরাজন্যক রাজ্ঞী রাণক রাজপুত্র রাজামাত্য পুরোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃত অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক মহাক্ষপটলিক মহাপ্রতীহার মহাভোগিক মহাপীলুপতি মহাগণস্থদৌসৃসধিক বৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্ব গোমহিষাজাবিকাদি ব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবিনোধ্যক্ষ প্রচারোক্তান্ ইহাকীর্তিতান্ চট্টভট্ট জাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথাহং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ।

মতমস্তু ভবতাং।

যথা শ্রীবর্দ্ধমান ভুক্ত্যন্তঃপাতিন্যুত্তর রাঢ়ামণ্ডলে সাল্য দক্ষিণ বীথ্যাং খাণ্ডয়িল্ল শাসনোত্তরস্থিত সিঙ্গটিআ নদ্যারতঃ নাড়ীচা শাসনোত্তরস্থ সিঙ্গটিআ নদীপশ্চিমোত্তরতঃ অম্বয়িল্লা শাসন পশ্চিমস্থিত সিঙ্গটিআ পশ্চিমতঃ কুট্টম্বমা দক্ষিণ সীমালি দক্ষিণতঃ কুড়ম্বসা পশ্চিম পশ্চিমগতি সীমালি দক্ষিণতঃ আড়ড়হা গণ্ডি আদক্ষিণ গোপথ দক্ষিণতঃ তথা আডড়া গণ্ডি সোত্তর গোপথনিঃসৃত পশ্চিমগতি সুচকোণা গণ্ডি আকাচোত্তরালি পর্য্যন্ত গত সীমালি দাক্ষণতঃ নাড়িডনাশাসন পূর্ব্ব সীমালি পূর্ব্বতঃ জলশোথা শাসন পূর্ব্বস্থ গোপথার্দ্ধ পূর্ব্বতঃ মোলাড়ন্দী শাসন পূর্ব্বস্থিত সিঙ্গটিআ পর্য্যন্ত গোপথার্দ্ধ পূর্ব্বতঃ। এবং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ বাল্লহিট্টা গ্রামঃ শ্রীবৃষভ শঙ্কর নলেন সবাস্তু নালখিলাদিভিঃ কাকত্রয়াধিক চত্বারিংশদুন্মান সমেত আঢ়ক নব দ্রোণোত্তর সপ্ত ভূপাটাত্মকঃ প্রত্যব্দং কপর্দ্দক পুরাণ পঞ্চশতোৎপত্তিকঃ সসাট বিটপঃ স্থার্তোধর সজলস্থলঃ সগুবাক নারিকেরঃ সহ— দশাপরাধঃ পরিহৃত সর্ব্বপীড় তৃণপূতি গোচর পর্য্যন্তঃ অচট্টভট্ট প্রবেশঃ অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যঃ সমস্ত রাজভোগ্য কর হিরণ্য প্রত্যায় সহিতঃ।

বরাহ দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় ভদ্রেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ভরদ্বাজ সগোত্রায় ভারদ্বাজাঙ্গিরসবার্হস্পত্য প্রবরায় সামবেদ কৌথুমশাখা চরণানুষ্ঠায়িনে আচার্য্য শ্রী ওবাসু দেবশর্ম্মণে। অস্মন্মাতৃ শ্রীবিলাস দেবীভিঃ স্বুরসরিতি সূর্য্যোপরাগে দত্ত হেমাশ্ব মহাদানস্য দক্ষিণাত্বেনোৎসৃষ্টঃ মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য যশোভিবৃদ্ধয়ে আচন্দ্রার্কং ক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোস্মাভিঃ।

অতোভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং। ভাবিভিরপি নৃপতিভি অপহরণে নরকপাত ভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ঃ।

ভবন্তিচাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ।

বহুভির্বসুধাদত্তা রাজভস্ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমি প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি পিতামহাঃ।
ভূমিদাতা কুলে জাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥
ষষ্ঠিং বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তাচ তান্যেব নরকং ব্রজেৎ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হরেত বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
ইতি কমলদলাম্বুবিন্দু লোলাং
শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্য জীবিতং চ।
সকলমিদমুদাহৃতং চ বুদ্ধা
নহিপুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥

জিত নিখিল ক্ষিতিপালঃ শ্রীমদ্বল্লাল সেন ভূপালঃ।
ওবাসু শাসনে কৃতদূতং হরিঘোষ সান্ধিবিগ্রহিকং।
সং ১১ বৈশাখ দিনে ১৬ শ্রীনি। মহাসাংফরণনি॥

উৎকীর্ণ বিষয়ের মর্ম্ম স্থূলত এই ঃ—

১ম হইতে ৩য় শ্লোকে মহাদেব, চন্দ্র, ও চন্দ্র বংশের বর্ণনা।

চন্দ্র বংশে রাজা সামন্ত সেনের জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র রাজা হেমন্ত সেন। হেমন্ত সেনের পুত্র মহারাজ চক্রবর্ত্তী বিজয় সেন। বিজয় সেনের প্রধানা মহিষী রাসবিলাস দেবীর (বা বিলাস দেবীর) গর্ভে বল্লাল সেনের জন্ম হয়।

বল্লাল সেনের মাতা বিলাসদেবী সূর্য্যগ্রহণ সময়ে গঙ্গাজলে সুবর্ণনির্ম্মিত অশ্ব একজন ব্রাহ্মণকে দান করেন ও সেই মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপে ভূমি দান করেন। তাৎকালিক প্রথানুযায়ী ঐ দত্তভূমির দানপত্র তাম্রশাসনের দ্বারায় বল্লাল সেন বিধিবদ্ধ করিতেছেন।

(সেই উদ্দেশ্যে) বিক্রমপুর সমাবাসিত (রাজধানী) জয়স্কন্ধাবার হইতে অন্যান্য রাজা রাজ্ঞী, যাবতীয় রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য লোককে আদেশ করা হইতেছে যে সকলেই যেন ঐ দান মান্য করিয়া চলেন। বর্ত্তমান বা ভাবী কেহই যেন কাড়িয়া না লয়েন।

যে ভূমি দান করা হইয়াছে তাহার পরিচয় এই :—

"বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তর রাঢ় মণ্ডলে" "বাল্লহিট্টা" গ্রাম।

এই গ্রামের পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপ সীমানির্দ্দেশ আছে। চতুঃসীমা স্থূলত এই :—

উত্তর—"কুড়ম্বসা" শাসনের দক্ষিণস্থ "সীমালি" গ্রাম ও ঐ গ্রাম হইতে দক্ষিণে "তরালি" গ্রাম পর্য্যন্ত যে গোপথ গিয়াছে সেই গোপথ।

দক্ষিণ—"খাণ্ডয়িল্লা" শাসনের উত্তরস্থ "সিঙ্গটিয়া নদী।"

পূর্ব্ব—অম্বয়িল্লা শাসনের পশ্চিমস্থ "সিঙ্গটিয়া" নদী।

পশ্চিম—নাড্ডিনা শাসনের পূর্ব্বস্থ "সীমালি" গ্রাম, ও "জলশোথী" গ্রামের গোপথ।

এই "বালহিট্টা" গ্রামের পরিমাণ ও বার্ষিক রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার দববস্ত হক হকুক "হিরণ্য প্রত্যায় সমেতং" চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

দানের পাত্র বরাহ নামক ব্রাহ্মণের প্রপৌত্র, লক্ষ্মীধরের পুত্র, ভরদ্বাজ গোত্রীয় সামবেদী কৌথুম শাখানুষ্ঠায়ী "ওবাসু"।

এই দত্তভূমি কেহ প্রত্যাহার না করেন সেই জন্য অপহরণে পাপ ও দানে পুণ্যার্থবাচক ধর্ম্মশ্লোক পাঁচটি উদ্ধৃত আছে।

সমুদয় সম্পদ ও মনুষ্যজীবন পদ্মপত্র-জলবিন্দুর ন্যায় গণ্য করিয়া কাহারও পরকীর্ত্তি লোপ করা উচিত নয়।

সন তারিখের স্থলে লেখা আছে "সং ১১ বৈশাখ দিনে ১৬" অর্থাৎ রাজত্বের ১১ বর্ষে বৈশাখের ১৬ তারিখে।

উল্লিখিত স্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধানে যাহা বুঝা গিয়াছে তাহা এই—

বর্দ্ধমান, উত্তর রাঢ় সকলেই জানেন। "বাল্লহিট্টা" বর্ত্তমান "বালুটে"; কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। দক্ষিণ সীমায় যে "খাণ্ডয়িল্লা"র উল্লেখ আছে তাহাই বর্ত্তমান "খাঁড়ুলিয়া" বা "খাঁড়ুলে"। পশ্চিম সীমা নির্দ্দেশে যে "মোলাড়ন্দি" "জলশোথী" "তরালি" ও "সীমালি" আছে তাহা বর্ত্তমান "মুড়ান্দি" "জলশোথী" "তরালি" ও "সিমুলে"। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই।

বালুটে গ্রামের তিনদিক দিয়া অতি বক্রগতিতে ছোট খাল বা নদী (স্থানীয় ভাষায় কাঁদড়) আছে। উহাই অতীত কালের "সিঙ্গটিয়া" নদীর চিহ্ন স্বরূপ। নদীর গতি পরিবর্ত্তনে "বালুটে" গ্রামের পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব-দক্ষিণে যে সব গ্রাম ছিল তাহা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এখন ঐ দিকে বিস্তৃত মাঠ ও বহুদূরে পূর্ব্বদিকে "অনন্তপুরা" "কেউগুঁড়ি" গ্রাম ও পূর্ব্ব দক্ষিণে "গঙ্গাটিকুরি" গ্রাম—সম্ভবতঃ নূতন পত্তন। "বালুটের" উত্তরে মুর্শিদাবাদ কাঁদি মহকুমার সীমা আরম্ভ হইয়াছে। সেদিকে উত্তরে "নূতন গ্রাম" "বিরাহিমপুর" ও দূরে "সালার" নামক গ্রাম আছে। তাম্রশাসনে স্থান নির্দ্দেশে "সাল্য দক্ষিণ বীথ্যাং" এই পদ আছে। ইহার অর্থ যদি "সাল্য গ্রাম হইতে যে পথ দক্ষিণদিকে গিয়াছে সেই পথে" এইরূপ হয়, তবে "সাল্য" গ্রামের সহিত বর্ত্তমান "সালার" গ্রামের নামের সাদৃশ্য আছে।

তাম্রশাসনের সময় নিরূপণ :—

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের প্রকাশিত "বিদ্যাপতি" পুস্তকের উপক্রমণিকায় লিখিত আছে যে কাব্যবিশারদ মহাশয় যখন মিথিলায় বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে যান তখন সেখানে "লক্ষ্মণসেনাব্দ" নামক এক "অব্দ" প্রচলিত থাকা দেখিয়াছিলেন।

রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিসপি নামক গ্রাম দান করিয়া যে দানপত্র দেন তাহার এক অনুলিপি ঐ পুস্তকের প্রথম পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত আছে। ঐ দানপত্রের তারিখ লক্ষ্মণসেনাব্দ ২৯৩ শ্রাবণ সুদি ৭ গুরৌ এই তারিখ ও তৎসঙ্গে সন ৮০৭ সংবৎ ১৪৫৫ শাক ১৩২১ ইহাও লেখা আছে। দানপত্রের প্রথম শ্লোক হইতেও লক্ষ্মণাব্দ ২৯৩ বুঝা যায়। ইহা হইতে লক্ষ্মণাব্দের ২৯৩ ও বাং সন ৮০৭ এতদুভয়ের একত্ব এবং ৫১৪ সনে লক্ষণাব্দ প্রচলিত হওয়া জানিতে পারা যায়। রাজ্যারম্ভ হইতেই যে অব্দ গণনা হইয়াছে ইহা নিশ্চিতই ধরা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ৫১৪ সনে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব আরম্ভ

এবং কাজেই ঐ সনই তৎপিতা বল্লাল সেনের রাজত্বের শেষ।

বল্লাল সেনের রাজত্বকাল কত বৎসর ছিল তাহার নির্ণয় করিতে অনুমানের উপরই নির্ভর করিতে হয়।

বল্লাল সেন যে কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। এরূপ এক অভিনব সামাজিক প্রথার প্রবর্ত্তনে ইচ্ছা বা উদ্যোগ অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সেই সম্ভব। তাম্রশাসনের ৯ম ও ১০ম শ্লোকের অর্থ স্থূলতঃ যাহা বুঝিতে পারা যায় তাহাতে বিজয় সেনের মৃত্যুর পরে যে তাঁহার মহিষী বিলাসদেবী বল্লাল সেনকে প্রসব করিয়াছিলেন এইরূপই বোধ হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে কোন অভিনব প্রথার প্রবর্ত্তক তাহার প্রচলন কল্পে যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করেন তাঁহার পরবর্ত্তী অন্য কাহারও ততখানি যত্ন বা উদ্যোগ থাকে না। বল্লাল সেনের পুত্র যে পিতার শৈবমত উপেক্ষা করিয়া নিজে বৈষ্ণব মত আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা উভয়ের তাম্রশাসন দৃষ্টে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যিনি পিতার ধর্ম্মমত ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহার নিকট পিতার প্রচলিত অভিনব সামাজিক প্রথার যে বিশেষ আদর ছিল এমত বোধ হয় না। সুতরাং পরবর্ত্তীকালে কৌলিন্য প্রথার স্থায়ীভাবের বিস্তৃতি হইতে এই বোধ হয় যে এই প্রথা প্রচলন ও পোষনে যে দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা ও যত্ন আবশ্যক হইয়াছিল তাহা প্রথাপ্রবর্ত্তক বল্লাল সেন নিজেই করিয়া গিয়াছিলেন। অতএব স্থূলতঃ বল্লালের রাজত্বকাল ৫০ বৎসর অনুমান করিলে নিতান্ত অযৌক্তিক হয় না।

উল্লিখিত যুক্তিতে এই স্থির হয় যে বাং ৪৬৪ সাল বল্লালের রাজত্বের আরম্ভ ও সেই সন হইতে ১১ বর্ষে অর্থাৎ বাঙ্গলা ৪৭৫ (ইংরাজি ১০৬৮ খৃঃ অব্দে) এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল।

তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষর সম্বন্ধে পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি—

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী,
মুনসেফ, কাটোয়া, জেলা বর্দ্ধমান।

মঞ্জুলা *

মঞ্জুলানাম্নী কোনো নারী দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে বর পাইয়াছিল যে সূর্য্যদেব ও সুরদাস, দেবতা ও নর, এই উভয়ের মধ্যে একতমকে সে পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে। অতঃপর উভয় পক্ষের নিবেদন শুনিয়া মঞ্জুলা সুরদাসকেই বরণ করিল।

রূপে বিদ্ধ সুরদাস বসন্ত নিশীথে
পালঙ্কে লুটায়ে কাঁদে "মঞ্জুলা, মঞ্জুলা !"
বাহির আঁধার হতে ভেসে-আসা যত
অদৃশ্য ফুলের গন্ধ, সিক্ত মালঞ্চের
বাষ্পের উদ্বেগ, চন্দ্রহীন অন্ধরাত্রি,
অন্তরে ঘনায়ে তার লাগিল ফিরিতে।
অবশেষে উঠিল সে। যে গম্ভীর ক্ষণে
অনুভবে বুঝা যায় প্রচ্ছন্ন ঊষারে,
অনুমানে দেখা যায় তিমিরের তলে
নিকুঞ্জের শ্যামল আভাস,—সেই ক্ষণে
বাতায়ন হতে হেলি বাহিরের মুখে
প্রত্যূষের বসন্তের অস্ফুটতা পানে
দাঁড়াইল সুরদাস। তখন মঞ্জুলা
প্রভাত ভাবনা লয়ে ফিরিছে শিশিরে
নিদ্রা ভাঙি উজ্জ্বল নবীন—কপোলেতে
ক্লান্তিহর বিশ্রামের সরসরক্তিমা,
অনিন্দ্যফলের মত দেহকান্তি তার
যেন সেই মুহূর্ত্তেই পূর্ণ পরিণত।
সুদূর দ্যুলোক ভেদি মহাস্বর্গ হতে
তার মর্ত্ত্য মধুরিমা এনেছে ভুলায়ে
সূর্য্যদেবতার মন। আজি দ্বিপ্রহরে
মঞ্জুলা করিবে স্থির নর কি অমর—
সূর্য্য কিম্বা সুরদাস—কারে মাল্যদানে
বরণ করিবে স্বয়ম্বরে। তাই যবে
মেঘহীন দীর্ঘ দিন ভেসে যায় চলে—
যে গাঢ় সুনীল ক্ষণে বসন্ত বেলায়

---

* Stephen Philipsএর Marpessa কাব্যের অনুবাদ।

নিরলস মধুপের আনন্দ গুঞ্জনে
মুখরিত হয়ে ওঠে মাধবীমঞ্জরী,
আলোক কাঁপিতে থাকে একান্ত আবেগে,
উত্তাপ উদাস ক্লান্ত, প্রতি গুল্মফুল
মধ্যাহ্নের মহিমায় নত অভিভূত,—
তিনজনে মিলিল সে ক্ষণে,—মাঝখানে
দাঁড়ায়ে মঞ্জুলা,—একধারে সূর্য্যদেব
সদ্যজ্যোতি বিস্তারিয়া সমস্ত ধরায়
আগত আগ্রহে, অন্যধারে সুরদাস
নিদ্রাহীন যুবা। ধারাস্নাত পুষ্পসম
নবীন লাবণ্যখানি রমণীর দেহে
সৌভাগ্যের অভিষেকে উঠেছে উজ্জ্বলি ;—
বক্ষেব একান্তে আসি মূঢ় মধুকর
মূর্চ্ছিয়া পড়িতেছিল বিহ্বল তন্দ্রায়।
দেবতা ধাইল যবে আলিঙ্গিতে তারে
অমনি ধ্বনিল বজ্র, শুনিল তাহারা
ক্ষণ পরে মহেন্দ্রের দূরাগত বাণী—
"স্বয়ম্বরা হউক মঞ্জুলা!" সূর্য্যদেব
বাতাহত শিখাসম ঢুলি আশু পিছু
জ্বলিতে লাগিলা ক্ষুব্ধ সুন্দর আক্রোশে
গুমরিয়া ; প্রিয় তাঁর পশ্চিমের দ্বীপে
যেমন করেন দান প্রসন্ন কিরণ
তেমনি হাসিয়া শেষে কহিলেন কথা ;—
"মঞ্জুলা, যদিও ক্লেশ, কিম্বা দুঃখলেশ
আমারে স্পর্শিতে নারে বিধির বিধানে,
আত্মবশ ভূমানন্দে কাটে নিত্যকাল,
অবাধে দেবাত্মা মোর ভেসে চলে যায়
শান্তির প্রবাহে,—তবুও তোমারে হেরি
কল্পনায় লভিলাম দুঃখের পরশ।
এমন সুন্দরী তুমি, নরজন্মক্লেশ
তুমিও ভুঞ্জিবে? তোমার জীবনটুকু
শূন্যপানে বিকশিত ফুলের কাহিনী,
বায়ু আর কালের খেলেনা, গোলাপের
মত তুমি নিরর্থক শোভার ঈশ্বরী ;
কেবলি সুন্দর হবে এই ভাগ্য তব ;—
তুমি বিকাশের ধন প্রয়াসের নহ,—
কেবলি মধুর হবে ব্যথা না সহিয়া
দেবতার কৃপায় লালিত। ফুটিয়াছ
নববসন্তের কোলে এই ত সেদিন—
তুমিও বরিবে দুঃখ, প্রতি দণ্ড পল
তোমারে গ্রাসিবে, ছিন্ন করে নিয়ে যাবে
অন্তিম সন্ধ্যায়? হায় হেরিতেছি আমি
এখনি চলেছ সেই তামসীর পানে।
মহত্ত্বের প্রতি তব উদার উৎসাহ
ধীরে ধীরে জুড়ায়ে আসিবে, একদিন
প্রেমেরে করিবে ব্যঙ্গ বিজ্ঞ পরিহাসে ;
ক্রমশঃ দেখিতে পাবে ভক্তির মাধুরী
মানিতেছে পরাভব কালের নিকটে ;
নিদারুণ কৃতঘ্নতা প্রিয় সন্তানের
বাজিবে দুঃসহ দুঃখ ; দাঁড়াবে একদা
দীপ্তিহীন যৌবনের শ্মশান সৎকারে
ভদ্রশিষ্ট বেশে। শ্যামল শীতল রাত্রি
স্তব্ধ হবে যবে—সেই ক্ষণে জেগে রবে
মোহ অপগত শুষ্ক নিঃস্বপ্ন নয়নে—
পার্শ্বে শুয়ে পতি তব পরিচয়হীন।
কিন্তু যদি মোর সাথে কর তুমি বাস
ভূলোকের ঊর্দ্ধে রবে পরম পুলকে
সচল সজীব শান্তি মাঝে—সেই খানে
শ্রমমাত্রে উথলে আনন্দ পারাবার,
বিশ্রামেতে বহে প্রাণে হরষহিল্লোল।
কি আশে রমণী যাচে মানবের প্রেম,
আছে কি তাহার? প্রথম প্রারম্ভ তার
দয়াহীন সম্ভোগের আবেগে পাণ্ডুর,
রূপের লভিলে স্বাদ ক্লান্ত অবসাদে
অরুচি-অযত্নে অবসান। খোঁজে নর
যে অনিন্দ্যমুখ তাহা বিশ্বের অতীত ;
স্বপ্নাবেশে হেরি তার মর্ত্ত্য মরীচিকা
স্পর্শ করে—ছায়া দেখে দূরে চলে যায়।
তবে কি মরিবে তুমি? দিবে জলাঞ্জলি
মৃত্যুহীন জীবনের মহৎ ভাবনা—

হতাশ সমাধিশয্যা করিবে আশ্রয়
সকল সঙ্কল্প করি ধুলায় বিলীন ?
লাবণ্য, রাগিণী আর প্রাণবায়ু মিলি
একটি সঙ্গীতরূপে রচিল তোমারে
সে কি ঘূর্ণ-বালুকায় যাবে ছড়াইয়া ?
নৈশবায়ু তব আয়ু কোন্ সিন্ধু পানে
নিয়ে যাবে ?　হায়রে নিঃশ্বাসজীবী প্রাণী,
বারেক আসিয়া ভবে ক্ষণেকে ফুরাবি ?
এই পরিণামশোকে এত মূল্য তব,
মাটিতে মিশাবে বলে তুমি অপরূপ।
তবু যদি মোর সাথে কর তুমি বাস
চুম্বনে ঢালিয়া দিব দীপ্ত অমরতা
অধরে তোমার ; লয়ে যাব ঊর্দ্ধলোকে,—
আলোকে আনন্দে বিশ্ব করিয়া আপ্লুত
যে হর্ষ উপজে তাহা দুজনে ভুঞ্জিব !
মোর পানে সমুদ্রের প্রথম উচ্ছ্বাস
হেরিবে সে তুমি ; শিশিরে করিয়া স্নান
আরক্তিম ধরণীর কৃতজ্ঞ চাহনি
ঊর্দ্ধমুখে,—হেরিবে প্রত্যূষে।　মোরা দোঁহে
নাচিব অম্বরতলে,—নিম্নে বারাণসী
ঝলসিবে, মর্ম্মরিবে, করিবে ক্রন্দন,—
উদ্দীপ্ত হইবে উজ্জয়িনী, লুটিবে সে
আমাদের পদপ্রান্তে লয়ে পৌরজনে !
উঠিবে প্রোজ্জ্বল হয়ে পূজারি এসিয়া
বিপুল বিকাশে ; মোরা দোঁহে যাব শূন্যে,
আলোকিবে মহাদ্বীপ হতে মহাদ্বীপ,
সিন্ধু হতে সিন্ধু ঝলকিবে, দ্রুতহাস্যে
তুলিবে আতপ্ত করি সমস্ত ধরণী।
না হয় রমণী তুমি দিব তোমা তরে
কমনীয় কর্ম্মভার ; ধীরে প্রকাশিবে
সাগরের পরে, উর্ম্মিক্ষুব্ধ ব্যাকুলের
মিটাইবে আশা ; অথবা রচিবে তুমি
মহীয়সী কল্পপুরী সন্ধ্যাভ্র-শিখরে।
ফলায়ে তুলিবে যত্নে ধান্যের মঞ্জরী,
ঘনায়ে তুলিবে তাহে গাঢ় শ্যামলিমা।

শীত অরণ্যের জীর্ণ পর্ণস্তবকের
পীতবর্ণ অন্তিম-সৎকারে রবে তুমি
নিস্তব্ধ মুরতি। প্রসন্ন মুহূর্ত্তগুলি
প্রশান্ত কালের সনে মিলি করে লীলা
তাহাদের মন্ত্রণায় তুমি দিবে যোগ।
অথবা করিয়ো যাহা প্রাণ চায় তব,—
চিররুগ্ন অভাগারে মাধুর্য্যে ভুলায়ে
আনিয়ো বাহিরে ; পার্শ্বে লয়ে মৃত জন
ঊর্দ্ধমুখে যে তাকাবে দিয়ো তার ভালে
স্বর্ণ আশীর্ব্বাদী,—মার্জ্জনা-বঞ্চিত জনে
প্রসন্ন আলোক হতে কোরোনা বঞ্চিত ;
সুধীর শুশ্রূষা দিয়ে করি দিয়ো দূর
বিকার রোগীর চিত্তে আশঙ্কার ছায়া।"
দেবতার বাক্য শেষে' কহে সুরদাস
সবিনয়ে—"এ হেন বিচার শুনি আর
কি কহিব, কি দেখাব ক্ষীণ প্রলোভন ?
তবু জানি নারীচিত্ত দুরাশার চেয়ে
করুণায় ভোলে, তাই কহি দুটি কথা।
ওই দেহ বিশ্বের মাধুরী দিয়ে ভরা,
ফাল্গুনের লাবণ্যে উজ্জ্বল, মাধবীর
মদপাত্র, মলয় সমীরে হিল্লোলিত,
জীবনের নিশাপ্রান্তে তরুণ অরুণ,—
শুধু ওই দেহ তরে নহে মোর প্রেম।
প্রণয়ীর তন্দ্রালস দৃষ্টি-অভিহত
কম্প্র স্তন, সঙ্কটজটিল কেশজাল
তারো তরে নহে ; ওই যে তোমার মুখ
যার লাগি স্বর্ণপুরী ধ্বংশ হতে পারে
লোভের বিপ্লবে, অথবা তারুণ্য তব
অপূর্ব্ব স্বপ্নের মত ছাইল যা মোরে
তারো তরে নহে। তবে কেন ভালবাসি ?
অনন্ত তোমার পরে আছে পক্ষ মেলি,
আধ ছায়া আধ ভাবে পরিপূর্ণ তুমি ;
যে কথা বলিতে সিন্ধু প্রাণপণ বেগে
শৈলতটে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া—সে বাণীর
অর্থ তুমি ; সমীরণে অকথিত যাহা

স্তব্ধরাত্রে যাহা আভাসিত—তুমি তাই !
কণ্ঠ তব জন্মান্তরশ্রুত গীতিসম
মায়াবীণা-ঝঙ্কারিত মায়াসিন্ধু পারে।
তব মুখখানি যেন লোকান্তরস্মৃতি,
যেন তারি লাগি প্রাণ সঁপেছে কে কবে,
যেন তারি লাগি গান রচেছে কে কোথা !
অস্ত-শৈল-শিখরের অপরূপ মোহ,
সিন্ধুপ্রান্তে দিগন্তের ছায়াম্লান মায়া
আছে ওই মুখে। তব কাছে জাগে মনে
দুর দেশ, দুর কাল, দুর জন্ম যত,
কত না জ্যোতিষ্কলোকে কত জীবলীলা।
অয়ি কান্তি ঐকান্তিকী, প্রদীপ সমান
পরিস্ফুট, এ আঁধার পৃথিবী প্রদেশে !
তুমি মোর ব্যথা, মোর প্রথম আলোক,
মোর গীতধ্বনি ম্রিয়মাণ !" সুরদাস
এতেক কহিতেছিল যবে—মঞ্জুলার
নিঃশ্বাস বহিতেছিল উদ্ভিন্ন অধরে,
হেলিতেছিল সে ক্রমে আকাশের মাঝে
বাষ্পাকুল আঁখি, যেন স্বপ্ননিমগনা।
অবশেষে লয়ে কর মানব যুবার
আপনার করতলে—কহিলা তপনে :—
"হে অস্ফুট নিশান্তের ধীরে বিকশিত
শতদল ! তব তাপ কবর ভেদিয়া
মৃতেরে পরশ করে ; হে উষার অন্তরাত্মা,
ওগো ফুলকাননের কুলপুরোহিত,
কি মোহনরূপে তুমি যাও অস্তাচলে
অনন্ত আলয় পানে করি আকর্ষণ
উৎসুক অন্তর,—পৃথিবী নারীর পতি,
আচম্বিতে উঠ মর্ত্ত্যে—তোমা তরে পাতা'
বরশয্যাপরে যেন হে অধীর বর !
তব দিব্য রথযাত্রা দেখিবারে চাহি,
তব পরাভূত ভৃত্য মহাসমুদ্রের
মহাদৃশ্য,—মানবের বিচিত্র প্রয়াস
লোকালয়ে, এসিয়া চরণে প্রসারিত
ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে অলস ; কেশপাশে
প্রচ্ছন্ন আফ্রিকা ; ভারত সমাধিমগ্ন।
আকাশে কিরণপুঞ্জ বিকীর্ণ করিয়া
ছড়াতে নীরব হর্ষ বড় সে মধুর ;
আরো সে মধুরতর বন সীমান্তরে
ফলেরে করিতে পুষ্ট, ভূ-সমাধি হতে
শ্রাবণের স্নেহধারা-লালিত গোধুমে
জাগাইতে পুনর্জ্জন্মে স্বর্ণ মহিমায় ;—
চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি শান্ত কাল সনে
যত কার্য্য করে তারি সাথে যোগ দিতে।
সব চেয়ে প্রিয় কাজ—উর্দ্ধে চাহে যারা
মৃতের শিয়রে বসি, তাদের ললাট
উদ্ভাসিতে, হতাশেরে সঁপিতে আলোক ;
ধ্যানরতা রমণীর বিরহ রজনী
করি দিতে অবসান, বিকার রোগীর
আক্ষেপ করিতে শান্ত স্নিগ্ধ শুশ্রূষায়।
কিন্তু মোর মর্ত্ত্য আশা মর্ত্ত্য ভাষা শুনি
নাহি নিয়ো অপরাধ। তুমি গাহিতেছ
অমৃতের জয়গান, ভূমি হতে তুমি
উর্দ্ধে মোরে তুলি মম সদ্য মুকুলিত
দেহকান্তি নিতে চাও মৃত্যু হতে কাড়ি।
জানিনা এখনো আমি দুঃখ কারে বলে,
জলতলে পদ্মসম কাটায়েছি দিন,
বিধাতার ঝড় মোরে বিধির কৃপায়
করেনি পরশ, শুধু মৃদু মলয়ের
সোহাগের ধন আমি। স্থলবাসী যথা
শীতের আগুন ঘিরে পান্থশালে বসি
সাগরবিহারক্লান্ত বণিকের মুখে
শুনে প্রবাসের কথা—সেই মত আমি
ভবের তরঙ্গক্ষুব্ধ প্রবীণের কাছে
সুদূর দুঃখের বার্ত্তা শুনিয়াছি কানে।
শুনেছি কতনা তরী দুঃখসাগরের
বন্দরে রয়েছে বাঁধা, সে কাহিনী শুনে
কানে পশিয়াছে মোর নিদ্রাহীন রাতে
ভবদুঃখ-বারিধির কল্লোল-আভাস।
মনে পড়ে, শুনিয়াছি—বিশ্বাস সঁপেছে

কত নর, ভাল বাসিয়াছে কত নারী,
দীর্ঘদুঃখ সহি তারা, মরণের পরে
প্রাণের অক্ষয় ক্ষত সান্ত্বনাবিহীন
অনন্তে লইয়া গেছে ;—শুনিয়াছি কেহ
লক্ষ্য পানে ছুটে ছুটে ঊর্দ্ধশ্বাসবেগে
মরিয়াছে পরিণাম না করিয়া লাভ।
মনে পড়ে সব চেয়ে আমার মায়েরে—
শিশুকালে কত দিন কপোলে তাঁহার
মুখ রাখি অশ্রু তাঁর পেতেম জানিতে।
হাসিমুখে মোর পানে চাহিয়া সহসা
আঁখি তাঁর সিক্ত হত,—আমারো নয়নে
ভরিয়া আসিত জল না বুঝিয়া কিছু,—
এ কি দুঃখ, ভাবিতাম নীরব বিস্ময়ে।
এ যখন মনে পড়ে, কেমনে বলিব
দুঃখের বৈরাগ্যশিক্ষা লভিয়া আমিও
আমাদের এ নিস্তব্ধ ধীর ধরণীরে
লব না বরণ করি ? সেথা শান্ত শুয়ে
প্রেমে প্রাণ আপনি ভরিবে—মধুরতা
উদিবে আপনি, মালঞ্চের অনিবার
আনন্দের মত। মোর দেহভস্ম সেও
শান্তিমন্ত্র কবে—পীড়িত হৃদয় পাবে
চরম সান্ত্বনা। কিম্বা যদি পরলোকে
নাহি ফোটে ফুল, নাহি জাগে কলধ্বনি,
না আসে ভোরের গন্ধ, না দুলে পল্লব,
না জাগে মানবকণ্ঠে স্নিগ্ধ বাক্যালাপ,—
শুধু সেথা প্রেতাত্মারা সূর্য্যধ্যানে রত
হেথায় হোথায় ফিরে ভয়ঙ্কর রূপে
নিষ্পত্র অরণ্যতলে ক্রন্দিত পবনে ;—
তবু না ছাড়িতে চাই সে গতি, সে ঠাঁই,
যেথায় মোদের যত বীর যত কবি
আগে গিয়েছেন চলে, যে ক্ষত্রগণের
নিষ্ফল বীরত্বকথা হৃদয়ে আমার
পীড়া দিয়েছিল, তবু বীরজীবনের
গৌরব বুঝায়েছিল ; যাঁরা যুঝি একা
নিয়তির প্রতিকূলে সপ্তরথী শরে
সগর্ব্বে হইলা হত, জন্মাবধি যাঁরা
আমাদের বন্ধু পরিচিত,—গ্রাম্যগানে
সরল সঙ্গীতে, রৌদ্র পোহাবার কালে
করুণ গাথায়, সজীব আছেন যাঁরা
তাঁহাদের সাথে মোর এক গতি হোক্।
তাঁদের যে মৃত্যু সে যে নিত্যই আমার—
ছাড়িতে চাহি না তাহা। তুমি কহেছিলে
ব্যথাহীন অমৃতের কথা—অশ্রুহীন
অনন্ত জীবন ; সকল যন্ত্রণা হতে
আমারে বাঁচাতে চাও, পাছে একদিন
দিব্যকান্ত এই মুখ আঁধারে হারায়।
কিন্তু দেব, আমি যে মানবী, মানবের
দুঃখে মোর আছে প্রয়োজন ; শুনিয়াছি
সঙ্গীত অপূর্ণ রহে দুঃখবোধ বিনা ;
সহজ সুরের বশ বৃদ্ধদের মুখে
শুনেছি এসব কথা। শোকাতুর জন
চন্দ্রমার প্রিয় ; পাবার যা নয় তাই
গড়ে যারা মনে, সেই মর্ত্ত্য মানবের
অমর্ত্ত্য কল্পনা অন্তরবিকিরণেরে
মণ্ডিত করিয়া দেয় ম্লান মহিমায়।
মরিতে হইবে তাই কত না উজ্জ্বল
নক্ষত্রপথের ভাতি ! উত্তর বাতাস
বিরহীর কর্ণে কিবা অপূর্ব্ব শুনায় !
বৃথা যারা ভালবাসে তাহাদের কাছে
কি বিচিত্র বসন্ত শর্ব্বরী, নিঃশ্বাসিত
সুগন্ধধরণী ! মোদের বিষাদ দিয়ে
এমন সুন্দর করে রচিয়াছি মোরা
এ পৃথিবী,—আমাদের ব্রহ্মরন্ধ্র মাঝে
সিন্ধু করে হাহুতাশ, মোদের অন্তরে
নিবসে চন্দ্রের ব্যাকুলতা ; জন্ম মোর
এ বেদনা সহিবার তরে, মানবের
কন্যা আমি, মানবের দুঃখ তাপ কিছু
ছাড়িতে উৎসুক নহি ; ঘৃণা হয় মনে
করিতে আনন্দ ভোগ তার পরিহরি।
দুঃখ যে রসের মত মর্ম্ম বাহি উঠে,

ব্যথা ফুটে পুষ্পসম, সেই ত বেদনা,
সেই ত বিস্ময়! তবু যদি তোমাসহ
রহিতাম সুখে—চক্ষু মেলি ভাসিতাম
আনন্দধারায়—তবু ত আসিত জরা।
হায় দেব, স্বাস্থ্যহারা হইতাম যবে,
অনিচ্ছায় জ্যোতিহীন এই দুনয়নে
দিনে দিনে অল্পে অল্পে বিকার তোমার
লক্ষ্য করিতাম; দেখিতাম ছিল যাহা
ছোট ছোট সোহাগের কাজ, এখন তা
সাধিছ প্রয়াসে,—দ্রুত যাহা ছিল আগে
এখন তা শ্লথ হয়ে আসে, যে অধর
তেয়াগিতে সরিত না মন, এবে তারে
মনে করে চুম্বন করিছ; পশ্চিমের
সিন্ধুপারে পড়ে আছি তব পথ চেয়ে
ম্লান তনু, আকুল সংশয়, প্রাণপণ
হতাশ্বাস হাসি, বেশবাসে কেশপাশে
সকরুণ সজ্জার কৌশল। ক্রমে তব
কৃপা হ'ত মোর পরে, সে কৃপা দুঃসহ
তার কাছে, যে একদা ছিল প্রণয়িনী।
ছলিয়া আনিতে হত তোমারে আমার
বাহুপাশে, বক্ষে ধরে রাখিবার তরে
করিতে হইত তব করুণা উদ্রেক।
কিন্তু সুরদাসসহ করি যদি বাস
নিম্নলোকে ধরাতলে হাতে হাতে ধরি
দুজনে বাড়িব মুক্ত প্রান্তর-সৌরভে
কৃষিগ্রামে শান্তিময় কলরব মাঝে,
নিরখিব অস্তসূর্য্যে জ্বলে মাঠ ঘাট।
সুরদাস দিবে মোরে সাধের সন্তান—
তারা নহে দেবশিশু যারা মানবীরে
অবজ্ঞা করিবে—তারা কচি বাছনিরা
আঁকুবাঁকু তনু, মন ভুলভ্রান্তিময়।
রাত্রে তার পার্শ্বে শোব, দুঃস্বপ্নে ডরিলে
ভরসা পাইব তার কর পরশনে।
উৎসবের দিনে দোঁহে বেড়াব ভ্রমিয়া
দীপদীপ্ত পুরপথে—জনতার মাঝে
বাহু তার ধরি তারে বেশি কাছে পাব।
এইরূপে যাবে দিন। প্রথম প্রেমের
সে তীব্র আবেগ যেন মধুময় বিষ
সেও যদি হয় গত, নবীন যৌবন
লয়ে তার রসে ভরা অপর্য্যাপ্ত সুখ,
লয়ে তার বনান্তের গোধূলি বেলায়
সঙ্গোপন প্রথম চুম্বন,—লয়ে তার
ফিরে ফিরে উচ্চারিত বিদায়ের বাণী
যদি চলে যায়—বিশ্বাসে অটল শান্তি
আসিবে তখন, সুখে দুঃখে পরীক্ষিত
সখ্য মনোরম, প্রত্যহের ধূলি তারে
ম্লান করিবে না। যদিও পড়িবে চোখে
বিষাদের ছায়া—করুণ নয়নে তবু
হেরিব সবার ত্রুটি, করিব মার্জ্জনা,
স্নিগ্ধ নম্রচিত্তে সবে দিব আশীর্ব্বাদ।
তার পরে যথাকালে আসিলেও জরা
বৃদ্ধ হব এক সাথে; লাবণ্য আমার
ম্লান হলে, ক্ষীণজ্যোতি হলে মোর আঁখি,
ক্ষতি বোধ নাহি হবে তার—সে নয়ন
নিষ্প্রভ কভু কি ঠেকে পড়ে যার পরে
গভীর প্রেমের দৃষ্টি? শেষে একে একে
বর্ষগুলি আমাদের দিবে নম্র করি
ধরাপানে, নতমুখে দেখে দেখে যাব
আমাদের ধূলিময় চরম শয়ন।
তবু বসি রব মোরা পুণ্যহাসি লয়ে।
কত দিবসের দুঃখে কত পরিহাসে
একত্রবাসের গাঢ় চিরাভ্যাস সুখে
দোঁহে চাব দোঁহাপানে সুখস্মৃতিভরা
স্নিগ্ধ নেত্র মেলি। শেষে ধরাধূলিতলে
দুজনের একজনে অশ্রুজল রেখে
নেমে যেতে হবে—হায় বিধি একজনে
ছেড়ে যাবে আগে—এত দীর্ঘকাল পরে
ভাল হত দুজনের একত্রে পতন।
তবু যে মিলেছি মোরা কিছুদিন তরে
সেই সুখে সুখী হয়ে গ্লানিহীন স্মৃতি

পৃথিবীতে রেখে যাওয়া সেও বৃথা নয়।
আর তুমি, হে দেবতা, সে সুদূর 'দনে
নিম্নপানে চাবে যবে তোমার সুন্দর
অস্তযাত্রাকালে, মোর হেরি পক্ককেশ
মনে কি পড়িবে মোরে ভাল লেগেছিল,
এক কালে ছিলাম যুবতী ?"—যবে তার
কথা হল শেষ, সুরদাস উল্লাসিয়া
ধরিল তাহারে—তার পরে বিরাজিল
নিস্তব্ধতা,—রোষভরে আরক্ত তপন
করিলেন অন্তর্ধান। তখন দুজনে—
সুরদাস নতমুখ, উন্মুখী মঞ্জুলা—
গেলা চলি সায়াহ্নের শ্যামলচ্ছায়ায়।

শ্রী—

সংস্কৃতে প্রাকৃতপ্রভাব*

আজকাল কালের প্রভাবে প্রাকৃত হতাদৃত হইয়া গিয়াছে; সংস্কৃতের নিকটে প্রাকৃতের সমস্ত গৌরব মলিন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাকৃত সাহিত্যের মধ্যে যে বিশেষ কিছু উপভোগ্য আছে, তাহা অনেকেরই মনে আজকাল উদিত হয় না। কিন্তু সব সময়ে এইরূপ অবস্থা ছিল না। এক-দিন প্রাকৃত ভাষার মাধুর্য্যে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মহা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও প্রাকৃত না জানিলে নিজের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ মনে করিতেন না।† সংস্কৃতে মহাকবি হইতে হইলে সেই সময়ে প্রাকৃত না জানিলে চলিত না। ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবিগণ বহুপ্রকার প্রাকৃতের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। প্রাচীন যে-কোন দৃশ্য কাব্য দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

এই সংস্কৃত মহাকবিগণ কিজন্য প্রাকৃত ভাষাকে নিজ-নিজ কাব্যে স্থান দিয়াছিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রধানত দুইটি কারণ দেখিতে পাই। প্রথমত, প্রাকৃত ভাষা সাধারণ লোকসমাজে কথিত হইত; এবং দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত মধুরতর। সংস্কৃতের মধুর "কোমলকান্ত পদাবলী"-রচয়িতা "সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা" ইত্যাদি বলিয়া নিজ কবিতার মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে পারেন, এবং তিনি যে অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাকৃতের মাধুর্য্য তাহা অপেক্ষাও অধিক ও বিলক্ষণপ্রকার। আমাদের বঙ্গদেশের বর্ত্তমান প্রাকৃত বাংলা ভাষার যে মাধুর্য্য আছে, সংস্কৃতের ক্ষমতাও নাই যে তাহার নিকটে বসিতে পারে। সংস্কৃত যতই মৃসদ্ধ হউক না, বিদ্যাপতির কবিতার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে তাহার শক্তি হইবে না। "এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর" ইত্যাদি কবিতাকে কোনো সংস্কৃত কবি ঐ মাধুর্য্য অক্ষত রাখিয়া সংস্কৃতে প্রকাশ করিতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই।

মাধুর্য্যসম্বন্ধে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের কি প্রভেদ তাহা "সর্ব্বভাষাচতুর" রাজশেখর কর্পূরমঞ্জরীতে যেরূপ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আর ভাল করিয়া বলা যায় না। তিনি তাঁহার ঐ দৃশ্যকাব্যখানির প্রস্তাবনার মধ্যে সংস্কৃত ছাঁড়িয়া কেন তাহা প্রাকৃতে রচনা করিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত রচনা পরুষ, এবং প্রাকৃত রচনা সুকুমার; পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে ভেদ, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যেও তাহাই।*

---

* সত্বরেই প্রকাশ্যমান পালিপ্রকাশ-নামক পালিব্যাকরণের ভূমিকার একদেশ, মালদহ-উত্তরবঙ্গসাহিত্যসম্মিলনে পঠিত।

† গরুড়পুরাণে (পূর্ব্বখণ্ড, ৯৮. ১৭) প্রাকৃত ভাষাকে অনধ্যেয় বলা হইয়াছে—

"লোকায়তং কুতর্কঞ্চ প্রাকৃতং ম্লেচ্ছভাষিতম্।
ন শ্রোতব্যং দ্বিজেনৈতদধো নয়তি তদ্ দ্বিজম্॥"

আমার মনে হয় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থের কথা এখানে অভিপ্রেত হইয়াছে

* "সূত্রধারঃ—তা কিস্তি সক্কঅং পরিহরিঅ পাউঅবন্ধে পউট্টো কঈ ?

পারিপার্শ্বিকঃ—সব্বভাসাচউরেণ তেন ভণিতং জ্জেব। জহা—

পরুসা সক্কঅবন্ধা, পাউঅবন্ধো বি হোই সুউমারো।
পুরুসমহিলাণং জেত্তিঅমিহন্তরং তেত্তিঅমিমাণং॥"

কর্পূরমঞ্জরী ৮-৯ পৃষ্ঠা।

গউড়বহ (গৌড়বধ) নামক প্রাকৃত কাব্যের রচয়িতা বাক্‌পতিও বলিয়াছেন যে, নবীন অর্থ ও রচনামধুর সমৃদ্ধ বন্ধন জগতে অবিরলভাবে কেবল প্রাকৃতেই পাওয়া যায় (৯২)। সংস্কৃত সময়ে সময়ে যে কত কঠোর হয়, তাহা গউড়বহের টীকাকার একটি শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছেন (৬৫) :—

"দংষ্ট্রাগ্রর্দ্ধ্যা প্রাগ্ যো ত্রাক্ শ্মামবত্ত্ হাম্রুচ্চিক্ষেপ।
দেবক্রুপ্‌ ভিদ্‌দৃষ্টিকৃত্তত্যাঃ সোঽব্যাদ্বোঽজঃ সর্পাৎ কেতুঃ॥"

যে-কোন পদ লইয়া তুলনা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। নবমালিকা অপেক্ষা নোমালিআ, মুকুল অপেক্ষা মউল, নদী অপেক্ষা নঈ পদ যে অধিক মধুর তাহা যে-কেহ বলিবেন। আবার নিশ্বাস অপেক্ষা নীসাস, দুর্লভ অপেক্ষা দুলহ, ক্লেশ অপেক্ষা কিলেস পদ যে মধুরতর তাহা কে না স্বীকার করিবেন?

এই মাধুর্য্যেই আকৃষ্ট হইয়া একদিন ভারত প্রবল ভাবে প্রাকৃত আলোচনা করিয়াছিল। এবং সেই প্রাকৃত, শিষ্যগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্য, কত কত পণ্ডিত কত কত প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন; কালের গতিতে আজ সেইসমস্ত ব্যাকরণের কোনকোনখানির কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।* সাহিত্যদর্পণকার সাহিত্যার্ণব-কর্ণধার বিশ্বনাথ "অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনীভুজঙ্গ" ছিলেন; এই অষ্টাদশ ভাষার মধ্যে সংস্কৃত একটি, এবং অন্য সতেরটি প্রাকৃত ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার পিতা ভাষার্ণব নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং পুত্রের কথায় জানিতে পারা যায়, তাহাতে বিবিধ প্রাকৃত ভাষার লক্ষণ লিখিত হইয়াছিল।†

আমরা আজকাল প্রাকৃত জানি না বলিয়াই তাহার আদর করিতেছি না, কিন্তু যাঁহারা তাহা জানিতেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে তাহার যশ গাহিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই বাণভট্টের ন্যায় সংস্কৃতকবিও প্রবরসেনের সেতুবন্ধ ও সাতবাহন নরপতির গাথাসপ্তশতীর প্রশংসা না করিয়া নিজের প্রথম কাব্য (হর্ষচরিত) আরম্ভ করিতে পারেন নাই।‡

সংস্কৃত ভাষা অতি সমৃদ্ধ ইহা কোন মূর্খ স্বীকার না করিবে। কিন্তু এই সমৃদ্ধির জন্য সংস্কৃতকে যে প্রাকৃতের নিকট গিয়া কতক সম্পৎ অর্জ্জন করিয়া লইতে হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গুণাঢ্যের বৃহৎকথা আজকাল বিলুপ্ত, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার সার অংশ এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং যতদিন সংস্কৃতসাহিত্য জীবিত থাকিবে, অতি আদরের সহিত তাহা পূজিত ও আদৃত হইবে। গুণাঢ্যের বৃহৎকথা পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল। ইহার মধুর রস পান করিয়া সংস্কৃতকবিগণ স্ব স্ব কাব্যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।* বৃহৎকথা অতিমধুর ছিল বলিয়াই ব্যাসদাস মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র তাহা সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বৃহৎকথামঞ্জরী নামে প্রচার করেন। কিন্তু তাহা অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় সোমদেবভট্ট আবার তাহা দ্বিতীয় বার সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া কথাসরিৎসাগর নামে প্রচার করেন। তাঁহার এই অনুবাদে মূল হইতে কোন ব্যত্যয় হয় নাই।†

বাণভট্টের কাদম্বরীর যে কথাভাগ অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ সমাজ মুগ্ধচিত্ত হন, তাহা বাণভট্টের নিজের উদ্ভাবিত নহে; গুণাঢ্যের পৈশাচী ভাষায় রচিত ঐ বৃহৎকথাই তাহার মূল, বৃহৎকথা হইতেই তিনি এ কথাভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীহর্ষের নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা, বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ, ভবভূতির মালতীমাধব, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, এবং বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি ঐ বৃহৎকথারই অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রাকৃতভাষা পূর্ব্বে এইরূপই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

বেদভাষার সহিত প্রাকৃতের সম্বন্ধ পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে, এবং দেখা গিয়াছে যে, ঐ উভয় ভাষায় কিরূপ সাদৃশ্য আছে। লৌকিক সংস্কৃত আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, কত প্রাকৃত শব্দ তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, এবং কত শব্দ প্রাকৃতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

---

* শাকল্য, ভরত, কোহল ও বসন্তরাজ-প্রভৃতির প্রাকৃতব্যাকরণ দেখা যায় না; প্রাকৃতসর্ব্বস্বকার মার্কণ্ডেয় গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাদের গ্রন্থ দেখিয়া নিজের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

† সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

‡ "অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥
কীর্ত্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রযাতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥
হর্ষচরিত, ১ম উচ্ছ্বাস, ১৩-১৪।

---

* বাসবদত্তায় সুবন্ধু, হর্ষচরিতে বাণ, কাব্যাদর্শে দণ্ডী, দশরূপকে ধনঞ্জয়, এবং অন্যান্য আরো অনেক কবি ইহার কথা বলিয়া গিয়াছেন।

† "যথা মূলং তথৈবৈতন্ন মনাগপ্যতিক্রম।"

প্রাকৃতে বহুস্থলে সংস্কৃতের দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হইয়া থাকে। * আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে তাহার অভাব নাই। যথা, না ম স্থলে ণা ম (১০.১৪.১); এ ন ম্ স্থলে এ ণ ম্ (১৪.২৭.৭); অ নূ ক স্থলে অ ণূ ক (১৬.১৩.৬)। †

আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, অ নু লে প ন স্থলে অ নু লে প ণ (১.৩.১১.১৩; ১১.৩২.৫)।

প্রাকৃত ও পালিতে বহুস্থলে সমাসে, এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে ঈকার স্থানে ইকার হইয়া থাকে (১. § ১১; ৫. § ৩৫)। এ উদাহরণও সংস্কৃতের মধ্যে বিরল নহে। যথা, আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে স্ত্রি-ব্য ঞ্জ ন (৮.৬.১); গ র্ভি ণি-প্রা য় শ্চি ত্ত (৯.১৯.১৪), ন দি-দ্বী প (১৫.-১৬.২,৩)। আবার প ত্নি য়ঃ (২১.১৭.১৫); প ত্নি ভিঃ (১৪.১৫.২)। প ত্নি ও গ র্ভি ণি এই দুই শব্দ তৈত্তিরীয়-সংহিতা ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও স্থানে স্থানে হ্রস্ব-ইকারান্ত দেখা যায়। ‡ আবার রামায়ণেও (৭.৪৯.১৪) মু নি-প ত্নি য়ঃ লিখিত হইয়াছে। আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্রে (৯.১) চ তু র্থি-প্র ভৃ তি পদ দৃষ্ট হয়।

রামায়ণে বহুস্থলে এইরূপ অপর প্রয়োগও আছে। যথা, ল ক্ষ্মি-স ম্প ন্ন (১.১৮.৩০; ৬.১৪.১০); ল ক্ষ্মি-ব র্দ্ধ ন (১.১৮.২৮; ৬.১০১.২৪); কে ত কি-পুষ্প (৪·২৮·২৮)। §

লৌকিক সংস্কৃতের শব্দাবলীর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কত প্রাকৃত শব্দ তাহার মধ্যে অবিজ্ঞাতভাবে স্থান লাভ করিয়াছে। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণও ঐরূপ অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে কয়েকটি মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

সংস্কৃতে পশুর খুর (শফ) বুঝাইতে ক্ষু র ও খু র এই উভয় শব্দই পাওয়া যায়। যেমন ক্ষী র হইতে প্রাকৃতে খী র হয়, সেইরূপ ক্ষু র হইতে খু র হইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। একই অর্থ বুঝাইতে এতাদৃশ দুইটি শব্দ যুগপৎ উদ্ভাবিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। আমরা দেখিতে পাই কালিদাস নির্বাধে খু র শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, যথা—"তস্যাঃ খু র-ন্যাস-পবিত্রপাংশুম্" (র ঘু.২.২, ১.৮৫; দ্রঃ—মনু. ৪.৬৭)। নাপিতের ক্ষৌরকর্ম্মের অস্ত্র বুঝাইতেও অবশেষে ক্ষু র ও খু র উভয় শব্দই প্রযুক্ত হয়। আবার ক্ষু র প্র ও খু র প্র উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যকশাস্ত্রে গো ক্ষু র এবং গো খু র (শব্দরত্নাবলী) দুইই দেখিতে পাই। আবার ক্ষু রী ও ছু রী, এবং ক্ষু রি কা ও ছু রি কা উভয় রূপই প্রযুক্ত হয়। বলা বাহুল্য ক্ষু রী হইতে ছু রী, এবং ক্ষু রি কা হইতে ছু রি কা হইয়াছে (১.§২০)।

সংস্কৃত ঋ ক্ষ হইতে পালিতে অ চ্ছ হয় (১.§২)।* কিন্তু ভল্লুকার্থে ঋ ক্ষ শব্দের ন্যায় অ চ্ছ শব্দও সংস্কৃতে চলিয়া গিয়াছে। জলপ্রান্ত-অর্থে ক চ্ছ শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা প্রাকৃতের নিয়মানুসারে ক ক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ক ক্ষ হইতে ক চ্ছ, এবং ক চ্ছ হইতে বাঙ্লায় কা ছ (নিকটার্থক) হইয়াছে। য মু না-ক চ্ছ, ন দী-ক চ্ছ ইত্যাদি শব্দের অর্থ যমুনার কাছ, নদীর কাছ, ইত্যাদি।†

সংস্কৃত প্রি য়া ল শব্দ সুপ্রসিদ্ধ; আবার তাহা হইতেই উৎপন্ন প্রাকৃত পিয়াল শব্দও সংস্কৃতে বেশ চলিয়া গিয়াছে। কালিদাস লিখিয়াছেন :—

"মৃগাঃ পি য়া ল-দ্রুমমঞ্জরীণাম্।" কু. স. ৩. ৩১।‡

সংস্কৃত গ ণ্ড হইতে প্রাকৃতে গ ল্ল, এবং তাহা হইতে আমাদের গা ল হইয়াছে; ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

---

* মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃতে নকার স্থানে সর্ব্বত্র ণকার হয় (প্রা. প্র. ২.৪২; হে. চ. ৮. ১. ২২৮) আবার পৈশাচী প্রাকৃতে ণকার স্থানে সর্ব্বত্র নকার হয় (প্রা. প্র. ১০.৫; হে. চ. ৮. ৪. ৩০৬)। ইহা হইতেই "ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ" এই বচনের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বাভাবিক-ণত্ববিধির মূলও ইহাই বলিয়া বোধ হয়।

† See Dr. Richard Garb's Preface to the Apastamba Shrautasutra (A. S. B.), Vol. III, pp. vi—xi.

‡ যথা, প ত্নি—তৈ. ব্রা. ২. ৩. ১০ ২; গ র্ভি ণি—তৈ. স. ২. ১. ২. ৬; আপ. শ্রৌ. ১৯. ১৬. ১০।

§ আবার জু হ বে ত্র ভিৎ (৬. ৮০. ৫), গৃ হ গৃ ধ্নু নাং (৬. ৭৫. ১৪)।

* প্রাকৃতে রি চ্ছ, প্রা. প্র. ১. ৩০, ৩. ৩০; কু. পা. ২. ৯০।

† দ্রঃ—নিরুক্ত ৪. ৩. ২।

‡ রাজনির্ঘণ্টে প্রি য় ল্লা ল বৃক্ষের কথা দেখিয়াছি। এই প্রি য়-ল্লা ল হইতেই প্রাকৃত নিয়মানুসারে প্রি য়া ল ও পি য়া ল শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। দ্রঃ—হে. চ. ৮. ১. ২৬৭—২৭১।

কিন্তু গ ল্ল শব্দটি সংস্কৃতের মধ্যে বেশ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভবভূতিও এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন :—

"পাতালপ্রতিমল্ল গ ল্ল বিবর প্রক্ষিপ্ত সপ্তার্ণবম্।"

—মাল. মা. ৫. ২২।

গ ল্ল শব্দটি যে গ্রাম্য (অর্থাৎ প্রাকৃত) কাব্যপ্রকাশকার (৭ উল্লাসে) তাহা বলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন;* এবং বামনও স্বকীয় কাব্যালঙ্কারসূত্রে (২.১.৭) তাহা বলিয়াছেন।

ব জ্র হইতে পালিতে যেমন ব জি র হইয়াছে, সেইরূপ চ ন্দ্র হইতে চ ন্দি র (ভা.বি.১.১১৩; ৪.১), এবং ই ন্দ্র হইতে ই ন্দি র (স্ত্রীলিঙ্গ ই ন্দি রা) শব্দ বস্তুত প্রাকৃত হইলেও সংস্কৃতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

ব র্ষ হইতে যেমন প্রাকৃতে ব রি স, স র্ষ প হইতে স রি ষ প ইত্যাদি হইয়া থাকে,† সংস্কৃতেও সেইরূপ মা র্ষ (মৃষ ধাতু হইতে) শব্দকে মা রি স, বা, মা রি ষ করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং ঐ উভয় শব্দই সংস্কৃতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে।‡ বৈচিত্র্যের বিষয় এই যে, মা র্ষ অপেক্ষা মা রি ষ শব্দেরই প্রয়োগ সংস্কৃতে অধিক দেখা যায়। "সাহিত্যার্ণবকর্ণধার" কবিরাজ বিশ্বনাথ প্রাকৃতজ্ঞ এবং "অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনীভুজঙ্গ" হইলেও মা রি ষ শব্দই লিখিয়া গিয়াছেন।§ কিন্তু নাট্যশাস্ত্রকার ভরত এই প্রসঙ্গে ম র্ষ (=মা র্ষ) লিখিয়াছেন। অমরসিংহ কেবল মা রি ষ ধরিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। এই নিয়মেই মূল শ্ল থ হইতে শি থি ল হইয়াছে।¶

* "তাম্বুলভৃত গ ল্লো ঽয়ং ভ ল্লং জল্পতি মানুষঃ। করোতি খাদনং পা নং সদৈব তু যথা তথা॥" ভ দ্র হইতে ভ ল্ল. এবং তাহা হইতে ভা ল হইয়াছে। এইরূপ প র্ণ হইতে প ন্ন, এবং তাহা হইতে পা ণ বা পা ন শব্দের উৎপত্তি।

† প্রা. ল. ২. ৩০; প্রা. প্র. ৩. ৫৯—৬৬।

‡ যথা, মা র্ষ "অদ্য মা যা বোধসম্বোহত্তিনিষ্ক্রামযাতি," ল. বি. ২৮০; অ. চি. ২. ২৪; ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আবার ম র্ষ (এবং ম র্ষ ক) দেখা যায়, ১৭. ৭৩। মা রি ষ—দে. ভা. ১. ১১. ৬৫; মহা. ভা. ৭. ২৬. ১২; অমর. ১. ৭. ১৪; ম. পু. ৪. ৪৯; বি. পু. ১. ১৫. ৫০; ভা. ৯. ২৪. ২৭।

§ সা. দ. ৬.১৪৮।

¶ শ্ল থ=শি লি থ=শি থি ল; এরূপ বর্ণবিপর্য্যয় প্রাকৃতে অনেক পদে দেখা যায়; যথা, ল ঘু ক হইতে হইল হ লু ক (অ), ইহা হইতে বাঙ্লার হা ল কা; দী র্ঘ হইতে দী হ র (অথবা দী ঘ র, বাঙ্লা দী ঘ ল)। হে. চ. ৮.২.১২১—১২৪ দ্রষ্টব্য।

শিক্ষাকারগণের মতে উষ্ম বর্ণে সংযুক্ত রেফকে "রে" করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। যথা—দ র্শ তং (বা.স. ১৮.১৭) স্থলে দ রে শ তং ইত্যাদি উচ্চারণীয়।* এই উচ্চারণের মূলে পূর্ব্ববর্ণিত প্রাকৃত-প্রভাবই মনে আসে; প্রাকৃত নিয়মেই এই বিশ্লেষণ বৈদিক মন্ত্রেরও উচ্চারণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, যদিও সেই উচ্চারণ অনুসারে ঐ মন্ত্রগুলি পরবর্ত্তী কালে রূপান্তরে লিখিত হয় নাই। উচ্চারণ অনুসারে ভাষা যে সব সময় লিখিত হয় না, তাহা বাঙ্লা ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ।

শিক্ষা-ও প্রাতিশাখ্য-সমূহে যে স্বরভক্তির কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাও এখানে প্রণিধানের বিষয়।†

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে সংশ্লিষ্ট শব্দকে স্বর সংযোগে যেমন বিশ্লিষ্ট করা হইয়াছে, সেইরূপ বিশ্লিষ্ট শব্দকে স্বরবিয়োগে সংশ্লিষ্ট করার উদাহরণও সংস্কৃতে বিরল নহে। সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষত পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের কাব্যে মধু-অর্থে ম র ন্দ শব্দ প্রচলিত আছে;‡ কিন্তু ইহা প্রাকৃত শব্দ, সংস্কৃত ম ক র ন্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ কি স ল য় হইতে কি স ল§ শব্দও আছে।¶ ঐতরেয়োপনিষদের (৫.৩) জা রু জ শব্দও এইরূপে জ রা যু জ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাকৃতে দে ব কু ল হইতে দে উ ল, রা জ কু ল হইতে রা উ ল প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য। এই নিয়মানুসারেই পু রা ত ন হইতে প্রাকৃতে পু রা ণ হইয়াছে, কিন্তু বৈদিককাল হইতেই ইহা সংস্কৃতে চলিতেছে। সংস্কৃত মা তা হইতে এইরূপেই প্রাকৃতে মা আ (অথবা মা য়া), এবং তাহার পর মা হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মী-অর্থে মা শব্দ সংস্কৃতে স্থান লাভ করিয়াছে। লক্ষ্মী মাতার ন্যায় লোকগণকে পোষণ করেন বলিয়াই তিনি লো ক মা তা, এবং সেই জন্যই তিনি মা; অন্যথা লক্ষ্মীর মা-নাম হইবার অপর কোন কারণ নাই।

* প্রতিজ্ঞাসূত্র. ২; কেশবীশিক্ষা, শি. সং, ১৪১; প্রাতিশাখ্যপ্রদীপশিক্ষা, শি. সং, ১৯২; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

† তৈ. প্রা. ২১. ১৭; প্রাতিশাখ্যপ্রদীপশিক্ষা, শি. সং, ২৯৩; অমরেশনির্ম্মিতা বর্ণরত্নপ্রদীপিকা শিক্ষা, শি. সং. ১২২; যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, শি. সং, ১৭।

‡ ভা. বি. ১. ৫, ১০. ১৫।

§ Apte's Sanskrit-English Dictionary.

¶ লক্ষণীয়—কু সু ম হইতে সু ম, ভা. বি. ১. ৮৪।

বাঙ্‌লায় আমাদের মা য়া অথবা মে য়া বা মে য়ে শব্দ চলিত আছে। ইহার সহিত পালির স্ত্রীজাতিবাচক মা তু গা ম শব্দ তুলনীয়। মা তু গা ম শব্দের সংস্কৃত মা তৃ গ্রা ম অর্থাৎ মা তৃ শ্রে ণী—মা তৃ জা তি। বাঙ্‌লা-ভাষীরাও এইরূপ সমস্ত স্ত্রীজাতিকে মায়া (অথবা মে য়া, বা মেয়ে) অর্থাৎ মাতা বলিয়া সম্মান করিয়াছে।

বাঙ্‌লায় না রা য় ণ স্থানে না রা ণ বলিবার মূলেও ইহাই। এবং এইরূপেই অ ন্ধ কা র (=অ ন্ধ আ র=) হইতে আ ন্ধা র, কু ম্ভ কা র (=কু ম্ভ আ র=) হইতে কু ম্ভা র বা কু ন্ধা র বা কু মা র, এবং উ প বা স হইতে উ পা স, ইত্যাদি হইয়াছে।

বিশ্লিষ্টকে সংশ্লিষ্ট করিবার পূর্ব্বোক্ত নিয়মেই চ রি তু ং হইতে চ র্তু ং (মহা. ভা. ২. ১১২. ১৮-২১), প রি ষ ৎ হইতে প র্ষ ৎ, * পা রি ষ দ হইতে পা র্ষ দ † নূ ত ন ‡ হইতে নূ ত্ন, এবং প্র ত ন হইতে প্র ত্ন হইয়াছে। § প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে ব্যো ম নী-ব্যো ম্নী, এবং সপ্তমীর এক বচনে ব্যো ম নি-ব্যো ম্নি প্রভৃতি পদও এইরূপে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অমরেশশিক্ষায় (শি. সং. ১২৮) তৈ ত্তি রী য়া ণাং স্থলে তৈ ত্রা ণাং পদেরও পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন অপর কারণ দেখা যায় না।

বৈদিক সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ প চ্ছঃ পদটিও এই নিয়মেই প দ শঃ অথবা পা দ শ হইতে সংশ্লিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

আবার যাস্কের মত ধরিলে বলিতে হয় যে, এই নিয়মেই অ গ্র ণী (নী) হইতে অ গ্নি পদ হইয়াছে (অ গ্র ণী=অ গ্‌গ নী=অগ্নি)।¶

স্বরবিয়োগাদির দ্বারা শব্দকে এইরূপ সংশ্লিষ্ট করিবার একমাত্র কারণ দ্রুত উচ্চারণ, ইহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। সমস্ত ভাষাতেই এইরূপ আছে। বাঙ্‌লায় প ড়ি তে স্থানে প ড়্‌ তে, ব লি তে স্থানে ব ল্‌ তে, ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ।

দন্ত্য স স্থানে তালব্য শ, অথবা তালব্য শ স্থানে দন্ত্য স সংস্কৃতে এত হইয়াছে যে, সামান্য লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। মাগধী-প্রাকৃতে সাধারণত সর্ব্বত্রই তালব্য শকার, এবং অন্যান্য প্রাকৃতে সর্ব্বত্রই দন্ত্য সকার প্রযুক্ত হয়, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সংস্কৃতের মধ্যে যে এই বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ঐ প্রাকৃত প্রভাব ভিন্ন কিছুই নহে।

বৈদিক সাহিত্যে স দ্‌ ও শ দ্‌ * উভয় ধাতুরই প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু, যদিও তাহারা ধাতুপাঠে পৃথক্-পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, তথাপি ইহাদের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, তাহারা সর্ব্বপ্রথমে একই ছিল। বৈদিক সাহিত্য হইতেই এইরূপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কন্যার ভ্রাতা-অর্থে আমরা শ্যা ল শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু ঋগ্বেদের (১. ১০৯. ২) প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, পূর্ব্বে তাহা স্যা ল ছিল, পরে প্রাকৃত উচ্চারণে শ্যা ল হইয়াছে। যাস্কের সময়েও স্যা ল ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।†

বাঙলার কুলো-অর্থে সংস্কৃতে শূ র্প ও সূ র্প উভয় পদই দেখা যায়। কিন্তু আমাদিগকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, পূর্ব্বে শূ র্প ছিল, তাহার পর সূ র্প হইয়াছে; সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও নিরুক্তে আমরা শূ র্প শব্দই দেখিতে পাই।‡

বৈদিক সংস্কৃতে আমরা সর্ব্বত্রই ব সি ষ্ঠ দেখিতেছিলাম,

---

* বৌ. ধ. সূ ১. ১. ৮; যা. স. ১.৯।

† ভা. ৩.১৬.২।

‡ নূ ত ন শব্দের নূ হইয়াছে ন ব শব্দ হইতে; দ্রষ্টব্য—"ন ব স্য নূ-আদেশঃ..."—পাণিনি ৫. ৪. ২৫, বার্ত্তিক।

§ দ্রষ্টব্য—বার্ত্তিক, পাণিনি, ৫. ৪. ২৫। র ত্ন হইতে প্রাকৃতে র ত ন হয়, এইরূপ নূ ত্ন হইতেই নূ ত ন, এবং প্র ত্ন হইতেই প্র ত ন হইয়াছে বলিতে পারা যায়; কিন্তু স না ত ন, অ দ্য ত ন ইত্যাদি বহু স্থলে ত ন দেখা যাওয়ায় ইহাকেই আদিম বলিয়া ধরিতে হয়।

¶ "অগ্নিঃ কস্মাৎ? অ গ্র ণী-র্ভবতি, অ গ্রং হি যজ্ঞেষু প্রণীয়তে।' অপর নির্বচন—"অঙ্গং নয়তি সন্নমমানঃ, অক্নোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ, ন ক্নোপয়তি স্নেহয়তি। ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপূণিঃ; ইতাদ, অক্তাদ্ দগ্ধাদ্ বা, নীতাৎ; স খল্বেতেরকারমাদত্তে, গকারমনক্তের্বা দহতের্বা, নীঃ পরঃ।" নি. ৭. ৪. ১।

* দ্রঃ—"অগ্নি র্বা ব শ শা দ, অগ্নে র্বা ব শা দ মথস্মা বা ব শে দ্রঃ"—শত. ব্রা. ২. ১. ২. ১৬।

† "স্যাল আসন্নঃ সংযোগেনেতি নৈদানাঃ, স্যাল্লাজানাবপতীতি বা"—নি. ৬. ২. ৬।

‡ অথ. স ৯. ৬. ১৬, ইত্যাদি; শত. ব্রা. ১. ১. ১. ২২, ইত্যাদি; নি. ৬. ২. ৬।

কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে তাহার আর একটি রূপ হইয়াছে ব শি ষ্ঠ।

বক্ষ্যমাণ শব্দযুগ্মকগুলি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সর্ব্বপ্রথমে একটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং কালক্রমে তাহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে:—বি কা স তে—বি কা শ তে, বি ক স তি—বি ক শ তি, কি স ল য়—কি শ ল য়, ইত্যাদি। আবার কো ষ-কো স, পরিচ্ছদার্থে বে ষ-বে শ। বৈদিক কালে সূ ক র (ঋ. স. ৭. ৫৫. ৪,. অথ. স. ২. ২৭. ২) ছিল, পরে শূ ক র হইয়াছে। এইরূপ স র ল (বৃক্ষ)—শ র ল ইত্যাদি। এই সকল শব্দ কখনই যুগপৎ উৎপন্ন হয় নাই, প্রাকৃতসংসর্গে উচ্চারণের ভেদেই ইহারা মূলত এক হইলেও ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

নিম্নলিখিত ধাতুগুলি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, মূল এক-একটি ধাতু প্রাকৃত প্রভাবে কিরূপ পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছে।

সাধারণ প্রাকৃতের নিয়মে আদি যকার স্থানে জকার হয়।* এবং সেই নিয়মেই বর্জ্জনার্থক যু গি ধাতু হইতে জু গি ধাতু, এবং যু তৃ ধাতু হইতে জু তৃ হইয়াছে। অথবা মাগধী-প্রাকৃতের নিয়মে † জু গি ধাতু হইতেই যু গি ধাতু হইয়াছে বলিতে পারা যায়। অন্যত্রও এইরূপ।

প্রাকৃতের নিয়মেই (১§৩৮) স্থ গি ধাতু হইতে ত গি ধাতু, স্থ ঞ্চ ধাতু হইতে ত ঞ্চু ধাতু, এবং স্থ ধাতু হইতে স্থ ধাতু হইয়াছে।‡

চ র্ এবং চ ল্ ধাতু একই।§ আবার, রি ধাতু, লি ধাতু, এবং ই ধাতু এই তিনটিও এক বলিয়া মনে হয়। এইরূপ ম্রু ঞ্চ্, ম্লু ঞ্চ্, ও ম্র চ্-ম্লু চ্ এই চারিটি ধাতু বস্তুত এক।

প্রাকৃত প্রভাবেই ক্রু ঞ্চ্ হইতে কু ঞ্চ্ ধাতু হইয়াছে। এইরূপ ক্রীড়ার্থক কে ল্ ও খে ল্, * গত্যর্থক পে ল্, ও ফে ল্, † সেচনার্থক ধাতু ঘৃ ও ঘ্ন, ভোজনার্থক চ ম্, ছ ম্, জ ম্ ও ঝ ম্ ধাতু মূলত এক। এইরূপ কা স্ ধাতু ও কা শ্ ধাতু, ভ্র ন্ স্ ধাতু ও ভ্র ন্ শ্ ধাতু, বা স্ ধাতু ও বা শ্ ধাতু স্র ন্ ভ্ ধাতু ও শ্র ন্ ভ্ ধাতু, এবং স্তু ধাতু ও তু ধাতু ইত্যাদি। ধাতুপাঠে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই এতাদৃশ ভূরি-ভূরি ধাতু পাওয়া যাইবে। উচ্চারণের বৈচিত্র্যে এইরূপেই এক-একটি ধাতু ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে; এবং যদিও তাহারা মূলত এক, তথাপি সংস্কৃত বৈয়াকরণিকগণ তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ধাতুগণ যে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাও তাহার অন্যতম কারণ।‡

প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ প্রযুক্ত হয় না, এই জন্য প্রাকৃতে সকারান্ত শব্দগুলির সকারের লোপ হইয়া থাকে। যথা ম ন স শব্দ প্রাকৃতে হইবে ম ন। সংস্কৃতও মধ্যে মধ্যে অনেক স্থলে এই পদ্ধতি অজ্ঞাতে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে। আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রে (১. ১. ২. ২১) অ ধ স্ শব্দকে অ ধ করা হইয়াছে; § আবার স র্ব ত: স্থলে স র্ব ত পঠিত হইয়াছে।¶ সংস্কৃতে এরূপ প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত আছে। যথা—"পিণ্ডং দদ্যাদ্ গয়া শি রে" ‡‡; এখানে শি র স্ শব্দকে শি র বলিয়া ধরা হইয়াছে। মহাভারতে (১. ৯১. ৫) অ নো ক: শা য়ী স্থলে অ নো ক-শা য়ী পদ দেখা যায়। এতাদৃশ প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াই বৈয়াকরণিকগণ বলিয়াছেন যে, সমস্ত সকারান্ত শব্দই বিকল্পে অকারান্ত হয়। এইরূপেই আকাশবাচী বি হা য় স্

* প্রা. প্র. ২. ৩১।

† "জ-দ্য-যাং যঃ"—হে. চ. ৮. ৪. ২৯২।

‡ ধাতুপাঠে স্থ ধাতুর অর্থ শব্দ ও উপতাপ লিখিত হইলেও ঋগ্বেদে (২. ৩. ১০.১) তাহা গতি-অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়, এবং যাস্কও তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (নি ৩. ২. ৬)।

§ মাগধী প্রাকৃতে রকার স্থানে লকার হইয়া থাকে, হে. চ. ৮. ৪. ২৮৮।

* ক=খ, যথা—কী ল=খী ল।

† প=ফ, যথা প রু ষ=ফ রু স।

‡ স্মিলি-কুবি-স্ফপি-প্রভৃতীনাং ধাতুত্বং, ধাতুগণস্যাপরিসমাপ্তেঃ। বর্দ্ধত এব ধাতুগণ ইতি হি শব্দবিদ আচক্ষতে।...কা. সূ. ৫.২.২।

§ "অ ধা স ন-শায়ী," টীকাকার হরদত্ত এখানে লিখিয়াছেন—"অধঃশব্দস্য সবর্ণদীর্ঘশ্ছান্দসঃ অপপাঠো বা (!)।"

¶ "সর্বতোপেতং বার্ষ্যায়ণীয়ম্"—আ. ধ. সূ. ১. ৬. ১৯. ৮। হরদত্ত এখানে "ছান্দসো শুনঃ" লিখিয়াছেন।

‡‡ বায়ুপুরাণ।

হইতে বি হা য় হইয়াছে; আবার বি হা য় স,* এবং ব্যো ম ন্ হইতে ব্যো ম ন শব্দও সংস্কৃতে পাওয়া যায়।†

প্রাকৃতে সন্ধির কি প্রণালী তাহা মূল গ্রন্থের স ন্ধি-ক ল্প দেখিলেই বুঝা যাইবে। ঐ নিয়মে প্রাকৃতে হি+এ তং =হে তং হইবে। সংস্কৃতে এরূপ প্রয়োগ বহুল আছে। যথা কু ল টা, শ ক ন্ধু, ক র্ক ন্ধু, সা র ঙ্গ‡ ইত্যাদি। এতাদৃশ সন্ধিকে নিয়মিত করিবার জন্যই বার্ত্তিককার কাত্যায়নকে একটি সূত্র করিতে হইয়াছে। § স্থূ লো ঠ, স্থূ লো তু প্রভৃতি পদের জন্যও তিনি লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। ¶ এবং পাণিনিকেও শি বা যো°, শি বে হি প্রভৃতি পদের জন্য সূত্র করিতে হইয়াছে। প্রাকৃতে যাহা অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া আসিতেছিল, বৈয়াকরণগণের চেষ্টায় সংস্কৃতে তাহা প্রতি-রুদ্ধ হইলেও মধ্যে মধ্যে তাহা নিজ প্রভাব প্রকাশ করিতে বিরত হইত না। এইজন্য এতাদৃশ বহু পদ প্রাচীন বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে আমরা দেখিতে পাই। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১. ৪.৪. ৩) কা+ঈ তি=কা তি দেখা যায়। গোপথব্রাহ্মণে (পূর্ব্ব. ২. ৬) মে+আ য়ুঃ =মে য়ুঃ করা হইয়াছে। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে (১. ১. ২. ১৩) পা দো ন (পাদ+উন) স্থানে পা দূ ন পদ দৃষ্ট হয়।** ভাগবতে (৮.২২.২) মে+ঈ রি তং=মে রি তং লিখিত হইয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারতেও আমরা এরূপ প্রাকৃত প্রয়োগ অনেক দেখিতে পাই। মহাভারতে মে+আ স্তং সন্ধি করিয়া মে স্তং করা হইয়াছে।†† ভগবদ্গীতায় (১১. ৪১) স খে+ই তি সন্ধি করিয়া স খে তি লিখিত হইয়াছে। রামায়ণে তু ণাঃ+অ স্ত=তু ণা স্ত (৬. ৭১. ২০), ল ক্ষ্ম ণঃ+উ বা চ = ল ক্ষ ণো বা চ (৬. ৮৪. ৬), ত তঃ+উ বা চ=ত তো বা চ (৩. ১৩. ১২; ৬. ৯৫. ৯), এ ষঃ+আ হি তা গ্নিঃ=এ ষো হি তা গ্নি (৬. ১০৯. ২৩)। এইরূপ অ প্স রঃ +উ র গঃ=অ প্স রো গ (৭. ৪২. ২১)। কঠোপনিষদের (১. ৩. ১২) গূ ঢো ত্মা শব্দও এই প্রকার।

ইহা ছাড়া রামায়ণে আরো অনেক প্রাকৃত প্রয়োগ পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি প্রদর্শিত হইতেছে। যথা, সাধারণত সর্ব্বত্র বি দ্যু জ্ জি হ্ব পদ প্রযুক্ত হইলেও (৬. ৩১. ৬, ৯: ইত্যাদি) প্রাকৃতের নিয়মে অন্তস্থিত ত-কারের লোপে আবার বি দ্যু জি হ্ব লিখিত হইয়াছে (৬. ৩২. ৪১)।*

প্রাকৃতে ৎ+স=চ্ছ হয়; যথা, ব ৎ স=ব চ্ছ, (বাঙ্লায় বা ছা, ১. §৩৫)। রামায়ণেও (৬. ৪. ৬৩) উ ৎ সে ক স্থানে উ চ্ছে ক পদ রহিয়াছে।

কতকগুলি ক্রিয়াপদও রামায়ণে প্রাকৃতের নিয়মে প্রযুক্ত দেখা যায়। যথা, ব্র বী মি স্থলে ব্রূ মি (৬. ৯. ২০) †; ক রো মি স্থলে কু র্মি (২. ১২. ৩৬) ‡; এইরূপ হা স্য সি স্থলে জ হি ষ্য সি (৬. ১০৬. ২৭)। §

সংস্কৃতের ণিচ্ প্রত্যয় স্থলে পালিতে আ প য় এবং আ পে ¶, এবং প্রাকৃতে আ বে প্রত্যয়ও হয়।** রামায়ণের বক্ষ্যমাণ পদগুলির সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ প্রতীয়-মান হয়; যথা, জী বা পি ত (৭. ২৬. ২৭), ত র্জা প য় তি এবং ভ ৎ র্সা প য় তি (৬. ৩৪. ৯)।†† আবার আশ্বলায়ন-

* তুলনীয়—আ চা র্য্য ব চ স (শত. ব্রা. ১১. ২. ৬, ৬)। এইরূপেই ব্যাকরণোক্ত ব্র হ্ম ব র্চ স প্রভৃতি পদ হইয়াছে।

† "গ গ নং পুষ্কর ম্বর্মং খমভ্রং ব্যো ম নং হরং। ব্যো ম নীরং বি হা য় শ্চ বিহায়শ্চ বি হা য় স ম্।" মহেশ্বরমিশ্র-কৃত পর্য্যায়-রত্নমালা, MS., p. 1178.

‡ অথ. স. ২. ৩২. ২, ৫. ২৩. ৯; শত. ব্রা. ১৩. ৩. ৬. ২।

§ পা. .১.৬৪।

¶ পা. ১. ১. ৬৪।

** ব্যাখ্যাকার হরদত্ত লিখিয়াছেন "পররূপং ক ত ন্তু (কৃতান্ত?)-ব ৎ।" এইরূপেই পা দূ ন অথবা প দূ ন হইতে প উ ন এবং শেষে পৌ নে কথা বাঙ্লায় আসিয়াছে।

†† "বিবৃতক ততো মে স্তং প্রবিষ্টা চ সরস্বতী"—শান্তি, ৩১৮. ৭।

* এখানে বি দ্যু জ্ জি হ্ব পাঠ স্বীকার করিলে ছন্দোরক্ষা হয় না; "স বিদ্যুজ্জিহ্বেন সহৈব তচ্ছিরঃ।" নির্ণয়সাগরের মুদ্রিত পুস্তকে পূর্ব্বোক্ত পাঠই আছে।

† দ্র:—৪.§৩১।

‡ পালিতে কু ম্মি পদ হয়; ৪. §৮৭।

§ ৪. §১৪৯. §টীকা।

¶ ৪. §২১৩, ১৫।

** প্রা. প্র. ৭. ২৩।

†† পালির আ প য় প্রত্যয়ের সম্বন্ধ ধরিলেও প্র ক্ষা লা-প য় ত পদ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পূর্ব্ববর্ণিত প্রাকৃতসন্ধি-প্রভাবে তাহা হয় নাই। প্রাচীন সংস্কৃতে এরূপ বহু পদ পাওয়া যায়, যথা— আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে অ ভি বা দ য়ী ত (১. ৫. ১২; ১৬; ১৪. ১৬;২২);

গৃহ্যসূত্রেও (১.২৪.৯) প্র ক্ষা লা প য়ী ত পদ দৃষ্ট হয়। *

আবার শানচ্ প্রত্যয় করিয়া উৎপন্ন রামায়ণের চি ন্ত য়া ন (৬. ৪৬. ১৪, ৭. ৩৭. ৯), বে দ য়া ন (?), বি-স্ম য়া ন (৬. ৫৯. ৯৫), প্রা র্থ য়া ন (৬. ৯৪. ১৩), ইত্যাদি পদগুলি পালির খা দা ন, চা রা ন ইত্যাদি পদেরই ন্যায় (৪. §১৪)। অন্যত্রও এইরূপ পদ দেখা যায়; যথা, বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে (১১. ৯. ৯) আ ধি গ চ্ছা ন, শ্রীমদ্ভাগবতে (৩. ১. ১৬) মা ন য়া ন, ইত্যাদি †।

আবার অ ভি ষে চ ন স্থানে রামায়ণে অ ভি ষি ঞ্চ ন (২. ১০৭. ৯), এবং ক র্ত্ত ন স্থলে ঔশনসস্মৃতিতে কৃ ন্ত ন পদ (আনন্দাশ্রমের স্মৃতিসমুচ্চয় ৪৭ পৃঃ) প্রাকৃত ভাবেই উৎপন্ন। ছান্দোগ্যোপনিষদের (৬.১.৫) ন খ-নি কৃ ন্ত ন শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা।

প্রাকৃতে প স্থানে ব হইয়া থাকে; ‡ যথা, শা প স্থানে সা ব, ইত্যাদি। এই নিয়মেই সংস্কৃতে ত্রি পি ষ্ট প এবং ত্রি বি ষ্ট প, জ পা এবং জ বা, ও লি পি এবং লি বি, § এই উভয়বিধ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ¶

সংস্কৃতব্যাকরণানুসারে ব্রূ ধাতুর বর্ত্তমান কালেই আ হ, আ হুঃ প্রভৃতি পদ হয়। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেক স্থলে অতীত কালে ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। পালি ব্যাকরণে দেখা যায় যে, ঐ সকল পদ উভয় কালেই হইতে পারে। ** অতএব আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, পালি হইতেই এতাদৃশ প্রয়োগ আসিয়াছে। কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিকার বামনও লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন যে ঐ পদগুলি সংস্কৃতে অতীতকালেও ব্যবহৃত হয়। *

দেশী-প্রাকৃতেরও অনেক শব্দ ক্রমে-ক্রমে সংস্কৃতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সুরাবিশেষবাচী হা লা শব্দ খাঁটি দেশী প্রাকৃত। কিন্তু "হিত্বা হা লা-মভিমতরসাং রেবতী-লোচনাঙ্কাং" (মেঘদূত, ১.৫০) বলিয়া কালিদাস ও মাঘ-প্রভৃতি অন্যান্য কবিগণ তাহা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। † এইরূপ আগ্রহ বা নির্বন্ধ অর্থে হে বা ক (স্যা. ম. ৬, বিক্রমা. ১৮. ১০১), এবং সুন্দর বা লাবণ্য-অর্থে ল ট ভ (বিক্রমা. ৮. ৬; ভর্ত্তৃহরি-বৈরাগ্যশতক, ৩২)।

হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি একটুমাত্র দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে যে, এতাদৃশ কত শব্দ তিনি সংস্কৃত করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্লার খি ড় কী (দরজা) অর্থে তিনি সংস্কৃত পাইয়াছেন খ ড় কি কা। ‡ সংস্কৃত দং ষ্ট্রা হইতে পালিতে দা ঠা, ও প্রাকৃতে দা ঢা হয়; কিন্তু হেমচন্দ্র ইহাকেও সংস্কৃত করিয়া লইয়াছেন;—"দা ঢি কা দং ষ্ট্রি কা দা ঢা।"

বাঙ্লায় আমরা কোন ব্যবসায়ে টাকা খা টা ন কথা বলি। হেমচন্দ্রের যোগশাস্ত্রে একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আমরা ঐ খা টা ন পদের মূল খ ট্ট ধাতুর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি; সেখানে খ ট্ট য়ে ৎ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা, "পদমায়ান্নিধিং কুর্য্যাৎ পদং বিত্তায় খ ট্ট য়ে ৎ" (যো. শা. ১ম প্রকাশ, ১৫১ পৃঃ)। ইহা অপেক্ষা আর কি কৌতুকাবহ পদ হইতে পারে?

বর্ত্তমান সংস্কৃতে এরূপ পদও দেখা যায়, যাহা মূল সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত রূপ ধারণ করিবার পর আবার নূতনরূপে সংস্কৃতে আসিয়া দেখা দিয়াছে। সংস্কৃত ত ন্দ্র হইতে পালিতে দ ন্ধ হয়, দ ন্ধ হইতে ধ ন্ধ, এবং এই

প্র সা র য়ী ত (১. ৬. ৩; ১. ৩১. ৮); প্র ক্ষা ল য়ী ত (১. ২. ২৪, ২৯; ৩. ৩৬)। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে বে দ য়ী ত (১.২২.৯,১০)। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রেও এইরূপ আছে।

* সংস্কৃতব্যাকরণের স্থা প য় তি, অ র্থা প য় তি, প্রভৃতি পদ তুলনীয়।

† মহাভারতেও এইরূপ পদ আছে মনে হইতেছে।

‡ প্রা. প্র. ২. ১৫; হে. চ. ৮. ১. ২২১।

§ এখানে বর্গীয় ব গণনীয় নহে। পাণিনি (৮.২.২১) উভয় শব্দই ধরিয়াছেন

¶ চূলিকা ও পৈশাচী প্রাকৃতমতে (হে. চ ৮. ৪. ৩.২.৫) জ বা প্রভৃতি হইতেই জ পা প্রভৃতি হইতে পারে।

** দ্রঃ—৪, §§৩২, ১২৯; ম. সি. ১৮৩ পৃ. ৪৪৫ সূ, ২০০ পৃ. ৪৮৮ সূ।

* কা. সূ. ৫.২.৪৪।

† এস্থলে বামনের কাব্যালঙ্কারসূত্র (৫.১.১৩) হইতে এই কয় পঙ্ক্তি উদ্ধৃত হইতেছে:—"শ্রতিপ্রযুক্তং দেশভাষা পদম্॥ অতীব কবিভিঃ প্রযুক্তং দেশভাষাপদং প্রযোজ্যং, যথা—"যোষিদিত্যভিললাষ ন হা লা ম্" (মাঘ. ১০.২১) ইত্যত্র হা লে তি দেশভাষাপদম্।" কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমের বৈয়াকরণিক লেখক লিখিতেছেন—"হা লা হ ল্য তে কৃষ্যত ইব চিত্তমনেনেতি হল্ + ঘঞ্, টাপ্ (!)।" অদ্ভুত নির্ব্বচন।

‡ "পক্ষদ্বারে খ ড় কি কা"—অভিধানচিন্তামণি।

ধ ন্ধ হইতে সংস্কৃতে ধ ন্ধি ত পদ (ন্যায়কুসুমাঞ্জলির হরিদাস টীকা) প্রযুক্ত হইয়াছে।*

সংস্কৃতে ভ ল্ল ু ক † শব্দ আছে, আবার উহা হইতে মাত্রানুসারে প্রাকৃত নিয়মে উৎপন্ন ভা লু ক শব্দও সংস্কৃতে চলে। ‡ দ্বিরূপ, ত্রিরূপ কোষসমূহে যে সকল শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রাকৃত প্রভাবে স্বরমাত্রাদি ভেদ ও উচ্চারণাদি ভেদ হওয়ায় উৎপন্ন। § যথা, অ গা র—আ গা র, অ প গা—আ প গা, অ ঙ্কু র—অ ঙ্কূ র, পু রু ষ—পু রূ ষ, অ গ স্ত্য—অ গ স্তি, প্র তি-শ্যা য়—প্র তি শ্যা ব। আবার—

"বিরিঞ্চিনো বিরাচনো বিরিঞ্চী চ বিরিঞ্চনঃ।
বিরিঞ্চশ্চ বিরিঞ্চশ্চ বিরিঞ্চীরপি কথ্যতে॥
*   *   *   *
পিতা পিতামহঃ পীতা বিধাতা বিধতা ধতা॥" ¶

আবার আকারান্ত দু হি তা, ** মা তা, †† ও সীমা শব্দের সম্ভাবও চিন্তনীয়।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে সকলকেই বলিতে হইবে যে, প্রাকৃত সংস্কৃতের উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করে নাই।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

অভিব্যক্তি

বিরাট এ বিশ্বগ্রন্থ, এর পাতে পাতে
লিখা আছে, দেব, তব সুনিপুণ হাতে
অমর-কাহিনী তব—সরস, সুন্দর—
আরো লিখা আছে—তুমি কত মনোহর!

শ্রীগোপেন্দ্রকুমার সরকার।

---

* ত ন্দ্রা হইতে দ ন্ধা, দ ন্ধা হইতে ধ ন্ধা, এবং ধ ন্ধা হইতে ধাঁ ধা; বাঙলায় ধ ন্ধ কথারও প্রয়োগ আছে।

† ভ লু ক শব্দও আছে।

‡ "ভাল ূকো ভল্লুকেঽপি চ"—ভট্টোজিদীক্ষিত-কৃত শব্দভেদ-প্রকাশ, MS. p. 1204.

§ "কচিন্মাত্রাকৃতো ভেদঃ কচিদ্বর্ণকৃতোঽত্র চ"—শ্রীহর্ষ ও ভট্টোজিদীক্ষিত, MS. pp. 1112, 1204.

¶ অম্বিকামিশ্র-কৃত বিশেষামৃত, MS. p. 1196.

** "দু হি তাং মনুজাধিপঃ"—মহাভারত, বিরাট. ৭২. ৫; নীলকণ্ঠ টীকা দ্রষ্টব্য; "দু হি তাং তথা"—বৃহদযম ৩.৭।

†† "বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্"—শিবরহস্যে (শব্দকল্পদ্রুম)।

খেদ্দা বা বন্যহস্তী ধরিবার প্রণালী

বন্যহস্তী ধরা ভারতবর্ষে বিপুল অর্থসাপেক্ষ। এই বিপজ্জনক কার্য্যে প্রায় সহস্র সংখ্যক সুশিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হয়। সুতরাং ইহা প্রায়ই গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকে, তাঁহাদের নিযুক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা অধ্যক্ষ সকল বিষয় স্থির করিয়া দেন।

বঙ্গদেশের জলপাইগুড়ীর উত্তরস্থ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে আসাম অভিমুখে, পশ্চিমে তিস্তা হইতে পূর্ব্বে সঙ্কোষ নদী পর্য্যন্ত অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে বৃহৎ গজযূথ বিচরণ করে।

এই প্রদেশে বনের ছোট ছোট গাছপালাগুলি হস্তী-পদতলে দলিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য উহাদিগের নিকটে যাইতে হইলে কোনো গোপন অন্তরালের অভাবে সবিশেষ নৈপুণ্য এবং উহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, কারণ হস্তিগণ অত্যন্ত সতর্ক হইয়া বনে বিচরণ করে।

কোন গজযূথ বর্ত্তমানে কোথায় অবস্থিতি করিতেছে তাহা ঠিক করিয়া বলা সাধারণ দর্শকের নিকট অতি কঠিন বোধ হইবে, সন্দেহ নাই; কারণ হস্তিগণ সময় সময় এক রাত্রেই অনেক দূরে চলিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির অতি সামান্য পরিবর্ত্তনও বুঝিতে অভ্যস্ত দেশীয় ব্যক্তির চক্ষে ইহা তেমন কঠিন নহে। জমি দেখিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে কোনও নির্দ্দিষ্ট যূথের বর্ত্তমান আবাসস্থল ও উহার সংখ্যা মোটামুটি অনুমান করিতে পারে। ইহা অতিশয় বিস্ময়জনক, কারণ এক জমির উপর দিয়াই অনেক যূথ চলিয়া যাইয়া থাকে, কিন্তু দেশীয় লোকের গণনা ও অনুমান প্রায়ই সঠিক হয়, এবং সে এক যূথের পদচিহ্ন অন্যগুলি হইতে বাছিয়া লইতে পারে।

যূথের অবস্থিতি নিরূপণরূপ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইলে এবং জমি সুবিধাজনক হইলে পর যূথের চতুর্দ্দিকস্থ বনের মধ্য দিয়া একটী লাইন পরিষ্কার করিয়া ঐ স্থান বেষ্টিত করা হয়। ইহাকে making the surround বা বেষ্টনী নির্ম্মাণ বলে। ইহা করিতে হইলে রাত্রিকালে লোক-দিগকে যূথের অবস্থানের চতুর্দ্দিকে, ৮ মাইল পরিধিবিশিষ্ট স্থানের ধার দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে হয়। এই পরিষ্কৃত

পথে ৩০ হইতে ৬০ গজ অন্তর শুষ্ক কাষ্ঠের বোঝা রাখা হয়। হস্তিগণের ভ্রমণশীলতার জন্য এক রাত্রিতেই এই কাজ সারিতে হয়। বেষ্টনী নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইলে এই বোঝাগুলিতে আগুন লাগান হয়, এবং উহাদিগকে সর্ব্বদা জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। প্রত্যেকটীর কাছে দুইজন করিয়া লোক দাঁড়াইয়া থাকে।

এই কার্য্য শেষ হইলে সমস্ত ব্যাপারটীর প্রথমাংশমাত্র সম্পন্ন হইল। সমগ্র যূথ এখন নিঃসন্দেহ বশে আসিল, কারণ উহার কোনও অংশ বেষ্টনীর বাহির হইতে চেষ্টা করিলে সম্মুখে আগুন দেখিয়া বেষ্টনীর কেন্দ্রের দিকেই ছুটিয়া আসিবে।

কার্য্যক্ষেত্র নিবিড় অরণ্যের মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়; এই কারণে যূথকে প্রায়ই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে দেওয়া হয়, পরে উহা নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলে বেষ্টনী নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়।

বেষ্টনীর মধ্যে হস্তীযূথ একবার প্রবিষ্ট হইলে খেদ্দা বা ফাঁদ এবং উহার পথ প্রস্তুত করিতে হয়। বনের নিবিড়তম অংশই এজন্য মনোনীত হইয়া থাকে। সম্ভবপর হইলে কোনও জলাশয়ের অভিমুখে ইহা নির্ম্মিত হওয়া উচিত। বেষ্টনী হইতে খেদ্দায় যাইবার পথ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০ হইতে ২০০ গজ, এবং বেষ্টনীর পরিধির নিকট ১০০ গজ হইতে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর হইয়া খেদ্দার নিকটে প্রায় ৪ গজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পথ নির্ম্মাণ করিতে হইলে ভূমিতে শক্ত খোঁটা পুঁতিয়া তাহার উপরে শক্ত খোঁটা দিয়া বেড়া দিতে হয়। সমস্ত বেড়াটা মোটা কাছি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধা দরকার। হস্তিগণ পাছে ভিতর হইতে ঠেলা দেয় এইজন্য বেড়াটী বাহির হইতে খোঁটা দিয়া ঠেক্‌না দিয়াও রাখা হয়। এই পথের প্রান্তভাগে খেদ্দার দিকে একটী দরজা থাকে, উহাতে সংলগ্ন দড়ি কাটিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে উহা উঠাইতে ও নামাইতে পারা যায়।

'খেদ্দা' বা ফাঁদ প্রায় ৩০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটী গোলাকার বেড়া। ইহার নির্ম্মাণপ্রণালীও পূর্ব্ববর্ণিত পথের অনুরূপ। 'খেদ্দা' ও উহার পথের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে পরে ডালপালা এবং পাতা দিয়া খোঁটাগুলিকে ঢাকিয়া স্বাভাবিক বনের ন্যায় দেখাইবার চেষ্টা করা হয়।

পথের প্রশস্ততর প্রান্তে, উহার উপর কয়েক গজ মাত্র ব্যবধানে দুই লাইনে শুষ্ক ঘাসের বোঝা ও কাঠের টুক্‌রা স্তূপাকারে রাখা হয়।

এই সকল প্রাথমিক কার্য্য সমাপ্ত হইলেই অবিলম্বে হস্তীযূথ তাড়নের কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। ইহা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ও অতিশয় নীরস। ইহা সচরাচর সকালে ৯।১০টার সময়ে আরম্ভ করা হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বেষ্টনী রেখার উপরে যে অগ্নিকুণ্ড রাখা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির নিকট দুইজন করিয়া লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের একজন সতর্ক থাকিয়া কুণ্ডগুলি জ্বালাইয়া রাখে, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি অল্পে অল্পে বৃত্তের মধ্যে অগ্রসর হয়। বৃত্তটী এইরূপে ক্রমশঃই ছোট হইতে থাকে, এবং হস্তীযূথ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে খেদ্দার দিকে নীত হয়। এই সময় সবিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন, কারণ উহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় এত তীক্ষ্ণ যে, সামান্য শুষ্ক ডালের মরমর্ শব্দে সমস্ত শ্রম পণ্ড হইতে পারে। সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তী হস্তীটি খেদ্দার পথের সম্মুখে রক্ষিত ঘাস ও কাষ্ঠের বোঝা অতিক্রম করিলে কতকগুলি লোক দৌড়াইয়া মশাল দ্বারা ঐ সকল বোঝাতে আগুন লাগাইয়া দেয়। সমগ্র যূথ তৎক্ষণাৎ ঐ পথ দিয়া খেদ্দার অভিমুখে উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হয়। সাঙ্কেতিক ঘণ্টা বাজাইবামাত্র দড়ি কাটিয়া খেদ্দার দরজা নামাইয়া উহাদের সকলকে বন্দী করা হয়।

এক্ষণে খেদ্দার ভিতরে ও বাহিরে ভীষণ গণ্ডগোল আরম্ভ হয়; ভিতর হইতে হস্তিগণ ফাঁদের বাহিরে আসিবার চেষ্টা করে, আর বাহিরে প্রহরীরা বংশনির্ম্মিত সুতীক্ষ্ণ বল্লমের খোঁচা দিয়া উহাদিগকে বেড়া হইতে সরাইয়া দেয়। খেদ্দার বেড়া হইতে উহাদিগকে দূরে রাখিবার জন্য সময় সময় বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ও ছিটাগুলিরও প্রয়োগ করিতে হয়। যূথপতি প্রায়ই 'ঢুঁষ' দিয়া বেড়াটী ভাঙ্গিতে চেষ্টা করেন, এইরূপ স্থলে বাধ্য হইয়া অপরাধীকে গুলি করিতে হয়।

দুষ্ট হস্তীগুলি এইরূপে মারিয়া ফেলিয়া সমগ্র যূথকে

সমস্ত রাত্রি খেদ্দার বাহির হইতে অতি সতর্কতার সহিত পাহারা দিতে হয়। সকাল হইলে ইহাদের বন্ধন কার্য্য আরম্ভ হয়। যূথটী বড় হইলে হস্তীগুলি বাঁধিবার পূর্ব্বে খেদ্দার সংলগ্ন করিয়া একটী উঠানের মত তৈয়ার করিতে হয়। খেদ্দার দরজা হইতে কিছু দূরে খেদ্দার পথের উপরে বেড়া দিয়া উহা নির্ম্মাণ করিতে হয়। ঐ দরজা তুলিয়া কয়েকটী ধৃত হস্তী বাহির হইতে দিয়া ভিতরের খেদ্দার ভিড় কমান হয়।

এক্ষণে বন্ধন কার্য্য আরম্ভ হয়। বেড়ার দিকে পিঠ আছে এমন একটী হস্তীকে লক্ষ্য করিয়া তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী পালিত হস্তী চালনা করা হয়; ইহাতে বন্য হস্তীর লেজের দিকে তাহাদের মাথা থাকে; দুদিক হইতে গায়ে ঠেস দিয়া উহারা বন্যহস্তীটিকে আর নড়িতে দেয় না। তখন একটী শিক্ষিত ব্যক্তি বেড়ার মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া উহার পিছনের পা দুইখানি মোটা কাছি দিয়া বাঁধিয়া ফেলে; এই কার্য্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ইহাতে সাতিশয় নৈপুণ্যের দরকার, কারণ হস্তীটী মুক্ত হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। প্রায়ই লোকটীকে বেড়া গলিয়া চম্পট দিতে হয়, বেড়ার ডালপালাগুলি সরাইয়া এজন্য পলায়নের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়।

পিছনের পা দুইখানি বাঁধা হইলে ঐ বাঁধনের উপর দিয়া বেড়ার বাহির হইতে একটা মোটা দড়া পা দুইখানির মধ্যে গলাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর দড়াটা বাহিরে একটা মোটা গাছের গুঁড়ির গায়ে কয়েকবার জড়াইয়া বাঁধা হয়। তখন ভিতরে বন্যহস্তীটি প্রাণপণে বেড়া ভাঙ্গিয়া পলাইতে চেষ্টা করে, আর বাহির হইতে একদল লোক ক্রমে ক্রমে দড়াটা আরও শক্ত করিয়া টানিতে থাকে। ভিতর হইতে আবার একটি পালিত হস্তী বন্যহস্তীটিকে বেড়ার দিকে ঠেলিয়া বাহিরের লোকগুলির সাহায্য করে। সমস্ত যূথটী বন্দী না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপই চলিতে থাকে। তবে শাবকগুলি বাঁধিবার আর বড় প্রয়োজন হয় না, কারণ তাহারা স্ব স্ব মাতৃপার্শ্ব মুহূর্ত্তেকের নিমিত্তও পরিত্যাগ করে না।

বৃহদাকার হস্তীগুলি বন্দীকৃত হইলে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে স্থানান্তরিত করিতে হয়। প্রত্যেক বন্যহস্তীর প্রতি পার্শ্বে এক বা ততোধিক পালিত হস্তী বাঁধিয়া পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে উহাদিগকে লইয়া যাওয়া হয়। স্থানটী জলাশয়-সন্নিহিত এবং বন্ধনোপযোগী বিশাল বৃক্ষরাজি-সমন্বিত হওয়া প্রয়োজন।

এই স্থানে পৌঁছিলে পরে প্রত্যেক বয়স্ক হস্তীর পিছনের পা দুইখানি মোটা দড়া দিয়া একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলা হয়। আর একটী দড়া উহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া সম্মুখে আর একটী গাছের সহিত বাঁধা হয়। বন্ধনকালে উহার দুই পার্শ্বে পালিত হস্তী ঠেলা দিতে থাকে, তাহাতে হস্তীটী আর কোনওরূপ বাধা প্রদান করিতে পারে না। ইহার পরে বন্যহস্তীটি প্রাণপণে দড়া ছিঁড়িবার চেষ্টা করে; পরিশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়ে; পুনরায় বল পাইলে উঠিয়া স্বকীয় অদৃষ্ট ও কর্ম্মফল ভাবিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়। উহারা এই স্থলে যে ২।৩ দিন থাকে, সে কয় দিন ঘাস এবং কোন কোন গাছের ছোট ছোট ডালপালা অল্প পরিমাণে উহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়।

এইরূপে শান্তভাব ধারণ করিলে, পালিত হস্তীর সঙ্গে বাঁধিয়া উহাদিগকে একে একে জলাশয়ে লইয়া যাওয়া হয়। ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ পুরাতন সহচর পরিত্যাগ করিতে ইহারা বড় অনিচ্ছুক। কিন্তু জলাশয় হইতে প্রত্যাগমন কালে তাহারা অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করে, এবং সঙ্গীদিগকে পুনরায় দেখিতে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হয়।

এই সময়ে পশ্চাদ্ভাগে লাল রং দিয়া প্রত্যেকের সংখ্যা লিখিয়া উহাদিগকে চিহ্নিত করা হয়। তৎপরে উহাদিগকে Superintendent সাহেব কর্ত্তৃক পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। যেগুলি গবর্ণমেণ্ট নিজের ব্যবহারের জন্য রাখেন না, তাহারা প্রকাশ্য নীলামে প্রধানতঃ দেশীয় ব্যবসায়িগণের নিকটেই বিক্রীত হয়। তাহারা আবার ভিন্ন ভিন্ন দিকে দূরদেশে লইয়া গিয়া দেশীয় রাজা ও ধনীদিগের নিকট অনেক লাভে উহাদিগকে বিক্রয় করে।

খুব সম্প্রতিকার খবর এই যে, গভর্ণমেণ্ট হাতী ধরার ব্যবসা ছাড়িয়া দিবেন কি না বিচার করিতেছেন। যখন দেশে রাস্তা ছিল না, তখন ধনীদিগের একমাত্র যান ছিল হাতী ঘোড়া। এখন রাস্তাপথের উন্নতি হওয়াতে ধনী-

দিগের এই গজেন্দ্রগমন আর ভালো লাগিতেছে না; এখন হাতীর বদলে মোটর চালাইতেই সকলে ব্যস্ত। সুতরাং এখন আর হাতীর খরিদদার মিলিতেছে না; এবং যদিও বা মিলে তাহারা দাম এত অল্প দিতে চায় যে খেদ্দার খরচ পোষায় না। এক্ষেত্রে খেদ্দার ব্যবসা একটি সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। মোটরের একাধিপত্য হইলে হাতী ঘোড়া দাসত্বশ্রম হইতে বাঁচিয়া যাইবে বটে, কিন্তু ধনীর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রাণের লীলা সৌন্দর্য্যের আড়ম্বর নিতান্ত হীন হইয়া পড়িবে। শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত।

প্রেমের ভাষা

ভালবাসো জানি তাহা প্রাণ চাহে বল 'আহা
প্রেয়সি তোমারে ভালবাসি'!
এই কথা প্রাণ ভরে শুনিতে দিও গো মোরে,
এ পরাণ চির উপবাসী!
সার্থক সে মালা গাথা মিলনের সুরে বাঁধা
বাজে যবে সাহানার তান;
বরষা ঘনায়ে আসে বিরহী-নয়নে ভাসে
মল্লার-সজল অভিমান!
করুণ পুরবী রাগে ব্যাকুল বেদনা জাগে
পরিপূর্ণ বিদায়ের সুরে,
পূর্ণিমার আঁখিপাতে যামিনী মিলনে মাতে,
বেহাগে সে গীত উঠে পূরে।
নদী সে বহিয়া যায় মিলনের বাসনায়,
অন্তরে ধ্বনিত সারিগান;
সাগরের বক্ষে গিয়া পরজে গরজে হিয়া
তরঙ্গিত গীত দিনমান।
পুষ্পের পরাণ মাঝে বাতাসের বাঁশী বাজে
যখন সুরভি করে দান;
বৃক্ষের পল্লব ছাপি উঠিতেছে কাঁপি কাঁপি
সুরে তার মর্ম্মরিত প্রাণ!
তাই বলি ওগো প্রিয়, সাহানায় বেঁধে নিও
আমাদের মিলনের বাঁশী;
ভালবাসো জানি তাহা প্রাণ চাহে বল 'আহা
প্রেয়সি, তোমারে ভালবাসি!'

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বাভাবিক ও কৃত্রিম গুহা

সকলেই অবগত আছেন যে আদিম মানবেরা পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেন। ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক মানবের শত সহস্র স্মৃতির সহিত জড়িত ঐ সকল গুহার কতকগুলি স্বাভাবিক, অপর কতকগুলি কৃত্রিম বা মনুষ্যহস্ত-রচিত। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি আশ্চর্য্য গুহার বিবরণ লিখিত হইল।

শোভাযাত্রা, বাদকদল—অজন্তাগুহা-চিত্র।

সিডনি নগর কুইন্সল্যাণ্ড দ্বীপের অন্তর্গত। উক্ত নগরের একশত কুড়ি মাইল দূরে ব্লু-পর্ব্বতমালার মধ্যে জেনোলন নামে বহুসংখ্যক গুহা রহিয়াছে। স্বভাব-রমণীয় এই গুহাশ্রেণী যুগযুগান্ত ধরিয়া সাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মিওয়ান নামক এক অসভ্য লুণ্ঠনব্যবসায়ী কতকগুলি ষাঁড় চুরি করিয়া এই গুহা-প্রদেশে পলায়ন করে। কুইন্সল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে একদল লোক এই দুর্ব্বৃত্তের অনুসরণ করিতে গিয়া
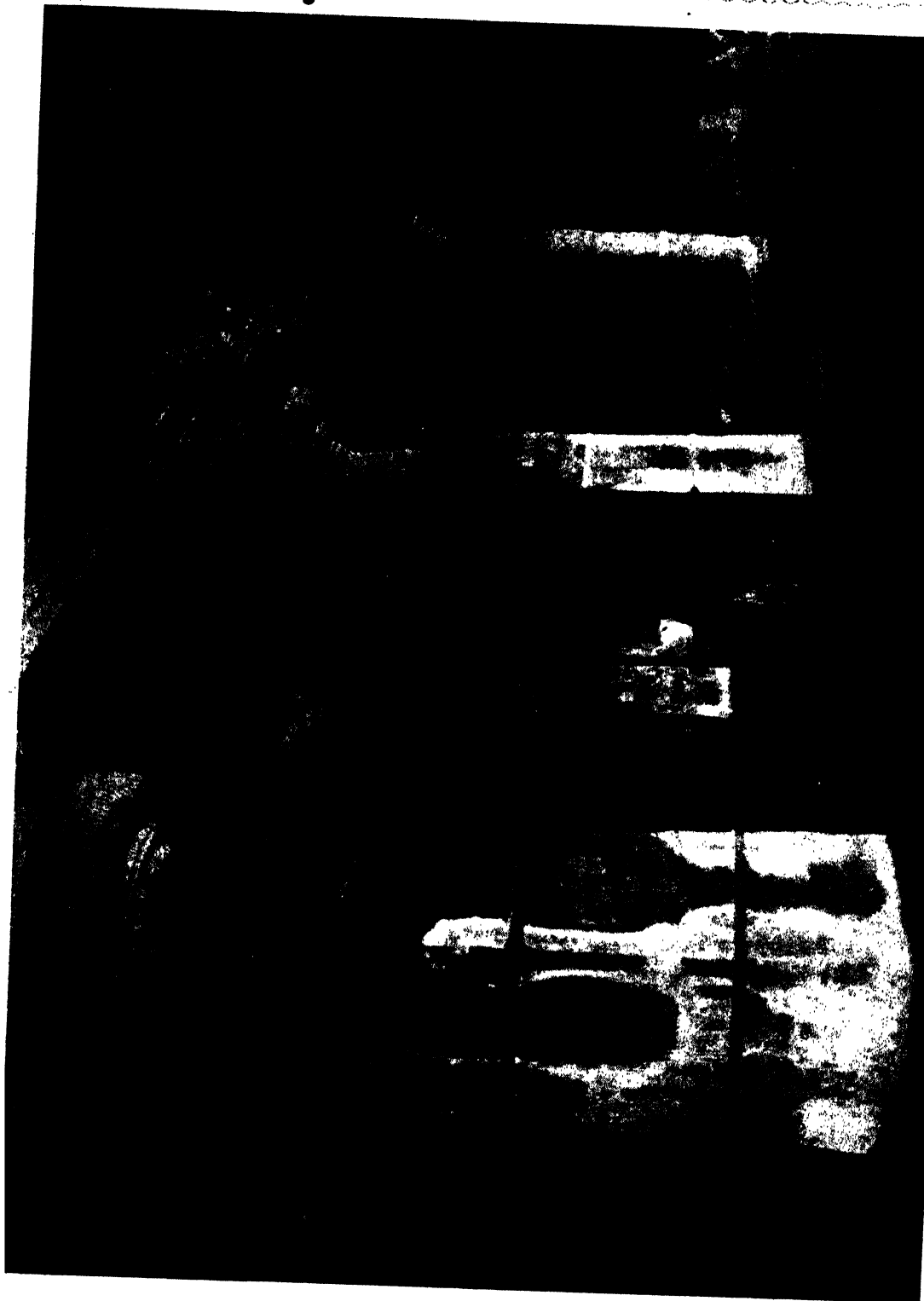
ত্রিমূর্ত্তি-মন্দিরের সাধারণ দৃশ্য—হস্তিগুহা।

স্তাবক—অজন্তাগুহা চিত্র।

এখানকার গুহাগুলি আবিষ্কার করে। আবিষ্কারের পর
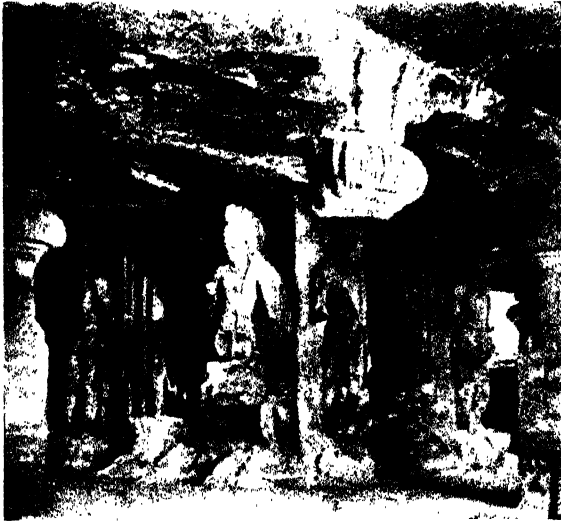
ত্রিমূর্ত্তিমন্দির—হস্তিগুহা।

প্রায় পচিশ বৎসর এই গুহাগুলি কৌতূহলের সামগ্রী হইয়া উঠিতে পারে নাই। দর্শকেরা সেখানে গিয়া যাহা খুসী করিত। ফলে হইল যে, সহস্র সহস্র বৎসর গুহার ছাদ হইতে চুণের জল ঝরিয়া ঝরিয়া যে সূচ্যগ্র ঝরী ও স্তম্ভগুলি স্বাভাবিকরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল প্রকৃতিদেবীর স্বহস্ত-রচিত সেই রমণীয় ঝরী (stalactites) ও স্তম্ভগুলি (stalagmites) যদৃচ্ছাক্রমে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অর্ব্বাচীন দর্শকেরা গুহাগুলিকে শ্রীহীন করিতেছিল। অবিবেচক দর্শকদের উপদ্রব হইতে এই শোভন দৃশ্যগুলিকে বাঁচাইবার নিমিত্ত অবশেষে কুইন্সল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্ট এইগুলির তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। গুহার অভ্যন্তরে যে সকল সূক্ষ্ম ও স্থূল স্বভাব-সুন্দর সূচ্যগ্র চৌর্ণ ঝরী ও স্তম্ভ আছে সেগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের চারিদিকে লৌহজাল বিস্তার করা হইয়াছে। সরকারী একজন কর্ম্মচারী

আকাশচারিণী—অজন্তাগুহা-চিত্র।

গুহাগুলি আটক করিয়া নিজের হাতে তাহার চাবি রাখিয়া থাকেন। ব্লু পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে ছয়টি গুহা খুব বৃহৎ। দুইটির মধ্যে আলো প্রবেশের পথ আছে বলিয়া সেই দুইটি উজ্জ্বল ও অপরগুলি অন্ধকারাবৃত। উজ্জ্বল গুহাদ্বয়ের একটির নাম "গ্রাণ্ড আর্ক", দ্বিতীয়টির নাম "কারলোট্টা"। প্রথমটির দৈর্ঘ্য ৫২০ ফুট, উচ্চতা ৮০ ও বিস্তার ২০০ ফুট। দ্বিতীয়টির উচ্চতা ১০০ ও বিস্তার ৭০ ফুট। ভূগর্ভস্থ অন্ধকার গুহাগুলিতে প্রবেশের পথ আছে, তথায় আলোকহস্তে প্রবেশ করিতে হয়। যে গুহাগুলিতে সর্ব্বদা লোকের গতিবিধি আছে—সেগুলির আকার দেখিয়া দর্শকেরা এক একটার
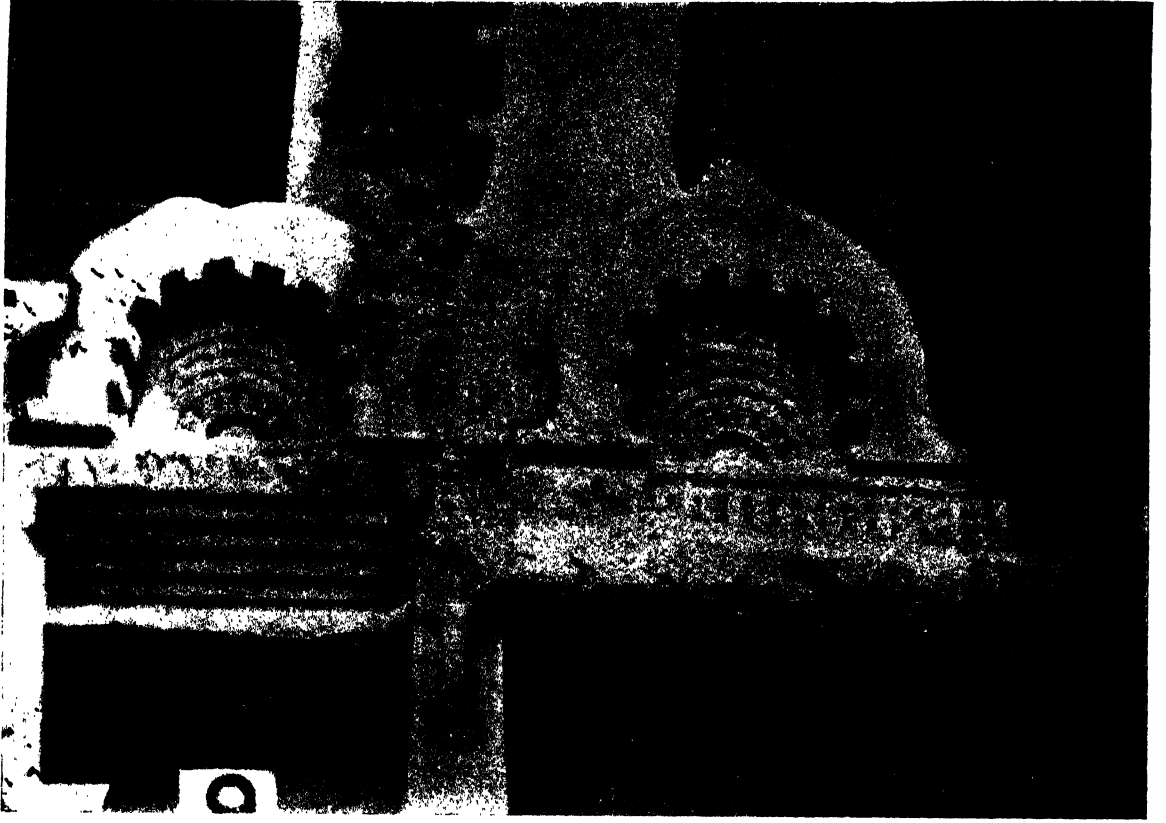
অজন্তা নবম গুহার বাহ্য দৃশ্য।

এক একটি নাম রাখিয়াছেন। "কেথিড্রাল" গুহার অভ্যন্তরে বেদীর তুল্য একটি উন্নত স্থান আছে। কল্পনা-কুশল দর্শকেরা ইহার অভ্যন্তরের নানা অংশকে মন্দিরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই গুহার উচ্চতা ৩০০ ফুট।

শালগুহার ছাদটাকে দর্শকেরা ভাঁজ করা শালের মত বলিয়া মনে করেন। "ব্রাইড্যাল" অর্থাৎ বিবাহ-গুহাটি বিবাহগৃহের মত সুসজ্জিত, উহার মেজে শ্বেত প্রস্তরের, ছাদ যেন প্রবাল দিয়া গঠিত বলিয়া মনে হয়। "জুয়েল কাস্কেট" গুহা বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরে যেন ঝকমক্ করিতেছে। "আর্কিটেক্ট ষ্টুডিও" গহ্বরে নানাবিধ স্বাভাবিক চিত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। কত কোটি কোটি বর্ষ ধরিয়া প্রকৃতিদেবী নিজের হাতে এই ছবিগুলি গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। গুহারক্ষক রাজ-কর্ম্মচারী বলেন যে পর্য্যবেক্ষণের ফলে তিনি জানিতে পারিয়াছেন একটী চৌর্ণ ঝরী ত্রিশ বৎসরে আয়তনে এক ইঞ্চিমাত্র বাড়িয়াছে।

জোনোলন গুহার মধ্যে প্রশান্ত নির্বাক প্রকৃতি দেবীর নীরব কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের অজন্তা গিরিগুহা উচ্চাভিলাষী মানবের কর্ম্মসহিষ্ণুতা ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের পরিচায়ক। অজন্তা গুহাশ্রেণী বৌদ্ধশিল্পিগণের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। আশাইর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চব্বিশ মাইল দূরবর্ত্তী অজন্তা জনপদের সন্নিকটে নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে সারি সারি ২৯টা গুহা রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অমৃতরস পান করিয়া ভারতবর্ষ যখন প্রাণবান্ হইয়া নানা দিক দিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল সেই অতীতকালে বৌদ্ধশিল্পিগণ চমৎকার কারুকার্য্যখচিত এই গুহাগুলি রচনা করিয়া আপনাদের শিল্পপাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই গুহাগুলি সেই অতীত যুগে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠ বা বিহার ছিল।

নিবেদন অজন্তাগুহা-চিত্র।

গিরিগাত্রে প্রস্তরের অঙ্গে বৌদ্ধশিল্পিরা তাঁহাদের ভাস্কর বিদ্যার যে উজ্জ্বল নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন তাহা দেখিয়া দর্শকমাত্রেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া থাকে। আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের খোদিত মূর্ত্তিগুলি নূতন বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। গুহার মধ্যে কোথায়ও বুদ্ধদেবের, কোনোখানে শোভাযাত্রার, কোনো স্থানে বা জন্ম মৃত্যু বিবাহ প্রভৃতি গার্হস্থ্য জীবনের, কুত্রাপি বা যুদ্ধের আলেখ্য চিত্রিত রহিয়াছে।

বোম্বাই নগরের পোতাশ্রয়ের নিকটবর্ত্তী ঘরপুরী দ্বীপে হস্তিগুহাশ্রেণী আছে বলিয়া ঐ দ্বীপটির নাম এলিফেণ্টা হইয়াছে। এই দ্বীপটির দক্ষিণদিকে গুহার সন্নিকটে একটা বিপুলকায় প্রস্তরহস্তী ছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এই হাতীর মাথা ও গলা খসিয়া পড়ে, অতঃপর একটু একটু করিয়া হাতীটা প্রস্তরস্তূপে পরিণত হইয়াছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সেই ভাঙ্গাচোরা পাথরগুলি স্থানান্তরিত করিয়াছেন। এই দ্বীপের গুহার সংখ্যা চার। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গুহাটি ২৫০ ফুট উন্নত একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। কুশলী শিল্পিরা পাহাড়ের গাত্র খুঁড়িয়া এই গুহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন—ইহার দৈর্ঘ্য ১৩০ ফুট। এই গুহার মধ্যে একটি চমৎকার শিবমূর্ত্তি বিরাজিত। বিগ্রহের তিনটি মস্তক যথাক্রমে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রকে প্রকাশ করিতেছে। এই মূর্ত্তির উচ্চতা ১৭ ফুট ১০ ইঞ্চি। চক্ষুর কাছ দিয়া মুখ তিনখানির পরিধি ২২ ফুট ৯ ইঞ্চি। এই মূর্ত্তির পুরোভাগে দুইটি প্রকাণ্ড খোদিত রক্ষকমূর্ত্তি আছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কোনো ভদ্রবেশী দুর্ব্বৃত্ত এই শিববিগ্রহের নাসিকা ছেদন করিয়াছে। দুষ্টলোকদের উৎপীড়ন হইতে এই প্রাচীন শিল্পকীর্ত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত অধুনা সরকার হইতে পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে এলোরা, কারলি, খণ্ডগিরি প্রভৃতি বহুস্থানে অনেক অদ্ভুত ও বিচিত্র গুহা অদ্যাপি বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়।

কেপকলনি রাজ্যের কঙ্গোর গুহাশ্রেণীও শোভনদৃশ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানের গুহাগুলির ছাদে অতি সূক্ষ্ম পরম সুন্দর চৌর্ণ ঝরী দৃষ্ট হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এই গুহাগুলি আবিষ্কৃত হয়। কিছু দিন এই গুহাগুলির মধ্যে দর্শকদের গতিবিধি অবাধ ছিল। এখন সরকার পক্ষীয় রক্ষকের

হরপার্ব্বতী—হস্তিগুহার প্রাচীরে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি

অজন্তাগুহাগাত্রে নাগচিত্র।

কিন্নর—অজন্তাগুহা-চিত্র।

লৌহসিঁড়ির সাহায্যে চল্লিশ ফুট নীচে নামিলে একটা প্রকাণ্ড কোঠা দেখা যায়। কোঠার সংলগ্ন বিভিন্ন দরজা দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষগুলিতে প্রবেশ করা যায়। এই গুহার অভ্যন্তরভাগ প্রায় এক মাইল বিস্তৃত। এই গুহার ছাদে যে চৌর্ণ ঝরীগুলি রহিয়াছে সেগুলি আকারে সূক্ষ্মতায় বিচিত্রতায় বিস্ময়ের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একএকটী ঝরী এমন সূক্ষ্ম যে অঙ্গুলির স্পর্শও সহিতে পারে না। আবার কোনো স্থানে পর্ব্বতগাত্র হইতে চূণের জল ঝরিয়া ঝরিয়া বৃহৎ আয়তনের স্তম্ভ গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্রমাগত ঐ চূণের জল পড়িয়া কোথায়ও একটা পাখীর, কোথায়ও একটা গাছের আকার, কোথায়ও বা কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। চৌর্ণ ঝরী-গুলির মধ্যে স্ফটিকশুভ্র প্রস্তরের দানা থাকায় সেইগুলি আলোকপাতে হীরকবৎ ঝল্‌মল্‌ করিতে থাকে। আলোকে উদ্ভাসিত গুহার অভ্যন্তর-ভাগ কবিকল্পিত পরীপুরীর তুল্য বলিয়া মনে হয়। এই গুহাগুলির প্রবেশদ্বার দর্শকদের করস্পর্শে শোভাহীন হইলেও অভ্যন্তরভাগ এখনও পরম সুন্দর রহিয়াছে। দ্বারদেশের নিকট হইতে কোন দর্শক ঝরী ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছেন—কেহ বা আপনাকে লোকের নিকট জাহির করিবার দুরাশায় গিরি-গাত্রে নিজের নাম খোদিয়া রাখিয়াছেন।

বিনা অনুমতিতে কেহ এই গুহাগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পাবে না। গুহাগুলির প্রবেশদ্বারের খোদিত চিত্রগুলি কালক্রমে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে—সেগুলির কোনটা যুদ্ধের কোনটা বা শিকারের চিত্র। কোন অরণ্য-বাসীর দ্বারা এই চিত্রগুলি খোদিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে

মল্টাদ্বীপে বহুসংখ্যক স্বাভাবিক ও কৃত্রিম গুহা আছে। এই দ্বীপের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের চড়ায় লাগিয়া সেণ্ট পলের জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছিল—সাঁতার কাটিয়া তিনি তীরে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে

হস্তিগুহার বহির্দৃশ্য।
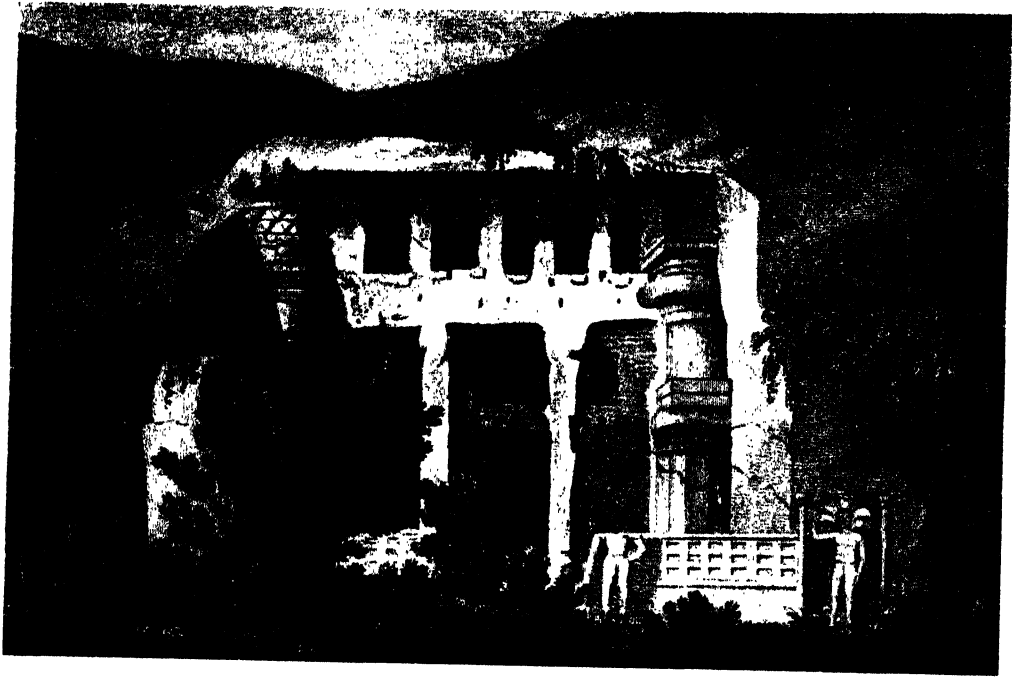
কেনেরী গুহার প্রবেশদ্বার।

ধাবমান মৃগ—অজন্তাগুহা-চিত্র।

এই দ্বীপের একটি উদ্যান ও একটি গুহাও তাঁহার নামে পরিচিত। গুহার অভ্যন্তরে সেণ্ট পলের খোদিত পাষাণমূর্ত্তিও রহিয়াছে। এই প্রদেশবাসীরা বিশ্বাস করে যে এই গুহার প্রস্তর জ্বরে ও সর্পদংশনে ঔষধের কার্য্য করে।

তুষারগুহার শোভা অতীব চিত্তস্পর্শী। এই গুহাগুলির অভ্যন্তরে গ্রীষ্মকালে স্চীবৎ তুষারঝরী দেখা যায়। গ্রীষ্ম যত বাড়িতে থাকে গুহার অভ্যন্তরে তত বেশি পরিমাণ বরফ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্যার রডারিক টি, মারচিসন (Murchison) রুষিয়া রাজ্যে একটি তুষারগহ্বরের ভিতর ও বাহিরের অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়াছিলেন। গুহার বাহিরে ছায়ায় যখন উত্তাপ ফারেনহিটের ৯০ ডিগ্রি তখন তিনি তিন চারি পদ অগ্রসর হইয়া গুহার মধ্যে চমৎকার তুষারঝরী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

স্যার হ্যারি জনষ্টন সাহেব সাহারা মরু-প্রান্তের কয়েকটি নগর পরিভ্রমণ করিয়া উক্ত প্রদেশের অধিবাসীদের আচার ব্যবহার ও গুহাবাস সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পলমল ম্যাগাজিনে তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—

অৰ্দ্ধনারীশ্বর মূৰ্ত্তি—হস্তিগুহা।

কয়েক বৎসর অতীত হইল ত্রিপোলীর অদূরবর্ত্তী সাহারা মরু বিভাগে আমি ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। এই দিকের মরুশোভা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। যাহারা অশ্বপৃষ্ঠে দেশ পর্য্যটনে অভ্যস্ত তাহারা এই দেশের বিচিত্র শোভন দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারিবেন না।

এই অঞ্চলের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী খর্জ্জুরকুঞ্জশোভিত ভূভাগ দেখিলে দর্শকের গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্ব্বর্ত্তী উর্ব্বর ভূভাগের কথা মনে পড়িবে। দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হইলেও এদেশের স্রোতস্বিনীগুলি জলশূন্য হয় না, নীলাভ শৈলশ্রেণীর মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় দৃষ্ট হয়—আর একটু ভিতরের দিকে অগ্রসর হইলেই সমতল ভূমি হইতে দুই তিন সহস্র ফুট উচ্চ দৈত্যপুরীর তুল্য ভগ্ন উচ্চ মালভূমি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মালভূমির উপরিভাগে প্রাচীন নগর দেখা যায়। এখানকার গৃহগুলি স্থানীয় প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত।

এই প্রাচীন নগরগুলির অধিবাসীরা বর্ব্বর ভাষাভাষী (of Berber speech), তাহাদের বাসগৃহগুলি রক্তবর্ণ পাথর দিয়া তৈরি—ছাদগুলি

অজন্তাগুহা-চিত্র।

প্রশস্ত, চূণকাম [illegible]। দুইটি গৃহের মধ্যবর্ত্তী অবকাশ স্থান যবের খড়ে ছাওয়া।

বর্ব্বর পুরুষেরা শাদা ছিটের ও রমণীরা নীলবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। এই অঞ্চলের কুকুরগুলিও দেখিবার যোগ্য জীব। সেগুলি দেখিতে কতকটা নেকড়ে বাঘের মত, রং শাদা, প্রকৃতি চঞ্চল, লেজ শাদা মোটা বুরুষের মত, চক্ষু কালো।

এখানকার প্রায় প্রতি নগরে এক একটি উচ্চ দুর্গ আছে। দুর্গগুলি শস্তের গোলারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। আর কিঞ্চিৎ উত্তরে অগ্রসর হইলে সারি সারি শুষ্ক ক্ষুদ্র হ্রদ দৃষ্ট হইবে;—গেবস্ উপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া আলজিরিয়া প্রদেশের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত শত শত মাইল ব্যাপিয়া এই হ্রদগুলি পড়িয়া রহিয়াছে। এক সময়ে এই হ্রদগুলি ভূমধ্য সাগরের খাঁড়ি ছিল; এখন অধিকাংশ স্থান প্রায় সমতল ক্ষেত্রের সহিত মিলিয়া গিয়াছে—স্থানে স্থানে সামান্ত জল রহিয়াছে। হ্রদগুলির পার্শ্বে স্থানে স্থানে ঝরণা আছে—সেগুলি হইতে জলস্রোত চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া গিয়াছে। এই নির্ঝরগুলির কোনো কোনোটার জল শীতল ও লবণাক্ত, কোনো কোনোটার সুস্বাদ ও উষ্ণ। সাহারা মরুভূমির উত্তরাংশের অনেক স্থান চূণা পাথরের। চূণা পাথর নরম শাদা মার্ব্বল পাথরের মত। এই প্রস্তরগুলি অনায়াসে খোঁড়া
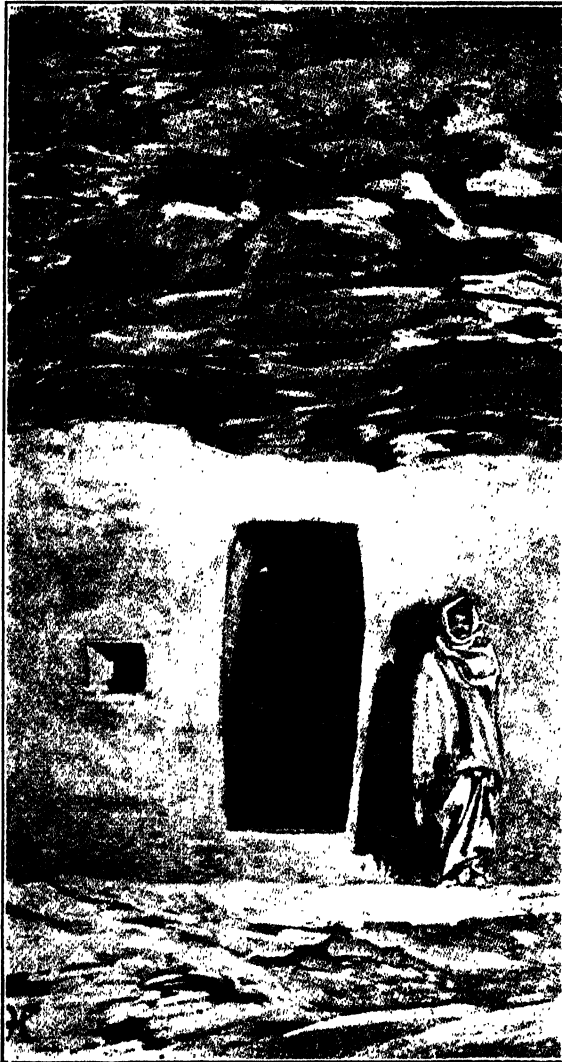
সাহারা প্রদেশের একটি গুহা।

যায়। পুরাকালে স্রোতের বেগে এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে অনেক গুহা স্বভাবতঃ গঠিত হইয়াছিল। ঐসকল স্বাভাবিক গুহা দেখিয়া সেকালের মানবদের মনে কৃত্রিম গুহা রচনার কল্পনা আসিয়া থাকিবে। এই উভয়বিধ গুহার মধ্যেই লোক-নিবাস রহিয়াছে। স্বাভাবিক গুহাগুলির প্রবেশদ্বার সাধারণত সংকীর্ণ—অভ্যন্তরভাগ বেশ বিস্তৃত। কৃত্রিম গুহাশ্রেণীর প্রবেশপথ সুন্দর।

এই প্রদেশটি দর্শকদের দৃষ্টিতে আরব্যোপন্যাস-বর্ণিত একটি রাজ্য বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। আমরা রাত্রিকালে এক একটি কৃত্রিম গুহায় বাস করিতাম। অন্ধকারাবৃত প্রবেশপথ অতিক্রম করিলেই বহুদূরবিস্তৃত এক একটি প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। প্রত্যেক বৃহৎ কক্ষের সহিত সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কোঠা থাকে। কৃত্রিম গুহাগুলির অভ্যন্তর খোদিত প্রস্তরে নির্ম্মিত সোফা, টেবিল, বেঞ্চি প্রভৃতি সাজসরঞ্জামে আসন বিছানো থাকে। পরিশ্রান্ত পথিকেরা গুহার ভিতর প্রবেশ করিয়া আবশ্যক মত বিশ্রাম করিয়া ক্লান্তি অপনোদন করিতে পারে।

এই অদ্ভুত রাজ্যে বৃষ্টিপাতের কোনো নির্দ্ধারিত সময় নাই। কোনো কোনো মালভূমির অধিবাসীদের মুখে শোনা গিয়াছে যে তাহাদের অঞ্চলে কখনো কখনো ক্রমাগত সাত বৎসরের মধ্যেও বারিপাত হয় নাই।

গেবসের গুহাপথ।

আমি যেদিন এই দেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম, সেই দিনটি নির্ম্মল ছিল। পরদিনই আমার প্রত্যাবর্ত্তনের কথা। আমি তিউনিস বাসীদিগকে আশা দিয়া বলিলাম যে পরদিনই তাহাদের রাজ্যে বৃষ্টি হইবে। সেই বৃষ্টিদুর্লভদেশের অধিবাসীদের কানে আমার কথা একান্ত অর্থশূন্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তথাপি কেহ কেহ আমার উক্তি আশার বাণী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। পরদিন প্রত্যূষে যখন অশ্বপৃষ্ঠে আমি ম্যাটামা মালভূমি আরোহণ করিতে-ছিলাম তখনকার আকাশের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল যে আমার বাণী অমোঘ হইবে। সাহারা মরুপ্রদেশে বর্ষায় কষ্ট পাইব একথা যাত্রাকালে একবারও আমার মনে জাগে নাই। ঘোড়া ছুটাইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই অজস্রধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। পথ কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়ায় অশ্বের গতি মন্দীভূত হইল। ঘোড়াটা বহু কষ্টে পথ চলিতে লাগিল। আমরা না থামিয়া সোজাসুজি, খোলা পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। বহুদূর অগ্রসর হইবার পর আকাশ

সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মনুষ্যপদাঙ্কিত একটি অস্পষ্ট পথ-রেখা দেখিয়া আমরা সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাদের শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পথিমধ্যে খরারৌদ্রে কষ্ট পাইয়াছি। তাহার উপর পূর্ব্বরাত্রি হইতে অনাহার—অচিরে আশ্রয় পাইবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সূর্য্য অস্ত গেল—রাত্রি হইল—সঙ্গে কোনো পথপ্রদর্শক নাই, কতক্ষণে আশ্রয়স্থান পাইব তাহারও নিশ্চয়তা ছিল না। আমাদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। ঘোড়াটাকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া সেটাকে ছাড়িয়া দিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

সাহারা মরুভূমির গুহাগাত্রে ইটের গাঁথুনির কারুকার্য্য।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়ে পাহাড়ের পার্শ্বে একটি আলোকশিখা দেখিয়া আমাদের মনে আনন্দ জন্মিল। আমার জনৈক সঙ্গী বর্ব্বরদের ভাষা জানিত—সে পার্ব্বত্য পল্লীর নিকটবর্ত্তী হইয়া উচ্চকণ্ঠে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে ডাকিতে লাগিল। পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র চারিদিক হইতে কুকুরগুলি চীৎকার করিয়া উঠিল। গ্রামবাসীরা বিস্মিত হইয়া মশালহস্তে আমাদের সমীপে উপস্থিত হইল। বর্ব্বর-ভাষাবিৎ আমার সহচর তখন গ্রামবাসীদের নিকট আমাদের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিলেন। গ্রামের সর্দ্দার আমাদিগকে তাহার গৃহে লইয়া গেল। তাহার অতিথিশালায় আমরা আশ্রয় পাইলাম। ক্ষুধা পিপাসা ও নিদ্রা আমাকে যুগপৎ আক্রমণ করিয়াছিল। আমি ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে কিছু আহার করি নাই। প্রথমে বরফের মত সুশীতল জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম; তৎপরে একটু কাফি পান করিয়া একটা গালিচার উপর শুইয়া পড়িলাম—শয্যার পার্শ্বেই আমাদের আহার্য্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কতকগুলি পোকা আমাকে আক্রমণ করিয়া জ্বালাতন করিতেছিল—আমার দেহ এমন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে অঙ্গ অঙ্গসঞ্চালন করিয়া সেগুলিকে তাড়াইবারও শক্তি ছিল না। খাদ্য প্রস্তুত হইবা মাত্র আহার করিয়া ক্ষুধা দূর করিলাম।

ক্রমে আমরা জানিলাম যে—আমরা টুজান (Tujan) নামক এক পার্ব্বত্য পল্লীতে আশ্রয় লইয়াছি। এই জনপদবাসীরা একবার তিউনিসবাসী ও আরবদের সহিত যোগদান করিয়া ফরাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল। বিদ্রোহ প্রশমনের পরে তাহারা বিদেশী শাসনের প্রতি বিদ্বেষবশত নানাস্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। কালক্রমে যখন তাহাদের মনে এই বোধের অবতার হইল যে ফরাসীরা তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, তখন তাহারা পূর্ব্বের বৈরিতা ভুলিয়া গিয়া আবার আপনাদের পৈতৃক বাসভূমিতে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন ইহারা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া নিরীহভাবে দিনযাপন করিতেছে।

আমার মনে হইতে লাগিল দশবৎসর পূর্ব্বে অসহায় অবস্থায় এমন-ভাবে এই জনপদে আসিয়া পড়িলে আমাদের জীবন রক্ষা পাওয়া দুরূহ হইত আর এখন ইহারা আমাকে সাদরে অতিথি রূপে গ্রহণ করিয়া বিনা পয়সায় আহার্য্য দান করিয়া আপ্যায়িত করিল। গ্রামের সর্দ্দার আমাকে এই একটি মাত্র অনুরোধ করিল যে আমি যেন ফরাসী দুর্গে ফিরিয়া সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট তাহার অনুকূলে দুই একটি কথা বলি।
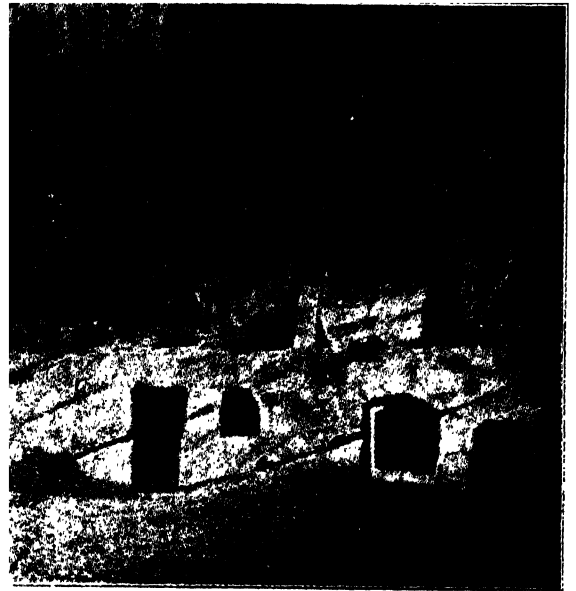
ইংলণ্ডের গুহাবলী।

শীতের শেষে প্রথম বসন্তের উজ্জ্বল প্রভাতে আমরা যখন উচ্চ মালভূমি অতিক্রম করিতেছিলাম—তখন চতুর্দ্দিকের দৃশ্য-শোভা আমাদের চিত্তকে বিস্ময়রসে অভিষিক্ত করিতেছিল। মালভূমির উচ্চ চূড়া হইতে আমরা সম্মুখে ঝোপ জঙ্গল ও নানা জাতীয় বৃক্ষলতা—দূরে পূর্ব্বদিকে পীতাভ মরু-উদ্যান-খচিত বিরাট মরুভূমির বিস্ময়কর শোভা—এবং মরুভূমির পরপারবর্ত্তী ভূমধ্যসাগরগর্ভস্থ গ্রীক-পুরাণ-বর্ণিত পদ্ম-ভোজী (Lotus-eaters) মানবদের বাসভূমি জেব্রা (Jebra) দ্বীপ দেখিতে পাইতেছিলাম। খর্জ্জুর ও তালকুঞ্জ-ভূষিত দূরবর্ত্তী দ্বীপগুলির অস্পষ্ট হরিত শোভা উজ্জ্বল বসন্তপ্রভাতে আমাদের দৃষ্টিতে পরম রমণীয় আলেখ্যবৎ প্রতীত হইতেছিল।

খাড়াই পার্ব্বত্য পথে চলিতে হইবে বলিয়া আমরা সঙ্গে একজন পথপ্রদর্শক লইয়াছিলাম। স্থানে স্থানে পথ এমন ভীষণ ছিল যে অশ্বের একটিবার পদস্খলন [illegible]

ত্রিমূর্ত্তি (হস্তিগুহা)।

স্থানে স্থানে গভীর গর্ত্ত ছিল আমাদের চালকের ইঙ্গিতমতে সেই সকল স্থানে আমাদিগকে পায় হাঁটিয়া চলিতে হইয়াছিল।

দুর্গম পথ চলিয়া আমি ম্যাটামার ফরাসী দুর্গে পঁহুছিলাম। পথিমধ্যে কোথায় কেমন করিয়া যেন আমি আমার ব্যাগটি হারাইয়া আসিয়াছি। ফরাসী দুর্গের অধ্যক্ষ মহাশয় পূর্ব্বেই তারযোগে আমার আগমনসংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর সকল দেশেই পর্ব্বতগুহায় একদল লোক বাস করিত এবং এখনও কোনো কোনো অসভ্য জাতি পর্ব্বতগুহায় বাস করে, কিন্তু বর্ত্তমান সুসভ্য ইংলণ্ডে যে এখনও গহ্বরবাসী এক সম্প্রদায় লোক থাকিতে পারে ইহা আমাদের কাছে বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই লোকগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতে খোদিত পর্ব্বত-গহ্বরে অতি সুখে ও শান্তিতে বাস করিতেছে। ওয়াইড্ ওয়ার্লড্ পত্রিকায় মিঃ এ, ই, জনসন ইংলণ্ডের কতকগুলি প্রাচীন গহ্বরের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার সার সংকলন করিয়া দিলাম।

জগতে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা ও আবিষ্কার-শক্তির যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার ফলে খোদিত গহ্বরে বাস করা ছাড়িয়া দিয়া সভ্য মানব এখন ইট, চুণ, সুরকি দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে পছন্দ করে। কিন্তু এখনও ইংলণ্ডের অনেকে গৃহ নির্ম্মাণ করা অপেক্ষা পাহাড় খুঁড়িয়া বাস করিতে ভাল-বাসে এবং প্রকৃতি দেবীর আশ্রয়ে অতি সুখে ও শান্তিতে বাস করে।

উরচেষ্টারসায়ারস্থিত কিডারমিনষ্টারের অনতিদূরে উন্নত কিনভার রিজ নামক পর্ব্বত অবস্থিত। ইহার শিখরপ্রদেশে অতি প্রাচীন একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। প্রবাদ যে মার্সিয়া দেশের রাজা উল্ফহিয়ার ৬৫৭ হইতে ৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহা ধ্বংস করিয়াছিলেন। রিজটি দৈর্ঘ্যে অনুমান তিন মাইল। এই সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া নানাবিধ গহ্বর দেখা যায় এবং সে সমস্তই পাহাড়ের গা খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। অতি অল্পদিন হয় স্থানীয় স্বাস্থ্যোন্নতি-সমিতি সেই ভগ্ন স্তূপগুলি খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে। ভগ্ন গহ্বরগুলি ছাড়াও কতক-গুলি গৃহ আছে, তাহাতে এখনও লোকবসতি দেখা যায়। অধি-বাসীরা বলে যে তাহার চেয়ে উত্তম বাসস্থান তাহারা চাহে না। বাহির হইতে যতগুলি অসুবিধার কথা আমরা মনে করি প্রকৃত পক্ষে তেমন কোনো অসুবিধাই নাই। রিজের লাল পাথরগুলি অতি সহজেই অস্ত্র দ্বারা ইচ্ছামত কাটা যায় কাজেই সমস্ত গহ্বরে আবশ্যক মত ঘর, দরজা, জানালা, এমন কি টেবিল, আলমারি ও দেরাজ পর্য্যন্তও প্রস্তুত করা হইয়াছে।

বাহিরের দেয়ালে বিশেষ কোনো কারুকার্য্য করা হয় নাই। বায়ু ও আলো প্রবেশের জন্য যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা রহিয়াছে। গৃহের মধ্যস্থিত সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিষগুলি লাল পাথরে প্রস্তুত। প্রত্যেক গৃহেই রান্না করার জন্য ষ্টোভ বা উনন্ খোঁড়া রহিয়াছে। শীতকালে গৃহগুলি উত্তপ্ত করিবার জন্য অগ্নিকুণ্ড ও 'চিমনীর' বন্দোবস্ত আছে। সাধারণতঃ দেয়ালগুলিতে ও ছাদে রং করা এবং জমি কাঠ দিয়া মুড়িয়া দেওয়া। যদিও ইহার কোনোই আবশ্যকতা ছিল না কারণ পাথরগুলিই
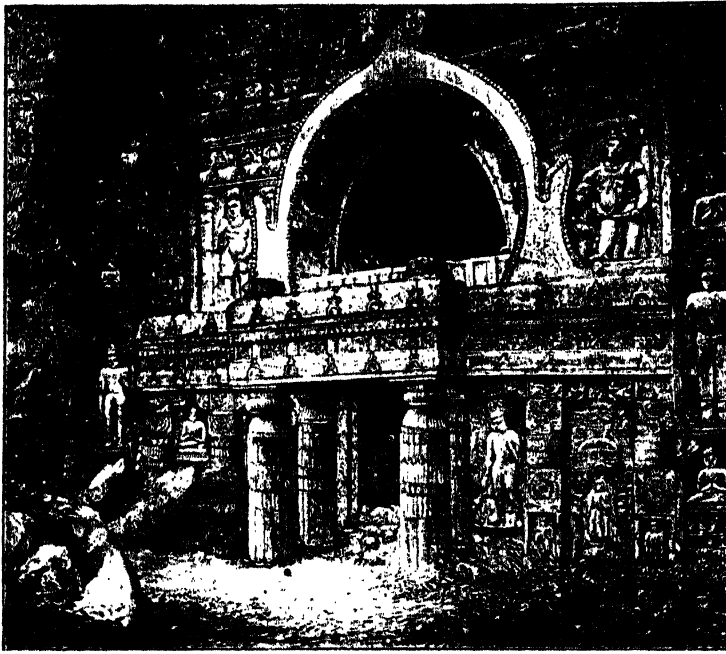
অজন্তা চৈত্যগুহার বহির্দৃশ্য।

ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয় নাই এবং সেরূপ ঘটনাও বিরল। মোটকথা বর্ত্তমান বিজ্ঞান স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য গৃহগুলি যেমন হওয়া আবশ্যক মনে করে এই গৃহগুলিতে সে সমস্তই আছে। অধিকন্তু গৃহগুলি শীতকালে গরম এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা থাকে। বাসের জন্য এগুলি ভাড়া করা যায়। ভাড়া সপ্তাহে মাত্র সাত আট পেনী। সকল শ্রেণীর লোকেই এ সামান্য ব্যয় বহন করিতে সক্ষম। মানুষ আর কি চায়?

কিন্‌ভার রিজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গহ্বরটীর নাম (Holy Austin Rock): 'হোলি অষ্টিন্ রক্'। এইটী গহ্বরটি অন্য সমস্তগুলি হইতে পৃথক। এই নামটির উৎপত্তি কিরূপে হইল আমরা তাহা জানি না তবে অনেকে বলেন যে এক সময় ইহা 'সন্ত অগষ্টীনের' ধর্ম্মপ্রচারক-দলের অধীনে ছিল। দূর হইতে দেখিলে তাহার ভিতরের গঠন সম্বন্ধে কোনোই ধারণা জন্মে না।

বর্ত্তমানে এখানে পৃথক তিনটি সম্প্রদায় বাস করে কিন্তু এক সময় ইহা বারটি বিভিন্ন পরিবারের আশ্রয়স্থল ছিল। গৃহগুলি তিনতলা এবং উপরের তলার গৃহটিই স্পষ্ট দেখা যায়। এখানকার পর্ব্বতগৃহগুলির সম্মুখে ইটের বারান্দা আছে এবং তাহাতে টালির ছাদ দেওয়া হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে ক্ষুদ্র একখানি ইটের একচালা ঘর তোলা হইয়াছে। তিনতলা গৃহে উঠিতে কোনোই কষ্ট হয় না। সমভূমি হইতে ক্রমে উঁচু হইয়া একটী রাস্তা গৃহের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। গৃহের দরজায় না পৌঁছিলে পাহাড়ের উচ্চতা সম্যক উপলব্ধি হয় না। পাহাড়টির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যই যেন সৃষ্টিকর্ত্তা তাহার শিখরদেশে একটী ফার বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উন্নত বৃক্ষটিতে উঠিলে দূরবর্ত্তী গ্রামগুলিকে এক একখানি আঁকা ছবির মত দেখায়।

এখান হইতে উল্‌ভারসির দিকে আরও অগ্রসর হইলে আর একটী গহ্বর দেখা যায়। সেটীর স্থানীয় নাম (Mega-Fox-Hole) মেগা-ফক্স-হোল। প্রবাদ যে এক শতাব্দী পূর্ব্বে এখানে একটী ডাকাইতের গুপ্ত আড্ডা ছিল। এ প্রবাদ সত্য হওয়ারই সম্ভব কারণ ইহা অপেক্ষা নির্জ্জন স্থানে এমন উৎকৃষ্ট গহ্বর আর দেখা যায় না। কথিত আছে এই গহ্বর হইতে এক মাইল দূরস্থিত (Drakelow) ড্রেক্‌লো পর্য্যন্ত একটী সুড়ঙ্গ পথ আছে।

আরও অগ্রসর হইলে (Crow's Rock) ক্রো রক দেখা যায়। এই গহ্বরটীতে এখনও একদল লোক বাস করে। পাহাড়ের পাদদেশ নানাবিধ সুখাদ্য ফলের গাছে ঘেরা রহিয়াছে। দূর হইতে এই বৃক্ষগুলির ঠিক উপরেই ঘরের ছোট ছোট জানালাগুলি দেখা যায়। (Holy Austin Rock) হোলি অষ্টিন রকের মত এখানেও ইটের ব্যবহার আছে। একটি বারান্দার ছাদ নির্ম্মাণের জন্য বড় বড় পাথর ব্যবহার করিয়াছে, পাথরগুলি ঠিক একই ভাবে আছে।

রিজের উপর ...

যায়। কোথাও শুধু একটা ভগ্ন দরজা বা জানালা আবার কোথাও বা একটা ক্ষুদ্র কুঠুরির ধ্বংসাবশেষ প্রাচীনকালের স্মৃতিকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। কাঠের কাজ সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা বলা আবশ্যক যে সেই নরম পাথরের উপর সমস্ত ভ্রমণকারীই তাহাদের নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে যে সমস্ত তারিখ লেখা আছে যদি তাহা সত্য হয় তবে বহুদিন হইতেই এ স্থলে ইংরাজ দর্শকগণ আসিয়াছে। লাটিন ভাষায় লিখিত একটা তারিখে অষ্টাদশ শতাব্দীর উল্লেখ দেখা যায়।

উলভারলি হইতে অনতিদূরে (Drake Hall) ড্রেক হল নামক গহ্বর অবস্থিত। সৌন্দর্য্য হিসাব করিলে ইহা (Holy Austin Rock) হোলি অষ্টিন রকের সমকক্ষ হইবে। যে রাস্তা গৃহের দরজা হইতে সমভূমি পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে তাহার মাঝখানে একটা বিশ্রামের স্থান আছে। পথিক ক্লান্ত হইয়া সেখানে জল পান করিতে পারে তাহার জন্য একটা সুন্দর পাতকুয়া রহিয়াছে। পাতকুয়াটি এক শত ফুট্ গভীর এবং তাহার জল অতি পরিষ্কার। আরও উপরে মুর্গী রাখিবার ঘর, শূকরের ঘর প্রভৃতি ছোট ছোট অনেকগুলি ঘর আছে। রিজ্ বাহিয়া আরও উপরে উঠিলে একখানি সুন্দর বাগান দেখা যায়।

কিন্‌ভার রিজেই গহ্বরবাসীদের বাসস্থান সীমাবদ্ধ নহে। গ্রামের অপর পার্শে নদীর উপরে (Gibralter Rock) জিব্রল্টার রক নামক গহ্বর আছে। ইহার পশ্চাৎ দিকে একটী ছোট রাস্তা আছে। তাহা উভয় পার্শ্বে এমন ভাবে ভগ্নস্তূপসকল রহিয়াছে যে দেখিলে মনে হয় পূর্ব্বে এখানে এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে বড় বড় বাড়ী ছিল। দরজা, জানালা, ষ্টোভ প্রভৃতির চিহ্ন স্পষ্ট রহিয়াছে।

কিন্‌ভারের গহ্বরগুলি কত শতাব্দী পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। সেস্থানের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্‌ভার হইতে একমাইল দূরে (Sammons Cave স্যামন্স কেভ নামক গহ্বরে এক রাক্ষস বাস করিত। (Holy Austin Rock) হোলি অষ্টিন রকে তাহার এক প্রতিবেশী ছিল।

বর্ত্তমান অধিবাসীরা রাক্ষস নহে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতে তাহারা সুসভ্য ইংরাজের সহিত মিশিয়া যাইবে।

শ্রীশরৎকুমার রায়, ও স্থ।

স্বর্গ

(একটি আরবী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে)

শাস্ত্রে শুনি সপ্ত স্বর্গ; অন্তরীক্ষে ছয়টি বিরাজে;
কোথায় সপ্তম স্বর্গ ? মানবের হৃদয়ের মাঝে।
পুণ্যবান রহে স্বর্গে;—কবি আর মনীষিরা বলে;
পুণ্য রহে কোন্ ঠাঁই ? মানবের হৃদয় অতলে।
সৃষ্ট জীব স্বর্গে যায়;—শাস্ত্রকার গিয়াছেন ক'য়ে;
স্রষ্টা বিরাজেন কোথা ? মানবের হৃদয়-নিলয়ে।
বাহিরের ছয় স্বর্গ,—ক্ষতি নাই—নাই যদি পাই;
প্রাণের পরম স্বর্গ, হে বিধাতা ! যেন না হারাই।
বুঝিতে পেরেছি প্রভু ! সীমাহীন তব কৃপাবলে,
হৃদয়টি স্বর্গ যার সব স্বর্গ তারি করতলে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ভাগ্যচক্র

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ফ্র্যাঙ্ক বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন বার্টি স্থিরভাবে বসিয়া আছে। ফ্র্যাঙ্ককে দেখিয়া আসল কথাটা বুঝিতে বার্টির বাকি রহিল না;—তাহার মনে হইল সে যাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে এইবার তাহা উপস্থিত! ফ্র্যাঙ্কের মুখভাবে, তাঁহার কথার স্বরে তাহার আগমন সূচনা করিতেছে! বার্টি হতাশ হইয়া পড়িল—আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টা, কোনো কৌশল আর তাহার অন্তর হইতে সাড়া দিল না।

ফ্র্যাঙ্ক গম্ভীর স্বরে বলিলেন "বার্টি! কথা আছে।"

বার্টি কোনো জবাব করিতে পারিল না—তাহার বুকের মধ্যে রক্তের তুফান উঠিতে লাগিল, সমস্ত দেহ স্পন্দিত, সে অলস ভাবে শুধু বসিয়া রহিল।

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন "ইঁভার সঙ্গে আজ আমার দেখা হল। শুনলুম তাঁরা এখানে অনেক দিন এসেচেন।"

বার্টি তখনও কথা কহিতে পারিল না, শুধু একবার কালো কালো কোমল চোখ দুটি তুলিয়া ফ্র্যাঙ্কের পানে চাহিল—সে চাহনি কী করুণ, কী নৈরাশ্যময়!

ফ্র্যাঙ্কের সমস্ত হৃদয়টা তোলপাড় করিয়া কি-একটা ঝড়ের মতো বহিয়া গেল। তিনি ভাবিয়াছিলেন কথাটা বেশ ধীরভাবে, শান্তভাবে বার্টির কাছে পাড়িবেন, কিন্তু কি-জানি-কেন বার্টির তখনকার সেই নিশ্চিন্ততা, সেই চুপ-করিয়া-পড়িয়া-থাকা দেখিয়া তাঁহার সমস্ত শরীরটা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। বার্টির উপর এই তাঁহার প্রথম রাগ। এ কি! এতবড় একটা গুরুতর বিষয়ের আলোচনা, তাহাতে বার্টির কোনো খেয়াল নাই; সে চুপ করিয়া দিব্য আরামে চেয়ার হেলান দিয়া বসিয়া আছে। অসহ্য! ফ্র্যাঙ্ক বুঝিতে পারিলেন না বার্টির হৃদয়টার মধ্যে তখন কী একটা ভয়ঙ্কর আন্দোলন চলিতেছে—কেন তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না; তিনি ভাবিলেন বার্টি ইচ্ছা করিয়া অবহেলা করিতেছে, তাই তিনি ধীরে সুস্থে যে কথা বলিবেন বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছিলেন সে কথা বলিবার ধৈর্য্যের বাঁধ মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাঙিয়া

গেল ;—এখনই শোনা চাই, তাঁহার উন্মত্ত ইচ্ছা গর্জ্জিয়া উঠিল—শোনা চাই—এখনই !

"শোনো বার্টি ! ইভাদের বাড়িতে আমি তিনখানা চিঠি লিখেছিলুম, তুমি জানো। ইভা বলচেন সে চিঠি তাঁরা পান্ নি—তাঁদের চাকর উইলিয়ম লুকিয়ে রেখেছিল। এ সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো ?"

বার্টি নীরব। তাহার চোখদুটি শুধু ফ্র্যাঙ্কের দিকে চাহিয়া কি একটা মর্ম্মভেদী আকুল আবেদন জানাইতেছিল।

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—'চিঠির কথা তুমি ছাড়া আর কেউ জানত না। উলিয়ম সে চিঠি লুকিয়েছে কেন ?"

বার্টি অনেক চেষ্টায় কণ্ঠস্বর ফুটাইয়া বলিল—"আমি তার কি জানি ?"

ফ্র্যাঙ্ক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তুমি নিশ্চয় জানো। বল ঠিক করে।"

ফ্র্যাঙ্কের কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় বার্টির আত্মরক্ষার সমস্ত চেষ্টা একেবারে অতলে ডুবিয়া গেল। কেমন করিয়া অতবড় গোপন কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল তাহা জানিবার জন্য তাহার আর তিলমাত্র আগ্রহ রহিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল আত্মসমর্পণ করাই এখন শ্রেয়। ব্যস ! আর কেন ? সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়া যাক। কি ফল বৃথা সংগ্রামে ?—যাহা অবশ্যম্ভাবী, যাহা দৈবের বিধান তাহার মুর্ত্তি তো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখা দিয়াছে—কে তাহাকে ঠেকায়—কার এত বড় সাধ্য—তবে কেন আর বৃথা আত্মরক্ষার চেষ্টা ? এই ভাবিয়া বার্টি সমস্ত কৌশল ও চেষ্টা হইতে নিজেকে বিযুক্ত করিয়া রাখিল। তাহার চোখের সামনে পরিণামের একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল ; তাহাতে একটা আতঙ্ক আসিল বটে কিন্তু মনকে তাহা কিছুতেই আত্মরক্ষার দিকে উত্তেজিত করিতে পারিল না। সে হতাশ হইয়া বলিল—"হাঁ। আমি জানি !"

—"কি জান ?"

—"আমিই"—

—"তুমি কী ?"

—"আমিই উইলিয়মকে ঘুষ দিয়েছিলুম চিঠি লুকিয়ে রাখতে।"

ফ্র্যাঙ্ক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। চোখের সামনে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরিতেছে ;—কে কি বলিতেছে, কোথায় কে আছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"তুমি তুমিই ! হা ভগবান ! এ তোমারই কাজ !"

—"হাঁ আমিই।"

—"কিন্তু কিসের জন্যে ?"

…"কিসের জন্যে ? অ্যাঁ ? তাইতো—কিসের জন্যে ? —কি জানি কিসের জন্যে।—না ! সে আমি বলতে পারব না—সে জঘন্য কথা বলবার নয়—আমি বলতে পারব না !" বলিয়া বার্টি কাঁদিয়া ফেলিল।

"বলবে না ? পাষণ্ড !" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক সজোরে বার্টির টুঁটি চাপিয়া ধরিলেন। একবার সবলে নাড়া দিয়া বলিলেন —"বল্ বলচি, এখনই বল্—নইলে গলা টিপে সে কথা বার করব !"

বার্টি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"বলচি শোন"—

"বল্। এখনই !"

—"আমি তোমার সঙ্গ ছাড়তে পারব না তাই। তোমার বিয়ে হ'লে আমায় দূর হয়ে যেতে হ'ত। আমি তোমায় এত ভালোবাসি—"

"হুঁ ! ভালোবাস—তারপর ?"

"তারপর—তুমি আমার প্রতি যে কত দয়া দেখিয়েচ—কত অযাচিত দান করেচ তা বলবার নয় আমি দেখলুম আমায় আবার খেটে খেতে হবে, এ ঐশ্বর্য্য ছেড়ে আবার দারিদ্র্যের মাঝে গিয়ে পড়তে হবে। ফ্র্যাঙ্ক ! ফ্র্যাঙ্ক ! শোনো। রাগ কোরো না। আমার সব কথা আগে শোনো—তারপর বিচার কোরো—আমাকে সব কথা খুলে বলতে দাও। আমি স্বীকার করচি আমি যা করেচি তা অতিবড় পাষণ্ডেও করতে পারে না—তবু আমাকে বলতে দাও—সব কথা না শুনে রাগ কোরো না। আমি মানুষটি যেমন আমাকে তেমনি করে দেখ,—উচ্চ আদর্শের সঙ্গে তুলনা করে আমায় দেখ না। আমায় ভগবান যেমন করে গড়েচেন আমি তেমনি হয়েচি—আমি কি করব বল ? যদি আমার সাধ্যের মধ্যে থাকত তাহলে আমি অন্য রকম হতে পারতুম—এমন জঘন্য বৃত্তি আমার হত না—কিন্তু কি

করব? আমার-অতীত একটা শক্তি আমাকে ক্রমাগতই বিপথে নিয়ে গেছে—আমি পারিনি, আমি পারিনি, নিজের শক্তিতে সুপথে ফিরতে আমি পারিনি। তুমি তো জানো আমি কি দুঃখের মাঝে, কি দৈন্যের মাঝে ছিলুম। তুমি আশ্রয় দিলে, আহার দিলে, আচ্ছাদন দিলে, স্নেহ দিলে, ভালোবাসা দিলে—তোমার কাছে থেকে, তোমাকে ভালোবেসে—এ কথা হয় তো বিশ্বাস করবে না তোমায় ভালোবাসি—কিন্তু তবুও আমি বলবো তোমায় ভালোবেসে আমি কি সুখে, কি নিশ্চিন্তে ছিলুম! তুমি সে সব কেড়ে নিয়ে আমাকে আবার নৈরাশ্যের মাঝে, দুঃখের মাঝে, দৈন্যের মাঝে ফেলে দিচ্ছিলে—তাই ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে আমি এমন কাজ করলুম। ফ্র্যাঙ্ক শোনো—অধৈর্য্য হয়ো না—আমার সব কথা আগে শোন—তোমাকে সব আমি খুলে বলচি। আমিই ইভার মনে সন্দেহ জন্মিয়ে দি যে তুমি তাকে সত্যি ভালোবাস না—আমিই তার মনে সন্দেহ এনে দিই তাতেই তোমাদের মিলন ভেঙে যায়—হাঁ আমিই তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিই। চিঠি আমিই বন্ধ করেছিলুম। ফ্র্যাঙ্ক! এ সবই আমারই কাজ—সমস্ত, আগাগোড়া সমস্ত আমার কাজ! যখন সে কাজ কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম—সত্যি বলচি—নিজের প্রতি দারুণ ঘৃণা হয়েছে কিন্তু তবুও নিবৃত্ত হতে পারিনি—আমার সাধ্যে কুলোয় নি;—আমি যে অমনি করে তৈরি হয়েচি, আমার নিজের বলে কিছু করবার সামর্থ্য ভগবান যে আমায় দেন নি—আমি তো আমার প্রভু নই—আমি যে দাস! আমি দৈবের দাস, ঘটনাচক্রের দাস, প্রবৃত্তির দাস—জঘন্য ক্রীতদাস! আমি অত্যন্ত অদ্ভুত—নানা মিশ্রণে আমার গঠন, তাই তুমি আমায় বুঝতে পার না। কিন্তু চেষ্টা কর ফ্র্যাঙ্ক, আমায় বুঝতে, তাহ'লে আমায় নিশ্চয় তুমি ক্ষমা করবে। বিশ্বাস করো—সত্যি বলচি আমি স্বার্থপর নই—সত্যিই সমস্ত প্রাণের সঙ্গে আমি তোমায় ভালোবাসি—সত্যি বলচি এমন ভালোবাসা কেউ কাউকে কখনো বাসেনি;—আর কেনই বা তোমায় ভালোবাসব না? তুমি আমার কি না করেচ! আমি স্বার্থপর নই, নই! ফ্র্যাঙ্ক! আমি কখনোই স্বার্থপর নই! এ কথা কেন বিশ্বাস করচ না? যখন তোমার ধনরত্ন গেল, সব গেল, যখন তুমি আমারই মতো দরিদ্র নিঃসম্বল হয়ে পথে দাঁড়ালে তখন কি আমি তোমায় ত্যাগ করেছিলুম? তখনো কি তোমার সমস্ত দুঃখকষ্টের ভাগ আনন্দের সঙ্গে বহন করে ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ফিরিনি? স্বার্থপর হলে কি তা করতে পারতুম? মনে করে দেখ, আমি তোমায় ত্যাগ করিনি, ত্যাগ করিনি! তোমার সঙ্গে একত্রে খেটেছি, হাসিমুখে তোমার দুঃখ বহন করেচি। হা ভগবান! সে দুঃখের দিনও রইল না কেন? আবার কেন ইভার সঙ্গে দেখা?—"

—"ব্যস থামো—আর কত বলতে চাও!" ফ্র্যাঙ্ক গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তাহলে এ তোমারই কাজ! তুমিই আমার জীবনের সমস্ত সুখশান্তি রসাতলে দিয়েছ! হা ভগবান! এও সম্ভব!—তুমি ঠিক বলেছ বার্টি, আমি তোমায় বুঝতে পারলুম না!", বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক একটা বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন;—মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল—চোখ দিয়া রাগ আগুনের মতো ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল।

বার্টি ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মিনতির স্বরে আবার বলিল—"ফ্র্যাঙ্ক! ভাই! আমাকে বোঝবার চেষ্টা কর—আমি কি তা বোঝ। মনে কর আমি তোমার সেই বন্ধু—অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন! ভগবানের নামে শপথ করে বলচি আমি যে মন্দ—সে আমি ইচ্ছে করে নই—ঘটনাচক্র, ভাগ্যচক্র আমাকে মন্দ করে তুলেচে। আজন্মকাল থেকে আমার মধ্যে এতটুকু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই—আমি সে শক্তি নিয়ে জন্মাতে পারিনি। ভগবান আমাকে চিন্তাশক্তি দিয়েছেন সত্য কিন্তু সে শক্তি আমার বশে নয়, আমি যা খুসী হয়ে ভাবতে ভালোবাসি তা তো পারিনে। সমুদ্র-তরঙ্গের উপর একটা গোলা পড়লে যেমন কেবলই সেটা ধাক্কা খেতে খেতে উঠতে পড়তে থাকে তেমনি করে সমস্ত জীবনটা আমি একটা না একটা দুরবস্থার ধাক্কা খেয়ে খেয়ে কেবলই উঠেছি পড়েচি—হাঁফ্ ছাড়তে পাইনি। কি করব? তরঙ্গের উপর মাথা জাগিয়ে বাঁচতে হবেত! ইচ্ছাশক্তি? মনের বল? জানি না তোমার সে সব আছে কি না, কিন্তু আমার মধ্যে তার পরিচয় আজ পর্য্যন্ত কখনো পেলুম না। আমি যে একটা কাজ করি সে আমাকে করতে হয় বলে আমি করি—ঘাড় ধরে করায়

বলে আমি করি—সে রকম না করে অন্য রকম করতে পারি না বলে আমি করি ;—যদিও তার বিপক্ষে আমার ইচ্ছা যায় তবুও পারি না—সে শক্তি, সে জোর আমার নেই। কি করব ? সত্যি বলচি ফ্র্যাঙ্ক আমি নিজেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। অবিশ্বাস করো না ফ্র্যাঙ্ক,—এ কথা অবিশ্বাস করো না,—আমার কথা বিশ্বাস করে আমাকে ক্ষমা কর।"

দাঁতের উপর দাঁত কষিয়া ফ্র্যাঙ্ক বজ্রকণ্ঠে বলিলেন—"কথা! কথা! কেবলই কথা! কথা আর ফুরোয় না! কী মাথামুণ্ড বকচিস কিছু বুঝি না। আমি কিছু শুনতে চাই না—আমি কোনো কথা বুঝতে চাই না। আমি শুধু এইটুকু বুঝচি যে তুইই আমার সর্ব্বনাশ করেচিস—আমার জীবনের সমস্ত সুখশান্তি তোর হীন স্বার্থপরতার জন্য নষ্ট হয়েছে—তোর মতো পাষণ্ড, নরাধম, কাপুরুষ জগতে নেই!—নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তুই আমার চিঠি গোপন করেচিস—ঘুষ দিয়েছিস! ঘুষ দিয়েছিস ?—হাঁ উইলিয়মকে ঘুস দিয়েছিস তুই! বল্ রাস্কেল, কার টাকা নিয়ে ঘুস দিয়েছিস—বল্ কার টাকা ?"

—"কার টাকা, অঁ্যা ?" বার্টি দারুণ ভয়ে ইতস্তত করিতে লাগিল, কারণ ফ্র্যাঙ্ক তখন তাহার গলার কাপড়টা জোর করিয়া ধরিয়া কেবলই মোচড় দিতেছেন!

—"বল বলচি—কার টাকা ? আমার টাকা নিয়ে ঘুস দিয়েচিস ? বল্ নইলে লাথি মেরে কথা বার করব ? আমার টাকা কিনা বল!"

—"হাঁ।"

—"কি! আমারই টাকা!"

—"হাঁ, হাঁ, হাঁ!"

ফ্র্যাঙ্ক ঘৃণার সহিত আছড়াইয়া বার্টিকে দূরে ফেলিয়া দিলেন!

হঠাৎ বার্টির মনের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া গেল—সে যে নিজেকে হীন করিয়া দেখিতেছিল তাহার বিরুদ্ধভাব জাগিয়া উঠিল। জগত নির্ব্বোধ! জগতের লোক নির্ব্বোধ! ফ্র্যাঙ্ক নির্ব্বোধ! বার্টি যে কেন এমন সে কথা ফ্র্যাঙ্ককে কিছুতেই বোঝানো গেল না—কিছুতেই সে বুঝিল না! সে মূর্খ! এতটুকু তার বোধ-শক্তি নাই!

বার্টি হৃতশক্তি ফিরিয়া পাইয়া এক লাফে দাঁড়াইয়া উঠিল। সাপের মতো তর্জ্জন করিয়া বলিল—"হাঁ গো হাঁ, হাঁ। যদি শুনতে চাও আবার বলি, হাঁ। এখনও যদি তুমি বুঝতে না পেরে থাক—ভগবান যদি তোমায় বুদ্ধি না দিয়ে থাকেন তাহ'লে আবার বলি হাঁ, তোমারই টাকা নিয়ে ঘুষ দিয়েছিলুম—দয়া করে তুমি যে টাকা আমায় দান করেছিলে সেই টাকায় ঘুষ দিয়েছি। সেই যে এক শ প' ও তুমি দিয়েছিলে সে উইলিয়মেরই জন্যে! মনে পড়চে না ? সে টাকা উইলিয়মকেই দেওয়া হয়েচে। এখন বুঝতে পেরেছ ? বুঝতে পারচ না ? নির্ব্বোধ! আহাম্মক! এতটুকু বুদ্ধি তোমার নেই। হায়, আমিও যদি তোমার মতো বুদ্ধিহীন হতুম! ছিলুম, আমিও এক সময় তোমারই মতো নির্ব্বোধ ছিলুম ;—কিন্তু জানো, কে আমার বুদ্ধি খুলে দেয় ? সে তুমি! সে এক সময় ছিল যখন আমি আর কিছু জানতুম না, কেবল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কোনো রকমে প্রাণটা রক্ষা করবার জন্যে ব্যস্ত থাকতুম—আর কোনো ভাবনা চিন্তা ছিল না ; যখন আহার জুটত খেতুম, না জুটলে উপবাসে দিন যেত, তাতে আমার কোনো দুঃখ ছিল না। তারপর তুমিই আমাকে রাজভোগের আহার দিলে, রাজার মতো পোষাক পরালে, অন্নবস্ত্রের কোনো ভাবনা ভাবতে দিলে না। তাতেই আমার সব মাটি! কোনো কাজ নেই—জীবনের সংগ্রাম নেই, কেবল অলসতা, বিলাসিতা! সেই অলসতার মধ্যে থেকে থেকে কল্পনার উন্মেষ হতে লাগল—কেবল কল্পনা, কল্পনা, কল্পনা। তাইতেই তো আমার বুদ্ধি, আমার চতুরতা, আমার দূরদৃষ্টি খুলে গেল। নইলে কে অত ফন্দি অত কুটিলতা জানত, আর সে সবের জন্য সময়ই বা কোথায় ছিল! এখন আমার ইচ্ছা করচে তোমার সামনে মাথাটা ফাটিয়ে আমার মগজটা বার করে দেখিয়ে দি যে তুমি আমার কি করেচ—আমার মাথাটাকে কি কতকগুলো অদ্ভুত অর্থহীন কল্পনায় পূর্ণ করে দিয়েছ! এ সব কথা বুঝতে পারচ না ? তাহ'লে একথাও বুঝতে পারবে না যে তোমার উপর আমার কোনো কৃতজ্ঞতা নেই—তুমি আমার জন্যে যা করেছ তার জন্যে আমি এতটুকু কৃতজ্ঞ নই—বরঞ্চ তোমাকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি! এই জন্য ঘৃণা করি যে তুমি আমার পরম শত্রু ;

—তুমি আমাকে বিলাসিতার মধ্যে রেখে আমার জীবনকে দুঃসহ করে তুলেচ—আমি তোমার প্রতি কি অবিচার করেছি? তার শত গুণ অবিচার তুমি আমার প্রতি করেচ! বুঝেচ? বেশ! সব বুঝতে না পার এইটুকু বোঝ যে আমি তোমাকে ঘৃণা করি—অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি!"

বার্টি নিজেকে একটা টেবিলের পাশে আড়াল করিয়া উন্মত্তের প্রলাপের মতো বকিয়া যাইতেছিল—সেতারের তার খুব কড়া করিয়া বাঁধিলে তাহা যেমন ছিঁড়িবার উপক্রম করে বার্টির মনে হইতেছিল তাহার দেহের স্নায়ুগুলা তেমনি ছিঁড়িবার উপক্রম করিতেছে! সে টেবিলের আড়ালে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়াছিল কারণ সম্মুখে ফ্র্যাঙ্ক রোষকষায়িত লোচনে বজ্রমুষ্টিতে দণ্ডায়মান—যেন বাঘের মতো লাফাইয়া পড়িয়া আক্রমণ করিবার জন্য উন্মুখ! কখন বার্টির কথা শেষ হয় তিনি তাহারই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বার্টি আর কোনো কথা খুঁজিয়া না পাইয়া আবার বলিল—"হাঁ, আমি তোমাকে ঘৃণা করি—হীন পশুর মতো ঘৃণা করি!"

ফ্র্যাঙ্ক আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। একটা ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দিয়া টেবিলের উপর লাফাইয়া উঠিলেন—টেবিল টলমল করিয়া সবসুদ্ধ বার্টির ঘাড়ে আসিয়া পড়িল;—ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি বার্টির গলা ধরিয়া তাহাকে টেবিলের নীচে হইতে টানিয়া বাহির করিলেন, তারপর ঘরের মধ্যখানে আনিয়া এক আছাড়ে ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকে চাপিয়া বসিলেন;—রক্তের পিপাসার মতো একটা পাশবিক তৃষ্ণা ফ্র্যাঙ্কের সমস্ত বুক শুষ্ক করিয়া জাগিয়া উঠিল। শত্রুকে কবলে পাইয়াছেন বলিয়া দানবায় আনন্দের একটা হাস্যরেখা মুখে ফুটিয়া উঠিল। তিনি সজোরে বার্টির গলাটা বাম হাতে চাপিয়া ধরিলেন; বাঘের মতো গর্জ্জন করিয়া তিনি দক্ষিণহস্তের বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিলেন।

দুম! দুম! দুম! ঘুসি উঠিতে ও নামিতে লাগিল।

দুম! দুম! দুম। কানে মুখে চোখে সর্ব্বত্র বজ্রের মতো পড়িতে লাগিল ঘুসি!

ফ্র্যাঙ্ক পৈশাচিক আনন্দে হাঁকিয়া উঠিলেন—"কেমন! কেমন! কেমন!" সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর কাঁপাইয়া শব্দ উঠিতে লাগিল—"দুম! দুম! দুম!"

দুম! দুম! দুম!

—লালিমার একটা কুহেলিকা ফ্র্যাঙ্কের চোখের সামনে জমিয়া উঠিতে লাগিল। সমস্ত লালে লাল;—লাল রং-মশালের আলোর একটা ঘূর্ণি চোখের সামনে অনবরত ঘুরিতে লাগিল—তাহার মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ও কী ভীষণ মৃত্যুবিবর্ণ মুখ!

ঘরের মেঝে, কড়িকাঠ, দেয়াল, সব ঘুরিতেছে, দুলিতেছে—একটা ভীষণ লালিমার আবর্ত্তে! সে কি বিচিত্র লাল! কোথাও শেষ নাই সে লালিমার—কোথাও শেষ নাই সে ঘূর্ণির! নেশার মতো তার আচ্ছন্নতা, স্বপ্নের মতো তার অস্পষ্টতা, উন্মত্ততার মতো তার নৃত্য! রক্তের সে কী প্রহেলিকা! ....

ফ্র্যাঙ্ক কঠোর হস্তে গলা চাপিয়া ধরিলেন—ঘুসি পড়িতে লাগিল দুম, দুম, দুম!

হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল। ইভা ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন;—সেই রক্তিম কুয়াশার জাল ভেদ করিয়া, ছিন্ন করিয়া, দুই হাতে সরাইয়া তিনি ফ্র্যাঙ্কের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"ফ্র্যাঙ্ক! ফ্র্যাঙ্ক! থামো—থামো। আর নয়, আর নয়।"

ফ্র্যাঙ্কের হাত শ্লথ হইয়া গেল; তিনি স্বপ্নাবিষ্টের মতো ইভার পানে চাহিলেন। ইভা তাঁহাকে টানিয়া বাধা দিয়া বার্টিকে তাঁহার কবলমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

—"ফ্র্যাঙ্ক! ছাড়ো, ছাড়ো। উঠতে দাও—মেরে ফেলো না! আমি এতক্ষণ বাহিরে দাঁড়িয়েছিলুম—ভারি ভয় করছিল। তোমরা ডচ্ ভাষায় কথা কইছিলে তাই কিছু বুঝতে পারছিলুম না। হায়! হায়! ফ্র্যাঙ্ক চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ বার্টির কি অবস্থা করেছ!"

ফ্র্যাঙ্ক দাঁড়াইয়া উঠিলেন—রক্তের সেই উন্মত্ততায় তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল—তিনি চোখ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

"শাস্তি! শাস্তি!—যেমন কাজ তার উপযুক্ত শাস্তি আমি দিয়েছি—এখনো হয়নি আরো বাকী আছে।"

বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক আবার আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন ;—রক্তের পিপাসা আবার তাঁহার বুকের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

ইভা দুই বাহু দিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বলিলেন—"না, ফ্র্যাঙ্ক ! না। আর না। যথেষ্ট হয়েচে। দেখ ওর কি অবস্থা করেচ !"

ফ্র্যাঙ্ক ঘৃণার সহিত গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তবে উঠুক, আব পড়ে কেন ? ওঠ্ ! ওঠ্ ! পাজি কোথাকার ওঠ্ !"

ফ্র্যাঙ্ক জুতার ঠোক্কর দিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন—"ওঠ্, ওঠ্, ওঠ্ !"

এক ঠোক্কর, দুই ঠোক্কর, তিন ঠোক্কর ! তবুও বার্টি উঠিল না।

ইভা বার্টির পাশে বসিয়া পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"আহা হা হা ! দেখ দেখ দেখ, বেচারার কি দুর্গতি হয়েছে। দেখচ না কি হ'ল ?"

ফ্র্যাঙ্ক চাহিলেন। রক্তের নেশা যেন তাঁহার কাটিয়া গেল। তিনি ভয়বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন—বার্টি পড়িয়া আছে—স্থির ! বুকে স্পন্দন নাই, চোখে পলক নাই, মুখ নীল—তাহার উপর রক্তের বিন্দু, ঝরিয়া ঝরিয়া মেঝেয় আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে। * * * *

বাহিরে ভীষণ গর্জ্জন ! ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ ! ঘরের ভিতর মৃত্যুর অনন্ত নিস্তব্ধতা—সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে দুই জনে দাঁড়াইয়া ভয়ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া রহিলেন সেই নীল স্থির দেহের পানে !

ইভা বার্টির দেহের উপর একবার নত হইয়া কান পাতিয়া শুনিলেন সত্যই বুকের শব্দ থামিয়া গেছে কি, না। তারপর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন ;—ফ্র্যাঙ্ককে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক ! বার্টি নেই, বার্টি আর নেই। চল, চল আমরা পালাই।"

—"বার্টি নেই ?" ফ্র্যাঙ্ক অস্পষ্টভাবে বলিলেন—"বার্টি নেই !" তাঁহার মনের ঘোর তখন কাটিয়া যাইতেছে—তিনি যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলেন। আর তাঁহার কোনো মোহ নাই। ইভার বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া তিনি বার্টির বুকের উপর গিয়া পড়িলেন—দেখিলেন, পরীক্ষা করিলেন, কান পাতিয়া শুনিলেন, তাঁহার মনে অস্পষ্টভাবে অনেক কথা উঠিল—ডাক্তার ডাকিবার কথা, সেবা শুশ্রূষার কথা, আরো অনেক কথা। সে সব কথা তিনি শুধু মুখে অস্পষ্ট ভাবে বলিয়া গেলেন • কিন্তু কাজে করিবার যেন কোনো শক্তি পাইলেন না।

ফ্র্যাঙ্ক একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"হাঁ ! বার্টি মরেচে, সত্যই বার্টি মরেচে ! কিন্তু আমি কি—?"

ইভা ফ্র্যাঙ্ককে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া তখনও অনুনয় করিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক, দুটি পায়ে পড়ি তুমি পালাও, আর এখানে নয়।" কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের মনের ঘোর তখন একেবারে কাটিয়া আসিয়াছে—প্রভাতের আলোকরশ্মি তাঁহার মনের কুহেলিকার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, এখন তিনি সব স্পষ্ট করিয়া দেখিতেছেন, বুঝিতেছেন। আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না—সবলে ইভার বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—একেবারে দরজার কাছে গিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন।

ইভা দেখিলেন ফ্র্যাঙ্ক তাঁহাকে একেলা ফেলিয়া চলিয়া যান, তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ও ফ্র্যাঙ্ক ! ফ্র্যাঙ্ক !"

ফ্র্যাঙ্ক ফিরিয়া দাঁড়াইলেন অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন—"চুপ্ ! তুমি এইখানে অপেক্ষা কর ; আমি ফিরে আসচি !

ইভার ইচ্ছা হইতেছিল তিনি ছুটিয়া গিয়া ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গ লন, কিন্তু চাহিয়া দেখেন ফ্র্যাঙ্ক ততক্ষণে চলিয়া গেছেন। তিনি একবার চেষ্টা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কিন্তু পা কাঁপিতে লাগিল, চলিবার শক্তি নাই ! মৃতদেহের পাশে বসিয়া তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। সম্মুখে মৃত্যুর সে কী বীভৎস লীলা ! রুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে ভয়ের সে কী তাণ্ডব নৃত্য ! তাঁহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল ;—ঘরের মধ্যে যেন নির্ভয়ে গ্রহণ করিবার মতো এতটুকু বাতাস নাই। ইচ্ছা হইতেছিল একটা জানালা খুলিয়া দেন কিন্তু জানালার কাছে যাইবার সাহস হইল না—ঐ যে সাসির ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে বাহিরের আকাশ—কী ভীষণ, কী রুদ্র,—যেন প্রলয়ের জন্য

মাতিয়াছে! সমুদ্রে আজ এ কী আলোড়ন, কী গর্জ্জন! ইভা ভয়ে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন;—এমনিতর আর একদিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল, তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"এ যে সেই! সেই মল্‌ডির আকাশ! সেই মল্‌ডির সমুদ্র—সেই প্রলয়ের বিভীষিকা! হা ভগবান! রক্ষা করো।"

বলিতে বলিতে মূর্চ্ছাতুর হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

পদ্মার প্রতি

হে পদ্মা! প্রলয়ঙ্করী! হে ভীষণা! ভৈরবী সুন্দরী!
হে প্রগল্‌ভা! হে প্রবলা! সমুদ্রের যোগ্য সহচরী
তুমি শুধু; নিবিড় আগ্রহ তার পার গো সহিতে
একা তুমি; সাগরের প্রিয়তমা অয়ি দুর্বিনীতে!
দিগন্ত বিস্তৃত তব হাস্যের কল্লোল তারি মত
চলিয়াছে তরঙ্গিয়া,—চিরদৃপ্ত, চির-অব্যাহত।
দুর্ণমিত, অসংযত, গূঢ়চারী, গহন-গম্ভীর,
সীমাহীন অবজ্ঞায় ভাঙিয়া চলেছ উভতীর!
রুদ্র সমুদ্রের মত, সমুদ্রেরি মত সমুদার
তোমার বরদ হস্ত বিতরিছে ঐশ্বর্য্য-সম্ভার।
উর্ব্বর করিছ মহী, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী,
গ্রাসিয়া নগর গ্রাম হাসিতেছ দশদিক ভরি'!
কখনো প্রসন্ন তুমি, কভু তুমি একান্ত নিষ্ঠুর;
দুর্ব্বোধ, দুর্গম হায়, চিরদিন দুর্জ্জেয়-সুদূর।
শিশুকাল হ'তে তুমি উচ্ছৃঙ্খল, দুরন্ত-দুর্ব্বার;
সগর রাজার ভস্ম করিলে না স্পর্শ একবার!
স্বর্গ হ'তে অবতরি' ধেয়ে চলে এলে এলোকেশে,
কিরাত-পুলিন্দ-পুণ্ড্র অনাচারী অন্ত্যজের দেশে!
বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন-মনোরথ
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজপথ;
আর্য্যের নৈবেদ্য, বলি, তুচ্ছ করি' হে বিদ্রোহী নদী!
অনাহুত অনার্য্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি!
সেই হ'তে আছ তুমি সমস্যার মত লোক মাঝে,
ব্যাপৃত সহস্র ভুজ বিপর্য্যয় প্রলয়ের কাজে!
দম্ভ যবে মূর্ত্তি ধরি' স্তম্ভ ও গুম্বজে দিনরাত
অভ্রভেদী হ'য়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাত
তার প্রতি কোনো দিন; সিন্ধুসখী! হে সাম্যবাদিনী!
মূর্খে বলে কীর্ত্তিনাশা, হে কোপনা! কল্লোলনাদিনী!
ধনী দীনে একাসনে বসায়ে রেখেছ তব তীরে,
সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতার কুটীরে;
না জানে সুপ্তির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে,
ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্লাবনের তানে,
নাহিক বাস্তুর মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই!
অয়ি স্বাতন্ত্র্যের ধারা! অয়ি পদ্মা! অয়ি বিপ্লাবিনী!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

নবীন সন্ন্যাসী

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

মোহিতের আগমন।

অপরাহ্ণ কাল। গুরুদাস বাবু বৈঠকখানায় আরাম কেদারায় হেলান দিয়া, একখানি ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। চক্ষে সোনার চসমা রহিয়াছে। কক্ষে আর কেহ নাই।

গুরুদাস বাবুর বয়স পঞ্চাশের উপর। বৃদ্ধ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ—যুবাকালে ইনি একজন সুপুরুষ বলিয়া গণ্য ছিলেন। এখন দেহখানি ঈষৎ স্থূল—কিন্তু বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। মস্তকের কেশগুলি বিরল হইয়া আসিয়াছে; যাহা আছে তাহার অধিকাংশই শুভ্র। চক্ষু দুইটি বৃহৎ ও হাস্যবিভাসিত। ক্ষৌরিত চিক্কণ মুখমণ্ডল হইতে যেন একটা সহৃদয়তার দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। গায়ে একটি পাতলা শাদা ফ্ল্যানেলের হাতকাটা পিরাণ। পার্শ্বে আলবোলায় তামাকু প্রস্তুত রহিয়াছে—কলিকা হইতে অল্প অল্প ধূমোদ্গম হইতেছে—কিন্তু বৃদ্ধের সেদিকে খেয়াল নাই। তামাকু মনের আক্ষেপে নিজে নিজেই পুড়িতেছে। গুরুদাস বাবু যখন পাঠে নিমগ্ন থাকেন—তখন তাঁহার পার্শ্বে তামাকু সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। কখনও মাঝে মাঝে

দুই এক টান দেন মাত্র। যখন টানিয়া দেখেন তামাক পুড়িয়া গিয়াছে, তখনি ছিলিম বদলাইয়া দিতে হুকুম করেন।—ভাল তামাক এমন করিয়া 'মাঠে মারা' যায় দেখিয়া ভৃত্যেরা তা হুতাশ করে।

বৈঠকখানার সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গন। বারান্দার নিম্নে খানিকটা স্থান ঘিরিয়া শ-খানেক গোলাপ গাছ দেওয়া। সেখানে শ্বেত, পীত ও রক্তবর্ণের বিভিন্ন জাতীয় গোলাপ-ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। বেলা চারিটা বাজিল। তখন বাহিরে হুম্ হুম্ করিয়া পাল্কী-বেহারার শব্দ উত্থিত হইল। ক্রমে পাল্কীখানি প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। গুরুদাস বাবু বাহিরের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটি অপরিচিত যুবাপুরুষ পাল্কী হইতে অবতরণ করিতেছে। বৈঠকখানার অপর অংশ হইতে প্রমথনাথ চটি জুতা ফট্ ফট্ করিতে করিতে বাহির হইয়া, মোহিতলালকে স্বাগত সম্ভাষণ করিল। পাল্কীর বিছানা এবং চামড়ার ব্যাগটি একজন ভৃত্যের জিম্মায় দিয়া, মোহিতকে লইয়া প্রমথনাথ পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইল। বলিল—"বাবা—এই আমার বন্ধু মোহিতলাল এসেছেন।"—সঙ্গে সঙ্গে মোহিত ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুদাস বাবুকে প্রণাম করিল।

"এস বাবা এস—ভাল আছ ত?"—বলিয়া গুরুদাস বাবু দণ্ডায়মান হইলেন। চশমাটি খুলিয়া পুস্তকের মধ্যে চিহ্নস্বরূপ রাখিলেন।

"আজ্ঞা হাঁ। ভাল আছি। আপনার শরীর বেশ ভাল আছে?"—বলিয়া মোহিত নতমস্তকে রহিল।

"হাঁ—বেশ আছি। এস,—বস।"—বলিয়া বৃদ্ধ কক্ষের মধ্যস্থিত, চৌকি-পরিবেষ্টিত টেবিলের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, মোহিত ও প্রমথ উপবেশন করিল।

গুরুদাস বাবু সস্নেহে মোহিতের পানে চাহিয়া বলিলেন—"কবে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলে?"

"শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিন। দুদিন খুলনায় ছিলাম।"

প্রমথনাথ বলিলেন—"খুলনায় বৈদ্যুতিক হিন্দুসভার বার্ষিক উৎসবে মোহিতের নিমন্ত্রণ ছিল।"

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"হাঁ—হাঁ। বৈদ্যুতিক হিন্দুসভা থেকে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল বটে। সভার নামটা শুনে একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। ব্যাপারখানা কি বল দেখি?"

মোহিত অল্প হাসিয়া বলিল—"সে সভার সভ্যদের মত টত একটু অদ্ভুত রকমের। তারা বলে বিদ্যুৎই হচ্চে আধ্যাত্মিক জগতের একমাত্র শক্তি।"

বিস্মিত স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন—"বিদ্যুৎ? বিদ্যুৎ আধ্যাত্মিক জগতের একমাত্র শক্তি?"

"আজ্ঞা হাঁ। তারা আরও বলে, মানুষের আত্মা আর কিছুই নয়—খানিকটে বিদ্যুৎ মাত্র। পূজা, হোম, জপ, তপ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য, এই বিদ্যুতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।"

শুনিয়া গুরুদাস বাবু হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—"তাদের মাথার কোনও গোলমাল নেই ত?—কারা এ সভা করেছে?"

মোহিত বলিল—"সহরের নিষ্কর্ম্মা ছেলেরা।"

"ওঃ—তাই বল। আমি ভেবেছি বুঝি বয়স্ক লোকেরা। ছেলে-বুদ্ধি নইলে আর এমন হয়!"

প্রমথনাথ বলিল—"কেন বাবা—কোন কোন বয়স্ক লোকেও ত এ রকম মত প্রচার করেন। হিন্দুধর্ম্মের অধিকাংশ ক্রিয়া কাণ্ডের বৈদ্যুতিক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।"

মোহিত বলিল—"এ যুগে ধর্ম্মের সঙ্গে জড়বিজ্ঞানে ঘোর যুদ্ধ চলছে। তাই কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারক মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করে থাকেন।"

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"তা ঠিক নয়। ধর্ম্মের সঙ্গে জড়বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই—বিরোধ সম্ভবও নয়। আমি প্রকৃত সত্যধর্ম্মের কথা বলছি। ধর্ম্মের ডগ্‌মার কথা বলছিনে।"

প্রমথ বলিলেন—"কিন্তু সকল প্রচলিত ধর্ম্মই ত ডগ্‌মায় পরিপূর্ণ। খৃষ্টধর্ম্ম—মহম্মদীয় ধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্ম—"

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের চেয়ে এ বিষয়ে নিষ্কণ্টক। যখন পিথাগোরাস এবং কোপর্নিকস্ প্রচার করেছিলেন যে সূর্য্য স্থির, পৃথিবীই তার চারিদিকে ঘুরছে—তখন খৃষ্টীয় জগতে কি তুমুল আন্দোলন উঠেছিল। পাদ্রীরা বলেছিলেন এটা 'entirely opposed to Holy Writ'—বাইবেলের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। পোপ পঞ্চম পল,

হুকুম দিয়েছিলেন, 'In order that this opinion may not further spread, to the damage of Catholic Truth' -এই মত পাছে বিস্তৃত হয়ে সার্ব্বজনীন সত্যকে নষ্ট করে, তাই এ সম্বন্ধে সকল পুস্তকাদি suspended, forbidden and condemned হল। কিন্তু হিন্দু জ্যোতীষিরা যখন এ সত্য আবিষ্কার করেছিলেন, হিন্দুধর্ম্ম কিন্তু আর্ত্তনাদ করে ওঠেনি।"

প্রমথ বলিল—"আপনি উচ্চ অঙ্গের হিন্দুধর্ম্মের কথা বলছেন। কিন্তু প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম—ক্রিয়াকাণ্ডমূলক যে হিন্দুধর্ম্ম—সেটা কি সব জায়গায় বিজ্ঞানসম্মত? যেমন ধরুন মূর্ত্তিপূজা।"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"মানুষের মনে যে একটা ভক্তিপ্রবৃত্তি আছে, সেইটেকে চরিতার্থ করবার জন্যে যদি সে মূর্ত্তি গড়েই ঈশ্বরকে পূজা করে—তাতে ক্ষতি কি?"

প্রমথ বলিল—"মূর্ত্তিতে ঈশ্বর আছেন কিনা সে ত অনেক দূরের কথা—ঈশ্বর মোটেই আছেন কিনা এর উত্তরই বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত দিতে পারে নি। সুতরাং বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের বিরোধ নেই এ কথা কি করে স্বীকার করি?"

গুরুদাস বাবু হাসিয়া বলিলেন—"আহা! ঈশ্বর নেই এ কথাও ত বিজ্ঞানে বলছে না গো। বিজ্ঞান শুধু বলছে—আমি জানি না। তুমি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ খুলে দেখ, সব জায়গাতেই লেখা আছে তিনি অচিন্ত্য—বড় বড় মুনি ঋষিরা ধ্যানেও তাঁকে পান না। তা হলেই ত হল স্পেন্সারের সেই unknowable—অজ্ঞেয়। ঈশ্বর আছেন কি না আছেন, এ নিয়ে তর্ক সম্পূর্ণ নিষ্ফল।—মানুষের মনে ঈশ্বরের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা আছে কিনা, এইটেই হল আসল কথা। এ বিষয়ে ধর্ম্ম আর বিজ্ঞান দুই-ই একমত। এ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্যে কেউ বা গির্জ্জায় গিয়ে উপাসনা করে, কেউ বা মশজিদে গিয়ে করে, কেউ বা ব্রাহ্মসমাজে যায়, আর হিন্দু মাটীর কিম্বা পাথরের মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজা করে। খৃষ্টান কি মুসলমান কি ব্রাহ্ম কেউ এমন কথা বলতে পারে যে তার মনে ঈশ্বরের যে ধারণা হয়েছে—ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ তাই?—কোনও বুদ্ধিমান এমন কথা বলবে না। আবার যারা ভক্ত—ব্রাহ্মই হোক, খৃষ্টানই হোক, মুসলমানই হোক,—তারা বলবে, পাহাড়ের সঙ্গে বালুকণার যে পরিমাণভেদ, ঈশ্বরের স্বরূপের সঙ্গে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির এ ধারণার তার চেয়েও বেশী প্রভেদ। হিন্দু কি জানে না, আমি যাকে পূজা করছি এ মাটীর মূর্ত্তি মাত্র? তা সে খুব জানে। কিন্তু আসল দেবতা পাবে কোথা?—অথচ ভক্তিপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি চাই। তাই সেই মূর্ত্তিকেই দেবতা মনে করে নিয়ে আকাঙ্ক্ষা মেটায়। এই যে ছোট ছোট মেয়েরা খেলার ঘর পাতে, ধূলোমাটী দিয়ে ভাত রাঁধে, পুঁতুল খোকাকে খাওয়ায়, সে কি জানে না যে এ ঘরও নয়, এ ভাতও নয়, এ খোকাও নয়?—খুব জানে। তবে ওরকম কেন করে?—কেউ কেউ বলেন, এটা শুধু অনুকরণ প্রবৃত্তি—বাপ মার দেখে—তাই করে। সে কথাই নয়। বীজের মধ্যে যেমন গাছ থাকে, বালিকার মধ্যে সেই রকম একটি মা আছে। তার মনের মধ্যে গৃহস্থালী পাতবার, সন্তান পালন করবার একটি আকাঙ্ক্ষা আছে। ও বয়সে সে গৃহ পাবে কোথা? সন্তান পাবে কোথা? তাই সে খেলার ঘর পেতে পুঁতুলকে খোকা কল্পনা করে' আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করে।"

মোহিত বলিল—"সাধ্বী স্ত্রীলোক যেমন প্রবাসী স্বামীর ফোটোগ্রাফ দেখে সান্ত্বনা লাভ করে—এও কতকটা সেই রকম।"

প্রমথ বলিল "সেই রকম কৈ হল? আসলের সঙ্গে নকলের সাদৃশ্য আছে। ফোটোগ্রাফ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু মূর্ত্তির সঙ্গে দেবতার সাদৃশ্য কোথায়? মূর্ত্তিটা দেবতার তুলনায় কিছুই নয়—মূর্ত্তিকে দেবতা কল্পনা করে দেবতার অপমান করা হয় না কি? এতে কি দেবতা সন্তুষ্ট হন?"

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"আচ্ছা আমি একটা উপমা দিয়ে একথার উত্তর দিই। মনে কর একটি লোক বিদেশে চাকরি করতে গেল, অনেক বৎসর ধরে বাড়ী এলনা। যখন সে বিদেশে যায়, তখন তার ছেলেটির চার পাঁচ বছর বয়স। সেই ছেলে ক্রমে বড় হল। তার মনে সর্ব্বদাই এই আক্ষেপ হয়, 'সকল ছেলেই আপন আপন

বাপের কাছে আছে,—আমিই কেবল বাপের কাছে থাকতে পেলাম না'। ক্রমে সে যুবাপুরুষ হল। দেখলে, তার সঙ্গীরা সকলেই নিজের নিজের বাপকে সেবা করে, যত্ন করে,—তার মনে এই দুঃখ হতে লাগল,—আমি আমার বাপের সেবা করতে পেলাম না। সে সামান্য রকম ছবি আঁকতে জানত। ইচ্ছা হল, বাপের একখানি ছবি সে আঁকে। সেই পাঁচ বছরের বেলায় বাপকে দেখেছিল—আবছায়া মত একটু মনে ছিল। সেই স্মৃতির অনুসরণ করে, নিজের সামান্য চিত্রবিদ্যার সাহায্যে, বাপের একখানি ছবি আঁকলে। কিন্তু আসলে সে ছবিখানি বাপের সঙ্গে কিছু মিললো না। সে সেই ছবিখানি সামনে রেখে রোজ প্রণাম করে, পূজো করে, এই রকম করে কিছুদিন যায়। একদিন সে বসে পূজো করছে, হঠাৎ তার বাপ এসে এই ব্যাপার দেখতে পেলে। তখন কি সে ছেলেকে জুতো নিয়ে মারতে যাবে, বলবে এ রকম ছবি এঁকে কেন আমার মানহানি করেছিস?—না, আনন্দে তার মন ভরে উঠবে—ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরবে?"

এই উপমাটি শুনিয়া প্রমথ ও মোহিত উভয়েই নিরুত্তর রহিল। উপমাটির সৌন্দর্য্য মোহিতকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

যুবকগণকে নীরব দেখিয়া গুরুদাস বাবু বলিলেন—"প্রমথ, ইনি শ্রান্ত হয়ে এসেছেন, এঁকে নিয়ে যাও। যাও বাবাজী হাত মুখ ধুয়ে বাড়ীর মধ্যে আমার রাধাবল্লভজীউ আছেন, তাঁকে প্রণাম করে, জল টল খাওগে।"

প্রমথনাথ মোহিতকে লইয়া উঠিল। যাইতে যাইতে মোহিত বলিল—মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে অনেক যুক্তিতর্ক শুনেছি কিন্তু উনি আজ গল্পচ্ছলে যে যুক্তির অবতারণা করলেন, সেটি বড়ই সুন্দর।"

প্রমথনাথ বলিল—"বাবা এত গল্প জানেন যে তার সংখ্যা নেই। আমরা ওঁকে গল্পার্ণব উপাধি দিয়েছি—অবিশ্যি সেটা ওঁর অসাক্ষাতে।"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিলাতী চিনি।

বৈঠকখানার পশ্চাতে বহির্ব্বাটী—তাহারই একটি সুসজ্জিত কক্ষ মোহিতলালের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই কক্ষের সহিত স্নানাগার প্রভৃতি সংলগ্ন। প্রমথনাথ সেই কক্ষে মোহিতলালকে লইয়া গেল। সমস্ত দেখাইয়া দিয়া, কিছুক্ষণের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মোহিতলাল হাত মুখ ধুইয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। আলমারি হইতে একখানি পুস্তক লইয়া, জানালার কাছে চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িতেছে।

প্রমথ বলিল—"কি পড়া হচ্ছে?"

"হক্সলির প্রবন্ধাবলী।"

"পড়ো না পড়ো না—নাস্তিক হয়ে যাবে।"

মোহিত বহি রাখিয়া হাসিয়া বলিল—"আমার আস্তিকতা তেমন ক্ষণভঙ্গুর নয়।"

প্রমথ বলিল—"বাড়ীর মধ্যে চল। ঠাকুর প্রণাম করবে, মাকে প্রণাম করবে এস।"

মোহিত উঠিয়া প্রমথনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। চকমিলানো দ্বিতল বাটী। উঠানে দাঁড়াইয়া একটি সাত বৎসরের বালক কলা খাইতেছে। ঝি চাকরেরা আপন আপন কার্য্য করিতেছে। সেই বালককে প্রমথনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"মা কোথা রে?"

আগন্তুকের প্রতি সন্দিগ্ধভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বালক বলিল—"উপরে।"

প্রমথ তখন মোহিতকে লইয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। সিংহাসনোপরি কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত রাধাবল্লভজীউ বংশী হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, পার্শ্বদেশে রাধিকা। মোহিতলাল বিগ্রহের নিকটবর্ত্তী হইয়া জানু পাতিয়া বসিয়া প্রণাম করিল।

তাহার পর পার্শ্বের একটি কক্ষে মোহিতকে উপবেশন করাইয়া, প্রমথ মাকে ডাকিতে গেল। মোহিত দেখিল, কক্ষখানিতে ইংরাজী ধরণের আসবাব। মধ্যস্থলে একখানি বৃহৎ গোল টেবিল আছে—তাহার চারি পাশে চৌকি। চারিদিকে দেওয়ালের নিকট চারিখানি সোফা। টেবিলের উপর টানা পাখাও ঝুলিতেছে। মোহিত একখানি সোফায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমথনাথ জননীকে সঙ্গে করিয়া প্রবেশ করিল। মোহিত বিস্মিত হইয়া দেখিল, ইঁহার বেশভূষা

সাধারণ হিন্দু গৃহস্থমহিলার মত নহে। ব্রাহ্মমহিলারই বেশ—কেবল পায়ে জুতা মোজা নাই।

প্রমথ বলিল—"মা, এই আমার কলেজের সহপাঠী বন্ধু মোহিত এসেছেন।"

মোহিত উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মা বলিলেন—"এস বাবা এস। দীর্ঘজীবী হও—রাজরাজেশ্বর হও।"

প্রমথ বলিল—"সে ত হবার যো নেই মা। মোহিত যে হবু-সন্ন্যাসী।"

মা বলিলেন—"ও আবার কি কথা! বালাই—সন্ন্যাসী হতে যাবে কেন? এই কি সন্ন্যাসী হবার বয়স?"

প্রমথ বলিল—"মোহিত আমাদের নবীন সন্ন্যাসী।"

এই কথা হইতেছে, এমন সময় একটি তের চৌদ্দ বৎসরের বালিকা আসিয়া গৃহিণীর কাছে দাঁড়াইল।

মোহিত দেখিল, বালিকারও বেশ মাতার ন্যায় নব্য-ধরণের। তাহার মুখশ্রী অতি পরিপাটী—বর্ণটিও সুন্দর। চুলগুলি খোঁপা বাঁধা নয়, খোলা অবস্থায় পিঠে পড়িয়া রহিয়াছে—যেমন ও বয়সের ইংরাজ মেয়েদের থাকে। হিন্দুয়ানির মধ্যে, কপালে একটি খয়েরের টিপ আছে এবং পায়ে জুতা মোজা নাই।

প্রমথ তাহাকে বলিল—"ইনি কে জানিস্?"

বালিকা নীরবে ঘাড় নাড়িল।

"আমার বন্ধু মোহিত—আমরা এক সঙ্গে কলকাতায় পড়তাম।"

এই কথা শুনিয়া বালিকা মোহিতলালকে নমস্কার করিল। প্রমথ মোহিতের দিকে চাহিয়া বলিল—"এটি আমার ছোট বোন চিনি।"

বালিকা একবার মার পানে একবার দাদার পানে চাহিয়া বলিল—"যাও দাদা, আমার নাম খারাপ কোরো না।"

"কেন, তোর নাম চিনি নয়?"

"না।"

"তবে কি, মিছরি?"

বালিকা সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল-"না।"

"তবে কি গুড়?"

বালিকা ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"আঃ—দেখ না মা।"

গৃহিণী কন্যার মাথার সম্মুখস্থিত কেশগুলি হাতে করিয়া সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন—"তা সত্যিই ত বাছা! চিনি বল্লে যদি ও রাগই করে, তবে কেন ওকে চিনি বলা? যখন ছেলেমানুষ ছিল তখন নাহয় বলেছিস। তাই বলে কি চিরকালই বলবি?"—বলিয়া গৃহিণী কন্যাকে লইয়া নিকটস্থ সোফায় উপবেশন করিলেন। মোহিত ও প্রমথ টেবিলের পার্শ্বস্থ দুইখানি চেয়ারে বসিল।

প্রমথ বলিল—"কেন, এখন কি উনি আর ছেলেমানুষ নেই? ভারি বিজ্ঞ হয়েছেন? চোখে চালশে ধরেছে? চশমা কিনে দিতে হবে?"

চিনি, মার একখানি হাত নিজ হস্তদ্বয়ের মধ্যে লইয়া বলিল—"দাদা যখন তখন বলেন—চশমা কিনে দেব? চশমা কিনে দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। যা কিনে দিতে এত দিন ধরে বলছি, তা কিন্তু কিনে দেবার নামটি নেই।"

গৃহিণী বলিলেন—"কি ফরমাস হয়েছে আবার?"

"দাদাকে জিজ্ঞাসা কর না।"

প্রমথ গম্ভীরভাবে বলিল—"একখানা নামাবলী।"

চিনি বলিল—"যাও—ভুলে গেলে?"

প্রমথ বলিল—"একটা হরিনামের মালা।"

"তোমার বেশ মনে আছে। তুমি শুধু আমায় রাগাচ্ছ। না মা—ও সব নয়।"

মা বলিলেন—"কি তবে তুই-ই বল্‌না।"

চিনি মার কানে কানে বলিল—"গ্র্যামোফোন্।"

গৃহিণী বলিলেন—"গ্রামোফোন? না বাছা—রক্ষে কর। গ্রামোফোনে কাজ নেই। কাণ ঝালাপালা। কলকাতায় যখন আমরা ছিলাম, আমাদের পাশের বাড়ীতেই সেই সোনারবেনেরা ছিল। তাদের ছেলে একটা গ্র্যামোফোন্ কিনে এনেছিল। দিন রাত্রি সেটা বাজাত। আমাকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়ে দিয়েছিল। যত গান ছিল, সব চেয়ে তার পছন্দ হয়েছিল একটা হতচ্ছাড়া গান। দিন নেই, দুপুর নেই, রাত্তির নেই,—সেইটে বাজাত। তার কেউ বন্ধুবান্ধব এলেই সেই গানটা শুনিয়ে দিত। ভাগ্যিস্ দিন কতক পরে তার কলটা ভেঙ্গে গেল, নইলে আমায়

অন্য বাড়ী ভাড়া নিতে হত। তুই তখন দশ বছরের ছিলি—মনে নেই ?”

চিনি বলিল—“মনে আছে বৈকি। সে গানটা হচ্ছে—‘চুরি গেছে মনোপাখী, পুলিসে কি খবর দিব’ ?—গ্রামোফোনে ত কত ভাল ভাল গান আছে মা,—সব ত আর এরকম নয়।”

“তা থাক বাছা—গ্রামোফোনের ভাল গান গ্রামোফোনেই থাক। আমার ঘরে তা সইতে পারব না। আমাদের বয়স হয়েছে—কাশী বৃন্দাবন চলে যাই—তখন তোরা বাড়ীতে গ্রামোফোন বাজাস্, ঢাক্ বাজাস্, যা খুসী বাজাস।”

এই কথা শুনিয়া চিনির চক্ষু দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল। “আচ্ছা না দাও না দেবে”—বলিয়া সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণী বলিলেন—“দেখলে একবার মেয়ের অভিমান! আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, শ্বশুরঘর করতে যাবে, আজও এমন অবুঝ। মোহিত, তুমি বাবা অনেক দূর থেকে এসেছ, তোমার ক্ষিদে পেয়ে থাকবে। জল খাবার তৈরি। বস, আমি সব ঠিক করিগে ঠিক করে ডেকে পাঠাব।”

প্রমথ বলিল—“মা, তুমি বোধ হয় মনে করেছ আমি বাড়ীতে বসে আছি বলে আমার ক্ষিদে টিদে কিছুই পায়নি। কিন্তু সেটা তোমার ভুল।”

মা হাসিয়া বলিলেন—“ভাগ্যিস্ ভুলটা সংশোধন করে দিলি—নইলে বোধ হয় আজ খাবার পেতিস্ নে।”—বলিয়া তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গার্ণবের চা পান।

জলযোগের পর মোহিতকে লইয়া প্রমথনাথ বাগানে কিয়ৎক্ষণ বেড়াইল। অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে মোহিত বলিল—“এবার ফেরা যাক্ চল—সায়ংসন্ধ্যার সময় হল।”

দুইজনে ফিরিল। পথে মোহিত বলিল—“তুমি সন্ধ্যা কর না কেন।”

প্রমথ হাসিয়া বলিল—“পৈতের পর একবৎসর করেছি। আবার চুল পাকলে দাঁত নড়লে আরম্ভ করব।”

“তোমার বাবা কিছু বলেন না ?”

“উনি কারু মতামতের উপর হস্তক্ষেপ করেন না। বলেন, যখন ওর ক্ষিদে পাবে তখন আপনিই খাবে।”

“আধ্যাত্মিক ক্ষুধা ?”

“অবিশ্যি।”

“তোমার বাবা এমন নিষ্ঠাবান আর তুমি এমন কালাপাহাড় কেন ?”

“একবারে কালাপাহাড় নই। যখন বাড়ীতে থাকি, রোজ সন্ধ্যার পর, বাবা যখন সায়ংসন্ধ্যা সেরে রাধাবল্লভজীউর ভোগ দেন, তখন আমাদের পূজোর ঘরে উপস্থিত থাকতে হয়—সকলকে—বাড়ীসুদ্ধ—মায় ঝি চাকর পর্য্যন্ত। ভোগ হয়ে গেলে বাবা রাধাবল্লভজীর স্তব করেন, আরতি করেন—সে সময়টা বেশ লাগে কিন্তু। আমি নিতান্ত কালাপাহাড় নই। আজ আরতির সময় বাবা তোমাকেও নিশ্চয় ডেকে পাঠাবেন।”

মোহিত বলিল—“বেশ ত। কিন্তু মেয়েরা থাক্‌বেন—আমি যাব কি করে ?”

“অত পর্দ্দা টর্দ্দা বাবা মানেন না। তবে অবিশ্যি তিনি এ ভালবাসেন না যে স্ত্রীলোক ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে, বলে নাচবে—কিম্বা সভাসমিতিতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করবে। যে সকল লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব—তারা বাড়ীতে এলে বাবা অন্তঃপুরে নিয়ে যান। তাতে তিনি কোনও দোষ দেখেন না।”

মোহিত বলিল—“কথাটা ঠিক বটে। তবে, আমাদের অভ্যাসের সংস্কারের বিরুদ্ধ বলে বাধো বাধো ঠেকে।”

বলিতে বলিতে ইহারা বাড়ী পৌঁছিল। সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া মোহিত নিজ কক্ষটিতে আসিয়া বসিল। প্রমথ আসিয়া তাহার সহিত গল্প করিতে লাগিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কর্ত্তা দুইজনকেই ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

মোহিত পূজার ঘরে গিয়া দেখিল, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া বিগ্রহের সম্মুখে গুরুদাস বাবু বসিয়া আছেন। ভোগ শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পার্শ্বে দুইদিকে দুইখানি কম্বল বিছানো আছে। একখানিতে মেয়েরা বসিয়া আছেন। অপরখানি পুরুষদের জন্য। প্রমথ ও মোহিত সেখানে গিয়া উপবেশন করিল। দ্বারের নিকট ঝি চাকরেরা বসিয়া আছে।

গুরুদাস বাবু তখন করযোড় করিয়া রাধাবল্লভজীউর স্তব পাঠ আরম্ভ করিলেন। গম্ভীর কণ্ঠে সুললিত সংস্কৃত শ্লোক ভক্তিগদগদচিত্তে আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ স্তব করিয়া অবশেষে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবতাকে প্রণাম করিলেন। সেই কক্ষস্থিত সকলেই স্ব স্ব স্থানে বসিয়া সেই সময় প্রণাম করিল। তখন গুরুদাস বাবু একহস্তে প্রজ্বলিত পঞ্চপ্রদীপ অপর হস্তে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ধারণ করিয়া আরতির জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। কক্ষস্থিত সকলেই দণ্ডায়মান হইল। মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া গুরুদাস বাবু আরতি করিতে লাগিলেন,—দুইটি ছোট বালক কাঁসর বাজাইতে লাগিল। আরতি শেষে গুরুদাস বাবু আবার প্রণাম করিলেন—অপর সকলেও প্রণাম করিল। অবশেষে তিনি কুশাগ্রে গঙ্গাজল লইয়া, সকলের মাথায় ছিটাইয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ইহার পর সকলে উঠিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। গুরুদাস বাবু মোহিতের হাতখানি ধরিয়া বাহিরে আসিলেন। পূর্ব্ববর্ণিত সেই বসিবার কক্ষে তাহাকে লইয়া গিয়া বলিলেন—"বস বাবা বস। আমি কাপড় ছেড়ে আসি—এইবার একটু চা খেতে হবে।"—বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

প্রমথ আসিয়া মোহিতের পার্শ্বে উপবেশন করিল। বলিল—"সন্ধ্যার সময় বাবা এইখানেই বসেন। বৈঠকখানায় যান না। প্রথমে যখন পেন্সন নিয়ে বাবা বাড়ী এসেছিলেন, তখন সন্ধ্যার পর বৈঠকখানাতেই বসতেন। কিন্তু পাড়ার যত সব বুড়োরা এসে তাস দাবা এই সব খেলবার প্রস্তাব করতে লাগল। রীতিমত একটি আড্ডা জমিয়ে তুল্লে। তাই বাবা সন্ধের পর আর বাইরে যান না। এই ঘরটিতে বসে চা খান, আমরা সব এসে বসি, গল্পগুজব করেন,—রামায়ণ কিম্বা মহাভারত পড়া হয়। কোনও দিন মা পড়েন, কোনও দিন আমার স্ত্রী পড়েন, কোনও দিন বা চিনি পড়ে।—যতক্ষণ খাওয়া দাওয়ার সময় না হয় ততক্ষণ এই রকম চলে।"

এই সময় একজন ভৃত্য, আলবোলায় একছিলিম তাওয়া সাজিয়া আনিয়া, টেবিলের কাছে একটি ছোট গোল চৌকির উপর রাখিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে গুরুদাস বাবুও প্রবেশ করিলেন।

চেয়ারে বসিয়া, আলবোলার নল মুখে দিয়া বলিলেন—"মোহিত, তোমার কখন্ চা খাওয়া অভ্যাস?—কেউ কেউ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চা খায়—আমরা বরাবর সন্ধ্যার পরেই খেয়ে থাকি।"

মোহিত বলিল "আজ্ঞা আমি চা খাইনে।"

বৃদ্ধ বলিলেন "অ্যাঁ! বল কি! চা খাও না?"

"আজ্ঞা না।"

"কি? কখনও খাও না?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ—কখন কখন খেয়েছি। শরীর অসুস্থ হলে—কিন্তু সেও খুব কালে ভদ্রে।"

"বটে? বেশ বেশ। ও অভ্যাস করনি ভালই করেছ। আমাদের এমন বদ্ অভ্যাস হয়ে গেছে—যথাসময়ে চা না পেলে কিছুই ভাল লাগেনা। মাথা ধরে যায়। তা শুধু আমি বলে না—গিন্নীসুদ্ধ, মেয়েরা পর্য্যন্ত। আমাদের বাড়ীর টিকটিকিটি পর্য্যন্ত চায়ের ভক্ত।"

এমন সময় চিনি, একটি থালায় করিয়া তিন পেয়ালা চা সাজাইয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। গুরুদাস বাবু বলিলেন—"আমার এই যে মেয়েটি দেখছ—এর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে কিনা বলতে পারিনে—এর নাম চিনি—এ বড় চমৎকার চা তৈরি করতে পারে। আর কারু হাতের চা আমার পছন্দই হয় না। ঠিক কয় মিনিট চা ভিজবে, ঠিক কতটুকু দুধ কতটুকু চিনি মেশাতে হবে,—এ যেমন বোঝে, তেমন আর কেউ পারে না দেখেছি। ও চিনি, তিন পেয়ালা কেন এনেছিস মা? মোহিত ত চা খান না।"

চিনি মোহিতের দিকে ফিরিয়া বলিল—"আপনি চা খান না?"—তাহার কণ্ঠস্বর হইতে এমন ভাবটা প্রকাশ পাইল যেন, কলিযুগে চা খায় না এমন মনুষ্য দর্শনীয় পদার্থ বটে!

মোহিত বলিল—"না—আমি চা খাইনে।"

গুরুদাস বাবু পেয়ালার মধ্যে চামচ সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন—"দেখলি?—খাগ। দেখে শেখ। উনি বল্লেন জীবনে দু তিনবার মাত্র চা খেয়েছেন—তাও শরীর

অসুস্থ হওয়াতে। আর তোরা, মার দুধ ছেড়েই চা খেতে শিখেছিস। তোদের মত বয়সে চা জিনিষটিকে আমরা ওষুধ বলেই জানতাম। তোদের দেখতে পাই, ভাত না হলেও চলে, কিন্তু চা—টি চাই।”—বলিয়া তিনি পেয়ালাটি তুলিয়া মুখে দিলেন। একচুমুক খাইয়া, চক্ষু বুজিয়া বলিলেন—আঃ।

চিনি একটি পেয়ালা ভ্রাতাকে নামাইয়া দিয়াছিল। তৃতীয়টি সম্বন্ধে বলিল—“তবে এ পেয়ালাটা কি হবে?”

গুরুদাস বাবু সেটির প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—“তাই ত—নষ্ট হবে? তার চেয়ে বরং আমিই খেয়ে ফেলব না হয়—থাক্—রেখে দে।”—চিনি তখন একটু মৃদু হাসিয়া, পেয়ালাটি টেবিলে নামাইয়া দিয়া, শূন্য থালাটি লইয়া চলিয়া গেল।

প্রথম পেয়ালাটি নিঃশেষে পান করিয়া, দ্বিতীয় পেয়ালাটি গ্রহণ করিয়া, গুরুদাসবাবু বলিলেন—“নেশা। এ একটা নেশার মধ্যেই গণ্য। যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল। এক একজন এত চা খায় দেখেছি! দুপেয়ালা—তিনপেয়ালা—চার পেয়ালা—চলেইছে। আমি সকালে এক পেয়ালা, সন্ধ্যায় এক পেয়ালা খাই। বড়-জোর এক পেয়ালার জায়গায় দুপেয়ালা হয়ে যায়। দ্বিজুরায়ের গানেই রয়েছে—

অসার সংসার কেহ নহে কার
ধন মান চাহিনা।
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই
ভাল এক পেয়ালা চা।

ওখানে দ্বিজুর একটু ভুল হয়েছে। লেখা উচিত ছিল, প্রাতে ও সন্ধ্যায়। ছন্দঃপতন হবার ভয়ে বোধ হয় লিখতে পারেনি। তবে যারা (এইখানে গুরুদাস বাবু দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন মেয়েরা কেউ আসিতেছে কিনা এবং স্বর নামাইয়া বলিলেন)—তবে যারা সন্ধ্যা-বেলা চার চেয়ে তীব্রতর কিছু পান করে, তাদের হয়ত সে সময় চা না পেলেও চলে।—“ধন মান চাহি না”—আহা, ঠিক লিখেছে। একেই ত বলে কবির অন্তর্দৃষ্টি। একটি বেশ গল্প মনে পড়ে গেল, বলি শোন।”—বলিয়া গুরুদাস বাবু পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া, রুমালে মুখ মুছিয়া আল-বোলার নলটি তুলিয়া লইলেন।

এমন সময় চিনি আসিয়া বলিল—“বাবা, মা জিজ্ঞাসা করলেন, আর এক পেয়ালা চা খাবেন কি?”

বৃদ্ধ বলিলেন—“আবার এক পেয়ালা কেন মা? দু পেয়ালা ত খেলাম। বেশী চা খাওয়া ভাল নয় ত।—হাঁ্যা কি বলছিলাম, সেই গল্পটা বলি শোন।”

গল্পের নাম শুনিয়া চিনি দ্বারের নিকটস্থিত একটী সোফায় উপবেশন করিল।

আলবোলার নলে গোটা দুই টান দিয়া, গুরুদাস বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

“আমি তখন বক্সারের সবডিভিজনাল অফিসার। মফস্বলে টুরে বেরিয়েছি। গ্রীষ্মকাল। ভয়ানক গরম পড়েছে—দিনের বেলায় লূ চলে। দিনে যাতায়াত করা অসম্ভব। আমি তাই রাত্রে যাতায়াত করতাম। একদিন গঙ্গা দিয়ে যাচ্চি। দুখানা নৌকো আছে—একখানা আমার, একখানাতে আমলা, আর্দ্দালিরা আছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত্রি। ফুর ফুর করে বাতাস দিচ্ছে। রাত্রি তখন ১২টা—তীরের খুব কাছ দিয়ে নৌকো দাঁড় টেনে যাচ্ছে। একটা জায়গায় তীরের কাছেই একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, তার কাছাকাছি আসতেই, মানুষের একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনতে পেলাম। নৌকো থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—‘কোন হায়?’—কোনও উত্তরই নেই। শুধু একটা অস্ফুটধ্বনি শুনতে পেলাম,—‘ইয়া আল্লা—জান গিয়া।’—ভাবলাম, কি হয়েছে? কেউ একে কেটে কুটে ফেলে যায় নি ত? কোনও ব্যারামে এ মরছে না ত?—নৌকো তীরে লাগিয়ে আমরা নামলাম। লোকটার কাছে গিয়ে দেখি—একবার সে উঠে বসছে—একবার শুচ্ছে—আর কাতরাচ্ছে। মুসলমান ফকীরের বেশ। সেখানটা তেপান্তর মাঠ। কোথাও জনমনুষ্য নেই। ধু ধু করছে বালির চড়া। জিজ্ঞাসা করলাম—‘তোমার কি হয়েছে? এমন করছ কেন?’—আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আর্দ্দালিরা জিজ্ঞাসা করলে, কোন উত্তর নেই। শুধু ‘ইয়া আল্লা—ইয়া আল্লা’—বলে কাতরানি। বসন্ত কিম্বা কলেরার কোন চিহ্ন দেখলাম না। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম,

গা-ও শীতল, জ্বর নয়। আর্দ্দালিকে বল্লাম—একে একটু জল এনে দে দেখি—যদি জল খায়। সে জল এনে দিলে—কিন্তু ফকীর তার হাতের পেয়ালা ঠেলে দিলে। আমার সঙ্গে বুড়ো পেস্কার ভাগবৎ সহায়, সে আফিম খেত। সে বল্লে 'হুজুর, এ বোধ হয় আফিমচী—আফিম না পেয়ে এর এ দশা হয়েছে।'—বলে সে নিজের পকেট থেকে আফিমের কৌটা বের করে, খানিকটে আফিম নিয়ে তার মুখের মধ্যে দিলে। আফিমের স্বাদ মুখে পাবামাত্র, সে দুহাত দিয়ে পেস্কারের হাতটি জড়িয়ে ধরলে। মুখের মধ্যে পেস্কারের সেই আফিম সুদ্ধ আঙ্গুল দুটো প্রাণপণ বলে চুষতে লাগল, চুষে আফিমটে নিঃশেষ করে, চুপ করে এক মিনিট বসে রইল। আর তার সে কাতরানি নেই। উর্দ্দুতে শেষে বল্লে—'বাবা—জিতা রও। আজ তুমি আমায় যে আনন্দ দিলে, দুনিয়ায় তার তুলনা নাই। আজ আমায় এখন যদি কেউ দিল্লীর সিংহাসন দিতে চায়, আমি তা তুচ্ছজ্ঞান করে অস্বীকার করি।'—আমরা আশ্চর্য্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর সে উঠে, আমাদের সেলাম করে, মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।—মৌতাত এমনি জিনিষই বটে। 'ধনমান চাহি না'—সে ফকীর, দিল্লীর সিংহাসনও চাহে নি।"

গল্পটি শুনিয়া মোহিত ও প্রমথ উভয়েই হাসিতে লাগিল। বৃদ্ধ তখন সে কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"চিনি—চিনি কোথায় গেলি ?"

চিনি গল্প শুনিতে বসিয়াছিল বটে—কিন্তু যখন দেখিল ইহা পুরাতন শোনা গল্প, তখন প্রস্থান করিয়াছিল। পিতার ডাকাডাকিতে পুনঃপ্রবেশ করিয়া বলিল—"কি বাবা ?"

গুরুদাস বাবু বলিলেন—"হ্যাঁ—কি বলছিলি তখন ?"

"কখন ?"

"এই যে একটু আগে এসে কি বলছিলি ? আমি আর চা খাব কি না জিজ্ঞাসা করছিলি বুঝি ? তা থাকে যদি তবে নিয়ে আয় না হয় আর এক পেয়ালা। যেন বেশী টং করিসনে।"—চিনি হাসিয়া অন্তর্হিত হইল।

গুরুদাস বাবু মোহিতকে বলিলেন—"ঐ যে বল্লাম, বেশী টং করিস্‌নে—ওর মানে কি বুঝতে পেরেছ ?"

মোহিত বলিল—"আজ্ঞা না।"

"আমাদের একজন চাকর ছিল, সে রোজ চা তৈরি করত। চা বেশী কড়া হয়ে গেলে সে বলত আজ বড় টং হয়ে গেছে। টং অর্থাৎ ষ্ট্রং। তাকে ঠাট্টা করে আমরাও টং বলতে সুরু করেছিলাম,—এখন অভ্যাসের বশে আমরাও বলি টং।"

চিনি আর এক পেয়ালা চা আনিয়া দিল। গুরুদাস বাবু বলিলেন—"মা—আজ একটু মহাভারত পড়ে শোনাও দেখি।"

চিনি তখন মহাভারতখানি আনিয়া, পিতার কাছে বসিয়া, পাঠ আরম্ভ করিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

হিন্দু ও মুসলমান

(সামাজিক পার্থক্য)

মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু কিরূপ ব্যবহার করিবে হিন্দু-শাস্ত্রে তাহার কোন বিধি বিধান নাই। কেমন করিয়াই বা থাকিবে—হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্র মুসলমানধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বহুকাল পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং কোন প্রচলিত বাঙ্গলা শব্দের ব্যাকরণ জানিতে হইলে পাণিনীর আশ্রয় গ্রহণ করা যেমন নিরর্থক, মুসলমান সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে হিন্দুশাস্ত্রের আশ্রয় লওয়াও সেইরূপই নিরর্থক। হিন্দুশাস্ত্রে ম্লেচ্ছ ও যবন প্রভৃতির উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহারা কেহই মুসলমান নহে। অনেকে না জানিয়া মুসলমানকে যবন বলে। কিন্তু এইরূপ বলা অসঙ্গত ও দোষজনক। দুঃখের বিষয় অনেক বাঙ্গালী গ্রন্থকার অবিচারে এই ভুল করিয়াছেন ও করিতেছেন।

ধর্ম্ম লইয়া হিন্দুর কাহারও সহিত বিবাদ নাই। হিন্দু-ধর্ম্ম নামে কোন ধর্ম্মই নাই। হিন্দুজাতি ধর্ম্মকে "ধর্ম্ম" বলিয়াই অভিহিত করে। মুসলমানের সঙ্গেও হিন্দুর ধর্ম্ম লইয়া কোন বিসম্বাদ হওয়ার কারণ নাই। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণও মুসলমান ফকিরদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন ; এমন কি সময় সময় মুসলমান সিদ্ধপুরুষদিগকে উপগুরুপদে বরণ করিয়া থাকেন।

হিন্দুর সহিত মুসলমানের যাহা কিছু ব্যবধান ও বাদ বিসম্বাদ, আচার ব্যবহার লইয়াই ঘটিয়া থাকে। এখন দেখিতে হইবে মুসলমানের কোন্ কোন্ আচার ব্যবহার লইয়া হিন্দুর সহিত সংঘর্ষণ ঘটিতে পারে।

প্রথম, বিবাহপ্রথা। মুসলমানের মধ্যে বিধবা-বিবাহ, সধবা বিবাহ, বহু বিবাহ ও সগোত্রে বিবাহ প্রচলিত। হিন্দুর মধ্যেও বহু বিবাহ আছে এবং একমাত্র বাঙ্গলাদেশ ব্যতীত অন্য সর্ব্বত্র নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে বিধবা বিবাহ ও সধবা বিবাহ প্রচলিত।* বাঙ্গলাদেশের বাহিরের খবর যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা অবগত নহেন যে, বাঙ্গলা দেশের বাহিরে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র হিন্দুজাতির মধ্যে ...হ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈশ্য, ভূঁইহার ব্রাহ্মণ ও মাহুরী ...তি কয়েকটী শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীস্থ প্রায় সকল ...র মধ্যেই বিধবা-বিবাহ ও সধবা-বিবাহ অবাধ-প্রচলিত। ...দিগের মধ্যে মাইঝরোট্ ও কুষ্ঠোত্গণ বিধবা-বিবাহ ...বা-বিবাহ দিয়া থাকে। একমাত্র ঘোষীন্ গোপ-...দায়ের মধ্যে উহা প্রচলিত নাই। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ...কল কাহার, কুর্ম্মি, ধানুক ও খোট্টা নাপিত ভাণ্ডারীর ...র্য্য করে, তাহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ও সধবা-বিবাহ অবাধ-প্রচলিত; অথচ বাঙ্গালী, বিহারী ও হিন্দুস্থানী সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে তাহাদের জল আচরণীয়। সুতরাং বিধবা-বিবাহ ও সধবা-বিবাহ লইয়া হিন্দু মুসলমানে দলাদলি হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

মুসলমান মাতুল-কন্যা ও পিশতুত ভগ্নী বিবাহ করে। বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যেও এইরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে; এবং উহা প্রশস্ত বিবাহ বলিয়া গণ্য। কেবলমাত্র সগোত্র-বিবাহ হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত নাই। হিন্দুর সহিত মুসলমানের বিবাহবিধানে এইটুকু মাত্র পার্থক্য।

বিবাহের পরে, সামাজিক আচরণের মধ্যে খাদ্য-বিচারই প্রধান। পঞ্জাব ও কাশ্মীরের উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দু-গণও কুক্কুটমাংস ভক্ষণ করেন। রাজপুতনার ক্ষত্রিয়গণ মুসলমানের অখাদ্য বরাহমাংসও ভক্ষণ করিয়া থাকেন। খাদ্য সম্বন্ধে মুসলমানের সহিত হিন্দুর একমাত্র গোমাংস লইয়া বিরোধ। পূর্ব্বকালে হিন্দুসমাজে গোমাংস প্রচলিত ছিল কি না, সে কথা লইয়া তর্ক তুলিতে ইচ্ছা করি না, বর্ত্তমানে সমগ্র হিন্দুসমাজই গোমাংস ভক্ষণের বিরোধী। কিন্তু একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দুর নিকট গোমাংস ঘৃণ্য বস্তু নহে; উহা পবিত্র, কিন্তু মাতৃমাংসের ন্যায় অখাদ্য।

গোবধ ও গোমাংস ভক্ষণ মুসলমান ধর্ম্মের অঙ্গ নহে। কয়েক বৎসর হইতে কোরবানীর দাঙ্গা হাঙ্গামা উপলক্ষে, গোবধ মুসলমান ধর্ম্মের অঙ্গ কি না ইহা বিশিষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছে। কেহই প্রমাণ করিতে পারেন নাই যে, গোবধ মুসলমানের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। মহামান্য কাবুলের আমীর মহোদয় কার্য্যতঃও ইহা দেখাইয়া গিয়াছেন। যে ঘটনা হইতে কোরবানীর উৎপত্তি সে ঘটনার সহিত গোবধের কোন সম্পর্ক নাই। ইব্রাহিম তাঁহার একমাত্র পুত্রকে বলি দেওয়ার জন্য ঈশ্বর (যিহোবা) কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই বিশ্বাসী মহাপুরুষ আপন পুত্রকে বলি দিতে উদ্যত হইলে, ঈশ্বর বলিলেন আমি তোমার বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্য এইরূপ আদেশ করিয়াছিলাম। এখন তোমার পুত্রের পরিবর্ত্তে দুম্বা (ভেড়া) বলি প্রদান করিলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। এই সূত্র ধরিয়া কোরবানীর উৎপত্তি। সুতরাং ইহার সহিত গোবধের কোনও সম্বন্ধ নাই।

কোন সুশিক্ষিত মুসলমান বন্ধুর নিকট আমি শুনিয়াছি মুসলমান শাস্ত্রে আছে যে, একদা খাদ্য বস্তুর অভাব হইলে হজরত মহম্মদ শকটবাহী বলীবর্দ্দ জবাই করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে গোমাংস পরিবেষণ করা হইলে, তিনি অঙ্গুলী দ্বারা উহা স্পর্শ মাত্র করিয়া অন্যান্যকে ভোজন করিতে বলেন। এই হইতে গোমাংস "পাক্" অর্থাৎ শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইল। যদি আমার বর্ণিত এই উপাখ্যান সঠিক হয়, তবে গোমাংস ভক্ষণ মুসলমানের নিকট আপদ্ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে, অবশ্যখাদ্য নহে।

---

* বাংলা দেশেও অনেক স্থানে কৈবর্ত্ত, ঢুলে, বাগদি, তিয়র, বাউরি, ডোম প্রভৃতি হিন্দুজাতির মধ্যেও বিধবা ও সধবা বিবাহ প্রচলিত আছে এবং ইহাদের অনেকের জল আচরণীয়।

—প্রবাসী সম্পাদক।

প্রাচীন মিশরের ইতিহাস * পাঠে জানা যায় যে, খৃষ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বে মিশর ও আরববাসীর মধ্যে গোবধ লইয়া ভয়ঙ্কর বিরোধ ছিল। মিসরবাসিগণ হিন্দুদের ন্যায় গোজাতিকে ভক্তিভাবে দেখিত এবং গোবধ ও গোমাংস ভক্ষণ অপরাধজনক বলিয়া মনে করিত। অন্য পক্ষে আরবগণ গোমাংস ভক্ষণ করিত। এই কারণে, উপরোক্ত দেশবাসীর মধ্যে ভয়ঙ্কর বৈরভাব ঘটিয়াছিল।

ইতিহাস-লেখক বলেন, আরবের অধিকাংশ স্থল মরুভূমি, এজন্য আরবগণ কৃষিপ্রধান জাতি হইতে পারে নাই এবং তাহাদের গোজাতির উপকারিতা অনুভব করার সুযোগ ঘটে নাই। পক্ষান্তরে মিশর অত্যন্ত উর্ব্বর স্থান; এবং মিশরবাসিগণ অধিকাংশ কৃষিজীবী, সুতরাং গোজাতির উপকারিতা অনুভব করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক; এবং এই কারণেই এক জাতি গোবধে ও অন্য জাতি গোরক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইতিহাস-লেখকের এই অনুমান সত্য কিনা জানি না, কিন্তু উভয় জাতির মধ্যে গোবধ ও গোরক্ষণ লইয়া যে মতান্তর ও মনান্তর ছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এই বিবাদের পরিণাম এই হইল যে আরবগণের নিকট যাহা দশ প্রকার খাদ্যের মধ্যে একপ্রকার খাদ্য মাত্র ছিল, প্রবল প্রতিবেশীর প্রতিবন্ধকতায় ও বিরুদ্ধাচরণে উহা অবশ্যখাদ্য ও আদরণীয় হইয়া উঠিল। ইহার পর আরব জাতি যেখানে গিয়াছে ও যেখানে যেখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, সেইখানেই সঙ্গে সঙ্গে গোবধ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যেখানে বাধা পাইয়াছে সেখানে অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এদেশীয় ঈশাপন্থিগণ (খ্রীষ্টান) যেমন খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত ইউরোপীয় আচার আচরণ অবিচারে গ্রহণ করিতেছে এবং ঐ সমস্ত আচরণকে খ্রীষ্টধর্ম্মের অঙ্গ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইতেছে, সেইরূপ এদেশীয় হিন্দুগণও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তৎসঙ্গে আরবীয় আচার আচরণ, এমনকি নাম ও উপাধি পর্য্যন্ত, গ্রহণ করিয়াছে এবং উহাকে এক্ষণ মুসলমান ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেছে। "ইব্রাহিম" ও "আশাদুল্লা" নাম না রাখিয়া "সুবোধ" ও "সুশীল" নাম রাখিলে অথবা আরবীয় মুসলমানগণের সমস্ত আচার আচরণ গ্রহণ না করিলে কি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া যায় না? এবিষয় শাস্ত্রজ্ঞ সুশিক্ষিত মুসলমানগণের মতামত জানিতে পারিলে আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইব।

একটী গল্প বলিয়া আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কোন গ্রাম্য দলাদলীতে দুই পক্ষ তুমুল বিতণ্ডা করিতেছিল। এক ব্যক্তি বিপক্ষ পক্ষের নেতাকে বলিল "শিরোমণি মহাশয়, ক্ষণকালের জন্য তর্ক ছাড়িয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করুন; সায়ংকৃত্যের সময় অতীত হইয়া যাইতেছে"। শিরোমণি ঠাকুর ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "আমি এখনই সায়ংকৃত্য করিতাম, কিন্তু তুমি বিরুদ্ধ পক্ষের লোক হইয়া যখন আমাকে অনুরোধ করিয়াছ, তখন কিছুতেই আমি উহা এখন করিব না"। উভয় সম্প্রদায়ের হিতসাধন-সঙ্কল্পে আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে এই গল্পের সারমর্ম্ম উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি। যখন এক ঘরে বাস করিতেই হইবে, তখন ভাই ভাই পরস্পরের বুকে আর শেল বিদ্ধ করিতে চেষ্টা না করিয়া উভয়ে উভয়ের বুকের শেল খুলিয়া দিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। হস্ত যদি অস্ত্র লইয়া চরণকে আঘাত করে তবে সেই ক্ষতচরণের অবসন্নতায় হস্তও অবসন্ন হইয়া পড়ে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান একই শরীরের দুইটী অঙ্গ, সুতরাং একের অনিষ্টে অন্যের ইষ্টলাভের আশা নাই; উভয়কেই মনে রাখিতে হইবে যে তাহাদের উভয়ের মধ্যে বাস্তবিক পার্থক্য কতটুকু এবং কতটা বা হাতগড়া অর্থাৎ জেদে পড়িয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

জ্যোতিষিক যৎকিঞ্চিৎ

১। চন্দ্রের গতি।

প্রতিদিনই দুইবার করিয়া সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস অর্থাৎ জোয়ার হয়। চন্দ্রের আকর্ষণই যে ইহার কারণ তিথিভেদে জোয়ারের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়া তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে পণ্ডিতগণ বলেন

* History of Egypt by S. Sharpe. Vol. I.

সমুদ্রের যে অংশের ঠিক উপরে চন্দ্র আসিয়া দাঁড়ায়, দূরদূরান্তরের জলরাশি চন্দ্রেরই টানে সেইস্থানে জমা হইতে থাকে। কঠিন শিলামৃত্তিকাকে টানিয়া স্তূপাকার করার শক্তি চন্দ্রের নাই। তরল জলই টানে পড়িয়া স্ফীত হইয়া দাঁড়ায়।

চন্দ্রের নিম্নবর্ত্তী স্থানে যেমন জলোচ্ছ্বাস হয়, উহারি বিপরীত দিকের ভূপৃষ্ঠে জল থাকিলে তাহাতেও সেই-প্রকার উচ্ছ্বাস দেখা যায়। ইহার ব্যাখ্যানে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—ভূপৃষ্ঠের বিপরীত দিকের জলরাশি চন্দ্র হইতে যত দূরে অবস্থিত, ভূ-কেন্দ্রের দূরত্ব তাহা অপেক্ষা অনেক কম। কাজেই দূরবর্ত্তী জলকে অধিক না টানিয়া নিকটবর্ত্তী কঠিন পৃথিবীকে চন্দ্র অধিক জোরে টানে। ইহার ফলে পৃথিবী জলের আবরণটিকে পিছনে ফেলিয়া নিজেই একটু চন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়। কাজেই ঐ পরিত্যক্ত জলরাশি স্ফীত হইয়া জোয়ারের উৎপত্তি করে। চন্দ্র পৃথিবীর একই স্থানের উপর দাঁড়াইয়া থাকে না। এক চান্দ্র দিনে সে যেমন একবার পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসে, তাহার পিছনে পিছনে ভূপৃষ্ঠের সেই দুই দিকের জলোচ্ছ্বাসও চলিতে থাকে। ইহাতেই সমুদ্রের প্রত্যেক অংশে প্রতিদিন দুইবার করিয়া জোয়ারের উৎপত্তি হয়।

যাহা হউক এই জলোচ্ছ্বাস পৃথিবীর আবর্ত্তনের সহিত একত্রে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া চলিতে পারে না। কারণ চন্দ্রই যখন উহার উৎপাদক, তখন চন্দ্রের স্বকীয় গতিকে মানিয়া চলা ব্যতীত তাহার অন্য উপায় থাকে না। চন্দ্রকে আমরা কখনই দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের ন্যায় নিশ্চল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। উহার নিজের গতির লক্ষণ প্রতিদিনের উদয়াস্তের কাল-পরিবর্ত্তনে সুস্পষ্ট জানা যায়। কাজেই চন্দ্রের অনুগত হওয়ায় জলোচ্ছ্বাসকে ধীরে ধীরে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে হয়। ইহার ফলে পৃথিবী জলোচ্ছ্বাসকে এক পূর্ণাবর্ত্ত-কালে ভূ-পৃষ্ঠের সর্ব্বাংশের উপর দিয়া কখনই চালাইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন,—সমুদ্রজলের এই বিপরীত গতি পৃথিবীর আবর্ত্তন-বেগকে ধীরে ধীরে কমাইয়া আনিতেছে। গাড়ির চাকায় ব্রেক্ কসিলে তাহার বেগ যেমন কমিয়া আসে, জলোচ্ছ্বাসের বিপরীত গতি যেন সেইপ্রকারে পৃথিবীর আবর্ত্তন-বেগকে কমাইতেছে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে এই হিসাবে প্রতি শত বৎসরে আমাদের অহোরাত্রির পরিমাণ ১২ সেকেণ্ড কমিয়া আসিতেছে। দুইটি চলিষ্ণু বস্তুর মধ্যে একটির বেগ কমিয়া আসিলে, তুলনায় অপরটিকে দ্রুত চলিতে দেখা যায়। কাজেই পৃথিবীর বেগ বারো সেকেণ্ড কমিয়া আসায়, পৃথিবী হইতে আমরা চন্দ্রের বেগের বারো সেকেণ্ড বৃদ্ধি দেখিতে পাই।

চন্দ্রের এই আপেক্ষিক বেগ বৃদ্ধির ব্যাপারটা গত শতাব্দীর জ্যোতিষিগণের অগোচর ছিল না। প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণ এসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানটিকেই যথার্থ বলিয়া মানিয়া আসিতে-ছিলেন। সম্প্রতি এই প্রসঙ্গের একটা নূতন কথা শুনা যাইতেছে। ডাক্তার ব্রায়াণ্ট (Dr. Bryant) নামক জনৈক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী প্রচার করিতেছেন, মহাকাশের স্থানে স্থানে যে ধূলিপুঞ্জ ভাসিয়া বেড়ায়, সম্ভবতঃ তাহাই দেহস্থ করিয়া চন্দ্র নিজের গতি বৃদ্ধি করিতেছে। ইনি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ধূলি জমাইয়া প্রতি শতাব্দীতে চন্দ্রদেহ যদি গড়ে এক ইঞ্চির পাঁচশ ভাগের এক ভাগ মাত্র স্থূল হয়, তবে শত বৎসরের শেষে উহার গতি অনায়াসে বারো সেকেণ্ড বাড়িয়া যাইতে পারে। ব্রায়াণ্ট সাহেব বলিতেছেন, এই পরিমাণ ধূলি চন্দ্রদেহে সঞ্চিত হওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং আমাদের সুপরিচিত সেই জলোচ্ছ্বাসের ব্যাপার ছাড়া চন্দ্রের বেগ বৃদ্ধির আর একটি কারণের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

সাতাইস দিন কয়েক ঘণ্টায় চন্দ্র একবার পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করিয়া আসে, এবং ঠিক সেই সময়ে সে নিজের চারিদিকেও একবার ঘুরপাক দেয়। ইহাতে চাঁদের একটা দিক্‌ই পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু তথাপি কখনো কখনো উহার পশ্চাৎদিকের কতকটাও আমাদের নজরে পড়িয়া যায়। এই ব্যাপারটি এককালে জ্যোতিঃশাস্ত্রের একটা বৃহৎ সমস্যা ছিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত লাপ্লাস্ সাহেব চন্দ্রের এই গতিবিভ্রাটের মীমাংসা করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ্কের আকার যদি ঠিক্ গোল হয়, তবে অপর গ্রহ উপগ্রহ তাহার উপর যে প্রভাব

দেখায় তাহা গণনা করা কঠিন হয় না। কিন্তু ঠিক গোলাকার জ্যোতিষ্ক একবারেই দুর্লভ। পৃথিবীর নিরক্ষ বৃত্তের সন্নিহিত স্থান যেমন মেরুপ্রদেশের তুলনায় উচ্চ, অনেক জ্যোতিষ্কের পৃষ্ঠকে সেইপ্রকার অসমই দেখা যায়। পৃথিবীর এই বলয়াকার উচ্চ স্থানটুকুকে চন্দ্র সূর্য্য সকলেই টানিয়া উহার গতিকে যে কত জটিল ও পরিবর্ত্তনশীল করিয়া তুলিয়াছে বিশেষজ্ঞ পাঠকের নিকট তাহার পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। কেবল ঐ স্থানটুকুর জন্য চন্দ্রসূর্য্যের অসম টানে পড়িয়া পৃথিবী বার বার মাথা নাড়িয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া থাকে। চন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও অতি গভীর মহা-গহ্বরে আচ্ছন্ন বলিয়া পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্রপৃষ্ঠ খুবই অসম। ভূ-ভাগের ন্যায় সমতল প্রদেশ চন্দ্রে একপ্রকার দুর্লভ বলিলেই হয়। কাজেই উহার নিরক্ষ রেখা ঠিক বৃত্তাকার নয়। উঁচু নীচু তলের উপর চলিয়া সেটা খুবই বাঁকিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই অসমস্থানকে পৃথিবী বা সূর্য্য কেহই সমভাবে টানিতে পারে না। লাপ্লাস সাহেব এই ব্যাপার অবলম্বনে গণনা করিয়া দেখাইয়াছিলেন, সূর্য্যের অসম টানে আমাদের পৃথিবী যেমন বিচলিত হইয়া মাথা নাড়া দেয় চন্দ্র যখন সেই প্রকারে মাথা নাড়িতে আরম্ভ করে তখনি উহার অপরার্দ্ধের কতকটা আমরা দেখিয়া ফেলি।

চন্দ্রের নানা উচ্ছৃঙ্খল গতির মধ্যে জ্যোতিষিগণ কেবল এই প্রকার কতকগুলি স্থূল ব্যাপারের কারণ দেখাইতে পারিয়াছেন। অপর ছোটখাটো উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ নির্ণয় করিতে গেলে, এত জটিল গণনার মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয় যে, তাহা সুসাধ্য হয় না। পৃথিবীর এত নিকটে থাকিয়া, চন্দ্র আজও তাহার গতিবিধির অনেক রহস্য লুক্কায়িত রাখিয়াছেন।

২। সূর্য্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ।

আমরা প্রতি রাত্রিতে আকাশে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাদের পরস্পরের ব্যবধান স্থূল দৃষ্টিতে অপরিবর্ত্তনীয় দেখাইলেও সত্যই তাহা চিরস্থির নয়। যেগুলিকে আমরা নিশ্চল নক্ষত্র বলি, কেবল আমাদেরই স্থূল ইন্দ্রিয়ের নিকট তাহারা নিশ্চল। শুক্র বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণ যেমন এক একটা নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া নিয়তই পরিভ্রমণ করে, প্রত্যেক নক্ষত্রটিও যে ঠিক সেই প্রকারে চলিতেছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নিকটের বস্তু যখন চলাফেরা করে, আমরা তাহাদের গতি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। অতি দূরের বস্তু যদি খুব প্রচণ্ড বেগেও চলে, তবে দূরে থাকিয়া দুই এক শত বৎসরে তাহাদের বিচলন লক্ষ্য করার শক্তি আমাদের নাই। অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীন্ প্রভৃতি যন্ত্রকেও এই গতি-বীক্ষণে পরাভব মানিতে হয়। এই কারণেই আকাশের সকল নক্ষত্রই সচল হইয়া আমাদের নিকট অচল। পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রটির দূরত্ব আড়াই লক্ষ কোটি মাইলেরও অধিক। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার তিন শত মাইল বেগে ধাবিত হয়। এই ভীষণবেগে চলিয়াও অনেক নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহন করে। এগুলি পৃথিবী হইতে যে কতদূরে অবস্থিত তাহা আমরা যেন কল্পনাই করিতে পারি না। সুতরাং ভীমবেগে চলাফেরা করার পরও এই প্রকার দূরবর্ত্তী নক্ষত্রগুলি যে আমাদের নিকট নিশ্চল বলিয়া বোধ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

সূর্য্য তাহার ক্ষুদ্র পরিবারবর্গের নিকট খুব প্রতাপশালী হইলেও, অনন্ত মহাবিশ্বে সে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমরা যেসকল নক্ষত্রের সহিত পরিচিত তাহাদের মধ্যে অনেকেই সূর্য্যাপেক্ষা শত শত গুণ বড়। দুইটি, তিনটি, চারিটি সূর্য্য একত্র অবস্থান করিতেছে, এ প্রকার নক্ষত্রও অনেক দেখা গিয়াছে। একটি সূর্য্যের কয়েকটিমাত্র গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি গণনা করিতে গিয়া আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়ি; বহুসূর্য্যময় এই প্রকার অসংখ্য জগতের অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ যে কত জটিল আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভিতর দিয়া নিজেদের পথ করিয়া লইতেছে, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। যাহা হউক নক্ষত্রমাত্রেই যেমন গতিশীল, আমাদের সূর্য্যও ঠিক্ সেই প্রকার গতিশীল। বৃহস্পতি শুক্র প্রভৃতি গ্রহচন্দ্রকে ডানায় ঢাকিয়া সে এক বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় একটি নির্দ্দিষ্ট দিক্ ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আমরা নিজের গার্হস্থ্য ব্যাপার লইয়াই বিব্রত। প্রতিদিনই যথাকালে সূর্য্যের

উদয় দেখি। রাত্রিকালে চন্দ্র, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহকে যথাস্থানে দেখিতে পাই। কাজেই সমগ্র জগৎ যে ভীমবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহা অনুভবই করিতে পারি না। যেসকল জ্যোতিষ্ক সূর্য্যের পরিবারভুক্ত নয়, যখন তাহাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, কেবল তখনই আমরা সৌরজগতের গতি বুঝিতে পারি। জ্যোতিষিগণ ঠিক এই প্রকারেই সূর্য্যের গতি ও তাহার দিক নির্ণয় করিয়াছেন। যেসকল অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্র আমাদের নিকট প্রায় নিশ্চল বলিয়া বোধ হয়, তাহাদেরই তুলনায় সৌরজগতের স্থান পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, জ্যোতিষিগণ সূর্য্যের গতি আবিষ্কার করিয়াছেন।

শনি, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণ যেমন একই ধারায় সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, নক্ষত্রগুলির মধ্যে অন্ততঃ কতক সেই প্রকার কোন যোগসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া একই নির্দ্দিষ্ট পথে চলে, এই কথাটা কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকটি জ্যোতিষীর মনে উদিত হইয়াছিল। জড়-জগতের বাহিরে যতই অনৈক্য থাকুক না কেন, তলায় তলায় গ্রহ চন্দ্র তারা সকলেই যে একই মহা যোগসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া চলিতেছে, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যত ভাল করিয়া বুঝিতেছেন, বোধ হয় প্রাচীনগণ সে প্রকার বুঝিতেন না। কাজেই গ্রহ চন্দ্রের ন্যায় নক্ষত্রদিগের গতিরও একটা সাধারণ লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করা অসঙ্গত হয় নাই। যাহা হউক, এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক যুগের কয়েকজন বিখ্যাত জ্যোতিষী যে ফললাভ করিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। ইহাঁরা বলিতেছেন, যেসকল নক্ষত্রের গতিবিধি আমাদের জানা আছে, তাহাদের এক একটি দলের গতির মধ্যে এমন কতকগুলি ঐক্য দেখা যায় যে, কেবল তাহার দ্বারাই উহাদিগকে এক পরিবারভুক্ত বলিয়া চিনিয়া লওয়া কঠিন হয় না। এগুলি কোটি কোটি মাইল দূরে থাকিয়াও কোন এক মহাকর্ষণের বন্ধনে পড়িয়া একই দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আমাদের সূর্য্য একটি নক্ষত্র। তা ছাড়া অপর নক্ষত্রদিগের ন্যায়ই ইহা গতিবিশিষ্ট। কাজেই কোন এক নক্ষত্রের ঝাঁকে থাকিয়া ইহা মহাকাশে চলাফেরা করিতেছে এরূপ অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত। এই যুক্তি মনে রাখিয়া কয়েকজন পণ্ডিত সূর্য্যের সহচরদিগের অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ডাক্তার ষ্ট্রুবান্ট (Dr. Stroobant) নানা নক্ষত্রপুঞ্জের সহিত সূর্য্যের গতি তুলনা করিয়া সেই সহচরদিগের সন্ধান পাইয়াছেন। ইনি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, কাসোপিয়া (Cassiopeia) ও বৃশ্চিক রাশির যোগতারাগুলি, এবং উত্তর ও পূর্ব্বভাদ্রপদার কয়েকটি নক্ষত্র সূর্য্যের সহিত প্রায় সমবেগে একই দিকে চলিতেছে। এই নক্ষত্রগুলির মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটিই দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা অপেক্ষা উজ্জ্বল। আমরা মোট ১০৫টি দ্বিতীয় শ্রেণীর তারকার সহিত পরিচিত আছি। সুতরাং ইহাদেরই মধ্যে যদি আট দশটিকে সূর্য্যের সহিত চলিতে দেখা যায়, তবে ঘটনাটিকে কখনই আকস্মিক বলা যায় না। খুব সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত তারাগুলি সূর্য্যেরই সহচর। ইহা ছাড়া সপ্তর্ষিমণ্ডল, মিথুন, কন্যা ও সিংহ প্রভৃতি রাশির মাঝে কয়েকটি নক্ষত্রের গতি ও দিক্ সৌরগতির তুলনায় অভেদ বলিয়া ষ্ট্রুবানট সাহেব মনে করিতেছেন। এখনো এ সম্বন্ধে গণনা শেষ হয় নাই।

৩। নূতন নক্ষত্র।

খালি চোখে আকাশের যতগুলি নক্ষত্র দেখা যায়, জ্যোতিষিগণ তাহার এক সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তার পর দূরবীন্ দিয়া, যত নক্ষত্র দেখা যায়, ফোটোগ্রাফির সাহায্যে আজকাল তাহাও নির্ভুলরূপে জানা যাইতেছে। সুতরাং কোনো রাশিতে যদি হঠাৎ কোনো নূতন নক্ষত্র দেখা দেয়, তবে অতি সহজেই এখন এই ব্যাপার জানিতে পারা যায়।

গত ১৮৬৬ সালে, সর্ব্বপ্রথমে এই প্রকার একটি নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। এটি এক দিন হঠাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর তারকার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া দুই দিনের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ন্যায় মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রকার জ্যোতিষিক ঘটনার সহিত তখন কাহারো পরিচয় ছিল না। কাজেই ব্যাপারটা সকলকেই অবাক্ করিয়া তুলিয়াছিল। শেষে স্থির হইয়াছিল, নূতন নক্ষত্রের অধিকৃত স্থানে নিশ্চয়ই পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র তারকা ছিল। তার পর সেইটিই কোন জ্যোতিষ্কের সংঘর্ষণে জ্বলিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

এই ঘটনার পর পূর্ব্বভাদ্রপদা, বৃশ্চিক প্রভৃতি রাশিতে অনেকগুলি নূতন নক্ষত্রের জন্ম দেখা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটিকে এখনো স্থায়ী নক্ষত্রের আকারে বা নিহারীকার ন্যায় আকাশে দেখা যায়। এই জ্যোতিষিক ঘটনার ব্যাখ্যানে পণ্ডিতগণ বলেন, মহাকাশের স্থানে স্থানে যেসকল অনুজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড পরিভ্রমণ করিতেছে, যখন তাহারা নিকটবর্ত্তী হইয়া পরস্পরকে সবলে ধাক্কা দেয়, তখন সেই অনুজ্জ্বল পিণ্ডগুলিই জ্বলিয়া পুড়িয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে। দূর হইতে আমরা এই জ্বলন্ত বস্তুকে নূতন নক্ষত্রের আকারে দেখি। যদি সামগ্রীর (Mass) পরিমাণ অধিক থাকে, তবে এগুলি কিছুকাল উজ্জ্বল নিহারীকার আকারে থাকিয়া ক্রমে কিছুকাল সত্যই এক একটি নূতন নক্ষত্রের উৎপত্তি করে, নচেৎ অতি অল্পদিনের মধ্যে নির্ব্বাপিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

সম্প্রতি মেষ ও ধনু রাশিতে এই শ্রেণীর দুইটি নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব-সমাচার পাওয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উভয় নক্ষত্রই দুইজন মার্কিন মহিলার চেষ্টায় আবিষ্কৃত। ১৮৮৯ সালে আগষ্ট মাস হইতে গত মার্চ্চ পর্য্যন্ত মেষ রাশির যে ৪৪ খানি ফোটোগ্রাফ্ ছবি উঠানো হইয়াছিল, তাহাতে কোন নূতন নক্ষত্রেরই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মিসেস্ ফ্লেমিং (Mrs. Fleming) নামক জনৈক মার্কিন মহিলা গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত যে একুশখানি ছবি তুলিয়াছিলেন তাহাতে উহার সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছিল। আবিষ্কারকালে নক্ষত্রটিকে দ্বাদশ শ্রেণীর তারকার ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইয়াছিল। এখন সেটি ষষ্ঠ শ্রেণীর নক্ষত্রের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে।

ধনুরাশিস্থ দ্বিতীয় নূতন নক্ষত্রের আবিষ্কর্ত্রীর নাম মিস্ ক্যানন্ (Miss Cannon), ইনিও একজন মার্কিন মহিলা। গত ১৮৯৯ সালের ৯ আগষ্ট তারিখে ধনুরাশির যে ছবি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে ঐ নবজাতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পরদিনের ছবিতে উহার প্রতিকৃতি ৮ম শ্রেণীর তারকার আকারে সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। যেসকল নূতন নক্ষত্র ধীরে ধীরে উজ্জ্বল না হইয়া হঠাৎ প্রভাসম্পন্ন হইয়া পড়ে, তাহাদের তিরোভাবের জন্য অধিক দিন প্রতীক্ষা করিতে হয় না। এই নবজাত জ্যোতিষ্কটির উজ্জ্বলতা দ্রুত ক্ষয় পাইয়া গত অক্টোবর মাসে ত্রয়োদশ শ্রেণীর তারার ন্যায় মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর এই নিষ্প্রভ নূতন নক্ষত্রের আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ

প্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা; অমিয় নিমাই-চরিত, কালাচাঁদ গীতা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা; পরম তেজস্বী, অথচ বিনয়ী ভক্ত বৈষ্ণব শিশিরকুমারের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একটি সুসন্তান হারাইয়াছে।

শিশিরকুমার যৌবনের প্রারম্ভকাল হইতেই লোক-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮।১৯ বৎসর বয়সে তিনি নীলকরদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত রায়তদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লেখনীধারণ করেন এবং হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় ক্রমাগত অত্যাচারকাহিনী নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিতে থাকেন। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীরাও তখন নীলকর সাহেবদের পৃষ্ঠপোষক ছিল; তাহাদের ভ্রুকুটিও যুবক শিশিরকুমারকে ব্রতভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। মুসলমান রায়তেরা কৃতজ্ঞতাভরে শিশিরকুমারকে "সিন্নিবাবু" বলিয়া সম্মান দেখাইত।

শিশিরকুমার মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের বাসগ্রাম পোলা মাগুরা সামান্য গ্রাম; সেখানে বাজার হাট কিছুই ছিল না। শিশিরকুমার ভ্রাতাদিগের সহযোগিতায় সেখানে বাজার বসাইয়া মায়ের নামে নাম রাখেন "অমৃত-বাজার" এবং তাহা হইতে সমগ্র গ্রাম তাঁহার মায়ের নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

গ্রামের অধিকতর উন্নতি করিবার জন্য শিশিরকুমার স্বগ্রামে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং নিজ হাতে ছাপাখানার কম্পোজ, ছাপা প্রভৃতি কাজ শিখিয়া স্বগ্রামে একটি কাঠের প্রেস

স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ।

ও কিছু পুরাতন হরপ লইয়া "অমৃত প্রবোধিনী পত্রিকা" নামে বাংলা পাক্ষিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্রিকা সেই সুদূর মফস্বলে অধিকদিন স্থায়ী হইতে পারে নাই।

সেই সময় সভ্রাতা শিশিরকুমারের উদ্যোগে গ্রামে ভ্রাতৃসভা, ব্রহ্মসভা ও হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় তাঁহারা বক্তৃতা দিতেন এবং দুঃস্থ নরনারীকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিতেন। এমন কি তাঁহারা অন্ত্যজ জাতির শব সৎকার পর্য্যন্ত করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।

শিশিরকুমারের পিতা বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সেই গুণ পুত্রগণে বর্ত্তিয়াছিল, এবং শিশিরকুমারে তাহা সবিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। তাঁহারা যাত্রার দল করিয়াছিলেন; শিশিরকুমার অভিনয়ের পালা ও গান রচনা করিতেন; তাঁহার রচিত গানগুলির পদ বড় সুমধুর ও কবিত্বময় হইত। স্বর্গীয় দিনবন্ধু মিত্র ইহাঁদের ভ্রাতৃ-প্রেম দেখিয়া ইহাঁদের বলিতেন "সুখী পরিবার"।

ইহাঁদের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাই হীরালাল ১৬ বৎসর বয়সে জগতের নরনারীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া ভাবাবেগে আত্ম-হত্যা করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—জগতের দুঃখ নিবা-রণে আমি যদি কিছু না করিতে পারি তবে আমার মরণই মঙ্গল!

শিশিরকুমারের প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি অবলম্বন স্বরূপ পুনরায় এক সাপ্তাহিক বাংলা সংবাদপত্র প্রচার করেন এবং তাহার নাম রাখেন "অমৃতবাজার পত্রিকা"। অতি অল্প দিনেই ইহার নির্ভীক উক্তির প্রতি সরকারের নজর পড়ে; এবং ৫ মাস পূর্ণ না হইতেই অমৃতবাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। আট মাস মোকদ্দমার পর যদিও শিশিরকুমার অব্যাহতি লাভ করেন তথাপি তাঁহার পরিবার নিঃস্ব হইয়া পড়েন।

এই সময় আবার যশোহরে ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রাদুর্ভাব হওয়ায় শিশিরকুমার অধিক সুদে এক শত টাকা কর্জ্জ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসেন। এই সব কারণে দুমাস পত্রিকা বন্ধ ছিল। কলিকাতায় আসিয়া উহা পুনঃ প্রচরিত হইতে লাগিল এবং উহার অর্দ্ধেক ইংরাজি অর্দ্ধেক বাংলা হইল। ইংরাজি প্রবন্ধ শিশিরকুমারই মনে মনে রচনা করিয়া একেবারে হরপে কম্পোজ করিতেন, কাগজে লিখিতে হইত না।

দুই সপ্তাহের মধ্যেই শিশিরকুমারের তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও নির্ভীক মতপ্রকাশের জন্য পত্রিকা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। শিশিরকুমারের দেশভক্তি ও নেশন সংগঠনের চেষ্টা কর্ত্তৃপক্ষেরও সম্মান আদায় করিল। সার এশলি ইডেন, বাংলার ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট, অমৃতবাজার পত্রিকাকে সরকারী কাগজ করিবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু শিশির-কুমার বলেন—দেশে অন্তত একখানাও স্বাধীন মতের কাগজ থাকা দরকার। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ছোটলাট দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদ পত্রের পরিচালন সম্বন্ধে এক কঠিন আইন প্রচার করিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা আইন প্রচারের পরদিনই সম্পূর্ণ ইংরাজি হইয়া সেই

আইনের লোলুপ কবল এড়াইল। এই সময় হইতে দেশের সকলবিধ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শিশিরকুমার অগ্রণী হইয়া দেশের অশেষবিধ কল্যাণের সহায় হইয়াছিলেন।

অন্তর্জীবনে তিনি ধর্ম্মসাধনে মনোনিবেশ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের গোঁড়া হইয়া উঠেন। সেই সাধনার ফলস্বরূপ তাঁহার বিরচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থরাজি সকল সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধার সামগ্রী হইয়াছে। শেষ দশায় শিশিরকুমার যথার্থ বৈষ্ণবের বিনয় ভক্তি বৈরাগ্য ও যোগ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ভারতবর্ষের জীবনের ইহাই পরিণতি—জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির সমন্বয় করাই ভারতের সাধনা। শিশির-কুমার ভারতের সুসন্তান ছিলেন এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

সপত্নী

(ইতালীয় গল্পের ফরাসী অনুবাদ হইতে)

১

যদিও রডল্‌ফ্ মুর্জের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার কখন ঘটে নাই,—তিনি আমার সহিত কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন বলিয়া আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। 'আর্ট' সম্বন্ধে আমার মতামত জানিবার জন্য আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে চাহেন। তাঁহার পত্রে আমাকে বলিয়াছেন,—তিনি জাতিতে জার্ম্মান্ কিন্তু ইতালী দেশের প্রতি ও আমাদের ভাষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ। তা ছাড়া, তিনি ইতালীয় ভাষায় আমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাষা অতি বিশুদ্ধ; তাহাতে একটিও অযথা শব্দের প্রয়োগ নাই, একটিও ব্যাকরণের ভুল নাই। নিজের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি কথা সেই পত্রে ছিল। বহু বৎসরাবধি তিনি ইতালী দেশে বাস করিতেছেন, আপাতত Sarrentএর উপকণ্ঠে একটা বাগান বাড়ীতে থাকেন। সেই পত্রখানি এমন ভদ্রভাবে, এমন নম্রভাবে লেখা যে, তাঁহার প্রার্থনা আমি অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। তাঁহাকে আমি লিখিলাম,—অমুক দিনে, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

সাক্ষাৎ হইল। আমি একাকী [illegible]

হইতেই তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম। একটু পরেই,—ফর্‌সা রং, পাতলা, বেশী লম্বাও না, বেশী বেঁটেও না, সাদাসিধা অথচ বেশ পরিপাটী পরিচ্ছদ-পরা একটি যুবক প্রবেশ করিল। নীল চোখ, কিন্তু তাহাতে যেন দৃষ্টির ভাব নাই, যেন কাচ দিয়া গঠিত বলিয়া মনে হয়। যাই হোক্, তাঁহার মাথার নাড়াচাড়া দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন। সে খবর পাইবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। সেই রডল্‌ফ্ মুর্জ্-ই বটে। একটু পরে, বৈঠকখানার দূর-কোণে যে একটা টেবিল ছিল, সেই টেবিলে আমরা দুজনে গিয়া বসিলাম। এবং বন্ধুভাবে নানা বিষয়ের কথা হইতে লাগিল।

তাঁহার মতে, সভ্যতার উচ্চ-আশা, সভ্যতার গৌরব, সভ্যতার উন্নতি এ সমস্তই শূন্য মায়া-বিভ্রম মাত্র; এ সমস্ত তাঁহার নিকট তুচ্ছ জিনিস। তাঁহার কথাবার্ত্তায় যেন একটা বিষাদের ছাপ্ রহিয়াছে, তাঁহার কথায় আমার মনে কতকগুলা দুশ্চিন্তা জাগিয়া উঠিল।

এক ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইল। আমার মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার পত্রে, তিনি আর্ট সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চাহিয়াছিলেন।

এই সময়ে তাঁহার কথার একটু বিরাম হইল, আমরা ঠাণ্ডা কাফিটা নিঃশেষে পান করিলাম।

হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম:—

—"ভাল, আর্ট সম্বন্ধে আমার মত কেন জানিতে চাহিয়াছিলেন বলুন দেখি?"

—"চাহিয়াছিলাম বটে!" এইরূপ ভাবে বলিলেন, যেন আমাদের এই দেখা সাক্ষাতের কারণটা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

—"সে একটা তুচ্ছ বিষয়ের জন্য। এখন মনে হচ্চে, কেন এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য আপনাকে বিরক্ত করে-ছিলেম।"

—"না না, কিসের বিরক্তি?—বলুন না, আমি শুন্‌তে প্রস্তুত আছি।"

—"আমি যে একজন লেখক—এ কথা এখনও পর্য্যন্ত আপনাকে বলিনি।"…

—“আর্টিষ্ট কি না জানি না। তবে একটু-আধটু লিখি বটে। নিজের আমোদের জন্য যে একটু সাহিত্য-চর্চ্চা করে, তাকে যদি লেখক বলা যায়, তাহলে আমি একজন লেখক। আমি নিজের জন্য লিখি, আর যখন আমার স্ত্রী আমার অজ্ঞাতে সেই লেখা কোন মাসিক পত্রে ছাপাবার জন্য পাঠিয়ে দেন তখন আমি তাঁকে তিরস্কার করি।”

—“অ্যাঁ! আপনি তবে বিবাহিত?”

—“আট বৎসরাবধি।”

—“তাহলে ত খুব অল্প বয়সেই বিবাহ হয়েছে?”

—“তখন ২২ বৎসর মাত্র আমার বয়স।”

—“আপনার স্ত্রী জাতিতে জর্ম্মান্?”

—“খাঁটি জর্ম্মান্। তিনি এ পর্য্যন্ত ইটালি-ভাষার এক বর্ণও শিখ্‌তে পারলেন না। আর তিনি বুঝ্‌তে পারবেন না এই মনে করেই ত আমি ইটালি-ভাষায় একটা হাসির নক্‌সা লিখেছি।”

—“একটা উপন্যাস?”

—“না। একটা এক অঙ্কের নাটক; একটা প্রহসন…”

—“একটা প্রহসন?” এ-হেন গম্ভীর-ধরণের ব্যক্তি একটা প্রহসন লিখিয়াছেন শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম।

তিনি বুঝিয়াছিলেন আমি বিস্মিত হইয়াছি। তাই তিনি বলিলেন তিনি একজন হাস্য-রসিক লেখক।

—“কি গদ্যে, কি পদ্যে, হাস্যরস ছাড়া আমি কিছুই লিখি না। হাস্যরসই আমার ভাল লাগে।”

—“আপনার নাটকের নামটা কি?”

—“সপত্নী”।

আমি হাসিয়া বলিলাম:—

“ও! তাই না কি? নামটা শুনে আমার মনে যে একটা সন্দেহ হচ্চে”।

—“আপনার সন্দেহটা অমূলক নয়। একটা সত্য ঘটনা থেকে ঐ লেখার বিষয়টা আমার মনে এসেছিল। ঐ “সপত্নী” আমার স্ত্রীরই সপত্নী”।

—“এই জন্যই ত আমি চাইনে যে তিনি আমার লেখাটা পড়েন।”

—“এখন বুঝ্‌তে পারলুম”।

—“আমি যখন লিখ্‌ছিলুম, তখন অন্য আর একটা বিষয় লিখ্‌ছি বলে তাঁকে ভোগা দিয়েছিলুম। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আমি একটা ট্র্যাজেডি লিখেছি।”

—“আর ইটালি দেশে অভিনয় হবে না কি, তাই ইটালি ভাষায় লেখা হয়েছে—এই রকম বোধ হয় তাঁকে বুঝিয়েছিলেন?”

—“ঠিক্ তাই।”

—“ইটালিতে অভিনয় করাবার মৎলবটা বাস্তবিক কি আপনার ছিল না?”

—“আপনার কাছে গোপন করব না। আপনি যদি বলেন অভিনয়ের যোগ্য তবেই আমি অভিনয়ের চেষ্টা দেখ্‌তে পারি। এবিষয়ের জন্যই আপনার মতামত জান্‌তে চেয়েছিলুম। কিন্তু দেখুন, আমি আমার নাম প্রকাশ করতে চাইনে। আমার নাটকটার কিরূপ অভিনয় হয় দেখ্‌বার জন্য শুধু আমার কৌতূহল হয়েছে; আর আমার মাথায় যা আসে তা সকলের কাছে বল্‌তেও একটা সুখ আছে। কিন্তু আমার নাম প্রকাশ করতে আমি রাজি নই। ও একটা ইতরজনোচিত গর্ব্ব।”

—“কথাটা এখন বুঝা গেল। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে আপনার নাটকখানা বাড়ীতে বসে পড়ব, আর আমার মতামত আপনাকে অকপটভাবে বল্‌ব।”

—“আমি অনুগৃহীত হলেম।”

তাঁর পকেট হইতে একটা পাণ্ডুলিপি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। তাঁহার নিকট আমার উৎসাহটা দেখাবার জন্য আমি তৎক্ষণাৎ নাট্যোল্লিখিত পাত্রগণের তালিকাটার উপর চোখ বুলাইয়া বলিলাম:—

—“এ কি? একটি মাত্র রমণীর ভূমিকা?”

“হাঁ, কেবল একজন স্ত্রীর ভূমিকা।”

—“আর ঐ স্ত্রী আপনারই স্ত্রী?”

—“তা বৈ কি।”

—"না না, সপত্নীর প্রবেশ নাই। রঙ্গমঞ্চে স্বয়ং-চারিণীর (automobile—মোটর-গাড়ী) অবতারণা করাটা তেমন সুবিধাজনক বলে মনে হয় না! "দেখুন মহাশয়, আমার মোটর-গাড়ীখানিই আমার স্ত্রীর সপত্নী। মোটর গাড়ীকে আমাদের ভাষায় স্বয়ংচারিণী বলে—এটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ—আপনাদের ভাষায় পুংলিঙ্গ না স্ত্রীলিঙ্গ? আমার নিকট ওটি স্ত্রীরই সামিল!"

তিনি না-হাসিয়া এই কথাগুলি বলিলেন। আমি বলিলাম:—"আপনি পরিহাস করচেন"...

তিনি গম্ভীরভাবে আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন:—

—"নাটকে এরূপ সপত্নীর অবতারণা একটা ঠাট্টা তামাসা মাত্র; রঙ্গমঞ্চে এরূপ অদ্ভুত ধরণের সপত্নী প্রবেশ করলে, দর্শকদের খুব হাস্যোদ্রেক হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু বাস্তবপক্ষে, এটা একটা হাসির কথা নয়।"

—"সত্যি?"

—"সত্যি। আমার স্ত্রীকে আমি খুবই ভালবাসি। কিন্তু তার নীচেই আমি আমার স্বয়ংচারিণীকে ভালবাসি। আমি জানি, এতে আমার স্ত্রীর প্রতি একটু অন্যায় করা হচ্চে; কেন না, স্বয়ংচারিণীর সহবাসে আমি যে সময়টা কাটাই, ততটা সময় আমার স্ত্রী, আমার সহবাস হতে বঞ্চিত হন। এইরূপে আমার দাম্পত্য কর্ত্তব্যের অবশ্য কতকটা ত্রুটি হয়। কিন্তু আমি সাফ্ কবুল কচ্চি, স্বয়ংচারিণীকে ছেড়ে আমি একদণ্ডও থাক্‌তে পারব না। আমি সেই সব লোকের মত, যাদের পত্নী ও পেত্নী দুই চাই। ধর্ম্ম-পত্নী সতীসাধ্বী ত হবেই—দ্বিতীয়টি হতেও পারে, না হতেও পারে। আপনি ত জানেন, ঐ সব লোক, ধর্ম্ম-পত্নীকে যতই ভাল বাসুক, দ্বিতীয়টিকেও ছাড়তে পারে না। আমারও সেই দশা হয়েছে। আমার স্ত্রীর জন্য যত টাকা খরচ করা উচিত, আমি সেই টাকা আমার মোটর-গাড়ীর জন্য খরচ করে থাকি। আমার যে একটা মোটর-গাড়ী আছে—সে কথাটা আমার স্ত্রীর কাছ থেকে গোপন করে রেখেছি। আমার স্বয়ংচারিণীর সহবাস সম্ভোগ করবার জন্য, নানা ছুতা করে' আমি বাড়ী হতে বাহির হয়ে যাই। আর আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বল্‌চি, এতে আমার এত সুখ, এত আনন্দ, এত মত্ততা হয় যে আমি আর সব ভুলে যাই। আমি ভুলে যাই—আমি একজন বিবাহিত ব্যক্তি; আমি ভুলে যাই—একজন সতীসাধ্বী সুন্দরী রমণী—বাড়ীতে আমার জন্য প্রতীক্ষা করে আছেন; আমি ভুলে যাই,—তড়িৎ-বেগে ধাবমান্ এই মোটর-গাড়ীতে যদি কোন দুর্ঘটনা হয়ে আমার মৃত্যু হয়, তাহলে বেচারী একেবারে উন্মাদ হয়ে পড়বে। তবু, এ কথাটা আমার গোপন না করলেই নয়। এ বিষয়ে আমার স্ত্রীর রুচি, আমার রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত। সতী স্ত্রীরা যেমন অসতী রমণীদের দু-চক্ষে দেখ্‌তে পারে না, আমার স্ত্রী সেইরূপ এই স্বয়ংচারিণী গাড়ীগুলাকে দু-চক্ষে দেখ্‌তে পারেন না। আমার একটা স্বয়ংচারিণী আছে বলে' তাঁর যদি একটু সন্দেহও হয়, তাহলেই তিনি একেবারে ভয়েই মারা যাবেন। তা চেয়ে আমি যদি একজন চক্রহীন জীবন্ত স্বৈরিণীতে আসক্ত হই, বরং তাও তাঁর সহ্য হবে। বলা বাহুল্য—মোটর-গাড়ীটা আমি যতই সম্ভোগ করচি, ততই গোপন করবার ইচ্ছাটা আমার আরও প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে। এই প্রকাণ্ড গাড়ীটার মধ্যে একাকী আমি যখন উপবেশন করি, তখন মনে হয়, জগতে আমার মত কেহ সুখী নয়। আর যখন এই প্রকাণ্ড যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তের মধ্যে এনে, আমার খেয়াল-অনুসারে যেখানে সেখানে চালিয়ে নিয়ে বেড়াই, তখন আমার মনে হয় যেন বজ্রধর ইন্দ্রের মত আমি একটা বজ্রকে আকাশ-পথে ছুটাছুটি করাচ্চি; আমি দেখি—আমার পাশ দিয়ে,—মানুষ, পশু পক্ষী, ঘর বাড়ী, গাছপালা, সেতু, নদী গিরি—সব পলায়ন করচে—আমি যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; দৈত্য দানবের মত শক্তিমান্—এমন কি, স্বয়ং ঈশ্বরেরই মত মহান্।"

এইরূপ বলিতে বলিতে, হৃদয়ের আবেগভরে তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। তাঁর মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও কুঞ্চিত হইয়া গেল, এবং তাঁহার চোখ দিয়া যেন বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল। আমি ভয়ে ভয়ে একটু আপত্তি জানাইয়া বলিলাম:

—"আপনি এইরূপ আবেগের উচ্ছ্বাস কি একটু সংযম করিতে পারেন না? এত আবেগে প্রাণের উপর জখম আসতে পারে। আপনার কি প্রাণের উপর মায়া নাই?"

—"না।"

"আর আমি,—যদি আমার প্রাণের উপর বিতৃষ্ণা হয়, তাহলে বরং আত্মহত্যা করে মরি তবু এরূপ ভয়ানক মরণ প্রার্থনা করি না। ওরূপ মরণের চেয়ে আত্মহত্যা ঢের সোজা, কোন হাঙ্গাম নেই, শীঘ্র কাজ শেষ হয়ে যায়।"

—"তবে বলি শুনুন। প্রাণের উপর আমার তেমন একটা মায়া নেই, আমার শুধু এই মনে হয়, বেঁচে থাকা আমার কর্ত্তব্য; আমি মানুষ, আমি একজন বিবাহিত ব্যক্তি; তাই আমি যতটা পারি, আমার জীবনের মূল্য ও মর্য্যাদা অনুভব করতে চেষ্টা করি।"

—"আমার ত তার উল্টাটাই মনে হয়।"

—"মশায়, সেটা আপনার ভুল। সাধ্যসাধনা করে মৃত্যুকে আহ্বান করলে তবেই জীবনকে সম্ভোগ করা যায়, জীবনের মর্য্যাদা ঠিক্ বুঝা যায়। প্রত্যেকবার যখন আমার এই মোটর-গাড়ীতে প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হয়, আমার মনে হয় বাঁচবার কর্ত্তব্যভারটা যেন একটু লঘু হয়ে আসছে—অন্তত কিছুকালের জন্য।...এইরূপ বেঁচে-থাকার একটা তীব্র আনন্দ আমি একবার অনুভব করেছিলুম,—যখন একদিন রাত্রে সিজা থেকে ফ্লরেন্‌সে যাবার সময়, আমার মোটর গাড়ীটা একটা শৈলখণ্ডে লেগে চূর্ণ হয়ে যায়। আমি যে কেন একেবারে গুঁড়া হয়ে যাইনি এই আশ্চর্য্য। আমি যেমন বরাবর একলা যাই, এবারও একলা গিয়েছিলাম। গাড়ী ভেঙ্গে যাওয়ায় আমি তার আঘাতে একটু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলুম, তারপর যখন আমার জ্ঞান হল, তখন দেখি আমার গাড়ীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে, আমি মাটীতে বসে আছি, আর তখন বেশ জ্যোৎস্না হয়েছে। আমার পায়ে সামান্য একটু আঘাত লেগেছিল, আর সর্ব্বাঙ্গে একটু বেদনা অনুভব করছিলুম। মৃত্যু আমার শরীরের উপর দিয়ে চলে' গিয়েছিল, অথচ শরীরের অঙ্গাদিকে স্থানচ্যুত করে নি। আমি তখনও জীবন্ত আছি এইরূপ অনুভব করলুম, আর সুখী জনের মত একটা বুক-ভরা সুখের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলুম। কি আনন্দ! যেখানে—সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে স্তব্ধ প্রকৃতির মধ্যে, আমার প্রাণের স্পন্দন হচ্ছিল—একটা গভীর প্রতিধ্বনি যেন তার এই উত্তর দিলে:—কি আনন্দ! এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণের উপর যতটা ভালবাসা হয়েছে এমন জীবনে আর কখন হয় নি!"

এই বলিয়া মুর্জ্‌ নীরব হইলেন।

এই নিস্তব্ধতা কয়েক মিনিট ধরিয়া রহিল—কি করিয়া এই বিজনতা ভঙ্গ করিব আমি বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমশ যুবকের মুখ আবার রঞ্জিত হইয়া উঠিল; তাঁহার ওষ্ঠাধরে একটু হাসির রেখা দেখা দিল—এবং তিনি তাঁহার সিগারেটের কৌটাটি খুলিয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

—"আপনি কি ধূমপান করেন?"

—"হাঁ, করি।"

আমি একটা সিগারেট্ লইলাম। আমি সিগারেট্‌টা জ্বালাইলাম। তিনিও তাহাই করিলেন। তাহার পর, অতীব শান্ত স্বরে, তাঁহার নাটকের কথা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

—"এখন যে সব কথা আপনাকে বল্লুম, তা আমার নাটকে কিছুই নাই। তা থাক্‌লে, লোকের বিরক্তিজনক হয়ে উঠ্‌ত। আমি আমার নাটকে একজন ধর্ম্মপত্নীর ঈর্ষাই বর্ণন করেছি, তাতে অন্য প্রকার রমণীর কথা নাই। তিনি জানতেন না যে, তাঁহার স্বামীর একটি মোটর গাড়ী আছে; তাঁহার স্বামী গৃহে কেন থাকেন না, অনেক চেষ্টাতেও যখন কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেন না, তখন ভাব্‌লেন, অবশ্য তাঁহার একটি সপত্নী আছে। এইটিই আমার নাটকের আখ্যান-বস্তু। ইহার মধ্যে কতকগুলি হাস্যকর ঘটনার দৃশ্যও সন্নিবিষ্ট করেছি, কিন্তু অভিনয়ের পক্ষে তা কতটা উপযোগী, সেই বিষয়ে আপনার মতটা জান্‌তে পারলে বড় সুখী হব।"

আমার একটু ক্লান্তি বোধ হইতেছিল। ভদ্রতার দুই চারিটা কথা বলিয়া, এবং তাঁহার নাটকখানি পড়িয়া দেখিব—আবার এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া, আমি উঠিয়া পড়িলাম। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আজই কি তাঁহার গৃহে ফিরিয়া যাইবেন। তিনি অবজ্ঞার ভাবে বলিলেন:—

—"এক ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে পৌঁছিব।"

—"এক ঘণ্টার মধ্যেই?—আপনার কি তবে ডানা আছে?

—"আমি মোটরে করে' যাচ্ছি।"

—"এক ঘণ্টা, সে ত খুব অল্প সময়।"

আমি মনে করিলাম, মোটর গাড়ীটা একবার দেখিগে যাই। আমার ভয়ানক কৌতূহল হইয়াছিল। আমি এই "সপত্নী" সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত কল্পনা করিয়াছিলাম, আমি মনে করিয়াছিলাম, বোধ হয় একটা প্রকাণ্ড গাড়ী একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিনে যোড়া...কিন্তু কৈ—কোন গাড়ী ত দেখিতে পাইলাম না। মুর্জ আমার বিস্ময়ের ভাবটা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, গাড়ীটা কিছু দূরে আছে। যেন বাস্তবিকই এ-একটা গুপ্ত প্রেমের ব্যাপার, এই ভাবে—কোথায় গাড়ীটা আছে ঠিক্ করিয়া তিনি কিছুই বলিলেন না এবং তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্যও আমাকে আহ্বান করিলেন না। একটু যেন সলজ্জভাবে আমার হস্ত মর্দ্দন করিলেন এবং করিয়াই দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম:—সোদ্দা কথা, এই জর্ম্মানটা বদ্ধ পাগল।

২

তার পরদিনই আমি তাঁহার নাটকখানা পড়িলাম। যে তুচ্ছ বিষয় লইয়া নাটকখানি রচিত, তাহার সহিত কতকগুলা অদ্ভুত দৃশ্য যুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—দৃশ্যগুলি বাস্তবিকই খুব হাস্যকর। পড়িতে পড়িতে আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথাবার্ত্তাগুলা একটু বেশী দীর্ঘ হইয়াছে—মাঝে মাঝে একটু ছাঁটিয়া দিলে রঙ্গমঞ্চে দর্শকের খুব হাস্যোদ্রেক হইতে পারে। আমার মতামত ব্যক্ত করিয়া তখনি তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিলাম এবং পত্রখানা ও তাঁহার নাটকের পাণ্ডুলিপি ডাকে রওনা করিবার জন্য, ডাকঘরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ডাকঘরে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছি এমন সময়ে দেখিলাম, একজন সংবাদ পত্রাদির বিক্রেতা আমার পাশ দিয়া যাইতেছে। তাহার নিকট হইতে কতকগুলা প্রভাতের সংবাদপত্র ক্রয় করিলাম। আমার যেমন চিরকেলে অভ্যাস,—প্রথম যে কাগজটা হাতে পাইলাম, তাহা গেলাম। হঠাৎ একটা সংবাদের উপর আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল;—"মোটর-গাড়ীর দুর্ঘটনা"। এইটুকু পাঠ করিয়াই আমার মনে হইল, মুর্জেরই বোধ হয় এই দুর্ঘটনা হইয়াছে—আমার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল।

আমি ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। সংবাদদাতা বলেন, পূর্ব্ব দিনে, সেঙ্গনো হইতে সর্য়ান্তের পথে, স্কুটারি-শৈলের শিখর হইতে, একটা মোটর-গাড়ী গড়াইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। গাড়ি-পরিচালকের টুপিটা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। আরও তিনি বলেন,—"এই দুর্ঘটনার সংবাদটা এক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; তাহার পর কর্ত্তৃপক্ষেরা জানিতে পারিলেন,—যাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, তিনি সেই ধনশালী জর্ম্মাণ, যিনি সহরের উপকণ্ঠে একটা বাগান-বাড়ীতে সস্ত্রীক বাস করিতেন। আগামী কল্য আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার বিবরণ দেওয়া যাইবে।"

এই সংবাদে আমি যেন বজ্রাহত হইলাম। যে হাতে আমার লিখিত সেই পত্র ও নাটকের পাণ্ডুলিপিখানা ছিল সেই হাতটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; মনে হইতেছিল, যেন সেই পত্রাদির কাগজে কোন এক প্রকার উৎকট বিষ মাখানো আছে;—মনে করিলাম, ঐ কাগজগুলা হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলি; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, পাণ্ডুলিপিখানি নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই। তাই পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, পাণ্ডুলিপিখানি বাড়ী লইয়া গেলাম। এক সপ্তাহের শেষে অনেক ইতস্তত: করিয়া, অনেক বিবেচনা করিয়া, মুর্জের বিধবা পত্নীর নিকট মুর্জের "সপত্নী" নাটকখানা পাঠাইয়া একটা দারুণ কষ্টকর কর্ত্তব্য সাধন করিলাম।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খেলা

(১)

এদেশে নানা রকমের খেলা আছে; কিন্তু তাহার কোন্‌টি

কোন্‌টি বিদেশের আমদানি, তাহা সহজে জানিতে পারা যায় না। খেলার ইতিহাস যে মানব সমাজতত্ত্বের একটি বিশেষ জ্ঞাতব্যবিষয়, এ কথা সুধী পাঠকেরা জানেন। যাঁহারা "খেলা" নামটি দেখিয়া এই প্রবন্ধটি পড়িতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহারা হয় ত প্রত্নতত্ত্বের নামে শিহরিয়া উঠিয়াছেন। হায় ইতিহাস!

খেলা এবং উৎসবে মানুষের সামাজিকতা বাড়িয়াছে, শত্রুরা বন্ধু হইয়াছে, শারীরিক বল বৃদ্ধি হইয়াছে, মানসিক প্রফুল্লতা জন্মিয়াছে। এমন উপকারী জিনিষের একটু ইতিহাস লিখিলে কি কেহ পড়িবেন না? একজন সমাজ-তত্ত্ববিৎ লিখিয়াছেন—"Take out of Savage life, its feasts and dances, and the remaining social activities will be slight indeed."

প্রতিযোগিতায় বল ও বুদ্ধির পরীক্ষা, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া জয়লাভ, এবং হাসি তামাসায় আনন্দ উপভোগ,—সাধারণতঃ এই তিন শ্রেণীতে খেলাগুলি বিভক্ত করা যাইতে পারে। খেলাগুলির আর একটি অন্য রকমের শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে যথা—(১) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শারীরিক ব্যায়াম, (২) কেবলমাত্র বুদ্ধি বা কৌশল প্রদর্শন এবং (৩) দৈবের উপর নির্ভর করিয়া জয়লাভ।

আমাদের সঞ্চিত বা অতিরিক্ত উৎসাহের (energy) খরচ হইতেই খেলার উৎপত্তি। শৈশবে যখন শরীরটি বাড়িয়া উঠিতে চায়, তখন আপনা আপনি একটা চঞ্চলতা জন্মে; সেই চঞ্চলতায় সকল শ্রেণীর জীবজন্তুরাই ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে,—ছুটাছুটি সেখানে খেলা। কাছাকাছি যতগুলি বাসায়, একশ্রেণীর যতগুলি পাখীর ছানা থাকে, তাহারা এক সঙ্গে মিলিয়া খেলা করে। বাছুরের খেলা, কুকুরছানার খেলা সকলেই দেখিয়া থাকি। অল্পাধিক পরিমাণে সকল শ্রেণীর জীবের মধ্যেই যে এই খেলায় তাহাদের শিক্ষা এবং সামাজিকতা বৃদ্ধি পায়, তাহা, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে Kropotkin-রচিত একটি প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। উহা স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছে কিনা [illegible] 'Nineteenth Century' পত্রের ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর ও নবেম্বর সংখ্যা)। স্বতঃজাত বলিয়া অনেক খেলাই সকল দেশের সভ্য এবং অসভ্য সমাজে প্রায় এক রকমের। কুস্তি খেলা, নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে তীর প্রভৃতি ছোড়া, লুকোচুরি খেলা প্রভৃতি বিশ্বব্যাপী।

শারীরিক বল পরীক্ষার খেলাগুলি অতি প্রাচীনকালে প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির সহিতই বেশি হইত। যখন যুদ্ধ বিগ্রহ থামিয়া গিয়া প্রতিবেশী জাতিরা শান্তিতে বাস করিত, এবং কেহ কাহারও গ্রাম আক্রমণ করিত না, তখন প্রায়শঃ অবসর ঋতুতে উহারা পরস্পরকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ প্রভৃতি বলের খেলায় আহ্বান করিত। এ খেলা তখন ক্ষুদ্র রকমের যুদ্ধেই দাঁড়াইত বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে ঐ খেলার ফলে পরস্পরে বন্ধুতা জন্মিত, এবং সামাজিক বিদ্বেষ চলিয়া যাইত। এখনো এদেশের অনেক পল্লীতে, এবং অনেক অসভ্যসমাজে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার খেলা দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ব্বর সমাজে যাহা যথার্থতঃ বিবাদ ছিল, সভ্যসমাজে তাহা খেলায় দাঁড়াইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে স্ত্রীচুরি করার প্রথা ছিল। যেখানে সত্য সত্যই স্ত্রীচুরি উঠিয়া গিয়াছে, সেখানেও উহার খেলা আছে। জ্যোৎস্না রাত্রে একদিকে একদল বালিকা, অন্য দিকে একদল বালক দাঁড়াইয়া গান গাহিয়া পরস্পরকে উপহাস করিতে থাকে; তাহার পর একজন পুরুষ সহসা গিয়া একটি বালিকাকে ধরিয়া তুলিয়া পলাইতে চেষ্টা করে। তখন সমস্ত বালিকারা আসিয়া অপহৃতার পক্ষ হইয়া টানাটানি আরম্ভ করে। 'হাডুডুডুর' মত যদি ঐ পুরুষ দম থাকিতে থাকিতে (দুই বার নিশ্বাস না লইয়া) বালিকা-দিগকে এড়াইয়া হৃতা বালিকাকে আপনার গণ্ডিতে আনিতে পারে, তবে তাহার জয় হয়। নচেৎ সে "মরিল," এবং খেলার স্থান হইতে দূরে গিয়া বসিল। বিলাতের Anthropological Instituteএর জর্ণালে (১৮৯২, ৪৮৫ পৃষ্ঠা) অবিকল এই খেলার কথা নিউগিনির একটি জাতির বিবরণে লিখিত হইয়াছিল।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার খেলার মত দৈবের খেলাও বিশ্বব্যাপী। দৈবের খেলাগুলি অধিকাংশই জুয়াখেলা। শরীরের সঞ্চিত উৎসাহের স্থলে, এখানে শ্রমসঞ্চিত [illegible]

সভ্য সমাজে জুয়াখেলা যথেষ্ট প্রচলিত থাকিলেও অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি উহাকে ঘৃণা করেন ; ঘৃণা করাও উচিত। কিন্তু এক সময়ে উহা যে বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলিকে সামাজিকতায় আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই। সম্বলপুরে অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, যে সকল জাতির লোকেরা অন্য সময়ে পরস্পরে মেশে না, অথবা ঝগড়া-বিবাদ মামলা-মোকদ্দমার জন্য পরস্পরের মুখ দেখে না, তাহারা দেয়ালীর জুয়াখেলার দিনে এক সঙ্গে বসিয়া জুয়াখেলা করে। সে দিন শত্রুকে হারাইয়া সুখলাভ করিতে চেষ্টা করে। যেখানে অন্য কোন সাধারণ সামাজিক মিলন ঘটিয়া উঠিতে পারে না, সেখানে যে জুয়াখেলা খুব দোষের, তাহা মনে করি না। জুয়ার আড্ডায় মিশিয়া পরস্পরের শত্রুতা ভুলিয়া সন্ধি করিয়াছে,—এরূপ দু'চারিটি দৃষ্টান্ত আমি সম্বলপুর সহরেই দেখিয়াছি।

খেলার ইতিহাসের একটুখানি আভাস দিলাম মাত্র। Newell যেরূপ আমেরিকায় বালকদিগের খেলা এবং গানের বিবরণ লিখিয়াছেন, Haddon যেরূপ অনেক খেলার সমালোচনা করিয়া সমাজতত্ত্বের অনেক জ্ঞাতব্য কথা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আমাদের দেশে যদি ঐরূপ কেহ সেকাল এবং একালের সমাজ তত্ত্বের খেলাগুলি বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ লিখিতে পারেন, তবে একটা দিকের উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। যাঁহারা এ বিষয়ের সাহিত্য পড়িতে চাহেন তাঁহাদিগের জন্য কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম করিতেছি। (১) Dictionary of British Folklore, Part I এ Mrs. Gomme লিখিত "Traditional Games of England, Scotland and Ireland. (২) সুপ্রসিদ্ধ E. B. Tylor লিখিত "Geographical Distribution of Games (Journal of Anthro. Inst. 1879). (৩) W. W. Newell প্রণীত Games and Songs of American Children. (৪) Stewart Culin প্রণীত Korean Games (জাপান ও চীনের খেলাও ইহাতে আছে। (৫) W. W. Gill প্রণীত Myths and Songs.

(২)

এখন এ প্রবন্ধে এ দেশের কয়েকটি খেলার কথা বলিব। এই বিবরণে খেলাগুলিকে কোন বৈজ্ঞানিক বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিব না। প্রথমতঃ অতি প্রাচীন পালি সাহিত্যে যে সকল খেলার উল্লেখ পাইয়াছি সেগুলির কথা বলিব। বিবরণটি দীঘনিকায়ের তৃতীয় সুত্ত হইতে গৃহীত হইল।

(১) "অকৃথন" খেলা—হাতে কয়েকটি গুটিকা লইয়া একটি উপরে ছুঁড়িয়া ফেলা, এবং শূন্য হইতে সেটি হাতে ধরিবার পূর্ব্বেই আর একটা গুটিকা উৎক্ষিপ্ত করা। এই বহু প্রাচীন খেলা এখনও ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। (২) "খলিকন্"—অর্থাৎ "জূতখলিকে পাশককীলনম্"—অর্থ হইল জুয়ার আড্ডায় পাশাখেলা। পাশাখেলা (কেবল দ্যূত ক্রীড়ায়) বহু প্রাচীন ; বেদেও উহার অস্তিত্ব সূচিত হয়। প্রাচীনকালে কিন্তু একখানা পাশা ঘুরাইয়া দিয়া জুয়া খেলা হইত। ১৬টি ঘুটি লইয়া তিনখানি পাশার দানে পাশাখেলা সম্পূর্ণরূপে এ দেশের খেলা বটে ; কিন্তু এই প্রথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পাশাখেলার নিয়মগুলি ভারতে সর্ব্বত্র এক। চারি হাতের খেলায় "ছুটা" খেলার প্রথাই অধিক প্রচলিত ; তবে বঙ্গদেশে দু-তিন-নয়, ষোল, সতের দানে হাত খোলার নিয়মের কড়াকড়ি বেশি। রং খেলার নিয়ম বোম্বাই থেকে বঙ্গ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ এক। (৩) ঘটিকা—"দীঘদণ্ডকেন রস্স দণ্ডক পহারণ কীলা"—অর্থাৎ গুলি-ডাণ্ডা খেলা। এ খেলাও ভারতে সভ্য-অসভ্য সকল সমাজেই প্রচলিত দেখিয়াছি। (৪) "সলাক হৎতম্"—একটা কাপড়ের উপর (নিশ্চয়ই জলে ভিজাইয়া ও আলো ফেলিয়া), হাতের বিচিত্রভঙ্গীতে হাতী, ঘোড়া প্রভৃতির ছবি প্রদর্শন। এদেশে ম্যাজিক্ লণ্ঠন আমদানি হইবার আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই খেলা প্রচলিত ছিল। (৫) অকৃথরিকা—আকাশে কিম্বা পিঠে অক্ষর লেখা, এবং কি অক্ষর হইল তাহা বলা। (৬) মনেসিকা—অর্থাৎ মনের কথা বলার খেলা। ইংলণ্ডের ড্ইংরুমে এই শ্রেণীর এক খেলা আছে। একজন মনে মনে কাহারও নাম ভাবিবে, অন্য জন সেটা বলিবে। এ খেলা খুব আমোদ-

উত্তরে কেবল, 'হাঁ' বা 'না' বলিতে হয়। দৃষ্টান্ত—সে কি বাঙ্গালী? সে কি পুরুষ? সে কি অমুক সহরে থাকে? ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া ধীরে ধীরে কৌশল পূর্ব্বক মনের কথা বাহির করিতে হয়। (৭) 'যথাবজ্জম্'—এই খেলায় কাণা খোঁড়ার এমন রূপ ধরিতে হইত যে লোকে কাণা খোঁড়া বলিয়া ভ্রম করে। (৮) বিকতিকা—সিংহ ব্যাঘ্র সাজিয়া ভয় দেখানো ও কৃত্রিম শিকার করা ইত্যাদি।

অন্য অন্য পালিগ্রন্থে আরো নানা রকমের খেলার আভাস পাওয়া যায়। থেরী গাথার একটি শ্লোক পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে সূতা দিয়া টানিয়া খুব মনোজ্ঞ-ভাবে পুতুলনাচ হইত।

বালকদিগের খেলার মধ্যে হাড়ু-ড়ু, কপাটি কপাটি, হয়ত অতি প্রাচীন; কেননা ভারতের সর্ব্বত্র ঐ খেলা একই প্রথায় হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে "ঘো ঘো রাণী" বলিয়া একটা খেলা আছে। ঐ খেলায় কতকগুলি ছেলে মেয়ে হাত ধরাধরি করিয়া একজনকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। যে মাঝখানে থাকে সে হাত দিয়া, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে, "এতটুকু পানি" বলিয়া চেঁচায়, এবং বেষ্টন-কারীরা "ঘো ঘো রাণী" বলিতে থাকে। তারপর সুযোগ দেখিয়া মাঝখানের বালকটিকে বেষ্টন ভেদ করিয়া পলাইতে হয়। এই খেলা বঙ্গদেশের বাহিরে সম্বলপুর ভিন্ন অন্য কোথাও দেখি নাই।

ভদ্রলোকের বৈঠকী খেলার মধ্যে দাবা, তাস ও পাশা প্রসিদ্ধ। একালের তাসখেলা যে ইউরোপের আমদানি, তাহা নিভূ‌র্ল। গ্রেমেরো খেলা পর্ত্তুগিজদের আমলের আমদানি। Trenta (তেরেন্তা) Quaranta (কোরোন্তা) প্রভৃতি শব্দগুলি পর্য্যন্ত বজায় আছে। আমাদের গ্রাবুখেলায়ও যে বিন্তি আছে, উহা Venti (ইটালীর বিংশতি) কথার অপভ্রংশ। খেলা রাখিতে হইলে দুকুড়ি সাত দেখাইতে হয়; কিন্তু বিন্তি হইলে উহাতে আর কুড়ি ফোঁটা (Venti) যোগ হয়। ঠিক ঐ প্রণালীতেই পঞ্চাশ হইলে—অপর পক্ষকে (হয় ত খেলার প্রথমে তাহাই ছিল) ৪৭+৫০=৯৭ দেখাইতে হইত। এক পক্ষের যদি ৯৭ থাকে, তবে কিছুতেই প্রতি-পক্ষ ৫০ দেখাইতে পারে না—কারণ ফোঁটা হইল ১৪৬। পঞ্চাশ কাবার করিলে প্রতিপক্ষের হাতে, অথবা সমগ্র অবশিষ্ট তাসে, ৯৬ বাকী থাকে বলিয়া, ৯৭ দেখাইতে না পারায় তাহাদিগকে হারিতে হয়। এক হাতে হন্দর হইলে মোটে ৪৬ বাকী থাকে; কাজেই ৪৭ ফোঁটার অভাবে খেলা হয় না। বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলাম, যে 'বিন্তি' কথাটি Venti মাত্র।

বিলাতি তাসের পূর্ব্বেও এদেশে এক রকমের তাস খেলা ছিল। বাঁকুড়া জেলায় এবং সম্বলপুর অঞ্চলে এই তাস খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯৬ সনের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'Circular cards of Bankura' প্রবন্ধে বাঁকুড়ার খেলার বর্ণনা করিয়াছেন। সম্বলপুরের তাসও গোলাকার; কিন্তু এই খেলার নাম গঞ্জিপা। ইহার বিশেষ বিবরণ ইংরাজিতে লিখিতেছি।

দাবা খেলা মূলতঃ ভারতবর্ষের খেলা বলিয়া Staunton এর দাবাখেলার গ্রন্থে স্বীকৃত আছে। যে কারণে বড়ের প্রথম চাল ইচ্ছানুসারে দুটি ঘর যাইতে পারার নিয়ম, এবং ঘর বাঁধিবার নিয়ম, ভারতবর্ষের নিয়ম হইতে পৃথক করা হইয়াছে, তাহাও উহাতে লিখিত আছে। খেলাটি নিশ্চয়ই খুব প্রাচীন; কেন না ভারতের সর্ব্বত্র একই নিয়মে খেলা হয়। রোমকেরা খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে ভারা হইতে ঐ খেলা শিখিয়া লইয়াছিল। দাবাখেলার নাম ইংরাজিতে Chess; কিন্তু ইটালিয়ানে Scacco,—উহার উচ্চারণ লইল স্কাককো। স্কাককো ঠিক কক্ষ কথার অপর মূর্ত্তি। বাণভট্টের গ্রন্থে চতুরঙ্গবল দাবাখেলার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে; কিন্তু অধিক প্রাচীন কোন সাহিত্যে উহার কোন উল্লেখ চোখে পড়ে নাই।

বালকদিগের দুইটি প্রিয় খেলার উল্লেখ করিয়া এবারের প্রবন্ধ শেষ করিব। (১) ঘুড়ি উড়ান; (২) লাটিমখেলা।

ভারতবর্ষের কোন প্রাচীন সাহিত্যে ঘুড়ি উড়ানের অভাস পাই নাই। Haddon সাহেবের Study of man গ্রন্থে দেখিতে পাই (২০২ পৃষ্ঠা) যে সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ব্বদেশের সহিত বাণিজ্যের সময়ে ঘুড়ি উড়ানো খেলা ইউরোপে আমদানি হয়। চীনদেশে জাপানে এবং পূর্ব্ব উপদ্বীপে এই খেলার বিস্তৃতি অত্যন্ত অধিক। ফরাসী

পণ্ডিত Dillaye লিখিয়াছেন (Haddon ২৩৭পৃ) হন্ সিন নামক একজন চীন-যোদ্ধা ২০০ খৃষ্ট পূর্ব্বে এই খেলার প্রথম আবিষ্কার করেন। চীনদেশে ঘুড়ি-উড়ানোর উৎসব এত জাঁকাল, যে, ঐ দেশ হইতেই পূর্ব্বউপদ্বীপে, এবং ব্রহ্ম হইতে বঙ্গে উহার আমদানি বলিয়া মনে করিতে ইচ্ছা হয়।

ইউরোপে অতি প্রাচীনকাল হইতে লাটিম খেলা ছিল; দ্বাদশ শতাব্দীর সাহিত্যেও উহার উল্লেখ আছে। ইংলণ্ডের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কোন পাণ্ডুলিপিতে একটি ধারে একটি লাটিমের ছবি দেখা গিয়াছে বলিয়া Strutt সাহেব তাঁহার Sports, &c. of England গ্রন্থে লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ মার্ব্বলের মত লাটিম খেলা ইউরোপ হইতে আসিয়া সহজেই বহুবিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ইউরোপ ও আমেরিকায় অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের কার্য্য

কোনও দেশের একজন মানুষ অপর একজনের অনিষ্ট-চেষ্টা করিলে, কখনও বা দেশের আইনে, কখনও বা সামাজিক শাসনে তাহাকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত রাখে। এইরূপ, একদেশবাসী একজাতি অন্যদেশবাসী অন্য জাতির অনিষ্ট-চেষ্টা করিলে অপচিকীর্ষু জাতিকে শাসনে রাখিবার জন্য আন্তর্জাতিক আইন বা বিশ্বমানবের প্রবল সামাজিক মত যদি থাকিত, তাহা হইলে ভাল হইত। এরূপ আইন বা মত যে মোটেই নাই, তাহা নয়। কিন্তু যাহা আছে, তাহা প্রবল জাতি কিম্বা শ্বেতকায় জাতিদের পরস্পর ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। দুর্ব্বল, অশ্বেতকায়, বা অসভ্য জাতিদের প্রতি প্রবল জাতি বা শ্বেতকায় জাতি যেরূপ ব্যবহারই করুক না কেন, তাহাতে বাধা দিবার বর্ত্তমানে কোন বিশিষ্ট ফলদায়ক মানবীয় উপায় নাই।

শ্বেতজাতির লোক এবং প্রবল জাপানীদের এখন প্রায় সর্ব্বত্র অবাধগতি। তাহারা ভ্রমণ ও বাণিজ্যাদির জন্য সর্ব্বত্র যাইতে পারে, কিন্তু ভারতবাসী ও অন্যান্য এশিয়াবাসীরা তাহা পারে না। শ্বেতকায়দিগের উপনিবেশ-সকলে এশিয়াবাসীদের প্রতি মানবোচিত ব্যবহার করা হয় না।

অন্যদেশের শ্বেতকায় ছাত্রেরা ইংলণ্ডে শিক্ষালাভের জন্য গেলে যেরূপ ব্যবহার পায়, যেরূপ স্বচ্ছন্দে, সন্দেহ-ভাজন না হইয়া, ভদ্রসমাজে মিশিতে পায়, ভারতবাসী ছাত্রেরা এখন তাহা পায় না।

এইরূপ অবস্থার প্রতিকার দুই প্রকারে হয়। প্রথমতঃ, অশ্বেত, দুর্ব্বল বা অসভ্য জাতিদের শক্তিশালী হইয়া উঠা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, কেবল আমাদের কথা ধরিতে গেলে, ভারতবর্ষ দুর্ব্বল হইলেও, ভারতবাসীরা যে সর্ব্ববিষয়ে অনুন্নত নহে, তাহারা যে এক সময়ে রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে ও শিল্পে উন্নত ছিল, এবং এখনও অনেক বিষয়ে উন্নত আছে, ইহা জগৎবাসীকে জানান দরকার। তাহা হইলে লোকে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষকে কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শিখিবে। চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশের লোকদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তাহাদেরও সভ্যতাসম্বন্ধে জগৎবাসীর জ্ঞান বড় অল্প। এই জ্ঞান বর্দ্ধিত হইলে সকলে তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে পারিবে। শ্রদ্ধা হইতেই প্রকৃত প্রেম ও সহানুভূতি জন্মিবে।

গত বৎসর আগষ্টমাসে জর্ম্মেনীর বার্লিন সহরে উদার-ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের যে আন্তর্জাতিক সভা হইয়াছিল, সাক্ষাৎভাবে তাহার উপকারিতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ না করিয়া বন্ধুভাবে পরস্পরের মত শ্রবণ ও আলোচনা করিলে সকল মানবের আধ্যাত্মিক একতা বুঝিতে পারা নিশ্চয়ই সহজ হয়। কিন্তু ইহাতে পরোক্ষভাবেও অনেক সুফল ফলে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে ও ভালবাসিতে শিখে। পরস্পরকে সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে শিখে। সুতরাং জাতিতে জাতিতে কলহের সম্ভাবনা অন্ততঃ কিছু কমিয়া আসে। এই জন্য আমাদের দেশের ব্রাহ্মসমাজের যে তিন জন প্রতিনিধি এবং শিখদের একজন প্রতিনিধি ও সিংহল হইতে বৌদ্ধদিগের যে একজন প্রতিনিধি বার্লিনের এই সভায় গিয়াছিলেন, তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে নিজ নিজ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইলেও

পরোক্ষভাবে ভারতীয় সভ্যতারও প্রতিনিধিরূপে গণিত হইতে পারেন। এই প্রতিনিধিগণের নাম অধ্যাপক হেরম্ব চন্দ্র মৈত্রেয়, ভাই প্রমথলাল সেন, অধ্যাপক টি, এল, ভাস্বানী, অধ্যাপক তেজা সিং এবং শ্রীযুক্ত জয়তিলক।

ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিনিধি অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় বার্লিনের কার্য্য শেষ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। বার্লিনে তিনি "অনন্তের সন্ধানে মানবাত্মার চেষ্টা" এবং "ভারতে হিন্দু ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম" এই দুই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ইউরোপে থাকিতে থাকিতে তিনি ফ্লোরেন্সে মহাত্মা থিওডোর পার্কারের জন্মের শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন এবং তথায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যাঁহারা থিয়োডোর পার্কারের পূত জীবনের কথা অবগত নহেন, তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত উক্ত মহাত্মার বাঙ্গলা জীবনচরিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পাঠকমাত্রেই উহা দ্বারা উপকৃত হইবেন। উহা কলিকাতায় ২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

মৈত্রেয় মহাশয়ের আমেরিকার কার্য্য সম্বন্ধে বিখ্যাত ভারতহিতৈষী মার্কিন গ্রন্থকার সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেব মডার্ন রিভিউপত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "মৈত্রেয় মহাশয় আমেরিকায় আসিয়া কেবল যে আমাদের উপকার করিয়াছেন, তাহা নহে, ভারতবর্ষেরও উপকার করিয়াছেন।" সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেবের মতে আমেরিকা, ইউরোপ ও ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা আছে। তিনি বলেন, এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তির কারণ দুটি। পাশ্চাত্য যে সকল খৃষ্টীয় মিশনরী ভারতবর্ষে আগমন করেন, তাঁহারা একটি কারণ।

"ভারতবাসীরা বোধ হয় জানেন যে আমরা সাধারণতঃ যে সকল লোককে মিশনরী করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাই, তাঁহারা আমাদের মধ্যে সুশিক্ষিততম, বা প্রশস্ততমমনাঃ নহেন। অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল আছে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে যাঁহারা মিশনরী হইয়া ভারতবর্ষে যান, তাঁহাদের মানসদৃষ্টি কিছু সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, তাঁহারা ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য, সভ্যতা, ও ধর্ম্মসমূহ সম্বন্ধে অল্পই জানেন। তাঁহাদের মন সম্পূর্ণরূপে এই ধারণার বশবর্ত্তী যে তাঁহারা যেসকল জাতির নিকট প্রেরিত হইতেছেন, তাহারা সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত, এবং এরূপ ধর্ম্মসমূহের প্রভাবাধীন, যেগুলি মিথ্যা এবং যারপরনাই কুসংস্কারপূর্ণ ও অবনতিকর। এবং অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা জীবনে কখনও এই ধারণা অতিক্রম করিতে পারেন না। তাঁহারা যখন ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া আসেন, এবং নানা স্থানে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বেড়ান, তখন তাঁহারা সাধারণতঃ এইরূপ ধারণা হইতেই কথা বলেন। তাহাতে এইরূপ বোধ হয় যে তাঁহারা ভারতের উৎকৃষ্টতর লোকদের সংস্পর্শে আসেন নাই, বা ভারতের চিন্তা, জীবন ও সভ্যতার উন্নততর দিকটির যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন নাই।

"ভ্রান্ত ধারণার আর একটি কারণ ইংলণ্ড। মিশনরীদিগের নিকট হইতে আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান পাই, তাহা ব্যতীত যাহা পাই, তাহার অধিকাংশ ইংরাজদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। অবশ্য অনেক ইংরেজ লেখক ভারত সম্বন্ধে পূর্ণ ন্যায্য ব্যবহার করেন, অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে সত্য কথাই লেখেন। কিন্তু অবস্থা যাহা, তাহাতে অধিকাংশ লেখক সম্বন্ধে ইহা সত্য হইতে পারে না। যে জাতি অপর এক জাতিকে নিজ অধীনে রাখিয়াছে তাহারা শাসিত জাতির সদ্গুণ সম্বন্ধে ন্যায্য কথা লিখিতে সমর্থ নহে; তাহারা শাসিতদিগকে অবশ্যই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, নতুবা তাহাদিগকে আত্মশাসনক্ষমতা দেয় না কেন? তাহারা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে অপকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিবে, নতুবা তাহাদিগকে অধীনতাপাশে বদ্ধ রাখিবার ন্যায়সঙ্গত কারণ কোথায় পাওয়া যাইবে? অতএব ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে আমরা ইংলণ্ডীয়সূত্রে ভারত সম্বন্ধে যে সাধারণ ধারণা লাভ করি, তাহা শুদ্ধতা হইতে দূরে অবস্থিত।"

সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেবের মতে মৈত্রেয় মহাশয়ের মত লোকে আমেরিকা গেলে আমেরিকা ও ভারতবর্ষ উভয়েরই উপকার হয়। কারণ তদ্দ্বারা অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়; আমেরিকা ভারতবর্ষের সভ্যতা ও ধর্ম্মের উচ্চতর দিক্‌টি দেখিতে সমর্থ হয়। হেরম্ব বাবুর পূর্ব্বেও আরও অনেক বিখ্যাত ভারতবাসী আমেরিকাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানালোক দিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রামকৃষ্ণশিষ্য বিবেকানন্দ স্বামী, বোম্বাইয়ের বী. নগরকার, জৈনধর্ম্মী বীরচাঁদ এ. গাঁধি, বৌদ্ধ ধর্ম্মপাল, পার্শী জীবনজী জমসেদ্‌জী মোদী ও কুমারী জীন সোরাবজী, এবং ব্রাহ্ম অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের নাম সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে, এই সকল ভারত-প্রতিনিধির কথা, আমেরিকার সমগ্র লোকসংখ্যার তুলনায় অতি অল্প লোকেরই কর্ণে পৌঁছিয়াছে; তথাপি তাঁহারা আমেরিকার লোকদিগকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্য কথা জানাইয়া এবং ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করিয়া প্রভূত উপকার করিয়াছেন। তিনি বলেন "We need to have more visitors of the same sort"—"আমাদের এবম্বিধ আরও অনেক আমেরিকা-দর্শকের প্রয়োজন আছে।"

ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা আমেরিকার কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এবং শিল্প ও কৃষিবিদ্যালয় সমূহে যাইতে আরম্ভ করায়,

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়

সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেব আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই সকল ভারতীয় ছাত্র আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের সহিত একসঙ্গে কাজ করিয়া আমাদিগকে ভারতবাসীর বুদ্ধির উৎকর্ষ দেখাইবে—বাস্তবিক ইতিমধ্যেই দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে, "indeed they have already begun to show us"। অবশ্য তাহারা ভারতবর্ষে নিজ নিজ অর্জ্জিত বিদ্যা লইয়া আসিয়া স্বদেশেরও মঙ্গলসাধনা করিবে। সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেব বলেন যে ভারতবর্ষের লোকদের যে সকল বিজ্ঞান প্রভৃতি শিখা আবশ্যক, সেই সকল বিজ্ঞান, কলকারখানার কাজ ও শিল্প শিখিবার শিক্ষালয় আমেরিকা অপেক্ষা আর কোথাও ভাল নাই। জাপানের ও চীনদেশের শত শত ছাত্র আমেরিকা যাইতেছে ও গিয়াছে। তিনি আমেরিকার ও ভারতবর্ষের কল্যাণার্থ, আশা করেন যে ভারতবর্ষ হইতে শত শত ছাত্র আমেরিকায় শিক্ষালাভার্থ যাইবে।

মৈত্রেয় মহাশয় আমেরিকায় যে যে স্থানে যে যে বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তাহা বিস্তারিতভাবে লিখিবার স্থান নাই। ব্রাহ্মসমাজের কথা ছাড়া তিনি প্রধানতঃ "আমেরিকার প্রতি ভারতের ধর্ম্মবিষয়ক বার্ত্তা," "ভারতবাসীর চক্ষে ইমার্সন," "জগতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম, ও ভারতবর্ষ তৎপক্ষে কি উপকরণ যোগাইতেছেন," "আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহিত তত্ত্ববিদ্যার সম্বন্ধ," প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেবের মতের তাৎপর্য্য নীচে দেওয়া গেল।

"আমেরিকায় মৈত্রেয় মহাশয় যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি যেখানে গিয়াছেন সেখানেই তাঁহার গভীর চিন্তা, বিস্তৃত সাহিত্যিক জ্ঞান এবং ইংরাজী লিখিবার ও বলিবার শক্তি, এবং গভীর আধ্যাত্মিকতার দ্বারা শ্রোতাদের মনে তিনি যে ভাবের উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন, তাহা সহজে মুছিয়া যাইবে না। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেরই মনে ভারতের চিন্তা, ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে নূতন জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা জন্মিয়াছে। তিনি আরও বেশী দিন থাকিতে না পারায় আমাদের মনে খেদ রহিয়া গেল। আশা করি ইহাই তাঁহার শেষ আমেরিকা-দর্শন নহে।"

প্রকাশ্য বক্তৃতায় এবং অপ্রকাশ্য কথাবার্ত্তায় যেখানেই সুযোগ পাইয়াছেন, সেখানেই হেরম্ববাবু ভারতের শিক্ষাবিষয়ক অভাব মার্কিনদিগকে জানাইয়াছেন। সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেব বলেন, যে, আমেরিকার লক্ষপতি ও ক্রোড়পতিরা স্বদেশে বিদেশে শিক্ষার জন্য কত টাকাই না দিতেছেন; তাঁহারা ভারতবর্ষের জন্য কিছু করেন না কেন? তিনি আরও বলেন, "আমাদের এত টাকা আছে; মৈত্রেয় মহাশয়ের সিটি কলেজের জন্য যত টাকা তিনি চান, তাহা তুলিবার পক্ষে নিশ্চয়ই আমাদের তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত।"

ইহা হয়ত অনেকে জানেন না যে সিটি কলেজ এখন ছাত্রসংখ্যা হিসাবে ভারতবর্ষের বৃহত্তম কলেজ। * ইহার কেবল মাত্র কলেজবিভাগে—এবং কলেজ বলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল কলেজবিভাগই বুঝা উচিত—নয় শত চুরাশি জন ছাত্র আছে। ভারতের অন্যান্য কোন কোন কলেজে, আইন পড়াইবার শ্রেণী বা স্কুলবিভাগ লইয়া, ইহা অপেক্ষা অধিক ছাত্র আছে। কিন্তু কেবল কলেজে আর কোথাও এত ছাত্র নাই। এই কলেজের বিশেষত্ব এই যে ইহা কোন কালেই কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ছিল না, এখনও নাই; ইহার সমুদয় আয় কেবল ইহার রক্ষা ও উন্নতির জন্য খরচ করা হয় এবং চিরকালই হইয়াছে। কলিকাতার অন্য কোন বেসরকারী কলেজ সম্বন্ধে ঠিক এ কথা বলা চলে না। এখন অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়ম অনুসারে কোন স্কুল বা কলেজ ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি বা আয়ের উপায় হইতে পারে না। কার্য্যতঃ এই নিয়ম প্রতিপালিত হইতেছে কিনা, জানি না। যাহা হউক, সিটি কলেজ প্রধানতঃ ছাত্রদত্ত সামান্য বেতন দ্বারা এই উন্নত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে।

---

* আমরা এইরূপই জানি। ভ্রম হইয়া থাকিলে পাঠকগণ সংশোধন করিবেন। বর্ত্তমান বর্ষের ৯ই ফেব্রুয়ারী সিটি-কলেজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা নীচে দেওয়া গেল।

প্রথমবার্ষিক শ্রেণী	২৯১ জন।
দ্বিতীয়বার্ষিক শ্রেণী	৪৮০ জন।
তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণী	৮৭ জন।
চতুর্থবার্ষিক শ্রেণী	১২৮ জন।
সমস্ত কলেজে	৯৮৪ জন।

স্বদেশী ও বিদেশী বদান্য ব্যক্তিদের দৃষ্টি ইহার উপর পড়া উচিত। তাহা হইলে ইহা আরও উন্নতি লাভ করিয়া দেশের মঙ্গল করিতে পারিবে।

আমেরিকা হইতে হেরম্ব বাবু ইংলণ্ডে আগমন করেন। সেখানে তিনি বেশী দিন থাকিতে পারেন নাই। পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনের গোলমালে, যে কয়দিন ছিলেন, তাহার মধ্যেও ভাল করিয়া কাজ করিবার সুযোগ পান নাই। ইংলণ্ডেও প্রকাশ্য বক্তৃতায় ছাড়া, ভারতের বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী লর্ড ক্রু প্রভৃতি কয়েকজন গণ্যমান্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। প্রকাশ্য বক্তৃতা ও উপদেশ তিনি প্রধানতঃ এগার বার দিয়াছিলেন;—অক্সফর্ডে দুইবার, কেম্ব্রিজে একবার, এবং লণ্ডনে আটবার। ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা ছাড়া তিনি লণ্ডনে গবর্ণমেণ্টের আবকারী নীতি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন ও ভারতবর্ষের নানা রাজনৈতিক বিষয়সম্বন্ধে আরও দুই স্থানে বক্তৃতা করেন। সুতরাং পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনের কোলাহল সত্ত্বেও তাঁহার বিলাতযাত্রা ব্যর্থ হয় নাই।

বাঙ্গালাদেশে মৎস্য পালন

মাছ খায় বলিয়া বাঙ্গালীর ভারতব্যাপী একটা দুর্নাম আছে। কিন্তু কয়েক শ্রেণীর হিন্দু ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিধবারা না খাইলেও মাছ জগতের সকল জাতিরই ভক্ষ্য। দুধ, ঘির ন্যায় মাছও বাঙ্গালাদেশে আজকাল ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। পদ্মা নদীর ধারে এক আনায় যে "এক হালি" (৪টা) ইলিশ মাছ পাওয়া যাইত ইহা এখন উপকথায় পরিণত হইয়াছে। ইংরাজেরা বঙ্গোপসাগর হইতে সামুদ্রিক মাছ ধরিয়া কলিকাতায় চালান দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। দেশে মাছের অভাব না হইলে এরূপ ব্যবস্থা হইত না।

এই অভাবের কারণ কি? প্রত্যেক আদম সুমারির প্রতিবেদনে (Census Report) দেখা যায় ভারতের লোকসংখ্যা মোটের উপর বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব (১) লোকসংখ্যার অনুপাতে মৎস্যকুল বৃদ্ধি না পাইলে এই অভাব ঘটা সম্ভব। (২) পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে যে পরিমাণ জল ছিল এখনও সেই পরিমাণ জল আছে বলিয়া মনে হয় না। পুকুর, খাল, বিল এমন কি ভাগীরথী ও পদ্মা প্রভৃতি বাঙ্গলার প্রধান প্রধান নদীগুলিরও জল কমিয়াছে; জলের পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় মাছের সংখ্যাও কমিয়া থাকিবে। (৩) আমাদের ন্যায় মাছেদের মধ্যেও অনেকটা খাদ্যাভাব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আজকাল সুন্দরবনের জঙ্গল আবাদ হওয়ায় ঐ অঞ্চলে বৃক্ষাদির গলিত পত্র, ফুল ও ফল নদীগর্ভে পতিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর তত পচিতে পায় না। পত্রাদিতে যে রস থাকে তাহা পচিয়া জলে মিশ্রিত হইলে সেই জল মৎস্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। মাছেরা গলিত পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে। (৪) রেলের জন্য অনেক নদী খাল নষ্ট হইয়াছে; ভৈরব প্রভৃতি ছোট ছোট নদীতে সর্ব্বদা ষ্টীমার যাতায়াত করায় উহার ঝপ্ ঝপ্ শব্দে মাছেরা ভয় পাইয়া থাকে। যে শব্দ শুনিয়া কুমীরেরা পর্য্যন্ত ভীত হইয়া অন্যত্র আশ্রয় লয় সেই শব্দে যে নিরীহ মৎস্যেরা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া অন্যস্থানে যাইবে না তাহার কারণ কি? (৫) সর্ব্বোপরি আমাদের সমাজের অজ্ঞতা মৎস্যকুলনাশের আর একটি প্রধান কারণ। আমরা মাছের বংশ লোপ করিতে মজবুত কিন্তু কিরূপে উহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয় তাহা আদৌ জানি না। গর্ভিণী জীব নাশ যে মহা পাপজনক তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু ডিমওয়ালা মাছ মারা আদৌ পাপজনক বলিয়া মনে হয় না। ডিমওয়ালা মাছ অন্যান্য মাছ অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় বলিয়া অজ্ঞ জেলেরা সেইরূপ মাছ অতি আগ্রহের সহিত ধরিয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে এইরূপ মাছ ধরা আইনবিরুদ্ধ। এক একটি ডিমওয়ালা মাছের নাশ হইলে যে কত মৎস্য নষ্ট হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একটি ইলিশ মাছের ডিম্বাণু গণিয়া দশ লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত পঁয়তাল্লিশ হইয়াছিল। গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানে প্রতিবৎসর যে সব ডিমওয়ালা ইলিশ মাছ ধরা হইয়া থাকে তাহাদের বাচ্চা হইতে পাইলে ইলিশ মাছের বর্ত্তমান অভাব হইত কি? ইহার উপর মাছের অত্যন্ত অভাব দেখিয়া জেলেরা

ছোট ছোট পোনা মাছ ধরিতেও ত্রুটি করে না। ফলতঃ লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, জলের অল্পতা, খাদ্যের অভাব, ডিমের নাশ প্রভৃতি কারণে বাঙ্গালা দেশে মাছের অভাব ঘটিয়াছে। ইহা ভিন্ন রেল ও ষ্টীমারের প্রচলন হওয়ায় যেসকল স্থানে পূর্ব্বে মাছ যাইত না এখন সেসকল জায়গায় অনায়াসেই চালান যাইতেছে। গ্রীষ্মকালেও যাহাতে দূরদেশে চালান দেওয়া যায় তাহার জন্য আজকাল বরফ দ্বারা বাক্স প্যাক করিয়া পাঠান হইতেছে। সুতরাং স্থানীয় বাজারে যে মাছ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহাতে পুষ্করিণী, বাঁধ প্রভৃতি ক্ষুদ্র জলাশয়ে মাছ পোষা যায় তাহার চেষ্টা করা এখন দরকার। এ দিকে ঝোঁক দিলে অল্প ব্যয়ে প্রভূত লাভ এবং সেই সঙ্গে পল্লীর পুকুরগুলির সংস্কার সাধিত হইয়া গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে।

কিরূপে বদ্ধ জলাশয়ে মাছ পোষা যায় তাহা বহুকাল হইতে নানা দেশের লোকেই জানে। এদেশে জেলেরা বর্ষাকালে গঙ্গা, দামোদর, পদ্মা প্রভৃতি নদী হইতে মৎস্যের পোনা (fry-fish) ধরিয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইতে মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ ভাগীরথীতে পশ্চিম বঙ্গের জেলেরা বিস্তর পোনা ধরিতেছে। লোকে সেই পোনা পুকুরে ছাড়িয়া মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই সহজ উপায় অবলম্বন করিলে অত্যল্প ব্যয়ে সংসারের খরচ বাদেও অনেক টাকার মাছ বেচিয়া লাভবান হইতে পারা যায়। যৌথ কারবারে আমরা অভ্যস্ত নহি। সুতরাং মূলধনের অভাবে আমরা বহুব্যয়সাপেক্ষ কারবার আরম্ভ করিবার উপযুক্ত নহি; তবে অল্প মূলধনেও যেসকল ব্যবসায়ে বিস্তর লাভ হইতে পারে মৎস্যপালন তাহার মধ্যে একটি। ইহার আর একটি সুবিধা এই যে প্রত্যেক পল্লীগ্রামেও মাছের খরিদদারের অভাব নাই। সুতরাং দূরদেশে চালান দিতে না পারিলেও ক্ষতির আশঙ্কা নাই।

কিরূপে সহজে মৎস্যসংখ্যার বৃদ্ধি করা যায় তাহাই এখন বিবেচ্য। হৃষ্টপুষ্ট সবলদেহযুক্ত জীবেরই অধিক সন্তান হইয়া থাকে; অনশনক্লিষ্ট দুর্ব্বল জীবের সন্তান অধিক হওয়া কি সম্ভব? সুতরাং মাছের বংশবৃদ্ধি করিতে হইলে উহাদের খাদ্যের উপযুক্তরূপ যোগান আবশ্যক। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জন্তুসকল যেমন একমাত্র বায়ুর সাহায্যে জীবনধারণ করিতে পারে না, মাছেরাও সেই-রকম কেবলমাত্র জল খাইয়া বাঁচিতে পারে না; বায়ু ও জলের সঙ্গে খাদ্যেরও প্রয়োজন। ১২॥০ মণ মাছ রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাতে ২০ ভাগ নাইট্রোজেন, ৮॥০ ভাগ প্রস্ফরস মিশ্রিত অম্ল ও ৪॥০ ভাগ ক্ষার দেখা যায় এবং তৈলজ পদার্থ শতকরা ১৯ ভাগ থাকে (কৃষিগেজেট ১ম খণ্ড)। অতএব ঐ কয়েকটি পদার্থ যে মৎস্যশরীর গঠনকার্য্যের উপযোগী তাহা বেশ বোঝা যায়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির ন্যায় মৎস্যদিগকে শরীরের তাপ (animal heat) রক্ষা করার জন্য বেশী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে হয় না। পুকুর, খাল, বিল, নদী প্রভৃতি জলাশয়ে যেসকল পচা পাতা, শেওলা, দাম এবং অন্যান্য প্রাণীসমূহের মলমূত্রাদি পড়ে বা থাকে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত নাইট্রোজেন, প্রস্ফরস-মিলিত অম্ল ও ক্ষার থাকে বলিয়া ঐ সকল দ্রব্য আহার করায় মাছের শরীরপোষণ ও ভার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেসকল পুকুরে লোকে স্নান করে এবং থালা বাসনাদি ধোয় সেই সকল পুকুরের মাছ মিউনিসিপাল পুকুরের মাছ অপেক্ষা অনেক হৃষ্টপুষ্ট ও বড় হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে মিউনিসিপাল পুকুরে দাম, শেওলা, পচা পাতা, মলমূত্রাদি পদার্থ না থাকায় অপেক্ষাকৃত খাদ্যহীন বিশুদ্ধ জল খাইয়া থাকিতে হয় বলিয়া মাছ বড় হইতে পারে না। সার জে, বি, লজ বলেন স্কটলণ্ডের প্রস্তরময় উচ্চ ভূমি হইতে যেসকল নদী নির্গত হইয়াছে ঐ সমুদায় নদীর জলে যবক্ষার অম্ল (nitric acid) নাই এবং ঐ জলে এমন কোন পদার্থ দৃষ্ট হয় না যাহার সাহায্যে জলজ উদ্ভিদ জন্মিতে পারে। কাজেই জলজ উদ্ভিদভোজী কীট এবং মৎস্য ঐ জলে বাস করে না। স্কটলণ্ডের অধিকাংশ সুন্দর নদী কিংবা হ্রদে কোন জাতীয় মৎস্য দেখা যায় না। কিন্তু ঐ প্রদেশের উচ্চ ভূমিতে একটি বিভাগ আছে; তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে ট্রাউট জাতীয় এক-প্রকার মৎস্য দেখা যায়; উহাদের এক একটির ওজন এক ছটাকের বেশী কদাচ হইয়া থাকে। কিন্তু দুইটি

প্রবাহের মৎস্যকে অত্যন্ত বড় হইতে দেখা গিয়াছে। একটির প্রবাহের সঙ্গে কুকুরের খোঁয়াড়ের এবং অপরটির সহিত আলুর ক্ষেতের নর্দ্দমার যোগ রহিয়াছে।

জলের মধ্যে যত রকম যৌগিক পদার্থ আছে সেগুলি ভিন্ন খোল (খৈল), পশুপক্ষী প্রভৃতির মলমূত্র, গলিত উদ্ভিদ ও জীবদেহ, ভাত, ডাল প্রভৃতি মৎস্যের খাদ্য। অন্যান্য খোল অপেক্ষা কার্পাসের খোল দ্বারা মাছের অধিকতর পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। মৎস্যের পক্ষে গোময় একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। পশুপক্ষীর চর্ম্ম, নাড়ীভুঁড়ি, কেঁচো, পচা মাছ প্রভৃতি দিলে মাছের উপকার হয়। মাছের পোনার পক্ষে শামুক ও গেঁড়ি (গুগুলি) বিশেষ উপযোগী। কলিকাতার নিকটস্থ ধাপার নীচে যে নদী আছে তাহার মাছ খুব বড় ও সুস্বাদু হয়; ইহার কারণ এই যে নর্দ্দমা দিয়া কলিকাতার সর্ব্বপ্রকার ময়লা ঐ নদীতে পড়িয়া থাকে। পুকুরের মধ্যে গোশালার নর্দ্দমা করিতে পারিলে ভাল হয়। ধোপাকে কাপড় কাচিতে দিলেও উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। তবে যে পুকুরে মাছের আবাদ করার জন্য মলমূত্রাদি নিক্ষিপ্ত হইবে সে পুকুরের জল মনুষ্য ও পশুর পক্ষে একেবারেই পরিত্যজ্য হওয়া ভাল।

জমিতে যেমন সার দিয়া শস্যের খাদ্য সংস্থান করিয়া দিতে হয়, জলাশয়েও সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে মৎস্যের খাদ্য যোগাইলে সহজে মাছের বংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। উপযুক্ত সময়ে পুকুরে পোনা ছাড়িলে শীঘ্রই বড় বড় মাছ পাওয়া যাইতে পারে। পোনার পরিবর্ত্তে ডিম ছাড়িলে আরও অল্প ব্যয়ে অধিক সংখ্যক মাছ পাওয়া সম্ভব। আমাদের দেশের বড় বড় নদী, বিল, খাল ও পুকুরে যেসকল মৎস্য দেখা যায় তাহাদিগকে প্রধান দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যেসকল মাছ সমুদ্র বা বড় বড় গভীর নদীতে বাস করে, কেবল বর্ষাকালে ডিম্ব প্রসব করিবার সময়ে বা আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহের জন্য সময়ে সময়ে নদী ও খালে যাতায়াত করে ঐ সকল মাছকে যাযাবর বা ভ্রমণশীল (migratory), এবং যে সকল মাছ নদী খাল ও পুকুরে সর্ব্বদা বাস করে, কখন অন্যত্র গমন করে না, তাহাদিগকে একদেশবাসী বা ঘরবোলা (non-migratory) মাছ বলা যায়। ইলিশ, খয়রা প্রভৃতি মাছ যাযাবর জাতীয়; রুই, মিরগাল, কাৎলা, কৈ, মাগুর প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। শীতকালে ইলিশ মৎস্য বড়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়া থাকে; মাঘ মাসের শেষে পাওয়া গেলেও তখন উহার আকার ক্ষুদ্র থাকে। ইলিশ মৎস্য অপ্রশস্ত ও অগভীর নদীতে বাস করে না; এই জন্যই বোধ হয় শীত ঋতুতে গঙ্গা প্রভৃতির অগভীর জলে বেশী ইলিশ মাছ পাওয়া যায় না। বর্ষাকালে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথির সময়ে জলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা সমুদ্র ও বড় বড় গভীর নদী হইতে দলে দলে পদ্মা প্রভৃতি নদীতে আসিয়া থাকে। এই সময়েই ধীবরেরা অনায়াসে এই সুস্বাদু মাছ ধরিতে সক্ষম হয়। ঐ সকল মাছের অধিকাংশই স্ত্রী জাতীয়; কারণ অধিকাংশেরই পেটে ডিম্ব থাকে। একটি প্রবাদ আছে যে 'ইলিশ মাছ কখন স্রোতের অনুকূলে চলে না; সর্ব্বদাই স্রোতের বিপরীত দিকে উজাইয়া চলে। যেসকল নদীর স্রোত প্রবল, সেই সকল নদীর মৎস্য অধিক বড় ও খাইতে সুস্বাদু হইয়া থাকে। মৎস্যের ডিম্বে বট বা ডুমুরের "বীচির" ন্যায় বহুসংখ্যক ডিম্বাণু থাকে। ঐগুলি ফুটিয়া এক একটি মৎস্যে পরিণত হয়। ঘরবোলা অপেক্ষা যাযাবর শ্রেণীর ডিম্বে অধিক সংখ্যক ডিম্বাণু থাকে। স্রোতের জলে অধিক সংখ্যক ডিম্বাণু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া ঐরূপ হওয়া সম্ভব। হনুমান, বাঘ, ভালুক প্রভৃতি জীবের মধ্যে পুরুষেরা সন্তান নাশ করিয়া থাকে। অনেক মাছের মধ্যেও সেইরূপ প্রবৃত্তি দেখা যায়। ডিম্ব প্রসবকালে পুং মৎস্যেরা গর্ভিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে এবং যেমন দুই একটি ডিম্ব প্রসূত হয় অমনি উহারা খাইয়া ফেলে। এইজন্য স্বভাবতঃ মৎস্যীরা প্রসবকালে স্থানান্তরিত হইয়া নদী বা তড়াগাদির এরূপ পার্শ্বদেশে স্থান বাছিয়া লয় যে তথায় সেরূপ স্বল্প কদর্য্য জলে ডিম্ব গ্রাসের জন্য অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন পুং মৎস্যের আগমন সম্ভবে না। এখানে ডিম্ব রাখিয়াই প্রসূতি স্থানান্তরে গমন করে। স্বভাবের ক্রোড়ে থাকিয়া ডিমগুলি রৌদ্র ও বায়ুর তাপে ক্রমে জাতীয় আকার প্রাপ্ত হয়। একদেশবাসী বা ঘরবোলা মৎস্যের মধ্যে আবার দুই দল দেখা যায়—

একপত্নীক ও বহুপত্নীক। শোল, লেঠা, চ্যাঙ প্রভৃতি মৎস্য একপত্নীক। অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে শোলমাছ প্রায় সর্ব্বদাই জোড় বাঁধিয়া চলে, ইহাদের একটি পুংজাতীয় অপরটি স্ত্রীজাতীয়। ডিম্ব প্রসবের পর কিম্বা ডিম্বাণু ফুটিলে মৎস্যদম্পতী উভয়েই স্বীয় সন্তান-দিগকে অন্যান্য হিংস্রজাতীয় মৎস্যের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই উহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। রুই, মিরগাল, কাৎলা, কৈ প্রভৃতি মৎস্য বহুপত্নীক শ্রেণীর অন্তর্গত।

লেঠা ও কৈ জাতীয় মৎস্যের একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। উহারা জল ব্যতীত অনেকদিন অনায়াসে বাঁচিতে পারে। অনেক পুরাতন পুকুরের তলদেশের মৃত্তিকা রৌদ্রের উত্তাপে ফাটিয়া যায় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উহারা ঐ ফাটালের মধ্যে থাকিয়া কেবল যে জীবন ধারণ করে তাহা নহে, সময়ানুযায়ী ডিম্ব পর্য্যন্ত প্রসব করিয়া থাকে। বৎসরের প্রথমে যখন দুই এক পশলা বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয় তখন উহারা ফাটাল হইতে উঠিতে আরম্ভ করে এবং ডিম্বাণু সকল ফুটিতে থাকে। ব্রহ্ম-দেশের অনেক জেলে শুষ্ক পুষ্করিণীতে জল ঢালিয়া সময়ে সময়ে এই জাতীয় অনেক মাছ ধরিয়া থাকে। বর্ষাকালে অনেক সময় জলপূর্ণ নালা বা পুকুর হইতে অনেক কৈ মাছকে ডাঙ্গায় উঠিতে দেখা যায়।

অনেকেই আড়মাছ দেখিয়া থাকিবেন। উহাদের জন্মবৃত্তান্ত বড় কৌতূহলজনক। ডাক্তার ডে এবং টমাস সাহেব একত্রে প্রায় ৫ শত আড়মাছ পরীক্ষা করেন। তাঁহারা বলেন উহারা মুখগহ্বরে ডিম্বাণু রাখিয়া "তা" দিয়া থাকে। স্ত্রীজাতীয় আড়মাছ কোন মৃত্তিকা-গহ্বরে কখন ডিম্ব প্রসব করে না। উহাদের উদরের নিকটস্থ ডানা ঠিক বাটির আকারে গঠিত হইয়া থাকে। মৎস্যীরা ঐ বাটি দুইখানিতে ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বাণু প্রস্ফুটিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ বাটির মধ্যেই থাকে; ফুটিলে পর পুংজাতীয় আড় মৎস্য উহাদিগকে মুখগহ্বরে রাখিয়া "তা" দিতে আরম্ভ করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যতদিন পর্য্যন্ত উহারা অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত না হয় অর্থাৎ যতদিন তা দেওয়া সম্পূর্ণরূপ শেষ না হয় ততদিন পুংমৎস্যেরা কিছুই আহার করে না। জীবের উৎপত্তি ও রক্ষার জন্য ব্রহ্মাণ্ডপতিকে যে কত অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

সামন ও ট্রাউট জাতীয় মৎস্যের ডিম্ব উৎপন্নের বিষয় শুনিলে আরও আশ্চর্য্য হইতে হয়। পুংজাতীয় সংসর্গ ব্যতীত হংসীরা যেমন বাওয়া ডিম প্রসব করিতে পারে, উহারাও সেই রকম অনায়াসে বাওয়া ডিম উৎপন্ন করিয়া থাকে। ডিম্বাণুসমষ্টি যখন পরিপক্ক হয় তখন উহারা মৃত্তিকার মধ্যে এক রকম গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ডিম্বাণু প্রসব করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রসবকালে পুংমৎস্যগুলি তথায় অপেক্ষা করিতে থাকে এবং প্রসবক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেই ইহারা দুগ্ধের ন্যায় এক প্রকার রস পূর্ব্বোক্ত ডিম্বাণুগুলির উপর বমন করিয়া দেয়; এই অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া দ্বারা ডিম্বাণুগুলির নিষেক-ক্রিয়া (fertilisation) সম্পন্ন হয় এবং ডিম্বাণুগুলি ক্রমে সজীব হইয়া উঠে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ রসে অনায়াসে শুক্রবীজ দর্শন করা যাইতে পারে। ডিম্বাণু সকল গর্ত্তে থাকার অবস্থায় কিম্বা প্রসবের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক প্রকার রসদ্বারা পরস্পর দৃঢ়রূপে সংযুক্ত থাকে; যদি কোন রকমে শিথিল হয়, তবে পুংমৎস্যের পরিত্যক্ত রস দ্বারা এতদূর দৃঢ়ীভূত হয় যে মৃত্তিকা বা প্রস্তর হইতে স্রোতের প্রবলবেগে বা অন্য কোন কারণে কখনই উহারা ভাসিয়া যাইতে পারে না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে ডিম্বাণুগুলি এমন কৌশলে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত হইয়া থাকে যে কোন প্রকারেই ইহারা স্থানান্তরিত হইতে পারে না। এই প্রকারের স্ত্রী ও পুরুষ মৎস্য ধরিয়া সম্ভবতঃ পুকুরেও মৎস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

আমাদের দেশীয় রোহিত (রুই), মিরগেল, কাৎলা বাটা প্রভৃতি সুখাদ্য মৎস্য বিল, খাল, পুকুর প্রভৃতি জলা-শয়ে অনায়াসেই জন্মিতে পারে। ইহারা একদেশবাসী। বর্ষাকালে আষাঢ় মাসের প্রথমে কিম্বা অম্বুবাচীর সময়ে বড় বড় নদী হইতে জেলেরা যেসকল ডিম ধরিয়া থাকে উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই সময়েই ডিম্বাণু সংগ্রহ করা উচিত। ডিম্বাণুসকল জলের ফেনার সহিত মিশিয়া ভাসিতে থাকে; কাপড় কিম্বা বিশেষরূপ জাল দ্বারা উহা

ধরিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মৎস্যের ডিম্বাণু চেনা কঠিন। তবে একটি জলপাত্রে সংগৃহীত ডিম্বাণু রাখিয়া একখানি কাপড় দ্বারা উহাকে ঢাকিলে রোহিত, মিরগেল, কাৎলা, বাটা প্রভৃতি সুখাদ্য মৎস্যের ডিম্বাণু অল্প সময়ের মধ্যেই একস্থানে মিলিত হইয়া জমাট বাঁধে, অন্য কোন মৎস্য বা পোকার ডিম কখনই একত্রিত হয় না।

প্রায় সকল পুকুরেই ডিম ফুটিয়া থাকে; তবে যে পুকুরের জল অত্যন্ত পরিষ্কার, মৎস্যের উপযোগী কোন খাদ্য নাই অথবা যাহাতে হিংস্র জাতীয় শোল, শাল, বোয়াল, চিতল প্রভৃতির বাস, সে পুকুরে ডিম ফুটাইবার আশা বৃথা। পুকুরে ডিম ছাড়িবার ৭।৮ দিন পরে ডিম্বাণু সকল ফুটিলে পরে পোনার খাদ্যের জন্য ময়দা, চালের গুঁড়া, ছাতু প্রভৃতি প্রদান করা দরকার। পরে একটু বড় হইলে পোনা অন্যত্র "চালা" (স্থানান্তরিত করা) ভাল। চীনদেশে জেলেরা হাঁস, মুর্গী প্রভৃতির ডিম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যস্থ লালা ও কুসুম বাহির করিয়া লয়। পরে উহার মধ্যে সদ্যঃপ্রসূত আঠাবৎ মৎস্যডিম্ব পূরিয়া ছিদ্রপথ বন্ধ করিয়া দেয় এবং ঐ ডিম হাঁস বা মুর্গীর বাসায় "তা" দিবার জন্য রাখিয়া দেয়। এইরূপে অণ্ড-মধ্যস্থ ডিম্বাণুগুলি কিছুদিন উত্তপ্ত হইলে লোকেরা সেই অণ্ড আনিয়া রৌদ্রতপ্ত জলপাত্রে ভাঙ্গিয়া দেয়। ঐ পাত্রের জলে থাকিয়া ডিম্বাণুগুলি ফাটিয়া ছানা বাহির হয়। উপযুক্ত হইলে উহাদিগকে পুকুর বা অন্য জলাশয়ে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ফ্রান্সিস ডে বলেন পোনা রক্ষার জন্য প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় জলে কয়েক ফোঁটা তরল পার্মাঙ্গানেট অব লাইম দিলে জল মিষ্ট ও অক্সিজেন বর্দ্ধিত হইয়া পোনার বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায় হয়।

আমাদের দেশে মৎস্যের প্রদর্শনী হয় না কিন্তু আমেরিকা ও ইংলণ্ডে উহার মেলা হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিদিগকে ও অন্যান্য দেশের রাজাদিগকে পর্য্যন্ত ইহাতে যোগ দিতে দেখা যায়।

মাছের ব্যবসায় যে বিশেষ লাভজনক ও অল্প মূলধন সাপেক্ষ, মাননীয় টমাস সাহেবের পরীক্ষাফল হইতে তাহা বোঝা যায়। যখন তিনি তাঁহার কোন... বাস করিতেছিলেন তখন বাসার নিকটস্থ একটি পুকুরে প্রায় একসের মাছের পোনা আনাইয়া ছাড়িয়া দেন। উহার প্রকৃত দাম দুই আনা। দেড় বৎসর পরে পুকুরের মাছ ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখেন যে ঐ একসের পোনা হইতে প্রায় ৫০ পঞ্চাশ মণ মাছ এবং পর পর বৎসরে আরও অধিক মৎস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রতি মণ মৎস্যের দাম গড়ে ১০৲ টাকা ধরিলে দুই আনা হইতে দেড় বৎসর পরে ৫০০ পাঁচ শত টাকার মাছ পাওয়া গেল। ইহা অপেক্ষা আর অধিক লাভজনক ব্যবসায় কি হইতে পারে? সামান্য মূলধন লইয়া নিরক্ষর মুসলমান ব্যাপারীরা পাবনা অঞ্চল হইতে বৎসর বৎসর দুই তিন হাজার টাকার শুট্‌কি মাছ চালান দিয়া বিস্তর লাভ করে। আজকাল মাছরক্ষা (preserve) করিবার অনেক রকম উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তপসী (ঋষি বা রামজটা) ও ইলিসমাছ রক্ষা করিয়া বিলাতে চালান দিতে পারিলে বিশেষ লাভ হওয়া সম্ভব। এই দুই জাতীয় মাছ ভারতসমুদ্রে বাস করিয়া থাকে, কেবল অণ্ড প্রসবকালে নির্ম্মল সুমিষ্টসলিলা নদীমধ্যে প্রবেশ করে এবং অভিমত স্থানে ডিম্ব প্রসব করিয়া পূর্ব্বতন বাসভূমি সমুদ্রে প্রত্যাবৃত্ত হয়। উক্ত মৎস্যদ্বয় যখন সমুদ্র ছাড়িয়া নদীর মিষ্ট জলে থাকে তখন সুস্বাদু হয়, অন্যথা লবণজলে থাকার সময় উহাদের স্বাদ থাকে না।

মাছের আঁইস ও কাঁটা প্রভৃতি প্রত্যহ একটা পাত্রে রাখিয়া পচাইলে উহা হইতে উৎকৃষ্ট সার হইতে পারে। একটি অতি ছোট কাঁঠাল গাছের গোড়ায় পচা পুঁঠি মাছের সার দেওয়ায় কাঁঠাল ফলিতে দেখিয়াছি। কিরূপে দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিতে হয় তাহা এখনও আমরা জানি না। কত দিনে যে এসব দিকে লোকের দৃষ্টি পড়িবে তাহা ভগবানই জানেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়।

চিত্রপরিচয়

এবারকার রঙিন ছবিটির আমরা নাম দিয়াছি দিন-মজুরী। দিগন্তবিস্তৃত ধূধূ প্রান্তরে কৃষকেরা হলচালন করিতেছে। একটি কৃষকবধূ তাহার সন্তানটিকে লইয়া মাঠে আসিয়াছে। শিশুটি আনন্দ-আবেগে পিতার গলা জড়াইয়া সোহাগ জানাইতেছে, সে সোহাগে চাষার কর্ম্মক্লান্ত ধূলিধূসর অঙ্গ পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, সে সকল কর্ম্মক্লান্তি ভুলিয়া বাৎসল্যরসের মাধুর্য্যে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সকল কর্ম্মের পশ্চাতে সকল-ক্লান্তিহরা স্নেহধারা বুভুক্ষিত হইয়া অপেক্ষা করে, যে তাহা বুঝিতে পারে তাহার কাছে কর্ম্ম মহিমান্বিত, ক্লান্তি সার্থক ও জীবন ধন্য হইয়া উঠে।

এই চিত্রখানির পারিপ্রেক্ষিক ও আলো ছায়ার সমাবেশ অতি সুন্দর হইয়াছে। ছবিখানি চক্ষু হইতে দূরে আলোকের বিপরীত দিকে ধরিয়া এক পাশ হইতে দেখিলে ইহার সমগ্র সৌন্দর্য্য দর্শকের কল্পনায় ফুটিয়া উঠে।

স্তন্যপীযূষদায়িনী চিত্রখানির বিষয় সহজবোধ্য। মাতা শিশুকে স্তন্য দান করিতেছেন। মাতার মুখে বাৎসল্য করুণার ভাব শিল্পী প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তবে মূর্ত্তিকল্পনা কিঞ্চিৎ স্থূল ও শিশুটি একটু আড়ষ্ট হইয়াছে। শিল্পী শিক্ষার্থীমাত্র। এই প্রথম রচনা তাঁহার ভবিষ্যত সফলতার সূচনা স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করিতেছে।

স্বাভাবিক ও কৃত্রিমগুহা প্রবন্ধে এবার অনেকগুলি সমগ্র পৃষ্ঠাব্যাপী ও কতকগুলি ছোট ছোট চিত্র দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি গুহার দৃশ্য এবং কতকগুলি বা গুহাপ্রাচীরে উৎকীর্ণ প্রতিমূর্ত্তি বা চিত্রিত আলেখ্যের নমুনা। অজন্তাগুহার চিত্রগুলিতে একটি চমৎকার কমনীয় কলাসঙ্গত ভঙ্গী দেখা যায়। হস্তীগুহার উৎকীর্ণ মূর্ত্তিগুলি গম্ভীর রমণীয়। গুহাগুলির স্থাপত্য কারুকার্য্যও দর্শনীয় ও বিশেষ চমৎকার; দ্বারপ্রান্তে কারুকার্য্য, স্তম্ভগুলির গঠনপারিপাট্য, ছাদের রচনারীতি, খিলানের সৌন্দর্য্য, মূর্ত্তিগুলির বৃহত্ত্ব ও গম্ভীর সুন্দর ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার সামগ্রী। এই চিত্রগুলি প্রাচীন ভারতের শিল্পচাতুর্য্যের একশেষ নিদর্শন।

আলোচনা

——:০:——

বরাহমিহির

(আলোচনার উত্তর)

বিগত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে আমি "বরাহমিহির" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। রাজসাহীর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয় কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। রায় মহাশয় স্পষ্টই লিখিয়াছেন: "বরাহমিহিরের সময় লইয়া বড়ই গোলযোগ দেখা যায়। সুতরাং এ বিষয়ে যত আলোচনা হয়, ততই সুবিধা।" তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি তাঁহার মতে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা ভাল, বরাহমিহির ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ সুতরাং তিনি ভারতীয় প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক জ্যোতিঃ শাস্ত্রীয় গ্রন্থনিচয় প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থোক্ত মতের আলোচনা করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে স্বদেশীয় মতেরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

রায় মহাশয় লিখিয়াছেন;— "আমরা বৃহৎসংহিতার যে সংস্করণ এখন দেখিতেছি, তাহা ২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত" কিন্তু এই সুনিশ্চিত সময় কি করিয়া পাইলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাঁহার প্রমাণ এই যে, যে সময়ে বৃহৎসংহিতা রচিত হয়, তখন কর্কটের আদিতে দক্ষিণায়ন হইত। কিন্তু কর্কটের আদিতে দক্ষিণায়ন কোন বিশেষ অব্দে হয় নাই। ২৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কর্কটের আদিতে দক্ষিণায়ন হইত। অতএব ইহা হইতে বৃহৎসংহিতা যে ২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল তাহা কি করিয়া প্রমাণ হয়? এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে বৃহৎসংহিতা ৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত, উক্ত সময়ের পরে রচিত হইতে পারে না।

রায় মহাশয় বলেন,- পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় লিখিত আছে;—"সংপ্রতি পুনর্ব্বসুতে দক্ষিণায়ন হইতেছে।" এ কথার অর্থ এই যে বরাহমিহির ২৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। কেননা পুনর্ব্বসুতে দক্ষিণায়ন ২৭৬-১১৬৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত হইত। তাহা হইলে পঞ্চসিদ্ধান্তিকাকার ৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, একথা অসম্ভব নহে। এতদ্ব্যতীত পঞ্চসিদ্ধান্তিকার প্রথম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোক হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে, তিনি ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন (১)। অতএব বৃহৎসংহিতাকার এবং পঞ্চসিদ্ধান্তিকাকার যে অভিন্ন ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। ঐ দুইখানি গ্রন্থের ভাষা পদবিন্যাসরীতি এবং ছন্দাদি সমস্তই এক প্রকারের, অতএব উভয় গ্রন্থের প্রণেতা যে একব্যক্তি তাহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

রায় মহাশয় আরও বলেন;—"বৃহৎসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত 'প্রথম মুনি, শব্দের অর্থ বরাহমিহির এবং তিনি ৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন"। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ঐ শ্লোক পাঠে অবগত হওয়া যায়, বরাহমিহির তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সুপ্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ গ্রন্থকারের নিকট ঋণ স্বীকার

---

(১) সপ্তাশ্বিবেদ সংখ্যংশককালমপাস্য চৈত্রশুক্লাদৌ।
অর্দ্ধাস্তমিতে ভানৌ যবনপুরে সৌম্যদিবসাদ্যে ॥৮॥
(পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক)

করিতেছেন মাত্র, তদ্ভিন্ন তাঁহাকে বরাহমিহির বলেন নাই (১)। বরাহমিহির যে সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ অবলোকন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামও যে বরাহমিহির হইবে তাহার প্রমাণ কি ?

রায় মহাশয় বিশ্বকোষের উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে বরাহমিহির সংক্রান্ত কতকগুলি ভিন্ন মত মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন "আমাদের জ্যোতিষী" নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা আমরা দেখি নাই এবং ঐ পুস্তক প্রাচীন শ্রেণীর পণ্ডিত সমাজে আলোচিত হয় না।

নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আলোচনার উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। আমাদের বক্তব্য আমরা এখানেই শেষ করিলাম।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা—দ্বিতীয় সংস্করণ। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত। ২১১ নং কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত। মুদ্রণ ও কাপড়ে বাঁধাই অতি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থখানা কোথায় পাওয়া যাইবে তাহা লেখা নাই। সুতরাং পাঠকগণ পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া সে সমস্যা পূরণ করিবেন। মূল্য এক টাকা মাত্র। গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ ২১০।৩।২, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ দর্শন-জগতে সুপরিচিত। কেবল এ দেশে নহে বিদেশেও তাঁহার পাণ্ডিত্য আদৃত হইতেছে। প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ তিনি অক্লান্তভাবে জ্ঞান বিতরণ কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। এই সময় মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারের জন্য তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে এত দীর্ঘকালের মধ্যেও তাঁহার মূল মতের কোনও পরিবর্তন হয় নাই। যাঁহারা চিন্তা-জগতের সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলেন তাঁহাদের মতের পরিবর্দ্ধন ও ক্রমবিকাশ অবশ্যম্ভাবী, আমূল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী নহে। কেন না, প্রথম হইতেই সত্যের সন্দর্শন লাভ করিলে এই বিপদের সম্ভাবনা নাই। তত্ত্বভূষণ মহাশয় সত্যদর্শী, তাই তাঁহার দার্শনিক মতের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী বিকাশ দৃষ্ট হইলেও এত দীর্ঘকাল পরেও তিনি বলিতে সমর্থ যে "তাঁহার মূল দার্শনিক মত অপরিবর্তিত রহিয়াছে।" ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে।

প্রায় বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যখন "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" প্রথম প্রকাশিত হয় তখন আমি ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু তখনই আমি এই ব্রাহ্মজিজ্ঞাসার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দর্শনালোচনায় প্রবৃত্ত হই। আমি আমার ধর্ম্মমত গঠনে "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার" কাছে বিশেষভাবে ঋণী। এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সম্মুখে করিয়া কত অনিদ্র রজনীর অধিকাংশ সময় কাটিয়া গিয়াছে। আবার তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষাদাতা গুরুও সর্ব্বদা মিলে না। যাক্ সে কথা। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে ঠিকই বলিয়াছেন, "এই সময়ের মধ্যে দেশে ধর্ম্মালোচনার সম্বন্ধে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির সংখ্যা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে"। কেবল যে ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে, বুঝিবার শক্তিও বাড়িয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রথম প্রচারে লোকের মনে যে একটা বিস্ময়ের ভাব আসিয়াছিল, এখন আর তাহার স্থান নাই। এখন আর কেহ হাস্যচ্ছলেও বলিবে না, "ওহে, আমরা ভাত খাইতেছি না, ভাব (ideas) খাইতেছি"। অধ্যাত্মবাদ (Idealism) এখন মানুষের মনের উপর আপনার আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মানুষ যতক্ষণ চিন্তাবিহীন হইয়া বাস করে ততক্ষণ এই অধ্যাত্মবাদের প্রভাব বুঝিতে পারে না, সহজ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই জগতে বিচরণ করে, জগৎকে গ্রহণ করে, কিন্তু একটু চিন্তার সহিত জগৎতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলেই এই সহজ বুদ্ধির ভ্রান্তি সহজেই ধরা পড়ে। কলেজের ছাত্র মনোবিজ্ঞানের (Psychology'র) প্রথম অধ্যায়ের পাতা উল্টাইয়াই ভাবিতে থাকে, "আমি জগতে না জগৎ আমাতে"? সহজ বুদ্ধি যেখান হইতে দেখে, চিন্তাশীলতা সেখান হইতে দেখে না। উভয়ের standpoint স্বতন্ত্র। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পাঠক "আত্মজ্ঞান ও বিষয় জ্ঞান" অধ্যায়টি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন, যে অধ্যাত্মবাদের ভিত্তি শক্ত জমির উপর পতিষ্ঠিত। "আমির" অস্তিত্ব যিনি স্বীকার করেন তাঁহার পক্ষে অধ্যাত্মবাদ বিস্ময়ের বিষয় থাকিতে পারে না। যিনি "আমি" বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে সমর্থ তাঁহার পক্ষে ভাত খাওয়া আর ভাব খাওয়া একই কথা। এই অধ্যায়টি সমস্ত গ্রন্থের ভিত্তি। যিনি এই অধ্যায়টি আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হইবেন তাঁহার পক্ষে সমস্তটাই অবোধ্য থাকিয়া যাইবে। আমরা যাহাকে জড় বলি তাহার যে আত্মাতিরিক্ত সত্তা নাই সে কথা বুঝিবার পক্ষে এই অধ্যায়টি চাবি স্বরূপ।

এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তত্ত্বভূষণের দার্শনিক মত এত দিন পাঠকবর্গ নানা গ্রন্থের সাহায্যে অবগত হইয়াছেন। আমরা গত আশ্বিনমাসের প্রবাসীতে গ্রন্থকারের Philosophy of Brahmaism-এর সমালোচনায় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি। মূল মত একই। সুতরাং তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না তাঁহাদের আক্ষেপ করিবার কিছুই থাকিবে না যদি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তাঁহারা পাঠ করেন। এমন কি অনেক স্থলে Philosophy of Brahmaism অপেক্ষা ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে কোন কোন বিষয়ের বিস্তৃততর মীমাংসা আছে। সুতরাং যাঁহারা উক্ত ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

অনেকে অধ্যাত্মবাদের নামে ভীত হন, তাহার কারণ এই, তাঁহাদের একটা ভুল বিশ্বাস আছে, যে উক্ত মতে জীব চৈতন্যের অস্তিত্ব থাকে না। অধ্যাত্মবাদের এমন ব্যাখ্যা নাই তাহা নহে, কিন্তু তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার সকল গ্রন্থেই ঐ মতের প্রতিবাদ করিয়া জীবচৈতন্যের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে জীবের অস্তিত্ব ভ্রান্তিপ্রসূত নহে, উহা ব্যবহারিক নহে, কিন্তু পারমার্থিক সত্য। "আমি যে ভ্রম বশতঃ আমার জ্ঞানকে সসীম মনে করিতেছি তাহা নহে; ইহার সসীমত্ব প্রকৃত অনতিক্রমণীয় বিষয়। আমার জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানের সহিত এক ইহা জানিয়াও, ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াও আমাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে আমার জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানের আংশিক প্রকাশ মাত্র।" "সুতরাং সৃষ্টিরহস্য ভেদ করিতে না পারিয়াও, অসীমের ভিতরে সসীম কিরূপে ভেদাভেদ ভাবে বর্তমান তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে না পারিয়াও আমরা এই নিঃসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে জীবের অস্তিত্ব ব্যবহারিক নহে, অবিদ্যা-কল্পিত নহে, ইহা পারমার্থিক"। আশা করি বাঙ্গলাভাষাভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেরই নিকট এ গ্রন্থ আদৃত হইবে।

তর্কবিশারদ—শ্রী[illegible]

---

(১) প্রথম মুনিকথিত মবিতথমবলোক্য গ্রন্থবিস্তরস্যার্থম্।
নাতিলঘু বিপুলরচনাভিরুদ্যতঃ স্পষ্টমভিধাতুম্।

ছাপা কাগজ ও বাইণ্ডিং উত্তম। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করা দুরূহ। অন্যের ভাব আমরা ভাষার সাহায্যে আয়ত্ত করি। ভাষার দরজা দিয়া ভাবের ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। ভাষা আয়ত্ত না থাকিলে ভাব আয়ত্ত করা যায় না। গ্রন্থখানি এই বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গ্রন্থ বলিয়া গ্রন্থকারকে ভাষা প্রস্তুত করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। সুতরাং তজ্জনিত অসুবিধা গ্রন্থকার ও পাঠক উভয়কেই ভোগ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য করিতে না পারিলে বাঙ্গালা দেশে অন্ততঃ এই বাঙ্গালা পুস্তকের পাঠক মিলিবে কি না সন্দেহ। গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তককে সহজবোধ্য করিতে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু সহজবোধ্য হওয়া অসম্ভব। ইংরাজী Logic-এর তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। দুর্ভাগ্য বশতঃ গ্রন্থকার যেখানে কেবল বাঙ্গালা বলেন সেখানে সাধারণ পাঠকের বুঝা দুঃসাধ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী বলিয়া দিলে বেশ বুঝা যায়। গ্রন্থকার যখন বলেন "ব্যাপার, পূর্ব্বভাবী, অনুভাবী" তখন কিছুই বুঝি না। কিন্তু যখন বলিয়া দেন যে উহারা অবোধ্য কিছুই নহে—আমাদের চিরপরিচিত "Phenomenon, Antecedent, Consequent" তখন আর বুঝিতে কষ্ট হয় না। এ বিড়ম্বনা কিছু দিন ভোগ করিতেই হইবে। এ বিড়ম্বনা দ্বিকল্পন্যায়ের (dilemma) উপর প্রতিষ্ঠিত। যিনি ইংরাজী জানেন, তাঁহার এ গ্রন্থের প্রয়োজন হইবে না, যিনি জানেন না, যদিও গ্রন্থ তাঁহারই জন্য লিখিত, তাঁহার বোধগম্য হইবে না।

আরাধিতো যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্॥

যাহা হউক, এতো গেল গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া তাহার অপরিহার্য্য ত্রুটীর কথা। কিন্তু তাহাতে নিরুৎসাহ হইবার কোনই কারণ নাই। ইংরাজীতে যখন গ্রীক্ লজিক্ প্রথম প্রকাশিত হয় তখন কি তাহার দশাও এইরূপই ছিল না? বরং গ্রন্থকার যে গুরুতর রাজকার্য্য করিয়াও এমন নিঃস্বার্থভাবে বঙ্গভাষাকে একটী অলঙ্কার পরাইয়া দিয়াছেন, সে জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বেরি-বেরি (Beri-Beri); হোমিওপ্যাথিক আয়ুর্ব্বিজ্ঞান-বিহিত বেরি-বেরি পীড়ার তত্ত্ব নিরূপণ ও চিকিৎসা বিধান। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ২৪০ পৃষ্ঠা; মূল্য ১।০; (প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

গ্রন্থের বিষয়ঃ—১। সংজ্ঞা, ২। শ্রেণী বিভাগ, ৩। প্রকৃতি, ৪। ব্যাপ্তি, ৫। শীতাতপ ও জলবায়ুর প্রভাব, ৬। নামের উৎপত্তি, ৭। ইতিহাস, ৮। ভৌগোলিক অবস্থিতি বিভাগ, ৯। নিদান, ১০। রোগের প্রচ্ছন্নাবস্থা, ১১। লক্ষণ, ১২। রোগীর অতীত ইতিহাস, ১৩। রোগের গতি, ১৪। রোগনির্ণয়, ১৫। বিকৃত শারীর তত্ত্ব, ১৬। মৃত্যু, ১৭। ভাবি-ফলনির্ণয়, ১৮। মৃত্যু-সংখ্যা, ১৯। জনপদব্যাপী শোথ, ২০। বেরি-বেরি ও শোথরোগের পার্থক্য নির্ণয়, ২১। সতর্কতা, ২৩। হোমিওপ্যাথি-আয়ুর্ব্বিজ্ঞানানুসারে চিকিৎসা-ব্যবস্থা, ২৪। হোমিওপ্যাথি-আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের মূল সূত্র, ২৫। হোমিওপ্যাথি-আয়ুর্ব্বিজ্ঞান অনুসারে ঔষধ-ব্যবস্থা, ২৬। পথ্য, ২৭। কতিপয় বেরি-বেরি রোগীর চিকিৎসা-বিবরণ।

এই গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সাধারণ চিকিৎসক ও পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া অনেক নূতন তত্ত্ব অবগত হইবেন।

গ্রন্থের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর হইয়াছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

সাবিত্রী শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিবৃত। নূতন সংস্করণ বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ সমালোচনা কালে আমরা এই গ্রন্থের প্রশংসাই করিয়াছিলাম এবং সেই প্রসঙ্গে যে সকল ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহা এই সংস্করণে সংশোধিত হইয়াছে দেখিতেছি। এবং গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন—"জননীগণকে সাবিত্রী চরিত্র আদর্শ করিতে বলায় কোন সমালোচক বলিয়াছিলেন যে, সাবিত্রী স্ত্রীর আদর্শ মাতার আদর্শ নহে; সুতরাং তাদৃশ অনুরোধ অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন স্ত্রীই এককালে সন্তানের জননী হন; ইত্যাদি"। কিন্তু ইহা কি ঠিক জবাব হইল—পত্নী ও জননী একই মানুষের দুটি দিক, এবং দুই দিকের আদর্শ বিভিন্ন, একই আদর্শ দুই দিকেকেই পরিচালিত করিতে কখনই পারে না। ইহা গ্রন্থকারই ভাবিয়া দেখিবেন।

গৃহধর্ম্ম—শ্রীবিদ্যাবতী আরিয়ার সরস্বতী সম্পাদিত। দ্বাবিংশ জাতীয় মহাসমিতি উপলক্ষে মহিলা সমিতির বিশিষ্ট অধিবেশনে পঠিত। দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। মূল্য আট আনা। এই গ্রন্থে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, তাহার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও পালনবিধি, মাতার দিক হইতে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে সন্তান পালন, শিশুশিক্ষা ও শিশু চিকিৎসা বিষয়ক অনেক কথা বেশ সোজা বাংলায় লিখিত হইয়াছে। মাতা ও বধূদিগকে উপহার দিবার যোগ্য; তাঁহারা পাঠ করিলে ও এই সকল উপদেশের কিয়দংশও পালন করিলে গৃহস্থের কল্যাণ হইবে।

মুদ্রা-রাক্ষস।

একটী প্রার্থনা

বিগত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে আমার "সন্দীপের পুন্নাল বৃক্ষ ও পুন্নাল তৈল" শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখিয়া অনেকেই আমার বন্ধু মৌলভী এস, এম, সেকান্দর হোসেন সাহেবকে পুন্নাল-বীজ পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন বীজ না থাকায় তিনি তখন বীজ পাঠাইতে পারেন নাই। সম্প্রতি নূতন বীজ বাহির হইয়াছে এবং তিনিও সকলকে বীজ পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। বীজের কোন দাম লাগিবেনা; শুধু ডাকমাশুলটাই লাগিবে। এইরূপ অবস্থায় ভি, পি, ফেরৎ দিয়া কেহ যেন এই ভদ্রলোককে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত না করেন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। ইতিমধ্যে যাঁহারা ঠিকানা পরিবর্তন করিয়াছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের নূতন ঠিকানা উপর্য্যুক্ত মৌলভী সাহেবকে অতি সত্বর জানাইবেন। যদি কাহারো ষ্টীমার যোগে গ্রহণ করিবার সুবিধা থাকে তাহা হইলে আষাঢ় মাসে পুন্নালের উত্তম চারা পাঠান যাইতে পারে। 'প্রবাসী' হইতে আমার প্রবন্ধটি যে যে কাগজের সম্পাদক মহোদয়গণ আপনাদের কাগজে উঠাইয়াছিলেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কয়টি পংক্তিও ছাপিবেন।

মোজাফফর আহ্মদ।
সন্দীপ, নোয়াখালি।

২০।০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কান্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
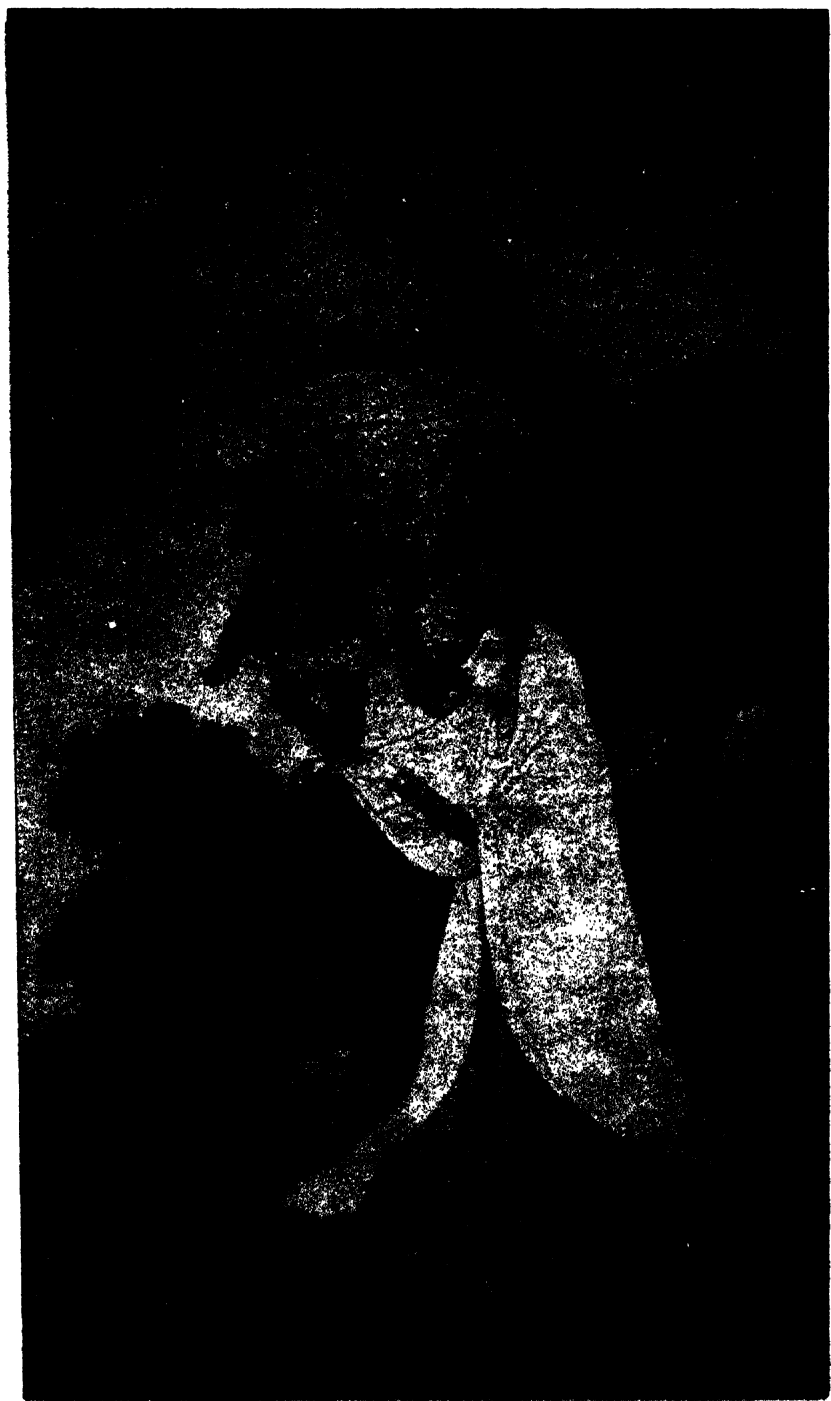
গণেশ-জননী।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে তাঁহার অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত

...our Blocks by U. Ray & Sons. KUNTALINE PRESS, ...

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

১০ম ভাগ
২য় খণ্ড | চৈত্র, ১৩১৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আত্মা ও অনাত্মা

১। শঙ্করাচার্য্যের মত।

ব্রহ্ম, আত্মা এবং অবিদ্যা বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য কি প্রকার মত পোষণ করিতেন তাহা পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।* আত্মা ও অনাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি কি বলিয়াছেন, অদ্য তাহাই বিবৃত হইবে।

(১)

বেদান্তভাষ্যের প্রারম্ভেই শঙ্করাচার্য্য আত্মা এবং অনাত্মা বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন —

"যাহা 'যুষ্মৎ'-জ্ঞানের গোচর তাহাকে 'বিষয়' এবং যাহা 'অস্মৎ'-প্রত্যয়ের গোচর তাহাকে 'বিষয়ী' বলা হয়। (অর্থাৎ আত্মা বিষয়ী এবং অনাত্মা বিষয়। অস্মৎ, অহম্, আমি, আত্মা, বিষয়ী, Ego, Subject ইত্যাদি কথা সমানার্থ বোধক এবং যুষ্মৎ, ইদম্, তুমি, ইহা, তাহা অনাত্মা, বিষয়, Non-Ego, Object ইত্যাদিও সমপর্য্যায়ের কথা।) ইহা প্রসিদ্ধ যে অন্ধকার ও আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব, বিষয় এবং বিষয়ীও তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব। ইহাদিগের মধ্যে এক অপরের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না এবং এতদুভয়ের ধর্ম্মও পরস্পর পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। (অর্থাৎ আত্মা অনাত্মা হইতে পারে না, আবার অনাত্মাও কখন আত্মা হইতে পারে না। তেমনি আত্মার গুণ অনাত্মাতে এবং অনাত্মার গুণও কখন আত্মাতে সংক্রামিত হইতে পারে না।) সুতরাং 'অস্মৎ'-প্রত্যয়-গোচর আত্মারূপী বিষয়ীতে যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয়ের আরোপ করা কিম্বা বিষয়ের ধর্ম্ম আরোপ করা ভ্রমাত্মক এবং ইহার বিপরীত ক্রমে বিষয়ে বিষয়ীর ধর্ম্ম অধ্যাস করাও অসত্য। অর্থাৎ আত্মাতে অনাত্মার অধ্যাস এবং অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস অসত্যমূলক।

"অথচ লোকে স্বভাবতঃ বলিয়া থাকে 'ইহাই আমি', 'ইহা আমার'। ('ইহাই আমি' এপ্রকার বলিলে অনাত্মাকে আত্মা বলা হয়; 'ইহা আমার' এ প্রকার বলিলে আত্মাতে অনাত্মার ধর্ম্ম অধ্যাস করা হয়।) লোকে যে এই প্রকার বলে ইহার কারণ অবিবেকতা। এই অবিবেকের জন্য আত্মা ও অনাত্মার ধর্ম্ম বিষয়ে লোকের মিথ্যা জ্ঞান হইয়া থাকে। এই জন্যই সত্য ও মিথ্যা জড়ীভূত হয়। এই অবিবেক বশতঃই আত্মাকে অনাত্মারূপে এবং অনাত্মাকে আত্মারূপে গ্রহণ করা হয় এবং আত্মার ধর্ম্ম অনাত্মাতে এবং অনাত্মার ধর্ম্ম আত্মাতে অধ্যাস করা হয়।

"এই যে অধ্যাস, ইহা কি? ইহার উত্তর এই ইহা এক প্রকার অবভাস; পূর্ব্বে অন্যত্র যাহা দৃষ্ট হইয়াছিল স্মৃতিতে তাহার মিথ্যা জ্ঞান হইলেই অধ্যাস হয়।

"কেহ কেহ বলেন যদি এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ধর্ম্ম আরোপ করা হয় তাহা হইলে সেই আরোপকে অধ্যাস বলা হয়। আর কেহ কেহ বলেন যাহাতে যাহার অধ্যাস, তাহার সহিত তাহার পার্থক্যবোধ না হইলে মিথ্যাজ্ঞান হয়; এই ভ্রমকে অধ্যাস কহে। কাহারও কাহারও মতে যাহাতে যাহার অধ্যাস তাহাতে তাহার বিপরীত ধর্ম্মের কল্পনা হইতে পারে; এই বিপরীত কল্পনার নাম অধ্যাস। দেখা যাইতেছে যে এই সমুদয় লক্ষণের মধ্যে প্রত্যেক লক্ষণেই বলা হইতেছে যে 'এক বস্তুতে অন্য ধর্ম্মের অবভাসের নাম অধ্যাস'। লোকেও বলিয়া থাকে শুক্তিকা রজতবৎ অবভাসিত হইতেছে; একচন্দ্র দুই চন্দ্রের মত প্রতীয়মান হইতেছে। এই প্রকার লক্ষণযুক্ত অধ্যাসকে পণ্ডিতগণ 'অবিদ্যা' বলিয়া থাকেন এবং বিচার দ্বারা বস্তুর স্বরূপ অবগত হওয়ার নাম 'বিদ্যা'।

"ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে যাহাতে যাহার অধ্যাস, তাহাতে তাহার দোষ বা গুণ অণুমাত্রও স্পৃষ্ট হয় না।

এই অবিদ্যার জন্যই—আত্মানাত্মার এই পরস্পর অধ্যাস বশতঃই প্রমাণ ও প্রমেয় ব্যবহার, লৌকিক ও বৈদিক কার্য্য এবং বিধি, নিষেধ ও মোক্ষমূলক শাস্ত্র ইত্যাদি সমুদয়ের উৎপত্তি।

"প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও শাস্ত্রসমূহ যে সমুদয় বিষয়ের বিচার করেন, সে সমুদয়কে কেন অবিদ্যামূলক বলা হইল? ইহার উত্তর এই 'দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিই আমি কিম্বা 'এসমুদয় আমারই' এই প্রকার ভাব না হইলে কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না আর যেখানে কর্ত্তৃত্ব নাই সেখানে প্রমাণাদিরও প্রবৃত্তি হইতে পারেনা। ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য না থাকিলে

* 'ভারতীয় ব্রহ্মবাদ' প্রবাসী ৮ম ভাগ চতুর্থ সংখ্যায়; 'আত্মা ও ব্রহ্ম' ৯ম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায়; 'অবিদ্যা' ৯ম ভাগ ষষ্ঠ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

হয়েন না? কারণ আত্মা এ সমুদয়ের বাহ্য অর্থাৎ বহিঃস্থ। রজ্জু প্রভৃতির ন্যায় আত্মা বিপরীত অধ্যাসের বাহিরে।" কঠঃ. ভাঃ., ৩।১১।

২। বিরোধী মত।

শঙ্করের মতে অবিদ্যা ও জগৎ অবস্তু—ইহারা অস্তিত্ব-বিহীন। 'সৎ' ও 'অসৎ'—এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না—সুতরাং অবিদ্যা ও অবিদ্যাত্মক জগতের সহিত ব্রহ্মের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই।

এখন প্রশ্ন, শঙ্করের পক্ষে অন্য কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করিবার উপায় ছিল কি না। আমাদিগের বিশ্বাস, ছিল না। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম' যাঁহার দর্শনের ভিত্তি, যিনি সুষুপ্তিকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া মনে করেন, যাঁহার মতে ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় নিরবয়ব ও ভেদরহিত তাঁহার পক্ষে অন্য কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। এখন দেখা যাউক শঙ্কর নিজ দর্শন দ্বারা অপরাপর মতামতকে কি প্রকারে নিরাস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

৩। অবিদ্যা পৃথক বস্তু হইতে পারে কি না।

ব্রহ্ম একমাত্র অদ্বিতীয় সত্তা, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে পৃথক সত্তা থাকিতে পারে না। এইজন্য অবিদ্যা এবং অবিদ্যাত্মক জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্ম 'অনন্তম' সুতরাং অবিদ্যানামক কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তিনি আর অনন্ত রহিলেন না। দুইটী বস্তু যদি বর্তমান থাকে তাহা হইলে কোনটিই অনন্ত হইতে পারে না।

৪। অবিদ্যা ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে পারে না।

ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং অজ্ঞানতা (অর্থাৎ অবিদ্যা) তাঁহার স্বরূপ হইতে পারে না। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা দগ্ধ হয় (বেঃ. ভাঃ., ১।৪।৩), সুতরাং বিদ্যা যাঁহার স্বরূপ তিনি কখন অবিদ্যাস্বরূপ হইতে পারেন না। কেহ কেহ মনে করেন 'ব্রহ্ম শক্তিস্বরূপ'। কিন্তু 'শক্তি' শব্দের অর্থ কি তাহা জানিলেই বুঝা যাইবে যে এ মতটী নিতান্তই ভ্রমাত্মক। শঙ্করের মতে শক্তি বা মায়াশক্তি, অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, মোহ, অবিবেক, মিথ্যাজ্ঞান, অধ্যাস ইত্যাদি সম পর্য্যায়ের কথা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শক্তিকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলাও যাহা, অবিদ্যা, অবিবেক, ভ্রমাদিকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলাও ঠিক তাহাই। অন্য দিক হইতে বিচার করা যাউক। ক্রিয়াশীলতাই শক্তির প্রকৃতি, যেখানে শক্তি সেইখানেই কার্য্য, সুতরাং ব্রহ্মকে শক্তিস্বরূপ বলিলে তাঁহাকে পরিবর্ত্তনশীল ও বিকারী বলা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মকে শক্তিস্বরূপ বলা যাইতে পারে না।

৫। অবিদ্যা ব্রহ্মের বিকার নহে।

বিকার দুই প্রকার হইতে পারে—আংশিক ও পূর্ণ। ব্রহ্ম নিরবয়ব সুতরাং তাঁহার অংশ নাই। যাঁহার অংশই নাই, তাঁহার আংশিক বিকারও সম্ভব হইতে পারে না। আর এই জগৎ পাপ তাপ জরা মরণাদি অশেষ দোষযুক্ত। এখন যদি এই অবিদ্যাত্মক জগৎকে ব্রহ্মের আংশিক বিকার বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এই অংশগত দোষ বশতঃ পরমাত্মাকেও দোষী সাব্যস্ত করিতে হয়। এ কারণেও ব্রহ্মের আংশিক বিকার স্বীকার করা যাইতে পারে না।

দুগ্ধ যেমন সর্ব্বতোভাবে পরিণত হইয়া দধির আকার ধারণ করে ব্রহ্মও তেমনি সর্ব্বতোভাবে পরিণত হইয়া জগদাকার ধারণ করিয়াছেন ইহাও কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। এ মত সমুদয় শ্রুতি ও স্মৃতিবিরোধী (ক্ষীরবৎ সর্ব্বপরিণামে পক্ষে সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতি কোপঃ—বৃহঃ. ভাঃ., ২।১।২০), কারণ ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অজর, অমর ইত্যাদি।

আর যদি ব্রহ্মের পূর্ণ বিকার স্বীকার কর তাহা হইলে বিকারী জগৎকেই ব্রহ্মের আসনে বসান হয়।

৬। জগৎ কি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নির্গত হইয়াছে?

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নি হইতে নির্গত হইয়া পৃথকরূপে অবস্থান করে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে তেমনি নির্গত হইয়া পৃথকরূপে রহিয়াছে ইহাও স্বীকার করা যায় না।

প্রথমতঃ—যাহার অংশ আছে তাহা হইতেই অংশ-বিশেষ নির্গত হইতে পারে—কিন্তু ব্রহ্ম 'নিরংশ' (তৈঃ. উঃ. ভাঃ., ২।১)।

দ্বিতীয়তঃ—যদি স্বীকার করা যায় যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে নির্গত হইয়াছে তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয়

যে পাপ-তাপাদিও ব্রহ্ম হইতে নির্গত হইয়াছে অর্থাৎ পাপ-তাপও ব্রহ্মের অঙ্গ।

তৃতীয়তঃ—এরূপ স্বীকার করিলে আরও একটী দোষ হয়। ব্রহ্মের যে-স্থল হইতে এ জগৎ ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, সে-স্থলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মের একটী ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা শ্রুতিবিরোধী, কারণ শ্রুত্যনুসারে ব্রহ্ম অব্রণ (অব্রণত্ব বাক্যবিরোধঃ—বৃঃ. ভাঃ., ২।১।২০)।

৭। দ্বৈতাদ্বৈতবাদও সত্য নহে

কেহ কেহ বলেন এ জগৎকে ব্রহ্ম না বলিতে পার; ব্রহ্ম হইতে জগৎ পৃথক ইহা স্বীকার না করিতে পার; কিন্তু ইহাকে ব্রহ্মের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করিতে দোষ কি? ব্রহ্মের সজাতীয় বা বিজাতীয় কোন দ্বিতীয় বস্তু নাই ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য; কিন্তু ব্রহ্মে স্বগত ভেদ থাকিতে পারে।

এই যে বিচিত্রতাপূর্ণ জগৎ দেখিতেছি কে ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারে? চক্ষু দ্বারা এই বিচিত্র জগৎ দেখিতেছি, কর্ণ দ্বারা এই বিচিত্র জগৎ শ্রবণ করিতেছি, নাসিকা দ্বারা এই বিচিত্র জগৎ আঘ্রাণ করিতেছি, জিহ্বা দ্বারা এই বিচিত্র জগৎ আস্বাদন করিতেছি এবং ত্বক দ্বারা এই বিচিত্র জগৎ স্পর্শ করিতেছি; আবার রূপ রসাদি ভেদেই যে এ জগৎ বিচিত্র তাহা নহে, রূপ রসাদির প্রত্যেকটীর মধ্যেই আবার বিচিত্রতা রহিয়াছে। এ সমুদয় প্রত্যেক লোকেরই প্রত্যক্ষ। চক্ষুকর্ণাদিই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়; যদি চক্ষুকর্ণের সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে কর তাহা হইলে কোন প্রকার জ্ঞানলাভই সম্ভবপর নহে, এপ্রকার অবিশ্বাসের পরিণাম অজ্ঞেয়তাবাদ এবং সন্দেহবাদ। সেইজন্যই বলি এই বিচিত্র জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। আর ব্রহ্ম ছাড়া যখন দ্বিতীয় বস্তুই নাই, তখন বলিতেই হইতেছে যে এজগৎ ব্রহ্মের অঙ্গীভূত। এই বিচিত্র জগৎ যখন ব্রহ্মের অঙ্গীভূত তখন ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রহ্মও বিচিত্রতাপূর্ণ এবং ব্রহ্মেও স্বগত ভেদ রহিয়াছে। আর যে একত্ব ও বহুত্ব একাধারে সম্মিলিত হইতে পারে তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। (১) একটী গরুর বিষয় চিন্তা কর। গরু একটী পদার্থ—দুই বা বহু পদার্থ নহে। ইহা একটী বস্তু হইলেও ইহার অবয়বে নানাত্ব রহিয়াছে। সাস্না, শৃঙ্গ, লাঙ্গুলাদি লইয়াই গরু। এখানে একটী বস্তুর মধ্যেই নানা বস্তুর সমাবেশ দেখিতেছি। এখানে যেমন একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে ব্রহ্মেও তেমনি একত্ব ও বহুত্ব সম্মিলিত হইতে পারে। (২) বৃক্ষের দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। লোকের চক্ষে বৃক্ষ একটী বস্তুই। কিন্তু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে, ইহার অবয়বের মধ্যে ভিন্নতা রহিয়াছে। কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফলাদি একজাতীয় বস্তু নহে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হইলেও ইহাদিগের সম্মিলনে বৃক্ষ নামক একটী বস্তু গঠিত হইয়াছে। বৃক্ষ বৃক্ষরূপে এক, কিন্তু শাখাদি ভেদে বৃক্ষে নানাত্বও রহিয়াছে; তেমনি ব্রহ্ম ব্রহ্মরূপে এক কিন্তু জগতাদি ভেদে ব্রহ্মে বহুত্বও বর্ত্তমান। (৩) সমুদ্রের দৃষ্টান্তও রহিয়াছে। সমুদ্র একটী বস্তু, কিন্তু জল তরঙ্গ ফেন বুদ্‌বুদাদি লইয়াই ত সমুদ্র। এই সমুদ্রেও একত্ব ও নানাত্ব একাধারে বর্ত্তমান। (৪) বনের দৃষ্টান্তও দেওয়া যাইতে পারে। এখানেও একাধারে একত্ব ও বহুত্ব বর্ত্তমান।

ব্রহ্ম বিষয়েও আমরা বলিতে পারি যে তাঁহাতে একত্ব ও বহুত্ব উভয়েরই সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। তিনি 'পূর্ণং'—পূর্ণকারণ; এই পূর্ণকারণ হইতে পূর্ণকার্য্য উৎপন্ন হয়। ব্রহ্ম যেমন কারণ অবস্থাতে পূর্ণ, কার্য্যোৎপত্তি অবস্থাতেও তিনি পূর্ণ। সুতরাং এই জগৎ স্থিতিকালেও পূর্ণব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার যখন প্রলয়-কালে এই জগৎ পরব্রহ্মে লীন হইবে, তখন আবার পূর্ণ-কারণ রূপেই অবশিষ্ট থাকিবে। সুতরাং এই জগৎকে উড়াইয়া দিবার কোন আবশ্যকতা নাই। এক ব্রহ্মই দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয়াত্মক। ভাষ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া শঙ্কর বলিতেছেন,

প্রথমতঃ,—আমরা যে জগতের অস্তিত্ব একবারেই অস্বীকার করিতেছি তাহা নহে। সাধারণ লোকের চক্ষে জগৎ চিরকালই থাকিবে। যাহারা সংসারে অনুরক্ত, সংসার ছাড়া যাহাদের অন্য কোন লক্ষ্য নাই, যাহারা সংসার ত্যাগ করিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে উপদেশ দিবার সময় অবশ্যই বলিব যে এ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়

সবই আছে। যদি বলি এসব কিছুই নাই তাহা হইলে তাহারা যে ভয়ে আকুল হইয়া পড়িবে কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু, যাঁহারা সংসারের অসারতা বুঝিয়া ইহার অতীত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটই পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশ করিব—তাঁহাদিগের নিকটই বলিব যে এজগৎ অস্তিত্ববিহীন।

দ্বিতীয়তঃ—তোমরা যাহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন বলিতেছ তাহা বাস্তবিক প্রকৃত দর্শন নহে। লোকে ত মায়া হস্তীও দর্শন করে, স্পর্শ করে, তাহার শব্দও শ্রবণ করে এবং সেই হস্তীর পৃষ্ঠে অধিরোহণও করিয়া থাকে। কিন্তু এই মায়া হস্তীর কি অস্তিত্ব আছে? স্বপ্নে কি লোকের দর্শন স্পর্শনাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় না? স্বপ্নে কি ব্যাঘ্রাদি দেখিয়া লোকে চীৎকার করে না, এবং তাহাদের শরীরাদি কি কম্পিত হয় না? অথচ এ স্বপ্নদৃষ্টবস্তু মিথ্যা বই আর কিছুই নহে। সুতরাং 'অনুভূতি' ও 'ব্যবহার'-কে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং এ কথাও বলা যায় না যে 'যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই অস্তিত্ববান'।

তৃতীয় বক্তব্য এই যে দ্বৈতাদ্বৈত মত অসার কল্পনা (তৎ অসৎ। বৃঃ. ভাঃ., ৫৷১)। প্রথম কারণ এই যে ব্রহ্ম বিষয়ে উৎসর্গ ও অপবাদ সম্ভব নয়। যেমন 'প্রাণীহিংসা করিবে না' ইহা একটী উৎসর্গ অর্থাৎ সাধারণ বিধি। ঐ সাধারণ বিধির অপবাদ করিয়া এ উপদেশও দেওয়া হইয়াছে যে 'যজ্ঞাদিতে প্রাণী হিংসা করিবে'। সর্ব্বত্র অহিংসাই বিধি ইহার বিশেষ স্থলে (একদেশ) হিংসাই বিধি। কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ে এ প্রকার বলা যায় না। প্রথমে ব্রহ্মকে অদ্বৈত বলিয়া তাহার পর বলা হইল তাঁহার বিশেষ স্থল দ্বৈত, এপ্রকার সম্ভব নয়। কারণ অদ্বৈত বস্তুর একদেশত্ব স্বীকার করা যায় না। (ব্রহ্মণঃ অদ্বৈতত্বাৎ এব একদেশত্ব অনুপপত্তেঃ। বৃঃ. ভাঃ., ৫৷১।) দ্বিতীয় যুক্তি এই যে ব্রহ্মবিষয়ে বিকল্পও সম্ভব নয়। 'অতিরাত্র যাগে ষোড়শী পাত্র গ্রহণ করিতে হয়'; 'অতি-রাত্র যাগে ষোড়শী পাত্র গ্রহণ করিতে হয় না'; এই দুইটী বিধি পরস্পর বিরুদ্ধ। এস্থলে বিকল্প গ্রহণ করিলেই বিরোধ পরিহার হয়। বিকল্প গ্রহণ বস্তুধর্ম্ম নহে—ইহা পুরুষের উপর নির্ভর করে। একজন পুরুষ প্রথম বিধি অনুসারে পাত্র গ্রহণ করিতে পারেন—অপর একজন দ্বিতীয় বিধি অনুসারেও কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু বস্তুবিষয়ে এপ্রকার সম্ভব নয়। ব্রহ্ম একবার দ্বৈত, আবার অদ্বৈত—এপ্রকার বিকল্প হইতে পারে না (ন ত্বিহ তথা বস্তুবিষয়ে দ্বৈতং বা স্যাৎ, অদ্বৈতং বেতি বিকল্পঃ সম্ভবতি অপুরুষ তন্ত্রত্বাৎ আত্ম-বস্তুনঃ। বৃঃ. ভাঃ., ৫৷১)।

চতুর্থতঃ—ব্রহ্মবিষয়ে সমুচ্চয়ও সম্ভব নহে। 'ব্রহ্ম দ্বৈত এবং অদ্বৈত উভয়ই' এপ্রকার বলা অযৌক্তিক, কারণ ইহা আত্মবিরোধী (বিরোধাচ্চ দ্বৈতাদ্বৈতয়োঃ একত্বস্য। বৃঃ. ভাঃ., ৫৷১)।

পঞ্চমতঃ—ইহা ন্যায়বিরোধী। যাহা অবয়ববিশিষ্ট, যাহা অনেকাত্মক এবং যাহা ক্রিয়াশীল তাহা নিত্যবস্তু হইতে পারে না। (তথা ন্যায় বিরোধোঽপি, সাবয়বস্য অনেকা-ত্মকস্য ক্রিয়াবতঃ নিত্যত্ব অনুপপত্তেঃ। বৃঃ. ভাঃ., ৫৷১।) সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয়।

ষষ্ঠতঃ—ইহা শ্রুতিবিরোধী। শ্রুতির মতে ব্রহ্ম সৈন্ধবঘনবৎ একমাত্র প্রজ্ঞানঘন, নিরন্তর (জাত্যন্তর রহিত), কার্য্য ও কারণ রহিত, বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদ-বর্জ্জিত ইত্যাদি। এই সমুদয় উক্তি সত্ত্বেও যদি ব্রহ্মকে দ্বৈতাদ্বৈত বল তাহা হইলে এই সমুদয় শ্রুতিকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হয় (সমুদ্রে প্রক্ষিপ্তাঃ স্যুঃ। বৃঃ. ভাঃ., ৫৷১।)

সপ্তমতঃ—দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলে 'একরস' ব্রহ্মকে সমুদ্র ও বনের ন্যায় অবয়ববিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করা হয়। এস্থলে জন্মমরণাদি শত সহস্র অনর্থকেই কি ব্রহ্মের অঙ্গ বলা হইতেছে না? শ্রুতিতে ব্রহ্মকে ধ্যেয় বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার অনর্থসঙ্কুল ব্রহ্ম কি ধ্যেয় হইতে পারেন? শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে 'ব্রহ্মকে এক প্রকার বলিয়াই জানিবে,' 'যে ব্রহ্মে নানাত্ব দর্শন করে সে মৃত্যু অপেক্ষাও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়'। ভেদ দর্শনের যখন নিন্দা করা হইয়াছে—তখন ব্রহ্মে কখনই ভেদ স্বীকার করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্ম 'একরস'। (বৃঃ. ভাঃ., ৫৷১)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ শ্রুতি,

স্মৃতি ও যুক্তিবিরোধী। এপ্রকার কল্পনা অপেক্ষা উপনিষৎ পরিত্যাগ করাই বরং শ্রেয় (তস্মাৎ শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় বিরোধাৎ অনুপপন্না ইয়ং কল্পনা ; অস্যাঃ কল্পনায়াঃ বরম্ উপনিষৎ পরিত্যাগঃ এব। বৃঃ. ভাঃ., ৫।-)।

৮। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।

এখানে একটী বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। বেদান্ত-শাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য উঃ., ৩।১৪।১) "এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মই"। ব্রহ্ম ভিন্ন যখন দ্বিতীয় সত্তাই নাই তখন জগৎকে ব্রহ্ম না বলিলে চলিবে কেন ? কিন্তু তাই বা কি করিয়া বলি ? ব্রহ্মে কোন প্রকার ভেদই নাই এবং এই জগৎ নানাত্বপূর্ণ। এঅবস্থায় এজগৎকে ব্রহ্ম বলি কি প্রকারে ? আমাদের উভয় শঙ্কট— জগৎকে ব্রহ্ম বলাও দোষ আবার না বলাও দোষ। এখন উপায় কি ? শঙ্কর ইহার একটী মীমাংসা করিয়াছেন।

রজ্জু দেখিয়া যেমন লোকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিতে পারে, শুক্তিকা দেখিয়া যেমন রজত বলিয়া ভ্রম হওয়া সম্ভব, গগনকে যেমন লোকে সুনীল কটাহতল বলিয়া ভ্রম করে, তিমির-রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেমন এক চন্দ্রের স্থলে দ্বিচন্দ্র দর্শন করে, তেমনি অজ্ঞলোকে স্বগতভেদরহিত ব্রহ্মকে বিচিত্রতাপূর্ণ জগৎ বলিয়া ভ্রম করিতেছে। বিজ্ঞ-লোক রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই জানিতেছে। আমি কিন্তু রজ্জুর স্থলে রজ্জু না দেখিয়া সর্পই দেখিতেছি। বিজ্ঞ-ব্যক্তি আমাকে বলিতে পারেন যে "তুমি যে সর্প দেখিতেছ তাহা রজ্জুই"। আমার যদি ভুল ভাঙ্গিয়া যায় আমিও সর্প না দেখিয়া সেস্থলে রজ্জুই দেখিব। সুতরাং এক অর্থে "সর্প রজ্জুই,"—এই অর্থে "জগৎ ব্রহ্মই"। ইহাকেই বলে "বিবর্ত্তবাদ"। রজ্জু কখন সর্পরূপে পরিণত হয় না, ব্রহ্মও তেমনি জগৎরূপে পরিণত হন নাই। রজ্জুকে যেমন সর্প বলিয়া ভ্রম করি, তেমনি ব্রহ্মকেও এই জগৎ বলিয়া ভ্রম হইতেছে—স্বগতভেদরহিত বস্তুকে নানাত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে। এখানে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। সর্প কখন রজ্জু হইতে পারে না এবং রজ্জুও কখন সর্প হইতে পারে না। তেমনি জগৎও কখন ব্রহ্ম হইতে পারে না এবং ব্রহ্মও কখন জগৎ হইতে পারেন না। "এই হস্তী মৃণ্ময়"—এই জ্ঞানে দুইটী জ্ঞানের সমাবেশ হইয়াছে। ইহাতে 'হস্তিজ্ঞান' রহিয়াছে এবং মৃত্তিকাজ্ঞানও রহিয়াছে। এই উভয় জ্ঞানের সম্মিলনে 'মৃণ্ময় হস্তী'র জ্ঞান হইয়াছে। এই অর্থেই কি বলা হইয়াছে যে "এই সর্প রজ্জুই" ? এখানে কি 'রজ্জুজ্ঞান' ও 'সর্পজ্ঞানের' সমাধিকরণ হইয়াছে ? 'রজ্জুজ্ঞান' এক, 'সর্পজ্ঞান' অন্য। এই উভয় জ্ঞানের সমাবেশ হইয়া অবশ্যই এখানে কোন নূতন জ্ঞানের উৎপত্তি হয় নাই। যতক্ষণ 'সর্পবুদ্ধি' থাকিবে ততক্ষণ "রজ্জুবুদ্ধি" জাগ্রত হইবে না। সর্প তিরোহিত না হইলে সেস্থলে রজ্জুর আবির্ভাব হইতে পারে না। বিজ্ঞ লোকের নিকটে রজ্জু রজ্জুরূপেই প্রকাশিত, তাঁহাদিগের নিকটে সর্পের অস্তিত্বই নাই। রজ্জু ও সর্পের মধ্যে যে সম্পর্ক, ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যেও ঠিক সেই সম্পর্ক। আমরা যে এই বিচিত্র জগৎ দেখিতেছি, প্রকৃত পক্ষে ইহা বিচিত্র জগৎ নহে ; কেবল ব্রহ্মই রহিয়াছেন, আমরা ভ্রমান্ধ হইয়াই এই স্থলে স্বগতভেদরহিত ব্রহ্মকে না দেখিয়া বিচিত্রতাময় জগৎই দেখিতেছি। কিন্তু যখন ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে তখন এই নানাত্বপূর্ণ জগৎ আর দেখিতে পাইব না, ইহার পরিবর্ত্তে "একরস" ব্রহ্মকেই দেখিতে পাইব। এই মত প্রচার করাই শঙ্করের উদ্দেশ্য। এইজন্যই তিনি বলিয়াছেন—

"বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যাজনিত জগৎপ্রপঞ্চকে লয় কর। লয় করিয়া সেই আয়তনভূত এক আত্মাকে একরস বলিয়া জান"। বৃঃ. ভাঃ., ১।৩।১।

রজ্জু ও সর্পের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিতেছি যে সর্প সর্পরূপে রজ্জু নহে ; প্রকৃত কথা এই এ সর্প সর্পই নহে উহা রজ্জুই। তেমনি জগৎ জগৎরূপে ব্রহ্ম নহে ; যাহাকে জগৎ বলা হইতেছে তাহা জগৎই নহে, তাহা ব্রহ্মই। এই অর্থেই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। জগৎ জগৎ-রূপেই গৃহীত হইবে অথচ বলা হইবে এ জগৎ ব্রহ্ম—ইহা শঙ্করের মত নহে। জগতের জগত্ব বিনাশ করিয়া ইহার ব্রহ্মত্ব স্থাপন করাই শঙ্করের উদ্দেশ্য।

আমরা চারিটি প্রবন্ধে শঙ্করের দার্শনিক মত ব্যাখ্যা করিলাম। পর প্রবন্ধে এই দর্শনের সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। মহেশচন্দ্র ঘোষ।

পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদান

"ইতি পৌরাণিকা বার্ত্তা" বলিয়া টীকাকার আপনার কর্ত্তব্য শেষ করেন, তিনি আর বেশী ভাবিতে প্রস্তুত নহেন। তত্ত্ববিদ্ তাহাতে সন্তুষ্ট হন না, তিনি আরও কিছু চান। টীকাকৃৎ যেখানে শেষ করিলেন, তত্ত্ববিৎ সেখান হইতে পশ্চাতে যাইয়া মূল অন্বেষণে তৎপর। পুরাণ সব জাতিরই আছে। সকলেরই জাতীয় জীবনের এক অধ্যায় পুরাণকোষে নিবদ্ধ। সে কঠোর আবরণ ভেদ করিয়া ফলশস্য আহরণ সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। তাই, এতকাল মানুষ এই আবরণ লইয়াই সন্তুষ্ট ছিল, এই আবরণই নাড়াচাড়া করিয়াছে। ভাবিয়াছে, এই আবরণই সব, আর কিছু ভাবিবার নাই। নারিকেলের ছোবড়া ও মালাকেই তাহার সর্ব্বস্ব বলিয়া ধরিয়া লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। এখন কিন্তু পুরাণের এই কঠোর আবরণ স্থানে স্থানে ভগ্ন হওয়ায় আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এই সকল নীরস আষাঢ়ে গল্পের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে জৈষ্ঠের সুরসাল ফলের আস্বাদন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে মানবেতিহাসের এক অবস্থায় সর্ব্বদেশেই মানবজাতির যাহা সম্পদ—তাহার দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জ্যোতিষ, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলই এই পুরাণের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। বাহ্যদৃষ্টির কাছে যাহা অভিব্যক্ত, আক্ষরিক ব্যাখ্যায় যাহা উদ্ভিন্ন, তাহাই পুরাণের অর্থ নহে। মূল যাহা, তাহা দৃষ্টির অতীত স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হইবে। এই কার্য্যে যে শ্রম ব্যয়িত হইবে তাহা যে সব সময়ে ফল উৎপন্ন করিবে তাহা নহে, কেন না, কোন্ অতীতে কোন্ অবস্থার মধ্যে যে মূলের পত্তন হইয়াছিল তাহা হয়তো এখন আমাদের ধারণারই অতীত। তবুও "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরা" এই উপহাসের বিষয়ীভূত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও আজ আমরা কয়েকটি সাধারণে প্রচলিত পৌরাণিক উপাখ্যান মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, অমৃত না উঠিয়া যদি গরল উঠে, তবে তাহাও শিরোধার্য্য।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে অনেকেই ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেন না, এই সকল আখ্যায়িকার সঙ্গে জনপ্রবাদ স্থান, কাল ও পাত্র জড়িত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা হইতেই উপাখ্যানগুলির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে একটা সহজ বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। কিন্তু অপরীক্ষিত জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। পৌরাণিক বীরপুরুষগণের সঙ্গে আপনাদের জন্মস্থান ও স্বজাতিকে জড়াইয়া জনপ্রবাদ রচনা করা মানবজাতির একটা স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি আছে বলিয়া মনে হয়। ইউরোপের জাতিসকল আপনাদিগকে ট্রয় যুদ্ধের কোনও না কোনও গ্রীক বীরের বংশোদ্ভব ভাবিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। ইংরাজ তো আপনাকে ইস্রেলের লুপ্ত দ্বাদশ শাখার অন্যতম বলিয়া পরিচয় দেয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বৃন্দাবনের তো কিছুই ছিল না বলিলে হয়। উহা সম্পূর্ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উদ্যমের ফল। পুরাণের সঙ্গে মিলাইয়া খুটিনাটি করিয়া সব স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মথুরা ও বৃন্দাবন দেখিয়া বেশ মনে হয়, যে, একটা প্রাচীন সহরের ভগ্নাবশেষ, আরটি নূতন পল্লীমাত্র—নূতন বেশ দিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে, উহা বিগত চারিশত বৎসরের কীর্ত্তি। কিন্তু জনপ্রবাদ এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব নির্দ্দেশ করিতেছে যে সাধারণ লোকের পক্ষে উহার প্রাচীনত্বে অবিশ্বাস করা অসম্ভব। একটা জনপ্রবাদ প্রচলিত হওয়ার পর শতবর্ষ অতীত হইলে তাহা শত বৎসরের কি দুহাজার বৎসরের তাহা নির্ণয় করা পরীক্ষা ও গবেষণা সাপেক্ষ, কেবল জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। এই বঙ্গদেশে এমন স্থান আছে যেখানে একটী সুড়ঙ্গ দেখাইয়া জনপ্রবাদ বলিতেছে যে মহিরাবণকে বধ করিয়া হনুমান এক স্কন্ধে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ও এক স্কন্ধে কালিকাদেবীকে বহন করতঃ এই পথে উঠিয়াছিলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী এক মন্দিরের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলে যে এই সেই মহিরাবণ-পূজিতা কালী। অথচ আদি রামায়ণে মহিরাবণের নাম গন্ধও নাই। উহা কৃত্তিবাসের কীর্ত্তি। সুতরাং জনপ্রবাদ তাঁহার পরে কল্পিত। সেইরূপ যদি আসামের তেজপুর সহরে বাণরাজা ও তদীয় কন্যা উষা সম্বন্ধে জনপ্রবাদ

অসঙ্কোচে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তবুও এক জনপ্রবাদের জোরেই উপাখ্যান ইতিহাস হইয়া উঠিবে না। কেন না, বাণরাজার আখ্যায়িকা ইতিহাসজাত নহে, উহার মূল সূর্য্যসম্বন্ধীয় রূপক—Solar Myth. সহস্রকিরণ রবি-দুহিতা উষা পুরাণকারের হস্তে সহস্রবাহু বাণকন্যা উষায় পরিণত হইয়াছেন। দিন যখন আসিয়া পড়ে তখন আর উষা থাকে না, অন্তর্হিত হয়। যিনি কবি, যাঁহার সৌন্দর্য্য বোধ আছে, তিনি জানেন উষা কেমন সুন্দরী, কেমন মনোরমা। কিন্তু হইলে কি হয়, দিনকে কেউ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না. দিন অনিরুদ্ধ, সে আসিয়াই পড়ে এবং উষাকে হরণ করে।

পৌরাণিক উপাখ্যানের "উষাহরণ" নাম নিরর্থক। কেন না, তাহার মধ্যে অনিরুদ্ধকেই চুরি করিয়া আনা হয়। কিন্তু সৌর রূপকে বাস্তবিকই দিনের আগমনে উষা অপহৃতা হয়। আর দিন যে উষারই স্বপ্ন। আমরা এখানে বসিয়া সে কথাটা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব না। পণ্ডিতপ্রবর তিলক দেখাইয়াছেন, উষা উপাখ্যানের মূল আর্য্যগণের আদি নিবাস সেই সুমেরু প্রদেশে। সেখানে উষা আমাদের এখানকার ন্যায় মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী নহে, একমাসব্যাপী। সেই ৫।৬ মাস স্থায়ী রজনীর অন্ধকারের —যে অন্ধকারের পরপারে যাইবার জন্য ঋগ্বেদের ঋষিগণের এত ব্যাকুল প্রার্থনা, সেই অন্ধকারের—অবসানে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে যখন উষা আবির্ভূতা, তখনই তো তাঁহারা দিনের কল্পনা করিতে অবসর পাইতেন, নতুবা এ দীর্ঘ রাত্রির যে অবসান হইবে—তাঁহাদের ব্যাকুলতা দেখিলে মনে হয়—তাহা তাঁহারা যেন সাহস করিয়া ভাবিতেই পারিতেছেন না। তাই অনিরুদ্ধ দিন উষার স্বপ্ন। স্বপ্ন হইলেও অনিবার্য্যরূপে দিন আসিয়া উষাকে হরণ করে। তারপর, বাণরাজার রাজধানী শোণিতপুর যে জবাকুসুম-সঙ্কাশ কাশ্যপেয় মহাদ্যুতি সূর্য্যদেবের বিশ্বব্যাপী কিরণজাল, যাহার মধ্যে সূর্য্যদেব অবস্থিত- তাহারই রূপক মাত্র তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। অথচ আসামের বাণরাজার কন্যা স্বপ্ন দেখিলেন গুজরাটবাসী শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে, আর অমনি বাণান্তঃপুরচারিণী চিত্রলেখা মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্বারকাদুর্গস্থিত, যে দুর্গ শত্রুভয়ে সমুদ্রগর্ভে নির্ম্মিত সেই দুর্গস্থিত সুষুপ্ত অনিরুদ্ধকে চুরি করিয়া আনিল, আর অমনি একটা উষাহরণ হইয়া গেল—এই কথা আমাদিগকে ইতিহাস বলিয়া গলাধঃকরণ করিতেই হইবে! তাই. কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন

> "গিলে কিহে আর্য্যজাতি এই ভস্ম ছাই
> অকপটে ?'

বস্তুতঃ, পৌরাণিক উপাখ্যানের উপাদান অধিকাংশ স্থলেই ঐতিহাসিক নহে। এই উপাদান অন্ততঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে।

১। প্রথমতঃ, কতকগুলির মূল যে ইতিহাস তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে তাহা নির্ণয় করা অতীব কষ্টসাধ্য। একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। কংস দৈববাণী শুনিলেন যে ভগিনীর পুত্র তাহার বিনাশ সাধন করিবে। ইতিহাস বলিল, এ জন্য দৈববাণীর প্রয়োজন নাই। যে নিজের পিতাকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া রাজা হইয়াছে এবং নিজে অপুত্রক সুতরাং ভগিনীর পুত্রগণই রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, ভগিনীর পুত্র জন্মিলে যে ঐ পুত্রকে লইয়া প্রজাগণ তাহার জীবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে পারে, এ সন্দেহ প্রাচীনকালের আরংজীব নৃশংস কংসের মনে আপনা হইতে উদয় হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক। দৈববাণীটা পৌরাণিক। একাদিক্রমে ছয় পুত্রের নিষ্ঠুর হত্যার পর সংক্রুদ্ধ প্রজাগণের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া অকালপ্রসূত সপ্তম এবং অষ্টম পুত্রকে কারাগার হইতে সরাইয়া ফেলা একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। সেজন্য যোগমায়ার বৈকুণ্ঠ হইতে কষ্ট করিয়া কংস-কারাগারে না আসিলেও চলে। তবে যে মায়াদেবী বলদেবকে দৈবকীর গর্ভ হইতে লইয়া রোহিণীর ক্রোড়ে স্থাপন না করিয়া গর্ভে স্থাপন করিয়াছেন, সে কেবল পুরাণের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, ইতিহাসের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বাহির হইবার সময় যে শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় বসুদেবের হাতের শৃঙ্খল খুলিয়া গেল, মায়াদেবীর কৌশলে যে প্রহরিগণ নিদ্রিত হইয়া পড়িল, ঝড় বৃষ্টির মধ্যে যে বাসুকী সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন বা ভাদ্র মাসে যমুনা হঠাৎ হাঁটু জলে পরিণত হইলেন সে কেবল পুরাণকারের অনুরোধে। নতুবা অত্যাচারী নৃশংস

রাজার বিদ্রোহী প্রজাগণের সহানুভূতির স্থলবর্ত্তী ও কেন্দ্রভূমি বসুদেবের হাতের বন্ধন খুলিয়া দিবার লোকের অভাব হয় না, সেজন্য কোন অলৌকিক শক্তির প্রয়োজন নাই। এরূপ স্থলে মায়াদেবীর সহায়তা ব্যতীতও প্রহরিগণকে নিদ্রিত করিয়া ফেলা যায়। সুতরাং এমন সময় যদি রজনীযোগে ঝড় বৃষ্টির আচ্ছাদনের সুযোগে অনার্য্যপতি বাসুকী সহস্র অনুচর সহ সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান হন তবে পুত্রক্রোড়ে বসুদেবের পক্ষে ভাদ্র মাসের যমুনা পার হওয়াটা একটা কষ্টকর কার্য্য হইবে না। কিন্তু অলৌকিকতা বর্জ্জন করতঃ উপাখ্যানকে স্বাভাবিক ঘটনার ভূমিতে আনিতে পারিলেই যে তাহা ইতিহাস হইল, তাহা নহে। ইতিহাস হইবার পক্ষে প্রথম আপত্তির নিরসন হইল মাত্র। এখন স্বাধীন প্রমাণের দ্বারা আখ্যায়িকাকে ইতিহাস রূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সে অতি দুরূহ ব্যাপার। ইতিহাস হইলেও এতদূর হইতে কোনও ঘটনাকে ইতিহাসরূপে প্রমাণ করা বহু আয়াসসাধ্য। তারপর ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া যখন কাব্য বা উপন্যাস রচিত হয় তখন ইতিহাস আরও জটিলতা-জালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কবি তো চিত্রকর। তিনি যেখানে যেটি ভাল পাইবেন তাহারই একত্র সমাবেশ করিয়া চিত্রাঙ্কণ করিবেন। তিনি যে দশ জায়গা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিলেন তাহা ঐতিহাসিক হইলেও তিনি যে চিত্র আঁকিলেন তাহা তো আর ঐতিহাসিক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি না। এতদূর হইতে ঐ চিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অংশগুলির ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত করা যে একরূপ অসাধ্য তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

২। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলির মূলে আধ্যাত্মিক ভাবের রূপক—যেমন চণ্ডীকাব্য। মানব-অন্তরে বা মানবসমাজে দেবাসুরের সংগ্রাম সর্ব্বদাই চলিতেছে এবং "সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" দেবীর কৃপায় অসুরগণ চিরদিনই পরাজিত হইতেছে, ইহা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। ইহাই আখ্যায়িকার উপাদান। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বস্তুটি এরূপ ব্যাপক যে এমন ক্ষেত্র নাই যেখানে ইহা খাটিবে না। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিরল নহে। সুতরাং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও যদি কোন গল্পের অন্য ব্যাখ্যা পাই তবে তাহা গ্রহণ করিতে আমাদের আপত্তি নাই।

৩। তৃতীয়তঃ, বহু আখ্যায়িকা জ্যোতিষিক রূপকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার মধ্যে দক্ষযজ্ঞ একটী সর্ব্বপ্রধান। ইহার আখ্যানবস্তু সকলেই অবগত আছেন। দক্ষের আটাশ কন্যার একজন সতী, শিবের পত্নী। কোন কারণে জামাই শ্বশুরে বিবাদ হইলে, শিবকে নিমন্ত্রণ না করিয়া দক্ষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিলেন, সুতরাং শিবানুচরগণ যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দক্ষের প্রাণ সংহার করিল। শেষে দক্ষপত্নী প্রসূতির প্রার্থনায় ছাগমুণ্ডে দক্ষের পুনরায় জীবন লাভ হইল। ইহার মধ্য হইতে জ্যোতিষিক রূপক বাহির করিতে হইলে হিন্দু জ্যোতিষের ইতিহাস কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে। এই আলোচনায় প্রমাণ হইবে, যাহারা মনে করে হিন্দু জ্যোতিষ গ্রীক জ্যোতিষের প্রতিবিম্ব (reflection) মাত্র তাহারা যেমন ভ্রান্ত, তেমনি আবার, যাহারা মনে করে হিন্দুগণ কাহারও নিকট হইতে কখনও কিছু ধার করেন নাই, জগৎকে কেবল ঋণ দিয়াই আসিয়াছেন তাহারাও তেমনি ভ্রান্ত। হিন্দুগণ যে অন্য নিরপেক্ষভাবে আপনাদের নক্ষত্রচক্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন সে বিষয়ে বোধ হয় আর কোনই সন্দেহ নাই। এই নক্ষত্রচক্রে প্রথমতঃ আটাশ নক্ষত্র ছিল। ইহারা চন্দ্রের ভ্রমণপথে অবস্থিত। সুতরাং পৌরাণিকের দক্ষপ্রজাপতির আটাশ কন্যা, এর মধ্যে ২৭টি চন্দ্রের সঙ্গে বিবাহিতা। একটি পথ হইতে বহুদূরে অবস্থিত, ইহার নাম সতী বা অভিজিৎ (Vega), সেইজন্য বোধ হয় ইহাকে চন্দ্রের পত্নী করা হয় নাই। হিন্দু জ্যোতিষের গণনা এই নক্ষত্রচক্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে বিদেশ হইতে রাশিচক্রের আবির্ভাব হইল। একদল এই রাশিচক্রের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। কেন না, নক্ষত্রচক্র অপেক্ষা রাশিচক্র উন্নততর। তাঁহারা বলিলেন রাশিচক্র লইয়া নক্ষত্রচক্রের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হউক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে নক্ষত্রচক্রের মধ্যে অভিজিৎকে রাখা যায় না। অভিজিৎ রাশিচক্রপথের অত্যন্ত বাহিরে অবস্থিত। তাই প্রস্তাব হইল অভিজিৎকে পরিত্যাগ করা যাক্।

ইহাই দক্ষের ২৮শ কন্যার একজনের মৃত্যু। হিন্দু জ্যোতিষের এই সংস্কারযজ্ঞে ইহাই সতীর দেহত্যাগ। এই অভিজিৎ বর্জ্জন হিন্দু জ্যোতিষের ইতিহাসে একটি অতি বিশিষ্ট ঘটনা। নব্য সংস্কারকদলের এই প্রস্তাব যে সহজেই গৃহীত হইল তাহা নহে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রাচীনতার পক্ষপাতী একদল আছেন যাঁহারা যতক্ষণ পারেন নূতনকে ঘরে ঢুকিতে দেন না। সুতরাং অভিজিৎ বর্জ্জন সাব্যস্ত হইল বটে কিন্তু রাশিচক্র গ্রহণ সর্ব্ববাদীসম্মত হইল না। রাশিচক্রও পরিত্যক্ত হইল। ইহাই দক্ষের প্রাণনাশ। ৩৬০ অংশে বিভক্ত দ্বাদশ রাশির ও ২৭ নক্ষত্রের বাসস্থান ঊর্দ্ধ-অধো-বিস্তৃত এই আকাশই যে দক্ষ তাহা হিন্দু জ্যোতিষাভিজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। যাহা হউক প্রাচীনগণ রাশিচক্র পরিত্যাগ করিলেন বলিয়াই যে নব্যসংস্কারকদল আশা ছাড়িয়া দিলেন তাহা নহে। জ্যোতিষক্ষেত্রে রাশিচক্রের উপকারিতা বিষয়ে তাঁহারা যুক্তির অবতারণা করিতে লাগিলেন। কিছু দিন আলোচনা চলিল। এই আলোচনাই দক্ষের প্রসূতি—তাঁহার পুনর্জ্জীবন-দাত্রী। আলোচনার ফল যাহা সকল সংস্কার সম্বন্ধেই হইয়া থাকে তাহাই হইল। নব্যদল আপনাদের মত প্রতিষ্ঠিত করিলেন, প্রাচীনগণ ক্রমে ক্রমে হার মানিলেন। ফল হইল, রাশিচক্রের গ্রহণ অর্থাৎ দক্ষের পুনর্জ্জীবন। কিন্তু এখনও দক্ষের মুণ্ড পরিবর্ত্তনের কথা বলা হয় নাই। এইখানেই রাশিচক্র যে বাহির হইতে গৃহীত তাহার একটি সুস্পষ্ট আন্তরিক সাক্ষ্য (internal evidence) বর্ত্তমান রহিয়াছে। হিন্দুগণ বহুপূর্ব্বেই নক্ষত্রচক্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে চক্রের প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনী। যাঁহারা নক্ষত্রগণের আকৃতি দেখিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন উক্ত নক্ষত্র একটি অশ্বমুখ। এখন যদি রাশিচক্রেরও উদ্ভাবনকর্ত্তা হিন্দুগণই হইতেন তবে প্রথম রাশির নাম মেষ হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকিত না, অশ্বই হইত। কিন্তু রাশিচক্র যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন, হিন্দুরা যেখানে অশ্ব দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সেখানে মেষ দেখিয়াছেন, এই মেষই রাশিচক্রের মাথা অর্থাৎ প্রথম। সুতরাং এই চক্র যখন গ্রহণ করা হইল তখন বাধ্য হইয়াই দক্ষের মুণ্ড পরিবর্ত্তিত হইল। দক্ষ এখন ছাগমুণ্ড লাভ করিলেন। ইহাই দক্ষের মুণ্ড পরিবর্ত্তনের ইতিহাস।

রাশিচক্রকে যে নক্ষত্রচক্রের উপর চাপাইয়া গোঁজামিল দেওয়া হইয়াছে তাহারও চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অভিজিৎ বর্জ্জনের কারণ এই যে ঐ নক্ষত্র রাশিচক্রবর্ত্মের এত বাহিরে যে রাশিচক্র রাখিতে গেলে আর সেটা রাখা যায় না। নতুবা ২৮ নক্ষত্রের মধ্যে ঔজ্জ্বল্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাকে পরিত্যাগ করিবার আর কোনই কারণ নাই। চক্রমধ্যে শেষ নক্ষত্র রেবতী অতি নগণ্য, তাহাকে পরিত্যাগ করাই স্বাভাবিক হইত। এখনও শ্রবণা বা স্বাতী নক্ষত্রচক্রের অত্যন্ত বাহিরে পড়িয়া থাকে, তাহা সহজ চক্ষেরই বোধগম্য। আরও একটা গোঁজামিল আছে। রাশিগণের মধ্যে বৃশ্চিক রাশির নামেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সার্থকতা। অন্য কোনও রাশির নামকরণে বোধ হয় স্বাধীন দুই ব্যক্তির এক মত হইবার সম্ভাবনা নাই। নক্ষত্রচক্রের তিনিটি প্রধান নক্ষত্র ইহার অন্তর্গত। অনুরাধা মস্তকে, জ্যেষ্ঠা বক্ষে, মূলা লাঙ্গুলে। কিন্তু নাক্ষত্রিক গণনায় অষ্টমরাশি বৃশ্চিক ১৮শ নক্ষত্র জ্যেষ্ঠাতেই শেষ হয়। গোঁজামিলের দরুণই এটি ঘটিয়াছে।

এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দুটি আপত্তির খণ্ডন প্রয়োজন। রাশির নাম মেষ কিন্তু দক্ষের মুণ্ড কেন ছাগ? ইহার উত্তর এই, ছাগ মেষ এক পর্য্যায়ভুক্ত পশু বলিয়া একার্থবোধক-রূপেই গৃহীত হইয়াছে। অশ্ব সেই শ্রেণীভুক্ত হইলে বোধ হয় রাশির নাম অশ্বই হইতে পারিত। তাঁহারা যে ছাগ মেষ একই অর্থে লইয়াছিলেন তাহার আরও প্রমাণ এই যে গ্রীক জ্যোতিষে দশম রাশি ছাগ (Capricornus) কিন্তু হিন্দুগণ তাহা বদলাইয়া মকর করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে মেষ যখন এক রাশির নাম আছে তখন একার্থবোধক আর একটা রাশি চক্রে থাকিলে গোলযোগ হইবে। অন্য কারণে নাম সংস্কারের প্রশ্ন যদি উঠিত তবে সংস্কারের জন্য ছাগল অপেক্ষা অনেক উচ্চতর জিনিষ ছিল।* যাহা হউক, অন্য আপত্তি এই যে

* সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্যই এই আপত্তিটির উল্লেখ করা গেল, কেন না, সাধারণতঃ লোকের এই ধারণা যে দক্ষের ছাগমুণ্ড ও প্রথম রাশি মেষ। সুতরাং এ দুটি স্বতন্ত্র জিনিষ। বাস্তব পক্ষে এখানে

শাস্ত্রানুসারে অভিজিৎ নক্ষত্রের অধিপতি শিব নহেন, ব্রহ্মা। ইহার উত্তর এই, যে, দক্ষপ্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র, সুতরাং দক্ষের কন্যাকে ব্রহ্মার সঙ্গে বিবাহ দেওয়াটা পুরাণকারের কাছে নিতান্ত ঘরাও বন্দোবস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, ইহাতে কিছু কবিত্বও নাই, দৃষ্টিকটুও বটে। তাই তিনি ব্রহ্মাকে ছাড়িয়া দিয়া ব্রহ্মার সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত দেবতা শিবের সঙ্গে সতীর বিবাহ ঘটাইয়াছেন। যদিও এরূপ ঘরাও বিবাহ পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে ছিল। মরীচি ও দক্ষ উভয়েই ব্রহ্মার পুত্র। তবুও মরীচিপুত্র কশ্যপ দক্ষের বহু কন্যার পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন।

কোনই বিবাদ নাই। আসল কথাটা মেষও নয়, ছাগও নয়, কিন্তু উভয়ার্থবোধক অজ। ভাগবতে দেখিতে পাই, দক্ষের পুনর্জ্জীবন আদেশ করিয়া মহাদেব বলিতেছেন,—"প্রজাপতের্দগ্ধশীর্ষ্ণো ভবত্বজমুখং শিরঃ"। শব্দকল্পদ্রুমে অজশব্দের ব্যাখ্যায় আছে—"অজঃ মেষ ইতি জ্যোতিষম্" এবং "অজঃ ছাগ ইতি মেদিনী"। বৃহজ্জাতক নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ গ্রন্থে রাশিগুলির "অজ বৃষভঃ" ইত্যাদি ক্রমে নাম দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং মেষ ছাগ একার্থবোধক বলিয়া দ্ব্যর্থবোধক অজ প্রথম রাশির নাম হইলে এবং দশমরাশির নাম ছাগ রাখিলে যে বিশেষ গোলযোগের সম্ভাবনা। সেইজন্যই যে হিন্দুগণ Capricornকে মকর করিয়াছেন, আমাদের এই অনুমান নিতান্ত ভিত্তিহীন না হইতে পারে। তবে এই মকর নাম কি নিতান্তই কাল্পনিক, না ইহারও কোন ইতিহাস আছে? আমার বিশ্বাস ইহা নিতান্ত কাল্পনিক নহে, এই নামকরণের যুক্তিযুক্ত কারণ রহিয়াছে। নানা জাতির রাশিচক্র মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে চীন ও ভারত ছাড়া আর সকলেরই দশমরাশি Capricorn বা ছাগ। চীনের Dolphin মৎস্যবিশেষ, ভারতের মকর। ভারতের রাশিচক্রেও কোনকালে দশমরাশি হয়তো ছাগই ছিল, কেন না, কার্ণেল ষ্টুয়ার্টকৃত চিত্রে ছাগই আছে—(Moor's Hindu Pantheon, Plate XLVIII). সাধারণতঃ পঞ্জিকায় দশমরাশি মৎস্যবিশেষ। কিন্তু ছাগল ও মৎস্যে সাদৃশ্য কোথায়? সাদৃশ্য মূল উপাদানে। পণ্ডিতগণ এরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে রাশিচক্রের উৎপত্তিস্থান বেবিলোন। সেখান হইতে সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। বেবিলোনিয়ান দশমরাশি Capricorn. ইনি কিন্তু এক অদ্ভুত জীব। মস্তক ও সম্মুখের পদদ্বয় ছাগের, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ ঠিক আমাদের পঞ্জিকায় অঙ্কিত মকরের অনুরূপ। ভারতের মকর আর বেবিলোনের Capricorn মিলাইয়া দেখিলে সাদৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে হয় এবং সকলেই বেবিলোন হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিলেও কেন কোথায়ও ছাগ, কোথায়ও মৎস্য তাহারও মীমাংসা পাইতে বিলম্ব হয় না। তবে হিন্দুগণের এখানেও বাহাদুরী আছে। যদিও রাশি আকৃতিতে জলজন্তু এবং সাধারণ নাম মকর, ইহার অপর একটী নাম মৃগ। পশ্চাদ্দিকের জলজীবত্ব এবং সম্মুখের পশুত্ব দুই-ই বজায় থাকিয়া যাইতেছে। তারপর অধিপতি দেবতা বিচার করিলে সকল বিবাদই চুকিয়া যায়। শব্দকল্পদ্রুম বলেন যে মকররাশির অধিপতি দেবতার নাম "মৃগাস্য মকরঃ।" ইনি কোন্ দেবতা? বেবিলোনিয়ান্‌দিগের সুপ্রাচীন দেবতা (Ea) ইয়া—ছাগমুখী মৎস্য এবং ইহাই তাঁহাদের দশমরাশির প্রতিকৃতি।

যাউক সে কথা, দক্ষযজ্ঞের এই পৌরাণিক আখ্যান ছাড়া একটা বৈদিক আখ্যানও আছে, তাহাও জ্যোতিষিক রূপক। তাহার স্থান আকাশের ঐ কালপুরুষ যাহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়। এ বিষয়ের বিশেষ তত্ত্ব যাঁহার জানিবার ইচ্ছা তিনি অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" গ্রন্থ পাঠ করুন।

৪। চতুর্থতঃ, অনেকগুলি উপাখ্যান নিতান্তই কাল্পনিক। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ কি? এবং চন্দ্রের মধ্যস্থিত ঐ কাল দাগগুলিরই বা অর্থ কি? গুরুর তো চক্ষুস্থির, আসল তথ্য জানা নাই। কিন্তু একটা উত্তর না দিলেও তো শিষ্যের কাছে মান থাকে না। তাই বলিলেন, জান তো দক্ষের ২৭টি কন্যা চন্দ্রের স্ত্রী, চন্দ্র কিন্তু রোহিণীকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে। ইহাতে অন্যান্য কন্যারা পিতার কাছে এক নালিশ দাখিল করিল। বৃদ্ধ তো চটিয়াই লাল, "কি এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমাকে অপমান" এই বলিয়া চন্দ্রকে শাপ দিলেন, "যা তুই ১৫ দিনের মধ্যে যক্ষ্মারোগে ক্ষয় হইয়া যা"। কন্যারা দেখিল ভালরে বিপদ, বাবার কাছে দুঃখ জানাইতে আসিয়া ফল তো হইল বেশ—হিতে বিপরীত, তখন তাহারা কাঁদিয়া বলিল, "বাবা, এ যে আমাদেরই সর্ব্বনাশ করিলে?" তখন দক্ষের হুঁস্ হইল, তিনি বলিলেন "তাইতো, চন্দ্র মরিলে যে তোমরা বিধবা হইবে। রাগ চণ্ডাল। তা এক কাজ কর, যাহা বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহার তো আর অন্যথা হইবে না, চন্দ্র একপক্ষে ক্ষয় হইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু অপর পক্ষে আবার বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণতা লাভ করিবে।" মেয়েরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, চুলোয় গেল চন্দ্রের পক্ষপাতিত্বের আব্দার। এবার কিন্তু চন্দ্রের পালা আসিল। চন্দ্র বলিল, "ঠাকুর, মেয়েদের অনুরোধে তো আমাকে ক্ষয় বৃদ্ধির ঘূর্ণীপাকে ফেলিলে, তা বেশ। কিন্তু আমি যে যক্ষ্মা রোগের যন্ত্রণায় মরি, তার কি? ইহা অপেক্ষা ক্ষয় হইয়া যাওয়া যে ছিল শতগুণে ভাল।" ব্রাহ্মণের ক্রোধ এতক্ষণ নিঃশেষে চলিয়া গিয়াছে, হৃদয়টা ভিজিল, তাই কাঁদ কাঁদ সুরে বলিলেন, "দেখ, বাবা, বুড় হয়েছি, ভীমরতি ধরেছে, কিসের মধ্যে যে কি করে ফেলি, ঠিক থাকে না, তা বাবা, রাগ করোনা।

এক কাজ কর, দুহাতে একটা খরগোস বুকে চেপে ধরে বসে থাক, যন্ত্রণার বেশ উপশম হবে। আর দেখ বাপু এতে তোমার শাপে বর হ'ল। বড় মানুষরা কত টাকা খরচ করে উপাধির জন্য, আজ হতে বিনা খরচায় তোমার 'উপাধি হ'ল শশাঙ্ক বা শশধর।" এই শেষটি হইল চন্দ্রের কালদাগের ব্যাখ্যা। সূর্য্যের কালদাগের অর্থ না পাইয়াও এইরূপ ভৃগুপদাঘাতের আজগুবি গল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল। তবে এখানে দ্বাদশাদিত্যের একতম বিষ্ণু আর ত্রিদেবের বিষ্ণু গল্পের মধ্যে গুলাইয়া খিচুড়ী পাকিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, চন্দ্রের এই গল্পের মধ্যে সত্য এইটুকু —যাঁহারা আকাশে দৃষ্টি রাখেন তাঁহারা দেখিয়াছেন, স্বীয় ভ্রমণপথে চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রের যত নিকটবর্ত্তী হন এমন আর কোন নক্ষত্রের নহে। তবে আসল বিষয়টা আষাঢ়ে গল্পমাত্র, নিছক কল্পনা!

৫। পঞ্চমতঃ, আর কতকগুলি আছে, প্রাকৃতিক ঘটনার রূপক। যেমন বৃত্রবধ। ইহার আদি ঋগ্বেদে। ইন্দ্রের বৃত্রবধ বহুস্থানে বিবৃত হইয়াছে, ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়া জল সকলকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিতেছেন। পণ্ডিতগণ ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন। বৃত্র এক মেঘাসুর, সে আকাশের সমস্ত জলকে সংগ্রহ করিয়া এক স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং স্বীয় নির্ম্মম প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া জীবজন্তু তৃষ্ণায় মরিয়া গেলেও একবিন্দু জল দিতেছে না। ইন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া এই অসুরকে বিনাশ করতঃ ধরণীকে শীতল ও শস্যশালিনী করিবার জন্য বদ্ধ জলস্রোত সবেগে ছাড়িয়া দিতেছেন। ইহা ভারতেরই কোন প্রাকৃতিক ঘটনার রূপক ধরিয়া লইয়া ইহার এইরূপ ভাষ্য হইয়াছিল। বৃত্র আর কিছুই নহে, প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপতাপিত ভারতীয় গ্রীষ্ম, যখন উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বিন্দুমাত্র বারি নেত্রগোচর হয় না ও নিম্নে নদী তড়াগাদি শুকাইয়া জলশূন্য হইয়া যায়; এবং বৃত্রের সঙ্গে দেবতার যুদ্ধও আর কিছুই নহে কেবল গ্রীষ্মান্তে বর্ষা-সমাগমে আকাশে পর্ব্বতপ্রমাণ মেঘসকল সঞ্চিত হইয়া বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি করতঃ মুষলধারে যে বারিবর্ষণ করিতে থাকে তাহারই রূপক মাত্র। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে এই মেঘের বক্ষ বিদীর্ণ করতঃ জলরাশিকে মুক্ত করিয়া দিয়া ধরণীর মহোপকার সাধন করেন, ইহাই বৃত্রসংহারের রূপক ধরিয়া পরবর্ত্তী কালে ইন্দ্র বজ্রপাণি আকাশদেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

এই ব্যাখ্যা ৭।৮ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি বৈদিক আখ্যায়িকা সকলের ব্যাখ্যা করিয়া দুইখানি অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। একখানি অধ্যাপক হিলেব্রাণ্ডকৃত (Hillebrandt) জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত Vedic Mythology,* আর একখানি পণ্ডিতপ্রবর তিলককৃত ইংরাজী ভাষায় লিখিত Arctic Home in the Vedas. ইঁহারা স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে অন্যোন্যনিরপেক্ষ হইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কিন্তু উভয়েই এই ব্যাখ্যার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই ভ্রান্তি প্রদর্শনে উভয়ের মধ্যে অতি আশ্চর্য্যরূপ ঐক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। পুরাতন ব্যাখ্যার প্রথম অসঙ্গতি এই যে এক মেঘকেই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একদিকে ইহাকেই জলের আধার পর্ব্বতের উপমাস্থানীয় করা হইতেছে, অন্যদিকে আবার ইহাকেই জলবদ্ধকারী বৃহদাকার কৃষ্ণকায় অসুররূপে বর্ণনা করা হইতেছে। দ্বিতীয় ও প্রধান অসঙ্গতি এই—যাহা সহজেই চোখে পড়া উচিত ছিল কিন্তু ভারতে তদনুযায়ী প্রাকৃতিক ঘটনা নাই বলিয়া পণ্ডিতগণ সেদিকে দৃষ্টিই দেন নাই এবং রূপক ব্যাখ্যায় এরূপ একটু আধটু অসঙ্গতি থাকিয়াই যায়—যে, যেখানে বৃত্র জল বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে ঋগ্বেদে সর্ব্বত্রই অদ্রি, গিরি, পর্ব্বত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, মেঘ বলিয়া নহে। তিলক ও হিলেব্রাণ্ড উভয়েই বলিতেছেন অদ্রি পর্ব্বত প্রভৃতি এমন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ওগুলিকে উপমা বলিয়া উড়াইয়া দিলে সুব্যাখ্যা হইবে না। পর্ব্বতকে পর্ব্বত রাখিয়াই ইহার ব্যাখ্যা সম্ভব, তাহাতে মেঘকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে না, অথচ তদনুযায়ী প্রাকৃতিক ঘটনাও মিলিয়া যাইবে। হিলেব্রাণ্ড

* মূল গ্রন্থ পাঠ করিবার আমার সুযোগ হয় নাই, কোনও কালে হইবে সে আশাও নাই। Indian Thought নামক ত্রৈমাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যায় অধ্যাপক থিব (Thibaut) ঐ গ্রন্থের যে সমালোচনা করিয়াছেন, আমি তাহা হইতেই এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

প্রথমতঃ দেখাইয়াছেন যে বৈদিক আখ্যান ও পরবর্ত্তীকালে মেঘকেই লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া যে সকল আখ্যান প্রস্তুত হইয়াছে উভয়ের মধ্যে ভাষা ও উপমা ইত্যাদিতে বিস্তর পার্থক্য। মনে হয় যেন দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়ের বর্ণনা পাঠ করিতেছি। অন্যদিকে আবার তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে,—যেমন লাটিন, নানা শাখায় বিভক্ত প্রাচীন টিউটনিক, বর্ত্তমান ইংরাজী, জার্ম্মান্, সুইডিস্ প্রভৃতি ভাষা হইতে—গাথা সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহাদের সঙ্গে বৈদিক আখ্যানের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রহিয়াছে। কিন্তু এ সব সাহিত্যে তো গ্রীষ্ম বর্ষার বিবাদ নয়, এ যে শীত বসন্তের কোন্দল। এই সব উত্তর প্রদেশের সাহিত্যের বর্ণনীয় বিষয় এই, যে, শীত নদী প্রস্রবণ সকল আটকাইয়া রাখিয়াছে, বসন্ত আসিয়া তাহাদের শিকল ছিঁড়িয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিল এবং তাহারা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়া চলিল। বেদে বর্ণনীয় বিষয়, বৃত্র জলস্রোত পর্ব্বতে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া শৃঙ্খলরূপে যেন তাহার চারি পাশে ঘিরিয়া রহিয়াছে, ইন্দ্র অসুরকে বধ করিয়া জলস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিলেন। অর্থাৎ বৃত্র মেঘাসুর বা গ্রীষ্মাসুর নহেন কিন্তু শিশিরদানব, যে পর্ব্বতগহ্বরে জলস্রোত বরফাকারে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ইন্দ্রদেব বসন্ত-সূর্য্যরূপে আবির্ভূত হইয়া সে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন কিন্তু ইহা যে ভারতের কোনও প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে মিলে না তাহার কি? পৃথিবীর উত্তর প্রদেশ সকলে শীতকাল অতি দীর্ঘ এবং শীতের অত্যাচারে সমস্ত প্রকৃতি একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। সেখানে শীতকালকে দানবকাণ্ড মনে করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। আবার যখন শীতান্তে বসন্তের আগমনে অসুরকরকবলিতা পীড়িতা প্রকৃতি মুক্তিলাভ করতঃ নব ভাবে নব আনন্দে জাগরিতা হইয়া উঠেন, বিশেষভাবে জলস্রোত তুষার বন্ধনমুক্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে পর্ব্বতকন্দর হইতে নামিয়া আসিয়া ধরণীতল প্লাবিত করতঃ আবার সুশ্যামল তৃণগুল্মে ধরাপৃষ্ঠ সুশোভিত করিয়া তোলে, তখন তাহাকে দেবতার কৃপা বলিয়া মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করাটাও কিছু বিস্ময়কর নহে এবং উত্তর দেশের কবিগণের কাছে এ গাথা কখনও পুরাতন না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যে ইহার অনুরূপ ঘটনা কোথায়? প্রশ্ন এই, ঋগ্বেদের কোনও সমস্যার পূরণের জন্য কি ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকাটা অপরিহার্য্য? আর্য্যগণ যে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নহেন, তাঁহারা যে কোনও উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন ইহা তো সর্ব্ববাদীসম্মত কথা। তাঁহারা পঞ্চনদ প্রদেশে বসিয়া বেদ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহার উপাদান উক্ত দেশ হইতে নাইবা সংগ্রহ করিলেন? এ কথাটা পণ্ডিতগণ বহু দিন পূর্ব্বেই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে ঋগ্বেদের কবি কোন কোন বিষয়ে এমন ভাবে কথা বলেন যাহাতে মনে হয়, যাহা তিনি বর্ণনা করিতেছেন তাহা তাঁহার নিজের গোচর কখনও হয় নাই, কেবল জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই বলিতেছেন। এমন কি, সময়ে সময়ে মনে হয় যে বর্ণিতব্য বিষয়ের উপলক্ষিত দেব বা দানবের অর্থ কি তাহাও যেন তাঁহার বুদ্ধির অধিগম্য নহে। সুতরাং এখন যদি মনে করা যায় যে ইন্দ্র-বৃত্র-সংবাদের উপাদান তাঁহারা আপনাদের আদিম আবাসভূমির ঘটনা হইতে সংগ্রহ করিয়া মৌখিক আখ্যায়িকারূপে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তারপর লিখনপ্রণালীর আবিষ্কার হইলে স্মৃতি হইতে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তবে কি একটা অসম্ভব কল্পনার আশ্রয় লওয়া হয়? তিলক বলিতেছেন, এ রূপকের উপাদান আর্য্যগণ আদি বাসভূমি সুমেরু প্রদেশ হইতে লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মতে বৃত্র যে জল হরণ করে তাহা আর কিছুই নহে cosmic waters বা watery vapours যাহা সেই মেরু প্রদেশের সুদীর্ঘ শীতরজনীর অন্ধকারে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কোন্ পাতাল পুরীতে চলিয়া যায়। একটী সুন্দর ছবির সাহায্যে তিনি এই বিষয়টী বুঝাইয়া দিয়াছেন। কেন যে পরবর্ত্তী সময়ে বৃত্রকে সর্প রূপে কল্পনা করা হইয়াছে উক্ত চিত্রে তাহারও আভাস পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার সঙ্গে এতদূর যাইবার জন্য এখন প্রস্তুত না হইলেও আমাদের মতন আর্য্যসন্তানদিগকে আর্য্যদেশ ও ম্লেচ্ছদেশের পার্থক্য ভুলিয়া বাপ পিতামহের অনুসন্ধানে একটু ঘরের বাহির হইতে হইতেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আফগানিস্থান হইতে বাহির হইয়া

হিরাত ও বল্‌খের মধ্য দিয়া তুর্কীস্থানে উপস্থিত হইলেই বেদের ব্যাখ্যাটা ভাল পাওয়া যাইতেছে। আরও যতই উত্তরে যাওয়া যায় বৃত্রসংহার কাব্যের ততই ভাল ভাষ্য মিলে। কেননা, ঐ সব স্থানে বৎসরের সর্ব্বপ্রধান ঘটনাই হইতেছে বসন্তের আগমনে শীতের হস্ত হইতে প্রকৃতির বন্ধনমোচন। ইরানিয়ান ও আর্ম্মানিয়ানদিগের পৌরাণিক কাহিনীতে দুই দেবতার নাম আছে—বেরেথ্রঘ্ন বা বহগন্ (Verethraghna and Vahagn)। আমাদের বাড়ীর ঐ বৃত্রহন্ বা বৃত্রঘ্ন ঠাকুরের নাম বলিয়াই মনে হইতেছে। আর্য্যগণ আসিতে আসিতে নামটা রাস্তায় ফেলিয়া আসিয়াছেন মাত্র। সুতরাং এখন বোধ হয় আর বেশী কথার প্রয়োজন নাই। আমাদের এই বৃত্রবধরূপ চিরপরিচিত উপাখ্যানটীর ভিত্তি খুঁজিতে আমাদিগকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া অনেকদূর যাইতে হইবে।

আজ এই জ্ঞানবিজ্ঞানালোকিত বিংশ শতাব্দীতে সুজলা সুফলা বঙ্গদেশে বসিয়া কালা বাঙ্গালী আমরা যে "বৃত্র-সংহার" কাব্যের রসাস্বাদন করতঃ আনন্দ উপভোগ করিতেছি, কোন্ সুদূর অতীতে, আর্য্যপিতামহগণের এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রে আপনাদের বাসভূমি নির্দ্দেশ করিবার কত শত যুগ আগে, কোন্ শীতপীড়িত উদ্ভিদহীন উত্তরকুরুতে, হয়তো বা মনোহারিণী উষার সেই সুমেরুপ্রস্থে, অন্ততঃ দ্বাদশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্বেতকায় আর্য্যগণের হৃদয়ে তাহার গোড়া পত্তন হইয়াছিল, এ কথা ভাবিতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে! প্রাচীন ও নবীনের কি অপূর্ব্ব মিলন! শ্বেত ও শ্যামলের, দেশের ও কালের ব্যবধান কি অকিঞ্চিৎকর! সেই সুমেরু হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড পিতৃপুরুষগণের পদরেণুতে অতি পবিত্র! এখন যদি কেহ ভারতবর্ষের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া—তাহা পঞ্চনদই হউক আর ব্রহ্মদেশই হউক—কেবল জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করতঃ বলেন, এই ছিল দধীচির আশ্রম, আর ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ঐখানে বৃত্র পড়িয়া গিয়াছিল—ঐ দেখ গর্ত্তপানা হইয়া রহিয়াছে, তবে তাহা নিশ্চয়ই ইতিহাস হইবে না। আমরা দেখিলাম, পৌরাণিক উপাখ্যান হইতে ইতিহাসের মাল মস্‌লা সংগ্রহ করিবার পক্ষে বহু বিঘ্ন হিমালয়ের মত মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া নিশ্চিত সত্যে পৌঁছিতে হইলে কি গভীর জ্ঞান, কি অগাধ পাণ্ডিত্য, কি বিপুল সংগ্রহ, কি বিরাট আয়োজন, কি ঐকান্তিক চেষ্টা, কি অমানুষী পরিশ্রম এবং কি অপরাজেয় অধ্যবসায়ের প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। গিজো (Guizot), গিবন (Gibbon), বাক্লের (Buckle) ন্যায় সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগী পক্ষপাতশূন্য নির্লিপ্ত ইতিহাসগ্রস্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব ছাড়া প্রকৃত ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। কেবল সত্যের অনুসন্ধান —আর সকল চিন্তা হইতে হৃদয়কে উন্মুক্ত করিতে হইবে। কোনও বিশেষ মতের দাসত্ব লইয়া ইতিহাস হয় না। এটা গ্রহণ করিব না তাহা হইলে ভারতের প্রাচীনত্ব খণ্ডিত হয়, উহা পরিত্যাজ্য, কেননা, উহা দ্বারা হিন্দুজাতির মহিমা খর্ব্ব হইতে পারে ইত্যাদি চিন্তা ঐতিহাসিকের নহে। যদি সত্যের উদ্ধারের জন্য শত সহস্র বর্ষের প্রাচীন অট্টালিকা ভূমিসাৎ করিতে হয়, কি করিব—নাচার। অর্থাৎ একেবারে নির্লিপ্ত নিস্পৃহ সন্ন্যাসী হইতে হইবে। নতুবা ভারতে ইতিহাসের পত্তন হইবে না। ইতিহাস যতই কেন গৌরবমণ্ডিত হউক না, তাহা যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তাহা দ্বারা জাতীয় কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। ঋষি বলিয়াছেন—"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।" "সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি।"

মন্তব্য—কেন সকল জাতির মধ্যে এমন করিয়া অনিবার্য্যরূপে পুরাণের আবির্ভাব হইল ভাষার দিক হইতে তাহার একটা উত্তর আছে। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি জাতীয় জীবনেও শৈশব দেখা যায়। শিশুর ভাষার সংস্থান অত্যল্প। সে কয়েকটিমাত্র কথা শিখিয়া রাখিয়াছে যাহা সে সব বিষয়েই প্রয়োগ করে। সে কুকুর বিড়ালের কথাই বলুক আর জল বায়ুর বিষয়ই ভাবুক, সে মানুষকেই ডাকুক আর চন্দ্র সূর্য্যকেই আহ্বান করুক, ভাষা তার এক আকারই ধারণ করে। এই বিভিন্ন জাতীয় বস্তু সকলের সম্বন্ধে কথা বলিতে যাইয়া যে বিভিন্ন প্রকারের ভাষা, অন্তত বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতে হইবে সে জ্ঞান তাহার পরিস্ফুট হয় নাই। "পবন বহিতেছে" বা "পবন দৌড়িতেছে" এই দুইএর মধ্যে এক "পবন" বায়ু

আর এক "পবন" যে মানুষ তাহা ক্রিয়াপদের সাহায্যে অতি সহজেই আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ। কিন্তু যেখানে ভাষার অপ্রাচুর্য্য বশতঃ দুই স্থলে একই ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতে হয় সেখানে আখ্যায়িকাংশের বংশপরিচয় অসাধ্য হইয়া উঠে। মানবজাতির শৈশবেও ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল। ভাষার অভাব বশতঃ সকল ঘটনাই তাঁহারা এক বা অনুরূপ ভাষায় আখ্যায়িকাবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার বর্ণনা করিতে যে ভাষা, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধির বর্ণনায়ও সেই ভাষা, নৈসর্গিক ঘটনাবলির জন্যও সেই ভাষা। কিন্তু ভাষার দৈন্য চিরদিন থাকে নাই। ক্রমে ক্রমে জ্যোতিষিক ঘটনা বর্ণনা করিবার ভাষা হইতে নৈসর্গিক ঘটনা বর্ণনা করিবার ভাষা পৃথক হইল এবং মানবীয় ঘটনাবলি বর্ণনা করিবার ভাষা উভয় হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল, কিন্তু প্রাচীন উপাখ্যানগুলির ভাষা তো আর সেই সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইল না। কার ঘাড়ে দুটি মাথা যে বেদের ভাষা বদ্‌লাইতে যাইবে! আখ্যায়িকাগুলি রহিল কিন্তু কোন আখ্যায়িকা কোন কুলভুক্ত তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য আখ্যায়িকার রচয়িতা সেই প্রাচীন মানবসমূহ তো আর আজ বিদ্যমান নাই। সুতরাং বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কলহ, দেবাসুরে সংগ্রাম, ইন্দ্র-বৃত্রসংবাদ ও দক্ষযজ্ঞ এক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পুরাণের সৃষ্টি করিল। ইহাই একমাত্র না হইলেও পুরাণ সৃষ্টির একটী মুখ্যতম কারণ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

অকালবার্দ্ধক্য নিবারণ ও দীর্ঘ জীবনলাভের উপায়

জগতে প্রত্যেক জীবশ্রেণীর একটা করিয়া নির্দ্দিষ্ট জীবিত কাল আছে। কোন জীবের স্বাভাবিক পরমায়ু একশত বৎসর, কাহারও বা ৫০, কাহারও ১৫ বৎসর, আবার কতগুলি কীট পতঙ্গ আছে যাহাদের জীবনলীলা ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়।

এখন প্রশ্ন এই—মনুষ্যের স্বাভাবিক পরমায়ু কত বৎসর? শুনিতে পাওয়া যায় সত্যযুগে মানুষের পরমায়ু অসম্ভব দীর্ঘ ছিল—আমরা সত্যযুগের মানুষ নই সুতরাং সে সময়ের কথায় আমাদের কোন আবশ্যক নাই। বর্ত্তমান যুগে মনুষ্যের পরমায়ু কি—তাহাই আমাদের বিবেচনার বিষয়। ইতিহাস যতদিনের সংবাদ দিতে পারে, তাহা হইতে বোধ হয় মানুষের পরমায়ু সাধারণতঃ ৭০।৮০ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। সত্য বটে কেহ কেহ এই নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়াও বাঁচিয়া থাকে কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত খুব যে বেশি তাহা নহে।

১৯০১ সালের ইংলণ্ডের General Register দৃষ্টে দেখা যায় যে সে বৎসর ইংলণ্ডে ৯০ বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা ৯৫৩৮ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৩০৫৬ আর স্ত্রী ৬৪৮২। আর যাহারা ১০০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা ১৪৬ জন; ইহার মধ্যে পুরুষ ৪৭ আর স্ত্রী ৯৯ জন।

যে সকল ব্যক্তি দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছে তাহাদের জীবনযাপনের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার প্রভৃতির আলোচনা করিলে, দীর্ঘ জীবনের অনুকূল অবস্থাসমূহের একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। যত দূর দেখা যায় ইহাঁরা প্রায় সকলেই মিতাচারী; মৎস্য মাংস অল্পই ভক্ষণ করে; নিয়মিত পরিশ্রম করে; আহার বিহার সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খল নহে; প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করে; ইহাদের প্রকৃতি মধুর গুণযুক্ত; ইহারা সর্ব্বদাই হৃষ্টচিত্ত—সকল অবস্থায়ই সুখ ও আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ।

সত্য বটে কোন কোন অলসপ্রকৃতি, উচ্ছৃঙ্খল ভোগৈশ্বর্য্যরত ব্যক্তিকেও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়—এরূপ ঘটনা কিন্তু সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত বলিয়াই মনে করা কর্ত্তব্য।

যে সকল নিয়ম পালন করিলে স্বাস্থ্যলাভ ও তাহা রক্ষিত হয় এবং যে সকল আচরণ দ্বারা উহার হানি হয় সেগুলি আমাদের সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। কেন না পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি পালন করিলে শরীর নীরোগ ও জীবন দীর্ঘায়ু হয়। আর শেষোক্ত আচরণের দ্বারা পরমায়ুর হ্রাস হয়।

আমরা কাহাকেও কাহাকেও বলিতে শুনিয়াছি যে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে হইলে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হয়, সেগুলি অতীব দুরূহ ও কষ্টসাধ্য, সুতরাং এরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া ক্লান্তিকর বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া এমনই বা লাভ কি? তদপেক্ষা জীবনের সুখ ও বিলাসৈশ্বর্য্য প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়া বৃদ্ধ ও অথর্ব্ব হইবার পূর্ব্বেই জীবনলীলা সাঙ্গ করা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। বলা বাহুল্য এরূপ যুক্তি নিতান্তই ভ্রমাত্মক, কেন না আমরা যে বার্দ্ধক্যের কথা বলিতেছি তাহা কোনরূপেই ক্লান্তিকর বা ক্লেশকর নহে; ইহাতে মানুষ অথর্ব্ব হয় না; আনন্দের অভাব হয় না; শারীরিক ও মানসিক শক্তিসামর্থ্য রক্ষিত হয়; আর একরূপ যন্ত্রণাবিহীন সহজ মৃত্যু দ্বারা ইহার সমাপ্তি হয়।

দীর্ঘ জীবনলাভের সঙ্গে সুখসম্ভোগ ও আমোদ-প্রমোদাদির যে চিরশত্রুতা আছে তাহা নহে। ইহা লাভ করিতে হইলে যে কঠোর সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে তাহারও কোন অর্থ নাই। সংযত হইয়া সকল প্রকার সুখই ভোগ করিতে পাবা যায়। তাহাতে পরমায়ুর হ্রাস হয় না।

যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খল হইলে চলিবে না। উহাতে পরমায়ুর হ্রাস হয় ও জীবন দুঃখময় হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় দীর্ঘায়ু অনেক স্থলে কৌলিক। যে সকল ব্যক্তির পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষগণ দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছে, তাহাদের পক্ষে দীর্ঘায়ুর আশা করা অন্যায় বা অসঙ্গত নয়, কিন্তু চেষ্টা করিলে স্বল্পায়ু বংশীয়েরা যে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে না পারে এমন নয়। কুলক্রমাগত দোষ অথবা গুণ ভাবী বংশধরের উপর যে নিশ্চয়ই বর্ত্তিবে এমন কোন কথা নাই। দীর্ঘজীবীর সন্তানদিগের যেমন অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা, স্বল্পজীবীর বংশধর-দিগেরও আবার চেষ্টা দ্বারা দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার তুল্যই সম্ভাবনা। আমরা এমন অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারি যেখানে অমিতাচারের জন্য দীর্ঘায়ুবংশীয়েরা স্বল্পায়ু হইয়াছে আর স্বল্পায়ুবংশীয়েরা মিতাচার ও সংযম অবলম্বন করিয়া এবং বিশেষ বাছিয়া বুঝিয়া বিবাহ করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছে।

স্বল্পায়ু বংশীয়দের দেখা উচিত তাহাদের পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দিগের মৃত্যুর কারণ কি? বহুমূত্র না হৃদ্‌রোগ, শ্বাস রোগ না ক্ষয়কাশ, না অন্য কোন রোগ। বাল্যকাল হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিলে এই সব কুল-ক্রমাগত রোগ প্রায়ই নিবারিত হয়, সুতরাং অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না।

শৈশব হইতে মিতাচার, পরিশ্রম ও breathing exercise বা প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতির রোগ সহজে হইতে পারে না। কোন ব্যক্তির কৌলিক বিশেষত্ব কি, তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তি কতদূর, তাহার আচার ব্যবহারই বা কিরূপ, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয় বা কেমন, এই সকলের সম্ভবমত বিচার করিয়া তাহাকে অনায়াসে দীর্ঘ জীবন লাভের পক্ষে অনুকূল পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে।

যাহার দেহযন্ত্রটির যে অংশটি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল সেই অংশটিকে সবল করিবার জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই কথাটি আমরা যেন কখনও না ভুলি—আমরা ঘরেই থাকি আর বাহিরেই থাকি সব সময় আমা-দের প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা উচিত। ইহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং ব্যাধির আক্রমণও বহুল পরিমাণে হ্রাস হয়।

বৃদ্ধ বয়সে শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও অংশ প্রত্যংশের এত বেশি ক্ষয় হয় যে শেষে আর তাহারা উহাদের নিজ নিজ কার্য্য করিতে পারে না, সুতরাং মৃত্যু ঘটে। আমাদের দেহের যত কিছু ক্ষয় হয় তাহা রক্ত হইতে পরিপূরিত হয়। আমরা যাহা আহার করি তাহা হইতে রক্ত নির্ম্মিত হয়। কেহ যদি কিছু দিন আহার না করে তাহা হইলে তাহার শরীর শুকাইয়া শেষে মৃত্যু হয়। আমাদের শরীরের প্রত্যেক অংশ প্রত্যংশে কতকগুলি করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী আছে, তাহাদের মধ্য দিয়া শরীরের প্রত্যেক অংশ প্রত্যংশে রক্ত গমন করিয়া থাকে। বৃদ্ধ হইলে এই সকল ধমনীর অনেকগুলি শুকাইয়া যায় সুতরাং শরীরের যন্ত্রাদি ও অংশ প্রত্যংশের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় রক্ত যাইতে পায় না। এই কারণে তাহা-দের সম্পূর্ণ ক্ষয়পূরণ হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত বৃদ্ধ হইলে শরীরের যে সকল যন্ত্রে রক্ত প্রস্তুত হয় তাহারাও

তাহাদের কাজ ভাল করিয়া করিতে পারে না; ইহার ফলে শরীরে মোটের উপর রক্তের পরিমাণও হ্রাস হয়।

আমাদের এমন চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে বার্দ্ধক্য-জনিত এই ক্ষয় শীঘ্র হইতে না পারে। ইহার একমাত্র উপায় নিয়মিতভাবে শরীরের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখা। কোন যন্ত্রকে যদি না খাটান যায় তাহা হইলে অবিলম্বে উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই কারণে আমাদের আলস্য ত্যাগ করিয়া নিয়মিত ভাবে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রমই করা কর্ত্তব্য। আমাদের শরীরের কোন যন্ত্র যখন কার্য্যে নিযুক্ত হয় তখন উহার ধমনীগুলি প্রসারিত হয় সুতরাং ঐ যন্ত্রের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রক্ত গমন করে—অধিক রক্ত গমন করার অর্থ—অধিকতর পরিমাণে পরিপোষক পদার্থ ও অম্লজান (oxygen) গমন করা। ইহার ফলে যন্ত্রটির পরিণতি ও পরিপোষণ সুচারুভাবে সম্পাদিত হইতে থাকে। মাংসপেশীই বল আর মস্তিষ্কই বল শরীরের সকল অংশই পরিশ্রম দ্বারা এইরূপে উন্নতি প্রাপ্ত হয়। সুস্থ অবস্থায় ধমনীগুলি কতকটা রবারের ন্যায় স্থিতিস্থাপক; এই নিমিত্ত যখন উহা-দের মধ্যে অধিক রক্ত যায় উহাদের কলেবরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বার্দ্ধক্যে ধমনীগুলির এই স্থিতিস্থাপক গুণের হ্রাস অথবা লোপ হয়। তখন আর উহাদের মধ্যে অধিক রক্ত যাইতে পারে না। ধমনীগুলির স্থিতিস্থাপকতা যতই হ্রাস হইতে থাকিবে ইন্দ্রিয়াদির পরিপোষণ ততই মন্দীভূত হইতে থাকিবে। ধমনীগুলির এই যে অবনতি—ইহা কেবল পরিশ্রম ও ব্যায়ামাদির দ্বারা নিবারণ সম্ভব। কেন না এই সময়ে ইহারা বড় হয় আর বিশ্রামকালে ক্ষুদ্র হয়, সুতরাং ইহাদের বড় ছোট হওয়া শক্তি লোপ পাইতে পারে না। পরিশ্রম দ্বারা ধমনীগুলির যেমন উন্নতি হয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডেরও উন্নতি সাধিত হয়। এক কথায় ব্যায়ামাদির দ্বারা রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া ভাল হয়—রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া ভালরূপ হইতে থাকিলে শরীরের পোষণ ও গঠন ক্রিয়াও ভাল করিয়া হইতে থাকে। কেন না মস্তিষ্কই বল, মাংসপেশীই বল—কি শরীরের আর কোন অংশই বল তাহারা নিজ নিজ পরিপোষণের উপাদান রক্ত হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকে। অধ্যাপক হক্সলি রক্তকে গ্রামবাহিনী নদীর সঙ্গে তুলনা করিয়া-ছেন—তুলনাটি সঙ্গত ও উপযুক্তই হইয়াছে। নদীটি গ্রামের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়—গৃহস্থ তাহাদের নিজ নিজ ঘাট হইতে আবশ্যকমত জল তুলিয়া লয়—আর গৃহের যত আবর্জ্জনা ময়লা প্রভৃতি নদীতে ফেলিয়া দেয়, স্রোতে এ সকল কোথায় ভাসিয়া যায়। আমাদের রক্ত যেন নদীর জল—রক্তবহা নাড়ীগুলি যেন নদীর গর্ভ—আর গ্রামস্থ গৃহস্থগণ যেন আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল। কোন কারণে নদীর স্রোত যতই মন্দীভূত হয় গৃহস্থগণের অসুবিধাও ততই বেশি হয়। আর নদীটি যদি একবারে শুষ্ক হইয়া যায় জলাভাবে গ্রাম-বাসিগণের জীবনরক্ষাও অসম্ভব হয়। আবার নদীতে যতই জল থাকুক না কেন গ্রামবাসিগণ যদি উহা তুলিয়া কলসী পূর্ণ করিতে না পারে তাহা হইলেও ইহাদের জীবনরক্ষা তুল্যরূপেই অসম্ভব। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যখন রক্ত যায়, তখনই কেবল তাহারা উহা হইতে নিজেদের ক্ষয় পরিপূরণোপযোগী পদার্থসমূহ আহরণ করিতে পারে আর পরিত্যজ্য দূষিত পদার্থসমূহ নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়, অন্য সময় নয়। তাহাদের কাহারও মধ্যে যদি রক্ত যাওয়া বন্ধ হয় তাহা হইলে ইহার আর বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়। তা এ সময় শরীরের অন্যান্য অংশে যতই রক্ত কেন থাকুক না শরীরের এ অংশের উহাতে কিছুই আসে যায় না।

হৃৎপিণ্ড ও ধমনীগুলির অবস্থা সকলের ঠিক একরূপ নয়। এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা মোটেই পরিশ্রম করে না, অথচ উহাদিগের হৃৎপিণ্ড ও ধমনীগুলি বহু বৎসর ধরিয়া কার্য্যক্ষম থাকে। আবার এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা পরিশ্রম না করিয়া যদি বসিয়া থাকে দেখিতে দেখিতে অল্পকাল মধ্যেই তাহা-দের হৃৎপিণ্ড ও ধমনীগুলির অবনতি হয়। এই দোষটা অনেক সময় কুলাগত বলিয়াই বোধ হয়। ইহা দূর করিবার প্রধান উপায় নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম বা অঙ্গ চালনা করা। ব্যায়াম অবশ্য নানা উপায়ে করিতে পারা যায়; তবে সকলের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সহজসাধ্য ব্যায়াম হইতেছে ভ্রমণ। ভ্রমণে শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের

উপর কাজ হয়। কেমন করিয়া হয় বলিতেছি ; পায়ের মাংসপেশীগুলির সংকুঞ্চন কালে পেশীগুলির ধমনী সকলের মধ্যে অধিকতর পরিমাণে রক্ত প্রবেশ করে। আর পেশীগুলির চাপ লাগিয়া পায়ের শিরাগুলির রক্ত হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে দ্রুততর বেগে গমন করে। হৃৎপিণ্ডে এইরূপে অধিক রক্ত যাওয়ায় হৃৎপিণ্ডের সংকুঞ্চন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুততর ও প্রবলতর ভাবে সম্পাদিত হইতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের যেমন ক্রিয়া বৃদ্ধি হয় সেই সঙ্গে ফুস্‌ফুস-গুলিরও ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভ্রমণের দ্বারা হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্ দুইয়েরই পুষ্টি ও উন্নতি হয়। পেটের মধ্যে যে সকল যন্ত্র আছে ভ্রমণের সময় উহাদের মধ্যেও অধিক রক্ত চলাচল করে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইলে শরীরের সর্ব্বত্রই অধিক রক্ত গমনাগমন করে। ভ্রমণের দ্বারা এইরূপে শরীরের প্রতি অংশ প্রত্যংশের পুষ্টি ও উন্নতি সাধিত হয়। আমাদের দেহের মধ্যে, রক্ত ও শরীরের প্রত্যেক অংশ প্রত্যংশের নিয়ত যেন একটা অদলবদল চলিতেছে। ভ্রমণ সময়ে এই অদল বদলটা খুব শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে। শরীরের অংশ প্রত্যংশ হইতে দূষিত পরিত্যজ্য পদার্থ-মিশ্রিত রস রক্তে গমন করে—আর পরিপোষক পদার্থ-মিশ্রিত রস রক্ত হইতে শরীরের অংশ প্রত্যংশে গমন করে। ভ্রমণকালে এই পরিবর্ত্তন শীঘ্র শীঘ্র হয় বলিয়া শরীরের অপকারক পদার্থনিচয় সঙ্গে সঙ্গে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, আর শরীরের ক্ষয়পূরণ ও পোষণ-কার্য্যও দ্রুতবেগে সম্পাদিত হয়। ভ্রমণের দ্বারা শুধু যে পায়ের পেশীগুলি উন্নত ও দৃঢ় হয় তা নয় তাবৎ পেশী-গুলিরই উন্নতি হইতে দেখা যায়। মাংসপেশীকে না খাটাইয়া যদি বসাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই ইহারা শুকাইয়া যায়। বার্দ্ধক্যের প্রথম লক্ষণ মাংসপেশীগুলিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আগমনে সর্ব্বপ্রথমে মাংসপেশীর আয়তন ও কলেবর হ্রাস হয়। বার্দ্ধক্য নিবারণ করিতে হইলে আমাদের সর্ব্বপ্রথমে মাংসপেশীগুলিকে সুস্থ ও উন্নত রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল ভ্রমণ ও অন্যান্য ব্যায়ামের দ্বারা এই অভিপ্রায়টি সিদ্ধ হওয়ার সম্ভব। এখন প্রশ্ন এই আমাদের প্রতিদিন কতখানি ভ্রমণ করা চাই? এবিষয়ে কোন একটা সাধারণ নিয়ম নাই। ব্যক্তিবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে ভ্রমণের হ্রাস বৃদ্ধির আবশ্যক হয়। কাহার কাহার পক্ষে দৈনিক অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ভ্রমণেই যথেষ্ট পরিশ্রম হয়, কাহারও কাহারও বা ৩ ঘণ্টা ভ্রমণের আবশ্যক হয়। বৃদ্ধদিগের অপেক্ষা যুবকেরা অধিক ভ্রমণ করিতে সক্ষম। আবার অভ্যাস দ্বারা বৃদ্ধরাও বহুদিন ধরিয়া অনেক দূর ভ্রমণ করিতে পারে। ভ্রমণের বেগও আবার সকলের পক্ষে একরূপ হইলে চলিবে না, ব্যক্তি-বিশেষে ও অবস্থাবিশেষে ইহারও তারতম্য হওয়ার আবশ্যক। স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে ঘণ্টায় দেড় মাইলের অধিক ভ্রমণ সঙ্গত নয়। আবার কাহার কাহার পক্ষে ঘণ্টায় ৪ মাইল ভ্রমণ করিলেও অসঙ্গত হয় না। যে সকল ব্যক্তির রক্ত সঞ্চলন ও শ্বাসযন্ত্রগুলি সবল তাহাদের পক্ষে সব সময় সমতল ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে চলিবে না। উচু নীচু জমির উপর দিয়াও ভ্রমণ করা আবশ্যক।

বাদলা বৃষ্টিতে অভ্যস্ত ভ্রমণ বন্ধ করিতে নাই। অবশ্য দুর্ব্বল রুগ্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে অন্য কথা। অনেক সবল ব্যক্তিও এইরূপ অভিযোগ করেন যে ঠাণ্ডায় বাহির হইলেই তাঁহাদের সর্দ্দি কিম্বা বাত হয়। এই ভয়ে ঠাণ্ডা দিনে তাঁহারা ঘরের বাহির হয়েন না। প্রথম প্রথম ঠাণ্ডায় বাহির হইলে এইরূপ হয় বটে, কিন্তু কিছুদিন অভ্যাসের পর আর তাহা হইতে দেখা যায় না, তখন সকল ঋতুতেই ভ্রমণ সম্ভব হয় ; আর তাহাতে শরীর এমন দৃঢ় ও মজবুৎ হয় যে, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে কোনরূপই অসুবিধা হয় না। প্রাত্যহিক ভ্রমণ ছাড়া সপ্তাহে একদিন দীর্ঘ ভ্রমণের আবশ্যক। দুর্ব্বল ও জরাগ্রস্ত অথর্ব্ব ব্যক্তি-দিগের পক্ষে অবশ্য ইহার আবশ্যক নাই। ব্যক্তিগত সামর্থ্যানুসারে এই ভ্রমণ ৩ ঘণ্টা হইতে ৬ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হওয়ার আবশ্যক। এসময় মধ্যে কিছু আহার অথবা পান না করিলেই ভাল হয়। বড় জোর কিছু মুড়ি বা বিস্কুট আর একটা আধটা ফল খাওয়া যাইতে পারে। এই সময় শরীরের ওজন কতকটা হ্রাস হইতে দেখা যায়, কারণ ঘর্ম্মের আকারে শরীরের কতক জলীয় অংশ ও উহার সহিত কতকগুলি অপকারক পরিত্যজ্য পদার্থ নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। শরীর হইতে জলীয় অংশ যেমন বাহির হয়

জলপান ও আহারাদি দ্বারা তাহা পরিপূরণ না করায় দেহের অংশবিশেষগুলি কতকটা যেন ক্ষুধাতুর হইয়া পড়ে, সুতরাং ভ্রমণান্তর যখন আহার করা যায় তাহা দ্বারায় শরীরের পোষণকার্য্যটি পূর্ব্বাপেক্ষা সুচারুরূপে হইতে থাকে।

অনেকে মনে করেন পরিশ্রম করিলে শরীরের বেশি ক্ষয় হয় অনিষ্ট হয়, আর বসিয়া থাকিলে তাহা হয় না। অতিরিক্ত পরিশ্রম অবশ্যই শরীরের হানিকর স্বীকার করি কিন্তু পরিমিত ও নিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা হানি না হইয়া বরঞ্চ ভালই হয়। শারীর যন্ত্র আর কল ঠিক এক নয়। শারীরযন্ত্র জীবন্ত উপাদানে নির্ম্মিত আর লৌহ চর্ম্ম কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা কল নির্ম্মিত। জীবন্ত পদার্থের এমন একটা গুণ আছে যাহাতে পরিশ্রমের জন্য উহার যে ক্ষয় হয় অবিলম্বে তাহা পরিপূরিত হয়, আর শ্রম না করিলে উহার ধ্বংস হয়। কলের বেলায় তাহা হয় না। উহা যতই কাজ করিবে উহার ততই ক্ষয় হইতে থাকিবে। অনেকে মনে করেন বৃদ্ধবয়সে আর পরিশ্রম করা উচিত নয়, এ সময় বিশ্রামসুখ উপভোগ করাই কর্ত্তব্য। ইহা অতিশয় ভুল ধারণা। বৃদ্ধের ক্ষমতা ও সামর্থ্যানুসারে প্রতিদিন ভ্রমণ করা উচিত, না করিলে অচিরে তাহার শক্তিসামর্থ্য লোপ পাইতে থাকিবে, বৃদ্ধ বয়সে যদি কোন একটা অভ্যাস দুই এক দিনের জন্য ত্যাগ করা যায় তবে তাহা আর পুনরায় হইবার আশা থাকে না—বাল্যে ও যৌবনে তাহা হইতে পারে—এই জন্য বৃদ্ধ বয়সে একদিনের জন্যও ভ্রমণ বন্ধ করা উচিত নয়।

ব্যায়ামই বল আর ভ্রমণই বল ইহা যদি খোলা জায়গায় করা যায় তবেই ইহার দ্বারা পূর্ণমাত্রায় সুফলের প্রত্যাশা করা সম্ভব, নচেৎ নহে। মুক্ত বায়ুতে ব্যায়ামাদি করিলে দেহের ত্বক্, স্নায়ুমণ্ডলী ও পরিপাক যন্ত্রাদি সবল হয়; শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু ও রোগাদির প্রকোপ সহ্য করিবার মত দেহের প্রচুর শক্তি জন্মায়। এই শক্তি যাহার শরীরে যত পরিণতি প্রাপ্ত হয় তাহার জীবন তত দীর্ঘ হয়। যে সকল ব্যক্তি এতদূর দুর্ব্বল হইয়াছে যে কোন রূপ শ্রম বা ব্যায়াম তাহাদের পক্ষে একবারে অন্যায় ইহারাও যদি একটা খোলা জায়গায় দিবসের অধিকাংশ-কাল অতিবাহিত করে তাহা হইলে তাহাদের শরীরের বিশেষ উন্নতি হইতে দেখা যায়। যক্ষ্মা ও অন্যান্য ফুস্‌ফুসের রোগে মুক্তবায়ু সেবনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুসের রোগ ছাড়া অন্যান্য অনেক রোগেরও মুক্তবায়ুতে বাস করিলে উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। প্রাত্যহিক নিয়মিত ভ্রমণ ও সপ্তাহে এক দিবস দীর্ঘ ভ্রমণের উপর বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া যদি পর্ব্বতারোহণ ও মাসাবধি শৈলবাস করা যায় তাহা হইলে দেহের প্রতি অংশের আশ্চর্য্য উন্নতি হইতে দেখা যায়।

ক্রিকেট, ফুটবল, অশ্বারোহণ, সন্তরণ প্রভৃতির দ্বারাও যথেষ্ট অঙ্গচালনা হয় সুতরাং শরীরের উন্নতি হয়। পর্ব্বতারোহণকালে নিশ্বাস প্রশ্বাস গভীর হয়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও বৃদ্ধি হয়। এই সকল কারণে ফুস্‌ফুস ও হৃৎপিণ্ডের ভাল পরিপোষণ হয়। পর্ব্বতারোহণে ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের উপর যে ভাবের ক্রিয়া হয় breathing exercise অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম বা প্রাণায়াম দ্বারাও কিয়ৎপরিমাণে সেই উদ্দেশ্যই সাধিত হইতে পারে। Breathing exercise বা প্রাণায়াম্ সকলেই করিতে পারেন—তবে ব্যক্তিবিশেষে ও ব্যক্তিগত অবস্থা-বিশেষে ইহার পরিমাণ কম বেশি হওয়া আবশ্যক। নিউমোনিয়া (pnuemonia) প্লুরিসি (pleurisy) বাতজ্বর (rheumatic fever) প্রভৃতি কয়েকটি রোগ হইতে আরোগ্যমুখে breathing exercise বা প্রাণায়াম না করাই উচিত—করিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। প্রাণায়াম বা breathing exercise অভ্যাস করিবার কালে ইহা যেন ৫ মিনিট কালের অধিক স্থায়ী না হয়। আর প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস খুব বেশি গভীর ও দীর্ঘ করিবার চেষ্টা করিতে নাই। ক্রমে ক্রমে করিয়া অভ্যাস হইলে মিনিটে দুইবার মাত্র শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতে হয়। যাঁহারা যোগাভ্যাস করিয়াছেন তাঁহারা প্রাণায়ামের নানা প্রকার প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেন—সাধারণের পক্ষে আমরা সে সকল অনুমোদন করি না। আমরা যে প্রাণায়ামের অনুমোদন করি তাহা খুবই সহজসাধ্য ও নিরাপদ—ইহা ফুস্‌ফুস্ দুটির একপ্রকার ব্যায়ামমাত্র। আমরা যে প্রাণায়াম বা breathing exerciseএর উল্লেখ করিতেছি তাহা নিম্নবর্ণিতভাবে করিতে হয়। প্রাণায়ামকারী সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে গভীর নিশ্বাস

লইতে থাকিবেন আর সেই সঙ্গে বাহু দুটি উর্দ্ধে উত্তোলন করিতে থাকিবেন। এইরূপে নিশ্বাসদ্বারা ফুসফুস্ দুটি পূর্ণ হইলে প্রাণায়ামকারী তাঁহার শরীর অবনত করিতে করিতে ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ফেলিতে থাকিবেন আর তাহার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে ভূমি অথবা তাঁহার পাদদেশ স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিবেন। প্রশ্বাসকার্য্য শেষ হইলে পুনরায় ধীরে ধীরে সোজা হইতে হইবে আর পূর্ব্বের ন্যায় নিশ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে আর বাহু দুটী উর্দ্ধে উত্তোলন করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে ৫ মিনিটকাল শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম করিবেন। কিছু দিন এইরূপ করার পর প্রাণায়ামের উপকার স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে থাকিবে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত দেহকে যথাক্রমে উন্নত ও অবনত করার জন্য কোমরের মাংশপেশীগুলি সবল ও দৃঢ়তর হয়, কোমরের বাত বা বেদনা হইবার ভয় থাকে না। আবার প্রাণায়ামকালে নিশ্বাসগ্রহণ করার সময়ে মেরুদণ্ড ও ঘাড় যদি দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে ঘুরান যায় আর প্রশ্বাসের সময় বাম হইতে দাক্ষণ দিকে ঘুরান যায় তাহা হইলে ঘাড় ও পৃষ্ঠদেশের মাংসপেশীগুলিও দৃঢ় হয়; তাহার ফলে ঘাড়ে ফিক্ ধরিতে পারে না আর খুব বৃদ্ধ হইলেও পৃষ্ঠদেশ বক্র হয় না। বৃদ্ধকালে ফুসফুস্ দুটির একরূপ ক্ষয় হয়, প্রাণায়াম বা breathing exercise দ্বারা তাহা অনেকটা নিবারিত হয়। বক্ষপঞ্জরের স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকত্ব, যাহা বার্দ্ধক্যে নষ্ট হয়, তাহা ইহাতে বহু দিন অক্ষুণ্ণ রহে, সুতরাং ফুস্ফুসের ক্রিয়া উত্তম রূপেই চলিতে থাকে।

প্রতি দিন সকাল সন্ধ্যায় অন্ততঃ ৫ মিনিটকাল এইরূপে প্রাণায়াম করিতেই হইবে। ইহা ছাড়া ভ্রমণের সময়ও গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে পারিলে ভাল হয়। কেহ কেহ breathing exercise খুব ক্লান্তিকর ও বিরক্তিকর মনে করেন কিন্তু ইহার দ্বারা শরীর ও মনের যে পরিমাণ উন্নতি হয় তাহার তুলনায় এ কষ্টকে কষ্ট বলাই চলে না। যে সকল ব্যক্তির অল্প শ্রমেই হাঁপ ধরে তাঁহারা যদি কিছু দিন breathing exercise করেন তাহা হইলে ইহার উপকার হাতে হাতেই টের পাইবেন। যে সকল ব্যক্তি প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়াছে, তাহারা অল্পেতে ক্লান্ত হয় না, শারীরিক ও মানসিক শ্রম পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে করিতে সমর্থ হয়। যে সকল ব্যক্তি সাহিত্যসেবা করেন কিম্বা রাজনৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কিম্বা আইন অথবা চিকিৎসা ব্যবসায় করেন তাঁহাদের পক্ষে breathing exercise বা প্রাণায়াম কত যে উপকারী তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। ভ্রমণ ও প্রাণায়াম ব্যতীত আরও অনেক প্রকার ব্যায়ামের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেমন জিম্‌নাষ্টিক্, নৌকাবহা, অশ্বারোহণ, উদ্ভিদ্‌পালন, ফুটবল, ক্রিকেট, নানাবিধ গ্রাম্য ক্রীড়া, প্রভৃতি। এ সকলের আলোচনার এস্থলে কোন আবশ্যক নাই। ডাক্তার জি, অলিভার (G. Oliver) একপ্রকার ব্যায়ামের বিশেষ পক্ষপাতী, এস্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি ইহাকে static or tension exercise নাম দিয়াছেন। ইহাতে ১ মিনিট কিম্বা ২ মিনিট কাল হাত পা ও শরীরের অন্যান্য স্থলের মাংসপেশীগুলি শক্ত করিতে হয়। বাত, gout প্রভৃতি রোগে ইহাতে ভারি উপকার হয়। এই সকল রোগে শরীরের অংশ সকল হইতে পরিত্যজ্য বিষাক্ত পদার্থ শীঘ্র বাহির হইতে চাহে না, সেগুলি শরীরে থাকিয়া এই সব রোগ আনয়ন করে। ডাক্তার অলিভার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে দেহস্থ মাংসপেশীগুলিকে এক মিনিট কাল শক্ত করিয়া রাখিলে শতকরা ২০ ভাগ পরিত্যজ্য পদার্থ দেহ হইতে অবশ্যই নিষ্ক্রান্ত হয়। এই ব্যায়াম দিবসের ও রাত্রের আহারের ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে করিতে হয়।

রক্তসঞ্চলন প্রণালী ও শ্বাসপ্রশ্বাস প্রণালীর প্রতি আমাদের যেরূপ দৃষ্টি রাখিতে হইবে পাকযন্ত্র ও খাদ্যের উপরও ঠিক সেইরূপ দৃষ্টি রাখা দরকার। আহার সম্বন্ধে এমন কোন নিয়মের উল্লেখ করা যাইতে পারে না যাহা সকলের পক্ষেই উপযোগী হওয়া সম্ভব। এ বিষয়ে প্রত্যেকের কোন না কোন বিশেষত্ব থাকিতে দেখা যায় সুতরাং কোন সাধারণ নিয়ম বাঁধিয়া দিবার যো নাই। তবে আহার সম্বন্ধে একটা কথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। আহার বিষয়ে আমাদের সকলেরই মিতাচারী হওয়া উচিত। মৎস্য মাংস ডিম্ব দাইল প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের বেলায় খুবই বেশী সতর্ক হওয়া উচিত এবং এই সকল

খাদ্য সম্বন্ধে যুবকদিগের অপেক্ষা বৃদ্ধদিগের অমিতাচার বিশেষ দোষাবহ। বৃদ্ধদিগের একদিনও অধিক ভোজন করা উচিত নয়। করিলে বিশেষ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। আহার সম্বন্ধে প্রায় সকলেরই একটা না একটা ভুল ধারণা থাকিতে দেখা যায়। অনেকে মনে করেন শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হইলে প্রচুর পরিমাণে মাছ, মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ, দাইল প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের আবশ্যক; তাহা না হইলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা বহুবার প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে এরূপ ধারণা নিতান্তই অসঙ্গত ও ভ্রমাত্মক। Collective Investigator Committeeর অনুসন্ধানের ফল ইহার বিপরীত সাক্ষ্য দিতেছে। ইহাতে দেখা যায়, যে সকল ব্যক্তি আশী বৎসরের অধিককাল বাঁচিয়াছে—তাহাদের মধ্যে শতকরা ৫ জন মাত্র অধিক পরিমাণে মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ করিত, বাকি ৯৫ জন হয় পাকা নিরামিষাশী নয় বেশি নিরামিষ অল্প আমিষ ভক্ষণ করিত। সার হেনরি টমসন, ডাঃ এ, জর্জ্জ কীথ, ডাঃ এ হয়ফ্ প্রভৃতি বিচক্ষণ পণ্ডিতগণের পরীক্ষাফলও পূর্ব্বোক্তরূপ। ভেনিস নগরীর অধ্যাপক কর্ণরো এই বিষয়ে একখানি খুব জ্ঞানপ্রদ পুস্তক লিখিয়াছেন। এই পুস্তকের এক-স্থানে তিনি আত্মকাহিনী বর্ণনা করিবার কালে বলিয়াছেন যে যৌবনে আহারাদি সম্বন্ধে তিনি বড়ই উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন; ফলে সর্ব্বদাই নানারূপে কষ্টভোগ করিতেন; কিন্তু যেদিন হইতে মিতাচার অভ্যাস করিয়াছেন সেই দিন হইতে আজ ৯০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দিব্য স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সার উইলিয়ম টেম্পল তাঁহার পুস্তকের "Health and Long Life" "স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছেন —পৃথিবীর আদিম অধিবাসীরা যে দীর্ঘকাল নীরোগ শরীরে বাঁচিয়া থাকিত তাহার প্রধান কারণ তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল মিতাচার, মুক্ত বায়ুতে বসবাস, দুশ্চিন্তা ও ভাবনার অভাব, সাদাসিধে গোছ আহার—খাদ্যদ্রব্যের অধিকাংশই ফলমূল, মৎস্য মাংস যৎসামান্য। ডাঃ জর্জ জেসনি বলেন, বৃদ্ধ বয়সে যদি কেহ খাদ্যের পরিমাণ এবং মৎস্য মাংসাদির পরিমাণ হ্রাস না করেন তাহা হইলে তাঁহার সুস্থ থাকা একবারেই অসম্ভব। যেমন যেমন বৃদ্ধের বয়স বাড়িতে থাকিবে সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণও হ্রাস করিতে হইবে। ৩০ বৎসর বয়সে শরীরের গঠন সম্পূর্ণ হয় সুতরাং ইহার পর আর অধিক খাদ্যের আবশ্যক হয় না। শরীরের গঠন জন্য যতটা আবশ্যক তাহার অধিক ভোজন করিলে নানাবিধ রোগ হইবার সম্ভাবনা।

অনেকেরই বিশ্বাস মৎস্য মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য বেশি করিয়া না খাইলে শারীরিক কিম্বা মানসিক কোন পরিশ্রম করা যায় না। এ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহা জাপানীদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বিদ্যাবুদ্ধি কিম্বা রণকৌশলে জাপানীরা য়ুরোপীয় কোন জাতিরই নিম্নে নহে। ইহাদের প্রধান খাদ্য কিন্তু ভাত তরকারী ও ফলমূল। সাধারণত ইহাদের মধ্যে মাংস মৎস্য ডিম্ব প্রভৃতির প্রচলন নাই। দুদশজন জাপানীকে মৎস্য মাংস খাইতে দেখা যায় বটে কিন্তু তাহা খুবই সামান্য পরিমাণে। আবার দৌড়ঝাঁপ সন্তরণ ভ্রমণ প্রভৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী পরীক্ষায় দেখা যায় যে চিরদিনই নিরামিষভোজীদিগের নিকট আমিষভোজীরা পরাভূত হয়। একবার এক ভ্রমণের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল যাহারা প্রথম দাঁড়াইয়াছিল তাহারা কেহই মৎস্য মাংসাদি স্পর্শ করিত না, ঘোরতর নিরামিষাশ; আর যাহারা মাঝামাঝি হইয়াছিল তাহারা মৎস্য মাংস আহার করিত বটে কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে; আর যাহারা সর্ব্বশেষ হইয়াছিল তাহাদের সকলেই পাকা আমিষভোজী। সুতরাং যাহারা মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে তাহারা যে অন্নাহারীদের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে তাহার কোন অর্থ নাই, বরঞ্চ তাহার বিপরীতই প্রমাণ হয়। মাংসাহারীদিগের অপেক্ষা নিরামিষভোজীরা অধিক দীর্ঘজীবী হয়। ইহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিসামর্থ্য বেশিদিন অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। অল্পমাত্রায় মৎস মাংস খাইলে সাধারণত কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না কিন্তু যাহাদের বাত (gout & rheumatism) প্রভৃতি রোগ আছে—তাহাদের পক্ষে মৎস্য মাংস স্পর্শ না করাই ভাল। যে সকল ব্যক্তি অতিরিক্ত মাত্রায় মৎস্য মাংসাদি আহার অভ্যাস করিয়াছেন তাঁহারা এই

কথাটি যেন মনে রাখেন যে হঠাৎ একবারে মৎস্য মাংস ত্যাগ করিয়া পাকা নিরামিষাশী হইতে চেষ্টা করিতে নাই—তাহাতে পেটের নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং সে গোলযোগ কিছুতেই যায় না। কিন্তু নিরামিষ আহারের সহিত যদি অল্প মাত্রায় মৎস্য কিম্বা মাংস ভক্ষণ করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা দুর হয়। সুতরাং পাকা আমিষাশীর পাকা নিরামিষাশী হওয়া একরূপ দুষ্কর ব্যাপার। মৎস্য মাংসের পরিমাণ অবশ্য খুবই হ্রাস করা যাইতে পারে কিন্তু একবারে ত্যাগ করা ইহাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

বৃদ্ধ বয়সে দেহের ওজনের স্বভাবতই হ্রাস হয়। অনেকে মনে করেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আহার করিয়া দেহের এই ক্ষয় দুর করা আবশ্যক। সাধারণতঃ ইহার কোন আবশ্যক নাই। তবে শরীরের ওজন যদি সহসা কমিয়া যায় কিম্বা শরীর যদি অসম্ভবরূপেই কৃশ হইতে থাকে তবেই খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির আবশ্যক নচেৎ নহে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে ৬০।৭০ বৎসর বয়ক্রমের পর শরীরের ভার হ্রাস হওয়াই স্বাভাবিক। এ বয়সে শরীরের ভার বৃদ্ধি হওয়া ভাল লক্ষণ নহে। এজন্য বৃদ্ধ বয়সে কাহারও দেহের যদি বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় তাহা হইলে খাদ্যাদির পরিমাণ, (বিশেষতঃ পুষ্টিকর খাদ্যের পরিমাণ) হ্রাস করিয়া এই ভার কমান উচিত।

খাদ্য ও আহার সম্বন্ধে কি কি নিয়ম পালন করা দরকার তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই বিশেষ একটা আগ্রহ দেখা যায়। তাহাদের এ ঔৎসুক্যটি মিটান কিন্তু একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। খাদ্য সম্বন্ধে কোনরূপই সন্তোষজনক ধারাবাহিক নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া চলে না। ব্যক্তিগত অভ্যাস, শরীরের অবস্থা, বয়স, পরিশ্রমকাল প্রভৃতির উপর খাদ্যের তারতম্য ও পরিমাণ বিশেষ ভাবেই নির্ভর করে। ইহা ব্যতীত, দেশকাল আবহাওয়া প্রভৃতির উপরও ইহা কম নির্ভর করে না। যে নিয়ম সর্ব্বদেশে সকলের পক্ষে প্রয়োগ করিতে পারা যায় না তাহা কোন মতেই সঙ্গত নিয়ম বলা যাইতে পারে না। এই কারণে আহারাদি বিষয়ে কোনরূপই সাধারণ নিয়ম সম্ভব নয়।

নাতি শীত নাতি গ্রীষ্ম দেশবাসী একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির কি কি দ্রব্য কি পরিমাণ ভোজন করা উচিত তাহার তালিকা প্রদান করিলাম। এ ব্যক্তির ওজন যদি ১ মন ৩০ সের হয় আর দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি হয় সে যদি প্রতিদিন ৩ ক্রোশ করিয়া ভ্রমণ করে আর ৬।৭ ঘণ্টা কার্য্য করে তাহা হইলে তাহার স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য রক্ষার জন্য এইরূপ আহার করা আবশ্যক হয়—দুগ্ধ ১ সের ; রাঁধা মাংস ৩।৪ ছটাক ; ভাত বা রুটি আধসের ৩ পোয়া ; তরিতরকারী ৮ ছটাক ; আলু ৮ ছটাক ; ঘৃত ১ ছটাক ; লবণ 1/4 ounce (আধ কাঁচ্চা) ; জল ১॥০ সের। পশু মাংসের পরিবর্ত্তে মৎস্য বা পক্ষীমাংস ব্যবহার করা যাইতে পারে। দধি ও ঘোল ভারি উপকারী। Gout (বাত) রোগে ইহারা একপ্রকার ঔষধ বলিলেই হয়। অধ্যাপক মেচেনিকফ বলেন মানুষের পেটের মধ্যে নানাপ্রকার জীবাণু বাস করে। এইসকল জীবাণু সর্ব্বদাই একরূপ বিষ সৃষ্টি করে। সেই বিষ রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ও অকালবার্দ্ধক্য উৎপন্ন করে। দধি বা ঘোলে এই সব জীবাণু বিনষ্ট হয়—সুতরাং অকালবার্দ্ধক্যও নিবারিত হয়। উপরে যে খাদ্যের তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা অবশ্য মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে। ১৪০হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদিগের পক্ষে উহা প্রচুর নহে। ইহাদের পক্ষে মৎস্য মাংসাদিরও পরিমাণ বেশি হওয়া আবশ্যক। ১২ হইতে ১৮ বৎসরের বালিকাদিগের পক্ষেও ঐ নিয়ম। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা ইহাদেরও অধিক খাদ্যের আবশ্যক হয়। বৃদ্ধদিগের পক্ষে খাদ্যের পরিমাণ খুবই অল্প হওয়া উচিত। ৫০।৬০ বৎসরের ব্যক্তিদিগের পক্ষে যুবকদিগের ⅞ পরিমাণ খাদ্য যথেষ্ট। ৬৫ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিদিগের অর্দ্ধেক ভোজন করা উচিত। বৃদ্ধ বয়সে মাছ মাংস দাইল প্রভৃতির পরিমাণ যতই কমান যায় ততই মঙ্গল। খাদ্য সম্বন্ধে সব ক্ষেত্রেই যে আহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম পালন করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। সৈন্যগণ যে সময় যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে সে সময় পূর্ব্বোক্ত হিসাবে আহার করিলে চলিবে না। অভ্যস্ত পরিশ্রম অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে হইলে খাদ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি হওয়ার

আবশ্যক। অলস ব্যক্তিদিগের পক্ষে আবার অতি অল্প পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক। কোন্ খাদ্য কতটা খাওয়া উচিত ইহা কেবলই যে দেহের ভার ও অভ্যস্ত খাটুনির উপর নির্ভর করে তা নয়, শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় মাংসপেশীগুলি কিরূপ পরিণত তাহাও দেখিতে হইবে। যাহাদের দেহ খুব মাংসল তাহাদের শরীরে অন্যান্য অংশ অপেক্ষা মাংসেরই ক্ষয় হয় সুতরাং এসকল ব্যক্তির পক্ষে যে সকল খাদ্য দ্বারা মাংসপেশী গঠিত হয়, যেমন মাছ মাংস ডিম্ব দাইল প্রভৃতি, সেইরূপ খাদ্যের অধিক আবশ্যক। শরীরের আকারের উপরও খাদ্যের প্রকারভেদ বড় কম নির্ভর করে না। দীর্ঘকায় অথচ কৃশ ব্যক্তির দেহ হইতে যে পরিমাণে তাপ বাহির হয় ঠিক সেই ওজনবিশিষ্ট হ্রস্ব স্থূলকায় ব্যক্তির দেহ হইতে তাহা হয় না। এই কারণে শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের অধিক পরিমাণে ঘৃত তৈল ও মিষ্টাদির আবশ্যক। ঘৃত তৈল মিষ্ট প্রভৃতিতে অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা অধিকতর তাপ সৃষ্টি হয়।

শীতপ্রধান দেশে ও শীত ঋতুতে ঘৃত তৈল ও মিষ্টের অধিক প্রয়োজন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ও গ্রীষ্মকালে এসকল দ্রব্যের অধিক আবশ্যক হয় না।

এখন প্রশ্ন এই দিবসে কয়বার ভোজন করার আবশ্যক। ইহাও আবার অনেকটা শরীরের অবস্থা, কাজকর্ম্ম ও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। অনেকে দিবসে দুবার আহার করিয়া বেশ ভাল থাকেন; কেহ কেহ ৩ বার ভোজন না করিলে ভাল থাকেন না; কাহারও কাহারও দিবসে ৪ বার আহারের আবশ্যক হয়।

খাদ্যের পরিমাণ ও গুণের বিচার করিয়া আহার করিলেই যে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় তা নয়। আহারের রকমের উপরও ইহা প্রভূত নির্ভর করে। খাদ্য বেশ ভাল করিয়া চর্ব্বিত না হইলে কখনও গলাধঃকরণ করা উচিত নয়। করিলে তাহা ভাল জীর্ণ হইতে পায় না। এ কথাটি কাহারও নিকট নূতন নয় বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় কাজের সময় ইহা কাহাকেও মানিতে দেখা যায় না। ভাল করিয়া চর্ব্বণ অভ্যাস করিলে কেবলি যে স্বাস্থ্যের সুবিধা হয় তা নয়—আর্থিক সুবিধাও বড় অল্প হয় না। চর্ব্বণ করিয়া আহার করিলে আবশ্যকের অধিক ভোজন করা হয় না—চিবাইয়া না খাইলে অনর্থক অধিক গেলা হয়। এ ছাড়া নানাবিধ রোগ দেখা দেয় এবং সে সকলের চিকিৎসার জন্যও বড় কম অর্থ ব্যয় হয় না। আহার সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে রাখা উচিত। মন যখন উদ্বিগ্ন অথবা ক্রোধের বশ থাকে সে সময় কিছু আহার করা কর্ত্তব্য নয়। শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তির অবস্থায় আহার করা উচিত নয়। আহারের পূর্ব্বে শরীর ও মন উভয়েরই বিশ্রাম আবশ্যক। খাদ্যদ্রব্য খুব গুরুপাক করিয়া রন্ধন করিয়া আহার করিতে নাই। আর এক কথা এই যে ভোজনের সময় অথবা ভোজনের অব্যবহিত পরে জল পান করিতে নাই। অন্ততঃ দু ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া জল পান করিতে হয়। আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে অথবা পরে অল্প মাত্রায় সুরা পান করিলে পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে বটে কিন্তু সাধারণতঃ সুরার কোন আবশ্যক নাই; তবে বার্দ্ধক্যবশতঃ যাহাদের হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়াছে তাহাদের পক্ষে অল্প মাত্রায় সুরার আবশ্যক হয়। যে সকল ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সুরাপায়ী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যের জন্য চা, কফি প্রভৃতির কোন আবশ্যক নাই। অল্প পরিমাণে এ সকল দ্রব্য পান করিলে বিশেষ কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না, বরঞ্চ ইহাদের দ্বারা চিত্তপ্রফুল্ল হয় এবং কার্য্য করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। অধিক পরিমাণে চা কফি পভৃতি ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যহানি হয়।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিয়মিত আহারের যেমন আবশ্যক সেইরূপ নিয়মিত ভাবে মলত্যাগেরও আবশ্যক। সাধারণতঃ ইহার জন্য বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না। স্বাভাবিক নিয়মে ইহা আপনা হইতেই হইতে থাকে। কিন্তু কাহারও কাহারও এমন কোষ্ঠবদ্ধতার ধাত যে এই স্বাভাবিক ক্রিয়া আপনা হইতে হয় না। এসকল ব্যক্তির মোটা আটা বা ময়দার রুটি ও কিছু বেশি পরিমাণে শাক্ সব্জি ভক্ষণ করা উচিত। প্রাতে শয্যাত্যাগের পর এক গেলাস জল পান করা কর্ত্তব্য।

বেশি মাংসাহার করিলে কোষ্টবদ্ধ হয় সুতরাং এসকল ব্যক্তির বেশি মাংস খাওয়া ভাল নয়। পেটের উপর

চাপ দিলে ও ধীরে ধীরে পেট টিপাইলে কোষ্টবদ্ধতা দূর হয়। আর এক কথা মলত্যাগের বেগ আমুক আর নাই আমুক প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে মলত্যাগের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিতে করিতে মলত্যাগের অভ্যাস জন্মায়।

Nervous system অর্থাৎ স্নায়ু মণ্ডলীর সুস্থ অবস্থার উপরও দীর্ঘজীবন কম নির্ভর করে না। স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী আছে তাহাদের মধ্য দিয়া রক্ত গিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর পরিপোষণ হয়। সুতরাং এই সকল ধমনীগুলি যদি ভাল না থাকে তাহা হইলে স্নায়ু-মণ্ডলীও ভাল থাকিতে পারে না। মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত ধমনীর একপ্রকার অবনতি বশতঃ উহা ফাটিয়া মস্তিষ্কের মধ্যে রক্তস্রাব হইয়া কত ব্যক্তির জীবননাশ হয় তাহার ঠিকানা নাই। আহার বিহার বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা বশতঃ মস্তিষ্কের ধমনীর এইরূপ অবনতি হইয়া থাকে। ইহার নিবারণের একমাত্র উপায়—মিতাচার, নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম এবং কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন না করা। সাধারণ ভাবে অঙ্গচালনা অথবা ব্যায়াম দ্বারা শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড ও স্নায়ু-সমূহেরও উন্নতি সাধিত হয়। মাংসপেশীগুলিকে দৃঢ় ও সুস্থ রাখিতে হইলে যেমন উহাদিগকে খাটান আবশ্যক মস্তিষ্ককে ভাল ও সুস্থ রাখিতে হইলে ইহারও খাটুনির আবশ্যক। মানসিকশ্রমকালে মস্তিষ্কের মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ রক্ত গমন করে তাহাতে উহার পরিপোষণ ভাল হয়। মানসিক শ্রমে জীবন দীর্ঘ ও সুখকর হয়। যে-সকল ব্যক্তি নিয়মমত মানসিক শ্রম করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের মস্তিষ্কের কার্য্যকারিণী শক্তি বহুদিন ধরিয়া অটুট্ অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শ্রমের মাত্রা হ্রাস করা কর্ত্তব্য। একথা সব সময় সত্য নহে। গুরুতর মানসিক শ্রম যুবা বৃদ্ধ সকলেরই পক্ষে অহিতকর সন্দেহ নাই; কিন্তু সম্ভবমত মানসিক শ্রম সকলেরই করা উচিত। ৫৫।৬০ বৎসর বয়সে কার্য্য হইতে বিশ্রাম লওয়ার রীতি সর্ব্বদেশেই প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু এক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অন্য কোনরূপ কার্য্যে মনকে নিযুক্ত না করিয়া রাখিলে এরূপ অবসরের ভাবী ফল প্রায় সর্ব্বত্রই মন্দ হইতে দেখা যায়। বড় বড় লোকের জীবনী পাঠে দেখা যায় যে ইহাঁরা খুব প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ন রাখিয়া জগতের এবং নিজেদের হিতকর বহুবিধ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। (Cicero) সিসিরো যথার্থই বলিয়াছেন যে জ্ঞান চর্চ্চা ও পাঠাভ্যাস বন্ধ না করিলে মানসিক শক্তি খুব প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ও অটুট্ থাকে। বার্দ্ধক্য জীবনটা কোন মতেই অলসভাবে ঝিমাইতে ঝিমাইতে অতিবাহিত করিতে নাই।

যাহাদের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট কাজ কর্ম্ম নাই তাহাদের কার্য্য সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই ব্যাপৃত থাকা উচিত। লোকহিতকর, দেশহিতকর কিম্বা সমাজহিতকর বহুতর কার্য্য আছে, ইচ্ছা করিলেই ইহাতে জীবন উৎসর্গ করা যাইতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে সকলেরই একটা না একটা সখ থাকা উচিত। এই সখকে ইংরাজীতে hobby বলে। মৎস্য ধরা, দেশ পর্য্যটন, তীর্থ ভ্রমণ, পুস্তক পাঠ, বৃক্ষ রোপণ, গান বাজনা, ছবি আঁকা এইরূপ নানাবিধ সখের কাজ আছে। প্রত্যেকের এইরূপ একটা না একটা সখের কাজ শিক্ষা করা উচিত। ইহাতে পরমায়ু বৃদ্ধি হয় এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে। যে সকল ব্যক্তির পিতৃপিতামহগণ শিরোরোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে তাহাদের নিয়মমত শারীরিক ও মানসিক শ্রম করা কর্ত্তব্য এবং আহার বিহারাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপে মিতাচার অবলম্বন করা উচিত—এমন করিলে তবেই ইহারা দীর্ঘকাল নীরোগ শরীরে বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে, নচেৎ নহে।

স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অনেকটা মনের গঠনের উপর নির্ভর করে। শরীরের উপর মনের শক্তি বড় অল্প নহে। মানুষ যে অবস্থাতেই পতিত হউক না কেন তাহাতেই যদি সুখ ও সন্তোষানুভব করিতে পারে, স্বচ্ছন্দচিত্তে স্ব স্ব কার্য্যে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, আশার মোহন মন্ত্রে চিত্তকে সর্ব্বক্ষণ সজীব রাখিতে পারে, তবেই তাহার জীবন দীর্ঘ হয় ও শরীর নীরোগ হয়। তাহা না করিয়া আমরা যদি হৃদয়ে অসন্তোষ, হিংসা দ্বেষ বিরক্তি ও দুঃখ পোষণ করি তাহা হইলে শরীর ও মন উভয়ই পীড়িত হইয়া জীবন অল্পায়ু হয়। বাল্য

কাল হইতে সকলের চিত্তের প্রফুল্লতার অনুশীলন করা আবশ্যক। অসন্তোষ, হিংসা দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতির দমন করা উচিত। জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যাহাতে দৃঢ় হয় সেইরূপ চিন্তা করা উচিত। যাহা সত্য ও ধ্রুব বলিয়া বিবেচনা হয় সর্ব্বদা তাহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, কিছুতেই তাহা হইতে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। এইরূপ আচরণ করিতে থাকিলে স্বাস্থ্যময় সুখপূর্ণ দীর্ঘজীবন লাভ করিবার সম্ভাবনা, অন্যথাচরণ করিলে মনের অশান্তি ও অবসাদ বশতঃ জীবন অল্পায়ু হইবার কথা। রিপুপরবশ হইয়াও কাহাকেও কাহাকেও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায় বটে কিন্তু এ সকল ব্যক্তি এক দিনের জন্যও সুখ শান্তি ভোগ করিতে পারে না, ইহাদের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে।

স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে নিয়মিতকাল নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে প্রায় সকলকেই অমনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায়। বয়স, পরিশ্রম ও অভ্যাসানুসারে নিদ্রা-কালের কম বেশি হওয়া আবশ্যক। যৌবন ও বার্দ্ধক্য-কাল অপেক্ষা শৈশবে ও বাল্যে অধিক নিদ্রার আবশ্যক। ভূমিষ্ঠ হইবার পর কয়েক মাস পর্য্যন্ত নিশ্চয় ১৮ হইতে ২০ ঘণ্টাকাল নিদ্রা যাওয়ার আবশ্যক হয়; দুই বৎসরের শিশু ১২ হইতে ১৪ ঘণ্টা নিদ্রা গিয়া থাকে; ৬ হইতে ১০ বৎসরে ১০ ঘণ্টা; ১১ হইতে ১৫ বৎসরে ৮।৯ ঘণ্টা; ১৫ বৎসরের পর হইতে ৬ হইতে ৮ ঘণ্টাকাল নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক। অনেকে শয়ন মাত্রই নিদ্রাগত হয়, কাহার কাহার আবার এমন অভ্যাস শয়নের পর বহুক্ষণ পর তাহাদের নিদ্রা হয়। কেহ কেহ এক ঘুমে রাত্রি যাপন করে—কাহার কাহার বার বার নিদ্রাভঙ্গ হয়—ইহাদের কখনও গভীর নিদ্রা হয় না। গভীর নিদ্রা সুখের আলয়। নিদ্রাবঞ্চিত ব্যক্তিগণ কত প্রকার নিদ্রাকারক ঔষধের আশ্রয় গ্রহণ করে—ইহাতে তাহাদের শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হইতে থাকে। কালেভদ্রে একদিন নিদ্রাকারক ঔষধ সেবন করিলে অপকার হয় না কিন্তু ইহা যদি অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবেই হইবে।

শয়নমাত্র যদি নিদ্রা না হয় আর নিদ্রা যদি বার বার ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে আমরা ইহা বিশেষ অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি কিন্তু বস্তুত পক্ষে আমরা যতটা অনিষ্টের আশঙ্কা করি—ততটা অনিষ্টের কোন হেতু নাই। এমন অনেক লোক দেখা যায় যাহারা গড়ে প্রতিদিন ৫ ঘণ্টার অধিককাল নিদ্রা যায় নাই অথচ ৭৫।৮০ বৎসর পর্য্যন্ত সুস্থ দেহে বাঁচিয়া রহিয়াছে। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির কোন মতেই ৮ ঘণ্টার অধিককাল নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। অল্প নিদ্রা অপেক্ষা অধিক নিদ্রা ঢের অনিষ্টকর। অধিক নিদ্রায় মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ ধমনীগুলির অবনতি হয়, এবং সেই কারণে মানসিকশক্তি লোপ পাইতে বসে। রাত্রিকালই নিদ্রার প্রশস্তকাল। বেশি রাত্রি করিয়া শোওয়া ও বেলা করিয়া উঠা স্বাস্থ্যভঙ্গের ও অল্পায়ুর একটি প্রধান কারণ। রাত্রি জাগিয়া আমোদ প্রমোদ বা লেখা পড়া করিতে নাই। কবি ও ঔপন্যাসিক প্রভৃতি লেখক শ্রেণীর কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে রাত্রে তাঁহাদের লেখা যেমন ভাল হয় দিবসে তেমন হয় না। এই কারণে ইহাঁরা অধিক রাত্রি জাগিয়া লিখিতে থাকেন। তাহার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ইহাঁদের প্রতিষ্ঠাভাস্কর মধ্যগগনে উদিত হইবার পূর্ব্বেই ইহাঁদের জীবন শেষ হয়। নিশীথের নিস্তব্ধতার মধ্যেই যে ভাব ও চিন্তাপূর্ণ লেখা হয় ইহার কোন অর্থ নাই। অভ্যাস করিলে দিবসের কোলাহলের মধ্যেও ভাল লেখা হইতে পারে। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া এক বাটি দুগ্ধ কিম্বা এক পেয়ালা চা ও সামান্য মত জলযোগ করিয়া যদি লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে এমন হয় যে রাত্রি অপেক্ষা প্রাতেও লেখা ভাল হয়।

ত্বকের সুস্থাসুস্থ অবস্থার উপরও আমাদের স্বাস্থ্য বড় অল্প নির্ভর করে না। ত্বক দ্বারা শুধু যে দেহের ক্লেদ নির্গত হইয়া যায় তাহা নহে—ইহা শরীরের তাপ নিয়মিত ও ব্যবস্থিত করিয়া থাকে। শরীরের মধ্যে যদি অধিক তাপবৃদ্ধি হয় ত্বক দ্বারা তাহা বাহির হইয়া যায়; আবার কোন কারণে শরীরের তাপ যদি স্বাভাবিক তাপের নিম্নে নামে, তাহা হইলে ত্বকের এমন পরিবর্ত্তন হয় যে দেহ হইতে আর তাপ নির্গত হইতে দেয় না; এ সকল ছাড়া ত্বক্ বর্ম্মের ন্যায় শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে। বার্দ্ধক্যে শরীরের অন্যান্য অংশের যেরূপ ক্ষয় হয় ত্বকেরও তেমনি ক্ষয় হয়। ত্বকে যেসকল রক্তবহা শিরা ধমনী ও ঘর্ম্ম

প্রস্তুতের যন্ত্র আছে, বৃদ্ধ বয়সে তাহাদের অনেকগুলি লোপ প্রাপ্ত হয়; এই কারণেই বৃদ্ধদিগের চর্ম্ম অধিক শুষ্ক দেখায়। ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ত্বকের রক্ত চলাচল ভাল হয় সুতরাং উহার পরিপোষণও ভাল হয়। ত্বকের ক্ষয় নিবারণ জন্য এই কারণে ব্যায়াম ভ্রমণ প্রভৃতির আবশ্যক। প্রত্যহ স্নান করিলে ত্বক্ যেমন ভাল থাকে এমন আর কিছুতেই থাকে না। নীরোগ সুস্থ-সবল ব্যক্তিদিগের প্রতিদিন শীতলজলে স্নান করা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল রুগ্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে শীতল জলে স্নান অনেক সময় সঙ্গত নহে। কেহ কেহ প্রথমে গরমজলে স্নান করিয়া পরে গাত্রে শীতলজল ঢালিলে বেশ ভাল বোধ করিয়া থাকেন। কোন কারণে স্নান করা যদি অসম্ভব হয় তাহা হইলে ভিজা গামছা বা ভিজা তোয়ালে দ্বারা গা মুছিলেও অনেকটা স্নানের কাজ হয়। স্নান করার পর সমস্ত শরীর শুষ্ক তোয়ালের দ্বারা মুছা উচিত। স্নানের পর ১৫ মিনিটকাল শরীর উন্মুক্ত রাখা অভ্যাস করিলে ত্বক্ দৃঢ় হয় এবং সহজে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় থাকে না। গা মুছিবারকালে হাতের নানা প্রকার গতি করিতে হয় তাহাতে কতকটা ব্যায়ামের কার্য্য হয়। গা হাত পা প্রভৃতির ডলা মাজা করিলে শরীরের তাবৎ যন্ত্রের কার্য্যকারী শক্তি বৃদ্ধি হয়। চোক কাণ নাক মাথা গলা হাত পা প্রভৃতি দেহের সর্ব্ব অংশেরই ডলা মাজা আবশ্যক।

দেশের জলবায়ু আবহাওয়া প্রভৃতির উপরও স্বাস্থ্য বহু পরিমাণে নির্ভর করে। যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতু সহ্য করার ক্ষমতা ততই ক্ষীণ হইতে থাকে। তবে কাহারও বেশি কাহারও কম এইমাত্র প্রভেদ। বৃদ্ধ বয়সে যাহারা শীত ও বর্ষায় কাশী সর্দ্দি ও বাত প্রভৃতি রোগে ভুগিতে থাকে তাহাদের কর্ত্তব্য শীত ও বর্ষা ঋতুর আগমনে দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য কোন দেশে বাস করা যেখানকার বায়ু শীতল নয় এবং সূর্য্যালোকের অভাব নাই। এইরূপ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গিয়া মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় আর নানাবিধ ফুলের সৌরভে ও নীল অনন্ত আকাশের সৌন্দর্য্যে চিত্ত প্রফুল্ল হয়। রোগাদির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সময়ে সময়ে সকলেরই বায়ু পরিবর্ত্তন করার আবশ্যক। একস্থানে বহুদিন ধরিয়া বাস করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। বৃদ্ধ বয়সে তো ইহার একান্ত আবশ্যক। এ সময়ে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ক্ষীণ হয়—কিছুতেই উৎসাহ থাকে না—এরূপ অবস্থায় দেশবিদেশে পর্য্যটন করিলে বিধাতৃরচিত ও মনুষ্যরচিত নানাবিধ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া চিত্ত প্রফুল্ল হয়। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাক্ষেত্র ও ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে হৃদয়ের সঞ্জীবনী শক্তি বৃদ্ধি হয়। নানা দেশের নানা জাতির আচার ব্যবহার রীতিনীতি ধর্ম্ম ও ভাষা প্রভৃতি শিক্ষায় মনের মধ্যে সন্তোষ জন্মায়। ইহার ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

শীতাতপানুসারে আমাদের বসনাদির ব্যবস্থা করা দরকার।

আমরা এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম তাহা হইতে এই জ্ঞান হয় যে সুখপূর্ণ বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়ার একটা নির্দ্দিষ্ট প্রশস্ত পথ নাই। নানাদিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে তবেই স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। আমরা যেসকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি ইহাদের কোনটাই অনাবশ্যক নহে। ইহাদের পালন করা যে খুব কষ্টসাধ্য তাহাও নহে। চাই কেবল মন ও অভ্যাস। স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি ও নিয়মগুলি পালন করিলে তবেই জীবন সুখপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। উপসংহারের পূর্ব্বে সেই নিয়মগুলির সংক্ষেপে পুনরায় উল্লেখ করিতেছি। আহার বিহার ভোগাদিতে মিতাচার, গৃহে ও গৃহের বাহিরে প্রভুত বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, দেহের সকল যন্ত্র ও ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখা, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সকল ঋতুতেই নিয়মিত ভ্রমণ, সকালে ও সন্ধ্যায় ৫ মিনিট কাল ধরিয়া প্রাণায়াম বা breathing exercise, সপ্তাহে একদিন নিয়মিত ভ্রমণের অতিরিক্ত ভ্রমণও মধ্যে মধ্যে শৈলবিহার, বংশগত ব্যাধি যাহাতে না হয় তাহার চেষ্টা করা, নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক শ্রম, স্থৈর্য্য, সন্তোষ, প্রভৃতি গুণের অনুশীলন, কর্ত্তব্য কাজে বিচরণ, ক্রোধ দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি রিপুগুলির দমন, অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ ও বেশি রাত্রি না করিয়া শয়ন, ৫।৬ ঘণ্টার অধিক কাল নিদ্রা না যাওয়া।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

আবাহন।

এসগো বসন্তলক্ষ্মি!—চঞ্চল পবন
ব্যাকুল লভিতে মধু পরশ তোমার;
তোমারে বন্দিতে আজি প্লাবিয়া ভুবন
কোকিল পাপিয়াকণ্ঠে অশ্রান্ত ঝঙ্কার।
নবীন পল্লবে শোভি' প্রফুল্ল কানন
করিছে মর্ম্মরতানে তব আবাহন।

২

আসিবে বসন্তলক্ষ্মী; আনন্দ উচ্ছ্বাস
তরঙ্গিয়া উঠিয়াছে ধরণীর বুকে,
বনের মনের গুপ্ত বাসনা-বিলাস
ফুটিয়া উঠেছে রক্ত অশোক কিংশুকে।
এস, পুষ্পদলে রাখি' অরুণচরণ,
ভ্রমর গুঞ্জরি' করে তব আবাহন।

৩

এসগো বসন্তলক্ষ্মি! সুখদ বাতাসে,
চূতমুকুলের গন্ধে, গুঞ্জরণে গানে,
বিমল বিচিত্র স্নিগ্ধ কুসুম-বিকাশে,
ফুটাও প্রেমের স্বপ্ন অবসন্ন প্রাণে।
নবসুরে বাঁধি' বীণা, সঙ্গীতে নূতন
গায়িবে বিশ্বের কবি তব আবাহন।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

নারিকেলের চাষ

ভারতবাসী বহুকাল হইতেই নারিকেল-বৃক্ষের সহিত পরিচিত, কারণ নারিকেল-বৃক্ষ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। নারিকেল বৃক্ষ হইতে আমাদের কি কি উপকার সাধিত হয়, নারিকেলের আস্বাদনই বা কি প্রকার তাহাও সকলেই বিদিত আছেন। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিয়া রীতিমত চাষ আরম্ভ করিলে এই বৃক্ষ হইতেই প্রভূত ধনোপার্জ্জন করা যায়, তাহা অনেকে অজ্ঞাত। দেখিতে পাওয়া যায় অস্মদ্দেশে অনেকে দুইচারি বিঘা জমি লইয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে নারিকেল-বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন, ভাবিতেছেন, উক্ত বৃক্ষের মূলে যথেষ্ট জল সিঞ্চন করিয়াই বৃক্ষকে সতেজ করিয়া তুলিব; এইরূপে পাঁচ সাত বৎসর অতীত হইলেই বৃক্ষ আমাকে ফলদান করিবে। কিন্তু আমরা যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, যে, যাঁহারা উক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই নিরাশ হইয়াছেন। ঐ সকল বৃক্ষের মধ্যে কোন কোনটা সতেজ হইয়া উঠে বটে, কিন্তু তাহারা অধিক ফলদানে অক্ষম; এই সকল বৃক্ষ অত্যন্ত উচ্চ হয়; নারিকেল-বৃক্ষ অধিক উচ্চ হইলে প্রচুর ফলদান করিতে পারে না। যে উপায় অবলম্বন করিলে যথেষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহারই যথাযথ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। নিম্নলিখিত বিবরণটী সিংহলবাসীদেরই প্রথার অনুকরণে লিখিত হইল। আমরা স্বয়ং উক্ত নিয়ম অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

সিংহলবাসীরা নারিকেল-বৃক্ষ রোপণে, তাহার সম্যক্ তত্ত্বাবধানে এবং উক্ত বৃক্ষ হইতে যথেষ্ট ফল উৎপন্ন করিতে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নারিকেল সিংহলবাসীর আদরের এবং ধনোপার্জ্জনের প্রধান পণ্য। সিংহলে যাঁহার অধিক নারিকেল বৃক্ষ তিনিই অধিক ধনী। তাঁহারা এই নারিকেল-বৃক্ষের শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার প্রত্যেক দ্রব্যটীকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিয়া বহু অর্থ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা বলিয়া থাকেন লবণাক্ত সমুদ্রতীরই নারিকেল-বৃক্ষ রোপণের উপযুক্ত স্থান। দেখিতে পাওয়া যায় যে সমুদ্রতীরেই ইহা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাঁদিগের মতে পুরাতন (কাঁকিনি) বৃক্ষের নারিকেলই রোপণের উপযুক্ত। ইহাঁরা সর্ব্বপ্রথমে একটী সমতল স্থান খনন করিয়া তাহাতে সমুদ্রের মৃত্তিকা এবং সামুদ্রিক পচা আগাছা পূর্ণ করেন, তৎপরে চারিশত কাঁকিনি নারিকেল উক্তস্থানে স্থাপন করিয়া যতদিন না অঙ্কুরোদ্গম হয় ততদিন প্রত্যহ জলসিঞ্চন করিয়া থাকেন।

অঙ্কুরিত হইলে পর, সূর্য্যতাপ নিবারণের নিমিত্ত উহার উপর চাঁদোয়া বা ছাউনি প্রস্তুত করিয়া দেন। এইরূপে জানুয়ারী মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত বৃক্ষগুলিকে ঐ ভাবেই থাকিতে দেওয়া হয়। এই প্রকারে

অঙ্কুরিত করাকে হাপোর দেওয়া বলা হয়। কিন্তু অস্মদ্দেশে সমুদ্রের মৃত্তিকার অভাবে আমরা মৃত্তিকাতে লবণ ও হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া তাহার উপর নারিকেল রাখিয়া উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছি।

ক্রমে এপ্রিল মাসের প্রারম্ভেই সিংহলবাসীরা উক্ত চারাগুলিকে রোপণ করিয়া থাকেন। যেস্থানে বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে সেই স্থানে ২০ ফুট অন্তর একটী করিয়া ৩ ফুট গভীর গর্ত্ত খনন করেন। উক্ত গর্ত্তে লবণই হউক বা সমুদ্রের মৃত্তিকাই হউক স্থাপন করিয়া বৃক্ষ রোপণ করেন।

এই সময়ে বর্ষার সমাগমে যথেষ্ট বারিবর্ষণ হওয়াতে বৃক্ষের মূলে আর পৃথকভাবে জলসিঞ্চন করিতে হয় না। অঙ্কুরোদ্গমের সময়ে যেমন রৌদ্র নিবারণের উদ্দেশ্যে উপরে ছাউনি করা হয়, এই চারাগাছগুলির উপরেও সেইরূপ ছাউনি দেওয়া হয়।

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষসকল পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করে। আমরা দেখিয়াছি যে এইরূপে তত্ত্বাবধান করিতে পারিলে প্রত্যেক বৃক্ষে প্রায় ৬০টী নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত হইলে পুনরায় বর্ষা আসিবার পূর্ব্বেই বৃক্ষগুলির গোড়া খনন করিয়া দেওয়া হয়; সমগ্র বর্ষাকাল ধরিয়া এই সকল বৃক্ষের মূলে জল সঞ্চিত হইয়া থাকে। অবশেষে বর্ষার অবসানে উক্ত বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বের মৃত্তিকা লইয়া একত্র করিয়া বৃক্ষের গোড়াকে উন্নত করিয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে বৃক্ষের শিকড়ও কিঞ্চিৎ ছাঁটিয়া দেওয়া হয়। বর্ষার অবসানেই ইহার শুষ্ক পাতা এবং শুষ্ক চুঁংরি কাটিয়া দিবার প্রশস্ত সময়। নারিকেলও এই সময়ে পাড়াইয়া লইতে হয়।

সিংহলবাসীরা এইরূপে চাষ করিয়া নারিকেলের যে কিরূপ আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। যাঁহারা সিংহলের নারিকেল দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন উহা আমাদিগের দেশের নারিকেলের অপেক্ষা আকারে কত বৃহৎ। এতদ্দেশে একশ্রেণীর ভিখারী বা সন্ন্যাসী ফকীরদিগের হস্তে একপ্রকার ভিক্ষাপাত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হয়ত অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। ঐ পাত্র উক্ত সিংহল প্রদেশের নারিকেলের খোলা। উক্ত ফলের শাঁস হইতে তৈল বা উহার ছাল হইতে রজ্জু প্রস্তুত হয় তাহা অস্মদ্দেশীয় প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন, সুতরাং উক্ত বিষয়ে সিংহলবাসীদিগের সবিশেষ বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক।

স্যার জে, ই, টেন্যাণ্টস্ লিখিয়াছেন, সিঙ্গাপুরের কোন একব্যক্তি একবার সিংহলে যাত্রা করেন। তিনি সিংহলের নারিকেলের আয়তন দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। স্বীয় দেশে কয়েকটী নারিকেলও আনয়ন করিয়া রোপণ করেন। কিন্তু যখন তাঁহার বৃক্ষে নারিকেল জন্মিল তখন তিনি দেখিলেন যে উক্ত নারিকেল সিংহল দেশীয় নারিকেল অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। কিন্তু নারিকেল ভাঙ্গিয়া দেখেন যে তাহার মধ্যে আদৌ জল নাই, মাখনের ন্যায় এক প্রকার নরম দ্রব্য রহিয়াছে। এই দ্রব্য আস্বাদনে অতি সুমিষ্ট, ইহাতে তৈলের ভাগ অত্যন্ত অধিক। সেই অবধি সিঙ্গাপুরে উক্ত নারিকেল প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা সিঙ্গাপুর হইতে কয়েকটী চারা আনাইয়া রোপণ করিয়াছি, এখনও ফল হয় নাই। এতদ্ব্যতীত সিঙ্গাপুরে আরও অনেক প্রকার নারিকেল দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা যত প্রকার নারিকেল দেখিয়াছি, কোন দেশের নারিকেলই সিংহলের সহিত সমকক্ষ হইতে পারে না। আমরা আরও দেখিয়াছি অস্মদ্দেশীয় নারিকেল বৃক্ষে পূর্ব্বে যেরূপ নারিকেল জন্মিত আমরা সিংহলদেশীয় নিয়ম অবলম্বন করাতে তাহার দ্বিগুণ ফল জন্মিতেছে। সুতরাং যাঁহারা নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহা হইতে লাভবান হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি পূর্ব্বলিখিত সিংহল দেশের প্রথা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও যে যথেষ্ট লাভবান হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

হোরী খেলা।

ভাল লুকাইয়া বসি, হে লীলাচতুর,
খেল আজ হোরী খেলা! শ্যামা দিগ্বধূর
সুনীল অঞ্চল খানি ফাগে লালে লাল।
রক্ত কিশলয় শোভী শৃঙ্গক বিশাল

উন্নত, সে উৎস মুখে হ'তেছে বর্ষিত
ফল্গু চ্যুতাঙ্কুর চূর্ণ, করিয়া ব্যথিত
ধরণীর পাণ্ডু গণ্ড। আচ্ছন্ন আবিরে
অশোক কিংশুক তরু। মদমত্ত ফিরে
চঞ্চল দক্ষিণা বায়ু "হোরী হ্যায়" রবে,
উড়ায়ে বাসন্তী বাস। শ্রান্ত অলি সবে
গুঞ্জরে সখেদে কারে খুঁজি বৃথা বনে।
হেরে শুধু ফল্গু চিহ্ন; দিগঙ্গনা গণে
"চোখ্ গেল" "চোখ্ গেল" করি "উহু" "উহু"
কুঙ্কুম আঘাতে কার কাঁদে মুহু মুহু।

চায়া-ওন্না

আমি যখন জাপানে যা-হোক-একটা-কিছু শিখিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলাম তখন আমার হিতৈষী অভিভাবকগণ অনেক কিছু আশা করিয়াছিলেন; আমিও নিজে নিজের সাফল্যের প্রতি যে বিশেষ আস্থাবান ছিলাম তাহা বলাই বাহুল্য।

একদিন প্রত্যুষে ইডেন গার্ডেনের ঘাট হইতে যখন জাহাজে চড়িলাম তখন সেই প্রভাতেরই কনক রৌদ্রের মত আমার ভবিষ্যৎ বড় সুন্দর বড় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। আগাগোড়া শুধু সফলতা, শুধু জয়। তাই যখন বন্ধুজনের বিরহবেদনা পাথেয় লইয়া জাহাজ কোন সেই অচেনা অজানা সুদূরের উদ্দেশে যাত্রা সুরু করিল, তখনো আমার মুখ নিষ্প্রভ হইয়া গেল না।

কত অপূর্ব্ব দেশ, বিচিত্র মানব, চমৎকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, সাগরবক্ষে নাচিতে নাচিতে আমার আশার নন্দন জাপানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

একদিন যখন দূর হইতে জাপানী নাবিকেরা স্বদেশের অয়শ্চক্রনিভ তটরেখা দেখিয়া সমস্বরে "বানজাই" বলিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন আমার চিত্ত প্রথম-প্রণয়-সম্ভাষণ-ভীরু নবোঢ়া বধূর মত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আমাদের জাহাজ জাপানের য়োকোহামা বন্দরে গিয়া লাগিল। আমি সেখানেই নামিলাম। এই সহরে দুদিন বিশ্রাম করিয়া তারপর ট্রেনে তোকিয়ো যাইব।

একটি হোটেলে আশ্রয় ঠিক করিয়াই সহর দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সমস্ত দেশটা যেন স্বপ্নের মত, মায়ার মত, কল্পনার মত; বাড়ীগুলি যেন ছবি, মানুষগুলি যেন পুতুল, কারবার যেন কলের। রাস্তায় আবর্জনা নাই, গোলমাল নাই, গাড়ীঘোড়ার হুড়াহুড়ি নাই। পথিকেরা শান্ত, মানুষটানা রিকশা গাড়ীগুলিও নিঃশব্দ; সমস্ত সহরটি যেন তন্দ্রাবেশে আচ্ছন্ন, এমনি একটা মোহময় স্তব্ধতা সর্ব্বত্র বিরাজিত।

যাহা দেখি তাহাই আমার চক্ষে নূতন ঠেকে। আমার কাজ ছিল না, চাখিয়া চাখিয়া সমস্ত খুঁটিনাটি দেখিয়া লইতেছিলাম।

দোকানগুলি ফিটফাট, শিল্পকলার লীলানিকেতন। এক একটা দোকানের কাছে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল। যে দোকানগুলি দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ সেগুলিও সুন্দর, আবার যেগুলি রিক্ত সেগুলিও চমৎকার,—তাহাদের শূন্যতা মনকে শান্তি দেয়, কিন্তু চক্ষুকে পীড়া দেয় না।

এমনি একখানি আসবাবহীন দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া তাহার রিক্ত সৌন্দর্য্য দেখিতেছি, এমন সময় আমায় চমকিত করিয়া কাহার মধুসম্ভাষণ আমাকে অভিনন্দন করিল—দান্না মুকায়রু! (আসিতে আজ্ঞা হোক মহাশয়!)

আমি চেতনা পাইয়া দেখিলাম আমি একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া আছি। একটি তরুণী তাহার হাত দুখানি দুই উরুর উপর রাখিয়া একটু নত হইয়া আমাকে দোকানে অভ্যর্থনা করিতেছে—দান্না মুকায়রু!

সে স্বরে কী ভব্যতা, কী বিনয়! অভ্যর্থনার সে কী সরস ভঙ্গী! আমার কোনো পুরুষে চায়ের ধার ধারে না, তবু এমন তরুণীর এমন আহ্বান আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। চায়াতে (চায়ের দোকানে) প্রবেশ করিলাম।

তরুণী চায়া-ওন্না (চা-ওয়ালী) অমনি আমার সম্মুখে আসিয়া দুই উরুতে হাত রাখিয়া ঈষৎ অবনত হইয়া দাঁড়াইল; তারপর সরলভাবে দাঁড়াইয়া একখানি চেয়ার

টানিয়া দিয়া বলিল—ও কাকে নাসাই (বসিতে আজ্ঞা হোক!)।

আমি চেয়ারে বসিলাম। তরুণী চায়া-ওন্না পুতুল বাজির পুতুলের মত নিঃশব্দে চলিয়া গেল এবং মুহূর্ত্তেক পরে এক পেয়ালা চা আনিয়া আমার সামনে একটা সেপায়ার উপর রাখিল; আর আনিল একটা রেকাবে করিয়া খানকতক সাকুরা-মোচি (চেরিফুলের পিঠে।)

চীনে মাটির শুভ্র স্বচ্ছ পেয়ালার গায়ে ঈষৎ হরিতাভ চায়ের ক্ষীণ আভাসটুকু সেই তরুণীরই কপোল দুটির অনুকরণ করিতেছিল; চেরিফুলের পিঠেগুলির বুকের মাঝে যে মৃদু ঘ্রাণ তাহা সেই তরুণীরই অন্তরখানির আভাস দিতেছিল।

আমি চায়ের পেয়ালাটিতে অধর স্পর্শ করিয়া চুমুকে চুমুকে সুগন্ধি চা আর তারই মাঝে মাঝে সাকুরা-মোচি আস্বাদন করিতে লাগিলাম। কিন্তু চোখ দুটা আমার নিবিষ্ট হইয়াই ছিল সেই তরুণীর তনুলতায়।

সে ঠিক যেন একটি রজনীগন্ধা ফুল—তেমনি তন্বী, তেমনি শুভ্র, তেমনি নিটোল, তেমনি কোমল, তেমনি মধুর! তাহার মাথায় ফাঁপানো খোঁপা। পরণে চিত্রবিচিত্র কিমোনো (জাপানী পোষাক), যেন একটি প্রজাপতি তাহার বর্ণবহুল ডানা মেলিয়া রজনীগন্ধার গায়ে জড়াইয়া ধরিয়াছে। আমি দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে-ছিলাম।

অনেক বিলম্ব করিয়াই চায়ের পেয়ালা শেষ করিলাম। তখন আর অপেক্ষা করিবার কোনো ছুতা খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা উঠিতে হইল। চায়ের দাম শোধ করিয়া দিতেই তরুণী অতি মোলায়েম কণ্ঠে বলিল—আরিগাতো! (ধন্যবাদ!)

ইহার উত্তরে আমার কি বলা উচিত ঠিক করিতে না পারিয়া আমি একটু হাসিয়া মস্তক নত করিলাম। সে হাসিতে আমার প্রাণের সমস্ত তরলতা ঢালিয়া দিয়া তরুণীকে বুঝিতে দিলাম—আমি বিদেশী, আমার মুখে ভাষা নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্যের সমাদর করিতে পারি এমনতর সরস প্রাণ একখানি এই কালো চামড়ার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে।

আমি বাহির হইয়া আসিতেছি, তরুণীও আমার সঙ্গে সঙ্গে চায়ার দ্বার পর্য্যন্ত আসিল এবং আবার তাহার কণ্ঠস্বরে জগতের সকল মাধুর্য্য মিশাইয়া সে বলিল—সায়ো নারা! আরিগাতো গোজাইমাশ, মাতা নেগাইমাস।

(বিদায়! ধন্যবাদ মহাশয়! আবার অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন!)

সুন্দরী কি বলিল কিছুই বুঝিলাম না; শুধু ভাবে বুঝিলাম সে বলিল—হে বন্ধু, আজিকার মতন বিদায়; কিন্তু এ বিদায় যেন শেষ বিদায় না হয়, আবার এসো বন্ধু, আবার এসো!

আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া আসিলাম।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত মানুষ আছে, তাহার মধ্যে এক একজনের সঙ্গে কেমন ক্ষণে দেখা হয় যে তাহাকে আর কিছুতেই ভুলিতে পারা যায় না। সে যে সৌন্দর্য্যের মোহ বা নূতনত্বের মাদকতা ঠিক তা বলা যায় না। প্রাণটা যেন এতদিন তাহারই প্রতীক্ষায় বিরহবেদনা ভোগ করিতেছিল, তাহারই মিলনে হৃদয় মন ভরিয়া উঠে, জীবন ধন্য বোধ হয়।

সামান্য একটি চায়া-ওন্নাকে দেখিয়া আমার প্রীতির সাগর যেন উছলিয়া উঠিল; তাহার কোমল রূপ, মধুর বাণী, ললিত ভঙ্গী, সুরস সঙ্গ আমার অন্তর যেন ভাবে আনন্দে ভরিয়া ছাপাইয়া তুলিল।

মাত্র দুদিন য়োকোহামায় থাকার কথা। এই দুদিনে যতবার পারি তাহাকে দেখিয়া আমার আকুল অন্তরটাকে তৃপ্ত করিয়া লইব ঠিক করিলাম।

সন্ধ্যাবেলা আবার চায়াতে গেলাম। তরুণী আমায় দেখিয়া তাহাদের দেশের রীতি অনুসারে দুই উরুতে হাত রাখিয়া ঈষৎ নত হইয়া মধুকণ্ঠে আমাকে অভ্যর্থনা করিল—কোম্বান ওয়া! (শুভ সন্ধ্যা!)

তাহার মুখে হাসির রেখামাত্র ছিল না, কণ্ঠে প্রকম্প ছিল না, কিন্তু তার ছোট টানা বাঁকা চোখ দুটি আমার সাক্ষাৎলাভে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। আমিও তাহাকে শুভ সন্ধ্যা জ্ঞাপন করিলাম।

রাত্রে হোটেলে ফিরিলাম, কিন্তু মন পড়িয়া রহিল সেই চায়ের দোকানে। একটি সাকুরা ফুলের মত

ছোট অথচ পরিপূর্ণ-যৌবনার স্মৃতিটিকে শতপাকে বেষ্টন করিয়া আমার চিত্ত ভ্রমরের মত গুঞ্জরণ করিতেছিল। এই বিদেশিনীর সকল কথা আমি বুঝি না, আমার একটা কথাও তাহাকে বুঝাইতে পারি না। কিন্তু এই ভাষাহীন ভাষার অন্তরালে যে কল্পনা যে ভাবপুঞ্জ জমিয়া উঠিত তাহা বিচিত্র, তাহাই আমার অন্তর বাহির পুলকাঞ্চিত করিয়া তুলিতেছিল।

সমস্ত রাত্রি চায়া-ওন্নাকেই স্বপ্ন দেখিলাম। প্রভাতে তাহাকে স্মরণ করিয়াই নয়ন মেলিলাম।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া চায়ার দিকে চলিয়া গেলাম। তখনও প্রভাতের আলো ভাল করিয়া ফুটে নাই, চায়ার দোকান খুলে নাই। মুদ্রিত কমলের চারিদিকে ব্যস্ত ভ্রমরের প্রবেশ যাচনার মত ব্যাকুল চিত্তে আমি চায়ার সম্মুখে পদচারণা করিতে লাগিলাম। প্রভাতে দ্বার খুলিল। তরুণী চায়া-ওন্না আমাকে দ্বারের কাছে দেখিয়া হাসিয়া বলিল—ও হায়ো! (সুপ্রভাত!)

আমিও তাহাকে সুপ্রভাত জানাইয়া মনে মনে বলিলাম—প্রভাতে উঠিয়া শ্রীমুখ দেখিনু, দিন যাবে ভাল ভাল!

দুটি দিনেই আমরা পরস্পরের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিলাম। আমি বুঝিলাম এই তরুণী আমারই জন্য জগতে আসিয়াছে, আর এই সাত সমুদ্র তের নদীর পারে সুদূর জাপানে ইহারই সহিত মিলনের জন্য আমার এই অভিসার—বিদ্যার জন্য নয়, খ্যাতির জন্য নয়, অর্থের জন্য নয়—এ আমার প্রেমযাত্রা!

দুদিন গেল। তবু আমার তোকিও যাওয়া হইল না। মনে করিলাম য়োকোহামাতেই কোনো কালেজে বা কারখানায় কিছু একটা সুরু করিয়া দি, তারপর কিছুদিন পরে তোকিও গিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিলেই হইবে। কিন্তু সব প্রথমে এ দেশের ভাষা শিক্ষা করা দরকার এই শিক্ষাটুকু আমি চায়া-ওন্নার কাছেই প্রথম লাভ করিলাম।

হোটেলের ম্যানেজারকে বলিলাম আমায় একজন এমন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিন যে ইংরেজি জানে আর আমাকে জাপানী শিখাইতে পারে। ম্যানেজার একজনকে আনিয়া দিল। লোকটি গাকশা অর্থাৎ পণ্ডিত।

আমি প্রথমেই তাহার কাছে প্রেমের পাঠ লইতে আরম্ভ করিলাম। প্রণয়ের অভিধানে যে কথাগুলার খুব চলন সেগুলাই বাছিয়া বাছিয়া আমি গাকশার কাছে প্রথমেই তর্জমা করিয়া শিখিয়া লইতে লাগিলাম।

লোকটাও বেশ রসিক আর প্রণয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ। আমি যেমনটি চাই ঠিক তেমনি করিয়াই আমাকে তালিম করিতে লাগিল।

একদিন গাকশা হাসিতে হাসিতে আমায় জিজ্ঞাসা করিল—কি হে বিদেশী ছাত্র! নিপ্পনের মাটিতে পা দিতে না দিতে প্রেমে পড়লে না কি?

হাঁ সেনসেই (গুরুমশায়)।

কেমন সে তরুণী?

যেন একটি সাকুরা হানা (চেরি ফুল) গাকশা!

কোথায়, কোথায় এমন নিধি মিলল?

কেবল সেইটি বলব না, গাকশা!

গাকশা একটু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা না-ই বললে। আমি তোমায় প্রণয়ের ভাষায় তালিম করে দিব, যেন শীঘ্র সফল হও। বিবাহের দিন আমায় নিমন্ত্রণ করিতে ভুলো না যেন।

এমনিতর পরের কাছে নিজের ভাব তর্জ্জমা করিয়া লইয়া মুখস্থ ভাষায় আমার প্রণয় বেশ অগ্রসর হইতে লাগিল। গাকশার সহিতও একটা বেশ সরস বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিল। ক্রমে জানিলাম সেও একজন নূতন প্রণয়ী, তাহারও নাকি একটি ছোট তরুণী প্রণয়িণী আছে, হাসুনো হানার মতো স্নিগ্ধ সে, তাই গাকশা আমার ঠিক উপযুক্ত শিক্ষক হইতে পারিয়াছিল।

এমনি করিয়া অনেক দিন গেল। একদিন গাকশা আমায় পড়াইতে আসিয়া খুব হাসিতে হাসিতে বলিল—বন্ধু, বন্ধু, তুমি ধরা পড়ে গেছ!

আমি ব্যাপার কতকটা আন্দাজ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলাম—কি গাকশা, কি?

গাকশা আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—চায়া-ওন্না তোমার প্রণয়িণী তা এত দিন আমায় বলতে হয়। আজ হঠাৎ ঐ পথে যেতে তোমাদের মিলন-মণ্ডল ভাব দেখে আমি আন্দাজ করে নিলাম। একথা আমায় আগে বলতে

হয়—তাহলে তোমাকেও এত পাঠ মুখস্থ করতে হত না, আমাকেও এত বেগ পেতে হত না। একটি মন্ত্রে সব ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনি হয়ে যেত।

আমি উৎসাহিত হইয়া বলিলাম—কি গাকশা, সে মন্ত্রটি কি?

এস তোমায় শিখিয়ে দি—বলিয়া গাকশা সে দিন অনেক যত্নে আমায় নূতন রকমের কতকগুলি কথা মুখস্থ করাইল। তারপর বলিল—এই কথা শুনলে চায়া-ওয়া একেবারে মুগ্ধ হয়ে একান্ত তোমারি হয়ে যাবে।

এই কথা বলিয়া গাকশা খুব হাসিতে লাগিল।

অতিরিক্ত ঔৎসুক্য ও আনন্দের বশে সে দিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইতে না ঘনাইতে আমি চায়াতে গেলাম। যথা-রীতি অভিবাদন ও চা পানের পর আমি চায়া-ওয়াকে খুব নিকটে টানিয়া বসাইলাম—সেই ছোট্ট মানুষটিকে দূরে রাখিলে যেন তাহাকে খুঁজিয়া পাইতাম না; সে যেন সারারাত্রি জাগিয়া দূরবীণ করিয়া দেখিবার মতন অতি দূরের জ্যোতিষ্ক, সে যেন টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিবার পুতুল, সে যেন বুকের উপর বোতাম-বিঁধে সাজাইয়া রাখিবার ফুলটি।

তাহার ছোট হাতখানি আমার হাতের মধ্যে তুলিয়া লইলাম—তখন প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমচিত্র আমার মনে পড়িল। আমি হাসিয়া গাকশার শেখান পাঠ তাহার কানের কাছে আবৃত্তি করিলাম।

গাকশা বলিয়াছিল সে মন্ত্র। বাস্তবিকই সে মন্ত্র সয়তানের, সে মন্ত্র সর্ব্বনাশের! আমার কথা শুনিবামাত্র সে আমার হাত হইতে হাত ছিনাইয়া লইয়া বড় রূঢ় দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

আমি সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া গাকশার শেখান কথার আরো খানিকটা আবৃত্তি করিলাম।

তখন সে ধনুর্নিক্ষিপ্ত বাণের মত ছিটকাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল! তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘৃণা ভৎর্সনা অবিশ্বাস বিচ্ছুরিত হইতেছিল।

আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আবার গাকশার শেখান পাঠ বলিতে লাগিলাম। তখন চায়া-ওয়া চীৎকার করিয়া দোকানের লোকজনদের ডাকিল, অনেক লোক ছুটিয়া আসিল। চায়া-ওয়া তাহাদের কি বলিতেই তাহারা আমাকে মারিয়া দোকান হইতে বাহির করিয়া দিতে প্রস্তুত হইল।

ব্যাপার কি আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না, এবং এমন গণ্ডগোল হইয়া উঠিল যে কাহাকেও কোনো কথা বুঝাইয়া বলিবার বা প্রশ্ন করিবার অবসর রহিল না। এবং দোকানীদের রকম মোটেই না বুঝিবার মতন নয় বলিয়া আমি জানা না জানার মধ্যে পড়িয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িলাম।

এমন সময় দেখি ভিড়ের এক পাশে দাঁড়াইয়া গাকশা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। আমি তাহাকে দেখিয়া যেন অকূল সমুদ্রে স্থল পাইলাম। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—গাকশা গাকশা, চায়া-ওয়া হঠাৎ আমার উপর কেন রাগ করেছে? আমি হয় ত কি বলতে কি বলেছি, কিংবা ও-ই হয় ত শুনতে ভুল করেছে; তুমি আমার কথাগুলো ওকে বুঝিয়ে বল গাকশা!

গাকশা হাসিয়া বলিল—বন্ধু, তুমি কিছুই ভুল বল নি, ওকুসামাও (মহাশয়াও) কিছু ভুল শোনে নি—তুমি তাকে বলেছ, তুই কুৎসিত, তুই আমার দাসী হবারও যোগ্য ন'স, তোকে আমি একটুও ভাল বাসি না, তোকে আমি ঘৃণা করি, শুধু তোকে নিয়ে এতদিন একটু তামাসা কচ্ছিলাম, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া পাংশুল মুখে বলিলাম—সে কি গাকশা, আমি তো অমন সব কথা বলতে চাইনি?

গাকশা হাসিয়া বলিল—আমি বলাতে চেয়েছিলাম।

আমি উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—সে কি গাকশা, সে কি? কেন এমন করলে?

গাকশা তেমনি নির্ব্বিকার ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল—ওকুসামা আমার প্রণয়িনী। তুমি নিপ্পন অপবিত্র করবার পূর্ব্বেই আমার হৃদয় ওঁর শ্রীচরণে উৎসর্গ করেছি। হয় না হয় তুমি ওকুসামাকেই জিজ্ঞাসা কর।

একী অদ্ভুত সমস্যা! আমি গাকশাকে বলিলাম—গাকশা, তুমি ত পরাজিত হয়েছ, এখন ওকুসামা আমার!

গাকশা হাসিয়া তেমনি নরম ভাবেই বলিল—কক্ষনো না! যত দিন আমি বেঁচে থাকব তত দিন না!

এই বলিয়া সে নিজের পেশীপুষ্ট বাহুখানা অনাবৃত

করিয়া হাসিতে হাসিতেই আমার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিল।

আমি বলিলাম—ভয় দেখিয়ো না গাকশা। তোমার জাপানী য়ুযিৎসু আছে, আমারও হিন্দুস্থানী কুস্তি আছে। ঠিক বলা যায় না কে জিতবে। অতএব একটা রফা করে ফেল।

গাকশা তেমনি হাসিতে হাসিতেই বলিল—হৃদয় নিয়ে যেখানে মারামারি সেখানে আবার রফা কি?

আমি মিনতি করিয়া বলিলাম—

গাকশা, তুমিই ত নিজে আমায় প্রণয়মন্ত্রে শিক্ষিত করে আমার সফলতার সহায়তা করেছ, এখন এ বিঘ্ন ঘটাচ্ছ কেন?

গাকশা হাসিতে হাসিতে বলিল—

তখন কি জানতাম যে তুমি আমাকেই আশ্রয় করে আমারই সর্ব্বনাশ করছ? তোমায় এতদিন অনেক কথা শিখিয়েছি। আজ একটা শেষ শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি, বল— জায়েন নাগারা কোকো দে ও ওয়াকারে মোশিমাস।

আমি হতাশ ভাবে দুঃখবিমলিন মুখে বলিলাম— গাকশা, এর অর্থটাও তবে বলে দেও।

গাকশা তেমনি হাসিয়া হাসিয়া বলিল—আমি দুঃখিত হইতেছি, আজ এই আমাদের চিরবিদায়।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্ধ-প্রেম

(শেখ সাদীর—মূল ফারসী হইতে)

গোলাপ নিকুঞ্জ হ'তে ফির্'রে সে আসিল যবে
সুধাইনু তা'রে—
"কি ফুল চয়ন করি এনেছ আঁচল ভরি'
প্রিয় জন তরে।"
কহিল সে—"হায়! প্রিয়! নিতুই প্রবেশ পথে
জপি অনুক্ষণ—
মালঞ্চ রচিয়া দিব প্রাণপ্রিয় জনে—করি
কুসুম চয়ন!
কিন্তু হায়! ফুল বনে প্রবেশিলে, উন্মাদক
মদির সুবাসে
আমার চেতনা হরে, অঞ্চল খসিয়া পড়ে
আবেগে আবেশে।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

বৈদিক অগ্নিমন্থন ও যজ্ঞীয় পাত্র

আমরা সকলেই শুনিয়াছি পুরাকালে ভারতীয় আর্য্যগণ কাষ্ঠসংঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন, এবং সেই অগ্নি যথাবিধি স্থাপন করিয়া তাহাতে তাঁহারা হোম করিতেন। ঐরূপে অগ্নি উৎপাদন করার পদ্ধতি এখনো যাজ্ঞিক সমাজে প্রচলিত আছে। কাশী ও দাক্ষিণাত্যে এখনো অনেককে এইরূপে অগ্নি আধান করিয়া যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিতে দেখা যায়। কেহ তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিলে কাশীর সুপ্রসিদ্ধ দ্রাবিড়-পণ্ডিত বৈদান্তিকবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী (৩৪, গোবিন্দজী নায়ক, দুধবিনায়ক মহল্লা), ও গৌড়ীয়-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভুদত্ত শাস্ত্রীর (শকরকান্দি গলি, মীরঘাট) গৃহে গমন করিলেই পূর্ণমনোরথ হইবেন।

জানিয়াছি গৌড়দেশের মধ্যে পণ্ডিত প্রভুদত্তজীই একমাত্র অগ্নিহোত্রী। আমি ইঁহার নিকটে শ্রৌতসূত্র সম্বন্ধে কিছু উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি, এবং ইঁহার অনুষ্ঠিত দর্শযাগও দেখিয়াছি। ইঁহার অগ্নিশালা হইতে বেদির এক আলেখ্যও (plan) সংগ্রহ করিয়াছি। সময়ান্তরে পাঠকগণের নিকট তাহা উপস্থাপিত হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমি কিছু কাল কিঞ্চিৎ বেদান্ত ও মীমাংসা অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। আজ তাঁহারই অনুগ্রহে অগ্নিমন্থনের যন্ত্র কয়টির প্রতিকৃতি পাঠকগণকে উপহার দিতে সমর্থ হইতেছি। কিছু দিন পরে ইঁহারই অনুগ্রহে আবার যজমান, যজমানপত্নী, ও ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য ঋত্বিগ্‌গণ-সংযুক্ত অগ্নিশালার চিত্র প্রদর্শিত হইবে।

অগ্নিমন্থনে পাঁচটি যন্ত্রের আবশ্যক হয়; যথা অ ধ রা র ণি, উ ত্ত রা র ণি, প্র ম স্থ, ও বি কী, চা ত্র, এবং নে ত্র।

অরণিদ্বয় শমীগর্ভ অর্থাৎ শমীবৃক্ষের মধ্য হইতে উৎপন্ন* অথবা শমীবৃক্ষের সহিত সংসক্তমূল† অশ্বত্থ বৃক্ষের পূর্ব্বমুখ, উত্তরমুখ বা উর্দ্ধমুখ শাখা ছেদন করিয়া তাহারই দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হয়। শমীগর্ভ অশ্বত্থ না পাওয়া গেলে যে-কোন অশ্বত্থেরই শাখার হইতে পারে (কর্ম্মপ্রদীপ, ১. ৭. ৩)।

অধরারণি এই অশ্বত্থশাখা হইতে নির্ম্মিত একখানি চতুষ্কোণ কাষ্ঠ। ইহা দৈর্ঘ্যে ২৪ আঙুল, বিস্তারে ৬ আঙুল এবং উচ্চতায় ৪ আঙুল। চিত্রে ইহা সর্ব্বনিম্নে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; যে কাষ্ঠখণ্ডে একখানি রজ্জু জড়ান রহিয়াছে দেখা যাইতেছে, তাহা এই অধরারণির উপরেই স্থাপিত রহিয়াছে। এই চতুষ্কোণ কাষ্ঠের মূলের দিকে আট আঙুল, এবং অগ্রের দিকে ১২ আঙুল ত্যাগ করিয়া মধ্য স্থানে একটু খুদিয়া নিম্ন করিয়া দিতে হয়, যাহাতে ঐ স্থানে স্থাপিত প্রমন্থনামক কাষ্ঠখানি বেশ ঘুরিতে পারে।

অধরারণির ন্যায় উত্তরারণিও উল্লিখিত শমীগর্ভ অশ্বত্থ-শাখার কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়, এবং ইহার আকার ও পরিমাণও ঠিক অধরারণির ন্যায়, কেবল ইহার মধ্য স্থলে অধরারণির ন্যায় খুদিয়া নিম্ন করা হয় না। চিত্রে ইহা অধরারণির বাম দিকে দেখা যাইতেছে। এই উত্তরারণিকে ১৮ ভাগে বিভক্ত করিতে হয়; এবং সেই এক এক ভাগেরই নাম প্র ম ন্থ। চিত্রে উত্তরারণিকে এইরূপ বিভক্তাবস্থায় দেখা যাইতেছে না; ইহাতে কেবল পরিমাণানুসারে চিহ্ন কাটা আছে। একটি প্রমন্থ শেষ হইয়া গেলে ঐ চিহ্নমত আবার একটি কাটিয়া লইতে হয়। অধরারণির উপরে ইহারই দ্বারা অগ্নি মন্থন করা যায় বলিয়া ইহার নাম প্র ম ন্থ।

অরণি শব্দের অর্থ নির্ম্মন্থনকাষ্ঠ। অগ্নিমন্থনের সময় অধর অর্থাৎ নীচে থাকে বলিয়া ঐ কাষ্ঠের নাম অ ধ রা র ণি, এবং প্রমন্থরূপে উত্তর অর্থাৎ উপরে থাকে বলিয়া ইহার নাম উ ত্ত রা র ণি।

চিত্রে দেখা যাইতেছে অধরারণির মধ্য স্থলে উপরে একখানি কাষ্ঠ উত্থিত আছে, এবং তাহাতে একখানি রজ্জু জড়িত রহিয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ সেখানে দুই খানি কাষ্ঠ সংযোজিত রহিয়াছে। অধরারণির ঠিক উপরে সংলগ্ন হইয়া যে কাষ্ঠ খানি উত্থিত আছে, ইহার নাম প্র ম ন্থ। ইহা যে পূর্ব্বোক্ত উত্তরারণিরই এক অংশ তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যে কাষ্ঠ খানিতে রজ্জু বেষ্টিত আছে, তাহারই মূল দেশে এই প্রমন্থকে একটি লৌহকীলক (পেরেক) দ্বারা দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া দেওয়া হয়; এই কীলকটি রজ্জুবেষ্টিত কাষ্ঠখানিতে লগ্ন করিয়াই রাখা হয়। প্রমন্থ দৈর্ঘ্যে ৮ আঙুল, বিস্তারে ২ আঙুল, এবং উচ্চতাতেও ২ আঙুল হইয়া থাকে।

যে কাষ্ঠখানিতে রজ্জু জড়িত রহিয়াছে, তাহার নাম চাত্র। চা ত্র যে কোন সারবান্ কাষ্ঠের হইতে পারে। কেহ কেহ খদির কাষ্ঠের করিবার বিধি দেন। ইহার নিম্নে লৌহকীলকযুক্ত চতুরস্র গর্ত্ত থাকে, এবং তাহাতেই প্রমন্থ আবদ্ধ হয় ইহা বলা হইয়াছে। চাত্রের নিম্ন ও উপরিভাগ লোহার পাত দিয়া মোড়া হয়; ইহার উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ করিলে নিয়ত ঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া সত্বরে তাহা নষ্ট হইয়া যায় না। ইহার উপরিভাগ এরূপ ভাবে একটু সরু করিয়া দিতে হয়, যাহাতে কোনো ছিদ্রের মধ্যে তাহাকে প্রবিষ্ট করাইতে পারা যায়।

* আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ৫. ১. ২. রুদ্র ভাষ্য; কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ৪. ৭. ২, বৃত্তি; পারস্কর গৃহ্যসূত্র ১. ২. ৫, হরিহর ভাষ্য; উদ্ধৃত যজ্ঞপার্শ্বকারিকা।

† "সংসক্তমূলো যঃ শম্যা স শমীগর্ভ উচ্যতে"— কর্ম্মপ্রদীপ, ১. ৭. ৩; যজ্ঞপার্শ্বকারিকা।

এই চাত্রের উপরিভাগে যে কাষ্ঠ খানিকে মধ্যভাগে স্থাপন করিয়া বালকটি তাহার দুই প্রান্ত দুই হস্তে ধরিয়া রহিয়াছে তাহার নাম ওবিলী।* ইহাও খদির বা অপর কোন সারবান্ কাষ্ঠের হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ১২ আঙুল। ইহার নিম্নদিকে লোহার পাত, এবং মধ্যস্থলে চাত্রের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করাইবার জন্য গর্ত্ত থাকে।

চিত্রে যে রজ্জু খানি দেখা যাইতেছে, তাহারই নাম নেত্র। ইহা শণ ও গোপুচ্ছের লোমে অতিমসৃণভাবে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা দৈর্ঘ্যে যজমানের হস্তের পরিমাণে ৩॥০ হাত (১ ব্যাম) হওয়া আবশ্যক।

অগ্নিমন্থন কিরূপ ভাবে করিতে হয়, তাহা চিত্রেই দেখা যাইতেছে। যজমান পশ্চিমমুখে ওবিলী ধারণ করিয়া থাকেন, আর অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া ও নেত্র ধারণ করিয়া দধিমন্থনের ন্যায় চাত্রকে ঘূর্ণিত করেন। যজমানপত্নী অথবা অন্য কোন দৃঢ়কায় ব্রাহ্মণও মন্থন করিতে পারেন। কিছুক্ষণ মন্থন করিলেই অধরারণি ও প্রমন্থের সংযোগস্থলে ধূম উঠিতে থাকে, এবং তাহার পর অনতিবিলম্বেই সেই স্থানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। তখন সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে শুষ্ক গোময়চূর্ণ অথবা তুষের উপর ধারণ করিলেই ক্রমশ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, এবং তদনন্তর যথাবিধি সেই অগ্নিকে স্থাপন করা হইয়া থাকে।

চিত্রে যে মধুরদর্শন বালকটি ওবিলী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীমান্ রামসুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। ইনি পূর্ব্বোক্ত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর দৌহিত্র, এবং কলিকাতা-সংস্কৃতকলেজের বেদান্তাধ্যাপক ও আমার সতীর্থ-বন্ধু শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর পুত্র। ইহাঁর বয়স এখন ১২ বৎসর হইবে, কিন্তু ইহার মধ্যেই লঘুকৌমুদী ব্যাকরণ শেষ করিয়া কিছু কিছু কাব্য এবং তর্কসংগ্রহ পাঠ করিয়া ফেলিয়াছেন। যজ্ঞীয় কার্য্যেও ইঁহার পটুতা জন্মিয়াছে। পূজ্যপাদ শাস্ত্রীজীর দর্শ ও পূর্ণমাস ইষ্টিতে এই বালকই ব্রহ্মার আসন পরিগ্রহ করেন। আমি যেদিন চিত্র তুলিবার জন্য যাই, সেদিন তাঁহার যজ্ঞীয় পাত্রসমূহের বিনিয়োগ উল্লেখ পূর্ব্বক আসাদন ও অন্যান্য কার্য্যে তৎপরতা দর্শন করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

আর যিনি নেত্র বা রজ্জু ধারণ করিয়া মন্থন করিতেছেন, ইঁহার নাম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী। ইনি উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। ইনি ন্যায় ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন। ইষ্টির সময় ইনি সাধারণত অধ্বর্য্যুর কার্য্য করিয়া থাকেন। এই সময় হোতা, ব্রহ্মা, আগ্নীধ্র ও অধ্বর্য্যু এই চারিজন ঋত্বিক বৃত হন, ইঁহাদের মধ্যে অধ্বর্য্যুর কাজই প্রধান।

২য় চিত্র যজ্ঞীয় পাত্র।

দ্বিতীয় চিত্রে কতকগুলি যজ্ঞীয় পাত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যজ্ঞীয় পাত্রসমূহ, সাধারণত ত্রিবিধ; যথা, ঐষ্টিক অর্থাৎ দর্শ-পূর্ণমাসাদি ইষ্টি-বিষয়ক; পাশুক, অর্থাৎ পশুযাগ বিষয়ক; এবং সৌমিক, অর্থাৎ সোমযাগবিষয়ক। চিত্রে কেবল ঐষ্টিক কতকগুলি পাত্র দেখা যাইতেছে। সম্মুখে যে ধীর-প্রশান্ত উজ্জ্বল তপস্বী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ইনিই মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। ইনি সর্ব্বত্রই সুপ্রসিদ্ধ। ইনি যেমন গভীরপাণ্ডিত্যপূর্ণ, সেইরূপই চরিত্রবান্। বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য দেশ-বিদেশ হইতে দলে দলে বিদ্যার্থী ইঁহার নিকট সমাগত হন। ইনি যখন প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্রের পর সেই পবিত্র ভস্ম ললাট ও বক্ষঃস্থলে লেপন করিয়া অজিনাসনে উপবেশন পূর্ব্বক কুশহস্তে শান্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়া উপনিষৎ ও

* খুব সম্ভব প্রকৃতি নিয়মানুসারে ইহা অবিলী হইতে হইয়াছে। নয়ে বিল গর্ত্ত।

শারীরক-ভাষ্য শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করেন, সেই সময়ে তাঁহার শান্ত-গম্ভীর প্রসন্ন ভাব নিতান্তই হৃদয়াকর্ষক।

কল্যাণভাজন শ্রীমান রামদাস উকিলের উদ্যোগে কাশী-হিন্দুকলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই ছবি দুইখানি তুলিয়া দিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

নীহারিকা।

তৃণের বুকের'পরে বিছায়ে শয়ন
কখন্ ঘুমায়ে গেছে নীহার রূপসী,
নিশান্তের স্বপনের ক্ষীণ পরিশেষ
অধরে শিহরে তা'র মৃদু মৃদু হাসি।

স্ফটিক জিনিয়া স্বচ্ছ হিয়াটুকু তা'র
না জানি গভীর কত—কত কোমল!
সান্ত্বনাবিহীনা ধরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া
নিশিশেষে ফেলেছে কি দুটী অশ্রুফল?

পথিক চ'লেছ কেবা—যাও ধীরে ধীরে,
শিশির দেখিছে সেথা সুখের স্বপন;
দিগন্তে মেঘের কোলে উষারাণী তাই
থমকি' দাঁড়া'য়ে গেছে—স্খলিত গুণ্ঠন!
সতীর নয়ন-কোণে দুটী মুক্তাফল
এরি' মত শুভ্র, বুঝি এমনি নির্ম্মল!

শ্রীসচ্চিদানন্দ লাহিড়ী।

উত্তর বঙ্গের পীর কাহিনী *

উপস্থিত সাহিত্যিকগণ মধ্যে পীরাণ গান অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। পীরাণ গান মুসলমান পীরচরিত অবলম্বনে রচিত। ঐ সমস্ত পীরচরিতের ছাপান পুঁথির সর্ব্বত্র প্রচার আছে। মুসলমান পীর বা সাধুপুরুষগণের তিরোভাবের দিবস স্মরণোপলক্ষে "উরছ" অর্থাৎ বার্ষিক ধর্ম্মোৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু সদাসর্ব্বদা তাঁহাদের চরিত্র গান করার প্রথা মুসলমান প্রধান দেশে প্রচলিত নাই। এই প্রথার মূলে হিন্দুয়ানির প্রভাব স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। বঙ্গের অশিক্ষিত সমাজে কিছুকাল পূর্ব্বে এই সমস্ত পীর-চরিতের কার্য্যকরী শক্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না। কিন্তু হিন্দু যাত্রাগানাদির ন্যায় এই সব পীরাণ গানেও থিয়েটারি ভাব উত্তরোত্তর প্রবল হইতে থাকায় ইহা এখন গ্রাম্য যুবকদলের মনোরঞ্জনের উপকরণ মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খাঁটী কোরাণিক মতের বহুল প্রচার হেতু মুসলমান সমাজও আর গীত বাদ্যাদির প্রতি তেমন শ্রদ্ধাশীল নহেন। ইত্যাদি কারণে এই সব পীরাণ গান পূর্ব্ববৎ লোক আকর্ষণে আর সক্ষম হইতেছে না। পুঁথিগুলি মুসলমানি বাঙ্গালায় রচিত ও বিবিধ অলৌকিক উপাখ্যানে পূর্ণ থাকায় শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের নিকট অশ্রদ্ধার বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। কোন কালে বঙ্গদেশে এই পীর অর্থাৎ সাধুপুরুষ-গণের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। নিম্নশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত ইঁহাদের ইঙ্গিতে চালিত হইতেন। তাহাতে হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন কথা ছিল না। এই সমস্ত পীরচরিত যদি সমাজের স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় কিম্বা গল্প গুজবে পরিণত হইয়া লোকের মনোরঞ্জনের উপকরণ মাত্র হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা একটী গুরুতর ত্রুটী বলিয়া বিবেচিত হইবে। শিক্ষিত মুসলমান সমাজ এই সব পীর-চরিত উদ্ধারে মনোযোগী না হইলে প্রত্যবায়ভাগী হইবেন। যাহাই হউক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কল্যাণে এই ত্রুটী অধিকদিন অসংশোধিত থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না।

ভারতে মুসলমান সংখ্যা বাহুল্যের হেতু যিনি যাহাই বলুন না কেন, মুসলমানগণ যে মূলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়াই আরব ভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইসলামভক্ত পীর বা সাধুপুরুষগণ তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে প্রধান সহায় স্বরূপ ছিলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় তাঁহাদের কর্ত্তব্য নীরবে প্রতিপালিত হইত বলিয়া ইতিহাসে তাঁহাদের উল্লেখ

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের বিগত মালদহ অধিবেশনে পঠিত।

অতি সামান্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। মুক্তিফৌজের এই সৈনিকগণ জড়রাজ্যের পরিবর্তে মনোরাজ্য অধিকারে সাধ্যাতীত শক্তি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় ভাব উন্মেষক অনুকূল আব হাওয়ার সহিত তাঁহাদের সরল ধর্ম্মমতগুলি মিশ্রিত হইয়া তাঁহাদিগকে অজেয়প্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। রামানন্দ, গোরক্ষনাথ, কবীর, নানক, বল্লভাচার্য্য, ও চৈতন্যাদি ভারতীয় ধর্ম্মবীরগণ যথা সময়ে আসিয়া যদি তাৎকালিক ভারতীয় সমাজের সঙ্গে একটা রফা বন্দোবস্ত না করিতেন তাহা হইলে ভারতের পরবর্ত্তী ইতিহাস কি ভাবে লিখিত হইত কে বলিতে পারে! যাহাই হউক আমাদের এই উত্তর বঙ্গে কথিত পীরশ্রেণীর কর্ম্মক্ষেত্র নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল না। প্রতি জেলাতেই দুই চারিটী করিয়া ইহাঁদের সমাধি বা আশ্রম বিদ্যমান থাকিয়া আজ পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মবীরগণের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। একশত বৎসর পূর্ব্বে যখন হেজ্জাজ যাতায়াতের পথ অপেক্ষাকৃত দুর্গম ছিল, সেই সময়ে এতদঞ্চলের মুসলমানদের নিকট পাণ্ডুয়া, মহাস্থান, ও পাঞ্জতনের (জেলা গোয়ালপাড়া) দরগা তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। ক্রমান্বয়ে ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে বিবিধ আচার অনুষ্ঠান ঐ সব পীরস্থানে আচরিত হইতে থাকায় এবং বঙ্গীয় মুসলমান সমাজেও ভক্তিভাব উত্তরোত্তর খর্ব্বীকৃত হইতে আরম্ভ হওয়ায় এই পীরস্থানগুলির দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই পীরোত্তর সম্পত্তি ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত। মন্দির বা সমাধিগুলির অবস্থা অনেক স্থলেই শোচনীয়। পীরসাহেবগণের যথার্থ পরিচয় ও তাঁহাদের জীবনের ঘটনাবলী বিবিধ অলৌকিক ও অসম্বদ্ধ ঘটনাদ্বারা আচ্ছন্নপ্রায়। অধিকাংশ স্থলেই সত্যউদ্ধার সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয়। কয়েকবৎসর যাবৎ আমাদের এই উত্তরবঙ্গের পীরস্থানগুলির একটী তালিকা সংগ্রহের দুরাশা আমি অন্তরে পোষণ করিতেছি। কিন্তু আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা এই কার্য্য সমাধা হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। উপস্থিত সাহিত্যিক মহোদয়গণকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ নিবেদিতেছি। অন্ততঃপক্ষে আমাকে সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করিলে পথ অনেকটা সহজ হইতে পারে। যাহাই হউক আমি এ যাবৎ যতদুর সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি আপনাদের সমক্ষে প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব। সাহিত্যসম্মিলনে প্রবন্ধ পাঠের জন্য যে সময় নিরূপিত হয় তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সঙ্কীর্ণ। এজন্য আমার সংগ্রহ হইতে তিনজন পীরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অত্র প্রবন্ধে উল্লেখ করিতেছি। বলা বাহুল্য যে প্রদত্ত বিবরণে ভ্রম প্রমাদ থাকা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। তাহার সম্ভাবনা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

যে তিন জন পীরের নাম আমি উল্লেখ করিতেছি তাঁহারা যে কেবল উত্তরবঙ্গেই মাননীয় ছিলেন এরূপ নহে। তাঁহাদের চরিতাবলী বিবিধ ছন্দে খোল, করতালাদির সাহায্যে বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই গীত হইয়া থাকে। ইহাঁদের মধ্যে সত্যপীরের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাঁর কোন নির্দ্দিষ্ট দরগা আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। সাধারণতঃ ভাদ্র মাসে আটা, কলা, গুড় ও দুগ্ধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া এই পীরের অপক্ক সিরণী লোককে ভোজন করাইবার রীতি আছে। ইহাঁর দেহত্যাগ ও সমাধি কোথায় হইয়াছিল এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। পুঁথি পাঠে জানা যায় যে মালঞ্চা নগরের হিন্দু অধিপতি মৈদলব রাজার অবিবাহিতা কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে ভগবদিচ্ছায় বিনা পিতায় সত্যপীরের জন্ম হয়। তিনি ঐশ্বরিক জ্ঞানে বিভূষিত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়েন এবং পিতামহ সহ অন্যান্য বহু লোককে ইসলামিক মতে দীক্ষিত করেন। ইহা ব্যতীত অনেক অলৌকিক কার্য্যও তাঁহার দ্বারায় সাধিত হইয়াছিল বলা হয়।

পুঁথি হইতে মোটামোটি এই সত্য গৃহীত হইতে পারে যে সত্যপীর মূলে হিন্দুসন্তান ছিলেন। উত্তর কালে ইসলাম মত গ্রহণ করতঃ একজন সাধক ও ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত হয়েন। অল্প দিন হইল এই পীরের জন্মস্থান আবিষ্কৃত হইয়া রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। মালঞ্চা নগরের অবস্থান উত্তরবঙ্গ ষ্টেট রেলওয়ের জামালগঞ্জ ষ্টেসন হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে এবং দিনাজপুরের অন্তর্গত পত্নীতলা থানা হইতে ২০ মাইল

পূর্ব্ব দিকে পাহাড়পুরের নিকট স্থিরীকৃত হইয়াছে। পশ্চিমে নুর নদী পূর্ব্বে কম্পনদী মধ্যে মালঞ্চা রাজ্য। এই পাহাড়পুরের নিকট মাদারের স্থান বলিয়া বি ৬/৪৷৷৵ ধুর ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে। বাদলগাছির কাছারিতে পোরসার জমিদার মহাশয়দের ১২৭৮ সালের ১০ই বৈশাখের লিখিত যে চিঠা আছে তাহার সীমাবন্দিতে "মৈদলন রাজার বাড়ী সত্যনারায়ণের জমি" এরূপ দৃষ্ট হয়। হিন্দু সমাজে সত্য-নারায়ণের পূজা ও তাঁহার প্রসাদ বিতরিত হইয়া থাকে। এই প্রসাদের উপকরণ ও প্রস্তুত প্রণালী সত্যপীরের সিরণীর অনুরূপ। সত্যপীর ও সত্যনারায়ণকে অভিন্ন মনে করিয়া পুঁথিতে বলা হইয়াছে যে—

"চারি প্রাণে নারায়ণ অবতার করে।
সহল পামান নারায়ণ সত্য নাম ধরে॥
যেই সত্য নারায়ণ সেই সত্য পীর।
দুই কুলে লৈছে সেবা করিয়া জাহির॥"

পুঁথির লেখক হরনারায়ণ দাস, রচয়িতা কৃষ্ণহরি দাস। কৃষ্ণ হরির পিতার নাম রামদেব দাস, মাতা পঞ্চমী। গুরুর নাম তাহের মহম্মদ সরকার। জন্মস্থান সাখারিয়া গ্রাম, হাল নিবাস মইপুর (রঙ্গপুর ?)। সত্যনারায়ণের দুইখণ্ড ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণের মুদ্রিত পাঁচালী মিলাইয়া দেখিয়াছি। তাহাতে—

"সত্য পীর নামে পূজা করিবে যবনে।
এরূপে করিবে সেবা যার যেই মনে॥"

লিখিত আছে। পাঁচালী রচয়িতার নাম অপ্রকাশ, নিবাস ব্রহ্মপুত্রকুলস্থিত ব্রাহ্মণবৈশ্যাদি পূর্ণ কাশীপুর গ্রামে। একখণ্ড পাঁচালী ফরিদপুরের অন্তর্গত হাসাম-দিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়রত্ন কর্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত।

সত্যপীরের পরেই গাজীর নাম বঙ্গে সুপরিচিত। ইনি সুবিখ্যাত আদিনা মসজীদ নির্ম্মাতা ও বঙ্গে জরিপ প্রথার প্রবর্ত্তক বঙ্গের তৎকালিক শাসনকর্ত্তা সেকেন্দর সাহের পুত্র। গাজী চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাণ্ডুয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম্মাত্মা গাজী বুদ্ধের ন্যায় রাজসিংহাসন তুচ্ছ করিয়া অল্প বয়সেই সন্ন্যাস অবলম্বন করতঃ ইসলাম প্রচারে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম দারাবউদ্দিন। গাজী উপাধি মাত্র, অর্থ ধর্ম্মযোদ্ধা। কালু নামে একজন হিন্দুসন্তান ইহার ধর্ম্মবন্ধু ও সহপ্রচারক ছিলেন। মতান্তরে কালুকে সেকেন্দর সাহের মন্ত্রিপুত্রও বলা হয়। তিনি চিরকুমার ছিলেন। গাজী ও কালুর কীর্ত্তিকাহিনী বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই গীত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের সোনার গাঁ পরগণায় পঞ্চগাজীর নামে ৫টী মসজীদ স্থাপিত ছিল। দারাবউদ্দিন গাজী ও কালু সহ দারাবউদ্দিনের ভ্রাতা বঙ্গেশ্বর গয়েসউদ্দি, পিতা সেকেন্দর সাহ ও পিতামহ পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন অধিপতি হাজী ইলিয়াস সামসুদ্দি এই পাঁচজন পঞ্চগাজী নামে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীহট্টে, সমাধিপ্রাপ্ত সাহজালালের সঙ্গে যে ৩৬০ জন সাধু পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও গাজী উপাধি ছিল। "গাজী, কালু ও চম্পাবতীর পুথি"তে গাজীকে (দারাব-উদ্দিন) বৈরাট নগরেব অধিপতি সাহ সেকেন্দরের পুত্র বলা হইয়াছে। যে কয়েক খণ্ড গাজীর পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহার রচনা ও রচয়িতা এক নহে। আবদার রহিম একজন রচয়িতা, নিবাস গলাচিপা, পোঃ হোসেনপুর, জেলা ময়মনসিংহ। সেখ মহম্মদ মুনসীও একজন রচয়িতা, তাঁহার নিবাস ও পুঁথির রচনা কাল জানিবার উপায় নাই। তবে রচনা খুব আধুনিক বলিয়াই মনে হয়। পুঁথির মতে ৬ মাস বয়স্ক কালু সমুদ্রে সিন্দুক মধ্যে ভাসমান অবস্থায় গাজীর মাতা অজুপা কর্ত্তৃক অলৌকিক উপায়ে প্রাপ্ত ও তাঁহারই দ্বারা পালিত। কালুর পিতামাতার নাম অপ্রকাশ। ১৩০৮ সনের "নব্য-ভারতে" ও ১৩১৬ সনের "ইস্‌লাম প্রচারক" পত্রিকায় গাজী ও কালু সাহের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দারা পীরদ্বয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। গাজীর দেহত্যাগ ও সমাধি স্থান লইয়া মতভেদ বিদ্যমান। হুগলীর উত্তর ত্রিবেণীর নিকট শিবপুর গ্রামে যে গাজীর দরগা আছে উক্ত দরগাকে কেহ কেহ দারাবউদ্দিন গাজী ও কালুর সমাধি মনে করেন। উক্ত দরগা জাফর সাহ গাজীর দরগা বলিয়াও কথিত হয়। ত্রিবেণীর অপর পারেই গাজীর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ও শ্বশুরালয় ব্রাহ্মণ নগর স্থাপিত ছিল, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। গাজীর হিন্দু শ্বশুর রাজা মুকুট রায়ের ইষ্ট দেবতা দক্ষিণ রায় অমিতবলশালী ছিলেন। পুঁথির মতে তিনি গাজীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়েন। তিনিই নাকি এখন হাওড়া

অঞ্চলে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায় নামে পূজিত হইয়া থাকেন। হাওড়া খুরুট রোডের পার্শ্বে এই ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণ রায়ের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ইহার নিকটেই ঘোলাডাঙ্গা পল্লিতে অশ্ববাহন ফকির কালু রায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। উভয় স্থানেই ব্রাহ্মণ পূজক। সুন্দর বন অঞ্চলে গাজী ও কালু পীরের অনেক দরগা আছে। সাধারণতঃ ব্যাঘ্রভয় নিবারণের নিমিত্তই গাজী ও কালুর পূজা বা সিন্নি দেওয়া হইয়া থাকে। প্রচলিত গাজী ও জোল হাউসের (গয়েস-উদ্দিনের) পুঁথি অবলম্বনে গায়কেরা গাহিয়া থাকেন যথা—

> পোড়া রাজা গয়েসদ্দি, তার বেটা সামসুদ্দি,
> তার পুত্র বাদসা সেকেন্দর।
> তার বেটা বড়খাঁন গাজী, খোদাবন্দ মলুকের রাজী
> কলিযুগে যার অবতার।
> বাদসাই ছাড়িল রঙ্গে, কেবল ভাই কালু সঙ্গে,
> নিজ নামে হইল ফকির।

রিয়াজউস সালাতিন্ ও ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালার ইতিহাসে গয়েসউদ্দিকে সামসুদ্দির পৌত্র বলা হইয়াছে। গয়েস-উদ্দিনের কোন সহোদর ভ্রাতা থাকাও জানা যায় না।

অতঃপর একদিলসাহেব সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। একদিলের পুঁথিতে পশ্চিম দেশের সাহানা নদীর তীরে, সাহানাগ্রামে, সাহনীর সওদাগরের পত্নী পুণ্যবতী আশকস্তুরীর গর্ভে বিনা পিতৃসংযোগে একদিলের জন্ম লিখিত আছে। সাহানানগর কাঞ্চননগর রাজ্যের অন্তর্গত। ছত্রজিত রাজা সেই সময়ে রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। উক্ত রাজ্যের নিকট মালিক পাটন, বেলপুর ও গুজরাট ইত্যাদি দেশের বা নগরের অবস্থান থাকা জানা যায়। বৈরাট নগরের মোল্লা আতার নিকট একদিল শিক্ষা লাভ করেন। চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত পীর সাহবদর একদিল সাহের মুরসেদ অর্থাৎ দীক্ষাগুরু ছিলেন। রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত মিঠাপুকুর থানার হরিপুর গ্রাম নিবাসী জয়নুল্লা মণ্ডলের পুত্র আশক মামুদ মণ্ডল ১২৪১ সালের ১৩ আশ্বিন এই পুঁথির রচনা শেষ করেন। পুঁথির উক্তি গ্রহণ করিলে পশ্চিমে গুজরাট পূর্ব্বে বঙ্গদেশ একদিল সাহের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল মনে করিতে হয়। উত্তর বঙ্গের সর্ব্বত্রই ইহাঁর চরিত গান করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এতদঞ্চলে যে একদিল সাহের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল এরূপ মনে করা অযৌক্তিক নহে। গাজী পীরের জন্মস্থান সর্ব্বজনবিদিত পাণ্ডুয়া নগরে অথচ গাজীর পুঁথিতে বৈরাট নগর বলা হইয়াছে। একদিল সাহের শিক্ষালাভের স্থানও বৈরাটনগর। কোন কালে পাণ্ডুয়া বৈরাট নামে পরিচিত হইত কি না, ঐতিহাসিক-গণের বিবেচ্য। উত্তর বঙ্গের একাধিক স্থানে বিরাট রাজার রাজ্য অন্ততঃপক্ষে গোগৃহ নিরূপণের চেষ্টা চলিতেছে। উত্তর বঙ্গ ব্যতীত মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের মধ্যে একটী, বিন্ধ্য পর্ব্বতের পাদদেশে একটী ও জয়পুর রাজ্যে একটী বিরাট রাজার রাজ্যের অস্তিত্ব পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের চেষ্টায় আমরা জানিতে পারিতেছি। এখন একদিল ও গাজীর পুঁথির লিখিত বৈরাট নগর কাল্পনিক কি ইহার মধ্যে কোন একটী, মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। পুঁথির সাহায্যে একদিল সাহের দেহত্যাগ কোথায় হইয়াছিল নির্ণয় করা কঠিন। জেলা ২৪ পঃ অন্তর্গত বারাশত মহকুমার এলাকায় কাজীপাড়ার নিকট একদিল সাহের এক সুপরিচিত দরগা আছে। এই দরগাই কথিত একদিল সাহের দরগা কি না এপর্য্যন্ত মীমাংসা হয় নাই।

আমানৎউল্যা আহম্মদ।

মরণ।

> আমি তপনের মত চাহিগো মরণ,
> উজলিয়া সান্ধ্যরাগে, হাসিতে হাসিতে।
> হোক্ না সে স্বল্প কেন ধরার জীবন,
> হোক্ না সে দিন দিন যাইতে আসিতে।
> চাহিনা মরণ আমি চন্দ্রমার মত,
> পক্ষধরি তিলে তিলে ক্ষয়ের যাতনা।
> হোক্ না জীবন দীর্ঘ হ'তে পারে যত,
> চাবি পাশে তারাদল করুক সাধনা।

শ্রীকালিদাস রায়।

শিমলা

(১)

শিমলা নগরী প্রায় ছয় মাইল দীর্ঘ একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার গিরিশ্রেণীর উপর অবস্থিত। এই গিরিশ্রেণী কোথাও উন্নত এবং কোথাও আনত হইয়াছে। উন্নত অংশগুলি এক একটী উচ্চচূড় পর্ব্বতে পরিণত। এই পর্ব্বতগুলির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম আছে, যথা :—প্রস্পেক্ট হিল, অব্‌জার্ভেটারী, সমার হিল, ইলীশিয়ম্ হিল, ষ্টার্লিং হিল, জ্যাখো হিল (যক্ষ পর্ব্বত) ইত্যাদি। প্রস্পেক্ট হিল্ ৭০৪০ ফুট উচ্চ; অব্‌জারভেটারী হিলের উচ্চতা ৭০০৭ ফুট, ষ্টারলিং হিলের উচ্চতা ৭৪০০ ফুট ও যক্ষ পর্ব্বতের উচ্চতা ৮০৪৮ ফুট। অবশ্য এই সমস্ত উচ্চতা সমুদ্রের উপরিভাগ হইতেই ধরা হইয়াছে। যক্ষ পর্ব্বতই শিমলার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত।

এই সমস্ত পর্ব্বতের শিখর প্রদেশে, গাত্রে, স্কন্ধে ও সানুদেশে আবাসবাটী সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অগভীর উপত্যকা ভূমিতেও অসংখ্য বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। একটি অধিত্যকা ভূমি (plateau) সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে প্রায় ৭২৩০ ফুট উচ্চ। সেখানেও অনেক বাটী এবং ক্রাইষ্ট চচ্ নামক প্রসিদ্ধ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মন্দির বিদ্যমান আছে। পর্ব্বত সমূহের গাত্র কাটিয়া রাজপথ প্রস্তুত হইয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেক পর্ব্বতই রাজপথ দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু রাজপথগুলি সমতল ভূমির উপর দিয়া গমন করে নাই; তৎসমুদায় উচ্চাবচ ভূমির উপর প্রস্তুত হওয়ায় কখনও ঊর্দ্ধদেশে প্রধাবিত হইয়াছে এবং কখনও বা নিম্নদেশে অবতরণ করিয়াছে। এই উন্নতানত রাজপথগুলিকে স্থানীয় চলিত ভাষায় "চড়াই ও উতরাই" বলে। যাঁহারা সমতল ক্ষেত্রের রাজপথ সমূহে চলিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের পক্ষে "চড়াই-উতরাই" বিশিষ্ট এই পার্ব্বত্য রাজপথসমূহে পরিভ্রমণ করা একান্ত কষ্টকর। চড়াই অতিক্রম করিতে করিতে তাঁহাদের দারুণ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়; এবং "উতরাই" পথে অবতরণ করিতে করিতে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ পদদ্বয় অতিশয় কম্পিত হইতে থাকে। কিন্তু কালক্রমে এইরূপ পথে ভ্রমণ করা অভ্যাস হইয়া গেলে, আর বিশেষ কষ্ট বোধ হয় না। "চড়াই"-পথ অতিক্রম করিবার নিয়ম এই যে, উঠিবার সময় ধীরে ধীরে পাদক্ষেপ করিয়া উঠিতে হয়। যদি বেগে উঠিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে, অল্পক্ষণ মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে এই দুর্গম পথ সমূহ অতিক্রম করিয়া থাকে। সমতল ভূমিতে ভ্রমণ করিতে আমাদের যেরূপ কোনও কষ্ট হয় না, পার্ব্বত্য প্রদেশের উন্নতানত পথসমূহে ভ্রমণ করিতে ইহাদেরও তদ্রূপ কোনও কষ্ট হয় না। কিন্তু শুনিয়াছি যে সমতল ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে হইলে, ইহারা যারপর নাই কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে! অভ্যাসের এইরূপ বিচিত্র গুণই বটে।

এই রাজপথগুলি প্রায় ১৪।১৫ ফুট প্রশস্ত। অধিকাংশ স্থলে, পথের একদিকে দুরারোহ বনাচ্ছন্ন পর্ব্বত-গাত্র, এবং অপরদিকে গভীর খাত। খাতের দিকে কোথাও বা তারের বেড়া এবং কোথাও বা কাষ্ঠের বেড়া আছে। এই বেড়াগুলি যে কোনও ভারী বস্তুর পতন নিবারণ করিতে ক্ষম, তাহা বোধ হয় না; কিন্তু তথাপি ইহাদের বিদ্যমানতা পাদচারী পথিক, অশ্বারোহী ভ্রমণ-কারী, ও রিক্‌সা (Rickshaw) নামক শকটবাহী কুলি-গণের মনে যে একটী ভয়শূন্য স্বচ্ছন্দ ভাব উৎপন্ন করে, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

আবাসবাটীসমূহ রাজপথের উভয় পার্শ্বে উর্দ্ধ ও অধঃপ্রদেশে নির্ম্মিত হইয়াছে। কতকগুলি পর্ব্বতগাত্রে সোপানের ন্যায় স্তরপরম্পরা দৃষ্ট হয়। এই স্তরগুলি গৃহনির্ম্মাণের পক্ষে একান্ত উপযোগী। স্তরগুলি প্রায়ই সমতল ক্ষেত্র, সুতরাং তৎসমুদয়ে গৃহ নির্ম্মিত হওয়া ব্যতীত মনোহর উদ্যান রচিত এবং কৃষিক্ষেত্র সমূহও সুবিন্যস্ত হয়। গৃহ-উদ্যানকৃষিক্ষেত্র-পরিশোভিত এই স্তর-গুলি দূর হইতে অতিশয় সুন্দর দেখায়। মনে হয় যেন একটী মনোহর চিত্রপট আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। রাত্রি কালে, গৃহগুলি যখন আলোকমালায় বিমণ্ডিত হয়, তখন গিরিগাত্রগুলির যে অপূর্ব্ব শোভা দৃষ্ট হয়, তাহা লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। শিমলায় যে দিন উপস্থিত হই, সেই দিন রাত্রিকালে আলোকমালা-

বিমণ্ডিত একটী দূরস্থিত গিরিগাত্রের শোভা দেখিয়া আমি একান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। রজনীর অন্ধকারে গিরিগাত্র বা গিরিগাত্রস্থিত সৌধাবলী কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না; কেবল আকাশপথে স্তরে স্তরে উজ্জ্বল আলোকশ্রেণীই নয়নযুগলে প্রতিভাত হইতেছিল। দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, আমরা যেন ভূতল পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের অমরাবতীর সন্নিহিত হইয়াছি!

শিমলার চতুর্দ্দিকের স্বাভাবিক দৃশ্য পরমরমণীয় ও চমৎকার। কোনও দিকে পর্ব্বতরাজির উপর পর্ব্বতরাজি; কোথাও গভীর উপত্যকাভূমি ও খাত, কোথাও নিবিড় বনাচ্ছন্ন গিরিগাত্র; কোথাও বৃক্ষলতাশূন্য উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ এবং কোথাও বা সুগভীর খাতের মধ্যে কলনাদিনী তটিনী। শিমলা নগরী পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে লম্বিত ও বিস্তৃত। রেলপথ পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া শিমলা নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। রেলগাড়ী হইতে সর্ব্বপ্রথমেই প্রস্‌পেক্টহিল্ ও অবজারভেটারীহিল্ নয়নপথে পতিত হয়। এই শেষোক্ত পর্ব্বতের উপর বড়লাটসাহেব বাহাদুরের প্রাসাদ অবস্থিত। আমি এই পর্ব্বতের নাম জানিতাম না; কিন্তু রেলগাড়ী হইতে এই পর্ব্বত ও তদুপরি-স্থিত প্রাসাদ সর্ব্ব প্রথমে নয়নগোচর করিবা মাত্র, আমি প্রাসাদটিকে একটী অব্‌জার্ভেটারী বা নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণ-গৃহ মনে করিয়াছিলাম। পরে পর্ব্বতের নাম শুনিয়া নামের সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল্ বোইলো (Colonel Boileau) এই পর্ব্বতের উপর একটী অব্‌জার্ভেটারী গৃহও স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সেই কারণেই এই পর্ব্বতের নাম অব্‌জার্ভেটারী হিল্ হইয়াছে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে অব্‌জারভেটারী গৃহ পরিত্যক্ত হয় এবং পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ চূড়াটি কাটিয়া পর্ব্বতের উপরিভাগে একটী বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই সমতলক্ষেত্রের উপর বড়লাট সাহেব বাহাদুরের সুন্দর প্রাসাদ হইয়াছে। এই প্রাসাদের নাম ভাইস্‌রীগ্যাল্ লজ্ অর্থাৎ সম্রাট্-প্রতিনিধির বাসভবন।

অব্‌জারভেটারী পর্ব্বতের দক্ষিণপশ্চিম পাদমূলে এবং প্রস্‌পেক্ট হিলের পূর্ব্বভাগে যে বসতি আছে, তাহা কর্ণেল বোইলোর নামানুসারে বোইলোগঞ্জ (Boileauganj) নামে অভিহিত হয়। এখানে একটী বাজার আছে এবং কতিপয় উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বাস করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শিমলানগরী একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার গিরিশ্রেণীর উপর অবস্থিত। প্রস্‌পেক্টহিল ও বোইলোগঞ্জ সেই অর্দ্ধচন্দ্রের পশ্চিমপ্রান্ত, এবং কাণুমটি ও ছোট শিমলা তাহার পূর্ব্বপ্রান্ত। এই অর্দ্ধচন্দ্রের অভ্যন্তরভাগের সম্মুখে দক্ষিণদিকে সুগভীর ও সুবিস্তৃত উপত্যকা বিদ্যমান। ইহা শিমলানগরী হইতে প্রায় সহস্রাধিক ফুট নিম্ন এবং অসংখ্য গভীর খাত, অনুচ্চ শৈল, পয়োনালা ও তটিনীদ্বারা বিভক্ত। এই অর্দ্ধচন্দ্রের বিপরীত অর্থাৎ উত্তরভাগেও গভীর খাত ও পয়োনাল পরিশোভিত উপত্যকা আছে এবং পৃষ্ঠ দণ্ডের ন্যায় চারিটি পর্ব্বত উত্তরদক্ষিণদিকে লম্বমান হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রের বহির্বৃত্তের সহিত সংযুক্ত আছে। পশ্চিমভাগে অব্‌জারভেটারীহিলের নিকট অর্দ্ধচন্দ্রের প্রথম পৃষ্ঠদণ্ডস্বরূপ যে পর্ব্বত দণ্ডায়মান, তাহার নাম সমার হিল্ অর্থাৎ বসন্তগিরি।* এই পর্ব্বতটি অতীব মনোহর। ইহার গাত্রনিচয় নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। উভয় পার্শ্ববর্ত্তী বনের মধ্য দিয়া রাজপথ ঘুরিয়া ফিরিয়া ধীরে ধীরে ইহার উচ্চ শৃঙ্গাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে। পর্ব্বতের পশ্চিম-ভাগে যে রাজপথ, তাহা প্রায় গৃহশূন্য ও জনশূন্য। নির্জ্জন আরণ্য পথ বহিয়া পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে করিতে হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয় এবং মনোমধ্যে নানা গভীর ও উচ্চভাবের উদয় হয়। এই পর্ব্বতের সমান্তরালে পশ্চিম-দিকে আর একটী বনাচ্ছন্ন পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। সেই পর্ব্বতের নাম পটারি হিল্ বা কুম্ভকার পর্ব্বত। পটারি হিল সিমলা নগরীর সীমার বহির্ভূত ও পাটিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার শৃঙ্গে কুম্ভকারেরা কুম্ভ ইত্যাদি প্রস্তুত করে বলিয়া ইহার নাম কুম্ভকার পর্ব্বত বা পটারি হিল্ হইয়াছে।

বসন্তগিরি বা সমার হিলের উপর আরোহণ করিতে করিতে উত্তরভাগে উপনীত হইলে চমৎকার পার্ব্বত্য দৃশ্য

* শীতপ্রধান দেশে যাহা Summer বা গ্রীষ্মকাল, আমাদের দেশে তাহা বসন্তের তুল্য। এই কারণে, Summer Hill এর অনুবাদ "বসন্তগিরি" করা হইল।

নয়নপথে পতিত হয়। এইস্থলে পথিকের উপবেশনের জন্য কতিপয় লৌহময় আসন আছে। আকাশ পরিষ্কৃত থাকিলে এই স্থল হইতে হিমাচলের চিরতুষারময় ধবল শৃঙ্গাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, এই স্থান হইতে কৈলাস পর্ব্বতের চূড়াও দেখিতে পাওয়া যায়। সমার হিলের উত্তরদিকে চ্যাড্‌উইক্ ফল্‌স্ নামে সুন্দর জলপ্রপাত আছে। অনেকে এই জলপ্রপাত দেখিতে যান। আমরা যে সময় শিমলায় গিয়াছিলাম, সেই সময়ে জলাল্পতা হেতু প্রপাত ছিল না। শুনিয়াছি, শিমলার মনোহর দৃশ্যাবলীর মধ্যে এই প্রপাতও পরিগণিত হইয়া থাকে। সমার হিলের দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগে অনেকগুলি আবাসবাটী আছে।

অর্দ্ধচন্দ্রাকার গিরিশ্রেণীর দ্বিতীয় মেরুদণ্ডস্বরূপ কাইথু পর্ব্বত উত্তরদক্ষিণে লম্বমান হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রের বহির্বৃত্তের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই পর্ব্বতের উপরিভাগে সেণ্ট্ জোসেফ্‌স্ স্কুল ও অনেক বাটী বিদ্যমান। ইহার অব্যবহিত পশ্চিমভাগে একটী গভীর উপত্যকার মধ্যে এনান্‌ডেল্ নামক প্রসিদ্ধ ঘোড় দৌড়ের মাঠ ও উদ্যান আছে। ইংরাজী এনান্‌ডেল্ শব্দটি বাঙ্গলা "আনন্দ-নিলয়" শব্দ দ্বারা অনুবাদ করিলে স্থানটি অম্বর্থনামা হয়। "আনন্দ-নিলয়" দেখিয়া মনে হইল, একটী পর্ব্বতের শিখরদেশকে কাটিয়া ফেলিয়া, তাহাকে যেন সমতলক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। "আনন্দ-নিলয়ে" অবতরণ করিবার দুইটী পথ আছে; একটী দুরবতরণীয়, অপরটি সুখাবতর্য্য। প্রথম পথটিতে গমন করিলে শীঘ্রই "আনন্দ-নিলয়ে" উপনীত হওয়া যায়; দ্বিতীয় পথটি ঘুরিয়া ফিরিয়া গমন করায়, যাইতে কিছু বিলম্ব ঘটে। কিন্তু এই শেষোক্ত পথের শোভা অতীব মনোহারিণী। পর্ব্বতগাত্র হইতে কেলু, কইল প্রভৃতি সুদীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষরাজি সরলভাবে আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। এক একটী বৃক্ষের কাণ্ড একশত ফুট অপেক্ষাও অধিক দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। কাণ্ডের পরিধিও নিতান্ত অল্প নহে। হিমালয় ব্যতীত অন্যত্র কোথাও এরূপ মহান্ বনস্পতি দৃষ্টিগোচর হয় না। রিক্‌শা-নামক দ্বিচক্রবিশিষ্ট নরযানে আরোহণ করিয়া আমি "আনন্দ নিলয়ে" গমন করিয়াছিলাম। বাহকেরা আমাকে দুরবতরণীয় পথ দিয়াই সেখানে লইয়া গিয়াছিল। সেই পথ দিয়া নামিতে নামিতে আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন পাতালপুরীতেই অবতীর্ণ হইতেছি। পথটি একপ্রকার "খাড়া" বলিলেই হয়। সম্মুখে দুইজন কুলী গাড়ীর ধুরা ধরিয়া আছে, এবং পশ্চাতে তিনজন তাহাকে বিপরীত দিকে টানিয়া রাখিতেছে। যদি গাড়ীখানি সহসা কুলীদের হস্তচ্যুত হইত, তাহা হইলে তাহা আরোহী সহিত মুহূর্ত্ত মধ্যে নক্ষত্রবেগে কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়া যাইত, তাহার স্থিরতা নাই। সমতল ভূমির অধিবাসী আমরা—এইরূপ পথে "আনন্দ-নিলয়ে" গমন করিবার কালে মনোমধ্যে অত্যন্ত ভয় ও উদ্বেগ অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন "আনন্দ-নিলয়ে" ঘোড়দৌড় হইতেছিল। ঘোড়দৌড়ের মাঠে ইংরাজ নরনারীর তো কিছুমাত্র অভাব ছিল না; অধিকন্তু শিমলা ও শিমলার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে অসংখ্য পার্ব্বত্য নরনারীরও সমাগম হইয়াছিল। আমি ইতঃপূর্ব্বে এতদ্দেশীয় পার্ব্বত্য নরনারীগণকে দেখিবার তেমন সুযোগ পাই নাই। সেইদিন ঘোড়দৌড়ের মেলায় তাহাদিগকে দেখিয়া যেরূপ বিস্মিত এবং আনন্দিত হই, তদ্রূপ দুঃখিতও হইয়াছিলাম। বিস্ময়ের কারণ এই যে, পার্ব্বত্য মহিলারা যে এরূপ সুন্দরী হইবে, তাহা পূর্ব্বে আমি মনোমধ্যে ধারণাই করি নাই। তাহাদের বিশালায়ত চক্ষু, সুগঠিত নাসিকা, পরিপাটী অধরোষ্ঠ, গোলাপরাগ-রঞ্জিত শুভ্র কান্তি এবং সহাস্য ও প্রফুল্ল বদনমণ্ডল তাহাদিগকে দিব্যাঙ্গনার ন্যায় প্রতীয়মান করিতেছিল। তাহারা নানাবর্ণের বিচিত্র বসন ও পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক ঘোড়-দৌড় দেখিতে আসিয়াছিল। এই নারীগণ যে আর্য্যবংশ-সম্ভূতা, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। আমার আনন্দের কারণ এই যে, মহিলাগণের মধ্যে অনেককেই আমি সরলা, পবিত্রস্বভাবা, তেজোময়ী, বৃথাসঙ্কোচবর্জ্জিতা, অথচ সলজ্জাও দেখিলাম। আমার দুঃখের কারণ এই যে, "আনন্দ-নিলয়ে"র এই আনন্দ, পবিত্রতা, সরলতা এবং শোভার মধ্যেও পাপের বীভৎস মূর্ত্তি আমার দৃষ্টিগোচর হইল। পরিতাপের বিষয় এই যে, কমলে কণ্টক আছে, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, অমৃতে বিষ আছে এবং মানব-সমাজেও পাপপিশাচ বিচরণ

করিয়া তাহাকে নরকের লীলাভূমিতে পরিণত করিয়াছে।

অর্দ্ধচন্দ্রাকার গিরিশ্রেণীর তৃতীয় মেরুদণ্ডস্বরূপ ইলী-শিয়াম হিল্ (অর্থাৎ নন্দন-গিরি) উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রের বহির্বৃত্তের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই গিরির একাংশকে ষ্টার্লিং হিল্ বলে। নন্দনগিরির দৃশ্য অতীব সুন্দর এবং ইহার উপরিভাগে অনেক সুন্দর বাটীও আছে।

অর্দ্ধচন্দ্রাকার গিরিশ্রেণীর চতুর্থ মেরুদণ্ডস্বরূপ যক্ষপর্ব্বত উত্তরপূর্ব্ব কোণ হইতে দক্ষিণপশ্চিম কোণের দিকে লম্বমান হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রের বহির্বৃত্তের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই যক্ষপর্ব্বত শিমলার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। ইহা বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয় এবং ইহার শোভাও পরম রমণীয়। ইহার শিখর, গাত্র ও পার্শ্বদেশ সুদীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট বিপুলকায় বৃক্ষরাজিতে সমাচ্ছন্ন। ইহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণের জন্য একটী সুন্দর রাজপথ আছে। এই রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে এমন সুন্দর সুন্দর দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয় যে, তৎসমুদায় চক্ষে না দেখিলে কদাপি তাহাদের সৌন্দর্য্য বর্ণনাদ্বারা উপলব্ধ হইবে না। রিক্শাযোগে কিম্বা পদব্রজে সহস্র সহস্র নরনারী এই পথে প্রত্যহ ভ্রমণ করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

যক্ষপর্ব্বতের উপরিভাগে হনুমান্জীর একটী মন্দির আছে। এই পর্ব্বতের উচ্চশিখর হইতে চতুর্দ্দিকের শোভাসন্দর্শনের উদ্দেশ্যে এবং মন্দির দর্শনাভিলাষেও একদিন ইহাতে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। রিক্শাযোগে যতদূর আরোহণ করা নিরাপদ মনে করিলাম, ততদূর আরোহণ করিয়া পদব্রজে পার্ব্বত্যপথ অবলম্বন পূর্ব্বক শৃঙ্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই পথ এরূপ দুরারোহ যে, মনে হইতে লাগিল, আর অধিক উচ্চপ্রদেশে আরোহণ করিতে পারিব না। মধ্যে মধ্যে এক একটী স্থানে কিয়ৎক্ষণ উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রামলাভ করিতে লাগিলাম। আবার পাকড়াণ্ডী লাঠীর * উপর ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এইরূপে সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত প্রাক্কালে যক্ষগিরির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত হইলাম।

তখন জ্যৈষ্ঠমাস। সেই সময়ে দিবাভাগেও, শিমলাতে মাঘ ফাল্গুন মাসের মতন শীত। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যক্ষপর্ব্বতের শিখরদেশে উপনীত হইয়া পৌষ-মাসের মতন তীব্র শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। শিখরদেশে একটী প্রশস্ত মাঠ আছে। এই মাঠের মধ্যস্থলে হনুমানজীর মন্দির বিরাজমান। এই মাঠের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ও আছে। মন্দিরস্বামী সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন যে, এই জলাশয় হইতেই তিনি বারমাস ব্যব-হারোপযোগী জল পাইয়া থাকেন। মন্দিরে হনুমানজীর মূর্ত্তি দর্শন করিলাম এবং সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কিছু প্রণামীও দিলাম। এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী বৃক্ষসমূহে অনেক বানর বাস করিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। এই কারণে, আমরা তাহাদের জন্য কিছু ভাজা ছোলা লইয়া গিয়াছিলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বানরগণের কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বানরগণের দলপতিকে "রাজা, রাজা" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। অমনই রাজা মহাশয় একটী নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন। তৎপরে তিনি "রাণী"কে আহ্বান করিলেন। রাণীও, বক্ষোলগ্ন কুমার সহ, তথায় উপনীত হইলেন। আমরা মন্দিরের বিস্তৃত বহিঃপ্রাঙ্গণে ভাজা ছোলা ছড়াইয়া দিলাম। ভাজা ছোলা দেখিয়া নিকটবর্ত্তী বৃক্ষসমূহ হইতে অনেগুলি বানর আসিয়া তৎসমুদায় ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শুনিলাম, দিবাভাগে ইহারা সর্ব্বক্ষণ মন্দির প্রাঙ্গণেই থাকে। কিন্তু আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপস্থিত হওয়ায়, ইহারা আসন্ন নিশাযাপন মানসে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-ছিল। ইহারা স্বচ্ছন্দচিত্তে ও নির্ভীকমনে ছোলা ভক্ষণ করিতে লাগিল। আমরা যেরূপ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করি, বানরশিশুগুলিও তদ্রূপ মাতৃপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মাতার সহিত ভ্রমণ করিতেছিল। এ দৃশ্য দেখিতে চমৎকার ও

* পদব্রজে পর্ব্বতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতগাত্রে অপ্রশস্ত বক্রগতি পথ আছে। এই পথগুলি অতীব দুরারোহ। বাঁশের লাঠীর উপর ভর দিয়া এই সমস্ত পথে চলিতে হয়। লাঠীর অগ্রভাগে সূচীমুখ লৌহসংযুক্ত আছে। এই লাঠীকে পাকড়াণ্ডী বলে।

হাস্যোদ্দীপক। কতিপয় ইংরাজ এবং ইংরাজমহিলাও পর্ব্বতশিখরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা, বিশেষতঃ মহিলারা, বানরশিশুগুলিকে মাতৃপৃষ্ঠে অশ্বারোহীর ন্যায় আরোহণ করিতে দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। শীতের অত্যন্ত প্রাখর্য্য দেখিয়া আমাদের জনৈক বন্ধু আপন মনে বলিতে লাগিলেন "এই সময়ে এক পেয়ালা গরম গরম চা পান করিতে পারিলে, আরাম বোধ করা যাইত।" সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন "আপনারা অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি এখনই চা প্রস্তুত করাইয়া হনুমানজীকে নিবেদন করিব ও তাঁহার প্রসাদ আপনাদিগকে দিব।" আমরা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে তাঁহার এই প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু বলিলাম, "সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, এখন আমরা গৃহে ফিরিয়া যাইব। দুঃখের বিষয় যে হনুমানজীর প্রসাদের জন্য আমরা আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।" কিন্তু তিনি বার বার অনুরোধ করায়, আমরা তাঁহার অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী ঠাকুরের একটী চেলা চা প্রস্তুত করিতে গেলেন; সেই অবসরে সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাদের সহিত নানাপ্রকার গল্প করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "হনুমানজীর কৃপায় এই উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গেও তাঁহার সেবার নিমিত্ত কোনও দ্রব্যের অভাব হয় না। হনুমানজীর মন্দিরে কতিপয় পয়স্বিনী গাভী আছে। বড় বড় ইংরাজেরাও এখানে আসিয়া হনুমানজীর প্রসাদ—চা ও দুগ্ধ—পান করিয়া যান। লঙ্কাতে লক্ষ্মণজী রাবণের শক্তিশেলের আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, হনুমানজী গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে ঔষধ আনিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু ঔষধ না পাইয়া, তিনি গন্ধমাদনের শৃঙ্গটিই উপাড়িয়া লঙ্কাতে লইয়া গিয়াছিলেন। গন্ধমাদনের সেই প্রকাণ্ড শৃঙ্গ মস্তকের উপর বহন করিয়া চলিতে চলিতে তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়েন, এবং এই পর্ব্বত শৃঙ্গে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন। তদবধি এই পর্ব্বত শৃঙ্গ পবিত্র স্থানে পরিণত হইয়াছে। তাঁহারই পূজার জন্য এই মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে।" ইত্যাদি। হনুমানজীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতেছি, ইত্যবসরে একটী প্রকাণ্ড পাত্রে চা প্রস্তুত হইয়া আসিল। সন্ন্যাসীঠাকুর শঙ্খধ্বনি করিয়া হনুমানজীকে সেই চা নিবেদন করিলেন, এবং আমাদিগকে তাঁহার প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে চা অতীব উপাদেয় পানীয় হইয়াছিল, এবং আমরা আগ্রহসহকারে তাহা পান করিয়া অবসাদ ও ক্লান্তি দূরীভূত করিলাম। তৎপরে সেই উচ্চ শৃঙ্গ হইতে ভগবান্ সূর্য্যদেবের অস্তগমন দর্শন করিয়া আমরা ধীরে ধীরে পর্ব্বতের পাদমূলে উপনীত হইলাম।

বোইলোগঞ্জ হইতে ছোট শিমলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত শিমলা নগরীর আকার প্রকারের একটী স্থূল আভাস প্রদত্ত হইল। এক্ষণে নগরীর সামান্য বর্ণনা করা যাউক।

সম্রাট্ প্রতিনিধি বড়লাট সাহেব বাহাদুর শিমলা নগরীতে বৎসরের মধ্যে আট মাস কাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন। পঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুরও গ্রীষ্মকালে শিমলায় আসিয়া বাস করেন। ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি বা জঙ্গীলাট সাহেব বাহাদুরও শিমলাকে তাঁহার কার্য্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল করিয়াছেন সুতরাং শিমলা নগরীকে ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য রাজধানী বলা যাইতে পারে। রাজধানী যেরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরী হইয়া থাকে, শিমলাও তদ্রূপ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, নগরীর পশ্চিমাংস বোইলোগঞ্জ নামে পরিচিত। বোইলোগঞ্জের নিকটেই প্রস্পেক্ট হিল ও বড়লাটের প্রাসাদযুক্ত অবজারভেটারী হিল্। এই শেষোক্ত পর্ব্বত হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ভূমি অপেক্ষাকৃত সমতল। এই কারণে, ইহাকে "চৌড়া ময়দান" বলা হইয়া থাকে। চৌড়া ময়দানের পর বড় শিমলা। বড় শিমলা ক্রয় বিক্রয়ের স্থান এবং নানাবিধ মনোহর আপনশ্রেণীতে পরিশোভিত। কলিকাতা নগরীর চৌরঙ্গীতে যেরূপ বড় বড় আপণ আছে, এখানেও সেইরূপ বড় বড় আপণসমূহ দৃষ্ট হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, এলাহাবাদ, লাহোর, মীরাট, দিল্লী প্রভৃতি নগরীর বড় বড় দোকানের শাখা শিমলা নগরীতে বিদ্যমান। বড় শিমলা যে গিরিশ্রেণীর উপর অবস্থিত, তাহার গাত্রে স্তরে স্তরে সৌধাবলী রাজপথসমূহে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত। তাহা দেখিতে বড় সুন্দর। কিন্তু আবাসবাটীগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ায়, এই স্থানটি শিমলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় স্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হইল না। বড় শিমলায় অনেক বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী প্রবাস করিয়া

থাকেন। আমি রাজপথে অনেক বাঙ্গালী বালকবালিকাকে দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। শিমলায় বড়লাট, ছোটলাট ও জঙ্গীলাটের বিভিন্ন বিভাগের আফিস-সমূহ অবস্থিত। আফিসগৃহগুলিও প্রকাণ্ড ও দেখিতে রমণীয়। এতদ্ব্যতীত শিমলার নানাস্থানে বড় বড় হোটেল, খৃষ্টীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনা-মন্দির বা গির্জ্জা, এবং ইংরাজ বালকবালিকাগণের জন্য বড় বড় বিদ্যালয় বিদ্যমান আছে। বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত স্কুলগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। যথাঃ—Bishop Cotton School, The Convent School, Auckland High School for Girls, Mayo School, ও Christ Church School। বলা বাহুল্য যে, শিমলা নগরীতে বহুসংখ্যক ইংরাজ ও ইয়োরোপীয় বারমাস বাস করিয়া থাকেন। ইহাঁদের পুত্রকন্যা ব্যতীত, ভারত-প্রবাসী অনেক ইংরাজের পুত্রকন্যারাও এই সমস্ত স্কুলে বাস করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করে। ইংরাজ বালক বালিকাগণের সুশিক্ষার জন্য যে কি প্রভূত অর্থব্যয় হয়, তাহা একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে। এক Bishop Cotton School নামক বিদ্যালয়ের বাটী ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করিতেই দুই লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় হইয়াছে।

বড় শিমলার অনতিদূরে "লক্কড় বাজার" নামে একটি বাজার আছে। এই বাজারে নানাবিধ উৎকৃষ্ট যষ্টি ও কারুকার্য্যময় কাষ্ঠের আসবাব ও দ্রব্যাদি বিক্রীত হইয়া থাকে। কারীগরেরা অধিকাংশই কাঙ্গড়া উপত্যকা, পঞ্জাব ও কাশ্মীরের অধিবাসী। ইহাদের কারুকার্য্য অতীব চমৎকার। বড় শিমলা হইতে যক্ষ পর্ব্বতের পাদমূলস্থ রাজপথে গমন করিতে করিতে ছোট শিমলা নামক স্থানে উপনীত হওয়া যায়। ছোট শিমলারও বাটীগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট। এখানেও বেশ বাজার আছে এবং অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক চাকরী উপলক্ষে প্রবাস করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে শিমলা নগরী প্রায় ছয় মাইল দীর্ঘ। এই দীর্ঘ নগরীর মধ্যে গমনাগমন করিবার নিমিত্ত প্রায়শ রিক্‌শা ও অশ্ব ব্যতীত অন্য কোনও যান নাই। রিক্‌শা যোগাইবার জন্য স্থানে স্থানে আড্ডা আছে। সেখানে বহু রিক্‌শা ও রিক্‌শাবাহী কুলি সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখা হয়। দূরত্বানুসারে রিক্‌শার ভাড়া নিরূপিত আছে। আরোহণ করিয়া বেড়াইবার জন্য অশ্বও দৈনিক ভাড়াতে পাওয়া যায়। পার্ব্বত্যপথগুলি উন্নতানত ও বিপজ্জনক বলিয়াই হউক, কিংবা আর যে কোনও কারণেই হউক, এখানে সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত অশ্ববাহিত যানের কোনও ব্যবস্থা নাই। তবে শিমলা হইতে টোঙ্গা-রোডে স্থানান্তরে যাইবার নিমিত্ত টোঙ্গা নামক অশ্বদ্বয়-বাহিত যান ভাড়া পাওয়া যায়। একদিন অব্‌জারভেটারী হিলের নিকটবর্ত্তী পথে একটী জুড়ী গাড়ী চালিত হইতে দেখিয়াছিলাম। শুনিলাম, ইহা বড় লাট সাহেবের গাড়ী। এক বড়লাট ও জঙ্গীলাট ব্যতীত এখানে অপর কাহারও অশ্ববাহিত যান ব্যবহার করিবার আদেশ নাই বলিয়া অবগত হইলাম।

বৈকালে ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে শত শত রিক্‌শাগাড়ীতে চড়িয়া ইংরাজমহিলারা বায়ু সেবন করিতে বহির্গত হন। অনেকের নিজের নিজের রিক্‌শা আছে। এই রিক্‌শাবাহী কুলিগণ প্রায়ই বিচিত্র পরিচ্ছদ (livery) পরিধান করিয়া গাড়ী টানিয়া থাকে। ইংরাজ পুরুষেরা প্রায়ই পদব্রজে কিংবা অশ্বারোহণে বহির্গত হ'ন।

ইংরাজেরা ঘোড়দৌড়, পোলো, টেনিস, বনভোজন (picnic), থিয়েটারে অভিনয় দর্শন, ক্লবে গমন প্রভৃতি নানাবিধ আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়াতে লিপ্ত থাকিয়া অবসরকাল যাপন করিয়া থাকেন। বাঙ্গালীদের কোনও ক্লব্ নাই। তবে বোইলোগঞ্জে একটী অবৈতনিক নাট্য-সমাজ আছে বলিয়া অবগত হইয়াছি। একবার এই নাট্য-সমাজের অভিনয়ে লর্ড কর্জ্জন স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়াও শুনিতে পাইলাম। জনৈক বন্ধুর গৃহে এই নাট্য-সমাজের কতিপয় সভ্য একদিন আমাদিগকে নৃত্য দেখাইয়াছিলেন ও গান শুনাইয়াছিলেন। অনেকে তাস পাশা খেলিয়া এবং কেহ কেহ সঙ্গীতচর্চ্চা করিয়াও অবসর কাল অতিবাহিত করিয়া থাকেন। ছোট শিমলায় একটী হরিসভা আছে। কিন্তু এই হরিসভার প্রতি বাঙ্গালী সাধারণের যে বিশেষ অনুরাগ আছে, তাহা বোধ হইল না। এক পদব্রজে কিয়ৎ

দূর ভ্রমণ করা ব্যতীত, অন্য কোনও শারীরিক ব্যায়ামের প্রতি বাঙ্গালীদের বিশেষ আস্থা নাই। শিমলার ন্যায় শীত-প্রধান স্থানেও বাঙ্গালীপ্রকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। বাঙ্গালী মহিলারা নিজ নিজ গৃহমধ্যেই অবরুদ্ধা থাকেন। ইহাঁদের অবস্থা দেখিয়া স্বর্গে ঢেঁকির অবস্থার কথা মনে পড়িল।

শিমলার অনতিদূরে গিরিনদী নামে একটী নদী আছে। এঞ্জিনের সাহায্যে সেই নদী হইতে জল উত্তোলিত হইয়া শিমলায় আনীত হয়, এবং পাইপ্ সাহায্যে সর্ব্বত্র তাহা পরিচালিত হয়। স্থানে স্থানে এক একটী হাইড্রাণ্ট আছে। সেই হাইড্রাণ্টসমূহ হইতে সর্ব্বসাধারণে জলসংগ্রহ করিয়া থাকে। কলের জল ব্যতীত, উপত্যকাভূমিতে "বাঁউড়ি" নামক অনেক নির্ঝর আছে। অনেকে এই নির্ঝরসমূহের জলও পান করিয়া থাকেন। অনেকের বিশ্বাস এই যে গিরিনদীর জল অপেক্ষা বাঁউড়ির জল অধিকতর সুস্বাদ ও উপকারী। পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ জলের জন্য একমাত্র বাঁউড়ির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। আমি একদিন উপত্যকা-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া একটী বাঁউড়ি দেখিয়া আসিয়াছিলাম। পর্ব্বতের পাদমূলে একটী ক্ষুদ্র ও অগভীর কূপ বা খাত আছে। সেই কূপে জল ঝরিয়া পড়িতেছে, এবং কলস পূর্ণ করিয়া সেই জল পার্ব্বত্য মহিলারা গৃহে লইয়া যাইতেছে। সেই কূপই "বাঁউড়ি" নামে অভিহিত হয়।

শিমলার ন্যায় বৃহৎ নগরীর স্বাস্থ্য রক্ষার্থ এবং রাজপথ-সমূহ সুসংস্কৃত রাখিবার ও আলোক ও জল প্রভৃতি যোগাইবার নিমিত্ত একটী সুপরিচালিত মিউনিসিপালিটি আছে। মিউনিসিপালিটি গৃহস্থগণের গৃহে নিযুক্ত ভৃত্য-গণের জন্যও কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। শিমলাতে অধিক-সংখ্যক বাহিরের লোক আসিয়া নগরীকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া না ফেলে, সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই উক্ত কর ধার্য্য হইয়া থাকিবে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতেই পাঠকবর্গের মনে শিমলা-নগরী সম্বন্ধে একটী সামান্য ধারণা উপস্থিত হইবে। শিমলা-নগরীর অধিবাসীর সংখ্যা ৪০০০০ চল্লিশ হাজারের অধিক হইবে না। এই অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। এখানে মুসলমানের সংখ্যা অধিক নহে।

পূর্ব্বকালে, হিমালয়ের এই অংশে এবং শতদ্রুনদীর দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। তন্মধ্যে পাটিয়ালা ও কেউনথল্ অন্যতম। এই সমুদায় রাজ্যের সহিত সন্ধিসূত্রে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে। সেই কারণে এই রাজ্যগুলিকে মিত্ররাজ্য বলে। যে পার্ব্বত্যভূমিভাগের উপর শিমলা নগরী অবস্থিত, তাহার কিয়দংশ পাটিয়ালা রাজ্যের কিয়দংশ কেউনথল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কথিত আছে যে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গুর্খা-সমরের পর ইংরাজেরা বর্ত্তমান শিমলার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন; এবং পার্ব্বত্য রাজ্যসমূহের সহকারী পলিটিক্যাল এজেণ্ট লেফ্‌টেনাণ্ট রস্ (Ross) ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে শিমলায় একটী কুটীর নিৰ্ম্মাণ করেন। তৎপরে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে লেফ্‌টেনাণ্ট কেনেডি বসবাসের উপযোগী একটী সুন্দর বাটী প্রস্তুত করেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্যলাভাকাঙ্ক্ষী কতিপয় ইংরাজ পাটিয়ালা ও কেউনথলের রাজগণের অনুমতি লইয়া শিমলায় বাস করেন। উক্ত রাজগণ ইহাঁদিগকে এই সর্ত্তে বাসের জন্য নিষ্করভূমি প্রদান করিয়াছিলেন যে, ইহারা শিমলায় কদাপিও গোহত্যা করিবেন না এবং অনুমতি ব্যতীত কদাপি কোনও বৃক্ষচ্ছেদন করিবেন না। বর্ত্তমান সময়ে শিমলার একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে গোহত্যা হয় বটে; কিন্তু মিউনিসিপালিটির অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ বৃক্ষচ্ছেদন করিতে পারে না। শিমলা স্বাস্থ্যজনক স্থান বলিয়া ক্রমশঃ পরিচিত হইতে থাকিলে, ইংরাজগভর্ণমেণ্ট পাটিয়ালা ও কেউনথলের রাজগণকে বৃটিশ রাজ্যভুক্ত কতিপয় গ্রাম প্রদান করিয়া তৎপরিবর্ত্তে শিমলার ভূমিভাগ গ্রহণ করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এইরূপে শিমলার ভূভাগ অধিকৃত হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরের যুদ্ধের পর তাৎকালীন গভর্ণর-জেনেরাল্ লর্ড আমহার্ষ্ট বিশ্রাম লাভার্থ শিমলায় গমন করেন। তদবধি শিমলার উন্নতির সূত্রপাত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে শিমলার গৃহসংখ্যা ৩০, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ১০০, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৯০, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ১১৪১ এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১৩৫০

ছিল। বর্ত্তমান সময়ে গৃহের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কলিকাতার সন্নিকটে বারাকপুরে বড়লাট বাহাদুরের যেরূপ একটী নিভৃত বিশ্রামনিবাস আছে, শিমলা হইতে প্রায় ছয় মাইল উত্তরে মুসোব্রা (Mushobra) নামক স্থানেও তাঁহার তদ্রূপ একটী বিশ্রামনিবাস আছে। মুসোব্রা তিব্বত হিমালয়-রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত। একদিন আমরা মুসোব্রা দেখিতে গিয়া তত্রত্য বিচিত্র পার্ব্বত্য শোভা দর্শন পূর্ব্বক চমৎকৃত হইয়াছিলাম। স্থানটি অতীব নির্জ্জন ও মনোহর। একটী পর্ব্বতের শিখরদেশে বড়লাটের বিশ্রামনিবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। বড়লাট বাহাদুর প্রতি শনিবারে বিশ্রামনিবাসে উপনীত হন। পর্ব্বতের পাদমূলে কতিপয় দোকান আছে এবং অনতিদূরে একটী হোটেল্ আছে। এই হোটেলে ইংরাজ নরনারীগণ আসিয়া বাস করেন। মুসোব্রা যাইবার পথে একটী বৃহৎ পার্ব্বত্য সুড়ঙ্গ (tunnel) পার হইতে হয় এবং সিঞ্জৌলি নামক গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করিতে হয়। এই পথে গমন করিতে করিতে শিমলার মধ্যে জঙ্গীলাটের স্নোডন্ (Snowdon) নামক বাসভবন দেখিতে পাওয়া যায়।

শিমলার পশ্চিম প্রান্তে জুটোগ (Jutogh) নামক পর্ব্বতশিখরে একটী সৈন্যনিবাস আছে। এই সৈন্যনিবাসটি শিমলা হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত এবং জুটোগ পর্ব্বতের পাদমূলে জুটোগ্ ষ্টেশন নামে একটী রেলওয়ে ষ্টেশনও আছে। একদিন আমরা জুটোগ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সৈন্যনিবাস দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

সিমলার উত্তর-পশ্চিম কোণে Pottery Hill বা কুম্ভকার পর্ব্বত আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই পর্ব্বতটিও পরম রমণীয়। বসন্তগিরি ও কুম্ভকার পর্ব্বতের পাদমূলে জুটোগ ভিউ (Jutogh View) নামক বাটী আমরা ভাড়া লইয়াছিলাম। সুতরাং আমি প্রায় প্রত্যহই এই দুইটী পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া তাহার শিখর প্রদেশে ভ্রমণ করিতাম। প্রাতে প্রায়শঃ বসন্ত গিরির চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতাম; বৈকালে কুম্ভকার পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতাম। কুম্ভকার পর্ব্বত শিমলাসীমার বহির্ভূত ও পাটিয়ালা-রাজ্যের অন্তর্গত, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই পর্ব্বতগাত্রে কোনও প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত হয় নাই। একটী অপ্রশস্ত পার্ব্বত্য পথ দিয়া পাহাড়াওঁী লাঠীর সাহায্যে ইহার শিখরে আরোহণ করিতে হয়। ইহার শিখরদেশ পরম রমণীয় ও বনাচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে প্রশস্ত মাঠও আছে। মাঠের উপর বৃক্ষগুলি এরূপ ভাবে দণ্ডায়মান, যেন তদ্দ্বারা প্রকৃতিদেবী একটী চমৎকার গোলক ধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছেন। শিমলাপ্রবাসী জনৈক বন্ধু বলিলেন, এই গোলক ধাঁধার নাম Lovers' Labyrinth, অর্থাৎ প্রেমিকগণের গোলকধাঁধা। দুই একটী মনোরম নিভৃত স্থান দেখাইয়া তিনি বলিলেন, "এই গুলিকে Lovers' Bower বা প্রেমকুঞ্জ বলে।" বন্ধু মহাশয় কেবল প্রেমিক ও প্রেমের কথা লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু আমার মনে হইল, এই পবিত্র ও মনোরম স্থানগুলি প্রকৃত তপস্যারই স্থান। এই স্থানসমূহে কিয়ৎক্ষণ একাকী বসিয়া থাকিলে সংসার ভুলিয়া যাইতে হয়, আত্মার গভীরতম প্রদেশে কি এক উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়, এবং অন্তর্দৃষ্টি যেন উজ্জ্বল ও প্রখর হইয়া উঠে। শুনিলাম, প্রবাসী বাঙ্গালী মহোদয়গণ মধ্যে মধ্যে এখানে পরিবারবর্গ সহ বেড়াইতে আসিয়া বনভোজন করিয়া যান। এই মনোরম পর্ব্বতশৃঙ্গে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ যাপন করিয়া গেলে পবিত্রহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই মনে যে উচ্চ ও মহানভাবের উদয় হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘন বৃক্ষপত্রের অন্তরাল হইতে একজাতীয় পতঙ্গ বা কীট রজতময় ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় শব্দ করিতে থাকে। সেই ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া মনে হয়, প্রকৃতিদেবী যেন বিশ্বেশ্বরের সান্ধ্য আরতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

অযোধ্যা-প্রবাসী বাঙ্গালী

(বলরামপুর)

লক্ষ্ণৌ, প্রতাপগড়, ভরোচ এবং গোঁড়ার অন্তর্গত বলরামপুরের তালুক অযোধ্যার তালুকগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা

বড়। ইহার বিস্তার ১২৬৪ বর্গমাইল; আয় ২২ লক্ষ টাকারও অধিক। এই তালুকের পরিসর ও আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

১৩৭৪ খৃঃ অব্দে বাদসাহ ফিরোজসাহ তোঘলক ভরোচের দুর্দ্দান্ত দস্যু দমনের জন্য প্রেরণ করিলে "বরিয়ার সা" নামক জনৈক রাজপুত ইকোনা নামক স্থানে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। ইঁহার অধস্তন ৭ম পুরুষ মাধোসিং গৃহবিবাদে পৈত্রিক বিষয় ছাড়িয়া ১৫৬৬ অব্দে রাপ্তী ও কোয়ানা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড অধিকার করিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার পুত্র বলরাম দাস বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে বলরামপুর নগরের স্থাপনা করেন এবং পৈত্রিক জমিদারী বৃদ্ধি করেন। এই নবপ্রতিষ্ঠিত নগরীর নামে সমগ্র তালুকটী অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ১৭৭৭ অব্দে এই বংশে নবল সিং প্রথম রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। সে সময় তিনি একজন সমরকুশল বীর বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল এবং তিনি অযোধ্যার নবাবেরও বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার পৌত্র রাজা দৃগ্বিজয় সিং ১৮ বৎসর বয়সে ১৮৩৬ অব্দে তালুকের অধিকার প্রাপ্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি বহু ইংরাজ রাজপুরুষকে স্বীয় দুর্গের মধ্যে আশ্রয় দিয়া এবং তাঁহাদিগকে গোরক্ষপুরে নিরাপদে পাঠাইয়া দিয়া, এমন কি, বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাহার পুরস্কার স্বরূপ তিনি গবর্মেণ্টের নিকট হইতে গোঁডা ও ভরোচের অন্তর্গত বিস্তীর্ণ জায়গীর প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। গবর্মেণ্ট পরে তাঁহাকে মহারাজা বাহাদুর ও কে, সি, এস, আই, উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তিতে মহারাণী তালুকের উত্তরাধিকারিণী হন। তাঁহার দত্তক পুত্র মহারাজা ভগবতীপ্রসাদ বাহাদুর, কে, সি, আই, ই, বলরামপুরের বর্ত্তমান তালুকদার। মহারাজা দৃগ্বিজয় সিংহের সময়ই এখানে বাঙ্গালী প্রবাসের সূত্রপাত। সে আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর কথা। ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর-মজিলপুর-নিবাসী বাবু গোপালকৃষ্ণ বসু সামরিক পূর্ত্তবিভাগে কর্ম্ম লইয়া আসিয়া এলাহাবাদে প্রবাসী হন। এলাহাবাদ কীডগঞ্জে তাঁহার বাস ছিল। তিনি পরে এলাহাবাদ হইতে বদলি হইয়া লক্ষ্ণৌ আগমন করেন।

এখানে লক্ষ্ণৌপ্রবাসী রামগোপাল বিদ্যান্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। রামগোপাল বাবু এখানকার একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মহারাজা দৃগ্বিজয় সিংহের সহিত গোপালকৃষ্ণ বসুর পরিচয় করিয়া দেন। গোপালবাবু পূর্ত্তবিভাগের কার্য্যে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শীঘ্রই সরকারি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পূর্ত্তবিভাগীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে থাকেন। ১৮৭৮ অব্দে বলরামপুরে প্রাসাদ-নির্ম্মাণ-কার্য্য-সূত্রে মহারাজা কর্তৃক আহুত হইয়া গোপালকৃষ্ণ বাবু বলরামপুর গমন করেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজা তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যের পূর্ত্তবিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। ৩৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন হইয়াছিল। তিনি বলরামপুরের রাজপ্রাসাদ হইতে নগর পল্লী প্রভৃতি সুসজ্জিত নগরের স্বাস্থ্যোন্নতির সুব্যবস্থা করিতে এবং পথ, ঘাট, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বত্র গমনাগমনের সুবিধা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বলরামপুরের "গেষ্ট হাউস" বা অতিথিভবন (Guest House), "মিসেস্ এন্‌সন হাঁসপাতাল", "ষ্ট্যাচু হল" (Statue Hall) "ম্যাকডলেন অর্ফানেজ", "লায়াল কলিজিয়েট্ স্কুল", (দুই মাইল বিস্তীর্ণ) "আনন্দবাগ", "সুন্দরবাগ", "নূতন প্রাসাদ" প্রভৃতি তাঁহারই কীর্ত্তি। সুন্দর সুন্দর রাজপথ, নর্দ্দমা, এবং মিউনিসিপ্যালিটীর উন্নতি এ বাঙ্গালী এঞ্জিনিয়ার কর্তৃক সাধিত হইয়াছে। বলরামপুরের নূতন প্রাসাদ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রাসাদ ও গেষ্ট্ হাউস বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা শোভিত করা হইয়াছে। বাঙ্গালী এঞ্জিনিয়ার বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য জয়পুর সহরের নক্সা করিয়া দিয়া এবং তদনুসারে সুসজ্জিত করিয়া তাহাকে রাজপুতানার গৌরবস্থল ও জগদ্‌বাসীর দর্শনীয় স্থানে পরিণত করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রবাসী-বাঙ্গালী গোপালকৃষ্ণ বসু তদ্রূপ বলরামপুর নগরকে সৌধমালা, রাজোদ্যান, পথ, সেতু, পাঠগৃহ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত করিয়া অযোধ্যায় প্রবাসী বাঙ্গালীর চিরস্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার এইসকল কার্য্যে দক্ষতা দর্শনে এবং অন্যান্য রাজকীয় ও জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার সহায়তা দানের জন্য গত দিল্লীর দরবারে তিনি তিনখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন এবং তৎকালীন শাসন-বিবরণীতে প্রশংসিত হন। প্রাদেশিক লাটসাহেব সার এণ্টনি ম্যাকডনেল বাহাদুর তাঁহাকে সুনজরে দেখিতেন এবং মহারাজা বাহাদুর শাসন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। পক্ষান্তরে তিনি বলরামপুর রাজ্যে সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বমান্য ছিলেন। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যও তাঁহাকে করিতে হইত। তিনি ৩৩ বৎসর বলরামপুর প্রবাসবাসের পর ১৯০৩ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র, যিনি উপস্থিত মহারাজার সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটরী, এখানে স্বীয় মাতুলের স্মৃতি রক্ষার্থ একটী স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উহা মন্দিরের আকারেই নির্ম্মিত এবং ৩৩ ফুট উচ্চ। একটি সুবিস্তীর্ণ মনোরম উদ্যানের মধ্যস্থলে মন্দিরটী বিরাজিত এবং ইহার গাত্রে খোদিত আছে—

"In memory of
Gopal Krishna Bose,
Raj Engineer.
Born 27—11—1844
Died 20—11—1903".

গোপালকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পর শ্রীযুক্ত মণিমোহন বসু মহাশয় বলরামপুরে আগমন করেন। ইনি লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোঁড়ার ডেপুটী কমিশনরের দপ্তরে কর্ম্ম করিতেন। সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরে এজেণ্ট আপিসের হেডক্লার্ক হইয়া বলরামপুর আসেন। ইনি স্বীয় কর্ম্মদক্ষতার প্রভাবে অল্পকালের মধ্যেই উচ্চ এবং সম্মানিত পদসকল লাভ করেন। এখানে ইনি পরে পরে মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটরি, ষ্টেটের সহকারী ম্যানেজার, বর্ত্তমান মহারাজার খাস কর্ম্মচারী (Personal Assistant) ও খাজাঞ্চি (Treasury Officer) হন এবং মাসিক তিন শত টাকা বৃত্তি পাইতে থাকেন। তাঁহাকে অনররি ম্যাজিষ্ট্রেটীও করিতে হয়। বড়লাট লর্ড কার্জ্জন তাঁহার কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে সনন্দ প্রদান করেন। বলরামপুরে ইহাঁর সুনাম ও বেশ প্রতিপত্তি আছে। ইহাঁর পর আজ প্রায় বিশ বৎসর হইল শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাবু রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায় গোপালকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের স্থান অধিকার করিয়া বলরামপুরে পূর্ত্তবিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার অধীনে ওভারসিয়র পদে নিযুক্ত আছেন। বলরামপুর-প্রবাসী বাঙ্গালী-সম্প্রদায় এ রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন হিতসাধনকল্পে সহায়তা ও কার্য্যকুশলতা দ্বারা মহারাজা বাহাদুরের সন্তোষ সম্পাদন করিতে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সম্মান ও প্রীতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কালক্রমে যদি এ প্রদেশ হইতে বাঙ্গালীর প্রবাসবাস উঠিয়াও যায় তাহা হইলেও ৺গোপালকৃষ্ণ বসুর স্মৃতিমন্দির বলরামপুরে বাঙ্গালী-প্রবাসের ইতিহাস চিরজাগরূক রাখিবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

নবীন সন্ন্যাসী

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

গদাই পালের বিচারকার্য্য।

গদাই পাল নোটগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া, তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে দরিয়াপুর যাত্রা করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাছারিতে পৌঁছিয়া, কেনারাম ঘোষকে ডাকিয়া পাঠাইল।

কেনারাম যখন আসিল, তখন গদাই কাছারি বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া, মুদ্রিত নয়নে হরিনামের মালাজপে নিযুক্ত। একবার মাত্র চক্ষু খুলিয়া, ইসারায় কেনারামকে বসিতে বলিয়া, চক্ষু পুনর্মুদ্রিত করিয়া আপন মনে মালাজপ করিয়া যাইতে লাগিল। প্রায় একদণ্ডকাল এইরূপ ভণ্ডামির পর, মালাসুদ্ধ দুই হাত যুক্ত করিয়া, দুই মিনিট ধরিয়া প্রণাম করিল। তাহার পর বলিতে লাগিল—"জয়রাম শ্রীরাম সীতারাম। হরিনাম সত্য, হরিনাম সত্য, সকলি মিথ্যে, সকলি মিথ্যে—তারপর, ঘোষের পো, কি মনে করে?"

কেনারাম বলিল—"আজ্ঞে হুজুর ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলেন শুন্‌লাম—তাই এসেছি।"

"হরিনাম সত্য, হরিনাম সত্য—ওহো তাই বটে। তোমায় ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলাম বটে—ওটা ভুলেই গিয়েছিলাম। সকলি মিথ্যে, সকলি মিথ্যে। হ্যাঁ—দেখ,—তোমার বাড়ীর কাছে ঐ যে খানিকটে পতিত জমি আছে না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটাতে পূর্ব্বে চিনিবাস ঘোষ বলে একজন প্রজা ছিল—সে পলাতকা। দু তিন বছর ধরে জমিটে পড়ে আছে।"

"তা শুনেছি। সে চিনিবাস লোকটা কেমন ছিল? আসল কথা তবে তোমায় খুলে বলি। আমার ইচ্ছে, ঐখানটায় একটা ফল ফুলের বাগান করি। ফুল দিয়ে ঠাকুর দেবতার পূজো করতে আমি বড় ভালবাসি। ফুল দিয়ে পূজো করলে মনের যেমন তৃপ্তি হয়, এ শুকনো হরিনামের মালা ঠক্‌ঠকালে তা হয় না। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করা যে সেই চিনিবাস লোকটা কেমন ছিল। পাপী দুষ্ট নষ্ট লোকের ভিটেতে ফুলগাছ জন্মালে, সে ফুলে ঠাকুরদের পূজো করতে আমার মন সর্‌বে না। সে ফুল অপবিত্র বলে আমার মনে হবে। আর যদি এমন হয় যে সে লোকটা ধার্ম্মিক ছিল, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি রাখত—তাহলেই আমার মনটি শুদ্ধ হয়। এই জন্যেই তোমায় ডাকা। তুমি ধর তার একবারে লাগাও হামছায়া ছিলে। হাড়হদ্দ সকলি তুমি জান। কি রকম লোকটা ছিল বল দেখি?"

কেনারাম একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"আজ্ঞে, তা, লোকটাকে ত ভাল বলেই জানতাম। কারু কখনও কিছু মন্দ করেনি। তবে একবার আমার গোরু তার ক্ষেতে পড়েছিল—গোরুটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে খোঁয়াড়ে দিয়েছিল। ছ গণ্ডা পয়সা দণ্ড দিয়ে গোরুকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম।"

"গ্রাম ছেড়ে সে পালাল কেন? তার নামে কোনও ওয়ারিন টোয়ারিন বেরিয়েছিল না কি?"

"আজ্ঞে না তার শ্বশুর একজন বর্দ্ধিষ্টু প্রজা ছিল, শ্বশুরের আর কেউ ছিল না। সেই শ্বশুর মরে যাওয়াতে তার সব জোৎ জমাগুলি পেলে কি না, তাই এখান থেকে উঠে গেল। এখানে তার যা কিছু জমিজমা গোরু বাছুর ছিল সব বিক্রী করে ফেল্লে—করে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল। ওয়ারিন টোয়ারিন কিছু বেরোয়নি।"

গদাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"তাহলে লোকটা ভাল। আচ্ছা, এখানকার থানার দারোগা কে?"

"আজ্ঞে থানা এখান থেকে চার পাঁচ ক্রোশ দুর—ওদিকে যাওয়া আসা ত নেই। দারেগার নামটি বলতে পারলাম না। তবে শুনেছি কে একজন মুসলমান।"

"ওঃ—মুসলমান? একদিন যেতে হবে থানায়—দারোগার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে। জমিদারী রাখতে হলে দারোগাদের সঙ্গে একটু ভাবসাব রাখা দরকার। কখন কি হয় তা ত বলা যায় না। কালই না হয় যাওয়া যাক্। দিনটাও ভাল আছে। দারোগাকে কি নজর দেওয়া যায়? মুর্গি এণ্ডা এসব ত আমার দ্বারা হবে না। বরং একটা বড় ভাঁড়ে করে সের পাঁচেক ঘি নিয়ে যাওয়া যাবে। তুমি ত গয়লার ছেলে, ঘি চেন। দাও দেখি কাল সকালে আমায় সের পাঁচেক ঘি সংগ্রহ করে। বেশ ভাল ঘি। যা উচিত মূল্য তা দিচ্ছি। জমিদারের নায়েব বলে যে আমি জোর জবরদস্তি করে আধা কড়িতে ঘি কিনবো—সেরকম তন্ত্রের লোক আমি নই। সে আমার ধর্ম্মে সবে না। গরীবের উপর অত্যাচার করার মত মহাপাপ আর নেই। কি বল, পারবে সের পাঁচেক ঘি কিনে দিতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তার আর শক্ত কি? কখন চাই?"

"এই ধর কাল সকালে সকালে খাওয়া দাওয়া করে, বেরোন যাবে। তারই মধ্যে সংগ্রহ হওয়া চাই।"

"তা পারব। এনে দেব।"

"বেশ। টাকাটা এখনি নিয়ে যাবে?"

"কাল নেব এখন। দেখি কি দরে পাই।"

"আচ্ছা তা কালই নিও। আর এক কায কর না।"

"আজ্ঞে করুন।"

"তুমিও আমার সঙ্গে চল না। আমি পাল্কীতে যাব এখন। তুমি ঘোড়ায় যেও।"

কেনারাম একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"বেশ। তা যেমন আজ্ঞে করেন।"

গদাই কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল—"তোমার যদি কাযের কোনও রকম অসুবিধে না হয়—ইচ্ছে সুখে আমার সঙ্গে যেতে পার, তবেই চল। নইলে আমি জমিদারের নায়েব আর তুমি ক্ষুদ্র প্রজা বলে আমি যে তোমার উপর হুকুমাৎ চালাচ্ছি—এ মনে কোরো না। আমি সে তন্ত্রের লোকই নই। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার আর কোনও কারণ নেই—কেবল আমি নতুন লোক, কখনও ওদিকে যাইনি, কাউকে চিনি শুনিনা, সঙ্গে একজন লোক থাকলে দুটো কথাবার্ত্তা কইতে কইতেও যেতে পারব—এই জন্যেই আমার আকিঞ্চন।"

কেনারাম বলিল—"আজ্ঞে না—আমি ইচ্ছে সুখেই যাচ্ছি, আপনার মত এমন মনিবের সঙ্গে যাব না ত কার সঙ্গে যাব?"

গদাই বলিল—"মনিব কিসের? মনিব কিসের? তবে তোমার বিনয় দেখে খুসী হলাম। তুমি লোকটি অতি সজ্জন, তা বেশ বুঝতে পারছি। তোমরা ক ভাই?"

"আজ্ঞে আমরা দু ভাই ছিলাম। তা আমার ছোট ভাই বেচারাম মরে গেছে।"

"আহা! মরে গেছে? তা আর কি করবে বল। ছেলে পিলে কিছু রেখে গেছে?"

"কিছু না। কেবল তার ইস্তিরী আছে।"

"তা, তোমার ভাদ্রবৌকে কি তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছ, না সে তোমার সংসারেই আছে?"

কেনারাম একটু থতমত খাইয়া বলিল—"আজ্ঞে, কমাস থেকে সে নিজের বাপের বাড়ীতেই আছে।"

একথা শুনিয়া গদাধর বিস্মিত হইল। ভাবিল—তবে কি সে স্ত্রীলোকটা বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই? গেল কোথা? কি হইল? সে নিজেই থানায় চলিয়া যায় নাই ত? কিন্তু বাহিরে এই দুশ্চিন্তার ভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশ না করিয়া বলিল—"তার বাপের বাড়ী কোন গ্রাম?"

"সে এখান থেকে দুদিনের পথ।"

"গ্রামটার নাম কি?"

নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত, ঢোক গিলিয়া কেনারাম বলিল—"কুমড়োডাঙ্গা।"

"আচ্ছা বেশ, তবে কাল বেলা দশটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া করে, ঘিটে নিয়ে এখানে এস"—বলিয়া গদাই কেনারামকে বিদায় করিয়া দিল। পরে উঠিয়া নিজের শয়নকক্ষে গিয়া, কল্যাণপুর-ফেরৎ ক্যাম্বিশের ব্যাগটি হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ পান করিল। তাহার পর হুঁকাটি হাতে করিয়া, তক্তপোষে বসিয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল।

গদাই ভাবিতে লাগিল—"গঙ্গামণি গেল কোথা? ঘণ্টেশ্বরের মন্দিরের কাছে যেখানে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেখান থেকে এ গ্রাম বড় জোর ক্রোশ দেড়েক পথ—সোজা রাস্তা—রাস্তা ভুলে অন্য কোথাও গিয়ে পড়েছে তাও সম্ভব নয়। তাকে যে রকম ভয় দেখিয়ে দিয়েছি, তাতে সে যে থানায় গিয়ে নালিশ করবে, এও ত মনে হয় না। যা হোক কাল থানায় গেলেই জানতে পারব, নালিশ টালিশ কিছু হয়েছে কি না। ভেবেছিলাম এ হাজার টাকা সাফ্ আমার লভ্য হল—সেটা ফস্কে না যায়। দেখা যাক শ্রাদ্ধ কত দূর গড়ায়। আচ্ছা—ইয়ে হয় নি ত? কেনারাম গঙ্গামণিকে নিজের বাড়ীর মধ্যেই লুকিয়ে রাখে নি ত? গঙ্গামণি ভোরের বেলা এসে পৌঁছেছে,—ওরা যদিও লোকলজ্জা ভয়ে প্রচার করে দিয়েছিল সে তার বাপের বাড়ী চলে গেছে—নিশ্চয়ই তাকে জিজ্ঞাসা করেছে তুই এতদিন কোথা ছিলি, কি করছিলি। গঙ্গামণি নাম টাম কিছুই বলে নি। তাতে তাদের আরও সন্দেহ বেড়ে গিয়ে থাকবে। এ বিষয়ের একটা হেস্ত নেস্ত না হওয়া অবধি বোধ হয় গঙ্গামণিকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে। তা হলে ত এ বিষয়ের সন্ধান নিতে হয়! এক কাজ করি। আর দুদণ্ড রাত্তির হোক্। ঘিয়ের টাকা দেবার নাম করে, হটাৎ তার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে পড়ি। গঙ্গামণি যদি থাকে, নিশ্চয়ই কোন না কোন সুলুক সন্ধান পাব।"

এইরূপ স্থির করিয়া গদাই পাল প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিল। পরে গুটি পাঁচেক টাকা লইয়া, অন্ধকারে বাহির হইল। হাতে একটি বাঁশের ছড়ি, চাদরখানা গলায় ফেলিয়া, নক্ষত্রালোকে গদাই নির্জ্জন গ্রামপথ অতিক্রম করিয়া চলিল। কেনারামের বাড়ীর দরজার নিকট উপস্থিত হইয়া, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া, কাণ পাতিয়া শুনিতে

লাগিল ভিতরে কোনও কথাবার্ত্তা হইতেছে কি না। দুই তিন জনের কণ্ঠস্বর শুনা গেল, কিন্তু কথা স্পষ্ট বুঝা গেল না। যেন কলহ ও ক্রন্দনের স্বর। গদাই তখন আস্তে আস্তে দরজাটি ঠেলিল—দরজা খুলিয়া গেল! অঙ্গন অন্ধকারময়, সেই অঙ্গনের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, কিয়দ্দূরে একটি উচ্চ রোয়াকের উপর তিন ব্যক্তি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। ঘরের ভিতরে প্রদীপ জলিতেছিল, তাহারই সামান্য আলোক রোয়াকে পৌঁছিতেছে—তাহাতে মানুষ চেনা যায় না।

গদাই শুনিল, একজন পুরুষকণ্ঠে বলিতেছে—"সত্যি যদি তোর কোন দোষ নেই, তা হলে পষ্ট বল্‌না কেন কে তোকে ধরে রেখেছিল?" গদাই বুঝিল ইহা কেনারামের কণ্ঠস্বর।

গঙ্গামণি বলিল—"সে আমি বলতে পারব না।"

একটি স্ত্রীকণ্ঠ বলিল—"কেন বলতে পারবিনে হত-ভাগী? তা হলে নিশ্চয়ই তোর মনে পাপ আছে। ওগো ওর কথা বিশ্বাস কোরো না—ওর সব মিথ্যে কথা। বল্ বলছি, নৈলে তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁ থেকে বের করে দেব।"—গদাধর অনুমান করিল, এ কেনারামের স্ত্রী হইবে।

গঙ্গামণি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমার কি বল্‌বার অসাধ? কিন্তু মা কালীর বারণ, তাই আমি বলব না।"

কেনারাম বলিল—"ইস্—তুই ভারি ধার্ম্মিক কি না, মা কালী তোকে দর্শন দিয়েছে। আসল কথা যদি না বলিস্ তবে এখনি ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে বের করে দেব।"

গঙ্গামণি একটু ক্রোধস্বরে বলিল—"কেন গো আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে? এ বাড়ী কি আমার নয়, তোমার শুধু একলার?"

কেনারামের স্ত্রী বলিল—"মর পোড়ারমুখী—ভাসুরের মুখের উপুর জবাব?"

কেনারাম রাগিয়া বলিল—"বটে! যত বড় মুখ তত বড় কথা! আমাকে আইন দেখাচ্ছিস্? বেরো এই দণ্ডে আমার বাড়ী থেকে। বেরো বলছি—নইলে চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে বিদেয় করে দেব।"

গঙ্গামণি বলিল—"খপর্দ্দার যদি আমার গায়ে হাত তুলবে ত ভাল হবে না বলছি। আমি এখনি গিয়ে নায়েব মশাইয়ের কাছে নালিশ করব।"

কেনারাম তাহাকে ভেঙ্গাইয়া বলিল—"নায়েব মশাইয়ের কাছে গিয়ে নালিশ্ করব! নায়েব মশাই ত আমার সব করবে! নায়েব মশাই জজ মেজেষ্টার কি না! যা তোর বাবা নায়েব মশাইয়ের কাছে যা।"

এমন সময় গদাইপাল গলা খাকার দিয়া বলিল—"কেনারাম।"

সচকিত দৃষ্টিতে কেনারাম উঠানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"কেও?"

গদাই সক্রোধে বলিল—"কেনারাম, আমি মনে করে-ছিলাম তুই একজন ভাল লোক। তুই ত দেখছি বজ্জাতের ধাড়ি!"

কণ্ঠস্বরেই কেনারাম বুঝিল নায়েব মহাশয়। তথাপি সন্দেহভঞ্জন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি প্রদীপটা আনিয়া উঠানে নামিয়া গদাইকে দেখিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"এ কি? নায়েব মশাই যে! প্রাতঃ প্রণাম।"

গদাই স্বর কাঁপাইয়া বলিল—"মিথ্যুক ভণ্ড চোর! এই না তুই আমার কাছে বলে এলি যে তোর বিধবা ভাজ তার বাপের বাড়ীতে আছে?"

কেনারাম বলিল—"আজ্ঞে বাপের বাড়ীতেই ছিল ত। আজই ত এসেছে।"

"ওকে শাসাচ্ছিস ধমকাচ্ছিস্ কেন?"

কেনারাম বলিল—"আজ্ঞে—আজ্ঞে—এমন ত কিছু শাসাই নি!"

"শাসাস্‌নি হারামজাদা? কোথা ওগো ভাল মানুষের মেয়ে, এ দিকে এসত।"

গঙ্গামণি উঠানে আসিয়া সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল।

গদাই বলিল—"কি হয়েছে বল ত মা।"

গঙ্গামণি বলিল—"আমার সোয়ামি যত দিন থেকে মরেছে, আমার ভাসুর, আমার যা' সেই থেকে আমায় বড় জ্বালা যন্ত্রণা দেয়, মারে, খেতে দেয় না—আর আজ বলছে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। কেন নায়েব মশাই,

আমার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে কেন? বাড়ী কি ওর একলাকার? আপনি এর বিচার করুন।"

গদাই বলিল—"আমি জজও নই মেজেষ্টারও নই কিন্তু আমি জমিদারের প্রতিনিধি। আমি অবিশ্যি এর বিচার করব। আমি করব না ত কে করবে? আমি এর সূক্ষ্ম বিচার করে দিচ্ছি। হ্যাঁরে কেনারাম, তোরা দুই ভাই ছিলি বল্লি না?"

"আজ্ঞে কর্ত্তা।"

"তা হলে তোদের এই বাড়ী জোৎজমি যা কিছু আছে, সমস্ত বিষয়ের আট আনা হিস্যা তোর এই ভাজের। এ আইনের কথা—গুপ্তপ্রেস পাঁজিতেও লেখা আছে।"

কেনারাম বলিল—"আর আমি যে একলা জমিদারের খাজনা গুণছি?"

"তা হলে কি হয়। খাজনার টাকা কি তোর বাবার ঘর থেকে দিচ্ছিস্? জমির উপসত্ব থেকেই ত দিচ্ছিস্।"

"আর আমি যে এত মেহনৎ করছি? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমি চষছি, ফসল তৈরি করছি?"

গদাই দাঁত খিচাইয়া বলিল—"জমি তুই চষবি নে ত কি বাড়ীর বউকে দিয়ে চষাবি, নচ্ছার? ভারি যে আইনবাজ হয়েছিস্ দেখছি। যা বলি শোন। তোর এই ভাজ যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন জমির অর্দ্ধেক উপসত্ব ওর। সেই ভাবে আদর যত্ন করে যদি তোর ভাজকে বাড়ীতে রাখতে চাস্ ত রাখ। নৈলে বল কালই আমি জমি জমা ভাগ বাটোয়ারা করে, আট আনা হিস্যা তোর ভাজের নামে দাখিল খারিজ করে নেব। ও আপনার বাপের বাড়ী চলে যাক্—আমি ওর জমি বিলি করিয়ে দিচ্ছি। বাপের বাড়ী বসে পায়ের উপর পা দিয়ে সে জমির উপসত্ব ভোগ করবে। কি বলিস?"

ইহা শুনিয়া কেনারাম কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। শেষে বলিল—"আমি ত ভাজের উপর কোন রকম অত্যাচার উপদ্রব করিনে। বলুক না ও কি অত্যাচার করেছি।"

গঙ্গামণি বলিল—"আমায় খেতে দেয়নি। উঠতে বসতে আমায় ভাল মন্দ করেছে। আমাকে মেরেছে পর্য্যন্ত।"

গদাধর, হাতের লাঠিটা উঠানে আছড়াইয়া বলিল—"হ্যাঁরে মহাপাপী! স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলেছিস্? স্ত্রীলোক যে আদ্যাশক্তি ভগবতী তা জানিস্ মুখ্যু? তোর যে নরকেও স্থান হবে না।"

কেনারাম বলিল—"কবে আবার মেলাম! ওর কথা শুনবেন না নায়েব মশাই।"

"ওর কথা শুনব না? এখনি আমি স্বকর্ণে যে শুনলাম তুই বলছিস বেরো আমার বাড়ী থেকে নইলে চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে বের করে দেব। আ—রে গঙ্গাজলে বব্বলে!—আমি যে এই উঠানে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া সব শুনেছি। মনে করেছিস্ বুঝি যে নায়েব মশাই অতি ভালমানুষ, ফোঁটা কাটে, হরিনাম করে, কাউকে উঁচু কথাটি বলে না, আমরা যা খুসী তাই করব?—ওরে, নায়েব মশাই ভালর কাছেই ভাল মানুষ। কিন্তু বজ্জাৎ অধার্ম্মিকের পক্ষে মুগুর। আমার নিজমূর্ত্তি দেখিস্ নি এখনো তোরা। তোকে ভালমানুষ বলে মনে করেছিলাম ব'লেই তোর বাড়ী বয়ে এসেছি। কাছারিতে বসে হঠাৎ মনে হল কৈ কেনারাম ত ঘিয়ের টাকা কটা নিয়ে গেল না—তা না হয় নিজেই গিয়ে দিয়ে আসি। তাই পাঁচটা টাকা তোকে দিতে এনেছিলাম। এই দেখ।"—বলিয়া গদাধর টাকা বাহির করিয়া দেখাইল।

কেনারাম নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

গদাই বলিল—"তা হলে কি বলিস্? জমিজমা ভাগ করে দিবি, না ভাজকে আদর যত্ন করে ঘরে রাখবি?"

কেনারাম বলিল—"কেন যত্ন করব না—কেন আদর করব না? ওকি আমার পর? আমার যে ভাই—আপন সহোদর—তারই ত ও ইস্তিরী! আমি কি ওকে অযত্ন করতে পারি? আজ যদি আমার ভাই বেঁচে থাকত!"—বলিতে বলিতে কেনারাম ক্রন্দনের উপক্রম করিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওরে আমার ভাইরে—বেচারাম রে—তুই কোথা গেলি রে।"

গদাই বলিল—"থাম থাম, তোর আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না। যা বল্লাম তা করবি। যদি ভাজকে কোনও রকম জ্বালা যন্ত্রণা দিচ্ছিস্ শুনতে পাই—তাহলে সেই দণ্ডে তোর অর্দ্ধেক জমিজমা কেড়ে নিয়ে এই ভাল

মানুষের মেয়েকে দেব। সাবধান! রাত হয়ে গেল, এখন আমি চল্লাম। হ্যাঁ—আর এই টাকা পাঁচটা রেখে দে। পাঁচ টাকার ঘি কাল দশটার মধ্যে কিনে কাছারিতে আনবি। বেশ ভাল ঘি হয় যেন। ওগো ভালমানুষের মেয়ে—তুমি গ্যাঁট হয়ে বসে থাক। তোমার উপর যদি আর কোনও উৎপীড়ন হয়, তখনি এসে আমায় জানাবে। আমি জমিদারের প্রতিনিধি—গ্রামের লোকের মা বাপ। আমার রাজ্যে কোনও অত্যাচার—কোন অধর্ম্ম হতে দেব না। এখন চল্লাম তবে।"

কেনারাম করযোড়ে বলিল—"নায়েব মশাই, গরীবের ঘরে যদি পায়েব ধুলো দিলেন, একবার তামাক ইচ্ছে করবেন না?"

গদাই বলিল—"না—আর দাঁড়াব না। অনেক রাত হল। এখনো আমার একশো আট হরিনাম করতে বাকী আছে। একশো আট হরিনাম করে তবে খাব, শোব।"—বলিয়া গদাই প্রস্থান করিল।

আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয়ন ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, একটি বাক্স হইতে গদাই গোপীকান্ত বাবুর নোটের তাড়া বাহির করিল। চশমা চোখে দিয়া সেগুলি সহাস্যবদনে গণিতে লাগিল। ক্যাম্বিশের ব্যাগ হইতে বোতলটি পুনরায় বাহির করিয়া অবশিষ্ট মদ্যটুকু উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। ঈষৎ মত্ততা উপস্থিত হইলে, নোটগুলি সম্মুখে বিছাইয়া, স্নেহগদ্গদস্বরে বলিতে লাগিল—"এ হাজার টাকা আমার হল। পুলিসকে দিতে হবে না, কাউকে দিতে হবে না। এ হাজার টাকা আমার—আমার—আমার। বুদ্ধি যার, টাকা তার—বুদ্ধি যার, টাকা তার।"

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পারসীজাতির ধর্ম্মসমাজ *

পারসীদিগের আদিম বাসস্থান পারস্যদেশে। প্রাচীন পারসী রাজ্য মুসলমানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইলে পর সমগ্র পারসীজাতি ক্রমে ক্রমে মুসলমান হইয়া পড়িল। ইহাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। প্রবাদ আছে যে স্বদেশী বেশ, অস্ত্র এবং গোহত্যা বর্জ্জন করিবার সর্ত্তে তাহারা এদেশে বাস করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। এখানে, ভিন্ন ধর্ম্ম ও ভিন্ন জাতীয় লোকদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহারা আপনাদের ভাষা ও আপনাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্ঞান প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল। কিন্তু একটি বিষয়ে তাহারা সতর্ক ছিল। যে কয়েকটি ধর্ম্মগ্রন্থ তাহাদের সঙ্গে ছিল সেগুলিকে বিশেষ যত্নে তাহারা রক্ষা করিয়াছিল। এই সকল ধর্ম্মপুস্তকের যথার্থ ধারণা যদিচ তাহাদের মনে ছিল না তথাপি প্রধান পুরোহিতদের মধ্যে বংশানুক্রমে ইহাদের মোটামুটি তাৎপর্য্য কতকটা পরিমাণে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল।

আন্তর্জাতিক বিবাহ ইত্যাদির দ্বারা ক্রমে ক্রমে ইহারা হিন্দুদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া প্রায় হিন্দুই হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, ইহারা ইচ্ছার সফলতা কামনা করিয়া হিন্দু দেবমন্দিরে মানৎ করিত। পরে ভারতবর্ষে মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই পারসীরা অনেকগুলি মুসলমান রীতিনীতিও গ্রহণ করিল এবং প্রসিদ্ধ মুসলমান পীরদের দরগাগুলিতেও পূজা দিতে লাগিল। এই সময় ইহারা আপনাদের সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদিও প্রায় আর কিছুই জানিত না তথাপি ঈশ্বর এক এবং একব্যক্তির একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত নহে শাস্ত্রের এই দুটি বাক্য ইহারা কখনো বিস্মৃত হয় নাই। ইহারা প্রাচীন পারসী ভাষাতেই প্রার্থনামন্ত্র সকল উচ্চারণ করিত কিন্তু তাহার একটি বর্ণেরও ভাব তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। কয়েকজন পুরোহিত ব্যতীত আর কেহই তখন পারসী ভাষা ও সেই শাস্ত্রোপদিষ্ট মতগুলি সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। হিন্দুদের ও নিজের অনুষ্ঠানগুলি পালন করিয়াই তাহাদের দিন কাটিত। পারসীধর্ম্মের মত ও উপদেশগুলি সম্বন্ধে একটি সাধারণ ভাবের অস্পষ্ট আভাস তাহাদের মনে ছিল; কেবল তাহাদের শাস্ত্রের নীতি উপদেশ সম্বন্ধে এই কথাটি তাহারা স্পষ্টরূপে জানিত যে সুচিন্তা, সুবাক্য ও সুকার্য্যই কল্যাণকর। বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভ কালে পারসীদের অবস্থা এইরূপ ছিল।

ভারতবর্ষে ইংরাজশাসন পারসীদিগের অধিকতর

* শ্রীযুক্ত দাদাভাই নওরোজীর প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

পরিমাণে স্বাধীনতালাভ ও শক্তিবিকাশের অনেক সুযোগ করিয়া দিয়াছে। ইংরাজশাসন-সময়েই পারসীরা প্রথম তাহাদের স্বদেশীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা করে ও বোম্বাই অঞ্চলে প্রথম স্বদেশী ভাষায় সংবাদপত্র বাহির করে। পরে খৃষ্টান মিশনরিগণ পারসীধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের আক্রমণ করিবার উপলক্ষ্যও ছিল, কারণ পরবর্ত্তীকালের পুরোহিতদের প্রবর্ত্তিত সাহিত্য ও অনুষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের অনুষ্ঠানগুলি যুক্ত হইয়া আসল ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়াছিল। এই সময় ক্যাথলিক চার্চ্চের অধীনস্থ একটি বিদ্যালয়ের দুইটি পারসী যুবক ছাত্রকে মিশনরিরা খৃষ্টান করায় পারসীদের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইল। পারসীরা এইরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণের স্রোতকে বাধা দিবার জন্য প্রবল উদ্যমে প্রবৃত্ত হইল। পারসীধর্ম্মকে সমর্থন করিবার এবং খৃষ্টানধর্ম্মকে সমালোচনা ও আক্রমণ করিবার উদ্দেশে এই সময় উহারা কতকগুলি মাসিক পত্রিকাও বাহির করে। এই সময়েই তাহাদের চেতনা জন্মিল যে অর্থ না বুঝিয়া কেবল শাস্ত্রের কতকগুলি শ্লোক মুখস্থ করায় কোনই লাভ নাই এবং বালকবালিকাগণকে এক্ষণ হইতে আপনাদের ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য শিক্ষা দেওয়াই বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। এই আন্দোলন উপলক্ষ্যে পারসীগণ তাহাদের স্বধর্ম্মের একটি প্রশ্নোত্তর-মালা রচনা করিয়াছিল। নিজেদের ধর্ম্মতত্ত্ব ও চরিত্রনীতি সম্বন্ধে তখন তাহারা যেরূপ বুঝিত তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে সেই প্রশ্নোত্তরমালা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্র। জরথোস্তি সম্প্রদায়ভুক্ত আমরা কাহাকে বিশ্বাস করি?

উ। আমরা কেবল এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া থাকি, এবং তিনি ছাড়া আর কাহাকেও বিশ্বাস করি না।

প্র। সেই এক ঈশ্বর কে?

উ। যিনি অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, স্বর্গদূতগণ, নক্ষত্রসকল, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, জল, চারিভূত এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ঈশ্বরকেই আমরা বিশ্বাস করি, পূজা করি, আহ্বান করি ও আরাধনা করিয়া থাকি।

প্র। আর কোন দেবতায় কি আমরা বিশ্বাস করি না?

উ। যে কেহ আর কোন দেবতায় বিশ্বাস করে সে একজন অবিশ্বাসী মাত্র, তাহাকে নরকের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

প্র। আমাদের ঈশ্বরের রূপ কি?

উ। আমাদের ঈশ্বরের মুখ নাই, আকার নাই, বর্ণ নাই, গঠন নাই, এবং কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানও নাই। তাঁহার মত অন্য আর কোন কিছুই নাই; কেবল মাত্র একাকীই; এমন তাঁহার মহিমা যে আমরা তাঁহাকে স্তুতি ও বর্ণনা করিতে অক্ষম। এবং আমাদের মনও তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না।

প্র। এমন কোনো পদার্থ আছে যাহা ঈশ্বরও সৃষ্টি করিতে পারেন না?

উ। হাঁ, একটি বস্তু আছে যাহা স্বয়ং ঈশ্বরও সৃষ্টি করিতে পারেন না।

প্র। সেই বস্তু কি আমাকে বুঝাইয়া দাও।

উ। ঈশ্বর সমুদয় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা; কিন্তু যদি তিনি আপনার মত দ্বিতীয় আর এক ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তাহা তিনি করিতে পারেন না। ঈশ্বর নিজের মত অন্য আর একটি সৃষ্টি করিতে পারেন না।

প্র। ঈশ্বরের কতগুলি নাম আছে?

উ। কথিত আছে তাঁহার এক হাজার একটি নাম, কিন্তু তাহার মধ্যে এক শত একটিই প্রচলিত।

প্র। ঈশ্বরের এতগুলি নাম কেন?

উ। ঈশ্বরের যে নাম তাঁহার স্বরূপকে প্রকাশ করে তাহা দুইটি—এক যজদান্ (সর্ব্বশক্তিমান) আর এক পাউক (পবিত্র)। হরমাজদ্ (পরম আত্মা), দাদার (ন্যায়কর্ত্তা), পরবরদিগার (বিধাতা), পরবরদার (রক্ষাকর্ত্তা) প্রভৃতি তাঁহার অন্য নামও আছে—ইহাদের দ্বারা আমরা তাঁহার স্তব করিয়া থাকি। তাঁহার মঙ্গল কার্য্যসকলের বর্ণনাসূচক আরো অনেক নাম তাঁহার আছে।

প্র। আমাদের ধর্ম্ম কি?

উ। ঈশ্বরের পূজাই আমাদের ধর্ম্ম।

প্র। কোথা হইতে এই ধর্ম্ম আমরা পাইয়াছি?

উ। ঈশ্বরের সত্য প্রচারক জর্থোস্ত অস্ফন্তমান্ অনোশির্বান ঈশ্বরের নিকট হইতে আমাদের জন্য এই ধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছেন।

প্র। পবিত্র হোর্মজদ্‌কে (পরম আত্মা) পূজা করিবার সময় আমরা কোন্‌দিকে মুখ ফিরাইব ?

উ। সৃষ্টবস্তু সকলের মধ্যে কোন একটি উজ্জ্বল ও মহিমাপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের দিকে মুখ করিয়া আমরা সেই পবিত্র ও ন্যায়বান পরম আত্মার পূজা করিব।

প্র। এই সকল পদার্থ কাহারা ?

উ। যেমন, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমূহ, অগ্নি, জল ও এইরূপ আর মহীয়ান্ পদার্থসকল। এইরূপ পদার্থগুলির দিকে আমরা মুখ ফিরাই, কারণ ঈশ্বর তাঁহার বিশুদ্ধ মহিমার একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ ইহাদিগকে দান করিয়াছেন এবং সেই জন্যই সৃষ্টির মধ্যে ইহারা শ্রেষ্ঠতর।

প্র। জর্থোস্তের পূর্ব্বে পারস্য দেশে কোন্ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল ?

উ। রাজা ও প্রজা সকলেই ঈশ্বরের পূজা করিত কিন্তু তাহাদের মন্দিরে তাহারা হিন্দুদিগের ন্যায় পুত্তলের ও গ্রহ সকলের মূর্ত্তি রাখিত।

প্র। মহাত্মা জর্থোস্তের দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগকে কি আদেশ প্রেরণ করিয়াছেন ?

উ। অনেক আদেশ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যেগুলি সর্ব্বদা স্মরণ করা ও যদ্দ্বারা আপনাদিগকে পরিচালিত করা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য সেইগুলিরই আমি উল্লেখ করিব :—

ঈশ্বরকে এক বলিয়া জানা; এই গৌরবশালী জর্থোস্ত ঋষিকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করা; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে ও তাঁহার প্রকাশিত "অবেস্তা" ধর্ম্মগ্রন্থে শ্রদ্ধা স্থাপন করা; ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে বিশ্বাস করা; ধর্ম্মের আদেশগুলির মধ্যে কোন একটিকেও লঙ্ঘন না করা; অসৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করা; সৎকর্ম্মে সচেষ্ট হওয়া; দিনে পাঁচ বার প্রার্থনা করা; মৃত্যুর চতুর্থ দিনের প্রত্যূষে পাপ পুণ্যের বিচার হইবে এই কথায় বিশ্বাস করা; নরককে ভয় ও স্বর্গকে আকাঙ্ক্ষা করা; প্রলয়ের দ্বারা একদিন সমস্ত পূত হইবে ইহা স্থির বিশ্বাস করা; সর্ব্বদা স্মরণ রাখা যে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন তাহাই তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন এবং তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই তিনি করিবেন; যখন ঈশ্বরের পূজা করিবে তখন কোন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের অভিমুখ হওয়া।

প্র। যদি আমরা কোন পাপাচরণ করি তবে জর্থোস্ত কি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন ?

উ। এই বিশ্বাসে কখনো পাপাচরণ করিও না কারণ আমাদের জর্থোস্ত ঋষি আমাদিগকে ঠিক পথে চালিত করিয়াছেন, তিনি স্পষ্টই প্রচার করিয়াছেন যে "তোমাদের কর্ম্ম অনুসারে তোমরা ফললাভ করিবে।" তোমাদের কর্ম্মসকলই তোমাদের পরজগতের গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। তুমি যদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর তবে স্বর্গ তোমার পুরস্কার হইবে, যদি অসৎকার্য্য ও পাপাচরণ কর তবে তোমাকে নরক দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কোন একব্যক্তির দ্বারা পরিত্রাণ পাইবে এই বিশ্বাসে যদি কেহ পাপ করে তবে সেই প্রতারক ও প্রতারিত উভয়েই জগতের শেষদিনে দণ্ডিত হইবে।

প্র। কিসের দ্বারা মনুষ্য কল্যাণ ও উপকার প্রাপ্ত হয় ?

উ। ধর্ম্মকার্য্য, দান, দয়া, নম্রতা, মিষ্টবাক্য, অপরের হিতেচ্ছা, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, জ্ঞানচর্চ্চা, সত্য বাক্য, ক্রোধদমন, সহিষ্ণুতা, সন্তোষ, লজ্জাশীলতা, বালক বৃদ্ধ সকলেরই যথাযোগ্য সম্মাননা, ধার্ম্মিক ভাব, গুরু ও পিতা মাতার প্রতি ভক্তি। এইগুলিই সৎলোকদের বন্ধু ও অসৎলোকদের শত্রু।

প্র। কিসের দ্বারা মনুষ্য নষ্ট হয় ও দুর্গতি লাভ করে ?

উ। মিথ্যাবাক্য, চৌর্য্যবৃত্তি, দ্যূতাসক্তি, স্ত্রীলোকের প্রতি পাপ দৃষ্টিপাত, বিশ্বাসঘাতকতা, অসৎ ব্যবহার, ক্রোধ, অপরের অনিষ্ট ইচ্ছা, গর্ব্ব, বিদ্রূপপরায়ণতা, আলস্য, নিন্দা, লুব্ধতা, অশিষ্টতা, নির্লজ্জতা, পরধন হরণ, প্রতিহিংসাপরতা, অশুচিতা, ঈর্ষা, মোহ, অন্যায়াচরণ, ইহারা অসৎ লোকের বন্ধু, ও ধার্ম্মিকের শত্রু।

প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থগুলি ইতিপূর্ব্বেই দেশীয় গুজরাটি ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কেবল মাত্র আক্ষরিক ও ভাবহীন অধিকন্তু বিচারশূন্য যন্ত্রগঠিত ভাবে লিখিত

হওয়ায় নিতান্ত দুর্ব্বোধ্যও ছিল। এক্ষণে একটি নূতন শক্তির আবির্ভাব হইল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে আমি ও আর কয়েকজন যুবক, সদ্য কলেজ হইতে বাহির হইয়া, পূর্ণ উৎসাহে, ছাত্রদের দ্বারা চালিত "সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমিতির" সাহায্যে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করি। রিক্ত হস্তে পরিপূর্ণ উৎসাহ লইয়া প্রথমে আমরা এই কার্য্য আরম্ভ করি এবং সমাজের অধিকাংশ বাধা বিরোধ সত্ত্বেও প্রাতে ও সন্ধ্যায় আমরাই স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষক রূপে ইহার অধ্যাপনাভার গ্রহণ করি। আমরা দৃঢ়ভাবে এ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে চারিজন উদারমতাবলম্বী ধনীলোক আমাদের অনুকূল্যে অগ্রসর হওয়াতে তাঁহাদের সাহায্যে এই বিদ্যালয়গুলি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া রীতিমত দৈনিক স্কুলে পরিণত হইল। এই সময়েই আমরা "ছাত্র সমিতির" শাখা স্বরূপে "জ্ঞানপ্রসারকমণ্ডলী" স্থাপন করি। এই শাখাগুলি, স্বদেশী ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া ও বক্তৃতাদি করিয়া হিন্দু এবং পারসী উভয়জাতিরই মধ্যে, সাধারণ ভাবে, সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় উন্নতিসাধনে সাহায্য করিয়াছিল। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রসমূহের অধিকতর বিস্তৃতি এই সময়কার আর একটি উন্নতির হেতু হইয়াছিল।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে "রোস্ত গোফ্‌তার" নামে আমি একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করি। আমার বিশ্বাস এই পত্র পারসীদের চিত্তে একটি উচ্চতর সুর সঞ্চার ও সংবাদপত্রের উপকারিতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে "রহনুমই মজ্‌দিয়স্না" (এক ঈশ্বরের উপাসকগণের নায়ক) নামে একটি সমিতি আরম্ভ করা হয় ও আমি ইহার প্রথম সেক্রেটরি নিযুক্ত হইয়াছিলাম। পারসীদের ধর্ম্মসাধনার সহিত যেসকল হিন্দু ও মুসলমান অনুষ্ঠান মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল সেগুলিকে দূর করাই ইহার প্রথম উদ্দেশ্য এবং পারসীদের প্রাচীন ধর্ম্মের সত্য আদর্শ টি কি তাহাই বিচার পূর্ব্বক নির্ণয় করা ও তাহাতে পরবর্ত্তীকালের যে সমস্ত বিকার জড়িত হইয়াছিল তাহাই দূর করা ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। এই সমিতিকেও অনেক বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান অনুষ্ঠানগুলিকে পারসী জীবনযাত্রা হইতে দূর করিতে গিয়া পরিবারের শাসনকর্ত্রী মাতা, স্ত্রী ও ভগ্নীদের নিকট হইতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বাধা পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু বালিকাবিদ্যালয়ের দ্বারা এ সম্বন্ধে সফলতা লাভের উপায় হইল। বালিকারা তাহাদের বিদ্যালয়ে ভ্রান্ত সংস্কারগুলির বিরুদ্ধে যে উপদেশ প্রাপ্ত হইল তদনুসারে যখন ঘরের মধ্যে তাহারা বলিতে ও চলিতে লাগিল তখন তাহাদের মাতাদের দিক হইতে বাধা সহজেই ক্ষয় হইয়া আসিল।

সেই সকল বালিকারা এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজেরাই মাতা হইয়াছে এবং যে সংস্কারকার্য্য আমরা যৌবনের পূর্ণ উৎসাহে আরম্ভ করিয়া কিছুদিনের জন্য অকৃতকার্য্য হইয়াছিলাম আজ তাহারা তাহাই সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। ১৮৫২ ও ৫৩ সালে যখন এই সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল তখন পারসীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সামাজিক অবস্থার আর একটি পরিবর্ত্তন ঘটে। পারসীদের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা চিরদিনই বিশেষ সম্মান পাইয়া আসিতেছে। কেবল আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ মুক্তভাবে পুরুষের সহিত মিলিত হইতে, অপর পুরুষদের সহিত একত্র ভোজন করিতে ও কোন প্রকাশ্য সম্মিলনীতে যোগদান করিতে পাইত না। পারসী পরিবারের কয়েকজন কর্ত্তৃপক্ষ এই সময় আপন পরিবারস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেরই মধ্যে, সামাজিকভাবে সম্মিলন, একত্র ভোজন ও স্বাধীনভাবে আলাপের ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে, স্ত্রীলোকদের এ সম্বন্ধে যেটুকু অনধিকার ছিল তাহা ঘুচিয়া গেল। স্ত্রীপুরুষের সমতার অনুকূলে জর্থোস্তের সুস্পষ্ট উপদেশও এই সামাজিক পরিবর্ত্তন সাধনের সাহায্য করে। জর্থোস্ত একস্থানে বলিয়াছেন—

> "হে বর ও কন্যাগণ! হে স্বামী ও স্ত্রীগণ! আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে তোমরা একমন হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর; পবিত্র চিত্তে তোমাদের ধর্ম্মকার্য্য সকল একত্র সম্পন্ন কর; উভয়ে উভয়ের প্রতি সত্য আচরণ কর, ইহাতে তোমরা নিশ্চিত সুখী হইবে।"

অনুমান চারিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বাক্য কথিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মপুস্তকের সর্ব্বত্রই উক্ত হইয়াছে যে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় ক্ষেত্রেই স্ত্রী পুরুষের অধিকার সমান।

বহুশতাব্দী ধরিয়া পারসীরা যদিচ হিন্দু ও মুসলমান-দিগের মধ্যে বাস করিয়াছে তথাপি তাহারা বহুবিবাহ প্রথা কোন দিন গ্রহণ করে নাই। পারসীদের সমাজব্যবস্থার সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট আইন না থাকাতে এক সময় প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা সকল হিন্দু ইংরাজি অথবা কোন্ আইন অনুসারে নিয়মিত হইবে? শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং নূতন শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীনদের শাসন শিথিল হওয়ায় কয়েকজন পারসী প্রথম স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সমস্ত পারসী সমাজ তাহাদের এই ঘৃণিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। তৎক্ষণাৎ একটি সভা আহ্বান করিয়া একটি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইল এবং বহুবিবাহ, ইংরাজের ন্যায়, পারসীর পক্ষেও দণ্ডনীয় এই মর্ম্মে গবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থা সভা হইতে একটী আইন পাস করাইয়া লওয়া হইল। এই সভা হিন্দুদিগের অনুকরণে শৈশবে বাগদান রীতির বিরুদ্ধেও আপত্তি উত্থাপন করিল। পুরাতন রক্ষণশীলদল নানা কারণে এই আন্দোলনের বিরোধী হইলেন, অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা রফা হইয়া এই প্রশ্ন আপাততঃ অমীমাংসিত রহিয়া গেল, কিন্তু কার্য্যত এই প্রথা শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে আপনিই উত্তরোত্তর বিলুপ্ত হইবার পথে চলিয়াছে।

পারসীদিগকে লোকে অগ্নিপূজক বলিয়া থাকে। পারসীরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলে যে তাহারা অগ্নির পূজা করে না, অগ্নি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তি সকলকে তাহারা দিব্য শক্তির চিহ্ন বোধে সম্মাননা করে। আমি এই অপবাদকে যেমন অমূলক মনে করি এই প্রতিবাদকেও সেইরূপ কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি বলিয়া গণ্য করি। প্রকৃতিতে যা কিছু সুন্দর, বিস্ময়কর, নির্দ্দোষ ও উপকারী পারসীরা যদিচ তাহাকেই স্মরণ করে, স্তুতি করে, ভালবাসে ও পবিত্র বোধ করে, তথাপি কোন একটি অজ্ঞান জড়বস্তুর নিকট তাহারা কথনো সাহায্য বা কল্যাণ প্রার্থনা করে না। অতএব তাহাদিগকে পুত্তলপূজক বা জড়োপাসক বলা যায় না। পক্ষান্তরে পারসী তাহার উপাস্য দেবতা হোর্মজ্দ্ বা পরম আত্মাকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করিবার সময় বিশেষ কোন একটি বস্তুর সম্মুখীন হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করে না। পার্সী বলিয়া থাকে যে তাহার হোর্মজ্দ্ যস্ত্ (হোর্মজ্দের স্তব) নিঃসঙ্কোচে সর্ব্বত্রই সম্পন্ন হইতে পারে। পরন্তু জল বা অন্যান্য ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে সম্বোধন করিবার সময় পারসী কথনো অগ্নির সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় না। সে যথন বিশেষ ভাবে কেবল অগ্নির দেবতাকেই সম্বোধন করে তথনই সে অগ্নির দিকে মুখ ফিরায়। কিন্তু হোর্মজ্দ্ বা পরমাত্মার উপাসনা করিবার সময় পারসী কোনো চিহ্নকে স্বীকার করে না এবং কোন কিছুর দিকে মুখও ফিরায় না। সমুদ্র, সূর্য্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক মহীয়ান বস্তু সকলের মধ্যে একমাত্র অগ্নিকেই মন্দিরের সীমার মধ্যে আনয়ন করা সম্ভব হয় বলিয়া পারসীদের উপাসনামন্দিরগুলিতে স্বভাবত কেবলমাত্র অগ্নিরই ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে এবং সেই জন্যই পারসী-দিগকে অগ্নিপূজক বলিয়া লোকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়া থাকে।

ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে "যিনি ঈশ্বরকে তাঁহার কর্ম্মের মধ্য দিয়া জানেন তিনিই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন।" ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞানে কোন বিশেষ বস্তুর দিকে পারসীকে মুখ ফিরাইতে হইবে এরূপ অনুশাসন কোন পারসীশাস্ত্রে আমি দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। তবে প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরে উত্তীর্ণ হইবার উপদেশ শাস্ত্রবাক্য সকলে দেখিতে পাওয়া যায়। পারসীদের ধর্ম্মগ্রন্থসকলের মধ্যে, শয়তানের তুষ্টিসাধনার্থে কোন প্রকারের পূজা বা অনুষ্ঠানের বিধান কোনখানে নাই। পাপের ধ্বংস ও মঙ্গলসাধনার উদ্দেশে সংগ্রাম করিবার কথা ইহাতে বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পারসীদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত ও বিশ্বাস এইরূপ ছিল। সম্প্রতি শিক্ষিত পারসীরা বিশেষ আগ্রহ ও পরিশ্রমের সহিত বিচার পূর্ব্বক "জেন্দাবেস্ত" পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। "রহনুমাই সভা" এইসকল শিক্ষিত পারসীদের দ্বারাই গঠিত। ইহারা প্রাচীন পারসী সাহিত্য অনুসন্ধান করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে সভায় বক্তৃতা ও পুস্তকাদি প্রকাশের দ্বারা তাঁহাদের গবেষণার ফল সমগ্র পারসীসমাজের গোচর করিতেছেন। এইসকল শিক্ষিতদের এক্ষণে এই মত [illegible]

ধর্ম্মগ্রন্থ যাহা প্রামাণিক বলিয়া পারসীদের ধারণা ছিল তাহা যথার্থ পক্ষে প্রামাণিক গ্রন্থ নহে, এবং এইসকল গ্রন্থের "গাথা" অংশটি ব্যতীত অবশিষ্ট অংশগুলি জর্থোস্ত অথবা তাঁহার সমসাময়িক কোন সহযোগী বা শিষ্যদের বাক্যও নহে। ইঁহাদের ধারণা "জর্থোস্তের" পূর্ব্বে পারসীরা প্রায় পৌত্তলিকই ছিল। "জর্থোস্ত" আসিয়া ধর্ম্মরাজ্যে সম্পূর্ণ বিপ্লব সাধন করেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহান এক ঈশ্বরের পূজাই জর্থোস্ত-প্রচারিত ধর্ম্মের আদি ও অন্ত। তাঁহার ঈশ্বর একাকীই সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধাতা। জর্থোস্ত প্রাচীনতর দেবদেবীগণের পূজা পরিত্যাগ করেন ও ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলেন "একমাত্র তোমাকেই আমার অন্তশ্চক্ষু দেখিতেছে।"

জর্থোস্তের একেশ্বরবাদ সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট এবং এক ভার্য্যা গ্রহণ সম্বন্ধেও তাঁহার অনুশাসনে কোনো সংশয় নাই। বর্ত্তমান শিক্ষিত পারসীরা বলেন তাঁহাদের অনেকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে পুরোহিতদিগের দ্বারা রচিত। জর্থোস্তের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যেসকল ভৌতিক শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল পরবর্ত্তী পুরোহিতগণ পুনশ্চ তাহার প্রচলন করেন এবং সেই সঙ্গে আপনাদের সুবিধাজনক ও লাভজনক কতকগুলি রীতিপদ্ধতি ও অনুষ্ঠানও তাঁহাদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। দেবতাদের আনুকূল্য প্রার্থনা করা জর্থোস্ত-স্থাপিত ধর্ম্মের অঙ্গ নহে। এই সকল শিক্ষিতেরা বলেন যে আপনাদের ধর্ম্মের সনাতন আধ্যাত্মিকতা, সরলতা ও বিশুদ্ধিতার মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করাই এক্ষণে পারসীদের কর্ত্তব্য। তাঁহাদের মতে, এক ঈশ্বরের পূজা এবং সুচিন্তা, সুবাক্য ও সুকার্য্যের অনুষ্ঠানই একমাত্র চিরন্তন বিধান, ইহাই জর্থোস্তের বাক্য। যে সকল রীতিপদ্ধতি ও অনুষ্ঠান দেশকালগত রুচি ও অবস্থানুসারে গ্রহণ করা হয়, সমাজের কল্যাণার্থে এবং আধ্যাত্মিক ও লৌকিক প্রয়োজনানুসারে সেগুলির পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। অতএব বর্ত্তমান কালের আবশ্যকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রচলিত ধর্ম্মের অনেক রীতিপদ্ধতি অনুষ্ঠানের সংস্কার-সাধনের জন্য শিক্ষিত পারসীরা এক্ষণে উদ্যোগী হইয়াছেন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

বাক্ প্রয়াসী

(১)

নিরন্তর তোমার পর
সকল ভর
না দিলে,
শুধু কি হায় পাব তোমায়
গাঁথা কথায়
সাধিলে ?
তোমার দেওয়া সকল দান ;—
এই যে দেহ, এই যে প্রাণ,
এই যে হাসি, এই যে গান,
সকল দিয়া
এমন তুমি, তোমায় কি হে
পাব, কথায়
সাধিলে।

(২)

চক্ষে যদি প্রেমের নদী
জন্মাবধি
না বহে,
তবে কি হায় শুধু কথায়
ডেকে তোমায়
পা'ব হে।
তোমার রূপে জগৎ ঘেরা,
জগত মাঝে জীবের ফেরা,
সাধু এবং পণ্ডিতেরা
বলে দেছেন
ভাব হে,
এ রূপ প্রাণে রয় কি, যদি
প্রেমের নদী
না বহে॥

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মিত্র।

ভারতীয় ভাস্কর্য্য

[শ্রীযুক্ত আনন্দ কে, কুমারস্বামী কর্ত্তৃক লিখিত একটি ইংরাজী প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত।]

এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের বহুবিধ উৎকৃষ্ট নমুনা একত্র সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু সাময়িক প্রদর্শনীতে কোনো জিনিষেরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা বহুসংখ্যক নমুনা একত্র করা সম্ভব হয় না; কারণ বড় মূর্ত্তিগুলি নড়াইয়া আনা দুষ্কর এবং ছোটখাটো মূর্ত্তিগুলি প্রায়ই কোনো না কোনো পুরাশিল্পশালার মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও এলাহাবাদের প্রদর্শনীতে সংগৃহীত ভাস্কর্য্য মূর্ত্তিগুলির নমুনা হইতেও ভারতের বিশেষত্ব ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে।

ঐসকল নমুনার মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় কালেরই গঠিত মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন নমুনার মধ্যে দুটি তিনটি খুব চমৎকার শিল্পকুশলতার নমুনা।

ইহাদের মধ্যে একটি বরাহ অবতার (১ম চিত্র)। ইহা ঝাঁসি হইতে সংগৃহীত। ইহার গঠননৈপুণ্য দর্শকের মনের উপর একটি সম্ভ্রমসূচক স্থায়ী ছাপ বসাইয়া দেয়। বরাহগাত্রে উৎকীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিগুলি উহার সৌন্দর্য্যহানি না করিয়া বরং উহার জমকালো ভাবকে অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছে। বরাহের পাদপীঠ হইতে মস্তকচূড়া পর্য্যন্ত উচ্চতা তিন ফুট পাঁচ ইঞ্চি। বরাহের তলদেশে নাগিনী ও সম্মুখে গদাধারিণী লক্ষ্মী মূর্ত্তি রহিয়াছে।

১ম চিত্র—বরাহ অবতার।

দ্বিতীয় সুন্দর মূর্ত্তি অবলোকিতেশ্বরের (২য় চিত্র)। ইহা তাম্র নির্ম্মিত। ইহার শ্রীমণ্ডিত দেহসৌষ্ঠব ও ভাব-ব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মূর্ত্তি ভারতের প্রান্তরাজ্য নেপালে গঠিত হইয়া থাকা সম্ভব; ইহার রচনারীতিতে অজন্তা চিত্রাবলীর সুন্দর রীতির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয় সুন্দর মূর্ত্তিও নেপালেরই কারুশিল্পের চমৎকার নমুনা। ইহা পিত্তল-নির্ম্মিত তারা মূর্ত্তি (৩য় চিত্র)। এই মূর্ত্তিটি কাশিমবাজারের বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-সংশ্লিষ্ট মিউজিয়ম রমেশভবনের জন্য ক্রয় করিয়াছেন; তাঁহার অনুগ্রহে ইহা এখন বাঙালীর সাধারণ সম্পত্তি হইল। মহারাজা এই উদ্দেশ্যে আরও অনেক চিত্র ও মূর্ত্তি ক্রয় করিয়াছেন। তারা মূর্ত্তির অঙ্গপরিপাট্য, সুসমঞ্জস গঠন, শান্ত মহিমান্বিত মুখভাব, সরল সুসমাহিত বসিবার ভঙ্গি মূর্ত্তিটিকে অনবদ্য করিয়াছে। ইহার হাতপায়ের গড়ন (৪র্থ চিত্র) চমৎকার সুসঙ্গত ও সুন্দর।

এই কয়েকটি প্রাচীন নমুনার পরিচয় দিয়া এখন দেখা যাক ভারতে আধুনিক কালে ভাস্কর্য্যের অবস্থা কিরূপ। ভারতের আর্ট সম্বন্ধে রুচিবিকৃতি ও আর্টের প্রতি ঔদাসীন্য

২য় চিত্র—অবলোকিতেশ্বর।

প্রভৃতি সর্ব্বনাশী কারণ সত্বেও এখনো সেই প্রাচীন মনোরঞ্জিনী বিদ্যার জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য ও স্থায়িত্ব এত কাল পরেও আমাদিগকে চমৎকৃত করে।

এইসকল নবীন ভাস্কর্য্যের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেগুলি জয়পুরের ভাস্করদিগের কুলক্রমাগত বিদ্যার পরিচয়। ঐ সকল ভাস্করের মধ্যে মালিরাম (৫ম চিত্র) অন্যতম। ইনি যদিও স্বচ্ছন্দে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন তথাপি আর্টিষ্ট মাত্রকেই জীবিকার জন্য জনসাধারণের উপরই নির্ভর করিতে হয়; অথচ আমাদের দেশের জনসাধারণের রুচি আর্টের অনুকূল নয়। ইহার ফলে মালিরামকে অনেক নিকৃষ্ট আর্টহীন মূর্ত্তি গঠন করিতে হয় এবং তাহাতে তাঁহার কলাকুশলতা ক্ষতিগ্রস্তই হইতে থাকে। কিন্তু কাহাকেও বিচার করিতে হইলে তার শ্রেষ্ঠ রচনার দ্বারাই বিচার করা উচিত। মালিরামের শ্রেষ্ঠ রচনা অতি উচুঁ দরের। নমুনা স্বরূপ এখানে তিন চারটি মালিরামের রচনার প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল।

৩য় চিত্র—তারা।

৬ষ্ঠ চিত্রে একটি রাজপুত মহিলার মূর্ত্তি একখানি পাথরের টালির গায়ে অল্প খুদিয়া উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহা একটি প্রাচীন চিত্রের আদর্শে রচিত। সে চিত্রখানির প্রতিলিপি আমার Indian Drawings নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। এই উৎকীর্ণ শিলাফলকের মূর্ত্তিখানিতে

৪র্থ চিত্র—তারা মূর্ত্তির বাম হস্ত

৫ম চিত্র—মালি রাম।

আসল চিত্রকরের তুলিকার উদ্দেশ্য, কমনীয়তা, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির ভাব প্রায় হুবহু ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিপুণ কলা-কুশলতা ও যথার্থ শিল্পজ্ঞান ব্যতীত এমনতর সুন্দর মূর্ত্তি

৬ষ্ঠ চিত্র—রাজপুত মহিলা—মালিরাম কৃত।

ভারতের ভবিষ্য আর্টের ইতিহাস উজ্জ্বল দেখিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য ভারতের কারিকরদিগকে ভালো ভালো কাজ দেওয়া। এই প্রকার বিদ্যোৎসাহ প্রদান ভারতের রাজন্যবর্গের এককালে রীতি ছিল। এখন এরূপ ঘটনা বিরল হইয়া আসিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় আমাদের রাজন্যবর্গের রুচি, শিক্ষাদীক্ষা ও সৌন্দর্য্যবোধ কত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ভারতের অপর দুইটি প্রদেশ হইতে এইরূপ উঁচুদরের আধুনিক ভাস্কর্য্য মূর্ত্তির নমুনা আসিয়াছে।

মান্দ্রাজের মালাইকন্নু আচারি নির্ম্মিত হনুমান মূর্ত্তি (৯ম চিত্র) শক্তিমত্তা ও ভারতবর্ষের বিশেষত্বব্যঞ্জক অঙ্গসঞ্চালন প্রকাশ করিতেছে।

ব্রহ্মদেশের পেগু ও ডেবিন প্রদেশ হইতে কতকগুলি রৌপ্য ও তাম্রময় মূর্ত্তি আসিয়াছে; তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পরিকল্পনা ও রচনায় চমৎকার সুন্দর। মঙ্গ সান পে নির্ম্মিত কিন্নরমূর্ত্তি (১০ম চিত্র) ব্রহ্মদেশীয়ভাব, সজীবতা ও শ্রীতে পরিমণ্ডিত এবং ইহার গঠন ও পরিকল্পনা চমৎকার সুন্দর।

৭ম চিত্র মালিরাম কর্ত্তৃক বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী হস্তিগুহার ত্রিমূর্ত্তির নকল। ইহা যদিও আসলের মতন সুন্দর হয় নাই, তথাপি ইহা শিল্পীর নিপুণতায় অনুপ্রাণিত।

৮ম চিত্রও মালিরাম কৃত, উপবিষ্ট উষ্ট্রমূর্ত্তি।

মালিরাম শীলমোহর, ছাঁচ প্রভৃতি খোদাই করিতেও সিদ্ধহস্ত। তাহাকে দিয়া সরকার মুদ্রাসমূহের পরিকল্পনা করাইয়া লইলে প্রচলিত মুদ্রা অপেক্ষা অনেক সুন্দর মুদ্রা হইতে পারে।

মালিরাম ও তৎসদৃশ কারিকরগণ এখন সাধারণের নিকট সহানুভূতি ও সাহায্য পাইবার অপেক্ষা করিতেছে।

অপর একটি ভাস্কর্য্য বিভাগের কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক। এগুলি তাম্রফলকে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য প্রভৃতি চিত্রের আদর্শে শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় চৌধুরী কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ। এই সকল চিত্র বহুপরিচিত। সুতরাং ইহার বাহুল্য উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

লক্ষ্ণৌনিবাসী দুর্গাপ্রসাদ জী নিজের মূর্ত্তি প্রস্তরে উৎকীর্ণ করিয়া বাষ্ট নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা খুব নিপুণতা ও নিষ্ঠার সহিত

খোদিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভাবাবেশের অভাবে ও ফটোগ্রাফ নকলের মতন হওয়াতে ইহার প্রতি সকল শ্রম পণ্ড হইয়াছে।

এইরূপ আমাদের ভারতের ভাস্কর্য্যের জীবন্ত নমুনা। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে ভারতের স্থাপত্যের মতো ভারতের ভাস্কর্য্যও জীবিত আর্ট; অভাব যা কিছু সেই আর্ট বুঝিবার লোকের। চাহিদা না থাকিলে শিল্পীরা কিসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠ নিপুণতার ফল জোগান দিবে? ভারতের কলালক্ষ্মী সুপ্ত

৭ম চিত্র--ত্রিমূর্ত্তি—মালিরাম কৃত।

৮ম চিত্র—উষ্ট্র—মালিরাম কৃত

সেবাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। যে জনসাধারণ আর্টে তুচ্ছতা, অসরলতা ও ভাবহীনতা লইয়া সন্তুষ্ট; যাহারা আকারপ্রধান চিত্রই বৈঠকখানার সৌষ্ঠব মনে করে; যাহাদের কাছে সঙ্গীত শিল্প চিত্র হেলাফেলার জিনিষ, সাধনার সামগ্রী নহে; তাহাদের কাছে কলালক্ষ্মীর আদর সম্ভব হইবে না। কলাবিৎ এমন লোকের কাছে সমাদৃত হয় না। এমন তথাকথিত শিক্ষিত লোকও আছে যাহারা সঙ্গীত বা

করা মনে করে। এই রকম অবস্থা যতদিন না পরিবর্ত্তিত হইবে ততদিন কোনো দেশের আর্টের যথার্থ উন্নতির আশা নাই। উপকরণ ত আমাদের আশে পাশে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত আছে, চাই শুধু সেই অমৃত-কুণ্ডের জল যাহার স্পর্শে বিক্ষিপ্ত অস্থিকঙ্কাল একত্র হইয়া জোড়া লাগিবে এবং চাই সেই সোনার কাঠি যাহার স্পর্শে সুপ্ত রাজকন্যা জাগিয়া উঠিবে। আমরা ছিন্নমস্তার মতো নিজেদের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর শিরশ্ছেদ করিয়া তাহার রুধিরধারা পান করিতেছি। সে দিন কি দুর্দ্দিন যে দিন আমরা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া জানিব আমরা কি অমূল্য নিধি হেলায় হারাইয়াছি। লক্ষ্মীদেবীর পূজা ত আমরা ঘরে ঘরে করি—কিন্তু কৈ সে আমাদের প্রাণ, কৈ সে আমাদের দৃষ্টি, যাহাতে আমরা লক্ষ্মীকে চিনিয়া লক্ষ্মীছাড়া না হই। শ্রী যে আমাদের মন্দিরে দেউলে, ঘাটে পথে, মাঠের কৃষাণের কর্ম্মে, মজুরণীর গতিলীলাতে, ধ্বংসাবশেষে এখনো আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। কেবল নাই তিনি এই আমাদের মতন শিক্ষিত উন্নতিকামী সম্প্রদায়ের মধ্যে। আমরা কলা-লক্ষ্মীর প্রতি অন্ধ এবং বিশেষ ভাবে অন্ধ আমাদের অন্ধতার প্রতিই। ইহার অর্থ কি এবং ইহার অবসান কবে এবং কিরূপে কে বলিবে?

১০ম চিত্র কিন্নর—মঙ্গ সান পে কৃত।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের লোপ*

অশোকের এত বড় সাম্রাজ্য কেমন করিয়া ধ্বংস হইয়া গেল ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ তাহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার Early History of Indiaতে তিনি লিখিয়াছেন যে সর্ব্বপ্রথমে কলিঙ্গ এই সাম্রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যায়, তৎপরে বিদর্ভ, অন্ধ্র প্রভৃতি প্রদেশও

* এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-রচিত প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।

তাহার অনুসরণ করে। গ্রীকেরা পাঞ্জাব অধিকার করায় পাঞ্জাবও সাম্রাজ্যচ্যুত হইয়া গেল। এ সমস্তই সত্য হইলেও চিন্তার বিষয় এই যে, অশোকের ন্যায় প্রতাপশালী সম্রাটের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য যে তাঁহার মৃত্যুর চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পরেই শতধা হইয়া গেল, তাহার কারণ কি?

ইহার কারণের জন্য অধিক দূর অন্বেষণ করিতে হইবে না। যদিচ অশোক সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে সহিষ্ণু ছিলেন ও তাঁহার রাজত্বে সকল ধর্ম্মমতই বাধাহীন ছিল তথাপি তাঁহার কতকগুলি অনুশাসন হইতে তাহার কিছু অন্যথাও দেখা যায়। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন যে অশোক কেবল পাটলিপুত্রের পশুবলি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যের অন্য অনেক স্থানেও বলির নিষেধব্যঞ্জক অনুশাসন পাওয়া যায়। তাহা হইতে বুঝিতে পারি যে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে সর্ব্বত্রই বলি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তখনকার ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত বলিপ্রিয় ছিলেন এবং এই অনুজ্ঞাটি তাঁহাদেরই বিরুদ্ধে প্রচার করা হইয়াছিল। তাঁহাদের এই চিরপ্রচলিত প্রথাটি একজন শূদ্র রাজার আজ্ঞায় বন্ধ হইয়া যাওয়াতে ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সকল বিষয়েই ব্রাহ্মণের একাধিপত্য ছিল। কেহ যদি সমাজ বা ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিত তবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত এবং ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলেই তবে তাহার অপরাধ মোচন হইত। অশোক ধর্ম্ম-ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণের চিরাগত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা এই ক্ষমতাহানি শান্তভাবে গ্রহণ করিবার পাত্র ছিল না। তাহাদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর ক্ষোভের কারণ এই ছিল যে অশোক তাঁহার রাজত্বে দণ্ডসমতা ও ব্যবহারসমতা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—অর্থাৎ দণ্ড ও বিচার সম্বন্ধে উচ্চ নীচ বর্ণে কোন পার্থক্য ছিল না। অশোকের তাম্রলিপি যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই দণ্ডসমতা ও ব্যবহারসমতা এই দুইটি শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণের অপরাধ যতই গুরুতর হউক তাহাদিগকে কোন শারীরিক শাস্তি বা ফাঁসি দেওয়া হইত না। তাহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন দণ্ড ছিল নির্ব্বাসন, ও সর্ব্বাপেক্ষা অপমানকর দণ্ড ছিল শিখাচ্ছেদন। মামলা মকদ্দমায় তাহাদের অনেক সুবিধা ছিল, তাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে হইত না। কোন ব্রাহ্মণ যদি স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে আসিতেন তাহা হইলে বিচারক কেবল তাঁহার উক্তি লিখিয়া রাখা ছাড়া তাঁহাকে জেরা করিতে পারিতেন না। এই অবস্থায় অনার্য্যদিগের সহিত একত্রে কারাবাস ইত্যাদি শাস্তি বহন করিবার কল্পনা মাত্র ব্রাহ্মণের নিকট নিতান্ত দুঃসহ মনে হইত। যতদিন অশোকের দৃঢ় হস্ত রাজদণ্ড বহন করিতেছিল ততদিন ব্রাহ্মণেরা সমস্ত অপমান নীরবে সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মণেরা অশোকের বংশধরগণের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইল। কিন্তু তাহারা নিজেরা যুদ্ধ করিতে পারে না অথচ যে ক্ষত্রিয়গণের সাহায্য তাহারা আশা করিতে পারিত তাহারাও নন্দবংশের দ্বারায় পূর্ব্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে তাহাদের একজন উপযুক্ত সহায় জুটিয়া গেল। তিনি মৌর্য্যবংশের সেনাপতি পুষ্যমিত্র। পুষ্যমিত্র কোন্ জাতীয় ছিলেন তাহা জানা নাই। পারস্যদেশের যেসকল অদম্য যোদ্ধা-দিগকে গ্রীকগণ তাড়াইয়া দিয়াছিল তিনি বোধ হয় তাহাদেরই মধ্যে কেহ হইবেন। তাঁহার নামের শেষ ভাগ হইতেও বুঝা যায় যে তিনি পারসীক জাতীয়। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। গ্রীকেরা প্রতিবৎসরেই অল্পে অল্পে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতেছিল। পুষ্যমিত্র সর্ব্বপ্রথম তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাঁহার বিজয়ী সেনা লইয়া তিনি পাটলিপুত্রে ফিরিলেন এবং অশোকের বংশধরের নিকট হইতে উপযুক্ত অভ্যর্থনা লাভ করিলেন। সেই উপলক্ষ্যে নগরের বাহিরে শিবির স্থাপন করিয়া যখন সৈন্য পরিদর্শন করা হইতেছিল তখন উৎসবের মধ্যে সহসা একটি তীর আসিয়া অশোক-বংশধর রাজার ললাটে বিঁধিল ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। এইরূপে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অবসান হইল এবং পুষ্যমিত্র আধিপত্য লাভ করিলেন। "মালবিকাগ্নিমিত্রে" দেখা যায় যে তিনি তাঁহার সৈন্য লইয়া পাটলিপুত্রে ছিলেন

ও তাঁহার পুত্র বিদিশাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিপ্লবে আমরা স্পষ্টই ব্রাহ্মণের হস্ত দেখিতে পাই। কারণ যে অশোক তাঁহার সাম্রাজ্যে বলি নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন সেই অশোকের রাজধানী পাটালপুত্রেই পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন। ইহাতেই কি ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা প্রকাশ পায় না? কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধনিপীড়ক বলা হইয়াছে। বস্তুত তিনি ব্রাহ্মণের হস্তগত ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ব্রাহ্মণগণ মৌর্য্য সাম্রাজ্যের কর্ত্তা হইয়া বসিল। কেবল তাহাই নহে তাহাদের প্রভাব বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের বেগ রোধ করিল, দেশের সমস্ত বিদ্যাকে তাহারা গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে এমন একটি গতি দান করিল যাহা আজ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই। এই পুষ্যমিত্রের যাগযজ্ঞে পতঞ্জলি পৌরোহিত্য করিতেন ও পুষ্যমিত্রেরই অনুগ্রহাধীনে থাকিয়া তিনি বিখ্যাত 'মহাভাষ্য' রচনা করেন। কান্ববংশীয় রাজগণ মনুসংহিতা সঙ্কলন করাইয়াছিলেন, ও তাঁহারাই রামায়ণ মহাভারতকে তাহার আধুনিক আকার দান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ রাজবংশ যখন সিংহাসন অধিকার করে নাই তখনও ব্রাহ্মণেরা সুঙ্গবংশীয় রাজাদের গুরুর পদ অধিকার করিয়া ছিল এবং রাজ্যচালনায় তাহাদের যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব ছিল। যখন তাহারা রাজকীয় অধিকার হারাইয়া ফেলিল তখনও বহু দিন ধরিয়া তাহারা সমাজের প্রধান পদে ছিল ও বিধি ব্যবস্থায় তাহাদের কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পাইত। অশোক ব্রাহ্মণদিগকে যেসকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন মনুসংহিতায় দেখা যায় যে ব্রাহ্মণগণ পুনশ্চ সেইসকল অধিকার লাভ করিয়া সমাজে আপন শ্রেষ্ঠতা দৃঢ়স্থাপিত করিয়া লইয়াছে।

একদা অশোক যে ভূদেব আখ্যাধারী ব্রাহ্মণদের ভূদেবত্বের অভিমান মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহারা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর সম্মান লাভ করিল।

সম্রাট অশোক জাতিনির্ব্বিশেষে যে বিচারসমতার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার পরিণাম কি হইল তাহা আমরা মৃচ্ছকটিক নাটক হইতে জানিতে পারি। এই নাটকের রাজা পালক অশোকের অনুগামী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার রাজত্বে ব্রাহ্মণদের বড় দুর্দ্দশা দেখা যায়। চারুদত্ত নামক ব্রাহ্মণ বণিক তাঁহার অনুচরবর্গসহ অত্যন্ত দরিদ্র দশায় পতিত হইয়াছিলেন। শর্ব্বিলক নামক আর এক ব্রাহ্মণ জীবিকার জন্য চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। বিচারক যখন চারুদত্তকে স্ত্রীহত্যা অপরাধে অপরাধী স্থির করিলেন তখনো তিনি ব্রাহ্মণকে প্রাণদণ্ড দিতে দ্বিধাবোধ করিলেন। কিন্তু রাজা তাহা শুনিলেন না, তাহাকে জীবিত অবস্থায় পুঁতিয়া ফেলিবার আজ্ঞা দিলেন। তাঁহার আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই বিপ্লব বাধিল। রাজা সিংহাসনচ্যুত হইলেন। চারুদত্ত প্রধান অমাত্যের পদলাভ করিলেন এবং শর্ব্বিলকও উচ্চ পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সাহিত্য হইতেই প্রমাণ হয় যে অশোক ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বসাধারণের সহিত সমক্ষেত্রে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার সাম্রাজ্য টিকিতে পারিল না।

শ্রীঅতসী দেবী।

ভাগ্যচক্র

পঞ্চম ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সেই দুর্ঘটনার পর হইতে দুই বৎসর কাটিয়াছে;—সে দিনগুলা যে কি কষ্টে গেছে তাহা ফ্র্যাঙ্ক আর ইভাই জানেন! উভয়কেই সকল দুঃখ নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে—তাহাও আবার পৃথকভাবে—একা, একা! কারণ ফ্র্যাঙ্ক ছিলেন একস্থানে, ইভা আর একস্থানে। মধ্যে মধ্যে অল্পক্ষণের জন্য দুইজনের দেখা হইত—সে কারাগারের অন্ধকার গৃহে!

সেইদিনই ফ্র্যাঙ্ক স্বপ্নাবিষ্টের মতো গিয়া একেবারে পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করেন—তাহার পর হাজত, বিচার। বিচারে এ খুনী মামলার বিশেষ কিছু রহস্যভেদ করিবার ছিল না—একটা ঝগড়ার ফলে যে খুনটা হইয়া গেছে তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল। ফ্র্যাঙ্ক স্বেচ্ছায় খুন করেন নাই;—তাহার প্রমাণ ইভার সাক্ষীতেই পাওয়া গেল। তিনি বলিলেন, ফ্র্যাঙ্ক প্রথমে নিজেই বুঝিতে

পারেন নাই যে বার্টি মরিয়া গেছে, তিনি ভাবিয়াছিলেন বোধ হয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়া আছে, তাই তাহাকে উঠাইবার জন্য বার বার পদাঘাত পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

জনসাধারণ এই বিচার অত্যন্ত আগ্রহের সহিত দেখিতেছিল। যখন প্রকাশ পাইল বার্টি নিজের স্বার্থের জন্য ফ্র্যাঙ্কের চিঠি পর্য্যন্ত চুরি করিয়াছিল তখন সকলেরই মন ফ্র্যাঙ্কের প্রতি একটা সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। আর কোনো বিশেষ গোলযোগ রহিল না। দেড় মাসের মধ্যেই সব নিষ্পত্তি হইয়া গেল ;—ফ্র্যাঙ্ক দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ড পাইলেন।

এই দুই বৎসর তাঁহার দিনের পর দিন যেন একটা বিষাদময় জাগ্রত স্বপ্নের মতো কাটিয়াছে,—চোখের সামনে কেবলই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা—সেই মৃত্যুবিবর্ণ মুখ, সেই রক্তাক্ত দেহ ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! কিছুতেই তাহাকে সম্মুখ হইতে সরাইতে পারেন নাই পড়িতে গেলে বইয়ের পাতার উপর তাহার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে; লিখিতে গেলে তাহারই স্মৃতির কথা ছাড়া আর কিছুই লিখিবার খুঁজিয়া পান নাই; চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহারই কথা কেবল মনে পড়িয়াছে,—রুদ্ধ কারাগার হইতে জানালা দিয়া যখন বাহিরের দিকে চাহিয়াছেন তখনই চোখে পড়িয়াছে সমুদ্রের উপকূলে সেই ক্ষুদ্র বাড়িটি যেখানে তাহারই সহিত তিনি একত্রে শুইতেন, বসিতেন, খাইতেন, এবং যেখানে তিনি তাহাকেই হত্যা করিয়াছেন! কী ভয়ঙ্কর!

ইভা স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই—এ সময়টা ফ্র্যাঙ্কের কাছাকাছি থাকিবার জন্য পিতাকে অনেক অনুনয় করিয়াছেন, পিতাও ইভার স্বাস্থ্যের ভয়ে তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। ইভার যে অমন স্বাভাবিক স্থিরতা তাহাও এখন স্নায়বিক উত্তেজনায় একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে—এখন কেবলই তিনি চোখের সামনে নানারূপ ভয়ের দৃশ্য দেখেন—রক্তের দৃশ্য, বজ্রের শব্দ! এই কারণে আর্চিবল্ড কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে সাহস করেন নাই।

ইভা ফ্র্যাঙ্কের নিকটেই ছিলেন—মধ্যে মধ্যে কারাগারে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, চেষ্টা করিতেন তাঁহাকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে,—আশান্বিত করিয়া তুলিতে ;—বলিতেন বর্ত্তমানের পীড়নে কাতর হইয়া পড়িয়ো না, ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া বুক বাঁধ। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বিমর্ষতা কাটিত না ;—প্রতিবারই তিনি কারাগার হইতে নিরুৎসাহ হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেন।

ফ্র্যাঙ্ককে আশান্বিত করিতে না পারিলেও ইভা নিজে কিন্তু কখনো আশা হারান নাই—তিনি যে আশাতেই বাঁচিয়া ছিলেন! তাঁহার বিশ্বাস ছিল জীবনের এ অন্ধকার বেশি দিন নয়—তাঁহাদের জন্য আনন্দ, আলোক ভবিষ্যৎ বহন করিয়া আনিতেছে। তাঁহার মন বলিত প্রতীক্ষা কর তাহারই আশায়, চাহিয়া থাক তাহারই অপেক্ষায়—আসিতেছে নবীন জীবন!

নবীন জীবন! সে কী সুখের! তাঁহার সমস্ত হৃদয় নাচিয়া উঠিত সেই আনন্দের সুরে, সেই আনন্দের তালে!

কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে এমন আশার বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে? তাঁহার জীবনের যে দারুণ অভিজ্ঞতা তাহা তো নৈরাশ্যকেই বাড়াইয়া তোলে—তবে কেন এ আশা? না! না! সে কথা ভাবিয়া কাজ নাই। ভবিষ্যৎ আমার উজ্জ্বল, সুন্দর নিশ্চয় ;—সে মলিন হইবার নয়! এমন কি তাঁহার চোখের সামনে যখন সব নানারূপ বিভীষিকা খেলিয়া বেড়াইয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিত, তখনও তিনি নিরাশ হইতেন না—অনাগত সুখের আশায় সমস্ত ভয় এবং দুর্ভাবনাকে ঠেলিয়া রাখিতেন। কল্পনায় সুখের চিত্র আঁকিতে আঁকিতে সময় সময় তাঁহার মুখে আনন্দের রেখাও ফুটিয়া উঠিত ;—যখন তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে হাতে একখানি ক্যালেণ্ডার লইয়া সেইদিনকার তারিখটা পেন্সিল দিয়া সজোরে কাটিয়া দিতেন তখন সেই সুখের ভবিষ্যৎ ক্রমেই দূর হইতে নিকটে আসিতেছে ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত আশায় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। কখনো কখনো তারিখ-গুলা তিনি জমাইয়া রাখিতেন—তারপর এক সময় ছয় সাত দিনের তারিখ একেবারে চাঁচিয়া ফেলিতেন—যেন দুঃখের সময়টা পশ্চাতে রাখিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন সুখস্বপ্নময় ভবিষ্যতের দিকে! সে কী আনন্দ!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এতদিন পরে সত্যই একটার পর একটা করিয়া সে ভয়ঙ্কর দিনগুলা অতীতের গর্ভে চলিয়া গেছে। তাহারা আর ফিরিবে না—যেখানে গেছে সেইখানেই চিরদিনের মতো বিভীষিকাপূর্ণ তাহাদের সমস্ত অস্তিত্ব লইয়া থাকিয়া যাইবে; আর তাহাদের স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়া মনকে উৎপীড়িত করিবে না—এই কথা ভাবিয়া ইভা এখন অনেকটা শান্ত হইয়াছেন—তাঁহার স্নায়বিক উত্তেজনা কমিয়া গেছে—ভবিষ্যতের সুখের জন্য তাঁহার যে একটা অসহ্য অধীরতা ছিল তাহাও এখন আর তত প্রবল নাই—কারণ তিনি ফ্র্যাঙ্ককে লাভ করিয়া সুখী হইতে চলিয়াছেন।

ইভা ও তাঁহার পিতা এখন লণ্ডনে; অত্যন্ত নির্জ্জন ভাবে বাস করিতেছেন। ইভা এখন সুখী বটে কিন্তু তবুও এই বর্ত্তমানের সুখকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার মনে অতীতের সেই নিদারুণ স্মৃতি এখনও জাগিয়া উঠিতেছে—সে স্মৃতি যেন কিছুতেই নিজেকে লুপ্ত হইতে দিবে না! ফ্র্যাঙ্কও লণ্ডনে আসিয়াছেন—সামান্য একটা চাকরী গ্রহণ করিয়া দিন গুজরান করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার উন্নতি হইবে—তাঁহার উপযুক্ত একটা চাকরী মিলিবার শীঘ্রই সম্ভাবনা।

আর্চিবল্ড এখন আরো বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন—বাতে পঙ্গু! কিন্তু এখনও তাঁহার সে ইতিহাসচর্চ্চা ত্যাগ করেন নাই—সমস্ত দিন ধরিয়া বসিয়া এখনও তিনি বইয়ের পাতা উল্টাইয়া যান। ইভা ফ্র্যাঙ্ককে বিবাহ করিতে চাহেন শুনিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু কোনো বাধা দেন না। এখন যেন আর তাঁহার কোনো কিছুতেই আপত্তি নাই—সংসারের প্রতি যেন নির্লিপ্তভাব; যাহা হয় হউক, এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে যেন ইতিহাস-আলোচনায় কেহ না বাধা দেয়, ব্যস্ তাহা হইলেই হইল! তিনি বলিতেন—"বাপ্! আমি বুড়া হইয়াছি—অতশত বুঝি না—ছেলেমেয়েরা যাহা ভালো বোঝে করুক!" আর্চিবল্ড যদিও বাহিরে এইরূপ নির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ করিতেন, কিন্তু অন্তরে, ইভার সহিত ফ্র্যাঙ্কের বিবাহের কথা শুনিয়া, খুসী ছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন ফ্র্যাঙ্ক যত অপরাধই করিয়া থাকুন, আসলে তিনি লোক খারাপ নহেন—ইভা তাঁহার হাতে পড়িলে সুখী হইবে, আদর যত্ন পাইবে আর এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহারো দিন রাত কাছে কাছে থাকিবার মতো একটি লোক জুটিবে—একটি ক্ষুদ্র সঙ্গী!

সমস্ত সপ্তাহের মধ্যে ফ্র্যাঙ্কের সহিত ইভার বড় দেখা শুনা হইত না কারণ ফ্র্যাঙ্ক কাজে ব্যস্ত থাকিতেন কিন্তু রবিবার তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইতই। ইভা সমস্ত সপ্তাহটা ধরিয়া মনে মনে কেবল এই রবিবারটাই আলোচনা করিতেন - ফ্র্যাঙ্ক কখন আসিয়াছেন, কখন কোন কথাটি বলিয়াছেন, কেমন করিয়া কখন তাঁহার পানে চাহিয়াছেন সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া কেবল মনে মনে তাহাই তোলাপাড়া করিতেন,—এই একদিনের আনন্দকে তিনি সপ্তাহের মধ্যে বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়া তাহাকে অন্তরের সহিত উপভোগ করিতেন। ফ্র্যাঙ্কের উপর তাঁহার ভালোবাসা এখন যেমন শত মুখে উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে তেমন আর কখনো হয় নাই—আহা তিনি বড় দুঃখী—তাঁহার সমস্ত দুঃখকে ভালোবাসার দ্বারা, সান্ত্বনা দ্বারা দূরীভূত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিত! ফ্র্যাঙ্ককে তিনি প্রথম ভালোবাসেন তাঁহার বলিষ্ঠ দেহের সঙ্গে তাঁহার অন্তরের যে নমনীয়তা ও দুর্ব্বলতার বৈষম্য তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া। এখন এ বৈষম্য পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহা তাঁহার বড় ভালো লাগে। এখন তিনি দেখেন এত বড় একটা জোয়ান পুরুষ অতীতের একটা স্মৃতির পীড়নে কী মর্ম্মান্তক কাতর! হৃদয়ের এ বল তাঁহার নাই যে এই কাতরতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া আবার তিনি নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করেন! ফ্র্যাঙ্কের এই শক্তির অভাব ইভাকে ভবিষ্যতের সুখকল্পনায় হতাশ করিতে পারিত না—বরঞ্চ এ দুর্ব্বলতার জন্য তিনি ফ্র্যাঙ্ককে বেশি করিয়া ভালোবাসিতেন এবং তাহা লইয়া তিনি নানারূপ সুখস্বপ্ন দেখিতেন।

ইভা স্ত্রীলোক হইলেও জোর করিয়া অতীতকে ভুলিতে পরিয়াছিলেন—ভবিষ্যতের দিকে তিনি সাহসের সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন এবং অসীম ধৈর্য্যের দ্বারা ও আন্তরিক বিশ্বাসের দ্বারা সুখকে তিনি করায়ত্ত

হইতে বাধা করিতেছিলেন! নিরাশ হইবার কারণ কি? অতীতের সমস্ত দুঃখকে কি তাঁহারা অতিক্রম করিয়া আসেন নাই? ফ্র্যান্স যে পাপ করিয়াছেন এতদিনের মর্ম্মান্তিক অনুশোচনায় কি তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? তবে ভয় কিসের? এখন যে ফ্র্যান্সের অবসাদটুকু আছে সে কিছু নয়—নিশ্চয় তাহা শীঘ্র কাটিয়া যাইবে;—ফ্র্যান্সের হৃদয়ের সকল গ্লানি নিশ্চয় তিনি দূর করিয়া দিতে পারিবেন—সে বিশেষ কিছু নয়।

এই বলিয়া ইভা বহুদিন ধরিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, আশা দিয়াছেন—প্রথমে মনকে স্বীকারই করিতে দিতেন না যে ফ্র্যান্সের চিত্ত দিনের পর দিন ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে—ক্রমেই তিনি বেদনার গুরুভারে অবসাদের অতলে ডুবিয়া যাইতেছেন; কিন্তু অবশেষে একদিন আর পারিলেন না—আর নিজেকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু তাঁহাকে জোর করিয়া দেখাইয়া দিল যে যখন তিনি আশার উৎসাহে কথা কহেন তখন ফ্র্যান্সের হৃদয় হইতে তাহার সমর্থনের জন্য কোন বাণী উঠে না, তিনি চুপ করিয়া থাকেন; শুধু নীরবে শুনিয়া যান তাঁহার আশার কথা—মরীচিকার স্বপ্ন! আর মধ্যে মধ্যে চক্ষু মুদিয়া অতি সন্তর্পণে রুদ্ধশ্বাস ত্যাগ করেন। ইভা তবে কোন সাহসে কেমন করিয়া আর মনকে বুঝাইবেন! তিনি দেখিতেন তাঁহার আশার বাণী ফ্র্যান্সের হৃদয় হইতে কেবলই নৈরাশ্যের প্রতিধ্বনি লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে!

যখন এ কথা আর মনের কাছে কিছুতেই গোপন রাখিতে পারিলেন না, যখন তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইল যে ফ্র্যান্স কিছুতেই আশান্বিত হইতেছেন না তখন একদিন দেখেন তাঁহার নিজেরও হৃদয় ভাঙিয়া গেছে—সেখানে আর উৎসাহ নাই, আশা নাই। এতদিন যে আশার মোহে সুখের কল্পনা করিতেছিলেন তাহা মিথ্যা, স্বপ্ন! তবে তিনি কি করিবেন? তাঁহার হৃদয় হইতে নৈরাশ্যের একটা তীব্র যাতনা উঠিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল—তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ

(De La Mazeliere-র নব প্রকাশিত ফরাসী গ্রন্থ* হইতে)

ভৌগোলিক ভূমিকা।

রুসিয়াকে বাদ দিয়া য়ুরোপ যত বড়, ভারতবর্ষ সেই য়ুরোপের মত বড়; সমুদ্র ও হিমালয়-গিরিমালার দ্বারা ভারতবর্ষ এশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন। এই গিরিমালা নীচে নামিয়া আসিয়াছে: পূর্ব্ব দিকে, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা, তিব্বৎ ও ভারতের মধ্যে একটা যাতায়াতের পথ খুলিয়া দিয়াছে; ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ, হিন্দ-চীনের সহিত ভারতকে সংযুক্ত করিয়াছে; পশ্চিম দিকে,—হিমাচল আবার উত্তরাভিমুখে সমুত্থিত হইয়াছে; হিমালয়ের যে সকল শাখাগিরি হিমালয়কে সমুদ্রের সহিত মিলিত করিয়াছে, সেই সব গিরিমালার উপর দিয়া কতকগুলি গিরি-পথ গিয়াছে, সেই পথ দিয়া বেলুচিস্থান ও আফ্‌গানিস্থানে প্রবেশ করা যায়।

গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত, সাগর-ধৌত, উচ্চ পর্ব্বতসমূহের দ্বারা শীত-বায়ু হইতে সুরক্ষিত এই ভারতবর্ষ; ইহার বায়ু উষ্ণ হইলেও এই উষ্ণতা অসহ্য নহে। ইহার জীবজন্তু, গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ এশিয়াখণ্ডেরই মত। ইহার উদ্ভিজ্জ, ত্রিবিধ: উত্তর পশ্চিম ভাগে,—পশ্চিম এশিয়ার ন্যায় উদ্ভিজ্জের দারিদ্র্যদশা; পূর্ব্বভাগে,—ইহার উদ্ভিজ্জ মালাই-দেশের উদ্ভিজ্জের ন্যায়; দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে,—এশিয়া ও আফ্রিকার বৃক্ষাদি দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ই একটা অঞ্চল বিশেষ;—এই অঞ্চলের যে অংশ নাতিউচ্চ তাহা চীন পর্য্যন্ত প্রসারিত; যে অংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চতর তাহা সাইবিরিয়ার সংলগ্ন।

এই গোড়ার কথাগুলি হইতে, কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

ভূমির উর্ব্বরতা, শীতোষ্ণতার মৃদুতা, ভারতকে নিকৃষ্ট জাতিদিগের বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে; সামুদ্রিক অঞ্চলাভিমুখে ক্রমশ অগ্রসর হইয়া, এই সকল

* এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভুল-সিদ্ধান্ত থাকিলেও, আলোচনাগুলি কৌতূহলজনক ও শিক্ষাপ্রদ; লিখিবার প্রণালীটিও সুন্দর। অনুবাদক।

জাতি বহুশতাব্দি ধরিয়া আপনাদিগের অস্তিত্ব বজায় রাখিবে।

ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা দিয়া, অথবা পঞ্জাবের গিরি-পথ দিয়া, মধ্য-এশিয়ার লোকেরা ভারতকে আক্রমণ করিবে, তাহার ফলে, ভারতে নানা ছাঁচের জাতি পরিলক্ষিত হইবে।

পুনঃ পুনঃ আক্রমণ সত্ত্বেও, সাগর ও গিরিমালার দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ায়, এশিয়ার সহিত ভারতের নিত্যনিয়মিত গতিবিধি থাকিবে না।

ভারতের গ্রীষ্ম-প্রধান-দেশ-সুলভ আব্-হাওয়া একটি উদীয়মান জনসমাজের সহায়তা করিবে; কিন্তু অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজকে হীনবীর্য্য করিয়া ফেলিবে।

ভারতের খনি হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, বহুমূল্য রত্নাদি উদ্ধার করা সহজসাধ্য বলিয়া, ভারত, বহুকাল পর্য্যন্ত সমৃদ্ধ বলিয়া, যার পর নাই খ্যাতি লাভ করিবে। লৌহ ও কয়লা তেমন বেশী না থাকায়, ভারত শ্রমশিল্পের জন্য সহজে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে না।

বহির্জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, ভারত একটি অ-পূর্ব্ব সভ্যতা গড়িয়া তুলিবে, কিন্তু বিদেশীয়দিগের আক্রমণ ফলে, এই সভ্যতা প্রভূত পরিমাণে রূপান্তরিত হইবে। অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া ও বিচিত্র জাতির দ্বারা অধ্যুষিত বলিয়া, ভারতের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ঐক্য সহজসাধ্য হইবে না।

১

ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান আলোচনা করিয়া দেখিলে, উপরে যে কথা বলিলাম, তাহা দৃঢ়ীভূত হইবে। ভারতের অন্তর্ব্বর্ত্তী বর্ষ বা মহাদেশ ও ভারতের প্রায়দ্বীপ—এই দুই অংশকে পৃথক্ করিয়া দেখা আবশ্যক।

ভারতের বর্ষস্থান বা মহাদেশ, তিন বৃহৎ অংশে বিভক্ত: সিন্ধুনদ-প্রদেশ, গাঙ্গেয়প্রদেশ ও রাজপুতানা,—সেই মরু-প্রদেশ যাহা ঐ দুই নদীধোত প্রদেশের মধ্যে প্রসারিত।

* * *

সিন্ধুনদের প্রদেশটি আফ্গানিস্থান ও বেলুচিস্থান হইতে পর্ব্বতের দ্বারা পৃথককৃত, এবং হিন্দুস্থান, রাজপুতানায় মরুভূমির দ্বারা পৃথক্কৃত হইয়াছে। অতএব সিন্ধুনদের প্রদেশটি একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ। কিন্তু পশ্চিমদিকে গিরিপথসমূহ ও উত্তরদিকে বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র থাকায় এই নদী-প্রদেশটি মধ্য-এশিয়া ও হিন্দুস্থান এই দুই দেশের মাঝামাঝি একটা সংক্রমণ-ভূমি বা সেতুপথরূপে পরিণত হইবে। এই উপত্যকা-প্রদেশের সভ্যতা কিরূপ হইবে—যদি জানিতে চাই তাহা হইলে দেখিব, উত্তরভাগে ও ব-দ্বীপটিতে, তত্রস্থ মৃত্তিকার উর্ব্বরতা, কৃষির অনুকূল হইবে, এবং নদী-ধৌত প্রদেশটি সমুদ্রে গিয়া শেষ হওয়ায়, ঐ প্রদেশটিতে বাণিজ্যের উন্নতি হইবে। আক্রমণের পথ মুক্ত থাকায়, পঞ্জাবের লোক মিশ্রজাতীয় হইবে। আক্রমণের নিত্য আশঙ্কা থাকায়, উহার অধিবাসীরা যুদ্ধপ্রিয় হইবে। এবং ঐ প্রদেশের যেরূপ জলবায়ু, সেই জলবায়ুর প্রভাবে ওখানকার লোকদিগের রীতিনীতি মধ্য-এশিয়ার রীতিনীতির মত' হইবে। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষের রীতিনীতির মত' আদৌ হইবে না।

* * *

রাজপুতানার উত্তরে, পঞ্জাবের পলি-মাটীর ক্ষেত্রভূমি, যমুনা-ধৌত প্রদেশের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই যমুনা গঙ্গানদীর একটি প্রধান শাখা।

গাঙ্গেয় প্রদেশটি তিনভাগে বিভক্ত: যমুনা প্রদেশ এবং গাঙ্গেয় প্রদেশের মাঝামাঝি স্থান—এই দুইটি লইয়া খাস-হিন্দুস্থান। এই উর্ব্বর ভূখণ্ডকে হিমালয়—উত্তরের শীত-বায়ু হইতে, এবং বিন্ধ্যগিরিমালা—দক্ষিণের শুষ্ক বায়ু হইতে রক্ষা করিয়াছে। এখানকার শীতকালটি বেশ সুখদ; বসন্তকালে প্রখর উত্তাপ; নিদাঘের সঙ্গে সঙ্গে মৌসম বায়ু আসিয়া উপস্থিত হয়; অবিরাম বৃষ্টি হয়; নদনদী, জলে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। শরৎকাল, শুষ্কতা ও উত্তাপ আনয়ন করে; ভিজা মাটি হইতে বাষ্পাদি উত্থিত হইয়া জ্বর-রোগ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করে। এখানকার জীবজন্তু ও তরুলতাদি মালাই দেশের ন্যায়।

এই উর্ব্বর দেশে কিন্তু দৌর্ব্বল্যজনক জলবায়ুর মধ্যে অবস্থিত লোকেরা সভ্যভব্য হইবে, কৃষিরত হইবে, কল্পনা-প্রবণ হইবে, সংসারকে দুঃখময় বলিয়া অনুভব করিবে, কোন দারুণ উৎকট চেষ্টা অথবা দীর্ঘকালস্থায়ী চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে।

তারপর, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সাধারণ ব-দ্বীপ—বঙ্গদেশ; তাহার সহিত মহানদীর ব-দ্বীপ উড়িষ্যাকে যুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই দুই নদীকর্ত্তৃক কর্দ্দম আনীত হওয়ায়, এই প্রদেশের ভূমি যার-পর-নাই উর্ব্বরা হইয়াছে। গ্রীষ্মদেশসুলভ অরণ্য:—বটবৃক্ষ যাহার শাখা হইতে শিকড় নামে, বাঁশগাছ, ঝাল মসলার গাছ, বিবিধ লতা। বানর, টিয়া, ব্যাঘ্র, অজাগর সর্প, গণ্ডার, হাতী। পর-পর বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণে পরাভূত হইয়া কতকগুলি জাতি এই বাঙ্গালায় আসিয়া আশ্রয় লইবে, সমুদ্র তাহাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করিবে, অরণ্য তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে। আবার বিজয়ীদিগেরও যোদ্ধৃসুলভ গুণগুলি শীঘ্র নষ্ট হইবে, কেবলমাত্র বেহারের হীনবীর্য্য লোকেরাই তাহাদের প্রতিবেশী হইবে; তাহাদের পরিশ্রম করিবার আগ্রহও চলিয়া যাইবে; যে ভূমি অতিমাত্র উর্ব্বরা সেখানে কর্ষণ অনাবশ্যক; এবং জঙ্গল নদীর বন্যা, শঙ্কটাবহ সাগর-কূল—এই সমস্ত বাণিজ্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। কিন্তু লোকের অলস জীবন, কতকগুলি মনোবৃত্তিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবে। যথা:—কল্পনা, বাগ্মিতা, স্মৃতি, এরূপ বুদ্ধি যাহার গভীরতা নাই, এবং পরে কতকগুলি নৈতিক গুণও স্ফূর্ত্তি পাইবে; যথা সৌম্যতা, নম্যতা ও চতুরতা।

২

অন্তর্মধ্যবর্ত্তী-ভারতের অন্তর্গত প্রথমে সেই ত্রৈকোণিক মালভূমি—সেই বিন্ধ্যাচল: ইংরাজেরা ইহাকে মধ্য ভারত বলিয়া অভিহিত করে। এই মালভূমি বন্য জাতিদিগের আশ্রয়-স্থল হইবে। ইহার স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, ও জীবিকার কঠোরতা নিবন্ধন, বিজয়ী মেষপালক ও যোদ্ধৃগণ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। সামন্ত-তন্ত্র স্থাপনের পক্ষে পর্ব্বতাদি বড়ই অনুকূল, তাই আভিজাতবর্গ রাজস্থানের বালুকাময় ছোট ছোট পাহাড়ের উপরে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

* * *

তা ছাড়া, গুজরাট্‌ও অন্তর্মধ্যবর্ত্তী ভারতের অন্তর্ভূত, এই প্রদেশটি সমুদ্রকূলের মধ্য-মালভূমি ও কাথেওয়ারের উপদ্বীপ—এই দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত। এই প্রদেশের ভূমি বেশ উর্ব্বরা, সাগর-বায়ুর প্রভাবে ইহার আব্-হাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, ইহার উপকূলে কতকগুলি ভাল ভাল বন্দর আছে; সুতরাং এখানকার লোকেরা কৃষক, নাবিক ও বণিক হইবে।

৩

ভারতবর্ষ একটি ত্রৈকোণিক উপদ্বীপ, ইহা দক্ষিণ-ভারতে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই দাক্ষিণ-ভারত দাক্ষিণাত্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে এই দক্ষিণ-ভারত একটি মালভূমি, ইহার উত্তরে বিন্ধ্যাচল; উত্তর ও পশ্চিমে ঘাট পর্ব্বতশ্রেণী। এই মালভূমি অত্যন্ত শুষ্ক ও উষ্ণ, কেবল যেখান দিয়া গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদী প্রবাহিত—সেই পূর্ব্বদিকভাগে এরূপ নহে; এখানকার দরিদ্র অধিবাসীরা দস্যু কিংবা সৈনিক হইবে।

* * *

ঘাট পর্ব্বত ও সমুদ্র—এই দুয়ের মধ্যে, দীর্ঘ উপকূলের রেখা চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব উপকূলটি বেশী বিস্তৃত ও বেশী উর্ব্বরা; বিশেষত দক্ষিণ উপকূলটি কৃষকদিগের বাসযোগ্য স্থান; সুতরাং এই উপকূলে একটি গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার উদয় হইবে; কিন্তু এই সভ্যতা, আব্-হাওয়ার উপর, ও বাহ্যপ্রকৃতির উপর নির্ভর করিবে। এখানকার আব্-হাওয়া ও বাহ্যপ্রকৃতি, নিরক্ষ-অঞ্চলের আব্-হাওয়া ও বাহ্যপ্রকৃতির ন্যায়।

পশ্চিম উপকূলটি অতি সংকীর্ণ। অনেক জায়গায়, খাড়া-পর্ব্বত সকল সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে এবং এই অঞ্চলটি খণ্ড খণ্ড হইয়া এক একটি স্বতন্ত্র জনপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাল ভাল বন্দরগুলির মুখ পশ্চিমাভিমুখে; মৌসম-বায়ু নিয়মিত রূপে প্রবাহিত হওয়ায়, বৎসরের কিয়দংশ সময়, নৌ-চালনের বেশ সুবিধা হয়। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী এশিয়া, আফ্রিকা ও য়ুরোপের জাহাজ-সকল এই সব বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

* * *

বর্ষীয় (Continental) ভারত, বিন্ধ্যাচলের দ্বারা পৃথক্‌কৃত হইয়াছে, সুতরাং উপদ্বীপীয় (Peninsular) ভারতে যে জাতি ও যে সভ্যতার উদয় হইবে তাহা একটু বিশেষ-ধরণের। যেমন একদিকে বহির্জগতের সহিত সংস্রব না

থাকায় হিন্দুস্থানের উপর বহিঃশত্রুর আক্রমণের নিত্য আশঙ্কা থাকিবে, তেমনি আবার সর্ব্বপ্রকার আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত হওয়ায়, দাক্ষিণাত্য স্বকীয় বন্দরগুলির দ্বারা সামুদ্রিক সভ্যতা লাভ করিবে—যদিও দাক্ষিণাত্যের আব্-হাওয়া খুবই গরম, কর্ষণ-যোগ্য ভূমিও খুব সংকীর্ণ। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাক্ষিণাত্য মুখ্য স্থান অধিকার না করিয়া শুধু একটা গৌণ স্থান অধিকার করিবে

৪

ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান হইতে ভারতবাসীদিগের অন্তঃপ্রকৃতি ও চরিত্র সম্বন্ধেও কতকগুলি গোড়ার কথা পাওয়া যায়।

আর কোন দেশে, বাহ্যপ্রকৃতি এরূপ বিরাট্ নহে—এরূপ ভীষণ নহে। ভারতের আকাশে, এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়, যথা:—সূর্য্যের প্রখর তেজ, মৌসম-কালের ঝড়, বৃষ্টির জলে পুষ্ট হইয়া নদীজলের ভয়ানক বৃদ্ধি। (আসামের উত্তর ভাগে বর্ষায় তিন মাস যেরূপ বৃষ্টি হয়, আমাদের Champagne প্রদেশে অর্দ্ধশতাব্দীতেও সেরূপ হয় না।) তার পর, ঘূর্ণী-ঝড়; ১৮৭৪ অব্দে এই ঝড়ে দুই লক্ষ মনুষ্য কালগ্রাসে পতিত হয়।

ভূমির গঠন:—হিমালয় পর্ব্বত, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, ও সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। মেঘনা-নদী—যেখানে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা আসিয়া মিশিয়াছে তাহার বিস্তার ২০ kilometre পরিমাণ।

গাছপালা:—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তালজাতীয় বৃক্ষ; এমন বৃহৎ বটগাছ—যাহার তলায় একটা সমগ্র সৈন্যমণ্ডলী আশ্রয় লইতে পারে; বড় বড় লতা-গাছের জঙ্গল।

জীবজন্তু:—হস্তী, গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র, বানর, বড় বড় মহিষ, অজাগর, মারাত্মক বিষদংষ্ট্র সর্প।

এইরূপ বাহ্যপ্রকৃতি হইতে অসম্ভব কল্পনা প্রসূত হইবারই কথা;—এরূপ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইবার কথা, যাহার মধ্যে নানাপ্রকার ভীষণ ও অতিপ্রাকৃত মত ও বিশ্বাসের সমাবেশ আছে।

তা ছাড়া ভারতের বাহ্যপ্রকৃতি, লোকের মনে একটা শৃঙ্খলার ধারণা জন্মাইয়া দেয়। এই উপদ্বীপের আকার প্রায় ত্রৈকোণিক। হিমালয়কে দেখিলে যেরূপ বৃহত্ত্বের ভাব, যেরূপ অনাড়ম্বর সরলতার ভাব মনে আইসে, এমন আর কিছুতে আইসে না। ঘাট-শৈলের গাত্রে যেন কতকগুলা সোপান-ধাপ খোদিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শরৎ, শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম—এই ঋতুগুলি যথাসময়ে নিয়মিতরূপে আবির্ভূত হয়। গ্রীষ্মকালে, নিত্য জলবর্ষণ হইয়া থাকে। শীতকালে, উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে, এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। প্রথম মৌসম-বায়ু কেবল করমণ্ডল-উপকূলে বৃষ্টি ও ঝড় আনয়ন করে; দ্বিতীয় মৌসমে, ভারতের অন্যান্য অংশে ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সমস্ত হইতে, ভারতবাসীদিগের মনে একটা শ্রেণীবন্ধনের ভাব আসিয়াছে, ইহার সহিত, আব্-হাওয়া-জনিত অবসাদ-দৌর্ব্বল্যও বেশ খাপ্ খায়।

উদ্ভট কল্পনা ও শ্রেণীবন্ধনের (classification) ভাব—এই দুইটি মিলিত হইয়া ভারতবাসীদিগকে যে মানস-প্রকৃতি প্রদান করিয়াছে তাহা একটু বিশেষ ধরণের; তাহারা যে সভ্যতা উত্তরোত্তর সকল জাতির মধ্যে—এমন কি, খুব নীচ জাতিদিগেরও মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহারা যে সভ্যতা এমন সকল জাতিরদিগের মধ্যেও প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, যাহারা নিজের আচার-ব্যবহার, নিজের ধর্ম্ম সঙ্গে করিয়া ভারতে আসিয়াছিল—সেই অপূর্ব্ব সভ্যতার মৌলিকতার মধ্যে উপরি-উক্ত মানস-প্রকৃতির লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এস !

বন-পল্লবে ঘন করি' দিয়ে এস বসন্ত বায়!
পুলকাঞ্চিত করি' ধরণীরে এস লঘু দ্রুত পায়।
এস চঞ্চল! এস প্রসন্ন!
পূর্ণ কর গো যা' আছে শূন্য,
সৌরভে, রসে, সুপ্ত হরষে ভরি' দেহ চেতনায়।
কোকিল-কণ্ঠে এস হে রঙ্গে,
এস তরঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে,
হরিতে, স্বর্ণে, তরুণ বর্ণে, সুখ-ভরা সুষমায়

এস অন্তরে, এস হে হাসিতে,
সন্ধ্যা উষার পুষ্প-রাশিতে,
অঞ্চলখানি দীপে দীপে হানি' সঞ্চর জোছনায়।
এস যৌবনে হে চির-কিশোর!
এস মম চিতে ওগো চিত-চোর!
নব-রবি-তাপে এস গো পান্থ নব-কিশলয়-ছায়।
এস পরিচিত পরশের মত,
সুখ-স্বপনের হরষের মত,
আঁখি-পল্লবে চুম্বন দিয়ে যেয়ো যেথা মন চায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন

সপ্তম ভাগ

সিদ্ধ মকরধ্বজ।

প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসমূহে এই সিদ্ধ মকরধ্বজের কোথাও উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। অথচ প্রায় প্রত্যেক কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ-তালিকায় উহা স্থান পাইয়াছে। যদি অনুগ্রহ করিয়া কোন মহোদয় সিদ্ধ মকরধ্বজ কোন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে বলিয়া দেন তাহা হইলে অত্যন্ত বাধিত হইব। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের তালিকাপুস্তক হইতে জানা যায় যে এই মকরধ্বজও স্বর্ণঘটিত এবং এই মকরধ্বজ প্রস্তুতকালে সাধারণ পারদ ব্যবহার না করিয়া শত বা সহস্রপুটিত পারদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার জন্য শত বা সহস্রপুটিত পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণ মিলাইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করা হয় ও পরে ঊর্দ্ধপাতনের দ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। অপর একজন কবিরাজের তালিকাপুস্তক হইতে এইরূপ অনুমিত হয় যে শত বা সহস্রবার পুনঃপুনঃ গন্ধক দিয়া পুনঃপুনঃ ঊর্দ্ধপাতিত করিয়া এই মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই মকরধ্বজের মূল্য সাধারণ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজের মূল্যাপেক্ষা অনেকগুণ বেশী—ইহার মূল্য সেরকরা ৬৪০০৲ টাকা।

রাসায়নিক পরীক্ষার ফল—দেখিতে ঠিক রসসিন্দুরের মত, কোনও পার্থক্য অনুভূত হয় না। চক্‌চকে ঈষৎ লাল দানাদার।

স্বর্ণ.....................নাই

অসংযুক্ত গন্ধক..........নাই

গন্ধক*............(১) ১৩·৪৫ (শতকরা)... প্রথম পরীক্ষা

(২) ১৩·৬২　　„　　...দ্বিতীয় পরীক্ষা

রসসিন্দুরের গন্ধকের পরিমাণ শতকরা ১৩·৭৯ ভাগ।

উপরোল্লিখিত রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইতে দেখা যাইতেছে যে সিদ্ধ মকরধ্বজ এবং রসসিন্দুর একই পদার্থ। আর ঐরূপ হওয়াই সম্ভব। শতবার বা সহস্রবার মারিত বা পুটিত পারদ পরীক্ষা করি নাই, তবে পারদকে গন্ধকের দ্বারাই মারিত ও পুটিত করা হয়।

"দ্বিপলং শুদ্ধসূতস্য সূতার্দ্ধং গন্ধকং তথা। কন্যানীরেণ সংমর্দ্দ্য দিনমেকং নিরন্তরং। রুদ্ধা তত্তুধরে যন্ত্রে দিনৈকং মারয়েৎ পুটে।" অর্থাৎ "দুই ভাগ পারদ ও একভাগ গন্ধক একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে একদিন নিরন্তর মর্দ্দনপূর্ব্বক মুখ বন্ধ করতঃ ভূধর যন্ত্রে একদিন পুটপাক করিয়া লইলে পারদ মারিত হয়"।—রসেন্দ্রসারসংগ্রহ পৃঃ ১৩ (কালী প্রসন্ন কবিশেখরের সংস্করণ)।

এইরূপে পুটিত বা মারিত পারদ অবিশুদ্ধ কালো মারকিউরিক্ সল্‌ফাইড্‌ই (impure black murcuric sulphide) হইবে। এইরূপে বার বার গন্ধক দিয়া পারদ পুটিত হইলেও তাহা মারকিউরিক্ সল্‌ফাইড্‌ই থাকিয়া যাইবে। পরে ঐ পুটিত পারদ পুনরায় গন্ধকের সহিত কজ্জলাকৃত এবং ঊর্দ্ধপাতিত হইলে ঊর্দ্ধপাতিত মারকিউরিক্ সল্‌ফাইড (resublimed mercuric sulphide) বা রসসিন্দুরেই পরিণত হইবে। মকরধ্বজে স্বর্ণের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে উহা এখানে পরিত্যক্ত হইল।

কবিরাজ মহাশয়েরা তিনপ্রকার ঊর্দ্ধপাতিত মারকিউরিক্ সল্‌ফাইড্ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন—রসসিন্দুর, ষড়্‌গুণবলিজারিত স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, এবং স্বর্ণঘটিত সিদ্ধ মকরধ্বজ। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে এই তিনপ্রকার দ্রব্য ভিন্ন পদার্থ নহে—এতাবৎকাল রাসায়নিক বিশ্লেষণ না করাতে ইহারা ভিন্ন পদার্থ বলিয়া

---

* গন্ধকের পরিমাণ দুইটি পরীক্ষায় Corius' methodএ করা হইয়াছিল।

পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের দানাদার আকার এক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই তিনপ্রকার মকরধ্বজ যে অভিন্ন পদার্থ এ ধারণা যদি দেশ অচিরেই গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। আজ হউক, দুইদিন পরেই হউক সত্যের জয় অবশ্যই হইবে।

সে দিবস আমার একজন ছাত্র বড় হাসাইয়াছিল। সে আসিয়া বলিল "সার, এমন হইতে পারে যে রসসিন্দুর ও স্বর্ণসিন্দুর টার্টারিক বা ল্যাক্‌টিক আসিডের (tartaric or lactic acid) মত দুই stereo-isomeric রূপান্তরিত দ্রব্য।" আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানে asymmetric carbon-অণু কোথায়?" তাহার উত্তরে ছাত্রটি বলিল "কেন, গন্ধকঅণুও asymmetric হইতে পারে?" আমি তাহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "বলি এখানে প্রথম asymmetryই কোথায়, এক অণু পারদ আর এক অণু গন্ধকের সহিত মিলিত—asymmetry আসিবে কোথা হইতে?" পরে উচ্চ হাস্যে গুরু শিষ্যের বিবাদ মিটিয়া গেল।

মদ্যবর্গ।

বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতে মদ্য প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। ঋকবেদে যে সকল সোমের প্রতি মন্ত্র আছে তাহা আলোচনা করিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বৈদিক কালে সোমরস, সুরা (fermented liquor) রূপে পান করা হইত না, এখন লোকে যেমন দুগ্ধ ও চিনি মিশাইয়া সিদ্ধি পান করে সেইরূপে তাহা পান করা হইত। ঋকবেদের নবম মণ্ডলের ৬৬ সূক্তে সোমরস প্রস্তুত করিবার সমস্ত পদ্ধতিই উল্লিখিত হইয়াছে। উহা পাঠে জানা যায় যে—

"সোম লতারূপে থাকে, তাহার দুইটী পত্র বক্রভাবে অবস্থিত থাকে (২ ঋক)। প্রস্তর দ্বারা সেই লতা নিষ্পীড়িত হইলে (৭ ঋক) পরে রমণীগণ অঙ্গুলী দ্বারা তাহা চটকাইয়া রস বাহির করে (৮ ঋক)। পরে সেই রস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া মেষলোম-নির্ম্মিত পবিত্র অর্থাৎ চাঁকনি দ্বারা ছাঁকা হয় (৯ ঋক)। সেই চাঁকনি কলসের মধ্যে স্থাপিত হয়, অঙ্গুলী দ্বারা উপরের রস সঞ্চালিত করা হয়, সুতরাং ছাঁকা শোধিত রস কলসের ভিতর পড়ে (১০.১১,১২ ঋক)। সেই ছাঁকা শোধিত রস ক্ষীর বা দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করা হয় (১৩ ঋক)। ক্ষরণশীল সোমরস শুভ্রবর্ণ (২৪ ঋক)। অথবা ঈষৎ হরিতবর্ণ বা পিঙ্গল বর্ণ বলিয়াও কোন কোন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। গো চর্ম্মের পাত্রে এই সোমরস স্থাপিত হয় (২৯ ঋক)।—ঋগ্বেদ সংহিতা (রমেশচন্দ্র দত্ত)—৯ মণ্ডল, ৬৬ সূক্ত।

সোমলতার (Asclepeas Acida or Sarcoshema Viminalis) নিজের কোনও মাদকতা গুণ নাই, অথচ ঋকবেদের অনেক স্থানে সোমরসের মাদকতার উল্লেখ দেখা যায়। তাহা হইলে সোমরসে এই মাদকতা কিরূপে আনয়ন করা হইত? ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অতি সুন্দরভাবে ভারতে মদ্যব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে সোমরস প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা হইত। সোমলতার রস বাহির করিয়া তাহার সহিত জল মিশান হইত। পরে তাহার সহিত যবের গুঁড়া, ঘৃত, বনজাত ধান্য মিশাইয়া নয় দিবস কলসী মধ্যে রাখিয়া মাতাইয়া লওয়া হইত।* এইরূপ পচনক্রিয়ার (fermentation) দ্বারা সুরা উৎপন্ন হইবে এবং এই সুরা সোমরসের মাদকতার কারণ।

সুরা প্রস্তুতের রাসায়নিক ক্রিয়া আলোচনা করিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে যে সুরা প্রস্তুত করিবার জন্য যব, চাউল, আলু প্রভৃতি শ্বেতসার (Starch) যুক্ত দ্রব্য বা ইক্ষুরস, মধু, গুড়, দ্রাক্ষারস প্রভৃতি শর্করা (Sugar) সংযুক্ত দ্রব্যের প্রয়োজন। যব ভিজাইয়া পরে শুষ্ক করিয়া কিছুদিন রাখিলে তাহাতে স্বতঃই এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকে diastase বলে। এই পদার্থের গুণ হইতেছে যে ইহার অতি অল্প পরিমাণ অংশ অধিক পরিমাণ শ্বেতসারকে শর্করায় পরিণত করিতে পারে। পরে এই পচনীয় শর্করা (fermentable sugar) মাতিয়া সুরা (alcohol) উৎপন্ন করে এবং সেই সঙ্গে কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস বাহির হয়। পূর্ব্বোক্ত সোমরসপ্রস্তুত বিধিতে ভিজান যবের গুঁড়া হইতে diastaseএর উৎপত্তি হয় এবং উহা ধান্যের শ্বেতসারকে শর্করায় পরিণত করে। পরে কিছু দিবস রাখিয়া দিলে এই শর্করা হইতে বায়ুমণ্ডলস্থিত জিবাণু দ্বারা সুরা উৎপন্ন হয়। সোমরস

* R. L. Mitra's Indo-Aryans, Vol. I, P. 419

হয়ত এই রাসায়নিক ক্রিয়ার সহায়তা করে বা উৎপন্ন সুরার আস্বাদন পরিবর্ত্তিত করে।

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংহিতা, সূত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, কাব্য, তন্ত্র প্রভৃতি নানা গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন যে ভারতে সুরার ব্যবহার বৈদিক যুগ হইতে আবহমানকাল বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল, এমন কি পুরললনাগণও মদ্যপান করিতেন। এ বিষয়ের আলোচনা এ প্রবন্ধের বহির্ভূত বিষয়, যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চাহেন তাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। আমরা সুরা প্রস্তুত বিধি সম্বন্ধে ডাক্তার মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। অন্যতম স্মৃতিকার পুলস্ত ঋষি দ্বাদশ প্রকার মদ্যের উল্লেখ করিয়াছেন * যথা, (১) পানস, (২) দ্রাক্ষা, (৩) মাধুক, (৪) খার্জ্জুর, (৫) তাল, (৬) ঐক্ষব, (৭) মাধ্বীক, (৮) সৈর, (৯) অরীষ্ট, (১০) মৈরেয়, (১১) নারিকেলজ, (১২) সুরা বা পেষ্টী। শেষোক্ত সুরা মদ্য সকলের অধম। এই দ্বাদশপ্রকার মদ্যের প্রস্তুতপ্রণালী ডাক্তার মিত্র মহাশয় মৎস্যসূক্ত তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

পানসমদ্য—অপক্ক পনস (কাঁঠাল), আম্র, কুল একটি কলসীতে রাখিয়া দিবে এবং প্রতিদিন তাহাতে খানিকটা কাঁচা দুগ্ধ ও মাংস দিবে। একদিবস অন্তর তাহাতে পাটশাক ও মিষ্ট লেবু দিবে এবং মাতিয়া উঠিলে চোয়াইয়া তাহার সত্ত্ব বাহির করিয়া লইবে। উহাকে পানসমদ্য বলে।

> অপক্কং পানসঞ্চৈব আমঞ্চ বদরং তথা।
> স্থাপয়িত্বা ঘটে নিত্যং দদ্যাদামপয়ঃ কলম্।
> ত্রৈলোক্যবিজয়াঞ্চৈব মাতুলঙ্গং তথৈবচ।
> সমেঽহনি ততো দদ্যাৎ সন্ধানাৎ সত্ত্বমীরিতম্॥

দ্রাক্ষামদ্য—দ্রাক্ষাফলের (grape) রসের সহিত দধি, ঘৃত মিলাইয়া মাতাইয়া লইবে এবং তাহাতে মঞ্জিষ্ঠা ও চিরাতা দিবে। মঞ্জিষ্ঠার দ্বারা মদ্য রংবিশিষ্ট হইবে এবং চিরাতার দ্বারা ঈষৎ তিক্তরস সংযুক্ত হইবে। আজকাল দ্রাক্ষা ফল হইতে ইউরোপে অধিকাংশ মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

> দধিমধুঘৃতঞ্চাপি মঞ্জিষ্ঠং তিক্তকং তথা।
> অনুপানে তু দেবেশি দ্রাক্ষামদ্যং হুনিশ্চিতম্॥

মাধুকমদ্য—এই মদ্য মধু হইতে প্রস্তুত হয়। মধুর সহিত বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী, লবণ প্রভৃতির সংযোগে মদ্য সুস্বাদু করা হয়।

> বিড়ঙ্গং শালবমূলম্
> মধুনা সহ সংস্থাপ্য কোষে পাকং সমাচরেৎ।
> পিপ্পলী লবণং দত্বা মধুনা মদ্যমীরিতম্॥

খার্জ্জুরমদ্য—পক্ক খর্জ্জুর (খেজুর) এই মদ্যের প্রধান উপাদান। ইহার সহিত কাঁঠাল, আদা ও সোমলতার রস মিলাইয়া পাক করা হয়।

> পনসং পক্কখর্জ্জুরং আর্দ্রং সোমলতারসং।
> একীকৃত্যাগ্নিসন্ধানাৎ খার্জ্জুরং মদ্যমীরিতম্॥

তালমদ্য—পক্কতাল হইতে এই মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। আস্বাদনের জন্য দন্তিশাক, এবং ককুভপত্র ইহাতে মিশ্রিত করা হয়।

> পক্কতালং দন্তিশাকং ককুভঞ্চ তথৈব চ।
> এতৈরেব সুসন্ধানাৎ তালমদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥

ইক্ষুমদ্য—ইক্ষুদণ্ড, মরিচ, কুল এবং দধির সংযোগে মদ্য প্রস্তুত করিয়া শেষে লবণ দিয়া ইক্ষুমদ্য প্রস্তুত হয়।

> ইক্ষুদণ্ডং মরিচঞ্চ বদরঞ্চ তথা দধি।
> শেষে তু লবণং দত্বা ইক্ষুমদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥

মাধ্বীকমদ্য—এই মদ্যের প্রধান উপাদান মৌয়া ফুল। তাহার সহিত পাকা বেল ও শর্করা দিয়া মদ্য প্রস্তুত হইলে তাহাকে মাধ্বীকমদ্য বলে।

> নবং মধু তথা বিল্বং পক্কং শর্করয়া সহ।
> সন্ধানাজ্জায়তে মদ্যং মাধ্বীকং শরতো রসম্॥

টঙ্কমাধ্বীক মদ্য—শতাবরী, টঙ্কমূল, লক্ষণ, পদ্ম এই কয়েকটি দ্রব্য মধুর সহিত মিলাইয়া যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহাকে টঙ্কমাধ্বীক মদ্য কহে।

> শতাবরী টঙ্কমূলং লক্ষণং পদ্মমেব চ।
> মধুনা সহ সন্ধানাৎ টঙ্কমাধ্বীকমীরিতম্॥

মৈরেয়মদ্য—মালুর মূল, কুল এবং শর্করা এই তিন দ্রব্যজাত মদ্যকে মৈরেয় মদ্য বলে।

> মালুরমূলং বদরী শর্করা চ তথৈব চ।
> এষামেকত্র সন্ধানাৎ মৈরেয়ং মদ্যমীরিতম্॥

---

* পানসং দ্রাক্ষামাধুকং খার্জ্জুরং তালমৈক্ষবম্।
মাধ্বীকং সৈরমারীষ্টং মৈরেয়ং নারিকেলজম্॥
সমানানি বিজানীয়াৎ মদ্যানেকাদশৈব তু।
দ্বাদশন্তু সুরামদ্যং সর্ব্বেষামধমং স্মৃতম্॥

গৌড়ীমদ্য—ইহার প্রধান উপাদান গুড়। ইহার অন্য অন্য উপকরণ দধি, পাটশাক, এবং করীকণা নামক ভেষজ।

দধি ত্রৈলোক্যবিজয়া তথৈব ৫ করীকণা।
গুড়েন সহ সন্ধানাৎ গৌড়ীমদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥

নারিকেলজমদ্য—নারিকেলের জল ইহার প্রধান উপাদান। ইন্দ্রজিহ্বা, পক্ক ধাত্রীফল এবং পক্ক কদলী ইহার অপর অপর উপকরণ।

ইন্দ্রজিহ্বা পক্কধাত্রী নারিকেলজলং তথা।
কদলীফল সন্ধানাৎ মদ্যং তন্নারিকেলজং॥

জৈষ্টীমদ্য—অর্দ্ধ সিদ্ধ চাউল, যব, মরিচ, লেবুর রস, আদা ইহার উপকরণ। যব এবং চাউল গরম জলে দুই দিবস সিদ্ধ করিবে, পরে অন্য অন্য উপকরণ মিলাইয়া মাতাইয়া এবং চোয়াইয়া লইলে জৈষ্টীমদ্য প্রস্তুত হয়।

শস্কুলীমর্দ্ধসিদ্ধান্নমুষ্ণোদকসমন্বিতম্।
বহ্নৌ সন্তাপয়েৎ কিঞ্চিৎ স্থাপয়িত্বা দিনদ্বয়ম্॥
শেষেঽহনি তু সম্প্রাপ্তে জীবনং তত্র নিক্ষিপেৎ।
শৃঙ্গবেরং মরিচঞ্চ মাতুলঙ্গং তথৈবচ।
এতেষামেব সন্ধানাৎ জৈষ্টীমদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥

এই দ্বাদশ প্রকার মদ্য ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার মদ্য ব্যবহৃত হইত। সুশ্রুত বিংশতি প্রকার মদ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল মদ্যই শ্বেতসার বা শর্করাযুক্ত পদার্থকে মাতাইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ডাক্তার মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন যে এই সকল মদ্য প্রথমে পচনক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত (Fermented) করা হইত ও পরে চোয়াইয়া (Distilled) লওয়া হইত। কিরূপ যন্ত্রে প্রথমে চোয়ান হইত এবং পরবর্ত্তীকালের তির্য্যকপাতন, বারুণী এবং নাড়িকা যন্ত্র কিরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার সন্ধান পাইলে আয়ুর্ব্বেদের যন্ত্রপরিচয়ের এক অধ্যায় সুস্পষ্ট হইবে।

ইউরোপের মদ্যপ্রস্তুত-বিধিও বহুপ্রাচীন। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে, হোমারের কবিতায় মদ্যের উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়া মিশরবাসী, গলবাসী (Gauls), জার্ম্মান্স (Germans) প্রভৃতি প্রাচীন জাতিবৃন্দ মদ্যের আস্বাদন জানিতেন। তাঁহারা শ্বেতসারসংযুক্ত শস্য বা শর্করাসংযুক্ত মধু হইতে মদ্য প্রস্তুত করিতেন। বারান্তরে তির্য্যকপাতনের ইতিহাস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব।

বংশলোচন।

বংশলোচন কোন্ সময়ে আয়ুর্ব্বেদে গ্রহণ করা হইয়াছিল ঠিক নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই দ্রব্য বাঁশের মধ্যে ছোট ছোট আকারে কখন কখন এক ইঞ্চি লম্বা খণ্ডে জন্মিয়া থাকে। কখন কখন মরা পোকা ইহার সহিত মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। ইংরাজীতে ইহাকে Bamboo Manna, অর্থাৎ বংশশর্করা বলা হয়। কিন্তু ইহা আদৌ মিষ্ট নহে। সম্পূর্ণ স্বাদবর্জ্জিত, দেখিতে ধবধবে সাদা। ইহার উপাদান প্রধানতঃ বিশুদ্ধ সিলিকা (Silica), ইহার সঙ্গে অল্প পরিমাণে সোডা ও চুণ পাওয়া যায়।

বংশশর্করা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বংশলোচন স্বাদবর্জ্জিত সিলিকা, আসল Bamboo Manna নহে। বংশশর্করা অর্থাৎ আসল Manna বংশদণ্ডের ভিতর জন্মায় না, উহার ত্বক হইতে বাহির হয়। সংস্কৃতে ঐজন্য উহাকে "ত্বকক্ষীর" বলা হয়। প্লিনী ও ডাইওস্‌কোরাইডিস (Pliny and Dioscorides) এক প্রকার দ্রব্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহার নাম Sacchoron, or a kind of concrete honey found in India and Arabia Felix, in consistence like salt and brittle between the teeth like salt", সম্প্রতি সেন্‌ট্রাল প্রভিন্স (Central Provinces) হইতে লাউরি সাহেব আসল বংশশর্করা আবিষ্কার করিয়াছেন।* ঐ শর্করা বংশদণ্ডের গাত্রে সাদা আটার মত লাগিয়া ছিল। মাটি হইতে পাঁচ ফুট পর্য্যন্ত উহা বংশদণ্ডের গাত্রে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার উর্দ্ধে ঐ পদার্থ আদৌ ছিল না। লাউরি সাহেব বংশদণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে তাহাতে পোকায় খাওয়ার কোনরূপ চিহ্ন ছিল না। তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে বংশদণ্ড হইতে রস বাহির হইয়া বাহিরে জমিয়া শর্করায় পরিণত হইয়াছে। এই শর্করার একটিন তিনি হুপার সাহেবের নিকট পরীক্ষার্থ

* Agricultural Ledger, 1900, No. 17—Bamboo Manna by D. Hooper.

পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। খাইতে চিনির মত মিষ্ট। হুপার সাহেব রাসায়নিক পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ফল পাইয়াছেন।

জল	২·৬৬
দ্রাক্ষাশর্করা (Grape Sugar)	০·৭৫
ছাই (Ash)	০·৯৬
শর্করা (Sugar)	৯৫·৬৩
	১০০·০০

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে এই পদার্থ প্রায় বিশুদ্ধ চিনি এবং ইহা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে।

স্রোতোঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন ও রসাঞ্জন।

সুশ্রুত অঞ্জনাদি গণের মধ্যে সৌবীরাঞ্জন ও রসাঞ্জনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুই অঞ্জন ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার অঞ্জনের প্রয়োগ আয়ুর্ব্বেদে দৃষ্ট হয়; যথা—স্রোতোঞ্জন, পুষ্পাঞ্জন। পুষ্পাঞ্জন যে কি পদার্থ তাহা অধুনা নির্ণয় করা যায় না। অপর তিনটি অঞ্জন এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্রোতোঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন ঠিক কোন পদার্থের নাম সে সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে মতভেদ দৃষ্ট হয়। মদনপাল অনুসারে "সৌবীরাঞ্জনং কৃষ্ণং"। কিন্তু ভাবপ্রকাশ ঠিক তাহার বিপরীত লিখিতেছেন "তত্তু স্রোতোঽঞ্জনং কৃষ্ণং সৌবীরং শ্বেতমীরিতম্"। ডাঃ উদয়চন্দ্র দত্ত মহাশয় মদনপালের অনুবর্ত্তী হইয়া সৌবীরাঞ্জনকে কৃষ্ণসুর্ম্মা আখ্যা দিয়াছেন এবং স্রোতোঞ্জনকে শ্বেতবর্ণ বলিয়াছেন।* অধ্যাপক রায় মহাশয় কোনও রূপ সন্দেহ না করিয়া তাঁহার গ্রন্থে ডাক্তার দত্তের মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভাবপ্রকাশে ঠিক বিপরীত মত দৃষ্ট হয়।

রাসায়নিক পরীক্ষা।

সৌবীরাঞ্জন—মদনপাল ও ভাবপ্রকাশের মধ্যে মতভেদ দেখিয়া কবিরাজ মহাশয়েরা কোন্ দ্রব্য সৌবীরাঞ্জন বলিয়া ব্যবহার করেন তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কলিকাতার দুইটি বিখ্যাত ঔষধালয় হইতে নমুনা আনয়ন করা হয়। দুইটিই শ্বেতবর্ণের গুঁড়া। পরীক্ষায় জানা গেল দুইটিই এন্টিমনি অক্সাইড (oxide of antimony)। ডাক্তার দত্ত বোধ হয় সুর্ম্মা পরীক্ষা করিয়াই লিখিয়াছেন যে সৌবীরাঞ্জন কৃষ্ণবর্ণ এবং উহা লেড্ সল্‌ফাইড (sulphide of lead)। সুর্ম্মা সংস্কৃত কথা নহে এবং তাহার পরীক্ষার দ্বারা সৌবীরাঞ্জনের নির্দ্দেশ হইতে পারে না। কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয় ডাক্তার দত্তের গ্রন্থ সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতেও সৌবীরাঞ্জনকে কৃষ্ণসুর্ম্মা বলা হইয়াছে কিন্তু তাঁহার নিজের ঔষধালয়ের তালিকায় সৌবীরাঞ্জনকে শ্বেত-সুর্ম্মা ও স্রোতোঞ্জনকে কৃষ্ণসুর্ম্মা বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন।

স্রোতোঞ্জন—ডাঃ দত্ত লিখিয়াছেন যে স্রোতোঞ্জন শ্বেতবর্ণ এবং তিনি হিন্দুস্থানী ঔষধ বিক্রেতাদিগের নিকট নমুনা লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উহা দানাদার কেল্‌সিয়াম্ কার্ব্বনেট (Iceland Spar)। আমি কবিরাজ মহাশয়দের নিকট হইতে নমুনা আনাইয়া দেখিলাম যে স্রোতোঞ্জন কৃষ্ণবর্ণ ও উহা লেড্ সল্‌ফাইড্ (lead sulphide)। তবেই দেখা যাইতেছে যে বঙ্গদেশে কৃষ্ণসুর্ম্মাকে সৌবীরাঞ্জন বলা হয় না, উহা স্রোতোঞ্জন নামে অভিহিত। নামের গোলমাল ছাড়িয়া দিলেও বঙ্গদেশে যে শ্বেতবর্ণ অঞ্জন ব্যবহৃত হয় তাহা এন্‌টিমনি অক্‌সাইড, কিন্তু ডাক্তার দত্তের মতে পশ্চিম অঞ্চলে Iceland Spar শ্বেতসুর্ম্মা বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রসাঞ্জন—রসাঞ্জনের বস্তু নির্দ্দেশ লইয়াও এইরূপ মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। ভাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে দারুহরিদ্রার কাথ ও দুগ্ধ সমভাগে পাক করিয়া পাদাবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে সেই ঘনীভূত দার্ব্বীকাথকে রসাঞ্জন কহে, উহা চক্ষুর পক্ষে অত্যন্ত হিতকর।* অথচ কবিরাজ মহাশয়েরা পূর্ব্বোক্ত লেড্ সল্‌ফাইড্ অর্থাৎ কৃষ্ণসুর্ম্মাকেই রসাঞ্জন বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমি রসাঞ্জন বলিয়া যাহা নমুনা পাইয়াছি তাহাও লেড্ সল্‌ফাইড্

* Dutt: Materia Medica of the Hindus, p. 74.

* দার্ব্বীকাথসমং ক্ষীরং পাদম্পক্বা যথাঘনম্
তদা রসাঞ্জনাখ্যন্তং নেত্রয়োঃ পরমং হিতম্।—ভাবপ্রকাশ, প্রথম ভাগ, ২৯৪ পৃঃ।

(কৃষ্ণসুর্ম্মা)। ডাক্তার দত্ত লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালার কবিরাজ মহাশয়েরা রসাঞ্জন অর্থে কৃষ্ণসুর্ম্মা বুঝিয়া থাকেন কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে রসোত অর্থাৎ উক্ত দারুহরিদ্রার কাথকেই রসাঞ্জন বলিয়া ব্যবহার করা হয়। তাহার কারণ তিনি বলিয়াছেন যে এই দারুহরিদ্রা হিমালয় অঞ্চলে পাওয়া যায়, সেই জন্য বাঙ্গালার কবিরাজবৃন্দের পক্ষে উহা দুষ্প্রাপ্য।* তবেই দেখুন যে ঠিক বস্তুনির্দ্দেশ না হইলে অনেকস্থলে কিরূপ বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়—কোথায় দারুহরিদ্রার কাথ আর কোথায় কৃষ্ণসুর্ম্মা।

* Dutt: Materia Medica of the Hindus, p, 107.

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

ইতর জীব কি মানুষ অপেক্ষাও পেটুক ?

কাহাকেও অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজন করিতে দেখিলে আমরা শূকর, গ্লাটোন্ অথবা অন্য কোনো পেটুক জানোয়ারের সঙ্গে তাহাদের তুলনা করি। কিন্তু তুলনাটা কতদূর ঠিক হয় তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। কথা প্রসঙ্গেও "হাঁসের ন্যায় নির্ব্বোধ", "বাদুরের ন্যায় অন্ধ", "শশকের ন্যায় ভীরু", প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে এইসকল কথার কোনোটাই ঠিক নহে। ভোজন বিষয়ে জীবজন্তুদের উপর আমরা যে এই অপবাদটি আরোপ করিয়া থাকি তাহা কতদূর ন্যায়সঙ্গত অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। একজন সাধারণ মানুষ যাহা খায় অনেক জন্তু তদপেক্ষা বেশী খায় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু এই কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে মানুষ অপেক্ষা পেটুক বলা যায় না। কারণ, সাধারণতঃ লোক-লজ্জা অথবা হজমশক্তির অভাবে, উদরে যে পরিমাণ ধরিতে পারে আমরা তাহা অপেক্ষাও অনেক কম খাই। সেইজন্য সাধারণ লোকের সঙ্গে তাহাদের তুলনা না করিয়া, আমাদের মধ্যে যাহাদের পেটুক বলিয়া খ্যাতি আছে এরূপ লোকের সঙ্গে তুলনা করিলে তাহাদের প্রতি সুবিচার করা হইবে।

ভোজনের প্রণালীর হিসাবে আমাদের সঙ্গে প্রাণীদের অনেক পার্থক্য আছে। চেষ্টা করিলেই আমরা আমাদের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারি এবং সঞ্চিত রাখিয়া ইচ্ছামত গ্রহণ করিতে পারি। সেইজন্য আমরা দৈনিক আহারকে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে ভাগ করিয়া লইতে পারিয়াছি। তেমন ক্ষুধা না পাইলেও নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহারে বসিতে আমরা ভুলি না। কিন্তু মানবেতর প্রাণীদের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবার সুবিধা না থাকায় তাহাদের আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না; কাজেই যখনই তাহারা আহার্য্য পায় তখনই খায়। কেবল কোনো কোনো সরীসৃপকে অনেক দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে দেখা যায়। নিজের মনোমত খাদ্যদ্রব্যের অভাবই ইহার প্রধান কারণ।

আহার সম্বন্ধে জীবজন্তুকে দুই প্রকারে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। এক আহার্য্যের পরিমাণ অনুসারে, অপরটি তাহাদের বিশেষ বিশেষ খাদ্যের প্রতি পক্ষপাতিতা অনুসারে। যেসকল জন্তু অধিক পরিমাণে আহার করে এবং বিশেষ বিশেষ আহার্য্যের প্রতি পক্ষপাতী, মানুষ তাহাদেরই মধ্যে। ইংলণ্ডের একজন রাজা কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে লাম্প্রে মাছ ভক্ষণ করিয়া মারা পড়েন। আমাদের দেশেও পেটুক লোকের অভাব নাই। এমনও দুই একটি লোকের নাম পাওয়া গিয়াছে যে একটি পূর্ণবয়স্ক হস্তীর দেহের সহিত তাহাদের দেহের অনুপাতে হস্তীর আহার অপেক্ষা তাহাদের আহারের পরিমাণ অনেক বেশী। এইরূপ লোককে "গ্লাটোন" ভিন্ন আর কি বলা যায়? খাদ্যাখাদ্যের বিচার সম্বন্ধেও মানুষের দৃষ্টি বড় কম নহে। পোর্টল্যাণ্ডের একজন ডিউক 'মুলেট' মাছের কেবল যকৃৎটুকু (লিবার) ভক্ষণ করিয়া বাকি অংশ ফেলিয়া দিতেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অর্থও বড় কম ব্যয় করিতে হইত না! আমাদের দেশেও এইরূপ শ্রেণীর লোকের অভাব নাই।

এই তো গেল মানুষের আহার সম্বন্ধে। এবার দেখা যাউক এবিষয়ে মানবেতর প্রাণীগুলি কিরূপ। ইহাদের মধ্যেও পেটুক অনেক আছে। অনেকগুলি খাদ্যাখাদ্যবিচারে বেশ পটু। ছুঁচা, শূকর, গ্লাটোন, ভল্লুক, হায়না,

শকুন, হাঙ্গর প্রভৃতি জন্তুগুলি পেটুকের দলে। ইহারা যে কত খাইতে পারে তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কিন্তু পেটুক মানুষের সঙ্গে ইহাদের এক বিষয়ে পার্থক্য আছে। হাঙ্গর, ছুঁচা, শকুন প্রভৃতির অতিভোজনের একটু বিশেষ কারণও আছে। ইহাদিগকে একদিন আহারের পর হয় ত সপ্তাহ কাল অনাহারেই থাকিতে হয়। কখন যে তাহাদের সম্মুখে আহার উপস্থিত হইবে তাহারও কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। শকুনের খাদ্য পচা মাংস। কিন্তু এরূপ মাংস সকল সময়েই পাওয়া কখনো সম্ভবপর নয়। কাজেই কখন আবার খাইতে পাইবে সে-সম্বন্ধে নিশ্চয়তার অভাবে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত হইলেই শকুন একদিনেই সপ্তাহকালের মত কাজ সারিয়া লয়। কিন্তু মানুষের সেরূপ কোনো অসুবিধা নাই। তাহাদের আহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় আছে; ভবিষ্যতের জন্য আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবারও তাহাদের সুবিধা আছে। সুতরাং একবারে একরাশি আহার করিয়া সপ্তাহকালের জন্য নিশ্চিন্ত হইবার তাহাদের কোনো প্রয়োজন নাই। ছুঁচাকে সমস্তদিন জমি খুঁড়িয়া খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়; হাঙ্গরকে খাদ্যান্বেষণের জন্য সমুদ্রময় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। সুতরাং তাহাদের পরিশ্রম অনুসারে কিছু অতিরিক্ত আহারেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে।

জীব-জন্তুর অতিভোজনের সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বিচার করিয়া দেখিবার আছে। বড় বড় অজগর (python) ও সর্পদের অনেক সময় বাধ্য হইয়া অতিরিক্ত ভোজন করিতে হয়। ইহাদের দন্ত-পঙ্ক্তি মুখের ভিতরে এরূপভাবে অবস্থিত যে একবার শিকারকে কামড়াইয়া ধরিলে তাহাকে আর ছাড়িয়া দিতে পারে না—ধীরে ধীরে আস্ত শিকারটিকেই গ্রাস করিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে একটি সর্প তাহারই স্বজাতীয় একটিকে আস্ত গিলিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সেজন্য সে বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ এরূপ কাজ অনেক সময়েই তাহাদের ইচ্ছাকৃত নহে। মনে করা যাক্ দুইটি সাপ দুই দিক হইতে একটি ইঁদুরকে কামড়াইয়া ধরিয়াছে। তখন একটি সাপ অন্যটিকে গ্রাস করিতে বাধ্য হইবে। সাপের পক্ষে কোনো কিছুকে একবার কামড়াইয়া ধরিয়া সেটাকে ছাড়িয়া দেওয়া যখন সম্ভব নহে তখন অন্য উপায় আর কি আছে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি কতকগুলি প্রাণী খাদ্যাখাদ্য বিচার করে। জিরাফ, পিপীলিকাভুক, ছোট ছোট সর্প, হামিং পাখী (Humming bird), মৌমাছি ও বোলতা প্রভৃতি এই দলে। ছোট ছোট সাপগুলির মত এমন 'বাবু' প্রাণী চিড়িয়াখানায় খুব অল্পই আছে। ইহাদের আহারের ব্যবস্থা করিতে কর্ত্তৃপক্ষদের অস্থির হইতে হয়। ইহাদের কোনোটা হয় ত শুধু পাখীর ডিম খায়, কোনো কোনোটার খাদ্য শুধু গিরগিটি, কোনো কোনোটার ইঁদুর ভিন্ন অন্য কিছু মুখে রোচে না। মনোমত খাবার না পাইলে ইহারা উপবাস করিতেও নারাজ নয়। সৌভাগ্যের বিষয় অনেক দিন অনাহারে থাকিলেও ইহাদের বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় না। এমনও দুই একটি "পাইথনের" কথা শুনা গিয়াছে যে দুই বৎসর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অনাহারে থাকিয়াও বেশ সুস্থকায় অবস্থায় জীবিত ছিল।

স্থানভেদে গিরগিটির মধ্যে আহারের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। পৃথিবীর পূর্ব্বাংশের গিরগিটির খাদ্য মাংস, কিন্তু পশ্চিমাংশের গিরগিটি নিরামিষাশী।

বহুরূপী (Chameleon) মক্ষিকা খুব খাইতে পারে কিন্তু অন্যপ্রকার কীটাদি তাহারা মুখে দেয় না, মাকড়সা দেখিলে পলাইয়াই যায়। একজন ভদ্রলোক বহুরূপীর জন্য মক্ষিকা সংগ্রহ করিবার একটি সুন্দর উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই ভদ্রলোকের একটি পোষা বহুরূপী ছিল। বহুরূপী যেস্থানে বসিয়া থাকিত তিনি তাহার সম্মুখে একটুকরা মিষ্ট পদার্থ ঝুলাইয়া রাখিতেন। মক্ষিকার দল যখন তাহার উপর আসিয়া বসিত বহুরূপীটি তাহার স্বস্থানে বসিয়া, সুদীর্ঘ রসনাটি প্রসারিত করিয়া এক একটি করিয়া মক্ষিকা ধরিয়া ভক্ষণ করিত।

উচ্চ শ্রেণীর জীব জন্তুদের খাদ্যাখাদ্যের বিচার খুব অল্পই দেখা যায়। চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে জিরাফ্ ও পক্ষীদের মধ্যে "হামিং বার্ডের" এ বিষয়ে বেশ একটু দৃষ্টি আছে। বুনো অবস্থায় এক প্রকার গাছের কোঁকড়ানো পাতা জিরাফের অত্যন্ত প্রিয়খাদ্য। সেই গাছের অভাবে কোনো কোনো স্থানের জিরাফবংশ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে।

চিড়িয়াখানার জন্য খুব কচি কচি ও কোমল ঘাস আনা হয়। ইহারা সেইরূপ ঘাসের শুধু অগ্রভাগটুকু ভক্ষণ করিয়া বাকি অংশ পরিত্যাগ করে। আহারের সময় জিরাফ প্রত্যেক আহার্য্যটি ধীরে ধীরে বেশ উপভোগ করিয়া আহার করে।

প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে আন্দীজ্ (Andes) পর্ব্বতের হামিং বার্ডের বিশেষ বিশেষ ফুলের মধু ও কীটপতঙ্গ ব্যতীত অন্য প্রকার খাদ্য পছন্দ হয় না। এক জাতীয় হামিং বার্ড আবার অন্য জাতীয় হামিং বার্ডের খাদ্য ভক্ষণ করে না।

ডাইভিং পাখীর (Diving bird) আহার্য্য একমাত্র জ্যান্ত মাছ; তাহারা মরা মাছ মুখেও দেয় না।

হরণবিল (hornbill) জাতীয় পক্ষীদের মতো এমন রাক্ষসে প্রাণী খুব অল্পই দেখা যায়। পাখী, সাপ, গিরগিটি, মাছ, কাঁকড়া, বিছা, ফল ইত্যাদি কিছুই তাহাদের মুখের কাছে বাদ পড়ে না।

স্থানভেদে জীব জন্তুদের আহার সম্বন্ধে অনেক সময় আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য দেখা যায়। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তোতা পাখী চিরকালই নিরামিষাশী। কিন্তু কোনো কোনো স্থানে মেষ-মাংসও তোতা পাখীর অতিশয় প্রিয় খাদ্য হইয়া দাঁড়ায়। বেবুন্ বেচারা চিরকালই ফলের ভক্ত। সেই বেবুনকেও কোনো কোনো স্থানে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য সমস্ত খাদ্য পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়। কোনো কোনো স্থানের বিড়ালকে ফলের ও অশ্বকে পাখীর মাংসের অত্যন্ত ভক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। মানুষের নিকট হইতেই ইহারা এরূপ অস্বাভাবিক অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোনো কোনো শ্রেণীর প্রাণীর স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে আহার্য্যের পার্থক্য দেখা যায়। এক শ্রেণীর পুংমশক গাছের রস পান করিয়া জীবন ধারণ করে কিন্তু স্ত্রীমশক প্রাণীদের রক্ত শোষণ করিয়া উদর পূরণ করিয়া থাকে।

এক এক ঋতুতে কোনা কোনো প্রাণীর কোনো বিশেষ খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য জন্মে। তাহারা জানে যে সেই ঋতুর অবসানেই সেই খাদ্যটির অভাব উপস্থিত হইবে। সেই জন্য তাহারা সেই সময় যত পায় পেট ভরিয়া খাইয়া লয়। শেট্ল্যাণ্ডের (Shetland) সামুদ্রিক পাখীরা শুধু শীতকালে মাছ খাইতে পায়, অন্য সময়ে শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। নাট্হ্যাচ্ (Nuthatch) সমস্তটা গ্রীষ্মকাল কীট-পতঙ্গাদি ধরিয়া ভক্ষণ করে, কিন্তু শীতকালে তাহাকে কীটাদির অভাবে বাদাম ফল খাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হয়। কোনো কোনো বিশেষ সময়ে আবার প্রাণীদের আহারেও পরিবর্ত্তন জন্মিতে দেখা যায়। সমস্ত বছরটাই চড়ুই পাখী শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে কিন্তু ডিম্ব প্রসবের সময় তাহাদের সে খাদ্য আর পছন্দ হয় না। সে সময় তাহারা কীট পতঙ্গাদির ধ্বংসে প্রবৃত্ত হয়।

আমাদের প্রশ্ন ছিল কোনও জীব-জন্তু মানুষ অপেক্ষা অধিক পেটুক কি না। কিন্তু এরূপ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া সহজ কথা নহে। অনেক স্থলেই তাহাদের আহারের পরিমাণ যথাযথরূপে মাপ করিয়া রাখা যায় না। কোনো কোনো প্রাণী যে এক একবারে মানুষ অপেক্ষা বেশী খায় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের পক্ষেও বলিবার অনেক কথা আছে। তাহাদিগকে একদিন আহারের পর যে অনেক দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে হয়, সে তো আছেই, তাহা ছাড়া ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জানোয়ারদিগকে খাদ্যান্বেষণের জন্য, হরিণাদির পিছনে পিছনে ছুটাছুটি করিয়া এবং মহিষ ও গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জন্তুর সঙ্গে লড়াই করিয়া, একটু অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। সুতরাং এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর তাহাদের ক্ষুধাটাও যে একটু অতিরিক্ত পরিমাণেই হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনো কারণ নাই। আমরা তো চোখের সম্মুখেই দেখিতে পাই, যাহারা সমস্ত দিন তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া বসিয়া বসিয়া খায়, তাহাদের অপেক্ষা সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর মুটে মজুরেরা অনেক বেশী খাইতে পারে।

অন্যান্য জীবজন্তুদের অপেক্ষা মানুষ কম খাইয়া থাকে, নির্ব্বিকার চিত্তে একথা বলা যায় না। মানব ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যে কাহারা অধিক পেটুক, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারিলে এবিষয়ে মানবের জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে এরূপ তো বোধ হয় না।

তেজেশ।

নদীর প্রতি অরণ্য

তুই নদী, আমি অরণ্যাণী—
তোরে যে আমার বলে' জানি।
আমারি বুকের পাশে,
বয়ে যাস্ কলহাসে
তরল রজতধারাখানি;
তোরে যে আমারি বলে' জানি!

তলতল ছলছলচল
খেলা করে তোর ক্ষ্যাপা জল;
আমি থাকি চেয়ে চেয়ে,
বুঝি না কেমন মেয়ে—
একেবারে আপনা বিহ্বল
ছুটে চলে তোর ক্ষ্যাপা জল।

শুষ্ক রুক্ষ কাঠিন্যের সারি—
আমি তোরে কিবা দিতে পারি?
কূলের সীমাটি রাখি'
রাত্রিদিন চেয়ে থাকি
শিরে তোর ছায়াটি বিথারি—
কিবা আছে, কিবা দিতে পারি?

পত্ররাজি ফুল ফলহার
আছে যাহা, দিই উপহার;
বিহঙ্গের কণ্ঠ দিয়া
পাঠায় আকুল হিয়া
মরমের মৌন সমাচার—
দীন আমি—দীন উপহার।

তোর কথা—কি কহিব আর
জানি তুই জীবন আমার,
পুষ্প পত্র বিটপী বল্লরী
তারি তরে প্রাণে উঠে ভরি'
ধরি নব নব শোভাভার—
তোর কথা—কি কব সে আর!

কিন্তু তোরে বাঁধি কিসে বল্
রে চপল, রে চির চঞ্চল!
রাতদিন হেলা ফেলা,
একি প্রেম ছেলেখেলা!
শুধু মন ভুলাবার ছল;
রে নিলাজ, রে চির চঞ্চল!

দিন যায়, রাত্রি ফিরে' আসে,
হাসে চাঁদ অগাধ আকাশে;
দক্ষিণের সমীরণ
জাগায় পাগল মন
শাখায় শাখায় হাহাশ্বাসে!
কত রাত্রি যায় আর আসে।

প্রাণপণ প্রণয়ে উদাসী—
একি ভালবাসা, সর্ব্বনাশি!
আশাহীন শূন্য প্রাণে
আমি চেয়ে তোর পানে
চলে যাস্ তুই কল হাসি,
প্রাণপণ প্রণয়ে উদাসী!

স্বতন্তরা—বুঝিনু ব্যাভার—
সিন্ধু সেই বাঞ্ছিত তোমার!
তবে হোক সমাপন,
অর্থহীন এ জীবন
তোরি সাথে হোক একাকার—
ভেঙে যাক স্বপন আমার।

কিন্তু নদি, অভিশাপ মোর,
এ দিন রবেনা কভু তোর;
পরিশুষ্ক পরিক্ষীণ
হবি তুই একদিন
গলে পরি বন্ধনের ডোর,
হেন দিন রবেনাক তোর।

অস্থিরূপে বালুকার রাশি
বক্ষ ভেদি উঠিবে বিকাশি;

হইয়া দুকূল হারা
মজিবে আকুল ধারা,
কলহাসি কোথা যাবে ভাসি'
তপ্তবুকে ধূ ধূ বালুরাশি!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

এস্কাইলাস্

প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে (খৃঃ পূঃ ৫২৫ অব্দে) গ্রীসদেশে এস্কাইলাস্ জন্মগ্রহণ করেন। তখন করাইলাস্, প্রতিনাস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গ্রীকগীতিনাট্যের সবে মাত্র সূত্রপাত করিয়াছেন। ইউরোপের অন্য কোনও স্থানে তখন পর্য্যন্ত নাটকের চর্চ্চা বিশেষভাবে আরম্ভ হয় নাই। ভারতবর্ষেও সেই দূর অতীতে যে তেমন একটা নাট্য-সাহিত্য ছিল তাহার নিদর্শন খড় বেশী কিছু নাই। জার্ম্মেন্ লে কক (Le Coq) সাহেবের যত্নে, উদ্যোগে ও নেতৃত্বে ১৯০৪ খৃঃ অব্দে বার্লিন হইতে মধ্যএসিয়ার তুর্ফান নগরে এক প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কীয় অভিযান প্রেরিত হয়; তাহার ফলস্বরূপ তিনি এক পরিত্যক্ত নগরীর ভূগর্ভনিহিত অট্টালিকাপ্রকোষ্ঠ হইতে বহুতর পুস্তক নিজদেশে লইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে এই সকল পুস্তকের ভিতরে ২৫০০ বৎসরের প্রাচীন সংস্কৃতনাটক বাহির হইয়াছে। জনমানবের অনাদৃত, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কৌতুকস্থল এই সংস্কৃতনাটকের কথা বাদ দিলে, বোধ হয় গ্রীসদেশের নাট্যচর্চ্চা বিশ্বসাহিত্যে একটী শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার উপযোগী, এবং এস্কাইলাস্ গ্রীসদেশের গৌরব-স্থানীয় সেই নাট্যকলার শ্রেষ্ঠসাধক নামে অভিহিত হইবার সম্পূর্ণ অধিকারী। বস্তুতঃ শোকাবহ মর্ম্মস্পর্শী হৃদয়বিদারক চিত্রাঙ্কণে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন; ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে সেক্সপিয়রের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে ট্রাজেডি নাটকে জগতের অপর কোনও লেখক এস্কাইলাসের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। সাহিত্যরাজ্যে আপন বিভাগে এইরূপ অক্ষুণ্ণ প্রতাপে প্রায় দুই হাজার বৎসর ব্যাপিয়া মানবমনের, সমাজের ও সভ্যতার উপর একাধিপত্য করিয়াছেন, পরবর্ত্তীকালের এক হাস্যরসিক এরিষ্টফেনিস্ ভিন্ন এমন অপর আর কেহ জগতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

এস্কাইলাস নিজে একজন সৈনিক ছিলেন, এবং মেদী ও পারসীজাতি যখন অগণিত সৈন্য লইয়া গ্রীসদেশ আক্রমণ করে, তখন বিরাটবাহিনীর সম্মুখে সেলামিস্ নামক প্রসিদ্ধ রণক্ষেত্রে সৌনিকের বেশে উপস্থিত ছিলেন। সেই যুদ্ধের পরিণামফল স্বপ্রণীত "পারসী" নামক নাটকে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই নাটকখানি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মারকলিপি বলিয়া ইতিহাসের হিসাবে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। অগণিত ধনরত্নের অধিপতি হইয়া যাঁহারা প্রতিবাসী স্বাধীনতাপ্রিয় দরিদ্র জাতিকে পদানত করিবার জন্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, পারস্যসম্রাট জেরাক্‌সিসের শোচনীয় পরাভব তাঁহাদিগের শিক্ষার স্থল। বিজয়পিপাসু আক্রমণকারী পরাজয়ের প্রতিঘাতে কিরূপে অভিভূত হইয়া পড়েন, ইহাই এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে।

জেরাক্‌সিস্ যুবাপুরুষ, ধূলিপটলে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে স্থলপথে গ্রীসযাত্রা করিয়াছেন; ক্ষেপণি-নিক্ষিপ্ত জলকণায় ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বভাগে কুয়াসা সৃষ্টি করিয়া তাঁহার শত শত যুদ্ধজাহাজ গ্রীসদেশ বেষ্টন করিয়াছে। জেরাক্‌সিস্ সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন। বৃদ্ধের অন্তরে, নারীর হৃদয়ে, বালকের চিত্তদর্পণে বিপদের পূর্ব্বচ্ছায়া সর্ব্বাগ্রে পতিত হয়। দেশে বৃদ্ধপ্রধানগণ (elders) একত্রিত হইয়া এক অব্যক্ত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছেন। প্রৌঢ়া জননী অতোসা স্বর্ণ পালঙ্কে কুস্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইতেছেন। তিনি দেখিলেন পরমাসুন্দরী দুইটী পারসী ও গ্রীক্ রমণী কলহ করিয়া তাঁহার পুত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার বীরপুত্র উভয়কে বাঁধিয়া রথবাহকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে, হঠাৎ সেই গ্রীকরমণী রথ উল্টাইয়া দিয়া জেরাক্‌সিসকে ভূপতিত করিয়াছে, পতিত পুত্রের সম্মুখে পিতা দরায়ুস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—পুত্র রাগে তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করিয়া দিতেছে। জাগরিত হইয়া অতোসা মধুচক্র ও গন্ধদ্রব্য লইয়া সূর্য্যের মন্দিরে বলি দিতে যাইবেন, হঠাৎ তিনি দেখিলেন একটী বাজ-

পক্ষীর আক্রমণে সন্ত্রস্ত হইয়া একটী ঈগলপক্ষী সূর্য্যমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এই অস্বাভাবিক দৃশ্যে অতোসা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রধানদিগের সম্মুখে আসিয়া ব্যাকুলভাবে মাতৃহৃদয়ের সমস্ত আশঙ্কার দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। এই সময়ে ভগ্নদূত আসিয়া বলিল "Persia's flower is fallen and gone." দৈবের খেলায় পারসীজাতির শ্রেষ্ঠরত্নসকল প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, কেবল অভিযানের নেতা স্বয়ং পারস্যরাজ জেরাক্সিস্ বিচ্ছেদের শেলে বিদ্ধ ও অপমানের মর্ম্মন্তুদ যাতনায় নিষ্পিষ্ট হইবার জন্যই যেন মৃত্যু অপেক্ষা শতগুণ হীনতর তুচ্ছ জীবন ধারণ করিয়া আছেন। এথেন্স নগরী এস্কাইলাসের জন্মভূমি, তিনি ভগ্নদূতের মুখে বলিতেছেন যে, এথেন্সের অধিবাসীরা আপন দেশের জন্য রক্ত দিতে প্রস্তুত ছিল ; মানুষ যখন নিজ দেশকে পুত্রকলত্রের ক্রীড়াকানন বলিয়া, পিতৃপুরুষের সমাধিভূমি, ও উপাস্য দেববিগ্রহের মন্দিরসমাকীর্ণ পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া অন্তরে অন্তরে অনুভব করে, তখন লোক আক্রমণের শত অত্যাচারেও স্বাধীনতা হারাইতে পারে না। এই যুদ্ধের পরিণাম ফল বিস্তারিতভাবে জানিবার জন্য অতোসা তখন ভগ্নহৃদয়ে স্বামীর সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। গব্যদুগ্ধ, পুষ্পমধু, সদ্যজাত ঝরণার জল, দ্রাক্ষারস ও জলপাই তৈলের তর্পণে ও নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পমাল্য দানে ও নানাপ্রকার প্রেত-আবাহন-মন্ত্রে মৃতস্বামী দরায়ুসের প্রেতাত্মাকে সমাধি হইতে ডাকিয়া তুলিলেন। দরায়ুসের ছায়ামূর্ত্তি আপন মহিষীকে ও সমবেত প্রধানগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "The Country there fights for her sons", দেশমাতা তাহার সন্তানের জন্য লড়িতেছে, এই অবস্থায় শত্রুসংখ্যা তিনগুণ হইলেও গ্রীসের কোনও অনিষ্ট হইবে না। জেরাক্সিসের অবশিষ্ট সৈন্যগণ বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।

কিছুদিনের পরে জেরাক্সিস্ গৃহে ফিরিলেন, প্ল্যাটিয়ার রণক্ষেত্রে তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। প্রেতাত্মার বাক্য সফল হইল।

এস্কাইলাসের স্বদেশ ও স্বজনপ্রীতি এই নাটকের ছত্রে ছত্রে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমালোচকেরা দেখাইয়াছেন যে, একমাত্র সেক্ষপিয়র ভিন্ন আজ পর্য্যন্ত কোনও লেখক আপন সময়ের ও দেশের প্রতি এত স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। "এথেন্স" এই কথাটী লিখিতেই যেন এস্কাইলাসের লেখনী আনন্দে নাচিয়া উঠিত।

"সপ্তম" (*Septem*) তৎপ্রণীত আর একখানি নাটক। কোনও দেশের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য উদ্যোগ ও আয়োজন যেমন পাপ, প্রয়োজন হইলে ভ্রাতৃরক্তে মেদিনী প্লাবিত করিয়াও স্বাধীনতা রক্ষা করা তেমনি পুণ্যকর্ম্ম। থিবসের রাজপুত্র পোলীনিস্ কনিষ্ঠভ্রাতা ঈতিওক্লিস্ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। পোলীনিস্ সেই ব্যক্তিগত আক্রোশ নির্ব্বাণের জন্য দল বাঁধিয়া সপ্তরথীতে থিবসের সপ্তদ্বার আক্রমণ করিয়াছেন। সপ্তরথীর প্রত্যেকেই গ্রীসদেশের প্রখ্যাতনামা যোদ্ধা, প্রত্যেকের বীরত্বগাথায় সমস্তদেশ প্রতিধ্বনিত। কিন্তু ক্যাড্মাস নগরের স্বাধীনতা হরণের জন্য আজ সকলে পোলীনিসের নেতৃত্বে সমবেত, তাঁহাদের অনেকে রাজপরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ, নগরের স্বাধীনতাগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিত ছিল ; কিন্তু তাহারা আততায়ীর বেশে নগরের পুরোদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, সমস্তদেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। ঈতিওক্লিস্ নগর রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া সপ্তমদ্বারে নিজে ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। দ্বিতীয় তরণীসেনের মত যেন তিনি বলিয়া উঠিলেন,

"পিতা হৌন্, ভ্রাতা হৌন্, হউন জননী।
দেশের যে শত্রু তারে শত্রু বলে গণি॥"

ভ্রাতৃস্নেহ স্বদেশরক্ষার চরণতলে চূর্ণ হইয়া গেল। উভয় ভ্রাতা সংগ্রামক্ষেত্রে পরস্পর বিদ্ধ হইয়া জীবলীলা সমাপন করিলেন। কিন্তু থীব্স্ স্বাধীন রহিল। দেশদ্রোহী পোলীনিসের মৃতদেহ শৃগাল কুকুর ভক্ষণ করিবে বলিয়া নগরের প্রধানগণ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু যে পোলীনিস্ সাম্রাজ্যলাভের মদিরা পান করিয়া দেশের ও সমাজের, ভ্রাতার ও দেবতার অভিশাপ মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, জীবনান্তে ভগিনীর অশ্রুজলে ও স্নেহে তিনি যেন সকল জ্বালা যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া সহোদরা আন্তিগোনির

স্বহস্তনিক্ষিপ্ত মৃত্তিকার অন্তরালে শান্তিলাভ করিলেন। ঈতিওক্লিস্, কি নির্ম্মম! কি কর্ত্তব্যপরায়ণ! মৃত্যুর দ্বারেও তিনি অমৃতের অধিকারী! বীরশ্রেষ্ঠ স্পার্টানজাতি, বীরশ্রেষ্ঠ লিওনিদাস ঈতিওক্লিসের বিজয়বিঘোষিত ক্ষেত্রেই জাগিয়াছিলেন। "পারসী" নাটক স্বাধীনতা হরণের পাপে অভিশপ্ত, আর "সপ্তম" নাটক স্বাধীনতা রক্ষার গৌরবে গৌরবান্বিত।

এস্কাইলাসের প্রমিথিয়স বাউণ্ড (Prometheus Bound) নামক নাটকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত দেববীর প্রমিথিয়সের সমক্ষে ত্রিদিবের দেবতা অত্যাচারী জ্যুসের চিত্র ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। ক্রোনস্ যখন ত্রিলোকের অধিপতি ছিলেন, তখন দেবতাদের মধ্যে দুইটী দলের সৃষ্টি হয়। একদল ক্রোনসের পক্ষ ও প্রমিথিয়স-প্রমুখ, অন্যদল তৎপুত্র জ্যুসের পক্ষ সমর্থন করেন। এই বিবাদে শেষে জ্যুসের জয়লাভ হয়। কিন্তু জ্যুস আধিপত্য লাভ করিয়াই মানবজাতির প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। পরন্তু প্রমিথিয়স ন্যায়ের অনুরোধে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি তাহাদিগকে জ্যোতিষরহস্য, সংখ্যাতত্ত্ব, লিখনপদ্ধতি, হলকর্ষণ, রথচালন, পোতনির্ম্মাণ প্রভৃতি সভ্যতার উপাদানসমূহ শিক্ষা দিলেন। তিনি আশা দিয়া নশ্বর মানুষের মৃত্যুর ভয় দূর করিলেন। স্মৃতিশক্তি দিয়া মানবকে অদ্ভুতকর্ম্মা করিয়া তুলিলেন। এবং সর্ব্বশেষ বিশ্বজ্যোতিঃ হরণ করিয়া মানবকে অমরত্বের সুফল প্রদানে সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। এই শেষোক্ত অপরাধে জ্যুস বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে তাঁহাকে সাগরতীরে নির্জ্জনশৈলে হস্তপদবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বিজ্ঞ বরুণ দেব তাঁহাকে রাজশক্তির চরণে মস্তক নত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, সাগরবালাগণও তাঁহাকে সেই উপদেশ প্রদান করিল, ও তাঁহাকে শক্তিমান দেবরাজের প্রতি ভক্তিমান ও সংযতবাক্ হইয়া যন্ত্রণামুক্ত হইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু নিগড়বদ্ধ প্রমিথিয়স সগৌরবে বলিয়া উঠিলেন, 'তার চেয়ে মৃত্যু ভাল'—কিন্তু তিনি মৃত্যুরও অতীত। ইহাতে তাঁহার যন্ত্রণা শতগুণ বাড়িয়া উঠিল।. সর্ব্বশেষে দেবদূত আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিল। তিনি অন্যায়ের চরণে কিছুতেই মস্তক অবনত করিবেন না। গৃধ্রচঞ্চুদষ্ট নিত্যবর্দ্ধিত যকৃৎ লইয়া মানবহিতাকাঙ্ক্ষী প্রমিথিয়স ভাবী মুক্তির আশায় সাগরকূলে বহুদিন যাপন করিলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ দেবরাজের প্রতাপ ও ক্ষমতা প্রমিথিয়সের সত্বগুণের ও আত্মসম্মানের কাছে উপহাসের বস্তু হইয়া পড়িল। ন্যায় যাহা বুঝিব, তাহার জন্য জগতের সুখসম্পদ, স্বদেশ, সুবিধা, এমন কি দেবরাজের অনুগ্রহ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ, স্নেহের পরিবর্ত্তে ঘৃণা, সম্পদের পরিবর্ত্তে বিপদ, স্বদেশের পরিবর্ত্তে বিদেশের নির্জ্জনশৈল, অধীনতার পরিবর্ত্তে স্বাধীনতার ক্রূর নিগড় গ্রহণ করিতে এই জগতে কাহারা আছেন? যাঁহারা আছেন, তাঁহারা দেবতা।

হীরাদেবীর মন্দিরের পুরোদ্বারের পরিচারিকা ইনেকাসের কন্যা আইও (Io) পরম রূপবতী মানবদুহিতা। দেবরাজ তাঁহার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া সেই যৌবনভারাক্রান্তা বালিকাকে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইবার জন্য স্বপ্নাবস্থা হইতে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। হীরা এই তথ্য অবগত হইয়া আইওকে গাভীতে পরিবর্ত্তিত করিলেন, এবং যাহাতে আইও কোথাও সুখশান্তিতে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিতে না পারে, সেইজন্য ডাঁশ পোকা তাহার পশ্চাতে লাগাইয়া দিলেন। আইও নানাদেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক প্রমিথিয়সের আদেশে শেষে মিশর দেশে গমন করিলেন। পরে একদিন জ্যুসের করস্পর্শে গর্ভবতী হইয়া বংশ বিস্তার করিলেন। উত্তরকালে তাঁহার বংশে দনৌ এবং ঈজিপ্তাস্ নামক দুই পুত্র জন্মে। দনৌর পঞ্চাশ কন্যা ঈজিপ্তাসের বলদর্পিত পঞ্চাশ পুত্রের প্রেমআবাহন উপেক্ষা করিয়া এথেন্স নগরের সাগরোপকণ্ঠে নির্ম্মিত দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। সগোত্র বিবাহ এই কন্যাদিগের কাছে বড়ই ঘৃণার বস্তু ছিল। পিলাস্‌জাস তখন সমগ্র গ্রীসের অধিপতি, তিনি প্রজাসাধারণের অনুমতি লইয়া সেই পঞ্চাশ কন্যাকে ঈজিপ্তাসের পঞ্চাশ পুত্রের করকবল হইতে রক্ষা করিলেন। "সাপ্লিসেস্" (Supplices) নামক নাটকের ইহাই উপখ্যানভাগ। এথেন্সবাসী এস্কাইলাস্ এই উপলক্ষে আপন জন্মভূমির যে মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লেখনী

ধন্য হইয়াছে। "Vox populii vox Deii" (জনসাধারণের কণ্ঠ ভগবানের কণ্ঠ), "পাঁচে পরমেশ্বর"— আধুনিক জগতের এই মহাবাণী এস্কাইলাস্ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আপন গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া জনসাধারণের স্বাধীনতার প্রথম বিজয়মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন।

অরেষ্টিয়ান্ ট্রাইলজি (Oresteian Trilogy) এস্কাইলাসের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। এগামেম্‌নন্ (Agamemnon) কোফোর (Choephore) এবং ইউমিনাইডিস (Eumenides) এই ত্রিনাটকের তিনটী শাখা। ট্রাইলজি (Trilogy) গ্রীকনাটকের একটী বিশেষত্ব। তিনটী নাটক যেন একটী মণিমালা বিশেষ। ট্রয় যুদ্ধে যাইবার সময় আর্গস্‌রাজ এগামেম্‌নন্ সাগরতরঙ্গ নিবারণের জন্য দেবতার আদেশে আপন পরম রূপবতী কন্যা ইফিজেনিয়াকে বরুণের উদ্দেশে বলি দিয়াছিলেন। আর্গসের কন্যাবিয়োগবিধুরা রাণী ক্লিতামেনস্ত্রা প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। রাজার দশ বৎসর বিদেশে অবস্থানের সময়ে রাণী শাসনদণ্ডে সাম্রাজ্যগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু চরিত্রগৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। রাজার সগোত্র (Egisthus-) এগিস্থাসের সহিত গুপ্ত প্রণয়ে তিনি দুষ্টা হইয়াছিলেন। দশ বৎসর পরে রাজা বিজয়লাভ পূর্ব্বক আপন নগরে ফিরিয়া আসিলেন। নগরের প্রধানগণ, দেশবাসী জনসাধারণ সকলেই অনন্দিত হইল। রাণী মায়াকান্না কাঁদিয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন এবং প্রাসাদকক্ষে স্বহস্তে স্বামীহত্যা করিয়া কন্যার মৃত্যুর প্রতিশোধ তুলিলেন ও আপন প্রণয়ের পথ পরিষ্কার করিলেন। দশ বৎসর ব্যাপিয়া প্রণয়ীযুগল দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। দশ বৎসর পরে সূর্য্যের আদেশে রাজপুত্র ওরেষ্টিস্ (Orestes) পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য আর্গস দেশে আগমন করিলেন। তিনি শৈশবে ক্রীতদাসরূপে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে মাতৃভক্তির পবিত্র স্থানে ঘৃণা ও জিঘাংসাপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। পিতার সমাধিক্ষেত্রে ভগিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভগিনীর স্নেহপূর্ণ বাক্যে তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়, ও পিতৃহত্যার প্রতিশোধবাসনা আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। তিনি অতিথির ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ পূর্ব্বক কৌশলে এগিস্থাসকে হত্যা করেন। রাণী এই সংবাদ পাইয়া পুত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, রাজপুত্র মাতৃহত্যার জন্য কুঠার উত্তোলন করিলেন। মাতা ব্যাকুল হৃদয়ে পুত্রের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন, আপনার বক্ষের আচ্ছাদন উন্মোচন পূর্ব্বক মানবের চিরশ্রদ্ধা, চিরস্নেহের আধার, পূত পীযূষধারাবাহী মাতৃস্তনের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক সকাতরে প্রাণ ভিক্ষা করিলেন, কিন্তু সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। পরশুরামের ন্যায় কুঠারাঘাতে তিনি মাতৃহত্যা সম্পাদন পূর্ব্বক ভয়ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন। বিভীষিকার জীবন্তমূর্ত্তিস্বরূপিনী রাত্রিদুহিতা ফিউরিজ্ (Furies) তাঁহাকে বিশ্রামের অবসর না দিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া অনুসরণ করিতে লাগিল। পরে সূর্য্যদেবের আদেশে ওরেষ্টিস্ এস্কাইলাসের জন্মভূমির দেবতা এথেনা দেবীর শরণ লইলেন। এথেনা একটী মহাসভা আবাহন করিয়া ওরেষ্টিসের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। "জনক ও জননীর ভিতরে কে শ্রেষ্ঠ?"—আবার সেই প্রাচীন প্রশ্ন উঠিল। ওরেষ্টিস সূর্য্যের আদেশে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ তুলিবার জন্য মাতৃহত্যা করিয়াছেন। মহাসভার সভ্যেরা কেহ জনকের পক্ষে কেহ জননীর পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন, এবং সর্ব্বশেষে অযোনিসম্ভবা এথেনা পুরুষের মহত্ত্বের পক্ষ সমর্থন করিয়া ওরেষ্টিসকে বিভীষিকার হাত হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন, এবং বচনকৌশলে বিভীষিকাময়ী তমস্বিনীগণকে জগতের হিতার্থিনী আনন্দময়ী দেবকন্যারূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। ইহাই এই ত্রিনাটকের উপাখ্যানভাগ।

রাজপুত্রের ন্যায় মাতৃহন্তা ভারতের সাহিত্যে বিরাজমান আছেন, এবং ভারতের সংসারে এমন মাতৃহন্তার সংখ্যা বিরল নহে। কিন্তু স্বামীহন্ত্রী চরিত্রভ্রষ্টা নারীমূর্ত্তি ভারতের লেখনী কখনও কলুষিত করে নাই। ক্লিতামেনস্ত্রা শক্তিশালিনী সন্দেহ নাই, নারীজাতি সকল দেশেই শক্তিশালী। নারী শক্তিরূপা, শিবানী, মহামায়া, কিন্তু ক্লিতামেনস্ত্রা অশিবজননী, নষ্টচরিত্রা, পিশাচিনী। এস্কাইলাস এই রাণীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া নারীজাতিকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। বাস্তবিক জননী, ভগিনী ও গৃহিণী জাতীয়া

নারীর প্রতি এস্কাইলাসের কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব, ঘৃণার ভাব ছিল। এমন কি আন্তিগোনি, ইলেক্ট্রা, ক্যাসান্ড্রা প্রভৃতি শুভ্রকুসুমসম কোমলমধুর নারীচিত্রেও তিনি যেন কতক দৌর্ব্বল্যের ছায়া ফেলিয়াছেন।

এস্কাইলাসের অনেকগুলি নাটক লোপ পাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিমন্দিরের ভগ্নাবশেষস্বরূপ যাহা কিছু কালের করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহার প্রত্যেকটী ন্যায় ও স্বাধীনতার বিজয়বার্ত্তা পাঠককে জ্ঞাপন করিতেছে। এস্কাইলাসের বিভীষণ চিত্রের ভিতরে মানবশিক্ষা ও সমাজশিক্ষা ওতোপ্রোতোভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে; অথচ মনোমদ কাব্যকৌশলে তাঁহার সমস্ত রচনা অনন্ত আনন্দ-প্রস্রবণ স্বরূপ মানবের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে।

শ্রীরজনীরঞ্জন দেব।

মিশরের মিশরী

বন্যায়।

—বানের জলে দেশ ভেসেছে, রাখাল-ছেলে তুই কোথা?
—বাঘর-বোয়াল মাছের সাথে দুখের সুখের কই কথা!

—সবুজ ঘাসের নেই নিশানা, রাখাল-ছেলে কই রে কই?
—ভোঁদড় চরাই ভেড়ার বদল, পিছ্-পা হ'বার পাত্র নই!

—বানের জলে শাল্‌তি চলে, রাখাল-ছেলে আয় ঘরে!
—কোন্ মুখে আর ফিরব? আমার কুমীর মিতে পায় ধরে।

ধান মাড়া

গাই-বলদে মাড়িয়ে যাও!
ধান থেকে তুঁষ ছাড়িয়ে দাও!
চাষার লেগে শস্য রেখে
পোয়ালগুলি মুড়িয়ে নাও!
গাই-বলদে মাড়িয়ে যাও!

আজ্‌কে গরম নেইক মোটে
কাজ সেরে নাও একটি চোটে;
দাঁড়িয়ো না গো, খুঁড়িয়ো না গো,
চালগুলি সব কাঁড়িয়ে দাও!
গাই বলদে মাড়িয়ে যাও!

আভাস

কুসুম ফুলের রং ধরেছে ধোয়া চাদরে,
রঙীন্ হ'য়ে উঠেছে মন তোমার আদরে!
জলের সঙ্গে মিশ্‌ল সুরা,
হৃদয়খানি হ'ল পূরা;
অনুরাগের তপ্ত ধুনায় গন্ধ না ধরে!

ঘোড়সওয়ারের সখের ঘোড়া হাওয়ায় ছুটেছে,
যেখান্‌টিতে ডঙ্কা বাজে আপনি জুটেছে!
সুপ্ত দীপের সলিতাতে
গুপ্ত শিখা লাগ্‌ল রাতে;
খুল্‌তে আঁখি শিকারী বাজ শূন্যে লুটেছে:

অভয় মন্ত্র

ওপারে আমার বঁধুর সোহাগ,
এপারে রয়েছি আমি;
মাঝখানে নদী, নদীতে হাঙর,
তবু সে নদীতে নামি!
ঝাঁপ দিয়া তবু পড়ি তরঙ্গে
স্মরিয়া তাহার মুখ,
বঁধুর প্রেমের রভসে আমার
দ্বিগুণ বেড়েছে বুক!
তরল সলিলে সোপান মানিয়া
অবাধে নামিয়া যাই,
বঁধু শিখায়েছে অভয়-মন্ত্র
আর কোনো ভয় নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সচ্চাষী জাতি

(২)

সচ্চাষী জাতি হিন্দুসমাজের মধ্যে একটী বিশিষ্ট জাতি। ইহাদের প্রধান উপায় ও অবলম্বন চাষ ও ব্যবসায়। যাহারা সহরে বাস করে বা ধনাঢ্য ও সভ্য তাহারা অধিকাংশই ব্যবসায় বাণিজ্য করে। অনেকে ইহার দ্বারা বেশ ধন বৃদ্ধি করিতেছেন। আর যাহারা গ্রামে বসবাস করে তাহারা কৃষিকার্য্য ও গোপালনের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। খুব অল্পসংখ্যক লোক পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা আপনাদিগকে একটু সভ্যতায় উন্নত করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ ডাক্তার, উকিল, প্রভৃতি হইয়াছে। আর যদিও এ জাতির ভিতর অধিক সংখ্যক বিদ্বান নাই তথাপি সাধারণের মধ্যে অনেকেই লিখিতে পড়িতে জানে এবং তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ, বিশেষত যুবকেরা, শ্রমশিল্প—যথা স্বর্ণকারের কাজ, ঘড়ির কাজ, ফটোর কাজ, ছাপাখানার কাজ, চিত্রকলার কাজ, মিলের মিস্ত্রির কাজ প্রভৃতি—দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। কিন্তু প্রধানতঃ এই জাতি চাষবাস করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে বলিয়া অতি শান্ত-স্বভাব ও নিরীহ, এবং সভ্যতার আলোকে সহরে আসিতে চাহে না বলিয়া, এতদিন সমাজের এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছে।

সচ্চাষী জাতি যে কোন নিকৃষ্ট বা হেয় জাতি হইতে উৎপন্ন নহে, ইহার প্রমাণের জন্য বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না। পুরাতন সেনসস্ তালিকা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই জাতির লোকের জীবিকা অর্জ্জনের প্রথম ও প্রধান উপায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। রিজলি সাহেব মহোদয় তাঁহার জাতিবিভাগ পুস্তকে (Tribes and Castes of Bengal) লিখিয়াছেন—

> "এই জাতির প্রধান নাম 'চাষাধোবা' কিন্তু কথাটা 'চাষাধোবা' নহে 'চাষীধব' অর্থাৎ ধব অর্থে স্বামী, তবেই হইল চাষের মালিক বা চাষীর শ্রেষ্ঠ—ইহারা কখনও চাষাধোবা অর্থাৎ ধোবা চাষের কার্য্যে ব্যাপৃত এরূপ নহে—এইটী এ জাতির মত।"

এখন সচ্চাষী স্থলেও ঠিক তাই, সৎ শব্দে শ্রেষ্ঠ বা স্বামী এবং চাষী অর্থেও কৃষিজীবী, তবেই হইল চাষীধব=সচ্চাষী। এই কথার সমর্থন আমরা অন্যত্র দেখিতে পাই। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় ইহারা চাষীপতি বলিয়া দলিলপত্রে উল্লিখিত হয়। ইহাতেও স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে কথাটা চাষাধোবা নহে, চাষীধব চাষীপতি। কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত পীতাম্বর সরকার কর্ত্তৃক রচিত "জাতি বিকাশ" পুস্তকের ২৮, ২৪৩, ২৫৬ পৃষ্ঠায় ইহার যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে। আরও একটা প্রমাণ দিতেছি—যশোহর জেলায় এই জাতীয় লোক 'হলধর' বলিয়া পরিচিত। হলধর অর্থেও কৃষিজীবী। অতএব সচ্চাষী, চাষীধব, চাষীপতি, হলধর প্রভৃতি কয়েকটী শব্দই কৃষিবাচক এবং এক জাতিরই স্থান বিশেষে নামান্তর বিশেষ। উক্ত পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠা দেখিলে ইহার সম্বন্ধে সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।

এখন কথা হইতে পারে যে এক জাতীয় লোকের এই বিভিন্ন নাম হইল কিরূপে। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে জাতীয় নামটী ছিল চাষীধব অর্থাৎ চাষীর শ্রেষ্ঠ বা স্বামী; কিন্তু ভারতে, বিশেষত বঙ্গদেশে, ক্রমশঃ যতই সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার কমিয়া আসিতে লাগিল, ধব অর্থে যে স্বামী হয় এটী লৌকিক ব্যবহার হইতে লোপ পাইল এবং উচ্চারণের দোষে ধব স্থানে ধোবা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং চাষীধব চাষাধোবায় পরিণত হইল। কিন্তু বাঙ্গালা চলিত ভাষায় ধোবা অর্থে কোন মানেই যখন হয় না, তখন সাধারণে মনে করিয়া লইল এটা চাষীধোবা নহে চাষা-ধোপা। এখন এই 'চাষাধোপা' কথা চলিত কথায় প্রচলিত হওয়ায় লোকে বুঝিতে পারিল ইহারা একটী অতি নিকৃষ্ট জাতি, ধোপার সম্পর্কীয় হইবে। এদিকে এই 'চাষীধব' জাতীয় লোক অতি শান্তিপ্রিয়, গ্রামবাসী, কৃষিজীবী ও লেখাপড়ার বিশেষ কোন সম্পর্ক না রাখায়, বিশেষ কিছুই আপত্তি করিল না এবং তখনকার দিনে তাহারা আইন আদালত জানিত না যে মানহানির নালিশ করিবে। ফলে কালক্রমে তাহারা লোকসমাজে চাষাধোপা নামে পরিচিত হইল। একে পল্লীগ্রামবাসী তায় অশিক্ষিত ও নিরীহ, তাহারা ইহার কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া যে যেখানে ছিল ভাগ ভাগ হইয়া রহিল। কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর যে স্থানের লোক একটু সভ্য ও ধনবান হইল তাহারা কৃষিবাচক শব্দে নিজেকে

অভিহিত করিতে লাগিল, কেহ সৎ+চাষী, কেহ চাষী+পতি, কেহ হলধর প্রভৃতি আখ্যা গ্রহণ করিল, কারণ প্রত্যেক সমাজই দূরগত হইলেও জানিত যে পূর্ব্বতন আদি 'চাষীধব' শব্দ দাঁড় করাইতে যাওয়া সুবিধা নয়, অপভ্রংশ চাষাধোবায় পরিণত হইবে। কিন্তু এই যে স্থানবিশেষে তাহারা নিজেদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করিল ইহার ফল হইল বিষময়, কিছুকাল পরেই কেহ কোন দূরগত সমাজের সহিত মিলিত হইতে পারিল না, প্রত্যেকেই স্ব স্ব সীমাবদ্ধ ও স্বস্বপ্রধান হইয়া পড়িল। সমাজ বিশৃঙ্খল হইল, সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ সাধারণ সমাজে আরও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সহিত ইহারা ধোপা চাষের কাজে ব্যাপৃত অর্থাৎ কি না প্রকৃত চাষাধোপা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল।

এদিকে পুরাতন শাস্ত্রে এই চাষাধোবার ত কোনই উৎপত্তি বিবরণ বা আদি কথা পাওয়া যায় না। কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্র যেরূপ বিশাল ও কল্পতরুস্বরূপ তাহাতে এ জাতির বিবরণ পাওয়া যায় না, এ কথা বলা সাজে না, কাজেই একটী শ্লোকের প্রক্ষিপ্ত আদেশ হইল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে। এখন এই "সদ্গোপাৎ পতিতো যস্তু সংসর্গাদ্রজকস্ত্রিয়ঃ কৃষিরজক নাম্নৈব তথাসৌ পরিকীর্ত্তিতঃ" শ্লোকটীই হইল এ জাতির বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় বিধি এবং সাধারণ বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের একমাত্র পুঁজি। তাহারা বলিল, যে সদ্গোপ জাতি রজক জাতীয়া স্ত্রীর সংসর্গ হেতু পতিত হইয়াছে তাহাকে কৃষিরজক কহে এবং এই শাস্ত্রোক্ত কৃষিরজকই হইতেছে চলিত কথায় প্রচলিত চাষাধোবা। বেশ, এটা স্বাভাবিক ও কালের অনন্ত গতির প্রামাণিক। কিন্তু কেহ কি এ পর্য্যন্ত দেখাইতে পারেন যে এই কৃষিরজকই চাষাধোবা। কুন্তলীন প্রেস হইতে প্রকাশিত "জাতিবিকাশের" গ্রন্থকারকে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর অধ্যক্ষ শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় লিখিতেছেন—

"মহাশয়, আমাদিগের পুস্তকালয়স্থিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের পুঁথি অনুসন্ধান করাইয়া দেখিলাম যে আপনাদিগের জিজ্ঞাস্য কৃষিরজক সম্বন্ধীয় কোনও শ্লোক নাই। আমরা তিনখানি পুঁথি অনুসন্ধান করিয়াছি কিন্তু কোনখানিতেই উক্ত শ্লোক দৃষ্ট হয় নাই। রচনাদি দেখিয়া উক্ত শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।" জাতি-বিকাশ, ২৮৩—২৮৪ পৃষ্ঠা।

মূল ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ১৮০০০ শ্লোক ছিল, এক্ষণে ২১০০০ শ্লোকে পরিণত হইয়াছে; অতএব ৩০০০ শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যত আদি পুঁথি সংগ্রহ করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথি যে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বাস্য সে বিষয়ে আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

কৃষিজীবী হিন্দুগণ বেদের আদি কাল হইতে অবস্থিত, তাহাদের অবস্থা কোনরূপে হীন বা ঘৃণ্য ছিল না। বিলাতে এখনকার যে dignity of labour (পরিশ্রমের মান্য) দোহাই দিয়া English farmer(ইংরাজ কৃষক) একটী বিশেষ সম্মানিত সম্প্রদায় হইয়াছে তাহার অপেক্ষাও হিন্দু কৃষক যথেষ্ট শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় ছিল। তখনকার দিনে সকল শ্রেষ্ঠ লোকেই কৃষিকার্য্য করিতেন, এই জন্য ভারতে 'ধান্যেন ধনবান' কথাটী একটী প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। সে যাহা হউক শাস্ত্রে এই কৃষিকার্য্যজীবী ব্যক্তিগণের সাধারণ ভাবে বর্ণনা থাকায় এবং কোন জাতিবিশেষের নাম উল্লেখ না থাকায়, অন্যদিকে পূর্ব্বপ্রচলিত 'চাষীধব' কথার অপভ্রংশ চাষাধোপা কথা ইংরাজী আমলের কিছু পূর্ব্বে বঙ্গদেশে চলিত থাকায় উক্ত প্রক্ষিপ্ত শ্লোক এ যাবৎ বেশ প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া একটী নিরীহ জাতিকে সমাজের নিম্নস্তরে নামাইয়া দিয়াছিল। এবং লোকে যে যাহা মনে করিত এক একটী ইতিহাস এ জাতির জন্য দিত। মাননীয় রিজলী সাহেব বাহাদুর অনেক অনুসন্ধান করিয়া যে Tribes and Castes of Bengal প্রণয়ন করিয়াছেন বাস্তবিকই এই গ্রন্থে অনেক তথ্য তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার দত্ত একটী ইতিহাস এই জাতির সম্বন্ধে সঠিক কথা না বলিতে পারিলেও একটী মন্দ কথা বলে নাই। তিনি লিখিতেছেন—

একদা ব্রহ্মার কাপড় ধৌত করিবার জন্য তাঁহার নিকট এক রজকপত্নী পুত্রের সহিত আসিয়াছিল। ব্রহ্মা সে সময়ে কিছু ব্যস্ত ছিলেন. সেজন্য রজকপত্নীকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। রজকপত্নী দেরী দেখিয়া পুত্রকে রাখিয়া গৃহে চলিয়া গেল। তৎপরে ব্রহ্মা তাঁহার কাপড় দিবার জন্য আসিয়া দেখেন, বালক সেখানে নাই। তিনি স্থির করিলেন যে কোন অসুর বালকটীকে খাইয়া থাকিবে। তাহার মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তখন তিনি একটী পূর্ব্ববৎ বালক (মানসপুত্র) সৃজন করিলেন। কিন্তু এইরূপ নির্ম্মাণের পরক্ষণেই মাতা স্বীয় বালককে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মা নিজ কার্য্যের গোলমাল দেখিয়া, রজকপত্নীকে বলিলেন 'বাছা তুমি এই ছেলেটীকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করিবে কিন্তু কোন নিকৃষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত করিবে

না, যেহেতু এই বালক দেবতার মানসপুত্র, তুমি ইহাকে চাষবাস ও তৃণশস্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবে।'

রিজলী সাহেব বাহাদুরের যে এটী কল্পিত উপাখ্যান তা নয়, এইরূপ একটী প্রচলিত প্রবাদ ছিল তাহাই তিনি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা উক্ত উপাখ্যানে এই পাই যে সচ্চাষীরা বা চাষীধব জাতি যদিও চাষাধোবা নামে ইংরাজরাজত্বের পূর্ব্বে প্রখ্যাত ছিল, তথাপি আচার ব্যবহারে তাহারা শুদ্ধ ছিল, নিকৃষ্ট কার্য্য কখনও করিত না। সাধারণ লোকে ভাবিত যে ইহারা যদি চাষাধোবা তবে ধোপার কার্য্য না করিয়া চাষের কার্য্যে সকলেই ব্যাপৃত কেন? নিশ্চয়ই ইহারা চাষা আর ধোপা এই দুইয়ের মিশ্রণ, কিন্তু ইহার বিশেষ কোন নিদর্শন যখন নাই তখন ঐরূপ একটী দেবোৎপত্তি দিলে কোনই বাধা হয় না। এইভাবে ঐ প্রবাদটী ক্রমশ শক্তিবিকাশ করিয়া থাকিবে। কিন্তু অন্যদিকে এই প্রবাদটী সত্য বলিয়া মানিয় লইলেও দেখা যায় যে চাষাধোবা ব্রহ্মার মানসপুত্র, তবে বাল্যে রজকপত্নীর গৃহে অবস্থিত ও প্রতিপালিত এবং ক্রমে কৃষি ও বাণিজ্যে ব্যাপৃত, অন্যথা বাল্যে এরূপ রজকগৃহে লালিত না হইলে দেবসম্ভূত বলিয়া বহু উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য। কিন্তু যাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে গোল নাই, সে নিম্নজাতির গৃহে প্রতিপালিত হইলেও, তাহার জাতিধর্ম্ম লোপ পায় না, তাহার প্রমাণ আমাদের হিন্দুশাস্ত্র।

এইরূপে রিজলী সাহেব মহোদয় খুব শ্রেষ্ঠ ইতিহাস প্রদান করা সত্ত্বেও শেষে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে ইহারা নিশ্চয়ই ধোপা হইতে উত্থিত—ধোপা সভ্য ও শিক্ষিত হইল চাষাধোপা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং আপনাদিগকে উচ্চজাতি বলিয়া মনে করে। কিন্তু তাই যদি সত্য হয় তবে চাষাধোপার সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে কেন?

১৮৭২ সনের	সেনসসে মোট	সংখ্যা ছিল	৪৫,৬২৬
১৮৮১	ঐ	ঐ ঐ	৩১,৫১২
১৯০১	ঐ	ঐ হইয়াছে	২৯,৫০৬

আর আমরা সেনশস রিপোর্টে দেখিতে পাই বঙ্গে রজকের সংখ্যা একলক্ষের উপর। যদি তাহারা সভ্য বা শিক্ষিত হইয়া চাষাধোপা জাতিতে উন্নীত ও গৃহিত হয়, তবে এ জাতির সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাস হইতেছে কেন? এ বৈষম্যের কারণ কি কেহ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন?

আর এক কথা, এই জাতির নাম যাহা এক্ষণে সচ্চাষী বলিয়া পরিগণিত হইবার প্রস্তাবনা, তাহা প্রায় সর্ব্বত্রই চাষাধোবা নামে প্রচলিত আছে, ক্রমে অবশ্য দুই এক স্থলে চাষাধোপা নামে প্রচলিত হইয়াছে। কলিকাতা সিমলা অঞ্চলের একটী রাস্তার নাম চাষাধোবাপাড়া ষ্ট্রীট কিন্তু সেখানে চাষাধোপা এ কথার ব্যবহার নাই। এখন ধোবা কথাটীর মানে ধোপা কিনা তাহাই বিচার্য্য। ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রায়গুণাকরের কালে "বিদ্যাসুন্দর" গ্রন্থে দেখা যায়—

> যুগি চাষাধোপা, চাষাকৈবর্ত্ত, অনেক ॥
> সেকরা, ছুতার, নুড়ী, ধোপা, জেলে, গুড়ী।

পাঠক দেখিবেন প্রথম লাইনে চাষার পরে ধোবা আছে, এবং পরের লাইনে ধোপা আছে। এইটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছে, কেবল যে চাষাধোবা ধোপা হইতে পৃথক তা নয়, কিন্তু ধোবা কথাটীও ধোপা হইতে পৃথক। ঐ কথাটা যে চাষীধব কথারই অপভ্রংশ তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

এখন বেশ প্রতীয়মান হইল যে ধোপার সহিত এ চাষীধব জাতির কোন সম্পর্ক নাই—কি শাস্ত্রসঙ্গত কি অনুপাতগত—যে কোন অনুসন্ধানে এ তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। এখন কথাটা এই যে লোকে যাহাকে চাষাধোপা বলে তাহারা সচ্চাষী হইবে কিরূপে এবং ইহারই বা প্রমাণ কি যে উভয় জাতি এক। ইহার উত্তরে আমাদের অধিক বলিবার নাই। যদি চাষাধোপা কথাটা চাষীধব সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে যখন দেখা যায় ধব মানে স্বামী, শ্রেষ্ঠ, সৎ, তখন চাষীর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সৎ-চাষী নাম কখনও নাম সংস্কার ব্যতীত নব নামকরণ বা গ্রহণ নহে। অর্থাৎ চাষীধব নাম যখন উচ্চারণের দোষে ও পূর্ব্বোক্ত কারণনিচয়ের ফলে চাষাধোবায় পরিণত হইয়া এ জাতির একটী বিশেষ অখ্যাতির ও মর্য্যাদাহানির কারণ হইয়াছে এবং উচ্চজাতীয় সমাজবিশেষ ইংরাজি শিক্ষিত হইলেও যখন সংস্কারবশে

নিম্ন সমাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন, তখন আর ঐ নামটী বজায় রাখা ভাল নহে। একবার যাহা অপভ্রংশে পরিণত হইয়াছে, সংশোধন ও পুনরুদ্ধার করিলেও সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারশূন্য দিনে ও হিন্দি ধোবা কথার বঙ্গে প্রচলন থাকায়, পুনরায় ঐ কু-আখ্যায় পরিণত ও অভিহিত হইতে পারে। এইসকল সন্দেহ ও অপভ্রংশ ও প্রক্ষিপ্তবাদ ও প্রবাদ সমূলে দূর করিবার জন্য আমরা এ জাতির সৎ-চাষী নাম বাহাল করিতে চাই। এ নামটী যে একেবারে কল্পিত তাহা নহে, স্থান বিশেষে এই জাতীয় ব্যক্তিগণ যে যে কৃষিবাচক শব্দে আপনাদিগকে অভিহিত করেন, তাহার মধ্যে এইটী শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় এবং অন্যূন ৫০ বৎসর পূর্ব্বকাল অবধি ঐ সচ্চাষী নাম এমন প্রচলিত আছে, যে, অনেকে বলেন "তোমাদের ও নাম ত প্রচলিত আছে, তবে এত আন্দোলন কেন?" চাষীধব জাতির দলিলপত্রে অধুনা চাষাধোবা নাম লেখা না হইয়া বহুদিন হইতে যে সচ্চাষী নাম ব্যবহৃত হয়, তাহার একটী নিদর্শন দিতেছি। কলিকাতা হাইকোর্টের ১৯০৬ সালের ৩৩নং ইণ্ডিয়ান ল-রিপোর্টে ৯০৫-৯১৪ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন, মাননীয় বিচারপতি উড্‌রফ লিখিতেছেন—

"In my opinion the Satchasi sect of Chatra is a defined class of the general public, and the suit has been properly instituted in their behalf under sec. 30." **অর্থাৎ চাতরার (হুগলী জেলা) সচ্চাষীজাতি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একটী বিশিষ্ট বিভাগ এবং এই মোকর্দ্দমা তাহাদেরই পক্ষে ৩০ ধারা অনুসারে রুজু করা হইয়াছে।**

পুনরায় বিচারপতি লিখিতেছেন—

"Undoubtedly this is a public religious trust, not a trust for the public at large but for a portion of it answering a particular description, *viz.*, the Satchasi caste of Chatra **অর্থাৎ নিশ্চিতই ইহা একটা সাধারণ ধর্ম্মভবন লইয়া বিবাদ কিন্তু তা বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নহে, কিন্তু সাধারণের মধ্যে একটী বিশেষ জাতীয়, যথা চাতরাস্থিত সচ্চাষী জাতীয়।**

উক্ত মোকর্দ্দমার পেপার বুকে ২৭ পৃষ্ঠায় দেখা যায়—

'Registered Patta, executed by Peari Mohun Chakravarti, dated 6th Feb. 1883.—To Rakhal Chandra Dass, son of Panch Courry Dass, by caste *Shatchasi*, occupation trading business."

১৮৮৩ সনেও জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এই জাতি সচ্চাষী বলিয়া দলিলে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত প্যারিমোহন চক্রবর্ত্তীর স্থানে শ্রীরামপুরের মাননীয় অনারেবল রায় কিশোরীলাল গোস্বামী বাহাদুর ঐ জমির এক্ষণে জমিদার। এখন দেখা যাইতেছে যে সচ্চাষী নাম নব গৃহীত বা কল্পিত নহে, অন্তত হাইকোর্টের প্রমাণে ২৮ বৎসর পূর্ব্বেও সচ্চাষী নাম প্রচলিত ছিল। এমন কি পূর্ব্বতন সেনসস রিপোর্টে এ জাতি চাষাধোবা বলিয়া শ্রেণীভুক্ত হইলেও, তৎপার্শ্বে টিপ্পনীতে "a cultivating and trading, also called Satchasi"—'কৃষিবাণিজ্যজীবী সচ্চাষী বলিয়াও এই চাষাধোবারা পরিচিত' এরূপ বর্ণিত আছে।

বুঝিলাম না হয় যে এই জাতির নাম পূর্ব্বে চাষীধব ছিল, পরে অপভ্রংশে চাষাধোপায় পরিণত হওয়ায় স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কৃষিবাচক শব্দে এই জাতি আপনাদিগকে উল্লিখিত করে এবং তন্মধ্যে সচ্চাষী এই কথা অন্তত ৫০ বৎসর প্রচলিত আছে এবং অপর সকল আখ্যার মধ্যে এইটী বহুগৃহীত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং এই জাতীয় ব্যক্তিরা উক্ত নামটী এক্ষণে বিশেষত এই সেনসসে বিশিষ্টভাবে প্রচলন করাইতে চান, কিন্তু কেবল এই নাম পরিবর্ত্তনের ফলে প্রকৃত কি ফল দাঁড়াইবে, জাতির প্রকৃত মর্য্যাদা কি ইহাতে বাড়িবে, পূর্ব্বে তাহাদের কি অবস্থা ছিল এবং এখনই বা সামাজিক অবস্থা কি—ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে; তাহার পরিচয় পাঠককে দিতেছি। আজকাল হিন্দুর সমাজ কেবল আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির উপর অনেকটা প্রতিষ্ঠিত, যে যেমন কাজ করে, তাহার সেইরূপ মর্য্যাদা ও স্থান হয়। এবং আদি ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরও সেইরূপ চিরন্তন প্রথা ছিল কিন্তু মধ্যযুগে সে সমস্ত শাস্ত্রবিধি অতি কুরীতিতে পরিণত ও কুসংস্কারযুক্ত হইতেছিল। অধুনা আবার এমন যুগ আসিয়াছে, যখন নিম্ন সমাজের লোক জ্ঞানী ও শিক্ষিত ও ধনবান হইতে পারিলেই তাহার জাতিগত [illegible] লোপ পাইয়া, তাহার প্রকৃত কার্য্য ও চরিত্রগত বিভাগ হইতেছে। এটী খুব সুলক্ষণ। এবং এই সুসময়ে এই কৃষিজীবী বহুধাভিন্ন বিবিধ নামে পরিচিত চাষীধব জাতি যাহা জেলাবিভাগ ও নদী ও অন্যান্য বিভাগে বিভিন্ন ও ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছে যে সকলে পূর্ব্ববৎ একত্র মিলিত হইতে না

পারিলে আর [illegible]াণের ও উন্নতির আশা নাই। পূর্ব্বে এক সমাজ অন্য সমাজের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিত, কারণ একটা বিশেষ শিক্ষিত ও বর্দ্ধিষ্ণু সমাজ অপর সমাজকে ছোট নিকৃষ্ট মনে করিত, মনে করিত আমরা বেশ আছি, সাধারণের সমক্ষে আমাদের ত কোন অসম্মান নাই, ব্রাহ্মণের বাড়ী, ধনবানের বাড়ী, কলিকাতায় আদর্শ সমাজে আমাদের ত কোন আদর অভ্যর্থনার অভাব নাই, তবে এত "জাতের ঘোঁট পাকাইয়া গরীব চাষাধোবাগুলাকে আমর স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দি কেন।" কিন্তু এখন তাহরাও বুঝিয়াছে যে প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে সকলে পুনায় সম্মিলিত হইতে হইবে, দলবদ্ধ হইতে হইবে, তা না হইলে কোন স্থায়ীফল দাঁড়াইবে না, কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত একটী জেলার সন্তানদিগকে শিক্ষাদান করিল কার্য্য শেষ হইবে না। তাই প্রকৃত পন্থা ক্রমশঃ দৃষ্ট হইতেছে। এই নামসংস্কার করিতে গিয়া সর্ব্বত্রই সচ্চাষিগণ অপর সমাজের সচ্চাষীর সহিত, এমনকি পূর্ব্ববঙ্গের জাতীয় ভ্রাতাগণ যাহারা "হলধর" বলিয়া পরিচিত তাহাদিগেও সহিত, মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে, অন্তত স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না। পূর্ব্ব প্রবন্ধে (কার্ত্তিকের প্রবাসীতে) দেখাইয়াছি এই জাতি বিদ্যাবিস্তারের জন্য কতটা প্রয়াসী, কেবলমাত্র নাম পরিবর্ত্তনের জন্য নহে। অধুনা এই ক্ষত্রিয় বৈশ্যত্বের দিনে এবং সম্মুখে সেনসাস থাকাতে তাঁহারা ছোটলাটের নিকট আবেদন করিবার জন্য সকলে একত্রে স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র দিয়াছেন, পূর্ব্বে কিন্তু পরস্পর চিঠিপত্র লিখিতেই ছোটসমাজকে বড় সমাজ ঘৃণা বোধ করিত এবং মনে করিত উহারা ধোবা আর আমরা [illegible]। পাঠক বুঝুন এই আন্দোলনের নিম্নে একটা [illegible] গঠনের কত বীজ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। [illegible] হিন্দুসমাজের অবস্থা তাহাতে সচ্চাষীর স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট আছে? তাহার উত্তরে শ্রীযুক্ত [illegible] লিখিত বিবরণ দেখিলে সবিশেষ বুঝিতে পারা যা।

২৪ পরগণা জেলার বিবরণে দেখিতে পাইবেন, অনেক উচ্চ জাতিব সহিত ইহাদিগকে শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। হুগলী, যশোহর জেলায় তদপেক্ষা একটু নিম্নে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোথাও কোথাও এরূপ উল্লেখ আছে যে এখানে চাষাধোবা জাতিরা জল-আচরণীয়।

এই জাতীয় ব্যক্তিবর্গ সাধারণত ধর্ম্মপ্রাণ। অনেকেই গোস্বামীর শিষ্য এবং ভাগবৎ পুরাণাদি পাঠে রত। দান একটী এজাতির ভূষণ স্বরূপ, ধান্যকুড়িয়ার জমিদার ও শ্যামবাজারের বল্লভ ও সাউ মহাশয়দিগের ক্রিয়াকলাপের কথা নূতন করিয়া বলিতে হইবে না।

এই জাতির ভিতর যে সমস্ত পদবী প্রচলিত আছে, তাহার একটী তালিকা দিতেছি।

গঙ্গার পূর্ব্বকূলে—রায়, পাইক, হালদার, বল্লভ, সাউ, গাইন, মণ্ডল, বিশ্বাস, কবিরাজ, খাঁ, দাস, আলুনি, কাবাসী, কয়াল, সাঁপুই, ঘরামী, গোলদার, মান্না, তরফদার, বাছাড়, খাঁড়া, সমর্দ্দার, শৈল, মৈতে, কাজলা, টিকারী।

গঙ্গার পশ্চিমকূলে—দাস, মণ্ডল, চৌরঙ্গী, বিশ্বাস, পাড়ুই, প্রামাণিক, বেলেল, বাগ, জালুই, কোটাল, খাঁ, হাতী, পুরকাইত, নবজ্জা, কপাটী, ঢেঁকি, অবতার, সরকার, হিজলী, মাঝি।

পূর্ব্ববঙ্গে—দত্ত, হাজরা, মল্লিক, চৌধুরী, সিংহ, শ্রীমানী, ভৌমিক।

কুলীন মৌলিক প্রথা—"সচ্চাষীদিগের মধ্যে রায়, পাইক, হালদার এই তিন ঘর কুলীন এবং বল্লভ, বিশ্বাস, সাউ ও সোমদ্দার প্রভৃতি আট ঘর সম্মৌলিক আছেন। কায়স্থদিগের মধ্যে যেরূপ গুহ মহাশয়েরা প্রদেশ বিশেষে কুলীনের স্থান অধিকার করেন, সেইরূপ সচ্চাষীদিগের মধ্যেও বল্লভ উপাধিধারিগণ কুলীন পদবাচ্য হইয়া থাকেন।"—সচ্চাষী সুহৃদ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৫।

জাতীয় বর্ণের ব্রাহ্মণ পুরোহিত—এই জাতীয় ব্যক্তিগণের শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ পূজা অর্চ্চনাদির জন্য এক-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট আছেন, তাঁহারা আর কোন জাতির ক্রিয়া কলাপাদি করিতে পান না। কিন্তু যাঁহারা দীক্ষাগুরু তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন ভেদাভেদ নাই, তাঁহারা এ জাতির অপেক্ষা উচ্চ জাতিরও দীক্ষাগুরু হইয়া থাকেন।

শ্রীনন্দলাল দাস, বি,এ,
চাতরা।

সখের ভিক্ষা

(গল্প)

১

মিসেস পাইক বেশ সঙ্গতিপন্ন কিন্তু অতিশয় কৃপণ ছিলেন। বহুকাল হইল তাঁহার স্বামী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, দূরসম্পর্কীয় এক ভাগিনেয় ছাড়া নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন তাঁহার আর কেহই ছিল না। এই ভাগিনেয় প্রায়ই সপ্তাহে সপ্তাহে মামীর খোঁজখবর লইতে আসিত। মামী অপেক্ষা মামীর অর্থের উপরই ভাগিনেয়ের অধিকতর দৃষ্টি ছিল। ভাগিনেয় মনে মনে বলিত, "মামীর হাতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা আছে, বুড়ী আর কদিনই বা বাঁচবে, তারপর সমস্তই ত আমার। এখন একটু খোসামোদ করে মামীকে খুসী রাখা দরকার।" বাহিরে কিন্তু সে মামীকে এইরূপ ধরণের কথা বলিত, "দেখ মামী, শরীরের দিকে একটু দৃষ্টি রেখো,—তোমার যে কি রকম কাণ্ড কিছুই বুঝতে পারিনে! একটু শরীরের দিকে তাকাও না! আজ সকালে তোমার বৌমার সঙ্গে এই কথাই হচ্ছিল। আমি তাকে বলছিলুম মামী যদি একটু শরীরের যত্ন নেন তা'হলে এখনও অনেক দিন বাঁচ্‌তে পারেন।"

মামীও একটু হাসিয়া উত্তর করিতেন, "সে ত ঠিক কথা বাছা! কিন্তু খরচ যে বড্ড বেশী হয়। এই হপ্তায় তিন দিন ডাক্তার এসেছিল—অনর্থক কতকগুলো টাকা খরচ হল।"

ভাগিনেয় রহস্যচ্ছলে বলিত, "তা খরচ হ'লই বা মামী, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমার ত আর টাকার অভাব নেই। তুমি ত টাকার ওপরেই বসে' আছ।"—বলিয়া মামীর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিত—তাঁহার কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয় কি না।

মুখখানি গম্ভীর করিয়া মামী বলিতেন, "টাকার অভাব আর কার নেই! আর যা' দু'পয়সা আছে সব যদি ডাক্তারের ভিজিট দিতেই খরচ হ'য়ে যায় তা'হলে আর নিজে খাব কি?"

ভাগিনেয় হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, "তাইত! সেই ভেবে ভেবেই তোমার অসুখ! তুমি যদি দিন কুড়ি টাকা করেও ডাক্তারের ভিজিট দাও, তা'হলেও তুমি পায়ের ওপর পা দিয়ে সুখে সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিতে পার!"—এই বলিয়া মামীর অজ্ঞাতে মুখ টিপিয়া টিপিয়া আরও হাসিত।

কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া মামা উত্তর দিতেন, "যাঃ যাঃ তোর আর তামাসা করতে হবে না।"

মামী ভাগিনেয়ে এইরূপ চলিত।

মিসেস পাইকের বয়স সত্তরের কিছু উপর হইবে। কিন্তু এখনও তাঁহার শরীরে বেশ বল—এখনও প্রত্যহ একক্রোশ পথ তিনি হাঁটিয়া বেড়ান। কোন রোগ না থাকিলেও নিজেকে চব্বিশঘণ্টা রুগ্না বলিয়া মনে করাই মিসেস পাইকের একটি বিশেষ রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মিসেস পাইকের বাটীর অনতিদূরেই ডাক্তার রে থাকিতেন। মিসেস পাইক একটু অসুস্থ বোধ করিলেই এই ডাক্তারকে ডাকিতেন। ডাক্তারটি নূতন পাশকরা, পশার জমাইবার জন্য রোগীদের বিশেষ যত্ন করিয়া দেখিতেন,—সহরের ডাক্তারদের মধ্যে তাঁহারই ভিজিট সব চেয়ে কম। যত্ন করিয়া দেখিবার জন্য হউক বা না হউক এই শেষোক্ত কারণটির জন্যই বোধ হয় মিসেস পাইক তাঁহাকে পছন্দ করিতেন।

একদিন মিসেস পাইক ডাক্তারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ডাক্তার আসিয়া যথারীতি অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মিসেস পাইক, আমাকে কি জন্য ডেকেচেন?"

মুখমণ্ডল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কাতরকণ্ঠে মিসেস পাইক উত্তর করিলেন, "ডাক্তার, আমার খবর বড় খারাপ।"

ডাক্তার মিসেস পাইককে খুব ভালরকমই চিনিতেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, কি হল আবার!"

"এই তিন চার দিন আমার ভাল খিদে হচ্ছে না—সমস্ত দিনই যেন শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।"

হাসিতে হাসিতে ডাক্তার বলিলেন, "এর জন্য এত ব্যস্ত হয়েচেন! ও সব কিছু না,—মনের বিকার মাত্র। সকালবেলা একটু বেশী করে বেড়াবেন, তা'হলেই সব সেরে যাবে।"

দ্বিগুণ উৎকণ্ঠার চিহ্ন মিসেস পাইকের মুখে ফুটিয়া উঠিল। এক নিশ্বাসে তিনি বলিয়া গেলেন, "না, না, ডাক্তার—আপনি আমার কথাটা ভাল করে বুঝতে পার্‌চেন না। রাত্রে বেশ ঘুম হয় কিন্তু সকালবেলা যেন আর বিছানা থেকে উঠ্‌তে ইচ্ছা করে না—মনে হয় যেন সমস্ত দিনই শুয়ে পড়ে থাকি। আর খেতেও পারিনে—এ ত বড় ভাল লক্ষণ নয়, একটা উপায় ক'রে দিন।"

ডাক্তার মনে মনে খুব খানিকটা হাসিয়া বাহিরে গম্ভীর ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি একটা ওষুধ লিখে দিচ্চি,—এইটে খাবেন, আর সকালবেলা সূর্য্য ওঠা না পর্য্যন্ত বাগানে বেড়াবেন। কতক্ষণ সাধারণতঃ আপনি সকালে বেড়ান?"

"বেশীক্ষণ না—এই আধ ঘণ্টাটাক্।"

"আরও বেশী বেড়ান আবশ্যক। প্রত্যহ আপনি দেড় ঘণ্টা বেড়াবেন, আর মনটা যা'তে বেশ প্রফুল্ল থাকে এমন কাজ করবেন! ভাল, আপনি কি থিয়েটারে যেতে ভালবাসেন?"

"হাঁ, খুব ভালবাসি" কথাটা বলিয়াই মিসেস পাইক যেন একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন—ভাবিলেন কথাটা বলা বড় ভাল হয় নাই। যদি ডাক্তার তাঁহাকে থিয়েটারে যাইতে বলেন তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ! এখনি অনর্থক কতকগুলা টাকা খরচ হইয়া যাইবে।

ডাক্তার বলিলেন, "বেশ ত, এই শনিবার থিয়েটারে আসুন না।"

মিসেস পাইকের সমূহ বিপদ উপস্থিত। ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে উত্তর করিলেন, "হুঁ, গেলেও হয়,—কিন্তু—"

মিসেস পাইকের মনের ভিতর কিরূপ আন্দোলন চলিতেছিল বুঝিতে পারিয়া ডাক্তার তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, না, যা[illegible] এই নিন টিকিট। এরা সখের দল—খুব ভাল অভিনয় করে।"

পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম মুক্ত হইলে যেমন আনন্দ লাভ করে, অর্থ ব্যয় হইবে না জানিয়া মিসেস পাইকও সেইরূপ আনন্দ অনুভব করিলেন, তথাপি একটু গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিলেন, "[illegible] সখের দল! তা'রা আবার কি অভিনয় করবে!"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনাদের ঐ এক ভুল ধারণা! ব্যবসাদার থিয়েটারের দলে সকলেই বেতনভোগী, সখের দলে ত তা' নয়। সখের দলের সময়েরও অভাব নেই—সমস্তক্ষণই 'থিয়েটার' করেই তা'রা দিন কাটায়! আমার বিশ্বাস ব্যবসাদার থিয়েটার দলের চেয়ে সখের দল ইচ্ছা করলেই ভাল অভিনয় করতে পারে।"

"আচ্ছা আমি যাব" বলিয়া মিসেস পাইক ডাক্তারকে বিদায় দিলেন।

২

সেই দিন বিকালবেলা মিসেস পাইক নদীর ধারে পার্কে বেড়াইতে গেলেন। সূর্য্য তখনও ভাল করিয়া অস্ত যায় নাই; অস্তোন্মুখ সূর্য্যের লাল আভা নদীর জলের উপরে পড়িয়া ঝিক্ মিক্ করিতেছিল। মৃদু মন্দ বাতাসও বহিতেছিল। মিসেস পাইক মনের মধ্যে বেশ একটু আরাম বোধ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ বেড়াইয়া বেড়াইয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া মিসেস পাইক একটি বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া বসিয়া লোকজনের যাতায়াত দেখিতেছেন এমন সময় মিসেস পাইক দেখিলেন, একজন ভদ্রলোক তাঁহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া চলিয়া গেল। কিয়দ্দূর গিয়া লোকটি আবার তাঁহার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল এবং কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া আবার চলিয়া গেল। মিসেস পাইক তখন একবার নিজের শরীরের দিকে চাহিলেন—যদি বুঝিতে পারেন তাঁহার কি দেখিয়া লোকটি তাঁহার দিকে এইরূপ ভাবে চাহিতেছে। কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানি অতি পুরাতন, মলিন ও জীর্ণ। লোকটি তাঁহাকে খুব গরীব ঠাওরাইয়াছে ভাবিয়া মিসেস পাইক একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মনে মনে বলিলেন, "হাঁ, ঠিক গরীব লোকই চিনেছে বটে! সত্যিই আমাকে গরীবলোকের মতই দেখাচ্চে! ঐ যে লোকটা আবার আমার দিকেই আসচে! এবার ওর সঙ্গে একটু মজা করা যাক্।" মিসেস পাইক লোকটির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এবারও ভদ্রলোকটি যাইবার সময় মিসেস পাইকের মুখের দিকে একবার চাহিল। মিসেস পাইক তৎক্ষণ

উঠিয়া ভদ্রলোকটির দিকে অগ্রসর হইয়া কাতর দৃষ্টিতে বলিলেন, "মশায়, আমাকে কিছু পয়সা দেবেন—আজ সকাল থেকে আমি কিছু খাইনি।"

"এঁ্যা, বল কি!—সকাল থেকে তোমার খাওয়া হয়নি?" বলিয়া লোকটি পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া মিসেস পাইকের হাতে দিল। মিসেস পাইক মনে মনে বলিলেন, "আমার দরকার নেই তবু ঈশ্বর আমাকে ভিক্ষা জুটিয়ে দিলেন, কিন্তু যার প্রকৃত দরকার তা'কে কেহ একটি পয়সাও দেয় না। বিধাতার এই রকমই নিয়ম বটে!"

লোকটি চলিয়া গেলে মিসেস পাইক বেঞ্চের উপর বসিয়া আর একবার খুব হাসিলেন—সে হাসি মিসেস পাইকের রোগ শোক সব দূর করিয়া দিল। অনেকদিন এত হাসি তিনি হাসেন নাই। আজ যেন তাঁর হাসির ঘরের রুদ্ধ কবাট ভাঙিয়া গেছে।

মনে মনে মিসেস পাইক বলিলেন, "ঠিক, ঠিক, সখের ভিক্ষুক! ডাক্তার বল্‌ছিল, সখের দল ব্যবসাদার দল অপেক্ষা ভাল অভিনয় করে। ঠিক কথা! আমিও আজ ভিক্ষুক সেজে খুব ভাল অভিনয় করেচি! সখের কি না!"

সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত মিসেস পাইক কেবল ঐ কথাই ভাবিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে আহার শেষ করিয়া তিনি ইচ্ছা করিয়াই পূর্ব্বদিনের সেই জীর্ণ মলিন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন, মনে মনে বলিলেন, "আজও লোকদের সঙ্গে একটু মজা করা যাক্।"

পার্কে একটু বেড়াইয়া মিসেস পাইক নদী পার হইয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পসময়ের মধ্যেই মিসেস পাইকের আটআনা রোজগার হইল। তাহার পর একটি নৌকার মাঝিকে ভদ্রলোক ঠাওরাইয়া, মিসেস পাইক বলিলেন, "মশায়, আমাকে কিছু পয়সা দেবেন? আমাকে অনেকটা হেঁটে যেতে হবে, আমি বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েচি।"

লোকটি একটু কর্কশ ভাবে উত্তর করিল, "তোর কষ্ট হচ্চে ত আমার কি রে মাগী! পরের পয়সায় গাড়ী চ'ড়ে যাবেন! ভারি ফূর্ত্তি কি না!" মিসেস পাইকের বড় রাগ হইল কিন্তু কি করিবেন! দ্রুতপাদবিক্ষেপে তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। কিয়দ্দূর গিয়াই আবার ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেইদিন গৃহে ফিরিয়া মিসেস পাইক হিসাব করিয়া দেখিলেন তাঁহার দুই টাকা এক আনা ভিক্ষা লাভ হইয়াছে। মনে মনে বলিলেন, "বাঃ এ ত বেশ মজার ব্যবসা!" আজ আর মিসেস পাইক তেমন করিয়া হাসিতে পারিলেন না—আজ আয়ের হিসাবটাই তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া রাখিল।

এখন হইতে মিসেস পাইক নিয়মিতরূপে ভিক্ষাবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। খুব কম হইলেও মিসেস পাইক প্রতিদিন একটাকা উপায় করিতেন। ভিক্ষা যে নীচবৃত্তি মিসেস পাইকের মাঝে মাঝে ইহা মনে হইত কিন্তু ব্যাধি তখন বিকারে পরিণত, ঔষধ প্রয়োগ বৃথা। তিনি ত আর প্রকৃত ভিক্ষুক নন—এ তাঁহার সখের ভিক্ষা, এই বলিয়া মিসেস পাইক তাঁহার মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতেন।

মিসেস পাইক যখন ভিক্ষা করিতেন তাঁহার করুণ স্বরে এমন একটি মর্য্যাদার ভাব মাখান থাকিত যে, চাহিলে কেহ আর তাঁহাকে ভিক্ষা না দিয়া থাকিতে পারিত না। কখন কখন প্রকৃত ভিক্ষুকের মত, পয়সা কিংবা অন্যকিছু ভিক্ষা পাইলে মিসেস পাইক অতি মিহি-সুরে বলিতেন, "বাবা, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" বলিয়াই তাঁহার বড় হাসি পাইত—অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিতেন। যদি তাঁহার ভণ্ডামি জানিতে পারিয়া প্রকৃত ভিক্ষুকেরা নির্জ্জনে পাইয়া তাঁহাকে 'নাস্তানাবুদ' করে এই আশঙ্কায় মিসেস পাইক তাঁহার সখের ভিক্ষা অতি সাবধানে করিতেন। পুলিশের লো[illegible] অত্যন্ত ভয় ছিল—যদি কেহ তাঁহার ভি[illegible] করা দেখিতে পায় তাহা হইলেই বিপদ!

মিসেস পাইক লোকচক্ষুর অন্ত[illegible]লে প্রতিদিন এমন যে একটি সুন্দর অভিনয় করিয়া যাইতে[illegible]ছেন তাহাতে তাঁহার আত্মপ্রসাদের আর অবধি ছিল না,—আনন্দের চিহ্ন তাঁহার সর্ব্বশরীরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মিসেস পাইক একদিন ডাক্তারের বাড়িতে গিয়া বলিলেন, "দেখুন ডাক্তার, বেড়িয়ে আমার খুব উপকার হয়েচে। আজ কাল রোজই আমি ছ' সাত মাইল বেড়াই!"

মিসেস পাইকের মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিলেন, "তাইত, আপনার চেহারাও দু'দিনে বদ্‌লে গেছে। এখন আপনাকে যে নতুন লোক বলে' বোধ হচ্চে।"

"সত্যই ডাক্তার, আমারও বোধ হয় যেন আমি একটু নতুন রকমের হয়েচি।"

"তা বলে' বেশী পরিশ্রম করবেন না—ক্ষতি হতে পারে।"

"না, না" বলিয়া মিসেস পাইক ডাক্তারের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৩

ক্রীষ্টমাসের সময়। সমস্ত সহর আনন্দময়। দীন, দরিদ্র, ধনী, বালক, বৃদ্ধ সকলের মুখেই একটা আনন্দের ভাব। মিসেস পাইকের ব্যবসায় এই সময়ে 'পুরাদমে' চলিতেছিল। প্রত্যহই তাঁহার অনেক টাকা রোজগার হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মিসেস পাইক একটি লোককে ভিক্ষার জন্য বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। লোকটি বড় ধীর প্রকৃতির,—মিসেস পাইককে তিনি বলিলেন, "দেখ, আমার কাছে কিছুই নাই।" কিন্তু মিসেস পাইক তাহা না শুনিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও মিসেস পাইক যখন কথা শুনিলেন না তখন ভদ্রলোকটি বলিলেন, "দেখ, আবার যদি তুমি আমার কাছে ভিক্ষা চাও তা হলে আমি তোমাকে পুলিশের হাতে দিতে বাধ্য হব।"—ঠিক এই সময়ে বিংশতি বর্ষ বয়স্ক একটি যুবক মিসেস পাইকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি 'কনষ্টেবল' দাঁড়াইয়া হাই তুলিতেছিল। যুবকটি তাহার নিকট গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল। কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ আসিয়া মিসেস পাইকের হাত ধরিয়া বলিল, "চল্ রে মাগী, থানায় চল্।"

মিসেস পাইকের এই অকস্মাৎ বিপদ দেখিয়া সেই ভদ্রলোকটি মিসেস পাইককে বাঁচাইবার চেষ্টায় কনষ্টেবলকে বলিল, "তোমার ভুল হয়েচে। ও ত কিছু করেনি, আমিই ওর সঙ্গে আগে কথা কয়েচি! ও নির্দ্দোষ—ওকে ছেড়ে দাও।"

কনেষ্টবল শুধু বাজে কথায় ভুলিবার পাত্র নয়, সে বলিল, "না মশায়, আমি একে ভিক্ষা করতে দেখেচি!"

ভদ্রলোকটি অনেক প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, মিসেস পাইক নিরপরাধিনী। কিন্তু সেই যুবকটি চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, মাগীটা আমার কাছেও ভিক্ষা চাচ্ছিল।" কনষ্টেবল্ আর কোন কথা না শুনিয়া মিসেস পাইককে থানায় লইয়া গেল।

৪

এই বিষয় লইয়া মিসেস পাইকের প্রতিবেশী মহলে একটা তুমুল আন্দোলন চলিল। তাঁহার এইরূপ দুর্দ্দশায় সকলেই তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "আহা, বুড়ো বয়সেও এত লাঞ্ছনা! পুলিসের কাছ থেকে কাহারও নিস্তার নাই।"

বিচারের দিনে মিসেস পাইকের হইয়া সাক্ষ্য দিতে আদালত লোকে লোকারণ্য। ডাক্তার রেও আসিয়াছিলেন।

এইরূপ অভিযোগ অসম্ভব! মিসেস পাইক প্রভূত অর্থশালিনী, সমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি, বয়সও সত্তর একাত্তর বৎসরের ঊর্দ্ধে,—তিনি কখনই এরূপ নীচ কাজ করিতে পারেন না। বিচারপতি মিসেস পাইককে বে-কসুর খালাস দিলেন এবং সেই যুবকটিকে তাহার কার্য্যের জন্য মিসেস পাইকের নিকট ক্ষমাভিক্ষা চাহিতে আদেশ করিলেন।

মিসেস পাইক নির্ব্বাক। তাঁহার কেবলি মনে হইতে লাগিল আজ মর্ত্ত্য আদালতে মানব-বিচারকের সম্মুখে নিরপরাধিনী হইয়াও তিনি প্রকৃত অপরাধিনী;—সেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিচারকের নিকট তাঁহার অপরাধ ত আর গোপন নাই। উত্তেজনায় মিসেস পাইকের বক্ষ বিকম্পিত হইতে লাগিল, লজ্জায় তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল এবং কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল—অদৃষ্টের এ কী দারুণ পরিহাস!

জনমণ্ডলী মিসেস পাইকের মুখের দিকে স্তম্ভিত ভাবে চাহিয়া রহিল। অপরাধী মুক্তি পাইলে তাহার মুখে যে আনন্দ-রশ্মি ফুটিয়া উঠে মিসেস পাইকের মুখে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই।

ধীরে ধীরে মিসেস পাইক বিচারালয় হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন—বন্ধুবান্ধবদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া পর্য্যন্তও তাঁহার আর হইল না। তখনও তাঁহার মুখ বিষাদসমাচ্ছন্ন। বিচারক তাঁহাকে মুক্তি দিল বটে কিন্তু বিবেক তাঁহাকে মনের নিকট চিরদিনের জন্য অপরাধিনী করিয়া রাখিল। অপরাধী দণ্ড পাইলে অনেকটা শান্তি অনুভব করে, কিন্তু আজ অপরাধিনী মিসেস পাইকের নিকট মুক্তিদণ্ড বড় ভীষণ কঠিন হইয়া উঠিল।

* * * *

ইহার কিছুদিন পরে খবরের কাগজে দেখা গেল, মিসেস পাইক এই মর্ম্মে একখানি 'উইল' করিয়াছেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্র-সেবায় ব্যয়িত হইবে।*

শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রপরিচয়

গণেশ-জননী

এই চিত্রখানি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পিত। দুর্গা শিশু গণেশকে হাতের উপর দাঁড় করাইয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, গণেশ শুঁড় দিয়া মায়ের আঁচলে বেল পাড়িয়া দিতেছেন। এই পরিকল্পনা কবিকৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। গণেশের ক্রীড়াচঞ্চল ভঙ্গি, দুর্গার শান্ত ভাবতন্ময় মুখশ্রী এই চিত্রের প্রধান বিষয়; এ ছাড়া চিত্রের পশ্চাৎদৃশ্য অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে; কৈলাসের উত্তুঙ্গ শিখরপার্শ্বে ছিন্ন মেঘের অন্তরালে খণ্ডচন্দ্র ও ঘনপল্লব তরুরাজির সম্মুখে বিরলপত্র বিল্বশাখা বৈপরীত্যহেতু মনের মধ্যে বিচিত্র ভাবসঞ্চার করিয়া দেয়।

---

* Maxwell হইতে অনুবাদিত।

আলোচনা

কর্ম্মক্ষেত্রের আহ্বান

গত মাঘ মাসের "প্রবাসী"তে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের মালদহে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধ "সাহিত্যসেবী" প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম উহা লইয়া বেশ একটা আলোচনা চলিবে। কিন্তু বিষয়টা বাস্তবিকই যেন চাপা পড়িয়া গেল বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহা আমাদের দেশের পক্ষে শুভ লক্ষণ নয়। সাহিত্যসম্মিলনগুলিতে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হয় বা যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় সে সম্বন্ধে সম্বৎসরব্যাপী একটা আলোচনা চলিলে তবে তাহার একটা স্থায়ী ফল ফলিতে পারে। আর সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধ ও গৃহীত প্রস্তাবগুলি যে শুধু সম্মিলনক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যক্তিদিগেরই উপর একটা দায়িত্ব আনিয়া দেয় তাহা নয়, উপস্থিত, অনুপস্থিত সকল বাঙালীরই মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের উপর সেগুলির একটা দাবি আছে,—বাঙালী, বাঙলা-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই সেগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিতে ও তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিতে ন্যায়ত বাধ্য বলিয়া মনে হয়।

বিনয় বাবু উক্ত প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই:—আমাদের দেশে কাব্য উপন্যাস ও কথাসাহিত্য বাদ দিলে সাহিত্য-পদবাচ্য আর কিছু আছে কি ভাবিয়া দেখিতে হয়: ইতিহাস, সমালোচনা-বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বাঙলাভাষায় আমাদের দেশে অতি অল্প গ্রন্থই রচিত হইয়াছে; এমন কি সমালোচনা-বিজ্ঞানের সূত্রপাতই হয় নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। যখন কোনো দেশীয় সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানসমূহ ব্যক্ত ও প্রচারিত হয় তখনই তা[illegible] প্রকৃত পক্ষে উন্নত ও আদর্শস্থানীয় সাহিত্য বলা যাইতে [illegible]। বলা বাহুল্য আমাদের সাহিত্য সে অবস্থায় আসি[illegible] নাই। সে অবস্থায় পৌঁছিতে হইলে আমাদের সাহিত্যকে অবিলম্বে জগতের সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানসম্পদের অধিকারী করিতে হইবে। দেড়শত বৎসরে প্রকৃতির সাধারণ গতিতে আমাদের যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। কিন্তু যখন আমরা আমাদের এই সাহিত্যদৈন্য গভীরভাবে অনুভব করিতে পারিয়াছি, তখন আর একান্ত ভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকা ঠিক নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেমন সময়ে সময়ে বৈদেশিক শিল্পবিজ্ঞানের ধারা আনিয়া নিজেদের উন্নত ও পুষ্ট করিয়াছে, চেষ্টা করিলে আমরাও সেইরূপ পারিব। সে জন্য এক এক বিষয়ে বিশেষরূপ পারদর্শী অনেকগুলি পণ্ডিতের অধীনে কতকগুলি সুশিক্ষিত যুবক কাজ করিলে এই উদ্দেশ্য অল্পকাল মধ্যেই সংসাধিত হইতে পারে। যাহাতে এই কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সে জন্য উক্ত পণ্ডিতগণ ও সহকারী কর্ম্মিবৃন্দের অনন্যকর্ম্মা হওয়া প্রয়োজন। তাঁহাদিগকে অনন্যকর্ম্মা করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ আবশ্যক। এই অর্থ আসিলেই, যে সাহিত্যিক উন্নতি তিনশত বৎসরে সম্ভবপর হইত তাহা দশ বৎসরে সম্ভবপর হইতে পারিবে। যে দেশের সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত অবশ্যপাঠ্য (Compulsory) হইয়াছে সে দেশের লোকের পক্ষে দেশীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে নিশ্চেষ্ট থাকা কোনমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না। যাহাতে অনতিবিলম্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী অবধি জগতের সর্ব্বোচ্চ